মনোজ বসুর
শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভার

॥ সুবর্ণ খণ্ডের সূচী ॥

গ্রন্থপ্রকাশ

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ   ১৩৮০ ;

প্রকাশক ঃ   নন্দিতা বসু
গ্রন্থপ্রকাশ,
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক ঃ   ব্রজলাল চক্রবর্তী,
মহামায়া প্রেস,
৩০।৬।১, মদন মিত্র লেন,
কলকাতা ৭০০০০৮০

প্রচ্ছদ ঃ প্রণবেশ মাইতি

আলোক চিত্র : মোনা চৌধুরী

নিশিকুটুম্ব

প্রথম পর্ব

ও

দ্বিতীয় পর্ব

(একত্রে)

মনোজ বসু

অকাদেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ

গ্রন্থপ্রকাশ

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম পর্ব

আমার পিতৃদেব

রামলাল বসুর

পুণ্য স্মৃতিতে

এত শৈশবে তাঁকে হারিয়েছি যে চেহারাই মনে করতে পারিনে।
তাঁর পদ্য ও গদ্য রচনার মধ্যেই পিতৃসান্নিধ্য পেয়েছি।

প্রথম পর্ব

এক

গায়ের উপর মৃদু স্পর্শ। বাহুর উপর, বাহু থেকে গলায়, তারপর কোমরের দিকটায়। জানি গো জানি—তোমার হাতের আঙুল। চঞ্চল আঙুলগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে সরীসৃপের মতন।

ঘুমের মধ্যে আশালতার মুখে হাসি খেলে যায়। সর্বাঙ্গ শিরশির করে। ঝিমিয়ে আসে আরও যেন চেতনা। হাত একটা বাড়িয়ে দেয় পুরুষের দিকে, কাছে টেনে আনে। একেবারে কাছে। হবে এই রকম, সাহেব তা জানে। ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে।

নাম হল গণেশ, সাহেব-সাহেব করে সকলে। আরও পরে অঞ্চলময় এই নাম ছড়িয়ে গিয়েছিল, সকলের আতঙ্ক—সাহেব চোর।

হাতের বেষ্টনে আশালতা কঠিন করে বেঁধেছে। যুবতী মেয়ের দেহের মধ্যে নিঃসাড় হয়ে আছে সাহেব। মেয়েমানুষের কোমল অঙ্গের উষ্ণ স্পর্শ নয়—কাঠ এক-টুকরো। অথবা খুব বেশি তো তুলোর পাশবালিশ একটা। এ-ও নিয়ম। নিঃসাড় হয়ে খানিক পড়ে থেকে ভাব বুঝে নেবে। তারপরে কাজ।

ঘর অন্ধকার। যত অন্ধকার, তত এরা ভাল দেখে; চোখ জ্বলে যেনি বিড়ালের মতো, সময়বিশেষে বন্য বাঘের মতো। মেয়েটা কালো কি ফর্সা ধরা যায় না, কিন্তু ভরভরন্ত যৌবন। নিশিরাত্রে বিশাল খাটের গদির বিছানায় যৌবনে যেন ঢেউ দিয়েছে, দেহ ছাপিয়ে যৌবন উছলে পড়ে যায়। কিন্তু এ-সবে গরজ নেই কিছু। কোমরে সোনার চন্দ্রহার বেরিয়ে পড়ে চিকচিক করছে, যতটা দেখা যায় দুরকম—একালের নেকলেশ, সেকালের কণ্ঠমালা। বেশিও থাকতে পারে। হাতে কঙ্কণ, বাহুতে অনন্ত, 'কানে কানপাশা। হাত বুলিয়ে দেখে নিয়েছে সাহেব, হাতের স্পর্শে ওজনেরও মোটামুটি আন্দাজ পেয়েছে। দিব্যি ভারী জিনিস। হবেই —নবগ্রামের সেন-বাড়ির বউ যে। সেনেরা পুরনো গৃহস্থ, টাকাকড়ির বড় দেমাক। সেই বাড়ির শঙ্করানন্দ সেনের সঙ্গে আশালতার বিয়ে হয়েছে সম্প্রতি। খুঁজিয়াল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাবতীয় খবর সংগ্রহ করেছে, অতিশয় পাকা লোক ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য, তার খবরে ভুল থাকে না।

দোজপক্ষের বর শঙ্করানন্দ—বিয়ের আগে বুড়ো বর বলে ভাংচি পড়েছিল। কন্যাপক্ষের জ্ঞাতিগোষ্ঠি ও আত্মীয়-স্বজনরা দোমনা হলেন, শুভকর্মে টালবাহানা হল খানিকটা। কিন্তু মিথ্যা রটনা, দুটো-পাঁচটার বেশি বরের মাথায় চুল পাকে নি। হিংসা করে লোকে বুড়ো বুড়ো করছিল। বিয়ের পরে এবার সেনরা তার

শোধ তুললেন। নতুন বউকে পাঠিয়েছেন। মেয়ের সুখ দেখুক সেই হিংসুকেরা, দেখে জ্বলে পুড়ে মরুক।

হয়েছে ঠিক তাই। আশালতা বাপের বাড়ি পা দিতে খবর হয়ে গেল। বউ-মেয়েরা ভেঙে এসে পড়ে। তাকে দেখতে নয়—পাড়ার মেয়ে চিরকালই দেখে আসছে, নতুন করে কি দেখবে আবার। দেখছে গয়না। হাতের গয়না, কানের গয়না, সিঁথির গয়না, খোঁপার গয়না, গলার গয়না, কোমরের গয়না, পায়ের গয়না—দেখে সব হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। নিজে দেখে, অন্যকে দেখায়। মুখ সিঁটকায়ঃ ওমা, সেকেলে প্যাটার্ন, ঠাকুরমা-দিদিমারা পরতেন, আজকাল কেউ পরে না এ জিনিস। আবার তারিফও করছেঃ সে যাই হোক, মালে আছে কিন্তু। আজকালকার ফঙ্গবেনে জিনিস নয়।

বলছে হেসে হেসে বটে, মনের মধ্যে বিষের জ্বালা। মেয়েটা সেদিন সাদামাটা অবস্থায় শ্বশুরবাড়ি গেল, আজ দুপুরে রাজরাজেশ্বরী হয়ে ফিরেছে, দেখ। সারা বিকাল পাড়াশুদ্ধ আনাগোনা, রাত্রি হয়ে গেল তখন অবধি চলছে। এরই মধ্যে এক গণকঠাকুর এসে গেছেন বাড়িতে—ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য। অতি মহাশয় ব্যক্তি তিনি। এই তল্লাটে ঘুরছেন ক'দিন। আজ সকালে গাঁয়ের ঘাটে এসেছেন। আশালতার হাত দেখে আশীর্বাদ করে গেছেনঃ বৃহস্পতি তুঙ্গী, সুখ-সৌভাগ্যের সীমা থাকবে না তোমার মা, কিং কুর্বন্তি গ্রহাঃ সর্বে যস্য কেন্দ্রী বৃহস্পতি। আশীর্বাদ করে যথারীতি প্রণামী নিয়ে গেছেন। তাঁর যা করণীয়, সন্ধ্যার আগে সুসম্পন্ন হয়ে গেছে।

রাত দুপুরে এইবার সাহেবদের কাজ। ডেপুটি অপেক্ষা করছে বাঁশবাগানের অন্ধকারে। আরও দূরে তীক্ষ্মদৃষ্টি সতর্ক পাহারাদার। আজ রাত্রের কারখানার কারিগর সাহেব। কিন্তু খাটের উপর আশালতার কঠিন বন্ধনে সে বাঁধা পড়ে আছে। তবু তো দেখেনি মেয়েটা, কী রূপ ধরে এই পুরুষ। ফর্সা ধবধবে দেহবর্ণের জন্য নাম হয়ে গেল সাহেব। সায়েব একেবারে মড়া হয়ে পড়ে আছে—নিঃশ্বাসটাও পড়ে কি না পড়ে। অজগর সাপে পেঁচিয়ে ধরেছে যেন। অজগরের কবল থেকে এমনি কায়দায় বাঁচতে হয়—জোরজারি করতে গেলে উল্টো ফল ছোবল দেয়।

সত্যি সত্যি ঘটেছিল তাই এক নিশিরাত্রে। সাহেব সোলমাছ ধরতে গিয়েছিল কুঠির দীঘিতে। ফুলহাটা গাঁয়ে সেকালের নীলকর সাহেবদের শৈবালাচ্ছন্ন বিশাল দীঘি। ছিপে বেঙ গেঁথে পাড়ের জঙ্গলের ভিতর দাঁড়িয়ে সাহেব জলের উপর নাচাচ্ছে। পায়ের উপর এমনি সময় ঠাণ্ডা স্পর্শ। এই জঙ্গলে জাত গোখরো কালাজ কেউটে কত যে আছে, সীমাসংখ্যা নেই। তাদের একটি নিঃসন্দেহে। সায়েব স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, একবিন্দু নড়চড়া করে না। দুখানা পায়ের পাতার উপর দিয়ে সাপ ধীরে ধীরে গড়িয়ে চলে গেল গাছের শিকড় বা অমনি একটা কিছু ভেবে। চলে গেছে, তখনও সাহেব অচল অনড়। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে জায়গা থেকে সরে এল। আজকেও অবিকল তাই।

উঁহু তার বেশি। সাপের চেয়ে যুবতী মেয়েমানুষের কবল বেশি শক্ত। শুধু

চুপচাপ থেকে হবে না, আলতো ভাবে আঙুল বুলাতে হবে পায়ে—আদর-সোহাগ যেন গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে পাঁচটা আঙুলের ডগা বেয়ে। এবং মুখে নিদালি-বিড়ি —প্রয়োজন মতো ধোঁয়া ছাড়বে। চুপিসারে এরই মধ্যে কাজ চলেছে। শিকার বল কিম্বা মক্কেল বল সে মেয়ে ব্যাপার কিছু বুঝতে পারে না—নিজেকে এলিয়ে দিয়ে আরও সুবিধা করে দিচ্ছে কাজের। জোঁক ধরলে যেমন হয়—দু-মুখ দিয়ে রক্ত শুষে নিচ্ছে, সে কি টের পায়? সুড়সুড় করছে ক্ষতস্থানে, আরাম লাগছে। হাত দুটো জোঁকের দুই মুখের মতন হতে হবে, ওস্তাদ বলে দিয়েছে।

দুটো হাতই ব্যস্ত এখন সায়েবের। বাঁ-হাতটা আদর বুলাচ্ছে, ডান হাতের ক্ষিপ্র আঙুলগুলো ইতিমধ্যে নেকলেশ, চন্দ্রহার, কঙ্কণ একটা একটা করে খুলে সরিয়ে নিল। গা খালি হয়ে গেল—কিছুই টের পায় না মেয়ে, আবেশে চোখ বুজে আছে। হাতের এমনিধারা মিহি কাজ। শুধু সাহেবই পারে, আর পারতেন বোধ-হয় সেকালের মুরুব্বিদের কেউ কেউ। আজকাল ওসব নেই, কষ্ট করে কেউ কিছু শিখতে চায় না। নজর খাটো—সামনের মাথায় ক্ষুদকুড়ো যা পেল কুড়িয়েবাড়িয়ে অবসর। কাজেরও তাই ইজ্জত থাকে না—বলে, চুরি-ছ্যাঁচড়ামি। সেকালে ছিল —চোর মানেই চতুর, চুরি হল চাতুরী।

চুরিবিদ্যা বড়বিদ্যা—বড় নাম এমনি হয় নি। অতিশয় কঠিন বিদ্যা। এ লাইনে দিকপাল হতে হলে ওস্তাদের কাছে রীতিমত পাঠ নিতে হত। পরীক্ষা দিতে হত। সাদা কাগজে খানিকটা কালির আঁকজোক কেটে বি-এ এম-এ-র মতো পরীক্ষা নয়। সাহেবের ওস্তাদ পচা বাইটা—পরীক্ষায় পাশ করে তবে তার 'বাইটা' খেতাব। সে যে কী ভীষণ পরীক্ষা—কিন্তু থাক এখন, ওস্তাদের মুখেই শোনা যাবে যথাসময়ে। এবং সাহেবকে কঠিনতর পরীক্ষা দিতে হল ঐ বাইটা মশায়ের কাছে—।

সাহেব নিঃসাড়ে পড়ে আছে। কাজ চুকেছে, নড়াচড়ার জো নেই। সেই মাছ ধরতে গিয়ে সাপ পায়ে ওঠার অবস্থা। যতক্ষণ না যুবতী নিজের ইচ্ছায় বাহুর বাঁধন খুলে দিচ্ছে, ততক্ষণ পড়ে থাকবে এমনি। হল তাই—একসময় হতেই হবে —হাত সরিয়ে নিয়ে আশালতা নড়েচড়ে ভাল করে শুল। সুড়ুৎ করে সাহেব উঠে পড়ে তখনি। দুয়োরের খিল খুলে রেখে দিয়েছে, টিপিটিপি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। ধীরেসুস্থে সমস্ত, তাড়িঘাড়ির কিছু নয়। বেরিয়ে পড়ে এক লহমার মধ্যে হাওয়া হয়ে মিলিয়ে যায়।

যুবতী আবেশে বিহ্বল। অনেকক্ষণ সাড়া না পেয়ে কথা ফুটল এইবার। ফিসফিসিয়ে বলে, ঘুমুলে? চোখ মেলল। ধ্বক করে অমনি মনে পড়ে যায়, শ্বশুরবাড়ি কোথা—এ যে বাপের বাড়ি। একে একে সমস্ত মনে পড়েঃ নবগ্রাম থেকে আজ দুপুরে বাপের বাড়ি জুড়নপুর চলে এসেছে। শঙ্করানন্দ তাকে জুড়ন-পুরের ঘাটে নামিয়ে দিয়ে সেই পানসিতে খুলনা সদর চলে গেল। সম্পত্তিঘটিত জরুরি মামলা সেখানে। কাল নিশিরাত্রে কথা কাটাকাটি এই নিয়ে। আশালতা বলেছিল, যেও না, অসুখ হয়েছে বলে মামলার সময় নাও। শেষটা ফোঁস করে

নিশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে গুটিশুটি হয়ে শুয়ে পড়ল, বর অশেষ রকমে চেষ্টা করেও সে মান ভাঙ্গাতে পারে নি। তার পরে বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর কিছু সে জানে না। সকালবেলা চক্ষু মুছে উঠেই রওনা হবার তোড়জোড়। শঙ্করানন্দ বলে গেছে, বাড়ি ফেরবার মুখে শ্বশুরবাড়ির ঘাটে নামবে একবার, নেমে একটা দিন অন্তত থেকে দেখেশুনে যাবে। তার এখনো ছ-সাত দিন দেরি। অভ্যাসে আশালতা কিনা আজ রাত্রেই ভিন্ন এক পুরুষকে সেই মানুষ ভেবে—ছি-ছি-ছি!

ছি-ছি করে জিভ কাটে। সত্যি সত্যি ঘটেছে, অথবা ঘুমের ভিতর আজব স্বপ্ন একটা? উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি আশালতা আলো জ্বালে। দক্ষিণের পোতার ঘরে ছোটবোন শান্তিলতাকে নিয়ে শুয়েছে। বড় খাটের শেষ প্রান্তে দেয়াল ঘেঁষে শান্তি ঘুমুচ্ছে বিভোর হয়ে—এত কান্ড হয়ে গেল, কিছু জানে না। খোলা দরজা হাঁ-হাঁ করছে! কেমন একটা গন্ধ গন্ধ ঘরের মধ্যে—অতি মধুর। আর দেখে, জানলার ঠিক নিচে সিঁধ।

চোর, চোর! চোর এসেছে—

আচমকা চেঁচামেচিতে শান্তিলতা ধড়মড়িয়ে উঠে দিদিকে জড়িয়ে ধরে। থরথর কাঁপছে, কুক ছেড়ে কেঁদে ওঠে। বাড়িসুদ্ধ তোলপাড়। বড়ভাই মধুসূদন লাফ দিয়ে উঠানের উপর পড়ল। ভাজ ছুটে এসে তার হাত এঁটে ধরে। চার বছরের ছেলেটাও দেখি ঘুম ভেঙে দাওয়ায় বেরিয়ে এসেছে। মধুসূদনের মা গিয়ে তাড়াতাড়ি বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলেন। চাকর মাহিন্দারেরা বাইরে-বাড়ি থেকে ছুটে এল। কর্তামশায়ের ওঠার অবস্থা নেই, পুবের ঘর থেকে তুমুল চিৎকার করছেন তিনি।

কোন দিকে গেল চোর? কতক্ষণ পালাল? দাঁড়িয়ে কী গুলতানি হচ্ছে, বাইরে গিয়ে দেখ সব। নিয়েছে নাকি কিছু? কি কি নিল?

এইবারে আশালতার খেয়াল হচ্ছে, কোমরের চন্দ্রহারটা নেই। পুরানো ভারী জিনিস, অনেক সোনা—বুড়ি দিদিশ্বাশুড়ী এই দিয়ে নতুন বউয়ের মুখ দেখেছিলেন। গলার নেকলেশটাও নেই যে! একটা হাতের কঙ্কণ নেই। এ দুটো শঙ্করানন্দের আগের স্ত্রীর গয়না। ডান হাত চেপে কাত হয়েছিল, একটা কঙ্কণ তাই রক্ষে পেয়েছে।

মধুসূদন ওদিকে হাত ছাড়াবার জন্যে ঝুলোঝুলি। বউয়ের উপর তড়পাচ্ছে: ছাড়ো বলছি। অপমানের একশেষ। বলি, বাড়িটা আমাদের না চোরের? যেখানে থাকুক টুঁটি চেপে ধরব। আকাশে উঠুক আর সাগরে ডুবে যাক, আমার কাছে পার পাবে না।

বউ প্রাণপণে ধরে থাকে। মুখের কথাই শুধু নয়, মানুষটা সেই রকমের বটে। রোগা দেহ, বলশক্তিও তেমন নেই, কিন্তু দুনিয়ার উপর কিছুই পরোয়া করে না। কপালখানা জুড়ে কাটা দাগ—সে চিহ্ন কোনদিন মুছবার নয়, একবারের গোয়ার্তুমির পরিণাম। হাড়মাংস কেটে ইঞ্চিখানেক ফাঁক হয়ে গিয়েছিল, যমে-মানুষে টানাটানি করে বাঁচিয়েছে, কিন্তু শিক্ষা হয়নি কিছুমাত্র। ছাড়া পেলেই ধনুক থেকে ছোঁড়া

তীরের মতো অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

বউ বোঝাচ্ছে: একজন দু-জন নয় ওরা দল বেঁধে আসে। তলোয়ার-ছোরা সঙ্গে রাখে। সেবারে মাথা ফাটিয়েছিল, গলা কেটে নেবে কোন দিন।

মধুসূদন গর্জে ওঠে: নিক তাই। অসতের সঙ্গে লড়ে প্রাণ যাবে তো যাক। সে মরণে পুণ্যি আছে।

বউ রেগে উঠে ব্যঙ্গের সুরে বলে, কাজকর্ম না থাকলে বড় বড় বচন আসে অমনি। মাথার উপরে সব রয়েছেন, সংসারের কুটোগাছটি ভাঙতে হয় না তো!

আশালতা হাপুসনয়নে কাঁদছে। গয়নার শোক বড় শোক মেয়েদের কাছে। অঙ্গ একখানা কেটে নাও, খুব বেশি আপত্তি নেই। কিন্তু সেই অঙ্গের গয়নাখানা অতি-অবশ্য খুলে রেখে যেও। মা বকছেন: একটা একটা করে এতগুলো জিনিস গা থেকে খুলল, টের পেলি নে তুই। ঘুমুচ্ছিলি না মরেছিলি?

কেমন করে খুলে খুলে নিয়েছে সে তো মরে গেলেও বলা যাবে না। যা মনে আসে মায়ের কাছে সেই রকম বলে যাচ্ছে: কঙ্কণে টান পড়তেই তো ধড়মড়িয়ে উঠলাম মা। কে-কে—করছি, দুড়দাড় করে পালিয়ে গেল। যদি টের না পেতাম, গয়নার একখানাও থাকত নাকি?

গয়নার দুঃখ আছে—কিন্তু তার চেয়ে বড় দুঃখ, মেয়েমানুষের জীবনে সকলের বড় যে গয়না অচেনা পুরুষ এসে তার খানিক তচনচ করে দিয়ে গেল। খানিকটা তো বটেই। আশালতা তাই হতে দিয়েছে, নিজেই যেচে তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়েছে। সেই বুক-ফেটে চৌচির হবে, কিন্তু কোনদিন মুখ ফুটবে না কারও কাছে।

চোরের নামে পাড়াপ্রতিবেশী এসে জুটছে। সিঁধের দিকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে কেউ কেউ। বড় বাহারের সিঁধ গো! দেখ দেখ—জানলার গরাটের নিচে মাটির দেয়াল আধখানা চাঁদের মত কেটেছে। কেটেছে যেন কম্পাস ধরে, একচুলের এদিক-ওদিক নেই। হাত কত চোস্ত হলে তাড়াতাড়ির মধ্যে এমন নিখুঁত গর্ত হয়।

কাজের প্রশংসা সাহেব কানে শুনছে না—কিন্তু জগবন্ধু বলাধিকারীর গল্পের সঙ্গে অবিকল মিলে যায়। পণ্ডিত মানুষ বলাধিকারী, হেন শাস্ত্র নেই যা তাঁর অজানা। সাহেব তাঁর বড় অনুরক্ত। মৃচ্ছকটিক নাটকের গল্প। ব্রাহ্মণ-ঘরের ছেলে শর্বিলক এদিকে চতুর্বেদ বিশারদ, আবার চোরও তেমনি পাকা। চারুদত্তের বাড়ি সিঁধ কেটে গয়না নিয়ে গেছে। গচ্ছিত-রাখা গয়না সমস্ত—কি নিয়ে গেছে, ক্ষতির বিবেচনা পরে। চারুদত্ত মুগ্ধ হয়ে সিঁধ দেখছে—সত্যিকারের শিল্পকর্ম একটি। সাহেবদেরও তেমনি কতকটা—হাতের কাজের তুলনা নেই। জাত-কারিগরের কাজ।

পাড়ার এক গিন্নি করকর করে ওঠেন: কেমনধারা আক্কেল তোমার আশার মা! সোমত্ত মেয়ে তার এক গা গয়না—কি কি নিয়ে গেল শুনি? সেই চন্দ্রহার, বল কি, অনেক দামের জিনিস গো, বিস্তর সোনা—

বিকালবেলা ইনিই কিন্তু অন্যকে চোখ টিপে বলেছিলেন, সোনা না কচু। গিল্টি। কাপড়ের নিচে কোমরে পরবে, কেউ চোখে দেখবে না, সোনা কেন দিতে যাবে? সোনায় গিনি গেঁথে তার চেয়ে সিন্দুকে রাখবে। বলেছিলেন

এমনি সব। সেই চন্দ্রহার চুরি যাওয়ায় মনে মনে আরাম পাচ্ছেন! বলছেন আক্কেল বলিহারি! সোমত্ত মেয়েটাকে ঐটুকু এক গুঁড়ো মেয়ের হিল্লেয় আলাদা করে দিয়েছ। তবু ভাল যে শুধু গয়নার উপর দিয়েই গেছে—

অপ্রতিভ হয়ে মা বলছেন, বললাম তো আমি শুই তোর সঙ্গে, শান্তিলতা বাপের কাছে থাকুক। মেয়ে আড় হয়ে পড়ল, ঠেলে পাঠিয়ে দিল পুবের ঘরে। আজকালকার মেয়ে কারও কি কথা শোনে!

আশালতা কাঁদতে কাঁদতে বলে, বাবা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। রাত্তির-বেলা কখন কি দরকার হয়—

মধুসূদনের বউ বলে, আমিও তো বলেছিলাম ভাই—

তার কথায় আশালতা জবাব দেয় না। বলেছিল বউ সত্যিই, কিন্তু আশালতাই প্রাণ ধরে সেটা হতে দেয় নি। বর নিয়ে শোওয়ার স্বাদ পেয়ে এসেছে, মন চায় নি ওদের স্বামী-স্ত্রীকে আলাদা করতে। তাছাড়া একটা-দুটো রাতের ব্যাপার নয়, চৈত্র মাস সামনে—সেই মাসটা পুরো থাকবে সে বাপের বাড়ি। দাদা-বউদি ততদিন আলাদা শোবে—নিজের হলে ঠেকবে কেমন? এই তো একটা রাতের বিচ্ছেদেই কী কেলেঙ্কারি ঘটে গেল।

যত ভাবছে, ভয়ে লজ্জায় তত কাঁটা হয়ে যায়। গয়না চুরি নিয়ে শ্বশুরবাড়ির ওরা কি বলবে? এত সাজিয়ে বউ পাঠাল, কী বেশে গিয়ে দাঁড়াবে আবার সেখানে! বলতেও পারে, বাপ-ভাই গয়না বেচে দিয়ে চুরির রটনা করেছে। মুখে না বলুক, মনে মনে ভাববে হয়তো তাই। সর্বরক্ষে, তবু ঐ ছাইভস্ম সোনার উপর দিয়ে গেছে, ধর্ম কেড়ে নেয় নি। কেড়ে নেবার কথাও তো ওঠে না, ঘুমের ঘোরে তখনকার যা অবস্থা—

পাড়াশুদ্ধ লোক হৈ-চৈ করে চোর ধরতে বেরুল। ঘরের ডানদিকে কশাড় বাঁশবন। লণ্ঠন তুলে কয়েকজন উঁকিঝুঁকি দেয় সেদিকে। বেশি এগোবার সাহস নেই—কী জানি কোনখানে বজ্জাত চোর ঘাপটি মেরে আছে। দিল বা অন্ধকারে এক বাঁশের বাড়ি কষিয়ে। একদা মধুসূদনের মাথা যেমন দু-ফাঁক করে দিয়েছিল।

থানা ক্রোশখানেক দূরে। বাঁশবনটা ছাড়িয়েই নদী, কিনারা ধরে পথ। তারার আলোয় নদীর-জল চিক-চিক করছে। ঘাটের উপর এক ডিঙিতে গণকঠাকুর ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য সুর করে মহাভারত পাঠ করছে। আরও পাঁচ-ছ'খানা নৌকো—মাঝিমাল্লা চড়ন্দার উৎকর্ণ হয়ে শুনছে সকলে। হেন কালে চোর-চোর উৎকট চেঁচামেচি। চোরের নামে এ-নৌকো সে-নৌকো থেকে নেমে পড়ে অনেকে। পাঠে বাধা পড়ে যায়, ভট্টাচার্য অতিমাত্রায় বিরক্ত। গ্রামের চৌকিদার এই রাত্রে খবর দিতে থানায় ছুটেছে।

যারা নেমে পড়েছে, তারা সব জিজ্ঞাসা করে: চুরি কোন বাড়ি? ধরা পড়েছে নাকি চোর? পালিয়েছে—কোন দিকে গেল?

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য পাঠ থামিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে ছিল, গলা চড়িয়ে আবার শুরু করল :

নিজ অঙ্গে দেখালেন এ তিন ভুবন।
দিব্যচক্ষু সর্বজনে দেন নারায়ণ॥
দিব্যচক্ষু পেয়ে সবে একদৃষ্টে চায়।
যতেক দেখিল তাহা কহনে না যায়॥
তেত্রিশ কোটি দেবতা দেখে পৃষ্ঠদেশে।
নাভিপদ্মে আছে ব্রহ্মা দেখে সবিশেষে॥
নারদ বক্ষেতে শোভে দেব তপোবন।
নয়নে দেখায় একাদশ রুদ্রগণ॥
বিশ্বরূপ নিরখিয়া সবে মূর্চ্ছা গেল।
গোবিন্দের অগ্রে তারা কহিতে লাগিল॥

পাণ্ডব হইবে জয়ী কুরু পরাজয়।
অচিরে হইবে কৃষ্ণ নাহিক সংশয়॥
এত বলি কর্ণবীর করিল গমন।
প্রেম রূপে গোবিন্দেরে দিয়া আলিঙ্গন॥
হরিহরপুর গ্রাম সর্বগুণধাম।
পুরুষোত্তম-নন্দন মুখটি অভিরাম॥
কাশীদাস বিরচিল তাঁর আশীর্বাদে।
সদা চিত্ত রহে যেন দ্বিজ-পাদপদ্মে॥

ভণিতা শেষ করে ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য সশব্দে পুঁথি বন্ধ করল। চোরের খবরা-খবর নিয়ে তখন সকলে ফিরে আসছে। পাশের নৌকোয় বৃদ্ধ মাঝি বলে, চলুক না ঠাকুরমশায় আরো খানিক।

না—ক্ষুদিরাম ঘাড় নাড়ল। রাগ হয়েছে, রাগের সঙ্গে অভিমানও। বলে, বেনাবনে মুক্তো ছড়ালাম এতক্ষণ ধরে। সৎপ্রসঙ্গে কারো মতি নেই, কেউ কানে নাওনি তোমরা। যাকগে, বলে আর কী হবে! অন্য কেউ না শোনে, আমার নিজের কাজ তো হল। আমার শিষ্যসাগরেদ এরা ক'জন শুনল। তাই বা মন্দ কি!

কে-একজন ওদিক থেকে টিপ্পনী কেটে ওঠে : একটি সাগরেদ কাড়ালে ঐ তো চট মুড়ি দিয়ে পড়েছে সন্ধ্যে থেকে। সকলেরই ঐ গতিক—নয় তো সাড়া পাওয়া যায় না কেন? ঠাকুরমশায়, মাছ খায় সবাই, নাম পড়ে কেবল মাছরাঙার।

বুড়ো মাঝি লজ্জা পেয়ে কৈফিয়ৎ দিচ্ছে : শুনছিলাম তো ঠাকুরমশায়। চোরের কথা কানে পড়েই না ছোঁড়াগুলো হৈ-হৈ করে ছুটল।

ছোঁড়া বলে কেন, তুমি নিজেও ছুটেছিলে মুরুব্বির পো। তাই তো দেখলাম, পাপ কলিযুগে গোবিন্দ-নামের চেয়ে চোরের নামের কদর বেশি।

এরপর কিছুক্ষণ ক্ষুদিরাম গুম হয়ে রইল। রাগ পড়েনি, পুঁথি আর খুলল না।

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ে। কাড়ালের দিকটায় চট মুড়ি দিয়ে গুটিসুটি হয়ে আছে সাহেব—ঐ নৌকোর লোক খোঁটা দিয়ে যার কথা বলল। সন্ধ্যা থেকেই সকলে চট-মোড়া মানুষটা দেখছে। ছিল কিন্তু চটের নিচে রামদাস। কর্ম সাঙ্গ হবার পর—এদিকে জমিয়ে সকলে পাঠ শুনছে, রামদাসকে সরিয়ে সাহেব নিঃসাড়ে ঢুকে পড়ল। গভীর ঘুম ঘুমাচ্ছে।

ছোট্ট ডিঙি সকালবেলা আজ এই ঘাটে ধরেছে। মূল সোয়ারি ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য, তল্পিদার বংশী। এবং সাহেবের সম্বন্ধে কী বলা যায়—সাগরেদ হলে সকলের সেরা পয়লা নম্বরের সাগরেদ সে। হাল বেয়ে বেয়ে জলে আলোড়ন তুলে নৌকো লাগাল ঘাটে, ঘাটে লাগতে না লাগতে একছুটে হাটখোলায় গিয়ে চাল-ডাল নুন-তেল কিনে আনল, মুহুর্মুহু তামাক সেজে সসম্ভ্রমে ভট্টাচার্যের দিকে হুঁকো এগিয়ে দিচ্ছে, উনুনে আগুন দিয়ে ফুঁ পাড়ছে মুখ ফুলিয়ে। এ ছাড়া মাল্লা দুজন—কেষ্টদাস, রামদাস। মোটমাট পাঁচ।

সেকালে ফি বছর শীতের সময়টা ক্ষুদিরাম ডিঙি নিয়ে এই রকম বেরিয়ে পড়ত। বয়স হয়ে ইদানীং বন্ধ একরকম। খাতিরে পড়ে এইবারটা কেবল বেরিয়েছে। নদীখাল যেন জাল বুনে আছে—জলের জীবন, জলের ধারে বসবাস মানুষের। ডিঙি আস্তেব্যস্তে স্রোতে ভেসে চলে। ভাল গাঁগ্রাম দেখে নেমে পড়ে ভট্টাচার্য মশায়, ভদ্র গৃহস্থবাড়ি উঠে আলাপ-পরিচয় করে। ব্যাগ খুলে স্বর্ণসিঁদুর ও চাটি-মকরধ্বজ বের করে দেখায়—বাজারে বস্তু নয়, ভট্টাচার্য নিজ হাতে বকাল মেপে ষোলআনা শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে বানিয়েছে, ছেলেপুলের ঘরে রেখে দিতে হয় এ সমস্ত—সামান্য অসুখবিসুখে বড় কাজে লাগে। এ ছাড়া হস্তরেখাদি বিচার করে ক্ষুদিরাম, খড়ি পেতে ভবিষ্যতের কথা বলে দেয়! অতিশয় নিষ্ঠাবাণ ব্রাহ্মণ—তা সত্ত্বেও চাপাচাপি করলে সৎগৃহস্থের বাড়ি চাট্টি চাল ফুটিয়ে সেবা নিতে খুব বেশি আপত্তি করবে না। বাইরের পরিচয় এই হল মোটামুটি।

জলের কাজ—নৌকো চেপে জলে জলে ঘোরা। ডাঙার কাজের চেয়ে সোজা, সুবিধা অনেক বেশি। সকালে জানে না সন্ধ্যাবেলা কোনখানে আজ আস্তানা। শিকার হয়ে কে মুখে এসে পড়ে, কোন-কিছু ঠিকঠিকানা নেই। অথবা ভাগ্যদোষে নিজেরাও পড়তে পারে জলপুলিসের শিকার হয়ে। তখন সাঁ-সাঁ করে নৌকো ছুটিয়ে কোন এক পাশখালিতে ঢুকে পড়ে। আঁকাবাঁকা খাল, বাঁকে বাঁকে শতেক মুখ বেরিয়েছে। বেঁচে যায় সেই গোলকধাঁধার মধ্যে লুকোচুরি খেলে। আবার কত সময় ধরেও ফেলে ফাঁদ পেতে সুকৌশলে খালের মধ্যে ঢুকিয়ে। এমন হয়েছে, দলকে দল একেবারে খতম হয়ে গেছে। দল নয়, নল বলাই ঠিক। দল তো অতি সামান্য জিনিস, পাঁচটি মানুষ এরা যেমন দল করে এসেছে। বড় বড় নল উৎখাত হয়েছে, তবু কাজকর্ম ঠিক চলেছে, এক দিনের তরে বন্ধ হয়নি। নতুন নতুন নল গড়ে উঠেছে আবার। এখন তো দয়াময় সরকার। ধরল এবং আদালতে শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হয়ে গেল তো এক বছর দু-বছরের জেল। সরকারি পাকা দালান, শীতের কম্বল, নিশ্চিন্তে তিন বেলা আহার—আর দশটা গুণীর সঙ্গে মিলেমিশে দিনগুলো দিব্য কেটে যায়।

গায়ে গতিত্ত লাগে, মনে স্ফূর্তি আসে। বেরিয়ে এসে ডবল জোরে কাজে ঝাঁপিয়ে পড় আবার। কিন্তু সেকালে—অনেক কাল আগে—এমন সুখ ছিল না। বলাধিকারী মশায়ের কাছে শোনা। মহাবিদ্বান জগবন্ধু বলাধিকারী—তাঁর যে কাজ তাতে খাটাখাটনি অল্প, বইপত্র নিয়ে দিনরাত পড়ে আছেন। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের মতো ফোঁটা-কাটা মানুষভোলানো পণ্ডিত নন তিনি। সেকালে নাকি খুব কড়া ব্যবস্থা ছিল—চোরকে শূলে দিত, চোরের হাত কেটে ফেলত। তা বলে বিদ্যা কি লোপ পেয়েছে কোন রাজ্যে! বড়-বিদ্যা বলে কত জাঁক। এই বিদ্যার জোরে কত দেশের কত শত মানুষ করে খাচ্ছে। চুরি কথাটা স্পষ্টাস্পষ্টি বলতে মানী লোকের বোধকরি ইজ্জতহানি ঘটে। রকমারি নাম দিয়েছে তাই—পান খাওয়া, উপরি পাওনা। হালফিল আবার একটা নতুন নাম কানে আসে—কালোবাজারি। নাম যা-ই হোক, কাজ সেই সনাতন বস্তু। এই সমস্ত বলেন বলাধিকারী, আর হেসে খুন হন।

সে যাকগে। সাহেব চট মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে ডিঙির উপর, তারই ত্রিশ হাতের ভিতর পাড়ের রাস্তা দিয়ে হনহন করে চৌকিদার থানায় চলল। বাঁশের জঙ্গল না থাকলে সেহ দক্ষিণের পোতার ঘরটাও নজরে আসত এই জায়গা থেকে। গাঁয়ের মানুষ পাতি-পাতি করে চোর খুঁজে বেড়াচ্ছে, এদিকে কেউ তাকায় না। চোর যে কাজ সেরে এসে ভালমানুষ হয়ে বাড়ির ঘাটে শুয়ে পড়েছে, এমন সন্দেহ হয় না কারো। হলেই বা কি! নৌকো তল্লাসি করলে মিলবে হাঁড়িকুড়ি চাল-ডাল তেল-মশলা এবং ভট্টাচার্য মশায়ের ক্যাম্বিসের ব্যাগে কিছু স্বর্ণসিঁদুর মকরধ্বজ মধু এবং মহাভারত নূতন-পঞ্জিকা কাকচরিত্র বৃহৎ জ্যোতিষসিদ্ধান্ত এই জাতীয় বই কয়েকখানা। গয়না সিকিখানা পাবে না খুঁজে, সমস্ত গাঙের নিচে। সিঁধ কাটার সময়টা বংশী সাহেবের পাশে থেকে সাহায্য করছিল, তারপর সাহেব ঘরে ঢুকে গেল তো সে একটু আড়াল হয়ে দাঁড়ায়। এদের ভাষায় পদটিকে বলে ডেপুটি। মাল নিয়ে বাইরে এসে ডেপুটির হাতে পাচার করে দিল। ব্যস, কারিগরের দায়িত্ব শেষ, ছুটি এবার। যা করবার ডেপুটি করবে।

গামছায় পুঁটলি করে সেই মাল বংশী গাঙের জলে ছুঁড়ে দেয়। নিশানা আছে—সরু দড়ি গিঁট দেওয়া পুঁটলিতে, দড়ির অন্য মাথা আগাছার সঙ্গে বাঁধা। দড়ি টেনে যখন খুশি মাল ডাঙায় আনা যাবে। সিঁধকাঠি ছোরা লেজা রামদা—সরঞ্জাম-গুলোরও ঐ ব্যবস্থা। ডিঙির উপরে যা-কিছু সমস্ত নিরীহ নির্দোষ জিনিস। জলের উপর কাজকারবারে এই বড় সুবিধা। তাড়াহুড়ো করলে সন্দেহ অর্শাবে যদি বোঝ, নৌকো চাপান দিয়ে গদিয়ান হয়ে ঘাটে থাক একদিন দু-দিন। ফাঁক বুঝে তারপর পিঠটান দাও, মাল থাকুক যেমন আছে পড়ে। চারিদিক ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কোন একসময় এসে তুলে নেওয়া যাবে। নৌকো না হল তো হেঁটেই চলে আসবে, তাতে কোন অসুবিধা নেই।

সাহেব ফিরে-আসতে একবার চোখাচোখি হল ক্ষুদিরামের সঙ্গে। বড় খুসি দু-জনেই। পাঠ চলছে—তপোধন নারদ শোভা পাচ্ছেন শ্রীগোবিন্দবক্ষে—বলতে বলতে

নিজের বুকে প্রচণ্ড এক থাবা বসিয়ে দেয়। অর্থাৎ দেখলে বটে তো ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের কাজের নমুনা—কী দরের খুঁজিয়াল বুঝে দেখ। খোঁজদারির বখরা অন্য লোকের যদি হয় এক আনা, ক্ষুদিরামের নিদেনপক্ষে ছয় পয়সা। কাজ যা করে একেবারে নিটোল, কোন অঙ্গে ভুলচুক থাকে না। যেমন এই আজকের কাজ।

আশালতা গা-ভরা গয়না নিয়ে বাপের বাড়ি এসেছে, ডিঙিতে বসে বসে টের পাবার কথা নয়। খুঁজিয়াল খবর বয়ে এনে দিল। অন্যের মুখের খবর নয়, খোদ ক্ষুদিরামের—গণকঠাকুর হয়ে নিজে দেখেশুনে মেয়ের হাত গণে এসে বলল। যা করবার আজ রাত্রেই। দেরি হলে হবে না, দেরিতে মানুষের বুদ্ধিবিবেচনা এসে যায়। বাড়িসুদ্ধ আজকের দিন দেমাকে রয়েছে পাড়ার মানুষদের গয়নাগাঁটি দেখাচ্ছে। একদিন দু-দিন পরে তুলেপেড়ে ফেলবে। বড়লোক মিত্তিরদের লোহার সিন্দুকে রেখে আসবে সম্ভবত। তখন সিঁধকাঠিতে কুলাবে না, রীতিমত বন্দুক-বোমার ব্যাপার। চুরি নয় তখন, ডাকাতি—আয়োজন তার বিস্তর। কাজও নোংরা। চুরির মতন এমনধারা পরিচ্ছন্ন নয় যে—মাল সমস্ত পাচার হয়ে গেল, বাড়ির মানুষের গায়ে আঁচড়টি পড়ল না।

পহরখানেক রাতে আর একবার নৌকো থেকে নেমে ক্ষুদিরাম শেষ খবর এনে দিল। না, কুকুর নেই বাড়িতে। বাইরের অতিথি অভ্যাগত নেই। ছোট্ট সংসার। অসুখ-বিসুখের কথা যদি বল—আছে অসুখ বটে, কিন্তু পুরানো ব্যাধি। পক্ষাঘাতে কর্তামশায় শয্যাশায়ী। কর্তার সেই পুবের ঘরও অনেকখানি দূরে দক্ষিণের পোতার ঘর থেকে। ছোট বোন আজ একসঙ্গে এক খাটে শুয়ে আছে। বয়সে ছেলেমানুষ, শুয়েছেও একেবারে দেয়াল ঘেঁষে। এসব মেয়ে ঘুমিয়েই থাকে, হাঙ্গামা করে না। ভাবনা কিছু মুল-মক্কেলকে নিয়ে—আশালতাটা ডবকা রীতিমত। তবে বিয়ে হয়ে গেছে, নতুন বিয়ের পর আজকেই দ্বিরাগমনে ফিরল। এবারে তুমি বিবেচনা করে দেখ সাহেব।

খবর বুঝিয়ে দিয়ে ক্ষুদিরাম ছইয়ের মাথায় হেরিকেন লণ্ঠন টাঙিয়ে নিশ্চিন্তে এবার মহাভারত খুলে বসল। উদ্যোগ পর্ব। কুরুক্ষেত্র আসন্ন—তারই ঠিক আগের পাঠ।

খুব ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা। ওস্তাদের নিষেধ, ডবকা মেয়ের ঘরে ঢুকবে না। সে মেয়ে অবিবাহিতা কুমারী হলে তো কথাই নেই। ঢুকে পড়লেও কদাপি সে মেয়ের গা ছোঁবে না। না, না, না—ওস্তাদের দিব্যি দেওয়া আছে। কুমারী দেহ অপবিত্র হবে, সেটা খুব বড় কথা নয়। যে সময়টা কাজে নেমে পড়েছ, পুরুষমানুষ নও তুমি তখন। মানুষই নও। কাজ করবার কল। যেমন সিঁধকাঠি আছে, সিঁধকাঠি ধরবার কলও আছে একটা। সে কলের একজোড়া চোখ, সেই চোখের জ্বলজ্বলে নজর। নজর কিন্তু মেয়ের গায়ের দিকে নয়, গায়ের উপর যেখানে যে বস্তু রয়েছে শুধুমাত্র সেইটুকুর উপর। মুশকিল হল ভিন্ন দিক দিয়ে। অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের পশরা সাজিয়ে মেয়েটা উন্মুখ হয়ে আছে ডালি দেবার জন্য। রক্ষে আছে অঙ্গের উপর প্রথম পুরুষের ছোঁয়া পেলে! ঘুমে হোক আর জাগরণে হোক মাথা থেকে

পদতল অবধি শিরশির করে উঠবে, গায়ে কাঁটা দেবে। ঘুমন্ত হলে চক্ষের পলকে জাগবে, ভয় পেয়ে চেঁচাবে নতুন অনুভূতিতে।

এবং আরও একদিক দিয়েও বিবেচনা—গয়না কখানাই বা থাকে কুমারী মেয়ের গায়ে! হাতে দু-গাছা চুড়ি, কি দুটো কানের ফুলের জন্য অতখানি ঝুঁকি কোন সুবুদ্ধি কারিগর নিতে যাবে?

কিন্তু বিবাহিত মেয়ের আলাদা বৃত্তান্ত। এক কথায় খারিজ করা যাবে না। পুরুষ-সঙ্গ অভ্যাসে এসে গেছে তখন। গয়নাগাঁটিও খুব এসে জমে বিয়ের পর থেকে। জোয়ারের জলের মতো। বাপের বাড়ির গয়না—বিয়ের মুখে কষেমেজে পাত্রপক্ষ যা আদায় করেছে। শ্বশুরবাড়ি ও আত্মীয়স্বজনের দেওয়া গয়না। আর সোহাগিনী বউকে সুগোপনে দেওয়া বরের গয়না। সেই সব গয়না পরে দেমাকে মেখে ঘুরে বেড়ায়। গা-ভরা টাকশাল। পার যদি সেই টাকশালের টাকা সরাতে নিষেধ নেই। পেরে উঠবে কিনা সেই বিবেচনা। ঐ যা বলা হল—ডবকা মেয়ে ঘুমোয় না বেশি। বয়সের দোষে ছটফট করে, ক্ষণে ক্ষণে উঠে বসে। ঘুমাল তো অতি পাতলা সে ঘুম। একটা ইঁদুর নড়লে জেগে ওঠে। ঢুকে পড়তে পার এ হেন গয়না-পরা নতুন বিয়ের মেয়ের ঘরে—ওস্তাদের আশীর্বাদ এবং ষড়ানন কার্তিকের ও মা-কালীর তেমনিধারা কৃপা যদি থাকে তোমার উপর। জ্ঞান-গুণ যদি থাকে। একটা সূঁচ পড়ার যে শব্দ, সেটুকুও হবে না তোমার চলাচলে। সিঁধ কাটতে গিয়ে ঝুরঝুর করে মাটির গুঁড়ো পড়বে না, ডেপুটি হাতের মুঠোয় ধরে নিয়ে অস্তে আস্তে রাখবে। নিঃসাড়ে মেয়েটার কাছে চলে যাবে, অবস্থা বিশেষে শুয়ে পড়বে পাশটিতে। বর যেমনধারা করে। গায়ে হাত দেবে আলতো ভাবে, সইয়ে সইয়ে—ঘোর কেটে না যায় মেয়ের, সন্দেহ না আসে যে ভিন্ন পুরুষ। বড় কঠিন কাজ। যৌবন বয়সের জোয়ান পুরুষ তুমি, মন কিন্তু দুলবে না একটুও। সে কেমন? ভরা কলসি নিয়ে নাচওয়ালী যেমন সভায় নাচে। ঢং করছে কত রকম, পুরুষের দিকে চক্ষু হানচে। করতে হয়, তাই করে। কিন্তু আসল নজর মাথার কলসি মাটিতে না পড়ে যায়। তোমারও তেমনি। যুবতী নারী কে বলেছে, শুধুমাত্র একটি মক্কেল। কুষ্ঠী অষ্টাবক্র হলে যা করতে, যুবতীর বেলাতেও সেই পদ্ধতি অবিকল। কাজ কিসে হাসিল হবে তাই শুধু দেখ।

ঘুমেরও একটা হিসাব নিতে হবে। ঘুমোচ্ছে কতক্ষণ ধরে। ঘরের কানাচে বসে বসে সাড় নাও। বেড়ার ঘর হলে নিশ্বাসের শব্দ থেকে টের পাবে—এতক্ষণে জেগে ছিল, ঘুমাল এইবারে। এই সঙ্গে কালাকালের বিচার আছে। শীতকালে ঘুম আসতে দেরি হয় না—লেপের তলে গিয়েই সন্ধ্যারাত্রে ঘুমিয়ে পড়ে। শেষরাত্রে ঘুম তাই পাতলা, ভোর না হতে জেগে ওঠে। শীতকালের কাজকর্ম অতএব সকাল সকাল। গরমের সময়টা ঠিক উল্টো। সারারাত আই-ঢাই করে ভোররাত্রে ঘুম আসে। অতএব গ্রীষ্মের কাজে চুপচাপ ধৈর্য ধরে বসে থাকবে। ছটফট করলে হবে না।

কত দিক কত রকমের বিচার-বন্দোবস্ত। নির্বিঘ্নে তবেই এক একখানা কাজ

নামানো যায়। চুরি অমনি করলেই হল না, বিদ্যেটা সহজ নয়। তাই যদি হত, দুনিয়াসুদ্ধ মানুষ সোজাসুজি বেরিয়ে পড়ত সিঁধকাঠি হাতে। ঘোরপ্যাঁচ করে বেনামি চুরির তালে যেত না।

সকালবেলা বংশী নেমে গিয়ে একটা আশশ্যাওড়ার ডাল ভেঙে গাঙের ধারে ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসে অনেকক্ষণ ধরে দাঁতন করল। শীত-শীত বলে চাদর জড়িয়ে নিয়েছে গায়ে। দড়ি টেনে টুক করে গয়নার পুঁটুলি তুলে ফেলল একসময়। তুলে চাদরের নিচে ঢুকিয়েছে। ছোট জিনিস বলেই হাতের কায়দা দেখানো গেল। সরঞ্জামগুলোর ব্যাপারে সাহস করা যায় না, চাদরে সামাল হবে না অত জিনিস। জলতলে থাকুক পড়ে আপাতত, যাচ্ছে কোথায়? আর গেলেই বা কী—কত আর দাম।

কাজ সমাধা, নানান জায়গায় বেকুব হয়ে হয়ে এইবারে আশাতীত রকম হয়ে গেল। জড়েনপুরের ঘাটে আর কেন? অকুস্থলে অকারণে পড়ে থাকতে নেই। সাহস দেখাতে হবে বটে, কিন্তু মাত্রা আছে।

চললাম ভাইসকল। অর্ধেক জোয়ার হয়ে গেল, জো ধরে গিয়ে উঠি।

রোদ্রে ভরে গেছে চারিদিক। ঘাটের মাঝিমাল্লাদের বলেকয়ে রীতিমত শব্দসাড়া করে ভট্টাচার্য মশায়ের ডিঙি ছাড়ল।

কালকের সেই বুড়ো মাঝি প্রশ্ন করে, কদ্দুর যাওয়া হচ্ছেন?

হুঁকো টানছিল ক্ষুদিরাম, এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, সেটা তো জানিনে। গাঙের স্রোত আর ভবিতব্য যেখানে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। জীবনেও ঠিক এমনি, ভাই। কাল রাত্রে এখানে এই ঘাটে কত সৎপ্রসঙ্গ করেছি, আজ রাত্রের কোন কাজ বিধাতা-পুরুষ কোন ঘাটে লিখে রেখেছেন—

মাঝি গদগদ হয়ে বলে, আপনার সঙ্গে কিন্তু চালাকি খাটে না বিধাতাপুরুষের। কপালের লিখন কেমন পুটপুট করে বলে দেন।

ক্ষুদিরাম একগাল হেসে গৌরবটা পরিপাক করে নেয়। মাঝি বলছে, সকলের হাঁড়ির খবর বলে দেন ঠাকুরমশায়, নিজেরটা কেন তবে পারবেন না?

ঐ তো মজা। ডাক্তারে তাবৎ লোকের চিকিচ্ছে করে বেড়ায়, নিজের রোগ ধরতে পারে না। বলি খনার চেয়ে তো বিদ্যাবতী কেউ ছিল না—ভুত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান নখের উপর ভাসত, চোখ তুলে একটিবার দেখে নেবার ওয়াস্তা। কিন্তু শ্বশুর বেটা যে জিভ কেটে টিকটিকি দিয়ে খাওয়াবে সেইটেই ধরতে পারলেন না তিনি।

বাঁক ঘুরে যেতে বংশীকেই ক্ষুদিরাম সেই প্রশ্ন করে: যাওয়া হচ্ছেন কতদূর? উত্তর অঞ্চলে, কয়েকটা ভাল তল্লাট আছে ঢুঁ মেরে আসা যায়। তুমিই বল বংশী, তোমার দায়ে যখন বেরিয়ে পড়েছি।

বংশী বলে সকলের আগে ফুলহাটা। বলাধিকারী মশায়ের হাতে মাল গিয়ে তো পড়ুক। তারপর তিনি যেমন বলেন।

সাহেবেরও সেই মত। নৌকোর সকলেরই। মাল বলাধিকারী অবধি পেঁছিলে

তখনই জানলাম, রোজগারের টাকা সত্যি সত্যি গাঁটে এসে গেল। মাল গলিয়ে বিক্রি-করা টাকাপয়সা বখরা করে দেওয়া সমস্ত তাঁর কাজ। ধর্মভীরু মানুষ—চিরকাল, সেই যখন দারোগা ছিলেন তখনও। সিকি পয়সার তঞ্চকতা নেই তাঁর কাছে। কত কত মহাজন এ-লাইনে, কিন্তু জগবন্ধু বলাধিকারী দ্বিতীয় একজন নেই। কাজও অঢেল। বড় বড় দলের সঙ্গে কাজকারবার। কাপ্তেন কেনা মল্লিক প্রধান তার মধ্যে। ছোটখাট দল আমল পায় না। তবে সাহেব আছে বলে এদের সঙ্গে সম্পর্ক আলাদা। বড় গুণের ছোকরা, বলাধিকারী বড় ভালবাসেন। তার উপর ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য—বলাধিকারীর চিরকালের পোষ্য। বংশীও পায়ে পায়ে ঘুরে তার। হাত পেতে নেবেন তিনি ওদের জিনিস। নৌকা অতএব সোজা গিয়ে ফুলহাটা উঠুক, পথের মধ্যে কোনখানে থামাথামি নেই।

বড় গাঙ ছেড়ে সরু খালে ঢুকল। ফুলহাটা এসে গেছে। কত বড় জায়গা ছিল একদিন, কত জাঁকজমক। ফুলহাটার নীলকুঠির এদেশ-সেদেশ নামডাক, অঞ্চলের যত নীল নৌকো বোঝাই হয়ে খালের ঘাটে উঠত। প্রকাণ্ড দীঘি, দীঘির পাড়ে সারি সারি নীল পচানোর চৌবাচ্চা। তেতলা বিশাল অট্টালিকা—নীলকর সাহেবরা থাকত সেখানে। সময় সময় মেমসাহেবরাও আসত বিলাত থেকে, ছ-মাস এক বছর থেকে আবার চলে যেত। কাঠের মেঝের নাচঘর বানিয়েছিল অট্টালিকার নিচের তলায়। ভেঙেচুরে কাঠে উ'ই ধরে এখনো খানিকটা নমুনা রয়েছে। দিনদুপুরে আজ বুনো-শুয়োর আর সাপ-শিয়াল চরে বেড়ায় নীলকুঠির জঙ্গলে। শীতকালে কেঁদোবাঘও আসে।

জঙ্গল ফুঁড়ে অট্টালিকার চিলেকোঠা উঠেছে, ডিঙি থেকে নজরে পাওয়া যায়। বলাধিকারীর চোখ বেঁধে একদিন ঐখানে কোথায় ঝুলিয়ে দিয়েছিল। উঃ, কী কাণ্ড! গল্প শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। হেসেও খুন হতে হয়। আজকে সেই জায়গায় সকলের প্রভু হয়ে আছেন বলাধিকারী, অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্য-নির্বিশেষে আশ্রিত-পালন করছেন। অঞ্চলের যাবতীয় থানার লোক এসে খোশামোদ করে যায়। না করে উপায় কি? খুব খাওয়ান তাদের বলাধিকারী। অন্তরালে তাদের সম্বন্ধে বলেন: ভাল খাওয়ার লোভে আসে তো যতবার আসে আসুক আপত্তি নেই। অতিথি-সেবার ত্রুটি হবে না। ভিতরে অন্য কোন মতলব থাকে তো বিপদে পড়বে। আমিও দারোগা ছিলাম একদিন, অত্যন্ত দুঁদে দারোগা। আমার যেমন হয়েছিল, তার শতেক গুণ নাজেহাল হতে হবে।

গয়নাগুলো ঘরের মধ্যে নিয়ে নেড়েচেড়ে রেখে এলেন বলাধিকারী। ফিরে এসে সাহেবকে তারিপ করেন: পাকা কারিগর তুমি হে! এইটুকু বয়সে এমনধারা কাজ আমার আমলে কখনো দেখি নি। না হবে কেন, শিক্ষা কত বড় ওস্তাদের কাছে! আবার তা-ও বলি, বীজ ভাল হলেই ফসল যে সব সময় ভাল হবে তা নয়। উর্বর ক্ষেত্র চাই, তবে অঙ্কুর ওঠে। অঙ্কুর থেকে গাছ, গাছ থেকে সুফল। তোমার ব্যাপারে সেইটে হয়েছে। তুমি যে উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র, রেলগাড়ির কামরায় পয়লা নজরে সেটা টের পেয়েছিলাম। তখনই ঠিক করলাম, এমন প্রতিভা নষ্ট হতে দেব না। হয়েছে

তাই। আরও কত হবে! আজ আমার বড় আনন্দ।

পেশায় মহাজন বটে, কিন্তু বলাধিকারী সত্যিকার বিদ্বান মানুষ। কথাবার্তা পন্ডিতজনের মতো। গদগদ হয়ে সাহেবকে তিনি আশীর্বাদ করেন: ভবিষ্যদ্বাণী করছি, কাপ্তেন হবে তুমি একদিন। কাপ্তেন তো কতজনা—কেনা মল্লিকও মস্তবড় কাপ্তেন। কিন্তু মিহি কাজ বড় কেউ জানে না। তুমি যাবে সকলের উপরে। পুঁথিপুরাণে অনেক ইজ্জত এই বিদ্যার। সর্বশাস্ত্রের সঙ্গে রাজপুত্র চৌর্যবিদ্যারও পাঠ নিচ্ছেন, নইলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না। চৌষট্টি কলার একটি। উচ্চাঙ্গের কলা বটে—যা এক একটা বিবরণ পাওয়া যায়, শিল্পীর দক্ষ হাত ছাড়া তেমন বস্তু না। অতদূরের পুরাণ-ইতিহাসেই বা যেতে হবে কেন—তোমারই ওস্তাদ বাইটা মশায় বয়সকালে কী সব কান্ড করে বেড়িয়েছে! একদিন গিয়ে তোমার এই কাজকর্মের কথা সবিস্তারে বলে এসো বুড়োকে, বড় আনন্দ পাবে। যেমন গুরু ঠিক তার উপযুক্ত শিষ্য।

সাহেবের গুরু পঞ্চানন বর্ধন। পচা বাইটা নামে পরিচয়। ওস্তাদের কথা উঠলে সাহেবের হাত দুটো আপনি জোড় হয়ে কপালে গিয়ে ওঠে, ঘাড় নুয়ে আসে। সেকালের কথা জানিনে, কিন্তু এখনকার দিনে এত বড় ওস্তাদ আর জন্মে না।

গয়নার পুঁটুলি নিয়ে কোথায় চলে গেলেন বলাধিকারী। এই অধ্যায়টা একেবারে অজ্ঞাত, নানা জনের নানা রকম আন্দাজ। হঠাৎ একদিন বলাধিকারীর মুখে বখরার হিসাব পাওয়া যায়, বখরাদার যত জনই থাকুক, টাকা-আনা-পয়সায় কার কত পাওনা মুখে মুখে বলে দেন। এ কাজে কাগজ-কালির কারবার নেই। কাগজের লেখা সর্বনেশে জিনিস—বিপদ ঐ পথ ধরে আসে অনেক সময়। বলাধিকারীর মৌখিক হিসাবে সকলে খুশি। আড়ম্বরে গদি সাজিয়ে দিস্তা দিস্তা কাগজ লিখে ঐ যে হিসাবপত্র রাখে, যত গলদ তাদেরই কাছে। বলাধিকারীর কাছ থেকে মানুষে হরদম আগাম নিয়ে যাচ্ছে, তারও লেখাজোখা থাকে না, মনে গেঁথে রাখেন। আগামের টাকাপয়সা কেটে নিয়ে বাকি প্রাপ্য মিটিয়ে দিচ্ছেন, সিকি পয়সার ভুলচুক নেই।

গয়নার ব্যবস্থায় পুরো একটা বেলা কাটিয়ে বলাধিকারী বাসায় ফিরলেন। হাসি-হাসি মুখ—তাই থেকে অনুমান হয়, মাল অতিশয় সাচ্চা। এবং ওজনে উত্তম। কাজ চুকিয়ে এসে এখন অন্য দশরকম কথাবার্তা।

একবার বললেন, তাড়াহুড়ো করতে বলিনে, শুয়ে বসে থাক এখন পাঁচ-সাত-দশ দিন—জিরিয়ে নাও। ছিপ ফেল, তাস-পাশা খেল। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য ওদিকে দিন দেখতে লাগুন আবার একটা। শুভক্ষণে বেরিয়ে পড়ো মাতৃনাম স্মরণ করে। পয় যাচ্ছে এখন, দু'হাতে কুড়োও।

হাতে কাজকর্ম না থাকলে ক্ষুদিরাম অবিরত পঞ্জিকা উলটায়। সকলের বড় শাস্ত্র, তার মতে, পঞ্জিকা। ডিঙি থেকে ডাঙায় উঠেই সে পাঁজি নিয়ে পড়েছে। দিনক্ষণ প্রায় কণ্ঠস্থ। বলে, সামনের বিষ্যুৎবারেই হতে পারে। নবমী তিথি আছে, যেটা হল রিক্তা তিথি। মঘা নক্ষত্র তার উপরে—যাত্রামুখে মঘা, সামলাবি তুই ক'ঘা?

সাহেব শিউরে উঠে বলে, ওরে বাবা!

ক্ষুদিরাম হাসতে হাসতে বলে, সেই তো মজা। বিষে বিষক্ষয়। দুই শয়তান কাঁধে কাঁধ দিয়ে গ্রামভোগ হয়ে দাঁড়াল। অব্যর্থ অভীষ্টলাভ।

বলাধিকারী বললেন, জলে জলে নয়, এবারে ডাঙা অঞ্চলে। ডাঙার কাজ একখানা দেখাতে হবে সাহেব—নিখুঁত পরিপাটি কাজ। কেনা মল্লিকের কাছে জাঁক করে জলের কথা বলব, তেমনি ডাঙার কথাও বলতে পারি যেন।

বিস্তর ভাল ভাল গাঁ-গ্রাম আছে, গাঙখাল নেই সেখানে। নৌকো করে যাওয়া যায় না, গাড়ি-পাল্কিতে অথবা পায়ে হেঁটে যেতে হয়। চীনের হুয়েনসাং এসে যা দেখেছিলেন, এখনকার এই যুগেও প্রায় সেই অবস্থা—উৎপাতের অভাবে দরজায় খিল দিতে ভুলে যায় সেখানকার লোকে, বাক্সের তালা-চাবি কেনা বাহুল্য মনে করে। সাহেব গিয়ে বাহারের কাজ কিছু দেখিয়ে আসুক, চারিদিকে তোলপাড় পড়ে যাক। যাতায়াতের কষ্ট বলে মানুষগুলো কেন একেবারে বঞ্চিত হয়ে থাকবে? এবং ভেবে দেখলে, সাহেবদের পক্ষেও সেটা অগৌরবের কথা বটে।

কিন্তু আর একবার তো আশালতাদের গাঁয়ে যেতে হয়। জুড়নপুর গাঁয়ে। সরঞ্জামগুলো গাঙের নিচে পড়ে রইল, কি নিয়ে তবে কাজে বেরোয়? প্রশ্ন হবে, সরঞ্জাম এই একটা সেট কি শুধু? পড়ুক না ওরা বেরিয়ে—বলাধিকারী মশায়ের উপর ভার থাকবে, সুযোগ মতন তিনি ওগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করবেন। কিন্তু আর যাই হোক, সিঁধকাঠিটা আদর ও সম্মানের বস্তু সাহেবের কাছে। ওটা হাতে না পেয়ে বেরুবে না। ঐ কাঠি ওস্তাদ তার হাতে দিয়েছে। সে ওস্তাদ আজেবাজে কেউ নয়, স্বয়ং পচা বাইটা। কাঠিখানাও বাজারের সাধারণ জিনিস নয়, যুধিষ্ঠিরের নিজ হাতে গড়া। অমন কারিগর তল্লাটের মধ্যে নেই, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কামান-বন্দুক গড়েছে তার পূর্ব-পুরুষেরা। সেই বংশের কারিগর যুধিষ্ঠির।

তাছাড়া নতুন কাঠির কথাই তো আসে না। ওস্তাদ যা হাতে তুলে দিয়েছেন, সে বস্তু তুলবেই সে জল থেকে। লাইনে নেমেই এতখানি নামযশ, সেটা সাহেবের নিজের কিছু নয়—ওস্তাদের আশীর্বাদ আর ওস্তাদের দেওয়া কাঠির গুণে। অনেক রকম গুণজ্ঞান থাকে তো ওঁদের, হয়তো বা মন্ত্রপূত করে দিয়েছেন বস্তুটা। কাঠি ধরে কাজে বসলে সাহেব তখন আর এই মানুষ থাকে না। কী এসে ভর করে যেন কাঁধে—আলাদা মানুষ।

ফাঁসুড়ে ঠগদের কথা বলেন বলাধিকারী। বিস্তর তাজ্জব কাহিনী। এমনি তারা খুব ভাল। ধার্মিক, দয়াশীল, দানধ্যান জপতপ পুজোআচ্চা করে—বলতে হবে বাড়াবাড়ি রকমের ধার্মিক। বছরের মধ্যে অন্তত একটিবার বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যেশ্বরী অথবা কালীঘাটের দক্ষিণাকালীর পাদপদ্মে গিয়ে পড়বে, আয়ের একটা মোটা অংশ পুজোয় খরচ করবে। গলায় রুমালের ফাঁস এঁটে মানুষ মারা পেশা তাদের। পেশা বলা ঠিক হল না, দেবী চামুণ্ডার নিত্যপূজা এই পদ্ধতিতে। মানুষ মেরে টাকা পয়সা নিয়ে নেয় বটে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য টাকা নয় সেটা তো যৎসামান্য উপরি লাভ। চামুণ্ডার তুষ্টিতে নরবধ—এক একটা নরবধে বিস্তর পুণ্য। কাজটা আসলে দেবীরই, তাঁর প্রতিনিধি হয়ে কাজ করে দেয়। পৌরাণিক রক্তবীজ-

দৈত্য বধ করতে গিয়ে দেবী নাজেহাল হলেন, সেই তখন থেকেই ধারা চলে আসছে। মন্ত্র-পড়া একরকম গুড় আছে, কাজের আগে দলের মানুষকে সেই গুড় খাইয়ে দেয়। মুহূর্তে সে ভিন্ন একজন। গলায় ফাঁস দেবার জন্য হাত নিসপিস করে। সেই মুখে বাইরের মানুষ না পেলে শেষটা হয়তো হাতের রুমালে নিজেরই গলায় দেবে টেনে ফাঁস। সিঁধকাঠির বেলাতেও তাই, হাতে ধরলে সাহেব আলাদা মানুষ। কী করি কী করি অবস্থা। যুবতীর পাশে শুয়ে নির্বিঘ্নে কাজ চুকিয়ে বেরিয়ে এল নিশ্চিন্ত ঐ কাঠির গুণে। কত লোকে ঐ অবস্থায় ধর্মভ্রষ্ট হয়, ধরা পড়ে জেল খেটে লবেজান হয়। চোরের সমাজের কলঙ্ক তারা।

জুড়নপুরের ঘাটে এসে পেঁছিল সাহেব। আশালতাদের সেই ঘাট। প্রায় দুপুর তখন। ঘাটে আজ বড় মহাজনী নৌকা একখানা—গাঁয়ে গাঁয়ে লঙ্কা মসুরকলাই আর খেজুরগুড় কিনে বোঝাই দিচ্ছে। বিপদ হয়েছে, মাঝিমাল্লারা হঠাৎ কি রকম কবিতাভাবাপন্ন হয়ে নৌকো থেকে নেমে গাঙের ধারে অশ্বত্থতলায় রান্নাবান্নায় লেগেছে। ঝাটপাট দেওয়ার ধুম দেখে অনুমান করা যায়, আহারাদিও ঐ জায়গায় হবে। এবং আহারান্তে শীতল ছায়াতলে শুয়ে বসে গুলতানি করাও একেবারে অসম্ভব বলা যায় না। বিষম বিপদ। কিছু না হোক, সিঁধকাঠি তো তুলতেই হবে। সেই সঙ্গে ছোরাখানা যদি পারা যায়। এত পথ ভেঙে সেই জন্যে এসেছে। তুলে নিলেই হবে না, কাপড়ের নিচে উরুর সঙ্গে বেঁধে ফেলতে হবে। দুই উরুতে দু-খানা। খানিকটা তো সময় লাগবে—এতগুলো মানুষের দৃষ্টি বাঁচিয়ে কাজ। সেই ফুরসত কতক্ষণে হবে, ঠিক-ঠিকানা নেই। গাঙের ধারেই বা কাঁহাতক ঘোরাঘুরি করা যায়—নজর পড়ে যাবে ওদের, সন্দেহ করতে পারে।

খুনীর সম্বন্ধে শোনা যায়, যেখানে খুন করেছে টানে টানে একটিবার অন্তত যেতে হবে সেই জায়গায়। ঝানু পুলিস ওত পেতে থাকে, অপরাধী স্বেচ্ছায় কবলে গিয়ে পড়ে।

ঘাটের উপর এসে সাহেবেরও আজ দুর্দম লোভ, আর কয়েক পা এগিয়ে বাড়িটা ঘুরে দেখে আসে। রাত্রিবেলা দেখেছে, দিনমানে দেখবে। অন্ধকার ঘরে ঘুমের মধ্যে আশালতা মেয়েটা বউয়ের মতো ভাব করেছিল, দিনদুপুরে সেই মেয়ের চেহারাটা ভাল করে দেখবার কৌতূহল। তার উপরে, যদি সম্ভব হয়, দেখে আসবে দিনের আলোয় এখন সে কী সব বলে, কেমন ভাব দেখায়।

দক্ষিণের পোতার ঘর, পিছনে বাঁশবন—এই ঘরে ছিল দুইবোন। জানলার নিচে মাটির দেয়ালে সিঁধ কেটেছিল, সেটা মেরামত করে ফেলেছে। পুরানো দেওয়ালের সঙ্গে নতুন মাটি মিশ খায় নি, চিনতে পারা যায় জায়গাটা।

আরও এগিয়ে সাহেব ভিতর-উঠানে এসে দাঁড়ায়। লাউমাচা এদিকে, লম্বা আকারের লাউ ঝুলে ঝুলে আছে। গাইগরু একটা মাটিতে শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে বোধকরি একটি দুটি ঘাসের আশায়। পুবের ঘরের ছাঁচতলায় সারি সারি ধানের ছড়া ঝোলানো—দাওয়ায় উঠতে নামতে সর্বক্ষণ মাথার উপর ধানের আশীর্বাদ ঠেকে যায়। বাঁশবাগানের নিচে ছায়াচ্ছন্ন ছোট পুকুর একটা ডোবার মতন। লকলকে

কলমিডগায় বেগন্নি কলমিফুল ফুটে আছে অজস্র। রান্নাঘরে ছ্যাঁকছোঁক করে সমারোহে রান্নাবান্না হচ্ছে। কিন্তু বাইরে কোন দিকে একটা মানুষ দেখা যায় না।

নিঃশব্দে এমন দাঁড়িয়ে থাকা সন্দেহজনক। সাহেব সাড়া দেয়ঃ ঘরে কে আছেন, জল দেবেন একটু। জল খাব।

রান্নাঘর নয়, পুবের ঘর থেকে স্ত্রীকণ্ঠ করকর করে ওঠে। আশালতার মা উনি —ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের হিসাব মতো। কর্তা-গিন্নি থাকেন ঐ ঘরে। দিনমানে এখন অন্য মেয়েলোক যে না থাকতে পারে এমন নয়। কিন্তু কতৃত্বের ঝাঁজে বাড়ির গিন্নি বলেই তো ঠেকে। বলছেন, একটা-কিছু মুখে করে যে না সে-ই ঢুকে পড়বে, ভদ্দরলোকের বাড়ির একটা আবরুপর্দা নেই। সেদিন এই এতবড় সর্বনাশ হল। এত করে বলি, দেয়াল দেবার পয়সা না জোটে বাঁশ ফেড়ে কাচনির বেড়া তো দিয়ে নেওয়া যায়। তা শুয়ে বসে আড্ডা দিয়ে সময় পায় না, ফুরসত কোথা বাবুর ?

নিশ্চয় গিন্নিঠাকরুন। বাবু বলে ঠেস দিচ্ছেন ছেলেকে—আশালতার বড় ভাই মধুসূদনকে। চুরির দরুন মনের ভিতরটা জ্বলছে, কথার মাঝে ফুটে বেরুচ্ছে জ্বলুনি। নিজের বাহাদুরিতে সাহেবের তো মজা পাবার কথা—কিন্তু কষ্ট হচ্ছে। তার এই উল্টো স্বভাব। এয়ারবন্ধু যত আছে সকলের থেকে আলাদা। মধ্যবিত্ত সংসার—পক্ষাঘাতে গৃহকর্তার পঙ্গু অবস্থা, কিছু জমিজমা আছে, কষ্টেসৃষ্টে দুবেলা দু-মুঠোর সংস্থান হয় কোন রকমে ? কারো সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। বড়লোক দেখে জামাই করেছেন, জামাইয়ের বয়সটা আমলের মধ্যে আনেন নি। সমস্ত খবর ক্ষুদিরামের কাছে পাওয়া গেছে। গয়না সেই বড়লোকদের। সাহেব এতবড় সর্বনাশ করে গেছে নিরীহ পরিবারের।

ঘরের ভিতরের বকাবকি থামতেই চায় না। অপরাধ তো একঢোক জল চেয়েছে। বলছেন, গাঙ-খাল রয়েছে, সে সমস্ত চোখে পড়ে না। জলসত্র করেছি কিনা আমরা, বাড়ির মধ্যে পাছদুয়োর অবধি ম্যাচ-ম্যাচ করে মানুষ চলে আসে !

সাহেবের কিন্তু একটুও মনে লাগে না। ন্যায্য পাওনা। পাওনা অনেক বেশি —তারই ছিঁটেফোঁটা সামান্য একটু। হেন অবস্থায় চলে যাওয়া বোধ হয় উচিত, সে ইতস্তত করছে। এমনি সময় এঁটো থালা-বাটি-গেলাস নিয়ে গিন্নি বেরিয়ে এলেন। পঙ্গু স্বামীর খাওয়া সকাল-সকাল সকলের আগে সমাধা হল, বাসন কখানা ধুয়ে নেবেন। এদিক-ওদিক চেয়ে বলেন, ডাকছিলে কে, তুমি ? কোন দিকে ?

নজর তুলে দেখে সাহেব পাথর। কী সর্বনাশ ! একবার ভাবে, চোঁচা দৌড় দিয়ে বেরোয়। তাতে অব্যাহতি নেই—এই দিনমানে চোর চোর বলে সারা গ্রাম পিছন ছুটে পলকের মধ্যে ধরে ফেলবে। দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই—সাহস করে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ফুৎকারে অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া ! ট্রেনের কামরায় দেখা হয়েছিল মা-জননীর সঙ্গে—ভিন্ন অবস্থায়। এঁরই ঠিক পায়ের নিচে শুয়েছিল। ইনি এবং ছেলেবউ, একটি ছোট বাচ্চা। চেহারা হুবহু মনে গাঁথা আছে, ভুল হবার জো নেই। গিন্নিঠাকরুনও বুঝি চিনেছেন, ভ্রূ কুঞ্চিত করে চোখ দুটো

স্থাপিত করেছেন তার দিকে। সাহেবও ঠিক করে ফেলেছে—যত কিছু বলুন, ন্যাকা সেজে সমস্ত বেকবুল যাবে। জন্মে চোখে দেখিনি এঁদের, এই প্রথম দেখছে—এমনিতরো ভাব।

গিন্নি বললেন, জল না খেয়ে চলে যাচ্ছ যে বড়? সোনাদানা নয়, শুধু একটু তেষ্টার জল। না খেয়ে ফিরে গেলে গৃহস্থের অকল্যাণ। দিচ্ছে এক্ষুনি, দাঁড়াও।

আশালতার উদ্দেশে হাঁক দিয়ে ওঠেন, বড়-খুকি, কানে শুনতে পাস নে? জল চাচ্ছে, এক গেলাস জল গড়িয়ে দিয়ে যা ছেলেটাকে।

সাহেবের গোলমাল হয়ে যায়। কী ভেবেছিল, আর দাঁড়াল কী রকমটা! ঘরের ভিতর উৎকট মেজাজ—বেরিয়ে এসে চোখে দেখার সঙ্গে সঙ্গে জুড়িয়ে গঙ্গাজল। কণ্ঠস্বর অবধি আলাদা, এ যেন এক ভিন্ন মানুষ কথা বলছেন।

সাহেব তাড়াতাড়ি বলে, জল খেয়েই যাব আমি মা। বাইরের ওদিকটায় গিয়ে দাঁড়াই, জল ঐখানে পাঠিয়ে দেন।

অর্থাৎ চোখের সামনে থেকে একটুকু সরে পড়তে দাও বুড়ি, তারপর বুঝব। জল এখন মাথায় উঠে গেছে।

বৃদ্ধা বলেন, এসে পড়েছ যখন জলটা খেয়েই বাইরে যাবে। রাগ হয়েছে তোমার, সেটা কিছু অন্যায় নয়। আমি ভেবেছিলাম কে না কে—আজেবাজে চোর-জোচ্চোর মানুষ এসেও তো দাঁড়াতে পারে ছাঁচতলায়। সেদিন আমাদের এক মস্তবড় সর্বনাশ হয়ে গেছে বাবা।

সাহেব অতএব সেই আজেবাজে চোর-জোচ্চোরের দলের মধ্যে পড়ে না। সাধুসজ্জন লোক, ঘরের ছাঁচতলায় স্বচ্ছন্দে যতক্ষণ খুশি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। চিনতে পারেন নি বুড়োমানুষটি। এই একটা জিনিস বরাবর দেখে এল, মানুষ কেমন চট করে সাহেবের আপন হয়ে যায়। যেন গুণ করে ফেলে। চটকদার চেহারাখানা, নিরীহ চাউনি, চলাফেরার ভাবভঙ্গি—সমস্ত মিলিয়ে গুণীনের মন্ত্রের চেয়ে বেশি জোরদার। কথা বলছেন গিন্নিঠাকরুন—সত্যিকার মা সে জানে না, বোধকরি তারা ছেলের সঙ্গে এমনিভাবেই বলে থাকে!

অধীর কণ্ঠে মেয়ের উদ্দেশে বলেছেন, শুনতে পেলি বড়-খুকি? এঁটোকাঁটা নিয়ে আমি তো মেটেকলসি ছুঁতে পারব না। বাসন ক'খানা মেজেঘেষে তাড়াতাড়ি নেয়ে-ধুয়ে আসি। এক্ষুনি জামাই এসে পড়বে।

আশালতা দক্ষিণের ঘর থেকে জবাব দিল: যাচ্ছি মা। আলতার শিশি খুলে নিয়ে বসেছি। এই হয়ে গেল আমার, যাচ্ছি—

সন্ধ্যার দিকে সকলে সাজগোজ করে, এই মেয়ে খাওয়াদাওয়ার বেলায় আলতা পরতে বসে গিয়েছে—ভারি তো শৌখিন মেয়ে তবে! আর ঠাকরুন বললেন তাড়াতাড়ি নেয়েধুয়ে আসবেন, তারও তো গতিক দেখা যায় না। এঁটো থালা চিতানো বাঁ-হাতের উপর ধরে সেই এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে সাহেবের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছেন। চোখে বোধকরি পলকও পড়ে না। বিপদ কেটেছে ভেবে সাহেব নিশ্চিন্ত ছিল, এতক্ষণ পরে সেই শঙ্কার কথা উঠে পড়ে—

তোমায় কোথায় যেন দেখেছি বাবা।

সাহেব গরুর নাম জপছে মনে মনে। ঘাড় নেড়ে হেসে বলে, আজ্ঞে না, কোথায় দেখবেন? আমি এদিকে আসি নি আর কখনো। গরু কিনতে বেরিয়েছি।

একগাদা আত্মপরিচয় দিয়ে যায়ঃ গাঁয়ে ঘুরে গরু কেনা ভাল, দেখে শুনে খোঁজখবর নিয়ে পছন্দ করা যায়। তা পেলাম না তেমন; মিছামিছি হয়রানি। শেষবেশ গাবতলির হাট আছে—বিস্তর গরু ওঠে, আজকেই তো হাটবার—

বৃদ্ধা এসব শুনছেন না। বলে উঠলেন, হুঁ, নিশ্চয় দেখেছি, মনে পড়েছে—

এমনি সময়ে বাচ্চা ভাইপোটাকে কোলে করে শান্তিলতা পাড়া বেড়িয়ে এল। গিন্নিঠাকরুন হাসি-হাসি মুখে রহস্যভরা কণ্ঠে বলেন, ছোট-খুকি, বল দিকি কে ছেলেটা? দেখি, কেমন মনে আছে তোর।

শান্তিলতা এক নজর দেখে নিয়ে বলে, জানিনে তো মা।

কী তোরা! তুই তো ছিলি সঙ্গে। গরিবপীরের থানে পুজো দিতে গিয়ে পিছল ঘাটে গেলাম। ছেলেটা ধরে ফেলল। প্রাণ বাঁচাল বলতে হবে। প্রসাদ রান্না-বান্না করে একসঙ্গে খেলি তোরা সবাই। দেখ দিকি ঠাহর করে।

শান্তিলতা বলে, মা তোমার চোখের নজর একেবারে গেছে। সে তো কালোভূষো এই গাট্টাগোট্টা মানুষ।

সেই উঠানের প্রান্তে আঁস্তাকুঁড়ের পাশে ঠাকরুন বাসন ধুতে বসে গেলেন। সে মানুষ এই নয়, বুঝতে পেরেছেন। ঘটনাটা মাস পাঁচ ছয় আগেকার। জাগ্রত গরিবপীরের থান দূরবর্তী নয়। প্রতি বৃহস্পতিবার হিন্দু মুসলমান অগণ্য মানুষ থানে যায়, রোগপীড়া বিপদআপদের জন্য মানসিক করে, বিপদ কাটলে ঢাকঢোল নিয়ে মানসিক শোধ দিতে যায় আবার একদিন। হিন্দুর পাঁঠা-বলি মুসলমানের মুরগি-জবাই—একই গাছতলায় পূর্বদিকে আর পশ্চিম দিকে দুই তরফের পুজো-সিন্নি চলে। বড়-পুকুরের দুই পারে দুই জাতের আলাদা রান্নাবান্না ও বিশ্রামের ঘর। সেদিন উপকারী মানুষটাকে ওরা ছেড়ে দেয় নি—বলির পাঁঠা রান্নাবান্না হল, খাওয়াদাওয়ার পর প্রায় সন্ধ্যা অবধি ছিল সকলে একসঙ্গে। ঠাকরুন চোখে কম দেখেন, কিন্তু শান্তিলতার কাঁচা চোখে তফাৎ না বুঝবার কথা নয়।

দক্ষিণের ঘরের দিকে মুখ করে ঠাকরুন আবার বলে উঠলেন, রেকাবিতে করে চাট্টি মুড়কি নিয়ে আসবি রে বড়-খুখি। যা মেয়ে তোরা আজকালকার, জলের কথা বলেছি তো শুধু এক গেলাস জলই এনে ধরলি মুখের কাছে!

আশালতার গলা আসেঃ মুড়কি কোথায় রেখেছ মা?

বিরক্ত হয়ে ঠাকরুন ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেনঃ রেখেছি আমার মাথায়। মুড়কি কোঁচড়ে নিয়ে বাসন ধুতে বসেছি। কুলোয় আছে, নয়তো ধামায়। মাথার উপর দুটো চোখ বসানো আছে কি করতে?

সাহেবের দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সুর পালটে বলেন, মনে পড়েছে। গুরুঠাকুর মশায়ের সঙ্গে এসেছিলে সেবার। নতুন পৈতে হয়েছে, মাথা মুড়ানো। রাত্রে সুর করে ভাগবত পড়লে—কী মিষ্টি গলা, এখনো ভুলতে পারি নি—

শান্তিলতা বলে, না মা, ঠাকুরমশায়ের ছেলে নয়।

বিরক্ত হয়ে ঠাকরুন বলেন, তোমার নামটা কি বল তো বাবা?

আশালতা খোঁজাখুঁজি করছিল, এই সময়ে রায় দিয়ে উঠল: পাচ্ছিনে তো মুড়কি। নেই।

নেই তবে আর কি হবে? জল চেয়েছে, তাই দাও এনে, আর কতক্ষণ ভোগাবে? আমি গেলে ঠিক পেতাম। একটা কাজ দেখেশুনে গুছিয়ে করবার যদি ক্ষমতা থাকে!

মায়ের বকুনি খেয়ে—বিশেষ করে বাইরের লোকের সামনে—আশালতা রাগে গরগর করতে করতে জলের গেলাস নিয়ে বাইরে আসে। বেরিয়েই ও মা, ও বাবাগো—তুমুল আর্তনাদ।

সাহেবের মুখ সাদা হয়ে গেছে। অন্ধকারে চোখে তো দেখেনি, মেয়েটা চিনল তবে কি করে? শান্তিলতা খিলখিল করে হাসছে। একটুকরো ঢিল ছুঁড়ে মারল—সাহেবকে নয়, একটা বিড়ালের দিকে। বিড়াল ছুটে পালায়। হাসিতে শান্তিলতা শতখান হয়ে ভেঙে পড়ে।

মাঠাকরুন বলেন, মেয়ের আদিখ্যেতা দেখে বাঁচিনে। বাঘ দেখেও মানুষ এমন চেঁচায় না।

অপ্রতিভ মুখে আশালতা জল দিতে এলো। হাত বাড়িয়ে সাহেব নেবে কি, চোখ মেলে দেখেই কুল পায় না। দু-চোখ দিয়ে গিলে যাচ্ছে যৌবনমতীকে। স্নান করে পরিচ্ছন্ন পরিপাটি হয়ে ধবধবে কাপড় পরেছে, আলতা দিয়েছে পায়ে। কপালে সিঁদুরের টিপ, কী সব গন্ধ-টন্ধ মেখেছে, এই সব করছিল এতক্ষণ বসে বসে—কাছে এসে মাথা ঘুরিয়ে দেয়। জান না মেয়ে, সে রাত্রে কাছে যাকে টেনেছিলে সে মানুষ আমি। চোরকে বলে রাতের কুটুম—বিদ্বান বলাধিকারী বাহার করে বলেন নিশিকুটুম্ব। নিশিকুটুম্ব আজ দিনমানে এসে পড়েছি। ওস্তাদের আশীর্বাদী সিঁধকাঠি নিয়ে চোর ছিলাম সেরাত্রে—সিঁধকাঠি বিহনে আজকে মানুষ। জোয়ান যুবা পুরুষমানুষ। আর তুমি যুবতী নারী আমার সামনে।

জলের গেলাস আশালতা হাতে দেয় না, পৈঠার উপর রেখে দিল। নিক ওখান থেকে তুলে। লোকটা কি দেখে রে অমনধারা তাকিয়ে? গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে আশালতার। ভয় করছে! শিশুটা কোলে নিয়ে শান্তিলতা বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে—আশালতা সেদিকে তাকায়। একফোঁটা মেয়ে তার কোন খেয়াল নেই।

মাঠাকরুন তখন বাসন ধুয়ে ঘরে রাখতে যাচ্ছেন। আশালতা ডেকে বলে, মুড়কি তো নেই, খেয়ে ফেলেছি আমরা সব। ভাত হয়ে গেছে, বল তো ভাত এনে দিই।

ঠাকরুন ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রীত হয়ে বললেন, ভাল বলেছিস মা। জামাই আসছে বাড়িতে, দশ রকম রান্নাবান্না—দুপুরবেলা ছেলেটা শুধু-মুখে বেরিয়ে যাবে, মনটা খচখচ করছিল আমার। চাট্টি ভাতই খেয়ে যাও বাবা। দাওয়ার উপর একটা ঠাঁই করে দে ছোট-খুকি।

আশালতা ভাত এনে দেয়—নিশিকুটুম্বর সেবা আসল জামাই-কুটুম্বর আগে। সাহেব একগাল হেসে বলে, দেম তাই, মালক্ষ্মীকে কখনো না বলতে নেই।

যে ঘরে সিঁধ কেটেছিল, সেই দক্ষিণের দাওয়ায় শান্তিলতা জল ছিটিয়ে পিঁড়ি পেতে ঠাঁই করে দিল। স্নানে যাচ্ছেন ঠাকরুন, দাওয়ার ধারে এসে একবার দাঁড়ান। পরিচয় দিচ্ছেন : আমার বড় মেয়ে ঐ ভাত আনতে গেল, ওর বিয়ে দিয়েছি এক মাসও হয়নি এখনো। আজকে এই নতুন জামাই আসছে। বউমা সাত সকালে চান করে রান্নাঘরে ঢুকেছে। ছেলে পাঁচবেঁকির মুখ অবধি এগিয়ে বসে আছে—সদর থেকে ফিরছে আজ জামাই—না আসতে চায় তো জোরজার করে নিয়ে আসবে। খুব বড়লোক তারা, নবগ্রামের সেনেরা—

শান্তিলতা ঠাঁই করে দিয়ে ছেলেটাকে কোলে তুলেছে আবার। কথার মধ্যে সে প্রশ্ন করে ওঠে : বেলা তো অনেক হল। আসে না কেন এখনো ?

পাঁচবেঁকি তো এখানে নয়। তার উপর উজোন টেনে আসতে হচ্ছে। এইবার এসে পড়বে। না আসবার হলে একলা মধু পায়ে হেঁটে এতক্ষণ ফিরে আসত।

মধু—মধুসূদন নামে নতুন করে সাহেবের চমক লাগে। বেপরোয়া গোঁয়ারগোবিন্দ মধুসূদনের চিনে ফেলতে মুহূর্তকাল দেরি হবে না। মধুর বউ রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত, নইলে সেও চিনত। শান্তিলতার কোলের এই ছেলেটাই রেলের কামরায় ছিল সেদিন। অজান্তে একেবারে বাঘের গুহায় ঢুকে পড়েছে। তার উপর লোভে পড়ে—আশালতাকে ভাল করে অনেকক্ষণ ধরে অনেকবার দেখবার লোভে—খেতে বসে গেল। বুড়ি ঠাহর করতে পারলেন না—কিন্তু মধুসূদন দেখতে পেলে, এমন কি বউটা দেখলেও রক্ষে নেই। চিনে ফেলবে এক নজর দেখেই। এক্ষুনি আসছে মধু, যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। যা-হোক দুটো মুখে দিয়ে সরে পড়তে পারলে হয় তার আগে।

মাঠাকরুন হঠাৎ ধরা গলায় বলে উঠলেন, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে বাবা। বড়লোক কুটুম্ব এক-গা গয়না দিয়ে বউকে রাজরানী সাজিয়ে বাপের বাড়ি পাঠাল, সিঁধ কেটে ঘরে ঢুকে চোরে সমস্ত নিয়ে গেছে।

[সতেজ লতার মতো যুবতী মেয়ে· গয়নাগুলো অঙ্গ জুড়ে ফুল হয়ে ফুটে ফুটে ছিল। সোনার ফুল। খুঁটে খুঁটে সাহেব ফুল তুলে নিয়ে লতা শূন্য করে দিয়ে গেছে।]

ঠাকরুণ বলছেন, জামাই আসছে, ভয়ে লজ্জায় কাঁটা হয়ে আছি বাবা। কী বলব, মনে ওরাই বা কী ভাববে ! অভাবে পড়ে মেয়ের গয়না বেচে খেয়েছি, তাই যদি ভেবে বসে—

সাহেবের মনের মধ্যে কেমন করে ওঠে—গয়না গলে গিয়ে এত দিনে যে টাকা হয়ে গেছে ! নয়তো সেই গয়না ছুঁড়ে দিয়ে যেত আবার এক রাত্রে এসে। প্রতিবাদ করে উঠল : তা ভাবতে যাবে কেন ? সত্যিই যখন সিঁধ কেটেছিল—

সিঁধ তো আমরাও কেটে চেঁচামেচি করে লোক-জানান দিতে পারি। অভাবে মানুষ কত কি করে—

এরই মধ্যে খপ করে বললেন, আচ্ছা বাবা, একটা কথা বলি। সত্যিই তোমায় দেখেছি, কোনখানে সেটা মনে করতে পারছি নে। হাটের মধ্যে আমার মধুকে মেরে-ধরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল, তুমি বোধ হয় সেই ছেলেটা—সকলের সঙ্গে লড়ালড়ি করে তার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে। ঠিক মনে পড়েছে এবার। রক্তে কাপড়-চোপড় ভেসে যাচ্ছে—মাগো মা, ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলে তুমি। গোড়ায় ভাবলাম, জখম তুমিই হয়েছ, পালিয়ে চলে এসেছ হাট থেকে—

এই উদ্বেগের মধ্যে বারম্বার এক ধরণের কথা ভাল লাগে না। সাহেব বলে, ভুল করছেন। আমি নই, সে অন্য কেউ—

বয়স হয়ে ঠাকরুনের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছে। স্মৃতিও দুর্বল। যত ভাল ভাল কাজ চাপাচ্ছেন সাহেবের উপর। বৃদ্ধাকে বাঁচিয়েছে সে, অথবা তাঁর ছেলেকে। নেহাৎ পক্ষে মুণ্ডিতশির গুরুপুত্র হয়ে ভাগবত পাঠ করে গেছে এ বাড়ি। যে কর্মের মধ্যে সত্যি সত্যি দেখা হয়েছিল, সেটা কিছুতে মনে পড়ে না মা-জননীর।

আশালতা রান্নাঘরে ঢুকে ভাজকে বলে, ও বউদি, কুটুম্ব এসেছে।

এসে গেল বর ? মধুসূদনের বউ মুখ টিপে হেসে তাড়া দিয়ে ওঠে: তুমি বুঝি ধোঁয়ার মধ্যে মুখ লুকোতে এলে। যাও বলছি, নয় তো চেলাকাঠের এক বাড়ি—

আশালতা বলে, উঁহু, সে কুটুম্ব নয়—আলাদা একজন। ভেবে ভেবে মা ধরতে পারছে না, মানুষটা কে। কিন্তু কুটুম্ব ঠিকই। জল খেতে চেয়েছিল, শুধু জল দিয়েছি বলে মা রেগে আগুন। দশখানা তরকারি দিয়ে ভাত বেড়ে দিতে বলল।

বউ এবারে রাগ করে উঠল: বাড়িতে জামাই আসছে—এ কোন লাটসাহেব এসে উদয় হল, আগ ভেঙে ভাত-তরকারি দিতে হবে ?

দিতেই হবে। নয় তো রক্ষে রাখবে না মা। হেসে চোখ-মুখ নাচিয়ে আশালতা বলে, চুপি চুপি বলি বউদি, চেহারায় কাতিকঠাকুরটি, ময়ূর থেকে নেমে যেন উঠানের উপর দাঁড়িয়েছে। অত ভাল লেগেছে মায়ের তাই।

রান্না শেষ হয় নি, কড়াইয়ে তেল ঢেলে দিয়েছে, বউ সেদিকে ব্যস্ত। থালা নিয়ে আশালতা ভাত বাড়ল। ডালের সঙ্গে চিংড়িমাছ, ডাল ঢেলে নিয়েছে খানিকটা বাটিতে—

নজর পড়ে বউ রে-রে করে ওঠে: সকলের বড় মাছটা দিয়ে দিলে, এ কোন ঠাকুরজামাই বল তো ঠাকুরঝি ?

আশালতা নিরীহ ভাবে বলে, কি জানি কোনটা বড় আর কোনটা ছোট। তোমাদের নিক্তি-ধরা ওজন বুঝিনে আমি বাপু। জামাইয়ের মাছ সিকি আন্দাজ যদি কমই হয়, মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

বউ কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে বলে, হুঁ, বুঝতে পেরেছি। মজেছ তুমি কাতিক ঠাকুরটি দেখে।

পিঁড়ির উপর সাহেব বসে আছে ভাতের অপেক্ষায়। ইচ্ছাসুখে নয়, না বসে উপায় নেই সেই জন্য। দুই পাহারাদার সামনে খাড়া—শান্তিলতা আর গিন্নি-

ঠাকরুন। স্নানে যাওয়া এখনো ঠাকরুনের হয়ে ওঠেনি, সুখ-দুঃখের কথা নিয়ে মেতে গেছেন। সাহেব যেন কতকালের চেনা, কত আপন! কথার মাঝে হঠাৎ চুপ করে যান—স্মৃতির সমুদ্রে আলোড়ন চলছে, কোনখানে দেখেছেন একে? কবে? রেলের কামরার মধ্যে সেই বিচিত্র ঘটনার কথা কেউ যদি এখন মনে করিয়ে দেয়, ঘাড় নেড়ে ঠাকরুন নিজেই বেকবুল যাবেন। চুরির কাজের মধ্যে এই ছেলে—অসম্ভব, শত্রুতা করে বলছে।

আশালতা দাওয়ায় উঠে সাহেবের সামনে ঝুঁকে পড়ে ভাতের থালা রাখল। ব্যবধান বিঘতখানেক বড় জোর। কিন্তু সে রাত্রে একেবারে কিছু ছিল না, গায়ে গায়ে শুয়েছিল দুজনে। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য তন্নতন্ন করে খবর নিয়ে গিয়েছিল। জামাই বড়লোক বটে, কিন্তু বয়সে আধ-বুড়ো, চেহারায় কালোকুচ্ছিত। আলতা পরে গন্ধ মেখে এতক্ষণ ধরে সাজগোজ করেছে সেই লোকের মন ভোলাবার জন্য। দিন-মানে একবার দেখ না রূপসী তোমার সেই বরের পাশাপাশি মনে মনে মিলিয়ে। কিছু অভ্যাসক্রমে খানিক হয়তো শিকড় পোড়ানোর ধোঁয়া ও নিদালি-বিড়ির গুণে এবং খানিকটা কারিগরের আঙুলের সম্মোহনে অন্ধকারের মধ্যে আলিঙ্গনে বেঁধেছিলে, কিন্তু আমাদের মতন আঁধারে দেখবার চোখ যদি থাকত চেঁচিয়ে উঠতে নাকি সতী-সাধ্বী বউয়ের যা করা উচিত?

যৌবন জ্বলছে যেন দুপুরের রোদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। এরই গায়ে গা ঠেকিয়ে-ছিল, যত ভাবছে ততই এখন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সাহেব। বাঘের মতো ঝাঁপ দিয়ে পড়ে বুঝি একবাড়ি লোকের চোখের সামনে—যা হবার হোক। রাত্রিবেলা গায়ের গয়না চুরি করে নিয়েছিল, ডাকাতি করে আজকে গোটা মানুষটাকেই নিয়ে বুঝি পালায়।

এমনি সময় বাইরের দিকে কলরব। মধুসূদনের গলা: ও মা, এসে গেছি আমরা—

জামাই নিয়ে এসেছে। শান্তিলতা ছুটল। গিন্নিঠাকরুনের স্নানের কথা মনে পড়েছে, এঁটোকাঁটা ছুঁয়ে জামাইয়ের কাছে দাঁড়াবেন কেমন করে? দ্রুতপায়ে বাঁশ-তলার পুকুরে চললেন। মধুসূদনের বউ খুন্তি হাতে রান্নাঘরের দরজায়, নজর ঐ বাইরের দিকে। সে নজর সাহেবের দাওয়ার দিকে ফিরবে না, সেটা জানা আছে। আশালতা ঘরে ঢুকে গেছে, সে-ও বর দেখছে সুনিশ্চিত। এইবারে ফুরসত। বড় গলদা-চিংড়ি সাহেব সবেমাত্র থালায় নামিয়ে নিয়েছে। কথা বলতে বলতে মধুসূদন ভগ্নিপতির হাত ধরে উঠানে এসে পড়ল। লহমার তরে দেখে নিয়েছে সাহেব। সেই ফাটা কপাল—জাঁক করে যাকে বলেছিল জয়তিলক।

সাহেব আর নেই। শূন্য পিঁড়ি। পাখি হয়ে উড়ল, কিংবা বাতাস হয়ে মিলিয়ে গেল।

মাথায় উলুখড়ের আঁটি, বলাধিকারীর ফুলহাটায় সাহেব এসে হাজির। বোঝা দাওয়ার উপর ফেলল। পাকানো গামছার বিড়ে মাথা থেকে নিয়ে বাতাস খেল দু-চারবার। বংশীকে ডেকে চাপাগলায় বলে, সমস্ত এসে গেছে—কাঠি ছোরা লেজা

রাগদা, যা সমস্ত রেখে এসেছিলে। আঁটি খুলে তুলেপেড়ে রাখ।

হেসে বলে, জলজ্যান্ত মানুষের ঘরে ঢুকে সিঁধের মুখে ধনসম্পত্তি বের করে নিয়ে আসি, জলের নিচে ক'টা জিনিষ আনব এ আর কত বড় কথা!

আশালতাদের বাড়ি ছেড়ে সাহেব সোজা নদীর ধারে অশ্বত্থের মাথায় চড়ে বসল। আপাতত কিছু নয়, পাতার আড়ালে চুপচাপ বসে থাকা। মহাজনি নৌকো বিদায় হয়েছে, কপালক্রমে ঘাট একেবারে খালি। তাই বলে নামা চলবে না, শখ করে নদী-স্নানেও এসে পড়তে পারে শ্যালক আর ভগ্নিপতি। এলো না অবশ্য। খানিক পরে আন্দাজ করে নিল খাওয়াদাওয়ায় বসেছে এইবার। গুরুভোজনের পরেই তো গড়িয়ে পড়া। এবং হল তো বউয়ের সঙ্গে নতুন জামাইয়ের নিরিবিলি ঘরে কিছু ফষ্টিনষ্টি।

সাহেব পরম নিশ্চিন্তে ধীরেসুস্থে জিনিসগুলো তুলে ফেলল। লেজার লম্বা আছাড় খুলে জলে ছুঁড়ে দেয়। মতলব ঠিক করা আছে—চরের উলুবনে চাষীরা উলু কেটে কেটে আঁটি করে রেখেছে; ঘর ছাইতে লাগে। তারই একটা নিল মাথায় তুলে। সিঁধকাটি ও ছোরা নিজ অঙ্গের সমান—ঐ দুটো বস্তু আলাদা রাখতে পারে না, কাপড়ের নিচ উরুর সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়েছে। আর সমস্ত উলুর আঁটির ভিতর গোঁজা। সদর-পথের উপর দিয়ে বুক চিতিয়ে চলে এসেছে সাহেব। চাষাভুষো লোক হামেশাই এমন যায়, চোখ তুলে কেউ তাকায় না।

আঁটি থেকে বের করে সেরে সামলে রাখ বংশী—

বলাধিকারী সাহেবকে দেখে বললেন, একটা চিঠি এসেছে গণেশচন্দ্র পালের নামে। গণেশটা কে, ভেবে পাইনে। বংশী বলল, তোমার তোলা-নাম।

চিঠির নামে সাহেব রীতিমত ভড়কে যায়।

আমার? আমায় কে চিঠি দিতে যাবে? গণেশ নামই ছিল নাকি গোড়ার দিকে। শোনা কথা, জ্ঞান হয়নি তখন আমার। কারণ সে নামও মনে নেই, আমার নিজেরও নেই। চিঠি অন্য কারো হবে, ঠিকানা ভুল করে এসেছে।

বলাধিকারী মুখ টিপে হেসে বলেন, তোমার মা লিখেছে।

সাহেব জ্বলে উঠল: মা নেই আমার। থাকলে তবে তো মা লিখবে চিঠি।

বলাধিকারী বিশ্বাস করলেন, মনে হয় না। আগের কথারই জের টেনে বলছেন, বিয়েথাওয়া দিয়ে শোধন করে তুলতে চায় তোমার মা। গব্যরসে যেমন পারা শোধন করে। বাউন্ডুলে হয়ে ঘুরতে দেবে না।

হাসতে হাসতে তিনি ঘরে ঢুকে গেলেন। পোস্টকার্ডের চিঠির আদ্যন্ত পড়েছেন, তাই আরও বেশি হাসি সাহেবের উৎকট রাগ দেখে। রাগারাগি করে ছোঁড়াটা ঘর থেকে পালিয়েছে, মা তাকে বাঁধার কলাকৌশল করছে। খুব সম্ভব প্রণয়ের ব্যাপার —মনের মানুষ না পেয়ে মনোদুঃখে পালিয়ে এসেছে।

হেসে গেলেন বলাধিকারী—হাসিটা নিদারুণ রকম ব্যঙ্গের। সাহেবের বুকে ধারালো ছুরির মতো কেটে কেটে বসে। বিয়ে করে ঘর-লাগা শিষ্ট মানুষ হয়ে যাবে, এত বড় অপদার্থ ভাবলেন তাকে। সে যেন আর এক বংশী। বংশীও কথাটা

শুনে নিল—কত রকম ঠাট্টাতামাসা করবে সে, সকলকে বলে দেবে।

উপস্থিত বংশীর কাছেই সাহেব সাফাই দিচ্ছেঃ মা-টা নেই আমার। কোনদিন ছিল না।

চিঠি হাতে করে এমনি সময় জগবন্ধু বলাধিকারী ফিরে এলেন।

নেই বুঝি মা তোমার? পড়ে দেখ, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। কুড়িখানেক কনে দেখা হয়ে গেছে, গোটা চার-পাঁচ মনে ধরেছে তার ভিতর। মা নেই তো করছে কে এত সব? ছেলের বিয়ে দিয়ে গৃহস্থালী পাতাবার সাধ মা ছাড়া কার এমন?

থেমে গিয়ে হঠাৎ কৌতুককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, রানীকে জানো তুমি?

চমক লাগে সাহেবের। এত খবর ঐটুকু চিঠিতে। বিয়ের কথা, আবার রানীর কথাও! মুখ টিপে হাসছেন বলাধিকারী। প্রণয়ের ব্যাপার ভেবেছেন, কিন্তু সাহেবের একেবারে নির্বিকার ভাব। এটুকু যদি না পারবে, অতবড় ওস্তাদের কাছে শিখল কি এতদিন ধরে? চোর গ্রেপ্তার করে দারোগা কত রকম জিজ্ঞাসাবাদ করবে, তার উপরে বাঘা-বাঘা উকিল-হাকিমের জেরা—তুমি নিপাট ভালমানুষ হয়ে বেকবুল যাচ্ছ আগাগোড়া। সিকিখানা কথা আদায় করতে পারবে না কেউ। শিক্ষা তো এই।

রানীকে চেনো না?

সাহেব বলে, দুনিয়া জুড়ে কত রাজা কত রানী রয়েছে। তাদের চেনবার লোক কি আমরা?

মুকুট-পরা রানী নয়। রানী বলে একটা মেয়ে। এখন তার অনেক টাকা। খুব ধনীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বুঝি?

দেন তো দেখি—

ফস করে পোস্টকার্ডটা একরকম ছিনিয়ে নিল জগবন্ধু বলাধিকারীর হাত থেকে। চিঠি চোখের সামনে ধরে বলে, বুঝেছি, নফরকেষ্টর কারসাজি। হাতের লেখা, লেখার বয়ান সমস্ত তার। মার খেতে খেতে পালিয়ে বাঁচল—সেই রাগ রয়েছে তো! দল থেকে বের করে আবার আমাকে কালীঘাটে নিয়ে ফেলতে চায়। তাই তো বলি, সরকারের জল-পুলিসে পাত্তা পায় না, আর পোস্টকার্ডের চিঠি এতগুলো গাঙ-খাল স্টেশন-বন্দর পার হয়ে এসে ধরে ফেলল—পিছনে চর না থাকলে এমন হয় না। নফরাই ঠিকানা জানে, সে ছাড়া অন্য কেউ পারত না।

নফরকেষ্ট মানুষটা এই ফুলহাটাতেই ছিল, সাহেবের সঙ্গে এসেছিল। কাজের মধ্যে সর্বনাশা বেকুবি করল, তুমুল কাণ্ড হতে হতে কোন রকমে বেঁচে এল সবাই। অনেক রকমে জগবন্ধু তাকে দেখেছেন। সেই মানুষের এমন ক্ষমতা, বিশ্বাস করবেন কেন? বলবেন, ইতি—'তোমার মা' বলে সই করেছে, কিন্তু সুধামুখী দাসী।

সাহেব আরও জোর দিয়ে বলে, সুধামুখী-টুখি কিচ্ছু নয়, রানীও কেউ নেই। আগাগোড়া বানানো।

ঝকমকে হস্তাক্ষর, এমন খাসা রচনাশক্তি—রীতিমত গুণীলোক তবে তো! বললে না কেন এখানে যখন ছিল। তবে আর ছেড়ে দিই! চাকরি দিয়ে কাছে কাছে

রাখতাম। আমার আত্মজীবনী বলে যেতাম, নিজের মতন করে সে লিখত। নবেল-নাটক হার মানত সেই বইয়ের কাছে।

হাসতে হাসতে জগবন্ধু আবার বললেন, নফরকেষ্টও কিন্তু বলত, বাপ হয় সে তোমার। বংশীকে বলেছে, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যকে বলেছে আরও বলেছে কতজনকে। তুমি বলছ বানানো। বানানো বাপ, বানানো মা। তুমি কি স্বয়ম্ভু হয়ে ভুবনে এসেছ বাপধন? স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা—সুবর্ণ অণ্ডে জলের উপর জন্ম?

সাহেব রাগ করে বলে, বিশ্বাস হবে না জানিই তো। চোরের কথা কে বিশ্বাস করে!

বলাধিকারী তখন কোমল সুরে বলেন, যাদের ঘরের কনে বাছাবাছি হচ্ছে, পিতামাতা গাঁইগোত্র নিয়ে তারাই সব মাথা ঘামাক। আমাদের বিশ্বাস হল না-হল কী যায় আসে! পড়ে ফেল চিঠিখানা, ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ। কালীঘাটে নিয়ে তোলবারই যদি ফিকির—যে বিদ্যে শিখেছ, শহরে গিয়ে কিন্তু কোন সুবিধে হবে না। শহরের কাজের ধরন আলাদা। সে হল তাস-পাশা খেলার মতো—একটুখানি জায়গার মধ্যে এক ঘণ্টা দু-ঘণ্টার ব্যাপার। তোমার কাজ হল দরাজ জায়গায় খেলা দেখানো। বড় বড় গাঙ ভারি ভারি গাঁ-গ্রাম বনজঙ্গল ডাঙা-ডহরের এলাকা জুড়ে দিগ্বিজয়ী বাহিনী। কেনা মল্লিকের নামই শুনছ, মরশুম এলে বেরিয়ে পোড়ো তাদের কোন একটা দলের সঙ্গে। তোমার মতন কারিগর লুফে নেবে তারা। বৃহৎ কাজের নমুনা দেখে এসো স্বচক্ষে। মস্তবড় জীবন সামনে—দেখেশুনে বুঝে-সমঝে তারপর পথ ঠিক করে নাও।

চিঠি নিয়ে সাহেব চলে গেল। গেল নির্জন খালের ধারে। ফ্রী প্রাইমারি ইস্কুলে যাতায়াত ছিল, তার উপরে বলাধিকারী মশায়ের সঙ্গে এতগুলো দিন। সঙ্গদোষে এখানেও দশ-বিশটা বই পড়ে ফেলেছে। জগবন্ধু বলেন, ও সাহেব, তোমার যা মাথা, নিয়মিত লেখাপড়া করলে—

সাহেবের তুড়ুক জবাব: করলে কচু হত। হতাম আর এক মুকুন্দ মাস্টার! ওরে বাবা, কী বাঁচা বেঁচে গিয়েছি!

সুধামুখী সাহেবকে লেখাপড়া শেখাতে চেয়েছিল। তারই জেদে ইস্কুল যেতে হয়েছিল কিছুকাল। চিঠি অতএব না পড়তে পারার কথা নয়। মুক্তার মতন ঝকঝকে অক্ষরগুলো সাজিয়ে গেছে—না পড়ে চিঠির উপর শুধুমাত্র একবার হাত বুলিয়েই বোধকরি মর্মকথা বলে দেওয়া যায়।

কালীঘাটের আদিগঙ্গার তীরে সুধামুখী স্বপ্ন দেখছে।

সাহেবের বিয়ের আগেই বস্তি ছেড়ে তারা ভদ্রপাড়ায় গিয়ে উঠবে। কালীঘাট থেকে অনেক দূরে, কালীঘাটের লোক যে পাড়ায় না যায়। বস্তির ঘরে পুরুষ ডেকে ডেকে এনে দিন গুজরান করত, শায়েবের বউ সে কথা জানবে না, নতুন পাড়ার কেউ কোনদিন জানতে পারবে না। মনের বাঞ্ছা সুধামুখী কতদিন মুখে মুখে বলেছে—সাহেবকে বলেছে, নফরকেষ্টর কাছে বলেছে। পিছন-পথের সকল পঙ্ক গঙ্গাজলে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে নতুন পাড়ার নতুন জীবনে যাবে। পোস্টকার্ডের চিঠিতে

খোলাখুলি লেখা চলে না। কিন্তু বরানগরে ঘর দেখে পছন্দ করে এসেছে—বাসা বদলের মানেই তো সেই পুরানো অভিপ্রায়। অথচ বস্তির নতুন মালিক হচ্ছে নাকি অন্য কেউ নয়—রানী। টাকা হয়েছে রানীর, মাটকোঠা ভেঙে ইতিমধ্যেই তাদের দু-কুঠুরি দালান হয়ে গেছে। বস্তি ছাড়তে হলে সুধামুখীর রাতারাতি পালাতে হবে—চোখের উপর দিয়ে যেতে দেবে না কিছুতেই, রানী সে মেয়ে নয়।

সাহেবকে বলাধিকারী ঠাট্টা করে বলেন স্বয়ম্ভু। বিস্তর পুঁথিপত্র পড়া আছে, তাই দেবতাগোঁসাইয়ের তুলনা দিয়ে বললেন। দেবতা না হয়ে সাহেব হল সিঁধেল চোর। বাপমায়ের ব্যাপারটা কিন্তু তা-বড় তা-বড় দেবদেবী মুনিঋষিদের মতোই গোলমেলে। ঋষ্যশৃঙ্গ মুণির মা হরিণী, সীতা লাঙলের ফলায় উঠে এলেন, বশিষ্ঠ জন্ম নিলেন ভাঁড়ের মধ্যে—

এই কথাবার্তার সময় বংশীটা ছিল। কৌতূহলে এক সময়ে বলল, নফরা আমাদের কাছেও বলেছে কিন্তু। নেশার মুখে বেশি করে বলত, আর হাউহাউ করে কাঁদত। সে নাকি বাপ হয় তোমার—

সাহেব নির্লিপ্ত কণ্ঠে ভিন্ন কথা বলে এখন ঃ হতে পারে।

বলাধিকারী মশায়ের কাছে তবে যে 'না' বলে দিলে ?

সাহেব বলে, না-ও হতে পারে। মিথ্যুকে আর সত্যবাদীতে মিশাল দুনিয়া। সত্যি মিথ্যে কোনটা সে বলত, কে জানে ?

বংশী আবার জিজ্ঞাসা করে, আর ঐ মায়ের কথাটা—বললে যে মা নেই তোমার ?

সাহেব দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলে, মা নেই তো ভবধামে এলাম কি করে ? জন্মেছি যখন মা ঠিক আছে একটা।

হাসছে সাহেব। হেসে উঠে বলে, অত খোঁজ কেন রে বংশী ? মেয়ে বিয়ে দিয়ে জামাই করতে চাও ? সবেধন একটা ছেলে তো তোমার। তা দুনিয়া আজব—বউয়ের পেটে না হলেও কত মেয়ে কত দিকে জন্মে থাকতে পারে। সেই মুনিঋষির কাল থেকেই হয়ে আসছে !

জ্ঞান হওয়া অবধি এই বড় সমস্যা সাহেবের—কে তার বাবা ? মা কে ? নফরটা বড় আঁকুপাকু করে—কিন্তু নফরকেষ্ট নামের বদলে নফরকালি বলে তার মিশকালো রঙের জন্য—ঐ বাপের সাহেব হেন ছেলে কেমনে হতে পারে ? সুধামুখীও তেমনি মা নয়—হাড়গিলের শাবক হাড়গিলেই হয়, মানুষ হয় না কখনো। তবু কিন্তু মনটা কী রকম হয়ে আছে সেই থেকে—সুধামুখীর চিঠি যখন তখন চোখের সামনে মেলে ধরে। হঠাৎ এক সময় দুর্ণিবার ঝোঁক উঠল—সাহেব এক বেলার পথ পোস্টঅফিস অবধি গিয়ে পোস্টমাস্টারকে দিয়ে ইংরেজিতে ঠিকানা লিখিয়ে চিঠির জবাব ডাকে দিয়ে এল ঃ চাকরিতে আছি আমি, ভাবনাচিন্তা কোরো না। ছুটি নিয়ে যাব চলে বৈশাখ মাসের দিকে। ইতিমধ্যে কিছু টাকাও পাঠাচ্ছি, নতুন বাসার দরুন বায়না দিতে হয় তো দিও।

কালীঘাট ছাড়বে সুধামুখী, কিন্তু শহর ছাড়ার কথা মাথায় আসে না। আসবে চলে পাকারাস্তা আর কলের জলের মোহ কাটিয়ে, পিছনের জীবন বিস্মৃতির জলে

ডুবিয়ে দিয়ে। কোন এক বিশাল গাছে ঢেউয়ের আছাড়িপিছাড়ি, তারই কূলে বাড়ি তুলবে। সুধামুখী হল শাশুড়ী, আশালতার মতো একটা ডাগরডোগর বউ। গোলপাতার ছাউনির ঘর একটা-দুটো, লাউয়ের মাচা উঠানে, লম্বা লম্বা লাউ ঝুলে আছে। কানাচের ছোট্ট পুকুরে প্যাক প্যাক করে পাতিহাঁস নামে সকালবেলা। মাঘ মাসে ধানের পালায় পালায় উঠানে পা দেবার জায়গা থাকে না। বাচ্চাছেলে থপথপ করে লুকোচুরি খেলে বেড়ায় ধানের পালার আড়ালে আবডালে। আশালতা ছুটে গিয়ে ধরে তোলে বুকের উপর : মাগো মা, চলে যাচ্ছিল বাঁশতলার পুকুরের দিকে, কী যে করি এই ডাকাতটুকু নিয়ে !

যুবতী নারীর গায়ে ঠিক বিষ থাকে। বিষের ছোঁয়া সে রাত্রে গায়ে লেগেছিল, তারই জ্বালায় বংশীর কাজটা সে নিজে নিয়ে নিল। সিঁধকাঠি আনার নামে চলে গিয়েছিল জুড়নপুর গাঁয়ে আশালতার কাছে। সুধামুখীর মতন সাহেবকেও ঠিক নেশায় ধরেছে, নেশার ঘোরে সুধামুখীর চিঠির জবাব দিয়ে এল। কিম্বা মনের গড়নটাই তার এমনি। মনের উপরে যখন তখন স্বপ্ন খেলে বেড়ায়। বাপ কিম্বা মা একজনের মন বোধহয় এইরকম ছিল, সাহেব তাই পেয়েছে। মা কিম্বা বাপের একজন ছিল ভাল, খুব ভাল—অপর জন রাক্ষস।

জন্মলাভের সময় শিশুর যে জ্ঞানবুদ্ধি থাকে না ! ক্ষুদে শিশু চোখ পিটপিট করে দেখছিল সেই রাক্ষস বাপ বা রাক্ষসী মায়ের ষড়যন্ত্র, কিন্তু বড় হয়ে মনে নেই আর কিছু। তা হলে সত্যিকার বাপ খুঁজে বের করে ফেলত। কিম্বা সেই মা-জননীটিকে। কী করত তখন ! চুলের মুঠি ধরত গরীয়সী জননীর : বাপের নামটা বল্, বাপ চিনিয়ে দে। চুলের মুঠি ধরে বনবন করে পাক দিত। বয়সটা কত হবে এখন সাহেবের ? আঠার অথবা কুড়ি। সঠিক বলতে পারে সুধামুখী। সেই ততটা বছর আগে এই কব্জির জোর আর মানুষ চেনবার জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে জন্ম নিতে পারত যদি !

চলে যাই সেই আঠারো অথবা কুড়িটা বছর পিছিয়ে সাহেব-চোরের যখন জন্ম। কালীঘাটের আদিগঙ্গার ধারে—গঙ্গার ঠিক উপরে বস্তি। দোতলা মাটকোঠা। সুধামুখী ও আর কতকগুলো মেয়ে থাকে।

দুই

আদিগঙ্গার উপরে মাটকোঠা। মেয়েরা থাকে। বিকালবেলা সেই মেয়েদের সাজগোজের ধুম। সন্ধ্যা থেকেই রাজকন্যা এক একটি। পরের দিন ঘুম ভাঙতে বেলা দেড়প্রহর। তখন বিসর্জনের পরের প্রতিমার মতো খড়-দড়ির বোঝা।

এক বিকালে সুধামুখীর সাড়া-শব্দ নেই, ঘরের দরজা বন্ধ। দরজায় টোকা পড়ে, ফিসফিসিয়ে তার নাম ধরে ডাকছে।

ভিতর থেকে সুধামুখী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে : শরীর ভাল নেই। চলে যাও।

মিহি গলায় সুর করে ডাকছিল, মানুষটা এবার খিকখিক করে হেসে উঠে।

বুঝতে পেরেছে সুধামুখী, নিঃসংশয় হবার জন্য তবু একবার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, কে?

গলায় চিনলে না, হায় আমার কপাল! নফরকেষ্ট আমি গো। নফরা, নফর-কালি—যেটা বললে বোঝ। দুয়োর এঁটে দিয়ে কার আদর-সোহাগ হচ্ছে শুনি?

এ হেন কথার উপরেও সুধামুখী বাপ তুলে মা তুলে করকর করে ওঠে না। প্রেমের গোরচন্দ্রিকা হল গালি—ঐ বস্তুর লোভে নফরকেষ্ট মজে আছে, এত কালেও নেশা কাটে না। খানিক সে হতভম্ভ হয়ে থাকে। একটা-কিছু হয়েছে আজ ঠিক, বড় রকমের কোন গোলমেলে ব্যাপার।

বলে, খবর আছে। দুটি বাবু গান শুনতে আসবে আজ।

বললাম তো শরীর গতিক খারাপ। পেরে উঠব না, বল গিয়ে সেই বাবুদের।

নফরকেষ্ট এবারে সত্যি রেগে গেল: স্বর্গ-মর্ত্য চুঁড়ে মানুষ আনব, এক কথায় উনি নাকচ করে দেবেন। খোল না দরজা, কী হয়েছে দেখি।

সুধামুখীর এবার নরম হতে হয়। নফরকেষ্টর সঙ্গে আলাদা সম্পর্ক। বয়সের সঙ্গে কুঞ্জবনের বিহঙ্গেরা পিঠটান দিয়েছে, শুধু এই নফরায় ঠেকেছে। কুহু-ডাকা কোকিল নয়, নিশিরাত্রের পেঁচা। অনেক দিনের মানুষটা, সেসব দিনের একমাত্র অবশেষ।

একদিন নফর ভাবে গদগদ হয়ে মনের কথা বলে ফেলেছিল। এমনি এক বিকাল-বেলা। সুধামুখী স্নান করে এসে চুল আঁচড়াচ্ছে, পাউডার বুলাচ্ছে মুখে, গয়না-গাটি পরছে। নফরকেষ্ট উদয় হয়ে হঠাৎ প্রেমগুঞ্জন শুরু করে দিল: ভালবাসি, তোমার মতন কাউকে ভালবাসিনি আমি জীবনে।

সুধামুখীর হাত জোড়া, এতগুলো কথা তাই বলতে পেরেছে। কানের ছিদ্রে টাবজোড়া লাগানো শেষ করে ধাঁই করে চাপড় কষিয়ে দিল নফরকেষ্টর গালে। পাহাড়ের মতো জোয়ান পুরুষটা হকচকিয়ে যায়। ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে।

মিথ্যে বলবে না। অত সব বানানো কথা তোমার মুখে শুনতে পারিনে।

মিথ্যে বলছি, কেমন করে জানলে? ভাল না বাসলে পিছন পিছন ঘুরি কেন দিনরাত?

বউ আমল দেয় না, বারো মাস বাপের বাড়ি পড়ে থাকে, সেইজন্যে। বউয়ের সোহাগ পেলে থুতু ফেলতেও আসতে না। কিন্তু দিনে আসতে মানা করে দিয়েছি না? দিনমানে কিছু নয়, তোমার ভালবাসা রাত্রে—গভীর রাত্রে। সন্ধ্যারাত্রের মানুষেরা ভালটাল বেসে চলে যাবে, তারপরে। তারা টাকা দিয়ে ভালবাসে, তোমার মুফতের ভালবাসায় তো ক্ষিধে মরবে না। রাত করে এসো—ভালবাসা পাবে।

নিশিরাত্রে নফরকেষ্টর আসার সময়। সুধামুখীর দিনকাল এখন খারাপ—আপোসে বড় কেউ ভালবাসতে আসে না সন্ধ্যারাত্রে আগেকার মতন। তদ্বির করে আনতে হয়। সে-তদ্বির সুধামুখী নিজে তো বটেই, নফরকেষ্টও করে থাকে। আজকে তেমনি এক খবর নিয়ে এসেছে।

নফর বলে, দেখি কী হয়েছে তোমার।

গায়েগতরে ব্যথা, মাথা ছিঁড়ে পড়ছে। চোখে দেখে কী বুঝবে তুমি?

আরও খানিকটা ইতস্তত করে ধীরেসুস্থে সুধামুখী দরজার খিল খুলে দিল। আজকে যা হয়েছে, ঠিক এমনি জিনিসই একদিন ঘটেছিল তার জীবনে। পুরানো কথা নফরকেষ্টর জানতে বাকি নেই। সে এসে দেখবে, বড় লজ্জা হচ্ছে। ভয়ও বটে। যদি সে খোঁটা দিয়ে কিছু বলে বসে। বহুকালের ক্ষতে রক্ত ঝরবে আবার।

তা হলেও খুলতে হয় দরজা। খুলতে খুলতে সহজভাবে একটা সাফাই গেয়ে রাখেঃ যেটা ভাবলে, মোটেই কিন্তু তা নয়। বাইরের মানুষ নেই ঘরে। থাকলে কেন বলব না, কাকে ডরাই?

খুব আড়ম্বর করে নফরকেষ্ট উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। আলনার কাপড়চোপড় সরিয়ে দেখে। ঘাড় লম্বা করে বড় আলমারির পিছনটা দেখে নেয়। এসব সুধামুখীকে চটাবার জন্য। চটে গিয়ে গালিগালাজ করবে অন্য দিনের মতো। নিষ্প্রাণ ঘর অকস্মাৎ রসে টইটম্বুর হবে, উঠানে জানলার সামনে হয়তো বা অন্য মেয়েরা হুড়োহুড়ি করে দাঁড়িয়ে যাবে। ভারি সে এক মজা!

কিছুই না। পালঙ্কের পাশে গিয়ে নফরকেষ্টর নিজেরই মুখে বাক্য নেই। দুষমণ চেহারার পুরুষ, মহিষের মতো মোটা, মহিষের মতো কালো, টকটকে রাঙা চোখে চেয়ে দেখে না—যেন রক্ত শুষে নেয়। সেই দৃষ্টিদুটো দিয়ে পাখির পালক বুলিয়ে দিচ্ছে যেন। পালঙ্কের গদির উপরে শাড়ি ভাঁজ করে এক বাচ্চা শুইয়ে দিয়েছে।

নফরকেষ্ট বলে, সুধা, তুমি মিছে কথা বললে। মানুষ নেই নাকি ঘরে?

একগাল হেসে সুধামুখী বলে, বয়স একদিন কি দুদিন। এই আবার মানুষ নাকি? রক্ত-মাংসের দলা—

গভীর কণ্ঠে নফরকেষ্ট বলে ওঠে, রক্ত-মাংস নয় গো, মাখন। মাখনের পুতুল গড়ে পাঠিয়েছেন বিধাতাপুরুষ।

সুধামুখী কোথা থেকে মধু সংগ্রহ করেছে। দরজা খুলতে গিয়েছিল, ফিরে এসে আবার এক ছিটে মধু আঙুলের ডগায় লাগিয়ে বাচ্চার মুখে ধরল। চুকচুক করে কেমন সেই আঙুলটা চুষছে।

নফরকেষ্ট বলে, রাক্ষস। তোমার আঙুলসুদ্ধ না খেয়ে ফেলে!

হেসে আবার আগের প্রসঙ্গই শুরু করেঃ বাচ্চাছেলে মানুষ না-ই হল, বাইরের বটে তো! পুরো সত্যি তবে হল কই?

সুধামুখী বলে, বাইরের কেন হবে? আমার ছেলে।

তোমার? কবে হল গো?

আজ সকালে।

পালঙ্কের কাছে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কথার পিঠে কথা দিয়ে রসের ঝগড়া চলল খানিকক্ষণ। নফরকেষ্ট ব্যাপার খানিকটা আন্দাজ করেছে। ঘাড় নেড়ে বলে, ছেলে তোমার নয়—আমার, আমার। সকাল থেকে পাচ্ছিলাম না খুঁজে, এখানে এসে

জুটেছে কেমন করে বুঝব ?

ফিক ফিক করে হাসে একটু আপন মনে। বলে, কালকুটি পাথরের বাটি, তোমার আব্বা দেখে বাঁচিনে সুধামুখী ! মুখের উপর বলছি, রাগ করো না। ছেলে তোমার হলে, ঐ যে কাপড়ের উপর শুইয়ে দিয়েছ—ছেলের ঘামের কালিতে ওটা এতক্ষণ কাল হয়ে যেত।

সুধামুখীর ভারি ভাল মেজাজ, কিছুতে আজ রাগ করে না। বলে তুমি কিন্তু নফরকালি সাক্ষাৎ কন্দর্পঠাকুর। চেহারায় হুবহু মিলে যাচ্ছে। ছেলে তোমার, একনজর দেখেই লোকে সেটা বলে দেবে।

নিজ অঙ্গের দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নফরকেষ্ট বলে, তা কেন। আমার বউ দেখনি তো। মাগী আধা-মেমসায়েব। ছেলে যদি মায়ের রং পেয়ে থাকে ?

সুধামুখী তর্ক করেঃ আমার বেলায়ও বা সেইটে হবে না কেন ? কতলোক আসে—তার মধ্যে যে জন ওর বাপ, সে হল খাঁটি বিলাতি সাহেব। ছেলে বাপের মতন হয়েছে।

নফরাকে কোণঠাসা করবার জন্য হঠাৎ আবার বলে ওঠে, তবু যদি একদিনের তরে ঘরবসত করত তোমার মেমসাহেব বউ !

ব্যথার জায়গাটায় নিষ্ঠুর সুধামুখী ঘা দিয়েছে। হাসিখুশি রঙ্গ-রসিকতার মধ্যে গরল উঠে গেল। মেজাজের মুখে নফরকেষ্ট সমস্ত খুলে বলেছে সুধামুখীর কাছে। কথা সে পেটে রাখতে পারে না, বলেকয়ে খালাস। খুব সুন্দরী বউ নফরার, হাজারে অমন একটা হয় না।

সুধামুখী বলে, কতই তো মেম আছে দুনিয়ায়। ট্রামরাস্তা ধরে এগিয়ে যাও, চৌরঙ্গীপাড়ায় ডজন ডজন মেমসাহেব। লঙ্কায় সোনা সস্তা—তোমার কোন মুনাফা তাতে ?

নফরকেষ্ট সগর্বে বলে, বিয়ে-করা বউ আমার। মন্তোর পড়ে সাতপাক ঘোরানো। বড় শক্ত গিঁঠ—তিন সাতে একুশটা উল্টো পাক দিলেও ফাঁক কাটিয়ে বেরুবার জো নেই। যাবে কোথায় ? আজ না হল কাল, কাল না হল পরশু—

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, আমি খারাপ কিনা ! ভাল হলে আসবে বলেছে।

খাওয়ানো শেষ হয়েছে। মধুর শিশি কুলুঙ্গিতে রেখে সুধামুখী নিস্পৃহ কণ্ঠে বলে, ভাল হয়ে গেলেই তো পার।

সে আর এ জন্মে হবে না। লেখাপড়া করিনি, স্বভাব নষ্ট করে ফেলেছি। নইলে যা বউ আমার—পেটে ছেলে ধরলে ঠিক এই জিনিসই বেরুত। কিন্তু আমিও ছাড়ছিনে। ভাইকে সব খুলে বললাম, ভাল হতে যদি না-ই পারি টাকা হলে তোমার বউদি এসে পড়বে ঠিক। দিনরাত টাকার ধান্দায় ঘুরি। হাতে কিছু জমলেই বাড়ি চলে যাই। তোমায় আর কি বলব, কোনটা তুমি জান না সুধামুখী ? রমারম খরচা করি বাড়ি গিয়ে। হাটে গিয়ে সকলের বড় মাছটা কিনি, মানুষজন ডেকে ডেকে খাওয়াই। বুঝলে না, মাছ মারতে গিয়ে চার ফেলে যেমন আগে—

চারের গন্ধে মাছ আসে। শ্বশুরবাড়ি তিন ক্রোশ পথ—খবর পেঁছুতে দেরী হয় না। চার ফেলেই যাচ্ছি—মাছ আসে আসে, আসে না। একবার প্রায় এসে গিয়েছিল, কিন্তু টাকাকড়ি তদ্দিনে ফুঁকে গেছে। চারেই সব খরচা হয়েছে, টোপের মসলা নেই। পালিয়ে এলাম।

হেসে উঠল উদ্দাম হাসি। মস্তবড় দেহখানা হাসির দমকে দুলে দুলে ওঠে। ছেলের দিকে একনজরে তাকিয়ে আছে। বলে, তাগড়া একটা বউ গাঁথা চাট্টিকথা নয়, মবলগ টাকা লাগে। তাই সই, আমিও ছাড়ছিনে।

সুধামুখী হেসে বলে, 'একবার না পারিলে দেখ শতবার, পারিব না এ কথাটি বলিও না আর'—

কথাবার্তা সহজ হয়ে এসেছে। নফরকেষ্ট বলে, কষ্টদুঃখের কথা থাক। এই ছেলে কিন্তু সত্যি সত্যি মেমের বাচ্চা। চৌরঙ্গিপাড়ারই কোন মেমসাহেবের। আমাদের পাড়ায় এ জিনিস হয় না।

সুধামুখী বলে, যেমন তোমার কথা। মেমসাহেব বাচ্চা ফেলতে আদিগঙ্গায় এসেছে! তে-মহলা, চার-মহলা মস্ত মস্ত বাড়ি—কত ভাল ভাল মেয়ে সেই সব বাড়িতে। ধুলো লাগে না, মাটি লাগে না, কাজকর্ম করে বেড়াতে হয় না, ঝিলিক মারছে গায়ের রং। মেমসাহেব তাদের পা ধোয়ানোর যুগ্যি নয়। দেখ নি, মোটর হাঁকিয়ে তারা মায়ের মন্দিরে আসে—

কথা কেড়ে নিয়ে নফরকেষ্ট বলে, মন্দিরে এসে মায়ের দিকে তাকায় না একবারও—ফালুকফুলুক করে। নাটমণ্ডপের উঠান থেকে ফুলবাবু কেউ ইশারা দিল, চলল গাড়িহাঁকিয়ে চাকুরে গোড়ে ছাড়িয়ে যে চুলো অবধি দুজনের চার চক্ষু যায়।

সুধা বলে, ফল তারপরে একদিন গঙ্গায় সমর্পণ করে দিয়ে যায় চুপি চুপি। কালির দাগ মুছে যেমনকার তেমনি ঘরে ফেরে।

বাচ্চার গলার দিকে নজর পড়ে যায় হঠাৎ। নফরকেষ্ট হেন দস্যুমানুষও শিউরে উঠল: হায় হায় গো, গলা টিপে মারতে গিয়েছিল। গলার উপর আঙুলের দাগ কালশিটে পড়ে আছে। পেটের সন্তান দম আটকে মেরে ফেলে—মা নয় সে রাক্ষসী।

সুধামুখী বারংবার ঘাড় নেড়ে আর্তনাদের মতো বলে মা কখনো করেনি, কখনো না। বাবা, পুরুষমানুষ। মেয়েমানুষে এ কাজ পারে না।

তার বাচ্চার বেলা সুধামুখী গলায় দাগ পায় নি। পেয়েছিল গলার ভিতরে—নুন। গালের ভিতরে নুন ঠেসে ঠেসে নাক টিপে মেরে ফেলা। পুরুষের পাকা হাত ছাড়া তেমন কাজ হয় না। সে পুরুষ নার্সিং-হোমের ডাক্তারবাবু। কিংবা সুধামুখীর বাবা—অতি নিরীহ পুণ্যবান মানুষটি। অথবা এমন হতে পারে বাচ্চার জন্মদাতা প্রেমিকপ্রবরটি হঠাৎ কোন ফাঁকে আবির্ভূত হয়ে পিতৃকর্তব্য সেরে গেছে।

তিক্ত কণ্ঠে সুধামুখী বলে, খুনজখম পুরুষের পেশা নফরকালি। পুরুষেরা রাক্ষস।

নফরকেষ্ট আজকে যেন যাবতীয় পুরুষজাতির প্রতিনিধি। জোর গলায় সে

সুধামুখীর প্রতিবাদ করেঃ পুরুষের খুনোখুনি সমানে সমানে—খুন করতে গিয়ে খুনও সে হয়ে যায়। একদিন-দুদিন বয়সের একফোঁটা অবোধ শিশু, যার সঙ্গে কোন রকম শত্রুতা নেই—

শত্রুতা নেই কী বলছ! পেটের শত্রুর—পেটে জন্মানোই শত্রুতা। ধার্মিক মানুষ আমার বাবা একটা মাছি-পিঁপড়ে মারতে কষ্ট হয়—এমন মানুষটিও ক্ষেপে ওঠে ক্ষুদে শত্রুর নিপাতের জন্য।

বলতে বলতে সুধামুখীর কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। সেই বাচ্চাকে পেয়ে গেছে আবার যেন। ছেলে নয়, সেটি মেয়ে। প্রসবে বড় কষ্ট পেয়েছিল দিনরাত। তারপরে কাতর হয়ে ঘুমাত। সন্দেহ, ডাক্তার চৌধুরীর কারসাজি—ওষুধ দিয়ে তিনি ঘুম পাড়িয়ে রাখতেন। পরে একদিন এই নিয়ে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া, মায়ের মন বলে সন্দেহ উঠেছিল কেমন একটা। নার্সটাকেও সে উত্যক্ত করে তুলল। নার্স-ডাক্তারে স্তোক দিয়েছিলঃ ভাল আছে, শিশু ঘুমুচ্ছে। নিয়ে এল তারপর সামনে। আনতেই হল, সুধামুখী এমন চেঁচামেচি করছে। জীবনদ্বীপ নিবে গেছে তখন—

—মুঠি-করা হাত দুখানি, চোখ দুটি বন্ধ।

কঠিন মুঠিতে সুধাময়ী ডাক্তার চৌধুরির হাত চেপে ধরলঃ ঘুমুচ্ছে বললেন যে, ঘুম থেকে জাগিয়ে দিন এবার। দিন, দিন—

রোগিনীর মূর্তিতে ডাক্তার ভয় পেয়ে গেছেন, মুখে হঠাৎ উত্তর যোগায় না। বললেন, আমাদের কাজ বাঁচিয়ে তোলা, মেরে ফেলা নয়। চেষ্টা যথেষ্ট করেছি, কিন্তু হেরে গেলাম। গর্ভাবস্থায় অনেক বিষাক্ত অষুধ খাওয়ানো হয়েছে, শিশু শেষ পর্যন্ত ধকল সামলাতে পারল না। গালিগালাজ তাদের দাওগে, ব্যবস্থা দিয়ে যারা সেই সব অষুধ গিলিয়েছে।

সহসা সুধাময়ীর নজরে পড়ে, নুন আছে বাচ্চার ঠোঁটের কোণে, নুনের গোলা। হাঁ করাতে গালের মধ্যেও কিছু ভিজে নুন পাওয়া গেল। ডাক্তার পাগলের মতো দিব্যিদিলেশা করছেন, তিনি কিছু জানেন না, একেবারে কিছুই না। অমলা নামে নার্স মেয়েটা—ডাক্তার চৌধুরি পরে যাকে বিয়ে করেন, বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন—সে-ও নির্দোষ। ব্রতের মতো রোগী-সেবা নিয়ে পড়ে আছে, এমন জঘন্য কান্ড সেই মেয়ের সম্বন্ধে ভাবতে যাওয়াও মহাপাপ।

বললেন, নার্সিং-হোমে তোমার বাবাও তো হরদম আসাযাওয়া করছেন। প্রবীণ মানুষ, ধর্মভীরুও বটে—নিজের চোখে যখন দেখিনি, তাঁর সম্বন্ধেও কিছু বলতে চাইনে।

ব্যাপারটা মোটের উপর রহস্যময় হয়ে আছে। সন্তানের বাপটি গোলমাল বুঝে শহর থেকেই পিঠটান দিয়েছিল। সুধামুখীর এমনও সন্দেহ হয়, কর্তব্যের তাড়নায় সেই লোক এসে পড়ে ডাক্তার-নার্সকে টাকা খাইয়ে দায়িত্ব শেষ করে গেল নাকি?

মধু খাওয়ানো হয়ে গিয়ে সুধামুখী এখন পালঙ্কের উপর শিশুর শিয়রে বসে গায়ে হাত বুলোচ্ছে।

নফরকেষ্ট বলে ওঠে, ও কি, কাঁদছ তুমি সুধা? কী হল তোমার?

দু-চোখে ধারা গড়াচ্ছে, সুধামুখী বাচ্চা ছেলের গায়ে মাথায় হাত বুলায়। শনির দৃষ্টি না পড়ে যেন শিশুর উপর। মা দক্ষিণাকালী, দেখো তুমি একে। শয়তান মানুষের দৃষ্টি না পড়ে। কোন ডাক্তারের দৃষ্টি। যে জন একে ধরণীতে এনেছে সেই জন্মদাতা পিতার দৃষ্টি।

সেই ছেলে গণেশ। গণেশ নাম বড় কেউ জানে না। গণেশচন্দ্র পাল—শিরো-নামায় চিঠি এসেছে, বলাধিকারী লোক খুঁজে খুঁজে হয়রান। নাম শুনে সাহেবের নিজেরও গোড়ায় ধাঁধা লেগেছিল—নিজের নামই ভুলে বসে আছে। সকলে সাহেব-সাহেব করে ছোট বয়সের সেই গায়ের রঙের জন্য। রঙই শুধু নয়—টানা চোখ, টিকল নাক। অযত্নে, অবহেলায় গায়ের রঙ জ্বলেপুড়ে অবশেষে তামাটে হয়ে গেল। শিশু-বয়সটা বস্তির ঘরে—তারপরেই বা ভাল জায়গায় কে কবে থাকতে দিল দয়াময় সরকার বাহাদুর ছাড়া? জেলখানায় নিয়ে পোরো, পাকা দালানে আয়েস করে থাকা যায়। সে সুখও বা বেশি কী হল জীবনে! বুড়ো হবার পর এখন তো একেবারেই গেছে। দারোগা বিশ্বাসই করে না জেলবাস অর্জনের মতো তাগত আছে তার বুড়ো-বয়সের শরীরে। খাওয়া-থাকাটা চলনসই গোছের হলেও সাহেব কেন, রাজার ঘরের ছেলে বলে চালানো যেত এই চোর মানুষটাকে!

যাকগে, সেই গোড়ার কথা যা হচ্ছিল। সুধামুখীর কথা। সতের বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল সুধামুখীর, বিশ বছরে চুকিয়েবুকিয়ে বাপের বাড়ি উঠল। বাপের বাড়ি বেলেঘাটার এক ঘিঞ্জি রাস্তার কয়েকটা কুঠুরি। সমস্ত ঘুচে গেল, পোড়া যৌবন গেল না। চার বোনের মধ্যে সে সকলের বড়। মা নেই মাথার উপরে। বাপ এক ব্যারিস্টারের কেরানি। কেরানির কাজ হাইকোর্টে নয়, সাহেবের বাড়িতে। গবেষণার বাতিক আছে ব্যারিস্টারের—লাইব্রেরীতে বসে সাহেবের হয়ে সুধামুখীর বাপকে সেই মত করে দিতে হয়। লাইব্রেরীতে পুঁথিপত্র এবং বাড়িতে পুজোআচ্চা এই দুটো মাত্র জিনিস জানেন তিনি জগৎসংসারে। সুধামুখীরই অতএব সকল দিক বুঝেসমঝে সংসারের হাল ধরবার কথা। কিন্তু অবুঝ হল সে নিজেই, সাধুভাষায় যাকে বলে পদস্খলন তাই ঘটে গেল। বাপ চোখে সর্ষের ফুল দেখেন। এ লাইনের যারা বহুদর্শী, দায়ে পড়ে এমনি দু-একজনের দ্বারস্থ হলেন। অষুধপত্র খাওয়ানো হল যথারীতি, কিন্তু নিষ্ফল। নিরুপায় হয়ে ডাক্তার চৌধুরীর হেফাজতে দেওয়া হল—তাঁর নার্সিং-হোমে।

ডাক্তার চৌধুরি কোন রকমে পশার জমাতে না পেরে শহরতলীতে নতুন নার্সিং-হোম খুলেছেন। ভাল টাকা পেলে যে কোন রকম চিকিৎসায় রাজি। একটিমাত্র নার্স, অমলা—পরে যাকে বিয়ে করেছিলেন। এবং ঠিকে ঝি ও বিশ্বাসী পুরানো চাকর—রোগী যা আসত, সবই প্রায় এই জাতীয়—রোগী নয় রোগিণী। এখন দিন ফিরেছে ডাক্তার চৌধুরির, ডাক্তার হিসাবে রীতিমতো নামডাক। সেই জন্যেই পুরো নাম প্রকাশ করা ঠিক হবে না। কালীঘাটের অনতিদূরে নতুন রাস্তার উপর প্রকাণ্ড বাড়ি তুলছেন। সেদিনের সেই জঙ্গুলে শহরতলী জায়গা জমজমে শহর এখন।

নার্সিং-হোমেরও খ্যাতি খুব, আজেবাজে রোগী নেওয়া হয় না।

জঞ্জালমুক্ত হয়ে মেয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছে, বাপ নিতে এলেন : চল সুধা, বাড়ি এইবারে।

সুধামুখীর কী রকম জাতক্রোধ সেই ব্যাপারের পর থেকে—বাপ বলে নয়, বিশ্ব-সুদ্ধ সকলের উপর। বলে, তোমার মেয়ে পাপ করেছে তো বিষ খাইয়ে তাকেই বধ করলে না কেন? মারলে মেয়ের পেটের মেয়েটাকে, যে কিছু জানে না। ধার্মিক মানুষ হয়ে এ তোমার কেমন বিচার?

বাপ থতমত খেয়ে যান। কোথায় লজ্জায় নুয়ে থাকবে তা নয় উল্টে ধমকানি। ভালমানুষ লোক—ঠিক জবাবটা হাতড়ে পাচ্ছেন না তিনি। বলেন, আপদ বিদায় হয়ে ময়লা সাফসাফাই হল। আরও তিনতিনটে মেয়ে সেয়ানা হয়ে উঠেছে, সেগুলো পার করতে হবে। সকলে আমায় খাতিরসম্ভ্রম করে। এমনি বাপের মেয়ের যা হওয়া উচিত, এর পর সেই রকম থাকবি।

নিয়ে এলেন বাড়িতে। বৃত্তান্তটা ভেবেছিলেন বাড়ির মধ্যের তাঁরা কটা প্রাণী ছাড়া বাইরের কেউ জানে না। আড়াই মাস পরে সুধামুখী বাড়ি পা দিতে না দিতেই বোঝা গেল, রসের খবর বাতাসের আগে ছড়িয়েছে। সম্পূর্ণ দায়মুক্ত সেই প্রেমিক-প্রবরটিও বুঝি একদিন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল, পাড়ার মানুষ ধরে তাকে আচ্ছা রকম পিটুনি দিয়ে দিল। মচ্ছব না জমে যায় কোথা এর পর?

তিন বোন মাথায় মাথায়, বিয়ের এত চেষ্টা সত্ত্বেও কোনখানে সম্বন্ধ গাঁথে না। বাড়ির উপরে সুধামুখী হেন মেয়ে রয়েছে, সেই একটা কারণ। প্রধান কারণ হয়তো তাই। বোনেরা খিটখিট করে রাত্রিদিন, কথাবার্তা প্রায় বন্ধ করেছে সুধামুখীর সঙ্গে, পাঁচ বার জিজ্ঞাসা করলে তবে হয়তো একটা জবাব দিল। বিধবা আধবুড়ো এক মেয়েলোক রান্না করে, একদিন সে কাজ ছাড়বে বলে হুমকি দিল, সুধামুখী ছোঁয়াছুঁয়ি করেছে সেইজন্য। বাপ একটু বকুনি দিলেন : কী দরকার তোর রান্নাঘরে যাবার? পরে জানা গেল, বোনেরা উসকে দিয়েছিল রাঁধুনিকে, নিজে থেকে সে কিছু বলতে যায়নি।

টিকে থাকা হেন অবস্থায় অসম্ভব। ঘরের অন্ধকূপে দম বন্ধ হয়ে আসে। জানলায় এসে আকাশের একটু ফাঁকা হাওয়া নিয়ে বাঁচবে, সে উপায় নেই। প্রায়ই দেখা যায়, কেউ না কেউ সেখানে—মূর্তিমান কোন প্রেমিক। কয়লার জায়গা থেকে এক টুকরো কয়লা ছুঁড়ে মারল রাগ করে। গায়ে লাগে নি, পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। জানলার পাখি দিয়ে সুধামুখী তাকিয়ে দেখে, ছোঁড়া সেই কয়লাখণ্ড হাতে তুলে নিয়ে দেখছে। ওর সঙ্গে প্রেমপত্র বাঁধা আছে কিনা, খুঁজছে নিশ্চয় তাই। বাপের বাড়ি এই ক'টা বছর কী করে যে কাটিয়ে এসেছে সে শুধু তার অন্তর্যামীর জানা।

বাড়ি ছেড়ে সুধামুখী ডাক্তার চৌধুরির নার্সিং-হোমে এসে হাজির। বলে, অমলাদিদি কাজ তো ছেড়ে দিয়েছেন। সেই নার্সের কাজ আমায় দিন ডাক্তারবাবু।

চৌধুরি বলেন, ট্রেনিং চাইতো আগে। 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে' কেমন করে হয়। কিছু শিখে পড়ে নাও।

চলল সেই ট্রেনিং সদাশয় ডাক্তারবাবু উঠে পড়ে লাগলেন। জরুরি কেস এসে ডাক্তারের পাত্তা পায় না! একদিন হঠাৎ অমলা এসে পড়ে পায়ের স্লিপার খুলে পটাপট ঘা কতক দিয়ে সুধামুখীকে দূর করে দিল।

হনহন করে যাচ্ছে সে চলে, মোড়ের মাথায় শুভানুধ্যায়ী ডাক্তারবাবু।

আপনজন সবই তো ছেড়ে এসেছ, যাচ্ছ কার কাছে শুনি?

নিশ্চিন্ত কণ্ঠে সুধামুখী বলে, জুটিয়ে নেবো নতুন নতুন আপন জন।

তাকিয়ে দেখে, গিলে খেতে আসছেন যেন ডাক্তারবাবু। মুখে নয়, চোখ দুটো দিয়ে।

বলে, আপনি হবেন তো বলুন।

ডাক্তার চৌধুরি সামলে নিয়েছেন ততক্ষণে। স্বরে গাম্ভীর্য এনে মোটা রকম উপদেশ ছাড়েনঃ বাঁদরামি করো না। বিস্তর তো দেখলে। ভাল হয়ে থাকবে এবার থেকে, কথা দিয়ে যাও।

সুধামুখী বলে, এই মাত্র জুতো খেয়েছি। জুতোর বাড়ি কেটে কেটে বসেছে। আজকের রাতটা ভাল থাকব, কথা দিচ্ছি। কাল থেকে নইলে কে আমায় খাওয়াবে, বলতে পারেন? থাকব কোথা?

হি-হি করে উৎকট হাসি হাসে। উন্মাদের মতো। বলে, জুতো না খেলেও চলে যেতাম। আজ না হলেও কাল-পরশু। থাকার উপায় নেই, সে আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। রোগী হয়ে আপনার নার্সিং-হোমে থেকে গেছি—সেই রোগের বৃত্তান্ত জানাজানি হয়ে গেল। তার পরে আমার হাতে শুধুমাত্র নার্সের সেবা নিয়ে লোকে খুশি থাকতে পারে না। সে আমি জানতাম। ভেবেছিলাম, রোগীরা মুশকিল করবে। কিন্তু সে অবধি পেঁছনোর আগেই দেখি ডাক্তার—

ডাক্তারবাবুর এ সব কানেই যাচ্ছে না, অথবা কানে শুনেও বুঝতে পারেন না। নিরীহভাবে বলেন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কোনখানে গিয়ে উঠবে ঠিকঠাক আছে কিছু?

সুধামুখী বলে, খুব ভাল জায়গা। গতিকটা বুঝে আগে থাকতে ঘর দেখে রেখেছি। কালীঘাটে মা-কালীর পাদপদ্মের নিচে। ঠিক একেবারে আদিগঙ্গার পাশে। বড্ড সুবিধা। যত খুশি অনাচার কর, সকালবেলা গোটা কয়েক ডুব দিয়ে সাফসাফাই। সমস্ত পাপ ধুয়ে গেল, পতিতপাবনী সব গ্লানি ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন। আবার চালাও পুরো দিন আর পুরো রাত্রি। গঙ্গায় স্রোত যতক্ষণ আছে, কী ভাবনা!

রাত্রে খুব বৃষ্টিবাদলা হয়ে গেছে। জের কাটে নি, ভোরবেলাতেও জোর হাওয়া, আকাশ মেঘে থমথম করছে। সুধামুখী যথানিয়ম গঙ্গাস্নানে গেছে। দুর্যোগে একটা মানুষও ঘাটে আসে নি এখন অবধি। শেষ ভাঁটা, বাঁধানো ঘাটের শেষ সিঁড়িরও অনেক নিচে জল। কতটুকু আর—এক হাত দেড় হাত গভীর হবে বড় জোর। অবগাহন স্নান হবে না আজ, কোন একখানে বসে পড়ে গামছা ডুবিয়ে জল মাথায় দেওয়া। সেই জল অবধি গিয়ে পেঁছুতেও অনেক কাদা।

যাচ্ছে তাই সুধামুখী, না গিয়ে উপায় কী! গঙ্গাজলে যতক্ষণ না দেহটা ধোয়া হচ্ছে, গা ঘিনঘিন করে। অসুখবিসুখ যা-ই হোক, রাতের বিছানা ছেড়ে উঠেই সকলের আগে ঘাটে ছুটবে।

নজরে পড়ল, ভাঙা সিঁড়ির ইটের গাঁথনির গায়ে ন্যাকড়ার পুঁটলি আটকে আছে। কী বস্তু না জানি ভেসে এসেছে! কোন দিকে কেউ দেখছে না, ভয়সঙ্কোচের কারণ নেই। দিনকাল বড্ড খারাপ যাচ্ছে। পরশুদিন পারুল নামে মেয়েটার কাছ থেকে ধার করে এনে চালিয়েছে। নির্জন দুপুরে কাল বড় দুঃখে কালীবাড়ির নাট-মন্ডপে পড়ে কেঁদেছিল একা একা। মা তাই কি পাঠিয়ে দিলেন কিছু? দামি মাল যদি হয় গাপ করবে। নোংরা-আবর্জনা হলে—গঙ্গাগর্ভে রেয়ছে, স্নানের জন্যই তো এসেছে—ছুঁড়ে ফেলে গঙ্গাজল মাথায় দিয়ে ঘরে ফিরবে।

পুঁটলি খুলে দেখে বাচ্চা ছেলে। কী ছেলে মরি মরি! মেরে ফেলে গঙ্গায় ছুঁড়ে দিয়েছে। কার বুকের নিধি ছিনিয়ে আনল গো! ঠাহর হল, ধুক পুকানি এখনো যেন বুকে, এই হিমের মধ্যেও একটু যেন উত্তাপ পাওয়া যায়। এত গর্ভযন্ত্রণা সয়ে ধরাতলে এসে নামল, সঙ্গে সঙ্গেই অমনি প্রাণটা দিতে চায় না, আঁকুপাকু করে দেখে। তার মেয়েটাও এমনি হয়তো ছিল, কিন্তু দেখতেই দিল না ভাল করে। নার্সিং-হোমের চাকরটা তাড়াতাড়ি বস্তায় ভরে রেললাইন পার হয়ে গিয়ে জঙ্গলাকীর্ণ পরিত্যক্ত কবরখানার কোনখানে পুঁতে রেখে এল। নিশ্চিন্ত! প্রাণ নিয়ে দৈবক্রমে ফিরবে, তেমনি কোন শঙ্কা রইল না।

কে কখন এসে পড়ে এমন ধারা দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। কী হল সুধামুখীর—নিজেরই চলে না শঙ্করাকে ডাকে—ঘাটের জঞ্জাল ঘরে তোলার ঝঞ্ঝাট বুঝে দেখল না। গঙ্গাস্নান হল না আজ, কাপড়ের নিচে বাচ্চা জড়িয়ে ঘরে ফিরে এল।

ঘরে গিয়ে সেঁকতাপ দিচ্ছে। লাইনের সর্বশেষে সকলের বড় ঘরখানায় পারুল থাকে। মেয়েটা ভাল। তাকে ডেকে এনে দু-জনে মিলে করছে।

সুধাময়ী বলে, তুই একটুখানি থাক পারুল। ডাক্তার নিয়ে আসি।

পারুল বলে, ডাক্তার কি হবে! সাড় তো হয়েছে একটু, আরও হবে।

তবু একবার দেখানো ভাল। ডাক্তারের পয়সা তো লাগছে না। বড় ডাক্তার—এমনি আসবে।

সকালবেলা এই সময়টা রোগীর ভিড। ডাক্তার চৌধুরির বাড়ি। সুধাময়ী সেখানে গিয়ে পড়ল। চৌধুরী স্তম্ভিত। সিঁড়ির দিকে সশঙ্কে তাকান, উপর নিচে করবার মুখে অমলার নজরে সুধাময়ী পড়ে না যায়।

হাতের রোগীটাকে আপাতত শুইয়ে রেখে বসবার ঘরে সুধামুখীকে নিয়ে গেলেন। এখানে কি? বেশ রাগত স্বরেই বললেন।

সুধামুখী বলে, আমার বাড়িতে একবার যেতে হবে ডাক্তারবাবু।

অসম্ভব।

সুধামুখীর স্বর ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে: আমার দরকারে আজ যাবেন না, নিজের

যেদিন দরকার ছিল তখন তো গটগট করে চলে যেতেন। গড়ের মাঠে বাজি পোড়ানো দেখতে গেছি—সেইমাত্র একটা রাত—তা-ও দেখি রেগে মেগে চিঠি রেখে এসেছেন।

ডাক্তারবাবু গোঁ-গোঁ করে অবোধ্য আওয়াজ করেন একটা। হয়তো প্রতিবাদ, হয়তো বা কিছুই নয়। জবাব দেবার কিছু নেই, সেইজন্যে।

সুধামুখী আরও রেগে বলে, মিছে কথা? একদিন সমস্ত মিথ্যে হয়ে হয়ে যাবে, আমিও তা জানতাম। সে চিঠি রয়েছে আমার কাছে। আমার দলিল। দরকার হলে বের করে দেখাব। অমলা-দিদিকে দেখিয়ে যাব।

ডাক্তার চৌধুরির চক্ষু কপালে উঠে যায়ঃ বলিস কি রে, এমনি সর্বনেশে মেয়ে-মানুষ তুই! ঝোঁকের মাথায় কোন অবস্থায় লিখেছিলাম, সেই চোতা কাগজ তুই রেখে দিয়েছিস ব্লাকমেইল করবি বলে। এই তোর ধর্ম হল।

সুধামুখী শান্ত হয়ে বলে, কিছু করব না! আসুন আপনি ডাক্তারবাবু, এসে একটিবার দেখে যান। হয়তো কিছুই নয়। তবু কাছাকাছি এত বড় ডাক্তার আছেন, একবার না দেখিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি নে!

চৌধুরি কিছু নির্ভয় হয়ে বলেন, কার অসুখ?

আমার ছেলের—

বটে! ছেলে হয়েছে বুঝি তোর! কবে হল, কিছু তো জানিনে। বয়স কত ছেলের?

একদিন কিম্বা দু-দিন।

ডাক্তার সচকিত হয়ে সুধামুখীর দিকে নজর ঘুরিয়ে নেন। কাঁচা পোয়াতির লক্ষণ নেই, সুধামুখী মিছেকথা বলছে।

সুধামুখী বলে, পেটে আসে নি, কোলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল।

দু-চক্ষু বুজে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মুহূর্তকাল বুঝি অশ্রু সামলে নিলঃ মাটিতে পুঁতেছিলেন আমার বাচ্চা—মাটি ফুঁড়ে সে-ই আবার ফিরে এসেছে। সাত ভাই চম্পার তাই হয়েছিল ডাক্তারবাবু, আমার বাচ্চারই বা কেন হবে না?

ডাক্তার বিরক্তির সুরে বললেন, হেঁয়ালি ছাড়। কী ব্যাপার খুলে বল সমস্ত। ডাক্তারকে না বললে চিকিচ্ছে হবে কি করে?

সুধামুখী সমস্ত বলল। বলে, এত চেষ্টা হচ্ছে তবু কেমন সাড়া পাওয়া যায় না। ভয় ঘোচে না। সেইজন্যে ছুটে এলাম। সেবারে মেরেছিলেন, এবারে বাঁচিয়ে দিতে হবে ডাক্তারবাবু। তা যদি করেন, চিঠি আমি ছিঁড়ে ফেলব। আপনার সামনেই ছিঁড়ব।

ডাক্তার একটু ভেবে বলেন, না গেলে হবে না? এখান থেকে যদি ওষুধ দিয়ে দিই?

কঠিন স্বরে সুধামুখী বলে, না—

ডাক্তার বলেন, ষোল টাকা ফী আমার। এক পয়সা কম করতে পারব না।

সুধামুখী সকৌতুকে বলে, ফী আমার কাছেও?

আর কম্পাউণ্ডার যাবে আমার সঙ্গে। ছোঁড়া শুধু-হাতে ফিরবে, সেই বা কেমন! তার দু-টাকা বখশিস।

কম্পাউণ্ডারের কি দরকার ?

ততক্ষণে ডাক্তার চৌধুরি মনিব্যাগ খুলে দু-খানা দশ টাকার নোট সুধামুখীর হাতে দিলেন।

নিয়ে চলে যা তাড়াতাড়ি। এদিককার এই দরজা দিয়ে। ঠিক সাড়ে-দশটায় তোর বাড়ি যাব। কম্পাউণ্ডারের দরকার তোর নয়, আমারও নয়—অমলার। কম্পাউণ্ডারের সামনে গুণে ষোল আরা দুই, আঠারো টাকা দিবি। সে ছোঁড়া অমলার লোক, কি রকম ভাই সম্পর্কের হয় তার। স্পাই রেখেছে আমার উপর খবরদারি করতে। ডাক্তার আর রোগী—ছোঁড়ার সামনে আমাদের এইমাত্র সম্পর্ক, খাতির-উপরোধ নেই। খেয়াল রাখিস। আমি ঠিক তেমনি ভাবে কথাবার্তা বলব। যাব ঠিক সুধা, ভাবনা করিস নে।

রূপকথার সাত-ভাই-চম্পা সুধামুখীর মনে এসে গেল হঠাৎ, ডাক্তার চৌধুরির কাছে বলে ফেলল। চক্রান্ত করে দুয়োরাণীর সাত ছেলে আর এক মেয়ে ছাইগাদায় পুঁতে ফেলেছিল। ফুল হয়ে তারা ডালে ডালে ফুটে উঠল, মায়ের কোলে-কাঁখে ঝুপ-ঝুপ করে নেমে এল একদিন। সারা পথ ঐ গল্প ভাবতে ভাবতে সুধামুখী বাসায় ফিরেছে। চেয়ে চেয়ে যে বস্তু পাওয়া যায় না, নাছোড়বান্দা মানুষ তা রূপকথার মধ্যে গেঁথে প্রাণ ভরে বলাবলি করে। রূপকথাতেই ঘটে, আর ঘটে গেছে সুধামুখীর অদৃষ্টে। মা-গঙ্গা বাচ্চা ছেলে কোন মুলুক থেকে ভাসিয়ে এনে ভোরবেলা তার খাটে তুলে দিয়ে গেলেন।

ডাক্তার চৌধুরী কম্পাউণ্ডার-সহ যথাসময়ে এসে দর্শন দিলেন। ভালই আছে ছেলে। ওষুধপত্র দিলেন না, এক ফোঁটা দু-ফোঁটা করে মধু খাওয়াতে বললেন। ভিজিটের পুরো টাকা গুণে নিয়ে পকেটে ফেলে বিদায় হলেন।

সারা বেলা ধরে বাচ্চার খেদমত চলেছে! এঘর থেকে ওঘর থেকে মেয়েরা কতবার এসে দেখে যাচ্ছে। আহা, হাত নাড়ছে পা নাড়ছে সোনার পুতুল একটুকুন। আসায় যাওয়ায় মেলার মচ্ছব সুধামুখীর ঘরে। আর সন্ধ্যার মুখে সকলের শেষে এই নফরকেষ্ট।

নফরা চলে যেতে পারুল এসে আবার ঘরে ঢুকল। নফরকেষ্ট ডাকাডাকি করছিল, তখনকার কথাবার্তা সমস্ত কানে গিয়েছে তার। বলে, শরীরের কথা বলে লোক তাড়াচ্ছ দিদি, কিন্তু যে অসুখ ঘাড়ে তুলে নিয়েছ, শরীর তো একদিন দু-দিনে সারবার নয়। চিরকাল জীবনভোর চলবে। ছোট বোনের কথায় দোষ নিও না—দিন চলবে কিসে সেটাও ভেবে দেখ। মাথার উপরে শ্বশুর-সোয়ামি নেই যে তারা রোজগার-পত্তর করে আনল, ঘরে খিল দিয়ে বসে বসে তুমি ছেলের সোহাগ করলে।

কথা বড্ড খাঁটি। সুধামুখী খানিকটা কৈফিয়তের ভাবে বলে, চানের ঘাটে মা-গঙ্গা হাতের উপর তুলে দিলে, ফেলে আসি কেমন করে? দুটো-চারটে দিন তাউত করে তো তুলি, দেখা যাবে তারপরে।

সাজসজ্জা সারা করে এসেছে পারুল। দিনের শেষে এই সময়টুকুর জন্যই এতক্ষণ ধরে সাজ করেছে। তবু কিন্তু চলে যেতে পারে না। এক দিনের বাচ্চার গাল টিপে

আদর করছে। করছে কত রকম! হাত বুলাচ্ছে দুটো গালে। মুঠির আঙুল খুলে দেয়, আবার কেমন বুজে আসে। এই এক খেলা। সুধামুখীর জবাবে মুখ তুলে চাইল পারুল। বলে, দু-চারটে দিনের পরে কি হবে দিদি, কি করবে? রাখতে না পার তো আমায় দিয়ে দিও। এই বলা রইল। একগাদা বিড়াল পুষি, খরগোস পুষি, কাকাতুয়া পুষি—তার উপরে রইল না হয় একটা ছেলে। অসুবিধে নেই, আমি তো ঘরের বার হইনে। বড্ড খাসা ছেলে গো!

দেমাকের কথা। নবীন বয়স পারুলের, সুখের দিন। চলার ঢঙে যৌবন ছলকে ছলকে ওঠে। বাড়ির মধ্যে তাকেই শুধু দরজায় দাঁড়িয়ে রূপ দেখাতে হয় না। লোকে তার ঘরে চলে আসে—উল্টে ধমক দেয় সে, মেজাজ দেখায়। চরণের গোলাম যত পুরুষ।

আলাদা চাকর, আলাদা ঝি—হাটবাজার রান্না-বান্না তারাই করে। পারুলের কেবল শুয়ে বসে ঘরের মধ্যে থাকা—দিনমানটা কিছুতেই কাটতে চায় না। বলছে অবশ্য ভাল কথাই। বিবেচনার কথা! ছেলে পোষা বিলাসিতাই একটা—এ বাড়ির মধ্যে একমাত্র পারুলই পারে সেটা। দেখা যাক কিছুদিন—খদ্দের তো রইলই। পারুল বলে কেন, দেয়ালপাটের মতো ছেলে হাত বাড়িয়ে নেবার কত মানুষ কত দিকে।

মাসখানেকের মধ্যে ছেলে রীতিমত চাঙ্গা হয়ে ওঠে। মুশকিল রাত্রিবেলা। বাড়ির সবগুলো মেয়ে ব্যতিব্যস্ত তখন। দিনমানটা যত দূর সম্ভব ছেলে জাগিয়ে রাখে, সন্ধ্যা থেকে যাতে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। শোয়ানোর বাড়তি ঘর কোথা—রান্নার জন্য পিছন দিকে খোলার চালা, সেইখানে মেজের উপর পাশাপাশি দু-খানা পিঁড়ি পেতে ঘুমন্ত ছেলে শুইয়ে দেয়।

একদিন ছেলের বোধহয় পেট কামড়াচ্ছে, ক্ষণে ক্ষণে কেঁদে ওঠে। চলছে সেই বেলা দুপুর থেকে, রাত্রেও যদি এমনি করে তো সর্বনাশ। আরও একদিন হয়েছিল, ঘর ছেড়ে সুধামুখীকে বেরিয়ে আসতে হল ছেলে ঠাণ্ডা করতে। ঘরের লোক বিরক্ত হয়ে বলে, আর আসব না তোমার কাছে। গোড়াকার সেই সব দিনে রূপ তেমন কিছু না থাক, বয়সটা ছিল। বয়সেও ভাঁটা ধরেছে—আদরযত্ন করে, মিষ্টি কথা বলে এবং ভগবান যে কণ্ঠখানা দিয়েছেন—সেই কণ্ঠের গান গেয়ে ত্রুটি ঢাকতে হয়। কালীবাড়ির দিকে ফিরে সভয়ে বার বার হাত জোড় করে: হে মা দক্ষিণাকালী, ছেলের কান্না ভাল করে দাও। এক্ষুনি—সন্ধ্যে লাগবার আগে।

যত সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, ততই ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। কালকের দিনের কানাকড়ি নেই—কী উপায়! ঝিয়ের মাইনের হারাহারি অংশ দিতে হয়—সকাল বিকাল জোর তাগিদ লাগিয়েছে, কাল যদি না পায় পাড়া চৌচির করে কোন্দল লাগাবে। খাওয়া নিয়েও ভাবনা। নিজে উপোস দিয়ে টান-টান হয়ে পড়ে থাকতে পারে, কিন্তু বাচ্চার তো এক ঘণ্টারও সবুর সয় না। দুধ বিহনে জলবার্লিটুকুও না পেলে কেঁদেকেটে অনর্থ করবে। আবার বজ্জাত কী রকম—এরই মধ্যে স্বাদের তফাত ধরতে শিখেছে।

বার্লি যদি দিলে, পেটের ক্ষিদেয় দশ-বারো ঝিনুক খেয়ে তার পরে আর খেতে চাইবে না। দাঁতে দাঁত চেপে থাকবে। ঝিনুক চেপে মাড়ির ফাঁকে ঢেলে দিলে তো ফুঃ— করে ফোয়ারার মতন ছড়িয়ে দেবে। এক মাসের ছেলে এই, বড় হয়ে তো আস্ত ডাকাত হবে। কিন্তু এই জল-বার্লিও তো জোটানো যাচ্ছে না।

আরও কত রকমের দায়দেনা—ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে আসে। ভাবনার মধ্যে সুধামুখী যেতে চায় না ভয়ে ভয়ে। নফরকেষ্টর দশাও তথৈবচ। একদিন দুটো টাকা পাওয়া গেল তো আবার কবে মিলবে ঠিকঠিকানা নেই। পারতপক্ষে সে দিতেও চায় না, বউ গাঁথবার টোপের সংগ্রহে আছে। কেড়েকুড়ে নিতে হয় এক একদিন মল্লযুদ্ধ করে।

উল্টে রাতদুপুরে এসে হুমকি ছাড়বেঃ আর তরকারি কোথা ? কতবার বলেচি, এক তরকারি-ভাত খেতে পারিনে, খেয়ে পেট ভরে না আমার। শুধুমাত্র রাত্রিবাস নয়, রাত্রিবেলা খাওয়ার স্বত্ব জন্মে গেছে যেন এখানে। সুধামুখী হতে দিয়েছে। পারুল জীবজন্তু পোষে, তারও তেমনি একটা পোষা জীব। ভাগ্যবতী বটে পারুল, পশুপাখির উপরেও বাচ্চা পোষার শখ। আরও দু-তিন দিন বলেছে, মুকিয়ে আছে। দিয়ে দিতে হবে শেষ অবধি, তা ছাড়া উপায় দেখিনে।

ভাবছে সুধামুখী, আর প্রাণপণে ছেলে থাবড়াচ্ছে। ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি ঘুম দিয়ে যাও, বাটা ভরে পান দিলাম গাল পুরে খাও। গুণগুণ করছে মিষ্টি সুরে। মাসিপিসিদের কাছে পানের চেয়ে প্রিয়তর জিনিস কী! লোভে পড়ে বোধকরি অলক্ষ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন কেউ, চোখ বুজল ছেলে। ক্রমশ নেতিয়ে পড়ল। হে মা-কালী, রাতের মধ্যে আর নড়াচড়া করে না যেন।

সন্তর্পণে তুলে যথারীতি রান্নাঘরে শুইয়ে দিয়ে সুধামুখী বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। কপাল আজ বড্ড ভাল গো—সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিল না জানি। সেই দলটা এসে গলিতে ঢুকল। একটি মানুষ ওর মধ্যে ভাল রকম চেনা—রাজাবাহাদুর নামে যার পরিচয়। পাড়ার সবাই চেনে। রাজা হন না হন, বড়লোক দস্তুরমতো। নিজে থাকেন চুপচাপ, আমোদ- স্ফূর্তি যত কিছু সঙ্গের মোসাহেবরা করে। এ গলির সবাই চায়, রাজাবাহাদুর আসুন তার ঘরে।

সুধামুখী সবুর করতে পারে না। কোন মুখপুড়ী কোন দিক থেকে এসে গেঁথে ফেলে—ছুটে সে চলে যায় রাজবাহাদুরের কাছেঃ আজকে আমি আপনার সেবা করব।

রাজাবাহাদুর ভ্রূকুটি করেনঃ বলিস কী রে! তোর আস্পর্ধা কম নয়। আমার চাকর-বাকরের সেবাদাসী—এবারে আমা অবধি হাত বাড়াস! হাত মুচড়ে ভেঙে দেব না ?

বলে হো-হো করে হাসিতে ফেটে পড়েন। তার মানে দয়া হয়েছে, সুধাই পেয়ে গেল দলটা। রাজাবাহাদুর আগে আগে চললেন সুধামুখীর পাশাপাশি।

দেখ, বাজারের ভোজ্য আমি ছুঁইনে। জাত্যাংশে সদ্‌ব্রাহ্মণ, অনাচার আমায় দিয়ে

হবে না। উচ্ছিষ্ট খেয়ে জাত হারাব না, আমার ভোজ সকলের আগে। যে বস্তু উচ্ছিষ্ট হয় নি—

কথার মাঝে আবার হেসে ওঠেন রাজাবাহাদুর। বললেন, যাকে বলে উদ্যানের অনাঘ্রাত কুসুম। তোদের সব চোখে দেখেই আমার গা বমি-বমি করে।

সুধামুখী আহত কণ্ঠে বলে, তবে আসেন কেন আমাদের পাড়ায় ?

রাজাবাহাদুর বলেন, চারটে পোষা কুকুর আছে আমার বাড়িতে, নিজ হাতে খাওয়ানোর শখ খুব আমার। কুকুরগুলো ভাল, আ-তু-উ-উ—ডাকলে ছুটে আসে, এসে লেজ নাড়ে।

সঙ্গীদের দেখিয়ে বলেন, এদের মতন আছে আটজন। এই চার আর ঐ আট—পুরোপুরি ডজন হল। এরাও বেশ ভাল। ডাকতে হয় না, চোখ টিপলে ছুটে আসে। সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

কথাটা শেষ করে রাজাবাহাদুর হাসলেন, তার আগেই হি-হি-করে লোকগুলো হেসে অস্থির। রাজাবাহাদুরের পোষা কুকুরের সঙ্গে তুলনায় তারা কৃতার্থ হয়ে আনন্দে গলে গিয়েছে।

সবে জমে এসেছে, হেনকালে যে ভয় করা গিয়েছিল—ছেলে কেঁদে উঠল। সুধামুখী কাতর হয়ে বলে, ছুটি দিন একটুখানি রাজাবাহাদুর। ছেলের অসুখ, উঠে পড়েছে, ঘুম পাড়িয়ে আসি। এক্ষুনি এসে যাব।

রাজাবাহাদুর চোখ বড় বড় করে বলেন, কী বলিস, তুই আবার ছেলে পেটে ধরলি কবে রে ! ও-মাসেও তো এসে গেছি। মিথ্যে বলবার জায়গা পেলিনে !

সুধামুখী বলে, পেটে না ধরলেও ছেলের কোন অভাব আছে ? পথে-ঘাটে জলে-জঙ্গলে ছেলে। আপনারা কত সব আছেন মস্ত মস্ত মানীলোক—উচ্ছিষ্ট যাঁদের চলে না। মুঠো মুঠো টাকা ছড়িয়ে ভাল জিনিস উচ্ছিষ্ট করে আসেন। ফল পুষ্ট হবার আগে কুঁড়ি অবস্থায় বেশির ভাগ নষ্ট করে দেন। যাদের সে সুবিধা হল না, তাক বুঝে রাতদুপুরে মা-গঙ্গায় নিবেদন করে দায় খালাস হয়ে আসে।

ছেলে চুপ করে গেছে, আর কাঁদে না। জেগে পড়েছিল, আপনাআপনি আবার ঘুমিয়ে গেছে। একছুটে দেখে গিয়ে সুধামুখী বসে পড়ল আবার। যেটুকু কামাই হল পুষিয়ে নেবার জন্য ডবল করে হাসতে লেগেছে। বলে, জানেন তো রাজাবাহাদুর, সেকালে মরাঞ্চে পোয়াতিরা গঙ্গায় ছেলে ফেলে দিত, তার পরের বাচ্চাটা যাতে মায়ের কোল আলো করে বেঁচেবর্তে থাকে, শতেক পরমায়ু হয় তার। একালের মা-কুন্তীরাও পয়লা বাচ্চা গঙ্গায় দিয়ে মনে মনে বলে, গোড়ার ফলটা তোমায় দিয়ে যাচ্ছি মাগো। ভাল ঘর-বর হয় যেন, সতীসাধ্বী হয়ে পাকাচুলে সিঁদুর পরে চিরদিন সংসারধর্ম করি।

বেড়ে বলেছিস রে ! রাজাবাহাদুর হাসিতে ফেটে পড়লেন, দেখাদেখি সঙ্গীগুলোও হাসে। বলেন, হনুমান বুক ফেড়ে রামনাম দেখিয়েছিল—একালের অনেক সতীর বুকের তলা অমনি যদি কেউ ফেড়ে ফেলে, দেখা যাবে কত গণ্ডা নাম লেখা সেখানে।

হাসি থামিয়ে খানিকটা নড়েচড়ে রাজাবাহাদুর আড় হয়ে পড়লেন পালঙ্কের বিছানায়। বললেন, তোর ঘরে কী জন্যে আসি বল দিকি ?

সুধামুখী বলে, ভাগ্য আমার ! আপনার মতো মানুষের নেকনজরে পড়েছি।

দূর, নজরই তো বন্ধ করে থাকি তোর কাছে। তুই হলি কোকিল—গলা কোকিলের, চেহারাখানাও তাই। চেহারা দেখতে গেলে গা ঘিনঘিন করে, গানে আর মজা থাকে না ! দু-চক্ষু বন্ধ করে গান শুনে যাই। তোর কথার আবার বেশি বাহার গানের চেয়ে। ভাল ঘরের মেয়ে ঠিক তুই, ভাল ভাল কথাবার্তা শুনে পরিপক্ক হয়ে এসেছিস। বিদ্যেসাধ্যিও কিছু হয়ত আছে পেটে।

সুধামুখী দীর্ঘশ্বাস চেপে নেয়। টাকাকড়ি না থাক, বাবা কিন্তু বিদ্যার বারিধি। বলেছিলেন, পড়াশুনো নিয়ে থাক সুধা, আমি দেখিয়ে শুনিয়ে দেব, ঘরে পড়ে গ্রাজুয়েট হবি স্বচ্ছন্দে।

আগের কথার জের ধরে রাজাবাহাদুর বলেন, কাদের ঘরের কোন জাতের মেয়ে তুই, ঠিক করে বল আমায়।

সুধামুখী বলে, ছেলে যেমন গাঙে ভেসে এল, আমি একদিন ভাসতে ভাসতে কালীবাড়ির আঁস্তাকুড়ে এসে পড়েছি। জাতজন্ম নেই আমার, পিছন অন্ধকার। আমি একাই, বাবা আর বোনদের উঁচু মাথা কেন হেঁট করতে যাব বলুন।

আরও অনেক কথা বলতে গিয়ে বলল না, চেপে গেল। পিছনে ঘনঘোর অন্ধকার, সামনেটাও তাই। কিন্তু মনের দুর্ভাবনা খদ্দেরের কাছে বলা চলে না। বরঞ্চ ভাবনা-চিন্তা ঝেড়ে ফেলে হেসে ঢলে ঢলে পড়তে হয়।

কোন খেয়ালে রাজাবাহাদুর হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন : চল রে, তোর ছেলে দেখে আসি।

রান্নাঘরের সুঁড়িপথটা অতি সঙ্কীর্ণ। যা মোটা মানুষ—ভুঁড়ি বেধে আটকে যাবেন জাঁতিকলে-পড়া ইঁদুরের মতন। চালও বড় নিচু সেখানটা। লম্বা রাজা-বাহাদুর, তায় রঙে রয়েছেন। কত বার মাথা ঠুকে যাবে ঠিক নেই, তখন মেজাজ বিগড়াবে।

সুধামুখী বলে, আপনি কি জন্যে যেতে যাবেন ? বড্ড নোংরা ওদিকটা।

মাতালের রোখ চেপে গেছে। বলেন, তোর ঘরে এসে বসতে পারছি, এর চেয়ে নোংরা জায়গা ভবসংসারে কোথায় আছে রে ? নোংরা বলেই তো আসি, নোংরার জন্যে মন কেমন করে ওঠে এক এক সন্ধ্যাবেলা।

হি-হি করে খানিকটা হেসে নিয়ে বলেন, মানুষ জাতটা হল মহিষের রকমফের। সবুজ মাঠে চরে চরে সুখ হয় না ; এঁদো ডোবার পচা পাঁকে গিয়ে পড়বে। পড়তেই হবে। এই আমারই দেখ না—ঘরে খাসা সুন্দরী বউ। একটা গেল তো তারও চেয়ে সুন্দরী দেখে দুই নম্বর বিয়ে করে আনলাম। ভালবাসাবাসিও দস্তুরমতো—সে ভালবাসে, আমিও। কিন্তু এটা হল ভিন্ন ব্যাপার ! দশের মধ্যে সভা জমিয়ে সৎপ্রসঙ্গ করে এসে দুটো ময়লা কথার জন্য ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ানো। ঐ মহিষের বৃত্তি।

উঠে কয়েক পা গিয়েছেনও রাজাবাহাদুর। দেহ বিষম টলছে, গড়িয়ে পড়েন বুঝি বা। সুধামুখী তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, আপনি ছেলের মুখ দেখবেন, সে তো ছেলের বাপের ভাগ্যি, সাতপুরুষের ভাগ্য। রান্নাঘরে টেমির আলো ঘুরিয়ে আপনি দেখবেন, সে কি একটা কথার কথা হল? ফরমাস করুন, ঝাড়লন্ঠনের নিচে গদির উপর এনে দেখিয়ে দিই।

নেশার উপরে হলেও রাজাবাহাদুর নিজের দৌড় বুঝে নিয়েছেন। পা টলছে বেয়াড়া রকম। হাসতে হাসতে ধপ করে চেয়ারখানায় বসে পড়লেন।

নিয়ে আয় এখানে, তোর যখন তক্তাউশে তুলে দেখানোর অভিরুচি। বটেই তো, কত মানমর্যাদা আমার! আমি কেন যেতে যাব খারাপ মেয়ে-মানুষের ছেলে দেখতে? তুই এনে দেখা, বকশিস পাবি।

নিয়ে আসে সুধামুখী। রাজাবাহাদুরের চোখ ঠিকরে যায়। ইয়ারগুলো বকবক করছিল, তারাও চুপ হয়ে গেছে: অ্যাঁ রাজপুত্তুর ছেলে যে!

বিশাল পালঙ্কের উপর বিঘতখানেক পুরু গদি। ধবধবে চাদর-বালিশ তার উপরে। রাজাবাহাদুর হাঁ-হাঁ করে ওঠেন: আরে দূর, কত মানুষ শুয়ে বসে গেছে, ওর উপর শোয়ায় কখনো! ভাল কিছু পেতে দে। তুই আর ভাল কী পাবি, নোংরার মধ্যে সবই তো ছোঁয়া-লেপা হয়ে আছে। রোস—

বিচিত্র নক্সাদার সেকেলে জামিয়ারখানা কাঁধের উপর থেকে নিয়ে রাজাবাহাদুর শয্যার উপর পেতে দিলেন। হেসে বলেন, এ ছেলে আমারও হতে পারে। কত ঠাঁই ঘোরাঘুরি করি—কার ঘর থেকে বাচ্চা বেরুল, অত কে হিসাব রেখে বেড়ায়।

একটু থেমে রাজাবাহাদুর আবার বলেন, আমার না-ও যদি হয়, আমারই মতন কোন শয়তান-বেল্লিকের তো বটে। হোক শয়তানের তা হলেও বড়-বাপের বেটা। খাতির-যত্ন করিস রে মাগি, ছেঁড়া ঘরের ছেলে নয়—দস্তুরমতো বনেদি রক্ত চামড়ার নিচে।

সুধামুখী জোর দিয়ে বলে, ছেলে আপনারই। না বললে শুনি নে। অবিকল আপনার মত চাউনি। ফালুকফুলুক করে চোরা চাউনি দিচ্ছে ঐ দেখুন না।

রাজবাহাদুর রাগের ভান করে বলেন, বটে রে! চোরা চাউনি মেরে বেড়াই, এই কলঙ্ক দিলি তুই আমায়? তা বেশ, মেনেই নিলাম ছেলে আমার। এই ছেলের বাপ হতে যে-না-সেই আগ বাড়িয়ে এসে দাঁড়াবে। দু-দুটো বিয়ে করা পরিবারে দিল না—ছেলে আলটপকা তোদের নরককুন্ডের মধ্যে পেয়ে গেলাম।

চটে না সুধামুখী, চটলে কাজ হয় না। প্রগলভ সুরে বলে, ছেলের মুখ-দেখানি দিলেন কই? দেখুন না, ঐ দেখুন, ঠোঁট ফোলাচ্ছে ছেলে।

মুহূর্তকাল ছেলের দিকে তাকিয়ে থেকে রাজাবাহাদুর হা-হা করে হেসে উঠলেন। কী দেখতে পেলেন তিনিই জানেন, বললেন, আচ্ছা ফিচেল ছেলে তো! হবে না— আমি লোকটা কি রকম। কচুর বেটা ঘেচু বড় বাড়েন তো মান।

মেজাজ দিলদরিয়া এখন, মেজাজের গন্ধ ভকভক করে মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে নোটে টাকায় টাকা পনেরোর মতো বেরুল।

রাজাবাহাদুর অবাক হয়ে বলেন, মোটে এই ? আরো তো ছিল ; আরো অনেক থাকবার কথা। গেল কোথা টাকা ?

সঙ্গীদের একটি বলে ওঠে, বলবেন না, বড্ড পাজি জিনিস টাকা। পাখি খাঁচায় পুরে আটকানো যায়, টাকা কোনরকমে পোষ মানে না। উড়ে পালায় পাঁচ আঙুলের ফাঁক দিয়ে।

রাজাবাহাদুর বলেন, রাজপুত্তুরকে বুঝিয়ে বল রে সুধা, আজকে নেই। সোনার টাকায় মুখ দেখে যাব আর একদিন এসে।

এর পরে একটা জিনিস দেখা গেল, রাজাবাহাদুর পাড়ার মধ্যে ঢুকলেই সরাসরি সুধামুখীর ঘরে আসেন। ডাকাডাকি করতে হয় না। একাই আসেন বেশি, সোজা এসে ছেলের কাছে বসে পড়েন। একদঙ্গল পারিষদ জুটিয়ে এনে হুল্লোড় করেন না আগেকার মতো। অসাধারণ রকমের ফর্সা রং বলে সাহেব-সাহেব করেন—সাহেব নাম চালু হয়ে গেল তাঁরই মুখ থেকে। সোনার টাকা দেন নি বটে, তা বলে খালি হাতেও আসেন না কখনো। কোনদিন জামা কোনদিন বা দুটো খেলনা—কিছু না কিছু আনবেনই। হিংসা এই নিয়ে বাড়ির অন্য মেয়েদের। এবং পাড়ার সকলেরও। কত বড় লোকটাকে গেঁথে ফেলেছে মাংসের দলা ঐ একটুকু ছেলে দেখিয়ে।

প্রথম দিন জামিয়ারখানা পেতে দিয়েছিলেন, সেটা আর ফেরত নিয়ে যান নি। সাহেবেরই হয়ে গেল সেটা। দামি জিনিস—তবে অনেক দিনের পুরানো, পোকায় কাটা, ফেঁসে গিয়েছে জায়গায় জায়গায়। বেচতে গেলে খদ্দের হবে না। সাহেব যখন দশ-বারো বছরের, শীতের ক'মাস সুধামুখী জিনিসটা দোভাঁজ করে বুকের উপর দিয়ে পিঠের উপর দিয়ে জড়িয়ে পিঠ বেঁধে দিত। গরম খুব, অথচ পাখির পালকের মতো হালকা। শাল গায়ে চড়িয়ে সাহেবের মেজাজ চড়ে যেত, সমবয়সি সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে বেড়াত ঃ আমার বাবার গায়ের জিনিস। দেখ্ কী সুন্দর ! বাবার এমনি গাদা গাদা ছিল, যাকে তাকে দিয়ে দিত।

রাজাবাহাদুরের যাতায়াত তার অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। মানুষটা একেবারে ফোত। এ লাইনে হয়ে থাকে যেমন। রাজাবাহাদুরের চেহারাটাও সাহেবের ভাল মনে পড়ে না। কিন্তু চালচলন মনমেজাজ সুধামুখীর কথাবার্তার মধ্যে শুনেছে অনেক। তাই নিয়ে সমবয়সিদের কাছে দেমাক করে ঃ বড়লোক আমার বাবা। গা থেকে শাল খুলে আমার বিছানায় পেতে দিল। পকেটের টাকাপয়সা মুঠো মুঠো তুলে মুড়িমুড়কির মতো ছড়িয়ে দিত।

বালকের সামান্য কথায় নফরকেষ্টর বুক টনটন করে। অসহিষ্ণু হয়ে বলে ওঠে সেই বাপটা তোর বড়লোকই ছিল রে সাহেব। কিন্তু পোকায়-কাটা বড়লোক। গায়ের জামিয়ারখানা যেমন, মানুষটাও তাই।

সুধামুখী শুনতে পেয়ে ধমক দিয়েছিল নফরকে। কিন্তু মনে মনে সায় দেয়। এককালে অনেক ছিল রাজাবাহাদুরের—হাবে-ভাবে কথাবার্তায় বেরিয়ে আসে। হেন মানুষটা গলিঘুঁজির পচা আবর্জনায় আনাগোনা করে, বুঝতে হবে ঘুণে-খাওয়া নিতান্ত জীর্ণ অবস্থা তখন।

কিন্তু তাই বা কেমন করে? টাকার মানুষও যে আসে না, এমন নয়। কোন মানুষের কিসে স্ফূর্তি, বাঁধা নিয়মে তার হিসাব হয় না। একজন এসেছিল—টাকাকড়ি যেন খোলামকুচি তার কাছে, পকেটের ভারবোঝা। নিতান্ত গঙ্গার জলে না ফেলে গঙ্গার পাড়ে বস্তির ঘরে দু-হাতে ছড়াতে এসেছে। সকালবেলা, অসময়। বাজার করা স্নান করা রান্না করা—খাওয়াদাওয়া অন্তে হল বা কড়িখেলা তাসখেলা দু-এক হাত। শুয়ে পড়ে তারপরে বিশ্রাম। সময়টুকু একেবারে নিজস্ব মেয়েদের। দোকান যদি বলতে চাও তো পুরোপুরি ঝাঁপবন্ধ দোকানঘরের।

এ হেন সময় মানুষটা সিল্কের চাদর উড়িয়ে জুতা মসমস করে ঢুকে পড়ল। পারুলের ঘরটা আয়তনে বড় আর সাজসজ্জায় চমকদার—উঠানের শেষ প্রান্তে সেই ঘরে উঠল সোজা গিয়ে। খোঁজখবর নিয়েই এসেছে, আনকোরা নতুন মানুষ হলে ঠিক ঠিক ঘর চিনে যাবে কি করে? পারুল ভাগ্যধরী গা তুলে নড়ে বসতে হয় না তার। সে-ই পারে অবেলার খদ্দের সামলাতে।

ক্ষণপরে—ওমা, আরও দু-তিনটে মেয়ে পিলপিল করে যায় যে ওদিকে। সুধামুখীরও ডাক এল, পারুল ঝি পাঠিয়ে দিয়েছে।

দূর তোর দিদিমণির যেমন আক্কেল—আধবুড়ো মাগি বসছি গিয়ে আমি ওদের মধ্যে! বসলে কাজকর্ম করে দেবে কে আমার? ছেলে এই এক্ষুনি জেগে উঠবে, তাকে খাওয়ানো—

যাবে না তো পারুল নিজেই এসে পড়ল। সত্যিই ভালবাসে মেয়েটা, বড্ড টানে। বলে, চলে এস দিদি। টাকার হরির লুঠ দিচ্ছে, ফাঁকতালে কিছু কুড়িয়ে নাও। সাহেব ঘুমুচ্ছে, থাকুক না একলা একটুখানি।

হাত ধরে টেনেটুনে নিয়ে বসাল। শতমুখে লোকটা নিজের চতুরতার কথা বলছে। বাড়ির মেয়েরা ঝেঁটিয়ে এসেছে পুজো দিতে। তিন-চারটে পান্ডা জুটে গেছে—যেমন আয়োজনের পুজো, সারা হতে আড়াইটে-তিনটে বাজবে। বলি, চোদ্দ-শাকের মধ্যে ওল-পরামাণিক আমি বেটা কাহাতক ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াই। জায়গা খুঁজে বসিগে। খাস কলকাতার পাড়াগুলো বহু বার সার্ভে হয়ে গেছে, দক্ষিণের এইগুলো বাকি। দূর বলেই হয়ে ওঠেনি। নকুলেশ্বরতলায় যাই বলে ওদের কাছ থেকে সরে পড়লাম।

বেলেল্লা কান্ডবান্ড। সেই ব্যাপার, সেই যা বলতেন রাজাবাহাদুর—মহিষ দিন দুপুরে পচা ডোবায় গা ডোবাতে এসেছে। মানুষও ইতর জন্তু একটা, সদরে একে অন্যের সঙ্গে অভিনয় করে বেড়ায়—অন্তরঙ্গ ক্ষেত্রের নিরাবরণ মূর্তি দেখে এই তত্ত্বে সন্দেহ থাকে না। এই জীবনে এসে কত-কিছু চোখে দেখে, তারও বেশি কানে শুনে থাকে—তবু এই দিনের আলোয় সর্বদেহ কুঁকড়ে ওঠে সুধামুখীর। ধমকানি দেয়ঃ যান—চলে যান আপনি। ভদ্দরলোকের চেহারা তো আপনার—টাকার লোভে পেটের দায়ে আমরা যদিই বা নোংরা হই, আপনি লাজলজ্জা পুড়িয়ে খেলেন কি করে! তেমন জায়গা নয় আমাদের, দু-পা গিয়ে ভাল ভাল লোকের বাড়ি। হালদার মশায়ের এলাকা, ছিটেফোঁটা কোনরকমে কানে উঠলে ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে পাড়াসুদ্ধ

গঙ্গা পার করে দিয়ে আসবেন।

মানুষটা চলে গেলে পারুলকেও তারপর গালি দিয়েছিল ঃ অন্য সকলে জুটল পেটের ধান্দায়—না গিয়ে তাদের উপায় নেই। দুর্জনের মনিব্যাগ থেকে বেরুলেও টাকার উপরে দাগ থাকে না, বাজারে চলে। সেই লোভে গিয়েছিল। কিন্তু তুই বোন এই নোংরামীর কি জন্যে আস্কারা দিবি? তোর তো সে অবস্থা নয়।

পারুল একটুও লজ্জিত নয়, হাসিতে গলে গলে পড়ে। বলে, ছোটবেলায় রাস্তায় পাগল দেখলে ক্ষেপিয়ে দিয়ে মজা দেখতাম। এ লোকটাও তাই—উদ্দন্ড পাগল একটা। পাগল ক্ষেপে গিয়ে টাকার হরির লুঠ দিচ্ছে। দুটো-চারটে করে আঁচলে বেঁধে যে-যার ঘরে ফিরল—তুমি বোকা মানুষ, ফরফরিয়ে বেরিয়ে এলে রাগ করে। সত্যি দিদি, দলছাড়া গোত্রছাড়া তুমি যেন আলাদা কী এক রকম।

অতি-বড় কলঙ্কভাগিনী—বংশের উপরে আর বাপের মনে দাগা দিয়ে জন্মের মতো বেরিয়ে এসেছে, সুধামুখী মানুষটা তবু সত্যিই ভিন্নগোত্রের। এক বাবু এসেছিল তার ঘরে কয়েকটা দিন—সাকুল্যে আট-দশ দিন মাত্র। এই মোটা লেন্সের চশমা চোখে, ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড়-চোপড়—খবরের কাগজ হাতে করে এসেছিল, কাগজটা ফেলে চলে গেল। ঢাউস বাংলা কাগজ, অনেকগুলো পৃষ্ঠা। সুধামুখী পুরো দু-দিন ধরে কাগজখানা পড়ল—সকল অন্ধিসন্ধি, বিজ্ঞাপনের প্রতিটি লাইন। ঘরে দুয়োর দিয়ে ঘুমের ভান করে পড়ত। এমনই তো 'বিদ্যেবতী সরস্বতী' বলে অন্য মেয়েরা, কাগজ পড়তে দেখলে তারা রক্ষে রাখত না।

বস্তিবাড়ির বাইরে বৃহৎ একখানা জগৎ—বেলেঘাটার ঘিঞ্জি গলিতে তার আনা-গোনা ছিল, কিন্তু এ জায়গায় নেই। রূপকথার উড়ন্ত কার্পেটের মতো খবরের কাগজের উপর চেপে সেই জগৎ অনেক দিন পরে সুধামুখীর ঘরের মধ্যে হাজির হল। নেশা ধরে গেল, বাজারের মাছ-শাক কিনতে কিনতে ঐ সঙ্গে কাগজও একটা করে কিনে আনত। কদিন পরেই অবশ্য বন্ধ করতে হল পয়সার অভাবে। কোন দেশের এক রাজপুত্র আর তার বউকে মেরেছে, সেই ছুতোয় পৃথিবী জুড়ে দুরন্ত লড়াই। দুটো মানুষের বদলা হাজার লক্ষ মানুষ। সে লড়াই ডাঙায় আর সাগরের উপরে শুধু নয়—মানুষের পাখনা গজিয়েছে, আকাশে উড়ে উড়েও লড়াই। রামায়ণের ইন্দ্রজিতের যে কায়দা ছিল। খবর পড়তে-পড়তে সুধামুখীর মনটাও যেন আকাশ-মুখো রওনা হয়ে পড়ে খাপরায় ছাওয়া বস্তিবাড়ির অশ্লীল ইতর জীবন ফেলে মেঘের উপর গা ভাসিয়ে দিয়ে।

ঠাট্টা করে সেই বাবুর সকলে নাম দিয়েছিল ঠান্ডাবাবু। ঠাট্টার পাত্র তো বটেই। নিপাট ভাল মানুষজনও এখানে এলে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। এ মাটির এমনি মহিমা। মত্ত মানুষই বা কেন, মত্ত মহিষ। এঁর অপরাধ, মানুষই থাকেন পুরোপুরি। শান্ত হয়ে বসে বসে মোটা চুরুট খান, বই হাতে থাকল তো বই পড়েন চুপচাপ। এক-একদিন কেমন গল্পে পেয়ে যায়। অনেক দেশ-বিদেশে ঘুরেছেন বোধহয়, ঘাঁটা দিলে রকমবেরকমের গল্প বেরিয়ে আসে। গল্পের আর অন্ত থাকে না।

না থাকতে পেরে সুধামুখী একদিন বলেছিল, আপনি গিয়েছেন বুঝি ঐ সব জায়গায় ?

ঠান্ডাবাবু হেসে বললেন, মিছে জিজ্ঞাসা কর কেন ? চাপাচাপি করলে কতকগুলো বাজে উত্তর শুনবে। নিজের কথা তোমাদের কাছে কেউ বলতে আসে না, আমিও বলব না। নিজের ইচ্ছেয় যা বলি, সেইগুলো শুধু শুনে যাও। ভাল না লাগে কি অন্য রকম যদি তাড়া থাকে, খোলাখুলি বল। উঠে পড়ব এখনই।

সুধামুখী তাড়াতাড়ি বলে, উঠবেন না আপনি, মাথার দিব্যি। বলুন কি বলছিলেন—সারা রাত ধরে বলে যান। ভাল লাগে আমার।

বাবুটি নিজেই এক খবরের কাগজ। কাইজারের নাম তখন লোকের মুখে মুখে—জর্মন দেশের রাজা কাইজার। লড়াইয়ে কাইজার হরদম জিতছে—পিটে পিটে তুলোধোনা করছে শত্রুদের। কাইজারের দেশে এক বনেদি শহরের গল্প—ছাপাখানা করে প্রথম যে জায়গায় বই ছাপা হল। নাম-করা এক পুরানো কফিখানা আছে, বাঘা বাঘা গুণীজ্ঞানী পণ্ডিতেরা সেখানে যেতেন। মাটির উপরে আমরা একতলা দোতলা তেতলা দেখে থাকি, কফিখানার বাড়িতে মাটির নিচে ঠিক তেমনি তেতলা চারতলা পাঁচতলা নেমে গেছে। যত নিচে তত বেশি অন্ধকার—গুহার মত কুঠুরিগুলো, আসাবাবপত্র অতিশয় নোংরা। কফির দাম কিন্তু লাফিয়ে দ্বিগুণ চারগুণ ছ-গুণ হয়ে যাচ্ছে, বস্তু যদিচ সর্বত্র এক। এইসব ঘরে এই সমস্ত চেয়ারে বসে সেকালের অনেক দিকপাল খানাপিনা ও আমোদস্ফূর্তি করে গেছেন। নিশিরাত্রে চুপি চুপি এসে জুটতেন, প্রেমিকারা আসত, পাতালপুরীর বেলেল্লাপনা পৃথিবীর পৃষ্ঠের মানুষের কানে বড়-একটা পেঁছত না। পুরানো আমলের কিছু কিছু প্রেমপত্র কাচে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখেছে ঐসব কুঠুরির দেয়ালে। একালের মানুষ সেখানে বসে নিতান্ত নিরামিষ একপাত্র কফি খেয়ে আসে। কিন্তু গুণীদের রাসমণ্ডপে বসে খেয়েছে, সেই বাবদে অতিরিক্ত মাশুল গুণে দিতে হল। কফির দামের উপরে মাশুল চেপে গিয়ে অঙ্কটা নিদারুণ।

গল্পের উপসংহারে নীতি-উপদেশঃ বুঝে দেখ, আমরাই নতুন কিছু করিনে। এক রীতি সর্বদেশে আর সর্বকালে। হতেই হবে। এই তোমার ঘরে যতক্ষণ আছি, পুরোপুরি এখানকারই। অন্য যা-কিছু পরিচয়—গলির মোড়ে খুলে রেখে এসেছি। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার সেটা গায়ে চড়িয়ে ভদ্র-সমাজে নেমে পড়ব। উঁকি দিতে যেও না সেদিকে, অনধিকারচর্চা হবে।

রাজাবাহাদুরের সেই কথা ! মহিষ পচা পাঁকে গা ডোবাতে এসেছে। গোয়ালটা কোথা, সে খবরে কি দরকার ? তা বলে মন মানতে চায় না। যে সব লোক আসে তারা ঠিক জলে ভেসে-আসা ঐ সাহেবেরই মতন। পিছনের নাম-গোত্র পরিচয় নেই ! একাকী এসে রাজাবাহাদুর বেহুঁশ হয়ে ঘুমুতেন কোন কোন দিন। সুধামুখী তখন জামার পকেট হাতড়েছে। আর দশটা মেয়ের মতো টাকা-পয়সা গাপ করা নয়, কোন একটা চিঠি বেরিয়ে পড়ে যদি পকেট থেকে, অথবা এক টুকরো পরিচয়ের কাগজ। ছেলে-ছেলে করে ছুটে এসে পড়েন—স্নেহ-বুভুক্ষার কারণ যদি কিছু আবিষ্কার হয়।

অথবা এই যে মানুষটি—ঠাণ্ডাবাবু বলে যার উপর অন্যেরা নাক সিঁটকায়। এমনও রটনা আছে, পুলিসের চর নাকি উনি—বোমা-পিস্তলের স্বদেশিদের খবরবার উদ্দেশ্যে চুপচাপ বসে বসে নজর রাখেন, মাঝে মাঝে আবোল-তাবোল বকুনি দেন। আবার ঠিক উল্টোটাই বলে কেউ কেউ : উনিই স্বদেশি মানুষ—বিপদের গন্ধ পেয়ে এ পাড়ায় এসে ঠাঁই নিয়েছেন। সরকারের পুলিস সর্বত্র তোলপাড় করবে, লুচ্চো-লম্পটের আড্ডা বলে পরিচিত এই রকমের বাড়িগুলো বাদ দিয়ে।

ঠাণ্ডাবাবুর সত্য পরিচয় কে বলবে?

একদিনের ব্যাপার, বাবুটি এসে সুধামুখীর দাওয়ায় উঠছেন। দাওয়ার নিচে পৈঠার উপর পা দিয়েছেন, একখানা ইট খুলে উল্টে পড়ল, উনিও পড়লেন। কিসের খোঁচায় পা কেটে গেল একটুখানি। অতিশয় ছোট ঘটনা। কত সব ভাল ভাল বড় বড় কথা বলতেন তিনি। সমস্ত তলিয়ে গিয়ে এই এক দিনের তুচ্ছ কথা ভুলল না সুধামুখী জীবনে।

পড়ে গেলেন তিনি পৈঠার ইট খসে। ইটের ফাঁকে আমের চারা। চারা বলা ঠিক হবে না। আম খেয়ে আঁটি ছুড়েছিল, আঁটি ফেটে অঙ্কুর বেরিয়েছে। ইটের তলে বাড়তে পারেনি—সেই অঙ্কুর অবস্থায় রয়ে গেছে। সবুজ নয় সাদা—মানুষ হলে রক্তহীন ফ্যাকাসে বলা চলত। আঘাত পেয়েছেন ঠাণ্ডাবাবু কিন্তু সেটা কিছু নয়। কত বড় একটা আশ্চর্য জিনিস, এমনিভাবে সুধামুখীকে ডাকলেন? দেখ দেখ, ক্ষমতাটা দেখে যাও এদিকে এসে। ইটের তলে পড়েও মরেনি ঐটুকু অঙ্কুর। দুটো পাতা অবধি বের করে দিয়েছে শিশুর মুখে দু-খানা দুধে-দাঁতের মতন। আশাখানা বোঝ—দু-তিন ইঞ্চিও যদি মাথা বাড়াতে পারে, আলোর এলাকায় পড়ে যাবে। তখন ঐ পাতার মুখে আলো টেনে টেনে বেঁচে যাবে, বড় হবে, ডালে-পাতায় মহীরুহ হবে একদিন। বাঁচবার কত সাধ দেখ।

কী উল্লাস মানুষটির—উল্লাসের চোটে এক পাক নেচেই ফেলেন বুঝি বা! কাটা-পায়ে রক্ত বেরিয়ে এল। সুধামুখী ব্যস্ত হয়ে বলে, ইস রে, ঘরে আসুন, গাঁদাফুলের পাতা বেটে লাগিয়ে দিচ্ছি।

কানে নিতে বয়ে গেছে তাঁর। হাতের কাছে এক ভোঁতা কাটারি পেয়ে তাই নিয়ে মাটি খুঁড়ে অতি সন্তর্পণে চারাটা তুলছেন। বলে যাচ্ছেন যেন নিজেকেই শুনিয়ে : কী মায়া পৃথিবীর মাটির! অমৃতের পুত্র কেবল মানুষই নয়—জীবজন্তু, গাছ-পালা সকলে। মরতে সবাই গররাজি। একটা জীবন নেওয়া বড় সোজা নয়। পারল এই এতবড় ইটখানা?

পিছন দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তারপরে পাঁচিল। পাঁচিলের ধারে আমের চারা পুঁতে দিয়ে এলেন। বলেন, দিলাম একটু সাহায্য। মানুষের জন্য কিছু করতে পারিনে, এ-ও একটা জীব বটে তো! গরু-ছাগল পাঁচিলের ভিতর ঢুকতে পারবে না। কিন্তু মানুষে না উপড়ে ফেলে সেইটে নজর রেখ তোমরা।

কিছুদিন পরে এই ঠাণ্ডাবাবু উধাও হলেন। নতুন কিছু নয়, কত এমন আসে

যায়। চিড়িয়াখানায় কোন এক মরশুমে হঠাৎ যেমন বিচিত্র বর্ণের পাখি এসে ঝিলের উপর পড়ে, আবার একদিন চলে যায়। এ ব্যাপার নিয়ত চলছে। মানুষটি নেই, হাতের গাছটা দিব্যি বেঁচে উঠল। বেশ খানিকটা লম্বা হয়ে ডালপালা বেরুচ্ছে। দেখতে দেখতে সাহেবও দেড় বছরেরটি। কথা ফুটছে এইবার।

পারুল আসে যখন-তখন। ছেলের কাছে বসে থাকে। কথা শেখায়। বলে, আমার কাকাতুয়াকে পড়িয়ে পড়িয়ে কত শিখিয়েছি, ছেলে শেখানো আর কি! জানো দিদি, ভোর না হতেই দাঁড়ের উপর পাখনা ঝটপট করে বলবে, হরি বল মন-রসনা। বোষ্টম- ঠাকুর যেন প্রভাতী গাইতে উঠোনের উপর এসেছেন। আবার রাতের বেলা অন্ধকার থেকে হঠাৎ বলে উঠবে, দেখছি—দেখতে পেয়েছি। শিখিয়েছি তাই আমি।

খিলখিল করে হেসে উঠল পারুল। বলে, বজ্জাত কি রকম বোঝ দিদি। যে মানুষটা থাকে, ভয় পেয়ে সে লাফিয়ে ওঠে: কে কে ওখানে? কী দেখতে পেল? অবিকল মানুষের গলা তো! তবু তো পাখি একটা—পাখি কতটুকুই বা শিখবে! এই ছেলেকে যা একখানা করে তুলব। লোকে এসে ঘাঁটিয়ে ঘাঁটিয়ে শুনবে, কাছ ছেড়ে নড়বে না।

সাহেবের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে সুধামুখী তাড়া দিয়ে উঠল: না, আজেবাজে ফাজলামি শেখাতে পারবি নে, খবরদার!

পারুল সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় কাত করে বলে, তা কেন, শেখাব শুধু ঠাকুর-দেবতার কথা। রামায়ণ-মহাভারত, আর দেহতত্ত্বের ভাল ভাল উক্তি—কত আশা করে রে মানব দুই দিনের তরে আসিয়া, কাঁচামাটির দেহটা লইয়া অহংকারে মাতিয়া। এই সব।

চপল কণ্ঠ সহসা গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, ছেলে চাইলাম তোমার কাছে, তুমি তো দিলে না। তারপরে—কাউকে বলবে না কিন্তু দিদি, মাথার দিব্যি রইল—কেমন এক ঝোঁক চেপে গেল আমার, তারপর কতদিন ভোরে গঙ্গার ঘাটে গিয়েছি দিদি, যদি এসে পড়ে আবার অমনি একটি! ডাস্টবিন খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েছি। সে কি আর যার তার কপালে দেয় বিধাতাপুরুষ!

সুধামুখী হেসে বলে, আমি বুঝি জানি নে কিছু!

পারুল সচকিত হয়ে তাকায় চারিদিকে। বারবধূ—তবু একটুকু লজ্জার আভা যেন মুখের উপর। বলে, বাজে কথা। কোন রকম অসুখবিসুখ হয়তো। মিছে হয়ে যাবে অসুখ সেরে গিয়ে। কিন্তু কথাটা এরই মধ্যে রটে গেল—একগাদা মেয়ে-মানুষ এক জায়গায় থাকলে যা হয়। কতবারই তো রটল কত কথা!

সুধামুখী সত্যি সত্যি স্নেহ করে পারুলকে। তার সেই বোন তিনজন—শেষটা অবশ্য বিরূপ হয়েছিল, কিন্তু ছোট বয়সে কত ভাল ছিল তারা। তাদেরই একটি যেন পারুল। গভীর স্বরে বলে, না পারুল, এবারে মিছে নয়। গোপন করিস কেন? হাসপাতালে গিয়ে দেখিয়ে এসেছিস, তাও জানি? বাচ্চা আসুক কোল জুড়ে। বাচ্চার বড় সাধ তোর। আমি না দিয়ে থাকি, স্বয়ং বিধাতাপুরুষ দিচ্ছেন।

'এবারের প্রত্যাশা মিছে হয়নি। মেয়ে এল পারুলের কোলে। রানী। বলাধিকারী যার কথা নিয়ে সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, রানীকে চেন তুমি? নাকি ধনীর ঘরে বিয়ে হয়েছে সেই রানীর—সুধামুখীর চিঠিতে সেই কথা। সৎপাত্রে মেয়ে দেবে, পারুলের বড় ইচ্ছা। তাই বোধহয় হয়েছে। ফণী আড্ডির ছোট ছেলেটা—ডাক-নাম ঝিঙে, ঘুরঘুর করত ঐ বয়স থেকেই! সে-ই বর হল কিনা কে জানে! রানীর নাম করে জগবন্ধু বলাধিকারী মুখ টিপে হাসলেন। অর্থাৎ রানীকে না পেয়ে প্রণয়ভঙ্গ হয়ে সাহেব বাউণ্ডুলে হয়েছে, সেই অবস্থায় রেলের কামরায় তাদের ধরেছেন।

সন্ধ্যার মুখে থাবা দিয়ে দিয়ে ছেলে ঘুম পাড়ানো এবার। ঘুম এসে গেছে, বজ্জাত ছেলে তবু নরম হবে না। চোখ বুজল একবার, মিটমিটি তখনই আবার তাকিয়ে পড়ে। ঘুমো, ঘুমো—বড্ড দেরি হয়ে গেল, ওরা সব গিয়ে পড়েছে এতক্ষণে গলির মুখে।

এরই মধ্যে সুধামুখীর হঠাৎ কি রকম হল—ছেলের উপর ঝুঁকে পড়ে চুপিচুপি বুলি শেখাচ্ছে। বল রে খোকা—মা। সোনামণি লক্ষ্মীধন, বল—মা, মা, মা—। চারিদিকে তাকিয়ে নিল একবার: আমি তোর মা হই রে, আমারই জন্য ভেসে ভেসে এসেছিল—

জল নেমে আসে দু'-চোখ ছাপিয়ে। বিগতযৌবন কালোকুৎসিত নারী—কেউ না দেখতে পায়—চোখের জল তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে। আয়না তুলে নিয়ে সভয়ে দেখে, রং ধুয়ে গিয়ে আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ল বুঝি! রাজাবাহাদুর যাকে বলেন কোকিলের চেহারা। মানুষ তবে তো থু-থু করে সরে যাবে, রূপ দেখার পরে কেউ আর এগুবে না।

সকালে উঠে নফরকেষ্ট বেরিয়ে যায়। তার অনেক আগে রাত্রি থাকতেই ছেলে জেগে ওঠে। হাত-পা ছোঁড়ে, অঁ অঁ করে? যেন পাখির কাকলি। কথা বলছে শিশু যেন কার সঙ্গে। পাতলা ঘুমে নফরকেষ্টর চমক লাগল একদিন। মা-কালী বেরিয়ে এসেছেন মন্দির ছেড়ে, ছেড়ে এসেই যেন এই মাটকোঠার বন্ধ দরজা ভেদ করে শিশুর পাশে দাঁড়িয়েছেন হাসি-হাসি মুখ করে। শিশু অবোধ্য দেবভাষায় কত কি বলছে তাঁকে। চোখ বুজে বুজে নফরকেষ্ট সেইসব কথার মানে ধরবার চেষ্টা করে। বলছে কি দুঃখকষ্টের কথা, এই সংসারের? দুধ জোটে না, বার্লির জল খাওয়ায়। তাতেও একটুখানি মিষ্টি দেয় না। জগজ্জননীর কাছে নালিশ করছে? ঘুমের ভারে চোখ আচ্ছন্ন, চোখ মেলা যেন বিস্তর খাটুনির ব্যাপার—কান দুটোয় শুনে যাচ্ছে! চোখ মেলতে পারলে দেখা যেত ঠিক স্পষ্টাস্পষ্টি: মা দাঁড়িয়ে আছেন, নুমুণ্ডমালা খুলে রেখে সোনার মটরমালা পরে এসেছেন গলায়, খড়্গ-খর্পর ফেলে এক হাতে ধরেছেন ঝিনুক আর হাতে দুধের বাটি। সে বাটিতে দুধই বটে, জল-বার্লি নয়। ভোররাত্রে চুপিসারে ক্ষুধার্ত শিশুকে দুধ খাইয়ে বাতাস হয়ে এখনই মিলিয়ে যাবেন। চোখ মেললে দেখতে পাওয়া যায়—কিন্তু পাতা যেন আঠা দিয়ে

এঁটে রেখেছে, চোখে দেখা নফরার আর ঘটে উঠল না।

সকালবেলা পাখপাখালি ডাকতে সুধামুখী বাইরে গেছে। চোখ মুছে নফরকেষ্টও উঠে পড়ল। ছেলে ড্যাব-ড্যাব করে একনজরে কি দেখছে ঘরের চালের দিকে। তারপরে হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে তক্তপোষের উপর দুম-দুম পা ছুঁড়ছে, আর সেই অ-অ-অ—

নফরকেষ্ট শিক্ষা দিচ্ছে: অ-অ নয় রে বোকারাম। মা—মা, মা-জননী—

সুধামুখী এসে পড়েছে। বলে, তবু ভাল, মা ডাক বেরোয় আজও তোমার মুখ দিয়ে।

নফর বলে, সে মা কি আর নরলোকের পাঁচি-খেঁদি মা! যা দু-চার পয়সা রোজগার করি, সবই সেই মায়ের দয়ায়। মা দক্ষিণাকালী। জননী স্বয়ং এসেছিলেন তোমার ঘরে। চোখ খুলতে পারলাম না, তাই দর্শন হল না। বুঝে দেখ, যোগী ঋষি ধেয়ানে পায় না—তাই আমার হতে যাচ্ছিল। ঘুমের ঝোঁকে নষ্ট করে ফেললাম।

স্বপ্ন ছাড়া কি—পুরো স্বপ্ন না হোক, আধাআধি গোছের। বলল সমস্ত নফরকেষ্ট। সুধামুখী উড়িয়ে দেয় না। বলে, দেবী যদি হন—উনি মা-কালী নন, মা-ষষ্ঠী। এসব ষষ্ঠীঠাকরুনের কাজ—বাচ্চা যেখানে, ষষ্ঠীও সেখানে। বাচ্চা কতবার আছাড় খাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে উঁচু জায়গা থেকে—বড় ছেলে হলে সঙ্গে সঙ্গে চোখ উল্টে পড়ত। ওদের কিছুই লাগে না, ষষ্ঠীঠাকরুন কোল পেতে ধরেন। বাচ্চার গায়ে মাছিটা বসলে আঁচল নেড়ে তাড়িয়ে দেন। কালকেউটে ফণা তুলেছে, সে ফণায় আর ছোবল দিতে পারে না, ষষ্ঠীঠাকরুনের হুকুমে দাঁড়িয়েই থাকে, বাচ্চার উপরে ফণার ছত্র ধরে। ছিনতাই-ছ্যাঁচড়ামি কাজ তোমার—কোন ঠাকুরের কি মাহাত্ম্য, শিখবে আর কোথায় তুমি!

নফরকেষ্ট ফ্যা-ফ্যা করে হাসে। বলে, যা দেখেছি, এখন বুঝলাম মা-কালী নয় মা-ষষ্ঠীও নয়। দেবদেবীর হাতে ঝিনুক-বাটি, কোন পটে দেখিনি, পুঁথিতেও শোনা নেই—

সুধামুখীর খোশামুদ করে এই রকম মাঝে মাঝে, মিষ্টি কথার বন্যা বইয়ে দেয়। বলে, দেবতা-টেবতা নয় গো, মনে মনে তখন তোমাকেই দেখেছি। এই যেমন ভাবে তুমি এসেছ, রোজ সকালবেলা যেমন আস। একটা রক্তের ডেলাকে গড়েপিটে মানুষ করা কী সোজা ব্যাপার! ছেলেকে আমি শেখাচ্ছিলাম—বুলি ধরে সকলের আগে তোমায় ডাকবে—মা!

মেঝের উপর সুধামুখী ছেলে নিয়ে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছে। খাওয়াচ্ছে। বলে, আমি শেখাব—বাবা। মা নয় রে খোকামণি, বাবা বলা শিখে নে তাড়াতাড়ি। বাবা, বাবা, বাবা—! সেই হল আসল।

নফরকেষ্ট গদ-গদ হয়ে উঠেছে। মুখে হাসির ছটা। বল কি গো, বাবা ডাকবে আগে! আমি কী-ই বা করলাম! একটা দুটো টাকা—সে তো বরাবর দিয়ে থাকি। ছেলে এসে বেশি কি দিতে পেরেছি, ক্ষমতা কতটুকু আমার!

নফরার হাসি সুধামুখী নিমেষে ঘুচিয়ে দেয়, ফুৎকারে আলো নেভানোর মতো :
বলে, শখ দেখে বাঁচিনে ! কালোভুতো উৎকট এক বুনো-হাতি—তোমায় বাবা ডাকতে বয়ে গেছে। বাবা ডাকবার মানুষ আমার বাছাই-করা আছে। ডাক এক-একখানা ছাড়বে, আর টুং-টাং করে টাকা এসে পড়বে। বাবা ডাক মাংনা হয় না।

সেই বাছাই-করা মানুষ—একজন তো দেখা যাচ্ছে রাজাবাহাদুর। বাছাইয়ে ভুল হয়নি। তিনি এলেই সুধামুখী ছেলে বসিয়ে দেয় সামনা-সামনি। তারপর খানিকটা পিছু হটে রাজাবাহাদুরের পিছন দিকে গিয়ে ইসারা করে। পারুলের পোষা কাকাতুয়া যেমন—সঙ্গে সঙ্গে ইসারা বুঝে নিয়ে সাহেব ডেকে ওঠে, বাবা ! নতুন বুলি বলতে গিয়ে চাঁপার কলির মতো ঠোঁট দুখানা একত্র করে আনে। হাসি-হাসি মুখ। সেই সময়টা পলকহীন চোখে তাকিয়ে না থেকে উপায় নেই।

সাহেব ডাকে : বাবা, বা-আ-ব্বা—। রাজাবাহাদুর গলে গেছেন একেবারে। ঘাঁটিরে ঘাঁটিয়ে অনেকবার শুনতে চান, শুনে শুনে আশ মেটে না। জিনিসপত্র যা হাতে করে এসেছেন, গোড়াতেই দেওয়া হয়ে গেছে। এক সময়ে উঠে জামার পকেটের ব্যাগ বের করে একগাদা পয়সা-দুয়ানি-সিকি সাহেবের সামনে রাখেন। খেলা করুক ছেলে যেমন ইচ্ছে ফেলে-ছড়িয়ে। মেজাজি মানুষ যা বের করে দিয়েছেন, পকেটে আর ফিরে তোলেন না।

সুধামুখীর দিনকাল খারাপ। আসেন ঐ রাজাবাহাদুর—ছেলের ফাঁদ পেতে যাঁকে আটকেছে। ঘরের মানুষ নফরকেষ্টরও দুর্দিন—একটা দুটো টাকা দিত আগে, তাও আর পেরে ওঠে না।

দুঃখে এক-একদিন নফরকেষ্ট ভেঙে পড়ে। সরল মানুষটা মনের কথা চাপতে পারে না, সুধামুখীকে খুলে বলে। মানুষটা ভাল হতে পারবে না তো টাকার মানুষ হবে, সেই ধান্দায় অহরহ ঘুরে বেড়ায়। টাকা রোজগারের সবচেয়ে ইতর পথটা বেছে নিয়েছে। ঘটিচোর বাটিচোর বলে ঠাট্টাতামাসা চলে—সকলের অধম ছিনতাই মানুষ, পথেঘাটে যারা হাতের খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। চোর-ডাকাতের যে সমাজ, তার মধ্যে অন্ত্যজ। অথচ শিক্ষা চাই এই কর্মে—পুরোদস্তুর ম্যাজিক দেখানো শতেক জনের চোখের উপর। পাকা হাত হলে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তা হাত নিয়ে নফরকেষ্ট করতে পারে বটে দেমাক !

একদিন হল কি—পকেট থেকে নোটের তাড়া তুলে নিয়েছে। স্ফূর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ—পুরো একটা দল যাচ্ছিল নতুনবাজারে কেনাকাটা করতে। নফরার সঙ্গেও জন তিনেক। এমনটা হবার কথা নয়, তবু কি গতিকে মক্কেলদের একজনের নজরে পড়ে নফরার হাত এঁটে ধরেছে। অন্যদেরও ঘিরে ফেলেছে সবাই, সরে পড়তে দেয় নি। এই মারে তো সেই মারে। মেরে আধমরা করে তারপর পুলিস ডাকবে, পথের কাজের যে রকম দস্তুর। নফরা নিরীহভাবে দু-হাত উঁচু করে তুলেছে : বাজে কথা বললে তো হবে না, তল্লাস করে দেখে তারপরে বলুন। অতএব তল্লাসই চলল—একা একজন নয়, দল-সুদ্ধ মিলে। নেই কোথাও। অপর তিনজনকেও দেখে। নেই, নেই !

নফরা এবার জোর পেয়ে গেছেঃ দেখলেন তবে তো? খুশি হলেন? নিজেরা কোথায় ফেলেছেন। কিম্বা আনেন নি হয় তো একেবারেই। পথের মানুষ ধরে টানাটানি। দল হয়ে যাচ্ছেন, যা ইচ্ছে করলেই হল।

পাবে কোথায় সে বস্তু? যে মানুষটা নফরাকে চেপে ধরেছে, নফরা তারই পকেটে ফেলে দিয়েছে টুক করে। দুনিয়া জুড়ে তল্লাস করলে, নিজের পকেটে কখনো নয়। সরাবার অতএব সবচেয়ে নিরাপদ স্থান।

বিষম বেকুব হয়ে গেছে তারা। দাঁত মেলে হাসির মতো ভাব করে নফরকেষ্ট নমস্কার করেঃ খুশি হয়েছেন—আসতে পারি তো এবার? এমন আর করবেন না।

ভদ্রতা মাফিক বিদায় নিয়ে এল। ডেরায় চলে এসেছে। কই, বের কর দিকি, গোনাগুনতি হোক।

সেই নোট নিয়েই ফিরেছে। নফরকেষ্ট নয়, অন্য একজনের কাছ থেকে বেরুল। নমস্কার করে বিদায় নিয়ে আসবার সময় সেই মানুষটার গা ঘেঁষে পুনশ্চ পকেট থেকে তুলে নিয়েছে। গচ্ছিত-রাখা জিনিসটা ফেরত আনার মতো।

এমনি কত। যা সমস্ত নফরকেষ্ট বলে, বাড়িয়ে বলে ঠিকই—খানিকটা তবু সত্যি। নফরকেষ্ট না-ও যদি করে থাকে, কেউ না কেউ করেছে এমনি। দিনকাল তারপরে খারাপ হতে লাগল। মক্কেলরা সেয়ানা হয়ে যাচ্ছে। পয়সা-কড়ির অভাব, মানুষজন প্রায়ই খালি পকেটে বেরোয়। নফরকেষ্ট ট্রামে যেত আগে ফার্স্ট-ক্লাসে। খুব একজন বাবুলোকের পাশে গিয়ে বসল। একটা পকেটে বাবুর হাত ঢোকানো। তার মানে নিজেই দেখিয়ে দিচ্ছে, মাল আছে এইখানটা। নফরকেষ্টর হাতে ঘড়ি—বাজে বাতিল জিনিস, দেখতে চকচকে ঝকঝকে কিন্তু চলে না। নফরা বলে, চলবার জন্য তো ঘড়ি নয় পরবার জন্যে, কাজের সাজপোষাকের মধ্যে পড়ে এটা। সেই ঘড়িসুদ্ধ হাত কানের কাছে এনে ধরেঃ কি মুশকিল, এখন আটটা? দম দেওয়া নেই, বন্ধ হয়ে আছে। বলুন তো ক'টা বেজেছে। পাশের ভদ্রলোক পকেটের হাত তুলে ঘড়ি দেখে সময় বললেন। হাত সঙ্গে সঙ্গেই যথাস্থানে ঢুকেছে। হাসি ঠেকানো দুঃসাধ্য হয়, হাত ঢুকিয়ে কি সামলাচ্ছ এখন মানিক? সে বস্তু কি আছে, ডিম ফেটে পাখি হয়ে উড়ে বেরিয়ে গেছে পকেট থেকে। নফরই আবার ভদ্রলোকের নজরে এনে দেয়ঃ ব্যাগ পড়ে গেছে আপনার। শশব্যস্তে ভদ্রলোক তুলে নিলেন। হাসি আসে আবার নফরকেষ্টর মুখে—ব্যাগ ভরা কতই যেন ধনসম্পত্তি! তবু যদি পরীক্ষা করে না দেখতাম! দু-তিন আনা ছিল হয়তো গোড়ায়, ফার্স্টক্লাস ট্রামের টিকিট কাটতে খরচা হয়ে গেছে। একেবারে শূন্য ব্যাগ।

সেই থেকে নফরকেষ্ট ফার্স্টক্লাস ছেড়ে সেকেণ্ডক্লাস ধরল। তাতে বরঞ্চ মেলে কিছু কিছু। এই শিক্ষা হল, ভাল মক্কেল উঁচু ক্লাসে চড়ে না। এক জায়গায় একই সময়ে গাড়ী পৌঁছচ্ছে, বুদ্ধিমান হিসাবি লোক ফার্স্টক্লাসের অতিরিক্ত একটা-দুইটা পয়সা দিতে যাবে কেন? দেয় যারা বেপরোয়া উড়নচণ্ডী বাইরে কোঁচার পত্তন, পকেটে ছুঁচোর কেত্তন।

এসব আগের দিনের কথা, এই ক'টা বছরে বাজার পুড়েজ্বলে গেছে একেবারে। বয়সের সঙ্গে বেঢপ মোটা হচ্ছে নফরকেষ্ট, গায়ের রং আরও ঘন হচ্চে দিনকে দিন—যা নিয়ে সুধামুখী কথায় কথায় খোঁটা দেয়। বড় বড় রাঙা চোখ—আয়নায় চেহারা দেখে নিজেরই ভয় করে। নিরীহ পকেটের কারবারি কে বলবে, খুনি-দাঙ্গাবাজগুলোই হয় এ রকম। তার যে পেশা, সর্বদা সেজন্য মানুষের কাছাকাছি হতে হয়—কাছ ঘেঁষে গায়ে গা ঠেকিয়ে তবেই তো হাতের খেলা। কিন্তু চোখে দেখেই মক্কেল যদি ছিটকে পড়ে, কাজ হবে কেমন করে?

তার উপরে হাল আমলের ব্যবস্থাও সব নতুন। কাজের এলাকা ভাগ হয়ে গেছে। রাজার যেমন রাজ্যসীমা থাকে। ভিন্ন এলাকায় ঢুঁ মারতে গিয়েছ কি মেরে তক্তাপেটা করবে। পুলিসে নয়, যারা একই কাজের কাজি তারাই। এই কালীঘাটে সে আমলে মফস্বলের সরলপ্রাণ ভক্ত মেয়েপুরুষরা আসত। আসে এখনও গাঁ-গ্রাম থেকে, কিন্তু বিষম ধড়িবাজ—শহুরে মানুষের কান কেটে দেয় তারা। সমস্ত দিন ঘুরেও ভক্তিবিহ্বল আপন-ভোলা মানুষের মতো মানুষ একটি মেলে না। মায়ের নামে পকেটে নিয়ে এসেছে তো সর্বসাকুল্যে গণ্ডা পাঁচ-সাত পয়সা—চলেছে কিন্তু লক্ষপতির মেজাজে। ছত্রিশগড়ের রাজা কি ছাত্রির নবাববাহাদুর। পা পিছলে হুমড়ি খেয়ে গায়ে পড়লে মাল ঠেকবে ঠিকই—সে মাল রুপোর টাকা কি সোনার মোহর কি তামার পয়সা বাইরে থেকে কেমন করে বোঝে? এসব কাজকারবার একলা একজন দিয়ে হয় না, মক্কেল সাব্যস্ত হয়ে গেলে দুটো-তিনটে ডেপুটি অর্থাৎ সহকারী লাগে। কাজ অন্তে সকলের বখরা। সেই বখরা বিলির সময় ধুন্দুমার লেগে যায়—তামার পয়সা তারা মুখে ছুঁড়ে মারে। নফরকেষ্টর গলায় গামছা দিয়ে টানে: ওসব জানিনে, লোক যখন ফেলা হয়েছে খাটনির উপযুক্ত মজুরি চাই। কর কেন ভুয়ো-মক্কেল বাছাই—ধরে ফেললে মারগুতোন কি কম করে দিত পাবলিক? কোর্টে কেস উঠলে ছ-মাসের সাজা কি ছ-দিন হত? হয় মজুরি দেবে, নয়তো তোমায় মেরে হাতের সুখ করব।

এই ছ্যাঁচড়া কাজ ছেড়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। অথবা উৎকৃষ্ট এক খোঁজদার জুটিয়ে নেওয়া। সেই খোঁজদার আদি অবস্থায় গড়োপটে গোছগাছ করে দিল, নফরকেষ্ট দ্রুত গিয়ে কাজ হাসিল করল তারপর। নফরা আর সেই লোক—আজেবাজে ডেপুটি ডাকবে না।

আরও এক নতুন উপদ্রব—থানা-পুলিস। এতকাল তাঁদের নিয়ে উদ্বেগের কারণ ছিল না। থানায় সদাশয় পুরুষরা ছিলেন, পাকা বন্দোবস্ত ছিল। তাঁরা রোজগার করতে এসেছেন, তোমরাও এসেছ—কেউ কারও প্রতিযোগী নয়। মাঝে মাঝে তাঁদের ন্যায্য পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে নিজ রাজ্যে অবাধে চরে খাও—থানা তাকিয়েও দেখবে না। এখন এক হাড়বজ্জাত এসে বসেছে সেই থানার চূড়োয়।

মোক্তারমশায়রা আছেন, অতিশয় দক্ষ ও বিচক্ষণ। আদালতের লিস্টে তাঁদের নাম হয়তো রয়েছে, কিন্তু প্রাকটিশ থানার উপর এবং থানার আশেপাশে। যাবতীয় বন্দোবস্তে এঁরাই মধ্যবর্তী—নাম সেইজন্য পুলিসের মোক্তার। যেমন একজন বসন্ত

মোক্তার। দু-হাতে রোজগার, কিন্তু একদিনও আদালত মুখো হন না। পথ চিনে আদালতে হয়তো পেঁছিতেই পারবেন না। না যেতে যেতে ভুলে গেছেন।

বসন্ত মোক্তার গেলেন নফরকেষ্টর হয়ে। প্রবীণ মানুষটা চোখ-মুখ রাঙা করে ফিরলেনঃ নচ্ছার ফাজিল ছোঁড়া একটা, মানীর মান রাখে না। ইংরাজি শিখে পুলিসলাইনে ঢুকেছে কিনা, বিদ্যের দেমাকে ফেটে মরছে। কাজের একটু আঁচ দিতে গড়গড় করে ইংরাজি ছাড়তে লাগল—সাপ না ব্যাং মানে কিছু বুঝিনে। জুত হবে না, এইটুকু বেশ ভাল করে বুঝে এলাম।

বলেন, চিরকেলে মক্কেল তুমি, ফাঁকিজুকি দেব না। একটা টাকা ফী দিয়ে দিও।

. নফরকেষ্ট বলে, কাজ হল না, তবু ফী ?

সেই জন্যেই তো ষোলআনা। কাজ হলে ষোল টাকাতেও কি পার পেতে ? টাকা আজকেই যে দিতে হবে তার মানে নেই। হাতে যখন আসবে, সেই সময় দিও।

বসন্ত সেকেলে বাংলা মোক্তার। তাঁর ক্ষমতায় হল না তো নফরকেষ্ট ইংরেজি-নবিশ রাজমোহন সেনকে গিয়ে ধরে। বিস্তর অসাধ্যসাধন করেছেন ইতিপূর্বে। গেলেনও তিনি দু-তিন দিন, কিন্তু মুখ ভোঁতা করে ফেরেন। বললেন, গুচ্চের বকুনি শুনে এলাম, আর কিছু নয়। অন্তরে বিবেক, মাথার উপরে ভগবান—সৎপথে সাধুভাবে কাজকর্ম করে যাবে। সরকার যথাযোগ্য বেতন দিয়ে পুষছেন, সেই বেতনের উপর একটি আধেলা গোরক্ত-ব্রহ্মরক্ত। সংসার না চললে বরঞ্চ দু-বেলার জায়গায় একবেলা খাবে, অধর্মের পথে তবু পা বাড়াবে না।

সৎপথের পথিক হয়ে ছোকরা দারোগার কোন মোক্ষ লাভ হল, নফরকেষ্ট জানে না। এর অনেক পরে আর এক সাধু-দারোগা জগবন্ধু বলাধিকারীর পরিণাম শুনেছিল সে। বলতে-বলতে বলাধিকারী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেনঃ ধর্ম না কচু! মুকুন্দ মাস্টারের মত অপদার্থ যারা, গাল-ভরা এসব বলে তাঁরা দশের কাছে মান বাড়ায়, নিজের মনে সান্ত্বনা আনে। পুণ্যের জয় পাপের ক্ষয়—ওটা নিতান্তই কথার কথা। কিছু হয়তো সেকালে চলত, এখন চলে উল্টোটাই। পাপ নামটাই ভুল—পাপের পথ নয়, প্রয়োজনের পথ। ঘটে এতটুকু বুদ্ধি থাকলে প্রয়োজনের পথই আঁকড়ে ধরবে লোকে। নিরানব্বুই পার্সেণ্ট যা করছে তাই বাতিল করে এক পার্সেণ্ট পাগলের কথায় নাচানাচি করা আহাম্মুকি ছাড়া কিছু নয়।

এমনি কত কি। পণ্ডিত মানুষ বলাধিকারীর অনেক কথাই নফরকেষ্টর মাথায় ঢুকত না। বলতেন তিনি নফরকেষ্টকে উদ্দেশ করেও নয়। সাহেব থাকত, দল-বলের অনেকেই থাকত। কিন্তু যেটুকু যা-ই বুঝুক, সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হত তাঁর এই নতুন ধরনের কথায়। একটা প্রতিহিংসার ভাবও যেন কালীঘাটের সেই ছোকরা-দারোগার উপর। বেঁচে থাকে তো দিব্যজ্ঞান পেয়ে সে-ও এমনিধারা উল্টো কথা বলে নিশ্চয়।

কিন্তু বলাধিকারির সঙ্গে পরিচয়—সে হল অনেক পরের ব্যাপার! থানা থেকে অপদস্থ হয়ে ফিরে রাজমোহন সেনের ব্রহ্মতালু অবধি দাউদাউ করে জ্বলছে। খেঁচিয়ে

ওঠেন অলক্ষ্যে দারোগার উদ্দেশে : কসাইখানার মধ্যে বেটা ব্রহ্মার ঘৃত-পায়েস চড়িয়েছে। সাধু হয়েছিস তো বল্কল পরে বনে যা, থানার উপর কেন ?

নফরকেষ্টরও মনের কথা তাই। বাবুমশায়রা, ভগবান অঢেল দিয়েছেন, ধর্মপথে থেকে জপতপ হোমযজ্ঞি নামগানে লেগে থাকুনগে। কিন্তু অহরহ ছুটোছুটি করে অন্ন জোটাতে হয়, মাথার উপর পঞ্চাশমনি এক ভগবান চাপানো থাকলে আমাদের দিন চলবে কেমন করে ?

মনের দুঃখে নফরকেষ্ট সেই কথা বলছিল, কাজ-কারবার শিকেয় উঠে গেল। সদর রাস্তায় নিপাট ভালমানুষ হয়ে বেড়ালেও ধরবে। শহরের খুরে দণ্ডবৎ রে বাবা, ঘরবাড়ি রয়েছে সেখানে গিয়ে উঠিগে।

সুধামুখী আহা-ওহো করে না, উল্টে খিলখিল করে হাসে : বাড়িঘরে তুমি যাবে না, যেতে পারো না। কেন মিছে ভয় দেখাচ্ছ ?

চটে গিয়ে নফরকেষ্ট বলে, হাসির কী হল শুনি ? বাড়ি আমার নেই বুঝি ? সে বাড়িতে নেই কোন জিনিস ! এক-গোয়াল গরু, আউড়ি-ভরা ধান। ভাইরা আছে বোন আছে—ভাই-বোনে পৌণে দুগণ্ডা। ভরভরন্ত সংসার—তার মধ্যে আমিই কেবল হতচ্ছাড়া।

সুধামুখী সায় দিয়ে বলে, সমস্ত আছে, নেই শুধু বউটা।

আছে আলবৎ। দরবার-গুলজার বউ আমার। এই কালীঘাটের মোড়ে এনে যদি দাঁড় করিয়ে দিই, তীর্থধর্ম চুলোয় দিয়ে লোকে হাঁ করে চেয়ে থাকবে আমার বউয়ের পানে। তুমি তার পাশে দাঁড়ালে চরণের দাসী ছাড়া কেউ ভাবতে পারবে না।

এতবড় কথার উপরেও সুধামুখী রাগ করে না, হাসিমুখে টিপ্পনী কাটে : বউ নিজের বাড়িতেই নিতে পার না, কালীঘাটে আনবে কী করে ? বাড়ি গিয়েও তো চার ছড়ানো আর টোপ-গাঁথার ব্যাপার। লম্ফঝম্ফ যতই কর, কোনখানে তোমার নড়বার জো নেই। এই দাসীবাঁদী পোড়ামুখির ঘাড়েই এঁটে থাকবে জোঁকের মতো। যদ্দিন না আবার গাঁট ভারী হচ্ছে।

মর্মভেদী অনেকগুলো কথা বলে শেষটা বোধকরি করুণা হল মানুষটার উপর। সান্ত্বনা দিয়ে বলে, এত যাই যাই করবার কি হল শুনি ? পড়তা খারাপ—তোমার রোজগার নেই। আমারও না। তা ছেলে কামাইদার হয়েছে, তার পয়সাই খেতে লাগি এখন।

পুলকের আতিশয্যে সুধামুখী বালিশ সরিয়ে বের করে ধরে। রাজাবাহাদুর এই আজকের দিনেই বাচ্চাকে যা খেলতে দিয়ে গেছেন। রুমালে বেঁধে সেগুলো বালিশের তলে রেখেছিল, রুমাল খুলে গণে দেখল। বলে, দেখ একদিনের রোজগার। তোমার কথা জানি নে, কিন্তু আমায় এতগুলো কেউ দেয় না। রাজাবাহাদুর হপ্তায় দু-তিনবার আসছেন—ভাবনা কিসের, উপোসি থাকব না আমরা।

নফরকেষ্ট খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শোনে। এত হাসিখুশি সুধামুখী রোজগেরে ছেলের মা বলেই। কঠিন কথাও সেই দেমাকে গায়ে মাখল না। নফরকেষ্ট শতকণ্ঠে তারিফ

করছে ঃ বাহাদুর ছেলে বটে, ভাল করে কথা না ফুটতেই রোজগারে নেমেছে। ভাগ্যিস তখন পারুলকে দিয়ে দাও নি। এখনই এই, বড় হলে ছেলে তো বস্তা বস্তা টাকা এনে দেবে।

ফোঁস করে গভীর নিঃশ্বাস ছাড়ল ঃ আমার সেই হারামজাদি বউকে একটা দিনও ঘরে আনা গেল না। ছেলে থাকার কত গুণ, এ জন্মে বুঝল না।

চার দিনের মাথায় রাজাবাহাদুর আবার এসেছেন। ইদানীং বেশি ঘনিষ্ঠতা—তিনি এলে সুধামুখী এটা-ওটা খাওয়ায়। আজকে পিঠে হচ্ছে, পিঠে ভাজতে সে রান্নাঘরে ছিল। ঘরে এসে দেখে, সাহেব একাই বকবক করছে, রাজাবাহাদুর উঠে আলনায় টাঙানো জামার পকেট উদ্বিগ্নভাবে উল্টেপাল্টে খুঁজছেন।

সুধামুখী বলে, কি হল ?

রাজাবাহাদুর বলেন, মনিব্যাগ পাচ্ছি নে। ট্রামে আসতে হয় তোর বাড়ি, সহিস-কোচোয়ান জেনে ফেলবে বলে নিজের গাড়িতে আসতে পারি নে। পকেট মেরে দিল না কি হল—খোঁজ করতে গিয়ে দেখছি, নেই।

সুধামুখী গম্ভীর হল ঃ ছিল কত ব্যাগে ?

তাই আমি গণে দেখেছি নাকি ? নিতান্ত খারাপ ছিল না। দশ-বিশ হতে পারে, পঞ্চাশও হতে পারে—

সুধামুখী বলে, এক-শ ?

হতে পারে। পাঁচ-শ হলেও অবাক হন না। খাজাঞ্চিকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব।

হেসে বললেন, সমস্ত গেছে, ফিরতি ভাড়াটাও রেখে যায় নি। যাবার সময় গোটা দুই টাকা দিস তো সুধা। ছেলেটার হাতে দুটো-চারটে করে পয়সা দিই। অভ্যাস হয়ে গেছে ওর, হাত পাতে। আজ আমি ডাহা বেকুব হলাম ছেলের কাছে।

মুশকিল, আজকেই একটু আগে সুধামুখী ঘরভাড়া চুকিয়ে দিল। হাত শূন্য। নির্ভাবনায় ছিল, রাজাবাহাদুরের আসবার তারিখ। আবার নকরকেষ্ট বলেছে, ডেপুটি হয়ে কোন এক সাঙাতের কাজ করে দিয়েছে—আজ বখরা পাবে। দেবে কিছু রাত্রিবেলা। দুটো মাত্র টাকাও ঘরে নেই।

পারুলের কাছে গিয়ে হাত পাততে হয়। ঘর খোলা পারুলের—সন্ধ্যার মুখে বন্ধু কেউ এসে থাকে তো বিদায় হয়ে চলে গেছে। মেজাজি মেয়ে পারুল—স্বয়ং লাটসাহেব এলেও তার মন-মেজাজ বুঝে চলতে হবে। যখন বলব, তক্ষণ্ডেই বেরুতে হবে। না পোষায় তো এসো না। কে খোশামুদি করতে যাচ্ছে ! সময় ভাল পড়লে এই রকমই হয়, খদ্দের পায়ে পায়ে ঘোরে।

নিরিবিলি ঘরে পারুল এখন মেয়ে নিয়ে আছে। সোহাগি মেয়ে—হাসলে মাণিক পড়ে, কাঁদলে মুক্তো ঝরে। মেয়ের চোখে কাজল, কপালে কাচপোকার টিপ, গায়ে রংবেরঙের জামা। পাউডার বুলিয়েছে মুখে—সমস্ত হয়ে গিয়ে ছোট্ট ছোট্ট পা-দু-খানা কোলের উপর তুলে তুলি দিয়ে আলতা পরাচ্ছে।

দরজায় দাঁড়িয়ে সুধামুখী তাকিয়ে দেখে নিশ্বাস চেপে নেয়। বলে, দুটো টাকা হাওলাত চাচ্ছে সাহেবের বাপ।

পারুল তাকিয়ে পড়তে মৃদু হেসে বলে, সেই যে রাজাবাহাদুর বাপটা। ব্যাগ খুঁজে পাচ্ছে না। আবার যেদিন আসবে, দিয়ে দেবে।

উঠে গিয়ে টাকা বের করতে করতে পারুল কলকণ্ঠে বলল, পাঁজি দেখিয়ে এনেছি দিদি, বিষ্যুৎবারে আমার রানীর মুখে-ভাত। পুজোআচ্চা আর কি—মায়ের মন্দিরে নিয়ে প্রসাদ খাইয়ে আনব। বন্ধুমানুষ ক'জনকে বলছি, আর এ-বাড়ির যারা আছে। বেশি জড়াতে গেলে পারব না, কে ব্যবস্থা করে দেয় বলো। তোমার নফরকেষ্ট অবিশ্যি খুব পুলক দিচ্ছে, কিন্তু আমি সাহস করি নে।

সুধামুখী সভয়ে বলে, নফরার হাতে টাকাকড়ি দিস নি তো রে ?

পাঁচটা টাকা নিয়ে গেল। রানাঘাটে কে ওর আপন লোক আছে, সেখান থেকে পান্তুয়া আনবে। তার বায়না !

সুধামুখী হতাশভাবে বলে, রানাঘাটের পান্তুয়ার আশায় থাকিসনে পারুল। মিষ্টির অন্য ব্যবস্থা করে ফেল। নফরা দেশেঘরে চলে গেল।

পারুল অবাক হয়ে বলে, বল কি ! এই তো, এইমাত্তর এসে টাকা নিয়ে গেল।

এসেছিল, সে আমি টের পেয়েছি। নয় তো রাজাবাহাদুরের ব্যাগ গেল কোথায় ? আমায় দেখা দেয় নি—দেখা হলে হাঙ্গামায় পড়ত। ধরে নে, ঐ পাঁচ টাকাও সে হাওলাত নিয়ে গেছে।

একটু হেসে বলে, সাহেবের বাবাগুলো আজ মহাজন পাকড়েছে তোকে। দু-জনে পর পর। ফিরে এসে শোধও করবে ঠিক। ফিরছে কবে, সেই হল কথা ! তোর হল পাঁচ টাকা ; আর রাজাবাহাদুর বলছেন তাঁর দশ হতে পারে পাঁচ-শও হতে পারে—

বিড়বিড় করে নিজের মনের মধ্যেই যেন হিসাব করে দেখছে : পাঁচ আর দশ একুনে পনের। তা হলে দিন দশেকের বেশি নয়। পাঁচ-শ যদি হয় ধরে নাও বছর খানেক। বউ ধরার টোপ ফেলতে যাওয়া—খরচের ব্যাপার—টাকা একদিন ফুরোবেই। সেদিন না এসে যাবে কোথা ? কেউ যদি একনাগাড়ে টাকা জুগিয়ে যেত, তবে আর নফরকেষ্ট বাড়ি ছেড়ে ফিরত না।

কথাবার্তায় কেমন এক রহস্যের ছোঁওয়া। কৌতূহলী পারুল বলে, দাঁড়িয়ে কেন দিদি, বোসোই না শুনি ! সাহেবের বাপ সাহেবকে নিয়ে আছে, তোমায় তার কোন গরজ নেই।

বিছানার প্রান্তে বসে পড়ে সুধামুখী বলে, বাড়ি গিয়ে নফরা চাকরে সাজে। বাবু নফরকেষ্ট পাল—কলকাতার বড় চাকুরে বাবু। মানুষটা এমনি ভাল তো—এক-একদিন বলে 'ফেলে অন্তরের কথা। বলে আর চোখ মোছে। চাকরে মানুষের মতো দু-হাতে রমারম খরচ করতে হয়। নয়তো সন্দেহ করবে, খাতিরযত্ন উপে যাবে, হেনস্তা হবে। বউ থাকে বাপের বাড়ি—টাকা দেখিয়ে তাকে খপ্পরে এনে ফেলতে চায়। বউটাও তেমনি ঘড়েল আবার—

পারুল অবাক হয়ে বলে, টাকার বউ তো আমরাই সব। শালগ্রাম সাক্ষি রেখে মন্তোর পড়ে যাকে বিয়ে-করা—'

জানিস নে পারুল, বিয়ের বউয়েরই বেশি খরচা। বউ পোষা আর হাতি পোষা। তা-ও তো সে বউ কাছে পেল না একদিন, লোভে লোভেই ঘুরছে। সম্বল ফুরোলে বাড়িতে তারপর লহমাও দাঁড়াবে না। আসতে হবে এই চুলোয়—আমার কাছে। রাত দুপুরে আপাদমস্তক ক্ষিদে নিয়ে রাক্ষস হয়ে আসবে, তার জন্যে ভাত রেঁধে রাখতে হবে আমায়। গোগ্রাসে পুরো এক পেট গিলে তার পরে কথা। তখন আর কিছুতে নড়বে না। আমি বলি জোঁক—জোঁক যেমন দু-মুখ আটকে গায়ে লেপটে থাকে। কিছুতে ছাড়ান নেই।

বলে, ক'দিন থেকে বাড়ি-বাড়ি করছে। রূপসী বউয়ের টান ধরেছে। আমারই ভুল, রাজাবাহাদুরকে সাবধান করে দিই নি। জানলার কাছে জামা রেখেছেন, বাইরে থেকে ব্যাগ তুলে নিয়েছে। গায়ে থাকলেই বা কি হত—মন্তোর-পড়া হাত ওর, চোখ মেলে তাকিয়ে থেকেও ধরা যায় না।

টাকা নিয়ে সুধামুখী উঠে পড়ল। দু-পা গিয়ে কি ভেবে দাঁড়ায়ঃ তোরা বলিস, নফরা দিদির ভালবাসার মানুষ। হাসিতামাসা করিস। মিছেও নয়। কিন্তু সেই ভালবাসা নিয়ে সদাসর্বদা সামাল। টাকা হাতে পড়েছে বুঝতে পারলে ঝগড়া করে ভাব করে চুরিচামারি করে, যেমন করে হোক টাকাটা গাপ করে নিতে হবে। রক্তে পেট মোটা হলে জোঁক তখন আর গায়ে থাকে না, খসে পড়বে। আমাদের ভালবাসা জিইয়ে রাখতে কী কষ্ট রে পারুল!

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি সুধামুখী বেরিয়ে গেল।

তিন

অনেক দিন—অনেক বছর পরে। সাহেব বড় হয়েছে। সেই এক বড় সমস্যা। বাচ্চা বয়সে রান্নাঘরে জোড়া পিঁড়িতে ঘুম পাড়িয়ে রাখত, কুণ্ডলী পাকিয়ে ছেলে পড়ে পড়ে ঘুমুত। এখন আর সেটা চলে না। শোয়াতে পুরো মাপের মাদুর দরকার! এবং মাদুর পাতবার উপযুক্ত পরিমাণ জায়গা। সন্ধ্যারাত্রে তো ঘুমাবেই না। ঘরে রাখা চলে না ও-সময়—দিনরাত্রির মধ্যে কাজকারবারের ঐ সময়টুকু। বস্তিবাড়ি তখন মানুষজনের হুল্লোড়—বড়সড় ছেলের কাছে মুখ দেখাতে অনিচ্ছুক সেই সব মানুষ। ছোটখাট আলাদা একটু জায়গা পেত ছেলের জন্যে।

সাহেবের চোখ-কান ফুটেছে, জায়গা খুঁজেপেতে নিল নিজেই। কিছু না হোক, শোওয়ার সুখ বড্ড এই পাড়াটায়। বড় বড় লোকেরা গঙ্গার কুলে ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছেন। মার্বেলপাথরে নাম খোদাই-করা—একের পুণ্য অন্যের হিসাবে ভুলক্রমে জমা পড়ে না যায় খিলান-করা মণ্ডপ ঘাটের উপরে, বৃষ্টির সময়ের আশ্রয়।

সেই সব ঘাটের উপর কোন একখানে পড়ে শুয়ে। সিমেণ্ট-বাঁধানো মসৃণ চাতাল, ফুরফুরে গঙ্গার হাওয়া। সীতারামের সুখ যাকে বলে। শুয়ে শুয়ে চাঁদ দেখ, তারা দেখ। মেঘ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, চাঁদ-তারা ঢেকে দিচ্ছে মাঝে মাঝে। এক ঘুমে রাত কাবার।

মায়ের গর্ভ থেকে নেমেই বোধ করি এমনি ফুরফুরে গঙ্গার হাওয়ায় চাঁদ-তারা দেখতে দেখতে একদিন সাহেব ঘাটে ভেসে এসেছিল। উজান স্রোতে ভেসে ভেসে গিয়ে সেই মা-বাপ আত্মীয়জনদের একটিবার যদি দেখে আসা যায়!

ঘাটে সে এমনি ঘুমিয়ে পড়ে থাকে। কাজকর্ম মিটিয়ে সুধামুখী নিশিরাত্রে এক সময় ঘরে তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু কিছুকাল পরে সাহেব আরও খানিকটা বড় হয়ে যাবার পর সেটাও আর ঘটে ওঠে না। মাঝরাত্রে কাঁচা ঘুম ভেঙে উঠে হেঁটে হেঁটে বাড়ি অবধি যেতে বড় নারাজ সাহেব। ঐ ভয়ে শেষটা পালাতে লাগল। ঘাটের তো অবধি নেই—আজ এ-ঘাটে থাকে তো কাল ও-ঘাটে। সুধামুখী খুঁজে পায় না। বেশি খোঁজাখুঁজি হলে দূরে অনেক দূরে হয়তো চলে যাবে। এ তবু পাড়ার ভিতরে—বাইরে বেপাড়ায় গিয়ে কবে কোন বিপদ ঘটে না জানি। ভেবেচিন্তে সুধামুখী বেশি ঘাঁটা ঘাঁটি করে না। মা গঙ্গার উদ্দেশে বলে, তোমার পাশে পড়ে থাকে মা-জননী, দেখো আমার ছেলেকে। হেরিকেন-লণ্ঠন হাতে গভীর রাত্রে ঘাটের উপর ঘুমন্ত সাহেবকে দেখে চলে যায়। মাথার নিচে বালিশটা গুঁজে দিয়ে গেল কোনদিন হয়তো।

এমন স্ফূর্তির ঘুমানোয় মুশকিলও আছে, সেইটে বড় বিশ্রী লাগে। ঊষা-কালে পুণ্যার্থীরা সব গঙ্গাস্নানে আসেন: আরে মোলো, ঘাট জুড়ে পড়ে রয়েছে। উঠে যা ছোঁড়া, সরে যা। চানের পর ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে মরি শেষকালে।

চোখে ঘুম এঁটে আছে, হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়ে সাহেব। পুণ্যবাণের পথ আটকে থাকতে যাবে কেন? দেবেই বা কেন তারা থাকতে? হাতে লাঠি থাকে কোন কোন বুড়োমানুষের। গঙ্গাজল নিয়ে যাবার কলসি থাকে পুণ্যবতীদের কাঁখে। বলা যায় না—লাঠি মারল হয়তো পিঠে, কলসী ভাঙল হয়তো বা তার মাথায়।

সাহেবের এই রকম। সেই রাজাবাহাদুর বাপও অদৃশ্য হয়েছেন অনেক কাল আগে। বয়স আরও তো বেড়েছে—এ পাড়ায় আসেন না তিনি। কোন পাড়ায় যান কে বলবে। হয়তো কোনখানেই নয়। বৃদ্ধ হয়ে মতিগতি বদলেছে, পূজা-আহ্নিক ঠাকুর-দেবতা নিয়ে আছেন। কিম্বা মরেই গেছেন হয়তো। সুধামুখী আজকাল খবরের-কাগজ পড়ে না—সংসারের দশ রকম খরচা এবং ছেলের খরচা কুলিয়ে তার উপরে আর কাগজের বিলাসিতা সম্ভব নয় তার পক্ষে। তাই জানে না, কোন সকালবেলা হয়তো-বা কাগজে রাজাবাহাদুরের ছবি বেরিয়ে গেছে। অসংখ্য গুণাবলীর মালিক পূতচরিত্র এ রকম মানুষ হয় না, তাঁর বিয়োগে হাহাকার চতুর্দিকে। অসম্ভব কিছু নয়। নিয়তই ঘটছে তো এমনি। সেই ঠাণ্ডাবাবু

বলত জর্মানির কোন লাইপজিগ শহরের কফিখানার গল্প। কফিখানার পাতালতলে যে মেয়েরা নিশিরাত্রে এসে প্রেমলীলা চালাত, তাদের কাছে দিকপাল মানুষদের খুব সম্ভব একটি মাত্র পরিচয়—লম্পট নটবর। মানুষ মাত্রেই অভিনেতা, বলতেন ঠান্ডাবাবু। নকল সাজগোজ নিয়ে এ ওর কাছে ভাঁওতা দিয়ে বেড়ায়—সাজ ফেললে ভন্ড বীভৎস রূপ। এই সঙ্গে গবেষক ব্যারিস্টার সাহেবের কথাও মনে আসে—সুধামুখীর বাপ যাঁর লাইব্রেরিতে কাজকর্ম করেন। অগাধ পাণ্ডিত্য, দেশ বিশ্রুত নাম—লাইব্রেরির সংগ্রহ যেমন বিপুল তেমনি মূল্যবান। কিন্তু আরও এক নিগূঢ় সংগ্রহ আছে, বাইরের লোকের মধ্যে জেনেছিলেন একমাত্র সুধামুখীর বাপ। ধার্মিক মানুষ বাবা পরম বেদনায় গুরুদেবকে বলছিলেন মানুষের রুচি-বিকৃতি ও পাপলিপ্সার কথা। প্রতিরোধের উপায় জিজ্ঞাসা করতেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে মহাপণ্ডিত ব্যারিস্টার সাহেবের কথা তুললেন। একটুকু সুধামুখীর হঠাৎ কানে পড়ে গেল, জানলার বাইরে থেকে সে শুনতে পেয়েছিল। লাইব্রেরীর ভিতর একটা লোহার আলমারি সর্বক্ষণ তালাবন্ধ থাকে, তার মধ্যে দেশ-বিদেশের যত অশ্লীল বই আর ছবি। অতি গোপনে বিস্তর দামে এ সব বিক্রি হয়, পুলিশে টের পেলে টানতে টানতে শ্রীঘরে তুলবে। এত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে জলের মতন অর্থব্যয় করে বছরের পর বছর ব্যারিস্টার সাহেব সংগ্রহ জমিয়ে তুলেছেন। রাত্রে নিরিবিলি আলমারি খুলে দরজায় খিল এঁটে এই সমস্ত নাড়াচাড়া করেন। ছেলেপুলে সবাই জানে, গভীর গবেষণায় ডুবে রয়েছেন, পা টিপে টিপে চলাচল করে তারা, শব্দসাড়া হয়ে পাঠে কোনরকমে ব্যাঘাত না ঘটে। এ ব্যাধি থেকে কবে মুক্ত হবে মানুষ ? হবে কি কোনদিন ?

কিন্তু পরের কথা থাকুক এখন। দিনকাল আরও খারাপ। সুধামুখী চোখে অন্ধকার দেখে—কী হবে, ভবিষ্যতের কোন উপায় ? রাজাবাহাদুর ফৌত, তার উপর নফরকেষ্টরও বিপদ। ধরা পড়েছে সে, ধরে নিয়ে আটকে ফেলেছে। তারই মুখের কথা এ সমস্ত—আগে আগে বলত সে এইরকম। আটকে রেখেছে জেলে নয়, বড়গঙ্গার ওপারে হাওড়ায় ভাইয়ের বাসায়। অবরেসবরে চলে আসে সেখান থেকে। আসে দিনমানে, ছুটিছাটার দিনে।

বলত, জেলের চেয়ে বেশি খারাপ এ জায়গা। কয়েদিরা ছোবড়া পেটে ঘানি টানে সতরঞ্চি বোনে। সে হল আরামের কাজ। এখানে কারখানার ভিতর হাজার চিন্তার গনগনে আগুন—হরিশ্চন্দ্র পালার চণ্ডালের মত সর্বক্ষণ সেই আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ। জেল হলে মেয়াদ অন্তে কোন একদিন ছাড়ও হয়ে যায়। ভাইয়ের বাসার গোলকধাঁধাঁ থেকে কোনকালেই বেরুতে দেবে না, শ্বশুরবাড়ি থেকে বউটাকে এনে ফেলে ভাল করে আটঘাট বন্ধ করবে, শুনতে পাচ্ছি। টাকা পড়ে মরুক, একটা সিকিও মুঠোয় রাখতে দেয় না। মাসের মাইনে হাত পেতে নিয়েছি কি ভাই অমনি ছোঁ মেরে নিয়ে নিজের পকেটে পুরে ফেলবে।

হেসে বলে, আমার কাছে টাকা দেখলে কারও প্রাণে জল থাকে না সুধামুখী। টাকার গরমে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি না ফানুস হয়ে আকাশে উড়ি কেউ যেন সাব্যস্ত

করে উঠতে পারে না। কেড়ে নিয়ে তবে সোয়াস্তি। সে আমি তোমার বেলাতেও দেখেছি।

আগে আগে ইনিয়েবিনিয়ে বলত এমনি সব। কেমন করে গ্রেপ্তার হল তা-ও বলেছে। নফরের ঠিক পরের ভাই নিমাইকেষ্ট। নিমাইয়ের শ্বশুর হাওড়ার এক ঢালাই কারখানার ম্যানেজার। তিনিই জামাইয়ের চাকরি জুটিয়ে পাড়াগাঁ থেকে মেয়েজামাই উদ্ধার করে আনলেন। কারখানা থেকে ঘর দিয়েছে, বাসা সেখানে। কিন্তু নিজের ভাল নিয়েই নিমাইকেষ্ট খুশি নয়—বড়ভাইটা কত বছর আগে শহরে এসে উঠেছে, তার খোঁজ নিচ্ছে তন্নতন্ন করে। কোথায় থাকে সে, কি করে, রোজগারের টাকাকড়ি যায় কোথায়—

সুধামুখীর কাছে হাত ঘুরিয়ে নফরকেষ্ট ভাইয়ের ব্যাখ্যান করে: কলিযুগের লক্ষ্মণ সম ভাই। খোঁজ করে করে ঠিক গিয়ে ধরেছে। নিমাই কেন যে কারখানার কাজে গেল, টিকটিকি-পুলিশের লাইন হল ওর, অঢেল উন্নতি করত।

একটা গোপন ডেরা আছে নফরাদের, এতকালের ঘনিষ্ঠতায় সুধামুখী পর্যন্ত তার ঠিকানা জানে না। কেমন করে গলির গলি তস্য গলি ঘুরে পনের-বিশটা নর্দমা লাফিয়ে পার হয়ে আঁস্তাকুড়-আবর্জনা ভেঙে নিমাইকেষ্ট সেখানে গিয়ে হাজির।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে ভাইয়ের অবস্থার মোটামুটি আন্দাজ নিয়ে নিল। স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞাসা: চাকরিটা কোথায় তোমার দাদা?

থতমত খেলে সন্দেহ করবে। যেমন যেমন মুখে আসে, নফরকেষ্ট চাকরিস্থলের ঠিকানা বলে দেয়।

নিমাইকেষ্ট মেনে নিয়ে চুপচাপ চলে গেল। পরদিন আবার এসেছে। থমথমে মুখ। নফর প্রমাদ গণে।

গিয়েছিলাম দাদা তোমার আপিসে। বিস্তর লোকের বড় আপিস বললে—দেখলাম বিস্তরই বটে। লোক নয়, গরু আর মহিষ জাবনা খাচ্ছে। চাকরিটা কি তোমার—খাটালের গরু-মহিষের জাবনা মাখা?

নফরকেষ্ট তাড়াতাড়ি বলে, বাড়ির নম্বরের হেরফের হয়েছে, ওর পাশের বাড়িটা—চুয়ান্ন নম্বর।

সেইরকম ভেবে আমিও দু-পাশের বাড়ি দুটোয় খোঁজ করেছি। একটায় চুল কাটার সেলুন—চুল ছাঁটে দাড়ি কামায়। আর একটি মেসবাড়ি—দি গ্রান্ড প্যারাডাইস লজ।

নিমাইকেষ্ট মুখে কথা বলে, আর দুহাতে ভাইয়ের জিনিসপত্র কুড়োয়। এইদিক দিয়ে বড় সুবিধা, একটা বোঁচকায় সমস্ত ধরে গেল। বোঁচকা বড়ও নয় এমন কিছু। হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে ডাকে: চলো—

—কোথায় রে?

বাসা হয়েছে হাওড়ায়, তোমার বউমা এসেছে। বাড়ির বউ মজুত থাকতে ভাসুর হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাবে—ছি ছি করবে লোকে জানতে পারলে।

ফলাও করে নফরকেষ্ট বাসায় নিয়ে তোলার কাহিনীটা বলত। বড় সহজে

সেটা হয়নি, পাকছাট মেরেছে সে বিস্তর। নিমাইকেষ্ট তখন হাত চেপে ধরল। সে আরো বেশি পালোয়ান। গায়ের জোরে হিড়হিড় করে ট্রামে তুলে এবং অবশেষে বাসায় ঢুকিয়ে দিয়ে তবে সে হাতের কব্জি ছাড়ে। জেলখানায় ঢোকানো বলছে কেন আর তবে!

নফরকেষ্ট বাড়িয়ে বলত নিঃসন্দেহে, এতদূর কখনও হতে পারে না। সুধামুখীর কাছে ভালমানুষি দেখানো—বুঝতে সেটা আটকায় না। বয়স হয়ে গিয়ে পুরানো কাজকর্মে জুত করতে পারছে না। থানার শনির দৃষ্টি তদুপরি। বাউন্ডুলেপনা ছেড়ে নফরা ঘরসংসারে চেপে পড়ল।

ছোট ভাই নিমাই তাই করে তবে ছেড়েছে। বাসায় তুলে ক্ষান্ত হয় নি, শ্বশুরকে ধরে কারখানায় একটা কাজও জুটিয়ে দিল। হায়রে কপাল, নফরকেষ্ট পাল চাকরে মানুষ রীতিমত। চাকরি করে বলে আগে সে লোকের কাছে ধাপ্পা দিত—কিন্তু কথা তো ক্ষণে-অক্ষণে পড়ে যায়, অন্তরীক্ষের ভগবান তথাস্তু বলে দিলেন। চাকরির গুঁতোয় লবেজান এবারে দিনের পর দিন। আটটায় ভোঁ বাজলে হন্তদন্ত হয়ে কারখানায় ছোট। গলিত লোহা—লোহা কে বলবে, তরল আগুন—বালতি বালতি এনে ঢালছে ছাঁচের মধ্যে। ঢালছে অবিরত, লহমার বিরাম নেই—কলেই সমস্ত করে। নফরকেষ্টকে খাড়া দাঁড়িয়ে নজর রাখতে হয়। ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়, তাপে তারও দেহ এইবারে বুঝি গলে টগবগ করে ফুটবে। পিঠ চুলকাতে কিংবা গায়ের ঘাম মুছতে ভয় করে—হাতের চাপে সুসিদ্ধ হাড়-মাস-চামড়া বিচ্ছিন্ন হয়ে খাবলা খাবলা উঠে আসবে হাতের সঙ্গে। সন্ধ্যেবেলা টলতে টলতে বাসায় এসে পড়ে, তারপরে আর উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকে না। ছুটির দিনে যে একটু-আধটু বেরোয়, ভাইবউ সেটা পণ্ড করবার জন্যে আগেভাগে একশ গণ্ডা কাজের ফরমাস দিয়ে রাখে। আর বাসায় ফিরে ঘরে পা ঠেকানো মাত্র ছোট ভাইয়েরও হাজার গণ্ডা। বলো তা হলে, জেলখানার বাকি থাকল কিসে?

গোড়ার আমলে নফরকেষ্ট এমনি সব বলত। ইদানিং আর বলে না, ধাতস্থ হয়ে এসেছে। বলে, ভালমানুষ না হয়ে আমি টাকার মানুষ হতে গিয়েছিলাম, টাকায় সব কিনব। কিন্তু টাকা হল না, হবার ভরসাও নেই। এবারে মানুষ ভাল হয়ে দেখি। সংসারের বাজারটা আমি করে দিই। নিমাইএর বউ মান্যগণ্য করে বেশ, পিঁড়ি পেতে ভাত বেড়ে সাজিয়ে এনে দেয়। সন্ধ্যের পর পাড়ার ক্লাবে গিয়ে কোন দিন তাসে বসে যাই। কোন দিন বা থিয়েটারের রিহার্শাল দেয়, শুনি তাই বসে বসে। মাইনেও ফি বছর দু-তিন টাকা করে বেড়ে যাচ্ছে।

তবে আর কি! সংসার পোষ মানিয়ে ফেলেছে। এখন হয়তো মাসে একবার আসে, এর পর ছ-মাসেও আসবে না। টাকাপয়সার প্রত্যাশা ছাড়, মানুষটারই চোখের দেখা মিলবে না। হয়তো বা সারা জীবনের মধ্যে নয়—রাজাবাহাদুরের মতো। ভাল হয়ে গেছে নফর, বলবার কিছু নেই। প্রশংসারই ব্যাপার।

সুধামুখী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, বউ এল বাসায়?

উঁহু, আসেনি এখনও। আসার বেশ খানিকটা ভাব হয়েছে। আমার এক

খুড়তুত বোনের বিয়ে হল শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে—বোনকে নাকি আমার চাকরির কথা জিজ্ঞাসা করেছিল।

প্রত্যয়-ভরা কণ্ঠে বলে, আছি আমি লেগে পড়ে। আসতেই হবে—না এসে যাবে কোথায়, হারামজাদি? আজ না হয়তো কাল। বয়স তারও বাড়ছে, রূপের গুমোর আর বেশিদিন নয়। পাড়ার ছোঁড়ারা, আগে তো শুনতে পাই ঘরের চারদিকে ঘুরঘুর করত, শিয়াল তাড়ানোর মতো হাঁকডাক করতে হত রাত্রে। এখন একটাবার বেড়ায় ঘা পড়ে না, নাক ডেকে ঘুমোয়। আমারও ইদিকে বছর বছর মাইনে বেড়ে যাচ্ছে। ধর্মপত্নী হয়তো ঠিক একদিন এসে উঠবে।

পারুল ছোট বোনের মতো, সুধামুখীর সকল সুখ-দুঃখের কথা তার সঙ্গে।

ভাঙা আসর কোনদিন আর জমবে না পারুল। থুতু ফেলতেও কেউ আসে না। আলো নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে বসে থাকা এবার থেকে।

ফোঁস করে পারুল নিঃশ্বাস ছাড়ে। মেয়ে হওয়ার পর থেকে তাকেও ভয়ে ধরেছে। বলে, ত্রিভুবনে আমাদের আপন-কেউ নেই। সবাই সুখের পায়রা, সুখের দিনে ঘরে এসে বকবকম করে চলে যায়। শ্বশুরবাড়ি যদি পড়ে থাকতাম, রমারম টাকাকড়ি আসত না, গয়নাগাঁটি গায়ে উঠত না। কিন্তু গয়না-টাকায় মন ভরে না দিদি, সুখ আসে না।

পারুলের বয়স আছে, যৌবন আছে। তার আসর অন্ধকার হতে অনেক দেরি। লোকের সামনে কত ঠাকঠমক! সর্বাঙ্গে দোলন দিয়ে হাসে—খিক-খিক খুক-খুক। কিন্তু আড়ালে-আবডালে এমনি হয়ে যায়। আলাদা মানুষ—আমোদস্ফূর্তির মুখোসখানা ঘরের তাকে খুলে রেখে যেন সুধামুখীর কাছে এসে বসেছে, সন্ধ্যাবেলা আবার পরবে।

বলে মেয়েটা বড় হচ্ছে, ওর দিকে তাকিয়ে প্রাণে জল থাকে না দিদি। বিয়ে-থাওয়া দিতে পারব না, সারা জীবন শতেক হেনস্থা সয়ে বেড়াবে।

সুধামুখী সান্ত্বনা দেয়ঃ এমন খাসা মেয়ে, বিয়ে হবে না কে বলল! বয়সকালে আরও কী রকম শ্রী-ছাঁদ খুলবে দেখিস।

ম্লান হেসে পারুল বলে, এই মায়ের মেয়ে কে ঘরে নিতে যাবে বল। মায়ের পাপে মেয়ের খোয়ার। আমার মেয়েও যে ঠিক আর পাঁচটা মেয়ের মতো, এ কথা কেউ বুঝে দেখবে না।

খপ করে সুধামুখীর হাত চেপে ধরলঃ তুমি যদি বউ করে নাও সাহেবের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে। বড় ভাব দুটিতে, একসঙ্গে বেড়ায়—

আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সুধামুখী হেসে বলে, চখাচখী—যেমনধারা পদ্যে লিখে থাকে। একরত্তি ছেলে আর একফোঁটা মেয়ে, সমবয়সি খেলার সাথী—তুই একেবারে প্রেমিক-প্রেমিকা ধরে নিলি রে! বিয়ে না হলে মেয়ে অন্নত্যাগ করবে, ছেলে দেশান্তরী হবে—উঁ?

পারুল বলে, এড়িয়ে গেলে শুনব না দিদি। এখনই কে বলছে, কথাবার্তা হয়ে

থাক আমাদের। সাহেবকে আমি নিতে চেয়েছিলাম, দাওনি সেদিন। এবার আমার রানীকে দিতে চাচ্ছি, নিয়ে যাও।

সুধামুখী ধমক দিয়ে ওঠেঃ আস্ত পাগল তুই একটা। মায়ের দুধের গন্ধ এখনও মুখে—সেই মেয়ের বিয়ের ভাবনা লেগে গেল। বিয়ে না দিলে অরক্ষণীয়া মেয়ে ঘর ভেঙে বেরিয়ে যাচ্ছে। বড় হতে দে, তখন দেখবি সাহেব তো সাহেব —কত ভাল ভাল সম্বন্ধ হুমড়ি খেয়ে পড়বে। সাহেবের কথা উঠলে তুই-ই হয়তো তখন নাকচ করে দিবি।

হত তাই দিদি, না হবার কিছু ছিল না, আমি কালামুখী যদি ওর মা না হতাম। পণ দিয়ে দানসামগ্রী সাজিয়ে আমার ঐ একটা মেয়ের বর খরিদ করে আনতাম। কিন্তু আমার টাকা কলঙ্কের টাকা। বরের বাপের মনে মনে ইচ্ছে হলেও সমাজের ভয়ে পেরে উঠবে না।

চোখে আঁচল-ঢাকা দিল পারুল। কিন্তু পারুলের সঙ্গে যতই ভাবসাব থাক, সুধামুখী কথা দিতে পারে না। ছেলে নিয়ে তার সমস্ত আশা। রূপে যেমন গুণেও একদিন সাহেব সকলের সেরা হবে। সকলের মান্য হবে। এখনই বোঝা যায়, ছেলের টান কত তার উপরে! কিসে একটু সাশ্রয় হবে সেজন্য আঁকুপাঁকু করে ঐটুকু ছেলে। বিয়ে সাহেবের কি এই ঘরের ঐ রানীর মতো মেয়ের সঙ্গে। কত সুন্দর বউ নিয়ে আসবে, সে মতলব মনে মনে সুধামুখীর ছকা রয়েছে।

চোখ মুছে পারুল বলে, কী দুর্বুদ্ধি হল, কেন যে এসেছিলাম মরতে? মেয়েটার একটু সাজতেগুজতে সাধ, তা আমি একটা ভাল কাপড় পরতে দিইনে—নোংরা জায়গার দশ শয়তানে রংতামাশা করবে তাই নিয়ে। এর চেয়ে সমাজের মধ্যে শ্বশুরের ভিটেয় নুন-ভাত খেয়ে যদি থাকতাম, সে ছিল ভাল। মানসম্ভ্রম ছিল তাতে। দায়ে-বেদায়ে পাড়াপড়শিরা ছিল। বড্ড অনুতাপ হয় দিদি।

আমার হয় না।

কণ্ঠস্বরে চমকে গিয়ে পারুল তার মুখের দিকে তাকায়। সজোরে ঘাড় নেড়ে সুধা-মুখী বলে, কোনদিন আমার হয়নি। কিসের অনুতাপ! কলঙ্ক চাপা দিয়ে ঘরে থাকার মতো যন্ত্রণা নেই। সর্বদা আতঙ্ক, কখন কি ঘটে, কে কখন কি বলে বসে। মানুষ সুযোগও নিয়েছে ভয় দেখিয়ে। আজকে ঢাকাঢাকি নেই। আমি সত্যি সত্যি যে-মানুষ, তারই স্পষ্টাস্পষ্টি চেহারা। অনেক সোয়াস্তি এতে, অনেক আরাম।

পারুল প্রতিবাদ করে বলে, এ তোমার মুখের অহঙ্কার। ছোট বোনের কাছে মিথ্যে বলছ তুমি। কতদিন কাঁদতে দেখেছি তোমায়। আমায় দেখে চোখের জল মুছেছ।

দূর পাগলি, সে বুঝি অনুতাপে। আমার পয়লা নম্বর প্রেমিকটার কথা মনে পড়ে যায় মাঝে মাঝে। "জীবনে মরণে তোমার"—কেমন মিষ্টি করে বলত। প্রেমের কথা কতই তো শুনেছি, কিন্তু অমন মিঠে গলা কারো পেলাম না। পাগল হয়ে যেতাম, বুকের মধ্যে তোলপাড় করত। সারাক্ষণ তার পথ চেয়ে থাকতাম।

একটু থেমে ম্লান হেসে সুধামুখী বলে, তারপরে সেই বিপদের লক্ষণ দেখা দিল।

আঁচটুকু পাওয়া মাত্র "জীবনে-মরণে" সুড়ুৎ করে সরে পড়ল। পুরুষমানুষের সুবিধে আছে—"না" বলে ঝেড়ে ফেলে দিয়েই পার পেয়ে যায়। প্রমাণ হবে কিসে? মেয়েদের দুটো রাস্তা—হয় নিজের মরণ, নয়তো সেই বিপদের মরণ। বিপদ কাটিয়ে এসে দিব্যি আবার জমিয়ে আছি। সেই মানুষের দেখা পাবার জন্য আকুলি-বিকুলি করি। পথের দিকে তাকিয়ে ভাবি, এতজনে ঘোরাফেরা করছে—সে একটিবার আসে না!

পারুল গভীর কণ্ঠে বলে, আজও তাকে ভুলতে পার নি?

ভুলি কেমন করে? হাত নিশপিশ করে, সামনে পেলে খ্যাংরার বাড়ি মারি ঘা কতক। কিন্তু আসবে না সে। হয়তো কোন লাটবেলাট এখন! কোন দেশ-নেতা। এমনি তো আখছার হচ্ছে।

পারুল চুপ করে থাকে খানিকক্ষণ। সহসা নিশ্বাস ফেলে বলে, মানুষ খুন করলে তো ফাঁসি হয়। আমাদেরও খুন করেছে। খুনেই শোধ যায় নি, মড়া নিয়ে খোঁচাখুঁচি করে খুনেরা এসে। এতে আরও বেশি করে ফাঁসি হবার কথা।

সুধামুখী বলে, ফাঁসি দেয় ওরা সাদামাঠা মানুষ মারলে। খুন করার জন্যে আবার সুখ্যাতিও হয়। খুব বেশি খুন করলে ইতিহাসে জায়গা দিয়ে দেয়।

ঠাণ্ডাবাবুর কথাগুলো। কদিন মাত্র এসে কত রকম ভাবনাই দিয়ে গেছেন। খবরের-কাগজের পাতা-ভরা লড়াইয়ের কথা—মানুষ মারার খবর। তখন আর মানুষ নয় তারা—শত্রু। একজন-দুজন কিম্বা পাঁচজন-দশজন নয়—রেজিমেণ্ট। শত্রু মারবার কত রকম কলকৌশল, বৈজ্ঞানিকেরা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে তাই নিয়ে গবেষণা করছেন—

পারুলের পোষা কাকাতুয়া সহসা ও-ঘর থেকে বলে ওঠে, কৃষ্ণ-কথা বলো—

হেসে ফেলে সুধামুখী: ঠিক একেবারে মানুষের সুরে বলে উঠল। তুই যা শিখিয়েছিস, সেই বাঁধা বুলি বলছে। সমস্ত কিন্তু বলতে পারে ওরা। হ্যাঁ, সত্যি। আগেকার দিনে বলত—রূপকথায় পুরাণো পুঁথিপত্রে রয়েছে। এখনও পারে ঠিক তেমনি। এই কাকাতুয়া বলে নয়, সমস্ত জীব-জন্তু পারে। বলে না কেন জানিস?

পারুলের মুখের উপর মুখ তুলে তীব্র স্বরে বলে, ঘেন্না করে ওরা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে। মানুষের উপরে মানুষ যেমন নৃশংস, কোন ইতর জানোয়ারেরা সে রকম নয়।

রানীর বড্ড বাহার খুলেছে দু-কানে দুই মাকড়ি পরে। বলে দেয়, ইহুদি-মাকড়ি এর নাম। সাহেব হাঁ করে তাকিয়ে আছে। কথায় কথায় ঘাড় দোলানো রানীর অভ্যাস, মনের খুশিতে আজ বেশি করে দোলাচ্ছে। ঘাড় দোলানির সঙ্গে মাকড়ি দুটো দোলে, আর যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে। কী সুন্দর—মরি, কত সুন্দর হয়েছে রানী নতুন গয়না পরে। হঠাৎ যেন বড়সড় হয়েছে। বয়সে দু-বছরের ছোট, তবু যেন সাহেবের চেয়ে সে অনেকখানি বড়। চালচলনে বড়দের ভাব। মেয়েছেলে কেমন আগে বড় হয়ে যায়। বড্ড কড়া মা পারুল, ফ্রক পরা বন্ধ করে দিয়েছে—

নাকি আর থাকে না স্বকে, বিশ্রী দেখায়। শাড়ি পরে রানী—শাড়ি পরেই হঠাৎ বড় হয়ে পড়ল। রানী যেন আলাদা মানুষ আজকাল।

ভ্রূভঙ্গি করে সাহেব বলে, সাহস বলিহারি তোর রানী। কানে গয়না ঝুলিয়ে নেচে বেড়াচ্ছিস।

রানী অবাক হয়ে তাকায়।

বুঝতে পারছিস নে?

রানী বলে, গয়না পরব না, তবে মা টাকা খরচ করে কিনে দিল কেন?

কত টাকা রে?

রানী ঘাড় দুলিয়ে চোখ বড় বড় করে বলে, তা দশ টাকা হবে। নয়তো পঁচিশ টাকা। সোনা, হীরে, মুক্তো বসানো কিনা।

রানীর কানের পিঠে হাত রেখে হাতের উপর সাহেব ঘুরিয়েফিরিয়ে মাকড়ি দেখল। হীরে এই বস্তু! কোহিনুর হীরকের কথা পড়া আছে—জিনিস আলাদা হোক, জাত সেই একই বটে! বুকের মধ্যে জ্বালা করে ওঠে!

চাট্টি মুড়ি খেয়ে আছে সাহেব, সুধামুখীর তা-ও নয়। সন্ধ্যার মুখে কাল সুধামুখী বলল, সর্দি জমে বুকের মধ্যে পাথরের মতো ভারী হয়ে আছে, উপোস দিলে টেনে যাবে। উপোস প্রায়ই দেয় আজকাল। রাতের পর রাত। কিন্তু ঐ সর্দি কিছুতেই টানে না। এ সমস্ত বাইরের কাউকে জানতে দেবে না সুধামুখী, পারুলকেও না। কথায় আছে, নিত্যি মরায় কাঁদবে কে? তোমার বাড়ি নিত্যিদিন যদি মরতে থাকে, শেষটা কাঁদবার লোক পাওয়া যাবে না আর। তাই হয়েছে, দুঃখের কাঁদুনি লোকের কাছে গাইতে লজ্জা লাগে।

কিন্তু সুধামুখীর না হয় সর্দিজ্বর, ছেলেমানুষ সাহেবের কি? তার যে ক্ষিধে লাগে, ভাত না খেলে পেটই ভরে না। সুধামুখী বলে, জ্বরে কাঁপুনি ধরেছে, রাঁধতে যেতে পারছি নে বাবা। রাতটুকু মুড়ি খেয়ে কোন রকমে কাটিয়ে দে। সকালে উঠেই ফ্যানসা-ভাত রেঁধে দেব। গরম গরম ভাত, আলু-ভাতে, ঝিঙে-ভাতে—

মুড়িও এত ক'টি মাত্র ঠোঙায়। কলাইয়ের বাটিতে সেগুলো ঢেলে দিয়ে জ্বরাক্রান্ত সুধামুখী কিন্তু লেপ-কাঁথার নিচে গেল না। ভাদ্র মাসের টিপিটিপি বৃষ্টির মধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে দীর্ঘ গলিটা শেষ করে বড়রাস্তার মোড় অবধি গিয়ে দাঁড়ায়। সাহেব বোঝে সমস্ত। দোমহলা-তেমহলার বাবু-ছেলেপুলের মতো ভ্যাবা-গঙ্গারাম নয় এরা। সেই মোড় থেকে সুধামুখী পথচারী কাউকে নিয়ে আসবে ঘরে।

সাহেব মুড়ি ক'টা চিবিয়ে ঢকঢক করে জল খেয়ে ততক্ষণে ঘাটে চলে গিয়েছে। রানীকেও নিয়ে বসে কখনোসখনো, কিন্তু মেয়েটা ভালমন্দ খেয়ে তো ঢেকুর তুলছে, তাকে ডাকতে আজ ভাল লাগল না। ঘাটের পাকা পৈঠার উপর একলা বসে নৌকো দেখে। ঘুম ধরলে কোন জায়গা নিয়ে শুয়ে পড়ে। রাস্তার মোড়ে সুধামুখী তখন আর একটা মেয়ের গলা ধরে হাসিতে গলে পড়েছে। হাসে আর সতর্কভাবে তাকিয়ে দেখে, চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল কিনা কেউ। তা যদি হল, বাড়ির দিকে ফিরবে

এবার। এক-পা দু-পা চলে, আর আড়চোখে তাকায়—মানুষটা পিছন ধরল কিনা। একা একা ঘরে ফিরতে হলে কাল সকালে ফ্যানসা-ভাতের লোভ দেখিয়েছে,—সেই বস্তু হয়ে উঠবে না। জ্বর আরও বাড়বে, জ্বরের তাড়সে মাথা ছিঁড়ে পড়বে ঃ মাথা একেবারে তুলতে পারছিনে সাহেব, কেমন করে রাঁধতে বসি বল্ তুই।

কাল রাত্রে সাহেব মুড়ি চিবিয়ে আছে আর হীরে-মুক্তোর মাকড়ি দুলিয়ে বেড়াচ্ছে রানী। চোখ জ্বালা করে—অসহ্য চোখ মেলে গয়নার বাহার দেখা। সাহেব বলে, কানের মাকড়ি খুলে রাখ রানী। দেমাক দেখিয়ে বেড়ানো ভাল নয়।

সাধ করে রানী দেখাতে এসেছে, সাহেবের কথায় মর্মাহত হল। রাগ হয়ে গেল। মাথা ঝাঁকি দিয়ে জেদ করে বলে, না —। মাকড়ি দুলে ওঠে।

তোর ভালর জন্যেই বলি। মজা টের পাবি কানের নেতি ছিঁড়ে নিয়ে যাবে যখন।

রানী সবিস্ময়ে বলে, মাকড়ি আমার—কে নিতে যাবে? এত টাকা দিয়ে মা কিনে দিয়েছে—

নেয় না? গেরোনের দিনে কি হল সেবার—পাথরপটির ভিতরে; একজনের গলা থেকে মবচেন নিয়ে নিল না? তুইও তো ছিলি সেখানে।

ঠিক বটে। রানীর মনে পড়ে গেল। কত লোক জমে গিয়েছিল, কত হৈ-চৈ!

সাহেব বলে, কত দিকে কত সব চোর জুয়োচোর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। একটানে ছিঁড়ে নেবে। নেতি ছিঁড়ে ফাঁক করে ফেলবে, রক্ত বেরুবে গলগল করে। কানে আর কোনদিন গয়না পরতে হবে না।

রক্ত বেরোক, আর নেতি কেন গোটা কানই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক, রানী তাতে বিচলিত নয়। কিন্তু সারা জীবনে যে কানের গয়না পরা হবে না, তার চেয়ে বড় দুঃখ আর নেই।

পারুলের কাছে গিয়ে রানী সেই কথা বলল, সাহেব-দা আজ বড্ড ভয় দেখিয়েছে, কান ছিঁড়ে মাকড়ি নিয়ে নেবে নাকি।

কথাটা ভাল করে শুনে পারুলও ঘাবড়ে যায়। খাঁটি কথা বলেছে। এতখানি তার মনে আসে নি, অথচ আশ্চর্য দেখ ছেলেমানুষটার হুঁশজ্ঞান! বলে, গয়না গেলে গয়না হবে। একখানার জায়গায় পাঁচখানা হতে পারে। তার জন্য ভাবিনে। কিন্তু একটা অঙ্গের খুঁত হয়ে থাকলে সেটা বড় লজ্জার কথা। যেমন কুসুমের নাম হয়ে গিয়েছিল আঙুল-কাটা কুসি। ডাব কাটতে গিয়ে দায়ের কোপ আঙুলে মেরে বসেছিল। যদ্দিন না মরণ হল, আঙুলকাটা শুনতে শুনতে কান পচে গেল কুসির। আমার কাছেই কেঁদেছে কত।

মাকড়ি নিজেই খুলল মেয়ের কান থেকে। বলে, রেখে দে তুই, আর পরিস নে। কানফুল কিনে দেব, নাকছাবি কিনে দেব, যে গয়না ছিঁড়ে নিতে পারে না। মাকড়ি যায়, সেটা কিছু নয়। কান ছিঁড়ে যাবে, লোকে কান-কাটা কান-কাটা করবে—কান-কাটা রানী। সর্বনেশে কথা। বিয়ে দেওয়া যাবে না। ঠাকুরদেবতারা একটা খুঁতো পাঁঠা বলি নিতে চান না, খুঁতো কনে কোন বর নেবে?

তালপুজো সেদিনটা। অমাবস্যা তিথি, তার উপর মঙ্গলবার পড়েছে, ভাদ্রমাস তো আছেই। মা-কালীর ডালির সঙ্গে একটা করে তাল দিতে হয়, তাল পেয়ে দেবী মহাতুষ্ট হন। এতগুলো যোগাযোগ প্রতিবছর ঘটে না, মন্দিরে আজ তাই বড় মচ্ছব। দূর-দূরান্তর থেকেও মানুষ এসে ভিড় করেছে। বাহারের সাজপোশাকে ধাঁধা লাগে চোখে।

সুধামুখীর জ্বর ও মাথাধরা তেমনি চলছে। শুয়ে ছিল, সন্ধ্যার মুখে উঠে পড়ল। সাহেবকে বলে, ভরা অমাবস্যা, তায় ভাদ্দরমাস। তার উপরে এত বড় পরব। পুরোদস্তুর নিশিপালন আজ বুঝলি রে সাহেব? তেষ্টার জলটুকু ছাড়া কিছু নয়।

আরও কি কি যেন বোঝাতে যাচ্ছিল, গলা আটকে আসে, হাহাকারের মতন একটা আওয়াজ বেরোয়। জলের ঘটিটা নিয়ে সুধামুখী দ্রুতপায়ে বাইরে চলে যায়। জল থাবড়াল খানিকটা মাথায়, ভিজা চুলে তেল দিল। চুল আঁচড়াচ্ছে, রঙিন শাড়ি বের করেছে। এতক্ষণে সামলে নিয়ে বলে, মাকে আজ একমনে ডাকতে হয়—মাগো, ভাত-কাপড় দাও, সুখ-শান্তি দাও। উপোসি থেকে খুব ভক্তিভাবে বল্ দিকি—ছেলে-মানুষের কথা আজকের দিনে মা ফেলবেন না, যা চাইবি ঠিক তাই ফলে যাবে।

কাল চাট্টি মুড়ি হয়েছিল, অদৃষ্টে আজ তা-ও নেই বোঝা যাচ্ছে। নিরম্বু উপোস। সাহেব ক্ষেপে গেল: মিছে কথা তোমার, খেতে না দেবার ছুতো। কাল কেন তবে মুড়ি খেতে হয়েছে? ভাত আমি চাই। ভাত রেঁধে দেবে, নয় তো রান্নাঘরের হাঁড়িকুড়ি ভেঙে তছনছ করব। পারুল-মাসি নিতে চেয়েছিল, আমি জানি সমস্ত। কত যত্ন করত। রানীকে কত কি কিনে দেয়, আমাকেও দিত। কেন আমায় দাওনি তখন!

সুধামুখী বলে, মা হয়ে ছেলে পোষানি দেব?

মা না হাতি। চালাকি করে মা হয়ে আছ। শুনতে আমার বাকি নেই। পরের বাচ্চা গঙ্গা থেকে কুড়িয়ে এনে মা! চোরাই-মা তুমি।

সুধামুখী আকুল হয়ে কেঁদে পড়ে: এত বড় কথা বললি তুই সাহেব—পারলি বলতে?

নিঃশব্দে সুধামুখী কাঁদতে লাগল। কথা-কাটাকাটি করে না, এই কলহের একটি কথাও বাইরে চলে না যায়। বাড়িটা এমনি, মজার গন্ধ পেয়ে ভিড় হয়ে যাবে, কাজকর্ম ফেলে মেয়েরা এসে জুটবে। রসাল জিজ্ঞাসা নানা রকম। সাহেবের দিকে সবাই, শতমুখে সুধামুখীর নিন্দা করবে: আক্কেল দেখ না! আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। নাদুসনুদুস সোনা হেন ছেলেটাকে না খেতে দিয়ে সলতে করে তুলেছে!

সাহেব রান্নাঘরে হাঁড়িকুড়ি ভাঙতে যায় না, সুধামুখীর দিকে বার কয়েক তাকিয়ে বাড়ি থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়ল। চুপচাপ ঘাটের উপর গিয়ে বসে। মায়ের গর্ভ থেকে নেমেই ভাসতে ভাসতে একদিন যে ঘাটে এসে লেগেছিল। বন্ধু জুটেছে সমবয়সি কয়েকটা ছোঁড়া, ঘাটের বাঁধানো সমতলের উপরে একটু গর্ত খুঁড়ে নিয়ে গুলি

খেলে সকলে মিলে। ঘাটের মণ্ডপের ছাতে কলেকৌশলে উঠে গিয়ে ঘুঁড়ি উড়ায়। হঠাৎ এক সময় তড়াক করে লাফিয়ে পড়ে তীরবেগে ঘুঁড়ি ধরতে ছোটে। নৌকোঘাটা ঠিক পাশে বলে মাঝিমাল্লাদের এই ঘাটের উপর দিয়ে যাতায়াত। সাহেব তাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলে গল্প শোনার লোভে। ফুটফুটে ছেলেটা দেখে তারা কাছে ডাকে। ডেকে কত সময় নৌকোর উপর নিয়ে যায়। গল্প শোনা সাহেবের নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। কত কত গহিন নদী, কত অজানা দেশভুঁই। মালপত্র খালি করে নৌকো আবার ভেসে ভেসে চলে যায়। অমনি করে তারও নতুন নতুন জায়গায় ভেসে বেড়াতে ইচ্ছে করে।

ঝিঙে হল বস্তির ছোঁড়াদের সর্দার। এই বস্তির মালিক ফণী আঢ্যির ছোট ছেলে। ঝিঙে ছাড়া আরও দুই ছেলে ফণীর। দুনিয়ায় আসা যেমন করে হোক দুটো পয়সা রোজগারের জন্য, ভগবান সেই জন্য নরজন্ম দিয়ে পাঠান—ফণী আঢ্যি হামেশাই এই কথা বলেন। এবং ভগবৎ-ইচ্ছা পূরণের জন্য অহরহ লেগে পড়ে আছেন। ছেলে কোনটা কোথায় পড়ে রইল, খোঁজ নেবার সময় পান না। বাড়ি-ওয়ালার ছেলে—সেই খাতিরে, এবং নিজের গুণপনার জন্যে ঝিঙে ছোঁড়াদের মধ্যে মাতব্বর।

ঝিঙে ডাকে, ক্যলীবাড়ি চল সাহেব। আমরা যাচ্ছি।

না।

কত লোক এসেছে দেখতে পাবি। কত মজা।

ভাল লাগছে না। জ্বর হয়েছে আমার, শুয়ে পড়ব।

পারুলও আজ বাড়ি থেকে বেরুল। বড়রাস্তার মোড় অবধি এসে অন্য সকলে দাঁড়িয়ে পড়ে—মা-কালী করুন, পারুলের তেমন দশা কোন দিন যেন না ঘটে। মোড় ছেড়ে হেঁটে হেঁটে সে মন্দির অবধি চলে এসেছে। আলো দেখছে, দোকানপাট দেখছে,—কত রকমের মানুষ এসে আড়ম্বরের পুজো দিচ্ছে—ঘুরে ঘুরে তা-ও দেখল কতক্ষণ। যেখানে মানুষের ভিড় সেইখানে পারুল। ভিড়ের মানুষ অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখবে সেই ব্যবস্থা আজ অঢেল রকম করে এসেছে! সারা বেলান্ত খেটেছে দেহটা নিয়ে। খাটুনি মিছা হয় নি পায়ে পায়ে সেটা বুঝতে পারে। এই রকম এক-একটা বিশেষ দিনে পারুল বেরিয়ে পড়ে। ঘুরে-ফিরে দেখে-শুনে বেড়ায়। মানুষ টানবার ক্ষমতা বেড়েছে না কমে গেছে গত বছরের তুলনায়, তারও বুঝি একটা পরীক্ষা করে দেখে। একটা-দুটো লোক যেন খিমচি কেটে তুলে নিয়ে আসে জমাট ভিড়ের গা থেকে। খেয়ালি মেয়েমানুষ। লোক পিছনে তো ইচ্ছে করেই পারুল উল্টো-পাল্টা এদিক-সেদিক নিয়ে দুনো তেদুনো পথ ঘুরিয়ে মারে। কষ্ট হোক বেশি, কষ্ট বিনে কেষ্ট মেলে না। ছিটকে পড়ে কিনা দেখাই যাক। একবার-বা পিছনে ফিরে, বন্ধন ইতিমধ্যে কিছু ঢিলে হয়ে থাকে তো, চোখের নজরে মুচকি হাসিতে আঁটসাট করে নেয় সেটা। ঢুকল এসে গলিতে, পেঁছিল বাড়ির দরজায়। হঠাৎ তখন মারমুখি হয়ে পড়ে: পথের জঞ্জাল আদাড়-আঁস্তাকুড় বাড়ি ঢুকবার শখ তোমার! বেরো, বেরো—। পরখ যা করবার, হয়ে গেছে। অথবা মনে ধরল তো মোলায়েম কণ্ঠ:

আসুন না ভালবাসা, মন্দ বাসায় ঢুকে পড়ুন। টেনে নিয়ে তুলল সাজানো ঘরে—ঘরের খাটের বিছানায়। কত খেলায় এমনি! অজানা নতুন রাজ্যে দিগ্বিজয়ের আনন্দ।

রানীও মায়ের সঙ্গে। শাসন যতই হোক, মচ্ছবের দিনে মেয়েটি মুখ চুন করে একলা বাড়ি পড়ে থাকবে, সেটা হয় না। কোন প্রাণে পারুল মানা করতে যাবে। কেউ যদি পিছন ধরে তো রানীকে বলে দিতে হবে না, আপনা থেকেই ভিন্ন পথে এগিয়ে চলে যাবে। যেন মা-মেয়ে নয়—নিতান্তই পথের পথিক, কোনরকম জানা-শুনো নেই দুইয়ের মধ্যে। কোন অবস্থায় কেমন ভাব দেখাতে হবে, ছেলেমেয়েদের এখানে হাতে ধরে শেখাতে হয় না।

মন্দিরে যাবার ইচ্ছা সুধামুখীরও। কিন্তু বৃষ্টির পশলা, গায় জ্বর, আপাদ-মস্তক দেহটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে একেবারে। হেন অবস্থায় ভয় হল অতদূর হাঁটতে। তার চেয়েও বড় ভয়—হাত-মুখে রং মেখে সজ্জা করেছে, উজ্জ্বল আলোয় কারসাজি সমস্ত ধরা পড়ে যাবে। গলির মুখে প্রতিদিনের সন্ধ্যাবেলার আলোআঁধারি জায়গাটিতে গিয়ে দাঁড়াল। ভিড় কিছু পাড়ার মধ্যেও ছিটকে এসে পড়েছে। মা-কালীর উদ্দেশে জোড়হাতে সুধামুখী বারম্বার কান্নাকাটি করেঃ পার্বণ শুধু তোমার মন্দিরে কেন মা, আমার ঘরেও যেন ছিটেফোঁটা এসে পড়ে। আমার সাহেবের মুখে চাট্টি চাল ফুটিয়ে ধরতে পারি যেন মা।

সাহেব গঙ্গার ঘাটে। সুড়ুৎ করে এক সময় বস্তিবাড়িতে ঢুকে পড়ল। সব ঘরের মানুষ বেরিয়ে পড়েছে, দরজায় দরজায় শিকল তোলা। গিয়েছে বেশির ভাগ কালী-বাড়িতে, দু'চারজন মোড়ের উপর। এজমালি ভৃত্য মহাবীর—ভৃত্য বটে, আবার খানিকটা অভিভাবকও বটে! সে লোকটাকেও দেখা যায় না, গিয়ে মচ্ছবে জমে পড়েছে ঠিক। সন্ধ্যাবেলাটা এখন পাহারা দেবার কিছু নেই, মানুষজন আসতে লাগেনি যে এটা-ওটার ফাইফরমাস হবে। নির্ভাবনায় কোনখানে গিয়ে সে আড্ডা জমাচ্ছে!

অবিকল এমনিটাই ভেবে রেখেছে সাহেব। নিশ্চিন্ত। কাজও সাব্যস্ত হয়ে আছে—লাইনের সর্বশেষে পারুল-মাসির ঘরে। দেখেশুনে রেখেছে, তবু ঠিক কাজের মুখটায় সতর্কভাবে আর একবার দেখে নেওয়া উচিত। ঘরের ওপাশে ফাঁকা জায়গা-টুকুতে কয়েকটা গাঁদা দোপাটি ও পাতাবাহারের গাছ। ঠাণ্ডাবাবু সেই আমচারা পুঁতে গিয়েছিলেন, বিস্তর ঝড়ঝাপটা খেয়েছে—সেবারের আশ্বিনের বড় ঝড়ে পুরানো পাঁচিলের খানিকটা ভেঙে পড়েছিল চারাগাছের উপর—সামলে উঠে ডালপালা মেলে দিব্যি এখন তেজীয়ান হয়েছে! সেই গাছের উপর চড়ে সাহেব উঁকিঝুঁকি দেয়—এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে দেখতে পাওয়া যায় কি না, দেখছে কি না কোন লোক। নিঃসংশয় হয়ে এবার বারাণ্ডায় উঠে পড়ল।

ওরে বাবা, কত বড় তালা ঝুলিয়ে গেছে দেখ দরজায়। আদিগঙ্গার ওপারে লক্ষপতি মহাজনদের বড় বড় আড়ত, তারা কখনো এইরকম আধমনি তালা ঝুলায় না। কী করা যায়, কী করা যায়! ঝিঙেটা বাহাদুরি করে, সে নাকি হামেশাই এসব করে থাকে। আর সাহেব, ধরতে গেলে, নিজের ঘরেই কাজ করতে এসে হার স্বীকার করে ফিরে যাবে?

খোঁজাখুঁজি করে পেয়ে গেল কয়লাভাঙ্গা ভারী লোহাখানা। ঠিক হয়েছে। দু হাতে তুলে তালার উপর দেবে মোক্ষম বাড়ি। একের বেশি দুটো বাড়ি লাগবে না। কাছে-পিঠে মানুষ নেই যে শব্দ শুনে রে-রে—করে আসবে। অসে যদি, তারও উপায় ঠিক আছে। আমগাছ বেয়ে উঠে দেবে লাফ পাঁচিলের ওপারে। পাঁচিল টপকানো ব্যাপারটা সাহেবের খুব রপ্ত। সাধারণ যাতায়াতের ব্যাপারেও এই পথ বেশি পছন্দ তার। দরজার ছোট্ট খোপ গলে আর দশটা মানুষের মতো চলাচল সে কালেভদ্রে করে থাকে।

লোহাটা তুলে নিয়ে চতুর্দিক আরও একবার দেখে নেয়। মালকোঁচা সেঁটে নিল। তাড়া খেয়ে দ্রুত যদি পাঁচিলে উঠতে হয়, ঢলঢলে কাপড়ে বেধে বিপর্যয় ঘটাতে পারে। হাতিয়ারপত্র সহ রীতিমতো বীরমূর্তি। তালাটা হাতে ধরে ঘুরিয়ে দিচ্ছে, ঠিক জায়গায় বাড়িটা যাতে লাগে—

হরি, হরি! হাতে ছুঁতে না ছুঁতে তালা হাঁ হয়ে পড়ে। পুরানো বাতিল বস্তু, কোনগতিকে একটুখানি চেপে দিয়ে চলে গেছে। তালার সাইজ দেখেই চোর আঁতকে উঠে সরে পড়বে—ক্ষেতের মধ্যে যেমন খড়ের মানুষ দাঁড় করিয়ে কাক-পক্ষী তাড়ায়। সাহেব খলখল করে হাসে। পারুল-মাসি দশ টাকা কিম্বা পঁচিশ টাকা দিয়ে হীরে-মুক্তোর মাকড়ি কিনে দিয়েছে, দরজার জন্য চার গণ্ডা পয়সারও একটা তালা কিনতে পারে না!

বড় হয়ে এই দিনের ঘটনা নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা নিজেদের মধ্যে। সাহেব বলত, তালা ঠিকই ছিল, তালোদ্ঘাটিনী মন্ত্রে খুলে গেল। এখন সেটা বুঝতে পারি, সেদিন অবাক হয়েছিলাম। তালোদ্ঘাটিনী অতি প্রাচীন মন্ত্র—বলাধিকারী মশায় বলেন, বেদের আমলেও এই পদ্ধতি চলত? শাস্ত্রে প্রমাণ রয়েছে তার। নাকি মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তালা আপনি খুলে পড়বে। এ লাইনের ভাল ভাল মুরুব্বিদেরও, ঠিক এই বস্তু না হোক, তালা খোলার নানারকম তুকতাক জানা। এক রকম পাতার রস তালার ছিদ্রে ঢেলে দিলে তালা খুলে পড়ে! শিকড়ও আছে, বুলিয়ে দিতে হয়। সমরাদিত্য-সংক্ষেপ নামে পুঁথিতে গল্প আছে—গুরু-শিষ্যকে তালা ভাঙার মন্ত্র দিচ্ছেন, কিন্তু চুক্তি হচ্ছে কদাপি সে মিথ্যা বলতে পারবে না। কথা রাখতে পারল না শিষ্য, দৈবাৎ মিথ্যা বলে ফেলেছে। ফল অমনি হাতে হাতে। তালা ভেঙে যেইমাত্র ঢোকা, গৃহস্থ ক্যাঁক করে ধরে ফেলেছে। মোটের উপর এই একটা কথা। রীতিমতো নিষ্ঠাবান হতে হবে আপনাকে, নইলে চোরের দেবতা কার্তিকেয়র অভিশাপ লাগবে, যত সতর্কই হন নিশ্চিত ধরে ফেলবে ঘরের ভিতর।

সাহেব তাই বড়াই করে বলে, আমার কি রকম নিষ্ঠা দেখ ভেবে। রানীর সঙ্গে এত ভাবসাব, আমাদের দুজনের জুড়ি দেখে সবাই বর-বউ বলত। আদর্শ বউয়ের যেমনটি হতে হয়—রানীর সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার সব কথা আমার সঙ্গে। তবু দেখ তারই ঘরে কাজের বউনি আমার। অবলীলাক্রমে ঘরে ঢুকে গেলাম। পারুল-

মাসির সাজানো বড়ঘরের পাশে ছোট্ট ঘরখানা—পোষা কাকাতুয়া, বাক্স-পেঁটরা, কাপড়-চোপড় ও পানের সরঞ্জাম থাকে। সন্ধ্যাবেলাটা বড়ঘর ছেড়ে রানী এসে এখানে আস্তানা নেয়, তার ধনসম্পত্তি যাবতীয় সেখানে।

পুতুলের বাক্সে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে রানী মাকড়ি রেখেছে, সমস্ত জানা। লুকিয়ে রেখে গেছে। ঘরে ঢোকা, গয়না নিয়ে বেরুনো এবং তালা যেমন ছিল তেমনিভাবে লাগিয়ে রাখা—পলক ফেলতে না ফেলতে হয়ে গেল। পাঁচিল টপকে সাহেব সাঁ করে সরে পড়ল। ডুবে গেল তালপুকুরের মচ্ছবে। একবারও যে বাড়ি ঢুকেছিল, কেউ তা জানতে পারবে না।

পরবর্তী কালের সুবিখ্যাত সাহেব-চোর—ডাঙায় হোক, জলে হোক পরিচ্ছন্ন নিখুঁত একখানা কাজ দেখলেই লোকে বলত নিশিরাত্রে সাহেব-কুটুম্ব এসে গেছে নিশ্চয়। ভাঁটি অঞ্চলের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে সন্ধ্যাবেলা সুর করে যার নামে ছড়া কাটত—

কচ্ছপের খোলা দুয়ারে—
সাহেব চলল শহরে।
কুচে-কচ্ছপ-কাঁকড়া
সাহেব পালায় আগরা।
শিং-নড়বড়ে বোকা দাড়ি

চৌকি দেচ্ছেন আমার বাড়ি।
আম-শিমের অম্বল
কাঠ-শিমের ঝোল
সাহেব-চোর যায় পলায়ে
বুড়ি ভদ্রার কোল।

সেই সাহেবের পয়লা দিনের কাজ এই। রানীর সাধের মাকড়িজোড়া হাতের মুঠোয় নিয়ে ঘুরছে। যায় কোথা এখন, মাল সামলাবার উপায়টা কি?

সাহেব-চোরের পয়লা দিনের কাজ। জীবনের পাপ বল, দোষত্রুটি বল, এই তার সর্বপ্রথম। অনেক কাল পরে বলাধিকারীকে সে বলেছিল রানীর মাকড়ি-চুরির এই কাহিনী। আনুপূর্বিক শুনে তো হো-হো করে হেসে ওঠা উচিত! কিন্তু না হেসে তিনি সবিস্ময়ে তাকালেন: আদর্শ মাতৃভক্তি—মায়ের কথা ভেবেই ভালবাসার জনের মনে দুঃখ দিতে সঙ্কোচ হয়নি।—তুলনা করা ঠিক হবে না—তবু আমার বিদ্যাসাগর মশায়ের কথা মনে পড়ল। আরও বিস্তর বড় বড় লোকের কথা। মায়ের আশীর্বাদে তাঁরা সব বড় হয়েছেন। তুমিও বড় হবে সাহেব, এই আমি বলে দিলাম।

এত বলেও বলাধিকারীর উচ্ছ্বাস থামে না। আবার বললেন, মহৎ মানুষের ভাল ভাল কাজকর্মের কথাই পুঁথিপত্রে লেখে। চোরের কথা কে লিখতে যাবে? পুণ্যের বড় মান, পাপ হোক খানখান—গালি দিয়ে, থুঃ-থুঃ করে থুতু ফেলে সকলে সামাজিক কর্তব্য সেরে যায়। ভালমানুষ হয় অন্যের কাছে। মানুষের ভিতর অবধি তলিয়ে দেখবার চোখ আছে ক-জনার?

কৌতুক-চোখে সাহেব পিছনের এইসব দিনের পানে তাকিয়ে এসেছে। সত্যি সত্যি সাহেব একসময় খুব বড় হল, নামডাক হল প্রচুর। সাহেবচোর বলতে একডাকে চিনে ফেলত ভাঁটি অঞ্চলের মানুষ। পয়লা কাজে মাতৃআশীর্বাদ পেয়েছিল, তারই ফলে বোধ হয়। সুধামুখীর চোখ ফেটে জল এসেছিল, তালপুজোর রাত্রে চাল-ডাল কিনে এনে সাহেব যখন তার হাতে দিল। সাহেবের মাথায় হাত রেখে বিড়বিড় করে কি বলল খানিক। কিন্তু সুধামুখীকে মা-ই যদি বলতে হয় তো চোরাই-মা। সেই মায়ের আশীর্বাদে সন্তান বড় জ্ঞানী, বড় গুণী হয় না—হয় মস্তবড় চোর। সাচ্চা মা হলে সাহেবও সাচ্চা মানুষ হত—যাঁদের নামে লোকে ধন্য-ধন্য করে। তাঁদের পাশাপাশি না হোক, পায়ের নীচে বসবার ঠাঁই পেত।

সেইদিন আরও এক মাতৃভক্তির গল্প করলেন বলাধিকারী। সুবিখ্যাত কাপ্তেন কেনা মল্লিক, তার বড় ভাই বেচারামের। মহামান্য সরকারের বিচারে ফাঁসি হয়েছিল তার। আঙুল ফুলে কলাগাছ বলে—এই বেচা মল্লিক শালগাছ হয়েছিল। কাজের শুরুতে চোরও নয়, চোরাই মাল বয়ে আনার মুটে মাত্র। চোরেদের সঙ্গে গিয়ে পদ্ধতিটা তীক্ষ্ম নজরে দেখত। চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের জোরে সেই মানুষটা কালক্রমে ধুরন্ধর হয়ে উঠল, জলের পুলিস, ডাঙার পুলিস ঘোল খাইয়ে বেড়িয়েছে একাদিক্রমে সাত-আট বছর। এমনি সময় তার উপর রোমহর্ষক এক খুনের চার্জ এল। খুন করা নিয়ম নয় এদের। মহাপাপ—সমাজে অপাংক্তেয় হতে হয় ইচ্ছায় হোক দৈবক্রমে হোক মানুষ খুন হয়ে গেলে। তার উপরে মেয়ে খুন। মেয়েমানুষের উপর তিল পরিমাণ অত্যাচার হলে ওস্তাদের অভিশাপ লাগে, সর্বনাশ ঘটে যায়। সমস্ত জেনে বুঝে বেচারাম মুক্তাময়ী নামে ধনী ঘরের রূপসী মেয়েটাকে খুন করল—যে মেয়ে বেচারামের জন্য পাগল হয়ে ঘর ছেড়ে এসেছিল। খুন না করে উপায় ছিল না। প্রণয়ে হতাশ হয়ে মেয়েটা দলের কথা ফাঁস করে দিয়েছিল পুলিশের কাছে।

সরকার বাহাদুর বেচারামের মাথার মূল্য ধরে দিলেন দু-হাজার টাকা। জীবিত হোক, মৃত হোক, যে জুটিয়ে এনে দেবে তার এই লভ্য। বুঝুন এবারে। যে লোক সিঁধেল চোরের পিছু পিছু ঘুরে বমাল মাথায় বয়ে সমস্ত রাত্রে আটআনা রোজগার করেছে, সেই মাথাটারই আজ এই দাম উঠে গেছে।

পাঁকাল মাছের মতো বিস্তর কাল পিছলে পিছলে বেড়িয়ে অবশেষে একদিন বেচারাম ধরা পড়ল। সরকারের সবচেয়ে মোটা যে পদ্ধতি তারই প্রয়োগে এ হেন প্রতিভাধরের মর্যাদার ব্যবস্থা হল। ফাঁসি। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে যতক্ষণ না তুমি দম আটকে মারা যাও—জজের রায়ের বাঁধুনিটা এই প্রকার।

আঁতুড়ঘরে বেচারামের মা মারা গিয়েছিল। মানুষ করেছে সৎমা—যার গর্ভে কাপ্তেন কেনা মল্লিকের জন্ম। ফাঁসির আগে সেই বিধবা সৎমা দেখতে এল। এমন শক্ত মানুষ বেচারাম, কিন্তু আজ সে হাপুসনয়নে কাঁদছে। সৎমায়ের পায়ের কাছে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে : বড় অভাগা আমি মা। বুকের দুধ কত খাইয়েছ, একবার দুধের ঋণ শোধ করে যেতে পারলাম না !

সে এমন, জেলখানার মানুষ যারা পাহারায় ছিল, তারা অবধি চোখের জল ঠেকাতে পারে না। বাড়ির পিছনে তেঁতুলগাছটার কথা বলে, ছোটবেলা ওর ছায়ায় কত খেলা করেছে। বড় টান ঐ গাছের উপর। বলে, ফাঁসির পর মড়া তোমাদের দিয়ে দেবে মা। তেঁতুল-কাঠে পোড়ায় যেন আমায়। গোড়াসুদ্ধ গাছটা উপড়ে ফেলবে, চিহ্ন না থাকে। পোড়াতে যা লাগে, বাদ বাকি সমস্ত কাঠ গাঙের জলে ভাসিয়ে দেবে। মাটির উপর ঐ গাছ থাকতে আমার মুক্তি নেই, অপদেবতা হয়ে ডালে বাসা করতে হবে। গাছ থাকলে তোমারও তো যখন তখন আমার কথা মনে আসবে। কাঁদবে নিরালায়।

শেষ ইচ্ছা তেঁতুলগাছ উপড়ে ফেলা, তেঁতুল-কাঠে দাহ করা। উপড়াতে গিয়ে আসল মতলব পাওয়া গেল। তেঁতুলের শিকড়বাকড়ের মধ্যে ঘটিভরা মোহর। বেচারাম পুঁতে রেখেছে। মায়ের দুধের ঋণ শোধ দিয়ে গেল, মৃত্যুর সামনে একমাত্র মায়ের কথাই সে ভেবেছে।

মাকড়িজোড়া সাহেবের হাতের মুঠোয়। যায় কোথা এখন, মালের কোন ব্যবস্থা করে ?

বেশ খানিকটা গিয়ে আদিগঙ্গার কিনারে রেলের পুলের পাশে প্রাচীন এক শিবমন্দির, এবং আনুষঙ্গিক বাগানে দু-পাঁচটা ফলসা গাছ। সাহেব ঐখানে পেয়ারা খেতে আসে। বাগানের ধারে সরু গলির সঙ্কীর্ণ অন্ধকার ঘরে এক খুনখুনে বুড়ো স্যাকরা দিনমানেও প্রদীপ জেলে ঠুকঠুক করে সোনারুপোর গয়না গড়ে। সে বুড়োর যেন খাওয়া নেই, ঘুম নেই—সাহেব যখনই যায়, কাজ করছে সে একই ভাবে। কাজ করে একাকী—এতদিনের মধ্যে একবার মাত্র সেই ঘরে একটি দ্বিতীয় মানুষ দেখেছে।

বড়রাস্তার ভিড়ের দোকানে যেতে ভরসা পায় না, ভেবেচিন্তে ছুটল সেই স্যাকরার কাছে। এমন পার্বণের দিনে ধর্মকর্মে বুড়োমানুষেরই বেশি করে যাওয়ার কথা। সন্দেহ ছিল পাওয়া যাবে কি না যাবে। কিন্তু স্যাকরামশায় ঠিক তার কাজে—মেজের মাটির উপর নিচু হয়ে পড়ে মুচির আগুনে প্রাণপণে ফুঁ পাড়ছে।

পিছন ফিরে ছিল। চৌকাঠে সাহেব যেইমাত্র পা ঠেকিয়েছে, গুটানো সাপ যেমন করে ফণা তুলে ওঠে, স্যাকরামশায় চক্ষের পলকে তেমনি খাড়া হয়ে মুখ ফেরাল সাহেবের দিকে।

কে তুমি কি নাম ? কোথায় থাক ? কেন এসেছ, এখানে কী দরকার বল।

সাহেবের আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে দেখে সঙ্গে সঙ্গে সুর বদলে যায়।

বলে, বস তুমি। মালটাল এনেছ নাকি, না এমনি জিজ্ঞাসা করতে এসেছ?

বাঁচা গেল রে বাবা! সাহেবকে কোন ভূমিকা করতে হল না। বলে, একজোড়া মাকড়ি নিয়ে এসেছি। নেন যদি আপনি।

কার মাকড়ি?

আমার মার।

এ ছাড়া অন্য কি বলা যায়! ঢোক গিলে নিয়ে বলে, মায়ের বড় অসুখ, ওষুধ-পথ্যি হচ্ছে না। মা-ই তখন বের করে দিল—

ছোট ছেলের মুখে এত বড় দুঃখের কথা শুনেও স্যাকরা কিন্তু ফ্যা-ফ্যা করে হাসে: বটেই তো! দায়েবেদায়ে কাজে লাগবে বলেই তো গয়না গড়িয়ে লোকে টাকা লগ্নি করে রাখে। অসময়ে বের করে দেয়। তা বস তুমি, ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসে কাজ হয় না। মাদুরটা টেনে নিয়ে বসে পড়।

ফুঁ পাড়া বন্ধ করে দু-হাতে ঝেড়েঝুড়ে এবারে ভাল হয়ে ঘুরে বসল বুড়ো: দাও কি জিনিস দেখি—

হাতে নিয়েই ভ্রু কুঁচকে তাকায়: তোমার মায়ের বয়স কত বাপধন?

অ্যাঁ—

এই যখন মায়ের গয়না, মা আর বেটা একবয়সি তোমরা। কোন কারিগর গয়না গড়িয়েছে, তার নামটা বল দিকি।

মুচকি হাসছিল এতক্ষণ, এইবার সে দুলে দুলে হাসতে লাগল। সাহেব রাগ করে বলে, এত খবরাখবর কিসের জন্য? পছন্দ হলে উচিত দামে নিয়ে নেবেন। না হল তো তা-ও বলে দিন।

হাসি থামিয়ে স্যাকরা বলে, জিনিসটা হাতে করে এসেছ, পরখ করে তবে দেখিয়ে দিই। মনে আর সন্দ থাকে কেন?

কষ্টিপাথর বের করে মাকড়ির একটা কিনারে ঘষল বার কয়েক। পাথরখানা সাহেবের দিকে এগিয়ে ধরে। সগর্বে বলল, দেখতে পাচ্ছ? পাথর ঠুকে বলতে হয় না, চোখের নজরেই বলে দিতে পারি। জিনিস সোনা নয় বাপধন, পিতল। এই কর্ম করে করে বয়স চার কুড়ি বছর পার হয়েছে, বিরাশিতে পা দিয়েছি। জোচ্চুরি করে পিতল গছাতে এসেছ—বুড়োমানুষটা ধরতে পারবে না, উঁ?

সাহেব আগুন হয়ে বলে, জোচ্চোর আমি নই। কক্ষনো না। না বুঝতে পেরে এসেছি, আমাদেরই ঠকিয়ে দিয়েছে। দিয়ে দিন ওটা, চলে যাই।

স্যাকরা বলে, চটে যাচ্ছ বাপধন। কাঁচা বয়সে মানুষ হয় এমনি রগচটা।

কাঠের হাতবাক্স থেকে দুটো টাকা দিল সাহেবকে: নিয়ে যাও—

পাথরের দাগ দেখে সাহেব কিছু বোঝেনি, সোনা চিনবার বয়স নয় তার। এবার ভাবছে, বুড়োরই ভাঁওতা। বলে, শুধু যদি পিতলই হয়, দাম তবে কিসের।

টাকার সঙ্গে স্যাকরা মাকড়ি দুটোও দিয়ে দিল। বলে, ষোলআনা পিতল—সোনা একরত্তিও নেই। এ জিনিস আর কোথাও বেচতে যেও না। জোচ্চোর ভাববে, গণ্ডগোলে পড়তে পার। নিতান্ত দায়ে পড়েছ বলেই আমার কাছে এসে

উঠেছ। সেটা বুঝি বাপধন। শুধু হাতে ফেরানো যায় না, সেই জন্যে এই সামান্য কিছু। একেবারে দিচ্ছিনে কিন্তু। দান আমার কুষ্ঠিতে নেই, কারবার তাহলে লাটে উঠবে। সময় হলে শোধ দিয়ে যেও। কেমন?

শুনে সাহেব হতভম্ব হয়ে যায়। সুধামুখী বলেছিল, মা-কালীকে ডাকবি আজ এই পার্বণের রাত্রে, মনস্কামনা পূর্ণ হবে। সত্যিই তো সেই ব্যাপার। ক্ষিধের চোটে ব্যাকুল হয়ে ঠাকরুনের কাছে খেতে চেয়েছিল। মা-কালী স্যাকরা বুড়োর উপর ভর করে চালের দাম দিয়ে দিচ্ছেন। নইলে চেনা নেই, জানা নেই, কে এমন লোক টাকা দেয়! টাকা একটা নয়, দু-দুটো।

বলে, টাকা শোধ দিয়ে যেতে বলছেন—না-ই যদি দিই? নাম একবারটি জিজ্ঞাসা করলেন, তারও তো জবাব নিলেন না।

বুড়ো বলে, জবাব নিয়ে কি করব? নাম একটা বলতে, সেটা বানানো নাম। পয়লা দিন অজানা লোকের কাছে সত্যি নাম-ঠিকানা কেউ বলে না। নিতান্ত হাঁদারাম বলে বলে হয়তো। আমি তোমায় না-ই জানলাম, আমার আস্তানা তোমার জানা হয়ে রইল। শোধ দেবার অবস্থা হলে এইখানে এসে দিয়ে যেও। হাসতে হাসতে আবার বলে, সত্যি কথাই বলেছ, জোচ্চোর নও তুমি—চোর। হ্যাঁ বাপধন, চোখে দেখেই ধরতে পারি, মুখে কিছু বলতে হয় না। যেমন ঐ মার্কাড়ি পাথরে ঠোকার আগেই বলে দিলাম, মেকি জিনিস। নিতান্ত কাঁচা চোর, নতুন কাজে নেমেছ। মাল সরাতে শিখেছ, কিন্তু হাত বুলিয়ে সোনা-পিতলের তফাত ধরতে পার না। ঘাবড়াবার কিছু নেই। কত ছেলে দেখলাম—আজকে আনাড়ি, দুটো দিন যেতে না যেতে পুরো লায়েক। লাইনে যখন এসেছ, আমাদের সঙ্গে কারবার রাখতে হবে। আমার কাছে না এসো, অন্য কোথাও যাবে। টাকা দুটো তোমায় শোধ করে যেতে হবে না। ঋণ নয়, ধরো ওটা দাদন দিয়ে রাখলাম। মাল দিয়ে রুমারুম টাকা গুণে নেবে, তাই থেকে দুটো টাকা কেটে নেব আমি তখন। তা সে বিশ-পঁচিশ দিনে হোক, আর বিশ পঁচিশ বছরেই হোক।

চাল কিনেছে, তার উপর আলাদা এক ঠোঙায় ডাল একপোয়া। সেই রাজসূয় আয়োজন হাতে করে সাহেব বাড়ি এল। সুধামুখী ফেরে নি। সাহেব পাঁচিল টপকে বেরিয়েছিল ঢুকেছেও, সেই পথে। বড়রাস্তার মোড় হয়ে আসবার উপায় নেই। মা-মাসিরা রয়েছে, ছেলেমানুষের যাওয়ার বাধা আছে এখন। কাঠ-কাঠ উপোসের কথা হচ্ছিল—সেই জায়গায় চাল ফুটিয়ে ভাত বানিয়ে ভরপেট খাওয়া, ভাতের সঙ্গে আবার ডাল। কিন্তু যে-মানুষটি চাল ফোটাবে সর্দিজ্বর নিয়ে বৃষ্টিজলের মধ্যে সে দাঁড়িয়ে আছে এই তো কয়েক পা মাত্র দূরে। গিয়ে সে হাত ধরে টানবেঃ এস মা, আজ-কাল-পরশু তিন দিনের যোগাড় হয়ে গেছে, তিনটে দিন জিরেন নিয়ে অসুখটা সেরে ফেল, রান্নাঘরে এসে নির্ভাবনায় উনুন ধরাও······কিন্তু হবার জো নেই।

একসময় সুধামুখী ফিরে এল। একাই ফিরেছে, অবসন্নভাবে থপথপ করে আসছে।

সাহেব ডাকে, মাগো, মাগো, শুতে গেলে হবে না। দেখবে এস—ডাল-চাল এনেছি। রান্না চাপাও এইবার—আমি খাব, তুমি খাবে।

সাহেব উচ্ছ্বাস ভরে বলে, সেই যে তুমি বললে, তার পর মা-কালীকে খুব করে ডাকতে লাগলাম ঃ কত মানুষ এসে তোমায় কত কি ভোগ দিয়ে যাচ্ছে, আজকের দিনটা নিশিপালন করিও না। ঠিক কথাই বলেছিলে মা, পালাপার্ব্বনের দিন ঠাকুর খুব জাগ্রত থাকেন—ডালা-নৈবিদ্য-টাকাপয়সা বিস্তর পড়ে তো! আমার দরবার কানে পৌঁছে গেল—চাল আর ডাল দিয়েছেন এই দেখ।

কী রকমটা হল সুধামুখীর—সাহেবের মাথায় হাতখানা রেখে চোখ বোজে। ঠোঁট নড়ছে, বিড়বিড় করে বলছে কি যেন।

সামলে নিয়ে তারপর বলে, কে দিল এসব?

বললাম তো, মা-কালী দিয়ে দিলেন। বুড়োথুখুড়ে একজনের হাত দিয়ে। মানুষটার নাম জানি নে, দেখে থাকি মাঝে মাঝে। আমায় সে কাছে ডাকল—

দিব্যি তো বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারে! নিজের ক্ষমতা দেখে সাহেব অবাক।

মানুষটা কাছে ডেকে গায়ে হাত বুলিয়ে মোলায়েম সুরে বলল, মুখ শুকনো তোমার, খাওয়া হয় নি বুঝি? হাত ধরে হিড়হিড় করে দোকানে নিয়ে চাল কিনে দিল। আর খাঁড়িমুসুরির ডাল। তার মধ্যে ঠিক ঠাকুর ভর করেছিলেন, মানুষে তো এমন করে না। কি বল মা?

খাওয়াদাওয়া বেশ হল মাকালীর দয়ায়। চালই যখন জুটেছে, ভান্দুরে অমাবস্যায় উপোসি থেকে পুণ্যার্জনের কথা আর ওঠে না।

খেয়েদেয়ে সাহেব গঙ্গার ঘাটে চলল। বাইরে বাইরে ঘোরে এ-সময়টা—ঘাটে যায়, রানী ঘুমিয়ে না পড়লে যায় সেখানেও। অনেক রাত্রি অবধি ঘোরাঘুরি করে তারপর একসময় শুয়ে পড়ে।

আজ সুধামুখী মানা করল ঃ যাসনে কোথাও সাহেব। ঘর খালি, কী দরকার? সকাল সকাল আমার পাশে আজ শুয়ে পড়।

মা-কালী এমনি যদি দয়া করে যান আর কয়েকটা বছর! মা আর ছেলে নিত্যদিন তবে সন্ধ্যারাত্রে শুয়ে পড়বে। সাহেব বড় হয়ে গেলে তখন তো মজা—পায়ের উপর পা দিয়ে বসে ছেলের রোজগার খাবে। খাওয়াচ্ছে ছেলে সেই তো ক'দিন বয়স থেকে। অল্পবয়সে বিয়ে দেবে সাহেবের—টুকটুকে বউ আনবে, ঘুরঘুর করে বউ বাড়িময় বেড়াবে……

শুয়ে পড়েছে সাহেব বড়খাটের একপাশে। মাকড়িজোড়া গাঁটে, পাশ ফিরতে বারবার গায়ে ফুটছে। ঝুটো গয়না গাঁটে কেন বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, তাই ভাবে। গঙ্গায় ছুঁড়ে দিলেই আপদের শান্তি।

সুধামুখীকে বলে, রানী ঐ যে গয়না পরে বেড়ায়, ও কি সোনার গয়না?

সোনা ছাড়া কি—

উঁহু, সোনা নয়। ওরা সব বলছে পিতল।

ওরা কারা সে প্রশ্ন সুধামুখী করে না। এক বাড়িতে এতগুলো মেয়ে—পরের

সাচ্চা গিনিসোনাও ঠোঁট উলটে পিতল বলে দেয়। নিজের ভাবনায় সে ব্যস্ত, নিস্পৃহ-ভাবে বলে, হতে পারে—

পরে তো পিতল, তবে তার অত দেমাক কেন?

সোনা কি পিতল রানী অতশত কি করে বুঝবে? সোনা না দিয়ে থাকে তো ভালোই করেছে। ছোট মেয়ে কি যত্ন জানে? হারাবে, হয়তো বা ধোঁকা দিয়ে নিয়ে নেবে কেউ। গয়না পরেছে না গয়না পরেছে—ছেলেমানুষের মন ভুলানো। তুই কিছু বলতে যাবি নে, কিন্তু সাহেব। রানী কষ্ট পাবে, পারুলও রাগ করবে।

সাহেব বলে, দাম নাকি দশ টাকা। পঁচিশ টাকা। দশ-পঁচিশ খেলে তো, লম্বা লম্বা অঙ্ক তাই শিখে ফেলেছে।

বলতে বলতে হঠাৎ সে অন্য কথায় চলে যায়ঃ ফলা-নানান রপ্ত হয়েছে মা, গড়গড় করে পড়ে যেতে পারি। অঙ্ক শিখব আমি এবারে, কাল থেকেই—উঁ?

সুধামুখী সায় দিয়ে বলে, আচ্ছা। সায় না দিলে ভ্যানর-ভ্যানর করবে, ঘুমুবে না।

তখন সাহেব ভাবছে, ভাল করেছি মাকড়ি গঙ্গায় না ফেলে। গয়না ঝুটো কি সাচ্চা, রানী সেটা জানে না। কোনদিন জানবে না। এক ফাঁকে ওদের ঘরের মধ্যে ঢুকে মাকড়িজোড়া রেখে আসব।

সকালেও সাহেব পারুলের ঘরের দিকে যায় নি। ঘাটে একাকী বসে। ওপারে বড় বড় আড়ত। লগি বেয়ে দূরদেশের ভারী ভারী নৌকো হেলতে দুলতে গজেন্দ্র-গতিতে আড়তের সামনের ঘাটে লাগে। দালাল-পাইকারের ভিড় জমে যায়। নৌকোর খোল থেকে বস্তা টেনে টেনে গলুয়ের উপর ফেলছে। চালের বস্তা ডাল-কলাইয়ের বস্তা লঙ্কা-হলুদের বস্তা। খচখচ করে বস্তায় বোমা মেরে চাল-কলাইয়ের নমুনা বের করে দেখে। সুঁচাল-আগা লোহার শলাকা, নালার মতন টানা-গর্ত শলাকার উপরে —এই হল বোমাযন্ত্র। মেরে দাও বোমা বস্তার উপর—নালা বেয়ে ঝুরঝুর করে কিছু মাল বেরিয়ে আসবে। বারম্বার এদিক-সেদিক মেরে পরখ করে দেখে, সর্বত্র একই মাল কি না। নমুনা হাতে নিয়ে আড়তের দালাল দরদাম করেঃ কত? ফাঁকা-ফুকো বলো না ভাই—

আঠারো সিকে—

আঁতকে ওঠে দালাল লোকটাঃ অ্যাঁ, মুখ দিয়ে বেরুল কেমন করে ব্যাপারি? আঠারো সিকে মনের চাল কেন খেতে যাবে লোকে? চাল না খেয়ে সোনা খাবে, রুপো খাবে। বাজে বলে কি হবে, পুরোপুরি চার। যাকগে থাক, আর দু-গণ্ডা পয়সা ধরে দেব। খুন করলেও আর নয়।

দরে বনল তো মুটেরা মাথায় তুলে ওপারের রাস্তাটুকু পার হয়ে গিয়ে বস্তা ধপাধপ ফেলছে আড়তের গুদামে।

সাহেব বসে বসে দেখছে। রানীর কাছে যায় নি, রানীই দেখি ঘাটে এসে দাঁড়াল। হাসি নেই মুখে, মন-মরা ভাব। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সাহেব জানে সমস্ত। তবু জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে রানী?

রানী ঘাড় নেড়ে বলে, কিছু না—

হয়েছে বই কি! তোর মুখ দেখে বুঝতে পারি। লুকোলে শুনব না।

রানী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে : হবে আবার কি! সর্দারি করতে তোকে কে ডাকছে?

তারই জন্যে রানীর মনোকষ্ট, সাহেব পুড়ে যাচ্ছে মনে মনে। দুটো-চারটে ভাল ভাল কথা বলে প্রবোধ দেবে, কিন্তু তার আগে ব্যাপারটা শুনতে হয় রানীর মুখে। নয় তো আজামোজা কিসের উপর বলে? রানী যতবার ঝেড়ে ফেলে দেয়, সাহেব তত আরও খোশামুদি করছে।

বল্ না, বল আমায়। কাউকে বলব না। যে দিব্যি করতে বলবি করছি!

রানী নরম হয়ে ছলছল চোখে বলে, মাকড়িজোড়া পাচ্ছি নে। তাকের উপর পুতুলের বাক্সে রেখেছিলাম।

রাখলি তো গেল কোথা! কাকাতুয়া নয় যে উড়ে পালাবে। মনের ভুলে অন্য কোথায় রেখেছিস, দেখ ভেবে।

পুতুলের বাক্সে রেখেছিল, রানীর স্পষ্ট মনে আছে। সাহেবের কথায় তবু দ্বিধা এসে যায়। রাখতেও পারে অন্য কোথাও, এখন মনে পড়ছে না। মা যদি জানতে পারে গয়না পাওয়া যাচ্ছে না, কেটে আমায় চাক-চাক করবে। এই সেদিন একগাদা টাকায় কিনে দিয়েছে।

কচু! সাহেবের মুখে এসে পড়েছিল আর কি—তাড়াতাড়ি সামলে নেয়। মেনেই নিল রানীর কথা, একগাদা টাকায় কেনা ঐ বস্তু।

বিপদের বন্ধু ভেবে রানী সাহেবের কাছে পরামর্শ চাইছে : কী করি বল তো সাহেব, বুদ্ধি বাতলে দে। কখন মা খোঁজ করে বসবে, ভয়ে আমার বুক কাঁপছে।

সাহেব একটুখানি ভাবনার ভান করে বলে, ঠাকুরকে একমনে ডাক।

কে ঠাকুর?

বোকার মতন কথায় সাহেব খুব একচোট হেসে নেয় : আরে আরে, ঠাকুর জানিস নে? ঈশ্বর ভগবান মা-কালী মহাদেব কার্তিক গণেশ লক্ষ্মী গরুড় ঘণ্টাকর্ণ —দু-দশজন নয়, তেত্রিশ কোটি ঠাকুর, ক'টা নাম করি। যে নামে ইচ্ছা নাছোড়বান্দা হয়ে পড় : ঠাকুর, মাকড়ি পাচ্ছি নে, খুঁজে-পেতে এনে দাও। কালীঘাটে মা-কালীর এলাকা—তাঁকেই বরঞ্চ ধর চেপে।

রানী বলে, মা-কালী খুঁজে দেবেন?

সজোরে ঘাড় নেড়ে সাহেব বলে, আলবৎ। ভক্ত যদি ঠিক মতো ধরতে পারে, আবদার রাখতেই হবে মাকে। আমার কি হল—রাত্রে চাল আর খাঁড়িমুসুরি ডালের কথা বললাম মা-কালীকে। ঠিক অমনি জুটিয়ে দিলেন। রান্নাটা শুধু করে নিতে হল মাকে। ডেকেই দেখ না মনপ্রাণ দিয়ে। ফল না পাস তো বলিস।

ফলটা ঠিক হাতে-হাতে নয়, সন্ধ্যা অবধি সবুর করতে হল। বড়ঘরের পাশে ছোট্ট একটু ঘর, তার মধ্যে পারুলের বাক্স-পেঁটরা—কাকাতুয়ার দাঁড়, পানের সরঞ্জাম, হাঁড়িকলসি, গুঁড়চের আজেবাজে জিনিস। সন্ধ্যার পর এ-বাড়ির অন্য সকলের মতো পারুলও ব্যস্ত হয়ে পড়ে, রানী গিয়ে জোটে তখন ঐ ঘরে। ঘরের দেয়ালে মাকালীর

পটের উপর মাথা ঠুকছে—জোর তাগাদা, গড়িমসি করলে ভক্তির চোটে পটের অধিকক্ষণ আস্ত থাকার কথা নয়। সেই শঙ্কাতেই বুঝি জানলা দিয়ে মা টুক করে ফেলে দিলেন, রানী ছুটে গিয়ে কুড়াল জিনিসটা—তাই তো রে, সেই মার্কাড়ি!

কী আহ্লাদ রানীর! জাগ্রত ঠাকুরের কাজ-কারবার দেখে অবাক হয়ে গেছে। খবরটা সাহেবকে জানাতে হয়, না জানানো পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই। কোথায় এখন পাওয়া যায় সাহেবকে?

সেই গঙ্গার ঘাটেই। বড় এক সাঙড়নৌকো ভাঁটার সময় মাঝগঙ্গার কাদায় আটকে আছে। মাঝি বাজার-হাট করতে নেমে পড়েছিল, সওদা করে ফিরল এবার। কাদা ভাঙতে নারাজ। জোয়ারের জল তোড়ে এসে ঢুকছে। নৌকো এক্ষুনি ভেসে উঠবে, পাড়ে এসে লাগবে। মাঝি ততক্ষণ ঘাটের উপর অপেক্ষা করছে। সাহেব কেমন করে বুঝে পাকড়াও করছে তাকেঃ গল্প বল। মাঝিমাল্লারা দূর-দূরন্তর ঘোরে, দেশ-বিদেশের মজার মজার গল্প শোনা যায় তাদের কাছে; হতে হতে রাজা দুয়োরানী শুয়োরানী রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র কোটালপুত্র সওদাগরপুত্র ব্যাঙ্গমাব্যাঙ্গমীদের রূপকথা। রানীও এসে পড়ে হুঁ-হাঁ দিচ্ছে।

জোয়ারে নৌকো ভেসে ইতিমধ্যে ঘাটে এসে যায়। গল্প থামিয়ে মাঝি এক লাফে কাদা ডিঙিয়ে উঠে পড়ল।

রানী এইবার সুখবর জানায়ঃ মার্কাড়ি পাওয়া গেছে সাহেব। কানে পরে এসেছি দেখ্ সেই মার্কাড়ি।

খুশিতে ঘাড় নেড়ে মার্কাড়ি দুলিয়ে দেখাল। বলে, মোক্ষম বুদ্ধি বাতলে দিলি তুই। যেমন যেমন বলেছিলি ঠিক সেই কায়দায় চাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল। আরো একটা জিনিস চেয়ে দেখব। মার কাছে কদ্দিন থেকে চাচ্ছি, দেয় না। ভাবছি, মাকে না বলে যা-কিছু দরকার মা-কালীকে বলব এবার থেকে।

সভয়ে সাহেব বলে, একবার হল সে-ই ঢের। ঠাকুর-দেবতাকে বার বার কষ্ট দিতে নেই।

মাথার ঝাঁকুনি দিয়ে রানী সাহেবের আপত্তি উড়িয়ে দেয়ঃ ওঁদের আবার কি কষ্ট? নড়তেও হবে না জায়গা থেকে। ইচ্ছাময়ী মা—ইচ্ছে করলেই অমনি এসে পড়বে। বেশি কিছু চাচ্ছিনে তো, চুলের ভেলভেট-ফিতে এক গজ।

ভাটার সময় আদিগঙ্গায় জল থাকে না। সেই সময় ঝিঙে ও আর তিন-চারটের সঙ্গে সাহেবও কাদা ভেঙে ওপারে গিয়ে ওঠে। পুরুষোত্তম সা'র চালের আড়ত, মস্তবড় টিনের ঘর। গাঙের খালের নৌকো থেকে বস্তা বস্তা চাল মাথায় মুটেরা গুদামে নিয়ে ফেলছে। মাঝখানের রাস্তাটা পার হয়ে যায়। চলছে তো চলছেই—পিঁপড়ের সারির মতো বওয়ার আর শেষ নাই। বস্তায় বস্তায় গুদামঘরের ছাদ অবধি ঠেকে যায়। ওরে বাবা, কারা খাবে না জানি গুদোম ভর্তি এত চাল।

পুরুষোত্তমবাবুকে দেখা যায় রাস্তা থেকে। ঢুকবার দরজার ঠিক পাশে জোড়া তক্তাপোশ—কাঠের হাতবাক্স সামনে নিয়ে তিনি তার উপরে বসেন। ডাইনে বাঁয়ে আর দু'জন ঘাড় গুঁজে বসে তারা খাতা লেখে। বিশাল ভুঁড়ি, মাথায় টাক—খালি

গায়ে থাকেন পুরুষোত্তম প্রায়ই, খুব বেশী তো হাত-কাটা ফতুয়া একটা। গলায় সোনার মোটা চেন, ডান হাতে চৌকো সোনার চাকতি এবং তামা লোহা ও রুপোর একগাদা মাদুলি। হাত নাড়তে গেলে খড়বড় আওয়াজ উঠে। নাড়তেই হয় সেই হাত অনবরত। হাতবাক্স খুলে নোটে টাকায় এই এককাঁড়ি মাঝিদের দিয়ে দিলেন। পরক্ষণেই পাইকারদের কাছ থেকে টাকা-নোটের গাদা গুণে নিয়ে হাতবাক্সে ঢোকাচ্ছেন। গাঙের জোয়ার-ভাটার মতো সারা দিনমান এই কাণ্ড চলে। ওরে বাবা এত টাকা একসঙ্গে এক বাক্সের ভিতর মানুষ জমিয়ে রাখে। চাল খুঁটতে আসে সাহেবরা। নৌকো থেকে গুদামে উঠবার সময়।

বস্তা গলে দু-চারটে চালের দানা পড়ে! কাঁচাচোখের ছোঁড়াগুলো পথের ধুলো থেকে একটা একটা করে খুঁটে কোঁচড়ে তোলে। পাখি যেমন করে ঠোঁট দিয়ে তুলে তুলে নিয়ে খায়। এই নিয়ে ঝগড়াঝাটিও প্রচণ্ড। সকলের বড় বজ্জাত ঝিঙেটা—

ফণী আড্ডির বেটা তুই কেন এসব ছ্যাঁচড়া কাজে আসিস?

এ রকম প্রশ্নে ঝিঙে হি-হি করে হাসে: বাবার সংসারে শুধু খাওয়া-পরার বরাদ্দ। এই যা হল, নিজের রোজগার। বিড়িটা-আসটার খরচা কোথা থেকে আসে? শুধু বিড়িতে শোধ যায় না, মুখের গন্ধ মারতে এলাচ-দানা চিবুই। সৎমা বেটি মুকিয়ে থাকে—হাঁ কর্ তো দেখি। মুখ শুঁকে কিছু পেলে বাবাকে অমনি বলে দেবে। ভাতের বদলে সেদিন মার—

খরচা বেশি বলে ঝিঙের প্রতাপটাও বেশি। একটা দানা দেখলে তো ছোঁ মেরে নিয়ে নেবে অন্যের সামনে থেকে। অন্য কারো কিছু হতে দেবে না, রাস্তাটুকুর উপর সর্বক্ষণ যেন নৃত্য করে বেড়াচ্ছে।

কথা হল, জায়গার বাটোয়ারা হয়ে যাক তবে। একটা ডাল ভেঙে এনে রাস্তার উপরে দাগ দিয়ে নেয়—এখান থেকে এই অবধি ঝিঙের সীমানা। এই অবধি সাহেবের, এই অবধি অমুকের—। যার কপালে যা পড়ে, এলাকার বাইরে কেউ যাবে না।

বলিহারি সাহেবের কপালজোর! ভাগাভাগির পর প্রায় তখনই একটা বস্তার ছিদ্র খুলে তার লাইনের ভিতরে ঝুরঝুর করে মাল পড়ে। মুটে সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য হাত চাপা দিল। কিন্তু ইতিমধ্যে যা পড়েছে, সে-ও এক পর্বত—পুরো মুঠোর কাছাকাছি। ঝিঙে তড়াক করে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল, অন্যগুলোও সঙ্গে আছে। সাহেব যা তুলে ফেলেছিল, কোঁচড়ে হেঁচকা টান দিয়ে ছড়িয়ে দেয়।

এ কি, আপোস-বন্দোবস্ত এই যে হয়ে গেল—

সে হল ছিটেফোঁটার বন্দোবস্ত। এখন যদি হুড়মুড় করে স্বর্ণবৃষ্টি হয়, সে-ও তুই একলা কুড়োবি নাকি?

শয়তান মিথ্যেবাদী, মরে গিয়ে কালীঘাটের কুকুর হবি তোরা—।

কিন্তু মৃত্যুর পরের ভাবনা নিয়ে আপাতত কারো মাথাব্যথা নেই, মাটিতে পড়া সাহেবের চাল তাড়াতাড়ি খুঁটে তুলে নিচ্ছে। সাহেব পাগলের মতো গিয়ে পড়ল তো ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল তাকে।

চেঁচামেচিতে গদির উপর পুরুষোত্তমবাবুর নজর পড়েছে। এই, শুনে যা—।

বাঁহাতের আঙুল নেড়ে ডাকলেন।

আছে মোট পাঁচজন, দুঃসাহসী ঝিঙে এগিয়ে যায়। পুরুষোত্তম খিঁচিয়ে ওঠেন: আগ বাড়িয়ে এলি, তোকে কে ডাকে রে হাঁড়ির তলা? ঐ যে, ঐ ধবধবে ছেলেটা— ওকে ডাকছি।

সাহেবকে ডাকেন। ঘোর কালো বলে ঝিঙেকে বললেন হাঁড়ির তলা। বড় বড় চোখ ঘুরিয়ে এমন তাকান পুরুষোত্তম, বুকের ভিতর গুরগুর করে। সাহেবের ডাক হল তো দিয়েছে সে চোঁচা-দৌড়—

পরের দিন কাজে আছে, পিছন দিক থেকে কে এসে চটিসুদ্ধ পা তুলে দিল সাহেবের পিঠের উপর, এই ছোঁড়া—

মুখ ফিরিয়ে দেখে পুরুষোত্তম। সর্বনাশ, বাবু নিজে বেরিয়ে পড়েছেন যে!

ছোঁড়া তোকে কাল ডাকলাম, গেলি নে কি জন্যে?

সাহেব ফ্যালফ্যাল করে তাকায়! পুরুষোত্তম অন্যদের দিকে ফিরে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন: বড্ড স্ফূর্তি বেধেছে। আমার চাল পড়ে যায়, সেই সমস্ত তোরা নিয়ে যাস। পালা, পালা—নয় তো পুলিসে দেব।

অপমানিত জ্ঞান করল ঝিঙে—কাল বলেছে হাঁড়ির তলা, এখন এই। ঘাড় ফুলিয়ে দাঁড়ায়: চেঁচামেচি করেন কেন মশায়? সরকারি রাস্তা—পড়ে পেলাম খুঁটে নিলাম। আপনার গুদোম থেকে যদি নিতাম, কথা ছিল।

সরকারি রাস্তা—বটে! মুখে মুখে চোপরা করিস, এত বড় আস্পর্ধা!

দরজার ধারে লাঠি হাতে দরোয়ান বসে থাকে, রাত্রিবেলা ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয়। পুরুষোত্তম তাকে বললেন, তেড়ি দেখেছ এইটুকু ছেলের! লাঠি পিটে পিণ্ডি পাকিয়ে দাও, ঘরে ফিরবার তাগত না থাকে! বলছে সরকারি রাস্তা। সরকার বাবা ওদের—ঠেকাক এসে সেই সরকার।

দু-হাতে লাঠি তুলে দারোয়ান লম্ফ দিয়ে পড়ে। দৌড়, দৌড়। আর তিনজন উধাও, বেপরোয়া ঝিঙে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে চেঁচাচ্ছে: দেখে নেব। পাড়ায় পাবো না কোনদিন? ইট মেরে তোমার টাক ভাঙব।

দারোয়ান তেড়ে যেতে একেবারে অদৃশ্য। পুরুষোত্তম গর্জন করেন: উঃ, এখনই হাপ-গুণ্ডা। দেখতে পেলে ঐ ছোঁড়ার ঠ্যাং ভেঙে খোঁড়া করে দেবে, পাকা হুকুম আমার।

সাহেবও পালাবে, উঠে পড়েছিল। হাত এঁটে ধরে আছেন পুরুষোত্তম। ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। কেঁদে পড়ল সাহেব: আর কক্ষনো আসব না, কোনদিনও না। কান মলছি বাবু, নাক মলছি। ছেড়ে দিন।

পুরুষোত্তম হেসে ফেলেন: আসবি নে কি রে? তোর জন্যেই তো তাড়ালাম ওগুলো। এটা তোর রাজ্যপাট। দেখি, কতগুলো হল আজ।

কোঁচড় নেড়ে চালের পরিমাণ দেখলেন। হতাশ সুরে বলেন, এই? রোদে তেতেপুড়ে মুখ যে টকটক করছে—এত কষ্টের এই লভ্য? চিল-কাকগুলোকে এই জন্যে তাড়ালাম, এখন তুই একেশ্বর। হ্যাঁরে, থাকিস কোথা তুই? কে কে আছে?

আঙুল তুলে সাহেব ওপারে দেখায়। পুরুষোত্তম ঘাড় বাঁকিয়ে নিরিখ করে দেখছেন ঃ কোনটা রে? ঐ তো ফণী আড্ডির বস্তিবাড়ি—আড্ডির বস্তিতে থাকিস বুঝি? নতুন এসেছিস?

নিশ্বাস ফেলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলেন, কত ঘোরাঘুরি ছিল। ব্যবসা জেঁকে ওঠার পর ইস্তফা পড়ে গেছে। দূর দূর, টাকার নিকুচি করেছে, রসকষ কিছু আর থাকে না জীবনে। চোখ তুলে এদিক-ওদিক দেখেছ কি বারো শত্তুর অমনি ফুসুর-ফুসুর করবে ঃ শামশায় তাকাচ্ছেন।

একটা আধুলি হাতে গুঁজে দিলেন পুরুষোত্তম। বলেন, কাল থেকে একলা হলি, পুষিয়ে যাবে। অন্য কেউ ঢু' মারতে এলে দরোয়ানকে বলবি, লাঠিপেটা করে পোল পার করে দিয়ে আসবে। হুকুম দেওয়া আছে আমার।

বড় ভাল লোক, বড্ড দয়া। সাহেবের মনে এলো, বাপ হতে পারে—এই মানুষটাও। নয়তো এত টান কিসের? আদিগঙ্গার উপর বাসা—পুঁটলি বেঁধে ছেলে ভাসানো কাজটা অতি সহজে এরা পারে।

গাঙে এখন ভরা জোয়ার, পোল ঘুরে যেতে হচ্ছে। পোলের মুখে দেখে ঝিঙেরা চারজন। পুরুষোত্তমকে কবে পায় না পায়—উপস্থিত তাঁর পেয়ারের মানুষ সাহেবের উপরেই কিছু শোধ তুলবে বোধহয়। কোন কায়দায় সরে পড়া যায়, সাহেব এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

ঝিঙে বলল, ঘরে ঢুকিয়ে মারধোর দিল বুঝি তোকে? তাই দাঁড়িয়ে আছি।

সর্বরক্ষে রে বাবা! নাক ফোঁত-ফোঁত করে হাঁ করে বলে দিলেই চুকে যায়, সম্পূর্ণ নিরাপদ। কিন্তু সত্যি কথাটা বেরিয়ে যায় ফস করে। এই বড় মুশকিল সাহেবের, সামান্য মিথ্যে কথা বলতেও পারে না—বিস্তর কসরতের পর তবে হয়তো একটা বেরুল। তার জন্যে নানান রকম মহলা দিতে হয় মনে মনে। বাপ-মা ঠিক সত্যবাদী ছিল—ছেলে বাপ-মায়ের মতন হয়, সেই জন্য তার বিপত্তি।

সাহেব সত্যি কথাই বলল, ও রাস্তায় একলা আমি চাল খুঁটব, ডেকে নিয়ে তাই বলে দিল।

বলেই ভয় হয়েছে। ভয়ে ভয়ে আজকের সমস্ত চাল কোঁচড় থেকে ঢেলে দেয়। চাল ঘুস দিয়ে ভাব জমাচ্ছে। বলে, তোদের তো ভালই রে, সারা বেলাস্ত রোদ-পড়া হতে হবে না। নিত্যিদিন এইখানটা এসে আমি ন্যায্য ভাগ দিয়ে যাব। সকলে মিলে আশাসুখে রোজগারে আসি—পুরুষোত্তমবাবু একচোখা, তা বলে আমরা কেন তার মতন হতে যাই।

ঝিঙে তবু প্রবোধ মানে না। নজরে পড়ে, ঠোঁট দুটো তার থরথর করে কাঁপছে। ঐ রকম ডাকাত ছেলে, ভ্যাক করে কেঁদে পড়ল সহসা। কাঁদতে কাঁদতে বলে, চেহারার গুণে তোর আদর। হাঁড়ির তলা বলে হেনস্থা করল—ঐ পুরুষোত্তম শালাও তো কালো। আমি যদি ওর ছেলে হতাম, এমন কথা বলত কখনো!

চালগুলো দিয়েথুয়ে সাহেব বাসায় ফেরে। ভাগ করে নিয়ে নিক ওরা।

আধুলিটা তার আছে। ভাগের ভাগ যে চাল পেত, আধুলি তার অনেক উপর দিয়ে যায়।

কিন্তু সে আধুলিও বুঝি রাখা যায় না। বাসায় পা দিতেই রানী এসে ডাকল, শোন সাহেব একটি কথা। শিগগির শুনে যা।

রানী ঝগড়া করেঃ ফাঁকি কথা বললি কেন সাহেব? মা-কালী কিছু নয়, একেবারে বাজে। ভেলভেট-ফিতের কথা বলছি, শখ হল জিনিসটার উপর। কত আর দাম শুনি? এদ্দিনের মধ্যে দিতে পারলেন না।

বিপদের কথা বটে! মেয়েটার কালী-পদে মতি নেওয়াচ্ছে, সেই কালীরই পশার থাকে না। সাহেবের নিজেরও পশার নষ্ট। এর পর কোন কথা বললে রানী কি আর মানতে চাইবে?

সমস্যায় পড়ে গিয়ে আপাতত সামাল দেওয়ার কথা বলে, দূর, তাই হয় নাকি রে! এত বড় পৃথিবী সৃজন-পালন করছেন, এক গজ ফিতে দিতে পারেন না তিনি! তোরই দোষ, একমনে তেমনভাবে ডাকতে পারিস নে।

রানী তর্ক করেঃ পারি নে তো সেদিন মাকড়িজোড়া আদায় করলাম কেমন করে? সেদিন যে সমস্ত কথা যেমন করে বলেছিলাম, ঠিক ঠিক তাই তো বলি।

ইতিমধ্যে সাহেব অজুহাত খুঁজে পেয়েছে। বলে, মাকড়ি যা বললে হয়, ফিতে তাতে কেন হবে? মালে তফাৎ রয়েছে না? বলি, কার্তিকপুজোর যে মন্তোর লক্ষ্মীপুজোর কি তাই? আমার কথা বিশ্বাস না হয়, পারুলমাসিকে দেখ জিজ্ঞাসা করে।

জিনিসটা এতই সরল যে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হয় না। রানী সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিলঃ তবে কি হবে? ফিতের জন্য কোন কায়দা করতে হবে, বলে দে আমায়।

বারম্বার চাচ্ছিস তো, তোয়াজটা বাড়িয়ে করাই ভাল। কথাবার্তা নয়, মন্তোর। সে মন্তোর আমার কাছে আছে।

সাহেব ছুটে গিয়ে নিজের ভাণ্ডার থেকে মন্ত্র নিয়ে আসে। এক রকমের সিগারেট বাজারে খুব চালু—কালী সিগারেট। পুরুষোত্তমবাবু খুব খান। শেষ হয়ে গেলে বাক্স ছুঁড়ে ফেলে দেন বাইরে। সাহেব কয়েকটা কুড়িয়ে এনেছে। মা-কালীর ছবি বাক্সের উপর। হাতে খাঁড়া আর কাটা-মুণ্ড, গলায় মুণ্ডমালা, মাথার চুল সমস্ত পিছনটা কালো করে পদতল অবধি নেমে এসেছে। শিবঠাকুরের বুকের উপর—লজ্জায় সেজন্য টকটকে জিভ কেটে আছেন। ঠিক যেমনটি হতে হয়, একেবারে সত্যি-কার মা-কালী। ছবি ছিঁড়ে সাহেব সেঁটে দিয়েছে ঘরের দেয়ালে। পরে লক্ষ্য হল, ছবি ছাড়াও স্তব ছাপা রয়েছে বাক্সের ওদিকটায়। ভারি চমৎকার। সুধামুখীকে দিয়ে কয়েকবার পড়িয়ে নিল, এখন সাহেবের আধ-মুখস্থ। বস্তুটা সামনে রেখে গড়গড় করে পড়ে যেতে পারে। রানীকে তাই শোনাচ্ছেঃ

করালবদনা কালী কল্যাণদায়িনী
কাতরে করুণা দান করেন জননী।

বঙ্গবাসী জনে দেখি সিগারেটে রত
শ্বাসকাস আদি ক্লেশে ভোগে অবিরত
ব্যথিত হৃদয়ে মাখা দয়া প্রকাশিল
সিগারেট রূপে এবে সুধা বিতরিল।

রানী সন্দেহ ভরে বলে, এ তো সিগারেটের মন্তর। ফিতের কথা কই ?

সিগারেট পালটে ফিতে বললেই হল। চানটান করে শুদ্ধ কাপড়ে শুদ্ধ মনে দেখ না বলে। না খাটে তো তখন বলিস।

পরের দিন চুলে ফিতে পরে বাহার করে রানী মন্ত্রের ফল দেখাতে এল।

ডাকাবুকো মন্তোর গো সাহেব। বেড়ে জিনিস শিখিয়েছ, আমি মুখস্থ করে নিয়েছি। আজকে আমি একপাতা সেপটিপিন চাইব। সিগারেট পালটে ফিতে বললে হল, ফিতে পালটে সেফটিপিন বললেই বা কেন হবে না ?

যুক্তি অকাট্য। এবং এক পয়সার একপাতা সেফটিপিন জোগানো মা-কালীর পক্ষে কঠিনও নয়। কিন্তু একনাগাড় এমনি যদি চলে, তবে তো সর্বনাশ। চললও ঠিক তাই। সেফটিপিন হল তো মাথার কাঁটা, চিরুনি, গায়ে-মাখা সাবান। যা গতিক, কালীঠাকরুনকে পুরো এক মনোহারি দোকান খুলতে হয় রানীর জিনিস যোগান দেবার জন্যে।

(মায়া-অঞ্জনের খবরটা জানা থাকত যদি ! পরবর্তীকালে সকৌতুকে সাহেব কত সময় ভেবেছে। রানীর আবদার চক্ষের পলকে তাহলে মেটানো যেত। এই কাজল চোখে দিয়ে চোর অদৃশ্য হয়ে যায়। তাকে কেউ দেখে না, সে কিন্তু দেখতে পায় সকলকে। সেকালের পুঁথিপত্রে অঞ্জনের গুণপনার কাহিনী—গুরুকে বিস্তর সেবা করলে তবে তিনি এই বস্তু দিতেন। মক্কেল মালপত্র রেখেছে—মাটির নিচে হোক, বাক্স-পেঁটরার ভিতরে হোক, অঞ্জনের গুণে স্পষ্ট নজরে আসবে। নেওয়ারি ভাষায় এক পুরানো পুঁথি—পণ্ডিতেরা বলেন, হাজার বছরের মতো বয়স—ষণ্মুখকল্প। ছয়-মুখওয়ালা কাতিক হলেন চোরের দেবতা—তাঁর নামের পুঁথি। মায়া-অঞ্জন তৈরির পদ্ধতিও তার মধ্যে। বলাধিকারী চৌরশাস্ত্র নিয়ে পড়েছেন তো আদ্যন্ত না দেখে ছাড়বেন না। খবর পেয়ে বিস্তর কষ্টে পাঠোদ্ধার করে যাবতীয় মন্ত্র লিখে নিয়ে এলেন। অশুদ্ধ ভাষা হলেও মন্ত্রের পাঠে তিলপরিমান হেরফের চলবে না। মায়া-অঞ্জনের মন্ত্র ঃ ওঁ চন্দ্রসূচ্যময়দৃষ্টি দেবনির্মিতং হর হর সময় পুরয়ঃ হুং স্বাহা। উপকরণও এমন-কিছু দুর্লভ নয়। উলুক অর্থাৎ পেঁচার বসা, সিদ্ধার্থ অর্থাৎ আতপ চাল এবং কপিলাঘৃত। কপিলাঘৃত বস্তুটা জানা নেই। সমস্ত একত্র করে জ্বালিয়ে তেল বানাবেন। পদ্মসূত্রের সলতেয় নর-কপালে ঐ তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে কাজল পাড়ান, আর মন্ত্রটা এক-শ বার জপ করে ফেলুন। মায়া-অঞ্জন তৈরি হল—চোখে দিয়ে দেখুন মজাটা এবার। যা দিনকাল পড়েছে, গুণীরা দেখুন না পরীক্ষা করে।)

ধৈর্য হারিয়ে সাহেব একদিন বলে, কত আর চাইবি কালীর কাছে ? ইতি দে এবারে। যখন তখন মা'কে মুশকিলে ফেলবিনে।

ভ্রূভঙ্গি করে রানী বলে, মা-কালী তো আমাদের মতন নন। সিকি পয়সা খরচা নেই মায়ের—ইচ্ছাময়ী ইচ্ছা করলেই এসে যায়। তাঁর আবার মুশকিলটা কি?

সাহেব আমতা আমতা করেঃ তা হলেও ভাববেন, মেয়েটা বড্ড হ্যাংলা। বিরক্ত হয়ে শেষটা দেওয়া একেবারে বন্ধ করবে দেখে নিস।

এতদূর রানী তলিয়ে দেখেনি। মা-কালীর কাছে বদনাম হয়ে যাচ্ছে বটে। একটুখানি ভেবে নিয়ে বলে, এবারে চটিজুতোর আবদার করে বসেছি সাহেব। দিয়ে দিন একজোড়া। তার পরে আর মা-কালীর নামটাও মুখে আনছি নে। ইহজন্মে নয়। কী দরকার! মা হয়তো ভেবে বসবেন, আবার কোন মতলব আছে মনে মনে। নয়ত ডাকে কেন?

ঘাড় দুলিয়ে জোর দিয়ে বলল, এই আমার শেষ চাওয়া। টুকটুকে লাল চটি, মাখনের মত নরম। বড়লোকের ঘরের ভাল ভাল মেয়ে-বউরা এই চটি পরে আসে। নাটমণ্ডপের নিচে খুলে রেখে মন্দিরে ঢোকে। দেখে এসো একদিন সাহেব, কী সুন্দর!

দেখতে যেতে হয় অতএব সাহেবকে। জুতোচুরির ভয়ে ভক্তেরা সবসুদ্ধ মন্দিরে ঢোকে না, একজনকে রেখে যায় জুতোর পাহারায়। ব্যাপার বুঝুন। একবাড়ি মানুষ ঘোড়ার গাড়ি বোঝাই হয়ে এসেছে, মন্দিরে ঢুকে সবাই ঠাকুর-দর্শন করছে তার মধ্যে একজনই কেবল বাইরে দাঁড়িয়ে তাক করে আছে সকলের পায়ের জুতোয়। যে যেমন কপাল করে আসে।

অবশেষে চটিজুতোও দিয়ে দিলেন মা-কালী। রানীর পায়ে ঢলঢলে হয়, জিনিসটা তবু পছন্দসই।

হল কি সাহেব, চুরি যে একের পর এক চলল! পয়লা বার সুধামুখীর কষ্ট দেখে, তারপরে রানীর আবদারে। যে রানীকে সাহেবের বউ বলে সকলেই ক্ষেপায়। রানীও বউয়ের মতন সলজ্জ ভাব দেখায় লোকের সামনে। মায়ের জন্য চুরি, আর বউয়ের আবদার রাখতে চুরি।

ঠিক দুপুরে সাহেব চাল খুঁটছে আড়তের সামনের রাস্তায়। একেশ্বর এখন—তাড়াহুড়ো নেই, ধীরেসুস্থে খুঁটে খুঁটে তুলে নেওয়া। জুতো মশমশ[illegible] বাবু একজন এল। কতই তো আসে পুরুষোত্তমবাবুর কাছে কাজকর্ম নিয়ে। সাহেব আপন মনে চাল কুড়িয়ে যাচ্ছে।

কে রে, সাহেব না তুই?

বাদার জঙ্গলে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে, মাঝিদের কাছে সাহেব গল্প শুনেছে। তেমনি করে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাবুলোকটা সাহেবের চুলের মুঠি ধরে। তাকিয়ে দেখে, অন্য কেউ নয়—নফরকেষ্ট। এতকাল পরে রাস্তার উপরে হঠাৎ উদয়। চুল এঁটে ধরে প্রকাণ্ড চড় উঁচিয়েছে—

চেহারায় নফরকেষ্ট সত্যি সত্যি বাঘ। অথবা বুনো হাতী। ছেলেমানুষ

সাহেব বলে নয়, বড়রাও আঁতকে ওঠে। কিন্তু রাগে অপমানে জ্ঞান হারিয়েছে সাহেব। তড়াক করে উঠে ক্ষীণ হাত দু-খানায় বিশালদেহ নফরকে এঁটে ধরেছে। খিমচি কাটে, কেঁদেকেটে অনর্থ করে: কেন মারবে আমায় তুমি—কেন? কেন?

নফরকেষ্টর হুঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে মিইয়ে যায়। চড়ের হাত নেমে গেছে অনেকক্ষণ। মিনমিন করে বলে, চেঁচাচ্ছিস কেন রে? মারলাম আমি কখন, মিথ্যে বলবি নে। কী চেহারা হয়েছে, দেখ দিকি। না, দেখবি কি করে এখন—ঘরে গিয়ে আয়না ধরে দেখে নিস। ভাদ্দরের এই চড়া রোদে রক্ত যা ছিল সবটুকু মুখে উঠে গেছে।

সাহেব বলে, তোমার কি?

সে তো বটেই আমার কী। কথায় তোর বড্ড ধার হয়েছে সাহেব। পথে বসে বসে চাল কুড়োস—তুই কি কাঙালি-ভিখারি, হালদার-পাড়া রাস্তায় যারা সারবন্দি গামছা পেতে বসে থাকে?

মুহূর্তকাল চুপ থেকে নফরকেষ্ট বলে, এই যে উঞ্ছবৃত্তি করিস, সুধামুখী জানে?

কেন জানবে না! চাল কোন দিন কম হয়ে গেলে সন্ধ্যের আগে আবার পাঠিয়ে দেয়।

চল তো দেখি।

সাহেবের হাত ধরল নফরা। বলে, রাগ করিসনে সাহেব। তোর দশা দেখে মনে দুঃখ হল কিনা। অনেক দিন ছিলাম না—তার মধ্যে এই হাল হয়েছে, আমি বুঝতে পারি নি।

তৃতীয় ব্যক্তি কেউ উপস্থিত থাকলে মনে ভাবত, গৃহকর্তা প্রবাস থেকে ফিরে গিন্নির সম্পর্কে বকাবকি করছে। এবং ছেলের হাত ধরে কৈফিয়ত নিতে চলল যেন বাড়িতে।

বড়লোকি সাজপোশাক ও ভাবভঙ্গি দেখে সাহেব হাত ছাড়িয়ে নেয় না। শুধু বলল, চালগুলো সব পড়ে গেছে। দাঁড়াও তুলে নিই।

নফরকেষ্ট তাচ্ছিল্য করে বলে, থাক না পড়ে। যাদের অভাব-অনটন, তারা এসে তুলবে। ওদিকে তাকাতে হবে না। চাল আমরা দোকান থেকে নেব। একেবারে পাঁচ-দশ সের কিনে নিয়ে যাব।

হল তাই। রাস্তার চাল অভাবগ্রস্তদের তুলে নেবার সুযোগ দিয়ে নফরকেষ্ট সাহেবকে নিয়ে চলল। চিরকালের সে লোকটা নয়—ধবধবে ডবলব্রেস্ট কামিজ পরেছে, পায়ের জুতো মশমশ করছে, চলেছেন শ্রীযুক্ত বাবু নফরকেষ্ট পাল। কিম্বা তারও বড়—জমিদার রাজা কি নবাব-বাদশা কেউ একজন।

চালের ঠোঙা নিয়েছে হাতে। আর কি নেওয়া যায় সাহেব? মিষ্টান্নের দোকানের সামনে থমকে দাঁড়ায়: কিছু মিষ্টি নেওয়া যাক। খুব বড় বড় রাজভোগ বের কল্লো তো হে। ফুটবলের সাইজ—

চালের ঠোঙা আর রসগোল্লার হাঁড়ি বারান্দায় নামিয়ে রাখল। সুধামুখীর

সাড়া নেয়ঃ রাস্তা থেকে ছেলে ধরে আনলাম সুধামুখী। কী চেহারা হয়েছে দেখ।

বহুদিন পরে নফরকেষ্টর গলা পেয়ে সুধামুখী ছুটে আসে। নফরকেষ্ট নালিশ করছেঃ সাত ভিখারির এক ভিখারী হয়ে রোদ্দুরে রাস্তায় চাল খুঁটছিল। আসবে না কিছুতে। আবার কথার কী তেজ!

সুধামুখী স্নেহস্বরে বলে, পেটের দায়ে করতে হয়, নইলে সেই বয়েস কি ওর!

গামছা ভিজিয়ে এনে সাহেবের মুখ মুছে দেয়। তালপাতার পাখা নিয়ে এসেছে—

দূর! বলে সাহেব হেসে সেই পাখা কেড়ে নিল। অন্যে এসে পাখার বাতাস করবে—এতখানি আদর সে সহ্য করতে পারে না। আরও লজ্জা বাইরের একজন—নফরকেষ্টর সামনে ঘটতে যাচ্ছিল ব্যাপারটা। বেরিয়ে পড়ল। ঘাটে যাবার সেই সংক্ষিপ্ত পথ—আমের ডালে পা দিয়ে পাঁচিলের মাথায় উঠে ধপ করে ওদিকে এক লাফ।

টসটস করে হঠাৎ জল পড়ে সুধামুখীর চোখে। বলে, সাহেবকে আমি কিছু বলতে যাইনি, চাল কুড়ানোর বুদ্ধিটা নিজে থেকে মাথায় এনেছে। কী করে দুটো পয়সা সংসারে এনে দেবে, তার জন্য আঁকুপাকু করে। কত মায়াদয়া ঐ এক-ফোঁটা ছেলের!

আর চাল খুঁটে বেড়াতে হবে না। চতুর্দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দৈন্যদশা ঠাহর করে দেখল। সুধামুখী বাড়িয়ে বলছে না। লজ্জিত কণ্ঠে নফরকেষ্ট বলে, চালের দায় আমার। পাঁচ সের নিয়ে এসেছি, ফুরোলে আবার এনে দোব।

আসবে তো ছ'মাস পরে। তদ্দিন বেঁচে থাকলে তবে তো?

আসব রোজই সুধামুখী, ঠিক আগেকার মতো। গাঢ় স্বরে নফরকেষ্ট বলে, কোনদিন কোথাও আর যেতে চাইনে। আসবার পথে পুরানো ডেরাটা একবার ঘুরে দেখে এলাম। নিমাইকেষ্টকে সব দেখিয়েছি, শুধু কাজের সরঞ্জামগুলো গোপন ছিল। সেগুলো গোছগাছ করে রেখে এলাম। পুরানো কাজকর্ম—এইখানে আগের মতন তোমায় বেড়ে দিয়ে। তোমার ঝাঁটা-লাথি খাব, আর রাঁধা-ভাতও খাব। টাকাপয়সা কিছু আমি হাতে তুলে দেব, বাকিটা তুমি কেড়ে কুড়ে নেবে। যেমন বারবার হয়ে এসেছে।

সুধামুখী সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। নফরকেষ্ট বলতে লাগল, তাঁতের মাকু দেখেছ? একবার ডাইনে ছুটছে, একবার বাঁয়ে। আমারও তাই। গোড়ায় ঠিক করলাম, ভাল মানুষ নয়—টাকার মানুষই হব। দুনিয়াদারি ফাঁকা, সারবস্তু টাকা। টাকা হল না, কিছুই হল না—বয়সটা হল আর দেহের মেদ হল। ভাই এসে সুবুদ্ধি দিল। ভাবলাম, বাসায় উঠে ভাল মানুষই হইগে তবে। চাকরিবাকরি-করা বাবু-মানুষ, ঘরগৃহস্থালী করা সংসারী মানুষ। তা-ও হল না, তিতবিরক্ত হয়ে ফিরেছি। কাজ নেই বাবা। ঘেঁটুফুলে পুজোআচ্চা হয় না, ও জিনিস বনেবাদাড়ে ভাল।

সুধামুখী সন্দেহ ভরে জিজ্ঞাসা করে, বউ এলো না কিছুতে? এত রকমে টোপ

ফেলেও গাঁথতে পারলে না।

আসবে না মানে? বাসায় এসে রান্নাঘরে পা ছড়িয়ে রীতিমত ডাল-চচ্চড়ি রাঁধতে লেগেছে। ধর্মপত্নী যখন, না এসে যাবে কোথায়?

সুধামুখীর দৃষ্টিতে তবু বুঝি অবিশ্বাস। চটেমটে পকেট থেকে এক টুকরো কাপড় বের করে নফরকেষ্ট বলে, বউ আসে নি, এটা তবে কি?

রুমালের মতো বস্তুটা চোখের উপর মেলে ধরল।

কৌতূহলী সুধামুখী প্রশ্ন করে, কি ওটা?

বউয়ের শাড়ির আঁচল। কেটে এনেছি, আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।

সুধামুখীর মনের গুমোট কেটে গেছে, নফরার ভঙ্গি দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ে: তুমি যে আর এক শাজাহান বাদশা হলে নফরআলি।

নফরকেষ্ট বলে, শাজাহান বাদশা কি করল?

বউকে ভুলতে না পেরে তার নামে তাজমহল গড়ল। দুনিয়ার মানুষ দেখতে আসে, শাজাহানকে ধন্য-ধন্য করে। তোমারও সেই গতিক। বউ সঙ্গে নেই তো শাড়ির টুকরো পকেটে নিয়ে ঘুরছ। ভুলতে পার না।

নফরকেষ্ট সগর্বে বলে, ভুলবার জিনিস নাকি? পকেটে কি বলছ—আমি বাদশা হলে মাথায় যে মুকুট থাকত, নিশানের মতো তার উপর এই জিনিস উড়িয়ে দিতাম। গাইয়ে-বাজিয়েরা গলায় মেডেল ঝুলিয়ে আসরে নামে তো—আমায় যদি কখনো আসরে ডাকে, ঐ কাটা-আঁচল আমি গলায় ঝুলিয়ে যাব। কাঁচি ধরার কাজে নেমেছি তখন আমি ঐ সাহেবেরই বয়সি, আর এই অর্ধেকবুড়ো হতে চললাম সত্যি বলছি সুধামুখী, এত বড় বাহাদুরির কাজ আমি করিনি আর কখনো।

বারান্দায় জলচৌকির উপর বসে নফরকেষ্ট রসগোল্লা খাচ্ছে।

সুধামুখী বলে, বউয়ের রূপের ব্যাখ্যান চিরকাল ধরে করে এসেছ। ধরবার জন্যে কত ফন্দি-ফিকির। সেই বউ খপ্পরে এসে গেল, আর তুমি পালিয়ে চলে এলে?

বউয়ের রূপের কথায় নফর আহার ভুলে শতমুখ হয়ে উঠল। বলে, মাগীর বয়স হয়েছে, সেটা কুষ্ঠি-বিচার করে বলতে হয়। চোখে দেখে ধরতে পারবে না। সাজতে জানে বটে! গয়না পরে সেজেগুজে সব সময় একখানা পটের বিবি। উনুনে ফুঁ পাড়ছে, তখনো পরা আছে নীলাম্বরী শাড়ী।

সুধামুখী সামনে একটি পিঁড়ি পেতে বসে শুনছে। তার দিকে চেয়ে তুলনা এসে যায়। বলে, আর এই তুমি একজন মা-গোঁসাই এখানে। ছাই মেখে বনে গেলেই ল্যাঠা চুকে যায়। তিরিশ বছরের আধ-বুড়ি আমার বউ—পনের বছরের ছুঁড়ি বলে এখনো আর একবার বিয়ে দেওয়া যায়। গেরস্থ-বউ হলেও সাজের গুণে বাইরের মানুষ টেনে ধরে—শ্বশুরবাড়ি রাত দুপুরে বেড়ায় ঘা পড়ত, বেড়া বেঁধে

বেঁধে শালামশায়রা নাজেহাল। আর তুমি বাইরের মেয়েমানুষ হয়ে ঘরের লোক ক'টাকেও টেনে রাখতে পার না। রাজাবাহাদুর গেল, সেই ঠাণ্ডাবাবু বানের জলের মতো দুটো চারটে দিন ভুড়-ভুড়ানি কেটে কোন দিকে ভেসে চলে গেল। আমি যে এমন নফরকেষ্ট, ত্রিভুবনে সবাই দুর-দুর করে—আমি পর্যন্ত পাকছাট মেরে ক্ষণে ক্ষণে বেরিয়ে পড়ি।

মিষ্টি নিয়ে এসেছে নফরকেষ্ট, তাই থেকে কয়েকটা তাকে খেতে দিয়েছে। রসগোল্লা আর একটা গলায় ফেলে কোঁৎ করে গিলে নফরকেষ্ট বলে পুরানো বন্ধু হয়ে বলছি, সাজগোজ বেশি করে লাগাও। এখনো যা আছে, সাজিয়েগুছিয়ে লোকের চোখে তুলে ধর। রূপ ভগবান দেয় মানি, আবার মানুষেও দিয়ে থাকে। কবিরাজি মলমের মতো কোটোয় কোটোয় আজকাল রূপের মসলা। সেই মসলা হাতে-মুখে, এখানে-ওখানে লাগাও, যতখানি কাপড়ের বাইরে থাকে। আবার ওদিকে স্যাকরামশায়রা ভেবে ভেবে খেটেখুটে বছর-বছর এ-প্যাটার্নের ও-প্যাটার্নের গয়না গড়াচ্ছেন, যতগুলো পার গায়ের উপর চাপিয়ে দাও। ব্যস, আলাদা মূর্তি হয়ে গেলে। আয়না ধরে অবাক হবেঃ বাঃ রে, আমিই সেই সুধামুখী নাকি? বউয়ের কাছেপিঠে থেকে রূপের কারসাজি এবার ভাল করে বুঝে এসেছি।

একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে বলছে—সুধামুখী বিব্রত হয়ে ওঠেঃ বলি তো সেই কথা, সাজগোজের সেই রূপসী বউ ছেড়ে চলে এলে কেন?

লুফে নিয়ে নফরকেষ্ট বলে, রূপসী বলে রূপসী! যে দেখে সে-ই দেবচক্ষু হয়ে যায়। এক রবিবারে কারখানার একজন গিয়েছিল আমার কাছে। বউ দেখে কানে কানে বলল, সাত জন্ম তপস্যা করলে তবে এমন চিড়িয়া মেলে। বুকের মধ্যে নেচে উঠল শুনে।

তবে।

সে দেখা তো দিনমানের—দিনদুপুরের! রাতের বেলা আলো নিভিয়ে রূপ দেখা যায় না। তখন তুমি সুধামুখী যা, সে-বউও তাই। তখন শুনতে হয় কথা। বউয়ের মুখে কথা তো নয়, আগুন। আগুনের ছেঁকায় সর্বদেহ জ্বলে পুড়ে যায়। বুঝে দেখ সুধামুখী, সারাটা দিন ফার্নেসের পাশে কাজ—রাত্রে একটু ঠাণ্ডা হয়ে জিরোব, পাশে সেই সময়টা বউ এসে পড়ে। দিনরাত্রি আগুনের পাশে বাঁচব কেমন করে? চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছি, বাসা থেকেও পালিয়েছি। বউটা যদি না এসে পড়ত, যে ক'টা দিন বাঁচি ভাইয়ের বাসায় টিকে থাকতে পারতাম।

নিঃশব্দে নফরকেষ্ট আর কয়েকটা মিঠাই গলাধঃকরণ করে। ঢকঢক করে জল খেয়ে নিয়ে আবার বলে, তার উপরে এক কাণ্ড! আগুনে কেরোসিন পড়ল একেবারে। নিমাইকেষ্টর শ্বশুর বাসায় এসেছে মেয়েকে দেখতে। আমার বউ যেন আর-এক মেয়ে—'বাবা' বলে কাছে-পিঠে ঘুরঘুর করছে, ফাঁক বুঝে তারপর খবর জিজ্ঞাসা করেঃ কত মাইনে দেন আপনারা এ-বাড়ির বড়জনকে। শ্বশুর-বাড়ির সম্পর্কে যার সঙ্গে দেখা, মাইনেটা বরাবর ফাঁপিয়ে বলে এসেছি। নিমাই-কেষ্টকেও সামাল করা আছে—মায়ের পেটের ভাই হয়ে সে ফাঁস করবে না। কিন্তু

আমরা বেড়াই ডালে ডালে, বউ-মাগী বেড়ায় পাতায় পাতায়। কুটুম্বমানুষকে ধরে বসেছে। বুড়ো অতশত জানবে কি করে, বলে দিয়েছে সত্যি কথা। রাত্রে বউ দেখি একেবারে চুপচাপ। এমন তো হবার কথা নয়—ভয়ে আমার গা কাঁপছে। বোমা ফাটবে বুঝতে পারছি—আজ হোক আর একদিন-দুদিন পরে হোক। হল তাই ঠিক—

খাওয়া সমাপ্ত করে নফরকেষ্টর এইবার সাহেবের কথা মনে পড়ে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, ছোঁড়াটার নাম করে মিষ্টিমিঠাই আনলাম সে খেয়েছে?

দু-হাতে দুটো নিয়ে ঐ যে বেরিয়ে গেল। স্থির হয়ে দু-দণ্ড বাড়ি বসে থাকবার জো আছে?

অভিভাবক জনের মতো বিরক্ত কণ্ঠে নফরকেষ্ট বলে, এই রোদ্দুরে অবেলায় গেল কোথা?

সুধামুখী বলে, কোথায় আবার! ঘাটে গিয়ে বসে আছে।

ঘাটে কী এখন?

ঘাট ওর শোবার ঘর, ঘাটেই বৈঠকখানা। দেখ, পয়সাকড়ি জোটে না। নইলে কত সময় ভাবি, দরজার পাশে ঐ জায়গাটুকুর উপর ছাউনি করে দিলে রাতের বেলা সাহেব দিব্যি পড়ে থাকতে পারে। ঘাটের সিঁড়িতে যা করে ঘুমোয়।

নফরকেষ্ট বলে, বটেই তো! ঘাটে শোবে কেন ছোটলোকের মতন? ওসব হবে না, কালই চালা তোলার ব্যবস্থা করছি।

সুধামুখী প্রীত হয়ে বলে, ভাত চাপিয়ে এসেছি, এতক্ষণে ফুটে উঠল। গিয়ে ফ্যান গালব। তোমার কথা শেষ করে ফেল, শুনে যাই। তার পরে কি হল, কি করল বউ।

নফরকেষ্ট বলে, যা ভেবেছি, বোমাই ফাটল। লণ্ডভণ্ড কাণ্ড একেবারে। পরের দিনটা মাইনের তারিখ। দু-ভাই এসে যেই দাঁড়িয়েছি, বউ নিমাইয়ের সামনে হাত পাতল: ওর মাইনেটা আমার কাছে দাও। টাকা-আনা-পয়সায় ঠিক-ঠিক বলে দিল। আমরা থ। টাকাকড়ি আঁচলে বেঁধে ঘরের দুয়োর-জানলা এঁটে নিশিরাত্রে তারপর নিজমূর্তি ধরে। মিথ্যুক, অকর্মার ঢেঁকি। ভদ্রলোকের মেয়ের মুখের সেই সব বাছা বাছা জোরদার কথা বলতে আমার লজ্জা করছে। গাদা গাদা খরচা করে এই যে জার্মান-ইংরেজে এত বড় লড়াইটা হয়ে গেল—আমি ভাবি, বউকে যদি নিয়ে যেত কামান-বন্দুক, গুলিগোলা কিছু লাগত না, কথার তোড়েই শত্রু খতম হয়ে যেত।

আঁচল মুখে দিয়ে সুধামুখী হাসছে। নফরকেষ্ট বলে, হাসবে বইকি! পরের কষ্টে লোকের মনে বড় সুখ হয় তা জানি। একটা কথা আমার নামে বারবার বলছিল, কোন কাজের ক্ষমতা নেই। ছড়া কাটছিল: কোন গুণ নেই তায় কপালে আগুন। মনে মনে তক্ষুনি ঠিক করে বসলাম: চলে তো যাবই—তার আগে গুণের কিছু নমুনা ছেড়ে যাব। চিরকাল যেটা মনে রাখবে। হয়েছেও তাই। তবু তো সরঞ্জাম কিছু পেলাম না, ওরই কাঁথার ডালার ভোঁতা একটা কাঁচি—

সুধামুখী গালে হাতদিয়ে বলে, ওমা, আমার কি হবে! শেষটা নিজের বউয়ের পকেট কাটলে!

মেয়েমানুষের পকেট কোথায়? আঁচল। টাকার নামে মূর্চ্ছা যায়। বাপের বাড়ি থেকে নোট গেঁথে গেঁথে নিয়ে এসেছে। তার উপরে আমার পুরো মাসের মাইনে। ঘরে স্বামীরত্ন ঘুরছে তাই বোধহয় বাক্সপেঁটরায় ভরসা পায় না, আঁচলে বেঁধে নিয়ে বেড়ায়। বলি, রসো রূপসী, হাতের খেলা দেখাই একখানা। ঘুঁটে ধরিয়ে উনুনের উপর কয়লা চাপাচ্ছে। ধোঁয়ায় অন্ধকার। সেয়ানা বেশি কিনা—নোট-বাঁধা আঁচলের মুড়ো ফেরতা দিয়ে কোমরে গুঁজেছে। আমি বসেছি গিয়ে পাশে, কোমর থেকে আঁচল টেনে বের করেছি। কিছু জানে না। ভোঁতা কাঁচির পোঁচে পোঁচে কাপড় কেটেছি, মরি—বাঁচি তখনো উনুনে পাখা করে যাচ্ছে।

হো-হো করে হাসিতে ফেটে পড়ল নফরকেষ্ট।

সুধামুখী বলে, তবে আর যাচ্ছ না ফিরে। চুকিয়েবুকিয়ে চলে এসেছ, বুঝলাম।

যাতে আর কোনদিন না যেতে হয়, সেই ব্যবস্থা করে এসেছি।

পকেট থেকে নফরকেষ্ট ধাঁ করে বউয়ের আঁচলের কাটা টুকরো বের করে ধরে। বলে, পাড়টুকু ছিঁড়ে বাহুতে ধারণ করব। আমার ব্রহ্মকবচ।

আবার একচোট হাসি। হাসি থামিয়ে বলে, ছেলেবয়সে দিদিমা এই মোটা তামার মাদুলি হাতে বেঁধে দিয়েছিল—ব্রহ্মকবচ, ভূতপেত্নী পেঁচো-দানোর নজর লাগবে না। এবারও তাই। বউয়ের জন্যে কালেভদ্রে যদি মন আনচান করে ওঠে, শাড়ির আঁচলের দিকে তাকালেই ব্যাধি ঠাণ্ডা—মনে পড়ে যাবে পূর্বাপর সমস্ত।

সুধামুখীও হাসতে হাসতে ভাত নামাতে গেল।

আর ওদিকে ঘাটের উপর রানী এসে সাহেবকে ধরেছে: যা বলেছিলে সত্যি-সত্যি তাই খাটল গো সাহেব। মা-কালী কথা কানে নিচ্ছেন না। বকাবকি করবে বলে তোমায় বলিনি। পরশুদিন মায়ের কাছে একশিশি তরল-আলতা চেয়েছিলাম। তোমার সেই মন্তর পড়ে সিগারেটের জায়গায় বললাম আলতা।

সাহেব জিভ কেটে বলে, সর্বনাশ করেছিস তুই। আলতা এখন রক্ত হয়ে গলা দিয়ে গলগল করে না বেরোয়!

ভীত হয়ে রানী বলে, রক্ত বেরুবে কেন গলা দিয়ে? কী করলাম?

মায়ের কাছে পায়ের আলতার হুকুম—উঃ, কতখানি সাহস রে তোর!

মা চটিজুতো দিলেন, সে-ও তো পায়ের। পায়ের চেয়ে বড় হয়েছে মাপে। আনকোরা নতুনও নয়। তবু দিয়েছেন তো তিনি। জুতো দিতে পারেন, আলতায় তবে দোষ হবে কেন?

কথা জোগানো থাকে মেয়েটার জিভের ডগায়। পেরে ওঠা দায়।

সাহেব বলে, পা ছুঁয়ে মা তো মাপ নিতে পারেন না, সেই জন্যে জুতো বড় হয়েছে। কিন্তু একবার দিয়েছেন বলে তোর নিজের একটা আক্কেল-বিবেচনা থাকবে

না? চটেছেন কিনা দেখ বুঝে। এতবার এতরকম জিনিস এল, আলতার বেলা কেন ডুব মারলেন?

রানী বলে, বেশ, আলতা বাদ দিয়ে গন্ধতেল চাইব এক শিশি। মাথায় মাখবার জিনিস, এতে কোন দোষ নিতে পারবেন না। আমার লাভই হবে—গন্ধতেলের দাম আলতার চেয়ে অনেক বেশি।

মা-কালীর মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে অতএব গন্ধতেলের ব্যবস্থাও করতে হয়। কোন কৌশলে হবে, সেটা আপাতত মাথায় আসছে না। চটিজুতোর ব্যাপারে অতি অল্পের জন্য মাথা বেঁচে এসেছে। এক বিয়ে-বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল সাহেব। ফর্সা কাপড়-চোপড় পরেছে, তার উপর এই চেহারা। চেহারাটা সর্বক্ষেত্রে অদ্ভুত কাজ দেয়। কন্যাপক্ষের এক মাতব্বর ডাকলেন: ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন খোকা, আসরে গিয়ে বোসো। তাঁরা ভাবছেন, বরযাত্রী হয়ে এসেছে। বরযাত্রীদের মধ্যে গেলে সরে সরে তাঁরা পথ করে দেন: বর দেখবে খোকা? যাও না, বরের কাছে এগিয়ে বোসোগে। এঁরা ভাবছেন, কন্যাপক্ষের ছেলে। কিন্তু খোকা তো বসবার জন্য ঢোকেনি এ-বাড়ি। পাতা করছে ওদিকে, রকমারি খাদ্যের সুগন্ধ আসছে। বসে পড়া যায় স্বচ্ছন্দে, লোভও হচ্ছে খুব। তবু কিন্তু ভোজে বসা চলবে না সাহেবের। সবাই যখন বসে পড়বে, তার কাজ সেই সময়টা। একজোড়া জুতোর মধ্যে পা ঢুকিয়ে সুড়ুৎ করে সরে পড়বে। সে জুতোর বাছাবাছি বিস্তর। চটিজুতো—মেয়েরা যা পরে, সেই জিনিস। চটি হবে লালরঙের এবং হাল ফ্যাশানের। মা-কালী হয়ে পড়ে ফ্যাসাদ কত! সবাই খেতে গেল, ফুটফুটে একটা ছেলে সেই সময় বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে। ধরো, নজর পড়ে গেল একজনার। বাৎসল্য বশে সে গিয়ে সাহেবের হাত এঁটে ধরেছে। পায়ের দিকে চোখ গেল—মেয়েদের জুতো বেটাছেলের পায়ে। বুঝতে আর কিছু বাকি থাকে না। তারপর কি হবে? ভোজ ফেলে বরপক্ষ কন্যাপক্ষ দুদিক দিয়ে রে-রে করে পড়ল। পেটের চেয়ে হাতের সুখ করেই মজাটা বেশি।

হতে যাচ্ছিল ঠিক এমনিটাই।

ও খোকা, খেতে বসনি যে তুমি? যাচ্ছ কোথা? শোন, শোন—

সাহেব তো চোঁচা ছুট। সে লোকও পিছু ছুটেছে। পিছনে তাকায়নি সাহেব, তবে জুতোর শব্দ পেয়েছে বেশ খানিকক্ষণ। ইঁদুরের মতন এ-গলি সে-গলি ছুটে ঘণ্টা দুই পরে সাহেব হাঁপাতে হাঁপাতে নিজের ঘাটে এসে পড়ল। এসে সোয়াস্তি, গড়িয়ে পড়ল ক্লান্তির চোটে। পায়ের চটি হাতে তুলে নিয়েছিল কিছুদূর এসে। জুতো-পায়ে ছোটা যায় না। এতক্ষণ পরে তৃপ্তি ভরে জুতোর পানে তাকিয়ে দেখে। খাসা জিনিসটা, রানীকে মানাবে ভাল। পায়ে কিছু বড় হবে। বেটাছেলে সাহেব যা পায়ে ঢুকিয়ে বেরুল, সে জিনিস বড় তো হবেই মেয়েছেলে রানীর পায়ে। পায়ে পরে বেরুনো ছাড়া জুতো সরানোর নিরাপদ উপায় কি? তা-বড় তা-বড় মহাশয় ব্যক্তিরাও এই পন্থা ধরেন।

কিন্তু একবার দু'বার পাঁচবার সাতবারেও তো শেষ হয়ে যাচ্ছে না। আবদারের পর আবদার চলল একনাগাড়ে। গতিক দাঁড়িয়েছে সেই বিধাতা-পুরুষের মতো।

সে গল্প সকলের জানা। হবে না, হবে না করে জেলের বাড়ি ছেলে হল। সৎ গৃহস্থ, মিথ্যাচার ফেরেব্বাজির ধার ধারে না—সাচ্চা পথে যা আসে, তাতেই খুশি। সেই জন্যেই গরিব বড্ড। পান্তা খেতে নুন জোটে না। জেলের মা-বুড়ি বিষম ঝানু। আট দিনের দিন রাত্রিবেলা বিধাতা-পুরুষ শিশুর ললাটে ভাগ্য লিখে যান, বুড়ি সেই রাত্রে সূতিকাঘরের দুয়োর জুড়ে শুয়ে আছে। মতলব করেই শুয়েছে, ভাগ্য-লিখনের আগে একটা পাকা-বন্দোবস্ত করে নেবে। নিশিরাত্রে দু-পহরের শিয়াল ডেকে গেল, ঠিক সেই সময়টা পাকা-চুল, পাকা-গোঁফদাড়ি কানে কলমগোঁজা, হাতে দোয়াত-ঝুলানো ভাবনাচিন্তায় কুঞ্চিত-ভ্রূ বিধাতা-পুরুষ চুপিসাড়ে এসে পড়লেন। এসে সূতিকাঘরের দোরের সামনে থমকে দাঁড়িয়েছেন—মেয়েমানুষ ডিঙিয়ে যান কেমন করে? বুড়িও নড়বে না কিছুতে। আড় হয়ে এমনভাবে শুয়েছে—আধ ইঞ্চিটাক ফাঁক নেই, যার মধ্য দিয়ে বিধাতাপুরুষ গলে বেরিয়ে যান। সময় বয়ে যাচ্ছে, ব্যস্ত হয়ে বিধাতাপুরুষ বলেন, একটু সরে শোও বুড়িমা, কাজ চুকিয়ে চলে যাই। ত্রিভুবন-জোড়া কাজকর্ম, দাঁড়িয়ে থাকার ফুরসত নেই।

বুড়ি জো পেয়ে গেছে। বলে, তুমি বিধাতা হাড়-বজ্জাত। আজকে কায়দায় পেয়ে গেছি। আমার ছেলের কপালে ছাইভস্ম কি-সব লিখেছিলে, সারাজন্ম তার দুঃখধান্দায় গেল। দিনরাত্তির খেটে পেটের ভাতের জোগাড় হয় না। নাতির বেলা সেটা হচ্ছে না। ভাল ভাল সব লিখে আসবে কথা দাও, তবে পথ ছাড়ব। নয়তো কাজ নেই।

বিধাতাপুরুষ বুঝিয়ে বলেন, দেখ মা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু ওঁরাই হলেন ওপরওয়ালা। ভাগ্য উপর থেকে ঠিকঠাক হয়ে আসে, কেরানি হয়ে সেইগুলো কপালে লিখে যাওয়া কাজ আমার। পারো তো ওঁদের গিয়ে চেপে ধরো, চুনো পুঁটির উপর তম্বি করে কী ফল?

বুড়ি ক্ষেপে গিয়ে বলে, পাচ্ছি কোথা মুখপোড়া দুটোকে? কৈলাসে আর গোলকধামে লুকিয়ে বসে থাকে, নিচে মুখো হয় না। ঢাকঢোল পিটে পুজো-আচ্চা করে কত তোয়াজে লোকে ডাকাডাকি করে—নৈবিদ্যির লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে খপ্পরে একবার আনতে পারলে হয়, তখন আর ছেড়ে কথা কইবে না। তারাও কম সেয়ানা নয়, বোঝে সমস্ত। যত যা-ই কর, কানে ছিপি এঁটে বসে আছে। অবিচার অনাচার তো কম হচ্ছে না—বাগে পেলে কৈফিয়ৎ চাইবে। সেই ভয়। সেই-জন্য দেখা দেয় না।

বলে বুড়ি একেবারে চুপ। বিধাতাপুরুষ কত রকম খোশামুদি করেন, কিন্তু গভীর ঘুম ঘুমাচ্ছে সে। এদিকে রাতের মধ্যে মর্ত্যধামের কাজ সারা করে ফিরতে হবে। না হলে বিষম কেলেঙ্কারি—সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর তিন যুগের মধ্যে যা কখনো হয়নি।

তখন বিধাতা পুরুষ বলেন, শোন বলি ভালমানুষের মেয়ে। জেলের বেটার হাতে তো রাজদণ্ড দেওয়া যাবে না, জালই হাতিয়ার। তোমার খাতিরে খানিকটা আমি বাড়িয়ে লিখে যাচ্ছি—জাল ফেললে ভাল মাছ একটা অন্তত পড়বেই। নাতির

অন্নের অভাব হবে না। লেখার প্যাঁচে এইটুকু করে যাব, ব্রহ্মা-বিষ্ণু ধরতে পারবেন না।

বিধাতার মুখ দিয়ে যা বেরুল, তার অন্যথা হবে না। একটুখানি ভেবে নিয়ে বুড়ি পথ ছেড়ে দেয়। আর খলখলিয়ে হাসে আপনমনেঃ ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি। যে কথা বলে ফেলছ ঠ্যালাটা বুঝবে হাঁদারাম ঠাকুর।

বড় হল সেই নাতি। নাতিকে বুড়ি গাঙে খালে জাল ফেলতে দেয় না। বলে, জাল ভিজে যাবে, গায়ে কাদা লাগবে তোর। কোথায় পাতবি রে আজকের জাল? আমি বলে দিচ্ছি—বাড়ির উঠানে।

রাত দুপুরে জালে জড়িয়ে গিয়ে রুইমাছ উঠানের উপর লেজের ঝাপটা দিচ্ছে।

পরের রাত্রে জাল কোনখানে পাতবে? ঘরের চালে। খানিক পরে চালের উপর যথারীতি মাছের আফালি।

বুড়ি বলে দেয়, উই যে লম্বা তালগাছটা—বাঁশটাঁশ বেঁধে কষ্ট করে ওর মাথায় উঠে আজ জাল পেতে আসবি।

বিধাতাপুরুষ তো নাকের জলে চোখের জলে। জলে জাল ফেললে তাড়িয়ে-তুড়িয়ে একটা মাছ জালে ঢোকালেই হয়ে যেত। এখন নিজেকেই জলের মাছ ধরে কাঁধে বয়ে কখনো ঘরের চালে উঠে, কখনো বা গাছের মাথায় চড়ে জালে ঢুকিয়ে আসতে হয়। বুড়ো হয়ে পড়েছেন, চোখে আবছা দেখেন—বেকায়দা পা ফেলে হুড়মুড় করে নিচে না পড়েন, প্রতিক্ষণে এই ভয়। অথচ না করে উপায় নেই, দেবতার বচন মিথ্যে হয়ে যাবে তা হলে।

বুড়িরও দুর্বুদ্ধির অন্ত নেই। সুঁইকাটা ও সেঁজির জঙ্গলে ভরা একটা জায়গা—দিনের আলোয় অতি সতর্ক হয়ে ঢুকলেও আট-দশ গণ্ডা কাঁটা ফুটে যাবে—নাতিকে বলছে, ঐ কাঁটাবনে জাল পেতে আয় দিকি। রাগে রাগে বিধাতা-পুরুষ খড়ি পেতে হিসাবে বসলেন—কদ্দিন আর জ্বালাবে বুড়িটা, কত বছরের পরমায়ু। সে-ও দেখলেন বিশ বছর এখনো। এই বিধাতাপুরুষই একদিন অঢেল পরমায়ু কপালে লিখে দিয়েছেন, এমনি করেই তার শোধ তুলছে। নাতিটা বুড়ির বুদ্ধি শুনে অস্থানে-কুস্থানে জাল পেতে নিশ্চিন্তে নিদ্রা দেবে, বিধাতাপুরুষ তখন জল ঝাঁপিয়ে মাছ ধরে বেড়াবেন, মাছ না পেলে জেলেদের জিয়ানো মাছ চুরি করে এনে মহিমা বজায় রাখতে হবে। বিশ বছর ধরে প্রতিরাত্রে এই কাণ্ড। গোঁয়ার জেলেগুলো টের পেলে পিটিয়ে আধ-মরা করবে। জাল হাতে নিয়ে তবু করে বেড়াতে হবে এই সব। দেবতা হওয়ার গেরো এমনি।

সাহেবেরও. ঠিক বিধাতাপুরুষের দশা। রানীর কাছে কী কুক্ষণে ঐ দেবতা হল, সারাজীবনে দেবতাগিরি ছাড়ল না। কত জায়গায় কতবার দেবতা হয়েছে! দেবতা আর সিঁধেল চোর উভয়েই অন্তর্যামী। আশালতার বর হয়ে সেই যে গয়না সরাল (আসল বরেও গয়না সরায়, সাহেব স্বচক্ষে দেখেছে)—আরও একবার সিঁধ কেটে তার ঘরে ঢুকেছিল। আশালতার শ্বশুরবাড়ি—বরের সঙ্গে সেই ঘরে সে আছে।

পাকা দালানে বড় করে সিঁধ কাটা—কিন্তু ঢুকে পড়ে শুধুমাত্র দেবতার কাজ করে বেরিয়ে আসে। বর বউয়ে ভাব জমিয়ে দিয়ে। ডেপুটির কাছে মিথ্যা জবাবদিহি করে, কারিগরের পক্ষে যার চেয়ে বড় অন্যায় হয় না।

কাজ একখানা নেমে যায়, হয়তো পনের-বিশ মিনিটে। কিন্তু গোড়া বাঁধতে হয় বিস্তর কাল ধরে। দরকারি ছাড়া বেদরকারিও কত বস্তু নজরে এসে যায়। সাহেবের ওস্তাদ পচা বাইটার নিজেরই এক ব্যাপার। পচার বুড়ি-মা হাঁপানি-কাশিতে ভুগছে, ভাল পুরানো-ঘি মালিশের প্রয়োজন। খান তিনেক গ্রাম পার হয়ে গিয়ে চকদার পুঁটে চক্কোত্তির বাড়ি—পচা বাইটা চক্কোত্তির কাছে গিয়ে পুরানো-ঘি চাইল।

চক্কোত্তি আকাশ থেকে পড়েন ঃ আমি কোথা পুরানো-ঘি পাবো ?

পচা বাইটার নাম জানেন চক্কোত্তি, দস্তুরমতো সমীহ করেন তাকে। বলছেন, পুরানো-ঘি নেই আমার বাড়ি। থাকলে তোমার কাজে একটুখানি দিতে আপত্তি করব কেন ?

সত্যি জানেন না ?

পৈতে ছুঁয়ে দিব্যি করছি পঞ্চানন।

পচা বলে, হতে পারে। আপনার পিতামহ রামকিশোর চক্কোত্তি মরবার সময় বলতে ভুলে গেছেন। পুবের ঘরের যে সিঁদুরের খুঁটি আছে, তার গোড়ায় খুঁড়ে দেখুন। আমার সামনে খুঁড়ুন। রামকিশোর চক্কোত্তি মেটে ভাঁড়ে পাঁচ সের ঘি পুঁতেছিলেন পুরানো-ঘি করবার জন্য। বছর চল্লিশ মাটির নিচে আছে।

সত্যি সত্যি ঘিয়ের ভাঁড় পাওয়া গেল। চল্লিশ বছর আগে খোঁজদারির কাজে এসে পচা বাইটা দেখে গিয়েছিল। বাড়ির কেউ জানে না, পচা এসে ঠিক ঠিক বলে দিল। তবে আর অন্তর্যামী নয় কিসে ?

নফরকেষ্ট এক গাদা গয়না নিয়ে এলো। মাথার চুল থেকে পায়ের আঙুল অবধি—যেখানে যেটি পরতে হয়। বলে, যা-কিছু ছিল, বেচে খেয়ে তো বসে আছ। পরো দিকি—মানায় কেমন দেখা যাক।

নফরকেষ্টর রকম দেখে সুধামুখী হাসে ঃ বুড়ো হয়ে গেলাম, ছেলে বড় হয়ে গেছে, এখন এই পরতে যাচ্ছি !

তা পরবে কেন ! ভস্ম মাখা সন্ন্যাসিনী হয়ে থাক। আবার বল, মানুষ আসে না। আসবে কেন শুনি ? বলি, মানুষ তো এ-পাড়ায় যোগ-তপস্যা করতে আসে না। সেই ইচ্ছা হলে শ্মশানে-মশানে যাবে।

কথা যা বলছে সত্যি। ভেক নইলে ভিখ মেলে না। তবু ইতস্তত করে সুধামুখী। গয়না নাড়াচাড়া করে, হাসে ফিকফিক করে। নফরকেষ্ট আগ্রহ ভরে তাকিয়ে। সুধামুখী বলে, পেটের দায়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়, কিন্তু সত্যি বলছি বড় লজ্জা আমার এখন। ছেলের চোখের উপর দিয়ে যাইনে। সাহেবও বোঝে, তখন সে বাড়ির ত্রিসীমানায় থাকে না।

কথায় কথা এসে পড়ে। সুধামুখী বলে, তোমায় আসল যে কথাটা বললাম, তার কিছু করলে না এখনো। রাত্রে কেন সাহেব ঘাটে পড়ে থাকবে, একটু শোওয়ার জায়গা করে দাও খাড়ির মধ্যে। বড় কষ্ট ওর, কষ্ট আমারও। কোথায় গিয়ে পড়ে আছে, শোওয়ার আগে একটিবার দেখে আসি। না দেখে পারা যায় না। লণ্ঠন হাতে করে ঘাটে ঘাটে ঘুরি। এক রাত্রে খুঁজে খুঁজে আর পাইনে। শেষটা যা দেখলাম—মাগো মা, মনে পড়লে এখনো বুক কাঁপে। সিঁড়ির রানার উপর বসেছিল বোধহয়, অমনি ঘুম এসে গেছে। অথবা গুমোট গরম বলে ইচ্ছে করে বাবু গিয়ে জলের ধারে শুয়ে পড়েছে। এগিয়ে দেখি, জোয়ারের জল উঠে রানার উপরটাও প্রায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ইঞ্চিখানেক হয়তো বাকি। আর একটু হলে সাহেবকেও নিয়ে যেত—একদিন ভেসে এসেছিল, আবার তেমনি যেত চলে। অমন আর না শোয়, কড়া করে বলে দিয়েছি—গিয়ে গিয়ে দেখেও আসি। কে জানে কোন বেপরোয়া হতচ্ছাড়া বাপের বেটা—এক তিল ওকে আমি বিশ্বাস করিনে। ভয়ে কাঁপি সর্বদা। ছেলের ব্যবস্থাটা তুমি সকলের আগে করে দাও নফর।

নফরকেষ্ট বলে, বাঁশ দড়ি হোগলা দেখে দরদাম করে এসেছি। কাল হবে। কাল সন্ধ্যের মধ্যে সাহেববাবুর আলাদা ঘর। কিন্তু আমি যে পয়সা খরচ করে জিনিস-গুলো নিয়ে এলাম, একটিবার পরে দেখাবে না?

খরচ করে ভালবেসে দিচ্ছে, কে দেয় এমন! গয়না নিয়ে সুধামুখী পরছে একটি একটি করে। সাহেবের কথার শেষ হয় না—মুচকি হেসে আবার বলে, সবই তো হল নফরকালি। কিন্তু ছেলে দিনমানেই বা এমন পথে পথে ঘুরবে কেন? করপোরেশনের ইস্কুলে মাইনেকড়ি লাগে না—এক একবার ভাবি, ঐখানে জুতে দিলে কেমন হয়!

এবার নফরকেষ্ট এক কথায় সায় দিতে পারে না: ইস্কুলে যাবে সাহেব—ইস্কুলে গিয়ে কোন চতুর্ভুজ হবে?

সুধামুখী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, হাতের লেখা মুক্তোর মতো। ছাপা বই বানান করে পড়ে যায়। আমি একটু-আধটু বলে দিই, বাকি সমস্ত নিজের চেষ্টায়। কে জানে কোন বড় বিদ্বানের বেটা—যেমন সাফ মাথা তেমনি স্মরণশক্তি। ছ-মাস এক বছর যদি একটু মাস্টারের কাছে বসতে পায়, সাহেব আমাদের কী হয়ে দাঁড়াবে দেখো। বিদ্যের কত কদর, তুমিই তো বলে থাক। তোমারই ছোট ভাইয়ের কাজ গদি-মোড়া চেয়ারে বসে দশ-বিশটা সই করা, দুটো-চারটে হুকুম-হাকাম ছাড়া। সেই কারখানার আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে সর্বক্ষণ তোমায় সিদ্ধ হতে হয়। মাইনের বেলাও ভাইকে দেয় চারগুণ।

এইসব তুলনা এবং বিদ্যার গুণাগুণ নফরকেষ্টর ভাল-লাগে না। এড়িয়ে যেতে চায়। সুধামুখীকে তাড়া দিচ্ছে: হল তোমার? হাত চালিয়ে পরো। সেই পুরানো ডেরায় যাব একবার। রুজি-রোজগারে নামতে হবে। বউয়ের টাকা প্রায় ফুঁকে এলো।

এই স্বভাব নফরকেষ্টর। একটা কাজ করে সেই মুহূর্তে ফলাফল দেখতে চায়।

গয়না পরা হয়ে গেল। নফর ধাঁ করে খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ঘাড় কাত করে নিবিষ্ট হয়ে দেখে। টিকলিটা সরিয়ে কপালের ঠিক মাঝখানে এনে দেয়। শেষ পোঁচড়া মেরে কুমোর যেমন এগিয়ে পিছিয়ে নিজের হাতের প্রতিমা দেখে।—দেখে নফর প্রসন্ন হল ঃ বাঃ বাঃ, তুমি নাকি মন্দ! গয়না পরে মেয়ে-মানুষগুলো একেবারে আলাদা হয়ে যায়। আমার ঝানু বউ ষোলআনা সেটা জানে, সারাদিনমান গয়নার ঝিলিক দিয়ে বেড়ায়। শুয়ে পড়লে গায়ে ফোটে—রাত্তিরবেলা ঘরে এসে তাই গয়না খুলত। তখন দেখতাম। বলব কি সুধামুখী, রূপ সঙ্গে সঙ্গে সিকিখানা। পিদিম নেভালে যেমন সব অন্ধকার হয়ে যায়।

একগাল হেসে বলে, তোমারও ঠিক তাই। গয়নায় বাহার খুলে দিয়েছে। কিন্তু বেশি পরে থেকো না, গিল্টি চটে ভিতরের মাল বেরিয়ে পড়বে। সারাক্ষণের গরজই বা কি—এই সন্ধ্যের দিকে ঘণ্টা তিন-চার গায়ে থাকবে। এসব হল ব্যবসার সরঞ্জাম। আমার কাঁচিখানা কাজে অকাজে কেবলই যদি চালাই, ধার ক'দিন থাকবে? আর বলে দিয়েছে, আমরুল-পাতা কিম্বা সিদ্ধ-কাঁচাতেঁতুল দিয়ে মাসে একবার করে মেজে নিতে। গয়না চকচক করবে, চেকনাই এক-পুরুষ দু-পুরুষ বজায় থাকবে।

সুধামুখী বলে, দেখতে কিন্তু অবিকল গিনিসোনা। তফাৎ ধরা যায় না।

নফরকেষ্ট বলে, গিল্টির যুগ চলেছে—দুনিয়াসুদ্ধ এই। চোখের দেখা নিয়ে ব্যাপার—কষ্টিপাথর নিয়ে কে ঠুকে দেখতে যাচ্ছে? এ বাজারে খাঁটি সোনার কাজ যারা করে, তারা হল পয়লানম্বরি আহাম্মক।

সুধামুখীও মনে মনে মেনে নেয়। আদরের মেয়েকে পারুল শখ করে মাকড়ি কিনে দিল, তা-ও গিল্টি। শুধু গয়নাই বা কেন, গয়না-পরার মানুষগুলো অবধি গিল্টি।

দরজায় পাশে খাসা একটুকু জায়গা। দু-কোদাল মাটি ফেলে জায়গাটা আরও একটু না হয় উঁচু করে দেওয়া যাবে। মাথার উপরে হোগলার আচ্ছাদন। সাহেবের শোবার জায়গা। রাজ-অট্টালিকা হার মেনে যায়। খাসা হবে, সুধামুখী বলেছে ভাল।

নফরকেষ্টর যে কথা সেই কাজ। হোগলা বাঁশ পরের দিনই এসে পড়ল। আর একজন ঘরামি মিস্ত্রি। মিস্ত্রির সঙ্গে নিজেই সমস্তটা দিন জোগাড় দিচ্ছে। যত ভাবছে, ততই খুশি হয়ে ওঠে। জল খেতে একবার সুধামুখীর রান্নাঘরে গিয়েছে, বলে, বেড়ে বুদ্ধি বের করেছ তুমি। দরজার পাশে শুয়ে থেকে সাহেব আমারও দোর খুলে দেবে। কড়া নেড়ে বাড়িসুদ্ধ লবেজান করতে হবে না। একবার একটুখানি ওঠা—তারপরে ঘুমোক না পড়ে পড়ে রাতভোর এক পহর বেলা অবধি ঘুমোক—ঘাটের লোকের মতো কেউ খিঁচোতে যাচ্ছে না।

ছাউনি সারা হয়ে গেল। নফরকেষ্ট কখনো পিছিয়ে, কখনো ডাইনে কখনো বা বাঁয়ে ঘুরে মুগ্ধ চোখে দেখছে। গয়না পরিয়ে সুধামুখীকে যেমন দেখেছিল কাল। হাঁ, সত্যিকার ঘরই বটে! বসা যায়, দাঁড়ানো যায়।—পুরোপুরি পা

মেলে টান-টান হয়ে শোওয়া যায় কিনা, তারও একটা পরীক্ষা হওয়া নিশ্চয় উচিত।

সাহেব অদূরে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে ঘর বাঁধা দেখছে। নফরকেষ্ট ডাক দেয়ঃ দেখিস কী রে ছোঁড়া! কলকাতার উপর এমন একখানা আস্তানা—লাট-সাহেব পেলেও তো বর্তে যাবেন। মাদুর নিয়ে এসে লম্বা হয়ে পড় দিকি এইবারে।

ডাকছে সাহেবকে, কিন্তু ডাক নয়—মেঘগর্জন। গলার স্বর আর কথাবার্তার ধরনই এই। চেহারায় ও কণ্ঠে মণিকাঞ্চন যোগাযোগ হয়েছে। পারতপক্ষে কেউ সে জন্যে কাছ ঘেঁসে না। নানান কথা নফরকেষ্টকে নিয়ে—সে নাকি ডাকাত, খুনই করেছে পনের-বিশটা, তার মধ্যে বিনা অস্ত্রে হাতের থাপ্পড়েই বা কত! দেখে তাই মনে হবে বটে। এ হেন চেহারা সত্ত্বেও নিস্ফলা ফেরে না কেবল তার হাতখানার গুণেই। আহা-মরি কী একখানা হাত—অতি-সূক্ষ্ম যন্ত্রের মতো কাজ করে যায়। হাত নিয়ে নফরার বড্ড দেমাক।

নফরা বলছে, শুয়ে পড় সাহেব, দেখব। সারাদিন রোদে খেটে চেহারা আজ আরও উৎকট। শুতে বলছে, কাঁচা মাটির উপর—শুইয়ে ফেলে তারপরে কি করবে কে জানে। ভয় পেয়েছে সাহেব, থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অবাধ্যপনায় নফরকেষ্ট রেগে গেল। গর্জনই এবার সত্যি সত্যিঃ হাঁ করে দেখিস কি! কথা বুঝি কানে যায় না? মাদুর নিয়ে চোদ্দ পোয়া হয়ে পড়। চিত হয়ে শো, কাত হয়ে শো—জায়গায় কুলোয় কিনা দেখতে চাই।

কিন্তু তার আগেই ভীত সাহেব বোঁ করে ছুট দিয়েছে। তবে রে—বলে নফর-কেষ্টও ছুটল। রোখ চেপেছে—ধরে ঐখানে এনে শোয়াবে। এখনই এই মুহূর্তে। তার যে স্বভাব—কাজ করলে ফলাফলটা চাই নগদ নগদ। সুধামুখী রান্নাঘরে তখন। ছুটতে ছুটতে সাহেব সেখানে গিয়ে পড়ে। একেবারে কোলের পাশটিতে। চোখ পাকিয়ে বাইরে তাকিয়ে সুধামুখী নফরকেষ্টকে দেখতে পায়।

ঐ তো সুধামুখী—কালো চামড়ায় ঢাকা হাড় কয়েকখানা। রেগে গেলে তখন ভিন্ন মূর্তি। নফরকেষ্ট হেন দৈত্যব্যক্তি কেঁচো একেবারে। সুধামুখী হুমকি দিয়ে ওঠেঃ কী হয়েছে?

নফরকেষ্ট মিনমিনে গলায় বলে, ছোটবেলা রান্নাঘরে সেই গোল হয়ে শুত। চিরদিন কেন একভাবে কষ্ট করবে? বলছিলাম, পা ছড়িয়ে একবার শুয়ে পড় বাবা। না কুলোলে জায়গা বাড়িয়ে দিতে হবে।

সুধামুখী রায় দিলঃ সে আমি দেখব। সরে পড় এখন তুমি। ছেলে ভয় পেয়ে গেছে।

মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে থেকে নফর চলে যাচ্ছে, সুধামুখী ডাকলঃ একটা কথা শুনে নাও। এদ্দিন যা হয়েছে তা হয়েছে, চালচলন বদলে ফেল এবারে। ভদ্দর হয়ে বেড়াবে। তোমার এই ভুতের মূর্তি দেখে ছেলে ভয় পায়। আমরাই আঁতকে উঠি, সে তো ছেলেমানুষ!

নফরকেষ্টর মনে বড় লাগল। বলে, মূর্তি এমনধারা হয় কেন, সেটা তো একটু-খানি ভেবে দেখবে! হোগলা এক বোঝা নিজে মাথায় করে পোলের ঘাট থেকে

নিয়ে এসেছি। সারাক্ষণ তারপরে ঘরামির সঙ্গে খাটনি। এসব তো চোখে পড়বে না, মূর্তিটারই দোষ হয়ে গেল।

সুধামুখী বলে, তোমার কথাবার্তাগুলোও ঠেঙা-মারা গোছের। সেই জন্যে কেউ দেখতে পারে না। নিজের বউও না। নরম হয়ে মিষ্টি করে বলতে শেখ এবার থেকে।

রাগে নফরার ব্রহ্মতালু অবধি জ্বলছে। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলল। আপন মনে গজর-গজর করছেঃ ঘরে নবকার্তিকের উদয়—মদনমোহন বেশে ফুলোটবাঁশি বাজিয়ে আমায় কথা বলতে হবে।

সুধামুখী জিজ্ঞাসা করে, কি বলছ নফর?

নফরকেষ্ট তাড়াতাড়ি বলে, নরমশরম হয়ে খুব মিঠে সুরেই বলব এবার থেকে। মনে মনে মহলাটা দিয়ে নিচ্ছি।

ঐ যে বলে দিল সুধামুখী, সত্যিই এর পরে নফরকেষ্ট সাহেবের সঙ্গে হেসে ছাড়া কথা বলে না। নফর হেন লোকের পক্ষে আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলা এবং কথায় কথায় হাসির ভাবে দাঁত বের করা—সে এক মর্মান্তিক ব্যাপার। ওর চেয়ে দশ ঘা লাঠি খাওয়া অনেক ভাল। তবু কিন্তু হাসতে হয় এবং গলা দিয়ে মোলায়েম আওয়াজও বের করতে হয়। না করে উপায় কী?

একদিন দৈবাৎ মেজাজ হারিয়ে ফেলে। বর্ষায় রাতদুপুরে ভিজে এসে তুরতুর করে কাঁপছে। দরজায় ঘা দিচ্ছে—ডেকে ডেকে সারা হল, সাহেবের সাড়া নেই। অথচ বৃষ্টির ছাট আসে বলে মাথার উপরের হোগলা ছাড়াও জায়গাটির চতুর্দিক দরমা দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। খেয়াল করে নিজেই সব করেছে, কেউ বলে দেয়নি—আহা, ভিজে যায় ছেলেটা, ঘুমের মধ্যে বুঝতে পারে না! আর অবিরাম বৃষ্টির মধ্যে নফরকেষ্ট ডাকাডাকি করে মরছে—জেগেও পড়েছে সাহেব, কিন্তু কম্বল আর চট গায়ে জড়িয়ে গুটিসুটি হয়ে আছে। আলস্য লাগছে, উঠতে ইচ্ছে করে না। তারপর নিতান্ত যখন দোর ভাঙাভাঙি শুরু করল, উঠে হুড়কো খুলে দেয়। নফরকেষ্ট অমনি ঠাস করে মারে এক চড়।

চড় মেরেই বিপদ বুঝেছে। শব্দ বেরুনোর আগেই সাহেবের মুখে হাত চাপা দিল। কাতরাচ্ছেঃ কাঁদিসনে বাপধন আমার। আমি এর শতেক গুণ মারগুতোন খেয়ে থাকি। মেরে মেরে লোকের হাত ব্যথা হয়ে যায়, তবু এক ফোঁটা চোখের জল বের করুক দিকি। সামান্য এক চড়ে গলে পড়বি তো কিসের পুরুষমানুষ তুই?

পুরুষালির গৌরবে সাহেব চোখের জলটা মুছে ফেলে, কিন্তু ফোঁপাচ্ছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, কেন মারবে আমায় তুমি? কী করেছি?

ঝোঁকের মাথায় হয়ে গেছে, বলছি তো! ঘাট মানছি। তোর বাপ থাকলে সে মারত না? ধরে নে তাই—আমি তোর বাবা। বাপের মতনই করি তোর জন্যে। শোওয়ার জায়গা ছিল না, পথে ঘাটে শুয়ে বেড়াতিস—গাঁটের পয়সা খরচা করে সেই সঙ্গে গতরে খেটে ঘর বানিয়ে দিলাম। মারই দেখছিস, ভাল কাজগুলো একবার

তো ভেবে দেখবি! পুরুষ হয়ে জন্মেছিস, কত জায়গায় কত মার খেতে হবে। একটা চড়ে ঘাবড়ে গেলে হবে কেন?

মুখের কথায় কতদূর চিঁড়ে ভিজবে, ভরসা করা যাচ্ছে না। লেন-দেনে আসাই নিরাপদ। নফরা বলে, বেশ তো, যেমন মেরেছি রসগোল্লা খাওয়াব তোকে। সেদিন হয়েছিল, কাল সকালে আবার একদফা। যতবার মারব, ততবার খাওয়াব—এই কথা রইল। সকালবেলা দোকানে নিয়ে যাব। না নিই তো কুক ছেড়ে তখন কাঁদিস। কান্না তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না, এখন মুলতুবি রেখে দে।

পরদিন বেরোবার মুখে নফরকেষ্ট সত্যিই সাহেবকে ডাকছে: চল্—

মনমেজাজ রীতিমত ভাল। সাহেবের উপর বড় খুশি, চড় খাবার কথা সাহেব সুধামুখীকে বলে নি। বলে, মনে পড়ছে না? রসগোল্লা খেতে হবে যে দোকানে গিয়ে। আমায় এত ডরাস কেন বল দিকি? বাপকে যখন চিনিসনে, সে বাপ তো আমার মতোও হতে পারে। চেহারা খারাপ হলেই বাপ বাতিল করে দিবি?

হাত ধরে টান দেয়। লোহার সাঁড়াশি ঐ হাতখানা—সাহেবের নরম কবজি বুঝি গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যায়। আদর করে ধরেছে—রাগ করে ধরলে কী কাণ্ড না জানি!

ময়রার দোকানে গিয়ে উঠল। ময়রা পিতলের গেলাসে জল দিয়ে শালপাতা বের করে। নফরকেষ্ট হাঁ-হাঁ করে ওঠে: পাতায় কী ছেলেখেলা হবে গো! ওতে ক'টা মাল ধরবে? রস গড়িয়ে বাইরে যাবে। মালসা বের কর দিকি—দু-জনের দুটো মালসা।

সাহেব সভয়ে বলে, ওরে বাবা! পুরো মালসা খেতে হবে?

নফর সদয়ভাবে বলে, তুই ছেলেমানুষ, দশ-বারোটা না হয় কমই নে আগে। এই তো দুনিয়ার নিয়ম—যত মার, তত রসগোল্লা। এই লোভেই তো বেঁচে থাকা।

ময়রাকে ডেকে বলে দেয়, ছোট মালসা দাও ছোট মানুষটাকে। আমায় বড়। রস নিংড়ে দিও না, তাহলে অর্ধেক দাম। রসগোল্লা খেয়ে নিয়ে বাড়তি রসে চুমুক দেব।

সাহেবকেই সালিস মানে: কী বলিস তুই—অ্যাঁ? পয়সার মাল চেটেপুঁছে খাব। বড্ড কষ্টের পয়সা রে—

ময়রা মালসা ধুচ্ছে ওদিকে গিয়ে। সেই ফাঁকে নফরকেষ্ট মনের কথাটা বলে নেয়: বয়স হয়ে চেহারা বেঢপ হয়ে গেছে, একলা রোজগারের আর তাগত নেই। তুই আমার ডেপুটি হবি সাহেব? ডেপুটি বলিস কি খোঁজদার বলিস। একেবারে সোজা কাজ। ঘোরপ্যাঁচ যেটুকু, সে রইল আমার ভাগে। সুধামুখীকে বলবিনে কিন্তু—খবরদার, খবরদার! কাউকে বলবি নে, মা-কালীর কিরে। তোকে যদি কাজের মধ্যে পাই, বাপে বেটায় আমরা ধুন্ধুমার লাগিয়ে দেব? যাবি?

রসগোল্লা এসে পড়ায় পরামর্শটা চাপা পড়ল। সময় নষ্ট না করে নফরকেষ্ট আরম্ভ করে দিয়েছে। কী তাজ্জব কাণ্ড—সাহেব নিজে খাবে, না নফরের খাওয়া দেখবে তাকিয়ে তাকিয়ে? তাই বটে, অমন পাথুরে গতর এমনি হয় না। রসগোল্লা

সোজাসুজি সে গালে নেয় না। বাহার হয় না বোধকরি তাতে। ছুঁড়ে দেয় উপরমুখে, হাঁ করে তারপর গালে ধরে নেয়। পল্লীগ্রামে নাটাখেলা দেখা আছে—কিম্বা গুঁটিখেলা? অবিকল সেই বস্তু। গোড়ায় একটা করে ছুঁড়ে দিচ্ছে, হাত এসে গেলে তখন দুটো তিনটে চারটে অবধি। শেষটা এত দ্রুত, যে নিরিখ করা যায় না চোখে। লম্বাপানা একটা বস্তু তীরবেগে খানিকটা উপরে উঠে ভেঙে এসে মুখগহ্বরে ঢুকছে, এইমাত্র বোঝা যায়। কোঁত-কোঁত করে গিলে খাওয়ার আওয়াজ—গালের মধ্যে বস্তুগুলো তিলেক দাঁড়াতে দেয় না, গিলে ফেলে পরবর্তীর জায়গা খালি করছে।

খেয়ে ঢেকুর তুলে তার উপরে ঢকঢক করে গেলাস দুই-তিন জল চাপান দিয়ে তখন সাহেবের দিকে দৃষ্টি পড়ে। হতাশ ভাবে বলে, নাঃ, কোন কাজের নোস তুই। পরের পয়সায় খাবি, তা-ও পেরে উঠলিনে। নিজের পয়সায় হলে তো বাবুভেয়ের মতন আধখানা কামড়ে রেখে দিতিস। খাটতে হবে তোর পিছনে—কাজ শেখাতে হবে, খাওয়াও তো শেখাতে হবে দেখছি।

রাস্তায় নেমে সেই নতুন কাজের আরও ভাল করে হদিস দিয়ে দিচ্ছেঃ আজকের দিনটা থাক, কাল থেকে আমরা বেরিয়ে পড়ব—উঁ? পয়সাকড়ি তোর আমার কাছে না থাক, হাজার হাজার মানুষ নিয়ে ঘুরছে। ধনদৌলতের দেবতা কুবের যত হাঁদারামকে বেছে বেছে টাকা দিয়ে দেন, মুটে হয়ে তারা পকেটে পকেটে বয়ে বেড়ায়। সেইগুলোই ভাণ্ডার আমাদের—খুশি মতন তুলে নিই। নিয়ে তারপরেই ফুর্তিফার্তি, ময়রার দোকানে রসগোল্লার মালসা নিয়ে বসা।

কিন্তু পরদিন সকালে উল্টো কাজ এসে চাপল ঘাড়ে। ইস্কুলে দেবেই সাহেবকে, সুধামুখী ঠিক করে ফেলেছে। নিজেই সেই ইস্কুলে চলে গিয়েছিল। সুধামুখীর সঙ্গে সম্পর্কের কথা শুনলে তো সঙ্গে সঙ্গে হাঁকিয়ে দেবে। গিয়ে তৃতীয় ব্যক্তির মতো খবরাখবর জেনে এল শুধু। হেডমাস্টার বলে দিয়েছেন, হাঙ্গামা নেই, অভিভাবক ছেলে নিয়ে আসুন, ভর্তি হয়ে যাবে।

নফরকেষ্টকে বলে, তুমি নিয়ে যাও।

ওরে বাবা!

সুধামুখী গরম হয়ে বলে, পয়সা খরচ করতে হবে না—শুধু একটু সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া। তাই তুমি পারবে না?

করুণ অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে নফরকেষ্ট বলে, ভয় করে আমার।

কিসের ভয়?

দৈত্যসম মানুষটার ইস্কুল-পাঠশালে বিষম ভয়। শৈশবে তাকেও কিছুদিন যেতে হয়েছিল। একদিন গুরুমশায় এমন ঠেঙানি দিলেন, তারপরে আর কখনো পাঠশালা মুখো হয়নি। সেই আতঙ্ক রয়ে গেছে। খুনে মানুষ লোকে রটনা করে বেড়ায়—ভয়ডর বলতে কেবল এক পাঠশালার গুরুমশায়। ঐটে বাদ দিয়ে নফরকেষ্টকে যমের বাড়ি যেতে বল, হাসতে হাসতে সে চলে যাবে।

সুধামুখী চোখ পাকিয়ে সজোরে দিল ধাক্কা তার পিঠের উপরঃ যাও বলছি—

কী উপায়—চাকা গড়িয়ে দিলে গড়গড় করে চলবেই—নফরকেষ্ট সাহেবকে নিয়ে চলল! ভয়ের বস্তু ইস্কুল-পাঠশালাই কেবল নয়—সুধামুখীই বেশি। যাচ্ছে, আর গজরগজর করছে: দিগ্‌গজ পণ্ডিত হবে ইস্কুলে গিয়ে, এঁটোপাতের ধোঁয়া স্বর্গে গিয়ে উঠবে!

নফরকেষ্টর সঙ্গে ছেলে ছেড়ে দিয়ে সুধামুখী নিশ্চিন্ত নয়। মানুষটার হাড়হদ্দ জেনে বসে আছে, ইস্কুলে বলে তার ইচ্ছামতো কোন একখানে নিয়ে না তোলে। নিজে চলল পিছু পিছু। ইস্কুলের কাছাকাছি এক গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে নজর রাখে।

কতক্ষণ পরে দুজনে বেরিয়ে আসছে। নফরকেষ্ট হাসিতে ডগমগ। চোখ তুলে দূরবর্তিনী সুধামুখীকে এক নজর দেখে নিয়ে চাপা গলায় সাহেবকে উৎসাহ দিচ্ছে: ঘাবড়াসনে। ইস্কুল এক বেলা বই তো নয়! বিকেল আর সন্ধ্যাটা পুরো হাতে রইল। যত ভাল ভাল কাজ সন্ধ্যার পরেই। কপালে লেগে গেল তো রোজগার মুঠোয় ধরবে না। আমি তো বলি ভালই হল, দুটো পথই তোর দেখা হয়ে যাচ্ছে। কোনটায় বেশি মুনাফা এখন থেকে বুঝেসমঝে রাখবি। কলম ঘষে, না কাঁচি ধরে? বড় হয়ে যখন নিজের ইচ্ছেয় সবকিছু হবে, পছন্দমতো বেছে নিস।

সুধামুখী প্রশ্ন করে, হয়ে গেল?

নফরকেষ্ট একগাল হেসে বলে, ছেলের বাপ হয়ে এলাম। পাকা খাতায় রেজিষ্ট্রি-করা বাবা। ছেলে গণেশচন্দ্র পাল, পিতা শ্রীনফরকৃষ্ণ পাল।

সুধামুখী রাগ করে বলে, তুমি বাপ হতে গেলে কোন বিবেচনায়? সাহেবের বাপ মস্ত বড়মানুষ, ছেলের চেহারা দেখে যে না সে-ই বলবে। তুমি বড় জোর সে বাপের সহিস-কোচোয়ান।

নফরকেষ্টর মুখের হাসি নিভে গেল। বলে, বাপের নাম জিজ্ঞাসা করল। যে ছেলের বাপের ঠিক নেই, সে ছেলে ইস্কুলে ভর্তি করে না। তখন বলতে তো হবে একটা-কিছু!

সুধামুখী বলে, এমনি তো মুখ দিয়ে তড়বড় করে লম্বা লম্বা কথা বেরোয়। ভাল লোকের নাম একটা বানিয়েও বলতে পারলে না?

নফরকেষ্ট বলে, মুখে বলে দিলে হয় না, খাতার উপর সই করিয়ে নেয়। বাপের নাম বললাম—নবাব সিরাজদ্দৌল্লা কি সেনাপতি মোহনলাল। তখন খোঁজ পড়ত কোথায় সেই সিরাজদ্দৌল্লা?—এসে সই মেরে যাক। নফরকেষ্ট পাল বলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাঙ্গামা চুকিয়ে এলাম। কাজটা বড় অন্যায় করেছি!

সুধামুখীকে চুপ করে যেতে হয়। এ ছাড়া উপায় ছিল না বটে! পাকেচক্রে বাপ হয়ে গিয়ে নফরের স্ফূর্তি খুব। সুধামুখী কেবলই দমিয়ে দেয়, ক্ষেপিয়ে মজা দেখে। ইস্কুলে সহেব ধাঁ-ধাঁ করে এগিয়ে যাচ্ছে, ক্লাসের সেরা ছেলে। সগর্বে সুধামুখী বলে, এঁটো-পাতের ধোঁয়া বলতে, এঁটো-পাত কি ধূপ-চন্দন বোঝ এবারে। তুমি এখনো নিজের নামে 'ফ'-এর জায়গায় 'ঝ' লিখে বোসো। কোন সুবাদে তোমার ছেলে হতে যাবে? ওর বাপ মস্তবড় পণ্ডিত।

নফরকেষ্ট তর্কে হারবে না: ও লাইন আমি যে বাতিল করে এসেছি। আমার যে লাইন, সাহেবকে সেইখানে ফেলে তবেই বিচার হবে। হাত সাফাইয়ের কাজে

নফরা পালকে কেউ যদি কোনদিন হারাতে পারে, সে আমাদের এই সাহেব। কেষ্টঠাকুর গোকুলে বাড়ছে।

হাত নিয়ে বড় দেমাক নফরকেষ্টর। অনেক দিন পরের এক ব্যাপার বলি, ফুলহাটায় জগবন্ধু বলাধিকারীর বাড়ি। কাজের গল্প করছে নফরা—যেমন তার অভ্যাস। ভানুমতীর ভোজবিদ্যা কোথায় লাগে নফরার সেই সব কাজের কাছে!

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য ও আরও অনেকে আছে। সাহেব তো আছেই। তাজ্জব হয়ে শুনছে সকলে। বলতে বলতে নফরকেষ্ট উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ডান হাতখানা বাড়িয়ে ধরে বলে, চাঁদি রুপোয় বাঁধিয়ে রাখবার মতো এই হাত। সুড়সুড় করে লোকের পকেটে ঢুকে যায়। সুড়সুড় করে বেরিয়ে আসে পুকুরের মাছ জালে ছেঁকে তোলার মতন সর্বস্ব মুঠোর ভিতর নিয়ে। স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ত্রিভুবনের মধ্যে বের করো দিকি আমার মতন এমনি একখানা হাত।

কখন এসে বলাধিকারীও দাঁড়িয়েছেন—হাসির শব্দে টের পাওয়া গেল। হাসতে হাসতে বলেন, হাজার লক্ষ রয়েছে নফরকেষ্ট। তোমার হাত কোন ছার সে তুলনায়। টাকাটা-সিকেটা তোমার দৌড়, লাখ লাখ কোটি কোটির নিচে তাদের নজর নামে না। কৌশলও পরমাশ্চর্য—অঙ্গ ছুঁতে হবে না, যার পকেটের যত টাকা ঠিক ঠিক বেরিয়ে কারিগরের কাছে চলে যাবে।

এ হেন গুণী ব্যক্তিদের কথা সবিস্তারে শুনতে কার না লোভ হয়। উৎকর্ণ সকলে। জগবন্ধুও বললেন অনেক কথা। কিন্তু টাকাকড়ি ঘটিত গোলমেলে সব ব্যাপার। মুর্খলোকের বুঝবার নয়। এইটুকু বোঝা গেল, দুনিয়া জুড়ে ছিনতাই। ক্ষিধে ক্ষিধে করে লোকে কাঁদছে—সকাল থেকে রাত দুপুর অবধি খেটেও ক্ষিধে মারবার জোগাড় করতে পারে না। আবার ভিন্ন এক দল পায়ের উপর পা দিয়ে বসে ক্ষিধে নেই বলে কাঁদছে এক চামচ দুধ খেলেও পেটের মধ্যে গিয়ে পাক দেয়। ক্ষিধে কিসে হয়, সেই জন্য কান্না।

গয়নায় কাজ দিচ্ছে—যাই বলো। বউয়ের কাছ থেকে মাহাত্ম্য বুঝে এসেই নফরকেষ্ট সুধামুখীকে কিনে দিয়েছে। নানা রকম তুকতাক চলে এদের মধ্যে—মন্ত্র আছে, কবচ আছে, শিকড়বাকড় আছে। ভূতপেত্নী তাড়ানোর ব্রহ্মকবচের কথা সেই বলেছিল নফরকেষ্ট, আবার উল্টো রকমের মনোমোহন—কবচও রয়েছে ভূতপ্রেত কাছে টানা যায় যার গুণে। আঁধার রাতবিরেতে নাগর রূপে ঘোরাফেরা করে, ভূত বই তারা অন্য কিছু নয়। কন্ধকাটা-ভূত গো-ভূত—তেমনি হল নাগর-ভূত। মনোমোহন-- কবচ রাঙা সুতোয় বাম বাহুতে ধারণ করতে হয়। কাজল-পড়া অর্থাৎ মন্ত্রপূত কাজল দু-চোখে পরতে হয়। শিকড়-বাকড়েরও নানা রকম বিধি। কিন্তু সকলের সেরা দেখা যাচ্ছে গয়না। প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, কাজ পেতে দেরি হয় না।

পথচারীরা ইদানীং দেখছে খুব চোখ মেলে—দেখে সুধামুখী মানুষটা অথবা মানুষটার গা-ভরা গয়না, সঠিক বলা যায় না। নফরকেষ্টর টোপ ফেলে মাছ ধরার কথাটা এখানেও খাটে। গয়না হল টোপ, সুধামুখী বড়শি। কালো বড়শি লোভনীয়

টোপে ঢেকে দিয়েছে। সেই টোপে পাঁচটা মানুষ হয়তো দৃষ্টির ঠোক্কর দিয়ে সরে গেল, একটা কি গিলবে না শেষ পর্যন্ত? তা হলেই হল।

একদিন ভারি একটা শৌখীন লোক ফাঁদে পড়ে গেল। সুধামুখী যথারীতি গলির মোড়ের আবছা-অন্ধকার তার নিজস্ব জায়গাটিতে। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে লোকটা গটগট করে সোজা কাছে চলে আসে। এবং পিছন পিছন নয়, পাশাপাশি কথা কইতে কইতে গলি পার হয়ে একেবারে ঘরের মধ্যে। সুধামুখীর চেয়ে বয়সে ছোট বলেই মনে হয়। আর বাহারখানাও সত্যি দেখবার মত। দু-হাতের দশ আঙুলে আংটি, বুড়ো আঙুল দুটো কেবল বাদ। কিন্তু সে ক্ষোভ পুষিয়ে নিয়েছে অনামিকা ও মধ্যমায় দুটো করে আংটি পরে। সবসুদ্ধ মিলে পুরো ডজন।

দরজার পাশের ঘরটুকুতে সাহেবের এ সময় থাকার কথা নয়, তবু কি গতিকে আজ ছিল। সুধামুখীর সঙ্গে লোকটা ঘরে গেল এসেন্সে উগ্র গন্ধে চারিদিক মাতিয়ে দিয়ে। ঘরের মধ্যে ঢুকে গেছে, গন্ধ তবু বাতাসে ভাসে। কী খেয়াল হল, সাহেবও উঠে পড়ে। পা টিপে টিপে এগোয়, উঁকি দেয় জানলা দিয়ে। সুধামুখী বাবুটিকে বিছানায় নিয়ে বসিয়েছে। সুতো আর পুঁতিতে রংবেরঙের কারুকার্য-করা একটা বড় পাখা—সেই পাখা হাতে সুধামুখী বাতাস করছে। রাজাবাহাদুরের কথা অনেক দিন পরে সাহেবের মনে পড়ে যায়। তাকে এমনিধারা খাতির করত। এই পাখা তারপরে আর বের হতে দেখেনি।

দুয়োর খুলে এক সময়ে সাহেব ঘরে ঢুকে পড়ে। শৌখিন বাবুটির কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছোটবেলার সেই আশ্চর্য ভঙ্গিতে ডাকে, বাবা—

রাজাবাহাদুর ফৌত, কিন্তু বাবা বলার কৌশলটা তারপরেও চলেছে কিছু কিছু। কাজও হয়। সুন্দর ছেলের মুখে "বাবা"—ডাক শুনে ভদ্র-লোকে মেজাজের মাথায় সিকিটা আধুলিটা গুঁজে দেয় ছেলের হাতে। হাত নেড়ে কেউ বা সরিয়েও দেয়ঃ যা, এখন চলে যা তুই। যা দেবার এইখানে রেখে যাব। আবার এমনও আছে, কিছুই দিল না। যাঃ, যাঃ—বলে তাড়া করে।

আজকে অনেক বছর পরে সাহেবের কী রকম হল—বাবুটির গা ঘেঁষে আবদারের সুরে ডাকেঃ বাবা গো—

বাবু খিঁচিয়ে উঠলঃ এটা কোত্থেকে জুটল রে?

সুধামুখী পরিচয় দেয়ঃ ছেলে আমার—

তোমার ছেলে আমায় কি জন্যে বাবা বলতে আসে?

সুধামুখী বলে, সকলের বাপ দেখে ওরও বোধ হয় বাবা-ডাক মুখে এসে যায়। বড়ঘরের ভালমানুষ দেখলে ডেকে বসে।

খোশামুদিতে বাবুটি ভুলবার পাত্র নয়। রাগে কাঁপছে। ভয় পেয়ে সুধামুখী কাতর কণ্ঠে বলে, ধর্ম সম্পর্কও তো পাতায় লোকে, ধর্মবাপ থাকে। ধরে নিন তাই।

রাখো চালাকি। প্যাঁচে ফেলানোর মতলব। বাবা বলিয়ে শেষটা খোরপোষের দায়ে ফেলবে।

খপ করে সাহেবের হাত এ'টে ধরে হুঙ্কার দেয় ঃ ছোট মুখে বড় কথা ! বাপ হই আমি তোর—উ' ?

ঠাঁই-ঠাঁই করে সাহেবের মুখে মারছে। থামে না। মারতে মারতে মেরে ফেলে নাকি ? হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সাহেব ছুটে পালায়। ছেলের পিছু পিছু সুধামুখীও ছুটল।

নিশ্চিন্তে বাবু এবারে সিগারেট ধরায়। মুখের মধ্যে ধোঁয়া জমিয়ে আস্তে আস্তে কায়দা করে ছাড়ছে। গোল গোল আংটি হয়ে ধোঁয়া উপরে উঠে যায়। বাবু দেখে তাই সকৌতুকে, আর আয়েসে পা দোলায়।

সাহেবের হাত ধরে নিয়ে সুধামুখী আবার এসে ঢুকল ঃ দেখুন বাবু, কী অবস্থা করেছেন দেখুন একবার চেয়ে। গালিগালাজ নয়, বাবা বলে ডেকেছে। যে ডাক শুনে শত্রুমানুষ অবধি আপন হয়ে যায়—

কে'দে ফেলে বলতে বলতে। আংটির পাথরে সাহেবের চোয়ালের উপর অনেকখানি ছড়ে গেছে, রক্ত পড়ছে। বাবু মনে মনে বেকুব হয়েছে। তাচ্ছিল্য ভরে বলল, চামড়ায় ঘষা লেগেছে একটুখানি। একেবারে ননীর পুতুল বানিয়েছ, টুসকির ভর সয় না—সেটা আমি বুঝি কেমন করে ?

একটা টাকা সাহেবের হাতে গু'জে দিয়ে বলে, যা বললি বললি। বার দিগর আর বাঁদরামি করবি নে। খুন করে ফেলব। চলে যা, বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে—

তবু কিন্তু মানুষটির আনাগোনা বহাল হল এই থেকে। আংটির বাহার দেখে সকলের মুখে মুখে আংটিবাবু নাম। আসে খুব কম—দু-একটা গান শুনে বালিশের তলায় কিছু রেখে দিয়ে চলে যায়।

আংটিবাবুর আঘাতের দাগ অনেকদিন ছিল। রানীর কাছে, ঝিঙে ও দলবলের কাছে সাহেব দাগ দেখিয়ে দেমাক করে বেড়ায় ঃ রাগী মানুষ কিনা আমার বাবা—মারের চোটে কেটে গেল। এ কাটা হীরের আংটির। হীরেয় কাচ কাটে, সামান্য চামড়া কেন কাটবে না ? বাবার দু-হাতের আট আঙুলে বারোটা আংটি—সমস্ত হীরের।

তা রেগে গেল কেন, কি করেছিলি তুই ?

আজগুবি প্রশ্নে অবাক হয়ে সাহেব বলে, বড়লোক-মানুষ যে, রাগ হবে না ? যার যত টাকা, তার তত রাগ। ঘরের লোক বাইরের লোক চাকর-দাসী সকলকে মেরে বেড়ায়। আমি একেবারে আপন—আমায় তো মারবেই।

নফরকেষ্টরও কানে গেল ! সাহেবকে বলে, তাই বটে ! আমার হাত গাল না ছু'তেই তেরিয়া হয়ে উঠিস, রসগোল্লা খাইয়ে সামাল দিতে হয়। ও-মানুষটা মেরে আধ-জখম করল, সেই আহ্লাদে ধেই-ধেই করে নেচে বেড়াচ্ছিস। ও-হল কিনা আংটি-বাবু, আঙুলে আংটি—আমার নেড়া হাতে শুধুই হাড়।

বুকের ভিতর থেকে গভীর এক নিঃশ্বাস মোচন করে বলে, একলা তুই কেন, দুনিয়া জুড়ে এক রীতি। বড়লোকের ধামা ধরে সবাই। বিয়ে করা ধর্মপত্নীকে

টোপ ফেলে ফেলে টেনে আনলাম—যেই না শুনেছে মাইনে কম, সঙ্গে সঙ্গে মারমুখী।

ব্যঙ্গের সুরে কেটে কেটে বলে, ও সাহেব, তোর রাজাবাহাদুর বাবার শাল ছিঁড়ে কবে ফালা-ফালা হয়ে গেছে, আংটি-বাবার মারের দাগও তো মিলিয়ে এলো—আবার কোন বড়লোক বাবা ধরবি মায়ে-পোয়ে দেখ ভেবেচিন্তে।

শুনে সাহেবের রাগ হয় না, বড় কষ্ট হয়। ভয়ঙ্কর দৈত্য-দেহের ভিতর থেকে এক অসহায় ভিখারি যেন বড় কান্না কাঁদছে। বলে, বড়লোক তুমিই হও না কেন, গালগল্প তো খুব—হেনো করতে পারি, তেনো করতে পারি, ধনদৌলত মুঠো মুঠো তুলে আনতে পারি—

পারি—। চকিতে সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় দুলিয়ে নফরকেষ্ট বলে, আলবৎ পারি। তুই সহায় হ, পারি কিনা চোখের উপর দেখাচ্ছি। তাগত আছে, মা দক্ষিণা-কালীর দয়াও আছে—

যে দিকে কালীমন্দির, নফরকেষ্ট সেই দিকে ফিরে দু-হাত জোড় করে কপালে ঠেকায়। বলে, আমরা নিমিত্ত মাত্র, দয়াময়ী করেন সব। বাবুভেয়েদের পকেটের টাকা হাতে তুলে এনে দেন। কাজের মধ্যে সর্বক্ষণ মায়ের নাম স্মরণ করবি, এই একটা কথা কোন দিন ভুলিস নে সাহেব।

সাহেব বলে, কি করতে হবে, আমায় শিখিয়ে দাও।

নফরকেষ্ট খুশিতে তার পিঠ ঠুকে দিল: গোড়ায় গোড়ায় সকলকে যা করতে হয়—খোঁজদারির কাজ। এই দিয়ে হাতে-খড়ি। মক্কেল ধরে মালের হদিস দিবি, কারিগরে কাজ হাসিল করে আসবে। বিপদের ঝুঁকি নেই, খোঁজ দিয়েই তো তুই সরে পড়েছিস কাঁহা কাঁহা তেপান্তর। ঘরে গিয়ে হয়তো বা ঘুমুচ্ছিস, ঘুম ভাঙিয়ে বখরা ঠিক হাতে পেঁছে দিয়ে আসবে। সাচ্চা কাজকর্ম আমাদের এসব লাইনে—জুয়াচুরি-ফেরেশবাজি নেই। নেমে দেখ্, দিন গেলে নির্ঝঞ্ঝাটে দু-তিন টাকার মার নেই।

সাহেবের থুতনির নিচে হাত রেখে মুখখানা এপাশ-ওপাশ করে দেখে। ছবি দেখার মতন। বলে, দু-তিন টাকা কি বলছি—তোর রোজগার গুণতিতে আসবে না। রাজপুত্তুরের রূপ নিয়ে জন্মেছিস—এই নাক-মুখ-চোখ, এই গায়ের রং! রোদে রোদে চালের দানা কুড়িয়ে বিধাতার-দেওয়া এমন জিনিস তুই বরবাদ করছিলি। হায়, হায়, হায়! আর সেই পোড়া বিধাতা আমার বেলা কি করল! এমন একখানা উদ্ভট চেহারা—পারলে নিজের মুখে নিজেই থুতু ফেলতাম। এমন চোস্ত হাত দুটো নিয়েও নুলো হয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

দম নিয়ে আবার বলে, চেহারা দেখেই মানুষ ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে বিশ হাত ছিটকে পড়ে। কী করে কাজকর্ম হয়, বল। বলে, আমি নাকি খুনে ডাকাত। যারা বলে, তাদেরই খুন করতে ইচ্ছে যায়। ডাকাত হতে পারলে এই ছেঁড়া ন্যাকড়া পরে দারোগা-কনেস্টবলের তাড়া খেয়ে ঘুরি! সেই জন্যেই এত করে বলছি, বিধাতার-দেওয়া মূলধন নষ্ট হতে দিসনে বাবা! মহাপাপ। ভাঙিয়ে খা, কাজ-কারবারে লাগা, রাজ্যেশ্বর হয়ে যাবি।

পরবর্তীকালে সাহেব ভাল-ভাল গুরু-ওস্তাদ পেয়েছে। কিন্তু পয়লা গুরু বলতে গেলে নফরকেষ্ট। সাহেবকে সে বড় যত্নে হাতে ধরে শেখায়। শিক্ষাদীক্ষা গুণজ্ঞান সমস্ত দিয়ে যাবে।

বলে, আমার বউয়ের গর্ভে ছেলে হলেও এর বেশি করতাম না। সে বড় রূপসী —ছেলে হলে তোরই মত রূপ হত। তার গর্ভের নোস, তা-ই বা জোর করে কে বলবে! আমার ঘর করতে চায় না—বাপের বাড়ী পড়ে থাকে, নানান রকম বদনাম—

তর্কাতর্কি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলে, অত হিসাবের কাজ কি—তুই ছেলে, খাতায় লেখা বাপ আমি এখন। ইস্কুলের তিনটে বাঘা বাঘা পণ্ডিত-মাস্টার সাক্ষি। বাপ-ছেলেয় আমাদের নতুন কাজকারবার। ছেলে খোঁজদার, বাপ কারিগর।

কিন্তু সাহেব সম্পর্কটা মেনে নিতে রাজি নয়। হেসে বলে, কাজকারবার কানায় আর খোঁড়ায়—

সে কেমন?

পাঠ্যবইয়ে গল্পটা আজই সে নতুন পড়ে এসেছে। কানা দেখতে পায় না, খোঁড়া হাঁটতে পারে না। কানার কাঁধে খোঁড়া চেপে বসল—দেখতে পাচ্ছে এবার, হাঁটতেও পারছে।

সাহেব বলে, আমাদেরও তাই। আমার চেহারা, তোমার হাত। দুজনে মিলে এক-মানুষ হয়ে গেলাম।

সুধামুখী টের না পায়। সে জানে, ইস্কুলে পড়ছে ছেলে। লেখাপড়া শিখে চাকরিবাকরি বিয়েথাওয়া করে সংসার ধর্ম করবে—যেমন আর দশজনে করে থাকে। সুধামুখীর বাবা যেমন একজন। তাদের বেলেঘাটার গলিটুকু জুড়ে এবং পাড়ায় পাড়ায় যেমন সব শিষ্টশান্ত সংসারী লোকেরা। পড়ছে সাহেব ঠিকই, তাতে অবহেলা নেই। ইস্কুল যখন থাকে না, সেই সময়টা সে নফরকেষ্টর সঙ্গে।

নফরকেষ্ট বুঝিয়েছে: পড়ার সময়ে পড়তে তো মানা নেই। কাজকর্ম তার-পরে। ভাল ভাল ঘরের ছেলেরা গাড়িজুড়ি চড়ে ইস্কুলে যায়, টিফিনে সন্দেশ খায়, ছুটির পরে বাড়ি গিয়ে খেলা। ধরে নে, আমরা তেমনি খেলে বেড়াই দুজনে।

কিন্তু খেলার আগেও যে কিছু আছে। ভাল-ঘরের ছেলে ছুটির পরে বাড়ি ফিরছে, সাহেব একবার লক্ষ্য করে দেখেছিল। মা দাঁড়িয়ে আছে সদর-দরজা অবধি এগিয়ে এসে। হাত ধরে ছেলেকে উপরে নিয়ে গেল। উপরের বারান্দায় বসিয়ে খাবারের প্লেট দেয় হাতে।

নফরকেষ্ট আগের কথার জের ধরে চলেছে: পড়বি যেমন, সংসারও দেখবি সেই সঙ্গে। চালের দানা খুঁটে খুঁটে মায়ের হাতে এনে দিতিস—ধরে নে, এ-ও তাই। চাল না এনে টাকাপয়সা খুঁটে নিয়ে আসা। খুব লাগসই গল্পটা বলেছিলি—কানায় আর খোঁড়ায় একজোট। আমি হলাম সেই খোঁড়া—ঘাড়ে তুলে মোকামে হাজির করে দিস তবে আমি কাজ করি। তুই আপাতত কানা আছিস, দু-দিনেই চোখ ফুটে যাবে। তখন কারিগর খোঁজদার একাই সব। খোঁড়াকে

লাগবে না, কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিবি। দিস তাই, রাগ করব না। তুই বড় হলে সুখই আমার।

বকবক করে নফরকেষ্ট এমনি সব বলছে। সাহেবের কানেও যায় না। ঘুরতে ঘুরতে এক রাস্তায় ইস্কুলের ফেরত এক বড়লোকের ছেলে দেখেছিল একদিন। ঘণ্টা বাজিয়ে প্রকাণ্ড ঘোড়ায়-টানা গাড়ি হাঁকিয়ে ছুটছে—'তফাত যাও', 'তফাত যাও' করছে সহিস পিছনের পাদানি থেকে! ছেলে এসে পেঁছিল বাড়ি। গয়না-পরা ভারি সুন্দরী মা ফটক অবধি এগিয়ে এসে ছেলের হাত ধরলেনঃ এত দেরি কেন আজ? অনতিদূরে সাহেব—নিষ্পলক। দোতলার ঝুল বারান্দায় মা আর ছেলেকে আবার দেখা যায়। ছেলের মুখে মা খাবার তুলে দিচ্ছে। সাহেবের আসল মা-ও নিশ্চয় এমনি সুন্দর ছিল। মা মাত্রেই সুন্দর।

ফুলের বাগানের মধ্যে ঝকঝকে বাড়ি, হাস্যমুখ পরমাসুন্দরী মা-জননী, সুবেশ সুন্দর ছেলে, বিকালের রোদে-ভরা প্রসন্ন আকাশ, বড়-রাস্তায় গাড়ি মানুষের সমারোহ —সমস্ত পার হয়ে এসে সাহেব পায়ে পায়ে তাদের গলিতে ঢুকে পড়ে। নর্দমার দুর্গন্ধ নোংরা জল গলি ছাপিয়ে ওপারে পড়ছে, লাফিয়ে পার হতে হয় জায়গাটা। দুটো মেয়ের মধ্যে হঠাৎ কি নিয়ে ঝগড়া বেধেছে—আকাশ-ফাটানো চেঁচামেচি। ভদ্রমানুষরা, উজ্জ্বল পথের উপর এইমাত্র যাঁদের সব দেখে এলো—শুনতে পেলে ছি-ছি করে দু-কানে আঙুল দেবেন। কিন্তু ফণী আড্ডির বস্তির যাবতীয় বাসিন্দা কাজকর্ম ফেলে ভীড় করে দাঁড়িয়ে পরমানন্দে উপভোগ করছে। হাততালি দিয়ে স্ফূর্তি দিচ্ছেঃ লাগ ভেলকি, লেগে যা। এবং নারদ নারদ বলে কলহের দেবতা নারদ ঋষিকে আহ্বান করছে।

ঘোর হয়ে এলেই এক্ষুনি আবার বেরিয়ে পড়া। সাজগোজ সেরে মেয়েরা সব বেরিয়ে পড়ল—কেউ রাস্তায়, কেউ বা দরজায়। সাহেবও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে—খোঁজদার হয়ে মক্কেলের খোঁজ করে। ভাল কাজকর্ম সন্ধ্যার পর থেকেই। স্ফূর্তি-বাজ লোকে টাকা খরচা করতে বেরোয় তখন। আহা, কষ্ট করে কত আর ঘুরবে—সাহেবরাই কাজটুকু টুক করে সমাধা করে দেয়। খরচা করা নিয়ে কথা—লহমার মধ্যে সবশুদ্ধ খরচা হয়ে গেল। টাকা এবং টাকার ব্যাগটাও। মানুষজন ইদানীং নতুন চোখে দেখছে সাহেব—টাকা বয়ে বেড়ানোর মুটে এক একটা। সাহেবী পোষাক-পরা মানুষটা ঐ চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে যায়—ব্যাগের মধ্যে টাকা। শৌখিন কয়েকটি মেয়ে সুবাস ছড়িয়ে দোকানে ঢুকল—টাকা সুনিশ্চিত সকলের সঙ্গে, কে কোথায় গোপন করে রেখেছে সেই হল কথা। কপালে চন্দন স্থূলবপু একজন থপথপ করে যাচ্ছে—এই লোক নোটের তাড়া কোমরে বেঁধে নিয়েছে ঠিক। একরকম আলো ফেলে মানুষের চামড়া-মাংস ভেদ করে ভিতরের ছবি তুলে নেয়। সাহেবের চোখেও তেমনি কোন আলো থাকত—জামা-কাপড় ভেদ হয়ে টাকাপয়সা যাতে দেখতে পাওয়া যায়।

কাজকর্ম সেরেসুরে ফিরতে রাত হয়ে যায়। নফর তো চিরকালের মার্কা-মারা মানুষ—তাকে নিয়ে কথা নেই। কিন্তু নিশিরাত্রে সাহেব তার সঙ্গে রয়েছে, সুধামুখী

দেখতে পেলে মারমুখী হবে। মেজাজি স্ত্রীলোক কী যে করবে ঠিক-ঠিকানা নেই। নিজের মাথায় বসিয়ে দেয় এক ঘা, অথবা নফরার মাথায়।

কাজ নেই সাহেব, রাতে তুই বাড়ি যাস নে। আগে এঘাটে-ওঘাটে আস্তানা ছিল, আবার তাই হোক।

দরজার পাশে সাহেবের হোগলার ঘর প্রায়ই এখন খালি পড়ে থাকে। ভোরবেলা ইস্কুলের মুখে বই-খাতা আনতে কেবল একবারটি যায়।

সুধামুখী ধরে ফেলে পথ আটকে দাঁড়াল: দিব্যি তো নিরালা ঘর—পুরানো রোগে কি জন্যে ধরল?

সাহেব বলে, গরম লাগে, ঘুমুতে পারি নে। গঙ্গার কি সুন্দর হাওয়া!

খাস কোথা রাত্রে? পয়সা কোথা পাস, না উপোস করে থাকিস?

সাহেব একগাল হেসে বলে, উপোস কোন দুঃখে করতে যাব? সন্ধ্যাবেলা গোগ্রাসে চাট্টি গিলে নেওয়া আমার ভাল লাগে না।

একটুখানি ঘুরিয়ে বলে, পয়সার অভাব কি পুরুষোত্তমবাবুরা থাকতে! রোজগার করে নিই।

এবং প্রমাণস্বরূপ পকেট উলটে টাকা-পয়সা সমস্ত ঢেলে দেয়। দেখ আছে কিনা। নিয়ে চলে যাও, সমস্ত নিয়ে যাও তুমি।

সুধামুখী অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। সাহেব বলে, ওদের আড়তে একটা কাজ নিয়েছি।

কিচ্ছু তো নিজের জন্য রাখলি নে।

অবহেলার ভঙ্গিতে সাহেব বলে, এসে যাবে আবার। পয়সা রোজগারের মতো সহজ কাজ আর নেই মা।

টাকাপয়সা তুলে নিয়ে সুধামুখী আঁচলে বাঁধল। কী ভাবল, কে জানে! ভাবল হয়তো, করুণার সাগর পুরুষোত্তমবাবু সাহেবকে আদরের চোখে দেখছেন। সাহেবের চেহারার গুণে, সাহেবের কথাবার্তা শুনে। অঢেল টাকা-পয়সা—কোন একটি অজুহাত করে দিয়ে দিলেই হল।

বই নিয়ে সাহেব তখন ছুটে বেরিয়েছে। ইস্কুলের বেলা হয়ে গেল।

বর্ষাকাল এসে পড়ল।

গরম তো কেটে গেছে সাহেব। এবারে ঘরে এসে থাক।

এখন বৃষ্টিবাদলা। হোগলার ছাউনি পড়ে গেছে একেবারে। জল মানায় না।

সুধামুখী নফরকেষ্টর উপর গিয়ে পড়ে। শুধু মুখে বাপ হওয়া যায় না—

নফরকেষ্টরও তুড়ুক জবাব: লেখাতেও রয়েছে তো। ইস্কুলের খাতায় লেখা—মাস্টার-পণ্ডিতরা সাক্ষি।

বাপ হলে ছেলের সুখ-সুবিধা দেখতে হয়। ঘরের ছাউনি পচে গেছে, হোগলা দিয়ে নতুন করে ছেয়ে দাও।

নফর হা-হা করে হাসে: এই কথা! হোগলা কেন সোনা দিয়ে ছেয়ে দিলেও

ছেলে আর ঘরে থাকছে না। মন উড়ু উড়ু বাইরের টান—

হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বলে, ঘাটে মাঠে থাকতে দিয়েছিলে কেন সুধামুখী? আমি তো ছিলাম না তখন। তুমি দায়ী। আর আটকানো যাবে না, দুনিয়া চিনে ফেলেছে ছেলে।

শীতকাল সামনে। এবারে কি হবে সাহেব? ঘাটে যা কনকনে শীত—ঘরে না উঠে যাবি কোথায় দেখব।

কত শীত পড়ে দেখা যাক। ডরাই নে।

সুধামুখীর কথা সাহেব কানে নেয় না। বাইরে থাকতে থাকতে এমন হয়েছে, সেই খুপরী-ঘরে পা দিতেই কেমন যেন আতঙ্ক।

ওরে সাহেব, অসুখ করবে শীতের মধ্যে গঙ্গার ঘাটে যদি পড়ে থাকিস।

সাহেব বলে, শীতকাল বলে সবাই বুঝি চাল-বেড়া দেওয়া ঘরে গিয়ে উঠেছে! রাত্তিরবেলা বড়-রাস্তার ফুটপাথগুলো ঘুরে একবার দেখে এসো। এত মানুষ বাইরে বাইরে কাটাচ্ছে তো তোমার সাহেবই বা অক্ষম কিসে?

মাথায় খাসা এক মতলব এসে গেছে। তাই সাহেব অকুতোভয়। ফাঁকার মধ্যেই রাত কাটাবে সে, লেপ-বিছানা লাগবে না, অথচ ঘরে শোওয়ার চেয়ে ঢের বেশি সুখ। বলুন দেখি, কী সে ব্যাপার? হেঁয়ালির মতো ঠেকছে—

পাড়াটাই বড্ড সুখের যে! অন্য পাড়ায় হবে না। শীতকালটা আদি-গঙ্গার ধারে ধারে আরও দক্ষিণে চলে যাবে। কেওড়াতলায়। কালীক্ষেত্রের মহাশ্মশান—মায়ের দয়ায় চিতার অকুলান নেই। অহোরাত্র সারি সারি জ্বলছে। দরাজ উঠানের উপর চিতার জায়গা, চতুর্দিক ঘিরে পাকা দালান। আগুনে আগুনে হাওয়া উত্তপ্ত হয়ে আছে। তবু যদি শীত করে, কোন এক চিতার পাশে বোস গিয়ে। পরের খরচায় গনগনে কাঠের আগুন—হাত সেঁক, পা সেঁক। তার পরে শয্যা নাও আরাম করে দালানে বা উঠানে যে জায়গায় খুশি। কেউ কিছু বলতে যাবে না।

এমন ব্যবস্থা থাকতে কোন দুঃখে সাহেব তবে হোগলার ঘরে মাথা ঢুকাতে যাবে?

সুধামুখীর সর্বক্ষণ দুঃখ, ঘরে মন বসে না—দিনে দিনে ছেলে আমার পর হয়ে গেল।

পারুল বলে, বয়স হচ্ছে কি না। বিয়ে দিলে ঠিক উল্টো হবে দেখো। কাজকর্মে বাইরে পাঠালে ছুতোনাতায় ঘরে এসে ঢুকবে।

তারপরেই পারুলের সেই পুরানো দরবার, অনেকবার যা হয়ে গেছে।

হাঁ—বলে দাও দিদি, যোগাড়-যন্তরে লেগে যাই। সামনের ফাগুনে দুহাত এক করে দেবো। তুমি ছেলেওয়ালা—তোমার তো কিছু নয়। খরচ-খরচা হাঙ্গামা-হুজ্জুত আমার।

বলে ফিকফিক করে হাসেঃ ভাল মজা হল—ছিলে দিদি, হয়ে যাবে বেয়ান। সম্পর্ক যা-ই হোক, আমি চিরকালই তোমার ছোটবোন।

সুধামুখী সস্নেহে তাড়া দিয়ে ওঠেঃ দূর পাগলীঃ একেবারে ছোট মানুষ

যে ওরা। জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে। আমার সাহেবের হাঁড়িতে তোর মেয়ে চাল দিয়ে এসে থাকে তো নিশ্চয় তা হবে। কেউ খণ্ডাতে পারবে না।

নাছোড়বান্দা পারুল বলে, ছোট তা কি হয়েছে! সেকালে কত ছোট ছোট বর-কনের বিয়ে হত। সে বড় মজা। আমাদের গাঁয়ে দেখেছি একজোড়া। কনে-বউয়ের পুতুলের মুণ্ডু ভেঙে গেছে বরের হাত থেকে পড়ে। বরের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে খিমচি কেটে ঝগড়া করে বউ অনর্থ করে। তারপরেও আবার শাশুড়ির কাছে গিয়ে নালিশ। বাড়ি সুদ্ধ মানুষ হেসে কুটিকুটি হচ্ছে। আমার কিন্তু ভারি ভাল লাগে দিদি।

স্বপ্নে মেতে আছে পারুল, তাকে নিরস্ত করা দায়। সুধামুখী বলে, আসুক তো ফাগুন মাস। কিন্তু বিয়েটা কোথায় হবে শুনি? বউ নিয়ে সাহেব কোন জায়গায় উঠবে? এখানে—এই বাড়িতে? অ ঘেন্না!

পারুলও বুঝি সেটা ভাবে নি! বলে, তাই কখনও হয়—ছিঃ ছিঃ। ঠিক ওপারে চেতলায় একটা ঘর দেখে এসেছি, এক্ষুনি নিয়ে নেওয়া যায়। সাহেবের আড়তের খুব কাছে হবে, আমরাও যখন তখন গিয়ে দেখে আসতে পারব। সব দিক দিয়ে সুবিধা। নিয়ে নেবো ঘরটা?

সুধামুখীও ভাবছে আলাদা জায়গায় ঘর নেবার কথা। ভাবনাটা পেয়ে বসেছে তাকে। সে ঘর চেতলায় নয়, কাছাকাছি কোনখানে নয়—এই কালীঘাটের অনেক দূরে একেবারে ভিন্ন এলাকায়। এ পাড়ার চেনা মানুষ কখনও সেদিকে যাবে না। নফরকেষ্ট নয়, কেউ নয়। জীবনের এই অধ্যায়টা আদিগঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে শুদ্ধ-স্নিগ্ধ হয়ে সাহেবের হাত ধরে মা আর ছেলে নতুন বাসায় গিয়ে উঠবে। পুরুষেরা রাত্রিবেলা মুখ ঢেকে বিবরে এসে ঢোকে। ঘরে ফিরে গিয়ে আবার সেই আগেকার মানুষ—বিবরের লীলা-খেলা অন্ধকারে চাপা পড়ে থাকে। সারা জীবনেও ফাঁস হয় না। এমনিই তো বহু—এক-শ'র ভিতরে নব্বুই। সুধামুখীরও বা কেন হবে না?

ঠাণ্ডাবাবুর কথাঃ জীবন মরতে চায় না কিছুতে, মেরে ফেলা বড় কঠিন। অঙ্কুর ইট-চাপা পড়ে সাদা হয়ে গিয়েছিল—ডালে পাতায় কেমন সবুজ সুন্দর আমগাছ ঐ চেয়ে দেখ। সকালের রোদে স্নান করে পবিত্র হয়ে পাতা ঝিলমিল করছে। সুধামুখীও ঘরে ফেরার জন্য পাগল। বাপের ঘরে ঠাঁই হবে না, ছেলের ঘরে যাবে। সাহেব, তাড়াতাড়ি তুই মানুষ হয়ে যা। ছেলে, ছেলের বউ, কচি কচি নাতি-নাতনি —সুধামুখী কর্ত্রী সে ঘরের। এ-পাড়ার, এবং এই জীবনের তিল পরিমাণ চিহ্ন নিয়ে যাবে না। রানী সে ঘরের বউ হবে কেমন করে? ফুলের মতন মেয়ে রানী, বড় আদরের ধন, "মাসি" "মাসি" করে সুধামুখীর কাছে ঘোরে। তা বলে নতুন সংসারে বউ হতে পারে না পারুলের কলঙ্কের ফুল।

পারুলের কথা চাপা দিয়ে দেয়ঃ ফাগুনের ঢের দেরি, তাড়াতাড়ি কিসের?

পুরুষোত্তমবাবুর আড়তে কতক্ষণ ধরে কি কাজ—কত টাকা মাইনে দেয় না

জানি। গতিক দেখে সন্দেহ আসে, সত্যিই ঐ কাজ করে কি না। আড়ত দূরবর্তী নয়, এ-পারের ঘাট থেকেই নজরে আসে। পুল পার হয়ে সাহেবের খোঁজে খোঁজে একদিন সুধামুখী গিয়ে পড়ল সেখানে। ভিতরে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে, নেই সাহেব। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও দেখতে পেল না। তারপর আরও ক'বার গেছে। আড়তের কাউকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না—তার সম্পর্ক বেরিয়ে পড়লে চাকরে সাহেব ছোট হয়ে যাবে অন্যদের কাছে, চাকরির ক্ষতি হবে।

হঠাৎ হয়তো একদিন সাহেব সুধামুখীর ঘরের মধ্যে ঢুকে খই ছড়ানোর মতো খাটের বিছানায় পয়সাকড়ি ছড়িয়ে দেয়। দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেরুল। ইচ্ছা মতন তাকে পাওয়া যায় না, বসে দুটো কথা বলা যায় না। নিশিরাত্রে সুধামুখী আবার আগের মতন এ-ঘাট ও-ঘাট খুঁজে বেড়ায়। কার মুখে যেন শুনতে পেয়ে একদিন সে শ্মশানে চলে এলো।

সাহেবের বড় পছন্দের জায়গা, শীতের রাত কাটানোর পক্ষে সত্যি চমৎকার। দিনরাত্রি চব্বিশ ঘণ্টার মচ্ছব, তবু কিন্তু রাত্রি যত বাড়ে মচ্ছব, আরও যেন বেশি করে জমে। কাঁধে চড়ে চড়ে দেদার লোক এসে নামছে,—নানা অঞ্চলের নানান বয়সি পুরুষলোক স্ত্রীলোক। চিতায় চিতায় এত বড় উঠানে দুটো হাত জায়গাও খালি নেই। যমরাজের রন্ধনশালার শতেক চুল্লি একসঙ্গে জ্বালিয়ে দিয়েছে যেন। বিস্তর দল ঠায় বসে আছে নতুন চিতার জায়গা নেই বলে।

একটা ভারি জাঁকের মড়া এসেছে। বিশাল খাট, ফুলের পাহাড়। যে বিছানায় শুয়ে মড়াটি শ্মশানে এসেছেন, ফুলশয্যায় লোকে এমন জিনিস পায় না। জায়গা পেয়ে অবশেষে চিতা সাজিয়ে ফেলল—সে বস্তুও চেয়ে দেখবার মতো। তিন চিতার কাঠ এনেছে বেশি মূল্য দিয়ে। তার উপরে দশ সের চন্দন কাঠ ও এক টিন ঘি।

আর একটা শিশু ছেঁড়া-মাদুরে জড়িয়ে অনতিদূরে এনে নামাল। দুজনে নিয়ে এসেছে—একজন শ্মশানের অফিসে গেছে সৎকারের ব্যবস্থায়। আর একজন মৃত শিশুর মাথায় হাত দিয়ে নিঃশব্দে বসে। দুচোখে জল গড়াচ্ছে। খাটের মড়া ইতিমধ্যে চিতায় তুলে দিয়েছে, ফুলের গাদা এদিক-সেদিক ছড়ানো। সাহেবের কী ইচ্ছা হল—দু-হাত ভরে ছড়ানো ফুল ছেঁড়া মাদুরের উপর রাখছে।

একজন খিঁচিয়ে উঠল: কার ধন কাকে দিস—আচ্ছা ছোঁড়া রে তুই! ইচ্ছে হয়, নিজের পয়সায় ফুল কিনে দিগে যা।

সুধামুখী এসে দাঁড়িয়ে ছিল। আকুল হয়ে ডাকল, সাহেব।

রাত্রিবেলা এত মৃত্যুর অন্ধিসন্ধিতে ছেলেটা পাকচক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছে। সুধামুখীর সর্বদেহ শিরশির করে। ছুটে গিয়ে হাত চেপে ধরল: সাহেব রে—

কে যেন কাকে বলছে, সাহেব ফিরেও তাকায় না।

সুধামুখী বলে, বাসায় চল বাবা।

এবারে সাহেব কথা বলল: হাত ছেড়ে দাও—

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে যা-কিছু পকেটে আছে মুঠো করে দিয়ে দিল।

আমি কি টাকা চাইতে এসেছি?

আমায় নিয়ে যেতে এসেছ। আমি যাব না।

সুধামুখী কেঁদে বলে, তোর একফোঁটা মায়ামমতা নেই সাহেব। মনে মনে তুই সন্ন্যাসী। ঘরবাড়ি ভুলেছিস। টাকা-পয়সা খোলামকুচির মতো ছড়িয়ে দিস। কালকের খরচ বলে আধলা পয়সাও রাখিস নে। ভয় করে তোর রকমসকম দেখে।

নিশ্চিন্ত অবহেলায় সাহেব বলে, খরচ যেমন আছে, ভাঁড়ারও আনার অঢেল। পয়সাকড়ি গায়ে ফোটে, না সরালে সোয়াস্তি পাইনে।

মড়াপোড়ার দুর্গন্ধে সুধামুখী নাকে কাপড় দিয়েছে। নজর পড়তে সাহেব ধমক দিয়ে ওঠেঃ ঘেন্না করে তো দাঁড়িয়ে থাকতে কে বলেছে! কাজ হয়ে গেল, বাড়ি চলে যাও।

বলেই সে আর সেখানে নেই। প্রাঙ্গণে অগণ্য চুল্লির কোনটা দাউদাউ করছে, নিভে আসে কোনটা। সাহেব তাদের মধ্যে কিলবিল করে বেড়ায়। বহুরূপীর মতো রং বদলাচ্ছে—চিতার আলো ঝলসে ওঠে কখনো গায়ের উপর, কখনো সে আবছা অন্ধকারের ছায়ামূর্তি। এ-দলের কাছে গিয়ে কোথায় কি করতে হবে বাতলে দিয়ে আসে, ও-দলের মধ্যে গিয়ে মড়ার পরিচয় জিজ্ঞাসাবাদ করে। কোন এক চিতার পাশে বসে পড়ে হয়তো বা একটু আগুন পুইয়ে নিল। কাঠ কম দিয়েছে বলে ডোমের সঙ্গে ঝগড়া করে কোন দলের হয়ে। মড়া না সরাতেই বিছানাপত্র নিয়ে টানাটানি—একটা চেলাকাঠ তুলে ভিখারিগুলোর দিকে তাড়া করে যায়। ভারি ব্যস্তসমস্ত এখন সাহেব।

সুধামখী থ হয়ে দেখছে। সাহেবের কথাবার্তা ভাবভঙ্গি কোনটাই ভাল লাগে না। সাহেব কেমন যেন দূরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু জোরজারি করা চলবে না এ ছেলের উপর, সত্যিকার দাবিও নেই। নিশ্বাস ফেলে সে পায়ে পায়ে ফিরে চলল।

সাহেবও এক সময় খুশি মতন একটা জায়গা নিয়ে শুয়ে পড়ে।

আরামের ঘুম। পয়সা রোজগারের ফিকিরে কনেস্টবল এসে লাঠির গুঁতো দেয় না। ছোঁয়াছুঁয়ির শঙ্কায় পুণ্যার্থীরাও গালিগালাজ করেন না। তবু কিন্তু এক একদিন ঘুম ভেঙে উঠে বসে সে শেষরাত্রে। শ্মশানে তখন এক অদ্ভুত অভিনব চেহারা। লকলকে আগুন নিভে গিয়ে গনগন করছে চারিদিককার চিতাগুলো। শ্মশানের বাসিন্দারা সব এদিক-সেদিক পড়ে আছে—কাঁথা-মাদুর কাপড়-চাদর মুড়ি দিয়ে পড়েছে, মড়ার সঙ্গে যা সমস্ত বিদায় করে দেয়। ছেঁড়ার ফাঁক দিয়ে হাতের খানিকটা বেরিয়ে আছে, কারো বা কোমরের একটুখানি। কারো পায়ের গোছা, কারো বা মাথার চুল। ক্ষীণ আলোয় মনে হবে মানুষ নয়, মড়ারাই চারিদিকে ছড়ানো। টুকরো টুকরো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পূর্ণাঙ্গ কেউ নয়। যেন দৈত্য এসে পড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ছিবড়েগুলো ছড়িয়ে গেছে। অথবা লড়াইয়ের শেষে মৃত সৈনিক পড়ে আছে ইতস্তত। ঠাণ্ডাবাবুর কথাগুলো—সুধামুখীর কাছে অনেকবার যা শুনেছে সাহেব। অস্ত্রের লড়াই ছাড়াও অহরহ অদৃশ্য নিষ্ঠুর লড়াই চলছে—অনেককে মেরে ফেলে জন কয়েকের বিজয়োৎসব। বিজয়ীরা এই রাত্রে অট্টালিকাশিখরে উষ্ণ লেপ-গদির ভিতর

মিষ্টি মিষ্টি স্বপ্ন দেখছে।

ঠাণ্ডাবাবু থাকলে আরও হয়তো বলত, মহাশ্মশান কেন—গোটা দেশটারই চেহারা দেখলে সাহেব এই নিশিরাত্রে। মড়ার দেশ। সে মড়াও আস্ত নয়—টুকরো টুকরো অঙ্গ ছড়ানো।

এক দুপুরে অসময়ে ছুটতে ছুটতে নফরকেষ্ট বস্তিবাড়ি ঢুকল। এসেই বাইরের দরজায় খিল দিয়ে দিল। ঘরের ভিতরে খাটের উপর ধ্বপাস করে বসে পড়ে।

সুধামুখী ব্যস্তসমস্ত হয়ে পিছু চলে আসে: কি হল?

হাঁপাচ্ছে রীতিমতো। ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, এক গ্লাস জল দাও আগে।

ঢকঢক করে পুরো গ্লাস খেয়ে নিয়ে কোঁচার খুঁটে কপালের ঘাম মুছে কতকটা সুস্থির হয়েছে। সুধামুখী বলে, কে তাড়া করল—পুলিশ না পাবলিক?

নফরকেষ্ট বলে, বাঘ। একেবারে সামনাসামনি পড়ে গিয়েছিলাম।

চিড়িয়াখানার বাঘ ডাকে, নিশিরাত্রের স্তব্ধতায় এ পাড়া থেকে সুস্পষ্ট শোনা যায়। এই কিছুদিন আগে একটা বাঘ কি গতিকে বেরিয়ে পড়েছিল খাঁচা থেকে, পথের মানুষের উপর হামলা করেছিল—

নফরকেষ্ট অধীরভাবে বলে, চিড়িয়াখানার বাঘ খাঁচায় থেকে থেকে তো বিড়ালের শামিল। এ হল আসল জন্তু, সুন্দরবনের মানুষখেকো। বন থেকে সদ্য-আমদানি।

তার পর সুধামুখীর দিকে চেয়ে সকাতরে ব্যাখ্যা করে বলে, আমার বউ।

কোথায় দেখা পেলে?

কালীবাড়ি তীর্থধর্মে এসেছিল। বউ, নিমাইকেষ্ট আরও যেন কে কে—আমার তখন চোখ তুলে তাকাবার তাগদ নেই, এই ধরে তো এই ধরে। পাঁই-পাঁই করে ছুটেছি, খুব বেঁচে এসেছি।

ভাব দেখে সুধামুখী হেসে লুটিয়ে পড়ে। বলল, সেই ব্রহ্মকবচের গুণে বোধ হয়—

নফরকেষ্ট বলে, তা সত্যি। মন আনচান-করা ব্রহ্মকবচে একেবারে আরোগ্য হয়েছে। কিন্তু বউয়ের জন্য কোন্ কবচের ব্যবস্থা করা যায় বল দিকি, আমার নামেই যাতে শতেক হাত ছিটকে যায়? আগে যেমন ছিল।

সুধামুখী খিলখিল করে হেসে বলে, কবচ হলেও পারতে যাবে কে শুনি?

নফরকেষ্টও নিশ্বাস ফেলে ঘাড় নেড়ে বলে, কোন কবচই কিছু হবে না আর এখন। লোভে পেয়ে গেছে। আমাকে তো চায় না, চায় আমার মাইনের টাকা। মানুষটার উপর যত ঘেন্নাই হোক, ধরতে পারলে ঠিক সেই কারখানার চাকরিতে নিয়ে বসাবে। মুনাফা বিস্তর। মাস গেলে পুরো মাইনেটা হাতিয়ে দেবে—একটা মানুষের পেটে-ভাতে কত আর খরচা হয় বলো।

সন্ধ্যায় কাজে বেরিয়ে সাহেবকেও বলল: ঘটেছে দুপুরবেলা—এখনো কিন্তু আমার বুক ঢিবঢিব করছে। হ্যাঙ্গামের কাজে আজ যাচ্ছিনে, সোজাসুজি যদি কিছু হয়—

দিন দুয়েক পরে আবার দেখা যায়, ভীষণ ব্যাধিতে ভুগছে সে যেন। থপথপ করে পা ফেলছে বুড়োমানুষের মতো। হঠাৎ একেবারে দাঁড়িয়ে যায়। বলে, ফিরে চল, সাহেব, কাজকর্ম হবে না।

কি হল ?

সেই বাঘ। ভেবেছিলাম ফাঁড়া বুঝি কেটে গেল। তা নয়, নিমাই চুপিসারে পিছন পিছন এসে আস্তির বস্তি দেখে গেছে। আজকে যখন বেরুচ্ছি—হাওড়া থেকে অত সকালে এসে গলির মাথায় ওত পেতে ছিল। ক্যাঁক করে ধরে ফেলেছে।

বিপদটা কত বড়, সাহেবের সঠিক আন্দাজ নেই। নফরের অবস্থা দেখে তবু উদ্বিগ্ন হল : তা হলে ?

শাসিয়ে গেছে, আপোসে বাসায় গিয়ে যদি না উঠি, একদিন বউ নিয়ে এসে পড়বে। কী সর্বনাশ বল দিকি। যত ভাবি, হাতে-পায়ে খিল ধরে আসে আমার। এমন অবস্থায় মক্কেল ফেলা যাবে না, বিপদ ঘটে যাবে।

পরের দিন নফর বলে, আজও এসেছিল। ভেবেছিলাম, বয়স হয়েছে, আর পাক-ছাট মারব না, যে ক'টা দিন বাঁচি একটা জায়গায় কায়েমি হয়ে থাকব। হতে দিল না কিছুতে। কপাল বড্ড খারাপ সাহেব, ভাবি এক হয়ে যায় অন্য। নিমাই শ্বশুরকে বলে সেই পুরানো কাজ ঠিকঠাক করে ফেলেছে, ধরে নিয়ে জুতে দেবে। সারা দিনমান ফার্নেসের আগুন, রাত্রে বউ। তার মধ্যে ক'দিন বাঁচব আমি বল্।

বলতে বলতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। ঢোক গিলে নিয়ে বলে, পালিয়ে যাব, না পালালে রক্ষে নেই। সুধামুখীকে কিছু বলিসনে এখন। কিন্তু নফরাকে কেউ আর কলকাতা শহরে পাচ্ছে না।

নতুন কাজের নেশায় সাহেব মেতে আছে। উৎকণ্ঠিত ভাবে সে বলে, আমার কি হবে ? কারিগর না হলে খোঁজদার তো হাত-পা ঠুঁটো জগন্নাথ।

সাহেবের দিকে নফরকেষ্ট এক নজরে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে : যাবি তুই ? তোর যে কত ক্ষমতা, নিজে তুই জানিস নে—আমি সব চোখে দেখছি।

উৎসাহে পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, চল তাই। সুধামুখীকে টাকা পাঠাব, টাকা পেলে সে ভাবনাচিন্তা করবে না। বাপে-বেটায় মিলে দিগ্বিজয় করে বেড়াব আমরা। আমি কারিগর তুই ডেপুটি, কখনও বা আমি ডেপুটি তুই কারিগর।

•

ঠিক সেই দিনই এক কাণ্ড ঘটে গেল। সুধামুখীর হারমোনিয়ামের গোটা দুই রীড পালটাতে দোকানে দিয়েছে, তারা আজ না কাল করছে। মহাবীর আনতে গিয়ে এইমাত্র ফিরে এলো। ঝগড়া করতে চলেছে সুধামুখী—না হয়ে থাকলে যেমন আছে ফেরত আনবে। জরুরি দরকার। আংটিবাবু কয়েকজনকে নিয়ে গান শুনতে আসবে রাত্রে, খবর পাঠিয়েছে।

সাজগোজে থাকতে হয় এই সন্ধ্যাবেলাটা। রাগে রাগে দ্রুত পা ফেলে চলেছে, নফরের দেওয়া গয়না ঝিলিক দিচ্ছে অঙ্গ ভরে। কোন দিক দিয়ে ছুটতে ছুটতে সাহেব গায়ের উপর পড়ে একটা ভ্যানিটি-ব্যাগ সুধামুখীর হাতে গুঁজে দিল। চাপা গলায়

বলে, অনেক টাকা—নতুন হারমোনিয়াম হয়ে যাবে। বাড়ি চলে যাও ঢেকেঢুকে নিয়ে।

কি রে, কোথায় পেলি এ জিনিস?

কিন্তু বলছে কাকে! লহমার মধ্যে সাহেব উধাও। কোন গলিঘুঁজিতে ঢুকে পড়েছে। সুধামুখী ভয়ে কাঁটা। কাঁপতে কাঁপতে বাসার দিকে ফিরল।

গঙ্গার ঘাটের সদরে যাওয়া সাহেবও আজকের দিনে অনুচিত মনে করে। আস্তির বস্তির নিজস্ব খোপে এক ফাঁকে এসে ঢুকে পড়ল। সন্ধ্যা-রাত্রে অনেক দিন পরে এসেছে? আলো জ্বালে নি, অন্ধকারে পড়ে রইল। আর দু-হাতে নিজের গাল চড়াচ্ছে। জীবন নাকি মরে না, অমৃত—ঠাণ্ডাবাবুর কথা। পাতা ঝিলমিল করে পাঁচিলের ধারের ঐ আমচারা সাক্ষি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষকে নাকি ভালই হতে হবে শেষ পর্যন্ত, খারাপ হওয়া চলবে না। কী সর্বনাশ! এই যদি নিয়ম হয়, সাহেবের তবে কী উপায়? নিয়ম ভাঙবেই, আরও জোর করে লেগে যাবে সব গাছ-ই কি এই আমচারার মতো—পোকা ধরে পাতা ঝরে গিয়ে ডালপালা আধ-শুকনো হয়ে আছেও তো কত!

গালে চড় মেরে মেরেও বুঝি রোখ মিটল না। বই-খাতা দোয়াত-কলম আছে—এক সময় বসে অন্ধকারে কলম হাতড়ে নিয়ে খাতার উপর আঁচড় কাটতে লাগল। মনে যা সব উঠছে, লিখছে খাতায়।

কী কাণ্ড এই কতক্ষণ আগে! ট্রাম-রাস্তার উপর মস্ত বড় এক পোশাকের দোকানে সাহেব ঢুকে পড়েছে। নফরকেষ্টও আছে—অনেকটা দূরে, একেবারে আলাদা। কেউ কাউকে জন্মে চেনে না এই রকমের ভাব। চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের বড় ও অতিরিক্ত রাঙা বলে কাজের সময়টা নফরের নীল চশমা চোখে। অঙ্গে ধোপ-দুরস্ত কাপড়-জামা। এ-ও তার আপিসের পোশাক—এক এক অফিসে এক এক রকম। কাজ অন্তে এ সমস্ত খুলে পাট করে রেখে আট-হাতি ধুতি পরে মহানন্দে বিড়ি ধরাবে।

বাচ্চাদের পোশাক যে দিকটায়, সেখানে বড়ঘরের এক বউ। দুর্গা-প্রতিমার মতো চেহারা, কপালে প্রকাণ্ড সিঁদুরের ফোঁটা। মোমের পুতুলের মতো একটা ছোট মেয়ে বউয়ের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে—এই মা'র মেয়ে সেটা বলে দিতে হয় না। এক ডাঁই পোশাক-আশাক নামিয়ে নিয়েছে, আরও নামাচ্ছে। মেয়ের জন্য পোশাক পছন্দ করেছে মা—বিষম খুঁতখুঁতে, পছন্দ কিছুতে আর হয় না। দোকানের দুটো ছোকরা আর এই বউটি—তিনজনে হিমসিম হয়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণের বিস্তর রকমের চেষ্টার পরে একটি জামা অবশেষে মেয়ের গায়ে পরাল। বাচ্চা মেয়ের রূপের বাহার এক-শ গুণ হয়ে ফুটল এক পলকে। ছিল পদ্মকলি, পোশাক পরে যেন শতদল হয়ে পাঁপড়ি মেলল।

এমনি সময় সাহেব। ফুটফুটে ছেলে মুখ চুন করে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে পেয়ে বউ হাত নেড়ে কাছে ডাকে। শতেক পরিচয় জিজ্ঞাসা করছেঃ কার সঙ্গে কোথায় থাকে, কে কে আছে তার, ইস্কুলে পড়াশুনা করে কি না। সাহেবও

তেমনি—বানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জবাব। নানাবিধ দুঃখের বৃত্তান্ত। বলতে বলতে জল এসে যায় চোখে। দরকার মতন এই জল নিয়ে আসা খেটেখুটে অভ্যাস করতে হয়। আর এইসব লাগসই গল্প বানানো। সাহেবের দেখাদেখি বউয়ের চোখেও জল এসে গেছে, দু-ফোঁটা গাড়িয়ে পড়ল। কেল্লা ফতে—যা চেয়েছিল ঠিক তাই। ছেলেটার হাতে কিছু দেবে বলে বউ ব্যাগ খুঁজছে! কোথায় ব্যাগ? ব্যাগ ইতিমধ্যে লোপাট। সময় বুঝে সাহেব বাঁ-হাতের আঙুল তুলে কান চুলকে ছিল একবার। তার মানে বউঠাকরুনের বাঁ-দিকে দোকানের কাউণ্টারে বস্তুটি পড়ে আছে। খোঁজদারের কাজ এই অবধি। সে শুধু জানিয়ে দেবে মাল কোনখানটায় আছে এবং মক্কেলকে অন্যমনস্ক করে রাখবে। খবর বুঝে নফরকেষ্ট জামা দেখতে দেখতে এই দিকে এসে হাতের খেলা দেখিয়ে সরে পড়েছে। হিসাব-করা নিখুঁত কাজকর্ম, এক তিল এদিক-ওদিক হবার জো নেই।

এ পর্যন্ত নির্বিঘ্ন। গোলমালটা তারপরেই। খোঁজ দেওয়ার পরেই খোঁজদার সরে পড়বে, এই হল বিধি। বউ ব্যাকুল হয়ে ব্যাগ খোঁজাখুঁজি করছে, সাহেব কি দেখে সামনের উপর অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে? যে জামা গায়ে পরানো হয়েছে, ছোট মেয়ে কিছুতে তা খুলতে দেবে না। বউয়ের চোখে আবার জল এসে যায়—বড্ড প্যানপেনে তো বউটা! ভাল ঘরের নরম মনের মেয়ে—কে জানে, সাহেবের আসল মা-ও হয়তো এমনিধারা রাজরানী একটি। বউ দোকানের ছোকরাকে বলছে, কী করি আমি এখন! ট্যাক্সি করে না হয় বাড়ি ফিরলাম, বাড়ি গিয়ে ট্যাক্সি-ভাড়া দেব। আমার ডলির জন্মদিন আজ। পাঁচ ফুলের ডাল-ধোওয়া জলে চান করিয়ে দিলাম—সকলের আশীর্বাদ নিয়ে হাসিখুশি থাকতে হয় এই দিনটা, আনন্দ করতে হয়। আমার ভাইয়ের মেয়ের জামা পরে এসেছে—আপনাদের দোকানের তৈরি। মেয়ে বায়না ধরল, তারও ঠিক সেই জামা চাই। ভাবলাম, যাই, কতক্ষণ আর লাগবে। সাধ করে চাইল, না পেলে মুখভার করে বেড়াবে, সে হয় না। তা দেখুন, উল্টো হয়ে গেল—ছেলেমানুষের গায়ে পরিয়ে আবার খুলে নেওয়া, ওরা তো বোঝে না। আপনারাই বা কী করতে পারেন!

ভারী গলায় বলল বউটি। সাহেব হাত দিয়ে দেখে তারও চোখ ভিজে-ভিজে। কী কেলেঙ্কারি—শুনলে নফরকেষ্ট হেসে খুন হবে। যে শুনবে, সেই ছি-ছি করবে। কাজের দরকারে চোখে জল আনবে, তা বলে বেদরকারে আপনা-আপনি এসে পড়বে, এমন বেয়াড়া মন নিয়ে কাজকর্ম হয় কি করে? আর বুঝি দেখতে পারে না সাহেব, ছুটে বেরুল। এমনি করে বেরুনো ঘোরতর অন্যায়, সকলে তাকিয়ে পড়ে।

এক-ছুটে চলে গেল তাদের সেই জায়গাটিতে। নালা-পুকুর বুজিয়ে ক্ষেত-মাঠ-জঙ্গল সাফসাফাই করে নতুন রাস্তা হচ্ছে, ড্রেনের পাইপ বসবার জন্য মাটি তুলে পাহাড় করেছে, তারই পাশে একটা নারিকেলগাছ নিশানা।

টাকায় ঠাসা ব্যাগ, নফরকেষ্টর মুখে হাসি ধরে না। ছুটে এসে সাহেব হাত বাড়িয়ে বলে, দাও—

টাকা বের করে সাহেবের সামনেই গণেগেঁথে তার খোঁজদারির বখরা দেবে,সুকর্মের

পারিতোষিক হিসাবে বাড়তিও দেবে কিছু—কিন্তু তার আগেই ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে সাহেব দৌড় দিল।

আবার এক অনুচিত কাজ। ব্যাগ নিয়ে পোশাকের দোকানে ঢুকে পড়েছে। নফরকেষ্টর সেই যে গল্প—নোটের তাড়া তুলে নিয়ে ধরা পড়ে গেছে; যে ধরেছে তারই পকেটে নোটগুলো ফেলেছে আবার। সাহেবও কোন রকম কায়দা করে যার ব্যাগ তাকে দিয়ে আসবে।

কিন্তু গিয়ে পড়ে তুমুল কাণ্ড। কোথায় বা সেই বউ, আর কোথায় সেই ডলি নামের মেয়ে! দোকানের মানুষজন হৈ-হৈ করে ওঠেঃ আবার এসেছে। এরই কাজ। ধরো ছোড়াটাকে—

রে-রে—করে ধরতে আসে। সাহেবের সুন্দর চেহারা কাল হয়ে দাঁড়াল। একবার দেখলে আর ভোলবার জো নেই। দৌড়, দৌড়—

ভাবছে ছুঁড়ে ফেলে দেবে নাকি? লাভ নেই, পিছনে ছোটা তা হলেও বন্ধ করবে না। মাঝে থেকে টাকাগুলো নষ্ট। একরাশ টাকা, সুধামুখী নতুন হারমোনিয়াম কিনব কিনব করছে কত দিন থেকে—

আংটিবাবুরা গান শুনে অনেক রাত্রে চলে গেল। পারুলের হারমোনিয়ামটা এনে কাজ চালিয়েছে। তারপর নফরকেষ্ট যথারীতি এসে পড়ল। টুলের উপর চেপে বসে বউয়ের গল্প শুরু করে দেয়। বলে, বাঘে হামলা দিয়ে ফেরে, সেই অবস্থাটা চলছে এখন সুধামুখী। ঝাঁপিয়ে পড়ে কোন সময় না-জানি টুঁটি চেপে ধরবে।

এই পর্যন্ত—। হুঙ্কার দিয়ে সুধামুখীই ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাঘই বটে এই রোগাপটকা অস্থিসার রমণী। নফরকে বাঘে ধরেছে। লম্বা চুলে ফাঁপানো এলবার্ট-টেড়ি, রাত্রে এই বিশ্রামের সময় বাবু নফরকেষ্ট কিঞ্চিৎ বাহার করে আসে। মুঠো করে ধরেছে সেই চুল—

ছেলেকে তোমার পথে নামিয়েছ?

ঠাস-ঠাস করে চড়। হঠাৎ সুধামুখী হাউ-হাউ করে কেঁদে হাত-পা ছেড়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়েঃ ছেলে নিয়ে আমার যে কত সাধ! লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে, দশের একজন হবে। সে ছেলে ঘরবাড়ি ছেড়ে শ্মশানে-মশানে পড়ে থাকে এখন।

কাটা-কবুতরের মতো ছটফট করছে। বারম্বার বলে, সর্বনাশ করেছ তুমি। ছেলে আমার কাছ থেকে কেড়ে তোমার পথে নিয়ে নিলে।

চড় খেয়ে নফরারও মেজাজ চড়েছে। বলে, কাঙালি-ভিখারির মতন চাল কুড়াত—তার চেয়ে খারাপ এ পথ?

সুধামুখী উঠে বসে বলে, মন্দ পথ, অধর্মের পথ—

নফরকেষ্ট বলল, তুমি বলো ছেলে তোমার, আমি বলি ছেলে আমার—আমাদের ঘর থেকে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির বেরুবে, এই তোমার আশা? ঘেঁটুবনে চাঁপাফুল ফুটবে?

সুধামুখী বলে, ছেলে আমারও নয়, অন্য লোকের—

কথা শেষ করতে না দিয়ে নফরকেষ্ট তিক্ত স্বরে বলে, যাদের ছেলে তারা হল বড়-ঘরের অসতী মেয়ে আর বড়ঘরের বদমায়েস পুরুষ। তারা আমাদের চেয়েও খারাপ। আমাদের সোজা কথাবার্তা, স্পষ্টাস্পষ্টি কাজকর্ম। তাদের বাইরে ভড়ং, ভিতরে ইতরামি—

খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে—মাথার এলবার্ট-টেড়ি ভেঙে গিয়েছে, পকেটের চিরুনি বের করে নফরকেষ্ট টেড়ি কাটতে লাগল। সুধামুখী রান্নাঘরে গেছে। ভাত বেড়ে ফিরে এসে দেখে নফরকেষ্ট নেই।

ক্ষুধার্ত মানুষটা কোনদিকে গেল—হেরিকেন হাতে নিয়ে সুধামুখী খোঁজাখুঁজি করছে। সাহেবের খোপের কাছে এসে দেখে দরজা হা-হা করছে। হয়তো বা ঐখানে পড়ে আছে রাগ করে—

কেউ নেই ভিতরে। সাহেবের ক'টা কাপড়-জামা টাঙানো থাকে, তা-ও নেই।

নজর পড়ল, খাতা খোলা রয়েছে, কলমটা এক পাশে। হিজিবিজি অক্ষর খাতার পাতায়। সাহেব লিখে গেছে আত্মগ্লানির কথা : আমি ভালো, আমার কিছু হবে না। কেন ভালো হলাম ? হে মা-কালী, আমায় মন্দ করে দাও। খুব মন্দ হই যেন আমি—

ছয়

রাত্রিবেলা মেলগাড়ি হু-হু করে ছুটেছে। মাঝের জংশন-স্টেশন থেকে মধুসূদন মা-বউ আর বাচ্চাছেলে নিয়ে উঠল। জুড়নপুরে সাহেব ঘুমন্ত আশালতার গায়ের গয়না চুরি করল, এই বাচ্চা তখন বেশ খানিকটা বড় হয়ে উঠেছে। এ সময় মাস পাঁচ-ছয় বয়স।

রোগা মানুষ মধুসূদন, কিন্তু অশেষ কর্মিতকর্মা। মানুষ তুলে দিয়ে মালপত্তর গণে গণে তুলে সর্বশেষ নিজে উঠল। কামরার চতুর্দিকে মুহূর্তকাল নিরীক্ষণ করে দেখে। মাল ও মানুষ কোথায় কি ভাবে খাপ খাওয়াবে, মনে মনে তার নক্সা ছকে নিল। মা-কে বলে, ঐ কোণের বেঞ্চিটা নিয়ে নিলাম আমরা। দিব্যি নিরিবিলি। চলো—

আগে আগে চলল সে নিজে। ঐ তো তালপাতার সেপাই—একে ডিঙিয়ে ওর পাশ কাটিয়ে বোঁচকাবুচকি টিনের সুটকেস গ্লাডস্টোন-ব্যাগ ঘাড়ে তুলে ও হাতে ঝুলিয়ে টুক টুক করে পছন্দ-করা জায়গায় এনে ফেলছে। গোটা বেঞ্চিখানায় সতরঞ্চি বিছিয়ে দিয়ে বলে, বসে পড় এইবার।

বউকে বলে, বাচ্চা কোলে কেন ? ঐ কোণে শুইয়ে দাও। যত বেশি জায়গা জুড়ে নিতে পার এই সময়।

মালপত্র কোনটা বেঞ্চির তলে ঢুকিয়ে কোন কোনটা বাঙ্কের উপর তুলে দিয়ে লহমার মধ্যে গোছগাছ করে ফেলে। বউয়ের উপর খিঁচিয়ে উঠল : ওকি, হাত-পা গুটিয়ে অমনধারা কেন? গা-গতর ছড়িয়ে জায়গা নাও। এখন এই ফাঁকা দেখছ, এমন থাকবে না, তালতলা স্টেশনে গিয়ে বুঝবে ঠেলা। কালীপুজো গেছে কাল— পুজো দেখে কালীর মেলা সেরে মানুষজন ফিরে যাচ্ছে। কামরায় সর্ষে ফেলার জায়গা থাকবে না দেখো। বললাম যে জগদ্ধাত্রীপুজোটা কাটিয়ে যাই। মামারাও কত বলল। তা মা'র হয়েছে—একটা জায়গায় যাবার বেলা যেমন, আসার বেলাও তাই। রোখ চেপে গেলে আর রক্ষে নেই।

মধুসূদনের মা বলে ওঠেন, কর্তার ঐ অচল অবস্থা, মেয়ে দুটো পড়ে রয়েছে—মন ব্যস্ত হয় না! তোমার কি, চর্ব্য-চোষ্য খাওয়া আর রাজা-উজির মারতে পেলেই হল।

দিদিমাকে দেখতে মধুসূদনরা মামার বাড়ির গাঁয়ে গিয়েছিল, ফিরছে এখন। মধুর মা নিজেই বুড়ো মানুষ—তাঁর মা একেবারে থুনথুনে হয়ে পড়েছেন—কবে আছেন কবে নেই। নাতি মধুসূদনের ছেলেকে একটিবার তিনি চোখে দেখতে চেয়েছিলেন, তাই দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। ঐ সঙ্গে নিজের মেয়ে মধুর মা'কে দেখাও হয়ে গেল। মধুর বাপ, পক্ষাঘাতের রোগি, নড়তে চড়তে পারেন না, তিনি রয়ে গেলেন জুড়নপুরে। আশালতা শান্তিলতা দু-বোনও বাপের সঙ্গে। সোমত্ত মেয়ে নিয়ে ড্যাং-ড্যাং করে পথে বেরুনো ঠিক নয়। তা ছাড়া বোন দুটোও চলে এলে শয্যাশায়ী মানুষটাকে দেখে কে? মাত্র আটটা দশটা দিন থেকে সেই জন্যেই আরও তাড়াতাড়ি করে বাড়ি ফেরা।

বলেছে ঠিক, মধুসূদন খবরাখবর রাখে। তালতলার কাছাকাছি জঙ্গলবাড়ির শ্মশানকালী বড় জাগ্রত। কালীপুজোর সাতদিন আগে থেকে শ্মশানক্ষেত্রে মেলা বসে। পুজা অন্তে আজ সকাল থেকেই মানুষ ঘরে ফিরতে লেগেছে। পায়ে হেঁটে, গরুর গাড়িতে, নৌকোয়, ট্রেনে। মেলগাড়ি তালতলা স্টেশনে না পৌঁছতেই তুমুল হৈ-চৈ কানে আসে। দাঙ্গাই বেধে গেছে হয়তো বা প্লাটফরমের উপর।

মায়ের পাশটিতে মধুসূদন নির্বিঘ্ন জায়গা নিয়ে বসেছে। ঝিমুনিও এসেছিল একটু। গণ্ডগোলের সাড়া পেয়ে তড়াক করে উঠে পড়ে। কামরার দেয়ালে লেখা : বত্রিশ জন বসিবেক। তাড়াতাড়ি মানুষগুলো গণে নেয়। ছোট-বড়য় মিলে তেইশ। পুনশ্চ গণে নিঃসংশয় হয়, তেইশই বটে। তিন লাফে তখন দরজায় গিয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে ট্রেন প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে গেছে। বন্যাস্রোতের মতন লোক এসে দরজার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কামরার ভিতর থেকে মধুসূদন বীর-মূর্তিতে হ্যাণ্ডেল চেপে ধরেছে। বলে খুলে দিচ্ছি—চলে আসুন। মোটমাট নয়জন। তেইশ আর বত্রিশ। তার উপরে আধখানা নয়। আধখানা কি, একটা কড়ে-আঙুল অবধি ঢোকাতে দিচ্ছিনে। আইন মোতাবেক কাজ।

কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা রক্তাম্বরধারী দীর্ঘদেহ একজন—কালীভক্ত মানুষ সেটা আর বলে দিতে হয় না—জঙ্গলবাড়ি কালীর মেলা থেকেই ফিরছেন। দরজার সামনে

এসে অনুনয়ের কণ্ঠে বলছেন, যেতে হবে যে ভাই দুয়োরটা ছাড়।

মধুসূদন বলে, জায়গা নেই, বত্রিশ পুরে গেছে।

সাধু-মানুষটি হেসে বলেন, আমায় নিয়ে তেত্রিশ হবে। হয়ে যাবে একরকম করে। আমি আর কতটুকু জায়গা নেব। হয় কিনা, দেখিই না উঠে।

মধুসূদন ধমক দিয়ে ওঠে ঃ দেখবে কী আবার? লেখা রয়েছে বত্রিশ।

আমি যে যাবই ভাই—

বে-আইনি করে?

রক্তাম্বর সাধু ঝকঝকে দু-পাটি দাঁত মেলে হাসতে হাসতে বলেন, তুমি বুঝি আইনের বাইরে যাও না কখনও? আমি যাই। যারা আইন করে তারাও যায়।

বচসার মধ্যে মধুর মা ওদিকে ভীত স্বরে চেঁচাচ্ছেন ঃ ওরে মধু, চলে আয় তুই। তোর তো জায়গা রয়েছে, চুপচাপ এসে বসে পড়। একবার গোঁয়াতুমি করে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল, কোনরকমে প্রাণরক্ষে হয়েছে—

গর্জে উঠে মধুসূদন মায়ের কথা ডুবিয়ে দেয় ঃ প্রাণ যায় যাবে, সে মরণে পুণ্যি আছে। লোকে বলবে অন্যায়ের সঙ্গে লড়াই করে মরেছে।

রক্তাম্বর ইতিমধ্যে পাদানির উপর উঠে ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে কামরার অবস্থা দেখছেন।

মধুসূদন ব্যঙ্গস্বরে বলে, ঐ উঁকি পর্যন্ত। তার উপরে হবে না। আমি থাকতে নয়। দেখই না হয় একবার চেষ্টা করে। তার চেয়ে গাড়ি ছাড়বার আগে অন্য কোনখানে চেষ্টা দেখগে।

ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে তাঁকে। হঠাৎ সব কেমন উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। সাধুটি বাঁ-হাত আলগোছে রাখলেন মধুর গায়ের উপর। জোর করে সরিয়ে দিলেন, এমন কথা কেউ বলবে না। মন্ত্রবলে মধু আপনিই যেন দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। দূরে দাঁড়িয়ে সভয়ে তাকাচ্ছে ঃ এত শক্তি ধরে কাঁকড়ার ঠ্যাঙের মতো সরু ঐ আঙুলগুলো।

হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে দরজা খুলে কামরায় ঢুকে পড়ে মধুকে বললেন, জায়গায় গিয়ে বোসোগে। সবাই যাবে, একলা তোমার গেলে তো হবে না। এই ট্রেনে না গেলে প্লাটফরমে পড়ে সারারাত মশার কামড় খেতে হবে। পরের ট্রেন কাল দুপুরবেলা।

দরজা একেবারে মুক্ত করে দিয়ে জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, কম্প্টেসুণ্টে আরও বারো-চোদ্দ জনের জায়গা হয়। চলে আসুন, পয়লা ঘণ্টা দিয়েছে।

মধুসূদন হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে। তার দিকে চেয়ে সাধু স্নিগ্ধস্বরে প্রবোধ দেন ঃ অমনধারা করে না—ছিঃ! খুলনা অবধি যাওয়া নিয়ে ব্যাপার। তারপরে এ কামরা তোমারও নয়, আমারও নয়। ক-ঘণ্টার মামলা, তার জন্যে এমন মারমুখি কেন ভাই।

দরজা খোলা পেয়ে হুড়মুড় করে এক দঙ্গল ঢুকে পড়ল। পরের লোক এসে বেঞ্চিতে বসে পড়ছে, রক্তাম্বর নিজে কিন্তু জায়গা কাড়াকাড়ির মধ্যে গেলেন না। বাক্স বোঝাই জিনিষপত্র, তারই কতক ঠেলেঠুলে কায়ক্লেশে একজনের মতো একটু

জায়গা হল। রক্তাম্বর বাঙ্কের উপর উঠে গেলেন। মধুর মা-বউ বসেছেন, তাঁদেরই প্রায় মাথার উপরে।

সমস্ত হল। কিন্তু দ্বাররক্ষী মধুসূদনেরই বিপদ এখন। মায়ের পাশে যেখানটা সে বসেছিল, ছুটোছুটি করে নতুন এক ছোকরা সেই জায়গায় এসে বসে পড়েছে।

মধুসূদন হুঙ্কার দিয়ে পড়েঃ উঠে পড়ুন। আমার জায়গা এটা।

রণে পরাজিত মধুকে কে পোঁছে এখন! সেই ছোকরা খানিকক্ষণ তো কানেই শুনতে পায় না। বলে, জায়গাটা কি কিনে রেখে গেছেন মশায়?

মধুসূদন বলে, জায়গা ছেড়ে দরজায় চলে গেলাম সকলের উপকার হবে বলে।

উত্তম করলেন, পরের উপকারে পুণ্যি হয়। পরকে বসতে দিতে নিজে দাঁড়িয়ে কষ্ট করুন, আরও পুণ্যি। গাড়ি এখন স্টেশনে স্টেশনে থামবে, আপনি বরঞ্চ দুয়োর আটকে লোক খেদিয়ে সারা রাত পুণ্যি সঞ্চয় করুন। বসতে যাবেন কি জন্যে?

এই নিয়ে আবার একদফা জমে উঠেছে, ছোটখাট খণ্ডযুদ্ধের ব্যাপার। ঠিক সামনের বেঞ্চিতে সাহেব আর নফরকেষ্ট। নফরকেষ্টর আপিসের পোষাক—ধবধবে জামা-কাপড়, চোখে নীলচশমা। সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে মধুসূদনের জায়গা করে দেয়ঃ বসুন আপনি। সত্যিই তো, আপনার একার কিছু নয়—সকলের জন্য লড়তে গিয়েছিলেন।

মধুর মা চোখ পিটপিট করে তাকাচ্ছে সাহেবের দিকে। দেবতার মতো রূপবান ছেলের বিনয় ও বিবেচনা দেখে গলে গেছেন একেবারে। বাধা দিয়ে বললেন, সে হয় না। জায়গা ছেড়ে দিচ্ছ, তোমাকেও তো বাছা এত পথ তাহলে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। মধুর হকের জায়গা অন্য একজনে জুড়ে বসে রইল, সে তো একবার নড়ে বসে না। তুমি তবে কি জন্যে উঠতে যাবে। বসে থাক যেমন আছ।

সাহেব হাসে। সরু সরু সাদা দাঁত। ছেলেপুলের দুধে-দাঁত ইঁদুরের গর্তে দিয়ে বলতে হয়, এর বদলে তোমার দাঁত দিও ইঁদুরঃ নতুন দাঁত যেন ইঁদুরের মতো হয়। সাহেবের সেই ইদুরের দাঁত। ক্ষুদে ক্ষুদে দুই পাটি দাঁতের অপরূপ হাসি—ঐ হাসি দেখেই মানুষের আরও বেশি টান পড়ে।

হেসে সাহেব বলে, বসে বসে পায়ে খিল ধরে গেছে মা, একটুখানি দাঁড়াই। শরীর টান টান করে নিই। বেশিক্ষণ দাঁড়াব না। বড্ড কষ্ট যাচ্ছে কাল রাত্তির থেকে। বসে রাত কাটানো পোষাবে না আমার। শুতে হবে।

সাহেব বাঙ্কের শিকল ধরে দাঁড়িয়ে। এতক্ষণে এইবার কথাবার্তার ফুরসত। উপর থেকে রক্তবসন সাধুটি মধুসূদনের কপালে ক্ষতচিহ্নের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, কী হয়েছিল ভাই?

মৃদু হেসে মধুসূদন বলে, যে দেখে সে-ই জিজ্ঞাসা করবে। লুকোবার জো নেই।

তোমার ফাটা-কপাল হাজার লোকের মধ্যে থাকলেও নজরে পড়ে।

মধুসূদন গর্বিত কণ্ঠে বলে, ফাটা কপাল নয়, জয়তিলক। কপালের উপর পাকা হয়ে লেখা আছে। সরকারি লোকের উপর চড়াও হয়েছিলাম। হাটে মানুষ

গিজগিজ করছে, তারই ভিতর। বাঙালিকে ভীরু বলে—অপবাদটা খণ্ডন করলাম।

কানাইলাল-ক্ষুদিরামের পর কেউ বাঙালিকে ভীরু বলে না নিতান্ত নিন্দুকে আর শত্রুপক্ষ ছাড়া। কৌতূহলে রক্তাম্বর নড়েচড়ে খাড়া হয়ে বসেনঃ সরকারি লোক হাটের ভিতর গিয়ে কি করছিল ?

হাত-মুখ নেড়ে সেই বীরত্ব মধুসূদন সবিস্তারে বর্ণনা করে। সরকারি লোক মানে চৌকিদার। হাটের মালিক যথারীতি তোলা তুলে যায়, তারপরে চৌকিদারেরা জুটে চৌকিদারী তোলে। সুপারি একটা, পানপাতা দুটো, কাঁচালঙ্কা দুগণ্ডা, চিংড়ি-পুঁটি এক এক মুঠো, মুলো একটা, পালং একআঁটি, টো-ব্যাপারি যত আছে কারও একপয়সা কারও আধপয়সা—এমনি হল রেট। হাটের সময়টা চারিপাশের গ্রামের পাঁচ-সাতটা চৌকিদার কাক-চিলের মতো পড়ে চৌকিদারি তুলতে লেগে যায়। পরে সমস্ত এক জায়গায় নিয়ে বখরা করে। এক বুড়ো সেদিন গোটা পাঁচেক অকালের বাতাবিলেবু নিয়ে বসেছে—তারই একটা ধরেছে এসে। বুড়ো দেবে না, চৌকিদারও ছাড়বে না। টানাটানি, কাড়াকাড়ি। চৌকিদারের ছিল লম্বা দাড়ি—

কথার মাঝে নিজের বুক ঠুকে মধুসূদন বলে, এই যে মানুষটা দেখছ, অন্যায় কিছু চোখে পড়লেই মাথার মধ্যে চনমন করে ওঠে।

রক্তাম্বর মৃদুকণ্ঠে মন্তব্য করেনঃ কম বুদ্ধির লক্ষণ।

মধুসূদন কানেও নিল না। তেমনি দম্ভ ভরে বলে যাচ্ছে, চৌকিদারের দাড়ি ধরে পাক দিয়ে শুইয়ে ফেললাম। তারপরেই কুরুক্ষেত্তোর কাণ্ড। রে-রে—করে চতুর্দিক থেকে ছুটেছে। মারগুতোন শুরু হয়ে গেল—যাকে বলে হাটুরে-মার। কিল-চড়-ঘুষি—যে যতদূর কায়দার পায়, মেরে নিচ্ছে। মেরে হাতের সুখ করে।

চৌকিদারকে ?

উঁহু, তার কোমরে যে সরকারি চাপরাশ। সরকারী লোক মারার তাগত কি যার-তার থাকে। মারছে আমাকে। হাটের মাঝে এক তালগাছ—রাগ না চণ্ডাল, সেই তালের গুঁড়ির উপর নিয়ে আমার মাথা ঠুকতে লাগল। আমি সেসব কিছু জানিনে, জ্ঞান হল হাসপাতালে গিয়ে।

রক্তাম্বর বলেন, কিন্তু রাগটা তোমার উপর কেন ? তুমি তো সকলের ভাল করতে গিয়েছিলে।

আজকেও তো তাই, বসবার জায়গাটা অবধি বেদখল। পরে যেটা শুনলাম—গ্রাম পাহারা দেয় বলে পাবলিকেই চৌকিদারি আদায় করতে বলেছে। অন্যায়টা আসলে চৌকিদারের নয়, প্রেসিডেণ্ট-পঞ্চায়েতের। সদর থেকে চৌকিদারের মাইনে আসে, প্রেসিডেণ্ট সেটা মেরে দেন। হুকুম আছেঃ এলাকার ভিতর থেকে বন্দোবস্ত করে নাওগে। উল্টে চৌকিদারই প্রেসিডেণ্টকে দিয়ে থাকে কিছু কিছু, নইলে চাকরি বজায় থাকে না। তা প্রেসিডেণ্ট মশায় থাকেন দোতলা পাকা-দালানে, হাতের মাথায় পাই কেমন করে তাঁকে ?

একটু থেমে দম নিয়ে মধুসূদন বলে, তবে কথা একই—চৌকিদারের দাড়ি ধরে

প্রেসিডেন্টের দাড়ি ধরাই হয়ে গেল। সবাই সরকারি লোক। প্রেসিডেণ্ট বলে কেন, লাটসাহেবের দাড়ি—এমন কি, সমুদ্র-পারে ভারত-সম্রাটের অবধি দাড়ি ধরা হয়েছে। হয়েছে কিনা বলো?

সম্রাটের দাড়ি ধরে এসেছে—সেই আত্মপ্রসাদে মধুসূদন চারিদিক তাকিয়ে চোখের তারা বিঘূর্ণিত করছে, আর দ্রুতবেগে পা দোলাচ্ছে।

কতক্ষণ কাটল। মেলগাড়ি সড়াক-সড়াক করে স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে যায়। শিকল ধরে সাহেব তেমনি ঝুল খেয়ে আছে। চোখ বুঁজে আসে ক্ষণে ক্ষণে, মাথা কাত হয়ে পড়ে।

নজর পড়ে মধুসূদনের মা চুকচুক করেন: দাঁড়িয়ে ঘুমুচ্ছ বাছা, পড়ে যাবে যে!

লজ্জা পেয়ে চোখ মেলে সাহেব তাড়াতাড়ি বলে, ঐ যে বললাম মা, কাল রাত্তির থেকেই ধকল যাচ্ছে। চোখ ভেঙে আসছে! না শুয়ে উপায় নেই দেখছি।

মা অবাক হয়ে বলেন, বসতে না পেয়ে লোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে কোথায় শোবে তুমি?

সাহেব হেসে নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলে, বসার জায়গা না থাক, শোওয়ার তো অঢেল জায়গা।

শোবারই ব্যবস্থা করে নিল সাহেব। একদিকের বেঞ্চিতে পাশাপাশি মধুসূদন আর নফরকেষ্ট, উল্টো দিকে মধুর মা বউ আর বাচ্চা-ছেলেটা। দুই বেঞ্চির ফাঁকে মেজের কাঠের উপর সটান সে শুয়ে পড়ল। গায়ে জামা—শীতের আমেজ বলে সাহেব জামাসুদ্ধ শুয়েছে। মোটা সুতির চেক-কাটা চাদর কাঁধে ছিল, শুয়ে পড়ে গায়ের উপর চাপাল সেটা।

মধুর মা বলেন, পায়ের কাছে এ কেমন শোওয়ার ছিরি!

সাহেব বলে, আপনার পা গায়ে লাগবে, সে তো আশীর্বাদ আমার মা।

এমন সুন্দর কথা বলে ছেলেটা—পা একটু গুটিয়ে নিলেন মধুর মা। বেঞ্চির একেবারে কোণটায় বাচ্চা ঘুম পাড়িয়ে বালিশ ঘিরে দিয়েছে, তার এদিকে বউটা গুটি-সুটি হয়ে পড়ে! ঘুমিয়ে গেছে সন্দেহ নেই। সামনা-সামনি বসে মধুসূদনও এক-একবার ঢুলে পড়ে, নড়েচড়ে চোখ রগড়ে খাড়া হয়ে বসে আবার। আর নীল চশমার অন্তরালে, নফরকেষ্টর চোখ বন্ধ কি খোলা, বোঝার উপায় নেই।

দুলছে গাড়ি। খট-খট খটাখট। লোহার পাটির উপর দিয়ে ছুটছে খুব জোরে। স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে জোনাকিপুঞ্জ গাছে গাছে যেন তারা হয়ে ফুটে আছে। কিন্তু দেখছে কে এত সব! কামরার সমস্ত মানুষ, বসে হোক আর দাঁড়িয়েই হোক, চোখ বুজে রয়েছে। জগৎ-সংসার এখন আর চেয়ে দেখবে না, যেন প্রতিজ্ঞা।

হঠাৎ একবার নফরকেষ্ট ডেকে ওঠে: ওরে খোকা!

সাহেব নয়, আদি-নাম গণেশও না। এমনি সব ক্ষেত্রে নতুন নামে ডাকবার বিধি। 'খোকা' নাম বুড়ো হয়ে গেলেও চলে। বিশেষ করে, বাপের যে দাবিদার, সেই মানুষের মুখে।

চোখ খুলে মধুর মা বলেন, অকাতরে ঘুমুচ্ছে, ওকে ডাকাডাকি কর কেন ?

গাড়িতে উঠবার আগে গা-বমিবমি করছিল। এখন কেমন আছে, জিজ্ঞাসা করে দেখি।

মধুর মা চটে গিয়ে বলেন, বলিহারি তোমার আক্কেল! বমি যদি আসে, ডেকে তুলতে হবে না। আপনি উঠে বসবে। দেখতে পাচ্ছি, বড্ড হিংসুটে মানুষ তুমি। বসে বসে নিজের ঘুম হচ্ছে না, ওকেও তাই ঘুমুতে দেবে না। কী হয় তোমার ?

নফরকেষ্ট বলে, ছেলে।

চমক খেয়ে মধুর মা তাকিয়ে পড়লেন তার দিকে : কেমন ছেলে তোমার ?

সকলের যেমন হয়। পাশের মধুসূদনকে দেখিয়ে বলে, আপনার ছেলে যেমন ইনি।

ডেকে ডেকে ছেলেকে জ্বালাতন কর কেন ? অসুখের কথা বললে, চুপচাপ তবে ঘুমুতে দাও। চোখ বুজে নিজেও বরঞ্চ ঘুমানোর চেষ্টা দেখ।

ব্যাপারটা নফরকেষ্ট যেন আগে খেয়াল করেনি, বুঝে দেখে বিষম অপ্রতিভ হয়েছে। তেমনিভাবে বলে, উতলা হয়ে পড়েছি কিনা, ছেলেটার মা নেই। আপনি ঠিক বলেছেন। ডাকাডাকি করব না, আরাম করে ঘুমোক।

গায়ের উপরের চাদর জায়গায় জায়গায় সরে গেছে। নফরকেষ্ট পরিপাটি করে ঢেকে দেয়। বেঞ্চির তলায় মধুসূদনের গ্লাডস্টোন-ব্যাগ—সাহেবকে ঢাকা দিতে গিয়ে সে বস্তুটাও চাপা পড়ে যায় চাদরের নিচে।

কাল রাত্রেও গ্লাডস্টোন-ব্যাগ নিয়ে এক ব্যাপার। যখন যে ফ্যাশান ওঠে। গ্লাডস্টোন-ব্যাগ নিয়ে বেড়ানোর রেওয়াজটা বড় বেশি আজকাল। হাতে দু-চার পয়সা হলেই লোকে ঐ ব্যাগ একটা কিনে ফেলবে।

কালীঘাটে, এমন কি কলকাতা শহরের উপরও নয়—আপাতত রেলের কাজ ধরবে, নফরকেষ্টরা ঠিক করে বেরিয়েছে। অতএব সকালবেলা দু-জনে চাঁদনির এক দোকানে গিয়ে ঢুকল।

মালে চাইনে, দামে সস্তা—এমনি জিনিস মশায় হপ্তা পরে খতম হলেও ক্ষতি নেই। দেখতে খুব চমকদার হবে।

অভিজ্ঞ দোকানদার ঘাড় নেড়ে বলে, বুঝেছি। প্রীতি-উপহারের মাল। বাজার বুঝে সব রকম আমাদের রাখতে হয়। ঘর-ব্যাভারি থাকে, প্রীতি-উপহারও থাকে। যেমন ইচ্ছা নিয়ে নিন।

গ্লাডস্টোন-ব্যাগ কিনে জঞ্জালে ভরতি করছে। যথোচিত ভারী হয় না দেখে রাস্তা থেকে গোটা কয়েক পাথুরে খোয়া নিয়ে ভিতরে ঢুকাল। বাবু নফরকেষ্ট এবং তস্য পুত্র শ্রীমান গণেশচন্দ্র নগদ টাকায় টিকিট কেটে চলেছে দেশভ্রমণে। নফরের হাতে ব্যাগ, বাড়তি দু-চারটে জিনিস চেক-কাটা চাদরে সাহেব পুঁটলি করে নিয়েছে।

গাড়িতে উঠে সাহেব জানলায় মুখ দিয়ে বাইরের শোভা দেখছে। নফরকেষ্ট ভিতরের বেঞ্চিতে। ঘুম ধরছে, ঢুলে ঢুলে পড়ছে।

পাশের লোক খিঁচিয়ে ওঠে : বালিশ নাকি আমি—গায়ের উপর দিব্যি আরামে

মাথা চাপিয়ে দিয়েছেন ? খাড়া হয়ে বসুন।

মার্জনা চেয়ে নফর খাড়া হয়ে বসল। কিন্তু কতক্ষণ ! চোখ বুজে এবার সে একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে দুলছে। হঠাৎ এক সময় সাহেব চেঁচিয়ে উঠল এই তো, এসে গেছি বাবা—

ছোট একটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। গোটা দুই কেরোসিনের আলো টিমটিম করছে, সেই কয়েক হাত জায়গা ছাড়া ঘন অন্ধকার চতুর্দিকে ! হুড়মুড় করে দু-জনে নেমে পড়ল। গাড়িও ছেড়ে দেয় সঙ্গে সঙ্গে। কয়েকটা রক্তবিন্দু—দূরবর্তী হয়ে ক্রমশ তা-ও মিলিয়ে গেল।

গেট-বাবু লণ্ঠন উঁচু করে দেখে বললেন, টিকিট যে তালতলার। এঃ মশায়, এখানে নেমে পড়েছেন ! তালতলার তো অনেক দেরি।

বিপন্ন নফরকেষ্ট বলে, কী সর্বনাশ ! ঘুম এসে গিয়েছিল, ব্যস্তবাগীশ ছোঁড়াটা চেঁচিয়ে উঠল। রাত্তিরবেলা অত আর বুঝে উঠতে পারলাম না—

সাহেব বলে, আমি যেন পড়লাম স্টেশনের নাম—

নফরকেষ্ট গর্জন করে ওঠে : তোর বাপের মাথা পড়েছিস। পিটিয়ে তুলোধোনা করব, টের পাসনি হারামজাদা।

পরক্ষণেই সকাতরে গেট-বাবুকে বলে, পরের গাড়ি কখন স্যার ?

রাতের মধ্যে নেই। কাল দিনমানে—

নফর মাথায় হাত দিয়ে পড়ে : উপায় ?

গেট-বাবু দয়াবান। বললেন, ওয়েটিংরুমের চাবি খুলে দিচ্ছে। ঐখানে পড়ে থাকুন। আর কি হবে !

ওয়েটিং-রুমে ঢুকে দরজা এঁটে দিল। প্রয়োজন ছিল না, জনমানব কোন দিকে নেই। কিন্তু গুরুবাক্য : কাজের মুখে নিজেকেও বিশ্বাস নেই। আয়না ধরে নিজের চেহারাটাও দেখে নিয়ে নিঃসন্দেহ হবে, আমিই ঠিক সেই লোক কিনা।

দরজা-জানলা বন্ধ করে নফরকেষ্ট দেশলাইয়ের কাঠি জেবলে ধরল। নাববার সময় ব্যাগ বদল করে এনেছে। কাজটা একেবারে নির্বিঘ্ন। ধরে ফেলল তো জিভ কেটে বলবে, তাই তো মশায়, বড্ড রক্ষে হয়ে গেল। যথাসর্বস্ব আমার ব্যাগের ভিতর —কী যে মুশকিলে পড়তাম !

কাঠি একটা শেষ হয়ে গেলে আর একটা ধরায়। সাহেবকে সতর্ক করে : একটা একটা করে বের কর সাহেব। যত্ন করে নামিয়ে রাখ। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। মা-কালী কী জুটিয়ে এনে দিলেন, কিছু বলা যায় না। পলকা জিনিষও থাকতে পারে।

সাহেব বের করছে, ঝুঁকে পড়ে নফর দেখে। খাতা আর কাগজ। পুরানো বাংলা হরফে লেখা কান-ফোঁড়া নানা রকমের দলিল। ভিতরে হাত ঢুকিয়ে উলটে-পালটে দেখে, কাগজ ছাড়া অন্য কিছু নেই।

হায় মা-কালী, কী লীলাখেলা তোমার ! নতুন লাইনের কাজ ধরে পয়লা বউনি-মুখে এটা কি করলে ? ছেলেমানুষ কত আশায় ব্যাগ খুলেছে, তার মনটাই বা কী

রকম হয়ে গেল! কাগজপত্র ফেলে শুধু ব্যাগটাই যে নিয়ে নেবে—তলা উইয়ে খেয়েছে না কি হয়েছে, দেশি মুচি দিয়ে মোটা চামড়ার পটি দিয়েছে সেখানটা। এহেন মহামূল্য বস্তু পাছে কোনদিন পাচার হয়ে যায়, বড় বড় অক্ষরে মালিকের নাম-ঠিকানা ব্যাগের গায়ে।

ক্রুদ্ধ হতাশায় নফর গর্জন করে: শয়তান! হীরে-মুক্তো বোঝাই করে নিয়েছে, এমনিভাব দেখাচ্ছিল। তাই তো আরও বেশি করে আমার নজর ধরল। ডাহা বেকুব বানাল আমাদের!

সাহেব বলে, মামলার দলিলপত্তর এসব। যশোরে লোকটা মামলা করতে যাচ্ছিল। দলিল তো হীরে-মুক্তোই ওর কাছে।

ব্যাগ সুদ্ধ পুড়িয়ে ছাই করে দেব।

সাহেব মৃদুকণ্ঠে অনুনয়ের সুরে বলে, যাব তো ঐ দিকেই। আমি বলি, যশোরে নেমে কাগজগুলো পৌঁছে দিলেও হয়। উকিলের নাম ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছে। মানুষের অকারণ ক্ষতি করে কি লাভ!

এ কথায় নফরকেষ্ট ক্ষেপে যায়: জামার দোকানে সেদিন ঐ কাণ্ড করলি—আবার তাই? কোন হতচ্ছাড়া দয়াময়ের ব্যাটা—এ লাইন তোর জন্যে নয়। ভলান্টিয়ার হয়ে পরের দুঃখ মোচন করে বেড়াগে যা।

ক্রোধের কারণ আছে সত্যি। গ্লাডস্টোন-ব্যাগ এবং দুজনের রেলভাড়া গচ্চা গেল। কাজটায় বিপদ নেই বটে, কিন্তু কপালের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। নিতান্তই জুয়াখেলার মতো।

কাল রাত্রে এই হয়েছে। আজকে আর এক রকমের খেলা। রেলের কাজের বিস্তর পদ্ধতি। মধুর মায়ের সঙ্গে নফরার এত কথাবার্তা, কিন্তু বউ অথবা মধুসূদন একটিবার চোখ মেলেনি, কোনরকম সাড়া দেয়নি। সাড়া দেবার অবস্থাই নেই—নজর ফেলে বোঝা যায়। নীল-চশমার আড়াল থেকে নফরকেষ্ট সমস্ত কামরায় একবার চোখ ঘুরিয়ে নিল। তারপরে পায়ের চাপ দিল ঘুমন্ত সাহেবের গায়ে। রাস্তার কাজ, ট্রাম-বাসের কাজ, রেলের কাজ—কাজ অনুযায়ী নিয়ম-কায়দা সব আলাদা। আজকের এই কাজের কারিগর হয়েছে সাহেব। বয়স ও চেহারার গুণে সাহেবকেই এমনি ধারা ঘনিষ্ঠ হয়ে পায়ের কাছে শুতে দিয়েছে, অন্য কাউকে দিত না। নফরকেষ্ট চাদর গুঁজে কাজের গোছগাছ করে দিল। সেটা ডেপুটির কাজ। কিন্তু ডেপুটি না বলে এই ক্ষেত্রে সর্দার বা সেনাপতি বলাই ঠিক। নিকটে ও দূরে ভাল করে দেখে নিয়ে পায়ের চাপে সেনাপতি নিঃশব্দে হুকুম দিল: সুসময়, লেগে পড় এইবার।

ইঙ্গিত পেয়ে সাহেব গাঁট থেকে ছুরি বের করে। হরেক রকমের ছুরি সঙ্গে—চামড়া-কাটা ছুরি, টিন-কাটা ছুরি, ছাড়া কাচের টুকরো, পেরেক—তিন চারটে টাকাও। কাজের উপকরণ এই সমস্ত। টাকা রাখতে হয়—বিপদের মুখে হাতে গুঁজে দিয়ে পালাবে। সাহেবের সর্বদেহ চাদরে ঢাকা, শুধুমাত্র মুখ আলগা। সে মুখ-চোখ অঘোরে ঘুম ঘুমাচ্ছে, চাদরের নিচে দ্রুত হাতে কাজ চলছে ওদিকে। চাদর

একটুকু নড়ে না। দীঘির জলের নিচে মাছ কত খেলে বেড়াচ্ছে, উপরের জলে নাড়া লাগে না যেমন। রীতিমতো কষ্ট করে শিখতে হয়, এ বস্তু অমনি আসে না। নফরকেষ্টর সাফাই হাতের গুণগান সর্বত্র। বাপ ছেলের সম্পর্ক পাতিয়েছে—ছেলেকে উত্তরাধিকারী রূপে সেই গুণের খানিকটা ইতিমধ্যেই দিয়েছে। ছুরিখানাই বা কী—মধুসূদনের ব্যাগ যেন চামড়ার নয়, মাখন দিয়ে তৈরি। মাখনের দলার মধ্যে ছুরি চালাচ্ছে।

গ্লাডস্টোন-ব্যাগের কাজ সমাধা হল তো পাশে রয়েছে বোঁচকাবুচকি—ঘুমের ঘোরে চাদরের নিচের হাত বেরিয়ে এসে বোঁচকার উপর পড়ে। পায়ের আঙুলে চেপে ধরে নফরকেষ্ট চাদরের কোণ তাড়াতাড়ি সেদিকে টেনে দিল। দিয়ে চাপ দিল আবার পায়ের ঃ নির্ভাবনায় চালিয়ে যাও বাপ আমার।

নিখুঁত কাজকর্ম, তিলমাত্র ত্রুটি নেই কোনদিকে। কিন্তু অদৃষ্ট খারাপ—উঁহু শেষ পরিণাম বিবেচনা করে খারাপ অদৃষ্ট বলা যাবে না। ইঞ্জিনে জোর দিয়েছে, ট্রেন বিষম দুলছে। টিনের সুটকেশটা মধুসূদন বাঙ্কের উপর রেখেছে। হুড়মুড়িয়ে সেটা নিচে এসে পড়ে—পড়বি তো পড়, সাহেবের মুখের উপরে। চোখ মেলে মধুসূদনের মা হাউমাউ করে উঠলেন ঃ ওরে কী সর্বনাশ! খুন হয়ে গেছে পরের ছেলেটা গো!

মধুসূদন তুলে ধরল সুটকেস। সাহেবও উঠে বসল। তোবড়ানো পুরানো জিনিস, জোড় খুলে টিন হাঁ হয়ে আছে। টিনের খোঁচা লেগেছে সাহেবের মুখের দু-তিন জায়গায়। রক্ত বেরিয়ে গেছে। বাঁ-চোখের ঠিক নিচেই একটা খোঁচা—অল্পের জন্য চোখ বেঁচে গেছে।

সোরগোল। কামরার মানুষ সকলের ঘুম ছুটে গেছে। মধুর মা আহা রে, আহা রে—করছেন। চোখে জল পড়ছে তাঁর। কে-একজন ওদিক থেকে বলে ওঠে, অসাবধানে রাখে কেউ অমন! খুব তো ফড়ফড়ানি মশায়। মানুষটা খুন হয়ে যাচ্ছিল—আইনে এবার কি বলবে?

মধুসূদন বেকুব হয়েছে, তবু মুখের জোর ছাড়ে না ঃ লোকটার দিকে চেয়ে জবাব দেয় ঃ সাবধানেই রাখা হয়েছিল। সাধুমশায় ঐ যে সরিয়ে-ঘুরিয়ে স্বর্গে চড়লেন, উনিই গোলমাল করেছেন। তা হয়েছে কি শুনি?

সাহেবও সেই সুরে সুর মেশায় ঃ ছড়ে গিয়েছে একটুখানি। এমন কত হয়। আমার এতে লাগে না।

মায়ের উপর মধুসূদন ধমক দেয় ঃ তুমি অমনধারা করছ কেন মা? সব তাতে বাড়াবাড়ি। যার লেগেছে সে বলে, কিছু নয়। হলেই বা কি! ব্যাগের মধ্যে এক-ডিস্পেনসারি ওষুধ নিয়ে যাচ্ছি। হোমিওপ্যাথি ওষুধ—যার এক দাগ খাইয়ে কাটা-মুণ্ড জুড়ে দেওয়া যায়। তিন-চার বড়ি আর্নিকা খাইয়ে দিচ্ছি, ব্যথা-টুকুও হবে না।

বেঞ্চির তলায় গ্লাডস্টোন-ব্যাগ টেনে বের করে। এই গোলমালের মধ্যে নফরকেষ্ট কোন সময় জায়গা ছেড়ে উঠে পড়েছে। সিগন্যালের বিলম্বে গাড়িটাও লহমার জন্যে

থেমেছিল বুঝি। টুক করে সেই সময় সে নেমে পড়ল। সাহেব ব্যূহবেষ্টনীর মধ্যে। ব্যাগ টেনে এনে বেঞ্চির উপর রেখে মধুসূদন ওষুধ বের করবে। এ কি, একদিকের চামড়ায় লম্বালম্বি ফালি।

মধুর বুড়ি দিদিমা পদক-যশম দিয়ে নাতির ছেলের মুখ দেখেছেন। বড়মামী দিয়েছেন কোমরের নিমফল, ছোটমামী কপালের পুঁটে। এই তিন দফা গয়না রুমালে একসঙ্গে বাঁধা ছিল। আরও নাকি পাঁচ টাকার নোট দুখানা। সমস্ত লোপাট।

বাঙ্কের উপরের রক্তাম্বর সাধু লম্ফ দিয়ে পড়লেন। রাগে গরগর করছেন ঃ অ্যাঁ, ছোঁড়া তুই কোঁচড়ের ইঁদুর হয়ে কুটুর-কুটুর কাপড় কাটিস ?

বাঘের মতন পড়ে সাহেবের টুঁটি চেপে ধরলেন। আক্রোশে মধুসূদনও মারছে, কিন্তু সাধুর কাছে লাগে না। দমাদম কিল মারছেন পিঠের উপর। মুষলধারে—থামাথামি নেই। বেপরোয়া ঘুসি। কামরা-ভরা লোকের হাত নিসপিস করছে—কিন্তু সাধুই মেরে চলেছেন রকমারি কায়দায়, এদিক থেকে সেদিক থেকে পাক-চক্কোর দিয়ে। অন্যের এগোবার সাধ্য নেই তার ভিতরে। কাণ্ড দেখে সকলে থ হয়ে গেছে। যা রাগ, একেবারে মেরেই ফেলেন বুঝি !

তাঁকেই ঠেকাচ্ছে এখন সকলে মিলে ঃ অত মার মারছেন, মরে যাবে যে ! আপনার কী এতে বাবাজী ?

যাক মরে। যাক, যাক। এরা সব মানুষ নামের কলঙ্ক, সমাজের আপদবালাই। মরে গেলে ধরিত্রী জুড়োয়।

কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে ওঠে তাঁর ঃ আমারও সর্বনাশ হয়েছিল এমনি গাড়ির কামরায়। পরিবারের গয়নার বাক্স নিয়ে চম্পট দিয়েছিল। গয়নার দুঃখেই পরিবার শেষটা আত্মঘাতী হল। কলকে-ফুলের বীচি খেয়ে মরল। তারপর থেকে আমার এই দশা। নিকুচি করেছে সংসারে। সাধু বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বলতে বলতে পুরানো স্মৃতিতে রাগ আবার চড়ে যায়। পা তুলে লাথি কষিয়ে দিলেন সাহেবের পিঠে।

মধুসূদনের মা আঁকুপাকু করছেন। রক্তাম্বরের উপর ক্ষেপে ওঠেন ঃ ধর্মকর্ম কর না তুমি ? চণ্ডালের রাগ যে হার মেনে যায় তোমার কাছে।

আর এক প্যাসেঞ্জার বলে, ধর্ম না কাঁচকলা ! কাপালিক এরা—মারণ-উচাটন কাজ। পোশাকে টের পাচ্ছেন না ? নরবলি দেয়। কায়দায় পেয়েছে একটাকে। খাঁড়া-মেলতুক এখন কোথায় পায়—হাত-পা দিয়েই বলির কাজ সারছে।

জনকয়েক এগিয়ে এসে ধাক্কা দিয়ে রক্তাম্বরকে সরিয়ে দেয় ঃ আর মারবেন না, উল্টে আপনিই কেসে পড়ে যাবেন, সাধু বলে আইনে ছাড়বে না। আমাদেরও রেহাই দেবে না পুলিস, সবসুদ্ধ হাতে দড়ি পরবে। এখন ঠাণ্ডা হন। দৌলতপুরে এসে যাচ্ছে, গাড়ি অনেকক্ষণ থামবে। রেল-পুলিসের জিম্মা করে দেওয়া যাবে।

মুখ বাঁকিয়ে রক্তাম্বর বলেন, পুলিস ! বলবেন না, বলবেন না—এই বয়স অবধি পুলিস আমার ঢের ঢের দেখা হয়েছে। আপনারা এ দরজা দিয়ে বেরুলেন, পুলিসের

হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে আসামিও অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মধুসূদন বলে, পুলিস সাচ্চা হলেই বা ক্ষমতা কি তাদের! কোর্টে কেস তুলে দিলে—দু-মাসের জেল। মজাসে সরকারি খানা খেয়ে পাকা-ঘরে বসবাস করে একদিন বেরিয়ে এল জেল থেকে। এসে তখন দুনো তাগত নিয়ে কাজে লাগে।

উত্তেজনায় ছটফট করছে সে। বলে, জেল-টেল কিছু নয়—ধরে এদের ফাঁসিতে লটকানো উচিত। তবে সমুচিত শিক্ষা হয়। ফাঁসির পরেও গলায় দড়ি বেঁধে গাছে টাঙিয়ে রাখা। রোদে শুকোক, কাকে ঠুকরে ঠুকরে খাক। অসৎকর্মের পরিণামটা চোখে দেখুক সর্বজন।

সাহেব হাপুসনয়নে কাঁদছে। সকলের বলাবলিতে মারগুতোন আপাতত বন্ধ। তল্লাসি চলছে কাপড়চোপড় ও জায়গাটার এদিক-সেদিক।

গয়না-টাকা কোথায় রাখলি তুই?

কান্নাজড়িত কণ্ঠে সাহেব বলে, আমি নিইনি। আমি কিছু জানিনে।

মধুর মা মাথা ভাঙাভাঙি করছেন: মিছামিছি তোরা মারধোর করলি। ও নেয়নি, অমন ছেলে নিতে পারে না। চেহারা দেখেও বুঝিস না তোরা—চোরের কখনো এমন দেবতার মত রূপ! নিয়ে থাকে তো গেল কোথা জিনিসগুলো—গিলে খেয়েছে মুখের ভিতর ফেলে?

মায়ের কথারই জবাব দেয় মধুসূদন সাহেবের উপর তড়পে উঠে: তোর সেই বাপটাকে দেখছিনে তো! গেল কোথায়? তাকে দিয়ে পাচার করলি।

মা ওদিকে বলেই চলেছেন, বউটা হয়েছে তেমনি আগোছালো—কোথায় কি রাখে ঠিকঠিকানা নেই। ব্যাগে না রেখে হয়তো বা সুটকেশে রেখেছে, সুটকেশটা দেখ তোরা খুঁজে। আনেইনি হয়তো মোটে। তোর বড়মামীর কাছে রাখতে দিয়েছিলি—খোঁজ নিয়ে দেখবি, সেইখানে পড়ে আছে। উঃ, বাছা তুই কার মুখ দেখে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলি রে!

চকিতে সাহেব মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকায়। কে যেন বুকের মধ্যে বলে ওঠে, দুনিয়াময় মায়ের কোল—মায়ের কোল বাদ দিয়ে পালাবি কোনখানে হতভাগা? রেলের কামরাতেও মা। এক কাঠাও ভুঁই পাবিনে মায়ের কোল যেখানটা নেই।

মধুর বউয়ের উপর দোষ পড়েছে, বউ কথা না বলে পারে কেমন করে? বলে, আমি আগোছালো মানুষ—জিনিস না হয় ফেলে এসেছি। কিন্তু ব্যাগটা যে এমন করে কেটে ফাল-ফালা করেছে, সে মানুষটা কে?

সাহেব বলে, আমি করিনি—

বেঞ্চির তলে অনেকটা দূরে এই সময় ছুরি আবিষ্কার হল। নফরকেষ্টকে আর সব দিয়েছে, ওটা দেয়নি পাশাপাশি যেসব মাল আছে, সেই কাজের সময় লাগবে বলে। দুর্ঘটনায় আর কিছু হতে পারল না। ছুরিটা হাতে তুলে ধরে মধু বলছে, কার এটা—এঁল কোত্থেকে?

সাহেব বলে, আমার জিনিস নয়।

মার বন্ধ করে রক্তাম্বর ফুঁসছিলেন এতক্ষণ অজগর-সাপের মতো। আবার ঝাঁপিয়ে পড়েন : বটে রে! একে চোর, তায় মিথ্যুক! ছুরির বুঝি পাখনা হয়েছিল, উড়তে উড়তে তোর কাছে এসে গেছে ?

বলেই এক ঘুসি। আবার দ্বিতীয় ঘুসি তুলেছেন, ছুটে এসে একজনে হাত চেপে ধরে। ঠেকানো কি যায়! মানুষটার গায়ে অসুরের বল—সে তো কামরায় ঢোকবার মুখেই সকলের চাক্ষুষ হয়েছে।

বললেন, দৌলতপুর-টুর নয়—শেষ জায়গা খুলনায় নিয়ে ফেলব। ওখানকার থানা কোর্ট সর্বত্র আমার খাতির। মধুবাবু খাঁটি কথাই বলেছে—এই বয়সে এত বড় বিচ্ছু—ছোঁড়ার ফাঁসি হওয়াই উচিত। পানসা আইনে সে তো হবার জো নেই, কন্দুর ঠেসে দেওয়া যায় দেখি। চুল পাকবার আগে বাছাধনের বেরুতে না হয়, সেই তদ্বির করব। বেরিয়ে এসে লাঠি ঠুকঠুক করে দশ দুয়োরে ভিক্ষে করে বেড়াবে, অন্য কিছু করার তাগত থাকবে না।

খুলনা স্টেশনে ট্রেন তখনো ভাল করে থামেনি, রক্তাম্বর সজোরে সাহেবের ঘাড় ধাক্কা দিলেন : চল্—

মধুর মা ব্যাকুল হয়ে বলেন, সত্যি সত্যি যে নিয়ে চললে বাবা ?

ভগবানের নাম করি, সত্যি ছাড়া মিথ্যে এ মুখে বেরোয় না। বেরোবার উপায়ই নেই।

সাহেব আর্তনাদ করছে। ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়ে তাকে প্ল্যাটফরমে নামিয়ে ফেললেন।

লাইনের শেষ স্টেশন। সকলে নেমে পড়ছে। সাধু ডাক দিলেন, আপনাদের কেউ কেউ চলে আসুন মশায়রা।

কোথায় ?

আপাতত থানায়। তার পর যখন মামলা উঠবে, কোর্টেও দিন কয়েক। ছোঁড়াটাকে এত সমাদরে নিয়ে যাচ্ছি, সাক্ষি-টাক্ষি দিয়ে কৈবল্যধামের ব্যবস্থা করবেন তো!

যে লোকের সঙ্গে কথা হচ্ছে, রক্তাম্বর তারই হাত চেপে ধরেন : আপনি একেবারে সামনের উপর ছিলেন মশায়, সমস্ত চোখে দেখেছেন। আপনি আসুন।

লোকটা তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, মাপ করতে হবে বাবাঠাকুর। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, থানায় ছুঁলে একশ-আঠার। চশমা খোলা ছিল সে সময়টা, একেবারে কিছু দেখতে পাইনি।

মধুসূদনকে দেখিয়ে বলে, যাবেন এই ভদ্রলোক, যার জিনিস খোয়া গেছে। গিয়ে পড়ে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে আসুন। অন্যের কি দায় পড়েছে ?

মধুসূদন খিঁচিয়ে উঠল : তা বই কি! আমি গিয়ে থানায় উঠলাম—স্টিমার ফেল করে বাচ্চা আর দুটো মেয়েলোক সারাদিন ঘাটের উপর পটোলপোড়া হোক। যা যাবার সে তো গেছেই, গোদের উপর বিষফোঁড়া তুলে কাজ নেই। পা চালিয়ে

চলো মা, আমাদের স্টিমারেই বুঝি সিটি দিল ঐ।

দেখা যাচ্ছে, এত লোকের মধ্যে শিক্ষাদানের উৎসাহ একজনেরও নেই। এ বলে তুমি যাও, ও বলে আপনি যান। এবং নিজ নিজ মাল ও মানুষ নিয়ে বেরিয়ে পড়তে প্রত্যেকেই ব্যস্ত। বিরক্ত হয়ে রক্তাম্বর বলেন, না আসেন তো বয়ে গেল। থানা-স্টাফের মধ্যে আমার বিস্তর শিষ্যসেবক, কোর্টেও অনেক ভক্ত। আপনাদের কাউকে লাগবে না, আমার একার সাক্ষিতেই হয়ে যাবে। বাকি সাক্ষিসাবুদ যা লাগে, ওরাই সব গড়েপিটে নেবে।

মধুর মা তখনও বলছেন, কেউ যাবে না, তোমারই বা কী গরজ ঠাকুর! তোমার তো কানাকড়িও খোয়া যায়নি। ছেলের মুখের দিকে একটিবার তাকাও না। কিচ্ছু করেনি, এ ছেলে ভাল বই মন্দ করতে পারে না। ছেড়ে দিয়ে যাও।

সাহেবের দু-চোখ ভরে অকস্মাৎ জল নেমে আসে। নদীর জলে ভেসেআসা ছেলে—মা নেই, মাকে দেখেনি কখনো। অথচ মা যেন সর্বত্র। গর্ভধারিণী মাকে না পেয়ে ভালই হয়েছে বোধহয়। ছোট বাড়ির একখানা দু-খানা কি পাঁচখানা ঘর জুড়ে খুঁটিনাটি গৃহকর্মে ব্যস্ত একফোঁটা মা নয়—তার মা চরাচরব্যাপ্ত। যে বাড়ির যত মা এতাবৎ সে দেখে এসেছে, সকলের সঙ্গে একাসনে এক মূর্তি হয়ে তার মা-জননী। কুয়াসামগ্ন অনন্ত সমুদ্র দেখার মতো চোর-সাহেবের মনে এক বিশাল অনুভূতির অস্পষ্ট আভাস। সাধু হিড়হিড় করে টেনে জনতার আগে চললেন, সাহেব মুখ ফিরিয়ে বারম্বার মধুর মাকে দেখে নিচ্ছে।

প্ল্যাটফরমের শেষ মাথায় টিকিটবাবু। রক্তাম্বর নিজের টিকিটটা দিলেন, আর সাহেবকে দেখিয়ে একটি টাকা গুঁজে দিলেন তার হাতে।

সাহেব বলে, টিকিট তো আছে আমার।

সাধু হেসে ফেললেনঃ বটে! মুফতের কারবার নয়, লগ্নি করে কাজে নেমেছিস?

টিকিটবাবুর দিকে বলেন, জমা রইল টাকাটা। মনে করে রাখবেন, পরের কোন কেসে উশুল হবে।

ফাঁকায় আসার সঙ্গে সঙ্গে সাধুর কণ্ঠস্বর মধুমাখা হয়ে উঠেছে। মুচকি হাসি মুখে। বলেন, এত মারলাম তোকে, ব্যথা লাগে নি?

সাহেবও হেসে ফেলেঃ মারলে তো লাগবে! শুধু তম্বি, শুধুই আওয়াজ। কামরার মেজের ধুলোবালি কিছু গায়ে লেগেছিল, আদর করে থাবা দিয়ে সেই সমস্ত যেন ঝেড়েঝুড়ে দিলেন—আমার তাই মনে হচ্ছিল।

গলা ফাটিয়ে তুই কেঁদে উঠলি—সেই সময়টা একবার সন্দেহ হল, লেগে গেল নাকি হঠাৎ?

শতকণ্ঠে সাধুমশায় তারিপ করছেন। আমায় অবধি ধোকা ধরিয়ে দিস, বাহাদুর বটে তুই! সকলের মধ্যে সাট না থাকলে কাজ ভাল ভাবে নামে না। খাসা তোর শিক্ষাদীক্ষা—মুখ ফুটে বলতে হয়নি, বলবার ফুরসতও ছিল না, আপনা থেকেই

বুঝে নিলি। জোর কান্না কেঁদেছিলি বলেই তো বিনা দ্বিধায় তোকে আমার হাতে ছাড়ল। এত সহজে নিষ্কৃতি পেয়ে গেলি।

যেতে যেতে পরিচয় নিবিড় হচ্ছে।

আপনজন কে কে আছে তোর? বাপ বেঁচে আছে?

হুঁ—

মা?

হুঁ, হুঁ, হুঁ—। মায়ের কথায় বার তিনেক হুঁ দিয়েও সাহেবের তৃপ্তি নেই। রক্তবসনধারী এই যে পুরুষটি, ইনিও যেন মা হয়ে গেলেন তার।

ভাই-বোন আছে?

সাহেব এবারও ঘাড় নেড়ে দেয়। খুব সম্ভব মিথ্যা কথা হল না। যে দেখে সে-ই বলে, সাহেব কোন বড়মানুষের ছেলে। বড়মানুষরা হামেশাই মরে না—কোন অভাবে মরতে যাবে? ঘর ভরভরতি থাকে তাদের, ছেলেপুলে কিলবিল করে। অতএব বাপ-মা-ভাই-বোন সবই আছে তার। পরিচয় না জানুক, আছে নিশ্চয় পৃথিবীর কোথাও। এবং সুখে আছে।

রক্তাম্বর সাধু প্রশ্ন করেন, নাম কি রে তোর? বাপের নাম কি?

'খোকা' নাম নফরের মুখে একবার বেরিয়ে গেছে, নতুন-কিছু না বলে ওটাই আপাতত চালানো যেতে পারে। এবং 'সরকারি খেয়া'—অদূরে একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ছে, তাই থেকে উপাধিটা মনে এসে যায়।

খোকনচন্দ্র সরকার। এক কথায় বলে, কিন্তু বাপের নামে কিছু ভাবনার ব্যাপার। অগণ্য বাপ—রাজাবাহাদুর থেকে শুরু করে নফরকেষ্ট অবধি। কমবেশি সবাই কিছু কিছু বাপের কাজ করেছে। এই পল্টনের ভিতর থেকে কার নামটা পছন্দ করে বলবে, হঠাৎ কিছু মাথায় আসে না।

জবাব না পেয়ে সাধুমশায় অন্য রকম ভাবলেন। মৃদু হেসে বলেন, পালিয়ে এসেছিস বুঝি—নাম বললেই আমি বুঝি ধরে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেব! ভয় করিস নে—আমি ঠিক উল্টো রকম ভাবছি। কী কাজ করে তোর বাপ?

এতক্ষণে ভাল একটি বাপ ঠিক করে ফেলেছে। চেতলায় চালের আড়তের মালিক পুরুষোত্তম সা। বিশাল মানুষটি, ভুঁড়ি ততোধিক বিশাল—গলায় সোনার হার, হাতে সোনার চাকতি, হাতবাক্স-ভরা কাঁড়ি-কাঁড়ি নোট। এর চেয়ে উপযুক্ত বাপ আর হয় না।

কি করে বাপ তোর?

চালের ব্যবসা।

ব্যবসাদারের গুষ্ঠি তবে তোরা! সাধু হা-হা করে হাসতে লাগলেন। তোর ব্যবসাটাও স্বচক্ষে দেখলাম। দেখে তাজ্জব। বেড়ে হাতখানা বানিয়েছিস! চাদরের নিচে গুটগুট করে কাজ করে যাচ্ছিস—ছুরি ধরা থেকে আঙুল ঘুরিয়ে ব্যাগের মাল বের করে পাচার করে দেওয়া—সমস্ত ব্যাপারটা ছবির মতন চোখের উপর ভাসছে। ইচ্ছে হচ্ছিল, রুপো বাঁধিয়ে দিই অমন হাত। ছক-বাঁধা সাজানো কাজকর্ম।

নির্গোলে বেরিয়েও যেতিস ঠিক—বাক্স পড়ে বিপদ ঘটাল। দোষ তোদের নয়—নিয়তি, তার উপরে কারো হাত নেই। কাজের গোছগাছ করে দিচ্ছিল সে মানুষটাও ভাল। তাক বুঝে মাল নিয়ে কেমন সরে পড়ল। পাকা লোক। দুয়ে মিলে খাসা দলটুকু গড়েছিস তোরা।

নদী-তীরে নৌকোঘাটে এসে দাঁড়ালেন। মুগ্ধকণ্ঠে সমানে তারিপ চলছে। বলছেন, হাতের চেয়েও বড় রাজপুত্রের মতো তোর এই চেহারাখানা। মরি মরি, কী চেহারা নিয়ে জন্মেছিস—চোখ ফেরানো যায় না। মা-কালী যাকে দয়া করেন, চার হাত ভরে তার উপর ঢেলে দেন। এত গুণ নষ্ট হতে দিসনে, বুঝলি? মহা-পাতক। কাজ দেখার পর থেকে শুধু এই কথাটাই ভাবছি। এমন কাঁচা বয়সে পুলিসের হাতে না পড়ে যাস। বয়েস হয়ে পাকাপোক্ত হয়ে দু-চারবার ফাটক ঘুরে এলে খারাপ হয় না—ভালই বরঞ্চ, মুখ বদলানো। পুলিস এখন থেকেই যদি পিছনে ফিঙে লাগে, সব শক্তি বরবাদ করে দেবে। সেইটে ভেবেই অমন করে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম। নইলে, চেনা নেই জানা নেই, সবে আজ পয়লা দিনের দেখা—এত কাণ্ড করবার গরজটা কী ছিল!

ভাঁটা সরে নদীজল অনেকটা দূরে নেমে গেছে। ডান-হাতটা সাধুমশায় একটুখানি তুলেছেন কি না তুলেছেন, ঘাটে-বাঁধা এ-নৌকো ও-নৌকো থেকে পাঁচ-সাত জন মাঝি ঝপাঝপ লাফিয়ে পড়ে ডাঙা মুখো ধাওয়া করল। কাদায় হাঁটু অবধি বসে যায় কোনখানে, কখনো বা পিছলে পড়ে যাবার গতিক—উঠি-কি-পড়ি ছুটেছে তারা।

সাধু চেঁচিয়ে বলেন, অত জন কেন রে? আসতেও হবে না। যার নৌকোয় চড়ন্দার নেই, ওখান থেকে বলে দাও। আমি নেমে যাচ্ছি।

মাঝিরা কানেও নেয় না।

সাহেবের দিকে চেয়ে সাধু বলেন, যাবি রে আমার সঙ্গে?

সাহেব তখন সেই কাদামাটির উপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছে। কষ্ট করে—রীতিমতো শক্ত হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ, কিন্তু এই কাজটুকু না হওয়া পর্যন্ত মনে যেন কিছুতে সোয়াস্তি আসে না। তার এই বিষম দোষ। কোন একটু উপকার পেলে প্রাণ কানায় কানায় ভরে যায়, উপকারীকে কায়ে-মনে সেটার জানান দিতে হবে। তাদের যে কাজ, সে পথের দস্তুর আলাদা। সুন্দর চেহারা, সাফাই হাত, উপস্থিতবুদ্ধি—যাবতীয় গুণ রয়েছে, কিন্তু এই বদখত ভালমানুষিটা না ছাড়তে পারলে উপায় নেই।

প্রণাম সেরে উঠেই অনুতাপ। সেই আর এক দিনের মতো মাকালীর নামে সাহেবের মনে মনে আছাড়ি-পিছাড়ি: মা-কালী, মন্দমানুষ কর আমায়। খুব—খুব মন্দ। নফরকেষ্টর মতো নয়—ও মানুষটাও এক একসময় বড্ড ভাল হয়ে যায়। একেবারে নিটোল নিখুঁত মন্দ মানুষ করে দাও।

সারা জীবন ধঁরে সাহেব তার অজানা মা আর অজানা বাপের নামে গালিগালাজ করে এসেছে। কোন সৎ সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে আর সজ্জন পুরুষ—তাদের রক্ত থেকে এই দোষ বর্তেছে। ভাত-কাপড়ের কেউ নয়, নাক কাটবার গোঁসাই—বুড়ো হয়ে মরতে

গেল সাহেব, সেদিনও এই দোষের সংশোধন হয়নি।

থাক এসব। সকলকে পিছনে ফেলে এক মাঝি ছুটতে ছুটতে রাস্তার উপর উঠল। আবদারের সুরে বলে, ঝড়ু-মাঝি সেদিন এই ঘাটে রেখে গেল, আজকে আমি ফেরত নিয়ে যাব। ঘাড় নেড়ে দিন বলাধিকারীমশায়, ওদের সব হাঁক দিয়ে বলে দিই।

ভাঁটিঅঞ্চলের সুবিখ্যাত বলাধিকারীমশায়—জগবন্ধু বলাধিকারী। গাড়ির মধ্যে সারাক্ষণ সাধুমানুষ হয়ে এসেছেন। কলকাতা শহরটার বাইরে সাহেব একেবারে নতুন—তখন অবধি নাম শোনেনি, কোন-কিছুই জানে না বলাধিকারী মানুষটির সম্বন্ধে। কিন্তু ঘাটের উপরে এ হেন খাতির দেখে অবাক হয়ে যায়।

মাঝি বলছে, চরণধুলো আজ আমার নৌকোয় দিতে হবে। নয়তো মাথা খুড়ব পায়ে।

জগবন্ধু হেসে বলেন, ধুলো কোথায় পাব গো? এক-পা চটচটে কাদা। তাই তোমার নৌকোয় মাখাব। কি বলবে, বলে দাও ওদের ডেকে।

পুলকিত মাঝি জলের দিকে ফিরে পিছনে অন্যদের উদ্দেশে বুড়ো-আঙুল নাচায়। অর্থাৎ কেল্লা মেরে দিয়েছি আগেভাগে ছুটে এসে, তোমাদের শুধু কাদা ভাঙাই সার।

নিজের নৌকোয় মাল্লাদের চিৎকার করে বলে, নিমকির ঘাটে নিয়ে নৌ ধরু, ঐখানে যাচ্ছি আমরা।

এই অঞ্চলে একসময় বিস্তর নুন তৈরি হত। নুনের কোন বড় মহাজন পাকা-ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছেন নুনের নৌকো চলাচলের জন্য রশি দুয়েক পথ—মাঝি সেই ঘাটের কথা বলছে। সেখানে গেলে কাদা ভেঙ্গে নৌকোয় উঠতে হবে না।

বলাধিকারী বলেন, আবার কষ্ট করে উজান ঠেলে মরবে! গাঙখালের দেশের মানুষ কাদা ভাঙতে পারব না—পা দুখানা তবে তো মোড়ক করে লোহার সিন্দুকে রেখে দিলেই হয়।

নৌকো নিয়ে যাচ্ছে সেই নিমকির ঘাটে। ডাঙার উপরে হাঁটতে হাঁটতে এঁরা পথটুকু চলেছেন।

জগবন্ধু সাহেবের দিকে চেয়ে বলেন, জঙ্গলবাড়ির মা ভারি জাগ্রত। কত জায়গা থেকে কত মানুষ আসে, দেখলি তো তার খানিক। আমি যাই ফি বছর। সকলের যেমন—আমিও গিয়ে মানত শোধ দিই, নতুন বছরের জন্য মানত করে আসি—

বলে হাসতে লাগলেন। মাঝি ফোড়ন কেটে ওঠে: মস্তবড় সংসার আমাদের বলাধিকারীমশায়ের। ভালমন্দ কার কখন কি হয়, সেই জন্য মায়ের বাড়ি ধন্না দিয়ে পড়েন।

সংসার না থাকুক নিজে তো আছি। নিজের জন্য গিয়ে মানত করি।

মাঝি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, আপনার আবার সংসার নেই! তল্লাটের মধ্যে এত

বড় সংসার কার আছে শুনি ? কার মাথায় এত দায়ঝক্কি ?

জগবন্ধু বোধকরি প্রসঙ্গটা আর এগুতে দেবেন না। কথা ঘুরিয়ে নিলেন : মেলার মানুষ তিন-চার রাত্রির মধ্যে চোখের পাতা এক করতে দেয়নি। নৌকোয় উঠেই মাদুর পেতে পড়ব। গাবতলির আগে আমায় কেউ ডাকবে না, তোমায় বলা রইল মাঝি। গাবতলি গিয়ে সকলে ভরপেট জলটল খেয়ে নেবে।

সাহেবকে বলেন, আকাশের উপর থেকে ভগবান নাকি দেখেন। আমারও হল তাই। বাঙ্কের উপর থেকে দেখেছি। বাঙ্কটা পেয়ে গিয়ে ভারি স্ফূর্তি হয়েছিল। চলন্ত গাড়িতে ঘুমুতে মজা—মালপত্র ঠেসান দিয়ে বসে বসেই ক'দিনের বকেয়া ঘুম উশুল করে নেব। ঢুলুনিও এসেছিল। তোদের জ্বালায় হল না। হঠাৎ দেখি, কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছিস ঠিক আমার নজরের নিচে। অমন একখানা মজাদার কাজের শেষ না দেখে পারি কেমন করে ? কিন্তু সেই লোকটাকে আর দেখলাম না— বাপ হয়ে যে ছেলের গায়ে চাদর গুঁজে দিচ্ছিল।

পিছন থেকে নফরকেষ্ট অমনি সাড়া দিয়ে ওঠে : আজ্ঞে, এই যে আমি—

দ্রুত সামনে চলে এসে সাহেবের মতো সে-ও বলাধিকারীর পায়ে গড় করল। আশীর্বাদের ভঙ্গিতে মাথায় হাত ছুঁইয়ে জগবন্ধু হেসে বললেন, খোকনচন্দ্রের যে বাপ, এমনধারা কাঁচা ব্যবস্থা তার হাতে কেন হবে ?

নফরকেষ্ট সচকিত হয়ে বলে, আজ্ঞে ?

ভুঁড়িটা বড্ড একপেশে তোমার বাপু। একদিক চিটেপানা আর একদিকে বেঢপ মোটা। ঠিক করে নাও, ঠিক করে নাও। কত ডাক্তার কত দিকে—পেটে কী রোগ হয়েছে, কেউ হয়তো টিপে দেখতে গেল।

জামার নিচে কোমরে মাল বেঁধে নিয়েছে, ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটির মধ্যে একদিকে সেটা সরে গিয়েছে। সলজ্জে নফরকেষ্ট সামাল করে নিল।

সাহেব বলে, কী করব আমি, বলে দিন।

বলেই তো দিয়েছি। আমার সঙ্গে চল্। গাড়িতে গাড়িতে ছ্যাঁচড়ামির কাজ ছেড়ে দে, পিটিয়ে শেষ করবে কোনদিন। কাল রাত্রেই তো হচ্ছিল। ক্ষমতা নষ্ট হতে দিতে নেই, উচিত কাজে লাগা !

নফরকেষ্ট বলে, ছেলে ফেলে আমিও কিন্তু যাব না বলাধিকারীমশায়।

সাহেব ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, যাওনি ঐ গাড়ির মধ্যে ?

নফরকেষ্ট বলে, আমায় দু-ঘা মারলে তোর গায়ের ব্যথা কম হত নাকি কিছু ?

বলাধিকারী নফরকেষ্টকে সমর্থন করেন : ঠিক করেছে। কাজের এই নিয়ম। মার কি বলছিস রে, মেরে ফেললেও দলের কেউ এসে চেনার ভাব দেখাবে না। নির্বিঘ্নে কাজ নেমে গেল, সকলে একত্র হলি—আবার তখন পুরানো সম্পর্ক।

শহরের দুটো মানুষ বলাধিকারীর সঙ্গে জলের রাজ্যে চলল।

গাবতলির হাট অদূরে। সারি সারি চালা দেখা যায়। হাটবার আজকে। সূর্য

চলে এসেছে, জমজমাট এখন। গাঙের বাঁধ ধরে হাটুরে মানুষের পিলপিল করে যাওয়া-আসা চলছে।

বলাধিকারীর ঘুম নামে মাত্র। ডাকতে হয়নি, আপনিই উঠে পড়েছেন। হাটের দিকে আঙুল তুলে বলছেন, শীতকালে এবারে এই জমতে শুরু করল। কি করবি, জিজ্ঞাসা করছিলি না—দেদার কাজ। ধান পেকেছে, কাজের অভাব নেই আমাদের ভাঁটি অঞ্চলে। দিনের কাজ আছে, রাতের কাজ আছে—কাজের আর স্ফূর্তির দিন এখন। মানুষের দরকার অঢেল। ধান কাটার মানুষ চাই, পাঠশালা বসবে তার জন্য গুরুমশাই চাই, অসুখ হলে পয়সার গরমে এখন সকলে ওষুধপত্তোর খাবে তার জন্য ডাক্তার চাই, যাত্রার দল খুলবে তার সখী চাই—কত মোশানমাস্টার চাই—কত মানুষের কত কাজ! এ কি তোর শহরবাজার পেলি, কাজ-কাজ করে মানুষ যেখানে চোখের জলে বুক ভাসায়?

নৌকা ততক্ষণে হাটখোলা ধরো-ধরো করেছে। একদিকে কতকগুলো পত্রহীন বাবলাগাছ। বলাধিকারী বলেন, মরশুমের মুখে এখন বাবলাবনে এক নতুন হাট বসেছে—মানুষ-হাটা। গাঙের খোল থেকে ঠিক দেখা যাচ্ছে না। খানিকটা জায়গা সাফসাফাই করে গামছা পেতে সারবন্দি সব বসে আছে বিক্রি হবার জন্য। ক্ষেতেল চাষী, গুরুমশায়, ডাক্তারবাবু, গানের ছোকরা—হরেক-গুণের মানুষ। বলিস তো তোকেও ওর মধ্যে বসিয়ে দিতে পারি খোকনচন্দোর। হাটুরে মানুষ এক মরশুমের দরদাম ঠিক করে নৌকোয় নিয়ে তুলবে। এ সমস্ত হল দিনমানে সদরের উপরের কাজ, আর রাতের কাজের খবর যদি চাস—

বলাধিকারী অর্থপূর্ণ ভাবে একটু হাসছেন। নৌকোয় মাঝিমাল্লার ব্যাপারটা যে অজানা তা নয়। তবু এ সমস্ত অপরের কান বাঁচিয়ে বলার রীতি। এদিক-ওদিক চেয়ে অত্যন্ত গলা নামিয়ে বলতে লাগলেন, রাতের কাজেরও মরশুম এই। পুরো মরশুম চলছে। নিশিকুটুম্বরা সব নলে নলে বেরিয়ে পড়েছে বার-দশেরার পরে। দলে দলে বলবি নে—আয়োজন বৃহৎ, সেজন্য নলে নলে। বাইরে বাইরে তাদের কাজ, আমার ছুটি এই সময়টা। ছুটি বলেই জঙ্গলবাড়ি মায়ের দর্শনে যেতে পারলাম।

একেবারে হাটের নিচে এসে পড়েছে। বলাধিকারী ফিক-ফিক করে হাসেন: বিয়ে করার বাসনা যদি হয়ে থাকে, তারও মরশুম কিন্তু এই। জামাইহাটা ঐ যে—টেরি কেটে ধোপদুরস্ত কাপড় পরে জামাইরা সব ঐখানে এসে বসেছে। স্বয়ম্বর-সভা। তবে কনে আসে না, আসে বাপ-দাদারা। ঘুরে ঘুরে তারা আলাপ-পরিচয় করবে, কনের দর তুলবে। বরপণ নয়, কন্যাপণ। দরে বনিবনাও হয়ে গেল, জামাইটাও নেহাৎ অপছন্দের নয়—কনেওয়ালা তখন গাঁয়ের ঠিকানা দিয়ে নিমন্ত্রণ করে যাবে, বরকর্তা গিয়ে কনে দেখে টাকাকড়ি কিছু দাদন দিয়ে কথা পাকা করে আসবে।

সাহেবের দিকে চেয়ে বলাধিকারী হেসে বলেন, কীরে, যাবি নাকি নেমে জামাই-হাটায়। তোর মতন জামাই পড়তে পাবে না, চেহারায় মেরে দিবি—খুব সস্তা পণে কনে গেঁথে ফেলবি।

হাসাহাসি চলে খানিকক্ষণ। কথা হয়েছিল, হাটে নেমে মিষ্টিমিঠাই এবং টিউবওয়েলের মিঠাজল ভরপেট খেয়ে নেবে সবাই। কিন্তু ঘাটে এসে মাঝি এখন আড় হয়ে পড়েছে ঃ গোনের আর অল্পই আছে, দেরি করলে জোয়ার এসে যাবে। রাতও হয়ে আসে এদিকে—কোনখানে নৌকো বেঁধে গোনের আশায় সেই রাত দুপুর অবধি ঠায় বসে থাকা—ফুলহাটা পেঁছানো তাহলে সকালের আগে নয়। পেটে ক্ষিধে সকলের—তা বেশ, একজন কেউ নেমে গিয়ে ক্ষিধের রসদ নিয়ে আসুক। যাবে আর ফিরে আসবে। তা বলে বলাধিকারীমশায় নন, ওঁর নামা হবে না।

জগবন্ধু হতাশ হয়ে বলেন, শুনলে তোমরা ? আদালতের বিচার হয়ে জেল দেয়। মাঝি আমায় বিনা বিচারে আটক করল। যে কেউ তোমরা নেমে গিয়ে ঘুরেফিরে আসতে পার, আমারই কেবল পাড়ের মাটিতে পা ছোঁয়ানো মানা। মনে দুঃখ লাগে কিনা বলো।

মনের দুঃখে মুচকি-মুচকি হাসতে লাগলেন। নৌকার এই নতুন মানুষ দুটো সত্যিই বা সেইরকম ভেবে বসে—মাঝি তাড়াতাড়ি তাই কৈফিয়ৎ দিচ্ছে ঃ হঁ্যা, অন্যায় বলে থাকি তো ধরে মারুক সকলে। আপনি নেমে পড়লে তুলে নিয়ে আসা চাট্টিখানি কথা ! হাটের মধ্যে কত দেশের কত মানুষ, কত দোকানপাট। এ দোকান থেকে ডাকবে ঃ একটুখানি বসে যান বলাধিকারী মশায়। ও দোকানি ছুটে এসে ধরবে, পা ছুঁইয়ে যান একটিবার দোকানে। অমুক এসে শলাপরামর্শ চাইবে, তমুক এসে হাত পাতবে—একটা-দুটো টাকা দিয়ে যান। শতেক জনের হাজারো রকম দায়—হাট না ভাঙা পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে দেবে না।

নিজের প্রশংসায় বলাধিকারী বিব্রত বোধ করছেন। বাধা দিয়ে বলে ওঠেন ঃ থাক থাক, চুপ কর দিকি। এরা ভাববে, সত্যিই বুঝি আমি দরের মানুষ। টাকা দিয়ে দিচ্ছি, আর কেউ নয়—তুমিই নেমে পড় মাঝি। মুড়ি-বাতাসা আর মিষ্টিমিঠাই নিয়ে এসো। মিঠাজল এনো এক কলসি। দু-জন কুটুম্বমানুষ—মিষ্টি বেশি করে নিয়ে এসো। শহর থেকে এসেছে, পেট না ভরলে শহরে ফিরে নিন্দেমন্দ করবে।

ঘাটের উপর বোঠে পুঁতে নৌকায় কাছি করে মাঝি ডাঙায় লাফিয়ে পড়ে একছুটে বেরিয়ে গেল। টাকাপয়সা যায় যাক মানুষ মরে মরুক—সমস্ত সইবে, কিন্তু অকারণ গোন বয়ে যাচ্ছে, নৌকোর মাঝির বুকে তখন শেল বিঁধতে থাকে।

সাহেব তাকিয়ে তাকিয়ে চারিদিক দেখছে। দুচোখ ফেরানো যায় না। ছোট্ট বয়সে কালীঘাটে নৌকার মাঝিদের কাছে এমনি সব জায়গারই গল্প শুনেছে। মন উচাটন হত চোখে দেখবার জন্যে, এতদিনে ভাগ্যে তাই ঘটল। নৌকোয় নৌকায় ঘাটের জল দেখবার উপায় নেই। বিশাল নদীর ওপারে দীর্ঘব্যাপ্ত সবুজ রেখা অস্পষ্ট নজরে আসে। জনালয় নেই ওদিকে, বাদাবন। বাঘ-সাপ-কুমিরের আরামের রাজ্য।

বলাধিকারীর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নেয় ঃ নামটা দিয়েছে বেশ—বলাধিকারী। ঠিক ঠিক মানিয়েছে। বলের নমুনা গাড়িতে উঠবার মুখেই একটুখানি দেখালেন—মধুসূদন মানুষটাকে পোকামাকড়ের মতন আঙুলের ডগায় খুঁটে ফেলে দিলেন যেন।

জগবন্ধু বললেন, বলাধিকারী কারও দেওয়া নাম নয়—কৌলিক উপাধি। এক

বয়সে দেহচর্চা করে গায়ের বল কিছু করেছিলাম বটে। নিলাম দারোগার চাকরি—সে চাকরি হল খুনি-বদমাশ চোর-ডাকাতের নামে নিরীহ ভাল ভাল মানুষ ঠেঙিয়ে দুটো পয়সার সংস্থান করা। তার জন্য গায়ের বল চাই বইকি! কিন্তু মানুষের আসল বল বুদ্ধিবল—সে বস্তু কেউ চোখে দেখে না। আমার সেদিকটা একেবারে খাটো। কারো ঘটে যখন বুদ্ধি দেখতে পাই, মানুষটাকে খাতির করি। কপর্দকহীন মানুষ, দেখিসনি, পয়সাওয়ালা কাউকে দেখলে বেসামাল হয়ে কী রকম হেঁ-হেঁ করে! জামাইআদরে নৌকোয় তুলে নিয়ে যাচ্ছি তোকে নয় রে খোকনচন্দোর—তোর মগজের বুদ্ধি আর সুচতুর হাত-দুখানাকে।

এবং হাত ও মগজের গুণপনায় মুগ্ধ বলাধিকারী ঐ নৌকাঘাটেই বুঝসমঝ শুরু করে দিলেন।

নিম্নকণ্ঠে বলেন, আমাদের মাঝি উল্টো করে বোঠে পুঁতে গেল কেন?

পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝে বলে উঠলেন, তুই যে ডাঙার দেশের মানুষ, ভুলে গিয়েছিলাম। উল্টো-সোজার কি জানিস! ঠাহর করে দেখ, সব ডিঙিওয়ালা বোঠের চওড়া মাথা মাটিতে পুঁতেছে। পোঁতবার সুবিধা, চাপ দিলেই বসে যায়। আমাদের উল্টো। মুঠোর দিকটা পোঁতা, চওড়া মাথা উঁচুতে। কেন রে?

সাহেব কি জানে, আর কি বলবে? অবোধ চোখে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।

বলাধিকারী বুঝিয়ে দিচ্ছেন: হাটখোলা জায়গা—কতজনে কত মতলব নিয়ে ঘুরছে। রাত্রিকাল সামনে। বোঠে উল্টো করে পুঁতে জানান দেওয়া হল, বাপু হে, আমরাও ঐ কাজের কাজি। পিছু নিও না কেউ আমাদের।

বলেন, দেবভাষায় এ-জিনিসের নাম চোরসংজ্ঞা। সংজ্ঞা অনেক রকম আছে। মনে কর, পিছন ধরেছে একটা দল। আমাদের নৌকো মারবে, জোরে জোরে বেয়ে আসছে। অন্ধকারে মানুষ ঠাহর হয় না। কাছাকাছি এসে বলবে, এক ছিলিম তামাক দাও ও মাঝি-ভাই। কিম্বা বলবে, মাছ কিনে আনলাম, আঁশ-বঁটিখানা একবার বের করো ভাই। নৌকো মারবার মুখে এই সমস্ত বলে। কি করবি তখন, সামাল দেবার উপায়টা কি!

উপায়ের কথাটা আপাতত চাপা পড়ে যায়। জলের কলসি ও মিঠাই নিয়ে মাঝি ফিরে এলো। নৌকো ছুটিয়ে দিয়েছে, হাটখোলায় সময়ের ক্ষতিটুকু পূরণ করে নেবে।

আধখানা বাঁকও যায়নি। কে-একজন চেঁচামেচি করছে না পিছন দিকে? তেমনি একটা আওয়াজ বাতাসে ভেসে আসে।

বলাধিকারী চোখের উপর দিকটায় হাত রেখে নিরীক্ষণ করেন। সন্ধ্যাবেলা চারিদিক ঘোর হয়ে এসেছে। দেখেন জেলেডিঙ্গি যেন নদীজলের উপরে তরতর করে উড়ে আসছে।

বলাধিকারী বললেন, বোঠে তুলে ধরো তোমরা। দেখা যাক। কী যেন বলছে। নৌকো রাখতে বলছে, এমনি মনে হয়।

খানিকটা কাছে এলে বলাধিকারী একগাল হেসে ফেলেন: আরে, বংশী না?

বংশীই তো বটে ! মামার বাড়ী এসেছিল বোধহয় ।

বংশী চেঁচাচ্ছেঃ আমি যাব, আমি যাব। নিজ হাতে বোঠে ধরে অভিনব কায়দায় জলের উপরে মারছে। বলাধিকারীর ফুলহাটা গাঁয়ের মানুষ বংশীধর। অনুগত, এবং প্রতিপাল্যও বটে ! এই গাবতলির নিকটবর্তী সোনাখালিতে পঞ্চানন বর্ধনের বাড়ি। স্বনামধন্য ওস্তাদ পচা বাইটা। এত বড় গুণীমানুষের আপন নাতি বংশী—মেয়ের ছেলে। বাইটার মেয়ে এই একমাত্র ছেলে রেখে অনেক দিন আগে মারা গেছে।

সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে বলাধিকারী আবার সাহেবের দিকে ফিরলেনঃ বোঠের মুখ দিয়ে কথা বলাচ্ছে বংশী। কি বলছে শোন।

সাহেব কান পেতে শোনে। আওয়াজ বিচিত্র বটে। সাধারণ বোঠে বাওয়ার মতো নয়।

কি বলে ?

বোঠের তালে তালে বলাধিকারীই এবার মুখে বলেছেন, সাঙাত-সাঙাত সাঙাত-সাঙাত—তাই না ? নৌকোর গায়ে জলের ছলাৎ-ছলাৎ, আর বোঠের মুখের সাঙাত-সাঙাত। সাঙাত কিনা বন্ধু। এ-ও এক চোরসংজ্ঞা। সেই যে কথা হচ্ছিল—নৌকো মারবে বলে পিছন ধরে এসে পড়েছে, রাতের অন্ধকারে কেউ কাউকে চোখে দেখছে না, তখনকার উপায়টা কি ? জলের উপর বাড়ি মেরে বোঠে দিয়ে কথা বলাবি। কাঠে কথা বলানো গুণীলোক ছাড়া পারে না। সাঙাত বুঝতে পেরে তখন তোবা-তোবা করে নৌকো-মারার দল ফিরে যাবে।

পণ্ডিতমানুষ বলাধিকারী, সেকাল-একালের বিস্তর খবর তাঁর কণ্ঠাগ্রে। প্রাচীন চৌরশাস্ত্রের কথা উঠে পড়ে। সেই সূত্রে চোরসংজ্ঞা—অর্থাৎ, চোরে চোরে চেনা-জানার জন্য নানারকম গুপ্ত-সঙ্কেত। ভ্রম বশে এক চোর অন্য চোরের ক্ষতি করে বসে। কিন্তু বাইরের চতুর লোকে চোরসংজ্ঞা জেনে গিয়ে ঠিক উল্টোটাই ঘটিয়েছে অনেক সময়। রাজপুত্র বরসেনের কথায় পাওয়া যায়—চার চোর দেখতে পেয়ে তিনি চোরসংজ্ঞা করলেন। সম্পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন করে তারপর তিনিই তাদের মূল্যবান চোরাই মালের উপর বাটপাড়ি করলেন। রাজা বিক্রমও ঠিক এমনি করেছিলেন……

জেলেডিঙি ইতিমধ্যে পাশে এসে পড়েছে। হাতের বোঠে ফেলে বংশী বলাধিকারীর নৌকায় উঠল। বলে, খুব পেয়ে গেলাম। হাটবার দেখেই মামার-বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছি, হাটুরে-নৌকো ধরব এখান থেকে। তা হলে হাট ভাঙা অবধি হা-পিত্যেশ বসে থাকতে হত। বাঁক ছাড়িয়ে এসে আপনাকে দেখলাম—এক নজর দেখেই বুঝেছি, বলাধিকারীমশায় ছাড়া কেউ নন। উঃ, কী টান টেনে আসতে হল।

মাল্লাদের দিকে চেয়ে বলে, গোন কিছু নষ্ট হল তোমাদের। আমি তার পূরণ করে দিচ্ছি। দাঁড়ের মুরুব্বি তামাক ধরাও তুমি এবারে। আমি খানিকটা টেনে দিই।

বুড়ো-দাঁড়ি একজন—মানুষটাকে সরিয়ে দিয়ে বংশী দাঁড়ে বসে গেল। লহমার মধ্যে সব কিছু আপন তার। সাহেবের দিকে চেয়ে পলক পড়ে না, হাতের দাঁড় উঁচু

হয়ে থাকে। চোখ টিপে নিম্নকণ্ঠে বলে, কাণ্ডখানা কি, মেয়েছেলে হরণ করে কোথায় নিয়ে যাও তোমরা?

রসিকতাটা ঐ বুড়ো দাঁড়ির সঙ্গে। বলাধিকারী খবরের কাগজ খুলে বসে ছিলেন। সাপ্তাহিক ঢাউশ কাগজ, মেলা থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন। যে রকম আয়তন, এক প্রান্তে উপুড় হয়ে শুয়ে স্বচ্ছন্দে অন্য প্রান্ত পড়া যায়। কথা কানে পড়তে হেসে উঠলেন: শুনলি রে খোকনচন্দোর, তোকে মেয়েছেলে বলছে।

বংশী জোর দিয়ে বলে, যে দেখবে সে-ই একথা বলবে। আজেবাজে পাঁচি-খেঁদি মেয়েছেলে নয়—রাজকন্যে। চুল খাটো করে ছেঁটে চুড়ি ভেঙে হাত নাড়া করে বেটাছেলে সেজেছে। যাত্রার দলে পুরুষমানুষ গোঁফ কামিয়ে মাথায় পরচুলা গায়ে গয়না পরে মেয়েমানুষ হয়, তার উল্টো।

বুড়ো-দাঁড়ি এইবারে জবাব দিল: চাও তো রাজকন্যে তোমার ঘরেই তুলে দেওয়া যায় বংশী।

বলাধিকারী বলেন, ওরে বাবা! রক্ষে রাখবে বংশীর বউ। পতির ধর্মপথে মতি যাবে, সেজন্য কপাল ক্ষয়ে গেল দেবতা-গোঁসাইর কাছে মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে। তার উপরে এই উৎপাত গিয়ে পড়লে ঠাকুর-দেবতাকে না বলে সোজাসুজি সে ঝাঁটা তুলে দাঁড়াবে।

ঘরের পরিবারের কথা, বিশেষ করে নিজের পুরুষকে ভাল করবার চেষ্টা-এই সমস্ত উঠে পড়ায় বংশীর লজ্জার অবধি নেই। সাহেবের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে।

বলাধিকারী হেসে বললেন, অত করে কি দেখছ—লাইনের লোক। মাল কাঁচা এখনো, কিন্তু ভারি সরেস। আপন লোক ছাড়া ডেকে নৌকোয় তুলতে যাব কেন।

একচোট হেসে নিয়ে বললেন, কে নয় লাইনের শুনি? দুনিয়া সুদ্ধ চোর—ভীরুগুলোই বাইরে বাইরে ভড়ং দেখিয়ে বেড়ায়। একটা চোরের কথা কেউ যদি ভাল করে লেখে, সমাজের সকল মানুষের জীবনী লেখা হয়ে যায়। যে লেখক লিখেছে, সে নিজেও কিছু তার বাইরে নয়।

দাঁড়ের মুঠো আবার সেই বুড়োর হাতে দিয়ে বংশী সাহেবের পাশটিতে চলে গেল। বলাধিকারী কাগজ পড়ছেন। পাঠে কোনরকম ব্যাঘাত না ঘটে—মৃদুস্বরে দুজনের আলাপ-পরিচয় চলে। এই যে পাশে চলে এল, কোনদিন বংশী আর আলাদা হয়নি। বুড়ো বয়সে সকলের মতো সাহেব একদিন বলশক্তি হারাল, সেদিনের আশ্রয় বংশীর বাড়িতেই। বংশী মরে গেল তো বংশীর বউ তাকে সমাদরে ঠাঁই দিল। কিন্তু এসব অনেক পরের কথা, আগে বলতে যাই কেন?

কাগজ পড়ছিলেন বলাধিকারী। কাগজখানা ভাঁজ করে রেখে মুখ তুলে বংশীকে বললেন, মরে গেছে বুড়ো?

প্রশ্নটা হঠাৎ পড়ে বংশী হকচকিয়ে যায়: কার কথা বলছেন?

কার আবার! পঞ্চানন বর্ধন—পচা বাইটা। যার মরার দরকার দুনিয়ার মধ্যে

সকলের চেয়ে বেশি। মামার-বাড়ি থেকেই তো ফিরছ ?

হ্যাঁ—বলে বংশী ঘাড় নাড়ে। বেদনার সুরে বলে, নতুন করে কী মরবে! এককালে মুলুক চষে বেড়িয়েছে, সেই মানুষটা আজ বাইরের দোচালা ঘরে দিনরাত পড়ে আছে। বিষ-হারানো ঢোঁড়া। বাড়ি-ভরা মানুষজন—পুতের বউ দুজনা, নাতিপুতি দুগণ্ডা আড়াই গণ্ডা—কিন্তু ভাতের থালাখানা রেখে যাওয়ার মানুষ হয় না বুড়োর ঘরে। কেউ যায় না সেদিকে—বাড়ির লোক নয়, বাইরের লোকও নয়। একটা মানুষ দেখার জন্যে হা-পিত্যেশ করে থাকে। মরেই গেছে বাইটা—ঘরে-বাইরে সকলে সেই রকম ভেবে নিয়েছে।

বলাধিকারী তিক্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, ভাবাভাবির কি! পুরোপুরি গেলেই তো হয়। বুকের নিচের ধুকপুকানি কোন্ লোভে আর ধরে রাখা—আবার কি বয়স ফিরবে? সেই কথা আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম বাইটামশায়কে।

একটু থেমে আবার বলেন, ভাবি অনেক সময় সেকালের অত বড় গুণী-মানুষটার কথা। জিজ্ঞাসা করলাম, কিসের আশা আর এখন? একটা জবাবও দিল। বলে, গুণজ্ঞান যা-কিছু আছে ষোলআনা পুঁটলি বেঁধে সঙ্গে নিলে মুক্তি হবে না। দুনিয়ায় কিছু দিয়ে যাব। সেই নেবার মানুষের আশা করে আছি।

বংশী এবারে আগুন হয়ে ওঠে: মুখের কথা! একবর্ণ বিশ্বাস করবেন না বলাধিকারীমশায়। কতজনা এলো গেল, কাউকে ছিটেফোঁটা দেয়নি! গুরুপদ ঢালি—তাকে দেখেছেন আপনি, গোঁফ ওঠার আগে থেকে সাগরেদি ধরেছে, গোঁফ সাদা হয়ে গেছে এখন। হুকুমের গোলাম—উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে। তবু কণিকাপ্রমাণ বিদ্যেও দিলেন না তাকে। আমি আপন লোক, মরা মেয়ের এক ছেলে—বড্ড ধরাধরিতে দশ-বিশটা পাখপাখালি জন্তু-জানোয়ারের ডাক শেখালেন, আসল বস্তু কিছু নয়। আপনার কথার জবাব তো চাই—ধানাই-পানাই বলে মুখ রাখেন। আসলে মহাকঞ্জুষ। হচ্ছেও তেমনি। আজামশায়ের (দাদামশায় বলে না এ তল্লাটের মানুষ—আজামশায়) কষ্ট দেখে শিয়ালটা কুকুরটা অবধি কেঁদে যায়।

বলাধিকারী বলেন, বাহাদুরি করে বেঁচে এসেছে, কিন্তু মরার বাহাদুরি দেখাতে পারল না। কষ্ট সেই দোষে।

সাহেব এর মধ্যে কথা বলে ওঠে: দোষ হল বয়সের। বয়স হলে কার না এমন হয়!

বলাধিকারী উত্তেজিত হয়ে বলেন, সেইটে হবার আগে মরে যাবে। বাঁচার জন্যে যেমন বিবেচনা আছে, মরার জন্যেও তাই। পচা বাইটা অর্ধেকটা জিতে আছে—বড় জাঁকজমকের জিত। বাকি অর্ধেকে বেদম হার তেমনি। একই মানুষের এমনিধারা দু-চেহারা কেমন করে হয়, কেন হতে দেয়, তাই ভাবি।

বংশী অবাক হয়ে বলে, মরা তো নিজের হাতে নয়। যমরাজ যেদিন নিয়ে নেবেন—

হুঙ্কার দিয়ে বলাধিকারী মুখের কথা থামিয়ে দিলেন: হাতে নয়—কি বলছ তুমি! মানুষ মারতে পারে নিজের হাতে, মরতেও পারে নিজের হাতে। জীবন-

মরণ মুঠোর মধ্যে রয়েছে। সেইজন্যে তো বাঁচোয়া। সেই হল মানুষের বড় শক্তি, মস্তবড় বলভরসা।

না বুঝে বংশী হাঁ করে থাকে। সাহেবেরও চমক লাগে—চমকে তাকায় বলাধিকারীর দিকে। নফরকেষ্টর কোনরকম হাঙ্গামা নেই—খাসা অভ্যাস। কাজের সময় কাজ, বাকি সময় ঘুমানো। দাঁড়ানো-বসা-শোওয়া ইত্যাদি অবস্থা এবং সকাল-বিকাল-সন্ধ্যা ইত্যাদি সময় নিয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই তার। বসে বসেই আপাতত ঘুমিয়ে নিচ্ছে। মউজ করে ঘুমুচ্ছে, ক্ষণে ক্ষণে নাসাধ্বনিতে পরিচয়।

হাতের খবরের-কাগজটা তুলে ধরে বলাধিকারী বললেন, খবর বেরিয়েছে, অসমসাহসী এক ছেলে দিন দুপুরে কলকাতার চৌরঙ্গির উপর সাহেবকে গুলি করেছে। হাজার মানুষ সেখানে, তাড়া করে ময়দানের মধ্যে ধরেও ফেলল। ধরেছে কিন্তু ছেলেটিকে নয়—একটা মড়া। পকেটে বিষ ছিল, ছেলেটি মৃত্যুর ঘুলঘুলি দিয়ে সরে পড়েছে পুলিসকে কলা দেখিয়ে। এই মরার ছিদ্রটুকু আছে বলেই তো নিশ্বাস নিয়ে বাঁচা যায়—অসহ্য হলে ছিদ্রপথে টুক করে বেরিয়ে পড়ব।

দম নিয়ে আবার বলেন, শুধু এই একটি ছেলেরই ব্যাপার নয়। মরামরা খেলা চলছে যেন বাংলাদেশ জুড়ে। ভূপি-দার সঙ্গে ছোটবেলা এক ইস্কুলে পড়েছি। পড়া পারত না বলে পণ্ডিতমশায় মেরে ভূত ভাগাতেন। হঠাৎ দেখি ভূপি-দা দেবতা—সেই পণ্ডিত গদগদ হয়ে ভূপি-দার কথা আমায় বললেন। মরার খেলায় নামজাদা খেলোয়াড় হয়েছে বলে। আজ এমনি ব্যাপার—হাতে রিভলবার বোমা একটা কিছু থাকলেই সে মানুষ দেবতা হয়ে যায়। রিভলবার মানেই সাক্ষাৎ মৃত্যু—মৃত্যু দিতে পারে সে-মানুষ, মৃত্যু নিতেও পারে নিজের উপর। ভূপি-দার এক বুড়ি-ঝি ছিল। আপন কেউ নয়, অনেক কাল ধরে আছে এই পর্যন্ত। শিক্ষাদীক্ষাহীন পঁচাত্তর বছুরে বুড়ির কাছেও ভূপি-দা দেবতা। সেই বুড়ি-ঝির একটা গল্প বলি শোন।

বলছেন, ভূপি-দা বাড়ি নেই, বোমা আছে বাড়িতে। পুলিসে বাড়ি ঘিরে ফেলেছে, ভোর হলেই সার্চ হবে গ্রামের মানুষ সাক্ষি ডেকে এনে। বুড়ির মনে এলো, ঐ ক্যাম্বিসের ব্যাগের মধ্যে নিশ্চয় গোলমেলে বস্তু। কী করা যায়। জিনিস পুলিসের হাতে পড়লে বাবুর তো রক্ষে রাখবে না। মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল বুড়ির—দরদ থাকলে আসে মাথায় বুদ্ধি। বুড়ি করল কি—ভাত রান্নার যে উনুন, তার তলায় গর্ত খুঁড়ল খন্তা দিয়ে। বস্তুটা গর্তের ভিতর দিয়ে মাটি চাপা দিল উপরে। তার উপরে ছাই। রান্নাবান্না হয়ে গিয়ে উনুনে যেন ছাই জমে আছে। একবার ভেবেছিল, ছাইয়ের উপর গনগনে আগুন কিছু থাকলে কেমন হয়! বিচার করে দেখে, রান্না তো সেই সন্ধ্যারাত্রে হয়ে গেছে, সকাল অবধি আগুন থাকে কি করে? ভাগ্যিস দেয়নি আগুন—বোমা ফেটে তাহলে কী কাণ্ড হয়ে যেত! ভূপি-দা হাসতে হাসতে একদিন এই গল্প করেছিল। কলেজে পড়ি তখনও আমি।

এবার বলাধিকারী বংশীর দিকে চেয়ে বললেন, তোমার মাতামহ চতুর মানুষ বটে কিন্তু স্বল্পদৃষ্টি। বয়সকালে বুদ্ধির খেলা খেলে বেড়িয়েছে, কিন্তু বয়স কাটিয়ে এসে উপর দিককার মুক্তির ঘুলঘুলিটা দেখতে পায় না। তাহলে এত হেনস্তা সইত

না, কবে এদ্দিন পালিয়ে বেরুত। মরা জিনিসটাই বোঝে না বাইটামশায়। ভারি ভারি কাজ হাসিল করেছে—মরা দুরস্থান, একটা আঁচড় পর্যন্ত কারো গায়ে লাগে নি। না নিজের, না কোন মক্কেলের। সে বটে কাপ্তেন কেনারাম মল্লিক। বড়ভাইটা যেমন ছিল, ছোটভাইও প্রায় তাই। বেচা মল্লিক, শুনতে পাই, ফাঁসির দড়ি নিজের হাতে গলায় পরেছিল।

বংশী চুপচাপ এতক্ষণ। বলাধিকারীর কথাবার্তা কানে ঢুকেছে ঠিকই—অন্য কানের ছিদ্রপথে বেরিয়ে গেছে। নিজের ভাবনায় মগ্ন ছিল। বলল, আজামশায় সাগরেদ চায়। আপনাকে বলেছে, আপনিই তবে আমার নামটা উত্থাপন করে দিন। আপনার খাতিরে যদি নরম হয়। নয়তো যা গতিক—সকল গুণজ্ঞান বুড়োর সঙ্গে এক চিতেয় পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

কাতর হয়ে বলে, দুই মামা আমার দুই পথের পথিক—কেউ কিছু নিতে গেল না। একমাত্র নাতি আমিই তাহলে লোকত ধর্মত ষোলআনা হকদার। বলুন তাই কিনা? এদ্দিন ধরে আঁকুপাঁকু করে বেড়াচ্ছি—এবারও মামার-বাড়ি সেই মতলব নিয়ে যাওয়া। তা সে-কথার আঁচ দিতে গেলে বুড়ো তেড়ে মারতে আসে। বলে, শিয়াল-কুকুরের ডাক শিখিয়েছি—সেই তো ঢের।

বলাধিকারী হো-হো করে হেসে উঠেন: যা বলেছি, বাইটা মশায়ের নজরটা খাটো কিন্তু বুদ্ধি ঝকঝকে পরিষ্কার। গুণ-জ্ঞান তোমায় দিতে যাবে কেন? ময়লা ঘটিতে ভাল দুধ রাখলেও কেটে যায়। তুমি পেলে সে জিনিস কাজে আসবে না, পচে গিয়ে দুর্গন্ধ বেরুবে। নাতিকে ভালরকম জানে কিনা—কুকুর-শিয়ালের ডাক-গুলো দিয়েছে, জন্তুটন্তু ভাবে হয়তো।

বংশীর অপ্রতিভ মুখ দেখে বলাধিকারী কথা অন্যভাবে ঘুরিয়ে নেন: গুণজ্ঞান নিয়ে কী-ই বা করবে তুমি? ছিটেফোঁটা যা আছে তা নিয়েই তো বউয়ের সঙ্গে সর্বক্ষণ কোন্দল।

বংশী বলে, বউ কিছু টের পাবে না। মেয়েমানুষ জাত, ঠকাতে কি! আবার তা-ও বলি—এখন স্যাকরার সামান্য ঠুকঠাক, টাকাটা সিকেটার ব্যাপার জাতই যায়, পেট ভরে না। জাত-কামারের মত ভারী ভারী ঘা মারতে পারি যদি কখনো এক এক ঘায়ে এক-শ দু-শ ছিটকে এসে পড়ে—সেদিন ঐ বউই দেখতে পাবেন সোহাগে গলে গলে পড়ছে।

আকাশ-ছোঁয়া ঝাউয়ের সারি নজরে আসে। ফুলহাটা এসে গেল। বড়গাঙ ছেড়ে খালে ঢুকবে, মোহানার উপর নীলকুঠি। নীলকর সাহেবরা সারি সারি ঝাউগাছ পুঁতে কুঠির বাহার বাড়িয়েছিল—কত কালের সাক্ষি সুদীর্ঘ বিশাল গাছগুলো।

কুঠির কাছাকাছি এসে বলাধিকারীর মুখে আবার মৃত্যুর কথা। ঐ ভাবনায় আজ পেয়ে বসেছে। হাত তুলে সাহেবকে দেখান: ছাতের কার্নিশের সেই জায়গাটা রাত্রিবেলা দেখা যাচ্ছে না। একদিন জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে দোতালার উপর তুলে ভাল করে দেখিয়ে আনব। মৃত্যুর সঙ্গে ওখানটা মুখোমুখি আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। চোখ-মুখ বাঁধা, পা বাঁধা—বিশ্ব-সংসার কিছুই আমার কাছে নেই। দু-খানা হাতের

জোরে কার্নিশ ধরে ঝুলছি, দশটা আঙুলে আঁকড়ে ধরে আছি জীবনটা। বন্ধ চোখ বলেই মৃত্যুর চেহারাটা সামনের উপর পরিষ্কার হয়ে দেখা দিল। তার পরে এক সময় হাত ছেড়ে দিয়েছি। সবাই ভাবে, বাধ্য হয়ে ছেড়েছি, শক্তিতে আর কুলোয় নি বলেই। কিন্তু ধারণা ভুল। ঠিক সেই ক্ষণের অনুভূতিটা এখনো আমি স্পষ্ট ভাবতে পারি। মৃত্যুর সঙ্গে চেনা হয়ে গিয়ে ব্যাকুল আনন্দে হাত ছেড়েছিলাম—মৃত্যু কোল পেতে ধরবে বলে। পরিচয় করে না বলেই তো মৃত্যু নিয়ে লোকের অকারণ ভয়।

সাত

ঘাটে নেমে বংশী নিজের বাড়ি চলল। নৌকায় এই পথটুকুর মধ্যেই ভাব জমে গেছে সাহেবের সঙ্গে। খানিক দূরে গিয়ে ফিরে আসে আবার, সাহেবের কানে কানে উপদেশ দেয়। ঠিক এই কথাগুলোই ইতিমধ্যে আরও অনেকবার হয়ে গেছে ঃ মানুষ ভাল বলাধিকারীমশায়। মস্তবড় মহাজন। পাকসাট মেরো না, ঠাণ্ডা হয়ে থেকো। যা বলবেন, হেঁ-হেঁ করে যাবে। কাজ করতে বললে মুখের কথা মুখে থাকতে সেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

শ্বশুরবাড়ি মেয়ে পাঠানোর সময় মা-খুড়ি-পিসি যেমন বলে দেন। বলে, সব জায়গায় বলাধিকারীর খাতির। ঐ মানুষের নজর ধরেছে, কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে যাবে দেখতে দেখতে। আমিও রইলাম—এই গাঁয়ের মানুষ, শতেক বার দেখা হবে। সকালবেলাই যাব। সকালে না পেরে উঠি তো বিকালে।

খুলনার নৌকাঘাটা থেকেই বলাধিকারীর খাতির দেখতে দেখতে আসছে। কিন্তু বাড়ীর উঠানে এসে সাহেবের ভক্তি চটে যায়। পেট-মোটা প্রকাণ্ড আয়তনের গোলা, পিছন দিকটায় খান তিন-চার মেটে-দেয়ালের ঘর। এই মাত্র। ওর মধ্যে একটি বৈঠকখানা। তক্তাপোশ জুড়ে ফরাস—ফরাসের উপরে চাদর জোটেনি, শুধুই মাদুর। নিয়মমাফিক হাতবাক্স ফরাসের প্রান্তে—বাক্সের উপরে কাগজপত্র রেখে হিসাব লেখা হয়, ভিতরে টাকাপয়সা। পেরেক ঠুকে ঠুকে হাতবাক্সের সর্বঅঙ্গে যেন কুষ্ঠব্যাধি।

কী কাজে এসেছে একটা লোক, তক্তাপোশের প্রান্তে পা ঝুলিয়ে বসেছে। এবং রোগা লম্বাটে একজন কান-ফোঁড়া খাতায় হিসাব টুকছে। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য—জগবন্ধু বলাধিকারী নাম বলে দিলেন। ক্ষুদিরাম হাতবাক্স থেকে টাকা-রেজকি বের করে থাক দিয়ে লোকটার সামনে রাখে, গণে নিয়ে থলিতে ভরে লোকটা চলে যায়। অতএব গোমস্তা ও ক্যাশিয়ার হল ক্ষুদিরাম। চেতলার পুরুষোত্তম সা'র গদিতে এমনি ছিল। পাখনার কলম নিয়ে হাতবাক্সের উপর ঝুঁকে পড়ে সমস্ত দিন বসে বসে লিখত।

কুষ্টগ্রস্ত হাতবাক্সের মহিমা সাহেব পরে একদিন শুনেছিল ক্ষুদিরামের কাছে। মন্দ

লোকের রিপোর্ট পেয়ে সদর থেকে খোদপুলিসসাহেবের হঠাৎ জুতার ধুলো পড়ল এই ঘরে। খাতাপত্তর দেখে বাক্স উলটেপালটে টাকাপয়সা গুণেগেঁথে দেখে—আনায়-গণ্ডায় মিল। আরে বাপু থাকেই যদি কিছু, তুই ধরবি সাহেবের পো! পুলিশের কর্তা যতই চতুর হোক, জগবন্ধু বলাধিকারীর চেয়ে বেশি নয় কখনো। হাতবাক্সটা বড় পয়মন্ত—কাঠ বদলে কবজা-পতর পালটে তালি দিতে দিতে আদি জিনিসের প্রায় কিছুই বজায় নেই। তবু ফেলা যাবে না।

জগবন্ধু বললেন, পাকশাকের ব্যবস্থা করে ফেলুন ভটচাজমশায়। ও-বেলা ভাত পেটে পড়েনি। এই দু-জনের চাল বেশি করে নেবেন আজ থেকে। থাকবে এখানে। কাজকর্মে লাগিয়ে দেব বলে টেনে নিয়ে এলাম। কাজলীবালাকে দেখছিনে, শুয়ে পড়ল নাকি?

সাহেব ও নফরকেষ্টর আপাদমস্তক ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য বারম্বার নিরীক্ষণ করে। আগন্তুক দুটির প্রতি অঙ্গ বুঝি মুখস্থ করে নিচ্ছে। গোমস্তা ও ক্যাসিয়ার ছাড়া ভট্টাচার্যের অতএব আর কি পরিচয়—পাচক। দু-পাঁচ দিনেই অবশ্য জানা গেল, এ সমস্ত বাইরের চেহারা, ভূয়ো পরিচয়। মানুষ যা-কিছু কামনা করে সমস্ত আছে এই ক্ষুদিরামের। অশীতিপর বাপ-মা এখনো বর্তমান। ভাইরা সকলেই কৃতী। স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়েও বুঝি গোটা দুই। নিজেও ক্ষুদিরাম মূর্খ নয়—এককালে বাড়িতে টোল ছিল, সেই রেওয়াজে বাপ এই কনিষ্ঠ ছেলেকে সংস্কৃত পড়তে দিয়েছিলেন। সকলকে নিয়ে জমজমাট একান্নবর্তী সংসার, ক্ষুদিরামই কেবল ভাঁটি অঞ্চলে নোনা জল খেয়ে এইভাবে পড়ে থাকে। সর্বস্ব ছেড়ে এসেও বংশ-গরিমা ছাড়তে পারেনি, যার তার হাতের রান্না চলে না। রান্নাঘরে সেই গরজে ঢুকে পড়তে হয়।

দেখাদেখি বলাধিকারীও যান কখনো কখনো। কিন্তু ক্ষুদিরাম থাকতে হবে না, হাতা-খুন্তি কেড়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করে দেয়। কী আর করবেন, মনোদুঃখে নিজ ঘরে ঢুকে পড়ে তখন। সে ঘর বইয়ে ঠাসা। স্ত্রী নেই, দুই মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে মহানন্দে সংসারধর্ম করছে—ত্রিসংসারের মধ্যে বলতে গেলে আছে কেবল বই। অবসর পেলেই জগবন্ধু বইয়ের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। স্ত্রী থাকতে ঠাকুরদেবতারা এবং প্রচুর জপতপ ছিল। সমস্ত গিয়ে এখন তেত্রিশ কোটির মধ্যে শুধুমাত্র মা-কালীতে এসে ঠেকেছে। তা-ও যে কতখানি ভক্তির বশে আর কতটা কাজকর্মের গরজে, ঠিক করে বলা যায় না।

না, ভুল বলা হল। মেয়ে যে আরও একটি—কাজলীবালা। শুয়ে পড়ল নাকি কাজলীবালা—ক্ষুদিরামকে বলাধিকারী জিজ্ঞাসা করলেন। বলতে বলতে কাজলীবালা এসে পড়ল।

বলাধিকারী বললেন, তাড়াতাড়ি যোগাড়যন্তর করে দাও কাজলী। ভটচাজমশায় রান্না চাপাবেন।

সাহেবের দিকে চেয়ে বলেন, জানিস রে খোকনচন্দোর, এই হল কাজলীবালা। আমার মেয়ে।

কটকটে কালো রং, উদ্দাম দাঁতের ছড়া ঠোঁটের ফাঁকে বেরিয়ে পড়েছে, কুৎসিত কুদর্শন। কোমল-মধুর স্বরে তার পরিচয় দিচ্ছেন। এই কণ্ঠ যেন বলাধিকারীর নয়, বুকের ভিতরে থেকে অন্য কেউ বলছে। বললেন, ছোট মেয়েটাও বিয়ে হয়ে চলে গেল, এই মেয়ে তখন ফাঁকা ঘরে এসে উঠল। ঘর আমার ভরে রেখেছে। বড্ড সৎ—

হেসে উঠলেন ঃ বোকা কিম্বা ভীরু—তারাই সৎ হয়। কাজলী আমার ভীরু একটুও নয়, বোকা। জীবনে এত পোড় খেয়েও বুদ্ধি কিছুতে জন্মাল না—সৎ রয়ে গেল।

কাজলী কলকল করে বলে, সামনের উপর সদাসর্বদা আপনাকে দেখি, অসৎ হই কী করে? ইচ্ছে হলেও তো পেরে উঠিনে।

রান্নার যোগাড়ে দ্রুত সে রান্নাঘরে ছুটল। হাসিমুখে ক্ষুদিরাম খুব উপভোগ করছে। বলে, হল তো? মুখের উপর কেমন জবাবটা দিয়ে গেল? অসৎ বলে দেমাক করতে যান, এমন যে কাজলীবালা সে পর্যন্ত মানে না।

নিশ্বাস ফেলে বলাধিকারী বলেন, কি জানি! সৎই ছিলাম বটে একদিন। ফুল শুকিয়ে গিয়ে এখন কটুফল। ফলের চুড়োয় আধশুকনো ফুল একটু যদি থাকে, দায়ী তার জন্যে ঐ কাজলীবালা। শুকিয়ে একেবারে নিঃশেষ হতে দেয় না।

সাহেবকে এনে যখন ফেলেছেন, কাজকর্মে ঠিক লাগিয়ে দেবেন। সঙ্গী নফরকেষ্টও বঞ্চিত হবে না। দেবেন বলাধিকারী ঠিকই—দুটো দিন আগে আর পরে। সে-কাজ ধান-কাটা কিম্বা ডাক্তারি অথবা গুরুগিরি নয়, তা-ও বুঝতে বাকি থাকে না। মাঝে মাঝে সাহেবকে একান্তে ডেকে নিয়ে স্ফূর্তি দেন ঃ শহরে দেখে এসেছিস বাঁধা নিয়মের কাজকর্ম—পাঁচটা সাতটা দশটা রাস্তার মধ্যে। এখানে এলাহি কাণ্ডকারখানা—অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো কপালে জয়পত্র এঁটে ডাঙা-ডহর ভেঙে ছুটোছুটি। তোরও একদিন জয়জয়াকার পড়ে যাবে। দিব্যচক্ষে আমি দেখছি। রোজগারের কথা ধরিনে—দোকানদার-অফিসার ফড়ে-চাষা রোজগার সবাই করে থাকে। নামযশ পাবি অঢেল—সেকালে যেমন ছিল পচা বাইটা, একালের যেমন কেনা মল্লিক। চাই কি ছাড়িয়েও যেতে পারিস ওদের। কার ভিতরে কতখানি বস্তু, কাজে না পড়লে সঠিক নিরিখ হয় না।

কাজ হবে-হবে করছেন, এমনিভাবে মাসখানেক কেটে গেল। শুয়ে বসে সাহেবের দিন কাটে না, ছোঁক ছোঁক বেড়ায়, অধীর হয়ে এক এক সময় বলাধিকারীর কাছে গিয়ে পড়ে। নফরকেষ্টর মহৎ গুণ, ঘুম জাগরণ একেবারে তার হাত-ধরা। কাজ পড়ে গেল তো পাঁচ-দশটা অহোরাত্রি না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়; কাজ নেই তো সারাদিন ও সমস্ত রাত অবিরাম ঘুমোয়। ফুলহাটায় এসে মনের সাধে সে ঘুমোচ্ছে। দুপুরের আহার শেষ হতে না হতে ঘুমে ঢলে পড়ে, মাঝে একবার রাত্রিবেলা ভাতের থালাটা সামনে এনে ঠেলেঠুলে তুলে দিতে হয়—একটু ক্ষণের ঐ

বিরতি। নফরকেষ্টর সময় কাটানোর অসুবিধা নেই।

বলাধিকারী বলেন, ছটফট করিস কেন, জলে পড়ে যাসনি তো! দেখে-শুনে হাসিস্ফূর্তি করে বেড়া। ছুটকো-ছাটকা যদি কিছু মেলে সেই সন্ধানে আছি। তার বেশি এবারে হয়ে উঠবে না। সামনের মরশুমটা আসতে দে না—লুফে নেবে তোর মতন ছেলে।

চুকচুক আওয়াজ তুলে বলেন, দুটো মাসও আগে যদি পেতাম! কেনা মল্লিককে বললে সোনা হেন মুখ করে কোন একটা নলের সঙ্গে রওনা করে দিত। নতুন বলে হাতে কাজ করতে দিত না, তাহলেও ধারাটা দেখে বুঝে আসতিস। এ মরশুমে কিছু হবে না, কারিগরলোক সব বেরিয়ে পড়েছে। পাড়ায়পাড়ায় ঘুরে দেখ—বুড়ো বাচ্চা আর মেয়েলোক। সমর্থ জোয়ানপুরুষ কদাচিৎ এক-আধটা।

ঘুরে ফিরে একটা নাম কেবলই আসে—কেনা মল্লিক। কাপ্তেন কেনারাম মল্লিক। কেনার নামে সকলে তটস্থ। ভরা মরশুমে মল্লিকের দলবল চতুর্দিকে এখন রে-রে করে বেড়াচ্ছে। কাপ্তেন নিজেও ঘরে বসে থাকে না, আলাদা পানসি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে বিজয়া দশমীর ঠিক পরের দিন। শরৎকাল দিগ্বিজয়ে বেরুনোর সময়। রাজ-রাজড়াদের সেই পুরোনো রীতি কেনা মল্লিক এবং তার আগে বেচারাম মল্লিক ভাঁটি-অঞ্চলে বজায় রেখে আসছে।

একদিন সন্ধ্যার পর বংশী এসে ডাকেঃ চল সাহেব, একটা জায়গায় ঘুরে আসিগে।

সাহেব অর্থভরা হাসি হাসেঃ সত্যি রে?

বংশী কিন্তু গম্ভীর। বলে, রাতে বেরুনোর কথা আমাদের মুখে শুনলেই লোকে ভিন্ন রকম ভেবে নেয়। তুমি পর্যন্ত। বিয়ে করতে যাব, সেইদিন সকালেও এক সাঙাত বলছে, সত্যি কথাটা ভাঙ দিকি ভাই—কোথায়? যেন দুনিয়ায় আমাদের অন্য কিছু থাকতে নেই—সুখসর্বস্ব যা কিছু ঐ। কাজ অষ্টরম্ভা, নামটা আছে কিন্তু আমার। পচা বাইটার নাতি, সেই সুবাদে। এ নাম একবার রটলে সাগরের জল ঢেলেও ধুয়ে ফেলা যায় না।

সাহেব বলে, কী এমন বললাম যে একগাল কথা শোনাচ্ছ! কোন তীর্থ্যধর্মে যাওয়া হবে, তাই জানতে চেয়েছি শুধু।

বংশী বলে, ইস্কুলবাড়িতে—ছোটমামা যেখানটা আস্তানা নিয়েছে। ধর্মের জায়গা বানিয়ে তুলেছে, ফেরার সময় পুণ্যি অনেকটা জড়িয়ে আসবে দেখো।

ছোটমামা মুকুন্দ। মুকুন্দ বর্ধন—সোনাখালির পচা বাইটার কথা হয়ে থাকে, তার ছোটছেলে। মুকুন্দকে নিয়ে বংশী যখন তখন গালিগালাজ করে। বলে, পাকা মানুষ হয়েও আজামশাই ভুল করে বসলেন—পণ্ডিত বানাতে গেলেন ছেলেকে ইস্কুলে দিয়ে। উচিত প্রতিফল তার। জন্মদাতা পিতার নামে নাক সিঁটকায়। সোনাখালির এমন ঘরবাড়ি ছেড়ে ইস্কুলে পড়ে থাকে। বর্ধনকুলের মুশল।

সাহেব বলে হিরণ্যকশিপুর বেটা প্রহ্লাদ। হিরণ্যকশিপু পাপী দৈত্য, প্রহ্লাদ মহাভক্ত। বাপ-বেটায় ধুন্দুমার—

বংশী লুফে নিয়ে বলে, ঠিক তাই। ছোটমামার ঐ মতিগতি, তার উপর জুটল এসে ছোটমামীটা। সে এক পোঁটাচুন্নির বোঁট পদ্মবিলাসী। গায়ে একটু চিকন ছটা, সেই দেমাকে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পথ হাঁটে। পাপের ছোঁয়া লেগে না যায়। ঘরের বউ পুরুষকে কোথায় বুঝিয়েসুঝিয়ে ঠাণ্ডা করবে—সে-ই আরো বেশি করে বিগড়ে দিল ছোটমামাকে।

একলা মুকুন্দকে নয়, ঐ সঙ্গে তার বউকে জুড়ে বংশী নিন্দেমন্দ করে। পচা বাইটার নামে সাহেবের আগ্রহ, তার সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনতে চায়। বাইটার ঘরসংসারের যাবতীয় কথা। গুণী মানুষটা বয়স হয়ে গিয়ে এত কষ্ট পাচ্ছে। যার জন্য বলাধিকারী বুড়োকে মরতে বলেন। মরেছে কি বেঁচে আছে, উঁকি দিয়ে দেখে না বাড়ির লোক। তেষ্টায় চিঁ চিঁ করছে, জলটুকু এগিয়ে দেবার পিত্যেশ নেই। বড়ছেলে মুরারি জমিদারি সেরেস্তার নায়েব। জমিদারের কাজ এবং নিজেদের যে সম্পত্তি আছে তাই নিয়ে হিমসিম খেয়ে যায়। বড়বউয়ের এক গাদা ছেলেপুলে, কাঁধের উপর সংসারের যাবতীয় দায়ঝক্কি। কিন্তু বাঁজা-মানুষ ছোট ঠাকরুনের ঝক্কি-ঝামেলা নেই, ফুলেল তেল মেখে গতর দুলিয়ে বাহার করে বেড়াবে—

একফোঁটা মেয়ে সুভদ্রা বউ হয়ে এল, পচা বাইটা তখনও শক্তসমর্থ। মুকুন্দ একটা পাশ দিল সেবার। বাইটার ছেলে হয়ে হেন কাণ্ড করে বসল, লোকে তাজ্জব বনে গেছে। পাশ-করা বরের বউ হয়ে সুভদ্রারও মাটিতে পা পড়ে না। আর কিছুকাল পরে বউ খানিকটা সোমত্ত হয়ে বরের কানে বিষমন্তোর দেয়ঃ তুমি বিদ্বান হলে, কিন্তু বাড়ির নিন্দে গেল না। চোরের বাড়ি বলে মানুষ আঙুল দেখায়। সকালবেলা চক্ষু মুছে উঠে চোর-শ্বশুরের মুখ দেখতে হয়। বাইরের কোথাও কাজ-কর্ম দেখ। দু-জনে বাসা করে ধর্মভাবে থাকা যাবে।

সত্যি সত্যি এই বলেছিল কিনা, ধর্ম জানেন। কিন্তু লোকে বলে। সুভদ্রার নাক-সিঁটকানো দেখে বিশ্বাসও হয় তাই। গোড়ার দিকে ফিসফিসানি। বয়সের সঙ্গে গলা চড়তে চড়তে ক্রমশ রুদ্রমূর্তি। দিশা না পেয়ে মুকুন্দ ফুলহাটায় ভাগনে বংশীর বাড়ি এসে উঠল। বাইটার নাতি, এবং সেই পথের পথিক বলে বংশীরও অল্পসল্প নাম হতে শুরু হয়েছে। লোকে বলে, বাইটার বেটা লেখাপড়া শিখে নতুন কায়দায় কাজ ধরবে। পীঠস্থানে এসে পড়েছে—মাথার উপরে বলাধিকারী, পেছনে বংশীধর। অতএব তাড়াতাড়ি সে মাইনর ইস্কুলের এই মাষ্টারি কাজ জুটিয়ে নিয়ে বংশীর বাড়ি ছাড়ল। কলঙ্ক মোচন করল। সেই থেকে আছে। স্বামী-স্ত্রী ধর্মবাসা বানিয়ে একত্রে থাকবে, আজও সেটা ঘটে ওঠেনি। গোড়ায় পনের টাকায় ঢুকেছিল, এখন শোনা যায় পঁচিশ। ইস্কুলের মাইনের কথা ঠিকঠাক বলবার জো নেই—খাতায় লেখে হয়তো পঞ্চাশ। যত বড় সাধু মাস্টার হও, এটুকু করতে হবে। সবাই করে সকলে জানে। যে ইন্সপেক্টরকে দেখাবার জন্য করতে হয়, সে ভদ্রলোকও জানে নিশ্চয়। এই মাইনেয় ধর্মবাসা হয় না। ছোটবউ অগত্যা

চোর-শ্বশুর এবং নায়েব-ভাসুরের ভাতেই পড়ে আছে। মরমে মরে থেকে দু-বেলা দুই থালা অন্ন কোন গতিকে গলাধঃকরণ করে যাচ্ছে।

সন্ধ্যারাত্রে বংশী এসে বলল, বড় সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে, এখানে দু-জনে বসে ভুটুরভুটুর করে কি হবে? সে তো রোজই আছে। ইস্কুল-বাড়ি যাচ্ছি, তুমি চল।

সাহেব বলে, মতলব কি, বউয়ের তাড়ায় আবার ক-খ-ঠ শুরু করবে নাকি? সুবিধেও রয়েছে, তোমার ছোটমামা নিজে মাষ্টার—

সে কি আর এই বয়সে! সময় থাকতে তুমি যা-হোক খানিকটা করে নিয়েছ।

একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, কিন্তু বউ বলছে লেখাপড়া না হোক, ভাল হওয়া নাকি সব বয়সেই চলে। বলি, এমনি তবু দু-চার পয়সা আসে, ভাল হয়ে গেলে খাব কি শুনি? মেয়েমানুষ জাত, হিসেবজ্ঞান নেই—আদাজল খেয়ে ঘাড়ে লেগেছে। তা ভাবলাম একটা দিনেই কিছু আর ভাল হয়ে যাচ্ছিনে, দেখেই আসি না কেমন। খানিক পথ গিয়ে মনে হল, একলা না গিয়ে দোসর নেওয়া ভাল—একা না বোকা। তোমার কাছে চলে এসেছি।

বংশীর ভাব দেখে না হেসে পারা যায় না। হেসে উঠে সাহেব বলে, কী ব্যাপার ইস্কুলবাড়িতে?

একলা পড়ে থাকে ছোটমামা—দিনমানে ইস্কুল, সন্ধ্যার পর কি করে? কিছু-দিন থেকে তাই পাঠ ধরেছে। গীতা-পাঠ হত গোড়ায়, সে কটোমটো জিনিষ শোনার মানুষ হয় না। গীতা ছেড়ে আজ ক'দিন ধরে রামায়ণ ধরেছে। খুব জমেছে নাকি, নিত্যিদিন বউ সেখানে যায়। আমায় যেতে বলে। আজকে বড্ড শাসিয়ে গেছে।

বিরস মুখে বলে, সীতা বনে গেলেন রামের পেছন ধরে। কলির সীতার উল্টো ফরমাস, তার পিছন ধরে আমায় গিয়ে রামায়ণে বসতে হবে। আসরে না দেখতে পেলে বাড়ি ফিরে আজ মুণ্ডু থেঁতো করবে, সতীলক্ষ্মী বলে গেছে।

অগত্যা সাহেবকে উঠে পড়তে হয়। বলে রামায়ণ গান দিয়ে গৃহস্থ ভূত তাড়ায় শুনেছি। আমার মতন জ্যান্ত ভূত সেইখানে নিয়ে চললে বংশী—

বংশী বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল, এই কথায় হেসে ফেলেঃ সে বটে এক সময় ছিল ক্ষুদিরাম ভটচাজের গান। ইঁদুরে খাওয়া হারমোনিয়াম আছে একটা, তার বাজনা। বাজনা বলে আমায় দেখ, গান বলে আমায়। ইদানীং আর শুনিনে। রামায়ণ তো রামায়ণ—ওঝার মন্তোরও তার কাছে লাগে না, ভূতের ঠাকুরদাদা বেহ্মদৈত্য অবধি পৈতে ছিঁড়ে বাপ-বাপ করে পালাবে। ছোটমামার পাঠ তেমন নয়—শুনেছি খুব মিষ্টি। আমার বউ একটা দিন গিয়েই জমে গেল। সন্ধ্যে হলেই ঘরবাড়ি ছেড়ে ছুটে গিয়ে পড়বে।

সাহেব থমকে দাঁড়িয়ে বলে, 'এই দেখ, ভয় ধরিয়ে দিলে। আমিও যদি জমে যাই—শখ করে এক দিন গিয়ে রোজ রোজ যেতে হয় যদি। বলা যায় না

কিছু—শেষটা হয়তো ভস্ম মেখে সোঁদালফলের মত ছড়া ছড়া জটা ঝুলিয়ে সাধু হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সে নাকি বড় কষ্ট—ভক্তদের ঘি-দুধের সেবায় যা-কিছু রক্ত হল, মশা-ছারপোকায় তার ডবল টেনে নেয়। খাস কালীঘাটের আসল সাধুর মুখে শুনেছি।

হেসে ওঠে সাহেব, সে হাসিতে বংশী যোগ দিল না। বলে সাধু হলে একটা দিক বড় বাঁচোয়া। একদিন দেখি, থানার বড়বাবু ঘাড় নিচু করে ছোটমামার গীতা-পাঠ শুনছে। হিংসা হচ্ছিল—মামার কাছে কেঁচো হয়ে বসেছে, আমার কাছে সেই মানুষ বাঘ। কষ্ট ছোটমামার যা-ই হোক, চৌকিদার-দারোগার চোখ-রাঙানি নেই। ঐ লোভে এক এক সময় সাধু হতে ইচ্ছে করে।

আসরের একটা কোণ নিয়ে দুজনে বসে পড়ল। মুকুন্দ মাস্টারের অভিপ্রায় ছিল, সৎপ্রসঙ্গ করে ছাত্রের নৈতিক চরিত্রের বনিয়াদ গড়বে। কিন্তু সন্ধ্যার পর পড়া মুখস্থ না করে কোন ছেলে পাঠ শুনতে আসবে? গার্জেনেরও ঘোরতর আপত্তি ঃ লেখাপড়া করে আখেরের ব্যবস্থা করুক এখন, ধর্মকথা শোনার সময় অনেক পরে —বুড়ো হয়ে পড়লে। আসর তবু দিব্যি জমেছে। ছেলে না পাঠিয়ে ছেলের মা-বাপ মাসি-পিসিরা আসে। যাদের ছেলেপুলে পড়ে না, তারাও সব আসে। মরসুম পড়ে বাড়ির জোয়ানমরদেরা বাইরের কাজে চলে যাবার পর ভিড় অতিরিক্ত রকম বেড়েছে। এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকেও এসে জোটে। জলচৌকির উপরে পাঠের আসন। সামনের পিতলের ফেরোয় সিঁদুর ও আম্রপল্লব দিয়ে ঘটস্থাপনা হয়েছে। পাঠের আগে ও পরে সেই ঘটের সামনে গড় হয়ে বিড়বিড় করে সকলে কামনা জানায় ঃ কাজকর্ম খুব ভাল হয় যেন ঠাকুর, থলি-ভরা টাকা নিয়ে ঘরের মানুষরা সুভালাভালি ঘরে চলে আসে। যত দিন তারা না ফিরছে তল্লাটের মানুষ কোন রকম ধর্মকর্ম বাদ দেবে না। তাদের পাপে এদের পুণ্যে কাটাকাটি। ভক্ত শ্রোতা পেয়ে মুকুন্দও প্রাণ ভরে লেগে যায়।

বংশী ফিসফিসিয়ে বলে, ঐ দেখ আমার বউ। ঘোমটার ফাঁকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। আড়ে লম্বায় চৌকো মাপের ঐ যে বউটা। অবাক হবার কি আছে —আমি সরু বলে বউয়ের বুঝি মোটা হতে নেই। আঃ, আঙুল দিয়ে দেখিও না, রেগে যাবে।

থতমত খেয়ে সাহেব হাত নামিয়ে নেয় ঃ তা বটে! ভূতপেত্নি বাঘ আর স্ত্রীলোককে আঙুল দেখাতে নেই। ভুলে গিয়েছিলাম।

বংশী হেসে ফেলল ঃ কি জানি বাবা, বাঘ ভূতপেত্নি সামনাসামনি দেখিনি। কিন্তু ঐ যে দেখছ গদগদ হয়ে পাঠ শুনছে, বাড়ির উঠোনে পা দিলেই মারমূর্তি। গাছের কুল পাড়ার মতো আমায় যেন আষ্টেপিষ্টে ঝাঁকায়।

হাসির ছলে প্রথম দিন সাহেব যা বলেছিল, সত্যি বুঝি তাই খেটে যায়। খাসা পাঠ মুকুন্দর, প্রাণ কেড়ে নেয়। খানিকটা বুঝি নেশা ধরে গেল, প্রায়ই সে আসে।

বংশীই বরঞ্চ পাকসাট মারতে চায়, ঠেলেঠুলে সে-ই আনে বংশীকে। আসর সুন্ধ লোক ঘন ঘন সাহেবের দিকে তাকায়। তার চেহারার গুণে। গুণ নয়, অভিশাপ—চেহারাটার উপরে যত মানুষের নজরগুলোর অবিরাম খোঁচাখুঁচি। অস্বস্তি লাগে। তবে এখানে এই আসরে বসে একটা নতুন উপলব্ধি—পাঠ আরম্ভ হতেই ভিন্ন লোকে চলে যায় সে যেন। অন্যে কি করছে, খেয়াল থাকে না।

রাম-বনবাসের জায়গাটা হচ্ছে সেদিন। সাহেব তদগত হয়ে শুনছে। রামচন্দ্রের মতন তারও বনবাস। কোন রাজবাড়িতে জন্ম হল তার—সাতমহল অট্টালিকা, অগুণতি দাসদাসী, হীরা-মাণিকের ছড়াছড়ি—সমস্ত কেড়েকুড়ে নিয়ে পুরী থেকে নির্বাসন দিল। বারো বছর কবে পার হয়ে গেছে, দুই বারো হতে যায়—ফেরার দিন কই আসে না। কোন দিনই আসবে না। ঠিকানাই জানে না কোথায় তার অযোধ্যাপুরী। ঝড়বৃষ্টির দুর্যোগের মধ্যে নিশিরাত্রে চুপি চুপি পুঁটলিতে পুরে গঙ্গাজলে ভাসিয়ে দিল। ঘুমে অচেতন পুরবাসী, কেউ কিছু জানলই না—কেমন করে আকুল হয়ে রামের পিছন ধরে ছুটবে? পুত্রশোকে রাজা দশরথ কাঁদতে কাঁদতে মারা গেছেন—অথবা আপদ চুকিয়ে হাসতে হাসতে গাড়ি-ঘোড়া হাঁকাচ্ছেন, তাই বা কে বলতে পারে!

বংশী হঠাৎ গায়ে ঠেলা দেয়ঃ কী হচ্ছে সাহেব? সাহেব নামটা চালু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। বলছে, এই সাহেব, চোখ মুছে ফেল। চল, বাড়ি যাইঃ

সম্বিত ছিল না সাহেবের। জাগ্রত হয়ে বুঝতে পারে, দু-চোখে ধারা বয়ে যাচ্ছে। কেলেঙ্কারি! সকলের দৃষ্টি তার দিকে।

ধড়মড় করে উঠে পালিয়ে যাবে, কিন্তু মুকুন্দ মাস্টারও দেখে ফেলেছে। পাঠের মধ্যেই হাতের ইসারায় তাকে বসতে বলল। নিরুপায় হয়ে বসতে হয়। অধ্যায়টা শেষ করে মুকুন্দ বই বন্ধ করল। বলে, আজকে এই পর্যন্ত।

হরিধ্বনি দিয়ে শ্রোতারা উঠে পড়ে। সাহেবও উঠছিল সকলের সঙ্গে, মুকুন্দ মানা করেঃ আমার ঘরে চল একটুখানি। নিয়ে এস বংশী, আলাপ করি। বলাধিকারী-মশায়ের ওখানে আছ, সেটা শুনেছি। ক-দিন থাকবে এখানে ভাই?

'ভাই' বলে ডাকলেন অমন মান্যগণ্য মানুষটি। কম্পাউন্ডের একদিকে খোড়োঘরে মুকুন্দ মাস্টারের বাসা। অদূরে ঐ রকম আরও খান দুই ঘরে পুরানো দপ্তরি রজনী বউ-ছেলেপুলে নিয়ে থাকে। পাঠের আসর ইস্কুলের বড়-বারান্ডায়।

সাহেবকে সামনে বসিয়ে মুকুন্দ মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। বলে, সাধুসন্তের চেহারার মধ্যে পুণ্যের জ্যোতি ঠিকরে বেরোয়। তোমারও সেইরকম ভাই। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। ভাবের মানুষ, ভক্ত মানুষ, সংসারে বড় কম। পাঠের আসরে এসো তুমি যে ক'টা দিন আছ।

ঐ চোখের জলের কাণ্ড—তারই সঙ্গে মিলেছে চেহারা। লজ্জা—কী লজ্জা! গ্রাম সুদ্ধ মানুষ—তাই বা কেন, কত গাঁয়ের কত মানুষ আসে, সকলে দেখে গেল। ফুলহাটায় থাকাই তো চলে না এর পর। পুরুষ-মেয়ে আঙুল দিয়ে দেখাবেঃ ঐ যে—দেখ, দেখ, সেই ছিঁচকাঁদুনে ছোঁড়াটা।

নানা কথায় রাতটা কিছু বেশি হয়ে গেছে। মুকুন্দ উনুন ধরাবে এবার। বলে, চিঁড়ে ফুরিয়ে গেছে, নয়তো হ্যাঙ্গামে যেতাম না। যাক গে, চাল ফুটিয়ে ফ্যানসা-ভাত ঘুটে নিই। কতক্ষণ লাগবে!

বংশী বলে, নিজে কেন হাত পুড়িয়ে খাও ছোটমামা? আমি খারাপ, আমার আজামশায় খারাপ— আমাদের ভাত না-ই খেলে। রজনীরা পাশে আছে, ওর বউ চাট্টি রেঁধে দিতে পারে না?

মুকুন্দ বলে, রজনী নিজে থেকেই বলেছে কতবার। এমনি তাদের পাঁচ-ছটা ছেলে-পুলে, তার উপর আমি গিয়ে ঝামেলা বাড়াতে চাইনে।

ফেরার পথে বংশী বলে, অর্ধেক দিনই উপোস ছোটমামার। আজ ঠিক ঝাঁঝালো ক্ষিধে, গরজ করে তাই উনুন ধরাতে গেল। রজনী দপ্তরির সঙ্গে হলে খাও না খাও বাঁধা খরচা দিয়ে যেতে হবে। সেই জন্যে এগোয় না, কষ্ট করে হাত পুড়িয়ে খায়।

কঞ্জুষ বুঝি?

দায়ে পড়ে হতে হয়েছে। পেটে না খেয়ে দুঃখধান্দা করে পয়সা বাঁচায়—বাসা করে ছোটমামীকেও পাপের সংসার থেকে উদ্ধার করে আনবে। সে আর এ জন্মে নয়। দেহ থাকলে অসুখবিসুখ আছে, লোকালয়ে থাকলে দায়বেদায় আছে। টাকাটা সিকিটা পয়সাটা জমিয়ে জমিয়ে যা করল, এক ঝোঁকে সব লোপাট। বছর আষ্টেক তো হয়ে গেল, রাই কুড়িয়ে বেল আর হয় না। ভেবেচিন্তে দুটো পয়সা রোজগার বাড়াবে, সে ইচ্ছেও তো নয়। সাঁজের বেলাটা পুঁথি না পড়ে তিনটে ছেলে পড়ালে কোন না দশটা টাকা আসে! আলাদা ধাঁচের মানুষ—মাথা খারাপ, বলাধিকারী বলেন। নিঝের মাথা নিয়ে চুপচাপ থাকলে কথা ছিল না, পুঁথিপত্তর শুনিয়ে আরও যে দশটা ভাল মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। আমার বউয়ের তাই করছে। 'ভাল হও ভাল হও' দিনরাত বউ কানের কাছে ঘ্যানর-ঘ্যানর করে। আগে অমন ছিল না, ছোটমামার পাঠ শুনে শুনে হয়েছে।

এর পর সাহেবের নিজের কথা উঠে পড়ল। বংশী বলে, আজামশায়ের গুণজ্ঞান আছে, তার বেটা ছোটমামাও দেখছি গুণ করে ফেলতে পারে। ভিন্ন রকমের গুণ—উল্টো দিকে। আমার বউকে করেছে। তুমি বিদেশি মানুষ, বলাধিকারী আশায় আশায় কোন মুলুক থেকে টেনে এনে বাড়ির উপর ঠাঁই দিয়েছেন—তোমার চোখেও জল বের করে ছাড়ল।

লজ্জায় রাঙা হয়ে সাহেব চাপা দিতে চায়ঃ না না, উনি কি করলেন! পাঠ শুনে কেমন হয়ে গেল—জেগে জেগেই যেন দুঃখের স্বপ্ন দেখলাম একটা—

বংশী প্রবল ঘাড় নেড়ে বলে, পাঠ তো আমিও শুনলাম। আগেও কত দিন শুনেছি। আমার তো কই লঙ্কার গুঁড়ো চোখে ঠেসেও একফোঁটা জল বের করা যায় না। ছোটমামা তবে খাঁটি কথাই বলেছে—ওদেরই ভাবের মানুষ তুমি। ভক্ত মানুষ। বলাধিকারীর আশায় ছাই। ভুল মানুষ নিয়ে এসেছেন।

সাহেব সভয়ে বলে, খবরদার বংশী বলাধিকারীমশায়ের কানে না যায়। হাসবেন, ঠাট্টা করবেন। তাড়িয়ে দেবেন হয়তো দূর-দূর করে। তোমার ছোটমামার এই

পোড়া ইস্কুলে আর আসব না।

মাথা নেড়ে জোর দিয়ে বলে, কোন দিন আর আসছি নে। সর্বনেশে জায়গা। যা বললে—গুণই সত্যি। মনটা ভিজিয়ে জোলো করে দেয়। বুড়ো-বুড়িরা হাঁ করে শুনছিল, তাদের পোষায়—পুঁথি শুনবে, তারপর বাড়ি ফিরে বসে বসে ঝিমোবে।

মুখে এই বলল, মনে মনেও সাহেব সর্বক্ষণ নিজেকে এবং অজানা বাপ-মায়ের নামে ধিক্কার দিচ্ছে। বাপ অথবা মা—দুয়ের মধ্যে একজন। কথায় কথায় কেঁদে ভাসানো নিশ্চয় একের স্বভাব। বাপই হয়তো। নির্দোষ অবোধ সন্তান বিসর্জনের ব্যাপারটা কোমলপ্রাণ বাপ হয়তো জানত না কিছু, শয়তানী মা চুপিচুপি আত্মকলঙ্ক ভাসিয়ে দিয়েছে। দিয়ে সতী হয়েছে দশের মাঝে। অথবা হতে পারে, প্রসবকালে অচেতন মায়ের অজ্ঞাত দানব বাপ নিজের দায়দায়িত্ব নিশ্চিহ্ন করে গেছে—মা তারপরে কেঁদেছে কত। আজও হয়তো কাঁদে। এত বড় ভুবনের মধ্যে কোন কিছুই দিল না তারা, পিতৃমাতৃ-পরিচয়টুকুও নয়—উত্তরাধিকার শুধুমাত্র সেই অপরিচিত অপদার্থ মানুষের প্যাচপেচে কাদার মতো মন। প্রতি পদে যা নিয়ে অপদস্থ হতে হচ্ছে।

নেশা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারে না। দিনে দিনে বেড়েই চলল। খাতির বাড়ছে—মুকুন্দ ভাই বলে, সাহেব ডাকে ছোড়দা। সন্ধ্যা হলেই মন উসখুস করে আসরে গিয়ে বসবার জন্য। হঠাৎ এর মধ্যে বংশীর বউ ভেদবমি হয়ে কাহিল হয়ে পড়ল। বংশীর যাওয়া বন্ধ। ঘোমটার মধ্য দিয়ে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গতিবিধি দেখবার মানুষটা নেই, কোন দায়ে আসরে হাত-পা কোলে করে বসে থাকবে? সাহেব যায় একা একা।

বংশীর কাছেও সে কথা স্বীকার করতে লজ্জা। আজেবাজে বলে কাটান দেয়। বলে, হাটে গিয়েছিলাম। কোন হাটে রে? দিশা না পেয়ে ভুল এক গাঁয়ের নাম করে দেয়, ঐ বারের হাট সে গাঁয়ে নয়। ধরে ফেলে বংশী হেসে খুন। সন্ত্রস্ত হয়ে সাহেব বারবার বলে, বলবে না কাউকে, দোহাই! বলাধিকারীমশায় টের না পান।

আসরে বিশ গণ্ডা চোখের উপর জানাজানি হয়ে পড়ছে, আসরের বাইরে ভিন্ন সময় এখন সে ছোড়দার কাছে গিয়ে বসে। এক একদিন অপরাহ্ণে ইস্কুলের ছুটির পর খালধারে বেড়ায় দু-জনে। কায়দা পেলেই সাহেব মহাগুণী পচা বাইটার কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু আদায় হয় না কিছুই। মন্ত্রগুপ্তির মতো মুকুন্দ বাপের কথা চাপা দিয়ে ভগবান নিয়ে পড়ে। বেড়ানোর মুখেও ভগবৎপ্রসঙ্গ শুনে যেতে হয়। নিতান্ত যে খারাপ লাগে, তা নয়।

ঘরে ফেরার সময় সাহেব অনুশোচনায় ব্যাকুল হয়ে পড়ে। সারাপথ মনে মনে মা-কালীর পায়ে মাথা খোঁড়েঃ অনেক দূরে তুমি আছ মাগো, তবু কি আর দেখতে পাচ্ছ না? বলাধিকারীমশায়ের অনেক আশা আমার উপর, সব বুঝি বরবাদ হয়ে যায়। সর্বনেশে ধার্মিক ঐ ছোড়দা—কোনদিন তার কাছে যেন না আসি। চোখ দুটো খুঁড়ে ফেললেও এক ফোঁটা জল যেন না বেরোয়। মন্দ করে দাও আমায় মা-জননী—যার চেয়ে মন্দমানুষ কোনদিন কোথাও হয়নি।

বংশী বলেনি কিছু। বলাধিকারীর তবু টের পেতে বাকি নেই। বৈঠকখানা-ঘরে ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য আর সাহেব—সেইখানে হুঙ্কার দিয়ে এসে পড়লেন : মুকুন্দ মাস্টারের কাছে বড্ড যে আনাগোনা ! ব্যাপার কি ?

পাকা লোক ওয়াকিবহাল হয়েই বলছেন, অস্বীকার করে লাভ নেই। তাচ্ছিল্যের ভাবে সাহেব বলে, পাঠ করেন নেহাৎ মন্দ নয়। কাজকর্ম নেই, সন্ধ্যাবেলা বসেছি গিয়ে দু'এক দিন।

ঘৃণা ভরে বলাধিকারী বলে উঠলেন, বোকা ছাগল ! ছাগলের মতন নুরও রেখেছে একটু। এক একটা মানুষ হয় এই রকম। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।

সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে বলেন, ভূত নয়, ভগবান। দুটোর মধ্যে বড় বেশি তফাৎ নেই। হায় রে হায়, পচা বাইটার মতো গুণীর বেটা শেষকালে ভগবানের কিল খেয়ে মরছে !

সাহেব ফস করে বলে বসল, হয়তো বা বাইটামশায়ের পরিণাম দেখে। পাপের শাস্তি—বলছিলেন একদিন মাস্টারমশায়।

'ছোড়দা'—সাহেবের মুখে এসে গিয়েছিল আর কি ! মাস্টারমশায় বলে সামাল দিল। বলাধিকারীর গায়ে যেন আগুনের সেঁক লাগে। খিঁচিয়ে উঠলেন : পাপ-পুণ্যের কথা এর মধ্যে আসে কিসে ? বুড়ো হয়ে কোন মানুষটা বিছানা নেবে না, জোয়ান-যুবোর মতো পাকচক্কোর মেরে বেড়াবে, বল দিকি সেই কথাটা ! মুকুন্দ ঐ যে মহান্ত হয়ে সদাচারে আছে, লম্বালম্বা বচন ঝেড়ে আড়কাটির মতন তোদের ভালোর দলে টানছে—বুড়ো হলে তারও ঠিক বাইটার গতি। গীতা-রামায়নে ঠেকিয়ে দেবে না।

ক্ষুদিরাম হেঁট হয়ে খাতায় একটা যোগ দিচ্ছিল, ঘাড় তুলে এইবার বলে, দল ভারি করার ব্যাপার আসলে। গাঁজার নেশা একলা জমে না। চুরি বলুন সাধুগিরি বলুন, সব নেশার ঐ এক নিয়ম। খুলনা শহরে পাদ্রি সাহেবরা রাস্তার মোড়ে টুলের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচায় : পাপের চাপে নরকে তলিয়ে যাবে, শিগগির আমাদের খোয়াড়ে চলে এসো। কাঠমোল্লাদেরও ঐ কথা। যাবেন কোথা ? অজাঙ্গি পাড়াগাঁয়ে পটুয়ারা পট দেখিয়ে পালা শুনিয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়—মরার পরে যমদূতেরা—ঢেঁকির পাড় দিয়ে অসতী নারীকে চিঁড়ে কুটছে, ঘানিগাছের মধ্যে চোর-ডাকাত পিষে তেল বের করছে—সেখানেও সেই পুণ্যের জয় পাপের ক্ষয়।

বলাধিকারী ঝাঁঝের সঙ্গে বলেন, যে-বাড়ি ভিক্ষে করতে গেছে সেই মানুষটাই হয়তো শঠতা-বঞ্চনায় টাকার পাহাড় জমিয়েছে। তার পরিণাম কিন্তু পটে লেখে না।

ক্ষুদিরাম সহাস্যে বলে, তা-ও আছে। শাস্তি নয়, পুরস্কার। ফকির-বোষ্টম অতিথি-ভিখারি অন্ধ-আতুরকে দিয়েছে বলে বৈকুণ্ঠধামে সোনার সিংহাসনে বসিয়ে হীরা-মুক্তো খাওয়াচ্ছে তাকে। বুঝলেন মশায়, ভালোর দলের সঙ্গে আমরা পেরে উঠব না। ওদের তোড়জোড় টাকাকড়ি সাজ-সরঞ্জাম অনেক।

পচা বাইটায় কথাটা ঘুরছে ক্রমাগত বলাধিকারীর মনে। বললেন, বাইটামশায়ের

শাস্তি পাপের দায়ে নয়, বুদ্ধির দোষে। যা-কিছু রোজগার বিষয়আশয় ঘরবাড়িতে লাগিয়ে করে ফেলল। তা-ও বেনামি—সরকার কবে কোনটা বাজেয়াপ্ত করে বসে, সেই ভয়ে। কিন্তু বিষ না-ই থাকুক কুলোপানা চক্করে দোষটা কি ছিল? ভাব দেখাবে, এত খরচখরচা করেও আছে এখনো অঢেল। সেই মেজাজে চলবে। রাত্রে দুয়োরে খিল দিয়ে দুটো পাঁচটা টাকা নিয়ে টুংটাং করে নখে বাজিয়ে যাবে—কবাটের বাইরে নিশ্বাস বন্ধ করে বাড়ির লোকে গুণবে দু-শ পাঁচ-শ টাকা। পরের দিন সকালে দুয়োর খুলতে না খুলতে দেখবে চরণ সেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। টাকা না-ই বা থাকল, টাকার ঝাঁঝ থাকলেও কাজ চলে যায়। এইটুকু কেন যে ঘটে এলো না বাইটার! মুকুন্দ বর্ধনের এই দুর্গতি শেষ বয়সে, যদি না হাতে-গাঁটে পয়সা জমিয়ে রাখে। সে আর হয়েছে! অদ্যভক্ষ্য ধনুর্গুণ—দিন চলে না এখনই এই জোয়ান বয়সে।

সাহেব এই ক-দিনেই সেটা বুঝেছে। মুকুন্দর জন্য মায়া পড়ে গেছে মনে মনে। বলে, আড়কাটি যদি বলেন, সে মাস্টারমশায় নয়—আমি। আমিই ওঁকে ভাগিয়ে নিয়ে আসব ভালোর পথ থেকে। নয়তো সত্যি সত্যি উনি মারা পড়বেন।

ঘাড় নেড়ে ক্ষুদিরাম বলে, পাঁড় নেশাখোর বাপু পেরে উঠবে না। কাজলী-বালাকে পারা গেল? আর, এই যে ইনি—

বলাধিকারীর দিকে চেয়েও হয়তো অনুরূপ কিছু বলত। তার আগেই বলাধিকারী বলেন, পাঁড়-সাধু আমিও ছিলাম রে। অমন-চারটি মুকুন্দ-মাস্টার গুলে খেতে পারতাম। সত্যমেব জয়তে জপ করতাম, সত্য ছাড়া এক চুল এদিক-ওদিক হব না—সঙ্কল্প ছিল আমার। আপনার তো সবই জানা ভটচাজমশায়। সোনার পাথরের বাটি নাকি হয় না, কাঁঠালের আমসত্ত বললে নাকি লোকে হাসে—আমি কিন্তু তাই হয়ে ছিলাম। সাধু-দারোগা। এদেশ-সেদেশ আমায় ঐ নামে বলত। বলত—আর এখন বুঝতে পারি, হাসত মুখ টিপে টিপে। গরব করত কেবল আমার স্ত্রী। সেই গরবের দায়ে তাড়াতাড়ি চলে যেতে হল তাকে।

গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলাধিকারী চুপ হয়ে গেলেন।

আট

তখন জজ-ম্যাজিস্ট্রেট না হয়ে লোকে দারোগা হতে চাইত। (এবং খোদ জমিদার না হয়ে কোন একটা মহালের নায়েব, হাকিম না হয়ে হাকিমের পেস্কার) দারোগা মানে শাহান-শা সেই এলাকার। খাওয়ার ব্যাপারে যে কোন বস্তুর বাঞ্ছা হোক, বেড়াতে বেড়াতে হাটে কনেস্টবলকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দেওয়া। কারো ঘাড়ে একটি বই দুটো মাথা নেই যে দাম চাইবে। পরার ব্যাপারে তাই। সর্বব্যাপারেই। সদরে যাবেন হয়তো দারোগাবাবু, খবর দেওয়া হয়েছে, একলা মানুষটির জন্য পুরো

সতরঞ্চি খালি রেখে শেয়ারের নৌকো থানার ঘাটে এনে বেঁধেছে। শোনা গেল, দুপুরের গুরুভোজনের পর নিদ্রা দিচ্ছেন দারোগাবাবু। ডেকে তুলে খবরটা দেবে, এত বড় তাগত কারো নেই। গোন শেষ হয়ে যাচ্ছে, এর পরে সমস্ত পথ উজানে গুণ টেনে মরতে হবে, ছইয়ের নিচে ঠাসাঠাসি মানুষগুলো গরমে গলে জল হয়ে যাবার যোগাড়। তবু না মাঝিমাল্লা না প্যাসেঞ্জার—মুখে কেউ রা কাড়ে না। নিস্তব্ধ ধ্যানমূর্তি সব—কথাবার্তার আওয়াজ ডাঙার উপর গিয়ে দারোগাবাবুর নিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটায়।

জগবন্ধু দারোগাই কেবল সৃষ্টিছাড়া। হাটে বাজারে নিজে কখনো যান না। বাইরের মানুষ পাঠিয়ে সওদা করেন, দারোগার লোক বুঝতে পারলে পাছে কেউ কম দাম নেয়। কোথাও যেতে হলে বিনা খবরে ঘাটে এসে শেয়ারের নৌকোয় অপর দশ-জনের পাশে ছেঁড়া-মাদুরে বসে পড়েন। যেমন চিরদিন হয়ে আসছে—দায়ে-বেদায়ে কেউ হয়তো হাসি-হাসি মুখ করে ভেট নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে—জগবন্ধু দারোগা এই মারেন তো সেই মারেন। মানুষটাকে থানার সীমানা পার করে দিয়ে তবে সোয়াস্তি। পুলিসের মানুষ হয়ে এমন পরমহংসের স্বভাব, কোন আহাম্মক সেটা বিশ্বাস করে? ভাবছে, ভেটের পরিমাণ যথোচিত হয়নি বলেই রাগ। দুনো তেদুনো আয়োজন নিয়ে আসে আবার, তাড়া খেয়ে চলে যায়।

ইতর-ভদ্র ক্রমশ বিরূপ হয়ে ওঠে। অমুক কাজের তদ্বিরে এই রকম দিতে হয়, তমুক কাজের তদ্বিরে ঐ রকম—একটা অলিখিত নিয়ম চলে আসছে। সকলেই মোটামুটি সেটা জানে। কালাপাহাড়ের মতো বনেদি নিয়মকানুন ভেঙে ফেলেছে ধর্মধ্বজী দারোগা। ভেঙে আর কোন নিয়ম বহাল হল, ঘুণাক্ষরে জানা যাচ্ছে না। হতবুদ্ধি জনসাধারণ। পাশাপাশি থানাগুলোর রাগ—বিশেষ করে একেবারে পাশে ঝিনুকপোতার বড়বাবু অনাদি সরকারের। এই নিয়ম-রীতি সর্বত্র যদি চালু হয়ে যায়, শুখো মাইনের কয়েকটি টাকা ছাড়া আর কিছুই লভ্য থাকবে না। ঐটুকুর জন্যেই কি ঘর-বাড়ি ছেড়ে চোর-ডাকাত ঠগ বোম্বেটে ঠেঙিয়ে নোনা রাজ্যে পড়ে আছে? জগবন্ধুর নিজ থানায় অন্য যে সব কর্মচারী, তারা অবধি বিরক্ত। সাহস করে বড়বাবুর মুখের উপর কিছু বলতে পারে না।

আজকের দিনের সুবিখ্যাত কেনা মল্লিকের বড়ভাই বেচারামের দিন-কাল তখন। চালনা-বন্দরের নিচে থেকে দরিয়া-পর্যন্ত দলবল নিয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপে বিচরণ করে বেড়ায়। জগবন্ধু বলাধিকারীর বিদঘুটে চালচলতি বেচারাম একেবারে বিশ্বাস করে না। বলে দূর! কড়া দেবতা শনিঠাকুর কিম্বা খাণ্ডারণী মা-কালী অবধি পুজো পেলে বর দিয়ে যান। পুজো দিয়ে ঠাণ্ডা করছি, দাঁড়াও।

বিপন্ন কারিগরেরা ধরে বসে: সকলের মাথার উপরে তুমি কাপ্তেন মশায়। মানুষটা জলে ডাঙায় বেয়াড়া রকম চোখ ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যে কাজ হবে কেমন করে?

বেচারাম কথা দিল: এনে দিচ্ছি ওটাকে মুঠোয় ভরে। বন্দোবস্ত হয়ে যাক। তারপর যেমন ইচ্ছে খেলিয়ে নিয়ে বেড়িও।

জগবন্ধুর ছোটমেয়ের বিয়ে। থানার লাগোয়া কোয়ার্টার, বিয়ে সেইখান থেকে হবে। সামুদ্রিকাচার্য ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের বাসা অতি নিকটে—একখানা মাঠের এপার-ওপার। বাড়ির দরজায় প্রাচীন এক সাইনবোর্ডে উপাধি সহ ভট্টাচার্যের নাম লেখা। হাত-দেখা স্ফোটক-বিচার শান্তিস্বস্ত্যয়ন তান্ত্রিক-কবচ এবং আরও বিস্তর পণ্যের ফিরিস্তি ছিল, অনেক বছরের রোদবৃষ্টি খেয়ে অস্পষ্ট অবোধ্য হয়ে গেছে, কাছে গিয়ে নজর খাটিয়েও এই ক'টির বেশি পড়তে পারা যায় না।

থানার পরম সুহৃৎ ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য, সুখে-দুঃখে বিপদে-সম্পদে থানার লোকের পাশে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে—সে লোক চাই কি খোদ বড়বাবু হোন, অথবা মুন্সি বা থানার কোয়ার্টারে জল-তোলা চাকর। ভট্টাচার্যের বাসায় সকাল-সন্ধ্যা মানুষের ভিড় —ভাগ্য-গণনার ব্যাপারে আসে যৎসামান্য, প্রায় সকলেই অন্য দশ রকমের দায়গ্রস্ত মানুষ। থানার কাছে তাদের হয়ে দরবার করতে হবে, সেই জন্যে এসে ধরেছে। পরের দুঃখে বিগলিতপ্রাণ ক্ষুদিরামও অমনি লেগে পড়ে যায়। বরাবর এই নিয়মে চলে এসেছে, কেবল হতচ্ছাড়া এই সাধু-দারোগা বাগ মানে না কিছুতে।

ভাটিঅঞ্চলের যেখানে যত থানা, আশেপাশে এই ধরনের একজন দু-জন সুহৃৎ থাকে। থাকে তাই ইতরজনের সুবিধা। কেউ ডাক্তারি করে, কেউ ঠিকেদার, কেউ ইস্কুলের মাস্টার, কেউ বা একেবারে কিছুই না। থানার বিয়েথাওয়া-অন্নপ্রাসনে কোমরে গামছা বেঁধে দিন নেই রাত নেই খাটাখাটনিতে লেগে পড়ে। অথবা থানার বাবুদের বুড়োহাবড়া কোন আত্মীয় টেঁসে যাবার দাখিল—সুহৃদমশায়ের কোমরের গামছা সঙ্গে সঙ্গে কাঁধে উঠে যায়। আপনজনেরা ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমুচ্ছে—শ্মশান-বন্ধুর যথাযোগ্য সাজ নিয়ে এই ব্যক্তি রাত্রি জেগে সতর্ক প্রহরায় রয়েছে, বুকের ধুকধুকানিটুকু থামলেই হরিধ্বনিতে থানা মাত করে সকলকে ডেকে তুলে মড়া খাটিয়ায় চড়াবে। দেরি করিয়ে দিচ্ছেন বলে ধৈর্য হারিয়ে বিড়বিড় করে গালও পাড়ে মুমূর্ষুর উদ্দেশে: কী মায়া রে বাবা! এতকাল ধরে ভোগসুখ করলি, তবু লালসার নিবৃত্তি নেই! খাবি খেয়ে খেয়ে কেন খামোকা কষ্ট পাচ্ছিস, দেবচক্ষু হয়ে পড় এবারে। ভোগান্তি আর সহ্য হয় না, একটা কাজ নিয়ে কাঁহাতক দিবা-নিশি এমন পড়ে থাকা যায়।

এমনি সুহৃৎ একজন ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য। জগবন্ধু পাত্তা দেন না বলে তাঁকে এড়িয়ে খিড়কির পথে কোয়ার্টারে ঢুকে পড়ে। স্ত্রী ভুবনেশ্বরীর পিতামহ ছিলেন সিদ্ধ-পুরুষ—সেই ধারা খানিকটা চলে আসছে। স্বামী-মেয়ে ছাড়াও একদঙ্গল ঠাকুর-দেবতা তাঁর সংসারে। থানার মতো জায়গাতেও কালী মহাদেব গণেশ লক্ষ্মী রাধাকৃষ্ণ সঙ্কীর্ণ একটু তাকের উপরে গাদাগাদি হয়ে নিয়মিত নিত্যসেবা পেয়ে আসছেন। ক্ষুদিরাম টোলে পড়ে নানা শাস্ত্র শিখে এসেছে, জমিয়ে নিতে অতএব দেরী হয় না।

ভুবনেশ্বরী বাঁ-হাতখানা বাড়িয়ে ধরেন: বলুন ভটচাজ্জিমশায়, কি দেখতে পান?

ক্ষুদিরাম কল্পতরু এ সময়টা। আয়ু থেকে আরম্ভ করে ধনদৌলত স্বামী ও

মেয়েদুটোর সুখশান্তি—সংসারে যা কিছু কামনার বস্তু থাকতে পারে, একনাগাড়ে মুষলধারে বর্ষণ করে। এত প্রাপ্তির পরেও ভক্ত না হয়ে কেমন করে পারবে! ক্রমশ এমন হয়ে দাঁড়াল—কোন তিথিতে কি খেতে নেই ক্ষুদিরাম পাঁজি দেখে বলে দেবে, ভুবনেশ্বরী বঁটি পেতে তবে আনাজ কুটতে বসবেন।

এমনি চলছিল। মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ করে জগবন্ধুর সঙ্গে এবারে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয়ে গেল। বরের কোষ্ঠি কনের কোষ্ঠি মিলিয়ে ক্ষুদিরাম যোটক-বিচার করল, গণ-রাশি হিসাব করে শুভকর্মের দিনক্ষণ ঠিক করে দিল। পাকাদেখার দিন পাত্র-আশীর্বাদ করে এলো জগবন্ধুর সঙ্গে পাত্রের বাড়ি গিয়ে।

নদী-খালে বান ডেকে সারা অঞ্চল ডুবে গিয়েছিল। জল সরে গিয়ে এখন অবশ্য স্বাভাবিক অবস্থা। জেলে খবর দিয়ে আনা হয়েছে, মন তিন-চার পোনামাছের সরবরাহ দেবে। কিন্তু বায়না নিতে তারা আগুপিছু করে! বানের জলের সঙ্গে মাছও বেরিয়ে গেছে। জালে যদি মাছ না পড়ে তখন যে জাত যাওয়ার ব্যাপার।

বলে, যার পুকুরে হুকুম হবে, হুজুরের নজরের সামনে দড়াজাল নামাব, যতক্ষণ যে ভাবে বলেন টেনে যাব। কিন্তু চুক্তির বাঁধাবাঁধির মধ্যে যেতে ভরসা পাইনে।

ক্ষুদিরামকে পেয়ে ছোট-দারোগা চোখ টিপে টিপ্পনী কাটে: শুনেছেন ভটচাজ-মশায়? দিনে দিনে কী অরাজক অবস্থা হল, বুঝুন একবার! জেলের পুত থানার উপর দাঁড়িয়ে বলে কিনা বায়না নেবো না। কালী বিশ্বাসের আমল হলে ঐ কথার পরে উঠে আর বাড়িঘরে যেতে হত না, রোদের মধ্যে চোদ্দ-পোয়া হয়ে বেলাস্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হত। দশেধর্মে চোখে দেখে সামাল হত।

জগবন্ধুর ঠিক আগে দোর্দণ্ডপ্রতাপ কালী বিশ্বাস ছিলেন বড়বাবু। তুলনাটা তাঁর সঙ্গে। কিন্তু ছোটবাবু যত যা-ই বলুক, হেন অবস্থায় ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য মরে গেলেও হাঁ-না কিছু জবাব দেবে না। কোন কথা কার কানে কি ভাবে হাজির হবে—কথা খুব ওজন করে বলতে হয়। একেবারে না বলাই ভাল। ছোটবাবুও বোঝে সেটা, উত্তরের প্রত্যাশা করে না। একজন কাউকে সামনে রেখে মনের গরম খানিকটা বের করে দেওয়া।

বলছে, ঘাড় নেড়ে যাবার সাহসই হত না, বাপ-বাপ বলে বায়না নিত, সাগর সেঁচে মাছ এনে দিত। হেঁ-হেঁ, সে হল কালী বিশ্বাস—লোকে তো কালী বিশ্বাস বলত না, বলত কলি বিশ্বাস। নরদেহে সাক্ষাৎ কলিঠাকুর।

ক্ষুদিরামকে মধ্যস্থ মেনে বলে, সেই দেখেছেন আর এ-ও দেখুন। দেখে দেখে চক্ষু সার্থক করুন। কলি উল্টে সত্যযুগের উদয় আমাদের থানার উপর। কী করব—আমরাও সব হাত-পা গুটিয়ে ধ্যান-নেত্র হয়ে বসে আছি। আমরা অধার্মিক লোক, আমাদের কথা ছাড়ুন। কিন্তু আপনি হেন কারিত-কর্মা ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে মাছের কথা আপনাকেও একবার বলা হল না। সকলকে বাদ দিয়ে যজ্ঞি হবে, চৌকিদার দফাদার বেটারা করে দেবে। করুক তাই। শেষ অবধি—দক্ষযজ্ঞ—চক্ষু মেলে মজা করে দেখে যাব আমরা।

কথা ঠিক বটে! এসব কাজে চিরকাল ক্ষুদিরামকেই হাঁকডাক করতে হয়।

এবারে দফাদার-চৌকিদারের ডাক পড়েছে। অপমান বই কি! ঘাড় নেড়ে ক্ষুদিরাম ছোটবাবুর কথা স্বীকার নেয়। এবং সম্ভবত অপমানের জ্বলুনিতেই ছিটকে বেরিয়ে পড়ে।

দ্রুতপদে মোড় পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে সুঁড়িপথে অদৃশ্য হয়। ঘুরে এসে খিড়কির পথে টিপিটিপি জগবন্ধুর কোয়ার্টারে ঢুকে পড়ল। যে পথে বারবার ভুবনেশ্বরীর কাছে আসা-যাওয়া। জগবন্ধুকে অভয় দিয়ে বলে, মাছের চিন্তা নেই বড়বাবু। আমার দায়িত্ব রইল।

হেসে বলে শান্তিস্বস্ত্যয়ন করে আকাশের বেয়াড়া গ্রহগুলো অবধি বাগিয়ে নিয়ে আসি, আর জলের ক'টা মাছ তুলতে পারব না! পুকুর কতকগুলো দেখে রেখেছি, পনের-বিশ সের করে এক-একটা মাছ—চার মন তো নস্যি। বিয়ের দিন সকালবেলা জেলেরা জাল-দড়ি নিয়ে এসে পড়বে, নিজে আমি সর্বক্ষণ সঙ্গে থাকব।

কাজকর্মের মধ্যে ক্ষুদিরামকে জড়াবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নিরুপায় অবস্থায় এখন জগবন্ধুকে রাজি হতে হল। আশ্বস্ত হলেন। বললেন, বাজার হিসাবে যা ন্যায্য দাম, পুকুরওয়ালারা কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে নিয়ে যাবে আমার কাছ থেকে। সিকি পয়সার তঞ্চকতা না হয়। এ দায়িত্বও আপনার উপর।

যে আজ্ঞে, তাই হবে।

হাসতে হাসতে ক্ষুদিরাম আবার বলে, আমি আজকের মানুষ নই বড়বাবু। এ থানায় কতজনাই তো এসে গেলেন, এমন ধনুক-ভাঙা পণ কারো দেখিনি।

আমার তাই। পরের দয়া নিয়ে কিম্বা পরকে ফাঁকি দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেব না। মেয়ের তাতে কল্যাণ হবে না।

ক্ষুদিরাম গদগদ হয়ে উঠল: আহা, হাটের মধ্যে ঢোলসহবৎ করে বলতে ইচ্ছে যাচ্ছে। দশেধর্মে শুনুক। ক'জনে বোঝেন এতখানি—ক্ষমতা হাতে পেলেই তো গরিব মারবেন। আপনি আমায় ডাকেন নি বড়বাবু, অসুবিধার কথা কানে শুনে উপযাচক হয়ে ছুটেছি। পরসেবা, বিশেষ করে সজ্জনের সেবা মহাপুণ্য। আমার চিরকালের নেশা বড়বাবু। এক বয়সে মাসের পর মাস রাত জেগে অঞ্চল পাহারা দিয়ে বেড়াতাম, আমি ছিলাম দলপতি। আপনার আগে কালী বিশ্বাস ছিলেন এখানে। অতি খচ্চর। ট্যারা চোখ, বাঁ-হাতের ছ'টা আঙুল—খুঁতো মানুষগুলো হয় ঐ রকম। আমার সঙ্গে বনত না! দারোগা আছ, চোর-ছ্যাঁচোড়ে ভয় করবে—সত্যপথের পথিক, আমি কেন খাতির করতে যাব? বলুন।

সত্যের পথিক পরসেবী মানুষটির সম্বন্ধে জগবন্ধু কিন্তু উলটোই শুনেছেন। আবার এ-ও শুনেছেন, অতিশয় কাজের মানুষ। আগের কথার জের ধরে ক্ষুদিরাম বলে, দাম দিলে নেবে না কেন বড়বাবু? কালী বিশ্বাস দিত না। ঐ আসনে বসে ক'জনে বা দেয়! না পেয়ে পেয়ে সেইটেই নিয়ম বলে ধরে নিয়েছে। জলে বাস করে কুমির ক্ষেপানো তো ভাল কথা নয়।

জগবন্ধু উত্তেজিত হয়ে বলেন, যত শয়তান জুটে সরকারের নামে কলঙ্ক দিয়েছে। চোর ধরবার চাকরি, কিন্তু আমাদের চেয়ে বড় চোর কোথায় আছে?

চারখানা গ্রামের মধ্যে গোটা আষ্টেক পুকুর ঠিক করে রেখেছে ক্ষুদিরাম। বিয়ের দিন সকালবেলা জেলেরা দড়াজাল নামাল। মাছ ধরার নামে বিস্তর লোক জুটে যায়। সকলের চোখের সামনে জাল টানছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ পূর্ব থেকে পশ্চিম নানা রকমে নানান কায়দায় টানে। চার-চারটে গ্রাম ঘুরল, মাছের একখানা আঁশ পর্যন্ত ওঠে না। মাথায় হাত দিয়ে বসে ক্ষুদিরাম। এবং খবর পেয়ে বলাধিকারীও।

জেলেরা বলে, জানতাম আমরা ভটচাজমশায় জলের উপরটা দেখে তলার খোঁজ বলে দিতে পারি। ভার্তাভিত্তি যে আমাদের। কথাটা বলেছিলাম, মিলিয়ে দেখে নিন এবার। শুধ-শুধু নাজেহাল হলাম।

বেইজ্জতি ব্যাপার। দধি-মৎস্যাদির আয়োজন করিব, আপনারাও করিবেন—' লগ্নপত্রের এই চিরকালের বয়ান। বিয়ের ভোজে মাছ বাদ—বিধবারা মাছ খায় না, তেমনি একটা অলক্ষুণে যোগাযোগ মনে এসে যায়। নিমন্ত্রিতেরাই বা কি বলবে? এত বড় থানার উপর বসে থেকে অঞ্চলে চুঁড়ে মাছ মিলল না, এ কি বিশ্বাস হবার মতো কথা!

কী হল ভটচাজমশায়? শুনেছিলাম, অত্যন্ত দক্ষ লোক আপনি, কাজে নেমে কখনো হারেন না—

মুখ চুন ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের, তা বলে মুশড়ে পড়বার পাত্র নয়। বলে, হেরে গিয়েছি কি করে বলি। মাঝরাত্রে লগ্ন—বারোটার পর। বরযাত্রী-কন্যাযাত্রী বিয়ের পরেই না হয় ভোজে বসবে। উচিতও তাই। কাজের আগে কেউ খেতে চায় না। সে খায় কলকাতা শহরে। খেয়ে পানের খিলি মুঠোয় ট্রাম ধরতে ছোটে।

জগবন্ধু ভরসা পান না। বলেন বিকাল পর্যন্ত বেয়ে স্রেফ ঝাঁঝি আর পাটা-শেওলা তুলে বেড়াল। কোথায় কে মাছ জিইয়ে রেখেছে—এই তিন-চার ঘণ্টায় চার মন মাছ হয়ে যাবে? হবার হলে দিনমানেই হত।

ক্ষুদিরাম অবিচলিত কণ্ঠে বলে, দেখাই যাক।

জেলেরা তো বাড়ি চলে গেল। পারবেও না তারা—সারাদিন যা খেটেছে, নড়ে বসবার তাগদ নেই। কারা যাচ্ছে এবারে মাছ ধরতে?

জিভ কেটে হাতদুটি জোড় করে ক্ষুদিরাম বলে, ঐটি জিজ্ঞাসা করবেন না বড়বাবু। সঠিক আমিও জানিনে। একটু-আধটু যা জানি, বলা যাবে না আপনার কাছে। তবে ভার দিলে কাজ তুলে দেবে, মনে করি। কী হুকুম হয়, বলুন। সময় নেই, বুঝতে পারছেন।

জগবন্ধু গুম হয়ে রইলেন ক্ষণকাল। বলেন, উপায় নেই, যা করবার করুন গে। কিন্তু আমার কথা, দাম ষোলআনা নেবে তারা। রাত্রিবেলার খাটনি—ষোলআনার উপরেও কিছু নেবে।

অবস্থাটা চট করে ভেবে নিলেন। কি ভাবে কোথা থেকে মাছ এলো এই দারোগা-গিরি মেয়ের বিয়ের মুখে একটা দিন না-ই বা করলেন! শাস্ত্রের উক্তি মূল্য

দিলেই দ্রব্যের দোষ শোধন হয়। হাতে হাতে দাম চুকিয়ে দেবেন তিনি। সকলের মুকাবেলা।

দ্বিধাভরে বলেন, সারাদিনে লবডঙ্কা। অন্ধকারের মধ্যে কেমন করে কি হবে আমি কোন ভরসা দেখছিনে ভটচাজমশায়।

ক্ষুদিরাম একগাল হেসে বলে, দাঁত্যদানোর কাজ অন্ধকারেই খোলে ভালো। তৈরি হয়ে আছে সব। বলে কি জানেন বড়বাবু, পুকুরের মাছ তো হাতের মুঠোর জিনিস—হুকুম হলে বাদা থেকে বাঘের দুধ দুয়ে এনে দিই। সেই দুধে দিদিমণির বিয়ের পায়েস হবে। অন্য রাঁধাবাড়া হয়ে যাক, মাছ এসে পড়লেই কুটে ভেজে চড়িয়ে দেবে। বেশিক্ষণ লাগবে না।

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য সাঁ করে বন্দোবস্তে বেরিয়ে গেল।

প্রহরখানেক রাত। বড় একদল বরযাত্রী এসে উঠল নৌকাঘাটা থেকে। জগবন্ধু আব্যুতিতে বসেছিলেন, খানিকটা সেরে কুটুম্বদের আদর-অভ্যর্থনায় ছুটলেন। বরের আসর গমগম করছে।

এমনি সময় ক্ষুদিরামের আবির্ভাব। ফিসফিস করে বলে, একটু ইদিকে আসবেন বড়বাবু।

সশঙ্কে জগবন্ধু বলেন, খবর কি ?

কী আবার! মাছ। বলেছি তো, হারিনে আমি কোন কাজে। একটিবার এসে চোখে দেখুন।

দু-হাত দু-দিকে প্রসারিত করে বলে, মাছ নয়—এই বড় বড় রাজপুত্তুর। দেখে যান।

একটুখানি ফাঁক কাটিয়ে জগবন্ধু হেরিকেন লণ্ঠন হাতে ক্ষুদিরামের পিছু পিছু চললেন। থানার সীমানাটা ছাড়িয়ে বাদামতলার অন্ধকারে মাছ এনে গাদা করে গেছে। এনেছে বেশিক্ষণ নয়—লেজের ঝটপটি এখনো দু-চারটের।

একটা মাছের কানকোয় হাত ঢুকিয়ে ক্ষুদিরাম তুলে ধরল ভাল করে দেখানোর জন্য। মাছের ভারে মানুষটাই যেন নুয়ে যাচ্ছে। হেরিকেন উঁচু করে জগবন্ধু দেখে নিলেন, দেখে ভারি প্রসন্ন। রাজপুত্র বলে বর্ণনা দিল—লালচে রঙের সুপুষ্ট রুইমাছ, পুচ্ছ লাল, উপমা কিছুমাত্র বেমানান নয়। মাছ জিইয়ে রাখা ছিল কোন খানাখন্দে, হুকুম পাওয়া মাত্র তুলে দিয়ে গেল।

ক্ষুদিরাম বলে, রান্নার দিকটাও আমি দেখছি। আপনি একবার চোখে দেখে গেলেন, দেখে খুশি হলেন—ব্যস !

জগবন্ধু সবিস্ময়ে বলেন, সমস্তটা দিন জাল টেনে টেনে মরল, এত মাছ কোন পুকুরে ছিল তাই ভাবছি।

জেলে-বেটাদের কথা আর বললেন না! বক্র হাসি হেসে ক্ষুদিরাম বলে, হাটে হাটে হাতে কেটে ট্যাংরা-পুঁটি বেচে বেড়ায়, কতটুকু মানুষ ওরা—দুনিয়ার খবর কী জানবে! সে জানেন এক অন্তর্যামী ভগবান, আর ঐ দাঁত্যদানোগুলো। ডাকতে

হাঁকতে বরাবর ওরাই এসে পড়ে, থানার লোকের কোন দায় ঠেকতে হয় না। এবারে নতুন নিয়ম করতে গিয়েই মুশকিল হল। সে যাক গে। শেষ রক্ষে হয়ে গেছে—এখন আর ভাবনা কি ?

দেখছি না তো তাদের কাউকে। মাছ ফেলে দিয়েই পালাল। আমার যে নগদ টাকা হাতে হাতে দেবার বন্দোবস্ত।

ক্ষুদিরাম বলে, আপনার সামনে এসে হাত পেতে দাঁড়াবে, তবেই হয়েছে! পাইতক্কের মধ্যে অতবড় বুকের পাটা কারো নেই। তবে আমি আগে থেকে চুক্তি করে নিয়েছি, দাম কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিতে হবে। এ বিষয়ে আবদার শোনা হবে না। ভাববেন না বড়বাবু। আপোষে না নিতে চায় তো মানুষ চিনিয়ে দেব আমি—কনেস্টবল-চৌকিদারে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে থানার উঠানে এনে ফেলবে, বাপের সুপুত্তুর হয়ে দাম নিয়ে যাবে। শুভকর্মের মধ্যে এ নিয়ে মাথা গরম করবেন না, খুশি মনে কন্যা-সম্প্রদান করুন গে। আমি রান্নার তদারকে যাচ্ছি।

এই ছাড়া কী ব্যবস্থাই বা হতে পারে এখন! জগবন্ধু কড়া হয়ে বললেন, দাঁড়ি-পাল্লা ধরে মাছের সঠিক ওজন নিয়ে নিন এক্ষুনি! জলের মাছ জল-মরা বলে পাঁচ-দশ সের বাদ—এসব ধানাই-পানাই আমার কাজে করতে যাবেন না। পোয়া-ছটাক অবধি হিসাব করে দাম কষে ফেলুন। তারপরে কোটা-বাছা, তারপরে রাঁধাবাড়া। এই কাজটা শেষ করে তবে আপনি নড়বেন।

হুকুম দিয়ে জগবন্ধু চললেন। মনে মনে প্রবোধ নিচ্ছেন ঃ অত দেখতে গেলে হয় না। বাজার থেকে কতই তো কেনাকাটা করি, কোন সূত্রে কোন বস্তুটা এল তাই নিয়ে কে খোঁজাখুঁজি করতে যায়? ন্যায্য পরিমাণ দাম দিয়ে দিলেই বিবেকের কাছে দায় থাকল না।

সূত্র জগবন্ধুকে খুঁজতে হয়নি, পরের দিন থেকে আপনাআপনি প্রকাশ পেতে লাগল। বুধবার, অর্থাৎ মেয়ের বিয়ের তারিখ যেদিন, রাত্রিবেলা পুকুরের মাছ চুরি হয়েছে। সে পুকুর একটি দুটি নয়—এজাহারের পর এজাহার আসছে গোণাগুণতি ছাড়িয়ে যাবে এমনি গতিক। এবং শুধুমাত্র এই থানায় নয়, পাশের থানা ঝিনুক-পোতার এলাকার ভিতরেও। সর্বনেশে কাণ্ড করেছে বেটারা—যেখানে যত ভাল পুকুর, সর্বত্র জাল ছেঁকে বেড়িয়েছে।

ঝিনুকপোতার বড়-দারোগা অনাদি সরকার হাসিমস্করা করছে, খবর কানে এসে গেল। লোকজনের মধ্যে হাত-মুখ নেড়ে বলে, জগবন্ধু দারোগার কন্যাদায়—ব্যাপার সামান্য নয়। নিজের এলাকায় কুলালো না, তা মুখের কথাটা বললে আমিই সংগ্রহ করে দিতাম। তাতে বুঝি ইজ্জতে বাধে—তারও বড়, পয়সা খরচ হয়। তার চেয়ে রাতের কুটুম্ব পাঠিয়ে সোজাসুজি কাজ হাসিল করে নিয়ে গেল।

নিঃসাড়ে যেন মন্ত্রবলে কাজ সেরে গেছে। প্রতি পুকুরে জলের মধ্যে বোঝা বোঝা পালা—অর্থাৎ গাছের ডালপালা ও কঞ্চি ইত্যাদি। হঠাৎ এসে কেউ জালের খেওন না দিতে পারে। জাল ফেলবার আগে পালা তুলে ফেলে সমস্ত পুকুর সাফসাফাই করে

নিতে হবে। জলে নেমে পড়ে তাই করেছে, তাপরে জাল নামিয়েছে আট-দশখানা গাঁয়ের পনের-বিশটা পুকুরে। সন্ধ্যার পরে মাত্র তিন-চার ঘণ্টা সময়ের ভিতর। লগ্নের মুখেই মাছ এসে পড়ল। বাছাই-করা সারের সার মাছ—ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের উপমায় রাজপুত্তুর। কতগুলো জাল নিয়ে কত মানুষ ছড়িয়ে পড়েছিল রে বাবা! এত বড় কাণ্ড টুঁ শব্দটি নেই—পাকা হাতের পরিপাটি কাজ। সকালে উঠে ডাঙার উপর পালা এবং পুকুরপাড়ে জাল ঝাড়ার চিহ্ন দেখেই মাছ-চুরির ব্যাপার মালুম হল। ভদ্র মানুষজন দশের মধ্যে অবশ্য নিন্দে-মন্দ করে, কিন্তু মনে মনে চমৎকৃত হচ্ছে।

এক পুকুরের মালিক বলল, পুকুর ঠিক উঠোনের উপর বলেই জালের শব্দ একটু-খানি কানে গিয়েছিল। কিন্তু বেরুতে গিয়ে দেখে, বাইরে থেকে শিকল আঁটা। শিকল এঁটে বন্দী করে মাছ ধরেছে। চেঁচানি দিল একটা। ঝাঁটিতি বউ এসে মুখ চেপে ধরেঃ ঘরের মধ্যে ঢুকে গলা দুইখণ্ড করে দিয়ে যাবে। এক হাত মুখে চাপা দিয়েছে, আর এক হাত দরজায় খিল হুড়কো একের পর এক এঁটে দেয়। কথা বের হতে দিল না, বেরুতেও দিল না ঘর থেকে।

ঝিনুকপোতার দারোগা বলে বেড়াচ্ছে, সর্বপক্ষী মাছ খায়, নামটি কেবল মাছরাঙার!

সেই আসরে কে-একজন নাকি টিপ্পনী কেটেছেঃ মাছরাঙা তো চেলা-পুঁটি খায় বড়বাবু, বলাধিকারী খান তিমি। মাছের রাজা তিমি খেয়ে খেয়ে উনি তিমিঙ্গিল হয়েছেন।

বন্ধু লোকেরা আছে—তাদের কাজ ও-থানার কথা এ-থানায় এসে বলে যাওয়া। যত শোনেন, জগবন্ধু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছেন। নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে। এত-তলিয়ে দেখেন নি। এখন যে মুখ দেখানোর উপায় থাকে না আপন-পর কারো কাছে। ধর্মের কাছেই বা জবাবদিহি কি?

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য নির্বিকার। বলে, এই দেখুন, মুখ দেখানোর মুশকিল কি হল? অনাদি সরকার এত বলে বেড়াচ্ছে, তার বউয়ের গলার নেকলেশটা লক্ষ্য করে দেখেছেন? খুকির বিয়ের নেমন্তন্নে নেকলেশটা পরে এসেছিল। শুধুমাত্র দারোগা-গিরি করে হীরে-বসানো এমন জিনিস দেওয়া যায়? বলুন। পুকুরচুরি করে ওঁরা সব জিতে যাচ্ছেন, এ তো 'পুকুরের ক'টা মাছ। তা-ও লোকগুলো নিজের বুদ্ধিতে করেছে, আপনি কিছু বলতে যান নি। আবার তা-ও বলি, তাড়াহুড়োর কাজকর্ম—বলে-কয়ে অনুমতি নেবার সময় কোথা? পায়তারা কষতে গেলে কিছুই হয় না। তবে হ্যাঁ, ধর্মের ঐ কথাটা যা বললেন—

একটু দম নিয়ে বলে, ধর্ম কিছু আর পালিয়ে যায় নি একটা-দুটো দিনের মধ্যে। ধর্ম এখনো রাখা যায়। পুকুরে মাছ পোষে বিক্রি করে দুটো পয়সা পাবে বলে। পয়সা পেলেই চুকে-বুকে গেল। এই কথাটা আপনি তো গোড়া থেকে বলে আসছেন।

জগবন্ধু অধীর হয়ে বলেন, পুকুরওয়ালাদের ডেকে আপনি তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা

করে দিন ভটচাজমশায়। আজকে যদি হয়ে যায়, কাল অবধি সবুর করবেন না।

সেইমাত্র একটা এজাহারের শেষ হল ছোট-দারোগার কাছে। লোকটা বেরিয়ে যাচ্ছিল, ক্ষুদিরাম ডেকে এনে জগবন্ধুর সামনে হাজির করল।

লোকটা ফোঁত-ফোঁত করে কাঁদে: ছা-পোষা গৃহস্থ বড়বাবু, বেটারা সর্বনাশ করে গেছে। মাছগুলো বুক-বুক করে রেখেছিলাম—একসঙ্গে বেচে দিয়ে বিঘে দুই ধানজমি করব।

কি পরিমাণ গেছে, আন্দাজ করতে পারো?

লোকটা বলে, জলের মাছ—সঠিক বলি কেমন করে। চান করবার জো ছিল না, গায়ে ঠোক্কর দিত। একেবারে ছেঁকে তুলে নিয়ে গেছে।

জগবন্ধু বিরক্ত হয়ে বলেন, তবু বলবে তো একটা-কিছু?

তাড়া খেয়ে লোকটা বিড়বিড় করে দ্রুত হিসাব করে নেয়: গুণে সেবারে একশ বাছাই রুই ছাড়লাম। অর্ধেকও যদি মরেহেজে গিয়ে থাকে—

ক্ষুদিরাম প্রশ্ন করে ওঠে: কত বড় হয়েছিল?

সের পাঁচেক করে ধরে নিন। যাকগে যাক, আরও কিছু ছাড় করে দিয়ে গড়ে চার সের করেই হল—

রুই ছাড়া অন্য মাছও কিছু থাকবে তো পুকুরে! কাতলা মৃগেল বাটা সরপুঁটি—

আজ্ঞে হ্যাঁ, ছিল বইকি! অঢেল ছিল।

লোকটা চলে গেলে ক্ষুদিরাম বলল, নিন, হল তো! শুধু রুইমাছই পাঁচ মন। তাছাড়া কাতলা গেল—আরও শত শত রকমের। অঢেল ছিল সেসব।

বলাধিকারী আঁতকে উঠলেন: কী সর্বনাশ! আমাদের তো মোটমাট চার মন। তারও কতজন ভাগিদার। ডাহা মিথ্যেকথা বলে গেল লোকটা।

ক্ষুদিরাম হেসে বলে, এই লোক বলে কেন—যার কাছে বলবেন, হিসাব এমনিধারাই দেবে। এখন এই। আর ক্ষতিপূরণ বাবদ পাঁচটা টাকাও যদি কাউকে দিয়েছেন, এজাহারের ঠেলায় ছোটবাবু অস্থির হয়ে যাবেন, সরকারি খাতা হু-হু করে ভরাট হয়ে যাবে। পুকুর ডোবা খানাখন্দ যার একটা আছে, কেউ আর বাদ পড়ে থাকবে না।

ছি-ছি! জগবন্ধুর মুখে বাক্য নিঃসরণ হয় না।'

ক্ষুদিরাম বলে, আরও আছে বড়বাবু। হাতে-হাতে ক্ষতিপূরণ মানে চুরি দায় ঘাড় পেতে নেওয়া হল। ভেবে দেখবেন এদিকটা। চোরাই মাছে বিয়ের ভোজ হয়েছে, ঢাকঢোল পিটিয়ে জাহির হয়ে গেল।

স্তম্ভিত জগবন্ধু। বলেন, কী জগৎ! সত্যি কথা, সৎ কাজকর্মের ধার দিয়েও কেউ যাবে না!

ক্ষুদিরাম নিরীহ ভাবে বলে, বিদ্যাসাগরমশায় এটা করে গেলেন।

কী করলেন তিনি—অমন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি?

দ্বিতীয় ভাগে লিখে গেলেন—'সদা সত্য কথা বলিবে। আরও বিস্তর ভাল ভাল

কথা লিখলেন—'রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করিও না।' ছেলেপুলে না দৌড়ে কি ছায়ায় বসে বসে আফিংখোরের মতো ঝিমোবে? ঐ বয়স থেকেই বুঝে নিয়েছে, বইয়ে থাকে এ সমস্ত—বানান করতে হয় মানে শিখতে হয়, কাজে খাটাতে নেই। যেদিকে তাকাবেন এই। সত্য নিয়ে কারও শিরঃপীড়া নেই। এক-আধজন যদি দৈবাৎ মেলে, গবেট বলে তামাসা করবে তাকে লোকে।

আজও বলাধিকারী ক্ষুদিরামকে বলে থাকেন, প্রথমপাঠ আপনার কাছেই পেয়েছি ভটচাজমশায়। গুরুমান্য আপনার প্রাপ্য। চমক লেগেছিল বড্ড সেদিন। ন্যায়নীতি কোন এক কালে নিশ্চয় ছিল। কিন্তু রকমারি সমাজ-পদ্ধতির সঙ্গে এটির বিলয় ঘটেছে। একশ'র মধ্যে নিরানব্বুই জনই যা মানে না, তাকে আর ধর্ম বলা যায় কি করে? ইতিহাসের মাটি খুঁড়ে বিলুপ্ত বহু জীবের কঙ্কাল পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় লাগে, জীবনধারণের কাজে আসে না। ন্যায়ধর্মের যা সম্পূর্ণ বিপরীত, সেই রীতিগুলোই সমাজ আজকে ধরে রেখেছে।

ক্ষুদিরাম ছোট্ট একটু প্রতিবাদ করেঃ শতের মধ্যে নিরানব্বুয়ের হিসাবটা ঠিক হল না বলাধকারীমশায়। হাজারে ন-শ নিরানব্বুই বলাও বেশি হয়ে যায়।

বলাধিকারী বলেন, সত্য-ন্যায়ের একটা পাতলা পোশাক শুধু ঢাকা দেওয়া। সেই পোশাকের নিচের চেহারাটা সবাই জানে। নিজ নিজ ক্রিয়াকর্ম থেকেই বুঝতে পারে। বাইরে অবশ্যই চাই ওটা, তবে পোশাকটুকু অতি-জীর্ণ হয়ে এসেছে। আর বেশি দিন থাবছে না।

এসব এখনকার কথা। বলাধিকারী ও ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের মধ্যে হাস্য-পরিহাস চলে এমনিভাবে। সেদিনের জগবন্ধু আলাদা মানুষ। অন্য কোন উপায় না দেখে চার মন মাছের দাম হিসাব করে তিনি ক্ষুদিরামের হাতে দিলেন। দাম শোধ না করা পর্যন্ত সোয়াস্তি পাচ্ছেন না। টাকাটা দিয়ে, থানার বড়বাবু হওয়া সত্ত্বেও ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের হাত জড়িয়ে ধরলেনঃ আশাসুখে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। অজান্তে অন্যের উপর জুলুম হল, আঙুল ভেঙে তারা শাপ-শাপান্ত করবে, কিছুতে এটা সহ্য হচ্ছে না। ধর্মভার আপনার উপরে—টাকাপয়সা কারো কাছে ঋণ না থাকে দেখবেন।

ক্ষুদিরাম ঘাড় নেড়ে অভয় দেয়ঃ যারা মাছ ধরেছে, পুরো টাকা তাদের হাতে পৌঁছে দেব। কার পুকুরের কত মাছ তারাই জানে, ঠিকমতো বাঁটোয়ারা করে দেবে। একটা জিনিস জানবেন, চুরি করুক যা-ই করুক ধর্ম রেখে কাজ করে তারাই। ছ্যাঁচড়ামি ঘেন্নার বস্তু। কথা দিল তো কিছুতে তার নড়চড় হবে না। আমার কাছে কথা দিয়েছিল, বড়বাবুর মানের হানি হয় কিছুতে সেটা হতে দেবে না। তাই করল কিনা বলুন। যে ভাবেই হোক, কাজ ঠিক তুলে দিল।

মূল্য যথাযোগ্য স্থানে গিয়ে পড়বে, এত কথাবার্তার পরেও জগবন্ধুর পুরোপুরি বিশ্বাস হয় না। সান্ত্বনাঃ তিনি অন্তত মূল্য শোধ করে দিয়েছেন। এবং মনে মনে কঠোর সঙ্কল্প করলেন, এমন অনিশ্চিত সন্দেহ-সংকুল, কাজের মধ্যে কোনদিন আর

যাবেন না। মরে গেলেও নয়। যা হল এখানেই শেষ।

তবু কিন্তু শেষ হয় না। মাসখানেক পরে নতুন জামাই শ্বশুরবাড়ি এল। থানার সেই কোয়ার্টারে। হাটবার সেদিন। চাকর সঙ্গে নিয়ে জগবন্ধু নিজে হাট করে আনলেন। রাত প্রহরখানেক। রান্নাঘরে ভুবনেশ্বরী রান্নাবান্না করছেন. খোলা দরজায় টুক করে কি এসে পড়ল পিছন দিকে। আর একটু হলে গায়ের উপর পড়ত। মানকচুর পাতায় কলার ছোটো দিয়ে সযত্নে বাঁধা পুঁটুলি।

খুলে দেখে অবাক। কচুপাতায় মাংস বেঁধে ছুঁড়ে দিয়ে গেছে।

জগবন্ধু বাইরের ঘরে গল্পসল্প করছিলেন নতুন জামাইয়ের সঙ্গে। ভুবনেশ্বরী ডাকিয়ে আনলেন। দেখ কী কাণ্ড!

পাড়াগাঁ জায়গায় মাংস এমনি বিক্রি হয় না। একজন কেউ উদ্যোগী হয়ে পাঁঠা-খাসি মারে। যার যেমন প্রয়োজন—কেউ চার আনা, কেউ আট আনা, কেউ বা এক টাকার মতন ভাগ নিয়ে নেয়। জগবন্ধু তাই করবেন। সুপুষ্ট খাসি একটা ঠিক করে এসেছেন—রাত্রিবেলা মাছ ইত্যাদি হোক, দিনমানে কাল খাসির ঘাড়ে কোপ পড়বে। কিন্তু কোন সব অলক্ষ্য আত্মীয়জনেরা রয়েছে, জামাই-সমাদরের এতটুকু খুঁত তারা হতে দেবে না। এই রাত্রে ছাগল কেটে মাংসের ব্যবস্থা করেছে। হুকুমের তোয়াক্কা রাখে না, এতদূর স্বজন তারা।

ভুবনেশ্বরী জিজ্ঞাসা করেন, কে দিয়ে গেল বল তো?

আবার কে! বিয়ের মাছ যারা দিয়েছিল। এমন নিঃসাড়ে এসে ফেলে দিয়ে যাওয়া ঐসব গুণী লোক ছাড়া পারবে না।

ভুবনেশ্বরী বলেন, মাংস রাঁধতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না। কিসের মাংস, কে জানে? চোখে দেখে তো চিনবার জো নেই—শিয়াল কুকুর কেটেও দিয়ে যেতে পারে।

জগবন্ধু বললেন, আমারও ঠিক সেই মত। এ মাংস জামাইয়ের পাতে দেওয়া যাবে না। কুকুর-শিয়ালের নয়, সেটা বলতে পারি। তার চেয়েও খারাপ। কার ঘরে ঢুকে সর্বনাশ করে এসেছে। মাংস আস্তাকুড়ে ফেলে দাও তুমি।

এতদূর করলেন না অবশ্য ভুবনেশ্বরী। এখন চাপিয়ে দিয়ে মাংস রান্না হতে রাত তো পুইয়ে আসবে। রেখে দেওয়া যাক, কাল দিনমানে দেখেশুনে রান্নাবান্না করা অথবা কাউকে দেওয়া—যা হোক কিছু করবেন।

পরের দিন রোদ উঠবার আগেই জানা গেল, জগবন্ধুর অনুমান খাঁটি। ডাকের রানার রাখহরি পুঁইয়ের বুড়ি-মা লাঠি ঠুকতে ঠুকতে আধক্রোশ পথ ভেঙে থানায় এসে কেঁদে পড়লঃ দারোগাবাবু, আমার রাঙি ছাগলটা চুরি গেছে কাল রাত্রে। গোয়ালের একটা পাশ ছাগলের জন্য শক্ত করে ঘিরে দিয়েছি—সকালে দেখি, ঝাঁপ খোলা, ছাগল নেই। কেঁদো কি শিয়ালে নিয়েছে ভাবলাম। তারপরে দেখি: কচু-পাতায় বাঁধা মাংস। আমার রাঙিকে কেটেকুটে গৃহস্থর ভাগ রেখে গেছে।

হাপুসনয়নে কাঁদছে বুড়ি। ছাগল নয়, যেন পুত্রশোকের কান্না। চুরি-করা খাদ্য-বস্তুর ভাগ গৃহস্থকে দিলে শাপ অর্শায় না, চোরশাস্ত্রর বিধান এই। আর

গৃহস্থকে যদি সেই বস্তু খাওয়ানো যায়, উল্টে তখন পুণ্যলাভ। রাঙির মাংস চোর তাই রাখহরির বাড়িতেও কিছু দিয়েছে।

যথারীতি এজাহার লিখিয়ে বুড়ি ফিরে যাচ্ছে। কান্না দেখে জগবন্ধু বিচলিত হয়েছেন। একটা কনেস্টবল দিয়ে বুড়িকে ডাকিয়ে আনলেন।

বুড়োমানুষ কষ্ট করে পুষেছিলে, কত দাম হতে পারে তোমার ছাগলের?

সরল সাদাসিদে স্ত্রীলোক, কথায় কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই। বলে, ব্যাপারি এসে ন-সিকে বলেছিল শীতকালে। দিইনি। বলি, এত ছোট খাসি না-ই বেচলাম। বড় হোক।

জগবন্ধু তিনটে টাকা তার হাতে দিলেন। বিবেক-দংশন অনেকটা শীতল হল।

বুড়ি অবাক হয়ে গেছে। থানার মানুষ হাত উপুড় করে টাকা দিচ্ছে! সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি চার যুগের মধ্যে বোধকরি এই প্রথম। এবং স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ত্রিভুবনের মধ্যে শুধুমাত্র এই থানায়।

বিস্ময়ের ধকল খানিকটা সামলে নিয়ে বুড়ি বলে, দাম আপনি কেন দেন বড়বাবু? আপনার কোন দায় পড়ল?

আমতা-আমতা করে জগবন্ধু অকস্মাৎ এক কৈফিয়ৎ খাড়া করে ফেলেনঃ ছেলের অকালমৃত্যুর জন্য ব্রাহ্মণ এসে রাজা রামচন্দ্রকে গালি পাড়ে। শম্বুক বধ করে তবে নিষ্কৃতি। নিয়মই তাই। যার রাজত্বে বসবাস, প্রজার অমঙ্গলের দায় তারই উপর বর্তায়। থানার উপর বসে মাস মাস সরকারের মাইনে খাচ্ছি—মুল্লুকের চোরডাকাত যতদিন না শাসন হচ্ছে, লোকের ক্ষতিলোকসান ন্যায়ত ধর্মত আমাদেরই পূরণ করা উচিত।

বুড়ির এত সমস্ত বোঝার গরজ নেই। টাকা ক'টি আঁচলের মুড়োয় গিঁট দিয়ে পরমানন্দে চলে গেল।

বাসায় ফিরে জগবন্ধু স্ত্রীকে বললেন, মাংস আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিতে বলছিলাম। দিয়েছ নাকি?

রাখহরি মা'র খাসি-চুরির বৃত্তান্তটা ইতিমধ্যে ভুবনেশ্বরীর কানেও পেঁছে গেছে। বললেন, ফেলিনি ভাগ্যিস। রেখে দিয়েছি, এইবার চাপাব।

জগবন্ধু কঠিন কণ্ঠে বললেন, না। খুঁড়ে মাটি চাপা দেব। কাক-কুকুরের মুখেও যেন না যায়।

আবার কি হল? ভুবনেশ্বরী অবাক হয়ে তাকিয়ে পড়লেনঃ সন্দেহ তো মিটে গেছে। ছাগলেরই মাংস—বুড়ির পোষা খাসির। পুরো খাসির দামও তুমি দিয়ে দিলে—

জগবন্ধু বললেন, ঠিক ঐ জন্যেই। এ যাত্রা জামাই মাংস খাবে না, মাংসের নামগন্ধও উঠবে না বাড়িতে। কাল কিম্বা পরশুও যদি তুমি মাংস রাঁধতে বসো, ওধারে ছোটবাবুরা থাকে—খবর চেপে রাখতে দেবে না। বলবে, বুড়ি হৈ-হৈ করে পড়েছিল বলে মাংস সাঁতলে সাঁতলে কদিন রেখে দিয়েছে।

এত করেও কিন্তু লোকের মুখ বন্ধ রইল না। পুঁইপাড়ার এক বেওয়া স্ত্রীলোক

মাঝে মাঝে ভুবনেশ্বরীর কাছে মজা-সুপুরি বেচতে আসে। তার মুখে ভুবনেশ্বরী প্রথম শুনতে পেলেন। পরে অন্যখানেও শুনলেন। রাখহরি পুঁই বলেছে, জগবন্ধু দারোগার জামাই এসেছে, খবর আগে টের পাইনি যে! মাকে তা হলে বলে দিতাম, রাঙিছাগল গোয়ালে না রেখে নিজের কাছে নিয়ে শোয়। ঘরের দুয়ারে হুড়কো দিয়ে সর্বক্ষণ যেন জেগে বসে থাকে। খবর পাইনি, সমঝে দিতে পারিনি—দারোগার ভুত-প্রেতগুলো খাসি নিয়ে ঠিক সেই জামাইয়ের ভোগে লাগাল।

রাখহরি পুঁই যাদের ভুতপ্রেত বলছে এবং ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য দাঁত্যদানো বলেছিলেন, অদৃশ্য থাকলেও নিতান্ত অজানা নেই তারা এখন। বেচা মল্লিকের দল বল। বেচারাম নাকি জাঁক করে বেড়াচ্ছে ঃ একদিন বাগানের এক কাঁদি মর্তমান-কলা পাঠিয়েছিলাম, কাঁদি ধরে উঠানে ছুঁড়ে দিল। এবারে যে গাঁয়ে গাঁয়ে পুকুর তোলপাড়, মানুষের গোয়ালে খাসি-পাঁঠা থাকবার জো নেই।

জগবন্ধু যত শোনেন, ততই অস্থির হয়ে উঠছেন। আহার-নিদ্রা বন্ধ হবার জোগাড়। ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করেন, মাছের দাম হিসাব করে সমস্ত মিটিয়ে দিয়েছেন?

আলবৎ!

প্রশ্ন করে শুনে নিতে হল, ক্ষুদিরাম সেজন্য মর্মাহত হয়েছে। বলে, টাকা-আনা-পাই পর্যন্ত হিসাব শোধ। এখন আর বলতে দোষ কি—বেচারামের নিজের হাত দিয়েই।

খাসির দামও আমি দিয়ে দিয়েছি। বুড়ি নিজ মুখে যা বলল, তারও কিছু বেশি ধরে দিলাম। সেই বেচারাম তবে আবার এসব রটায় কেন?

দুর্জন লোক, সাচ্চা কাজকর্ম বরদাস্ত করতে পারে না। এমনধারা বড় একটা দেখে না তো চোখে। কানেও শোনে না। আমাদের ভাঁটিঅঞ্চলে নিতান্ত আজব ব্যাপার।

আজকের দিনে হলে জগবন্ধু সজোরে সায় দিয়ে উঠতেন ঃ শুধু ভাঁটিঅঞ্চল কেন, যেখানে মানুষ আছে সেখানেই। কিন্তু সেদিনের সাধু-দারোগা আলাদা মানুষ। বিবেচনার ভুলে দুর্জনের নাগালের ভিতর গিয়ে পড়েছেন, মনে মনে শতেকবার সেজন্য কানমলা খাচ্ছেন। তুমিও ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য চিজটি বড় কম নও। যোগসাজস তোমার সঙ্গেও। জেলেদের সম্ভবত টিপে দিয়েছিলে—সারাদিন চেষ্টাচরিত্র করে জাল নিয়ে তারা ডাঙায় উঠল আমাকেই জালে আটকাবার জন্যে।

কিন্তু মনের এই কথা মুখে প্রকাশ করা চলে না। সৎপথে চলেন বলে দেশসুদ্ধ শত্রু। তার মধ্যে এই মানুষটা সুহৃদরূপে সামনে ঘোরাফেরা করে, তাকে বিগড়ে দিয়ে আরও একটা শত্রু বাড়ানো কাজের কথা নয়। সতর্কভাবে খোসামুদির সুরে জগবন্ধু বলেন, আপনার চোখ দুটোয় কিছুই এড়াবার জো নেই ভটচাজমশায়। মনের কথা বলি একটা। সারাক্ষণ সেই যে জাল বেয়ে একটি ঘেঁয়া-পুঁটি অবধি পড়ল না, হতে পারে জেলেদের শয়তানি। হতে পারে, ইচ্ছে করে ছেঁড়া জাল নামিয়েছিল। অথবা টানবার সময় জলে ভার বাঁধেনি, জাল উপরে ভাসিয়ে এনেছে।

কথা না পড়তে ক্ষুদিরাম ঘাড় নেড়ে বসে আছে ঃ সবই হতে পারে বড়বাবু। হতে পারে কি, নিশ্চয় তাই। বেচারাম কলকাঠি টিপছিল দূর থেকে।

হঠাৎ থেমে গিয়ে ভাবল একটুখানি। খাপছাড়া ভাবে বলে, তার দিকটাও দেখতে হবে বইকি! দোষ আমাদেরও বলাধিকারীমশায়। এতদূর আমরাই জমিয়ে তুলেছি।

বলাধিকারী অবাক হয়ে তাকিয়ে পড়লেন। ক্ষুদিরাম বলে, মাছের দাম যদি না দিতাম, খাসি মেরে তবে আর মাংস দিতে আসত না। মাংসের দামও দিয়েছেন, আবার কি এসে পড়ে দেখুন। যতবার ঘাঁটাঘাঁটি করবেন, ততবার একটি করে চাপান দিয়ে যাবে। থানার মালিক আপনি—আপনার মেয়েজামাই-এর নাম করে কিছু যদি দিয়ে যায়, আপনি তার দাম শোধ করতে ব্যস্ত। বেচারাম সেটা অপমান জ্ঞান করে। নতুন নয়, বরাবরের নিয়ম এই তার। অগস্তিসাহেবের মতো বাঘা ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘোল খাইয়েছে—নিতে হল তাঁকে বাধ্য হয়ে।

জগবন্ধু চমকে উঠে বললেন, ঘুস নিলেন অগস্তি?

বেচারাম বলে ভেট—যতক্ষণ তার রাগের কারণ না ঘটে। খুব মান্য করেই দেয়। আপনারা ঘুস মনে করলে সে কি করবে বলুন।

অগস্তিসাহেবকে যারা জানে, ঘুষ হোক, আর ভেটই হোক, সে দরবারে গিয়ে পেঁছেছে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। শীতকালে হাকিমরা তখন মফস্বলে গিয়ে তাঁবু ফেলতেন। খোদ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট থেকে বড়-মেজ-ছোট সকল রকমের হাকিম। শাসন-বিচার হত উকিল-মোক্তারের আরজির-সওয়াল বাদ দিয়ে। আমলারাও অনেকে যেত হাকিমের সহযাত্রী হয়ে। বড্ড মজা সেই দিনগুলো। আহারাদির নিত্য-নূতন রাজসূয়ো আয়োজন—এক পয়সা খরচা নেই সেই বাবদে। আশেপাশের যাবতীয় জমিদার-তালুকদার গাঁতিদার-চকদার সিধা পেঁছে দিয়ে যাচ্ছে সকাল-বিকাল। এই নিয়ে পাল্লাপাল্লি—অমুক এই সাইজের গলদাচিংড়ি দিয়ে গেছে তো অঞ্চল ঢুঁড়ে দেখ, তার চেয়ে বড় কোথায় মেলে। এমনি ব্যাপার। কোন আমলা এবারে কোন হাকিমের সঙ্গে যাবে, তাই নিয়ে দস্তুরমতো তদ্বির চলত সদরে।

বেচারামও বরাবর ভেট পাঠিয়ে আসছে। দুনিয়ার উপর এক কাঠা জায়গাজমি নাই, ইজ্জত তবু জমিদারেরই। তার আয়োজনই সকলের চেয়ে বিপুল। দুর্জন লোক বলে কেউ তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যায় না।

অগস্তি এলেন জেলার কর্তা হয়ে। বিষম নামডাক, বাঘে-গরুতে জল খায় তাঁর প্রতাপে। পৌষমাসে ফুলহাটার অনতিদূরে মাঠের মধ্যে তিনি তাঁবু ফেললেন। সদরের গোটা অফিসটাই যাচ্ছে—বড় তাঁবু ঘিরে পাঁচ-সাতটা ছোট তাঁবু।

যথানিয়মে বেচারামের সিধা গিয়ে পড়েছে। দূর-দূর—করে হাঁকিয়ে দিলেন অগস্তি। জিনিষপত্র কিনেকেটে এনে খাবে, রায়তের কাছ থেকে একটা দেশলাইয়ের কাঠি পর্যন্ত কারও নেওয়া চলবে না।

চারজন লোক গিয়েছিল, ফিরে এসে কাপ্তেনের সামনে ধামাঝুড়িগুলো নামাল। অবমানিত বেচারামের মুখের উপর দাউদাউ করে যেন আগুন জ্বলে। এলাকার মধ্যে বসে ভেট ফিরিয়ে দেয়—তার-ই চিরকালের অধিকারে হস্তক্ষেপ। হোক তাই কিনে-

কেটে এনেই খাওয়াদাওয়া করুক।

সরকারি লোক যে দোকানে যায়, মাল নেই। কাপ্তেনের সঙ্গে গণ্ডগোল—মাল বেচে কোন বিপদে পড়বে। সরিয়ে ফেলেছে। তিন ক্রোশ দূরের বড় গঞ্জ থেকে চাল-ডাল আনিয়ে তাঁবুর লোকের রান্নাবান্না হল। তিন-চার দিন চলে এই ভাবে, তারপর সেখানেও বন্ধ। পুরো একদিন শুধুমাত্র পুকুরের জল খেয়ে অগস্তি-সাহেব সদরে চলে যান। কী নাকি জরুরী ব্যাপার সেখানে, এস-ডি-ও আসছেন অগস্তির জায়গায়।

আমলারা ব্যাকুল হয়ে গিয়ে পড়েঃ আমাদের উপায় কি করে যাচ্ছেন হুজুর, কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করে জলে থাকব কেমন করে?

মেজাজ হারিয়ে অগস্তি খিঁচিয়ে ওঠেনঃ কে দিচ্ছে, তোমরা কে নিলে সদর থেকে আমি কি দেখতে আসব এখানে? খবরদার, আমার কানে কখনো যেন না পেঁছিয়! তাহলে রক্ষে রাখব না।

আমলারা চোখ তাকাতাকি করেঃ পথে এসো বাপধন। বেচারামও শুনল—আমলাদেরই কেউ গিয়ে বলে থাকবে। আগেরবার চারজনকে পাঠিয়েছিল, এবারে তার ডবল—আট জন। ধামা-ঝুড়ি মাথায় দিনদুপুরে হৈ-চৈ করে তারা ভেট নিয়ে চলল।

জগবন্ধু দারোগার ব্যাপার কিন্তু এই জায়গাটুকুর মধ্যে নয়, আরও বহুদূর গড়িয়েছে। সদর অবধি। ক্রমশ সেটা প্রকাশ পেতে লাগল সদরে। পুলিশসাহেবের কাছে বেনামি চিঠি যাচ্ছেঃ দারোগা পাইকারি হারে উৎকোচ লইতেছে, যত চোর-ডাকাত তাহার শিষ্যসাগরেদ, প্রজাসাধারণ বিপন্ন—

দুর্গম ভাঁটিঅঞ্চলে এটা নতুন ব্যাপার নয়। নিয়মই বরঞ্চ এই। দুর্জনদের হাতে রেখে খানিকটা তোয়াজ করেই কাজকর্ম চলে। ভাবখানা হল—তোমায় আমি বেশি ঘাঁটাব না, তুমিও উৎপাত বেশি করবে না। নিতান্ত নিয়মরক্ষায় যেটুকু লাগে—সরাসরি ইজ্জত এবং আইনকানুনের মর্যাদা মোটামুটি বজায় রাখবার মতো। এসব বৃত্তান্ত সদরে একেবারেই যে না পেঁছিয় এমন নয়। কিন্তু কেউ মাথা গলায় না। গলাতে গেলে সেই মাথা কাঁধ থেকে নেমে পড়ারই অধিক সম্ভাবনা। ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে জানিনে-জানিনে করে কাজকর্ম চলে যায়।

এবারে অভিনব ব্যাপার। চিঠির মারফত সবিস্তারে খবর আসছে। একটা চিঠি গুটিয়ে পাকিয়ে ঝুড়িতে ফেলতে না ফেলতে পুনশ্চ চিঠি। ধাপধাড়া জায়গাতেও পোস্টাপিস বসিয়ে সরকার এই সর্বনাশটি করিয়েছেন। এক পয়সা, খুব বেশি তো দুটো পয়সার মাশুলে খবর কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক চলে যায়। বেচা মল্লিকের কাজ নয়—সে এত লেখাজোখার ধার ধারে না। রঙ্গক্ষেত্রে অন্যেরা এসে পড়েছেন। ঝিনুকপোতার অনাদি সরকার জাতীয় লোকেরা।

—দারোগার জন্যই প্রজাদের ধনসম্পত্তি সহ বাস করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ জগবন্ধুর মেয়ের বিয়ের উল্লেখঃ শিষ্যসাগরেদ পাঠাইয়া একরাত্রে

এই অঞ্চলের যাবতীয় পুকুরের মাছ তুলিয়া আনিল। তাহাতেই দায় উদ্ধার হইল। মাছ চুরির এজাহার পড়িয়াছে, সেই তারিখের সহিত দারোগার কন্যার বিবাহের তারিখ মিলাইয়া দেখিলেই হুজুরের বোধগম্য হইবে। ইহার পর অধিক তদন্তের কি আবশ্যক থাকিতে পারে ?

ক্রুদ্ধ বেচা মল্লিকও এদিকে হৈ-চৈ লাগিয়েছে। হাঁকডাক করে বলছে, আধলা পয়সা ঘুস নেবে না বড় মুখ করে বলত। সেই মুখ রইল কোথা ? বলি কালী-দুর্গা কেষ্ট-মহাদেবের চেয়ে দারোগা কিছু বড়-দেবতা নয়। তাঁরা অবধি বিনা ঘুসে নড়ে বসে না—পুজোআচ্চা সিন্নি-মানত ঘুসেরই রকমফের। পুজো পেয়ে তুষ্ট হয়ে তবে একটা কাজ করে দেন। আর জগবন্ধু দারোগা, তোমার অত ডাঁট কিসের হে ? অবিশ্যি, পুজোর কায়দাটা বুঝে নিতে হয় ভাল করে—কি ফুলে কি মন্ত্রে কি রকম নৈবেদ্যে কোন দেবতার পুজো। বাঁধাধরা এক নিয়মে সকল পুজো হয় না। সংসারের যত-কিছু গণ্ডগোল ঠিক জায়গায় ঠিক পুজোটি বসাতে পারে না বলেই।

কাপ্তেনের হাসাহাসি নানা সূত্রে জগবন্ধুর কানে আসে। বাদার হরিণ মেরে ঝিনুকপোতা থানায় কোন মক্কেল দিয়ে গেছে। দারোগা অনাদি সরকার সেই উপলক্ষে জগবন্ধুকে আহারের নিমন্ত্রণ করলেন। খেতে খেতে তিনিও বললেন কথাটা। যথাযথ দরদ দিয়ে বললেন ঃ নোংরা কথাগুলো আপনার নাম ধরে বলে বটে, কিন্তু ঝোঁকটা সমগ্র পুলিস-সমাজের উপর এসে পড়ে। চুপচাপ থেকেই আসকারা পাচ্ছে, রীতিমত শাসন হওয়ার দরকার।

সহানুভূতি ও দুঃখে টগবগ করে ফুটছেন তিনি। কিন্তু জগবন্ধু লক্ষ্য করেছেন ঠোঁটের আড়ালে হাসিটুকু। হাসি যেন বলছে, কি হে ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠির, আমাদের কথা লোকে ঠারেঠোরে বলে, তোমায় নিয়ে যে জগঝম্প পেটাচ্ছে আকাশ-পাতাল জুড়ে।

ক্ষেপে যাচ্ছেন জগবন্ধু। ভালো থাকতে গিয়ে এই পরিণাম। ভালোকে মন্দের খোয়াড়ে ঢুকিয়ে দিয়ে তবে যেন মানুষের সোয়াস্তি।

ক্ষুদিরামকে একদিন বললেন, শুনেছেন ?

ক্ষুদিরাম বলে, রেখেঢেকে তো বলে না, কেন শুনব না ? এক্তিয়ারের মানুষ নয়, মুখে চাবি আঁটারও জো নেই।

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য সম্বন্ধেও জগবন্ধু ইতিমধ্যে অনেক জেনেছেন। পরগাছা বিশেষ—যে যখন দারোগা হয়ে থানায় আসে, তাকেই আঁকড়ে ধরে। এই থানায় আসার প্রথম দিনটা মনে পড়ে। জগবন্ধু এলেন, কালী বিশ্বাস কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছেন। ক্ষুদিরাম ঢুকবার পথে দাঁড়িয়ে সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করল। সে-ই যেন গৃহকর্তা, জগবন্ধু অতিথি। কালী বিশ্বাসের দিকে চেয়ে একটা সাধারণ বাক্যেরও কার্পণ্য তখন। নতুন দারোগার মনস্তুষ্টি হবে বলে কালী বিশ্বাসের ট্যারা চোখ নিয়ে রসিকতাও করে একটু ঃ বিশ্বাসমশায় তাকালেন চোরটার দিকে—চোর ভাবে, গাছের উপরের পাখি দেখছেন কথাবার্তাও তাই, ভাজেন ঝিঙে তো বলেন পটল। কালী বিশ্বাসের কানে না যায়, লজ্জিত জগবন্ধু তাড়াতাড়ি এটা-ওটা বলে কথা চাপা

দিলেন। অথচ জানা গেল, ঐ কালী বিশ্বাসের দিনেও ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য দারোগার প্রধান অমাত্য এবং সর্বকর্মে দক্ষিণহস্ত। টাকার জন্য করে, তা নয়। ক্ষুদিরামের বাড়ির অবস্থা ভালো, টাকার কোন স্পৃহা নেই। আরও একটা কথা সবাই বলে, মানুষটা বিশ্বাসঘাতক নয়। যাকে যখন সুহৃৎ বলে মেনে নেবে, প্রাণ ঢেলে দেবে তার কাজে। স্বভাবই এই রকম বিচিত্র।

এমনি ভাবে আর চলে না। জগবন্ধু ঠিক করলেন, ক্ষুদিরামের হাতের পুতুল না হয়ে কাপ্তেন বেচামল্লিককেই শাসন করবেন সোজাসুজি। এই প্রতিজ্ঞা। মুখে চাবি আঁটার জো নেই, ক্ষুদিরাম বলে। জেলের ঘরে চাবি এঁটেই বেচারামের মুখ বন্ধ করে দেবেন। সুযোগও চমৎকার জুটে গেল—দুঃসাহসিক ডাকাতি।

নয়

দুঃসাহসিক ডাকাতি। গাবতলির যে হাট দেখে এসেছি, তার অদূরে মাঝনদীর উপর। হাটবার, নদীর এপারে-ওপারে, হাজার হাজার হাট-ফিরতি মানুষ জড় হয়েছে। তারই মধ্যে সকলের চোখের উপর কাজ সমাধা করে সরে পড়ল—এত দক্ষতা আর এমন সাহস কাপ্তেন বেচারাম, নিতান্ত পক্ষে তার বাছাই শিষ্যসাগরেদ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব না। যে না সে-ই বলবে এই কথা।

মুশকিল হল, গাবতলি জায়গাটা জগবন্ধুর এলাকার মধ্যে পড়ে না। ঝিনুক-পোতার এলাকায়—অনাদি সরকার সেখানকার বড়-দারোগা। অনাদি উৎসাহ দেখাবে না, সেটা বেশ জানা আছে। ভয় করে বেচা মল্লিককে। তা ছাড়াও অন্যবিধ গোপন কারণ আছে অনুমান করা যায়।

গাঙের উপর জমিদারি কাছারি? কাছারির ঘাটে ডিঙিনৌকো বেঁধে জন দশেকের একটা দল নেমে পড়ল। অনেক দূর উত্তরের ডাঙাঅঞ্চলে ঘর তাদের, বাদাবনে চাক কাটতে গিয়েছিল। দুই ক্যানেস্তারা মধু পাইকারকে মেপে দিয়ে দেশে ফিরছে। নৌকোয় জলের কলসি একেবারে খালি, জলের অভাবে দুপুরে রাঁধাবাড়া হয়নি। তেষ্টার জলও নেই। রাজকাছারিতে এসে অতিথি হল তাই।

বলে, আপনাদের কোন দায় ঠেকাতে হবে না নায়েবমশায়। চাল-ডাল আনাজপত্তর সমস্ত নৌকায় আছে। গাছতলায় শুকনো ডালপালা দু-চার খানা কুড়িয়ে নেব। কাছারির মিঠে-জলের পুকুরের বড্ড নাম, ঐ জলের নামে উঠে পড়েছি। কোন একটু আচ্ছাদন দেখিয়ে দেন, খান আষ্টেক ইট সাজিয়ে উনুন বানিয়ে নিই। চাট্টি চাল ফুটিয়ে খেয়েই চলে যাচ্ছি আমরা।

এইটুকু প্রার্থনা না শোনার হেতু নেই। একেবারে গাঙের কিনারে চালাঘর, বাবুদের নিজস্ব হাঙরমুখো পালকিখানা থাকে যেখানে। সেই ঘরের এক প্রান্তে রান্না চাপিয়েছে। ভাত কেবল ফুটে উঠেছে—রান্নাবান্না ফেলে হুড়মুড়িয়ে সকলে ডিঙিতে

উঠে পড়ল। চক্ষের পলকে ডিঙি খুলে দেয়। ইটের উনুনে ভাত ফুটতে লাগল টগবগ করে।

গাঙের উপর সেই সময়টা বড় এক সাঙড়-নৌকা ধান-বোঝাই করে হাটে গিয়েছিল, ফিরে যাচ্ছে। এর অনেক পরে জগবন্ধু দারোগা নিজে কাছারিবাড়িতে এসেছিলেন। ঘটনার আদ্যোপান্ত স্বকর্ণে শুনবার জন্য। আত্মপরিচয় দেননি, কে না কে এসে পড়েছে। দারোয়ান রামকৃপাল গল্পটা বলল—মামলা উঠলে লোকটা আদালতেও সাক্ষি দিয়েছিল। চালাঘরে রান্না চাপিয়েছে, রামকৃপাল কলকের আগুন নিতে এসেছে তাদের উনুনে। সাঙড়-নৌকো দেখেই তড়াক করে উঠে সবসুদ্ধ ঘাটে ছুটেছে—

রামকৃপাল জিজ্ঞাসা করে, কি হল গো ?

দলের কর্তাব্যক্তিটি জবাব দিল ঐ নৌকোয় ব্যাপারি যাচ্ছে, মানুষটা অত্যন্ত পাজি। এক গাদা টাকা কর্জ নিয়ে পলাপালি খেলছে। কাল রাত্তির থেকে তক্কে-তক্কে আছি। পালাচ্ছে কি রকম, চেয়ে দেখ না—

কথা এই ক'টি—তাও কি শেষ করে বলল ! বলতে বলতে লম্ফ দিয়ে পড়ল ডিঙির উপর। ছয়খানা বোঠে ঝপঝপ করে পড়ে। আলগোছে জল ছুঁয়ে—কিম্বা জল একেবারে না ছুঁয়েই বাতাসে উড়ে চলছে বুঝি ডিঙি।

জগবন্ধু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেই কর্তা মানুষের চেহারা জিজ্ঞাসা করেন। লম্বা দশাসই জোয়ানপুরুষ কিনা ?—হ্যাঁ। উপর ঠোঁটে শ্বেতি আছে কিনা ? জবাবে রামকৃপাল একবার বলে হ্যাঁ, একবার বলে না। মোটের উপর প্রমাণ হয় না কিছুই। শ্বেতির দাগ থাকলেও বেচা মল্লিক হতে পারে। অনেক ছলাকলা ওদের ঠোঁটের সাদার উপর রং চাপিয়ে গাত্রবর্ণের সঙ্গে বেমালুম মিলিয়ে দিতে পারে। তা ছাড়া দশাসই লম্বা মানুষ বেছে বেছে নিয়েই তো দল, বেচা মল্লিক ছাড়াও দশাসই জোয়ানপুরুষ বিস্তর আছে। তবে কাজকর্মের ধারা দেখে প্রত্যয় আসে, কাপ্তেন বেচা স্বয়ং হাজির ছিল সেদিন ঐ ডিঙিতে।

এপার-ওপার দুপার দিয়েই হাটের ফেরত মানুষজন যাচ্ছে। হাজার দেড় হাজার মানুষ তো বটেই। চোখের সুমুখে এত বড় কাণ্ডটা চলেছে, পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে সব। সাঙড়ের কাছাকাছি হয়েছে ডিঙি, মাঝে তবু হাত দশেক ফাঁক। সবুর না মেনে—সে এক তাজ্জব কাণ্ড !—ডিঙি থেকে তিড়িং তিড়িং করে এরা সাঙড়ের উপর পড়ছে। বানরে যেমন এ-গাছ থেকে ও-গাছ লাফ দিয়ে পড়ে। কতক আগ-নৌকায়, কতক ছইয়ের উপরে, কতক বা পাছগলুয়ে। কী শিক্ষা গো বাবুমশায় ! পলকের মধ্যে ঘটে গেল, পাড়ের উপর আমরা থ হয়ে দাঁড়িয়ে।

ভর সন্ধ্যায় তোলপাড় পড়ে গেল। ফাঁকা নদীর উপর তখনো বেশ আলো, সুমুখজ্যোৎস্না বলে আলো বহুক্ষণ থাকবে। ডাঙার উপর থেকে সমস্ত স্পষ্ট দেখা যায়। রামকৃপাল দেখছে, সেই হাজার মানুষ চোখ মেলে দেখছে। ডাইনে বাঁয়ে ধাক্কা মেরে সাঙড়নৌকোর মাল্লাগুলোকে টপাটপ জলে ফেলে দিল। ডালের উপর উঠে এক-হাতে যেমন পেয়ারা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে সেইরকম। তারপরে আওয়াজ পাওয়া যায়, দমাদম কুড়াল মারছে ছইয়ের ভিতরে। ব্যাপারটা সঠিক বোঝা যায়নি

গোড়ায়। কেউ ভাবছে, কুড়াল পেড়ে নৌকোর কাঠে, নৌকো কেটে চেলা-চেলা করছে। কেউ ভাবে, মানুষের মাথায় পড়ছে—যে ক'জন আটকে পড়ছে, খুলি চুরমার করে দিচ্ছে তাদের। পরে আসল বৃত্তান্ত পাওয়া গেল। নৌকোর মধ্যে লোহার সিন্দুক—মোটা শিকলে গুড়োর সঙ্গে বাঁধা, ধানবিক্রির যাবতীয় টাকা সেই সিন্দুকে। লোহার উপর কুড়ুল মেরে মেরে শিকল কাটছে। সহজে কাটবার বস্তু নয়—দশ-বারো কোপ পড়ার পরে মুল-ব্যাপারি বলরাম সাঁই ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে। শিকল বুকে জড়িয়ে ধরে লম্বালম্বি হয়ে পড়ল তার উপর। পাড়ের মানুষ যা-ই ভাবুক, মানুষের মাথায় সত্যি সত্যি কুড়াল চালানো যায় না। বেচারাম লুঠেরা বটে, কিন্তু খুনি নয়। মানুষ খুন করা মহাপাপ ওদের নীতিশাস্ত্র মতে। কাজের মধ্যে দৈবাৎ খুন হয়ে গেলেও নিন্দে রটে যায় খুনি বলে, সমাজে সে অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে টাকাকড়ি সোনারুপো মানুষের অর্জিত বস্তু, খোয়া গেলে কোন-একদিন পূরণ হলেও হতে পারে। কিন্তু প্রাণ ফেরত আসে না। যে বস্তু দেবার ক্ষমতা নেই, তাই তুমি হরণ করবে কোন বিবেচনায় ?

বলরাম শিকল আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে তো কুড়াল ফেলে লাঠি ধরল এবার এরা। পিঠের উপর দমাদম মারছে। তিলেক নড়াচড়া নেই বলরামের—ধানের বস্তার উপর লাঠি পিটে ধুলো ঝাড়ছে যেন। এই ঘটনা পরে একদিন বেচারামই বলাধিকারীর কাছে বলেছিল। মার খেতে পারে বটে বলরাম লোকটা ! নির্বিকারে মার খাওয়া দেখে মনে হয় কুম্ভযোগ করে দেহের খোলে বাতাস পুরে ফেলেছে। ফুটবলের মতো। এত বড় তাগদ তো ধান বওয়াবয়ি করে মরে কেন ? শুধু এই গুনের জন্যই অনায়াসে তাকে কোন একটা দলে ঢুকিয়ে নেওয়া যায়। এইসব কথা মনে হয়েছিল তখন কাপ্তেন বেচা মল্লিকের।

নদীর উত্তর তীরে এদিকে রীতিমত সোরগোল পড়ে গেছে। যত হাটুরে নৌকো এই মুখো বেয়ে আসছে। হাটখোলা অবধি খবর হয়ে গেছে—সে ঘাট থেকে বিস্তর নৌকো খুলে দিয়েছে, দাঁড়-বোঠে বেয়ে সাঁ সাঁ করে ছুটেছে, এসে ঘিরে ধরবে। এতক্ষণে সাহস পেয়ে এ-পার ও-পারের অনেক বীরপুরুষ ঝপাঝপ জলে পড়ে সাঁতার কেটে এগোচ্ছে। সময় নেই, মুহূর্ত আর দেরি সইবে না—

বেচারাম কোন দিকে ছিল—মারে কিছু হয় না তো ছুটে এসে খ্যাচ করে শড়কি বসিয়ে দিল বলরাম ব্যাপারির হাতের চেটোয়। ফিনিক দিয়ে রক্ত ছোটে, শিকলের উপরের হাত আপনি আলগা হয়ে যায়। তখন আর কি ! শিকল চুরমার হয়ে গেছে, মরদেরা ধরাধরি করে সিন্দুক ডিঙিতে নিয়ে ফেলে। নৌকোর উপরে নিয়ে বেড়ায় বলে সিন্দুক আয়তনে ছোট। তবু ডিঙি কাত হয়ে জল উঠে গেল খানিক। কাজ হাসিল করে মরদেরাও লাফিয়ে পড়েছে। হাতে হাতে বৈঠা—ঝপাঝপ বৈঠা মেরে সকলের চোখের উপর ডিঙি ছুটে পালাচ্ছে।

পাড়ের মানুষ উদ্দাম হয়ে ধর্ ধর্ করে চেঁচায়। বোঠে-দাঁড়ের তাড়নায় আর সাঁতারু মানুষের দাপাদাপিতে জল তোলপাড়। বিশ-পঁচিশটা নৌকো এসে নানান দিকে ঘিরে ধরেছে। ফাঁকা নদী, আড়াল-আবরু নেই। দুই তীরে মানুষ গিজগিজ

করছে—ডাঙায় উঠতে হবে না যাদুমণিরা, যাবে কোন দিকে।

এমনি সময় দুড়ুম-দাড়াম—বন্দুকের দেওড়। বন্দুকও রয়েছে সঙ্গে। থাকবে তো বটেই। হাটের জনতার মুখোমুখি এসে কাজে নেমেছে, আয়োজনে খুঁত রেখে আসেনি। দেশি কামারের লোহা-পেটা বন্দুক, বুলেট হল জালের কাঠি। রাইফেল অবধি কত সময় হার খেয়ে যায়। পুলিস ধুন্দুমার লাগিয়েছে, তা সত্ত্বেও ভাঁটি অঞ্চলে এখনো এই বস্তু প্রচুর। মানুষ মারা নিয়ম নয়, তাই বলে বিপদের মুখে হাত বাড়িয়ে এসে ধরা দেবে এমন অহিংস প্রতিজ্ঞা নিয়েও বেরোয় না কেউ বাড়ি থেকে। যত নৌকা তাড়া করে এসেছে, বন্দুকের আওয়াজ পেয়ে দাঁড় তুলে দাঁড়াল। যারা সাঁতরে আসছিল, পাক খেয়ে উল্টো মুখো ঘুরল। পাড়ের মানুষ এত যে জকার দিচ্ছিল, নিঃশব্দ তারা এখন। যে যেদিকে পারে পালাচ্ছে, বন্দুক তাদের দিকে তাক করে না বসে। এক ফালি চাঁদ কখন আকাশে উঠে গেছে, নদীজল ঝিলমিল করছে। জ্যোৎস্নায় তরঙ্গ তুলে ডাকাতের ডিঙি পলকের মধ্যে অদৃশ্য।.

ধরিত্রীর শিরা-উপশিরার মতো গাঙ-খাল। খালেরই বা কত শাখা-প্রশাখা ধানক্ষেতের মধ্যে, পতিত জলা ও জঙ্গলের মধ্যে, মানুষের বসতির আনাচে-কানাচে। তারই কোন একটায় ঢুকে পড়েছে, আবার কি! ধরা অসম্ভব। ধরতে যাওয়াও গোয়ার্তুমি। কোথায় কোন অন্তরালে ওত পেতে আছে—যে-ই না কাছে গিয়েছে, দিল ঘাড়ে লাঠির বাড়ি। কিংবা শড়কির খোঁচা।

জগবন্ধু বলাধিকারী কাছারির দারোয়ান রামকৃপালের মুখ থেকে এই সমস্ত শুনে এসেছেন। কিন্তু ঘুণাক্ষরে কারো কাছে প্রকাশ করেন না। ক্ষুদিরামকে বাজিয়ে দেখছেন। কাছাকাছি এত বড় কাণ্ড হয়ে গেল, বহুদর্শী সুহৃদের পরামর্শ চাইছেন যেন তিনি ঃ কী করা যায় বলুন ভটচাজমশায়, আমাদের কি কর্তব্য ?

ক্ষুদিরাম সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে ফেলে দেয় ঃ একেবারে কিছু নয়—বেশ খানিকটা সর্ষের তেল নাকে ঢেলে ঘুমান। কী দরকার বলুন ব্রণ চুলকে ঘা করবার ? বুঝুকগে অনাদি-দারোগা, যার এলাকায় ঘটেছে।

জগবন্ধু জেদ ধরে বলেন, কপালক্রমে সুযোগ এসে গেছে, এ আমি ছাড়ব না। দলসুদ্ধ শিক্ষা দিয়ে দেব, অকথা-কুকথা রটানোর শোধ তুলব। যতই হোক, বিদেশি মানুষ আমি। আপনি অনেককাল ধরে আছেন, অঞ্চলের নাড়িনক্ষত্র সমস্ত জানা। আপনাকে সহায় হতে হবে, সেইজন্যে বলছি। অনাদি সরকারকে বিশ্বাস করা যায় না, কেস গোলমাল করে দিতে পারে। নির্ঘাৎ সেই চেষ্টা করবে। যাতে না পারে, আমাদের দেখতে হবে সেটা।

ক্ষুদিরাম বলে, সেটা হবে কিন্তু বিড়াল কাঁধে নিয়ে ইঁদুর-শিকারের মতো। বিড়াল ঠেকাতেই জ্বালাতন হয়ে উঠবেন। দরকারটা কি, বুঝিনে। বেচা মল্লিক রেগে গিয়ে এটা-ওটা হয়তো বলছে, কিন্তু মানুষটা আসলে খারাপ নয়। মন বড় দরাজ। মেয়ের বিয়ের দিন তার কিছু পরিচয় দেখলেন। আমি গিয়ে শরণ নিলাম,

লোকজন লাগিয়ে রাত্তিরবেলা দায় উদ্ধার করে দিয়ে গেল। রাজাবাদশার মেজাজ। আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথাও শুনুন তবে।

ক্ষুদিরাম তখন খুলনা শহরে। গ্রাম ছেড়ে শহরের উপর আস্তানা নিতে বাধ্য হয়েছে। বাপ চেষ্টাচরিত্র করে আদালতের সেরেস্তায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। চাকরি করে, আর সকাল-সন্ধ্যা জ্যোতিষের চর্চা করে। নামও হয়েছে কিছু। শোনা গেল, কাপ্তেন বেচা মল্লিক কী একটা কাজে খুলনায় এসেছে।

ক্ষুদিরামেরই এক মক্কেল খবরটা এনে দিল। অনেক দিন থেকেই মল্লিকের কাছে যাবার ইচ্ছা। সুযোগ পেয়ে ক্ষুদিরাম তার বাসায় গিয়ে পড়ল।

কপাল-ভরা চন্দন, নগ্ন দেহে ধবধবে সুস্পষ্ট উপবীত। একজনে পরিচয় বলে দিল, সামুদ্রিকাচার্যমশায়—

বেচা মল্লিক তাড়াতাড়ি পদধূলি নেয়। জিনের কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ভাঁজ-করা নোট একখানা ক্ষুদিরামের হাতে দিল ঃ

ক্ষুদিরাম তটস্থ হয়ে বলে, এ কী! টাকার জন্য আসিনি আপনার কাছে।

বেচা মল্লিক বলে, ব্রাহ্মণের পায়ে শুখো প্রণাম চলে না। নিয়ে নিন, ফেরত দেবেন না।

দেবদ্বিজে ভক্তিমান, সন্দেহ নেই। কিন্তু শেষ কথাটুকু অনুনয় কি তর্জন বোঝা যায় না। নোটখানা ক্ষুদিরাম ভয়ে ভয়ে গাঁটে গুঁজে ফেলল।

বাড়ি ফিরে দেখে এক-শ টাকার নম্বরি নোট (এক-শ টাকার তখন অনেক দাম, এখনকার সঙ্গে তুলনা করবেন না)। ভুল করে দিয়েছে নিশ্চয়। হন্তদন্ত হয়ে ক্ষুদিরাম আবার ছুটল।

বেচা মল্লিক দেখে বলে, কম হল এবারে, তা জানি। এর পরে এসে উপযুক্ত মর্যাদা দেবো। হাতও দেখাব তখন।

কম কি বলছেন? নোট এক-শ টাকার।

তাই নাকি? দু-পকেটে দুই রকমের নোট। বড়খানা তবে আপনাকে দিয়ে দিয়েছি। অসুবিধা হবে খুব—কিছু কেনাকাটার গরজ ছিল, এবারে আর হবে না।

ক্ষুদিরাম বলে, নোট ফেরত দিতে এসেছি। ছোট যা আছে, তাই না হয় একটা দিয়ে দিন আমায়।

আপনার অদৃষ্টে গেছে। একবার হাত থেকে বেরুলে মল্লিক সে জিনিস আর ছোঁয় না। বাড়ি চলে যান ঠাকুর, ভ্যানর-ভ্যানর করবেন না।

সেই উগ্র কণ্ঠ। ক্ষুদিরাম তাড়াতাড়ি সরে পড়ে।

বলাধিকারীকে বলছে, মল্লিক লোকটার মনে যেন আলাদা আলাদা দুই কুঠুরি। ভালোয় মন্দয় মিশাল সাধারণ দশজনার মতো সে নয়। ভালো যখন, অতখানি ভালো কেউ হয় না। অশ্বত্থের মতো ছায়া দিয়ে রাখবে, গায়ে আঁচ পড়তে দেবে না। মন্দ হল তো আসল কালকেউটে। মেরে একেবারে সাবাড় করতে পারেন তো

করুন। খুব ভালো সেটা, লোকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। কিন্তু খবরদার, ঘাঁটা দিয়ে রাখবেন না। আপনি আমায় ভালবাসেন বড়বাবু, মা-ঠাকরুনও বিশেষ খাতির করেন। সকলের মুখ চেয়ে মানা করছি।

কথাটা মনে ধরেনি, বলাধিকারীর মুখ দেখে বলা যায়। ক্ষুদিরাম নিশ্বাস ফেলে বলে, আপনাকে আমি কি বুদ্ধি দিতে পারি! পূর্বাপর দেখুন সমস্ত ভেবে। যা করবেন সাথেসঙ্গে আছি, কেনা-গোলাম বিবেচনা করবেন আমায়।

জগবন্ধু যত ভাবছেন, জেদ আরও চেপে যাচ্ছে। আর একটা খবর বলেননি ক্ষুদিরামের কাছে। কারো কাছে প্রকাশ করে বলবার নয়। এমন কি ভুবনেশ্বরীর কাছেও বলতে ইচ্ছে করে না। সদরে ডি-এস-পি ও এস-পি'র কাছে বিস্তর বেনামি চিঠি গেছে তাঁর বিরুদ্ধে—এসব পুরানো কথা। এখন জানা গেল, কলকাতায় ইন্সপেক্টর-জেনারেল অবধি চলে গেছে চিঠি। যদু-মধুর দ্বারা এত দূর হয় না, দস্তুরমতো পাকা লোক পিছনে। ঝিনুকপোতার অনাদি সরকারই সম্ভবত। এতকাল মনের আনন্দে এক-একটা থানা সরোবরে হংস হয়ে মৃণাল তুলে খেয়ে এসেছে, দলের ভিতর একটা বক এসে পড়ে বাঁধা-নিয়মের ভণ্ডুল ঘটিয়ে দিল। জগবন্ধু বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছেন, এনকোয়ারির তোড়জোড় হচ্ছে ঐসব চিঠির অভিযোগ সম্পর্কে। সেই অবধি যদি গড়ায়, ফল যে রকমই হোক—মান-প্রতিপত্তি আর ধর্মপথের অহঙ্কার নিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে পারবেন না আর তিনি। উপরওয়ালার সন্দেহ অঙ্কুরে বিনাশ করবেন বেচা মল্লিককে জেলে পুরে। মেয়ের বিয়ের সময় যে ভুল করেছেন, সেই কলঙ্ক ধুয়েমুছে যাবে। অদৃষ্ট সুযোগ করে দিয়েছে এই সঙ্গিন সময়টায়। এ সুযোগ নষ্ট হতে দেবেন না।

আরও একটা জিনিস বেরিয়ে পড়ল। গাবতলি জায়গাটা ঝিনুকপোতার বটে, কিন্তু বলরাম ব্যাপারির বাড়ি জগবন্ধুর এলাকার মধ্যে পড়ে। পথঘাটের খোঁজ নেওয়া হল। অতিশয় দুর্গম গ্রাম—দূরও বটে। গাঙ-খাল নেই যে নৌকা চেপে যাবেন। ডাঙার পথও নেই। ধান কেটে-নেওয়া দিকচিহ্নহীন ক্ষেত—ক্ষেতের সরু আলপথ এবং খানিকটা বা গরু-চলাচলের পথ ধরে বিস্তর কষ্টে যেতে হয়।

বলরামের পাত্তা নেই সেই ঘটনার পর থেকে। ফেরারি। সাঙড়-নৌকো মাঝি বিহনে ভাসতে ভাসতে বাঁকের মুখে চড়ার উপর উঠে গেছে, পাটার উপর বলরাম আহত হাত চেপে ধরে আর্তনাদ করছে, এমনি সময় হাট-ফিরতি কোন এক আত্মীয়জন দেখতে পেয়ে তাকে নৌকায় তুলে নিয়ে চলে গেল। হাঙ্গামা চুকেবুকে যাওয়ার পর জমিদারি-কাছারি পাইক-বরকন্দাজ নৌকার খোঁজ করে কাছারির নিচে এনে নোঙর করে রাখল। পরের দিন ঝিনুকমারির ছোটবাবু এবং সিপাহিরা তদন্তে এসে মাল্লা একটিকে পেয়ে গেল। কিন্তু আসল জন—বলরাম ব্যাপারিই গায়েব। ডাকাতি তার উপরে যেন হয়নি, সে-ই যেন ডাকাত।

তা-ও ঠিক নয়। ডাকাত এসে একদফা লুঠেপুটে নিয়ে গেছে, তার উপরে আবার দ্বিতীয় দফা ডাকাতির আতঙ্ক। থানা-পুলিস অনেক বড় ডাকাত, বেচা মল্লিক কোথায় লাগে! ডাকাতির পদ্ধতিটা কিছু স্বতন্ত্র। যে মাল্লাটাকে পেয়ে গেছে, খোদ অনাদি

সরকার সমারোহে চলে গেলেন তার বাড়ি। ঘোড়ার পিঠে গিয়েছিলেন। ঘোড়ার খোরাকি সহিসের খরচা সিপাহির বারবরদারি এবং বড়বাবুর প্রণামি—একগণ্ডা হাঁস বিক্রি করে দায় মেটাতে হল। একটা দিনেই শেষ হল না, চলবে তো এই এখন। ভিটেমাটি বন্ধক পড়বার গতিক। সামান্য এক মাল্লামানুষ নিয়ে এই, মূল-ব্যাপারিকে পেয়ে গেলে কী কাণ্ড করবে ভেবে হৃৎকম্প হয়। টাকাকড়ি গেছে—ব্যবসায়-বাণিজ্য করে সামলে উঠবে হয়তো একদিন। হাতখানা জখম হয়ে গেছে, তা-ও সারবে। কিন্তু পুলিসের কবলে পড়লে যা-কিছু আছে সে তো যাবেই, তার উপরে কাজকর্ম ছেড়ে থানা-আদালত করে বেড়াও কমপক্ষে এখন দুটি বছর। একলা বলরাম ব্যাপারি নয়, অঞ্চলের যাবতীয় মানুষের মোটামুটি মনোভাব এই। চাপাচাপি কর তো যমালয়ে যেতে রাজি আছে, থানার পথে কদাপি নয়।

জগবন্ধুরও জেদ চেপেছে। চুপিচুপি বলরামের গাঁয়ে চললেন। সঙ্গে ক্ষুদিরাম ও দুটি কনেস্টবল। সামান্য সাধারণ লোক যেন, সাদা পোশাক সকলের। ঘোড়া নিলেন না—ঘোড়ায় চেপে দারোগাবাবু চলেছেন, সাড়া পড়ে যাবে। মড়ক লাগলে যেমন হয়, মুখে মুখে ছুটবে দুঃসংবাদ। বলরাম যেখানেই থাক, টের পেয়ে সতর্ক হয়ে যাবে।

কত কষ্টে যে পেঁছিলেন, সে জানেন জগবন্ধু দারোগা আর তাঁর অন্তর্যামী। কনেস্টবল দুটো দীঘির পাড়ে ঘাসের উপর ক্লান্তিতে শুয়ে পড়লো। ক্ষুদিরামের কাঁধে লাঠি। লাঠির মাথায় তালি-দেওয়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ। আজেবাজে খাতা ও ছাপা কাগজপত্র সেই ব্যাগে। গ্রামে এসে বলরামের বাড়িরও খোঁজ হয়েছে। দুজনে ঢুকে পড়লেন।

বলরাম সাঁইয়ের বাড়ি এটা ?

একটি লোক ছুটে এসে করজোড়ে দাঁড়াল। পরিচয় পাওয়া গেল, সম্পর্কে বলরামের মামা।

কিছুদিন আগে সেটেলমেণ্টের মাপজোক হয়ে গেছে। ক্ষুদিরামের কাঁধের ব্যাগ খুলে কিছু কাগজপত্র নেড়েচেড়ে জগবন্ধু বললেন, জরিপের লোক আমরা, বলরাম সাঁইয়ের খোঁজে এসেছি। তোমায় দিয়ে হবে না তো মাতুল মশায়, বলরামকে ডাকো। তার কাছে দরকার।

মামা বলে, কোথায় বলরাম, আমরা কেউ জানি নে। তাকে পাওয়া যাবে না।

একটা ছাপা কাগজ তুলে নিয়ে পেন্সিলের টানে জগবন্ধু খচখচ করে কয়েক ছত্র কাটলেন। লিখলেনও কি খানিকটা। মামা উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। জগবন্ধুই বলে দিলেন, পর্চা থেকে নাম কাটা গেল। কেউ তোমরা ক্ষেতখামারে যাবে না। ধান যা আছে, মলে ডলে জমিদারি-কাছারির গোলাজাত হয়ে থাকুক। বুজরাতের আগে বোঝাপড়া হবে না।

বাড়ির বাচ্চাগুলো অবধি ঘিরে দাঁড়িয়েছে। স্ত্রীলোকেরা অন্তরালে। মামা বলে, কেন, আমাদের ধান কাছারির গোলায় কি জন্যে উঠবে ? জমির খাজনা-সেস হাল সন অবধি শোধ। ধারদেনা ভাগ্নে আমার বরদাস্ত করতে পারে না।

জগবন্ধু বলেন, সে বুঝলাম, কিন্তু ভাগেই তো ফোত। আমাদের আপিসে খবর হল, ডাকাতে কেটে দুই খণ্ড করে গাঙের জলে ফেলে দিয়েছে। তদন্তে এসেও তাই দেখছি। পর্চার নাম না কেটে কি করি। জমির ধান আপাতত উপরের মালিকের জিম্মায় থাকবে। ওয়ারিশান সাব্যস্ত হয়ে কাগজপত্রের সংশোধন হোক, তারপরে জমির দখল।

চাষা-মানুষের জমি তো দেহের অঙ্গ। ভিতরে যারা উৎকর্ণ হয়ে আছে, ছটফটানি লেগে গেছে তাদের মধ্যেও। একবার সেদিক থেকে ঘুরে এসে মামা সকাতরে বলে, ভুল:খবর পেয়ে এসেছেন বাবুমশায়রা। কাছারি থেকেই রটাচ্ছে হয়তো। ভাগে আমার আছে।

জগবন্ধু গম্ভীর হয়ে বলেন, দেখাও তবে। স্বচক্ষে না দেখা পর্যন্ত রায় উল্টাতে পারি নে।

মামা ছুটোছুটি করে দুখানা জলচৌকি এনে দিল। বলে, যাবেন না হুজুরগণ, একটুখানি বসুন।

জগবন্ধু স্মিতদৃষ্টিতে ক্ষুদিরামের দিকে চেয়ে ফিসফিসিয়ে বলেন, অষুধ ধরেছে। কি বলেন ভটচাজ?

ক্ষুদিরাম বলে, গেল তো গেল, ফেরবার নাম নেই।

শলাপরামর্শ হচ্ছে সকলের সঙ্গে। বিচার-বিবেচনা হচ্ছে। দেরি বলেই ভরসা। এক কথায় কেটে দেবার হলে তাড়াতাড়ি ফিরত।

ঠিক তাই। ফিরে এসে মামা লোকটা আমতা আমতা করে: থানায় টের পাবে না তো হুজুর?

জগবন্ধু সাহস দিচ্ছেন: কি আশ্চর্য! তোমরা ভাবো সরকারি লোক হলেই বুঝি এক-দেহ এক-দিল? ঠিক উল্টো। সরকারের হাজার-লাখো ডিপার্টমেণ্ট—আদায়-কাঁচকলায় পরস্পর। ঘুস খেয়ে খেয়ে থানার ইঁদুরগুলোর অবধি ঐরাবতের সাইজ। ওদের উপর টেক্কা মারব বলেই তো এসেছি। আমাদের কাগজপত্র নির্ভুল হয়ে থাক, আর থানাওয়ালারা বেকুব হোক, অপদার্থ বলে বদনাম রটুক, সেইটেই তো চাচ্ছি আমরা।

বিস্তর বলাবলি এবং বহু রকমের প্রতিশ্রুতির পর মামা বলে, আসুন তবে হুজুরগণ। এ বাড়ি নেই, খানিকটা দূর হবে—

পাড়ার মধ্যেও নয়—ভিন্ন পাড়ায় একজনের গোয়ালঘরে কাঠকুটো রাখার মাচা, তার উপরে বলরাম গুটিসুটি হয়ে পড়ে আছে। পাড়াগাঁয়ে চলিত পাতা-মুঠোর চিকিৎসা—নানা রকম পাতা ও শিকড় বাকড় বেটে ঘায়ের উপর লাগিয়ে ন্যাকড়া বেঁধে রেখেছে। এ চিকিৎসায় সারে না যে এমন নয়—

জগবন্ধু অমায়িক সুরে প্রশ্ন করেন, কেমন আছ বলরাম? হাত সারল ভাল করে?

গায়ে জ্বর খুব। ন্যাকড়া খুলে ঘায়ের অবস্থাও দেখলেন। দেখে শিউরে ওঠেন: কী সর্বনাশ! হাসপাতালে না গিয়ে বড় অন্যায় করেছ বলরাম। এক

পয়সা তো খরচা নেই। সরকার হাসপাতাল বানিয়ে দিয়েছে লোকে যাতে মাংনা চিকিচ্ছে পায়।

ন্যাকড়া তুলতে গিয়ে কিছু আঘাত লেগে থাকবে। বলরাম উঃ-আঃ—করছে। জবাবটা মামাই দিয়ে দেয়ঃ ঘা চিকিচ্ছে হয়ে তারপরে কি বাড়ি ফিরতে দিত হুজুর? থানা-পুলিশ হাকিম-আদালতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মেরে ফেলত। হাতের যন্ত্রনার চেয়ে ঢের ঢের বেশি যন্ত্রনা। গেরোর ফের—নয়তো ভালমানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য করে বড়দলের বন্দরে ফিরছে, পথের মাঝে এমনধারা হতে যাবে কেন?

ক্ষুদিরাম ইতিমধ্যে সরে পড়েছে। বন্দোবস্ত তাই। ক্লান্ত সেই দুই পথিক দীঘির ধারে পুঁটলি মাথায় শুয়ে ছিল, তড়াক করে উঠে পুঁটলি খুলে পাগড়ি-পোশাক পরে দস্তুরমতো কনেস্টবল। ক্ষুদিরামের পিছন পিছন হুড়মুড় করে সেই গোয়ালঘরে তারা ঢুকে পড়ল।

মামা বলছে, ডাকাতের হাতে সর্বস্ব খুইয়ে এক অঙ্গে জখম নিয়ে ফিরে এল, এর পর আবার যদি পুলিসের হাতে পড়ে প্রাণটুকুও থাকবে না। পুলিসে না টের পায় সেইটে দয়া করবেন হুজুর।

জগবন্ধু এইবার আত্মপ্রকাশ করলেনঃ আমিই পুলিস। প্রমাণ-স্বরূপ কনেস্টবল দুটিকে দেখিয়ে দিলেন। ভাগ্নে ও মামা যুগপৎ আর্তনাদ করে উঠল, নৌকোয় ডাকাত পড়বার সময় যেমনধারা করেছিল। দ্বিতীয় আক্রমণ এবার।

মামা সাঁ করে ছুটে বেরিয়েছে। বলরামও নেমে পড়ল মাচা থেকে। জখমি হাতটা অন্য হাতে চেপে ধরে জগবন্ধুর পায়ে মাথা কুটছেঃ বড়বাবু আমায় রক্ষে করুন। আপনি ধর্মবাপ।

জগবন্ধু কিছুতে শান্ত করতে পারেন না। এমনি সময় মামাও ঢুকে পড়ে পায়ের উপর দণ্ডবৎ। হকচকিয়ে গেলেন জগবন্ধু। উঠে পড়তে দেখা গেল পাঁচটা রুপোর টাকা পদতলে সাজানো রয়েছে।

জগবন্ধু ভ্রূকুটি করলেনঃ কী এ সব?

এই নিয়ে ক্ষমা দিয়ে যান। ভাগ্নে হাসপাতালে যাবে না বড়বাবু, এমনি এমনি ভাল হয়ে যাবে।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে জগবন্ধু টাকা তুলে ছুঁড়ে দিলেন তার গায়ে। ব্যাকুল হয়ে মামা দিব্যিদিশেলা করেঃ এই পাঁচের উপর যদি আধেলা পয়সাও ঘরে থাকে তো বাপের হাড়। বাপের নাম নিয়ে দিব্যি করলাম বড়বাবু, বিশ্বাস করুন। কড়ার রইল, আরও পাঁচটা টাকা শ্রীচরণে নিবেদন করে আসব। এই মাসের ভিতরেই। কথার যদি খেলাপ হয়, মাস অন্তে শুধু ভাগ্নে কেন আমায় অবধি হাতে-দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবেন। ফাটকে হোক, হাসপাতালে হোক যেখানে খুশি পুরে দেবেন—কথাটি বলব না।

জগবন্ধু কঠিন হয়ে বললেন, লক্ষ টাকা গণে দিলেও হবে না। শত্রুরা যাই রটাক, লোভ দেখিয়ে আমায় কেউ সত্যপথ থেকে টলাতে পারবে না। কথা দিচ্ছি, এতটুকু ঝামেলা পোহাতে হবে না তোমাদের, একটি পয়সা খরচ হবে না। সরকার

সমস্ত দেবে ; তার বাইরে যদি কিছু লাগে, আমি দেব নিজের পকেট থেকে। হাসপাতালের বড়-ডাক্তার চিকিচ্ছে করবে, তাজা মানুষ হয়ে ড্যাং-ড্যাং করে ফিরবে বলরাম। আর বেচা মল্লিকের কাপ্তেনি ঘুচিয়ে নাকে-খত দেওয়াব, এই আমার প্রতিজ্ঞা। লোকের হাড় জুড়োবে। যা করবার, আমরাই সব করব সরকারের তরফ থেকে,—তুমি শুধু সাক্ষি দিয়ে আসবে বলরাম। প্রধান সাক্ষি বলরাম সাঁই। একটি কথাও মিথ্যে বলতে হবে না, গড়েপিটে সাক্ষি বানাতে আমি দিইনে। সত্যি সত্যি যা ঘটেছিল, সেই কথা কটা বলে তুমি খালাস।

মাপ হল না কিছুতে। বাড়িতে মড়াকান্না পড়ে গেল। ডুলিতে তুলে দুই পাশে দুই সিপাহি দিয়ে বলরামকে খুলনা সদরের হাসপাতালে নিয়ে চলল।

জগবন্ধুর জেদ চেপে গেছে। মামলার তদ্বির ষোলআনা নিজের হাতে রেখেছেন। আদালতের দেয়ালের টিকটিকিটা অবধি হাঁ করে আছে, যথোচিত বন্দোবস্তে হাঁ বন্ধ হয়ে গেলে মামলা ফাঁসাতে উঠে পড়ে লাগে। সে সুযোগ হতে দেবেন না বলাধিকারী। সরকার বাদি, সেজন্য পাবলিক-প্রসিকিউটার আছেন। অধিক সতর্কতা হিসাবে ঝানু মোক্তার হারাধন হালদারকে বলরামের তরফে মোক্তারনামা দেওয়া হল। সে খরচা জগবন্ধু যোগাচ্ছেন। প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন, বেচারামকে অঞ্চল-ছাড়া করবেনই এবার, অসৎ কাজে চিরকালের জন্য যাতে ইস্তফা দেয় তাই করে ছাড়বেন।

এই হারাধন মোক্তারের বাসায় কাজলীবালাকে পেলেন। সে এক স্বতন্ত্র গল্প। ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করে হারাধন বলেন, পুরানো ঝি ফিরে এসেছে—বাড়তি এটাকে কদ্দিন বইতে পারি বলুন। ছুড়ে ফেলে দিলে কে ঠেকায়—কিন্তু আমার ন্যায্য পাওনাগণ্ডাও তো সেই সঙ্গে বরবাদ। যাবেই বা কোথা, বয়সটা খারাপ হয়ে মুশকিল হয়েছে। হতভাগী ইচ্ছে করে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছে। এক একটা মানুষ থাকে এই রকম সৃষ্টিছাড়া।

গল্পটা এগুচ্ছে। আর জগবন্ধু একবার পান একবার জল একবার বা তামাক—এমনি সব ফরমাস করছেন। কাজলীবালা সামনে আসুক এই সমস্ত কাজে। আসছেও তাই। জগবন্ধু সেই সময় বারবার তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করেন। কুদর্শন নিরক্ষর এই মেয়ে কালোকোলো রোগা দেহটার মধ্যে এত তেজ কেমন করে ধরে রেখেছে, তাই যেন নিরিখ করে চোখে দেখতে চান। বাইরের চেহারায় চিহ্ন মেলে না, তাই এমন বারম্বার ডাকছেন।

মোক্তারমশায় বলছেন, এক একটা মানুষ এই রকম, গোঁয়ার্তুমি করে আখের নষ্ট করে। নিজের হিত বোঝে না। এ-ও বোধ হয় পাগলামির মধ্যে পড়ে। পাগলের ডাক্তার আছেন এ শহরে, তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করে দেখতে হবে।

হারাধন চোখ তুলে এক একবার জগবন্ধুকে দেখছেন। তাঁকেও বুঝি ঐ পাগলের দলে ফেলতে চান। সেটা খুব মিথ্যা হবে না। কাজলীবালা পাগল হলে তিনিও তাই। এত কালে সত্যি সত্যি একটা দলের মানুষ পাওয়া গেল, মনে হচ্ছে।

কাজলীবালার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু বরে নেয় না। একবার গিয়ে পড়ে ঝগড়াঝাটি

করে চলে এসেছে। বাইরের এক মেয়েলোক সেই সংসারের কর্তা। কাজলীবালা মরে গেলেও যাবে না আর সেখানে। খুলনায়, ঠিক শহরের উপরে নয়—পার্শ্ববর্তী গাঁয়ে বোন-ভগ্নিপতি থাকে, তাদের কাছে রয়েছে। ভগ্নিপতি ঘরামির কাজ করে। বোনও লোকের বাড়ি গাই দোয় ধান ভানে চিঁড়ে কোটে, যখন যেটা দরকার পড়ে করে দেয়। কষ্টের সংসার চলে এমনি ভাবে। কাজলীবালাও বসে থাকবার মেয়ে নয়—বোনের ছেলেপুলেগুলোর ভার নিয়েছে, আবার বোনের সঙ্গে জুড়িদার হয়ে বাইরের কাজেও যায়।

সেকালে বিস্তর নিমকির কারখানা ছিল ভাঁটি অঞ্চলে। ভৈরবনদের অসংখ্য বাঁক ঘুরে নুনের নৌকোর খুলনায় পেঁছিতে অনেক সময় লেগে যেত। সেই জন্য, শোনা যায়, রূপ সাহা নামে এক সওদাগর অনেক অর্থব্যয়ে খাল কেটে সোজাসুজি ভৈরবে এনে মিশিয়ে দিলেন। কেটেছিলেন সরু এক খাল—কিন্তু জলস্রোত সোজা পথ পেয়ে ধেয়ে চলল, ভৈরব এদিকটা মজে এল ক্রমশ। সেই খাল আজ বিশাল এক নদী, এ-পার ও-পার দেখা দুষ্কর। কীর্তিমান রূপ সাহার নামে রূপসা এ নদীর নাম।

রূপসা যেখানটা ভৈরবে এসে মিশল সেই সংগমের উপর প্রাচীন প্রকাণ্ড বাগান একটা। বাগানের ভিতর লম্বা-চওড়ায় সমান মাপের চৌকো পুকুর—পুকুরের ঠিক মাঝখানটায় জলটুঙি অর্থাৎ পাকাদালান জলের উপরে। সাঁকো বেয়ে জলটুঙিতে যেতে হয়। শৌখিন বাগান ছিল, এখন কিছু নেই, গাছপালা কেটেকুটে নিয়ে গেছে—পরিত্যক্ত নির্জন জায়গা। পাড় ভেঙে ভেঙে পুকুরও এখন রূপসার সংগে এক হয়ে গেছে—জোয়ারে টইটম্বুর, ভাটায় কাদা বেরিয়ে পড়ে—এখানে ওখানে অল্পসল্প জল। বাসা থেকে সামান্য দূরে জায়গাটা—পুকুরের আটকা জলে কাজলী-বালা মাছের সন্ধান পেয়েছে। ফ্যাসা-চাঁদা-কুচো-চিংড়ি জাতীয় সামান্য মাছ। ভাঁটার শেষে বোনের ছেলেটাকে নিয়ে চলে যায় পুকুরে। মাসি আর বোনপো কাদা ভেঙে ভেঙে গামছা ছাকনা দেয়।

এক সকালবেলা গিয়েছে অমনি। জলটুঙির সাঁকোর ধারে কী একটা বস্তু চকচক করছে—তুলে নিল ছোঁ মেরে। গয়না একটা গলায় পরবার। নেকলেশ এর নাম, পরে জানা গেল।

হাতের মুঠোয় নিয়ে চলেছে সুঁড়িপথ ধরে। এদিকে সেদিকে চালাঘরে ভাড়াটে পরিবার—খাস শহরের উপর থাকবার সংগতি নেই; সেই সব লোক একটাকা দু-টাকা ভাড়ায় এই অঞ্চলে থাকে। যাচ্ছে কাজলীবালা ও বোনপো—এক ঘরের গিন্নি ডাকলেন, কাজলী নাকি। শোন, কাল তোরা এসে ঘরের ডোয়া গেঁথে দিয়ে যাবি, এলি না কেন রে ?

কাজলী বলে, দিদি চিঁড়ে কুটতে গিয়েছিল রায়বাহাদুরদের বাড়ি। ধান ভিজিয়ে ফেলেছিল তারা, চাকর পাঠিয়ে ধরে নিয়ে গেল।

গিন্নি—ফুঁশিঠাকরুন বলে সবাই—করকর করে ওঠেন: আমরা বুঝি মাংনা খাটাতাম রে! আজকে আসবি, অবিশ্যি করে কিন্তু আসবি। বলবি গিয়ে তোর বোনকে—। হাতের মুঠোয় কি রে কাজলী ? দেখি, দেখি—বাঃ, দেখতে তো খাসা।

বস্তুটা দু-হাতে ছড়িয়ে ধরে ফুঁটিঠাকরুনের কণ্ঠ মধুর হল: রথের বাজারে দেখেছিলাম এই জিনিস। কিনব কিনব করে ভুলে এলাম। পিতলের জিনিস, কাচ বসানো। করে কিন্তু ভাল। তুই কি করবি কাজলী? আট আনার পয়সা দিচ্ছি, দিয়ে দে। নাতনীটকে পরাব।

পুরো একটা আধুলি—আচমকা এমনি লম্বা মুনাফার কথায় কাজলীবালা দোমনা হল। দেবো কি দেবো না ভাবছে। বোনপো বলে, বাড়ি চল মাসি—

কাজলীবালা বলে, দিদিকে একবার দেখিয়ে এক্ষুনি দিয়ে যাব। থাকো তুমি ঠাকরুন, এক ছুটে এসে দিয়ে যাচ্ছি।

ছুটেই হয়তো দিত। দেখে, ওদিককার বেড়ার অন্তরাল থেকে নিরু-বউ হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

ফিসফিস করে বলে, ও কাজলী, কি করে পেলি? দেখি একবার জিনিসটা।

হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে লুব্ধ কণ্ঠে বলে, পিতল হোক যাই হোক, বড় খাসা জিনিস। আমায় দে কাজলী, দুটো টাকা দিচ্ছি।

আঁচলে টাকা বাঁধা, নগদ টাকা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। একবার হাঁ বললেই খুলে দিয়ে দেবে। কাজলীবালা ইতিমধ্যে মন ঠিক করে ফেলেছে, বোনকে না দেখিয়ে দেবে না।

নিরু-বউ বলে, আচ্ছা, আচ্ছা, তিন টাকাই দিচ্ছি। তাই আছে আমার কাছে। বড্ড পছন্দের জিনিসটা। সোনা তো কেউ দিল না জীবনে, পিতল হোক কেমিকেল হোক তাই পরে সাধ মেটাই। ও কি, চললি যে ফরফর করে! শোন্, পাঁচটা টাকাই দেবো। আমার সর্বস্ব।

কাজলীবালা বলে, দিদিকে না জানিয়ে দিতে পারব না বউদি।

নিরু-বউ কাতর হয়ে বলে, আর নেই, সত্যি বলছি কাজলী। ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করতে পারি। থাকলে দিয়ে দিতাম।

চোখ দুটো তার যেন জ্বলজ্বল করছে গয়নার দিকে তাকিয়ে।

একআনা দু-পয়সা করে জমিয়ে জমিয়ে এই দাঁড়িয়েছে। যে মানুষের ঘর করি, জানিস তো তোরা—ঐ একআনা দু-পয়সার জন্যেও এক-শ গণ্ডা কৈফিয়ৎ। জিনিসটা দিস আমায়। গলায় চিরকাল মাদুলির বোঝা বয়ে গেলাম। কবে কখন মরে যাই, তার আগে গয়না বলে পরে নিই কিছু। তা সে যেমন গয়নাই হোক।

কাজলীবালার মনটা বড় নরম, চোখ ছলছল করে আসে। বলে, তোমাকেই দিয়ে যাব বউদি। বোন-ভগ্নিপতির হিল্লেয় থাকি, তাদের না বলে কিছু করলে রাগ করবে।

বোন তখন বাড়িতে নেই। রাহাবাড়ির চিঁড়ে কোটা কাল শেষ হয়নি, সকালেই বোধহয় ঢেঁকিশালে গিয়ে পড়েছে। অনেক বেলায় ফিরল। ফিরে এসেই প্রথম কথা: কোথায় নাকি পড়ে পেয়েছিস তুই—বেশ ভাল একটা গয়না?

ভাল জিনিস কি ফেলে কেউ কখনো? পিতলের ঝুটো-গয়না—তবে দেখতে ভাল। তুমি কোথায় শুনলে দিদি?

গিয়েছিলাম ফুশিটঠাকরুনের কাছে। ডোয়া গাঁথা আজও হবে না, সেই কথা বলতে। পাড়ার মধ্যে রৈ-রৈ পড়ে গেছে। বের কর তো দেখি কেমন।

নেকলেশ এনে কাজলীবালা বোনের হাতে দিল। বোন বলে, ঝুটো বলে তো মনে হয় না। এত লোকের গরজ তবে কেন? এখন কিছু করে কাজ নেই। মানুষটা আসুক, সে-ই বা কী বলে শোনা যাক।

মানুষটা, অর্থাৎ ভগ্নিপতি শম্ভুরাম। সারাক্ষণ চালের উপর বসে কাজ করে দুপুরের পর ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ি এল। বৃত্তান্ত শুনে খাওয়ার কথা মনে থাকে না, হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। কাজলীর উপর খিঁচিয়ে ওঠে একবার: একটু যদি ঘটে বুদ্ধি থাকে! ফুশিটঠাকরুনকে কেন দেখাতে যাস? তাকে বলা মানে তো খুলনা শহরে ঢোলসহরৎ করে জানান দেওয়া। দামি জিনিস যদি হয়, এ-কান সে-কান হতে হতে খাঁটি মালিকের কানে পেঁছে যাবে। সে লোক তো হায়-হায় করছে, ছুটে এসে পড়বে তক্ষুনি। যার জিনিস সে নিয়ে যাবে না, না দিলে পুলিস আনবে। কলা খেও তুমি তখন। এসব জিনিস হাত চিত করে নাচিয়ে আনে কেউ?

বকাবকি চলছে, কাজলীবালা তার মধ্যে চমক খেয়ে আর একটা কথা ভাবে। গয়না হারিয়ে ফেলেছে, সেই অসাবধান মালিকটির কথা। সত্যি যদি দামি জিনিস হয়, সে তো পাগলিনী হয়ে বেড়াচ্ছে। আহা, টের পেয়ে যাক সেই মানুষ, গয়না ফেরত নিয়ে গলায় পরুক। কাজলীবালা যদি খোঁজটা পেত, ছুটে গিয়ে যার জিনিস তাকে দিয়ে আসত।

গোটা খুলনা শহর না হোক, যা ছড়িয়েছে সে-ও বড় কম নয়। সন্ধ্যাবেলা নীলু স্যাকরা চলে এসেছে। শম্ভুরাম তার বাড়ির ঘর ছেয়ে দিয়ে এসেছে। বলে, বাড়ি আছ শম্ভুরাম? দেখি একবার জিনিসটা।

শম্ভুরাম আকাশ থেকে পড়ে: কোন জিনিসের কথা বলছেন, বুঝতে পারিনে তো।

নীলু হি-হি করে হাসে: বুঝতে ঠিকই পারছ বাপু? আজ সকালে যা কুড়িয়ে পেয়েছে। আমাকে দেখানোয় গণ্ডগোল নেই। বলি, মাটিতে পুঁতে রাখবার জিনিস তো নয়। গয়না পরে বউও তোমার ডোয়ামাটি লেপতে যাবে না। পরলে লোকে নানান রকম রটাবে। ব্যবস্থা কিছু করতেই হবে—তা আমি লোকটা কি দোষ করলাম? সোনা-রুপোর কাজ আমার—টিপেটাপে এমনি বন্দোবস্ত করব, কাক-পক্ষী জানতে পাবে না।

শম্ভুরাম ভেবেচিন্তে দেখছে। করতে হবে কিছু, তড়িঘড়ি করে ফেলতে হবে। বাড়ি বয়ে এসেছে, কি বলে শোনা যাক।

নেকলেশ বের করে দেখাল। হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে নীলু স্যাকরা মিইয়ে যায়, রেখে দাও, দিনমানে একসময় এসে ভাল করে দেখা যাবে।

সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে শম্ভুরাম বলে, কি দেখলেন?

সোনা যদি হয়, তবে মরা-সোনা। না কষে সঠিক বলা যাচ্ছে না। পাথর নিয়ে এসে দেখব।

ঘণ্টা কয়েক পরে গভীর রাত্রে দরজায় টোকা। শম্ভুরামের নাম ধরে ডাকছে। ঘুম ভেঙে শম্ভুরাম ধড়মড় করে উঠল। মুখ শুকিয়েছে। কিন্তু সে-ভাব না দেখিয়ে শান্তভাবে গিয়ে দরজা খোলে। শম্ভুরামের বউও উঠে পড়ে দরজার অন্তরালে দাঁড়িয়েছে। পিছনে গা ঘেঁষে কাজলীবালা।

কে ডাকে?

হরি, হরি—সে-ই নীলু স্যাকরা যে। আর-একদিন দেখবে বলে অবহেলা ভরে উঠে চলে গিয়েছিল, রাতটুকু পুইয়ে দিনও পড়তে দিল না।

সঙ্গে সুবেশ এক ভদ্রলোক। নীলু বলে, চেনো এঁকে? গৌরীপতিবাবু। ওঁকে ধরে নিয়ে এলাম।

জহুরী গৌরীপতি, মণি-রত্নের কারবারি। অতবড় মানুষটা নিশিরাত্রে শম্ভুরামের ঘরের দাওয়ায়। গয়নার কাচ ক'খানার ব্যাপারেই এসেছেন উনি। ঝুটো কাচ নয় তবে, গৌরীপতির এলাকার ভিতরের কিছু! শম্ভুরামের অতএব দেমাক দেখানোর সময় এইবার।

গৌরীপতি বলেন, বের করো একবার, দেখি।

জিনিস বাড়ি নেই বাবু। বিস্তর মানুষ আসছেন যাচ্ছেন, সেইজন্যে সরিয়ে দিলাম।

এই কষ্ট করে এলাম। দেখ দিকি—। গৌরীপতি গজর-গজর করলেন: নিজের কোট থেকে কোথায় সরাতে গেলে?

শম্ভুরাম চুপচাপ আছে।

গৌরীপতি বলেন, তা-ও বটে, আমি কি জন্যে জিজ্ঞাসা করতে যাই, আমায় কেন বলতে যাবে? তবে একটা কথা—গৌরীপতি এই একজনই, ষোলআনা ন্যায্য দাম আমি ছাড়া কেউ দেবে না। যেখানে সরিয়ে থাকো, সম্ভব হলে একবারটি এনে দেখিয়ে দাও। বড়-রাস্তায় গাড়ি রেখে এসেছি, গাড়িতে গিয়ে বসছি আমরা। গাড়িতে নিয়ে দেখাতে পার, অথবা খবর দিলে আবার এখানে আসব।

হেলাফেলার গয়না নয়, এবারে সঠিক বোঝা গেল। গৌরীপতির মতো মানুষ এই রাত্রে তা হলে গাড়ি হাঁকিয়ে আসতেন না। কাচগুলো সম্ভবত হীরে। স্যাকরার পো ঘুঘুলোক—এখানে উদাসীন ভাব দেখিয়ে গৌরীপতির কাছে চলে গিয়েছে। বাড়িতে নেই সেটা মিছে কথা। তবে বাক্সপেটরার ভিতরে নেই। চালের মধ্যে গুঁজে রেখেছে ভিতর দিক দিয়ে। চোর-ডাকাত কিম্বা পুলিস অথবা গয়নার মালিক যত খোঁজাখুঁজি করুক, মই দিয়ে চালে উঠে ছাউনির কুটো সরিয়ে দেখতে যাবে না।

গৌরীপতিকে ডেকে নিয়ে এলো রাস্তার উপরের গাড়ি থেকে। টর্চের আলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিনি দেখলেন। কষ্টিপাথর নীলুর হাতে, কিন্তু পাথর ঠুকতে গেলেন না তিনি। বললেন, জানাজানি হয়ে যাচ্ছে। জিনিস ধরে রেখো না হে। ন্যায্য দাম যা হওয়া উচিত, তার উপর কিছু বেশি করে বলছি আমি। দিয়ে দাও।

শম্ভুরাম তাকিয়ে আছে। হীরের দামের তো লেখাজোখা নেই। গৌরীপতি ফিস ফিস করে নীলুর সঙ্গে একটু পরামর্শ করেন। নীলু ঘাড় নাড়ল।

গলা খাঁকারি দিয়ে গৌরীপতি বললেন, তিন-শ সাড়ে তিন-শর বেশি হওয়া উচিত নয়। আমি পাঁচ-শ দেবো। এক-শ টাকার করকরে নোট পাঁচখানা। এক্ষুনি দেবো—নগদ নগদ!

ঘরের চালের উপর সারাদিন খাটাখাটনি করে শম্ভুরাম রোজ পায় একটাকা পাঁচসিকে। সেই মানুষ আপাতত একটি লাটবেলাট! হীরের দাম শোনা যায় তো অঢেল। এমন হীরেও আছে, এখানকার মূল্যে রাজার রাজত্ব বিকিয়ে যায়। শম্ভুরাম গম্ভীরভাবে গৌরীপতির কথা শুনে গেল।

নীলু স্যাকরা বলে, দিয়ে দিচ্ছ তা'হলে।

উঁহু। শম্ভুরাম ঘাড় নাড়ল ঃ আর একজন এসে ছ-শ টাকা দর দিয়ে গেছে।

কোন আহম্মক আছে, ছ-শ টাকা বলবে এই জিনিসের দাম? টাকা তো খোলামকুচি নয়।

নীলু বলে, আছে বাবু এক রকমের লোক, দর তুলে মাথা খারাপ করে দিয়ে যায়। সত্যি সত্যি কেনে না। চোখে দেখে গিয়ে সেই লোক আবার থানায় এজাহার দেয়, অমুক জিনিসটা আমার চুরি হয়ে গেছে। কত রকমের ছ্যাঁচড়া মানুষ আছে দুনিয়ার উপর।

আবার বলে, শম্ভু মানুষটা বড় ভাল। আমার বিশেষ চেনা। তারই উপকারের জন্যে টেনে এনে কষ্ট দিলাম বাবু। কদর বুঝল না। আর কি হবে চলুন—

কিন্তু গৌরীপতির যাওয়ার তত মন নেই। এক-পা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বলেন, পছন্দের ব্যাপার তো—হতেও পারে। চোখে ধরলে তখন আর মানুষের হিসাবজ্ঞান থাকে না। আমি না-হয় দিচ্ছি সেই ছ-শ টাকা। এসেছি যখন, শুধুহাতে ফিরব না।

শম্ভুরামও মনস্থির করে ফেলেছে। এক ধাপ্পায় যখন এক-শ টাকা উঠে গেল, না-জানি কত এর দাম! আরও সে চটে গেছে নীলু স্যাকরার ভয়-দেখানো কথায়। কাঁচা-ছেলে কেউ নয় রে বাপু—পুলিসের বাবাও সন্ধান পাবে না, গয়না এমনি জায়গায় সেরেছে।

নিয়ে নাও টাকাটা—

শম্ভুরাম সবিনয়ে বলে, আজ্ঞে না। যে-মানুষ আগে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। এই দামে দিতে হয় তো তাঁকেই দেব।'

গৌরীপতি চটে উঠলেন এবার ঃ খুলনা শহরে আমার উপর টেক্কা দিয়ে যাবে—নামটা কি শুনি?

নাম বলতে পারব না আজ্ঞে। সেই রকম কথা তাঁর সঙ্গে। কথা ভাঙব না।

বেশ, আমি যদি তার উপরে আরও পঞ্চাশ ধরে দিই।

নীলু স্যাকরা চোখ বড়-বড় করে বলে, রাগের বশে এটা কি করলেন বাবু! জিনিস কেনা কি লোকসান দিয়ে মরবার জন্যে?

গৌরীপতি কানেও তুললেন না। বলেন, সাড়ে-ছয় পেয়ে যাচ্ছ। কি বল এবার?

শম্ভুরামের মাথার মধ্যে পাক দিয়ে ওঠে। আরও এখন চেপে থাকার দরকার। দাম নিশ্চয় অনেক বেশি। অনেক—অনেক—অনেক—

বলে, তা হলেও একবার জিজ্ঞাসা করতে হবে আমি খবর দেবো আপনাকে।

চলে যাবার মুখে গৌরীপতি বলেন, পুরো সাত-শ যদি দিই ?

তিনিও তো উঠতে পারেন—সেই আগের মানুষ ? আপনি কিছু মনে করবেন না বাবু—

দরজা বন্ধ করে এলো। এর পরে ঘুম আসে না চোখে, কেউ শুতে যায় না। শম্ভুরামের বউ হেসে মাথার উপরের ফুটো চালের দিকে চেয়ে বলে, যাক রে বাবা। দু-দুটো বর্ষা জলে ভাসছি, এবারে ছাওয়া-ঘরে শুয়ে বাঁচব।

ঘরামি মানুষ শম্ভুরাম—দশজনের ঘর মেরামত করে বেড়ায়, অথচ নিজের ঘরের চালে কুটো নেই। বউ বলে বলে হয়রান। জবাব দেয়ঃ আগে খাওয়া, তারপর তো শোওয়া। পরের চালে উঠে উঠে খোরাকির জোগাড়টা হয়, নিজের চালে উঠতে গেলে সেটা যে বাদ পড়ে যাবে। দু-দিকের দুই হাঙ্গামা—একলা মানুষ সামাল দিই কেমন করে ? বউয়ের আজ সকলের আগে সেই কথাটা মনে এলো, বর্ষার রাত্রে জল বাঁচানোর জন্যে বিছানাপত্র একবার এখানে একবার ওখানে টানাটানি করতে হবে না। হোক না বৃষ্টি ঝুপঝুপ করে, একঘুমে রাত কাবার।

বলছে তাই, নতুন ছাউনির ঘরে আরাম করে ঘুমিয়ে বাঁচব রে বাবা।

শম্ভু বলে, ঘর ছাইতে কে যাচ্ছে ?

তবে কি মাঠে থাকব ? রুয়ো-আটন খসে খসে পড়ে যাবে এবারের বর্ষায়।

শম্ভু উল্লাস ভরে বলে, ঘর ভেঙে দালান হবে। সাত-শ আট-শ সে যে একগাদা টাকা !

কাজলীবালা এদের মধ্যে একটি কথাও বলে না। সে-ও জেগে। সে ভাবছে, এই মূল্যবান জিনিসটা যে মানুষ হারিয়ে ফেলেছে, তার অবস্থা। সকলে গঞ্জনা দিচ্ছে তাকে হয়তো। গল্প শুনেছে, কোন এক বউ জলে ঝাঁপ দিয়েছিল গয়না হারানোর দুঃখে।

পরের দিন শম্ভুরাম কাজে গেল না। ঘরামিগিরি করবে কি—বড়লোক এখন। দাম অর্ধেক হাজারের উপরে উঠে গেছে। পুরো হাজার ঠিক উঠবে। চাই কি বেশিও উঠতে পারে—কতদূর উঠবে, কিছুই প্রথম বলা যায় না। শম্ভুরামের এক পরম বন্ধু খানিকটা লেখাপড়া জানে—তার কাছে বুদ্ধি নিতে গেল। বাড়ি ডেকে নিয়ে এসে চুপিচুপি তাকে দেখাল জিনিসটা। সে একেবারে আকাশে তুলে দেয়। কলকাতার সাহেব-জুয়েলার্সের বানানো জিনিস, নাম খোদাই আছে সেই ফার্মের। ছ্যাঁচড়া কাজ করে না সে ফার্ম, বড়মানুষ ছাড়া সেখানে যায় না। ভালো রকম যাচাই করে দেখে তবে জিনিস ছেড়ো, এই এক জিনিসে কপাল ফিরে যাবে। কলকাতায় চলে যাও না হে—শহরের রাজা কলকাতা। কালোবাজার, সাদাবাজার, সাচ্চা কারবারি, ঝুটো কারবারি—সব রকম সেখানে।

সারাদিন ভাবনা-চিন্তা, শলা-পরামর্শে কেটেছে। কলকাতায় যাওয়াই ভালো।

অসংখ্য খদ্দের—উচিত মূল্য মিলবে। বন্ধুটিও সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছে। তার আগে এ-জায়গার সবচেয়ে বড় দোকান স্বর্ণভবন—পায়ে পায়ে শম্ভুরাম সেখানে চলে গেল। তারাই বা কি বলে শোনা যাক।

কি চাই ?

মালিকমশায়ের সঙ্গে কথা বলব একটু।

কর্মচারিটী চকিত হয়ে আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখে। এই ধরণের মানুষ—ছেঁড়া জামা, তালি-দেওয়া জুতো, তৈলহীন রুক্ষ চুল, নাপিতের পয়সার অভাবে খোঁচা খোঁচা দাড়ি—কিন্তু মানুষটা ছেঁড়া জামার পকেটে হয়তো সাত রাজার ধন নিয়ে ঘুরছে। নগদ পাঁচ-দশ টাকা হলেই দিয়ে চলে যাবে।

সসম্ভ্রমে সে আহ্বান করল : এই যে—পাশের ঘরে চলে আসুন।

মালিকমশায় বৈষ্ণবদাস খুব খাতির করে বসালেন : জিনিস আছে বুঝি ?

শম্ভুরাম বলে, কুড়িয়ে পেয়েছে বাড়ির একজন।

হেসে বৈষ্ণবদাস বলেন, কুড়িয়ে পেয়েছে কি অন্য কোন ভাবে এসেছে তাতে আমার গরজ কি ? দামের সেজন্য ইতরবিশেষ হবে না। এনেছেন ?

সঙ্গে নিয়ে ঘোরাঘুরি করবার জিনিস নয়—গর্বভরে শম্ভুরাম বলল, দয়া করে পায়ের ধুলো দিতে হবে আমার বাড়ি। তাই সকলে দিচ্ছেন।

বটে ! বাড়ি কোথায় আপনার ? কারা সব গিয়েছে ?

শহরের সেরা যারা, তাঁদেরই দু-তিন জন। হেজিপেজিরা গিয়ে কি করবে ?

বৈষ্ণবদাস গম্ভীর হয়ে বলেন, দর কি রকম বলে ?

শম্ভুরাম বলে, বলুনগে যা খুশি। আমি দু-হাজারের নিচে নামতে পারব না মশায়।

সবিস্ময়ে বৈষ্ণবদাস চোখ তাকিয়ে পড়লেন : এমন জিনিস ?

দেখতে পাবেন যদি যান দয়া করে। সাহেববাড়ির জিনিস—হীরেই তো আট-দশখানা।

রাত্রে ভাল ঠাহর হয় না। কাল ভোরবেলা আমি বেড়াতে বেড়াতে চলে যাব। কতটুকু আর পথ ? তবে আগে মাল যেন বেহাত না হয়। এই কথা রইল।

বুড়োমানুষ বৈষ্ণবদাস সকাল না হতেই হন্তদন্ত হয়ে শম্ভুরামের বাড়ি হাজির হয়েছেন। কিন্তু নেকলেশ সরে গেছে—চালের কুটোর মধ্যে নেই সেই জায়গায়। মাথায় হাত দিয়ে বসেছে শম্ভুরাম। বউ কপাল চাপড়াচ্ছে।

কাজলীবালাও নেই।

আগের দিন শম্ভুরাম যখন স্বর্ণভবনে গেছে, এদিকে এক রহস্যময় ব্যাপার। কাজলীবালা বাড়ির গলিতে ঢুকছে, মুখের উপর ঘোমটা-ঢাকা অচেনা একজন হাতছানি দিয়ে ডাকল।

তুমি কাজলীবালা তো ? অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, শুনে যাও।

কাজলীবালা অবাক হয়ে বলে, আমি তো জানিনা আপনাকে—

ঘোমটা এখন কমেছে কিছু। অপরূপ সুন্দরী, কাজলীর দিদির বয়সি হবেন। বড়ঘরের বউ নিশ্চয়—ভালভাবে থাকেন, ভরভরন্ত গড়ন।

কাজলীবালা বলে, আপনি আমায় চিনলেন কি করে ?

বিষণ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে বউ বলে, গরজ বলেই চিনতে হয়েছে। নেকলেশ কুড়িয়ে পেয়েছ নাকি তুমি, অনেকের মুখে তোমার নাম।

আরও একটি খদ্দের—সন্দেহ নেই। ভাগাড়ে মরা-গরু পড়লে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জাহির করতে হয় না—কাক-শকুন-শিয়ালের মধ্যে আপনি খবর পড়ে যায়। তেমনি সব এসে খোঁজাখুঁজি করছে।

কাজলীবালার স্বর কঠিন হয়ে উঠল। বলে, বিক্রি করব না। গোড়ায় সামান্য জিনিস ভেবেছিলাম, তখন এত বুঝে দেখিনি। পরের জিনিস বিক্রি করে টাকা নেওয়া—সে তো চুরি। গরীব-দুঃখী আছি, চোর কেন হতে যাব ? যার জিনিস তাকে ফেরত দিয়ে দেব।

বউ বলে, সে মানুষ পাবে কোথায় খুঁজে ?

তারই বেশি গরজ। কানে পড়লে খোঁজে খোঁজে চলে আসবে—এই যেমন আপনি এসেছেন। খবরের কাগজে ছেপে দিলে নাকি অনেকের চোখে পড়ে। পয়সা থাকলে তাই করতাম।

বউ শিউরে উঠে বলে, ওসব করতে যেও না, কখনো না। যার জিনিস তাকে খুঁজে পাবে না। পণ্ডশ্রম। সে মানুষ ধরা দেবে না।

কেন ?

কি জানি—। বউ ইতস্তত করে যেন এক মুহূর্ত। বলে, হয়তো প্রকাশ হতে দিতে চায় না ঐ জায়গায় সে গিয়েছিল। গহনা হারানোর জন্য কোন গল্প রটনা করে দিয়েছে ইতিমধ্যে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মুখে তাকিয়ে কাজলীবালা বলে, আপনি জানলেন কি করে ?

অনুমান—

কাতর হয়ে বউ বলে উঠল, চারিদিকে বড্ড চাউর হয়ে যাচ্ছে, ওটা আমায় দিয়ে দাও। বিক্রি করতে চাও না, দামও আমিও দেবো না। কাপড়চোপড় কিনো, মিষ্টি-মিঠাই খেও, সেইজন্য কিছু ধরে দিচ্ছি।

যা ভেবেছিল—খদ্দেরই ইনি। কিছুমাত্র আর সন্দেহ নেই। চালাক খদ্দের—সস্তায় নেবার জন্য কায়দা করে ভিন্ন ভাবে কথা বলছে।

কাজলীবালা বিরক্তভাবে ঘাড় নেড়ে বলে, কথা একই বিক্রির রকমফের। আমি দেবো না।

তবে ফেলে দিয়ে এসো গাঙের জলে। আমায় না দাও, দু-জনে এক সঙ্গে গিয়ে জলে ফেলে আসি।

মহিলাকে অগ্রাহ্য করে কাজলীবালা ঘাড় ফিরিয়ে ফরফর করে সুঁড়িপথে ঢুকে পড়ল। তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

চতুর্দিকে খবরটা চাউর হয়ে যাচ্ছে, শম্ভুরামও সেজন্য বিচলিত। বন্ধুকে নিয়ে কলকাতা রওনা হবার বন্দোবস্ত হচ্ছে—সেটা কাল কিম্বা পরশু, তার ওদিকে নয়। রাত থাকতেই কাজলীবালা নেকলেশ চুপিসারে বের করে নিয়ে থানায় চলল। সকলের মাথার উপর সরকার বাহাদুর—তাঁদের জিম্মায় দিয়ে নিশ্চিন্ত। খবরের-কাগজে ছেপে কিম্বা যেভাবে হোক মালিকের খোঁজ করে দিনগে তারা। পরের জিনিষ বাড়ি এনে কাজলীবালা মহাপাপ করেছিল, সেই পাপের মোচন হয়ে গেল!

সেটা হয়তো হল, কিন্তু কাজলীবালার ছাড় হয় না। এই চেহারা এই পোশাক—তার মুঠোর ভিতরে এমন দামী জিনিসটা! থানাওয়ালারা তোলপাড় লাগিয়েছে॥ কোথায় পেয়েছিস, বল্ সত্যি কথা। এমন জিনিসটা হারিয়ে ফেলে মালিক লোকটা থানায় এজাহার দিল না বললেই অমনি বিশ্বাস করব? কোন মুলুক থেকে চুরি করে এনেছিস, তাই বল্। সাঁড়াশি দিয়ে পেটের ভিতরের কথা আমরা টেনে বের করতে জানি। নিজের ইচ্ছেয় কদ্দুর কি বলিস, শুনে নিই আগে—সে পথ তারপরে তো আছেই। সরকার মাইনে দিয়ে এমনি-এমনি থানার উপর পোষে না আমাদের।

পুলিসের একটা দল কাজলীবালাকে নিয়ে শম্ভুরামের বাড়ি চলল। মজার গন্ধ পেয়ে পথের মানুষও জুটেছে। এমনিতরো আরও কিছু জিনিস মেলে কিনা দেখবে তল্লাসি করে। কাজলীবালা আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে: ও দিদি, ও দাদাবাবু, আমায় আটকে রাখবে। মারধোর দেবে। জামিনের ব্যবস্থা কর, জামিন দিয়ে ছাড়িয়ে আন। জিনিস কুড়িয়ে পেয়ে জমা দিতে গেয়েছি—আমি তো মন্দ কিছু করিনি।

শম্ভুরাম শুনতে পায় না, কানে বোধ হয় ছিপি-আঁটা। শম্ভুরামের বউ বলছে, আমরা কিছু জানিনে হুজুরমশায়রা। বোন একরকম বটে, কিন্তু আমার সংসারের কেউ নয়। রীতচরিত্রের দোষে শ্বশুরবাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছে—না খেয়ে ভিখারির হাল হয়ে এসেছিল, দয়া করে ঠাঁই দিয়েছি। দেওয়া খুব অন্যায় কাজ হয়েছে। দিন আনি দিন খাই, ঝঞ্ঝাটঝামেলায় যেতে পারব না। যা ইচ্ছে আপনারা করুন গে।

আবার তাকে থানায় নিয়ে তুলল। যা গতিক, বাড়ি রেখে গেলেও ঝেঁটিয়ে বের করে দিত। কাজলীবালা হাপুস নয়নে কাঁদছে। হারাধন মোক্তার কি কাজে এই সময়টা থানায় গিয়েছেন। কী ব্যাপার, মেয়েটা কাঁদে কেন? করুণা হল মোক্তার মশায়ের। বললেন, জামিন হয়ে সইসাবুদ করে দিচ্ছি, আমার সঙ্গে চল্।

হারাধন তারপর নিজে শম্ভুরামকে বলেকয়ে দেখেছেন। কাজলীর নাম শুনলেই বোন-ভগ্নিপতি মার-মার করে ওঠে। অত্যন্ত স্বাভাবিক। এত বড় মুনাফা ফসকে গেল মেয়েটার দুর্বুদ্ধির জন্য। ঘরামি শম্ভুরামের জীবনে তাহলে আর চালের উপর উঠতে হত না, পায়ের উপর পা রেখে বাবুমানুষের মতো দিব্যি দিন কেটে যেত।

বলে যাচ্ছেন হারাধন মোক্তার—বলাধিকারী তদগত হয়ে শুনছেন। নানান

ফরমাসে বারম্বার সামনে ডাকেন মেয়েটাকে। তালপাতার সেপাই—আঙুলের টোকায় বোধকরি মাটিতে লুটাবে। সেই মেয়ের মনের এমন বল অত টাকার লোভ অবহেলায় ঝেড়ে ফেলে দিল।

হারাধন-মোক্তার বলেন, সাহেব-বাড়ির গয়নার শেষ গতিটা শুনবেন না? সেই নেকলেশ অনাদি সরকারের বউয়ের গলায়। সরকারমশায় তখন সদর থানায়। প্রোমোশান পেয়ে তারপরে আপনারই পাশে ঝিনুকপোতায় চলে গেলেন। ঝিনুক-পোতার বড়বাবু। তাঁর বউয়ের গলায় উঁকি মেরে দেখবেন, হীরের নেকলেশ ঝিকঝিক করছে। আপনার ছোট মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্নে তিনিও তো গিয়েছিলেন—আপনি না দেখে থাকেন, বাড়ির মধ্যে জিজ্ঞাসা করবেন, তাঁরা ঠিক দেখেছেন।

সরকারী নিয়মানুযায়ী কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুল—মূল্যবান নেকলেশ পাওয়া গিয়াছে, মালিক উপযুক্ত প্রমাণ দর্শাইয়া লইয়া যাউন। নোটিশ লটকে দেওয়া হল সমস্ত সদর জায়গায়। মাসের পর মাস যায়। একটা মানুষ এসে হুঁ-হা করল না।

কী করা যায়?

কোর্ট হুকুম দিল, নিলামে তোলা হোক বস্তুটা। বিক্রির টাকা সরকারে জমা হবে। এইবারে অনাদি সরকারের তদ্বির। সে যে কী ব্যাপার, বর্ণনায় বোঝানো যাবে না? সমুদ্র-মন্থনে জলের আলোড়ন হয়েছিল—অনাদি সরকার জল-স্থল-অন্তরীক্ষ তোলপাড় করে তদ্বিরের ব্যাপারে। যে তদ্বিরের শক্তিতে বি, এ, এম, এ, পাশদের টপাটপ ডিঙিয়ে ঝিনুকপোতার মতো থানায় সে বড়বাবু। অনাদি বলল, শখের জিনিষটা পায়ে হেঁটে একবার যখন থানায় উঠেছে, ফেরত যেতে দিচ্ছিনে।

যা বলল, ঠিক তাই। যথারীতি নিলাম হয়ে সর্বোচ্চ ডাক আড়াই-শ টাকায় শৈলবালা দেবী জিনিষটা পেলেন। শৈলবালা হলেন অনাদি সরকারের বাড়ির পুরানো রাঁধুনী—ভাল কাপড়চোপড় পরিয়ে টাকা হাতে দিয়ে তাকে নিলাম ডাকতে পাঠাল। এছাড়া আরও দুটি খদ্দের ছিলেন, ডাকাডাকি করে দর বাড়ালেন। দুজনেই মহিলা। মহিলা ছাড়া এই বাজারে নগদ টাকা বের করে গয়না কিনতে যাবে কে? তাঁরা হলেন উমাশশী ভড় আর বীণা চক্রবর্তী। উমাশশী অনাদির বাড়ির চাকরানি, আর বীণা চক্রবর্তী হলেন অনাদির পরম অনুগত জমাদার হেমন্ত চক্রবর্তীর বউ। বীণা ডাক পেলেও বস্তুটা অনাদির বাসায় আসত।

কেস তো কিছুই নয়—কাজলীবালা জামিনে মুক্ত ছিল, এইবারে সম্পূর্ণ ছাড় হয়ে গেল। অধিকন্তু সদাশয় হাকিম নেকলেশের মূল্য থেকে দশ টাকা তাকে দিতে বললেন। হারাধন মোক্তারের উপরে কৃতজ্ঞতার অবধি নেই—জামিন হওয়া থেকে শেষ অবধি মামলা চালানো তিনিই করেছেন। টাকা এনে কাজলীবালা তাঁর হাতে দিল। কিন্তু মোক্তারি ফী এবং আনুষঙ্গিক খরচ-খরচায় পাওনা তো বিস্তর—দশটা টাকায় কি হবে? পুরানো ঝি দেশে চলে যাওয়ায় কাজলীবালা তার জায়গায় কাজ করেছে,—সেই কয়েক মাসের মাইনে যোগ দিয়েও অনেক বাকি থেকে যায়! পুরানো ঝি এসে গেছে, কাজলীবালাকে দরকার নেই—কিন্তু পাওনা আদায়ের কি হবে, তাই ভেবে হারাধন ইতস্তত করছেন।

ছোটমেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়ার পর থেকে জগবন্ধুর বাসা ফাঁকা হয়ে গেছে। তিনি তবু কাজকর্মে বাইরে বাইরে থাকেন, ভুবনেশ্বরীর একলা ঘরে মন টেঁকে না। কথাটা হারাধন মোক্তারের কানে গেছে! তিনি তাই প্রস্তাব করলেন: দরকার থাকে তো আপনি নিয়ে যান বলাধিকারীমশায়। এমনি ভাল, ঝিয়ের কাজ ভালই করবে। আমার প্রাপ্যটা দিয়ে যান, মাইনে থেকে মাসে মাসে শোধ করে নেবেন।

না—। বলে জগবন্ধু সজোরে ঘাড় নাড়লেন। বলেন, ঐ জাতের মেয়েকে ঝি করে রাখব এত বড় শক্তি আমার নেই, বড়বউয়েরও নেই—

পরক্ষণে বলে উঠলেন, রাখব, রাখব। ঝি মানে তো মেয়ে। মেয়ে ক'টির বিয়ে হয়ে গেল—কাছেপিঠে আর এক মেয়ে ঘুরেফিরে বেড়াবে। বোঁচকাবিড়ে বেঁধে নে, কাজলীবালা, নিজের বাসায় যেতে হবে।

হাসপাতালে নিয়ে তুলেছে বলরামকে। হাকিম এসে জবানবন্দি নিয়ে গেলেন। কাপ্তেন বেচারামের নামে হুলিয়া বেরিয়ে গেল। হুলিয়া অমন কতবার বেরুল। ইচ্ছে হল তো হঠাৎ একদিন বেচারাম গটগট করে আদালতে ঢুকে হাকিমের সামনে নমস্কার করে দাঁড়ায়। নিজের পরিচয় দেয়। দু-চার কথার পরেই হাকিম চেয়ার দিতে বলেন আসামীকে। মহাশয়-লোক কাপ্তেন মল্লিক, খাসা কথাবার্তা। অপরাধ শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হয় না। তদ্বিরে অতি নিখুঁত বন্দোবস্ত, ছাড়া পেয়ে সে বেরিয়ে আসে। বুড়ো হয়ে তো মরতে চলল, এতকালের মধ্যে জেলে গিয়েছে দু-বার কি তিনবার। অথচ এই বেচারামের অনেক চ্যাংড়া সাগরেদ ও পাঁচ-সাত-দশবার ঘুরে এসেছে। দু-তিনবার কাপ্তেন যা গিয়েছে—তা-ও নাকি নিতান্ত শখের যাওয়া। বউয়ের উদ্বেগ ঠাণ্ডা করবার জন্য। বড়বউ মাথার দিব্যি দিয়েছিল: শরীরগতিক খারাপ হয়ে যাচ্ছে, জিরান নাও কিছুদিন। একটা মরশুম চুপচাপ বসে থাক। এত সব দায়দায়িত্ব—বাড়িতে থেকে জিরান নেওয়া অসম্ভব। লোকে তা হতে দেবে না। অতএব রাজকীয় আশ্রয় নিতে হয়। সেকালের রাজারা গুণিজন প্রতিপালন করতেন। একালেও করেন। উঁচু পাঁচিলের ঘেরে লাল ইটে-গাঁথা ঝকঝকে জেলখানা বানিয়ে রেখেছেন গুণীদের আহার ও বিশ্রামের জন্য। বার দুই-তিন সেখান থেকে বেচারাম দেহ মেরামত করে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু এবারে আর তেমন কোন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। নিখোঁজ বেচারাম। দেহঘটিত অস্বাস্থ্য নেই, বড়বউ নিশ্চয় কিছু বলেনি। তা বলে জগবন্ধু শুনছেন না। সুযোগ যখন মিলেছে, নল ধরে উৎখাত করবেনই তিনি। যত রকমে পারেন, চেষ্টা করেছেন। ঝিনুকপোতার অনাদি সরকার সঙ্গে সঙ্গে আছেন বটে, থাকতে হয় তাই আছেন—তাঁর তরফের চাড় কিছু দেখা যায় না। জগবন্ধুকে সদুপদেশ দেবার চেষ্টা করেন: আমাদের হল সরকারী চাকরি, আপন নিয়ে চাকা ঘুরে প্রমোশান। কাজ করলে যা, না করলেও তাই। চাকরি রক্ষে করতে যেটুকু হৈচৈ-এর দরকার, তাই করুন মশায়। বেশি ঘাটাঘাটি করলে আখেরে পস্তাবেন।

জগবন্ধু কানে নেন না, ঘৃণায় রি-রি করে সর্বদেহ। ঘুসেল লোক এরা, বউয়ের

গলায় হীরে নেকলেশ পরিয়ে তাই আবার জাঁক করে দেখায়। সরকারের বদনাম এই সব অসৎ অফিসারদের জন্য। অনাদির সাহায্যের পরোয়া না করে একাই লড়ে যাবেন তিনি। বেচারামের খোঁজ হয়নি, তবে সাথী-সাগরেদ কয়েকটা ধরা পড়েছে। বেচারামের অনুপস্থিতিতে এই ক'জনকে নিয়ে বিচার চলবে। বলরামটা সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে কাঠগোড়ায় দাঁড়ানোর অপেক্ষা। চেষ্টা হচ্ছে তাড়াতাড়ি সারিয়ে তুলবার। হাসপাতালে দোতলার আলাদা ঘরে রাখা হয়েছে সতর্ক প্রহরায়।

জগবন্ধুর পক্ষে একনাগাড়ে ছেড়ে থাকা চলে না—থানা আর সদর করে বেড়াচ্ছেন। ক্ষুদিরাম সদরেই পড়ে আছে। মানুষটা এদিক দিয়ে বড় সাচ্চা। কাজ একটা ঘাড় পেতে নিলে তখন আর তঞ্চকতা করবে না। রূপকথার দৈত্যের মতো—দৈত্য, তুমি কার? কাল ছিলাম অমুকের, এখন তোমার। হুকুম হলে বিনা প্রশ্নে সেই মনিবের ঘাড় ভেঙে এনে দেবে। ক্ষুদিরাম তাই। বেচা মল্লিকের বিপক্ষে মামলা সাজানোর যা সব কল-কৌশল খাটাচ্ছে, বাঘা-বাঘা উকিলের তাক লেগে যায়। উকিল হাঁ হয়ে থাকে।

ক্ষুদিরাম মুচকি হেসে বলে, আদালতের আমলা ছিলাম যে! আদালত বাড়ির টিকটিকিটাকে জিজ্ঞাসা করুন না—টিকটিক করে সে-ও মামলায় যুক্তি দিয়ে দেবে।

এজলাসে রীতিমতো একটা জাঁকালো মামলা উঠেছে অনেক দিনের পর। কিন্তু আশায় ছাই—খানিকটা সুস্থ হয়ে বলরাম হাসপাতাল থেকে পালিয়েছে। ক্ষুদিরাম হায়-হায় করে জগবন্ধুর থানায় এসে পড়ল। কোর্টে দাঁড়াবার আতঙ্কে দোতলার বারান্ডা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পালাল, অথবা বেচা মল্লিকই কোন কৌশলে নিয়ে বের করেছে, সঠিক বলবার জো নেই।

মূল-আসামি ফেরারি, তার উপরে মূল-সাক্ষি পলাতক। এত কষ্টে গড়ে-তোলা মামলার পরিণাম যা হবে, বুঝতে বাকি থাকে না। কপালে ঘা দিয়ে জগবন্ধু হন্তদন্ত হয়ে সদরে ছুটলেন। হাকিমের কাছে অবস্থা নিবেদন করে লম্বা সময় নিয়ে নিয়েছেন। অতঃপর থানায় ফিরবেন, না বলরামদের সেই গাঁয়ে সোজাসুজি গিয়ে উঠবেন, তোলা-পাড়া করেন মনে মনে। হবে না কিছুই—'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ' এই নিয়মে খোঁজাখুঁজি করা শেষবারের মতন।

সদরে এসে জগবন্ধু হারাধন মোক্তারের বাসায় ওঠেন। কী একটু আত্মীয়তা আছে বুঝি তাঁর সঙ্গে। চুপিচুপি হারাধনকে বলে নৌকাঘাটের অভিমুখে বেরিয়ে পড়লেন জগবন্ধু। এই অবধি জানা। তারপরে আর কোন সন্ধান নেই।

মূল-আসামি এবং মূল-সাক্ষি গায়েব, তার উপরে সরকার-পক্ষের যিনি প্রধান তদ্বিরকারক, তিনিও নিরুদ্দেশ হলেন। অনাদি রটাচ্ছেন: গা-ঢাকা দিয়েছেন ভদ্রলোক ইচ্ছা করে। এ রকম হবে, আগেই জানতাম। সেই জন্য খুব বেশি গা করিনি।

বলাবলি হচ্ছে: মানুষটি রাঘববোয়াল তো! অন্যের সঙ্গে বিশ-পঞ্চাশে হয়ে যায়, ওঁর গর্ত ভরাট করতে পাহাড়-পর্বত লাগে। মেয়ের বিয়ের সময় দশেধর্মে

দেখেছে। এবারের এত তোড়জোড় আর ছুটোছুটি—সে কেবল দর বাড়ানোর জন্য। বন্দোবস্ত একদিনে সারা, বেচা মল্লিকের সঙ্গে দরে পটে গেছে। এখন আর জগবন্ধু দারোগাকে পাবে কোথা? চুক্তিই যে তাই।

পাওয়া গেল জগবন্ধুর থানা থেকে একবেলার পথ এই ফুলহাটা গ্রামে। নীল-কুঠির ভাঙাচোরা অট্টালিকায়, অট্টালিকার ছাতের উপরে।

চলো একদিন দেখে আসা যাক কুঠিবাড়ির ভিতর গিয়ে।

দশ

একদিন সাহেব আর নফরকেষ্ট নীলকুঠিতে ঢুকে পড়ল। কত বাহার ছিল এই জায়গায়! ফুলহাটা ইন্ডিগো-কনসারনের নাম সমুদ্র পার হয়ে চলে গিয়েছিল। বিশেষ বিশেষ পালপার্বনে আশপাশের সকল কুঠি থেকে সাহেব-মেমরা এসে জমত, আমোদস্ফূর্তি হত। নাচ হত বলে তক্তার মেজে নিচের হলঘরটায়। তক্তা উঁই ধরে নষ্ট হয়ে গেছে, কতক বা লোকে খুলে নিয়ে এ-কাজে সে-কাজে লাগিয়েছে। কিম্বা উনুনে পুড়িয়েছে। বড় বড় বট-অশ্বত্থ তেঁতুল ও আমগাছ, ডালে ডালে জড়াজড়ি। দিন-দুপুরেই রাত দুপুরের মতো লাগে।

যেতে যেতে নফরকেষ্ট সহসা থমকে দাঁড়ায়, চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে পড়েঃ ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই দেহখানা পাথর করে ফেললাম। কাজ নাকি নেই! হায় রে হায়, এ রকম আহা-মরি জায়গা থাকতে কাজ খুঁজে পাইনে।

তাকিয়ে আছে অট্টালিকার দিকে নয়, অট্টালিকার লাগোয়া প্রাচীন দীঘির দিকে। কুঠির-দীঘি যার নাম। ঘাটের চিহ্নমাত্র নেই, কসাড় জঙ্গল চতুর্দিকে। হঠাৎ দেখে ভ্রম হবে—দীঘিই নয়, পতিত মাঠ একটা। গরু ছেড়ে দিলে বোধকরি মাঠের উপর চরে খাবার জন্যে নেমে পড়বে।

নফরকেষ্ট বলে, ছিপে মাছ ধরব এখানে।

মাছ ধরতে জান তুমি?

মাছ কেন, মানুষ অবধি ধরিনি? সুধামুখী জানে সব, তুইও কি আর জানিসনে! অমন যে বেয়াড়া বউ, টোপ গেঁথেই তো হিড় হিড় করে টেনে আনলাম।

ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, ডাঙায় তুলে—থুড়ি, শহরে এনে তুলে তখন পস্তাই। মাছ নয়, মেয়েমানুষও তো নয়—কামট। কামট জানিসনে—কুচ করে অঙ্গ কেটে নেয়, সাড় হবে জল থেকে ডাঙায় উঠে পড়লে তখন। ভয় হয়ে গেল। রোজ রাত্রে শোবার সময় ভাবতাম, সকালে উঠে যদি দেখি একখানা হাত কি পা কিম্বা মুণ্ডুটাই কেটে নিয়েছে। ঘুম ভেঙে তাড়াতাড়ি হাত বুলিয়ে দেখতাম, সবগুলো অঙ্গ ঠিক আছে কিনা।

জঙ্গলের ভেতর গুঁড়ি মেরে দীঘির একেবারে কিনারা অবধি চলে গেল! তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। দামে এঁটে গিয়ে জল বড় চোখে পড়ে না। তার মধ্যে যা দেখবার দেখে নিয়ে সাহেবকে বলে, হয়ে গেছে।

কি?

ভারী ভারী সোলমাছ। পোনা ছেড়েছে। সোল-মারা ছিপ বানিয়ে নেবো। কাউকে কিছু আগেভাগে বলবিনে। খেয়েদেয়ে সকলকে দেখিয়ে শুয়ে পড়ব, তারপরে টিপি-টিপি বেরুব দুজনে। সোল ধরা বড্ড সোজা রে—জলের রাজ্যে অমন হাঁদারাম মাছ আর একটা যদি থাকে! তোকে শিখিয়ে নিতে একটা বেলাও লাগবে না।

ঢোক গিলে নিয়ে বলে, অন্য কাজে যেমন হয়েছে—আমায় ছাড়িয়ে উপরে চলে যাবি। অনেক উপরে। আমি তাতে খুশিই।

শেওলার ভিতরে এক এক জায়গায় সোলের পোনা কিলবিল করছে। ভাসে মুখ তুলে, পলকে ডুবে যায়, আবার ভাসে—এই খেলা। এক ধাড়ির যত পোনা সমস্ত এক জায়গায়, ধাড়ি মাছ পাহারায় আছে। কিন্তু হলে হবে কি—পোনা ছাড়ার পর ধাড়ি লোভী ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে। টোপ সামনে পেলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, তক্ষুনি গিলবে।

মাছ হোক আর না-ই হোক, সাহেব পরোয়া করে না। নিশাকালে সকলকে চুরি করে বেরুনোটাই লোভের ব্যাপার। বেরিয়ে এসে কুঠি-বাড়ির জঙ্গলে ভাঙা অট্টালিকায় জন্তুজানোয়ারের আস্তানার পাশে কাঁটাঝিটকে-কালকাসুন্দে ভাঁট আশশ্যাওড়া সন্তর্পণে সরিয়ে সরিয়ে লম্বা ছিপ হাতে পাড়ের উপর নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা। প্রাচীন মহীরুহেরা ডালে ডালে আকাশ ঢেকে আছে। নীচের স্তূপীকৃত অন্ধকারের উপরে জোনাকির ফিনকি ফুটছে। তেঁতুলগাছের চূড়ায় পেঁচা ডেকে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে। তক্ষক ডাকে নাচঘরের কড়িকাঠের কোটরে। বাদুড় উড়ে উড়ে দীঘির এপার ওপার করছে। বড় মজা, বড় মজা!

সাহেব মেতে উঠল। নফরকেষ্টর সঙ্গে তলতাবাঁশের ঝাড়ে ঝাড়ে ঘুরে পছন্দসই ছিপ কাটে। হাটে গিয়ে সুতো-বড়শি পছন্দ করে কিনল। টোপ সংগ্রহ করে। নফরকেষ্ট বারম্বার সামাল করে দেয়ঃ কারো কাছে বলবিনে কিন্তু সাহেব। মাছ হলে রাত্রিবেলা ডেকে জাঁক করব। না হলে তো বেকুব—লোকের ঠাট্টাতামাসা কেন সইতে যাব?

রাত দুপুর। আলো নেই, জনমানবের শব্দসাড়া নেই। বড় সোলমাছ গাঁথে এই সময়। তলতাবাঁশের ছিপ বেধড়ক লম্বা—আঠার-বিশ হাত অন্তত। সুতো খুব মোটা—সোলো সুতা নাম হয়েছে সোলমাছ ধরার জন্য বিশেষ ধরনে পাকানো এই সুতোর। বড়শিও রীতিমতো মোটা। ভাঁড় ভরতি টোপ জোগাড় করে রেখেছে—ক্ষুদে-বেঙ। একটা করে বেঙ বড়শিতে গেঁথে ছুঁড়ে দিচ্ছে যতখানি দূরে যায়। জলের উপর দিয়ে তরতর করে আলগোছে টেনে নিয়ে আসে কাছের দিকে। নাচিয়েই যাচ্ছে বেঙ, আরাম-বিরাম নেই, হাত টনটন করছে, মাছ কিছুতে লাগে না, কি হল? বিড়বিড় করে চলতি ছড়া বলে মাছ ডাকছেঃ আমার নাম ইলসে, টপাস করে গিলসেঃ

অনেকক্ষণ ধরে এমনি করতে করতে হুড়ুম করে দূরের জলে আফালি। দয়া হল তবে মাছের বেটার, টোপ নজরে পড়ল? হাতের টনটনানি কোথায় উপে যায়—মস্ত হস্তির জোর ডান-হাতখানায়। টোপ ছুঁড়ে দেয়, কাছে টেনে টেনে আনে। ফেলছে আর তুলছে। জীবন্ত বেঙ চাই—একটা বেঙ যেই মরে গেল, ফেলে দিয়ে নতুন একটা গাঁথে। চলে এমনি? হঠাৎ বাঘের আক্রমণের মতো দামের ভিতর থেকে লাফিয়ে উঠে বড়শি সুদ্ধ বেঙ গিলে ফেলল। অসহ্য পুলকে সাহেব দু-হাতে টান দেয়। সুতো ছিঁড়বার শঙ্কা নেই—কিছুতেই না। খলখল করে মাছ আসে টানের সঙ্গে। আসতে কী চায়, কী জোর সোলমাছের গায়! এই কিন্তু হয়ে গেল—এই জায়গায় কিম্বা আশে-পাশে আজ আর মাছ উঠবে না। যত মাছ সামাল হয়ে গেল। গরজও নেই, চলে যাবে সাহেব এইবার।

খানিকটা দূরে ডাইনের জঙ্গল থেকে মানুষের গলা। আরে, বংশীর গলা যে—মাছ মারতে সে-ও জঙ্গলে ঢুকে আছে। বলে, উঠে গেল ডাঙায়?

এক অপরিচিত কণ্ঠ সঙ্গে সঙ্গে বাঁয়ের দিক থেকে। কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না—বংশীর দেখাদেখি সে মানুষটাও বলে উঠল, কতবড় মাছ রে বাবা, দত্যিদানোর মতো হুল্লোড় লাগিয়েছে—

সোলমাছ পোনা ছেড়েছে, ধরবার এই মহেন্দ্রক্ষণ—ব্যাপারটা নফরকেষ্ট একলাই দেখেনি। ডাইনে-বাঁয়ের এই দুটি এবং দীঘির চতুর্দিকে জঙ্গলের অন্ধকারে আরও কত জনা ঘাপটি মেরে আছে, ঠিক কি! কথা বলা মছুড়ের পক্ষে অপরাধ, মরে যাবে তবু টু শব্দটি হবে না। কথাবার্তায় মাছ সরে যায়। সে ক্ষতি একলা তোমার নয়, যত এসে ছিপ হাতে বসেছে সকলের। বংশী এবং বাঁ-দিকের লোকটা দীর্ঘক্ষণ বসে নিরাশ হয়ে উঠি উঠি করছে, এমনি সময় সাহেবের মাছ ধরার আওয়াজে দেহমন দাউ দাউ করে উঠল। ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে মাছুড়ের নিয়ম ভেঙে সশব্দে বলে, উঃ, কত বড় মাছ!

বংশী এবং সেই লোকটা ছিপ গুটিয়ে বনবাদাড় ভেঙে সাহেবের কাছে সত্যিই মাছ দেখতে এল : দেখি গো, দেখি। ওজনে কী দাঁড়াবে, মনে হয়?

বংশী বলে, কপাল বটে তোমার সাহেব! খাসা মাছখানা গেঁথেছ। বিস্তর পুরানো—সাহেব-মেমরা দীঘির জলে ঝাঁপাঝাঁপি করত, তাদের গায়ের তেল-সাবান খেয়েই এই চেহারা।

উঠবে নাকি, না দেরি আছে তোমার? নফরকেষ্টর উদ্দেশে সাহেব ডাক দেয়। দু-জনে একসঙ্গে বেরিয়েছে—দীঘির পাড়ে পেঁছানোর পর আর তখন সম্পর্ক নেই। যে যার পছন্দমত জায়গা নিয়ে নিল।

সাহেব পুনশ্চ ডাকে : আমি চললাম, যাবে তো এসো। নফরকেষ্টর জবাব নেই। ছোঁড়াটাকে আজকেই ছিপ ধরাল—হাতে মাছ ঝুলিয়ে সে এবার ড্যাং-ড্যাং করে বাসায় ফিরবে, নফরা পিছু পিছু শূন্য হাতে যায় কোন্ লজ্জায়? চেঁচিয়ে গলা ফাটালেও এখন সাড়া দেবে না। মাছ না পেলে সকাল অবধি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেঙ নাচাবে।

যেতে যেতে বংশী সঙ্গের মানুষটির পরিচয় দেয়ঃ তুষ্টুচরণকে দেখনি তুমি সাহেব! এই ফুলহাটার লোক। গাঁয়ে থাকে না, আজকেই এলো। বলাধিকারীমশায় কেবল তো আশা দিয়ে ঘোরাচ্ছেন—তুষ্টুকে বলছিলাম, নিয়ে আয় দেখি জুত মতন একটা কাজের খবর।

পয়লা দিনই মাছ পেয়ে সাহেবের স্ফূর্তি ধরে না। রোজই আসে। নফর-কেষ্টকে বরঞ্চ এক এক রাত্রে ঘুমে পেয়ে যায়। সে আসে না, সাহেব একলাই আসে তখন। একটা হেরিকেন হয়তো হাতে করে এলো। দীঘির পাড় থেকে বেশ খানিকটা দূরে রেখে দেয়। খুব জোর কমিয়ে—আলো আছে কি না আছে। আলোর রেশ বাইরে না আসে—জলের মাছ কিম্বা জঙ্গলের মাছুড়ে কেউ বুঝতে না পারে।

রাত্রিবেলার কাজটা হল ভালই। দিনমানে আছে মুকুন্দ মাস্টার। মুকুন্দের সঙ্গে ভাব আরও জমেছে—সাহেব বলে ছোড়দা, মুকুন্দ বলে সাহেব-ভাই।

ইস্কুলের এক ছুটির দিন দুজনে বেলাবেলি বেরিয়েছে। যাবে হাটখোলা অবধি। হাটের দিন নয়, কিছু চাল-ডাল নুন-তেল কেনাকাটা আছে মুকুন্দর নিজের জন্য। সাহেব বলে, চলুন না, আমি কাঁধে বয়ে আনব।

মুকুন্দ কিন্তু-কিন্তু করে। সাহেব অভিমান ভরে বলে, তবে আর ছোট ভাই কিসের? ওটা মুখের কথা আপনার। ইস্কুলের শিক্ষক হয়ে ঘাড়ে চালের বস্তা—লোকে দেখে কি মনে করবে?

এর উপর আপত্তি চলে না। যেতে যেতে সাহেব আবার বলে, দেখাসাক্ষাৎ কথা-বার্তা যত-কিছু এমনি পথের উপরে ছোড়দা। আপনার আসরে আর যাব না, যাবার উপায় নেই, নিন্দে হচ্ছে।

মুকুন্দ বুঝল অন্য রকম। মরমে মরে গিয়ে বলে, জানি সাহেব-ভাই। এত সদাচারে থাকি, পিতৃপাপের তবু প্রায়শ্চিত্ত হল না। জন্মের উপর কারো হাত নেই, এটা মানষ বুঝে দেখে না।

সাহেব হেসে ফেলেঃ তাই বুঝি বললাম! পাপ যদি কিছু থাকে, সে সদাচারের। মনে-প্রাণে ভালো আপনি—আপনার আসরে হরবখত বসে আপনার পাঠ শুনে শুনে আমিও নাকি ভালো হয়ে যেতে বসেছি, সেই নিন্দের রটনা।

মুকুন্দ আশ্চর্য হয়ে বলে, নিন্দে তো মন্দের নামে রটে। ভালো যদি হও, তাই নিয়ে নিন্দে হবে কেন?

আপনারা ভালো কিনা ছোড়দা, আপনাদের কাছে মন্দর নিন্দে। আমরা মন্দরা ভালোর নিন্দে করি। দল হল দুটো—ভালোর দল আর মন্দর দল। আপনি ভালোর দলে বলে মন্দর নিন্দে কানে যায়। শুনে ভাবেন, এই বুঝি সমস্ত। আপনাদের ধারণা দুনিয়াসুদ্ধ মানুষ ভালো হবার জন্য পাগল, নিজেদের দিয়ে বিচার করেন। একপেশে বিচার। ইচ্ছাসুখে উভয় দলে পড়বারই মানুষ আছে।

পরক্ষণে সংশোধন করে নিয়ে বলে, ভুল হল ছোড়দা। আরও একটা দল আছে, গুণতিতে তারাই ভারী। মন্দকে বাপান্ত করে ভালোর গুণ গায়। মনে মনে বলে

ঠিক উল্টো ঃ কাজের মানুষ মন্দরা, ভালোগুলো অপদার্থ।

মুকুন্দ সবিস্ময়ে তাকিয়ে পড়ে ঃ নতুন নতুন কথা বলছ সাহেব-ভাই।

থাকি যে বলাধিকারীমশায়ের কাছে। ভালো পথ মন্দ পথ—দু-দিকের হদ্দমুদ্দ দেখা আছে তাঁর। আপনারা একচক্ষু হরিণ হয়ে একটা পথই দেখেন শুধু। ভিন্ন পথের হলে গালি দিয়ে ভূত ভাগাবেন। নিজের বাপ বলেও রেহাই নাই।

পচা বাইটার নিন্দায় সাহেব ক্রুদ্ধ হয়েছে, এতক্ষণে সেইটে ফুটে বেরুল। বলে, বাপের লজ্জায় মাথা কাটা যায়, বাপের জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে বিবাগী হয়েছেন আপনি —আবার কতজন আছে বাবা-বাবা করে দুনিয়াময় খুঁজে বেড়াচ্ছে। এত ঘেন্না করেন কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কতটুকু জানেন আপনি সেই বাপ-মানুষটার ?

বিরক্ত হয়ে মুকুন্দ সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় ঃ তবে তো চোর হতে হয়। চোর না হয়ে চোরকে জানব কি করে ?

পাশাপাশি হেলতে দুলতে যাচ্ছিল দুজনে, হঠাৎ সাহেব দ্রুত পা চালাল।

মুকুন্দ ডাকে ঃ রাগ করলে নাকি সাহেব-ভাই ? বাপ আমার—আমি যেটুকু জানি, তুমি তো তা-ও জান না। তোমার রাগের কারণটা কি ?

জবাব না দিয়ে সাহেব গতিবেগ আরও বাড়িয়ে দিল। মকুন্দ অনেকটা পিছনে।

বটে ! ছেলেমানুষি কাণ্ড দেখে মুকুন্দ হেসে ফেলে ঃ খোঁড়া-মানুষ ভাবলে নাকি আমায়—ধরতে পারব না ?

লহমার মধ্যে মুকুন্দ সাহেবের পাশে চলে এলো। সগর্বে বলছে, ইস্কুলে পড়ার সময় দৌড়ে ফার্স্ট হতাম আমি ; কোন ছেলে আমার সঙ্গে পারত না। অনেকদিন অভ্যাস নেই—তা হলেও নিতান্ত হ্যাক-থুঃ করবার নয়। দেখলে তো !

বিনাবাক্যে এবার সাহেব দৌড় দিল—হাঁটনা নয়, পুরোপুরি দৌড়। মুকুন্দরও রোখ চেপে যায় কেমন। মাইনর-ইস্কুলের মান্যগণ্য শিক্ষক, সে কথা মনে রইল না। আবার যেন ছাত্র হয়ে একশ গজের রেস দৌড়াচ্ছে। সাহেব প্রতিযোগী—তাকে হারিয়ে দিতে হবে। হারিয়ে প্রাইজ নেবে। তীর-বেগে দৌড়াচ্ছে। সাহেবও মরীয়া, তবু তাকে হার মানতে হয়। দৌড়াতে জানে বটে মুকুন্দ, বিস্তর আগে চলে গেছে।

অকস্মাৎ সাহেব এক কাণ্ড করে বসল। চোর—চোর—বলে চিৎকার ঃ টাকা চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে চোর—

এই সময়টা এক বিদেশি যাত্রা-দল মাঠ ভেঙে রাস্তার উপর উঠল। জন কুড়িক হবে। সাহেবের চিৎকারটা বোধকরি তাদের দেখেই। রে—রে—করে দলসুদ্ধ ছুটে আসে। হতভম্ব মুকুন্দ আগেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। ধান-কাটার মানুষ তখনো মাঠে। গরু-ছাগল নিয়ে রাখালদেরও ঘরে ফিরবার সময় এই। দেখতে দেখতে লোকারণ্য। চোরের উপর জনতার কিছু প্রাথমিক কর্তব্য থাকে, সেই লোভে এত লোক কাজকর্ম ফেলে ছুটেছে। অল্পসল্প সে ব্যাপার হয়েও থাকবে ইতিমধ্যে। আরও হত— সাহেব এসে পড়ে হি-হি করে হাসে ঃ ঠাট্টা রে ভাই, সত্যি-চোর কেন হতে যাবেন ! চোর বলে ছোড়দাকে চমক দিয়ে দিলাম।

তা-ও কি শুনতে চায়? আশাভঙ্গ হয়ে লোকে তখন সাহেবের উপর মারমুখি: মিথ্যে বলে ঠেকিয়ে দিচ্ছ, চালাকির জায়গা পাও না! বেশ তো, উনি চোর না হলেন—ওঁর মারটা তুমিই খেয়ে দাও তবে।

রক্ষে হল, চাষী-রাখালের কয়েক জন চিনতে পারল মুকুন্দকে: আরে মাস্টারমশায় যে! উনি কখনো চোর হতে পারেন—ছিঃ ছিঃ!

কেন পারবেন না, হতে বাধাটা কি? হাত-পা থাকলে যে কেউ যা-খুশি হতে পারে। লোকটা যাত্রা দলে ভীম-রাবণ সেজে প্রতি আসরে লড়াই করে বেড়ায়—কিছুতে নিরস্ত হবে না। বলে, হাত দুটো নুলো আর পা দু-খানা খোঁড়া—তারাই শুধু পারে না। তাই তো করতে যাচ্ছিলাম—সবাই মিলে বাগড়া দিচ্ছ, হবে কেমন করে?

মজা নেই, ভিড় সরে গেল ক্রমশ। দু-জনে নিঃশব্দে চলেছে। এক সময় মুকুন্দ বোমার মতো ফেটে পড়ে: কী রকমের ঠাট্টা হল শুনি?

সাহেব অবিচল কণ্ঠে বলে, পিতৃনিন্দা মহাপাতক, চোর হয়ে সেই পাপেই একটুখানি শাস্তি নিলেন। যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন। বেয়াড়া মন আমার—মমতা এসে গেল যে—প্রায়শ্চিত্তটা পুরোপুরি হতে পারল না।

রাগ করে মুকুন্দ আর একটা কথা বলে নি সমস্ত পথের মধ্যে।

বলাধিকারী একদিন সাহেবকে ডেকে মাছ ধরার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সাহেব বর্ণনা দেয়। শুনে বলাধিকারী পিঠ ঠুকে দেন: এ-ও দিব্যি রাতের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে তোদের। আলোর সঙ্গে শত্রুতা। এই কায়দাগুলোই ভাল করে রপ্ত করে রাখ, আসল কাজে দরকার পড়বে। মরশুমের সময় রাত্রি হলেই বিনি আলোয় ঘুট-ঘুট করে ঘুরতে হবে, বুঝলি?

এক রাত্রে সাহেব অমনিধারা ছিপে বেঙ নাচাচ্ছে। ঠাণ্ডাহিম এক বস্তু পায়ের পাতায় উঠল। সড়সড় করে সরছে। সাপ তাতে সন্দেহ নেই। অনড় একটা কাঠের খুঁটির মতন সাহেব দাঁড়িয়ে রইল, নিশ্বাসটাও বুঝি বইছে না। মানুষ বুঝলেই গর্জে উঠে ফণা তুলে দেবে ছোবল। দীর্ঘ দেহটা ধীরে ধীরে পার করে নিয়ে সাপ চলে গেল। আবার সেইসময় একটা আওয়াজ পাওয়া গেল জলে। মাছ এসেছে, এখন কিছুতে জায়গা ছেড়ে নড়া যায় না। যেমন ছিল ঠিক সেইরকম দাঁড়িয়ে বেঙ ছুঁড়ে দেয় দূরে, কাছে টেনে আনে। আবার ছুঁড়ে দেয়, আবার টেনে আনে কোনকিছুই হয়নি যেন, মিনিটখানেক মাত্র চুপচাপ ছিল। বহুক্ষণ এমনিধারা বেঙ নাচিয়ে মাছ ধরে নিয়ে শেষরাতের দিকে বাসায় ফিরল।

এই খবর কী করে জগবন্ধুর কানে গেছে। কেউটেসাপ পায়ের উপর উঠেছে, একচুল তবু নড়ে নি। মুগ্ধ বিস্ময়ে একটুখানি তাকিয়ে থেকে সাহেবের মাথায় তিনি হাত রাখলেন। বলেন, তাজ্জব হলাম রে সাহেব। লেগে থাক, খুব বড় হবি তুই। দেহের উপর আর মনের উপর যার পুরো আধিপত্য, বড় চোর সে-ই কেবল হতে পারে। বড় সাধু হবার জন্যেও ঠিক এই উপদেশ। চোর হোস আর সাধুই হোস,

সাধন-পথের খুব বেশি তফাত নেই।

আরও অনেক কথা বললেন এইদিন। চোরের সমাজে দুটো পাপের ক্ষমা নেই—মিথ্যাচার আর নারীঘটিত অপরাধ। দল থেকে সঙ্গে সঙ্গে তাড়াবে, গায়ে থুতু দেবে দলের লোক। সর্বকালের এই বিধি। সমরাদিত্য-সংক্ষেপের সেই যে গল্প ঃ চোর-গুরু শিষ্যকে মন্ত্র দিচ্ছেন—চুক্তি হল, কদাপি সে মিথ্যা বলবে না। কিন্তু গুরুবাক্য না মেনে দৈবাৎ সে মিথ্যা বলে বসেছে। তারপর যে-ই মাত্র ঘরে ঢোকা, হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেল।

বলাধিকারীর কথা দৈববাণীর মতো ফলেছিল। সাহেব কত বড় বড় কাজ করল জীবনে। জুড়নপুরের আশালতার কবলে পড়েছিল এরই কিছুকাল পরে। সাপের চেয়ে অনেক সাংঘাতিক ব্যাপার। সাপে পেঁচিয়ে ধরলে শুধুমাত্র নিশ্বাস চেপে নিঃসাড় হয়ে থেকে বিপদ কাটে, ঘুমন্ত রমণীর কবল কাটিয়ে বেরুনোর জন্য সাড়া জাগিয়ে চঞ্চল হয়ে কাজ করতে হবে। সেই রমণী যেমনটা চায়, তারই সঙ্গে মিল রেখে। এবং সেই সঙ্গে চৌরকর্মও সারতে হবে। কেউটে সাপ কোন ছার এর তুলনায়! সাহেব তাই নিখুঁতভাবে করেছিল ওস্তাদ পচা বাইটার শিক্ষায় আর মহাজন জগবন্ধু বলাধিকারীর আশীর্বাদের জোরে।

যাক সে কথা। ছিপ নিয়ে কুঠির দীঘিতে আসা সাহেবের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। যত রাত বাড়ে, মন চনমন করতে থাকে, বাসার কামরায় চুপচাপ পড়ে থাকতে পারে না। রীতরক্ষার মতো নফরকেষ্টকে একবার দু-বার ডাক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

একদিন আরও বিষম কাণ্ড। অদূরে অন্ধকার নাটবাগানের দিকে কচরমচর করে কি যেন চিবাচ্ছে—শব্দটা কানে এল সাহেবের। একঝোঁক বাতাস এল সেই দিক থেকে—বাতাসে দুর্গন্ধ। দীঘির পাড় ছেড়ে চলে যেতে পারে না—চলতে গিয়ে গাছপালা নড়বে, শব্দ হবে একটুখানি নিশ্চয়। অনেকক্ষণ সেই একটা জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে একসময় বেরিয়ে এলো। এবং পরের দিন শোনা গেল, গোবাঘার ভুক্তাবশেষ খানিকটা নাটবাগানে পড়ে আছে। তবু কিন্তু সেই পরের রাত্রেও যেতে হবে। মস্তবড় দায়িত্বের কাজ যেন, কামাই দেবার উপায় নেই।

ক্বচিৎ কখনো মস্করার ব্যাপারও ঘটে। মস্করা যাঁরা করেন, তাঁদের দেখতে পাওয়া যায় না, বাতাসে অদৃশ্যরূপে থাকেন। সাহেব এত সমস্ত জানত না, তিলমাত্র সন্দেহ হয় নি। তেমনভাবে লক্ষ্যও করেনি একটা দিন ছাড়া। সেই রাত্রে বড্ড বেশি ঘটতে লাগল। বড়শিতে বেঙ গেঁথে দূরে ছুঁড়ে দিয়ে সাহেব যথারীতি টেনে টেনে আনছে। ছুরুরু করে অদ্ভুত একটা শব্দ—তার পরে বেঙ আর নেই, খালি বড়শি। একবার দু-বার হলে না হয় বলা যেত, বড়শি থেকে বেঙ খুলে পড়ে গেছে। যতবার গেঁথে ফেলছে ঐ এক ব্যাপার! সে রাত্রে কিছুই হল না, পণ্ডশ্রম। বড় আশ্চর্য লাগে।

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য বিচক্ষণ বহুদর্শী লোক। দূর-আকাশের অদৃশ্য অজ্ঞাত

গ্রহনক্ষত্র নিয়ে কাজকারবার, সেই মানুষ এই ব্যাপারের হয়তো কিছু হদিশ দিতে পারবে। হল তাই। সাহেবের মুখে শুনে ক্ষুদিরাম চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে পড়ে। কী সর্বনাশ, এর পরেও ছিলে তুমি সেখানে, নতুন বেঙ গেঁথে গেঁথে ফেলতে লাগলে? অন্য কেউ হলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেরুত। তা-ই উচিত। বেঙ নিয়ে মজা করতে করতে, ধরো, তোমার মুণ্ডুখানা ছিঁড়ে দীঘির দামের নিচে ঠেস শেষ মজাটা করলেন। ওঁদের কি—মতলব একটা এসে গেলেই হল।

সেই রসিকবর্গের কিছু পরিচয় না শুনে নিয়ে সাহেব নড়বে না। ক্ষুদিরাম অবাক: কী আশ্চর্য, খবর রাখ না এদ্দিন এখানে আছ? গুণতিতে ওঁরা তো একটি-দুটি নন—জানাও নেই সকলের কথা। কেউ জানে না। কুঠির দীঘি আর পাড়ের পুরানো তেঁতুলগাছটার যদি বাকশক্তি থাকত তারাই সব বলতে পারত। এক মাতাল সাহেব এখানকার এক কাওরা মেয়ের সঙ্গে প্রণয় জমিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ছিল। বিলেত থেকে মেমসাহেব এসে পড়ল। সাঁতারের নামে সাহেব তাকে ডুবিয়ে মারতে গেল: মেমটাও তেমনি দুঁদে, গায়ে অসুরের মতো বল। নিজে গেল, গলা জড়িয়ে ধরে সাহেবটাকেও নিয়ে গেল সঙ্গে করে। মেয়ে নিয়ে আরও একটা ব্যাপার আমার চোখের উপরেই ঘটল। বেচা মল্লিকের প্রণয়িনী মুক্তাময়ী। ভাল ঘরের পরম রূপসী মেয়ে—কী দেখে মজল জানিনে। পরিণাম হল, দুর্গাপূজার পদ্ম তুলতে গিয়ে লোকজন দেখল, মুক্তাময়ী মড়া হয়ে ভাসছে। পেট ফুলে ঢোল। আরও কত আছে, ক'টাই বা বাইরে প্রকাশ পায়? অপঘাতে গিয়ে তাঁরাই এখন জমিয়ে আছেন, ফুর্তিফার্তি করেন রাতবিরেতে?

সাহেব বলাধিকারীর কথা তোলে। কুঠিবাড়ির ভাঙা অট্টালিকায় তাঁকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। বলে, অল্পের জন্য বেঁচে এসেছেন। মেরে ফেলে তাকেও তো ঐ রকম দামের ভিতর চালান দিত।

ক্ষুদিরাম ঘাড় নাড়ে: ক্ষেপেছ? অমন গুনীজ্ঞানী মানুষ কেন মারতে যাবে? বেঁচেবর্তে থেকে এখন কত কাজ দিচ্ছেন! বেচারাম কি বোকা? বোকা হলে অত বড় কাপ্তেন হওয়া যায় না। মারবার তো কতই কায়দা ছিল, সেই মুখ-বাঁধা অবস্থায় ধাক্কা দিতে পারলে ছাতের উপর থেকে, টু শব্দটি হত না। ঝুলিয়ে রাখতে যাবে কি জন্য?

হেসে বলে, একদিন সঙ্গে করে নিয়ে জায়গাটা দেখাব। চোখে দেখলে বুঝবে।

মুচকি হেসে বলে, আমি ছাড়া অন্য কেউ পারবে না। খোদ বলাধিকারী-মশায়ও না। চোখ-মুখ বাঁধা তাঁর সেই সময়। তার পরেই তো অকুস্থল থেকে সরিয়ে দিল।

সাহেব একদিন নফরকেষ্টকে চেপে ধরে: রেলগাড়ির রোজগারের ভাগ পেলাম কই?

নফরকেষ্ট বলে, পাচ্ছিস বই কি! দরকার হলেই তো পাস। হরবখত এই যে হাটে গিয়ে এটা-ওটা কিনিস, মিষ্টিমিঠাই খাস—খরচা আমিই তো দিয়ে থাকি। বল

সেটা—আমি, না অন্য কেউ ?

আবার বলে, এখন কোন্ খরচের দরকার বল্। চেয়েই দেখ একবার, সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাস কিনা।

সাহেব জেদ ধরে বলে, ওসব জানিনে। নিত্যিদিন কেন চাইতে যাব ? কেন হাত পাতব তোমার কাছে ? ভিক্ষে নয়, যা আমার ন্যায্য বখরা, হিসাবপত্তর করে মিটিয়ে দাও। ঢুকে গেল।

নফরকেষ্ট আহত স্বরে বলে, আমি হাতে করে দিলে সেটা বুঝি ভিক্ষে হয়ে গেল ? এত বড় কথা বলতে পারলি তুই ! মাথার উপরে বড় যারা থাকে, তাদের সঙ্গে বখরা করতে হয় না। গরজের সময় বুঝেসমঝে তারা দিয়ে দেয়।

কী কারণে সাহেবের মেজাজটা আজ চড়া। ভ্রূভঙ্গি করে বলে, মানুষ তো ডেপুটি—কারিগরের সঙ্গে সঙ্গে পোঁ ধরে বেড়ানো তোমার কাজ। মাথার উপরে কে তোমায় চড়িয়ে দিল শুনি ? বড়ই বা হলে কিসে ? ও সমস্ত না দেবার ফিকির। টাকা গেঁথে গেঁথে তুমি ঠিক পালানোর মতলবে আছ। ফিরে টোপ ফেলে বেড়াবে, এতকাল যেমনধারা করে এসেছ।

নফরকেষ্ট ক্ষিপ্ত হয়ে যায়ঃ মাথার উপর আমি কি নতুন চড়েছি, বড় কি এই আজকে থেকে ? ফাঁকি-মেকির বড় হওয়া নয়, বাপ হই তোর—পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম। দু-দিনের বাচ্চা, সুধামুখীর আঙুলের মধু চুকচুক করে খাচ্ছিলি, তখন থেকেই বাপের দাবিদার। সুধামুখী জানে, তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করিস, আর জিজ্ঞাসা করবি কর্পোরেশন-ইস্কুলের মাস্টারমশায়দের। তাঁরা তো মরে যাননি। মরলেও খাতাখানা রয়েছে—আপিসের এই মোটা কালো খাতা। পড়ে দেখিস, বাবা তোর কে ? মুখে না বললেই উড়ে গেলাম আর কি ? টের পাসনি ছোঁড়া, মামলা করে হাকিমের কাছ থেকে 'বাবা' বলবার রায় নিয়ে আসব।

রাগের বশে আবোল-তাবোল বকে যায় নফরকেষ্ট। সাহেব চুপ করে শোনে। তারপর প্রবীণোচিত ভঙ্গিতে বলে, হাকিমের রায়ে কি বাপ হওয়া যায় ? কত আসল বাপই দেখগে ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াচ্ছে বাপ হয়ে থাকার কায়দা জানে না বলে। আমার এত কষ্টের কারিগরির বখরা যদি বাপ সেজে গাপ করে ফেল, তোমার সঙ্গে কোন কাজে আর আমায় পাবে না। থাকবই. না একসঙ্গে। চোখের উপর বলাধিকারীমশায়ের ব্যবস্থাটা দেখ। কাজ একখানা নেমে গেলে হিসাবের পাইপয়সা অবধি সঙ্গে সঙ্গে হাতে গুঁজে দেবেন। কাজের মধ্যে শুধুকাজেরই সম্পর্ক। দশরকম ধানাই-পানাই করলে বিশ্বাস নড়ে যায় তখন, কাজের কোন জোর থাকে না।

বলাধিকারীই মধ্যবর্তী হয়ে সাহেবের প্রাপ্য হিসাব ধরে তাকে দিয়ে দিলেন। এই কাজে তাঁর জুড়ি নেই। সামান্য কয়েক টুকরো সোনা আর রুপো এদের—এত তুচ্ছ জিনিস বলাধিকারীর মতো মহাজন আঙুলে স্পর্শ করেন না। সামনে এনে ধরতেই সাহস করবে না অন্য কেউ। সাহেবকে কী চোখে দেখছেন, তার কথায় দায়িত্ব নিয়ে নিলেন। কিন্তু নফরকেষ্ট ভেবে পাচ্ছে না, সাহেবের হঠাৎ কী

এত টাকার গরজ পড়ে গেল। সে গরজ এমনি যে নফরকেষ্টর হাত দিয়ে খরচ হলে হবে না। মরে গেলেও নফরের কাছে তা প্রকাশ করা চলবে না। ফড় নামে যে জুয়াখেলা, তারই দু-তিনটে দল হাটে হাটে খেলতে আসে। ফড়ে জিতে সেই টাকা খরচ করে আসবার এবং ফড়ে হেরে মনোদুঃখ নিবারণেরও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা না আছে এমন নয়। মনে দুর্ভাবনা, তেমনি কোথাও জমে পড়ল নাকি সাহেব ?

টাকাকড়ি নিয়ে সাহেব ভাঁটিঅঞ্চলের সব চেয়ে বড় হাট বড়দলে চলে গেল। এবং তারই কয়েকটা দিন পরে চোখে পড়ে, হাতবাক্স খুলে বলাধিকারী তাকে পয়সা দিচ্ছেন।

নফরকেষ্টর সর্বদেহ হিম হয়ে যায়। ছেলের বাপের বোধকরি এমনিটাই হয়ে থাকে। যে শঙ্কা করেছে, মিথ্যা নয় তবে তো ! সাহেবকে এক সময় একান্তে ধরে ফেলল ঃ কিসের পয়সা দিলেন বলাধিকারী ?

সাহেব বলে, দেখে ফেলেছ ? তোমায়, আর বোধহয় মা-কালীকেও লুকিয়ে কিছু হবার জো নেই। শুধু আমায় কেন, বলাধিকারী এমনি অনেক জনকে দিয়ে থাকেন। নইলে মহাজন কিসের ! দাদনের পয়সা, কাজকর্ম করে শোধ হবে।

কিন্তু সেদিন যে এতগুলো টাকা গণে নিলি। টাকা আনা পয়সা অবধি হিসাব করে।

সাহেব হি-হি করে হাসে ঃ টাকা-আনা-পয়সা সমস্ত লোপাট। থলিটা অবধি। বড়দলের হাটের মধ্যে কোথায় পড়ে গেল, হাটুরে মানুষ নিয়ে নিয়েছে। বেশি নয়, চার গণ্ডা পয়সা—শুধু-হাতে থাকতে নেই, বলাধিকারীমশায়ের কাছ থেকে তাই নিয়ে নিলাম।

মনের কথা নফরকেষ্ট স্পষ্টাস্পষ্টি বলতে পারে না। বললেই তো বচসা বেধে যায়। অন্য দিক দিয়ে গেল ঃ আমি সামনের উপর থাকতে চার আনার জন্যেও অন্যের কাছে হাত পাতবি ?

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সে যাকগে, আমি একটা মানুষ—আমার আবার মান-অপমান ! কিন্তু সুধামুখী বলে আর-একজন বর্তমান রয়েছে, তার সঙ্গে দেখা হবেই। আজ না-হোক কাল না-হোক, হবে তো একদিন দেখা ! বুক ফুলিয়ে ছেলে নিয়ে বেরুলাম, ছেলের ভালমন্দ কিছু দেখিনি সুধামুখী যখন বলবে, কী জবাব আমার তার কাছে ?

কালীঘাটের ফণী আড্ডির বস্তিতে সুধামুখী দাসীর নামে মনিঅর্ডার। পাঠাচ্ছে নফরকৃষ্ণ পাল, বড়দল নামক পোস্টাপিসের সিলমোহর। জেলা খুলনা, কষ্টেসৃষ্টে পড়া গেল একরকম। কিন্তু জায়গাটা কোথায়, সঠিক কেউ হদিস দিতে পারে না। নফরকেষ্ট গিয়ে সেই অঞ্চলে জুটেছে। সাহেবকেও সে নিয়ে বের করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই বড়দল জায়গায় দুজনে যদি একত্রে থাকে, তবু অনেকখানি

নিশ্চিন্ত। পুলিসের খাতায় দাগি বটে, কিন্তু আসলে নফরা মানুষটি ভালো। সরল, স্নেহময়—এবং পাহাড়ের মতো দেহ থাকা সত্ত্বেও করুণার পাত্র। কী এমন সম্পর্ক মানুষটার সঙ্গে। তবু দেখ, সুধামুখীর অচল অবস্থা বুঝে মনিঅর্ডারে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। কুপনে অনেক কথা লেখা যায়, টাকার সঙ্গে ফাউস্বরূপ চিঠি পাঠানোর ব্যবস্থা ডাকের কর্তারা করে দিয়েছে। কিন্তু এই কুপনখানায় শুধুমাত্র নফরকৃষ্ণ পালের নাম, আর টাকার অঙ্ক। নিজের কথা নাই লিখল, "সাহেব ভাল আছে"—কথা কটা লিখতেও এত আলস্য?

আর একটা জিনিস অবাক করেছে! কুপনে লেখা শুধুমাত্র টাকায় নয়—আনাও টাকার সঙ্গে। কোন-একটা হিসাব করেছে বুঝি তার সম্বন্ধে—টাকা—আনায় পুরো-পুরি হিসাব শোধ। পয়সার মনি অর্ডার চলে না, পয়সা পাঠাতে পারেনি সেজন্য।

ভেবেচিন্তে সুধামুখী একখানা পোস্টকার্ডে চিঠি লিখে খুলনা জেলার বড়দল নামক পোস্টাপিসে নফরকৃষ্ণ পালের নামে :

সাহেব কেমন আছে, সেই সংবাদ অতি অবশ্য জানাইবে। টাকা চাহি না। মা-কালীর পাদপদ্মে পড়িয়া আছি, তৎপ্রসাদাৎ যেভাবে হউক কাটিয়া যাইবে। সাহেবকে লইয়া পত্র পাঠ মাত্র চলিয়া আইস, তাহার জন্য পাগলিনীপ্রায় হইয়া আছি।

পারুল এল এমনি সময়। বলে, নফরকেষ্টর নিন্দে করতে দিদি। টাকাকড়ি কেড়েকুড়ে রেখে তবে নাকি তার ভালবাসা বজায় রাখতে হয়। সে কথা কত মিথ্যা, বোঝ এইবারে। মনিঅর্ডার করেছে—বিদেশে গিয়ে চাকরে বর যেমনধারা বউয়ের নামে টাকা পাঠায়।

চিঠি লেখা বন্ধ করে সুধামুখী কলম রেখে দিল। কলকণ্ঠে পারুল বলে ওঠে, বরকে বুঝি লিখছিলে? ওমা আমার কী হবে, প্রেমপত্তর পোস্টকার্ডে লেখে নাকি কেউ?

সুধামুখী বলে, প্রেমপত্তরে পাঠ কি দিলাম শুনবি নে? হাড়মাস-কালি করা নফরকালি আমার—

যাও। একগাদা টাকা পাঠাল, ঐসব তুমি লিখতে যাচ্ছ! পাঠ শুনে কি হবে, কাজের কথা কি লিখেছ, তাই একটু পড়ো—

হাসতে হাসতে বলে, ছোটবোনের যেটুকু শোনা যায়, তেমনি করে রেখে-ঢেকে বলো। সুবিধা আছে—ছোট-বোন নিজে পড়তে পারবে না।

নিশ্বাস পড়ল সুধামুখীর। ধ্বক করে মনে পড়ে যায়, সেই কতকাল আগে বেলেঘাটার বাড়ির ছোটবোনগুলোর কথা। বর যেন তার জগৎ-পারের অজানা মৃত্যুলোকে নয়—সুদূর বিদেশে নিরুদ্দেশে আছে, সেখান থেকে মনিঅর্ডার করেছে হঠাৎ। সুধামুখী বরকে চিঠি লিখতে বসেছে, একটা বোন সকৌতুকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে—দেখবে একটুখানি প্রেমপত্র। সে আমলে বান্ধবীদের বাড়ি কত এমন দেখেছে, তার জীবনে হবারই বা কী বাধা ছিল? হল না।

নিশ্বাস ফেলে চিঠিখানা তুলে নিয়ে সুধামুখী বলে, মাত্র এইটুকু লিখেছি শোন—

শুনে পারুল অবাক হয়ে বলে, টাকা চাও না—এটা তুমি কি লিখলে দিদি? কত বড় দায়ের সময় টাকাটা এসে গেল। নইলে কী হত বল দিকি, জনে জনের কাছে হাত

পেতে বেড়াতে হত। আর এমন দায়বিপদ লেগেই তো আছে আজকাল।

সুধামুখী বলে, লিখেছি বলেই বিশ্বাস করবে, তবে আর কী প্রেমের মানুষ! পাঠিয়েছে তো নিজে গরজ করে, চাইতে হয়নি। আবার যদি ইচ্ছে হয়, চাইনে লিখলেও পাঠাবে। মানা শুনবে না।

দু-চোখে হঠাৎ ঝরঝর করে জল নামে: প্রাণের টানে কেউ কিছু দিয়েছে, এ-জিনিস আমার কাছে নতুন। একেবারে নতুন। তোকেই বলছি বোন—মান-অভিমানের এই-চিঠি লেখা—খেলিয়ে রসিয়ে আরও খানিকটা ভোগ করব বলেই। এ আমি কোনদিন পাইনি। মনি অর্ডারের মতলব নফরকেষ্টর নিরেট মাথায় এসেছে, আমার কিছুতে বিশ্বাস হয় না। সাহেব ছাড়া অন্য কেউ নয়। সাহেব আছে ওর সঙ্গে, ভাল আছে—বড় সান্ত্বনা এইটে আমার।

পারুল উঠে গেলে চিঠিটুকু শেষ করে ফেলল:

এক কাণ্ড হইয়াছে। কাল সকালবেলা তোমার সেই মেমসাহেব বউ এখানে আসিয়া উপস্থিত। তোমার ভাই নিমাইকৃষ্ণের সঙ্গে আসিয়াছিল। তোমাকে ধরিবার জন্য। না পাইয়া আমার উপর যত রাগ ঝাড়িল। আমিও কম দজ্জাল নহি। খুব শক্ত শক্ত শুনাইয়া দিয়াছি। লজ্জা থাকিলে আর কখনো আসিবে না।

সকালবেলা দেওর আর ভাজ সুধামুখীর ঘরের সামনে উঠানের উপর এসে দাঁড়ায়। বউটা সত্যি সত্যি রূপসী। মেমসাহেবের তুলনা দিত নফরকেষ্ট—তাদের মতন শ্বেতকুষ্ঠ রোগীর চেহারা নয়। এর রং যেন দুধে-আলতায়। গোবরে পদ্মফুল ফোটে—একেবারে সেই ব্যাপার।

নিমাইকেষ্ট বলে, দাদা কি শুয়ে আছেন?

আবার কৈফিয়তের ভাবে বলে, গঙ্গাস্নানে এসেছি। বউদি বললেন, আসা গেছে যখন এদিকে—

নফরার বউ শেষ করতে দেয় না। তীক্ষ্ম স্বরে বলে, এসেছি মানুষটাকে ধরতে। কোথায় পালায় আজ দেখি। ঠাকুরপো একদিন এসে ঘাঁটি দেখে গিয়েছিল। আঁস্তাকুড়-আবর্জনায় পা দিয়েছি গঙ্গাস্নান তো করতেই হবে। ফিরে গিয়ে করব। থুঃ-থুঃ—

সুধামুখী বলে, পথের উপরটা নোঙরা করবেন না, মানুষ চলাচল করে। থুতু ফেলতে হয়, ওধারে গিয়ে ফেলে আসুন।

বউ ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, তোমার মুখে ফেলব।

নিমাইকেষ্ট শশব্যস্ত হয়ে ওঠে: আহা, এর উপরে চটছ কেন বউদি, এ কি করবে? দোকান পেতে আছে, মানুষ ঘরে এলে কি দোর এঁটে দেবে? দোষ দাদার, চাকরি-বাকরি ঘর-সংসার কোন-কিছুই মনে ধরল না তার—

রূপসী বউ বলে চলেছে, বছরের পর বছর নাকে-দাঁড় দিয়ে ঘোরাচ্ছে—ভাবতাম, সে-মোহিনী না-জানি কেমন! নাকের দাঁড় গলায় তুলে দিলেই তো চুকেবুকে যেত, এ-দুর্ভোগ আমাদের ভুগতে হত না।

ফণী আড্ডির বস্তিবাড়িতে হেন দৃশ্য একেবারে অভিনব। ভিড় জমে উঠেছে।

সুধামুখী শান্ত স্বরে বলল, ঘরে আসুন, এখানে নয়।

ঐ ঘরে? হোক তাই। একেন পাপ, শতেন পাপ। গঙ্গাস্নান করতেই হবে—যে জাহান্নমে যেতে হয় চলো। আমরা গিয়ে বাবুর ঘুম ভাঙাব।

শব্দসাড়া করেই ঘরে ঢুকল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বউ বলে, কোথা?

হি-হি করে সুধামুখী হাসে, হাসিতে ভেঙে যেন শতখান হচ্ছে। বলে, এই সকালে অন্দর থেকে আসা—শেষরাত্রে বেরুতে হয়েছে। আপনাদের সব কষ্ট মিছে হয়ে গেল।

নিমাইকেষ্ট প্রশ্ন করে, দাদা আসেন নি?

নেই তো শহরে। আসবে কবে? থাকলে ঠিক আসত।

উৎকট প্রতিহিংসায় পেয়ে বসেছে সুধামুখীকে। মণিঅর্ডারের কুপনখানা বের করে এনে দেখায়। নফরকৃষ্ণ পাল, মাথায় টাকার অঙ্ক।

বলে, বাইরে আছে। টাকাকড়ি পাঠায় মাসে মাসে।

নফরার বউ বোমার মতো ফেটে পড়েঃ আমার সিঁথির সিঁদুর আর হাতের নোয়ার জোর যদি থাকে, ফিরবে সে একদিন। ফিরে এসে আমার কাছেই যাবে। ডাকিনী-হাকিনী তুই কদ্দিন গুণ করে রাখতে পারিস, দেখে নেবো।

সুমুখী খলখল করে হাসেঃ সে-ও যে উল্টো তাগা-কবচ পরে বসে আছে। নোয়ার জোর খাটাতে দেবে না—

সচকিত হয়ে নিমাইকেষ্ট জিজ্ঞাসা করে, তাগা কি?

পেত্নি-শাকচুন্নির যার উপর নজর পরে, ওঝায় মন্তর পড়ে তার হাতে সুতো পরিয়ে দেয়। তাকে বলে তাগা, অপদেবতা সেই মানুষের কাছ ঘেঁষতে পারে না। আপনার বৌদির আঁচল কেটে এনে পাড়টুকু নফরকেষ্ট হাতে পরে থাকে—তাগারই মতন কাজ দেয় নাকি। যেই একটু টানের ভাব দেখা দিল, তাগার দিকে তাকাবে। যার শাড়ি, সেই মানুষটাকে মনে পড়ে যায়। মন তখন শতেক হাত ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ে।

রাগে নফরার বউ'র কথাই বেরোয় না ক্ষণকাল। সামলে নিয়ে বলল, বাড়ি চলো ঠাকুরপো।

সুধামুখী সোজাসুজি তার মুখে তাকিয়ে বলে, আমাকেই দুষে গেলে, কিন্তু নিজের কথাটাও একদিন ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো। নিজের চরিত্র, আলাপ-ব্যবহার। তুমি মেয়েমানুষ, আমি মেয়েমানুষ, সেইজন্যে বলছি। রূপ দিয়ে টানা যায় হয়তো, কিন্তু বেঁধে রাখা যায় না। এবারে যখন এলো—চাকরি ছেড়ে, ঘরবাড়ি ছেড়ে যেন আগুনের চুল্লি থেকে ছুটে পালাচ্ছে। ছুটে এসে যেখানে ঠাণ্ডা ছায়া পায়, সেখানে গড়িয়ে পড়ে। সে-জায়গা নোঙরা কি ফুল-বিছানো, খতিয়ে দেখবার হুঁশ থাকে না।

নিমাইকেষ্টরা চলে গেল। সেই একটা জায়গায় সুধামুখী ঝিম হয়ে বসে আছে। কতক্ষণ আছে এমনি বসে, পায়ের শব্দে চোখ তুলে দেখে পারুল।

পারুল বলে, নফরকেষ্টর বউ এসেছিল নাকি? টের পাইনি—তাহলে চোখে দেখে যেতাম। ওরা বলাবলি করছে, বড্ড রূপের বউ নাকি?

সুধার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, তোমায় গালমন্দ করে গেল দিদি?

চোখের জল গড়িয়ে পড়েছে, সুধামুখী বুঝতে পারেনি। পাশে বসে পারুল

আঁচলে মুছে দিল। বলে, তোমায় কি বোঝাব দিদি। গালমন্দ অঙ্গের ভূষণ তো আমাদের। ওতে মন খারাপ করলে চলে না।

সুধামুখী একটু হাসল। বলে, গাল দিয়ে নতুন কথা কি শোনাবে? বলছিল, থুতু দেবে আমার মুখে। ওদের আর কতটুকু ঘৃণা! বিশ্বাস করু ভাই পারুল, নিজের মুখে যে নিজে থুতু দেওয়া যায় না, পারলে আমিই থুতুতে সারামুখ ভরে দিতাম।

পারুলের কথা যোগায় না। নিঃশব্দ বসে রইল। সুধামুখী আবার বলে, এক সময়ে সহমরণের প্রথা চালু ছিল। স্বামী মরলে বউকে সেইসঙ্গে চিতায় পোড়াত। চেঁচিয়ে দাপাদাপি করছে হয়তো, কিন্তু চতুর্দিকের ঢাক-ঢোল উলু-শাঁখ আর সতী-মায়ের জয়ধ্বনির মধ্যে সে চেঁচানি কারো কানে যায় না—

পারুল শিউরে উঠে বলে, কী পাষণ্ড ছিল সেকালের মানুষ—

সুধামুখী বলে, দরদী দয়ালু মানুষ তারা, চিতায় পুড়িয়ে কয়েক মিনিটে শেষ করে দিত! সে রীতি বাতিল হয়ে গিয়ে এখন তুষানলের ব্যবস্থা। জীবন ভোর ধিকিধিকি জ্বলে-পুড়ে মরা। চোখের সামনে ঘরে ঘরে হাজার হাজার মেয়ে স্বামীপুত্র শ্বশুর-শাশুড়ী নিয়ে ঘরকন্না করছে। আনন্দে হাসে, দুঃখে ব্যথায় চোখের জল ফেলে। তাই দেখে আমারও যদি কোনদিন নিশ্বাস পড়ে থাকে, সে দোষ আমায় দিবিনে—দোষ সেই বিধাতাপুরুষের, বিধবা জেনেও সে দেহ ভরে যৌবন বইয়ে দেয়, মনের মধ্যে ঝড় তোলে। সেকালে আত্মরক্ষার বড় উপায় ছিল ঈশ্বর আর পরজন্মে অবিচল বিশ্বাস। আজকে আমাদের চোখ-মন খোলা থেকেই বিপদ হয়েছে—দুনিয়ার সব সমাজের সকল রকম রীতি-নীতি আপনাআপনি কানে এসে পেঁছিয়। পুরানো বিশ্বাসের বর্ম পরে টিকে থাকার উপায় নেই। হাজারো দিন সহ্য করে কোন একটা মুহূর্তে হঠাৎ যদি একবার অনিয়ম হয়ে গেল, সে দোষের খণ্ডন নেই। পিছন-জীবনের কথা ভাবি। ভাল বংশের বিদ্বান বাপের মেয়ে আমি। আজকের এমনি দিনের অবস্থা কখনো স্বপ্নেও ভেবেছি! বাঁচবার আমি অনেক চেষ্টা করেছি পারুল, হবার উপায় নেই। অক্টোপাসের মতো আটখানা হাতে আঁকড়ে ধরে অনিয়ম আমায় ঠেলতে ঠেলতে পাতালের নীচে নামিয়ে দিল।

বলেই চলেছে সুধামুখী। যার কাছে বলছে সে মানুষের কতটুকু বিদ্যাবুদ্ধি দৃকপাত নেই।

বলেই, অনেক পুরানো পচা অভিযোগ এইসব। কিন্তু পুরানো বলেই মিথ্যা হয়ে যায় না। আমি একজনকে জানি—ঠিক আমারই অপরাধ তার। কাশী থেকে প্রসব হয়ে এসে গর্ভের মেয়েকে পালিত বলে নিজের কাছে রেখেছে। তারপরে পড়াশুনো করে একটা পাশ দিয়ে টাইপ করা শিখে নিয়ে আফিসের টাইপিস্ট। এক কামরা ঘর ভাড়া করে খাসা আছে মা আর মেয়ে, এক বুড়ি পিসিও আছেন তাদের সংসারে। আত্মীয়স্বজনে সমস্ত জানে—তারা চোখ-টেপাটেপি করে, কিন্তু বয়ে গেল। আমি একদিন গিয়ে ওদের সুখের সংসার দেখেছিলাম।

বলতে বলতে সুধামুখী ভেঙে পড়ে। আবার কান্না। বলে, আমার সেই একদিনের খুকুকে যদি থাকতে দিত, পুড়তে জ্বলতে আসতাম না কক্ষনো পারুল।

আমি অন্য মানুষ হতাম, মেয়ের মা হয়ে থাকতাম।

পারুলেরও চোখ ভরে জল আসে। সান্ত্বনা দিয়ে বলে, কী হয়েছে! মেয়ের মা না থেকে ছেলের মা হয়েছ। সাহেবের মা। আমার রানীকে নিয়ে নিলে ছেলে মেয়ে দুই-ই হবে তখন।

নানান পোস্টাপিসের বিস্তর সিলমোহরের আঘাত খেয়ে সুধামুখীর পোস্টকার্ড মাসখানেক পরে আবার ফিরে এল। বড়দলে নফরকৃষ্ণ পাল নামে কেউ নেই। মস্তবড় হাট—হাটের দিনে পাঁচ-সাত হাজার লোক জমে। নফরকেষ্ট যদি সেই হাটুরের একজন হয়, সে মানুষের খোঁজ কেমন করে হবে?

জগবন্ধু বলাধিকারীকে শেষ করে ফেলবে, এমন ইচ্ছা বেচা মল্লিকের নয়। ঠগ-ফাঁসুড়ের মতো এরা মানুষ মারে না। দৈবাৎ কেউ মারা পড়লে সমাজে নিন্দা রটে, অক্ষম অপদার্থ বলে সকলে নিচু চোখে তাকায়। তার উপরে বলাধিকারীর মতো গুণীজ্ঞানী ধর্মভীরু মানুষ। তবে বাগে পেলে কিছু শিক্ষা দেবার ইচ্ছা।

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য ভুয়োভুয়ঃ সামাল করে দিয়েছে: সাত চোরের এক চোর হয়ে চলাফেরা করবেন বড়বাবু। সাপের গায়ে খোঁচা দিয়েছেন। নানান ফিকির ওদের, গণ্ডা পঞ্চাশেক চোখ।

আছেন জগবন্ধু সদাসতর্ক। সদর থেকে ফিরছেন। সঙ্গে পরম বিশ্বাসী সেই সিপাহী দুটি। আর একটি বড় সহায় রয়েছে পিস্তল—কাপড়ের নিচে! কেউ সরকারি পোশাকে নয়—সিপাহি দুজনকে মনে হচ্ছে কোন জমিদার-কাছারির পাইক-বরকন্দাজ। জগবন্ধুকেও গলাবন্ধ জিনের কোট, সাদা উড়ানি এবং খাটো মাপের ধুতিতে সেই কাছারির নায়েব ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। যাতায়াত নৌকোয়। তিনজনে গাঙের ঘাটে এসে নৌকো খুঁজছেন।

আলাদা নৌকো ভাড়া করবেন না। বিশাল সাঙড়নৌকো হাটের অত লোক থাকা সত্ত্বেও সকলের চোখের উপর মেরে দিল, সে গাঙের উপর দিয়ে আলাদা নৌকোয় যাবেন কোন সাহসে? ঠিক করেছেন, গয়নার নৌকোয় যাবেন তাঁরা। গয়নার নৌকো অর্থাৎ শেয়ারের নৌকো—অনেক যাত্রী একসঙ্গে যায় এইসব নৌকোয়—ভাড়া দূর হিসাবে এক আনা থেকে চার আনা। যার যেখানে গরজ নেমে চলে যায়, নতুন মানুষও ওঠে পথের মাঝে। কমপক্ষে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ জন চড়নদার—নিতান্তই সাধারণের একজন হয়ে ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করে চলে যাবেন। বেশি মানুষ বলেই নিরাপদ।

খান আষ্টেক গয়নার নৌকো। ভাটা ধরেছে নদীতে, ছাড়বার সময় হল। মাঝিরা তারস্বরে চড়ন্দার ডাকাডাকি করছে। ঘাটের এ-মুড়ো ও-মুড়ো বার কয়েক চক্কোর দিয়ে জগবন্ধু একটা নৌকো ওর ভিতরে পছন্দ করে ফেললেন। সবচেয়ে বেশি লোক সেই নৌকোয়—মেয়েলোক প্রচুর, বাচ্চা-ছেলেপুলেও আছে। অন্য সকলে ডেকে ডেকে গলা ফাটাচ্ছে, এ নৌকোর মাঝি ডাঙার উপর দাঁড়িয়ে। কে-একজন তামাক কিনতে গিয়েছিল—হাঁক দিয়ে বলছে, ছুটে আয়, ছুটে আয়। যাত্রী আর

তুলছে না, ঐ মানুষটা এসে পড়লেই ছেড়ে দেবে।

কারণ অবশ্য বোঝা যাচ্ছে—এত ভিড় কেন এই নৌকোটায়, মাঝির এমন দেমাক কেন। গেরুয়া আলখাল্লা-পরা এক ছেলেমানুষ বৈরাগী গোপীযন্ত্র বাজিয়ে হরিনাম গান করছে পাছ-নৌকোয় বসে। গানের সুরে যেন মধু গলে পড়ে। মানুষের গাদাগাদি বৈরাগীকে ঘিরে। গান শুনবার লোভেই যত মানুষ এই নৌকোয় উঠতে চাচ্ছে। সব গয়নার নৌকোর ভাড়া একই রকম, এমন মধুর হরিনাম এবং তজ্জনিত পুণ্য এই নৌকোয় উপরি লাভ। চড়ন্দার সেইজন্য এত ঝুঁকেছে। কিন্তু যেতে চাইলেই অমনি তো নৌকোয় তোলা যায় না। বড় বড় ভয়াল নদী সামনে, পয়সার লোভে অগুন্তি বোঝাই দিয়ে মাঝনদীতে শেষটা ভরাডুবি ঘটাবে নাকি? মানুষ দেখে দেখে কে কোথায় যাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে তবে তুলছে। বেশির ভাগই কাছাকাছি যাবার মানুষ। বড়-নদীতে পড়বার আগে তারা নেমে গিয়ে নৌকো ভারমুক্ত হবে, এই বোধকরি অভিপ্রায়। চাষাভুষো শ্রেণীর প্রায় সমস্ত।

জগবন্ধু সঙ্গী দুজন নিয়ে মাঝির কাছে দাঁড়ালেন। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মাঝি। বুঝেছে জমিদারের লোক। জমিদারের এলাকার নিচে দিয়ে সদাসর্বদা আনাগোনা, মাঝি মাত্রেই সেজন্য খাতির করে। বলে, যাবেন তো তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন নায়েবমশায়। দেরি করবেন না। আর নয়তো পরে ঐসব নৌকোয় যেতে পারবেন।

চলেছে সেই গয়নার নৌকো—চলেছে। নামতে নামতে দশ-বারো চড়ন্দার রইল শেষ অবধি। বাচ্চা কোলে বউমানুষও একটি আছে। বৈরাগী বড্ড জমিয়েছে—কৃষ্ণলীলা চলেছে। বিপ্রলব্ধা রাই দুঃখ আর অভিমানের দহনে ছটফট করছেন, সেই জায়গা।

বড়-গাঙে এবার। সুতীব্র স্রোত আর পিঠেন বাতাস পেয়ে নৌকো তীরের বেগে ছুটছে। গান শুনতে শুনতে ধর্মপ্রাণ জগবন্ধু তন্মত হয়ে পড়েছেন, চোখের কোণে প্রেমাশ্রু—

কী কাণ্ড লহমার মধ্যে! চড়ন্দারেরা হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে জগবন্ধুর উপর। দাঁড়িরাও দাঁড় ফেলে তাদের সঙ্গে এসে জুটেছে। সকলের আগে দু-পাশের সিপাহী দুটোকে লাথি মেরে মাঝনদীতে ফেলল—সাঁতার দিয়ে কূলে উঠতে পারে তো আপত্তি নেই। কিন্তু জগবন্ধুকে ছেড়ে দেবে না। টুঁটি চেপে ধরেছে তাঁর। চোখ আর মুখ বেঁধে ফেলল কাপড় দিয়ে। দেখতে পান না আর কিছু। এমন শক্ত বাঁধনে বেঁধেছে, খুলে দিলেও বোধকরি বহুক্ষণ ঐ দুটো ইন্দ্রিয়ের সাড় হবে না। এবারে হাত দুটো পিছমোড়া দিয়ে বাঁধে, চোখ-মুখের বাঁধন খোলার একটু যে চেষ্টা করবেন সে উপায় রইল না। চোখ বাঁধার মুহূর্তটিতে বড় সিঁদুরফোঁটা-বউটাকে এক নজর দেখতে পেয়েছিলেন—কৌতুকের হাসিতে মুখ ভরে গেছে তার। আর সেই যখন চেঁচানি দিলেন, ভক্তপ্রবর বৈরাগী সঙ্গে সঙ্গে গানের গিটকিরি দিয়ে উঠল। চড়ন্দার কজন জগবন্ধুর মুখে কাপড় গুঁজে দ্রুতহাতে বাঁধাছাঁদা করছে, আর সুরলয়ে সুললিত দোয়ারকি করে চলেছে। খোল-কত্তালও ছিল নৌকোর

পাটার নিচে বের করে এনে তুমুল বাজনা শুরু করল সেই সঙ্গে। মাতামাতি ব্যাপার—তার ভিতরে জগবন্ধুর আর্তনাদটুকু একেবারে তলিয়ে গেল। প্রতিক্ষণ তিনি ভাবছেন, সিপাহিদুটোর মতো তাঁকেও দেবে এইবার এক ধাক্কা। সাঁতরে জলের উপর ভাসবেন, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সে সুযোগ হবে না। নদীতলে ভবের খেলার ইতি।

কিন্তু জগবন্ধু সামান্য ব্যক্তি নন, একটা থানার বড়বাবু। সিপাহিদের মতো অত সহজে তাঁর রেহাই নেই। নৌকো জোরে ছুটিয়ে দিল। গীতবাদ্য স্তব্ধ। দাঁড় তো আছেই, তার উপরে বোঠে পড়ছে অনেকগুলো। দাঁড়ে-বোঠেয় মিলে জলের উপর আলোড়ন তুলে নৌকো এই যেন একবার আকাশে উঠে যায়, আবার তখনই পাতালে নামে।

হঠাৎ মনে হয়, বড়-গাঙে নেই আর, সরু খালে ঢুকে পড়েছে। পাড়ের জঙ্গল গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। এ কোথায় নিয়ে চলল—চোখ-বাঁধা অবস্থায় জগবন্ধু আকাশ-পাতাল ভাবছেন।

এগারো

মাছ ধরায় বড় স্ফূর্তি সাহেবের। কিসে বা নয়? দিনকে দিন সে স্ফূর্তি বেড়েই চলছে। কত কায়দাকানুন কত রকম বুদ্ধি খেলানো। নফরকেষ্ট ইদানীং বড় একটা যায় না। মেজাজ আলাদা, একটা কাজ বেশি দিন ধরে থাকা পোষায় না তার। একাই যায় সাহেব, নফরা পড়ে পড়ে ঘুমোয়। বংশীর সঙ্গে প্রায়ই জঙ্গলের মধ্যে দেখা হয়ে যায়। দু-একবার তুন্টু ডোমকেও দেখেছে।

ছিপ বড় হতে হতে আস্ত এক তলতাবাঁশে দাঁড়াল। ছিপের মাথা দীঘির অনেক দূর অবধি যায়। এত বড় ছিপ অন্য কারো নয়। টোনের সুতো পাকিয়ে গাবের জলে ভিজিয়ে নিয়েছে, আড়াই-পেঁচি জোড়া-বড়শি তার সঙ্গে পুঁটলি-করা। মাছ তো মাছ, এ হেন ছিপে কুমির গেঁথে তোলাও নিতান্ত অসম্ভব নয়। আর, আশ্চর্য সাহেবের কান দুটো। কত দূরে হিঞ্চেকলমির দামের নিচে কিম্বা হোগলার বনে ক্ষীণ একটু শব্দ—মাছ কি অন্য-কিছু নিঃসংশয়ে বুঝে নিয়ে সেখানে ছিপ ফেলবে।

সকালবেলা বলাধিকারী ঘুম ভেঙে উঠলে কাজলীবালা ঝুড়িতে মাছ ঢেলে এনে দেখায়ঃ কাল রাত্রের এইগুলো—

চেহারা কী মাছের! কালো কুঁদ। ভাঙাচোরা ঘাটের ইটের গায়ে যেমন, মাছের গায়েও তেমনি যেন যুগযুগান্তরের শেওলা জমেছে। সেকালের নীলকরদের আমল থেকেই বোধকরি বছর বছর পোনা ছেড়ে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ঘরসংসার করছিল, সাহেব এতদিনে জল থেকে টেনে টেনে তুলছে।

বলাধিকারী বলেন, কোথায় সাহেব?

কাজলীবালা বলে, ফিরেছে ভোররাত্রে। খুব আহ্লাদ হয়েছে তো—ডেকে তুলে দেখায়ঃ চেয়ে দেখ বুনডি (বোনটি), মাছ তো নয়—দৈত্য-দানো। ঘুমুচ্ছে এখনো ঠিক।

বলতে বলতে সাহেবই এসে উপস্থিত। একা নয়—এত সকালেও বংশী তার সঙ্গে। এবং আরও একজন—সেই তুন্টু ডোম।

সাহেব বলে, ইচ্ছে তো ছিল ঘুমোবার। ঘুমোতে দিল কই! কাল সন্ধ্যায় তুন্টু গাঁয়ে এসেছে। দীঘি থেকে ফিরল না, সোজা এইখানে এসে বসে আছে।

বলাধিকারীর দিকে চেয়ে বলে, আপনার কাছে এসেছে। খবর বলছে।

বংশী পরমোৎসাহে বলে, ভাল একখানা ফসলের ক্ষেত—

সাহেব বলে, হুকুম দিয়ে দেন, দেখে আসি। ফসল কিছু তুলে এনে দিই।

বলাধিকারীর সেই স্তোক দেওয়া কথা: হবে, হবে। ধৈর্য ধরে থাক, জলে পড়ে যাস নি তো। ছুটকো কাজে বিপদ বেশি, হুট করে যেতে নেই।

সাহেব অধীর কণ্ঠে বলে, বিনি কাজে হাঁটুতে কনুয়ে মরচে ধরে গেল যে! হাত-পা নাড়তে গেলে এরপর কড়কড় করে উঠবে, ভেঙে যাবে।

বলাধিকারী তাচ্ছিল্যের ভাবে বলেন, তুন্টু আনল খবর, সেই খবরের উপর বেরুতে চাস?

তুন্টুর মুখে নজর পড়ে বলাধিকারী শিউরে ওঠেন! আরে সর্বনাশ! সাংঘাতিক কেটে গেছে তো! কেমন করে কাটল তুন্টু?

ইট মেরেছিল মনিবঠাকরুন।

জগবন্ধু চুকচুক করেন: চোখটা খুব বেঁচে গেছে। ঘা অমনভাবে থাকতে দিসনে, অষুধপত্তর কর কিছু। চক্ষু বিনে জগৎ অন্ধকার।

কিন্তু চোখের জন্য তুন্টু আপাতত উদ্বিগ্ন নয়। আগের কথা ধরে আহত কণ্ঠে বলে, আমার কথায় বেরুনা যাবে না—আমি কি ঝুটো খবর এনে দিই বলাধিকারীমশায়?

ঝুটো কে বলছে? কিন্তু অমন আজামোজা খবরে লাভ তেমন কিছু হয় না। বিপদই হয়। খবর জোগাড়ের পদ্ধতি আছে রীতিমতো। কঠিন কাজ। খবর এক ভাবের একটা এসে গেল—তার পরে ঠিক কোন খবরটা চাই, তার পরেই বা কি—ধাপে ধাপে এমনি সাজিয়ে যেতে হয়। খবর সাজানো যদি ঠিকমতো হয়, কারিগরের যদি খানিকটা হুঁশ আর হাত থাকে কাজ নির্গোলে নেমে যাবে। সেই জন্যে দেখতে পাও না ভালো খুঁজিয়ালের দেমাক কত! খোঁজ পেঁৗছে দিয়ে নবাব-বাদশার মতো ঘরে শুয়ে নাক ডাকছে—বমালের একখানা বখরা আগেভাগে তার নামে আলাদা করে রেখে তারপর ভাগাভাগি। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের বেলা একআনাতেও হবে না, বাড়তি আরও আধআনা। কাজের গুণে খুশি হয়ে দেয়। এর জন্য শিক্ষা তো আছেই, সকলের বড় গুণ হল মাথা খেলানো। ভালোমন্দের যতটুকু সেখানে ঘটতে পারে, ভটচাজমশায় ছক ধরে সব বলে দেয়।

তুন্টু ন্যাছোড়বান্দা: ভটচাজমশায় না হল, আপনি একবার অবধান করুন। যে দেশে কাক নেই, সেখানে বুঝি রাত পোহায় না!

তবু নয়। তুন্টুকে অগ্রাহ্য করে বলাধিকারী আবার সেই মাছ মারার প্রসঙ্গ

তুললেন। সাহেবের দিকে ফিরে বলেন, যা কাণ্ড আরম্ভ করেছিস সাহেব, আর কিছু দিন পরে শেওলা-ঝাঁঝি ছাড়া থাকতে দিবি না দীঘির জলে।

রসান দেয় বংশীঃ আর যা কান-চোখ-নাক-বুদ্ধি-সাহস সাহেবের, কাজে একবার নেমে পড়লে লোকের ঘরেও হাঁড়িকলসি ছাড়া অন্য কিছু থাকতে দেবে না।

হাসাহাসি খানিকটা। হাসিমুখে সাহেব প্রশংসা পরিপাক করে নেয়। তুণ্টু কেবল গুম হয়ে আছে।

সাহেব বলে, কুঠিবাড়ির বাগবাগিচা দেখলাম তো ঘুরে ঘুরে। দীঘির অন্ধিসন্ধি নাড়িনক্ষত্র দেখে নিয়েছি। মূলবাড়িটা কিন্তু আজও দেখি নি বলাধিকারীমশায়।

বংশী বলে, ঢোক নি দালানকোঠায়?

কাজলীবালা তাড়াতাড়ি বলে, না ঢুকে ভাল করেছে। ভেঙেচুরে যা হয়ে আছে। কেউটে-কালাজ বাঘ-শুয়োর কোন জন্তুটা যে নেই ওখানে, কেউ জানে না।

সাহেব হেসে বলে, তার জন্যে ভেবো না বুনাডি। আমি এক জন্তু—গেলেই আমাদের মুখ-শোঁকাশুঁকি হবে, যে যার জায়গায় ফিরে যাবে। ভয়ে যাই নি, সে কথা নয়। বলাধিকারীমশায়কে নিয়ে একসঙ্গে যাবার বাসনা। জায়গা দেখতে দেখতে আর ওঁর কথা শুনতে শুনতে যাব। উনি আমায় ভরসা দিয়ে রেখেছেন।

বলাধিকারীর দিকে তাকিয়ে বলে, একলা যাইনি কোন-একদিন আপনার সঙ্গে যাওয়া হবে বলে। চোখ বেঁধে নিয়ে ফেলল হঠাৎ সেই জায়গায়। সেই গল্প আপনার মুখে শুনতে শুনতে ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে উঠব। ভাঙা ছাতে গিয়ে দাঁড়াব। আগেভাগে দেখা হয়ে গেলে গল্পের সে রস পাবো না। আশায় আশায় ধৈর্য ধরে আছি। নইলে ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের সঙ্গেও চলে যাওয়া যেত। আমি গরজ করি নি।

শোন হে, সাহেব কি বলছে শোন তোমরা। বড় প্রীত হয়েছেন বলাধিকারী। বলেন, কবিমানুষ না হলে এমন বলতে পারে না। বিদ্যেসাধ্যি ভাল রকম থাকলে সাহেব বসে বসে পদ্য লিখত। না-ই লিখুক কাগজে, মুখে মুখে ঠিক পদ্য বানায়। গাঁয়ে গাঁয়ে এমন কত আছে—সাহেব আমাদের কবি চোর।

হাসতে হাসতে বলেন, এই যা-সব বলল—পদ্যই। ছন্দ-মিল না-ই থাকল, ভাবের কথা। সিঁধ কেটে এক চোর মহারাজ ভোজের প্রাসাদে ঢুকেছে। বিদ্বান সম্ভ্রান্ত লোকেরাও তখন চৌরবিদ্যা শিখে চুরি করত। গুণের মানুষ অনেক থাকত তাদের মধ্যে। এই চোর হল কবি। ভোজরাজাও কবি। চোর একেবারে তাঁর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে—

অন্য কথা এসে পড়ে। সেকালে একালে তুলনা। বলেন, পূর্বাপর ভেবে দেখি আমি। একই ধারা চলে আসছে—চেহারাটা কিছু বদলেছে একালে। বিদ্বান বুদ্ধিমান সম্ভ্রান্ত মানুষ আজও অনেকে জাঁদরেল চোর। সামান্য সাধারণ যারা সিঁধকাঠি নিয়ে বেড়ায়, ছিঁচকে-চোর তারা। চোরের মধ্যে ছোটজাত। দেশের যারা মাথা, সমাজের যারা নেতা, দু-দশ টাকা তাঁরা ছুতে যান না—লাখ লাখের কারবারি।

নৈকষ্য-কুলীন তাঁরাই, চোরের মধ্যে বর্ণ-শ্রেষ্ঠ।

গল্প বুঝি ফেঁসে যায়। সাহেব মনে করিয়ে দিল: রাজা ভোজের ঘরে চোর ঢুকে আছে কিন্তু বলাধিকারীমশায়।

বলাধিকারী বলতে লাগলেন, ভোজরাজা মস্তবড় কবি। আকাশে চাঁদ উঠেছে, গবাক্ষে বসে কবিতা লিখছেন চাঁদের সম্বন্ধে! সিঁধ কেটে চোর ঢুকেছে সেখানে। রাজাকে দেখে অন্ধকার কোণে লুকিয়ে পড়ল। রাজা এক লাইন লিখছেন, আর আবৃত্তি করছেন সেটা। চোর তার চৌরকর্ম ছেড়ে মুগ্ধ হয়ে শুনেছে। এক জায়গায় এসে আটকে গেল, লাগসই কথা হাতড়ে পান না রাজা। চোর কবিলোক, আত্মবিস্মৃত হয়ে সে পরের লাইন আবৃত্তি করে উঠল ছন্দ-অর্থ যথাযথ মিলিয়ে।

কে ওখানে—কে, কে? বিষম হৈ-চৈ, রাজবাড়িতে চোর ঢুকেছে। হাতকড়া দিয়ে চোরকে টানতে টানতে নিয়ে গেল। পরদিন বিচার। বড় কঠিন শাস্তি তখনকার দিনে—সরকারি খরচায় খানাপিনা ও বাসের ব্যবস্থা নয়। শূলে চড়াত চোরকে, অথবা হাত কেটে দিত। শাস্তির বদলে রাজা দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিলেন পাদপূরণের পারিশ্রমিক। কবিসম্মান দিলেন।

ঠিক হল, আজকেই—আজ বিকালে কুঠিবাড়ির অট্টালিকায় যাবেন সকলে। সাহেব ও বংশী যাবে, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যকেও বলা হবে। জগবন্ধু নিয়ে যাবেন সকলকে। তাঁর জীবনের উপাখ্যান পুঁথিপুরাণের ঠিক উল্টো—পাপের জয় পুণ্যের ক্ষয়। তাঁর মুখেই সব শোনা যাবে।

নদী থেকে একটা খাল ঢুকে পড়েছে গ্রামবসতির ভিতর। খাল মজে আসছে দিনকে দিন। মরা-ভাঁটিতে এমনও হয়, নিতান্ত ডিঙিনৌকো কাদায় আটকে পড়ে। খালের কিনারে অতিকায় আম-কাঁঠাল বট-তেঁতুলের ছায়ায় জঙ্গলে-ঢাকা ভাঙাচোরা অট্টালিকা—অতীতের নীলকুঠি। কুঠি বানানোর আগে থেকেই ঐসব গাছ, চেহারা দেখে সংশয় থাকে না। নৌকো ও গরুর গাড়ি বোঝাই দিয়ে আঁটি আঁটি নীল এনে ফেলত। ওজন হত কাঁটা খাটিয়ে। গোমস্তা ওজন টুকে রাখত খেরো-বাঁধা প্রকাণ্ড খাতায়। বড় বড় চৌবাচ্চার ভিতর নীলের আঁটি নিয়ে ফেলত। কপিকলে খালের জল তুলে চৌবাচ্চা ভরত, নীল পচান দেওয়া থাকত জলের মধ্যে। সমস্ত এইসব গাছের তলায়। অনতিদূরে কাছারিঘর—রাবিশে ভরতি হয়ে একেবারে অগম্য এখন। ঐখানে ফরাসের উপর খাতার হিসাব দেখে কুঠির দেওয়ান খাজাঞ্চিকে বলে দিত—আঙুলে টুংটাং টাকা বাজিয়ে দাম শোধ করে নিয়ে যেত ক্ষেতেলরা। গাছ-গুলো চেয়ে চেয়ে দেখেছে। নীলকর সাহেবেরা হাঁটুভর কাদা ভেঙে ক্ষেতে ক্ষেতে চাষ দেখে বেড়াত, দিনে দিনে তারপর লাটবেলাট হয়ে উঠল এক একজন। তেতলা অট্টালিকা উঠল। সাগর-পারের নীলনয়না মেমসাহেবও দু-চারটি থেকে গেছে ভাঁটি-অঞ্চলের এই দুর্গম পাড়াগাঁ জায়গায়। সমস্ত জলুষ তারপরে অস্তগত হল একদিন। মানুষজন কতক মরেহেজে গেল, কতক বা এখানে সেখানে ছিটকে পড়ল বেমালুম হয়ে। মহাবৃদ্ধ গাছগুলো পাতা ঝিলমিল করে সমস্ত দেখেছে।

জগবন্ধু দারোগাকে নিয়ে নৌকো সরু খালে ঢুকে পড়েছে। পাড়ের জঙ্গল পায়ে এসে লাগে। চোখ-বাঁধা অবস্থায় আকাশপাতাল ভাবছেন তিনি। নৌকো বেঁধে অনেকে এইবার ধরাধরি করে কাঁধের উপর তাঁকে তুলে নেয়। নিয়ে চলল কোথায় না জানি। ধ্বপাস করে এনে ফেলে ইটে-বাঁধানো জায়গার উপর। ভারী বস্তু দূর-দূরন্তর থেকে বয়ে এনে কাঁধ থেকে ফেলে লোকে যেমন সোয়াস্তি পায়। সেকালে শ্রান্ত মুটেরা বোধ-করি নীলের বোঝা এমনি এনে ফেলত। কাঁটাঝোপ জায়গাটায়, জগবন্ধুর সর্বাঙ্গ ছড়ে গেল। জোড়-হাতে ভর দিয়ে কোন গতিকে উঠে তিনি জবুথবু হয়ে বসলেন। অনেকগুলো গলা পাওয়া যাচ্ছে। নৌকোর সবগুলো মরদ এসেছে, বাড়তিও বুঝি ছিল বসে এখানে।

সকলকে নিয়ে বলাধিকারী এইবার অট্টালিকার সামনে রোয়াকের উপর উঠলেন। বললেন, এমন কসাড় জঙ্গল তখন হয়নি। কয়েকটা কাঁটাঝিটকের গাছ—সেই কাঁটা গায়ে বিঁধছিল। লোক চলাচল কিছু কিছু ছিল, বেচা মল্লিকের খাস যে নল, তাদের ওঠা-বসার আড্ডা এখানে। বিচারের জন্য আমায় এনে ফেলল। ঠিক কোনখানটি বলুন দিকি ভটচাজমশায়। আমার চোখ বাঁধা তখন। পৈঠা থেকে উঠেই রোয়াকের এই জায়গা, আমার মনে হয়। আপনি সঠিক বলতে পারবেন।

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য ঘাড় কাত করে বলে, হ্যাঁ জায়গা এখানেই।

সাহেবের দিকে চেয়ে হেসে ক্ষুদিরাম বলল, আমিও ছিলাম দলের মধ্যে বসে। একটা কথা বলিনি, কথা শুনলেই বলাধিকারীমশায় টের পেয়ে যাবেন। সিঁদুর-পরা যে মেয়েলোক উনি নৌকোয় দেখে এলেন—ভাল ঘরের মেয়ে, নামটাও ভাল—মুক্তাময়ী। দৈবচক্রে দলে এসে পড়েছিল। বিষম সাহসী, ঘরবাড়ি ছেড়ে নৌকোয় নৌকোয় বেচা মল্লিকের সঙ্গে ঘুরত। সর্বনেশে নিয়তি তার, ভাবলে আজও কষ্ট হয়। সেই মেয়ে একদিন চালান হয়ে গেল—রটনা আছে, দীঘির ধাপের নিচে—রাতে রাতে যেখানে মাছ ধরে বেড়াও তুমি সাহেব। প্রণয়ের শেষ পরিণাম। সে এক ভিন্ন উপাখ্যান। আর সেই যে গেরুয়া-পরা মধুকণ্ঠ বৈরাগী—এখনো সে কাপ্তেন কেনা মল্লিকের সংগে কাজকর্ম করে। একটা হাত নেই বলে হাত-কাটা বৈরাগী নাম হয়েছে। ভক্ত মানুষও বটে, ভগবৎ-কথায় দরদর করে অশ্রু পড়ে। এমনি সব রকমারি মানুষ দলের মধ্যে রেখে কাজ হাসিলের সুবিধা হয়। এসব তোমায় শেখাতে হবে না—কাঁটার মুখ ঘষে ধার করতে হয় না, তুমি নিজেই একদিন শিখেবুঝে নেবে সাহেব।

জগবন্ধুর বিচার বসল এখানে, এই রোয়াকের উপর। চোখ-মুখ-হাত বেঁধেছে কিন্তু কান দুটো খোলা রেখে দিয়েছে—আসামি স্বকর্ণে বিচার শুনতে পাবে।

কোন ব্যবস্থা উচিত হবে, মতামত নিচ্ছে সকলের।

কেউ বলছে, সড়কি মেরে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করো। কেউ বলে, মেলতুক দিয়ে চামুণ্ডার নামে বলি দাও—মহাভোগে মা প্রসন্ন হোন। আবার কেউ বলছে, মাটির নিচে পুঁতে ফেল—পচে গোবর হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে, বাইরে এতটুকু গন্ধ আসবে না। মানুষটা যে দুনিয়ার উপর ছিল, কোনদিন নিশানা হবে না তার।

প্রতিটি প্রস্তাব জগবন্ধু শুনে রোমাঞ্চিত হচ্ছেন। তাঁকে শোনাবার জন্যেই বলা।

শেষটা ভারী গলায় একজন বলে—পরে জেনেছেন, কাপ্তেন বেচারাম সেই মানুষটা—বেচা মল্লিক বলল, এটা কি বলছ—মানুষে টের পাবে না, তবে আর শাস্তিটা কি হল! কত থানাই তো আছে—থানার উপরে দারোগাও এই নতুন আসেনি। মানিয়ে-গুছিয়ে চিরদিন কাজকর্ম হয়ে আসছে। শয়তান এই লোকটা। মেয়ের বিয়ের সময় ইজ্জত বাঁচিয়েছিলাম, বিনি খবরে জামাই এসে পড়লে ছুটোছুটি করে তারও সুরাহা করে দিই। উপকার মনে না রেখে উল্টে ফেউ হয়ে পিছনে লেগে আছে। নেমক-হারামির পরিণামটা লোকে জানবে না, শিক্ষা হবে তবে কিসে?

বেচারাম চুপ করল। নিস্তব্ধতা থমথম করছে। হুঁকো দিয়ে গেছে ইতিমধ্যে কেউ, গুড়ুক টানার আওয়াজ শুধু। শাস্তিটা কোন পদ্ধতিতে হবে, তামাকের সঙ্গে তারই বোধহয় ভাবনাচিন্তা হচ্ছে।

আবার একজন বলে ওঠে, ফাঁসিতে লটকে দেওয়া যাক তবে। গাছে ডালে ঝুলুক। কোম্পানি বাহাদুর তিতুমীরের মানুষদের যেমন করেছিল। কাকে ঠুকরে ঠুকরে চক্ষু দুটো খেয়ে ফেলবে আগে। রোদ্দুরে ধড় শুকিয়ে কাঠ হবে। তাবৎ লোক দলে দলে এসে দেখবে।

ফড়ফড় করে অবিরত হুঁকোর টান। যে যা ইচ্ছা বলে যেতে পারে, কিন্তু শেষ কথা বেচারামের। হুঁকো নামিয়ে এইবারে সেটা উচ্চারিত হবে। বলল, নরহত্যা মহাপাপ, ওস্তাদের নিষেধ। সে কাজ ঠগীদের, আমাদের নয়। দেবী চামুণ্ডা তাদের উপর সেই ভার দিয়েছেন, মানুষ মেরে তারা দেবীর কাজ করে দেয়। আমরা আলাদা।

মুহূর্তকাল থেমে আবার বলে, তবে যদি কেউ নিজের ইচ্ছেয় মারা পড়ে, আমরা তার কি করতে পারি? তাই একটা মতলব ঠিক করলাম। দারোগার মরণ-বাঁচন তারই নিজের এক্তিয়ারে থাকবে, মরে তো আমরা সেজন্যে দায়ী হব না। অথচ মরবেই নির্ঘাৎ, বাঁচবার কোন উপায় নেই।

জগবন্ধু বলাধিকারীর মুখ বেঁধেছে, চোখ বেঁধেছে, তবু যদি হাত দুটো ছাড়া থাকত কানের ছিদ্র আঙুলে আটকে দিতেন। বিচার তা হলে শুনতে হত না। যেটা ওরা করতে চায়, হঠাৎ অজান্তে ঘটে যেত। এমন দগ্ধে দগ্ধে মরতে হত না! কী মতলব করেছে, তারাই জানে। চোখ ঠারাঠারি হয়ে থাকবে নিজেদের মধ্যে। নিয়ে চলল এইবারে সিঁড়ি বেয়ে উপরে—

আজ জগবন্ধুও সেই পথে সিঁড়ি বেয়ে সাহেবদের উপরে নিয়ে চললেন। ঘরদোর প্রায় সমস্ত ভাঙা, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উপরে যেতে তত বেশি অসুবিধা হয় না।

সাহেব বলে, এ যে রাবণের সিঁড়ি। শেষ নেই। যেন স্বর্গধামে উঠে যাচ্ছি।

বলাধিকারী বলেন, আমার ঠিক উল্টোরকম মনে হচ্ছিল সেদিন। সিঁড়ির শেষ যেন না হয়। এ জায়গায় আসিনি তার আগে, গ্রামটাও জানতাম না। হাত-বাঁধা দড়ি টেনে একজন আগে আগে উঠছে, পিছন পিছন ঠেলে দিচ্ছে ক'জনা। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। চোখে দেখবার উপায় নেই, প্রতিক্ষণে ভয় হচ্ছে, এই বুঝি সিঁড়ি শেষ হয়ে গেল, ছাতে উঠে পড়লাম। ছাদে তুলে নিয়ে—তারপর কোন মতলব

করেছে, ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে না কি করবে, কাপ্তেন কিছু তো বলল না! দেবী চামুণ্ডার কাছে মনে মনে মাথা খুঁড়ছি: এত অঘটন ঘটাও তুমি মা, একটা করে এই ধাপ উঠছি উপর দিকে ধাপ একটা সঙ্গে সঙ্গে যেন বেড়ে যায়। অনন্ত কাল উঠেও কখনো ছাদে পৌঁছব না। মা-চামুণ্ডার উপর পুরো ভরসা না করে, নিজেও যতটা পারি ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলেছি। জীবনের মেয়াদ কোন না বিশ মিনিট আধ ঘণ্টা বাড়িয়ে নেওয়া যাচ্ছে এই কৌশলে।

উপরের লোকটা, হাতের দড়ি ধরে যে টানছে, বিরক্ত ভাবে চেঁচিয়ে ওঠে: বলি সারা-রাত্তির লাগাবে নাকি এই কটা সিঁড়ি উঠতে? আপসে না যাবে তো বলো, কোমরে কাছি বেঁধে তুলে দিই।

মুখ তো জবর রকমে বেধে দিয়েছে, তবু আমায় জবাব দিতে বলছে। জবাব না পেয়ে চটেমটে গেল বোধহয়। ঠিক কাছি না বাঁধলেও প্রায় তার কাছাকাছি বটে—নিচের মানুষ উপরের মানুষ বল লোফালুফি করতে লাগল যেন আমায় নিয়ে। ধাঁ ধাঁ করে উঠে যাচ্ছি। কত উঁচুতে নিয়ে তুলল রে বাবা—হাত বাড়ালে আকাশে ঠেকে যাবে, এমনিতরো মনে হচ্ছে। অবশেষে থামল এক সময়। পা বুলিয়ে বুলিয়ে বোঝা গেল, সমতল জায়গা। ছাদে এসে গেছি। মনের মতলব কাপ্তেন বলবে এবারে।

সেদিন চোখ বেঁধে ধাক্কাধাক্কি করে নিয়ে এসেছিল। আজকে জগবন্ধু খোলা চোখে সেই ছাদে উঠে এসে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চতুর্দিক দেখাচ্ছেন। দেখ অবস্থা তোমরা, এক-মানুষ সমান উলুঘাস—গরু-বাছুর ছাতে উঠে চরে খেতে পারে না, ঘাসের তাই এমন বাড়বৃদ্ধি। যজ্ঞডুমুরের ডাল ঘিরে গয়না পরার মতো কত ফল ধরে আছে—ভাল কথায় যার নাম যজ্ঞডুমুর। দেয়ালের ভিতর শিকড় ঢুকিয়ে বটের চারা মাথা তুলছে—বটফল কাকে মুখে করে আনে, বীজ পড়ে গাছ হয় শুকনো ইট-চুন-সুরকির ভিতরেও। জীবন কোথায় যে নেই—যা-হোক একটু আশ্রয় পেলেই ডালপালা মেলে ধরবার জন্য মুখিয়ে থাকে জীবন।

সে রাত্রে এই ছাতে জগবন্ধুকে তুলে নিয়ে এলো। আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ, লোকগুলো জিরিয়ে নিচ্ছে। একটা অতি-কর্কশ কণ্ঠ তারপরে অনুমতি চাইল: বলো কাপ্তেন এবারে—

কাপ্তেন বেচারাম ভরাট গলায় বলে, হাতে দড়ি খুলে পা দুটো বেঁধে ফেল ঐ দড়িতে। আলসের ওধারে নিয়ে ঝুলিয়ে দাও।

সেই ব্যবস্থা হতে লাগল। জগবন্ধুকে সোজাসুজি ডেকে বেচারাম এবার বলে, ও সাধু-দারোগা, শুনে নাও। মানুষ আমরা মারিনে। ওস্তাদের মানা, কাজেরও বদনাম হয়। এত শত্রুতা করেছ, দুটো হাত তবু ছাড়া রইল। ছাতে আলসের মাথা আঁকড়ে ধরে ঝুলতে থাক। বাদুড় ঝুলে থাকে, চামচিকে ঝুলে থাকে, তুমি কেন পারবে না হে? তাদের চেয়ে অক্ষম কিসে? কপালে থাকলে পথ-চলতি মানুষ ঘাড় উঁচু করে দেখে উদ্ধার করবে। শক্ত করে ধরে থাক, হাত সরে না যায়। কতগুলো সিঁড়ি ভেঙে কত উঁচুতে উঠেছ, আন্দাজ আছে তো? পড়ে গেলে ছাতু-ছাতু হয়ে যাবে কিন্তু। সে মরার জন্য ধর্মের কাছে আমরা দায়ী হব না।

গল্প হতে হতে ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের দিকে চেয়ে জগবন্ধু হেসে ওঠেন : আর এই ভট্টাচাজমশায়ের ব্যাপার দেখ। এত বড় বন্ধুলোক সর্বক্ষণ তাদের সঙ্গে রয়েছেন একটি কথা বলছেন না আমার দিক হয়ে। সুহৃদের যন্ত্রনা চুপচাপ চোখে দেখে যাচ্ছেন।

ক্ষুদিরাম বলে, বিপদ কোথায় হল যন্ত্রণাই বা কিসের? আপনার উদ্ধারের জন্য শলাপরামর্শ করেই আমারা নেমেছি। কাপ্তেন থেকে চুনোপুঁটি অবধি সকলে। চোখ বাঁধা বলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, কথাগুলো কেবল শুনে যাচ্ছেন। মুখে রুক্ষ কঠিন কথা, কিন্তু মুখের উপরে হাসি।

সাহেবকে ক্ষুদিরাম বলে, বেচারাম নিজে আমায় বলল, দারোগাবাবুকে এনে ফেল দলের মধ্যে। এমন সাচ্চা মানুষটা অপথ-বিপথ ঘুরে নষ্ট হয়ে যাবেন, সেটা ঠিক হবে না। ঘনিষ্ঠতা তখন থেকেই। সদরের পথে সুবিধা হয় না তো অন্দরে আগে পশার জমালাম।

সাহেব বলে, সাচ্চা মানুষ সৎপথেই তো ছিলেন, নষ্ট হবার কথা এলো কিসে?

ক্ষুদিরাম বলে, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের কথা জানিনে, কিন্তু যাকে সৎপথ বলছ সেই পথ ধরে থাকলে এ-যুগে সকলে আঙুল দিয়ে দেখায়—

সাহেব বলল, আঙুল দেখিয়ে বলে, মহৎ মানুষ—আদর্শ মানুষ—

শুনিয়ে শুনিয়ে তাই হয়তো বলে। কিন্তু মুখ টিপে হাসে। মনে মনে বলে, হাঁদারাম। দুনিয়া সুদ্ধ লোকের যে আলাদা মতিগতি। মানুষকে মিথ্যাবাদী শঠ ফেরেব্বাজ বলো, সেটা গালি হয় না আজকের দিনে। শুনে কেউ অবাক হয় না, ঘৃণা করে না। কেননা নিয়মই এই দাঁড়িয়েছে—শতকরা সাড়ে নিরানব্বুয়ের এই নিয়ম। বাকি যে আধজন রইল, ধর্মধ্বজী বলে হাসতে হাসতে তাদের আঙুল দিয়ে দেখায়! বাড়ির বুড়োহাবড়া মানুষ সম্পর্কে একটা প্রশ্রয়ের হাসি থাকে, সেই রকম। ক'দিন আর আছেন, যা করছেন করুনগে যান। অর্থাৎ নিঃশেষ হয়ে যা মুছে যাচ্ছে, তাকে অবহেলা করাই ভালো। কিন্তু বলাধিকারীমশায়ের মতো মানুষকে ওরা তেমন হতে দেবে না—

বলাধিকারী বললেন, ভটচাজমশায় যখন তখন আমায় জপাতেন, তাঁর যে একটা স্থির উদ্দেশ্য ছিল ধরতে পারি নি। "সদা সত্য কথা বলিবে" "চুরি করা বড় দোষ" —এমনি সব সাধুবাক্য একফোঁটা বয়স থেকে ছেলেদের আমরা পড়াই, বানান করে মানে শেখে তারা। কিন্তু মন অবধি কি পৌঁছায়, সত্যি কোন কাজে আসে কী জীবনে? যে মাস্টার পড়ান, তিনিও একবর্ণ বিশ্বাস করেন না। এই সমস্ত শোনাতেন আমায় ভটচাজমশায়।

বলাধিকারী আবার বলেন, কত দিনের কত সব কথা! কোন এক কালে এসবের জীবন্ত অর্থ হয়তো ছিল, আজকে একেবারেই নেই। পাপ বলতে চাও বলো, কিন্তু এ বড় দুরন্ত পাপচক্র। একটা মানুষের সাধ্য কি চক্রের বাইরে থাকতে পারে? পুরানো যুগের মৃত্যু না-ও যদি স্বীকার করো, শতসহস্র ক্ষতে মুমূর্ষু হয়ে পড়ে আছে সে যুগ। ধুঁকছে, কোন অঙ্গের তিল পরিমাণ অংশ সুস্থ নেই। বৃহৎ বনস্পতি ভূশায়ী হয়ে পচে গলে যাচ্ছে, তার দিকে চেয়ে নিঃশ্বাস ফেল, আপত্তি করব না। কিন্তু

বাঁচিয়ে তুলে আবার পত্রসঞ্চার ঘটাবে, নিতান্তই পণ্ডশ্রম সেটা। এমনি চেষ্টা করতে যায়, বোকা বলে হাস্যাস্পদ হয়। যে বস্তু জীবনের বাইরে চলে গেছে, শতকরা একজনকেও ধারণ করছে না—জোর করে বললেই সেটা ধর্ম হয়ে যায় না।

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের দিকে চেয়ে হাস্যমুখে বলাধিকারী বলেন, এমনি সব বলতেন আপনি, মনে পড়ে?

ক্ষুদিরাম ঘাড় কাত করে স্বীকার করে নেয়। বলে, সাচ্চা মানুষের সর্বক্ষেত্র দরকার। আমাদের কাজকর্মে তো বেশি করে লাগে। চোরের সমাজে সকলের বড় গুণ, সাধু হতে হবে। বলাধিকারীমশায়ের উপর কাপ্তেনের তাই অত রোখ। ফলও এখন দেখছে সর্বজনা। বলাধিকারীমশায় গ্যাঁট হয়ে ঘরে বসে থাকেন—কত কত কাপ্তেন কাজকর্ম নিয়ে পায়ের কাছে ধর্না দিয়ে এসে পড়ে। মহাজন-থলেদারের অন্ত নেই—গণ্ডা গণ্ডা নানান দিকে ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াচ্ছে। আর বলাধিকারীমশায় দেখ, কাজ ঠেলে কুল পান না। নেবো না নেবো না করে মাথা ভাঙলেও রেহাইদেবে না।

বলাধিকারী বলেন, ইষ্টমন্ত্র সকলের আগে এই ভটচাজমশায় আমার কানে দিলেন। সেই নাম জপ করে চলেছি। এ পথের দীক্ষাগুরু—ওঁকে তাই সকলের বড় মান্য দিই।

জগবন্ধু হাত ছেড়ে দিয়ে যদি পড়েই যান, সে কারণে বেচারামের দল ধর্মের কাছে দায়ী হবে না ধর্ম তরিয়ে ধুপধাপ সিঁড়ি বেয়ে সকলে নিচে চলে গেল। ছাতের আলসে ধরে জগবন্ধু ঝুলতে লাগলেন। খবর রাখে, রীতিমতো জিমনাস্টিক-করা মানুষ তিনি। রাখবে না কেন—ক্ষুদিরামই রোজ সকালবেলা তাঁকে নিয়মিত ব্যায়াম করতে দেখেছে। হাতের বদলে পা দুটো শক্ত করে বেঁধে দিয়েছে, পায়ের সাহায্য নিয়ে কৌশলে ছাতের উপর যাতে উঠে আসতে না পারেন। ঝুলতে লাগলেন বলাধিকারী সেই অদ্ভুত অবস্থায়।

এক হাতে একটুখানি ঝুলে থেকে অন্য হাতে মুখের বাঁধন খোলা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখছেন। অসম্ভব। সে বাঁধন ছুরি দিয়ে না কাটলে হবে না। তা ছাড়া একখানা হাতের উপর এত বড় দেহের ভার—গেলেন বুঝি এই পড়ে—হাত ত্রিশেক নিচে। দুটো হাতে তাড়াতাড়ি আলসে চেপে আপাতত আত্মরক্ষা করলেন। ঝিঁঝির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে অনেক দূরের ভুমিতলে, তক্ষক ডাকছে পরিত্যক্ত বাড়ির অন্ধিসন্ধিতে। নৌকো ভাসিয়ে দস্যুদল এতক্ষণ চলে গেল কাঁহা-কাঁহা মুলুকে। উজ্জ্বল সিঁদুর-পরা সেই দুর্বৃত্ত রূপসী হয়তো খলখল করে হাসছে, মধুকণ্ঠী বৈরাগী কর্মসিদ্ধির আনন্দে আরও মধুর ভক্তিরসের গান ধরেছে। কত রাত্রি এখন না জানি—কতক্ষণে রাত পোহাবে! পথের মানুষ দৈবক্রমে উপরমুখো তাকিয়ে আজব কাণ্ড দেখবে—লাউয়ের মাচায় ফলন্ত লাউ যেমন ঝোলে, একটি মানুষ তেমনি ছাতের আলসে ধরে ঝুলে আছে।

কিন্তু দুটো হাতেও তো দেহভার রাখা যায় না, হাত টনটন করছে। মরীয়া হয়ে জোড়া-পায়ের একটা দোলন দিতে কার্নিশ পায়ে ঠেকল। আলসের খানিকটা নিচে দিব্যি উঁচু কার্নিশ। পা দুটোর আশ্রয় হল, খানিকক্ষণ তবে যুঝে থাকা যাবে। জগবন্ধু ঝুলছেন না আর এখন—আলসের মধ্যে দু-হাতে আঁকড়ানো, পা

কার্নিশের খাঁজে, ধনুকের মতো দুমড়ে রয়েছেন। জীবনকে যেন প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে আছেন কার্নিশ আর আলসের মাঝের জায়গাটুকুতে। কিন্তু কতক্ষণ আর! মা-চামুণ্ডা, তাড়াতাড়ি রাত পুইয়ে সকাল করে দাও মানুষ ঘুম ভেঙে বেরিয়ে চলাচল শুরু করুক।

পোহাল রাত অবশেষে। চামুণ্ডার দয়ায় তাড়াতাড়ি পুইয়েছে, তা নয়। বরঞ্চ উল্টো। মা যেন রাতটাকে টেনে টেনে বেধড়ক লম্বা করে সন্তানের ধৈর্যের পরীক্ষা করলেন। কাকপক্ষী ডাকছে, মানুষের কথাবার্তাও একটু বুঝি কানে পাওয়া যায়। রোদ চড়ে উঠল, সেঁক লাগছে গায়ে। হে মা-কালী, মানুষজনের উঁচুমুখো নজর তুলে দাও, কেউ না কেউ দেখে ফেলুক।

কি নিয়ে তর্ক করতে করতে জনকয়েক একেবারে নিকটে এসে পড়েছে। আবার ক্রমশ দূরবর্তী হয়ে কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল। নিরাশ হয়ে পড়লেন জগবন্ধু। জীবন আঁকড়ে ধরা আছে কয়েকটা মাত্র আঙুলের ডগায়। প্রাণপণে ধরে আছেন—কিন্তু কতক্ষণ আর! হাত দুটো খসে যাবে কোন মুহূর্তে। গলা ফাটিয়ে মানুষের উদ্দেশে শোনাতে চান: শোন, শুনছ গো তোমরা? পা-ফেলে-চলা মাটিটুকুই সব নয়, মাথার উপরেও আছে। ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে দেখ।

হায় রে, বাঁধা-মুখে আওয়াজ বেরোয় না। মানুষ ঘুরবে ফিরবে সারাদিন, দিন গিয়ে সন্ধ্যা হবে, রাত্রি হবে। আকাশমুখো কেউ তাকাবে না।

এমনি অবস্থায় নতুন দৃষ্টির যেন উন্মেষ হচ্ছে। সদাচার ও সাধুতার কথা মুখে বলা ভাল। কিন্তু জীবনে যারা সত্যি সত্যি প্রয়োগ করতে যায়, আহাম্মক বই তারা কিছু নয়। সৃষ্টিছাড়া হতে গিয়েই এই বিপত্তি। আর একবার বাঁচার সুযোগ যদি পাওয়া যেত, নতুন পথ ভেবে দেখতেন। কিন্তু সে আশা আকাশকুসুম বই কিছু নয়।

পিছনের অনেকগুলো দিন দ্রুত মনের উপর দিয়ে ছুটেছে—শিশু থেকে এই জোয়ানযুবো হয়েছেন, তার বহু ঘটনা। হঠাৎ মনে হল ঝুলছেন না তিনি, শূন্য-লোকে ভাসছেন রাজা ত্রিশঙ্কু হয়ে—স্বর্গেও নেই, মর্ত্যেও নেই। গভীর কালো তরলিত ছায়া নিম্নদেশে। হু হু করে পড়ে যাচ্ছেন তিনি সেখানে—আবর্তময় ভয়াল ছায়ানদীতে। ধারাস্রোত প্রবল এক পাক দিয়ে উল্কার বেগে নিয়ে চলল তাঁকে, লহমার মধ্যে পারাবারে পেঁছে দিল। পুরানো দিনের চেনা কণ্ঠধ্বনি অনেক কানে আসে, যেসব মানুষ বেঁচে নেই বলে জানেন। কিন্তু কঠিন ভাবে চোখ বাঁধা বলে দেখা যায় না কোন-কিছু। মুখ বাঁধা বলে ডাকতে পারেন না কারও নাম ধরে। পা-বাঁধা বলে সাঁতরে কাছে যাবেন, সে উপায় নেই। হাত দুটোই শুধু খোলা আছে, আচ্ছন্ন অবস্থায় কখন সে হাত বাড়িয়ে দিলেন তাদের ধরবার অভিপ্রায়ে ......তারপর আর কিছু মনে পড়ে না, খানিকটা সময় এর পরে একেবারে ফাঁকা। চেতনা অসাড় করে দিয়ে ডাক্তার অপারেশন করে, চেতনা ফিরে পেয়ে রোগি কিছুতে মাঝের অবস্থা মনে করতে পারে না। জগবন্ধুরও ঠিক তাই—হাত ছেড়ে দেবার পরে অনেকখানি সময় মুছে রয়েছে তাঁর মনে, জীবন থেকে বেরিয়ে চলে গেছে।

মরেননি বলাধিকারী। ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করে নিয়ে ঘড়ির হিসাব করেছিলেন। সর্বসাকুল্যে ঘণ্টা ছয়েক ছিলেন বোধকরি ঝুলন্ত অবস্থায়। কিন্তু কষ্টটা ছয় কিম্বা ছ-শ বছরের।

তেতলার ছাতে এনে তুলেছিল, ছাতের উপর ঐ যে চিলেকোঠা—। জগবন্ধু চিলেকোঠার আলসে দেখিয়ে দিলেন সাহেবদের। ক্ষুদিরাম সেই সময়টা মুখে হাত চাপা দিয়ে খিকখিক করে হাসছে। জগবন্ধুকে জানানো হয়েছিল : আলসের বাইরের দিকে তাঁকে ঝুলিয়ে দিয়েছে—ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাত নিচে মাটি। আসলে ঝুল খাচ্ছিলেন তিনি চিলেকোঠার আলসে ধরে। কার্নিশে পা রেখে ধনুকের মতন দুমড়ে ছিলেন, সরলরেখায় থাকলে পা থেকে ছাত দেড়-হাত দু-হাতের বেশি নয়। একটা বাচ্চা ছেলেও সেটুকু নিরাপদে লাফিয়ে পড়তে পারে। অথচ আতঙ্কে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি যমযন্ত্রণা ভোগ করেছেন। মরার কিছুমাত্র সম্ভাবনা না থেকেও হাজার বার মরণ হয়ে গেল। হাত অবশ হয়ে পড়ে গেলেন একসময়—পতন মাত্র হাত দেড়েক নিচু ছাদে। গায়ে আঁচড়টি লাগেনি, তবু কিন্তু অচেতন হয়ে রইলেন দীর্ঘক্ষণ। চোখ মুখ ও পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। আরও অনেকক্ষণ পরে সম্বিত পেয়ে চোখ মেলে চারিদিক দেখেন। কাপ্তেন বেচারাম কৌতুক করে গেছে—এত বড় বেকুবি কারো কাছে প্রকাশ করে বলার নয়।

সে দিনের এই মনোভাব। এখন লজ্জা ভেঙে গিয়ে বলাধিকারী হাঁকডাক করে সকলকে সেই বিচিত্র উপলব্ধির কথা বলেন : চোখের উপর মৃত্যুর স্পষ্ট চেহারাটা ভাল করে দেখে নিয়ে জীবন্তের মধ্যে ফিরে এসেছি আবার। মৃত্যুভয় তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছি। অভিজ্ঞতা চাক্ষুষ বলেই প্রত্যয় আমার দৃঢ়। জীবন উত্তাল উদ্বেগময়, মৃত্যু শান্ত নিরুত্তাপ নিরুপদ্রব। মৃত্যুতে নয়, মৃত্যু-ভয়েরই যন্ত্রণা। সে ভয়ের কিছুমাত্র ভিত্তিভূমি নেই।

বারো

ধুঁকতে ধুঁকতে জগবন্ধু থানায় ফিরে দেখলেন, সাধুতার আরও পুরস্কার অপেক্ষা করছে তার জন্য। সরকারের সুনাম ও প্রজাসাধারণের কল্যাণ বিবেচনা করে ডি-আই-জি সাসপেণ্ড করেছেন তাঁকে। তদন্ত হবে অভিযোগগুলোর সম্পর্কে। চাকরি বজায় থাকবে কিনা তদন্তের ফলাফলের উপর নির্ভর করছে। আপাতত ছোটবাবুকে চার্জ বুঝিয়ে দেবার নির্দেশ।

জগবন্ধু হেসে বলছেন, পাপের জয় পুণ্যের ক্ষয়—তার একেবারে জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। আজকে উল্টো পথে চলে প্রতিষ্ঠা শতগুণ বেড়ে গেছে। বৃত্তিটা আমার গোপন কিছু নয়—মুখ ফুটে না বললেও জানতে কারো বাকি নেই। ছেলেছোকরারা তামাক খায় বুড়োদের আড়াল করে, বুড়ো চোখে দেখেও না দেখার ভান করে। এখানেও ঠিক তাই। পুরানো ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা মোটামুটি বাতিল করে দিয়ে বাইরে আমরা একটু আবরু রেখে চলি এই পর্যন্ত।

কিন্তু জগবন্ধু যা-ই ভাবুন, ভুবনেশ্বরী একেবারে অবিচল। ধার্মিক পরিবারের মেয়ে তিনি—পিতামহ সিদ্ধপুরুষ। পুরোপুরি তেত্রিশ কোটি না হলেও সেই বাড়িতে বিগ্রহের সংখ্যা গুণতিতে আসে না। শিশু বয়স থেকে এই ঠাকুরদেবতার মাঝখানে মানুষ তিনি। জগবন্ধুর চিরকাল পড়াশুনোর অভ্যাস—দারোগার চাকরি পাওয়া সত্ত্বেও অভ্যাসটা ছাড়তে পারেন নি। বিয়ের পরে এক সময় ঝোঁক চাপল পুলিসের চাকরি ছেড়ে মাস্টারি করবে কোথাও। নিষ্পাপ নিরীহ পুণ্যকর্ম। ভুবনেশ্বরী নিরস্ত করলেন তাঁকে। এই চাকরী খারাপ হল কিসে? বহুজনকে রক্ষা করবার পবিত্র দায়িত্ব। মূর্খ লোভী প্রবঞ্চকেরা জুটেছে বলেই পুলিসের দুর্নাম। শিক্ষিত সজ্জনদেরই অতএব দলে দলে গিয়ে পড়া উচিত। চাকরী ছেড়ে চলে আসা কাপুরুষতা।

ভুবনেশ্বরীর কথায় বল পেতেন জগবন্ধু। চাকরি হল জনসেবা, মাইনেটা খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকবার সম্বল—এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে লাগলেন। চুরি-ডাকাতি যে আজকেই ঘটছে, তা নয়। ঋগ্বেদে পর্যন্ত চোরের কথা। বাইবেলেও চোর-জোচ্চোরের প্রসঙ্গ। তাদের মনস্তত্ত্ব বিচার করা উচিত সহৃদয়তার সঙ্গে। শুধুমাত্র শাসনে এ বৃত্তি উৎখাত হবার নয়—তা হলে ইতিহাসের আদিযুগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। তখনকার দিনে অতিশয় কড়া শাসন—চোরকে শূলে চড়াত, হাত কেটে দিত জলজ্যান্ত মানুষটার। সন্দেহের বশে প্রাণ হনন করাও হত। এই রকম অবিচারের বিরুদ্ধে আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে মনু সতর্ক করে দিচ্ছেন: ন্যায়বান রাজা বমাল সমেত না পেলে কোন চোরের মৃত্যুদণ্ড দেবেন না, চোরাই মাল ও সরঞ্জাম সব হাতে-নাতে ধরলে তবেই চরম সাজা দেওয়া যেতে পারে। শাসনের কড়াকড়ির ফলে বরঞ্চ উল্টো-উৎপত্তি হয়ে দাঁড়াল—চোরের ইজ্জত বাড়ল, সংঘ গড়ে উঠল চোরেদের। চৌর্যধর্মের শাস্ত্র হল—চৌরচর্যা, ষন্মুখকল্প। খণ্ডিতভাবেও পুঁথিপুরাণ আছে—বিলুপ্ত হয়ে গেছে আরও অনেক। বিরাট বিপুল মহাবিদ্যা। চৌরকর্মের অধি-দেবতাটিও সামান্য পুরুষ নন—দেবাদিদেব মহাদেবের পুত্র দেবসেনাপতি স্কন্দ বা কার্তিকেয়। প্রাচীন শাস্ত্রমতে চৌরপদ্ধতির প্রবর্তক তিনিই। বাংলাদেশের পুঁথিপত্রে আর এক অধিষ্ঠাত্রী দেবী যাঁর—'নিশিকালী মহাকালী উন্মত্তকালী নাম।' নিজে তিনি ভক্তদের চুরিবিদ্যা শিখিয়ে বেড়ান। চৌরশাস্ত্রের সকলের বড় ঋষি বোধ হয় ভগবান কনকশক্তি। অপর এক জাঁদরেল শাস্ত্রকার মূলদেব। (নিজেও মহাগুণী তস্কর—শুধুই শাস্ত্র-বচন নয়, কায়দাগুলো হাতেকলমে প্রয়োগের শক্তি ধরেন।) শাস্ত্রের ভাষ্যকার ভাস্করনন্দী। চৌষট্টি কলার একমত রূপে এই বিদ্যা বন্দিত হতে লাগল। দশকুমারচরিতে রয়েছে, সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেও রাজকুমারের শিক্ষা সম্পূর্ণ হল না যতক্ষণ না চৌরশাস্ত্র সম্যক অধিগত হচ্ছে।

ইজ্জত কত চোরের। রৌহিনেয় জাঁক করছে—তার বাপ ঘুঘু-চোর, মা-ও তাই। পিতৃকুল মাতৃকুল কোনটাই হেলাফেলার নয়। চোরসমাজে অতএব নৈকষ্যকুলীন বলতে হবে তাকে। বাপ পাখির মতন ফুড়ুত করে যে-কোন ঘরে ঢুকে যেতে পারে, আর রৌহিনেয় নিজে বিশেষ করে নানা পাখি ও পশুর ডাক আয়ত্ত করেছে চৌরকর্মে যার

সদাসর্বদা দরকার পড়ে। এ হেন কৃতী পিতা শয্যায় মরে পড়ে আছেন, বিধবা মা সেই অবস্থায় রোহিনেয়র উপর কুলধর্মের ভার দিচ্ছেন কপালে সপ্তশিখার প্রদীপ ঠেকিয়ে। রাজার মৃত্যুর পর রাজপুত্রের যেমন অভিষেক হয়। রাজগণের মধ্যে সকলের বড় রাজচক্রবর্তী চোরের মধ্যেও তেমনি চোরচক্রবর্তী। পুঁথিতে পুঁথিতে চোরচক্রবর্তীর বিচিত্র দিগ্বিজয়-কথা। কতরকম মন্ত্রতন্ত্র, নীতি-নিয়ম। আয়ুর্বেদের মতো গাছ-গাছড়ারও ব্যবহার। বহুকাল ধরে গুণীদের কাজের অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানের ফলে রীতিমতো একটা পদ্ধতি দাঁড়িয়ে গেছে। জগবন্ধু গোড়ার দিকে কৌতুকের মন নিয়ে অবহেলার ভাবে পড়তে আরম্ভ করেছিলেন। যত পড়েন অবাক হয়ে যান। প্রাচীন নিয়মকানুনগুলো আজকের দিনেও চলে আসছে অল্পসল্প রদবদল হয়ে। আমাদের পরিচিত সংসারের গায়ে গায়ে যেন এক বিচিত্র জগতের আবিষ্কার। আমাদের দিনমানের জগৎ, তাদের নিশিরাত্রির জগৎ। গতানুগতিক পথে এর মূলোচ্ছেদ হবে না। রোগই যদি বলতে হয়, সেই রোগের মূল ধরে টান পাড়তে হবে। সেই ব্রত বলাধিকারীর।

কিন্তু যত দিন যায়, কাজের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে। অবস্থা ক্রমশ বুঝতে পারছেন। সারাদিন যথানিয়ম চোর তাড়িয়ে অবসর সময়ে ঘরের মধ্যে বসে যত কিছু পড়াশুনা ও ভাবনাচিন্তা করতে পার, কিন্তু হাতে করবার কিছু নেই। জটিল শাসন-যন্ত্রের তুচ্ছাতিতুচ্ছ এক একটা নাট-বল্টু ছাড়া কিছুই নন তাঁরা। ঝিনুকপোতার দারোগার এ বিষয়ে স্পষ্টাস্পষ্টি কথা: বলেছে কে বাপু মূলোচ্ছেদ করতে? বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে ঠোকাঠুকি—কখনো লড়াইয়ে নেমে পড়ি, কখনো সন্ধিস্থাপন করি। ওরা করে খাচ্ছে, আমরাও করে খাচ্ছি—দিব্যি তো আছি। উচ্ছেদ হয়ে গেলে সরকার কি পুষবে আমাদের তখন?

একা ঝিনুকপোতা কেন, সব থানাওয়ালাই ভাবে এইরকম। সকলের থেকে আলাদা হতে গিয়েই জগবন্ধু ঘোর বিপাকে পড়ে গেছেন।

তদন্ত চলল অনেকদিন ধরে। সত্যপথের পথিক জগবন্ধু অবস্থা বিবেচনায় শুধুমাত্র সততার উপর নির্ভর করে থাকতে পারলেন না, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে ছুটাছুটি করছেন। এবং ডাইনে-বাঁয়ে টাকা ছড়াচ্ছেন। দারোগা হওয়া সত্ত্বেও টাকা করতে পারেন নি, সামান্য সঞ্চয় দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল। ভুবনেশ্বরীর মুখের হাসি কিন্তু একদিনের তরে মলিন হল না। নিজ হাতে একটা একটা করে গায়ের গয়না খুলে দিচ্ছেন—দু-হাতে শাঁখা এবং বাঁ-হাতে লোহাগাছি মাত্র রইল তাঁর। সাসপেন্ড হবার সঙ্গে সঙ্গে থানার কোয়ার্টার ছাড়তে হল। কিন্তু মোকাম ছাড়েন নি, তদন্তের সাক্ষিসাবুদ জোগাড়ে অসুবিধা ঘটবে। এবং ভুবনেশ্বরীও সেটা হতে দেবেন না—লোকে হাসিতামাসা করবে লেজ গুটিয়ে পালাল বলে। পাপ যখন নেই, কিসের ভয়? নানারকম কুৎসা আসত ভুবনেশ্বরীর কানে। রাগ করতেন না তিনি, হাসতেন: সত্য প্রকাশ হবে একদিন সূর্যের আলোর মতো, অন্ধকারের এইসব পেঁচার তখন নিশানা পাওয়া যাবে না।

দোষের প্রমাণ হল না তদন্তে। বলাধিকারী কিন্তু সত্যের জয় বলে স্বীকার

করেন না। প্রচুর ঘুষঘাষ দিয়ে সাক্ষ্য বানচাল করা হয়েছিল, জয় যদি বলতে হয় শুধুমাত্র সেই কারণে। তা সত্ত্বেও উপরওয়ালাদের আস্থা হয়নি, দেখা গেল। থানা থেকে সরিয়ে তাঁর উপরে একটা ছোট চৌকির ভার দেওয়া হয়েছে।

ভুবনেশ্বরীকে জগবন্ধু বলেন, এবারে যাবে তো ?

ভুবনেশ্বরী উদাস কণ্ঠে বলেন, রায় দিয়ে দিয়েছে। আর এখন বাধা কি ? লেজ গুটিয়ে পালানো আর কেউ বলবে না।

জগবন্ধু আরও সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এ জায়গা থেকে সে জায়গা—বদলি তো সকলেরই হয়ে থাকে। পুলিসের চাকরির দস্তুরই এই।

ভুবনেশ্বরী একটু হাসলেন : থানা থেকে চৌকিতে।

সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন, কে-ই বা জানতে যাচ্ছে ? আমরা তো বলছি নে কাউকে !

জগবন্ধুও সায় দিলেন : চলে যাবার পরে জানল তো বয়েই গেল। আর ফিরব না এখানে।

যাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে—অনেক দূরে কোন ধাপধাড়া জায়গার চৌকিতে। এক সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে দেখলেন, কাজলীবালা পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে। জগবন্ধুকে দেখে হাউ-হাউ করে কেঁদে পড়ল : মা কেমনধারা করছে, দেখ এসে।

ভুবনেশ্বরী মাটিতে পড়ে এপাশ-ওপাশ গড়াগড়ি দিচ্ছেন। মুখে ফেনা উঠছে। কী বলতে গেলেন স্বামীকে দেখে। কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও বলতে পারলেন না। দু-চোখে জল গড়াচ্ছে। তারপরেই পূর্ণ অচেতন হলেন।

উঠানে কলকে-ফুলের গাছ। কলকে-ফুলের-বীচি বেটে খেয়েছেন তিনি। শিলের উপর বাটনার কিছু অবশিষ্ট পাওয়া গেল। বড় বিষাক্ত জিনিস। বমি করিয়ে উগরে ফেলার অনেকরকম চেষ্ঠা হল। মাছ-ধোওয়া আঁশ-জল খাইয়ে দেখলেন। আরও নানাবিধ মুষ্টিযোগ। কিন্তু মৃত্যু ফসকে না যায়, সেজন্য অনেকটা খেয়ে নিয়েছেন তিনি। কিছুতে কিছু হল না। দূরের কোন চৌকিতে যাবার কথা—অনেক অনেক দূরে চলে গেলেন। দুনিয়াতেই আর ফিরবেন না।

ভুবনেশ্বরী চোখের জলে যে কথা বলতে গিয়ে পেরে উঠলেন না, তা-ও জগবন্ধু বুঝতে পারেন এখন। সিদ্ধপুরুষ পিতামহের রক্ত তাঁর দেহে, শৈশব থেকে সততা ও পুণ্যের সংসারে বড় হয়েছেন। জীবনভোর যা-কিছু জেনেবুঝে এসেছেন, হঠাৎ একদিন সমস্ত অলীক ও অর্থহীন হয়ে উঠল। চেনা ভুবন একেবারে অন্ধকার—বাসের অযোগ্য। স্বভাব বশে কবে মৃত্যু আসবে, ততদিন সবুর রইল না। সকলের অজান্তে এমনি কি কাজলীবালারও চোখ ফাঁকি দিয়ে পথ সংক্ষেপ করে চলে গেলেন। নিদারুণ ঘৃণায় পৃথিবী ছাড়লেন।

প্রথম পর্ব শেষ

(উপন্যাস)

এক

কয়েকটা দিন পরে বলাধিকারী ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যকে পথের উপর পেলেন। কোন দিকে গিয়েছিল, এখন বাসায় ফিরছে। সঙ্গে মক্কেল দু-তিনজন। বিয়ে-থাওয়ার ব্যাপারে তারা কোষ্ঠি-বিচার করতে এসেছে, হলদে তুলট-কাগজের পাকানো কোষ্ঠি হাতে। সেইসব কথা বলতে বলতে যাচ্ছে।

জগবন্ধুকে দেখে ক্ষুদিরাম মুখ ফিরিয়ে হাঁটার জোর বাড়িয়ে দিল। দেখতে পায়নি, এমনিতরো ভাব। জগবন্ধু একরকম ছুটে এসে পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলেন, চিনতে পারেন না বুঝি ভটচাজ মশায়? চিনবার কথাও নয়। থানা থেকে সরিয়ে দিয়েছে, তার উপরে আপনার আসল যে মক্কেল সে-ও চলে গেল।

থতমত খেয়ে ক্ষুদিরাম বলে, ক'দিন ছিলাম না বড়বাবু। আজকেই বাসায় গিয়ে দেখে আসতাম।

জগবন্ধু বললেন, বড়বাবু কেন বলছেন আমায়?

ক্ষুদিরাম কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলে, এ থানার না হলেও অন্য কোথাও বটে তো!

কোনখানে নয়। কাজে ইস্তফা দিয়েছি। একটা কথা বলব আপনাকে ভটচাজ মশায়। চলুন একটু ওদিকে—

চোখে-মুখে কি দেখতে পেল ক্ষুদিরাম—সঙ্গীদের বলে, বিকালে এসো তোমরা। এখন আমি পেরে উঠব না। বড়বাবুর সঙ্গে জরুরি কথাবার্তা।

লোকগুলো সরে যেতে জগবন্ধু বলেন, বেচা মল্লিকের কাছে আমায় নিয়ে চলুন। আজ হয়ে ওঠে তো কাল অবধি দেরি করব না।

ক্ষুদিরাম হেন ব্যক্তিরও চমক লাগে। মুখে একটু সূক্ষ্ম হাসি খেলে গেল। বলে, ইতর চোর-ডাকাত ওরা, পাপী, সমাজের শত্রু—

যেন মুখস্থ করে রেখেছে জগবন্ধুর নানান দিনের বলা বিশেষণগুলো। জো পেয়ে সবগুলো একত্র করে ছুঁড়ে মারল। জগবন্ধু গায়ে মাখেন না। এমন অনেক শোনার জন্য তৈরি তিনি এখন। বললেন, বেচারামকে আপনি একদিন আমার কাছে আনতে চেয়েছিলেন। থানার বড়বাবু ছিলাম বলে রাজি হইনি। আজ আমি শুধুই জগবন্ধু বলাধিকারী। আপনি নিয়ে চলুন, পায়ে হেঁটে তার কাছে চলে যাচ্ছি। বাধা ছিল সরকারি চাকরি—তার চেয়েও বড় বাধা আমার স্ত্রী। দুটো বাধাই সরে গেছে। মুক্তপুরুষ আজকে আমি।

জগবন্ধু কেমনভাবে হাসতে লাগলেন। ক্ষুদিরামের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, পলকহীন চোখে সে তাকিয়ে রইল।

জগবন্ধু বলেন, চুপ করে রইলেন কেন ভটচাজ মশায়? কবে নিয়ে যাবেন? দুনিয়াসুদ্ধ শেয়ানা, একলা আমি বোকা হয়ে কেন থাকব? ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাই।

জগবন্ধুর মনের সেই অবস্থায় ক্ষুদিরাম বাদ-প্রতিবাদ করে না। বলল, মল্লিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দু-চারদিনের মধ্যে আপনার বাসায় যাব।

গিয়েছিল তাই। জগবন্ধু তখন অনেক সামলে উঠেছেন। হাসছেন সহজ-ভাবে।

ক্ষুদিরাম বলে, নিয়ে যাচ্ছি বটে—কিন্তু পেরে উঠবেন না। সকলে সব কাজ পারে না। আমার কী হল—আমি হদ্দমুদ্দ চেষ্টা করেছি, বাপ মা-ভাই সবাই চেষ্টা করেছে। পরিবারের কত কান্নাকাটি—আপনার কাছে মিথ্যে বলব না বলাধিকারী মশায়, টানও খুব পরিবারের উপর। এত করেও ভাল থাকতে পারলাম না। আপনারও তেমনি—চেষ্টা যত যা-ই করুন, মন্দ হতে পারবেন না। যার যেদিকে টান, যার যাতে জমে। আফিঙের ডেলা মুখে ফেলে কেউ ঝিম হয়ে থাকে, বড়-কলকে না টেনে কারও মউজ হয় না, আবার পানের মধ্যে সিকি টিপ জরদা দিয়ে বারদুয়েক পিক ফেলে কেউ এলিয়ে পড়ে। বুঝলেন না, নেশারই রকমফের সমস্ত।

জগবন্ধু হেসে বলেন, এই সব বলেছেন নাকি বেচা মল্লিকের কাছে?

তাকে কিছু বলতে হয় না। এত লোক চরিয়ে বেড়ায়, নিজেই সব জানে। তার কথাগুলো আমি বলছি।

জগবন্ধু হতাশভাবে বললেন, তবে আর সেখানে গিয়ে কি হবে?

ক্ষুদিরাম বলে, যেতে হত না, মল্লিকই এসে পড়ত। বলে, সাধুলোকেরই দরকার আমাদের কাছে। অমন সাধু একজন পাই তো মাথায় করে রাখব। ছুটে আসছিল, আমি ঠেকিয়ে দিলাম। সাত-তাড়াতাড়ি চাউর হতে দিই কেন? ও-লাইনে আপনি যাবেন—আমি কিন্তু এখনো বিশ্বাস করিনে বলাধিকারী মশায়। যে-কেউ আপনাকে জানে, বিশ্বাস করবে না।

ক্ষুদিরামের নিজের কথা সেইদিন বলাধিকারী শুনলেন। পরবর্তীকালে চোর-ডাকাত কতই তো দেখলেন—অনেকে প্রয়োজনে পড়ে হয়, পেটের দায়ে। নেশায় পড়েও হয় বিস্তর—আফিঙ-গাঁজার ঐ তুলনা দিল, কোথায় লাগে এ নেশার দুরন্ত দুঃসাহসিকতার কাছে! ক্ষুদিরামের তাই—

মানুষ যত কিছু বাসনা করে, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের ছিল সমস্ত। এখনো আছে। উঁচু বংশগরিমা। পিতামহ ও প্রপিতামহ দিকপাল পণ্ডিত—তাঁরা চতুষ্পাঠী চালাতেন। চতুষ্পাঠী এখনো রয়েছে বাড়িতে। বাপ সংস্কৃত ছাড়া ইংরেজিতেও এম-এ পাশ করেছিলেন সেই আমলে। অঞ্চলের মধ্যে তিনিই বোধ হয় প্রথম। এক বয়সে ক্যালেক্টরিতে মোটা চাকরি করতেন। ভাইরাও সকলে নানাদিকে কৃতী। ক্ষুদিরাম সকলের ছোট। ঠিক হল, ভাল সংস্কৃত শিখে বাড়ি থেকে সে চতুষ্পাঠী চালাবে, পিতামহ ও প্রপিতামহের কীর্তি বজায় রাখবে।

পড়াশুনোয় ভালই কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি কাজকর্ম আলাদা রকম। বাড়ির সঙ্গে

তাই খাপ খাইয়ে থাকতে পারল না, ক্ষুদিরামের সমস্ত থেকেও নেই। ভাঁট-অঞ্চলে পড়ে রয়েছে। অনেকদূরে পৈতৃক গাঁয়ে-ঘরে বাপ-মা ভাই-ভাজ এবং নিজের স্ত্রী জমিয়ে সংসারধর্ম করছে—ক্ষুদিরাম যায় না সেখানে, এমন নয়। যায় খুব কম—রাত্রিবেলা লুকিয়ে চুরিয়ে গ্রামের উপর ওঠে, গিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। একদিন দু-দিন রইল তো সর্বক্ষণ সেই ঘরে চুপচাপ শুয়ে পড়ে থাকে। দরজায় তালা ঝুলছে। বাড়ির বড়রা ছাড়া সবাই জানে শূন্য ঘর—মানুষ নেই সেখানে। ফেরারি আসামীর অবস্থা। ফিরবার সময়েও রাত্রিবেলা অতি সন্তর্পণে রওনা। চেনাজানা কারো নজরে পড়ে না যায়। অনেকদিনের অদর্শনে ক্ষুদিরাম মানুষটাকে ভুলে গেছে সকলে, মরার শামিল ধরে নিয়েছে।

সেই বয়সটায়—অল্পদিন বিয়ে হয়েছে তখন—ক্ষুদিরাম আর এক মানুষ। বাড়ির চতুষ্পাঠীতে কাব্য ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্র পড়ে। বড় পরোপকারী ছেলে, কারো বিপদের কথাশুনলে ঝাঁপিয়ে পড়বে সকলের আগে গ্রামবাসীর চোখের মাণিক ক্ষুদিরাম।

একবার খুব চুরি হতে লাগল। তার বয়সের ছেলেদের নিয়ে ক্ষুদিরাম রক্ষি-বাহিনী গড়ল। দিনমানে লাঠি খেলে, কুস্তি ও দৌড়ঝাঁপ করে, রাত জেগে চোর পাহারা দেয়। বাহিনীর কর্তা সে-ই। সারারাত্রি গান গেয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। সে কী কাণ্ড! চোর তো চোর, বাঁশবনে পেঁচার ডাক—পহরে পহরে শিয়ালের ডাক অবধি বন্ধ হয়ে গেল তাদের গানের ঠেলায়। নটবর গুণীন বলত, শেওড়াগাছের ভূতপেত্নীরা অবধি গ্রাম ছেড়ে ভয়ে পালিয়েছে।

এইসব বলাবলির কারণেই হয়তো বা রক্ষীবাহিনী অকস্মাৎ চুপ হয়ে গেল। পথে বেরিয়েছে না বাড়িতে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে বোঝা যায় না। ক্ষুদিরাম বলছে, চোর তাড়ানো নয়—ধরেই ফেলব চোরগুলো। বারোমাস তিরিশ দিন পথে পথে গান গেয়ে বেড়ানো কিছু সম্ভব নয়। তার চেয়ে চোর ধরে ধরে চালান দিয়ে ফেললে উৎপাতের শেষ।

সেই বন্দোবস্ত হয়েছে। ঝোপেঝোপে ঘাপটি মেরে থাকে সারা গ্রামে ছড়িয়ে। উঁচু ডালের উপরে কেউ কেউ দূরের পানে নজর ফেলে বসে থাকে।

একটা দল তারপরে সত্যি সত্যি ধরে ফেলল। জন আস্টেকের মাঝারি দলটা। মূল-কারিগর থেকে মুটিয়া অবধি—গাঁয়ের উপর যারা উঠেছিল, একটাকেও আর ফিরতে দেয়নি। বাড়ির উঠানে হাতে-দাঁড় দিয়ে সকলকে মেইকাঠের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। সারা দিনমান অঞ্চল ভেঙে দেখতে আসে, আর রক্ষিবাহিনীর কাজের তারিফ করতে করতে চলে যায়।

সেই থেকে একেবারে সবচুপ হয়ে গেল। চোর বুঝি মুলুক ছেড়ে পালিয়েছে। গতিক এমন—শোবার সময় লোকে দরজার খিল আঁটতে ভুলে যায়। রক্ষিবাহিনী রাতের পর রাত শূন্য গ্রাম পাহারা দিয়ে বেড়ায়। লোক কমতে লাগল—দিনের বেলা কুস্তির আখড়াতেও লোক আসে না। উদাস ভাব

সকলের ঃ কি হবে এসে, গায়ের তাগত বাড়িয়ে প্রয়োগ হবে কার উপর ? চোর কোথায় ?

কেউ বলে, ক্ষুদিরাম-ভাই, রক্ষিবাহিনী ভেঙে দিয়ে দাবা-পাশার বন্দোবস্ত করো, একসঙ্গে বসে তবু খানিক আড্ডা জমানো যাবে।

ক্ষুদিরামও তাই দেখছে। বাহিনী আর টিকিয়ে রাখা যায় না। ভগবান এমনি সময় মুখ তুলে চাইলেন। চোর উঠেছে আবার গাঁয়ে। সিঁধেল নয়, ছিঁচকে। এক বাড়ির বৈঠকখানা থেকে পিতলের গাড়ু হেরিকেন-লণ্ঠন ও বাঁধানো হুঁকো নিয়ে গেছে। হোক ছিঁচকে, চোর তো বটে ! মাছ বলতে রুই-কাতলা যেমন, খেঁয়া-পুঁটিও তেমনি। গ্রামখানা একেবারে বয়কট করেছিল— আবার যখন নজর ধরেছে, ছিঁচকে থেকেই ক্রমশ বড়রা দেখা দেবে।

মেতে উঠল ছেলেরা। রক্ষিবাহিনী আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। চোরেও লাগল। রীতিমতো পাল্লাপাল্লি এবারে। চতুর চোর—বিশাল গ্রামখানা একেবারে যেন নখদর্পণে। নিত্যিদিনের ঘরগৃহস্থালীর মধ্যে তিলেক কেউ বেসামাল রয়েছে, এবং বাহিনীর লোক সেই সময়টা হয়তো ভিন্ন পাড়ায়—চোরে বুঝি অন্তরীক্ষে বসে খড়ি পেতে টের পায়, টুক করে তারই মধ্যে এসে কাজ সেরে চলে গেল।

এই চলছে। দলের মাথা ক্ষুদিরাম—তাকেই দেখিয়ে দেখিয়ে যেন কাজ। একদিন তাদেরই বাড়িতে। রান্নাঘরের তালা ভেঙ্গে ঢুকে যাবতীয় এঁটো-বাসন নিয়ে গেছে। এমন অবস্থা করে গেল পরের দিন কলাপাতা কেটে ভাত খেতে হয়। ক্ষুদিরাম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে—তারই অপমান সোজাসুজি। নিজেদের হাতে সম্পূর্ণ না রেখে অতঃপর থানায় হাঁটাহাঁটি করে। তিনটে কনস্টেবল মোতায়েন হল, রক্ষিবাহিনীর সঙ্গে বন্দুক নিয়ে তারাও পাহারা দেয়।

কী হবে ! সামনে আসে না চোর, সামনে পেলে তবেই তো বন্দুক। নাজেহাল করে মারছে। এক রাত্রে আবার ঐ ক্ষুদিরামের বাড়িতেই তুমুল চেঁচামেচি। চোর পড়েছে নাকি। মেজভাই দোর খুলে বাইরে বেরিয়েছিল— দেখে, রান্নাঘরের দাওয়ায় গুটিসুটি কী-এক বস্তু। কৃষ্ণপক্ষের শেষাশেষি একটা তিথি, তার উপর বাদামগাছ বড় বড় পাতা মেলে, জায়গাটায় ঘুরঘুট্টি আঁধার জমিয়েছে। মেজভাই গোড়ায় চোর বলে ভাবেনি—চোর তো রান্নাঘরেই যা করবার করে গেছে আগে। ভেবেছে শিয়াল। রান্নাঘরে পাকা কাঁঠাল— গন্ধে গন্ধে শিয়াল দাওয়ায় উঠে পড়েছে। আধেলা-ইট একটা হাতের কাছে পেয়ে ছুঁড়ে মারল শিয়াল তাড়ানোর জন্য। নিরিখ করেও মারেনি—কিন্তু ইট গিয়ে লাগল ঠিক সেই ছায়াবস্তুর উপরে। নতুন থালাবাটি কেনা হয়েছে— ঝনঝন করে একগাদা দাওয়া থেকে গড়িয়ে উঠানে পড়ল। পিণ্ডাকার ছায়াবস্তুও মুহূর্তে দুটো পা বের করে দৌড় দিয়ে পালাল।

হৈ-হৈ পড়ে গেল। রক্ষিবাহিনীর কয়েকজন কাছাকাছি ঘুরছিল, তারা

ছুটে এসেছে। বমাল নিয়ে নিঃশব্দে আজও সরে পড়ত, স্বভাবের তাড়ায় মেজভাই বেরিয়ে পড়ায় রক্ষে হয়েছে। ইঁটের ঘায়ে জখম হয়েছে চোর। রক্ত-পাত হয়েছে—দাওয়া থেকে বাইরের অনেক দূর অবধি চাপ চাপ রক্তের দাগ ।

দলপতি ক্ষুদিরাম-ভাইকে তো চাই। চোর খুঁজতে লাগো তোমরা, তাকে ডেকে নিয়ে আসি। পশ্চিমপাড়ায় আছে সেখানকার দলটার সঙ্গে।

একজনে ছুটল। পশ্চিমপাড়ার দল বলে, আমাদের সঙ্গে নয়। সে তো উত্তর পাড়ায় শুনেছি।

রক্ত-চিহ্ন ধরে ধরে কেয়াঝাড়ের মধ্যে ঢুকে চোর পাকড়াল। একখানা পা বিষম জখম। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এই অবধি এসে আর পারেনি। কেয়াপাতার কাঁটায় সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে বসে পড়েছে। বসে বসে হাঁপাচ্ছে।

অ্যাঁ ক্ষুদিরাম-ভাই, চোর তবে তুমি? নিজের বাড়ি চুরি করতে উঠেছিলে —কী সর্বনাশ।

তাজ্জব কাণ্ড! গ্রামময় সাড়া পড়েছে। পাড়া ভেঙে সব দেখতে আসছে। পুরুষলোক মেয়েলোক—এমন কি নিশিরাত্রি হলেও ছেলেপুলে অবধি ভিড় জমিয়েছে। মানী ঘরের ছেলে ক্ষুদিরাম, টোলে-পড়া বিদ্বান, গ্রামের সকল সৎকর্মে অগ্রণী—ভিতরে ভিতরে মানুষটা এই!

মেজভাই হাহাকার করে উঠল: আমার ভাই চোর!

রক্ষিবাহিনীর ছোকরারা ভেবে ভেবে দেখল, ইদানীং যত এই রকম ছ্যাঁচড়া চুরি হয়েছে, ঠিক সময়টা দলপতির উদ্দেশ মেলে নি। চাপাচাপি করতে হল না—ঘাড় নেড়ে ক্ষুদিরাম স্বীকার করে নেয়, কাজগুলি তারই বটে।

কপালে করাঘাত করে বুড়ো বাপ আর্তনাদ করে ওঠেন: কিসের অভাবে তুই চোর হতে গেলি?

অভাব কেন হতে যাবে? একটা জিনিসও সে বিক্রি করে নি, পানাপুকুরে সমস্ত ফেলে দিয়েছে।

নিঃসংকোচে এমন সহজভাবে বলে যে বিশ্বাস হওয়া শক্ত। দলের ছোঁড়ারাই পানাপুকুরে নেমে পড়ল। ক্ষুদিরামের নির্দেশ মতো ডুব দিয়ে দিয়ে জিনিস তুলে আনে। বিস্তর পাওয়া গেল। ছোটখাটো দু-দশটা পাওয়া যায় নি—পাঁকের নিচে হয়তো পুঁতে আছে, কিংবা অন্য দিকে সরে গেছে ফেলবার সময়।

অতি প্রিয় দু-একটি সাগরেদ এসে বলে, চোর শাসনের জন্য কী খাটনি খেটেছে ক্ষুদিরাম-ভাই। চোর শেষটা তুমিই হয়ে গেলে। এ যেন সাপ হয়ে ছোবল দেওয়া, ওঝা হয়ে ঝাড়ানো—

ক্ষুদিরাম হাসিমুখে নিরুত্তরে উপভোগ করছে।

ব্যাপার যখন এই, থানায় ধন্না দিয়ে কনেস্টবল এনে বসাতে গেলে কেন?

কাজ দেখে কনেস্টবলগুলো হাঁ হয়ে যাবে ভেবেছিলাম। থানায় বাবুদের গিয়ে বলবে, তারাও চলে আসবে। গাঁয়ের খাতির হবে পুলিশের কাছে।

ভেবেছিল একরকম, শেষ অবধি ঘটে গেল উল্টো। ফোঁস করে ক্ষুদিরাম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে মুখের উপর লজ্জার ক্ষীণ একটা হাসি। সে লজ্জা চোর হওয়ার জন্য নয়, ধরা পড়ার বেকুবির জন্য।

মায়ে-বাপে কথাবার্তা শুনতে পাওয়া গেল। মা বলছেন, বউমা এখানে নেই কী ভাগ্যি! তা বলে কানে যেতে কি বাকি থাকবে—কতজনে কত রকম রসান দিয়ে বলবে। বয়সটা খারাপ—ঝোঁকের মাথায় একটা কিছু করে না বসে, আমার সেই ভয়।

কাপড় কেরোসিনে ভিজিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া, ঘরের আড়ায় ও নিজের গলায় শাড়ি বেঁধে ঝুলে পড়া, কলসি গলায় বেঁধে পুকুরে ঝাঁপ দেওয়া ইত্যাদি নানা প্রণালী তখনকার কমবয়সি মেয়েদের মধ্যে চালু। মায়ের মনে সেই ভয় ঢুকেছে। ক্ষুদিরামও শিউরে ওঠে। বিয়ে এক বছরও হয় নি এখনো। বাপের বাড়ি আছে বউ, বছর পুরলে পাকাপাকি ঘর করতে আসবে। বারতিনেক অল্প-স্বল্প যা দেখা, তার মধ্যেই নতুন বউ বরের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে।

সকলের এক প্রশ্ন: এমন কাজ কি জন্য করতে গেলে? আরে, হিসাবপত্র করে বুঝেসমঝে করল নাকি কিছু? না করে পারে না, এমনি তখন অবস্থা। চোর তাড়ানোর জন্য এত কষ্ট—সেই চোর সত্যি সত্যি গ্রামছাড়া হয়ে গেল। ভাল জিনিস পড়ে মরুক, একটা আধলাপয়সা তুলে নেবারও লোক নেই। গৃহস্থবাড়ি সন্ধ্যাবেলা সব শুয়ে পড়ে, সকালবেলা চোখ মুছতে মুছতে ওঠে, রাত্রিগুলো একেবারে চুপচাপ, ঘুমের মধ্যে একবার পাশমোড়া দেবারও আবশ্যক হয় না কারো। রক্ষিবাহিনী নিয়ে মড়ার রাজ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমনি মনে হয় ক্ষুদিরামের। এত করে গড়েতোলা রক্ষিবাহিনীরও যায়-যায় অবস্থা—ছেলেরা ঘর থেকে বেরুতে চায় না, কী হবে মিছামিছি ঘুরে ক্ষুদিরাম-ভাই—

ক্ষুদিরাম ফাঁক বুঝে তখন নিজেই চুরি করে বসল। চোর এসেছে, চোর এসেছে—কলরব পড়ে গেল চতুর্দিকে। রক্ষিবাহিনী দেখতে দেখতে জেঁকে উঠল, মেঘ কেটে গেল সকলের মনের। গৃহস্থ-মানুষের চোখে ঘুম হরেছে, খুট করে কোন দিকে এতটুকু শব্দ হলেই আলো জেলে উঠে বসে। অমুক বলছে, তার দরজায় ঘা দিয়ে গেছে নাকি কাল। তমুক বলছে, সিঁধকাঠির কয়েকটা ঘা তার দেওয়ালে পড়তেই লাঠি নিয়ে লাফিয়ে পড়ল, সেইজন্যে রক্ষে হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে কার একটা যুটো ঘটি নিয়ে বুঝি পানাপুকুরে ফেলেছে—মানুষটা থানায় গিয়ে মালের লিস্টি জানিয়ে এলো। সেই সব মাল চোখেও দেখে নি তার চোদ্দপুরুষ। চোর নিয়ে নানান জল্পনা-কল্পনা—সঠিক চিনতে পেরে নামও বলে দিচ্ছে কেউ কেউ: তমুক গাঁয়ের এই জন। বলছে আবার ক্ষুদি-রামে কাছে এসে। রক্ষিবাহিনী চালনা করতে করতে দলের ছেলেদের ফাঁক কাটিয়ে বন্দুকধারী কনেস্টবলদের প্রায় চোখের উপরে টুক করে কাজ সেরে আসা

—বুড়ো বাপ-মা ভালো-মানুষ ভাইরা অথবা অবোধ কিশোরী বউ কারো পক্ষে এ জিনিসের মজা বোঝাবার কথা নয়। চোর ধরতে ধরতে নিজেই শেষটা চোর হয়ে পড়ল। হয় এমনি। থানার চৌহদ্দির মধ্যে এত চোর, সে বোধ হয় এই কারণেই।

চোরাই মাল সবই প্রায় ফেরত পাওয়া গেল, তা ছাড়া প্রাণপাত করে চিরদিন দশের কাজ করে এসেছে—এইসব বিবেচনায় ক্ষুদিরামকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া হল না, ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দিল সকলে মিলে। কিন্তু এর পরে আর গাঁয়ে-ঘরে থাকা চলে না। বাপ অবসর নিয়েছেন, তা হলেও খাতির খুব। আদালতে একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়ে ক্ষুদিরামকে সদরে পাঠালেন। চোখের আড়াল হয়ে থেকে লোকে ক্রমশ এই সমস্ত ভুলে যাবে, চাকরে-মানুষ হয়ে আবার এক সময়ে সকলের সঙ্গে যথাপূর্ব মেলামেশা করবে—এই প্রত্যাশা। হল না, একখানা কুঠরির মধ্যে দশটা-পাঁচটা বসে কলম-পেষা পোষায় না ক্ষুদিরামের। দুধের স্বাদ যে পেয়েছে, ঘোলে তার মন উঠবে কেন? কাপ্তেন বেচা মল্লিকের খুব নাম শোনা যায় আদালতে, ফৌজদারি নথিতে তার রকমারি কীর্তি-কাহিনী। বেচারাম সদরে এলে তার সঙ্গে ক্ষুদিরাম দেখা করল, চেনা জানা নিবিড় হল। চাকরী ছেড়ে তারপরেই সে ভাঁটি অঞ্চলে আস্তানা নিল পুরো-পুরি।

বলাধিকারী বলেন, বড়বউ আত্মঘাতী হল, রেলের কামরায় আমি সকলের কাছে বলেছিলাম। সাহেব, তোর মনে পড়বে। বলেছিলাম, গয়নার দুঃখে মারা গেল। গয়না গিয়েছিল সত্যিই—তদন্তের খরচা যোগাতে দু-হাতে দু-গাছা শাঁখা বই অন্য কিছু ছিল না। দুঃখে পড়ে মারা গেছে—অতি-বড় দুঃখ না হলে আমায় ঐ অবস্থায় একলা ফেলে চলে যেত না। কিন্তু ক-টুকরো সোনা-দানা হারিয়ে প্রাণ দেবার মেয়েলোক সে নয়। সে যা হারাল, দুনিয়ার যাবতীয় সোনা-রুপো, হীরে-মাণিকের চেয়ে তার দাম বেশি। তার দুঃখ আমিই কেবল জানি। অভিশাপ লেগে দেব দেবীর স্বর্গচ্যুতি হল, পুরাণে পড়ে থাকি। বড়বউয়ের জীবনে হঠাৎ একদিন তাই ঘটে গেল।

বলতে বলতে বলাধিকারী মুহূর্তকাল স্তব্ধ হলেন। যারা শুনছে, তাদেরও কথা সরে না। নিশ্বাসটা অবধি সন্তর্পণে ফেলে।

ম্লান হেসে বলাধিকারী বললেন, আরও একটা মিথ্যা কথা বলেছিলাম রে। স্ত্রী মারা গিয়ে, সংসারধর্ম ছেড়ে সাধু-বিবাগী হয়েছি আমি; ঠিক উল্টো—সাধু নয়, চোর।

সাহেব ঘাড় নেড়ে বলল, চোর কোথা, সাধুই তো আপনি।

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য ও সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন করে উঠেঃ সাধু বই কি! সাধু-দারোগা থেকে সাধু-মহাজন। চেষ্টা কি করেন নি চোর হতে? পেরে উঠলেন

না। ইচ্ছেয় হয় না কিছু। আমারও দেখুন। নিজে হন্দমুন্দ দেখেছি, তার উপর বাড়িসুদ্ধ উঠে পড়ে লেগেও সাধু বানাতে পারল না।

সাহেবকেই লক্ষ্য করে দরাজভাবে পরিচয় দিচ্ছেঃ মহাজন, অর্থাৎ মহৎ জন—ষোলআনা মানেটা বলাধিকারী মশায়ের উপরেই খেটে যায়। এমন খাঁটি-সাধু পাই-তক্কের ভিতর নেই। কারিগরে খেটেখুটে এসে বমাল ফেলে নিশ্চিন্ত—বখবার আধপয়সা অবধি হিসাব হয়ে ঠিক-ঠিক ঘরে গিয়ে পেঁছিবে। মর-সুমের মুখে গাঁ-গ্রাম ছেড়ে প্রাণ হাতে করে সব বেরিয়ে পড়ে—জানে, নিজেরা যদিই বা মারা পড়ে, বাড়ির বউ ছেলে-পুলে মরবে না বলাধিকারী মশায় বর্তমান থাকতে। কতই মহাজন কত দিকে—

বাধা দিয়ে বংশী তিক্তস্বরে বলে ওঠে, মহাজন কে বলে তাদের? ও-নামে ঘেন্না দিও না। তারা থলেদার। এক থলেদার আছে নবনীধর ধাড়া—গুরুপদ ঢালির চেনা মানুষ। সেই যে গুরুপদ—আমার আজামশায়ের সাগরেদি করতে করতে নতুন গোঁফ উঠে সেই গোঁফ এখন পেকে সাদা হয়ে গেছে। ধাড়ার কথা বলে গুরুপদ। মালপত্তরের দাম তার মুখস্ত—দেখতে হয় না, ভাবতে হয় না। রুপোর হাঁসুলি বারো-আনা, দা-কুড়াল বঁটি-খন্তা দু আনা করে, কাঁসার বাটি গেলাস এক-এক সিকি, পিতলের গামলা ছ আনা—

ক্ষুদিরাম বলাধিকারীকে বলে হতে পারবেন অমন? দেখেছেন তো চেষ্টা করে—আরও দেখুন—পারবেন না।

সাহেবের নিজের কথা মনে এসে যায়। সত্যি বটে, ইচ্ছেয় কিছু হয় না। মা-কালীকে কত করে ডেবেছে মন্দ করে দেবার জন্য। কিছুদিন নিশ্চিন্ত—মন্দ হয়ে দিব্যি মন্দ-মন্দ কাজ করে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ এক মোক্ষম সময়ে এমন কাজ করে বসল, বড় বড় পুণ্যবানেরই যা পোষায়।

ভ্রূভঙ্গি করে সাহেব বলে উঠে, ফাঁকির কাজ করবেন বলাধিকারী মশায়! তবেই হয়েছে! ক্ষমতাই নেই।

বলাধিকারী দুঃখের ভান করে বলেন, কাজলীবালাও ঠিক এই বলেছিল।

তারপরে ক্ষুদিরাম একদিন বলাধিকারীকে কাপ্তেন বেচা মল্লিকের কাছে নিয়ে গেল। বেচারাম তটস্থ। কথাবার্তা সঙ্গে সঙ্গে পাকা, বলাধিকারী এই ফুলহাটায় এসে আস্তানা নিলেন। ফলাও তেজারতি কারবার—টাকা কর্জ দেন খতে হ্যাণ্ডনোটে, ধান বাড়ি দেন, সোনা-রুপো ও জমাজমি বন্ধক রাখেন।

এ সমস্ত বাইরের আবরণ। কিন্তু ঘরের কাজলীবালা কেন সমস্ত কথা জানবে না? ডেকে নিয়ে একদিন বলাধিকারী বললেন, তুমি চলে যাও কাজলীবালা, আমার কাছে থাকা আর চলবে না।

কাজলীবালা অবাক হয়ে বলে, কী দোষ-পাপ করলাম, বাবাঠাকুর?

বলাধিকারী বলেন, বড় পবিত্র মেয়ে তুমি। ভাল থাকতে গিয়ে অনেক কষ্ট

পেয়েছ। দোষ-পাপ যাকে বলো, সে পথ আমিই বেছে নিলাম। তুমি সামনের উপর থাকলে মনে সর্বদা খচখচ করে বিঁধবে, সোয়াস্তি পাব না। তোমার কিছু নয়—আমার দোষ-পাপের জন্যেই তোমায় তাড়াচ্ছি।

তুমি করবে দোষ-পাপ, তবেই হয়েছে! কাজলীবালা উড়িয়ে দিল একেবারে। জেদ ধরে বসল, জুতো মারো, ঝাঁটা মারো, তোমার পায়েই পড়ে থাকব বাবা। ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিলে আবার ফিরে আসব। মা চলে গেছেন, আমি গেলে দেখাশুনো করবে কে?

জগবন্ধু সদুঃখে তাই বলেন, এতকাল লাইনে আছি, দুনিয়াসুদ্ধ মানুষ দোষঘাট করছে—আমি নাকি অক্ষম অপদার্থ, ঐসব কখনো করতে পারিনি। বড়বউ সারাজীবন বলে গেছে, কাজলীবালা এসেও তাই বলে, তোমরাও বলো যখন-তখন। সাধু হওয়ার দুর্নাম সারা জন্মে ঘুচানো গেল না।

ক্ষুদিরাম বলে, আমি মোক্ষম কথা বলে দিয়েছি—যার যাতে নেশা হয়ে যায়। নেশা জোর করে তাড়াতে গেলে আরও বেশি করে জড়িয়ে যায়। আমাদের গাঁয়ের একজন মদ ছাড়তে গিয়ে আফিং ধরল। এখন এমনি হয়েছে, চোখ বুজে ঘণ্টায় ঘণ্টায় গুলি ফেলে যেতে হয় মুখে। অনুপান হল আড়াই সের ঘন-আঁটা দুধ আর সেরখানেক রসগোল্লা। মদের পিতামহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনারও তাই। সাধু-দারোগা থেকে সাধু-মহাজন—আরও ছোটো বরুন. চিমটে-কম্বল নিয়ে ষোলআনা সাধু হয়ে বনে চলে যেতে হবে।

তুষ্টুরাম নাছোড়বান্দা। গুরুপদ ঢালিকে ধরে এনেছে। সেই প্রথম বয়স থেকে যেজন পচা বাইটার সাগরেদি করে আসছে। আজামশায়ের সাগরেদ হিসাবে বংশীর সঙ্গে পরিচয়—বংশীর বাড়ি উঠেছে। বয়স হয়েছে গুরুপদর —বয়সের জন্যে পুরো মরসুমের দিনে সে বাড়ি বসে রয়েছে। তুষ্টুর টানাটানিতে চলে এলো। নলের সঙ্গে একটানা মাসের পর মাস পেরে না উঠুক, ছুটো এক-আধখানা কাজে অসুবিধা হবে না। এবং কাজ যদি সত্যি-সত্যি নামানো সম্ভব হয়, গুরুপদ হেন প্রাচীন বহুদর্শী লোক উপস্থিত থাকতে সর্দার অন্য কে হতে যাবে? বখরার উপরে এত বড় সম্মানের আশা পেয়েই তুষ্টুর ডাকে এক কথায় গুরুপদ চলে এসেছে।

কিন্তু কিছুই হবে না, যতক্ষণ না জগবন্ধু বলাধিকারী ঘার নেড়ে 'হাঁ' বলে দিচ্ছেন। মা-কালী হলেন ইষ্টদেবী। আর দেব-সেনাপতি কার্তিকঠাকুর চোরেরও সেনাপতি হয়ে অলক্ষ্যে আগে আগে চলেন। দেব-দেবীর নিচেই, ভাঁটি অঞ্চলের এরা মনে করে, বলাধিকারীর স্থান। কপালের উপর অদৃশ্য এক চোখ আছে বুঝি—তাই দিয়ে আগেভাগে বলাধিকারী দেখতে পান। তিনি যে কানেই নিতে চান না, তার কী উপায়?

তুষ্টুরাম জনে জনের কাছে দরবার করে বেড়াচ্ছে। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যকে

গিয়ে ধরল : দিনক্ষণ দেখে তুমি একবার পাক দিয়ে এসো। ভটচাজ-বামুনের চোখে দেখে এসে বলো, ডোমের বেটার চোখের উপর বলাধিকারী মশায়ের বোধ-হয় ভরসা হয় না। তুমি বলে দিলে সঙ্গে সঙ্গে মত হয়ে যাবে।

আস্পর্ধার কথা শোন একবার। ক্ষুদিরাম স্তম্ভিত হয়ে যায়। তুণ্টু যেখানে পয়লা খুঁজিয়াল, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য সেই কাজের উপর চোখ দিতে যাবে! অর্থাৎ রাজমিস্ত্রি হয়ে গাঁথনিটা তুণ্টু করে এলো, ক্ষুদিরামের তার উপর চুন টানার কাজ। যদি শোনা যায়, সে-বাড়ির মক্কেল ঘরের মেজেয় মাদুর পেতে সোনার মোহর শুকোতে দিয়েছে, তেমন ক্ষেত্রেও তো যাওয়া চলবে না। রুজি-রোজগারের লোভ থাকতে পারে, তা বলে ইজ্জত মেরে কদাপি নয়।

তবে অতিশয় অনুগত ও আজ্ঞাবহ এই তুণ্টুরাম। বিস্তর কাজকারবারের সাথী—সে-লোকের মুখের উপর এত সব বলা যায় না। তুণ্টু হাত-পা ধরাধরি করছে : খোল পাঁজি ভটচাজ মশায়, দিন বের করো একটা—

ক্ষুদিরাম বলে, দিন এখন কোথা রে? মলমাস চলছে।

চলবে কদ্দিন?

নামের মধ্যেই তো মাস শুনলি—মলমাস, মলদিন নয়। সেটা দু-মাস না ছ-মাস পাঁজি দেখে হিসাবকিতাবের ব্যাপার। বলছিস যখন, তা-ই না-হয় করে দেখব এক সময়।

তুণ্টু বলে, মাসের হিসাব কি করবে তুমি? দিনের হিসাব করো। কিম্বা তার চেয়েও ছোট—ঘণ্টার হিসাব। লোহার সিন্দুকের টাকা কাঠের বাক্সে এসে নেমেছে। পরের টাকা, মুফতের টাকা—এর পরেই তো পাখনা মেলে উড়বে। যা করতে হয় তাড়িঘড়ি—

বলতে বলতে কাঁদো-কাঁদো হল তুণ্টুরাম : তোমার ঐ মলমাসের হিসাব কষে বাক্স ভাংতে গেলে দেখবে খোপে আর তখন পয়সা-টাকা কিছু নেই--একটা হত্তুকি।

কৌতূহলী হয়ে উঠেছে ক্ষুদিরাম। না-ই বা গেল সেখানে, খবরটা নিতে বাধা কি? খোঁজদারি কাজ যাদের, দরকারে লাগুক, বা না লাগুক, তল্লাটের সকল খবর নখদর্পনে রাখতে হয়। কোন্ গাইটার কি বাছুর হল, কোন্ ডালে ক'টা আম ফলল, সম্ভব হলে তা-ও।

বলে, সন্ন্যাসীপদ দত্তর বাড়ি মাহিন্দার তো তুই?

মরসুমের সময়টা জোয়ানপুরুষ দু-পাঁচ টাকার গোনা মাইনে নিয়ে গৃহস্থ-বাড়ি পড়ে আছে, এটা বড় লজ্জার কথা। অকর্মণ্যতার পরিচয়। তুণ্টুরামের কপালে তাই ঘটল এবার। সম্পূর্ণ নিজের দোষে—মনে পড়লে ঠাঁই-ঠাঁই করে নিজের গালে চড়াতে ইচ্ছে করে।

দশেরার রাত্রে লোক বাছাইয়ের তারিখটায় আকণ্ঠ তাড়ি গিলে পড়ে ছিল। হঠাৎ মনে পড়ে ব্যাকুল হয়ে হাঁটতে লাগল। হাঁটা নয়, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটা।

কিন্তু গেরো খারাপ—

নেশার ঘোরে পথ গোলমাল হয়ে যায়। সকাল অবধি তামাম অঞ্চলে হেঁটে বেড়িয়েছে, আসল ঠাঁই খুঁজে পায়নি। শেষটা হাটের চালার মধ্যে শুয়ে নাক ডেকে মনের সাধে ঘুমোতে লাগল। কাপ্তেনের কাছে পরে কত কান্নাকাটি —তখন আর কোন্ লোকটাকে বাদ দিয়ে নেওয়া যায়? মানুষ আজকাল মশা-মাছির মতন—গন্ধে গন্ধে এসে পড়ে—ভিড় ঠেলে কূল পাওয়া যায় না। তুষ্টুরাম নিজের দোষেই বাতিল এ বছর।

কৈফিয়ৎ দিচ্ছে তুষ্টু: বাতিল করে দিয়ে তারা সব বেরিয়ে গেল। বলাধিকারী মশায়ের কাছে বুদ্ধি নিতে যাই—কি করি এখন? ধার-কর্জে ডুবু-ডুবু। বেরুতে পারলাম না—এখন আবার ধার চাইতে গেলেতো 'মার' 'মার' করে তেড়ে আসবে। কিন্তু পেট তো বুঝবে না—পেটের পোড়ার কি উপায়? বলাধিকারী বলে দিলেন, গৃহস্থবাড়ি গিয়ে মাহিন্দারি কর। তাঁর কথায় একটা কাজ ধরে নিলাম।

খাতিরের মানুষ বংশীকে সঙ্গে করে এনেছে সুপারিশ করতে। বংশী বলে, মন্দটা কি হয়েছে? দুটো-তিনটে মাস দিব্যি রাজার হালে কাটালি। চারবেলা কষে খেয়েছিস, চিবোতে চিবোতে যতক্ষণ না চোয়াল ব্যথা হয়ে যায়। হাত পেতে মাস-মাস মাইনে নিয়েছিস। নিয়ে-থুয়ে ঝড়তি-পড়তি যা রইল, সেগুলো এইবার টেনে আনবার ফিকির।

ক্ষুদিরাম শশব্যস্তে বলে ওঠে, অ্যাঁ, ফসলের ক্ষেত বলছিলি—সেকি ওই সন্ন্যাসীপদর ফসল?

বংশী বলে, নয় তো কি তুষ্টুরাম বাবু গতর নেড়ে অন্য বাড়ি খোঁজদারি করতে গেছে? এতকাল দেখেও মানুষটাকে চেনোনি?

ক্ষুদিরাম হাত ঘুরিয়ে বলে, ও-ফসল ঘরে আসবে না। তুষ্টুরামের খোঁজ যখন—গোড়াতেই বুঝে নিয়েছি, সেইজন্যে গা করিনি। সাঁতালি পর্বতে লখিন্দরের লোহার বাসর—সন্ন্যাসীপদর বাড়ি তার চেয়েও শক্ত। বাড়ির সামনে মস্তবড় ফোকরওয়ালা কাঁঠালগাছ, সে ফোকরে মানুষ ঢুকে বসে থাকতে পারে। পিছনে পাঁচিলের গায়ে চইগাছ জড়িয়ে উঠেছে। বল্ তা হলে তুষ্টুরাম সে বাড়ির হদ্দমুন্দ দেখা আছে কিনা। হেঁ-হেঁ বাপু অন্তর্যামী ভগবানের চোখ যেখানে পেঁছিয় না আমার চোখ সেখানেও।

তুষ্টু ডোম ঘাড় কাত করে সসম্ভ্রমে মেনে নেয়। ক্ষুদিরাম বলে, জামলার তেপান্তর বিল পার হয়ে যেতে হয়—যেতে হবে ডোঙায় কিংবা ছোট্ট ডিঙিতে। বিলের মধ্যে ডোঙার পই—পইয়ে প্রায়ই তো জল থাকে না। নেমে পড়ে তখন হাঁটু সমান কাদা ভেঙে টেনে ঘাটে নিয়ে চলো। সে-ও এক হিসাবে ডোঙায় যাওয়া—ভিতরে চড়ে নয়, মাথা ধরে টানতে টানতে। আমি বাপু বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, অত ধকল সামলাতে পারব না। দল হয়ে যারা সঙ্গে যেতে চায় তাদেরও

হু'শিয়ার করে দিও—ভূমধ্য-সাগরের মধ্যে সে একটা দ্বীপ। তাড়া খেয়ে সাগরে তবু ঝাঁপিয়ে পড়া যায়, জানলার বিলের প্রেমকাদা পা দুটো আঠার মতন এঁটে ধরবে।

তুষ্টু ডোম বেজার হয়ে বলে, কথা না শুনেই তুমি রায় দিয়ে বসলে ভটচাজ মশায়। ফসলটা সন্ন্যাসীপদর, কিন্তু ক্ষেত আলাদা, সন্ন্যাসীর বাড়ির উপরে নেই। তা হলে কে বলতে যেত? ফালতু কথা তুষ্টুরামের মুখে বেরোয় না। ফসল চালান হয়ে গেছে তিলকপুর রাখাল রায়ের বাড়ি। লোহার সিন্দুকে বাঘা বাঘা তালা এটে রাখত, এখন রাখাল রায়ের ফঙ্গবেনে কাঠের ছাপবাক্সে গিয়ে পড়েছে। তিলকপুরের খটখটে রাস্তা—পা থেকে তোমার চটিও খুলতে হবে না। স্বর্ণসিন্দুর-পাঁজিপুঁথির ব্যাগটা নাও না একটিবার ঘাড়ে তুলে। এত করে বলছি—

বলাবলি সত্ত্বেও ক্ষুদিরামের পাশ কাটানো কথা ঃ আচ্ছা, দেখি তো—

গুরুপদ শুনে রাগে গরগর করে ঃ এসে যখন পড়েছি যাবই তিলকপুর। ঢু মেরে দেখে আসব। যে দেশে কাক নেই, সেখানে বুঝি রাত পোহায় না! বলি, ক্ষুদিরাম ভটচাজ ক'টা জায়গায় আর খোঁজদারি করে, তার বাইরে বুঝি চুরিচামারি বন্ধ? না যায় তো বয়েই গেল। আমরা চলে যাব। তুমি যাবে, আমি যাব, বংশী যাবে। নতুন মানুষ ঐ দু-জন ঘোরাফেরা করছে—বলে দেখো, তারা যদি যায়। মেলা লোকের কী গরজ—দল যত বাড়াবে বখরা তত কম।

তুষ্টু তবু ইতস্তত করে ঃ ক্ষুদিরাম চুলোয় যাক, আসল হলেন বলাধিকারী। তাঁকে দিয়ে 'হাঁ' বলানো দরকার। তবে সবাই বল পাবে। তাঁর অমতে বড় কেউ যেতে চাইবে না। এত খাতিরের বংশী—সে মানুষও গাঁইগুঁই করবে দেখো! নতুন ঐ ফুটফুটে ছোকরা—বলাধিকারীর নেকনজর তার উপরে। দেখি সাহেবকে বলে, নিজেও সে কাজের জন্য ছটফট করছে। বলাধিকারীকে বলে সে যদি মতটা আদায় করতে পারে।

দুই

বলাধিকারীর বড় ভাল মেজাজ। বলেন, ওসব থাক এখন, পরে শোনা যাবে। পাঠ শুনবে তো বল। মুকুন্দ মাস্টার ইস্কুল-ঘরে আসর বসায়। আমার এখানেও আজ পুঁথি-পাঠের আসর।

পুঁথি বের করলেন। কাপড় জড়িয়ে পরম যত্নে রাখা। সন্তর্পণে এক-একখানা পাতা খুলছেন। তালপাতার উপর গোটা গোটা প্রাচীন হরফে লেখা। বলছেন, এ-ও এক পুরান—বিস্তর পুরানো পুঁথি। এত পুরানো, বেসামাল হলে তালপাতা গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাবে। এখানা বাংলা পুঁথি—সংস্কৃত-পালিপ্রাকৃতেও পুঁথি আছে এমনি।

বললেন, তবে কিন্তু বিষয় আলাদা। মুকুন্দর পুঁথিপত্রে পুণ্যবান মানুষ-দের ধর্মকর্মের কথা, আমার পুঁথিতে চোরের কথা। মুকুন্দ মাস্টারের বাপ যেমন, তেমনি এক মস্ত মানুষের উপাখ্যান।

সুর করে দুটো লাইন পড়ে গেলেন ঃ

চোর-চক্রবর্তী কথা শুনতে মধুর।
যে কথা শুনলে লোকে হয় তো চতুর ॥

হেসে বলেন, কাজের খবর এসেছে, বেরোবার জন্য তোমরা ছটফট করছ। খানিকটা চতুর হয়ে নাও চোর-চক্রবর্তীর কথা শুনে।

কথকতার মতো পাঠ হচ্ছে, ব্যাখ্যা হচ্ছে, অন্য বৃত্তান্তও এসে যাচ্ছে প্রসঙ্গ-ক্রমে। কখনো সুর, কখনো শুধুমাত্র কথা। সকলের সেরা যে রাজা তিনি হলেন রাজ-চক্রবর্তী। চোর-চক্রবর্তী তেমনি সকল চোরের মাথার উপর। রাজ-চক্রবর্তী যেমন একজন মাত্র নয়, শক্তি ও প্রতিভার গুণে কালে কালে অনেক জন হয়েছেন, চোর-চক্রবর্তীও তেমনি।

এই জনের নাম হল খরবর। মহাসম্ভ্রান্ত বাপ—বিজয়নগর রাজ্যসভার পাত্র উগ্রসেন। এমনি হত তখন। সমাজের সর্বস্তর থেকে গুরুর কাছে চৌর-শাস্ত্রের পাঠ নিতে যেত। চৌষট্টি কলার একটি, এই বিদ্যা বাদ রেখে শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে বলা চলবে না। দেবাদিদেব মহাদেবের ছেলে স্কন্দ চৌরশাস্ত্রের প্রথম প্রবর্তক। রাজার ছেলে, দেখা যাচ্ছে, সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়েও কায়-মনে চৌরশাস্ত্র শিখেছেন। খরবরেরও তাই। কাব্য শিখেছেন, জ্যোতিষ শিখেছেন, আরও বিবিধ শাস্ত্রে পারঙ্গম। অবশেষে 'উত্তম-অধম চৌরবিদ্যা' কৌতুকভরে শিখে ফেললেন। অদ্বিতীয় হলেন। দেশের চৌর-সমাজ সসম্ভ্রমে তাঁকে চোর-চক্রবর্তী বলে মেনে নিল।

বংশী মাঝখানে ফোড়ন কেটে ওঠে ঃ যে রকম কাপ্তেন কেনা মল্লিক।

বলাধিকারী হাসেন ঃ এই কথা বলতে যেও দিকি তোমার আজামশায়কে। টের পাবে। মল্লিককে চোর বলেই স্বীকার করে না পচা বাইটা। হ্যাক-থু করে। বেচারাম-কেনারাম ওদের দুটো ভাইকেই। বলে, ডাকাত হয়তো খানিকটা। তাই বা কিসে—ডাকাতের ডাক হাঁক নেই। দো-আঁশলা ওরা। দিনকাল খারাপ, ঝুটো জিনিসের জয়জয়কার।

বললেন, এ কালের চোর-চক্রবর্তী কেউ যদি থাকে, সে পচা বাইটা। কাজের কৌশলের দিক দিয়ে বলছি। এখন জবুথবু বুড়ো-মানুষ—কিন্তু দিন ছিল তার, গল্প শুনে তাজ্জব হতে হয়। গুরুপদ দেখে থাকবে কিছু কিছু। তাও ভরভরন্ত যৌবনকালের নয়—বয়স হয়ে গিয়েছিল, তা হলেও ছিল ছিটেফোঁটা। বংশী তো কেবল কানেই শুনেছে।

আবার জগবন্ধু পুঁথিতে চলে গেলেন। চম্পাবতী নগরের চোরেরা দল বেঁধে খরবরের কাছে এসে পড়ল। রাজার বড় অত্যাচার—চোর উৎখাত করবার

জন্য কোমর বেঁধে লেগেছে। বিচার-আচার নেই, যাকে পাচ্ছে ধরে নিয়ে শূলে-শালে দিচ্ছে।

চোর-চক্রবর্তী হয়েছেন খরবর, শুধু নিজ-হাতের বাহাদুরি দেখিয়েই হবে না। শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন রাজধর্ম। চোর-চক্রবর্তীরও তেমনি কর্তব্য আছে—কিন্তু উল্টো রকমের: চোরের পালন, গৃহস্থের শাসন। যত চোর যেখানে আছে, দায়-বিদায়ে এসে পড়ে। তাদের কথা শোনেন তিনি, অসুবিধা দূর করে কাজকর্মের সুব্যবস্থা করেন। সেজন্য প্রাণ দিতেও পিছু-পা নন—

মাঝখানে ভিন্ন কথা এসে পড়ল। গুরুপদ বলে, গুরু নিন্দে করব না—চোর-চক্রবর্তী বাইটা মশায়ের ভিন্ন স্বভাব। বড় স্বার্থপর—নিজের খেলাটাই শুধু দেখিয়ে গেল, বুড়োথুত্থুড়ে মানুষ। কবে শুনব মরে গেছে। গুণজ্ঞান যত কিছু নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবে। দুনিয়ার উপরে একছিটে থাকবে না।

ক্ষুদিরাম গদগদ হয়ে বলে, সেদিক দিয়ে ইনি আছেন—এই বলাধিকারী মশায়। পুঁথি পড়ে চোর-চক্রবর্তীর গুণব্যাখ্যান করছেন—নিজে মানুষটা কী? সত্যি কথা মুখের উপর বলব। মরশুমে মানুষজন বেরিয়ে পড়েছে, এতগুলো সংসারের খবরদারি একটা মানুষের ঘাড়ে। কত রকমের দায়-দরকার নিয়ে নিত্যি দিন মানুষের আসা-যাওয়া। এর ছেলের অসুখ, ওর কলসির চাল ফুরিয়েছে, ওর ঘরের চালে কুটো নেই, পুরুষের খবর না পেয়ে ও বাড়ির বউটা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে—চতুর্ভুজ নারায়ণের এক গণ্ডা হাত নিয়ে রমারম পয়সা-টাকা ছড়িয়ে যাচ্ছেন, শিবের পঞ্চমুখ নিয়ে যাকে যা বলতে হয় বলে যাচ্ছেন। আর মজাটা হল, লেখাজোখার মধ্যে কিছু পাবে না, সমস্ত ঐ একটা মাথার ভিতরে। ভাবতে গিয়েই তো আমাদের মাথা ঘুরে আসে।

জগবন্ধু ক্রোধের ভান করে বলেন, দেখ, পুঁথি-পাঠে বারম্বার বাগড়া দিচ্ছ। সব পাঠের ফলশ্রুতি থাকে, এ পুঁথিরও আছে। কিন্তু এমন হলে ফল ফলবে না। আমার পণ্ডশ্রম।

বংশী বলে, ছোটমামা ধর্মের পুঁথি-পুরাণ পড়ে—কানে শুনলে পুণ্যি; মরার পরে স্বর্গবাস। চোরের পুঁথির ফলাফল আবার কি?

নেই? শোন তবে—। পাঠ করে জগবন্ধু একটু শুনিয়ে দেন:

চোরচক্রবর্তী নাম রহে যেই ঘরে।
চোরে না দেখিবে চক্ষে তাহার বাড়িরে॥

হেসে বলেন, মুকুন্দ পুঁথি-পুরাণ মহৎ বস্তু। ফলশ্রুতি বিরাট—অনন্ত পুণ্য আর অক্ষয় স্বর্গবাস। সবই কিন্তু ভবিষ্যতের পাওনা। মরে যাওয়ার পরে। আরও অসংখ্য সদাচারের মতো। যেমন ধরো বিধবার নির্জলা একাদশী—দেহের খোলে যতদিন প্রাণ আছে, কাঠ-কাঠ উপোস দিয়ে যাও; পরজন্মে বৈধব্য ভুগতে হবে না। এ জন্মের কষ্ট সেই জন্মে উশুল হবে—আমৃত্যু মাছভাত। কিন্তু চোরের পুঁথির ফল হাতে-হাতে ষোলআনা নগদ—চোর আসতে পারবে না চোর-

চক্রবর্তীর নাম যেখানে। না পড়ে পুঁথিখানা শুধুমাত্র ঘরে থাকলেও ফল আছে—

এই পুঁথি যেই জন ঘরেতে রাখিবে।
তার ঘরে চোর চুরি করিতে নারিবে ॥

খুব হাসছেন বলাধিকারী। নড়ে-চড়ে আবার শুরু করলেন: চোরেরা হাহাকার করে পড়ে খরবরের কাছে। শরণাগত-রক্ষণ বীরের কর্তব্য। চম্পাবতীর রাজাকে অতএব সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে। সর্বসমক্ষে চোর-চক্রবর্তী প্রতিজ্ঞা নিলেন:

চম্পাবতী পুরীখান করিমু বিকল।
তবে চোরচক্রবর্তী নাম হইবে সফল ॥
নগরিয়া লোক সব করিমু ভিখারী।
কেমতে রাখিবে রাজা আপনার পুরী ॥

আজেবাজে চোর নয়—চোরচক্রবর্তী নিজে যাচ্ছে তো রীতিমত জানান দিয়ে কাজে নামবে। রাজাকে চিঠি দিল: তোমার পুরীতে গিয়ে তোলপাড় করব, ক্ষমতা থাকে ঠেকাও।

শাস্ত্রমতে চোরের দেবতা কার্তিকেয় হলেও বাঙালী চোর মা-কালীকে মানে বেশি। ঠগ-ডাকাতের ইষ্টদেবী তিনি, সেখান থেকে চোরের রাজ্যে এসে পড়েছেন। মা-কালী করেনও খুব চোরের জন্য। চুরিবিদ্যার কায়দাকানুন হাতে ধরে শিক্ষা দিয়েছেন, পুঁথিপত্রে রয়েছে। কালী আগে আগে পথ দেখিয়ে মক্কেলের বাড়ি পৌঁছে দিলেন, তারও বিবরণ আছে।

নিশিকালী মহাকালী উন্মত্তকালী নাম।
চরণে পড়লু মাতা আইস এই ধাম ॥

কালী তখন স্বপ্নে দেখা দিলেন: আছি আমি সহায়, অলক্ষ্যে সঙ্গে সঙ্গে থাকব।

কালীর বরে খরবর চম্পাবতীতে খুশি মতন পাকচক্কোর দিচ্ছে। সওদাগরের বেশ নিয়েছে। গোয়ালিনীকে ধাক্কা দিয়ে ভরপেট দই খেয়ে উদগার তুলে সরে পড়ল। নাপিতকে ঠকিয়ে বিনি পয়সায় ক্ষৌরকর্ম করাল। তাঁতিকে ফাঁকি দিয়ে দামি দামি কাপড়-চাদর গাপ করল। পুরীর বাড়ি বাড়ি চুরি—

রাত্রে চুরি করে চোর, দিনে যায় নিদ।
প্রভাতে উঠিয়া দেখ সর্বঘরে সিঁধ ॥

সিঁধ সকলের ঘরে, তিন রকমের বাড়ি শুধু বাদ। যারা পণ্ডিত ও বিদ্বান, যাদের দানধ্যান আছে আর যাঁরা ভক্ত মানুষ—এমন লোকের বাড়ি চোর কখনো উৎপাত করবে না। চৌর নীতিশাস্ত্রের নিষেধ:

ব্রাহ্মণ সজ্জন দাতা বৈষ্ণব তিনজন।
ইহার ঘরে চুরি না করিও কখন ॥

এমনি কয়েকটা বাড়ি বাদ দাও। সকালবেলা শয্যা ছেড়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে

পাবে—কি দেখবে ? আজেবাজে চোর হলে উপমা দিয়ে বলতাম, দেখবে চম্পাবতী পুরীর সর্বাঙ্গ জুড়ে গলিত ক্ষত। কিন্তু চোর-চক্রবর্তী পাকা হাতের গুণে চম্পাবতীর ঘরে ঘরে রাত্রের মধ্যে যেন ফুল ফুটে উঠেছে। সিঁধগুলোর বাহার এমনি।

গল্প ছেড়ে সিঁধের প্রসঙ্গ চলল কিছুক্ষণ। জানার গরজ সকলেরই—বলাধিকারীর কাছে জিজ্ঞাসা করে নেয়। ভাল সিঁধ হল রীতিমত শিল্পকর্ম। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখতে হয়। বস্তুটা আজকের নয়। হাজার দুয়েক বছর আগেও সাত রকম উৎকৃষ্ট সিঁধের খবর পাওয়া যাচ্ছে। পদ্মব্যাকোষ অর্থাৎ ফুটন্ত পদ্মফুলের মতো সিঁধখানা। ভাস্কর অর্থাৎ সূর্যের গোলাকার। বালচন্দ্র অর্থাৎ কাস্তের আকারের চাঁদের মতো। বাপী অর্থাৎ পুকুরের মতো চৌকোণা। বিস্তীর্ণ কিনা অনেকখানি চওড়া। স্বস্তিকের চেহারার সিঁধ। পূর্ণকুম্ভের চেহারার সিঁধ। মোট এই সাত।

সিঁধ মানে সুড়ঙ্গ। অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে সগরপুত্রেরা সিঁধ কেটে সরে পড়লেন। কাটতে কাটতে একেবারে পাতাল অবধি। সেই বিশাল সিঁধ সর্বকালের আদর্শ হয়ে আছে। সিঁধ কেটে বিদ্যার ঘরে সুন্দর ঢুকে পড়ল, সে-ও বেশ চমৎকার সিঁধ। এই কিছুদিন আগে খবরের কাগজে একখানা উৎকৃষ্ট সিঁধের বিবরণ বেরিয়েছিল। পাঁচিল গেঁথে তারের জালে ঘিরে লড়াইয়ের বন্দীদের আটক রেখেছে—শান্ত্রীর দল দিনরাত পাহারায়। ঘরের ভিতর থেকে এরা মাসের পর মাস ইঁদুরের মতন সুড়ঙ্গ কেটে যাচ্ছে। সারা রাত ধরে কাটে, দিনমানে তার উপর বিছানা বিছিয়ে দেয়। শিবিরের ঘেরের মধ্যে চাষবাস হয়—সুড়ঙ্গের মাটি সেই চাষের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে রেখে আসে। মাস ছয়েক পরে বাইরে ফুটো বেরিয়ে পড়েছে। ইঁদুরেরই মতন গর্ত দিয়ে তখন ফুড়ফুড় করে পালিয়ে যায়।

জায়গা বিশেষে সিঁধ কাটার কায়দা আলাদা। কার্তিক ঠাকুর নিজেই তার হদিশ দিয়েছেন। ঝামা-ইটের গাঁথনি হলে একখানা করে ইট খসাবে। আমা-ইট হলে কাটবে। দেওয়াল যদি মাটির হয়, জলে ভিজিয়ে নরম করে নেবে। কাঠের দেয়াল হলে উপড়াবে। আজামোজা সিঁধ হলে হবে না, কাটবার আগে দেয়ালের উপর রীতিমত মাপজোপ করে নেবে যে দেহখানা ঢুকবে তার অনুপাতে। সিঁধকাঠি যেমন, সঙ্গে একগাছি শক্ত সুতোও থাকবে অতি অবশ্য। সুতোর অনেক কাজ। সিঁধের মাপ নেওয়া ঐ তো হল। দরজায় ভিতর থেকে হয়তো খিল দেওয়া আছে—সুতোর মাথায় বড়শির মতো কিছু বেঁধে কোন-এক ফুটো দিয়ে দরজার গায়ে গায়ে দাও নামিয়ে ! বড়শি খিলে আটকে আস্তে আস্তে উপর-মুখো টানো। খিল খুলে আসবে ছিপে মাছ গেঁথে ডাঙায় তোলার মতো। মেয়েমানুষের গয়নাও, কাছে না গিয়ে, খুলে আনা যায়

এই কায়দায়। আরও আছে। রাত্রিবেলা অন্ধকারের মধ্যে আনাচেকানাচে বসে কাজ—সাপে কাটতে পারে হেন অবস্থায়। ঐ সুতোয় তাগা বেঁধে তখন ওঝার বাড়ি যেতে পারবে। তাই ঘটে গেল চতুর্বেদবিশারদ শর্বিলক যখন সিঁধ কাটতে বসেছে। আঙুলে সাপে না কিসে কামড় দিল। সুতো নিয়ে যায় নি, কিন্তু ব্রাহ্মণসন্তান বলে গলায় পৈতে। পৈতে খুলে চট করে আঙুল বেঁধে ফেলল। নাস্তিক অনেকে আজকাল উপবীত ত্যাগ করেন—কিন্তু উপবীতের শুধু মাত্র এদিক দিয়েও কত দরকার, ব্রাহ্মণপুঙ্গবেরা দেখুন একবার ভেবে।

সিঁধ হয়ে গেল আর অমনি তুমি ঢুকে পড়বে, হেন কর্ম কদাপি নয়। সেকাল একাল—সর্বকালের ওস্তাদের মানা। ভিতরের মানুষ জেগে না ঘুমিয়ে —সেই পরখ সকলের আগে। প্রতিপুরুষ অর্থাৎ নকল মানুষ সিঁধে ঢোকাবে —চোরশাস্ত্রের আচার্যেরা বলেছেন। ঢুকিয়ে এদিক-সেদিক নাড়বে। চোর ধরবার জন্য কেউ তৈরি থাকে তো অন্ধকারে এঁটে ধরবে সেই বস্তু। বেকুব হবে।

গুরুপদ অবাক হয়ে বলে, আমাদেরও অবিকল সেই জিনিস। লাঠির মাথায় কেলে-হাঁড়ি বসিয়ে সিঁধের মুখে ঢুকিয়ে দিই। সে হাঁড়ি একটুখানি ঢুকে গিয়ে পিছিয়ে আসে, আবার এগোয়। মানুষই যেন, মানুষের চুল-ভরা কাল মাথা। হাঁড়ি নির্গোলে বার-কয়েক ঘুরে-ফিরে এলে তারপরে মানুষের যাওয়া।

বলাধিকারী বলেন, শুধু ওই একটা কেন, শর্বিলকের অনেক পদ্ধতি আজও হুবহু চলে। ঘরে ঢুকেই সে দরজা খুলে দিল—দরকার হলে স্বচ্ছন্দে পালাতে পারবে। পুরানো দরজা খুলতে গিয়ে আওয়াজ উঠতে পারে, তাই সাবধানে জল ঢেলে জোড়ের মুখ ভিজিয়ে দিল। তোমরা করো না? বলো সে কথা। ঘন নীল পোশাক নিয়েছে শর্বিলক। চোরের পোষাক আজও সেই। চারুদত্ত নাটকে দেখা যাচ্ছে 'কাকলী' নামে একরকম মৃদুস্বর যন্ত্র চোরের হাতে। তাই বাজিয়ে সে ভিতরের মানুষের সাড়া নেয়। হাত-কাটা বোষ্টম নামে একজন কেনা মল্লিকের সঙ্গে ঘোরে, বেচারামের সঙ্গেও সে ছিল। একখানা হাতে, আহা-মরি একতারা বাজায়। ঢিল ফেলা, দুয়োর-জানলা নড়ানো এ-সব হল মোটা কাজ। মিষ্টি বাজনায় মক্কেল মানুষটার মন ভরে যায়, জেগে থাকলেও ছুটে বেরিয়ে তাড়া করতে ইচ্ছে করে না। এমনি কত! চোরের পুঁথি এমন একখানা-দুখানা নয়—পুঁথিপত্রে নিয়মও অগুণতি। মিলিয়ে মিলিয়ে আমি দেখাতে পারি, সেই হাজার হাজার বছরের কায়দা-কানুনই মোটামুটি এখনো চলে আসছে।

চোর-চক্রবর্তীর কথা। রাত্রে বাড়ি বাড়ি সিঁধ দিচ্ছে, সকালে উঠে মানুষ-জন অবাক। সকলেরই এক দশা, কে কার জন্য হা-হুতাশ করে!

কিন্তু খরবর তৃপ্ত নয়। আসল মক্কেলই বাকি এখনো—যাঁর নাম করে

চম্পাবতী এসেছে। রাজবাড়িতে ঢুকবে এবার। কালীরও কথা পেয়েছে—'যাহ রাজঘরে আমি থাকিব সঙ্গীত।' অমন জায়গায় চুরির বস্তুটাও নিশ্চয় সকলের বড় হবে—

চোর বলে ধন লইয়া আমি কি করিব।
রানী চুরি করি আমি কলংক থুইব ॥

রাজবাড়ি নিশুতি। রাজা-রানী পাশাপাশি পালঙ্কে শুয়ে, খরবর নিপুণ হাতে রানীকে কাঁধে তুলে নিল। নিয়ে গেল পুরীর প্রান্তে গরিবের ঘরে—ধান ভেনে, চিঁড়ে কুটে দিন চলে তাদের। তারাও ঘুমে বিভোর। সেই ঘরের বউটা তুলে নিয়ে রাজ-রানীকে শুইয়ে দিল সেখানে। বউকে রাজার পালঙ্কে নিয়ে এলো।

হৈ-হৈ পড়ে যায়। ঘুম ভেঙে রাজা দেখেন, পাশে রানী নেই, কুৎসিত এক প্রেতিনী। ওঝা ডেকে ঝাড়ফুক করে প্রেত-শান্তি হচ্ছে। আর ওদিকে চিঁড়া-কুটি লোকটা দেখছে তার কুঁড়েঘরে স্বর্গ থেকে দেবীর আবির্ভাব। লোকজন ভেঙে এসে পড়েছে। ঢাকঢোল বাজিয়ে মহা আয়োজনে পুজোর যোগাড় হচ্ছে। খবর পেয়ে রাজাও এসে পড়লেন—

বলে যাচ্ছেন বলাধিকারী। শ্রোতারা হেসে খুন। গল্পের আরও আছে, অনেক সব ঘটনা।

—চোর ধরবে কোটাল, পুরী তোলপাড়। খরবর নাস্তানাবুদ করে সেই কোটালকে। কোটালের মেয়ে লীলাবতীর নতুন বিয়ে হয়েছে, জামাই হয়ে খর-বর কোটালের বাড়িতেই উঠল। কোটাল সর্বত্র খুঁজবে নিজের বাড়ি বাদ দিয়ে। খুঁজলেই বা কি—এমন কায়দা-কৌশল, মেয়ে নিজেই তো বর ভুল করে বসে আছে। লোক-লজ্জায় শেষটা কোটালকে দেশান্তরী হতে হল মেয়ে-বউর হাত ধরে। যাকে পায় তাকেই জব্দ করে বেড়াচ্ছে খরবর—'যে কথা শুনিলে লোক হয় তো চতুর।'

ছেলে-ভুলানো কাহিনী, কিন্তু বড়দেরও ভাল লাগে। সর্বসমাজে সব বয়সের মানুষই আসলে ছেলেমানুষ—গল্পের জন্য ছোঁক-ছোঁক করে। শ্রোতা বুঝে তুমি কেমনভাবে বলবে, সেই হল কথা। হেসে এরা সব লুটোপুটি যাচ্ছে, বড্ড জমেছে।

হঠাৎ থেমে গিয়ে বলাধিকারী বলেন, বিশ্বাস হয় না—কেমন ?

ঘুমন্ত মানুষ কাঁধে করে এত পথ নিয়ে গেল। দু-দুজন—রাজবাড়ি থেকে একটি, চিঁড়াকুটির বাড়ি থেকে একটি। কেউ কিছু টের পেল না—রাত পোহালেও বহাল মানুষটা পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। যে শুনবে, সেই ঘাড় নাড়বে : এমন কখনো হতে পারে না।

তারপর বলাধিকারী নিজেই বোঝাচ্ছেন, 'রাজার মন্দিরে গিয়ে নিদালি ভেজা-

ইল'—নিদালির উপরে কাজ হচ্ছে, খেয়াল রেখো। বাড়িতে হাজির হয়েই খর-বর সকলের আগে নিদালি করেছে।

সাহেব বলে, নিদালি যত যা-ই করুক, ঘুমই তো মোটের উপর। জেগে না উঠে পারে না। চোরের হাতে মরণকাঠি-জীবনকাঠি থাকলেও না-হয় বুঝতাম। রানীকে কাঠি ছুঁইয়ে বাঁচিয়ে দিয়ে এলো রূপকথার মতন—

বলাধিকারী সহাস্যে বললেন, ঘুম পাড়িয়ে মানুষ-চুরি বিশ্বাস হয় না তোমাদের?

সজোরে ঘাড় নেড়ে সাহেব বলে, পুঁথিপত্রে অনেক আজগুবি লেখে।

বলাধিকারী বললেন, সাহেব নতুন কিছু বলছে না—সবাই ঠিক এই বলবে। আমিও বলে বেড়াতাম যদ্দিন না পচা বাইটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল, বাইটার মুখে তার কাজকর্মের কথা শুনলাম। বুড়োথুথুরে বাইটা মশাই—কবে আছে, কবে নেই। আমায় খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করে ব্রাহ্মণবংশে জন্ম বলেই হয়তো। আমার কাছে মিথ্যে ধাপ্পা দিয়েছে, বিশ্বাস করব না।

বংশী অবাক হয়ে বলে, আজামশায় মানুষও চুরি করেছে? আমরা তো কই শুনি নি।

দরকার হলে তা-ও সে পারত। কিন্তু মানুষ নিয়ে কী মুনাফা—মানুষের গায়ে যা থাকে, সেইগুলোই শুধু নিয়ে নিত।

হাসেন বলাধিকারী। বললেন, মানুষ-চুরিতে মুনাফা তো নেই-ই, উল্টে নানান ঝামেলা। নিদালির ঘোর এক সময় না এক সময় কাটবে, জেগে উঠে গোল-মাল করবে। সেইজন্য ধীরে সুস্থে নিখুঁতভাবে সর্বাঙ্গ ন্যাড়া করে নিয়ে তার-পরে মক্কেল-রমণীটাকে ফেলে চলে যায়। আম খেয়ে আঁটি ছুঁড়ে দেবার মতন। মক্কেলই হতে দেয় তাই। ডানহাতের আঙুলের আংটি মণিবন্ধের চুড়ি-কঙ্কণ, বাহুর অনন্তবেঁকি—সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল তো বাঁ-হাতটা আবেশে এগিয়ে দেবে কারিগরের দিকে।

ভালবেসে—সোহাগ করে? জুত মতন প্রসঙ্গ পেয়ে এইবার নফরকেষ্টর কথা ফুটল। সে খি-খি করে হাসে।

বলাধিকারীও লঘুভাবে বলেন, একটা নিশির নিশিকুটুম্ব—চোখেই তো দেখল না মেয়েটাকে, ভালবাসা জমে কিসে? গরজ তো ভালবাসার নয় যে মাল নগদ-মূল্যে বাজারে চলবে, তাই কেবল হাতড়ে নিচ্ছে। নইলে যা অবস্থা তখন—নাকের খরকেকাঠি খুলে নিচ্ছে, নাক কেটে বোঁচা করে নিলেও সে রমণী আপত্তি করবে না। নিদালির এমনি মহিমা।

নিদালির কথা শোনে সবাই—রাতের কুটুমের বড় সহায়। কালের হাওয়ায় এবং তেমন পাকা ওস্তাদের অভাবে লোকে ইদানীং আস্থা হারাচ্ছে। কিন্তু অতিশয় প্রাচীন পদ্ধতি। বৈদিক আমলেও ছিল—অবস্বাপনিকা। মন্ত্র পড়ে ঘুম পাড়ানো। রেওয়াজটা চলে এখনো—মক্কেলের উঠানে গিয়েই কারিগর

আগেভাগে মন্তর পড়ে নেয়। সংস্কৃত নয়, গ্রাম্য-বাংলা কথা। মন্তর পড়ে, বাইটা একদিন শুনিয়েছিল আমায়। গোড়ার এক-আধ লাইন মনেও আছে ঃ নিদ্রাউলি নিদ্রাউলি, নাকের শোয়াসে তুললাম মণ্ডপের ধুলি—

পড়ে গেলেই হল না, প্রক্রিয়া আছে সেই-সঙ্গে। মণ্ডপ হল মণ্ডপ—ঘর। নাকের শ্বাসের ধুলো টেনে তুলতে হবে। মন্তরের কথা কিংবা প্রক্রিয়ার চেয়ে আমি কিন্তু মনে করি পড়াটাই আসল। বাইটা পড়ল, যেন বালি-খোলায় চড়বড় করে খই ফুটছে। মুখ-চোখের রকম আলাদা—

হেসে নফরার কথায় জবাব দিলেন ঃ তা-ও না হয় চেষ্টা করতাম, কিন্তু তোমার সামনে সাহস হয় না। এমনিই তো জেগে জেগে ঘুম—নিদালি করলে আর সে-ঘুম তোমার ভাঙানো যাবে না।

সামনের দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে বলাধিকারী আবার বলেন, মক্কেলের উপর মন্তরের কি গুণ, সঠিক আমি বলতে পারব না। কিন্তু যে পড়ে তার বুকে বল জাগে, মনে প্রত্যয় আসে। সেই যে এক পুরানো গল্প—গুরুর কাছ থেকে মন্ত্রপূত লাঠি পেয়ে গেল, লাঠি মুঠোয় ধরলে মানুষটা অজেয়। এদেশ-সেদেশ বৃত্তান্ত চাউর হয়ে গেল। রোগা লিকলিকে সেই মানুষ পালোয়ানের আখড়ায় হামলা দিয়ে পড়ে—বগলের লাঠি আস্তে আস্তে নিয়ে নিচ্ছে। পালোয়ানের কাকুতি-মিনতি ঃ রক্ষে কর, রক্ষে কর। লাঠি কঠিন মুঠিতে ধরে বেদম পিটছে। অসহায় দুর্বল ভেড়ার মতো মার খেয়ে যাওয়া ছাড়া তাদের উপায় নেই। গুরু মরবার সময় অনুতাপের বশে ব্যাপারটা ফাঁস করে গেলেন ঃ মন্তর ভাঁওতা, নিতান্তই সাধারণ লাঠি একটা। সেই লাঠি, সেই মানুষ সবই রইল, কিন্তু গুণ আর খাটে না এর পরে। এ-ও তেমনি। ওস্তাদ কানে দিয়েছে, সেই মন্তর পড়ে কারিগর অসাধ্য-সাধনের ক্ষমতা পেয়ে যায়। আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করে। কাজের তো অর্ধেক হাসিল এইখানে।

দম নিয়ে বলাধিকারী বলতে লাগলেন, কেন হবে না বলো দিকি, অসম্ভব কিসে? সম্মোহনের ব্যাপার দেখেছ নিশ্চয়—হিপনটিজম্। মানুষটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল—তারপর যা বলছে, তা-ই সে করে। তেমনি খানিকটা। মন্তর ছাড়াও কত রকমের ব্যবস্থা। আবহাওয়া বুঝে হিসেব করে নিয়েছে—রাতের মধ্যে কোন্ সময় ঘুমটা এঁটে আসবে। উঠানে ঢিল ফেলে, জানালায় দরজায় ঘা দিয়ে পরখ করে দেখেছে। নিশ্বাসের শব্দ বুঝে নিয়েছে ঘরের মানুষের। সিঁধের মুখে প্রতিপুরুষ ঢুকিয়ে দেখেছে। আরও আছে—এক রকমের ডাল-পাতা শুকিয়ে রাখা—ঘরে গিয়ে সেই বস্তু ধুপের মতো জ্বালিয়ে দেবে। মক্কেলের নাকে-মুখে কিছু ধোঁয়া যাওয়া চাই। সেই পাতারই বিড়ি বানানো আছে—কারিগর কাজ করছে, আর বিড়ি টেনে অল্প অল্প ধোঁয়া ছাড়ছে মক্কেলের নাকে। এমনি তো শতেক বন্দোবস্ত, কিন্তু সকলের উপরে কারিগরের হাত দুটো। হাত বেতালা চললে সমস্ত বরবাদ। আঙুল বেয়ে আনন্দ যেন

চুইয়ে-চুইয়ে পড়ছে মক্কেলের প্রতি রোমকূপে। কতক্ষণ আর যুঝবে হেন অবস্থায় ? তখন এমনি গতিক—যা তুমি চাইবে, এমন কি চাওয়ার আগেই, দেবার জন্য সে উন্মুখ হয়ে আছে।

ইঙ্গিতময় হাসি হেসে নফরকেষ্ট বলে ওঠে, এতখানি যদি হল, ছাইভস্ম দেড়খানা গয়না নিয়েই শোধ যাবে কেন ?

শিউরে উঠে বলাধিকারী জিব কাটলেন : ছি-ছি, এমন চিন্তা লহমার তরে মনে আসবে না। মহাপাতক। নিশিকালী উম্মত্তকালী সহায় থাকবেন না। বিচারবুদ্ধি হারিয়ে হাতও বেসামাল হবে, ধরা পড়বে কুমার কার্তিকেয়র অভিশাপে।

বলেন, সাধুসন্ন্যাসীরা কামিনীকাঞ্চনে নিস্পৃহ। চোর সে হিসাবে আধা-সন্ন্যাসী। কাঞ্চনই চাই, কিন্তু কামিনী একেবারে পরিত্যাজ্য। যুবতী কামিনীর সঙ্গে চোরে এক শয্যা নিয়েছে—ঘটনার এই অবধি শুনে সতীসাধ্বীরা আশঙ্কিতঃ কি সর্বনাশ, কী না জানি ঘটে এর পর ! বুদ্ধিমানের ঘাড় নড়ে ওঠে : অসম্ভব, এই কখনো হয় ! কোন চোরে বাহাদুরির আজগুবি গল্প রটিয়েছে। কিন্তু পচা বাইটার নিজ মুখে শোনা—ঠিক এমনটাই ঘটেছিল তার হাতে। এখনো আবার ঘটতে পারে—

সাহেব লুব্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে : পারে তাই ঘটতে ?

বলাধিকারী বলেন, বাইটা বলে তাই। বুকের ধুকপুকানিটুকু ধরে রেখেছে নাকি সেই লোভে। ক্ষেত্র পেলে খাঁটি জিনিস কিছু ছাড়বে। মরবার আগে—নিজের ক্ষমতায় আর হবে না, শিষ্য-সাগরেদের খেলা চোখ মেলে দেখে যাবে দু-একখানা। বলে বাইটা, আর নিশ্বাস ছাড়ে।

গুরুপদর দিকে তাকিয়ে বললেন, আর তোমরা বলো স্বার্থপর বুড়ো কৃপণের জাসু। গুণজ্ঞান নিজের সঙ্গে নিয়ে মরবে। বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো যায় না—ক্ষেত্র না জুটলে তাই অবশ্য করতে হবে বাইটাকে।

আজ ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য নয়, সাহেবের কাছে এসে তুষ্টুরাম ধর্না দিয়ে পড়ল। সঙ্গে বংশী আর গুরুপদ। তুষ্টু বলে, বলাধিকারীর নেকনজর তোমার উপর, তুমি ধরে পড় সাহেব। খবর আমার সাচ্চা, নইলে এত করে বলতাম না।

গুরুপদ আগুন। আশায় আশায় ঘর-বাড়ি ছেড়ে সেই থেকে বংশীর অন্ন ধ্বংস করে যাচ্ছে। হাত-পা কোলে করে মানুষ কাঁহাতক ধৈর্য ধরতে পারে! বলে, তোমাদের ভাব বুঝি নে। থলেদার যেন দুনিয়ার উপর নেই। ক্ষুদিরাম খুঁজিয়াল বাদ হল তো জগবন্ধু থলেদারও বাতিল। থলেদার আমি এনে দেবো। কত পড়ে ফ্যা-ফ্যা করছে।

সাহেব আহত কণ্ঠে তাড়াতাড়ি বলে, বলাধিকারী মশায় থলেদার নন—মহাজন।

গুরুপদ আরও ক্ষেপে যায়ঃ খেয়ে পেট মোটা হয়ে এখন মহাজন। ব্যাঙাচির লেজ খসে কোলাব্যাঙ। পেটের খিদে মরে আছে, কাজের আর চাড় নেই। মজাই তো তাই। তামাম মুলুক চুঁড়ে পাহাড় প্রমাণ মাল এনে দিলাম—হিসাবের বেলা থলেদার বলবে, মোটমাট সাড়ে দশ টাকা হল, তোমার ভাগে এই এগারো আনা। কারিগর মরে, থলেদার ফেঁপে ওঠে। বুড়ো বয়সে একটু ভগবানের নাম করব—তা কি করি, পেটের দায়ে ছ্যাঁচড়া কাজে আবার আসতে হল।

তুণ্টু ঘাড় নেড়ে সমর্থন করেঃ আমারও ঠিক তাই। ধার-দেনায় মাথার চুল অবধি বিকিয়ে বসে আছি। তাগিদের চোটে ঘেন্না ধরে যায়। বলি, দুত্তোর, সন্ন্যাসী হয়ে বনে যাওয়া ভাল। বনে গিয়ে ভগবানের নাম করিগে।

খপ করে সে সাহেবের হাত দুটো জড়িয়ে ধরেঃ তিলকপুরে আজকেও ঘুরে এলাম। দেখে আরও উতলা হয়েছি। মুফতের পয়সা পেয়ে রাখাল রায় দু-হাতে উড়াচ্ছে। নোনায়-খাওয়া পাঁচিলে মিস্ত্রি-মজুর লাগিয়েছে, ছাত দিয়ে নাকি জল পড়ে—ছাত খুঁড়ে নতুন করে পেটাচ্ছে। ছাত-পেটানো মুগুরের ঘা আমার বুকেই যেন পড়তে লাগল।

জোয়ানপুরুষ তুণ্টু ডোম বলতে বলতে কাঁদো-কাঁদো হয়ে উঠল। বলে, বুঝলে সাহেব, যা-কিছু এক্ষুনি। দেরিতে ভেস্তে যাবে।

বংশী জুড়ে দেয়ঃ বলাধিকারী মশায় একটিবার ঘাড় নেড়ে দিন, মালপত্তর পাদপদ্মে এনে ফেলি।

তুণ্টু আবার বলে, এত বড় ঘা-খানা কপালে নিয়ে ঘুরছি। ঘা বেড়েছে, সমস্ত রাত্রির টাটানি। তাই নিয়ে চলে গেছি রাখাল রায়ের হালচাল দেখতে।

সাহেব কি ভাবছিল। তুণ্টুর দিকে চমকে তাকায়। কপালের একটা পাশ পেঁচিয়ে ন্যাকড়ায় বাঁধা। রাজা যেমন কাত করে মুকুট বসিয়ে যাত্রার আসরে আসে।

সাহেব বলে, তুণ্টু, তোমার কপাল কেমন করে ফাটল, সেটা কিন্তু ভাল করে শোনা হয়নি।

তুণ্টু নিরীহভাবে বলে, বিধাতাপুরুষ ফাটাল।

এমন কথায় হাসি না এসে পারে না। সাহেব বলে, সে কি রে! বিধাতা এসে ইট মারল? সেদিন যে বললে তোমার মনিব-গিন্নি?

কথা সেই একই। ইটখানা বিধাতাপুরুষের গিন্নির হাত দিয়ে এসে পড়ল।

দার্শনিক মানুষের মতন কথা। হেসে উঠে সাহেব বলে, বিধাতাপুরুষ ত্রিভুবন সৃষ্টি করে বেড়ান, হঠাৎ তিনি নুলো হয়ে গেছেন—ইট মারবার জন্য গিন্নিকে ডাকতে হয়?

তুণ্টু বলে, কার কোন্ ঘরে জন্ম, সেটা তো ষোলআনা বিধাতার এক্তিয়ার। জন্মের দোষে ইট খেতে হয়। মেরেছে মন্দা বউ বটে, কিন্তু আসল মার বিধাতা-

পুরুষের। ডোমের ঘরে যিনি জন্মটা দিলেন।

ঘটনা শোনা গেল সবিস্তারে। সন্ন্যাসী দত্তের বাড়ি তুষ্টুরাম মাহিন্দার। সন্ন্যাসী মারা গেছে, তার শ্রাদ্ধ। ভিতর-উঠান বাইরের উঠান সাফ-সাফাই হয়েছে। সামিয়ানা খাটানো হবে। কুড়াল নিয়ে তুষ্টু বাঁশঝাড়ে গেছে বাঁশ কেটে আনতে। এনেছেও অনেকগুলো, সকাল থেকে এই করছে। একলা টেনে-হিঁচড়ে ঝাড় থেকে বাঁশ বের করা কত খাটনির কাজ, সে যারা করে তারাই শুধু বুঝবে। দুপুর গড়িয়ে গিয়ে কষ্টটা বড্ড বেশি লাগছে এখন।

তুষ্টুরাম বসে পড়ল বাঁশঝাড়ের ছায়ায়। নারকেল-খোসার নুড়িতে আগুন ধরিয়ে তামাক সেজে নিয়েছে। তামাক টানছে পা ছড়িয়ে বসে—আর যে বাঁশটা ফেলা হয়েছে, কুড়ালের উল্টোপিঠ দিয়ে ঠকঠক করে বাঁ হাতে ঘা মারছে তার উপর। অর্থাৎ বাড়ি বসে শুনুক তারা, ঝাড়ে গিয়ে তুষ্টু বিষম কাজ করছে। অবিরত বাঁশ কেটে যাচ্ছে। খেটে খেটে লোকটা নাজেহাল হয়ে গেল।

আয়েশ করে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে, এমনি সময়ে বোঁ করে ইট এসে কপালে। ঠিক বাঁ চোখটার ওপরে। রক্তের ধারা বয়ে গেল।

মন্দাকিনী স্বামীর শোকে উন্মাদিনী প্রায়, তা বলে সে রমণী কাজ ভোলবার বান্দা নয়। অনেকক্ষণ থেকে বাঁশ বাড়ি আসছে না—শুধু কুড়ালের আওয়াজ। মনে কেমন সন্দেহ হল, পা টিপে টিপে গেল চলে বাঁশঝাড় অবধি। গিয়ে দেখে তুষ্টুরামের কাণ্ড।

কপালের রক্ত হাতে মোছে তুষ্টু। মুছে মুছে পারা যায় না। ধারায় মুখের উপর দিয়ে। তুষ্টু গরম হয়ে বলে, ইট মারলে কেন ঠাকরুন?

মন্দাকিনী অবিচল কণ্ঠে বলে, কি করব তবে, কি করতে বলিস তুই? হাতে মেরে ছোঁয়াছুঁয়ি করব নাকি রে হারামজাদা? অবেলায় তার পরে চান করে মরি! হবিষ্যি করে করে এমনি আধমরা—এর উপরে নিউমোনিয়া ধরলে তো রক্ষে পাস তোরা সকলে।

শুনতে শুনতে হঠাৎ সাহেব গর্জে উঠল: যাব রে তুষ্টু। কাজ না হোক, গিন্নিকে একবার চোখে দেখতে হবে। সেইজন্যে যাব।

আরও কী সব বলতে যাচ্ছিল। তুষ্টুর হাসির তোড়ে গর্জন জমল না। হেসে হেসে বলছে, যাই বলো, জাতে ছোট হয়ে ভালই আছি। বিধাতাপুরুষকে দোষ দিই না—বেশ ভালই করেছে। সুবিধা কত ছোটজাতের! আমি সকলের ভাত খেতে পারি, আমার কাছে ভাত চেয়ে কেউ খরচার দায়ে ফেলবে না। মজা করে রাঁধা ভাত খেয়ে বেড়াব, আমায় কেউ রাঁধতে বলবে না। আর এই মারধোরের কথা যদি বলো, মন্দাঠাকরুনের মতো ধড়িবাজ ক-জনা? ছোঁয়াছুঁয়ির ভয় সন্ন্যাসী দত্তেরও ছিল—কিন্তু সে কেবল মুখেই তড়পাত। ইট মারার বুদ্ধি মাথায় ঢোকেনি তার কোনদিন।

শীতের সন্ধ্যা। জগবন্ধুর উঠানের সামনে জামতলায় চারজনে গোল হয়ে

বসেছে। দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে গেল। সাহেব ডাকে ঃ এক ছিলিম টেনে গরম হইগে চলো।

সাহেব দাওয়ায় থাকে, সেখানে চলল। তামাকের সরঞ্জাম সেখানে। তুষ্ট রামের সুখের কাহিনী শেষ হয়নি। ফিকফিক করে হাসছে। আগের কথার জের ধরে বলে, ছোঁবে না, ঘরে উঠতেও দেবে না আমাদের। উঃ, জাতে ছোট হয়ে কত রকমে যে রক্ষে হয়েছে! মাহিন্দারি এদ্দিন ধরে, তা ঝাঁট দিতে হয় না, জল আনতে বলে না, বাসন ছুঁতে দেয় না। জলচল নবশাখ হলে মন্দাঠাকরুন ছেড়ে কথা কইত। তেমন মেয়েমানুষই নয়। সমস্ত কাজ চাপান দিত একটা মনুষের ঘাড়ে। এ বেশ দিব্যি ছিলাম—বাইরে বাইরে কাজ, গৃহস্থের চোখের আড়ালে। এক দিনের বাঁশকাটা ধরেছে। সব দিনের সব কাজ ধরতে পারলে ইট তবে একখানা-দুখানা নয়—পুরো একপাঁজা খতম হয়ে যেত।

তিনজনে দাওয়ায় ওঠে, তুষ্টুরাম নিচে দাঁড়িয়ে পড়ল। সাহেব বলে, কী হল? এক্ষুনি চলে গেলে হবে না। উঠে এসো। আরও শুনতে হবে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ আছে।

ছাঁচতলায় আরও খানিকটা এগিয়ে এসে তুষ্টু বলে, এইখান থেকে বলছি, দাওয়ায় উঠব কেমন করে?

সাহেব তাকিয়ে পড়তে তাড়াতাড়ি বলে, ঐ যে হল। জাতে ছোট—

সাহেব বলে, ছোট হোক বড় হোক তবু একটা জাতের ছায়ায় আছ তুষ্টু, আমার যে তা-ও নেই। আমার দাওয়ায় উঠতে মানাটা কিসের?

উঠানে নেমে হাত ধরে হেঁচকা টানে তুষ্টুকে দাওয়ায় এনে তুললে। বলে, পৈঠায় কাঁটা দেওয়া নেই, দেখলে তো? উঠে পড়লে কেউ আটকাতে পারে না।

তামাক সাজতে সাজতে তুষ্টুর দিকে চেয়ে আবার বলে, জাতই নেই মোটে আমার। এক বলতে পারো মানুষজাত। সেদিক দিয়ে অবশ্য সুবিধা। তোমার চেয়েও ঢের সুবিধা আমায়—বামুন থেকে মুচি যে কোন জাতের মধ্যে গরজ মতন ডুব সাঁতার দিয়ে উঠতে পারি।

হেঁয়ালির মতো কথাবার্তা—জাত বেজাতের বিরুদ্ধে আজকাল লম্বা লম্বা বচন শোনা যায়, তেমনি কিছু হবে হয়তো। গুরুপদ অসহিষ্ণু হয়ে বলে, কাজের মধ্যে এখন জাতকুল কিসের? বলি, তুষ্টুর ঘরে আর সাহেবের ঘরে বিয়ের সম্বন্ধ নয় তো। কাজের কথা হোক।

তিন

কাজ তিলকপুরে। সামান্য সাত-আট ক্রোশ পথ। আদ্যোপান্ত আবার ভাল করে শোনা গেল। মক্কেল রাখালপতি রায়। বোনাই সন্ন্যাসীপদ মরে যেতে বোন-ভাগনে সঙ্গে করে তিলকপুরে নিজের বাড়ি এনেছে। বোন নিয়ে এসেছে এককাঁড়ি টাকা। খবর খুব পাকা। পারার ব্যাধি আর টাকার গরম

মানুষে চেপে রাখতে পারে না, ফুটে বেরোয়। রাখালের আগেকার কথাবার্তা আর এখনকার হাঁকডাক— কানে পড়লেই তফাত ধরা যাবে। আজকেও তুষ্টুরাম তিলকপুর চলে গিয়েছিল।

এই সন্ন্যাসীপদ লোকটা ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের বিশেষ জানা। খলিফা লোক —ভাল বিষয় আশয়, তার উপরে বন্ধকি কারবার। সোনা-রুপো রেখে টাকা কর্জ দিত। টাকা শোধ করে বন্ধকি মাল ছাড়িয়ে নেবার নিয়ম একটা আছে বটে, কিন্তু সুদ লাফিয়ে লাফিয়ে আসলের ঘাড়ের উপর চড়ে। দেখতে দেখতে মালের দামের দুনো তেদুনো হয়ে যায়। মালিক আর নিতে আসবে কেন? এমনি সোনা-রুপো অঢেল সন্ন্যাসীর ঘরে।

বয়স হয়েছিল, মন্দাকিনী সন্ন্যাসীর দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার। ভারী সংসার, কিন্তু নিজের ছেলেপুলে নেই। এই এক দুঃখ ছিল সন্ন্যাসীপদর। অনেক কাল দেখে, অনেক টালবাহনা করে বড়বউ বর্তমান থাকতেই রাখালের বোনকে বিয়ে করে আনল। মন্দা-বউ মান রেখেছে বটে—বংশরক্ষার মতো ছেলে হয়েছে একটা এই পক্ষে। অমূল্য। সন্ন্যাসী আর মন্দাকিনীতে বয়সের বিস্তর ফারাক। হাঁপানির অসুখ বেড়ে সন্ন্যাসীর হঠাৎ যায়-যায় অবস্থা। বুড়ো-বয়সের পেয়ারের বউ বলে মন্দাকিনীকে কেউ ভাল চোখে দেখে না। ভাইকে বিপদ জানিয়ে কেঁদে কেটে সে চিঠি লিখল।

বোনের এত বড় বিপদ রাখাল কেমন করে স্থির থাকে? পত্রপাঠমাত্র ছুটল। মন্দাকিনী মাথা ভাঙাভাঙি করেঃ কী হবে ও দাদা? ও-মানুষ চলে গেলে জগৎ অন্ধকার। কী করব আমি, এ পোড়া সংসারে কেমন করে থাকব? মরব আমিও—এক চিতেয় সহমরণে যাব।

রাখাল হেন পাটোয়ারি পাকা মানুষটারও চোখ বুঝি সজল হয়ে আসে। মন্দাকিনীকে ধরে তুলে চোখ মুছে দেয়ঃ ভেঙে পড়িস নে বোন। অমূল্য রয়েছে—তার মুখ চেয়ে বুক বাঁধ। এসে যখন পড়েছি, এ অবস্থায় যন্দুর যা সম্ভব ত্রুটি হবে না।

বড়বউ অর্থাৎ মন্দাকিনীর সতীন, শাশুড়ি, জা-জাউলিরা—কুটুম্বর আবির্ভাবে বাড়ির মধ্যে যে যেখানে ছিল, ছুটে এসে পড়েছে। ঘরের মধ্যে সামনের উপর কেউ নয়—যে কয়েকটা দুয়োর-জানালা, সবগুলোর আড়ালে কান পেতে দাঁড়িয়ে আছে। ফিসফিস করছে কখনো বা। একটা অতিমৃদু হাসি খেলে যায় রাখালের মুখে। বোনের মাথায় হাত রেখে অভয় দিচ্ছেঃ ভয় কিসের? এমন শাশুড়ি, এমন সব জায়েরা—পর্বতের আড়ালে রয়েছিস তুই। আর আছেন বড়বউ-ঠাকরুন—লক্ষ্মী সরস্বতী দুই বোন তোরা, দেখে চক্ষু জুড়ায়। আমি পর-অপর বই তো নই—আমি এর মধ্যে থেকে কি করব? বিপদ শুনে এসেছি, একদিন দু-দিন থেকে চলে যাবো।

সন্ন্যাসীপদর ভাইরা সব এসে রাখালের পায়ে ভক্তিযুক্ত হয়ে প্রণাম করে।

রাখাল বলে, চলো ভায়ারা, রোগির ঘরে দেখে আসি। মনে তোমাদের কি হচ্ছে, সে কি আর বুঝিনে! আমার ভাই ছিল না—বোনেদের একটি গেছে, আজও তার জন্যে ক্ষণে ক্ষণে বুকের মধ্যে চড়চড় করে ওঠে। এক মায়ের দুধ খেয়ে মানুষ—এ যে কত বড় ব্যথা, যার গেছে সে-ই শুধু বুঝবে।

রোগির উপর ঝুঁকে পড়ে রাখাল ডাক দেয়: দত্তজা, চিনতে পার? আমি রাখাল, তিলকপুরের রাখালপতি।

রোগি চোখ মেলে। চোখের মণি বিঘূর্ণিত হচ্ছে। দেখে ভয় করে।

রাখাল পুনরপি বলে: দত্তজা, ঠিকেদারের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে এসেছি। তোমার কাছে কবে তারা আসবে? তারিখ বলে দাও।

বাদাবন কাটার ঠিকেদার নিয়োগ হয় এই সময়টা সরকারি তরফ থেকে। সে কাজে টাকার দরকার, ভাল সুদে টাকা ধার করে তারা। টাকাও নিরাপদ। সন্ন্যাসীপদ ইতিপূর্বে রাখালকে ধরেছিল তেমনি কোন কোন ঠিকাদারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে। বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেছে, মুমূর্ষুকে রাখাল মিছামিছি বলল। সন্ন্যাসীপদর সংজ্ঞালাভের এমন মোক্ষম অষুধ আর হয় না। তবু কিন্তু সাড়া নেই। পিটপিট করে একবার চোখ বুজল।

অন্তরালে গিয়ে মন্দাকিনী বলে, কি রকম দেখে এলে দাদা? ফাঁকি দিয়ে ভুলিও না।

রাখাল বলে, বুক বাঁধ রে বোন, নাবালক অমূল্যের ভবিষ্যৎ ভেবে। বিচার-বুদ্ধি হারাসনে। দুনিয়ার উপর কেউ চিরকাল থাকতে আসে নি। দত্তজা বোধহয় চললেন। আমিও একদিন যাব, যাবে সকলেই।

সন্ন্যাসীপদর সোহাগিনী বউ—সংসারের চাবিকাঠি মন্দাকিনীর আঁচলে বাঁধা। সেই জন্য বাড়িশুদ্ধু সকলের রাগ। কিন্তু সে রাগ মনে মনে চাপা আছে—সন্ন্যাসীরা নাসারন্ধ্রে যতক্ষণ শ্বাস বইছে, মন্দার কেউ কিছু বরতে পারবে না। শ্বাস বন্ধ হলে তখন অবশ্য ভিন্ন কথা।

গলা অত্যন্ত নামিয়ে রাখাল বলে, কপাল সত্যিই যখন পুড়ছে আমি বলি কি, এখন অবধি তোর মুঠোয় সংসার—ভালমন্দ সাধ মিটিয়ে খেয়ে নে যে ক'টা দিন হাতে পাস, দু-দুটো পুকুর মাছে ঠাসা—জেলে ডেকে জাল নামিয়ে দে, ভারী ভারী রুই-কাতলা তুলে ফেলুক, ছ্যাঁচড়া মুড়ি ঘণ্ট, কালিয়া-কোপ্তা জন্মের মত খেয়ে নে।

তাই চলল। কুটুম্ব বড়ভাই এসেছে—জেলেরা দুই পুকুরে জাল নিয়ে পড়ল। তার উপর রোজ রাত্রে একটা করে পাঁঠার ঘাড়ে কোপ পড়ছে। সন্ন্যাসীর সেজ ভাই স্ত্রীর কাছে রাগে রাগে টিপ্পনি কাটে: কায়দায় পেয়ে দেদার খেয়ে নিচ্ছে। মোটা পয়সা মারবে বলে এদ্দিন ধরে বড়দা মাছ পুষে রেখেছে, পুকুরে কাপড় ছাঁকনাও দিতে দেয় না—সেরে যদি ওঠে টের পাবে তখন। মাছ তোলার মজা বেরিয়ে যাবে। উঠবেই বড়দা সেরে, ওকে নিয়ে যাবে যমরাজের এতখানি

তাগত নেই।

সেরে উঠবার কিন্তু কোন লক্ষণ নেই। অনেকবার পিছলে বেরিয়ে এসেছে, এবারে যমরাজ দৃঢ়সংকল্প। ডাক্তার-কবিরাজ জবাব দিয়ে গেল। ভাইরা তবু ভ্রূক্ষেপ করে না ঃ অমন তো কতবার জবাব দিয়েছে। বিনিঅষুধেই তারপর খাড়া হয়ে উঠল। একবার তো চিতার খরচার জন্য আমগাছ কেটে চেলা করে ফেলা হল। সেরে উঠে সেই গাছ কাটা নিয়ে ধুন্দুমার। হাতে মারতে কেবল বাকি রেখেছিল আমাদের।

অতএব শাশুড়ি সতীন দেওর ও জা-জাউলিরা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছে। রোগির ঘরে একা মন্দাকিনী। আট বছরের ছেলে অমূল্য মামা রাখালের সঙ্গে শুচ্ছে কয়েকটা দিন।

নিশিরাত্রে মন্দাকিনী এসে গায়ে ঝাঁকি দেয় ঃ ওঠো, দেখে যাও দাদা কি রকম করছে। ভয় করছে বড্ড আমার।

রাখাল ঘরে গিয়ে এক নজর দেখেই বলে, শ্বাস উঠেছে।

মন্দাকিনী হাউহাউ করে কাঁদে, ও দাদা কী হবে আমার!

সন্ন্যাসীপদর খাটের খুরোয় মাথা কুটছে। ধরে ফেলে রাখাল খিঁচিয়ে ওঠে ঃ আচ্ছা হাঁদা মেয়েমানুষ তো তুই। এমন করে লাভটা কি শুনি? যে মানুষ চলে যাচ্ছে তারই শুধু মন খারাপ করে দেওয়া। মাথা কুটলে যম ছেড়ে যাবে না তোরই কপাল ফুটো হবে।

কানে কানে ফিসফিস করে উপদেশ ছাড়ল ঃ সিঁদুর-পরা মাছ-খাওয়া ঘুচে গেল, তা হলেও বেঁচে থাকতে হবে। তার উপরে অমূল্য—মায়ে-পোয়ে অন্তত চাট্টি ডাল-ভাত খেয়েও যাতে বাঁচতে পারিস, সেই উপায় করে নে। গোড়ার দিনে আমায় বলেছিলি, পোড়া-সংসারে কেমন করে থাকব—বড় খাঁটি কথা! শাশুড়ি-সতীন-দেওরেরা যা এক-একখানা চিজ—দত্তজা যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে। এক্ষুনি একটা বন্দোবস্ত করে নিতে পারিস, তবে রক্ষে।

চতুর্দিকে আর একবার দেখে নিয়ে রাখাল ইঙ্গিতে বিশদভাবে বুঝিয়ে দেয়। বলে, যদ্দূর যা পেরে উঠিস, গুছিয়ে নে। এক্ষুনি—এই একটা ফাঁক পেয়েছিস। মায়েপোয়ে চিরকাল তা হলে ডাঁটের উপর থাকবি—এখন যেমনধারা আছিস। কাঁদবার অনেক সময় পাবি বোন, গোছগাছ সারা করে ধীরে-সুস্থে এর পরে যত খুশি কাঁদিস।

স্বামীর বিছানার পাশে মন্দাকিনী বড় মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। ভাইয়ের পাকা বুদ্ধির কথায় সম্বিত পেয়ে সন্ন্যাসীপদর কোমরের ঘুনসিতে হাত চালিয়ে চাবি খুলে নিল। এই খাটেরই শিয়রের খানিকটা অংশে সিন্দুক বানানো, বড় তালা ঝুলছে। সন্ন্যাসীপদ সিন্দুক চেপে বরাবর শুয়ে আসছে—তালা খুললেও ডালা তুলবার উপায় নেই। কিন্তু আজকে হাঙ্গামা নেই—ঘরের ভিতরের ছাতা-লাঠি-লণ্ঠনের মতোই অচেতন মানুষটি। ঠেলে দিল তাকে এক পাশে। সন্তর্পণে

ডালা তুলে হাতড়ে হাতড়ে পাওয়া যায়—নগদ টাকা এমন কিছু নয়, সোনারুপো বেশি। সন্ন্যাসীপদ সোনা-রুপো কিনে সঞ্চয় করত, কাগজের নোট বিশ্বাস করত না।

রাখাল বলল, তোর এখন মাথার ঠিক নেই মন্দ। আমার কাছে দে ওগুলো, সেরে সামলে রেখে আসি।

কিন্তু দেখা গেল, শোকাচ্ছন্ন হলেও মন্দাকিনী কিছুমাত্র হুঁশ হারায় নি। বলে, কুটুম্ববাড়ি তো খালি-হাতে এসেছ, তুমি কোথায় রাখবে দাদা? যতক্ষণ মানুষটার ধড়ে প্রাণ আছে, ওর জিনিস আমি ঘরছাড়া হতে দেবো না। জিনিস এই ঘরের মধ্যেই থাকবে। এত বাক্সপেঁটরা আমার—তারই কোন একখানে কাপড়চোপড়ের মধ্যে গুঁজে রেখে দেবো।

এর উপরে কী বলবে আর রাখাল! একটা মানুষ মরে যাচ্ছে, সেই মুখে তর্কাতর্কি ঝগড়াঝাটি ভাল দেখায় না। মাল সরিয়ে মন্দাকিনী নিজের একটা পোর্টম্যাণ্টোর ভিতর রাখল। রেখে যথারীতি খাটের সিন্দুকের তালা এঁটে সন্ন্যাসীপদকে পূর্বস্থানে সরিয়ে কোমরের ঘুনসিতে চাবি যেমন ছিল পরিয়ে দিল আবার।

সন্ন্যাসীপদ মারা গেল সে রাত্রে নয়, পরের দিনও নয়, তার পরের দিন। সর্বক্ষণ অবিরত শ্বাস টেনেছে। যমরাজ চোখের সামনে দেখা দেন না, মানুষের প্রাণবায়ুও অদৃশ্য। তবু সুনিশ্চিত এই কদিন উভয়পক্ষে টানাটানি চলেছে। এবং যমই জিতলেন এবারে। মরা স্বামীর পায়ের উপর মন্দাকিনী আছাড় খেয়ে পড়ে। পাড়ার মেয়েছেলেরা ধরে তুলে এক-একবার বসিয়ে দেয়, ধড়াস করে পড়ে গিয়ে আবার মাথা কোটে। সখেদে সকলে মুখ-তাকাতাকি করেঃ সতীসাধ্বী স্বামী-শোক সামলে উঠতে পারবে না। মরব মরব ইদানীং তো বুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে—ওকেও আবার ক'দিনের মধ্যে চিতায় তুলতে হয় কিনা দেখ তাই।

এবারে আনুষ্ঠানিক ভাবে মৃতের কোমর থেকে চাবি খুলে সর্বসমক্ষে খাটের সিন্দুক ও বড় ছাপবাক্স খুলে ফেলা—সন্ন্যাসীপদ যার মধ্যে যাবতীয় গয়না-টাকা ও হিসাবপত্র রাখত। মন্দাকিনীর প্রায় অচেতন অবস্থা, ক্ষণে ক্ষণে আর্তনাদ করে উঠছে—তাকে এদিকে আনা গেল না। কান্নার মধ্যেই একবার বলে, আসল মানুষটা ফাঁকি দিয়ে গেছে—উচ্ছিষ্ট ছাইভস্ম কি পড়ে আছে, আমি তা দেখতে যাব না। চোখ মেলে দেখতে পারব না। দেখুকগে গরজ যাদের।

পাড়ার গিন্নি-বউ মন্দাকিনীর দশা দেখে চোখ মোছে। সিন্দুক খুলে ওদিকে শাশুড়ি-সতীন-দেওরেরা গালে হাত দিয়ে বসেছে। ঝিমিয়ে ছিল মন্দাকিনী—হঠাৎ কিছু চাঙ্গা হয়ে মাথা-ভাঙাভাঙি লাগিয়েছে আবার, পাড়ার সকলে থামাতে পারছে না। এই অবস্থার মধ্যে তাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় না।

শোকের অবস্থা চলল একনাগাড়ে মাসাবধি। বোনের অবস্থা দেখে রাখালও চলে যেতে পারেনি। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাবার পর সন্ন্যাসীর মাকে বলল, মন্দা বড্ড কাহিল হয়ে পড়েছে—দেখতে পাচ্ছেন মা। অনুমতি দেন তো সঙ্গে করে আমি তিলকপুর নিয়ে যাই। দিনকতক রেখে খানিকটা তাউত করে আবার রেখে যাব।

শাশুড়ি তিক্তকণ্ঠে বলে, রেখে যাবে আবার কেন? এত পয়সাকড়ি—সন্ন্যাসী দেখছি সবই ফুকে দিয়ে গেছে। খাবে কি এখানে পড়ে থেকে? বোন-ভাগনে সঙ্গে করে নিয়ে যাও তুমি। চিরকাল ধরে তাউত করগে, কোনদিন এমুখো যেন না হয়।

রসিয়ে রসিয়ে তুষ্টু সবিস্তারে বলে যাচ্ছে। একজন মানুষ মারা গেল, কত বড় দুঃখের ব্যাপার—কিন্তু বলার ভঙ্গীতে শ্রোতারা হেসে লুটোপুটি খায়। সাহেব বলে ওঠে, খাসা গল্প বানাতে পারো তুমি তুষ্টু। বলছ এমনভাবে যেন নিজে হাজির থেকে চোখের উপর সব দেখেছ। কথাবার্তার খুঁটিনাটি কানে শুনে মুখস্থ করে এসেছ।

বংশী বলে, চোখে দেখা বইকি! সন্ন্যাসীদের শ্রাদ্ধ অবধি সে বাড়ির মাহিন্দার ছিল। শ্রাদ্ধের সময়ের দাগ ঐ চোখের উপর রয়েছে।

তুষ্টুরাম বলে, কানেও প্রায় সমস্ত শোনা। মাহিন্দারি কাজটা তো খতম হয়ে গেল। নতুন মরশুমের বিস্তর বাকি, ঘরে বসে বসে কি করব? দিনরাত তক্কেতক্কে থাকতাম ছুটো কাজ একটানা গুছিয়ে তোলা যায় যদি। ষোলআনা গুছিয়ে এসে তবেই না খোসামুদি করে বেড়াচ্ছি!

শেষ পর্যন্ত জগবন্ধু নিমরাজি হলেন: কী করা যায়! তেজি ঘোড়া বেঁধে রাখলে অবিরত পা ঠোকে। সাহেবের ঠিক সেই ব্যাপার। নানারকম চমকদার কাজের গল্প শুনে শুনে তার ধৈর্য থাকে না, একখানা করে সে দেখাবেই। তার উপরে উপসর্গ—গুরুপদকে লোভ দেখিয়ে এনে হাজির করেছে। নানান ছুতোয় আমার সঙ্গে সে ঝগড়া বাধায়, ঝগড়া করে শক্ত শক্ত কথা বলে গায়ের ঝাল মেটায়। যাও তোমরা, দেখাই যাক কি করে এসো। এইটুকু বলতে পারি, তুষ্টুরামের খবরে ভুল নেই।—

তুষ্টুরাম আনন্দে থই পায় না। বলাধিকারী তবে নির্বিকারী ছিলেন না। অন্য সূত্রেও খবরবাদ নিয়েছেন। খোঁজদারির প্রশংসা অমন মানুষটার মুখে!

বলাধিকারী বলেন, কোরবান শেখ রাখাল রায়ের বাড়ির নগদি। তার কাছে আলাদাভাবে শুনে নিলাম। খুঁটিনাটি তেমন না হলেও মোটের উপর একই বস্তু পাওয়া গেল। রাখালের বাড়ি মন্দাকিনীর গুরুঠাকুরের অধিক আদরযত্ন। সে যত্ন খালি হাতের মানুষকে কেউ দেয় না—বোন না হয়ে গর্ভ-ধারিণী মা হলেও না। কোরবানকেও একটু বখরা দিতে হবে কিন্তু। সামান্য ধরো, আধ পয়সার মতো।

দু-তরফের পাকা খবরের পর ইতস্তত কিসের ? কাজে ঝাঁ দেবার জন্য সকলে পাগল। সাত-আট ক্রোশ পথ হয়তো দুপুর নাগাদ বেরিয়ে সন্ধ্যা হতে হতেই গাঁয়ে গিয়ে উঠবে। তিথিটা চমৎকার, কৃষ্ণপক্ষের শেষ—সঙ্গে সঙ্গেই কাজের আরম্ভ, চুপচাপ সময়ক্ষেপ করতে হবে না। বহু রকমের সে কাজ—সকলের আগে বাড়ি ঘর-দোর বাড়ির মানুষজন জীবজন্তু পাকচক্কোর দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরখ করে নেওয়া। এই সবেই সময় যায়—গৌরচন্দ্রিকায় খুঁত না থাকলে আসল কাজে এক দণ্ডের বেশি লাগে না।

কাজে কবে বেরুচ্ছি, বলে দিন এবারে বলাধিকারী মশায়।

বলাধিকারী সহাস্যে বলেন, খবর তো আনলি তুষ্টু, গাঁয়ের মধ্যে দু-দুটো বন্দুক সে খবর কিন্তু জানিস নে।

বংশী চমৎকৃত হয়ে গুরুপদর গায়ে ঠেলা দেয়ঃ বোঝ—

দৃষ্টি কত দিকে বলাধিকারীর ! এই সব গুণেই মানুষটা এত বড়, সকলে এমন মান্য করে।

বলাধিকারী বংশীর ভাব লক্ষ্য করেছেন। বলেন, কিছু না, কিছু না। এ হল যেমন দাবাখেলার উপর চাল। খেলুড়ের নজর গেছে গেছে, কিন্তু পাশে যে লোক দেখছে হঠাৎ সে একখানা মোক্ষম চাল বলে দিল। কাঁচা মানুষ তোমরা প্রায় সবাই। সাহেব আনকোরা নতুন। তুষ্টুরাম যা করে, সেটা বলা যায় বমাল বওয়া মুটের কাজ। গুরুপদ বয়সে বেড়েছে, কিন্তু হাতও পেকেছে এমন কথা কেউ বলবে না। বংশীকে তার আজামশায় কেবল তো কুকুর-ডাক, শেয়াল ডাকই শেখান। গাঁয়ে বন্দুক থাকতে সেখানে তোমাদের না ওঠাই ভাল।

চৌকিদারের কাছে এমন একটা বন্দুক, আর চকদার অবিনাশ সামন্ত সম্প্রতি লাইসেন্স করে বন্দুক কিনে এনেছেন ! অবিনাশের জন্য কিছু নয়, জগবন্ধুর সঙ্গে দহরম-মহরম আছে ভদ্রলোকের। ভাবনা চৌকিদারের সরকারী বন্দুকটা নিয়ে।

বলেন, দারোগার হলে কিছুই ভাবতাম না। অধমের গরিবখানায় তাঁদের সদাসর্বদা চরণ পড়ে। ক্ষমতা ধরেন তাঁরা, বন্দোবস্তেও তাই সহজে আনা যায়। একটা বখরার ওয়াস্তা—কোরবান শেখের মতো। বন্দুক তখন বুকের সামনে উঁচিয়ে ধরেও দেওড় করবে না। চৌকিদারের সামান্য চাকরি, শিক্ষা-দীক্ষা নেই —বুকে তাই বল পায় না, ধর্ম-ধর্ম করে মরে।

ভেবেচিন্তে অবশেষে চৌকিদারের বন্দুকের ব্যবস্থাও হল। ঐ অবিনাশকে দিয়ে। অবিনাশের এক খুড়ো হলেন ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেন্ট—যত চৌকিদারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। অবিনাশের তখনও বন্দকের লাইসেন্স হয় নি—মনে পড়ল, চৌকিদারের বন্দুক নিয়ে খুড়ো-ভাইপোকে একদিন জামলার বিলে পাখি মারতে দেখেছিলেন। এখনই বা কেন তাই হবে না ?

চিঠি লিখে জগবন্ধু বংশীর হাতে দিলেনঃ তিলকপুর তুমি একটি বার ঘুরে

এসো। জামলার বিলে খুব কাঁকপাখি পড়ছে। সামন্তদের খুড়ো-ভাইপোকে নেমন্তন্ন করে পাঠাচ্ছি। সমস্ত দিন শিকার হবে, রাত্রে ফিস্টি আমার এখানে। মক্কেলের বাড়িখানা তুমিও একটাবার দেখে এসো।

কায়দায় পেয়ে বংশী গুরুপদকে বলে নেয়, নিন্দে করছিলে যে বড়! কারিগর মেরে টাকা করে—সে মহাজন আর যেই হোক, বলাধিকারী মশায় নয়। বলি, এত বড় একটা ফিস্টি তো মাংনা হচ্ছে না—ক্ষেতের ফসল কোথায় কি, মবলগ খরচা করে বসে রইলেন। হুঁশ করে নিজে থেকেই করছেন এত সব। কাজের কী দরাজ ব্যবস্থা বুঝে নাও, কাজের মুখে তখন আর টাকাকে টাকা জ্ঞান করেন না।

গুরুপদও প্রসন্ন মুখে বলে, বন্দুক হাতানোর বুদ্ধিটা বেড়ে হয়েছে। একবার কী গেরো! সোনাদানায় মির্জার সর্দারের বাড়ি কাজে গিয়ে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে পড়ে গেলাম। মনে পড়লে গা কাঁপে এখনে। শিকার-টিকার বুঝিনে বাবা—ফুলহাটায় বন্দুক এসে পৌঁছল, সেইটে চোখে দেখে তবে পা বাড়াব।

অসাধ্য-সাধনের ক্ষমতা ধরেন বলাধিকারী। সেই অবশ্য এই নতুন দেখা যাচ্ছে না। মাঝে একটা দিন বাদ দিয়ে অবিনাশ সামন্ত পাখি-শিকারে এসে পড়ল। পিছু পিছু চৌকিদার। বিলের এত জলকাদা ভাঙা একটামাত্র বন্দুকের লভ্যে পোষায় না। প্রবীণ প্রেসিডেণ্ট মশায় কষ্টের ভয়ে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেলেন, তাঁর অনুমতি আদায় করে অবিনাশ চৌকিদারকে সঙ্গে এনেছে।

দুপুর না হতেই ওঁরা নেমে পড়লেন জামলার বিলে, কালী-কপালিনীর নাম স্মরণ করে এরা চলল তিলকপুরের দিকে। যাবার আগে বলাধিকারীর সঙ্গে এক জায়গায় হয়েছে, কাজের ছকটাও মোটামুটি তিনি বেঁধে দিচ্ছেন।

নফরকেষ্ট রোখ ধরে: আমি যাব কিন্তু। আমায় বাদ দিলে হবে না।

বলাধিকারী দরাজ অনুমতি দিলেন: যাবেই তো। না বলছে কে? এ তল্লাটে একবারে নতুন তুমি। কেউ চেনে না। তোমায় না, সাহেবকেও না। কাজের পক্ষে সেটা বড় ভাল। ঠিক এই লাইনের না-ও যদি হও, আনাড়ি লোক নও তুমি। রেল-গাড়িতে তোমার পালানোর কায়দা দেখে বুঝেছি। তবে আর কি—পাঁচজন হলে, পঞ্চপাণ্ডব মিলেমিশে দল গেঁথে নাও এবারে।

নিতান্তই ছুটো কাজ। এবং দল নয়—দল অনেক বড় জিনিস, বিস্তর বিচার-ব্যবস্থা ও আয়োজন তার জন্য। পাঁচটি প্রাণীর সংকীর্ণ সামান্য দল একটু। কিন্তু সামান্য হলেও কাজের বিভাগ বড় দলেরই মতন। দলের মাতব্বর চাই একজন। গুরুপদ পুরানো লোক—ক্যাপ্টেন বল সর্দার বল তাকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হল, তার কথার উপর সকলে চলবে। শিয়াল-ডাক কুকুর-ডাক বিড়াল-ডাক নানান ডাকের ওস্তাদ বংশী পাহারাদার হলে উচিত হবে। তুষ্টু তো খোঁজদার আছেই। নফরকেষ্ট যখন যাচ্ছে, সে হল ডেপুটি। বাকি রইল সাহেব

—নতুন হলেও হেলাফেলার লোক নয় সে। জমাদার বলে পদ আছে, কাজের সঠিক সংজ্ঞা নেই! কোন কাপ্তেন বলে, সে পদ সর্দারেরও উপরে। আবার কেউ বলে নিচে।

ভেবেচিন্তে বলাধিকারী রায় দিলেন : এ কাজের জমাদার হলে তুমি সাহেব।

এই ভরামরসুমে সরঞ্জাম সমস্ত বাইরে, কাঠি দু'খানার বেশি জোটানো গেল না। একটা ফলা ত্রিকোণ—মাটির দেয়াল কাটা যায়। আর একটার মাথা চতুর্ভুজের মতো, পাকা দেয়াল খুঁড়তে লাগে। কাপড়ের নিচে উরুর সঙ্গে সর্দার গুরুপদ দু-রকমের কাঠি বেঁধে নিল। কাঠি নেবার কায়দা এই। লোকের নজরে পড়ে না। হালকা জিনিস বলে হাঁটা এবং প্রয়োজন হলে দৌড়ানোর কিছুমাত্র অসুবিধা নেই।

আর খুঁজেপেতে নফরকেষ্ট আবিষ্কার করল খাপসুদ্ধ ছোরা একখানা। ভোঁতা মরচে-ধরা জিনিস। নফরা বলে, তাই সই। আসল সাপ না-ই হল, বেতের সাপ দেখিয়ে কাজ হবে। খুনে লোকের চেহারাখানা আছে, যা হাতে ধরব তাই অস্ত্যের।

এখন একসঙ্গে বেরুচ্ছে—রাস্তায় পড়েই আগুপিছু হবে, এপথ-সেপথ ধরবে। কাজের তাই নিয়ম। কারো নজরে না আসে, সন্দেহের ভাঁজটুকু না পড়ে দলের উপর।

সত্যিই বেরুল তবে। এখন যা করেন কালী করালী। জীবনের প্রথম কাজের মুখে সাহেব একমনে কালী-নাম করছে। চোর-চক্রবর্তীর পুঁথিতে কালী-বন্দনা :

নিশিকালী মহাকালী উন্মত্তকালী নাম—
চরণে পড়িলাম মাতা, আইস এই ধাম।

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য রান্নাঘরে ফিস্টির আয়োজনে ব্যস্ত। শৌখিন রান্না কাজলীবালাকে দিয়ে হবে না। কোটনা-কোটা বাটনা-বাটা ইত্যাদি আগের কাজগুলো করিয়ে রাখছে এখন। মালমশলা এসে পড়লে পৈতে কোমরে গুঁজে নিজ হাতে খুন্তি নিয়ে পড়বে। নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত নেই। অথচ কী আশ্চর্য ব্যাপার—টনক নড়ে গেছে ঘরের ভিতর থেকেই। ছুটতে ছুটতে ঠিক সময়টিতে তেমাথার পথ আটকে দাঁড়ায়।

শুনে যাও ও সর্দার, আমারও একটা বখরা রইল কিন্তু।

সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলে, আমার দাবি জানিয়ে যাচ্ছি জমাদার। বলাধিকারী মশায়কে বাতলে দিও। কারিগরের সুপারিশ না হলে মহাজনের বখরা বসানোর এক্তিয়ার নেই।

সর্দার গুরুপদ খিঁচিয়ে ওঠে : কোন কাজটা করলে তুমি, কিসের বখরা? বেহদ্দ খোশামুদি করেছি, তখন রা কাড়লে না। লজ্জা করে না বলতে?

সমান তেজে ক্ষুদিরামও কলহ করে : বৈঠকখানার ফরাস ছেড়ে রান্নাঘরে

উনুনের মুখে বসেছি—কিসের জন্য শুনি ?—আমার পিতৃকুল মাতৃকুল উদ্ধার হবে বলে ? এটাও দলের কাজ।

এই এক ব্যাপার। মাংনা কেউ কুটোগাছটি নাড়বে না—কম হোক বেশি হোক বখরা আছে সকলের। কাজ অনুযায়ী রকমারি হিসাব। মাথা খারাপ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু অলিখিত আইন অনুযায়ী নির্গোলে ন্যায্য বখরা মিটিয়ে দিতে বলাধিকারীই শুধু পারেন। করে আসছেন বরাবর।

জামলার বিলের দুর্গম কাদায় বলাধিকারী সারাক্ষণ শিকারী দুজনের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। হল খারাপ নয়। কাঁকপাখিই গণ্ডা দুয়েক—ছোটখাট জিনিষও কিছু পড়েছে। বেলা পড়ে আসতে বিল থেকে উঠে বাসায় ফিরলেন। চৌকিদার কিছু জরুরি কাজ সেরে ভিন্ন পথে অনেক পরে এসে পৌঁছল। থানা অবধি চলে গিয়েছিল সে—কয়েকটা ভাল পাখি থানার বড়বাবু ছোটবাবুকে ভেট দিয়ে এসেছে। ফিরবার সময় অমনি দুটো বোতল গঞ্জ থেকে কিনে গামছায় জড়িয়ে নিয়ে এল। টাকা বলাধিকারীর—রাত্রে পক্ষি-মাংসের ফিস্টি—ফিস্টির কোন অঙ্গে খুঁত না থাকে।

স্ফূর্তির আসর সন্ধ্যে থেকে। বাইরের আরও দু-চারটি জোটানো হয়েছে। হারমোনিয়াম ও ডুগিতবলা এসেছে, গান হবে। বাড়তি লোকের দরকার অতএব। চৌকিদার গঞ্জের আবগারি দোকানে বসেই কিছু করে এসেছে কিনা কে জানে। শৈশবে কিছুদিন যাত্রার দলে ঘুরেছে, সখীর গান হঠাৎ স্মরণে এসে গেল। শুঁক-শুঁক করে বারকয়েক নাক সিঁটকে বলে, জুত হচ্ছে না। বলি, ঘুঙুর-টুঙুর আছে ? নেই তো বয়ে গেল,—কুচ পরোয়া নেই।

ঠোঁটের উপর দুটো আঙুল চেপে ঘুঙুরের মতো খানিকটা আওয়াজ বের করে, আর নাচে।

মাঠ পার হয়ে তিলকপুর গাঁয়ে পা দিয়েই বড় বড় তিন তেঁতুলগাছ। যে পথেই যাও, ঐ জায়গার নিরিখ থাকল। তেঁতুলতলায় সবাই হাজির হবে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। পাশের মানুষটাও চিনে নেওয়া মুশকিল। তুষ্টুর অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। খোঁজদার মানুষ—মক্কেলের বাড়ি অন্তত একটা পাক দিয়ে তবে আসবে এখানে, মক্কেলের শেষ খবর এনে দেবে। কাজের ঠিক আগে, একটু সাজ-গোজের ব্যাপারও আছে—সে খানিকটা যাত্রা-থিয়েটারের মতন। ছুটো কাজ বলে কাড়াকাড়ি নেই তেমন—রীতরক্ষা কোন প্রকারে। সমস্ত সমাধা করে তৈরী হয়ে আছে। ঘোড়দৌড়ের আগে ঘোড়ার যেমন চনমনে ভাব সেই অবস্থা।

এসেছে তুষ্টুরাম। ঝাঁক-বাঁধা প্রশ্ন—তূণ থেকে যেন তীরের পর তীর ছুঁড়ে যাচ্ছে। সর্দারের দায়িত্ব প্রশ্ন করা এবং উত্তর আদায় করে নেওয়া।

বাড়ির লোক গণে এসেছ আবার ? ক-জন মোটমাট ? মেয়ে কত, বেটাছেলে কত, বাচ্চা কত ? অতিথি-কুটুম্ব এলো কেউ বাড়িতে ? বাড়ির লোক

পড়ে নেই। গুরুতর রকমের রোগপীড়ে হয়নি কারও ?

না, কিছুই নয় সেসব। যেমনটি দেখে এসেছিল, আজকেও অবিকল তাই। খাওয়া দাওয়া সেরে কতক শুয়ে পড়েছে। বাড়ির কর্তা রাখাল হুঁকো টানতে টানতে গোয়ালের গরু বাছুর তদারক করছে, নুলেবাছুর আটকানো হয়নি বলে ধমকাচ্ছে বড় ছেলে নিশির উপর। এই অবস্থায় দেখে এসেছে তুষ্টুরাম। আরও তো কতক্ষণ গেল—শুয়ে পড়েছে। টিপিটিপি এগুনো উচিত এইবারে।

তেঁতুলতলা থেকে বেরিয়ে পড়ে পাঁচটা প্রাণী।

নীতিনিয়ম কয়েকটা শুনে রাখবেন নাকি সুবুদ্ধি পাঠক ? ভবসংসার বড্ড কঠিন ঠাঁই—কখন কোন্ পথ ধরতে হয় কেউ বলতে পারে না। শুনুন। রোগী থাকলে সে বাড়ি কদাপি ঢুকবেন না। গুরুর নিষেধ। আজ্ঞে হ্যাঁ, ধর্মকর্মে যেমন চৌরকর্মেও ঠিক তেমনি গুরু ধরতে হয়। গুরু বলুন, অথবা ওস্তাদ। গুরু কৃপা ভিন্ন বড় কিছু হওয়া যায় না। বহুদর্শী গুরু পইপই করে মানা করেন রোগীর বাড়ি ঢুকতে। ডাক্তার কবিরাজের আনাগোনা—হয়তো বা বাড়ির লোকে কুক ছেড়ে কেঁদে উঠল, হায়-হায় করে পাড়াপড়শি ছুটে আসবে, চোর আপনি বেড়াজালে আটক পড়ে যাবেন তখন। ভ্রষ্টা মেয়ে যে বাড়ি সেখানেও যাবেন না। প্রেমিকরা নিশিরাত্রে আনাচে কানাচে ঘুরঘুর করে বেড়ায়। সাত চোরের এক চোর—সিঁধেল-চোর কোন ছার তাদের কাছে ! লম্পট ছেলে ছোকরা থাকলে সেখানেও না—রাতের মধ্যে সেই ছোঁড়া এক সময় না এক সময় সুট করে বেরিয়ে পড়বে। প্রেমের দাপটে সাপ-বাঘের ভয় ঘুচে যায়—বিল্বমঙ্গলের পবিত্র কথা যাঁদের জানা আছে, সহজে তাঁরা বুঝবেন। এমন মক্কেলের ঘরে ঢুকে কারিগরের পক্ষে স্থির মনে কাজকর্ম অসম্ভব। বিস্তর ধৈর্য ও বিচার বিবেচনার প্রয়োজন এক-একখানা কাজ নামাতে। এতই যদি সোজা হত, লোকে চাকরি-বাকরি অথবা ব্যাপারবাণিজ্যের ঝঞ্ঝাটে না গিয়ে সিঁধকাঠি নিয়ে সরাসরি লক্ষ্মী-ঠাকরুনকে হরণের পথ ধরত।

নেই তো তুষ্টুরাম এমনিধারা হাঙ্গামা ? খুঁটিয়ে দেখে এসেছ—দেখেশুনে বুঝে-সমঝে বলছ ?

চার

তুষ্টুরাম আগে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে। নিঃশব্দ গ্রামপথ। রাখাল রায়ের বাড়ির সামনে এসে গেল। পাঁচিল-ঘেরা বাড়ি। খবর ঠিকই দিয়েছে—পাঁচিলের গায়ে ভারা-বাঁধা। আজকেও বোধ হয় কাজ করে গেছে, ভারার এদিকে-ওদিকে ইটের টুকরো ছড়ানো।

পাঁচিলের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। দরজা খুলে ভিতর-উঠানে ঢুকতে হবে। বিধি হল, টিপিটিপি একজন পাঁচিল বেয়ে উঠে ওপাশে নেমে পড়ে খিল খুলে দেবে। ভারা-বাঁধা অবস্থায় পাঁচিলে ওঠার কাজটাও সহজ হয়েছে।

প্রাচীন চৌরশাস্ত্রে এক রকম পাতার কথা রয়েছে, পাতা ছুঁয়ে চোরে দরজা খুলত। আর এক রকম মায়ামন্ত্র—কৃষ্ণাক্ষর নামে শাস্ত্রে বিদিত—পাঠমাত্রেই দরজা আপনি হাঁ হয়ে যাবে, আঙুল ঠেকাবারও প্রয়োজন হবে না। বলাধিকারী মশায় পড়ে শোনান এই সব। হায় রে হায়, পোড়া যুগের মূর্খস্য মূর্খ আমরা সমস্ত-কিছু হারিয়ে বসে আছি।

নফরকেষ্ট গোড়াতেই গোলমাল ঘটিয়ে বসল। নতুন মানুষ এইজন্য নেয় না। দরজায় সত্যি সত্যি খিল দেওয়া, অথবা শুধুমাত্র ভেজানো রয়েছে, পরখ করে দেখতে গিয়েছিল। মহিষের মতো মানুষটা, হাতির মতো গায়ের বল। ভেবেছিল অতি ধীরে একটুখানি নেড়ে দেখবে—নাড়াটা বে-আন্দাজি রকম জারদার হয়ে গেল। এই মানুষটাই ভিন্ন ক্ষেত্রে হাতের সূক্ষ্ম কাজ দেখিয়ে অবাক করে দেয়, বিশ্বাস করা শক্ত!

জরাজীর্ণ দরজা। তুষ্টুর খবরে ত্রুটি ছিল না—সমস্ত পাঁচিল, এবং কোঠা-বাড়িটুকুও নড়বড়ে। বোন-ভাগনে এসেছে—তারা যাতে আরামে থাকতে পারে, এবং তার চেয়েও বড় কথা—যে বস্তু সঙ্গে নিয়ে এসেছে, তাই যাতে নির্বিঘ্নে থাকে, তাড়াতাড়ি সেজন্য মেরামতের রাজমিস্ত্রি লাগিয়েছে। দরজার কিছুই বড় নেই—ধাক্কাটা এমন-কিছু জোরের না হলেও খিল ভেঙে দুই পাল্লা দুই দিকে দড়াম করে খুলে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে, কোথায় ছিল রাখাল রায়—লম্ফ দিয়ে উঠানে এসে পড়ল।

বাড়িতে টাকা এসে পড়ে মানুষটার চোখের ঘুম হরে গেছে। আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠে, কে? কারা তোমরা? ছেলেকে ডাকছে: ওঠ রে নিশি শিগগির বেরো। কারা সব ঢুকে পড়ল—

নির্গোলে অহিংস মতে কাজ সেরে বেরুবে, গণ্ডগোল হয়ে গেল। অবস্থা রীতিমত ঘোরালো। চুরিতে এসে ডাকাতি। কাজ হোক তবে সেই নিয়মেই। সর্দার গুরুপদ ছুটে এসে পায়ের সিঁধকাঠি খুলে এলোপাথাড়ি মারছে—বাড়ির মুরুব্বিকে ঠেঙিয়ে মালের খোঁজ আদায় করা। তা মার খেতে পারে বটে রাখাল। দেহখানা পাকানো দড়ির মতো—রক্তমাংস রসকষের বালাই নেই। যে বস্তু আছে, ঘা মেরে দেখা গেল, হাড়ও নয়—লোহার মতো কোন কঠিন বস্তু। লোহার সিঁধকাঠি তার উপর পড়ে ঠং করে যেন বেজে ওঠে। আবার তৈলাক্ত পাঁকাল মাছের মতো। পাঁচ-দশ ঘা খেতে খেতে সড়াৎ করে হাত পিছলে দৌড়।

পিছনে পিছনে তুষ্টু ছুটেছে। বাড়ির মানুষ বাইরে যেতে দেওয়া মারাত্মক ব্যাপার। মানুষ তো মানুষ—কাজ চলছে, সেই সময়টা বাড়ির গরু-ছাগল কুকুর বিড়াল অবধি বাইরে যাবে না। তুষ্টুর সঙ্গে ছুটে কেউ পারে না। কিন্তু গ্রহ আজ নিতান্তই খারাপ। গোয়ালের পাশে গোবরের গাদা—পা হড়কে তুষ্টু পড়ে গেল। গোবরে মাখামাখি। ওরে বাবা রে, মেরে ফেলল রে—চিৎকার করে রাখাল দৌড়চ্ছে। ক্ষমতা এ ব্যাপারেও আছে। পলকের মধ্যে বিলীন!

সে চিৎকারে পুত্র নিশির পাত্তা নেই—মন্দাকিনি দালানের দোর খুলে বেরুল। তুষ্টুরামের মনিবঠাকরুন। অস্ত্রাগারে তুষ্টুরাম—আজকে আর পরোয়া নেই, পাহাড়প্রমাণ অস্ত্র। ইট মেরেছিলে ঠাকরুন—এসো না এগিয়ে, তাল তাল গোবর ছুঁড়ব, রাতদুপুরে চান করে মরবে।

কিন্তু তার আগেই রণক্ষেত্রে নফরকেষ্ট রুখে দাঁড়াল। চুরিতে নেমে ডাকাতির কাজ রীতিমত। নফরার ভুলের জন্য এত ব্যাপার—কাজটা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে যাবার জন্য মন্দাকিনীর সামনে একটানে খাপের ছোরা বের করে ধরল: গয়না-গাঁটি যা আছে দিয়ে দাও। নয়তো এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে যাবে।

ঈশ্বর জানেন, একটা লাউ কি বেগুন অবধি এ ছোরায় এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয় না। নিতান্তই বেতের সাপ। এই ক'দিন নতুন হাঁড়িতে ঘসে ঘসে চকচকে করেছে। তাতেই কাজ দিল। দৈত্যসম মানুষটার কাছে ছোরার ধার পরীক্ষার জন্য কে এগোবে?

নফরকেষ্ট হুঙ্কার দিল: গয়না খোল বলছি।

মন্দাকিনী কেঁদে পড়ল: মেরো না, ধর্মবাপ তোমরা। বিধবা-বেওয়া মানুষ—আমার গয়নাগাঁটি সাধআহ্লাদ সেই এক মানুষের সঙ্গে ঘুচে গেছে।

গুরুপদ আজ ফেলনা মানুষ নয়—দলের সর্দার। কাজ দেখাতে কোন দিক থেকে অতএব ছুটে এসে পড়ল। বলে, বেওয়া-বিধবার গলায় কি ওটা চিকচিক করে? ফেলে দাও, দিয়ে দাও। মেয়েমানুষের গায়ে হাত দেবে না—ছুঁড়ে দাও বলছি।

ছেলের মায়ের শুধু-গলায় থাকতে নেই যে বাবা—

পুত্রের অমঙ্গল শঙ্কাতেই বোধকরি আঁচলের বেড় দিয়ে গলার মবচেন ঢেকে দিচ্ছিল, তুষ্টু চিলের মতন পড়ে ছোঁ মেরে ছিঁড়ে নিল। নিয়ে কাজের যেমনধারা দস্তুর—ডেপুটি নফরকেষ্টর দিকে ছুঁড়ে দেয়। মন্দাকিনী হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে। যে ছেলের কল্যাণে গলার হার, খোলা দরজায় সে-ও বেরিয়ে এসেছে। হার না হয়ে ঐ অমূল্যের মুণ্ডটা ছিঁড়ে নিলেও মন্দা বোধ করি এমন নিদারুণ কান্না কাঁদত না।

খরদৃষ্টি নফরকেষ্ট বলে, থান-কাপড়ের নিচে থেকে হাত দুটো বের করো দিকি বিধবাঠাকরুন।

হাতে কি বাবা?

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য হামেশাই যেমন বলে, সেই ধরনের কথা নফরার মুখে এসে গেল: হাত চিতিয়ে ধরো, ভাগ্যফল বলে দিই।

জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ—চেনহার গেছে, রুলিজোড়াও না যায়, সারাক্ষণ তাই হাত ঢেকে আছে। শনির দৃষ্টি এড়ায় না, উদ্যত ছোরার মুখে হাত বের করে ধরতে হয়। কতই যেন টানাটানি করছে রুলি খোলবার জন্য। কাতর চোখে চেয়ে বলে, খোলে না যে বাবা। কি করি—কি করব আমি এখন?

নির্বিকার নফরকেষ্ট সহজ উপায় বাতলে দিলঃ হাত টান-টান করে ধরো, পোঁছা পেড়ে কেটে দিই। টুকরো হাত ফেলে দিয়ে মাল নিয়ে নেবো।

তুষ্টুরাম যেন মুকিয়েই আছে। প্রস্তাব পড়তে না পড়তে মন্দার দুটো হাত সামনে টেনে ধরল—অর্থাৎ লাগাও পোঁচ এবারে। বলির মুখে পাঁঠা যেমন পাছড়ে ধরে কামারের মেলতুকের সামনে। আর নফরকেষ্টও পলকে চেহারা বদলে ভিন্ন এক মানুষ। রাঙা রাঙা চোখ দুটো আয়তনে ডবল হয়ে গেছে। বিঘূর্ণিত হচ্ছে। চাপা গর্জনে বলে, গলা দিয়ে টু-শব্দ বেরিয়েছে কি পোঁচটা হাতে না হয়ে গলায় উঠে যাবে।

অমূল্য পাথর হয়ে দেখছিল, তার দিকে কারো লক্ষ্য হয় নি। বালকের কচি গলায় হঠাৎ আকাশ-ফাটা কান্নাঃ ও মা, মাগো—

পাখির পাখনার মতো ছোট ছোট হাত দুটো মেলে উড়েই যেন এসে পড়ল নফরকেষ্ট আর মন্দার মাঝখানে। আকুল হয়ে বলছে, ও মা, পালাও। শিগগির পালিয়ে যাও, কাটবে!

কাজের ধান্দায় সাহেব কোন দিকে ছিল। তার সেই চিরকালের রোগ—মা-মা কান্নায় বুকের মধ্যে আর্তনাদ ওঠে। কত চেষ্টা করেছে, রোগ কিছুতে নিরাময় হল না। এত বড় মহাগুণী হয়েও যার জন্য বুড়ো বয়সে দুটো পেটের ভাতের জন্য বংশীর দুয়ারে পড়ে থাকতে হত। কোথায় ছিল সাহেব, পাগল হয়ে ছুটে এসে নফরাকে দিল বিষম এক ধাক্কা। মন্দাকিনী সেই ফাঁকে হাতের রুলি-সহ নির্বিঘ্নে দালানে গিয়ে দড়াম করে দরজায় হুড়কো এঁটে দিল।

কাজটা করে ফেলেই সাহেবের হুঁশ হয়েছে। অনুতাপ আর লজ্জায় মরে। মোক্ষম সময়টা ঝাঁপ দিয়ে পড়ে এত লোকসান ঘটিয়ে দিল, এমন লোকের মঠ-আশ্রম বানিয়ে পর-হিত করে বেড়ানোই উচিত—রাতের কাজে আসা ঝকমারি। যে না সে-ই এই কথা বলবে।

অপরাধ করেছে, প্রায়শ্চিত্তও সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বেছে নিল। অমূল্যটা বাইরে—বাঘ ছাগশিশুর উপর যেমন পড়ে, গর্জন করে তেমনি তার টুঁটি চেপে ধরে। মারছে—কিল-চড়-ঘুসি বৃষ্টিধারার মতো পড়ছে। লাথিও এক-একবার। কুক ছেড়ে অমূল্য কেঁদে ওঠে।

কাঁদ রে ছোঁড়া, যত পারিস কাঁদ। গলা ফাটিয়ে ফেল।

হিড়হিড় করে সাহেব দালানের কাছে টেনে নিয়ে যায়। ভিতরে মন্দাকিনী হুড়কো দিয়ে আছে। সেই মুখো হাঁক পাড়ছেঃ কালা নাকি গো ঠাকরুন? শুনতে পাও না, পিটছি তোমার ছেলে? কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাচ্ছি। ছেলে চাও তো গয়না খুলে ছুঁড়ে দাও।

অমূল্যও সমান তালে চেঁচাচ্ছেঃ ও মা, মেরে ফেলল আমায়—

কিছু নড়াচড়া যেন দালানের ভিতরে। আশায় আশায় সাহেব তাকায়। না—কিছুই না। দালানের কাছে চকিতের মতো এসে আবার সরে গেছে। অত

কাঁচা মেয়েমানুষ মন্দাঠাকরুন নয়।

ঘুমিলে পড়লে নাকি পাষণ্ডী মা ? সাড়া না পেয়ে সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে গালি গালাজ শুরু করে : মাগুলো এই রকমই। রাক্ষুসী ওরা সব—ছেলে মরে, নিজেরা গয়না ঝিকঝিকিয়ে ঘোরে। থুঃ-থুঃ—

পরের দিন নৌকোয় যাচ্ছিল সাহেব আর নফরকেষ্ট। সাহেবকে নফর-কেষ্ট টেনেটুনে নিয়ে চলেছে—ভাঁটি-অঞ্চলের পাট চুকিয়ে কালীঘাটের পুরানো জায়গায় নিয়ে তুলবে। সোনার বুলি বেহাত হওয়ার দুঃখ তখনো মনে খচখচ করছে। সেই কথা উঠে পড়ে। নফরা বলে, দয়াময় হয়ে দয়াটা দেখালি বটে! ধাড়ি মা'কে ছাড়িয়ে দিয়ে বাচ্চা ছেলের উপর মারধোর। বলিহারি বিচার তোর!

সাহেব হেসে বলে, তোমার যেমন ভোঁতা ছোরা, আমারও তেমনি ভোঁতা মার-ধোর। রেলের কামরায় বলাধিকারী আমায় মারলেন, সেই সময় কায়দাটা শিখে নিয়েছি। শিক্ষা সার্থক। ছেলেটা নিজেও ভাবল, ভয়ানক মার খাচ্ছে। ছেলে-মানুষের কথা না হয় বাদ দিলাম, কিন্তু তুমি হেন ঝানু মানুষটাও ভড়কে গিয়েছ। অথচ দেখ, মা বেটী কী পাজি—

বলতে বলতে সাহেবের কণ্ঠে যেন আগুন ধরে যায়। বলে, পেটের সন্তান মরে তো মরে যাক, নিজেদের গয়নাগাঁটি সুখ-শান্তি সম্মান-ইজ্জত বজায় থাকলেই হল। বাঘের বেলা বাপে বাচ্চা খায়, মানুষের বেলা মা—ঐ মন্দাঠাকরুনের মতো মায়েরা—

কোন এক নিষ্ঠুরা মা অবোধ শিশুর গলা টিপে একদিন জলে ছুঁড়ে দিয়ে-ছিল, মন্দাকিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাকেও খানিক গাল দিয়ে সাহেব মনের আক্রোশ মেটাল।

এ সমস্ত কথাবার্তা পরের দিনের—নফরা আর সে যখন ফুলহাটা থেকে সরে পড়ছে। আজকে এখন তো ধুন্দুমার রাখাল রায়ের বাড়ি। মারতে মারতে অমূল্যকে শুইয়ে ফেলল, তারস্বরে সে চেঁচাচ্ছে, তবু দেখ মা-জননীর প্রাণ গলে না। ঘুমিয়ে পড়ল নাকি আবার ?

এদিকে এই। তালপাতা কেটে রেখেছে গোয়াল ছাওয়ার জন্যে বোধহয়। একটা পাতা নড়ে উঠল। ঝড়-বাতাস নেই, গাছের উপরের পাতা নড়ে না, মাটিতে গাদাকরা শুকনো তালপাতার একটা নড়ে কেন ?

যা ভেবেছে তাই—মানুষ। রাখালপতি রায় ডোগো সমেত তালপাতা মাথায় চাপিয়ে বসে আছে। মুরুব্বি মানুষটাকে পাওয়া গেল এতক্ষণে।

তবে রে বুড়ো! আমরা হুড়হুড় করে মরি, তালপাতা মুড়ি দিয়ে মজা করে দেখছ তুমি ?

রাখাল বলে, হুঁ, মজা! কেন্নো আর শুয়োপোকা গায়ে কিলবিল করে ওঠে,

এর মধ্যে মজাই তো দেখবেন আপনারা! মার-গুতোন দেবেন না, যেমন যেমন হুকুম হয় করছি।

মারব না। বোনের যা সমস্ত গ্রাস করেছ, উগরে দাও। ফুল-বিল্বপত্রে তোমায় পুজো করে যাব।

সেই ঘটনা বুঝি? গরিবের বাড়ি সেইজন্যে পায়ের ধুলো পড়ল? বোনের ব্যবহারে রাখাল কত যে মর্মাহত, এই নিদারুণ বিপদের মধ্যেও গলার সুরে প্রকাশ পায়ঃ মন্দার জিনিস গ্রাস করবে, তত বড় মুখের হাঁ ত্রিভুবনে কারো নেই। বেকবুল যাচ্ছি নে মশায়রা, গেলেও তো মানবেন না। গচ্ছিত রেখেছে সামান্য কিছু—নিতান্তই যৎসামান্য।

অধৈর্য নফরকেষ্ট খাপের ছোরা ধাঁ করে খুলে রাখালের সামনে একপাক ঘুরিয়ে বলে, ধানাই-পানাই ছেড়ে কোথায় কি আছে বের করে দাও। বের করো শিগগির, নয় তো গলা কাটব।

রাখাল বলে, গলা কেটে কিছু পাবেন না মশায়রা, গলার মধ্যে নেই, যথাধর্ম বলছি। আসুন—

আগে আগে গিয়ে গোলার দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে গেল। তুষ্টুর হাতে কয়েকটা মশাল—নারকেল-তেলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে কাঠির মাথায় জড়ানো। এই বস্তুও সরঞ্জামের মধ্যে পড়ে। চুরির কাজে তেমন না হলেও ডাকাতিতে একেবারে অত্যাজ্য। অধিক আলোর প্রয়োজনে মশাল জ্বালাতে হয়। মানুষের গায়ে গুঁজে ধরে ভয় দেখিয়ে এই তুষ্টুরামই খোঁজ আদায় করেছিল একবার। খড়ের চালের উপর জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়ে দিয়ে গৃহস্থকে সেই দিকে ব্যস্ত রেখে রাতের কুটুমরা পালিয়েছে, এমন দৃষ্টান্তও আছে অনেক।

চালের কাছাকাছি হাত দেড়েক মাপের চৌখুপি দরজা। একটা মশাল জেবলে তুষ্টুরাম ভিটের উপর উঠে দরজার মুখে ধরে। গোলার গলায় গলায় ধান। ধানের ভিতর রাখাল হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

অধীর হয়ে তুষ্টু তাড়া দিয়ে ওঠেঃ হল কী?

রাখাল সকাতরে বলে, আছে বাবা, মিছে কথা বলিনি। রাত্তিরবেলা চোখে ঠাহর হয় না তেমন—

কোথায় ছিল সাহেব, গোলার ভিতর তুষ্টুর পাশে উঠে পড়েছে। তুষ্টুকে বলে, মশাল উঁচু করে ধরো। মুরুব্বিমশায় ঠাহর করতে পারছে না, খুঁজে দিয়ে আসি।

হাত বাড়িয়ে বাধা দিতে যায় তুষ্টু। ঐ তো সংকীর্ণ একটুকু দরজা—ইঁদুরের বাক্সকলে যাওয়ার মতো হচ্ছে। সাহেব গ্রাহ্যও করে না, ফুড়ুত করে ঢুকে গেল। বলে, ভাঁওতা দিচ্ছ না তো? টাকাকড়ি ধানের গোলায় কেন রাখলে?

রাখাল বলে, সেরেসুরে রাখতে হয় বাবা। সিন্দুকে রাখা যায় না আপনাদের

দশজনার ভয়ে।

বলেই বুঝি খেয়াল হল, নিন্দেমন্দ হয়ে গেল এদের। তাড়াতাড়ি সামলে নেয়ঃ দশজনা বলতে তো সবাই—আপন-পরে তফাত নেই। অন্যের কথা কি—নিজের ছেলেটা পর্যন্ত। কোন্‌খানে কি রেখেছি, শুঁকে শুঁকে বেড়ায়। ঝগড়া-কচকচি ঠেঙাঠেঙি—জন্মদাতা পিতা বলে রেয়াত করে না। তিতবিরক্ত হয়ে গেলাম বাবা। আপনারা নিয়ে চলে যান, এর পরে হারামজাদা ছেলে অত্যাচারের ছুতো পাবে না।

দু-জনের চারখানা হাত মিলে ধান হাতড়াচ্ছে। বিড়বিড় করে সাহেব সর্বক্ষণ শাসায়ঃ মিছে খাটনি যদি খাটাও, ধানের নিচে জ্যান্ত গোর দিয়ে যাব। নয় তো গোলার দরজায় তালা আটকে মশালের আগুন ধরিয়ে দেবো বাইরে থেকে।

না বাবা, মিথ্যে নয়—। বলছে আর দ্রুত হাতে ধান ঠেলে গর্ত করছে এদিক-সেদিক। সন্দিগ্ধভাবে বলে, বারো আঙুল এক বিঘতের ভিতরেই থাকবার কথা। শয়তানের বেটা শয়তান ঐ নিশিটা কিছু করল নাকি? তাই বা কেমন করে—গোলার চাবি সর্বক্ষণ আমি কোমরে নিয়ে ঘুরি।

না, মানুষটা সত্যবাদী। ধান হাতড়াতে হাতড়াতে ন্যাকড়ার বল অবশেষে হাতে ঠেকে। খানিকটা ন্যাকড়া গোল করে পাকিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা—দড়ি ধানের নিচে গভীর দেশে চলে গেছে। নিশানা এই বল—দড়ি ধরে ধান সরাতে সরাতে চলে যাও গোলার তলার দিকে। রাখাল আর সাহেব তাই করছে। দড়ির শেষ বেরিয়ে গেল, পিতলের ঘটির কানার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা। দড়ি টেনে ঘটি উপরের দিকে আনে। কী ভারী!

ঘটির মধ্যে কি ভরেছ বুড়ো—লোহালক্কড়?

ঘটির মুখ-বাঁধা। খুলে দেখা যায়, কাঁচা-টাকা আধুলী সিকি দুয়ানি আনি এবং পয়সা। তাই এত ভার। রাখাল কৈফিয়ৎ দেয়ঃ কাগুজে নোট হাতে এলেই ভাঙিয়ে ফেলি। স্বদেশিবাবুরা সাহেবদের থাকতে দেবে না। তাদের নোটের কাগজে তখন ঘুঁড়ি বানিয়ে ছেলেপুলেরা ওড়াবে।

মাথায় জড়ানো গামছাটা খুলে সাহেব ঘটির বস্তু ঢালছে। কোমরে বেঁধে নেবে। দস্তুর এই। কাজের মধ্যে কখন কি দশা—হয়তো জল ঝাঁপাতে হল, হয়তো বা গাছের মাথায় চড়ে বসতে হল। মাল দেহের সঙ্গে আঁটা রইল—মানুষ বজায় থাকে তো মালও থাকবে।

গামছায় বাঁধতে বাঁধতে বিরক্তি ভরে সাহেব বলে, আধ-পয়সা পাই-পয়সা রাখনি যে বড়?

তুচ্ছ কথা রাখালের কানে যায় না। সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে বলে, হাড় বজ্জাত আমার ঐ বোন। দালান সারানো দেখিয়ে বিহুর ভুজুং ভাজাং দিয়ে সামান্য কিছু বের করেছি। চেটেপুঁছে নিয়ে যেও না বাবা, কিছু প্রসাদী রেখে যাও।

হেন অবস্থার মধ্যেও সাহেবের হাসি পেয়ে যায়। বলল, প্রসাদী নিলে তো বিপদ। ছেলে ঠেঙানি জুড়বে। জন্মদাতা পিতা বলে খাতির করবে না।

জানতে দিলে তো? সে জেনে রইল, সবই আপনারা নিয়েথুয়ে গেছেন। কিছু যদি দয়া করে যান, সে জিনিস আমি জীবন থাকতে বের করব না। মরার সময়েও না।

খানিকটা নরম হয়েছে অনুমান করে রাখাল পুনশ্চ বলে, দয়া কিছু হবে দয়াময়?

সহসা তীক্ষ্ম ভয়াল চিৎকার পাঁচিলের বাইরেঃ মাছি ঘন—। পাহারাদার বংশী হাঁক পেড়ে সকলকে জানান দিচ্ছেঃ

মাছি ঘন, মাছি ঘন—

গোলার দরজার মুখে তুষ্টুরাম মশাল ধরে আছে, মশাল মাটিতে ছুঁড়ে দিল। নেভে না। কুড়িয়ে নিয়ে বাইরের কলসিতে ঢুকিয়ে দেয়। অন্ধকার। উঠানে তবু একটু চিকচিকানি, গোলার ভিতরে একেবারে নীরন্ধ্র।

সেই অন্ধকারের মধ্যে সাহেব দেখে, রাখালের কোটরগত চোখের মণি দপ্ করে জ্বলে উঠল। ধানের গাদার উপরে টলতে টলতে গিয়ে গোলার সংকীর্ণ দরজা আটকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সাহেবের কোমরের গামছা টেনে খসানোর জন্য। দন্তহীন মাড়ি মেলে উৎকট হাসি হাসছে।

বলা নেই কওয়া নেই, সাহেব দু-হাতে দু-মুঠো ধান নিয়ে রাখালের চোখ নিরিখ করে মারল। এই নিয়ম—একেবারে যা ভাবে নি তাই করতে হয়। হকচকিয়ে যায় মানুষ। ঘোর কাটিয়ে সুস্থির হয়ে রাখাল আবার ধরতে যাবে তার আগে সাহেব লাফ দিয়ে পড়েছে। পুরানো বাতিল ইটের গাদা সেখানটা, তার উপরে গিয়ে পড়ল। হাঁটুতে বিষম লেগেছে, ছড়ে গেছে খানিকটা, উঠে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু দাঁড়ানো তো নয়, হাঁটাও নয়--ছুটতে হল সেই অবস্থায়।

ধর্, ধর্—পালিয়ে যায়।

তিলকপুরের মানুষ হৈ-হৈ করে ছুটছে। ডাকাত পড়েছে রাখাল রায়ের বাড়ি। হুড়কোর বাঁশ লাঠি টর্চ হেরিকেন দা-কুড়াল যা পেয়েছে, হাতে তুলে নিয়েছে। রাখালের ছেলে নিশি বংশীর চোখ এড়িয়ে কোন্ ফাঁকে পাড়ায় বেরিয়ে খবর দিয়েছে। বড় ভাগ্য, বন্দুক দুটো চলে গেছে ফুলহাটায়। বলাধিকারীর কতখানি দূরদৃষ্টি, আর একবার তার পরিচয় হল। সকলের দুটো করে চোখ, তাঁর বোধ হয় অদৃশ্য তৃতীয় নেত্র কপালের উপর—আগেভাগে সমস্ত দেখতে পান। তুষ্টুরামও খানিকটা ভেবে এসেছে বিপদআপদের কথা। মশাল এনেছে, আবার দেখা গেল পটকাও আছে কয়েকটা গামছার ঝুলিতে। গোটা-দুই ছেড়ে দিল পর পর। পাঁচিলের দরজা পর্যন্ত যারা এসে পড়েছিল,

দুড়দাড় করে তারা পিছিয়ে যায়। অন্য কেউ না হোক, তুষ্টুরাম বেরুতে পারত এই ফাঁকে। কিন্তু হঠাৎ এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল।

মানুষ দেখে সাহস পেয়ে মন্দাকিনী এইবারে দালান থেকে বেরুল। মায়ের কর্তব্যবোধ চাড়া দিয়ে উঠেছে। গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে: আমার অমূল্যকে মেরে ফেলল গো, সর্বস্ব লুটেপুটে নিল।

জালুয়ার তলার কালি তেলের সঙ্গে মিশিয়ে তুষ্টুরাম সারা মুখে মেখেছে। চোখদুটো পিটপিট করছে তার ভিতর। পাগড়ির মতো করে মাথায় উড়ানি জড়িয়েছে মুখের অনেকটা ঢেকে দিয়ে। এমনি সাজ মোটামুটি সকলেরই। মুখোস না নিলেও চেহারা কিম্ভূতকিমাকার করতে হয়, চোখে দেখে যাতে কেউ চিনে ফেলতে না পারে।

মনিবঠাকরুনের মারমূর্তি দেখে কী রকম যেন হল—চনচন করে রক্ত চড়ে গেল মাথায়। দু-একটা পটকা তখনো ঝুলিতে—কিন্তু পালানোর কথা ভুলে উল্টোমুখো রোয়াকের উপর লাফিয়ে উঠে মন্দাকিনীর চুলের ঝুঁটি ধরল।

কেমন লাগে?

বলে ফেলেই মনে মনে জিভ কাটল। সর্বনাশ, কথা বলে ফেলেছে, রাগের বশে সেই মুহূর্তে কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। লোক অচেনা হলে দায়ে-বেদায়ে এক-আধটা কথা বললেও বলতে পার গলায় ভিন্ন আওয়াজ তুলে। চেনা মানুষের কাছে একেবারেই বোবা। পুরানো লোক হয়ে তুষ্টুরাম এত বড় বেকুবি করে বসল। রাগ না চণ্ডাল—স্বর বিকৃত করে বলতে হয়, রাগের বশে সে খেয়ালও ছিল না।

চুলের মুঠি ছেড়ে সাঁ করে সে ছুটল। যাবে কোথা, বেরুবার পথ নেই। মন্দাকিনী ওদিকে চেঁচামেচি করছে: তুষ্টু, তুই—তোর এই কাজ? নুন খেয়ে এত বড় নেমকহারামি—হায় কলির ধর্ম!

একবার এদিক একবার সেদিক তুষ্টুরাম ছুটাছুটি করছে। আর গাল চড়াচ্ছে শতেক বার। পাঁচিল ঘেরা বাড়ি—পিছন দিকে খিড়কির দরজা, সেদিকেও মানুষ জমেছে। কেলেঙ্কারি আজকে। নফরকেষ্ট দিয়ে শুরু—চুরি করতে এসে ডাকাত হতে হল। তুষ্টুরাম তার উপরে পরিচয়টা পরিষ্কার জানান দিয়ে দিল। ঘিরে ফেলেছে, দলসুদ্ধ লোপাট হবার দশা।

নতুন মানুষ সাহেব ওদিকে কী বুদ্ধি করেছে—দেখ, তাকিয়ে—দেখ একবার। পাঁচিলের উপর রাজমিস্ত্রিদের ভারা, পিলপিল করে তার উপরে উঠে পড়ল। ওঠার কায়দাও চেয়ে দেখবার মতো। গাছে ওঠা দেয়ালে ওঠা ঘরের চালে ওঠা—কারিগর-সমাজে কথা চলিত আছে, মাটির উপরে পায়ে হেঁটে চলাচল করো, ঐ সমস্ত জায়গায় কানে হেঁটে উঠতে হবে। সাহেব সেই কায়দায় উঠে পড়ল টিকটিকি কাঠবিড়ালি যেমন উঠে যায়। মানুষ জমে গিয়ে লোকারণ্য সামনেটায়। সকলের মাথা ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে সাহেব, সকলের চোখের

উপর। তারায় আবছা অলোয় মুখ চেনা যায় না, কিন্তু তাল-নারিকেলের মতোই খাড়া মানুষটা দেখা যাচ্ছে। দূরের দিকে যারা আছে, সাহেব সকলকে ডাকছে গলা ফাটিয়েঃ চলে এসো, কাছে এসে শোন সবলে, দলের জমাদার আমি বলছি—

গামছায় বাঁধা টাকাপয়সা কোমর থেকে খুলে হাতে নিয়েছে। বলাবলি কিছু নয়—সাহেব একমুঠো নিয়ে ছুঁড়ে দিল মানুষজনের দিকে। গোড়ায় হকচকিয়ে গিয়েছিল—কুড়ানোর জন্য তারপরে ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি। যত লোক এদিক-সেদিক ছিল, রে-রে করে ছুটেছে পাঁচিলের গায়ের ভারা এবং ভারার উপরের মানুষটা নিরিখ করে। কুড়ানো শেষ হয়ে যায়, সাহেব তত আবার মুঠো মুঠো ছড়ায়। টর্চের আলো ফেলছে, হেরিকেন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে—ডাকাত যে এক এক করে চোখের উপর দিয়ে পালাচ্ছে সেদিকে নয়। ঘাস-বনের মধ্যে টাকাপয়সা পড়েছে, আলো নিয়ে তাই খুঁজছে। হরির-লুটের মতো এক এক মুঠো ছড়িয়ে দেয়, আর নজর ফেলে দেখে নেয়—বেরিয়ে পড়ল কিনা সকলে, গেলই বা কতদূর।

কথা বলে ওঠে আবার। কণ্ঠ একেবারে আলাদা—সাহেব নয়, ভিন্ন এক মানুষ বলছে যেন। রীতিমতো এক বক্তৃতা। বলে, চোরের সেরা চোর রাখাল রায়। কুটুম্ববাড়ির সর্বস্ব মেরে এনেছে। বোন-ভাগনেকে পথে তুলে দেবে দু-দিন বাদে। পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যাচ্ছে, সকলে মিলে ভাগযোগ করে খাব। তবে কেন তোমরা পিছনে লাগতে এসেছ?

কানে শুনে যাচ্ছে এই পর্যন্ত। ঘাড় তুলে তাকানোর ফুরসত কোথা? নিজ নিজ কর্মে সকলে ব্যস্ত। তাড়াতাড়ি কে কত কুড়িয়ে তুলতে পারে। একজন চেঁচিয়ে ওঠেঃ আমার কপালে শুধুই পয়সা—তামার উপরে উঠতে পারলাম না। মোটা মোটা মাল ছাড় দিকি ভাই, লম্বা হাত করে ফেল। রাত্রে চোখে কম দেখি —সাফাই জায়গায় ছুঁড়ে দাও।

যেমন ইচ্ছে বলুক, সাহেবের হাতের মাপ আছে। ছড়াচ্ছে অল্প অল্প করে ভিতরে-উঠানের দিকে তীক্ষ্ম নজর রেখে। তুষ্টুরাম বেরিয়ে পড়েছে। নফর-কেষ্টও বেরুল নিঃশব্দ একটি ছায়ার মতন। মন্দাকিনী আর রাখাল যেন ওদিকে পাল্লা দিয়ে চেঁচাচ্ছেঃ পালিয়ে যায়, ধরো ধরো, বেড় দিয়ে ধরে ফেল।

কেবা শোনে কার কথা! গৃহস্থবাড়ি কুকুরের মুখে এক এক কুচি মাংস ছুঁড়ে যাবার নিয়ম, যতক্ষণ না চোরের কাজ হাসিল হয়। মানুষের বেলাতেও সাহেব সেই নিয়ম খাটিয়ে যাচ্ছে!

বাইরের ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ নিশিকে দেখে রাখাল গর্জন করে উঠলঃ তুই হারামজাদা সকলের সঙ্গে পয়সা কুড়োতে লেগেছিস—লজ্জা করে না?

নিশিও সমান তেজে বাপের কথার জবাব দেয়ঃ বলি, পাড়ার মানুষ জুটিয়ে আনল কে? সকলে ভাগ কুড়াচ্ছে, আমি বুঝি বোকা হয়ে হাত গুটিয়ে থাকব?

যুক্তি অমোঘ। বয়স এবং লজ্জায় না বাধলে—কী জানি, রাখালও হয়তো গিয়ে পড়ত। কিন্তু গুরুপদ মানুষটার কী হল বল দেখি। সর্দার হয়ে কাজের মধ্যে শুধু করেছে—দুর্বল বৃদ্ধ রাখালের আগাপাস্তালা লোহা পেটানো। গণ্ডগোল জেঁকে উঠবার পর আর তাকে দেখা যায়নি। হয়তো বা সে-ও তালপাতা মুড়ি দিয়ে পড়েছে কোথায়। সাহেব এদিকে পালাবার পথ খালি করে দিয়েছে, বুঝতে পারেনি দলের সর্দার।

অধীর হয়ে সাহেব স্পষ্টাস্পষ্টি ইঙ্গিত দিয়ে চেঁচায়ঃ জাল গুটাও সর্দার, জাল গুটাও। এক্ষুনি—

সর্বত্র নজর হানা দিয়ে অবশেষে দেখতে পায়, পাঁচিলের একেবারে গা ঘেঁসে দুই হাত দুই পায়ে হামাগুঁড়ি দিয়ে টিপিটিপি চলেছে একটা প্রাণী। গুরুপদ সন্দেহ নেই, পচা বাইটার সাগরেদ বলে যার দেমাক।

মজা-নদীর ধারে কসাড় জঙ্গল—এই বড় সুবিধা। ছুটোছুটি করে কোন রকমে জঙ্গলে গিয়ে পড়তে পারলে হয়। তাক বুঝে তারপর গ্রাম ছেড়ে মাঠে নামবে। ভারার উপরে দাঁড়িয়ে সাহেব দেখতে পাচ্ছে, তীরবেগে ছুটেছে ছায়াগুলো। অদৃশ্য হয়ে গেল। এইবারে তার নিজের—বাঁশ বেয়ে সড়াক করে মাটির উপর যেন পিছলে পড়ল। পড়বি তো পড়—একেবারে পয়সা-কুড়ানো দলটার মধ্যে। দু-একজন চোখও একটু তুলেছে—তাদের সেই চোখের সামনে গামছার অবশিষ্ট টাকাপয়সা দুই হাতে দু-দিক দিয়ে ছুঁড়ে দেয়। চোখগুলো সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ে আবার। পলক ফেলতে যেটুকু সময় সাহেব আর নেই।

আরও পরে এক সময় জনতার হুঁশ হল। কুড়ানো প্রায় শেষ তখন। কর্তব্য-বুদ্ধির তাড়ায় এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেঃ এই যাঃ, গেল কোনদিকে রে?

কেউ উত্তর দিক দেখায়, কেউ বলে দক্ষিণে। নজর তখনো মাটিতে—শেষ পয়সাগুলো খুঁটে নিচ্ছে। এইটুকু হয়ে গেলে কোমর বেঁধে লাগবে। আচমকা সকলের মাঝখানে এমনভাবে নেমে পড়বে, কে ভাবতে পেরেছে?

রাত ঝিমঝিম করছে। শিয়াল ডেকে উঠল বহু দূরে। বার বার তিনবার। তারপর এদিকে সেদিকে আরও শিয়ালের ডাক। মজা-নদীর ধারে জঙ্গলের ভিতর থেকেও যেন ডাকল কয়েকবার। সব শিয়ালের এক রা, ধুয়া একবার উঠে গেলেই হল। প্রথম তিন ডাক মাঠ-পারের তেঁতুলতলা থেকে। ডাকের আন্দাজ নিয়ে নানান দিক থেকে অন্য শিয়াল সেই তেঁতুলতলায় জুটেছে। ডেকেছে শিয়াল নয় বংশী—পশুপাখির ডাকে যে ওস্তাদ। ছুটেছেও শিয়াল নয়, দলের অন্য চারজন। পালানোর মুখে যে যেখানে পারে আশ্রয় নিয়েছিল, পাহারাদার বংশী আবার সকলকে একত্র করেছে। নিয়ম এই। [নিয়মটা বড় বেশি চাউর হয়ে যাবার পর হালে কিছু কিছু নতুন নিয়ম চালু হচ্ছে। একটা হল, শিয়াল ডাকার বদলে গাছের মাথায় চড়ে আকাশমুখো টর্চ জেলে

ধরা। চোর খুঁজতে যারা বেরিয়েছে, তারা মাটিতে খোজাখুঁজি করে, আকাশে তাকায় না। দলের লোকেই শুধু নজর তুলে দেখবে কোন্ দিকে আলো।]

মজা-নদীর কিনারা থেকে শেয়াল ডেকে সাহেব বংশীর জবাব দিয়েছে। ঠিক তার পনের-বিশ হাতের মধ্যে একই সঙ্গে আর একজনের ডাক। তুণ্টুরাম। এত কাছাকাছি, কিন্তু অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখেনি। ডাকের আন্দাজে সাহেব গিয়ে তার হাত ধরল।

চলো তুণ্টু—

তুণ্টুরামের দুঃখ হয়েছে। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, আমি যাব না। যেদিকে দু-চোখ যায়, বেরিয়ে পড়ব। কোন্ মুখে বলাধিকারী মশায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াই? আনাড়ি কাঁচালোক বুঝতে পেরেই তাঁর অমত ছিল। যা-কিছু তুমি তো একলাই করলে সাহেব। পাঁচিলের মধ্যে বেড় দিয়ে ফেলেছিল, তুমি বাঁচালে। বেঁচে গেছি, তাও বলা যায় না। সর্বনাশটা আমিই করলাম। চিনে ফেলেছে, হনুমানের লেজের আগুন সহজে ওরা নিভতে দেবে না।

বলতে বলতে তুণ্টু কেঁদে ফেলে। জোয়ান মানুষটার কান্না দেখে সাহেবের কষ্ট হয়। তিরস্কার মুখে আসে না, তুণ্টুর গলা জড়িয়ে ধরল। বলে, ভাবনা কিসের, বলাধিকারী আছেন কেন তবে? বাহাদুরি বটে তোমার তুণ্টুরাম! টাকাপয়সার মুনাফা আজকে কাণাকড়িও নয়, কিন্তু মস্তবড় মুনাফার কাজ তুমি করে এলে। মন্দাঠাকরুনকে থাপ্পড় কষিয়ে এলে। মানুষকে শেয়াল কুকুরের মতো ইট মেরেছিল, তার পাল্টা শোধ। মরদমানুষের কাজই তো এই। শোধ এমনি নিজের হাতে দিতে হয়—বড়লোকের আদালতে বড়লোকদের কিছু হয় না। মুখের ঐ রেখাটুকু—কী করবে, চাপতে পারো নি, আপনি এসে গেল। আমরা হলাম মুখ্যুসুখ্যু চোর-ছ্যাঁচোড় মানুষ—মনে একরকম মুখে অন্য পেরে উঠিনে। সেসব ভালোরা পারে।

যেতে যেতে আবার বলে, মা বটে দেখলাম। মা-নামে ঘেন্না ধরিয়ে দিল। মা নয়, মেয়েলোকই নয় ওর চোদ্দপুরুষে। ডাকিনী বাঘিনী হাকিনী—মায়া করে মেয়েলোকের রূপ ধারণ করেছে।

সান্ত্বনা দিতে দিতে তুণ্টুর গলা জড়িয়ে তেঁতুলতলা নিরিখ করে চলল। সেখানে রৈ-রৈ পড়ে গেছে। বংশীকে দুষছে: নিশি রায় বেরিয়ে গিয়ে লোক জুটিয়ে আনল, কিচ্ছু জানো না—চোখ বুঁজে পাহারা দিচ্ছিলে নাকি? রাগটা কিন্তু নফরকেষ্টর উপরেই সকলের বেশি। এই মারে তো সেই মারে: কাঠ-গোঁয়ার একটা। গোড়াতেই কাঁচিয়ে দিলে। এ কাজে বুদ্ধি লাগে। সে জিনিস এক-ফোঁটাও নেই মাথার মধ্যে—ঝুড়িখানেক গোবর।

হাত বেড় দিয়ে সাহেব নফরকে ঠেকায়। সর্দার হিসাবে গুরুপদর কণ্ঠ বেশি প্রবল, তার উপরে সাহেব খিঁচিয়ে উঠল: সবচেয়ে বড় দোষ তোমারই। দেয়াল কাটার জন্য কাঠি, তাই দিয়ে মানুষ ঠেঙাতে লাগলে। কাঠি কেড়ে

নেবার জন্য হাত নিশপিশ করছিল—সর্দার বলে মান্য দিয়ে বসেছি, তাই পারলাম না। বুড়োমানুষটাকে অমন করে মারলে, কী দোষ করেছে শুনি ?

গুরুপদ নির্বিকার কণ্ঠে বলে, দোষ না করুক, টাকা করেছে। সেইজন্য মারি। এদ্দিন ছিল না, ডাকাত কেন—একটা ছিঁচকে-চোরও ওর বাড়ি থুতু ফেলতে যেত না।

কারো মন ভাল নেই। তোড়জোড় করে এসে ডাহা বেকুব হয়ে ফেরা। কতদূর যে গড়াবে, তা-ও বলা যাচ্ছে না। বিরক্ত সুরে বংশী এর মধ্যে বলে, চিরকালের নিয়মই তো চলছে—নতুনটা কি হল ? ডাকাত মক্কেল ঠেঙায়, মনিব চাকর ঠেঙায়, জমিদার রায়ত ঠেঙায়, মাস্টার ছাত্র ঠেঙায়, বর বউ ঠেঙায়, বাপ-মা ছেলে ঠেঙায়। তুমি আমাদের এক দয়ারাম গোঁসাই—পিঁপড়ে মেরো না। ছারপোকা মেরো না, মশা মেরো না ঃ ছোটমামা ঠিকই ধরেছিল—ভাবের মানুষ তুমি, ভক্ত মানুষ। ঐ লাইনে যাও। চেহারাখানা আছে, হবে দু-চার পয়সা।

গুরুপদ বলে, আজেবাজে কথা ছেড়ে কোন্‌খানে গিয়ে উঠছি সেইটে ভাবো দিকি এখন। বলাধিকারী মশায়ের ফিষ্টির জের এখনো বোধহয় চলছে, বন্দুক নিয়ে অবিনাশ সামন্ত মোতায়েন আছে। সেখানে জুত হবে না। খালি হাতে মহাজনের কাছে যাবই বা কোন লজ্জায় ? ঘরবাড়ি ছেড়ে কদ্দিন ধরে পড়ে আছি—আমি এই ডাইনের পথ ধরলাম।

ডাইনে মোড় নিয়ে গুরুপদ ঘরমুখো হল। সর্দার হিসাবে বিদেশি মানুষ সাহেব ও নফরার উপর কিছু উপদেশ ছেড়ে যায় ঃ তোমাদের কে চেনে, তোমরা সরে পড়ে এইবেলা। যদি দেখ হাঙ্গামাহুজ্জুত হল না, নতুন মরসুমে কাজ ধরতে এসো। একলা তুমিই এসো সাহেব—নফর যেন না আসে, ওকে দিয়ে কাজ হবে না।

তুষ্টুরাম বলে, আমিও চললাম—

বংশী অভয় দিচ্ছে ঃ ঘাবড়াস কেন তুষ্টু ? সদর হল বিশ ক্রোশ পথ। গাঙখাল ঝাঁপিয়ে সদরের আইনকানুন এতখানি পথ পেঁছিয় না। তা যদি হত, আমার দাদামশায় অতকাল ধরে রাজত্ব করতে পারতেন না। যা-কিছু করেন দারোগাবাবু—কত দূর কি করবেন, তারও হদিস পাওয়া যাবে বলাধিকারী মশায়ের কাছ থেকে।

সাহেব বলে, ভয় নয় তুষ্টুরামের, লজ্জা। কিন্তু লজ্জার কি হল ? জোয়ান-মরদের যা করা উচিত, তুষ্টু সেইরকম করেছে। ঠাকরুন থাপ্পড়টা খেল, মানুষটা কে জানতে পারবে না—এই বা কোন বিচার ? আমি বলি, বেশ করেছ তুমি তুষ্টু।

তুষ্টুরামের কোন কিছুই যেন কানে যায় না। থপথপ করে চলেছে। নিজের মনে বলে ওঠে, কাঠ কাটতে সব বাদাবনে যাচ্ছে। কাঠুরে হয়ে একটা নৌকায়

উঠে পড়ি। বড়-শিয়ালে মুখে করে নেয় তো আপদ চোকে।

বড়-শিয়াল অর্থাৎ বাঘ। কাজে হেরে অবসাদে এখন ভেঙে পড়েছে। বাঘের মুখে যেতেও রাজি। হারাধনের ছেলেগুলোর মতো দলের লোক যে যার পথে সরে পড়েছে।

কেবল বংশী দেমাক করেঃ আমার ঘর আছে, বউ আছে, ছেলে আছে। আমি কোন চুলোয় যেতে যাব? কী দরকার! মক্কেলের বাড়িতেই ঢুকি নি, কেউ দেখে নি, নিশানদিহি হবে না আমার।

বলছে, বউ জানে সোনাখালি মামার বাড়ি গেছি। মামার বাড়িই তো ছিলাম এতক্ষণ। গণ্ডগোল বুঝলে বড়মামা নিজে গিয়ে হলফ পড়ে সাক্ষি দেবে।

অতএব বংশীও নিজের বাড়ি সংগৃহস্থ হতে চলল।

সাহেব আর নফরকেষ্ট দুজনে এইবার খালের মোহানায় এসে গেছে। জঙ্গলের ভিতর থেকে কুঠিবাড়ির ছাত অস্পষ্ট দেখা যায়।

নফরকেষ্ট হঠাৎ সাহেবের হাত এঁটে ধরেঃ ওদিকে নয় রে, আমরাও বাড়ি চলি।

সাহেব অবাক হয়ে বলে, আমাদের আবার বাড়ি!

হঁ্যা রে, হঁ্যা। বস্তি জায়গা, খারাপ মেয়েমানুষের বাস। কিন্তু বাড়ি আমাদের ভাল। টাকা থাকলে ভালবাসা, দয়ামায়া উপে গিয়ে টাকাটাই সকলের বড় হয়ে যায়। ভাগ্যিস টাকা নেই। সেজন্যে, দেখলি তো, মন্দাঠাকরুন মা আবার সুধামুখীও মা।

সুখামুখীর কথায় গদগদ হয়ে ওঠেঃ দুটো নাম এক সঙ্গে তুলতে ঘেন্না করে। সুধামুখী হল জাত মা। গর্ভের মেয়েটাকে নুন খাইয়ে মেরেছিল, গড়াতে গড়াতে শেষটা ঐ বস্তি-বাড়িতে উঠল। সন্তান-শোকে লোকে পাগল হয়ে যায়, সুধামুখীও তাই। সাহেব, তুই কোনদিন তাকে ছাড়িস নে।

বলতে বলতে কণ্ঠ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে দস্যু-মানুষটার। বলে, কালীঘাটে ফিরে যাই আবার। শহরের মানুষ শহুরে কাজের ধাঁচ বুঝি। নোনাজল, ধানবন, বাদার-জঙ্গল আমাদের ধাতস্থ হয় না। তার উপরে গুরুপদ যা বলে গেল, সেটাও ভাবতে হবে বই কি। এক্ষুনি এই পথে সরে পড়ি।

সাহেব গোঁ ধরে বলে, তুমি যাও, আমি থাকব।

নফরকেষ্টরও জেদঃ তোমায় রেখে কক্ষনো আমি যাব না। মায়ের ছেলেটা নিয়ে চলে এসেছি, সুধামুখীর হাতে হাতে হাজির করে দিয়ে তবে খালাস। তাই-ই বা কেন? আমার নিজেরও বুঝি দাবি থাকতে পারে না তোর উপর!

বিস্তর দিন দেশ-ছাড়া, শহর মন টেনেছে, সেখানে কল টিপলে আলো, কল ঘোরালে জল, রাতদুপুরে সুধামুখীর গালিগালাজ। সেখানে পথের মোড়ে হঠাৎ সহোদর ভাই ও সুন্দরী বউ বাঘ হয়ে দেখা দেয়। নফরাকে আর আটকে

রাখা যাবে না।

গতিক বুঝে সাহেব চুপ করে যায়। নদীর কূল ধরে চুপচাপ দু-জনে অনেকটা দূরে চলে গেল।

সাহেব বলে, হেঁটে হেঁটেই কালীঘাট চললে?

যাই তো গাবতলী অবধি। সেখানে গয়নার নৌকো পেয়ে যাবো।

কিন্তু অদৃষ্ট ভাল, নৌকো আগেই পেয়ে গেল। চরের উপর কাদার মধ্যে নেমে নফরকেষ্ট হাত তুলেছে, নৌকোর লোকই তখন চেঁচায়ঃ খুলনা যাবে তো উঠে এসো। দুই টাকা দু-জনার। যাক, গে যাক, দেড় টাকা দিও। পাইকারি দর।

সাক্ষির দল নিয়ে খুলনার সদরে মামলা করতে যাচ্ছে কাছারির গোমস্তা। যাচ্ছে জমিদারের খরচায়, এই দেড় টাকা উপরি রোজগার। গরজটা সেইজন্য।

বলে, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো। টানির মুখে নৌকো রাখা যায় না। পা ঝুলিয়ে বসো। ভাল ভাল মহাশয়-ব্যক্তিরা যাচ্ছেন। গাঙের জলে ভাল করে ধুয়ে তারপরে পা তুলবে। তোমরা যাবে কদ্দূর?

কলকাতা শহর। খুলনা থেকে রেলের টিকিট কাটব।

কী করা হয় মহাশয়দের?

নফরকেষ্ট বলে, ছুরি-কাঁচির কারবার।

পাঁচ

জোয়ার ধরে নৌকো তরতর করে চলল। মোকদ্দমায় সাক্ষি দিতে যাচ্ছে, এখন তো প্রতিজনে এক-এক লাটসাহেব। যতক্ষণ না কাঠগড়ায় উঠে তাদের কথাগুলো বলা হয়ে যাচ্ছে। পরক্ষণে এই গোমস্তা মশায়ই তাদের চিনতে পারবে না। সাক্ষিরা বোঝে সেটা বিলক্ষণ। মুহূর্তকাল স্থির হয়ে বসতে দিচ্ছে না। তামাক হয়ে গেল তো পান, পান হল তো আবার তামাক। গোমস্তা নিজ হাতে সেজে সেজে এগিয়ে ধরে। মুখে অবিরত খোশামুদি ও রসিকতার কথা। সাক্ষিদের দাঁত একটু যদি ঝিকঝিক করল, গোমস্তা অমনি ফেটে পড়ে হাসিতে। নৌকোর ছইয়ের নিচে এমনি সব চলছে।

সাহেবেরা শেষ প্রান্তে কাড়ালের উপর। সবুর সইছে না নফরকেষ্টর ঃ পোড়া আবাদ রাজ্যের এলাকা ছেড়ে বেরুতে পারলে বাঁচি রে বাবা। নামধাম যোগাড় করে জল-পুলিশের মোটর-লঞ্চ গাঙে খালে তক্কে তক্কে ঘুরবে। সাহেবকে নিয়ে রেলগাড়িতে উঠতে পারলে যে হয়!

হাসিখুশিতে মন ভুলিয়ে রাখছে। সাহেবকে বলে, কাজকারবারের কথা জিজ্ঞাসা করল—জবাবটা কি দিলাম শুনলি তো? সাধু-মহাজনের বাড়ি থেকে এসেছি, মিথ্যে কথা এখন মুখ দিয়ে বেরোয় না।

সাহেব অবাক হয়ে বলে, মিথ্যে নয়?

নফর বলে, বুঝতে পারলি নে—আ আমার কপাল। বললাম ছুরি-কাঁচির

কারবার। কাঁচির কারবারি আমি তো চিরকাল। ছুরির কারবারে এই নতুন বটে!

কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, 'ছ'-টা জিভ চেপে বলেছিলাম, শুনতে 'চ'-এর মতন। বোঝ এখন, কী দাঁড়াল!

গাবতলির হাটখোলা। সারি সারি হাটের চালা দেখা যায়। বেলা পড়ে এসেছে।

সাহেব জেদ ধরল ঃ গাবতলি নেমে ভাত খেয়ে নেবো। ক্ষিদেয় পেটের নাড়ি পটপট করছে।

নফরকেষ্ট বিরক্ত হয়ে বলে, আচ্ছা বায়নাদার তুই বাপু! পথের মাঝখানে ভাত রেঁধে কে বাতাস দিচ্ছে! টানের মুখে নৌকো রাখা যাচ্ছে না, শুনলি তো! একটা রাত্তির চিঁড়ে-মুড়ি, ছাঁচ-বাতাসা খেয়ে পড়ে থাক। খুলনায় নেমেই ভাত। বাঁধা হোটেল রয়েছে—ভাত, মাছ, ছ্যাঁচড়া-মুড়িঘণ্ট অষ্ট ব্যঞ্জন সাজিয়ে খাইয়ে দেবো দেখিস।

কিন্তু অবুঝ সাহেব শুনবে না। বলে, দোকানে চাল-ডাল কিনে নিয়ে একটা চালার নিচে ফুটিয়ে নেবো। নৌকো না রাখতে পারে, যাক চলে ওরা। খেয়ে-দেয়ে গয়নার নৌকোয় চার-ছ আনা দিয়ে যেতে পারব।

মাঝির উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে, ঘাটে ধরো একটু মাঝি। কেউ না নামে, আমি একলা নেমে যাই। ভাত না হলে আমার চলবে না।

যে-ই না বলেছে, যেন বোলতার চাকে ঘা পড়ল। হুঁশ হল, ক্ষিদে সকলেরই পেয়েছে। ছইয়ের নিচে সাক্ষিরা রে-রে করে উঠে ঃ সবাই নামব আমরা, সবাই ভাত খাব। না খাইয়ে অর্ধেক মেরে কাঠগড়ায় তুলতে চাও? উল্টোপাল্টা কথা বেরুবে তা হলে কিন্তু।

সাহেবের দিকে গোমস্তা একবার ভ্রূকুটি করে দরাজ হুকুম দিয়ে দেয় ঃ বাঁধো নৌকো। মামলা খারিজ হয় হোক গে, ধীরে-সুস্থে যবে হয় হাজির হওয়া যাবে। মচ্ছবের কোন অঙ্গে খুঁত না থাকে।

হাটখোলার ঘাটে ডিঙি বেঁধে রান্নাবান্না হচ্ছে। এক-চালার ভিতরে তিনটে মাটির ঢেলা বসিয়ে সাহেবদের আলাদা উনুন। চাল-ডাল, নুন-তেল-ঝাল এসেছে। একসঙ্গে ঘুঁটে খিচুড়ি হবে। দুটো পদ্মপাতাও পাওয়া গেল ছাঁচ-বাতাসার দোকানে। পদ্মপাতায় খিচুড়ি ঢেলে হাপুস-হুপুস খেয়ে নিয়ে ক্ষিদে শান্ত করবে! উনুনের সামনে বসে নফরকেষ্টরও ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে এখন।

কিন্তু মুশকিল করল উনুনে। জ্বলে না, কেবলই ধোঁয়ায়। ফুঁ পেড়ে পেড়ে নফরা নাজেহাল। সাহেব বলে, শুকনো কাঠ খানকয়েক কুড়িয়ে আনি। এক ছুটে এনে দিচ্ছি।

গেল তো গেল, ফেরবার নাম নেই।

কাঠ কুড়াতে গিয়ে সাহেব উধর্ব্শ্বাসে ছুটেছে। খোঁজাখুঁজি করে নফরকেষ্ট যাতে না ধরতে পারে। চলেছে সোনাখালি গাঁয়ে—পঞ্চানন বর্ধনের বাড়ি যেখানে। বংশীর আজামশায়—সুবিখ্যাত পচা বাইটা। একালের চোর-চক্রবর্তী —বলাধিকারীর মতো মানুষও যার কথায় শতমুখ হয়ে ওঠেন। ক্ষিধে-ক্ষিধে করে গাবতলির ঘাটে নৌকো ধরানো—মূলে তার এই মতলব। নফরকেষ্টকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয়নি, জানলে কোনক্রমে ছাড় হত না। হয়তো বা নিজেই পিছন ধরত। বাইটার যা মেজাজ শোনা গেছে, দল বেঁধে গেলে সঙ্গে সঙ্গে বিদায়।

সোনাখালি বংশীর মতে ক্রোশখানেক পথ। পথের মানুষ যাকে জিজ্ঞাসা করেছে সে-ও বলে এক ক্রোশ। ডাল-ভাঙা ক্রোশ বলে থাকে—সেই বস্তু নিশ্চয়। একটা ডাল ভেঙে নিয়ে রওনা হলাম—ডালের পাতা শুকাল, তখনই ধরা হবে ক্রোশ পুরেছে এইবারে। আবার মনে হচ্ছে, এ পথ দীনবন্ধু-দাদার দধিভাণ্ড। গল্পে আছে, দীনবন্ধু-দাদা এক খুরি দই দিয়ে গেলেন, শত শত লোক পরিতুষ্ট হয়ে খেয়ে যাচ্ছে! খুরি যতবার উপুড় করে তত আবার ভরতি হয়ে যায়, কমে না। সেই গাবতলির ঘাট থেকেই এক ক্রোশ চলছে—বেলা ডুবে সন্ধ্যা হয়ে আসে, জিজ্ঞাসা করলে এখনো সেই এক জবাব ঃ ক্রোশখানেক এখান থেকে।

এক সময়ে অবশেষে সোনাখালি এসে গেল, পঞ্চানন বর্ধনের কিন্তু খোঁজ হয় না। এত বড় ডাকসাইটে মানুষ, অথচ যাকে বলছে সে-ই হাঁ করে থাকে। সোনাখালি বলে কেন, তল্লাটের ভিতরেই ও-নামের মানুষ নেই। চিনতে কি তাহলে বাকি থাকত?

অন্ধকারে এক বাড়ির উঠানে গিয়ে পড়েছে। দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে বসে পাটটাকুর নিয়ে মুরুব্বি মানুষটা কোষ্টা কাটছে। মুখ তুলে বাঁ-হাঁতটা কানের পাশে নিয়ে সে বলে, অ্যাঁ, কী নাম বললে—পঞ্চানন বর্ধন, আমাদের সোনা-খালির?

সেই বাঁ-হাত ঘুরিয়ে মাথার উপর বার কয়েক টোকা দিয়ে বলে, ও হয়েছে। পঞ্চানন নয় তিনি, পচা। বর্ধন নয়, বাইটা। পচা বাইটা পঞ্চানন হয়েছে বুঝি! পয়সা করেছে, দালানকোঠা দিয়েছে—দশানন শতানন হলেই বা কে ঠেকায়? উল্টো পথে চলে এসেছ বাপু। দক্ষিণ মুখো ফেরো, ওরা দক্ষিণ পাড়ার লোক। পঞ্চানন নয়, বোলো পচা বাইটা। বরঞ্চ বড় ছেলের নাম ধরেই জিজ্ঞাসা কোরো, মুরারি বর্ধন মহাশয়ের বাড়ি যাব। সেখানে বাইটা বলে বোসো না কিন্তু—খবরদার, খবরদার! বে-ইজ্জতি হবে। বাপ বাইটা, ছেলে বর্ধন।

সে বাড়ি কদ্দুর?

এক ক্রোশ।

অতএব সাহেব দক্ষিণমুখো পুনশ্চ এক ক্রোশ ভাঙতে চলল।

মানুষটা সন্দিগ্ধকণ্ঠে পিছন থেকে ডাকে : শোন, শুনে যাও পচা বাইটার কাছে কি তোমার ?

সাহেব নিরীহভাবে বলে, কাজকর্মের চেষ্টায় ঘুরছি। বর্ধনমশায়ের নাম শুনলাম। যদি একটা কাজে লাগিয়ে দেন।

ব্যাপার নতুন কিছু নয়। ধান কাটার মরশুম, তার জন্য বিস্তর জনমজুর লাগে। এবং ধান পেয়ে অবস্থা সচ্ছল হওয়ার দরুন ছেলেপেলের বিদ্যাশিক্ষার জন্য হঠাৎ পাঠশালা স্থাপনের প্রয়োজন হয়, অসুখবিসুখে ডাক্তার-কবিরাজের খোঁজ পড়ে। বাদাবনে ঢুকে কাঠ ও গোলপাতা কাটবারও সময় এই, এবং আরও কিছু পরে চাকের মধু ভাঙবার। ডাঙা অঞ্চলের বিস্তর লোক কাজের চেষ্টায় এই সময়টা নাবালে নেমে আসে। হাটে গিয়ে বসে, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোরে।

কী কাজ করবে তুমি ?

বাছাবাছি নেই, পয়সা পেলেই হল। ভিক্ষের চাল কাঁড়া আর আকাড়া ! যা-কিছু পাই, লেগে পড়ব।

গৃহস্থমানুষ আমিও, কাজ কি আমার কাছে নেই ? রাখালের কাজ করবে তো বলো, এক্ষুনি বহাল করে নিই। ছোট ছেলেটা করত, নতুন পাঠশালা হয়ে সে এখন পাঠশালায় বসতে লেগেছে। ফুঁ দেওয়া কাজ। গরু-বাছুরে মিলে তেরোটা, আর ছাগল দুটো। গাই দোওয়া হয়ে গেল—এক কাঁসর পান্তা আচ্ছা করে ঠেসে নিয়ে ঢিকিঢিকি তুমি গরু-ছাগলের পিছন ধরে বেরুলে। কারো ক্ষেতে গিয়ে না পড়ে। সাঁজের বেলা গোয়ালে তুলে সাঁজাল ধরিয়ে জাবনা মেখে দিয়ে—বাস্‌ ছুটি। মাস-মাইনে চৌদ্দ সিকে, দেশে-ঘরে ফেরবার সময় ধান এক সলি—তার উপর তিন বেলা পেটে খেয়ে যদ্দুর উশুল করে নিতে পার, তাতে কেউ 'না' বলবে না।

সোনার চাকরি—সন্দেহ কি! রাত্রিবেলা কোথায় এখন হন্ড-হন্ড করে বেড়াবে! যা গতিক—এক ক্রোশ ভেঙে দক্ষিণপাড়া পৌঁছতে সকাল হয়ে যাবে হয়তো। সাহেব এক কথায় রাজি। বলে, রাখালির উপরেও পারি আমি। লেখাপড়া শেখা আছে খানিকটা, ইংরাজিতে নাম দস্তখত পর্যন্ত পারি।

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে সেই লোক বলে, বটে, বটে এত গুণ তোমার! তা হলে গোমস্তার কাজটাও নিয়ে নাও না কেন সকালবেলা। গোমস্তাগিরি সারা করে কলম রেখে, পান্তা-টান্তা খেয়ে রাখালিতে বেরুবে। ধান বাড়ি দেওয়ার ব্যবসা আমার। কত ধান কে কর্জ নিয়ে গেল, কার নামে কি পরিমাণ উশুল পড়ল, সেই উশুলের মধ্যেই বা সুদ কত, আসল কত—এ সবের নির্ভুল হিসাব রাখা গোমস্তার কাজ। মাইনে তিন টাকা, আর খাওয়া অমনি তিন বেলা। কিন্তু একলা একটা মানুষ তুমি—তিন বেলার জায়গায় ছ-বেলা খাবে কেমন করে ? খেতে চাও কোন আপত্তি নেই। দুই চাকরির মাইনে দাঁড়াল চোদ্দ সিকে আর তিন—একুনে সাড়ে ছয়। ওরে বাবা, লাটসাহেব পেলেও

তো বর্তে যান।

নিশ্চিন্তে আহার-আশ্রয়, মাস মাস মাইনের টাকা। রাত্রিবেলা আসল কাজ-কর্ম—সেই সময়টা পুরো অবসর থাকছে। আর কী চাই। খোশামুদি করে সাহেব কথা আরও পাকা করে নেয়ঃ কপাল ভাল আমার, ভাল জায়গায় এসে পড়েছি।

লুফে নিয়ে মানুষটা বলে, ভাল বলে ভাল! এসেছ পাটোয়ার-বাড়ি—রাতে ঠাহর করতে পারছ না। বাইটাদের গুলে খেতে পারি। আমার নাম দীননাথ পাটোয়ার। পচা বাইটা যখন পঞ্চানন, আমি হতে পারি মহারাজ রাজবল্লভ। হইনে কেন জানো? এখন লোকে একডাকে চেনে, তখন চিনতেই পারবে না। 'মহারাজ রাজবল্লভ' লিখে কপালের উপর সেঁটে বেড়াতে হবে সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে।

তালপাতার চাটকোল এগিয়ে দিল পাটোয়ারমশায়ঃ বোস—

দাওয়ায় উঠে সাহেব মুখোমুখি বসল। আলাপ পরিচয় হচ্ছে। একবার উঠে গিয়ে গোয়ালের গরু-ছাগল দেখে এলো—সুঁচাল-শিং দামড়াটার মাথায় হাত বুলিয়ে ভাব-সাব করে এলো খানিকটা। রাত পোহালেই চাকরি—দু-দুটো চাকরি একসঙ্গে।

প্রহরখানেক বেলায় গরু নিয়ে বেরিয়েছে। গরু তাড়িয়ে দক্ষিণপাড়ার দিকে গেল। এপাড়া-ওপাড়ায় এমনি কিন্তু পথ বেশি নয়। মাঝখানে বাঁওড় একটা —সেজন্য জলকাদা বাঁচিয়ে রাস্তাপথে অনেকখানি বেড় দিয়ে যেতে হয়। পচা বাইটাকে এক নজর অন্তত না দেখে সোয়াস্তি পাচ্ছে না। খোঁজে খোঁজে বাড়ির সামনে চলে এলো। ভিতর-বাড়িতে পাকা-দালান দু-তিন কুঠুরি, আর বাহির-ভিতর মিলিয়ে কাঁচাঘর যে কতগুলো, গুণতিতে আসে না। লোকে বলে, চোরের যত বড় রোজগারই হোক বাড়িতে কখনো দালানকোঠা হবে না। জোর করে দালান দিতে গেলে পুলিশের হাঙ্গামা কি পারিবারিক দুর্ঘটনা কিম্বা অপর কোন বাধা মাঝখানে পড়ে আয়োজন পণ্ড করে দেবেই। পচা বাইটার বেলা কেবল নিয়মটা খাটল না। একটা কথা এই হতে পারে, দালান-কোঠার সঙ্গে পচার সম্পর্ক কি? একটা রাতও সে পাকা ছাতের নিচে শোয়নি, বাইরের দোচালা খোড়োঘরে তাকে চালান করে দিয়েছে।

সকলের অলক্ষ্যে চারিদিক ঘুরে দেখে সাহেব আপাতত ফিরে গেল। প্রহর দেড়েক রাত্রে ছুটেছে আবার দক্ষিণপাড়ায়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফুড়ুত করে ঘরে ঢুকে পড়ল। পচা বাইটার সামনাসামনি।

টেমি জ্বলছে। উবু হয়ে বসে পচা ফড়ফড় করে হুঁকো টানছে। আশি বছরের উপর বয়স। তেমাথা মানুষ বলে কথা আছে—এক মানুষের তিন মাথা পাশাপাশি—অবিকল তাই। দুটো হাঁটু দু-দিকে মাঝখানে পাকাচুল-ভরা আসল

মাথাটুকু।

[বাপ মারা যাচ্ছেন—ছেলেরা কেঁদে বলে, কেমন করে সংসার চলবে বলে যাও। বেশি বলবার তাগত নেই, মাত্র দুটো কথা বলে গেলেন তিনি ঃ নিত্যি মাছের মুড়ো খেও, তেমাথার কাছে বুদ্ধি নিও। পিতৃ-উপদেশে ছেলেরা পুকুরের যাবতীয় রুই কাতলা ধরে ধরে মুড়ো খায়, তেমাথা পথে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকে বুদ্ধি নেবার জন্য। এমনি করে ফতুর হয়ে যাবার দাখিল। হঠাৎ এক বুড়ো থুত্থুড়ে বিচক্ষণ মানুষের দেখা পেয়ে গেল। তিনি বললেন, তেমাথা আমিই হে। যখন বসি, দুই হাঁটুর ভিতর মাথা নুয়ে পড়ে মোট তিন হয়ে যায়। কাতলা নয়, চুনোমাছ কুচোচিংড়ি খেতে বলেছে—গ্রাসে গ্রাসে যে মুড়ো গণ্ডা গণ্ডা খাওয়া হয়ে যায়। তার মানে, দিনকাল বুঝে কঞ্জুষ হয়ে চলবে।

পচা বাইটাও তেমনি এক তেমাথা মানুষ।]

চোখ বুঁজে পচা আয়েশে হুঁকো টানছিল, পায়ের শব্দে পিটপিট করে তাকায় ঃ কে তুমি? কোথা থেকে আসছ?

সাহেব বলে, বিদেশি লোক, ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি। দীননাথ পাটো-য়ার মশায়ের বাড়ি উঠেছি। তিনি একটু কাজ দিয়েছেন।

দীননাথটা কে হল আবার?

চুপচাপ পচা বাইটা ভাবে। বয়সের দরুন বিভ্রম এসেছে হয়তো। কিন্তু এমন কিছু নয়। একটুখানি ভেবে নিয়ে বলে, ও, সুখময় পাটোয়ারের বেটা দীনে। একরত্তি মানুষটাকে নিয়ে তুমি আজ্ঞে-হুজুর মশায় করতে লেগেছ—বুঝি কেমন করে?

সাহেব সবিনয়ে বলে, আজ্ঞে একরত্তি তিনি কেমন করে হলেন? গাল দুটো জুড়ে কান অবধি এই মোটা গোঁফের তাড়া—

পচা বাইটা অধীর হয়ে বলে, পেট থেকেই যদি গোঁফ নিয়ে পড়ে, তাই বলে বয়সে বুড়ো বলতে হবে? সাতানব্বুই সালে সেই যে বড় বুড়ি হল, সে আর ক'টা দিনের কথা! সেইবারে দীনের জন্ম। সুখো পাটোয়ার রাত দুপুরে জল ঝাঁপিয়ে নেত্য-দাইয়ের বাড়ি যাচ্ছে, আমি মানা করে দিলাম—নেত্যকে পাওয়া যাবে না। চকদার পুঁটে চক্কোত্তির বউয়ের প্রসব-বেদনা উঠেছে, বিকাল থেকে নেত্য সেইখানে পড়ে আছে। দাই বিনেই ছেলে হল ভোররাত্রে। ঐ দীনে।

বাংলা বারো-শো সাতানব্বুই সালে বড় বন্যা হয়। লোকের বড় সুখ—

গল্প শোনার মানুষ পেয়ে পচা বাইটা শুরু করে দিয়েছে ঃ উঠোনের উপর এক-হাঁটু এক-বুক জল। লোকের সুখের অন্ত নেই সেই ক'টা দিন। ছাঁচ-তলায় মাছের আফালি—ঘরের দাওয়ায় জলচৌকি পেতে মনের আনন্দে মাছ ধরে। ঘোলা জলের আবর্ত—তার মধ্যে মাছ খুব খায়, টানে টানে উঠে আসে। চাষবাসের কাজে ভুঁইক্ষেতে যেতে হচ্ছে না—মাছ মারো, খাও আর ঘুমোও। কলসির চাল বাড়ন্ত হবে এবং বন্যার জল সরে গিয়ে ক্ষেতের পচা ধানচারা বেরিয়ে

পড়বে একদিন। সে হল পরের কথা। তখনকার ভাবনা ভেবে আজকের সুখ মাটি করা কেন?

সেদিনের গল্প এই অবধি। পরে ঘনিষ্ঠ হয়ে সাহেব গল্পের গূঢ় অংশটুকুও শুনেছে। এক একখানা কাজ নামাবার আগে অনেকদিন—এমন কি একবছর দু-বছর ধরে খোঁজদারি করে বেড়াতে হয়। চকদার চক্কোত্তি মশায়দের বাড়ি এবং আরও কয়েকটা জায়গায় খোঁজদারি চলছিল কিছুকাল ধরে। ডাঙার কাজে হাঁটাহাঁটি করে বেড়াতে হয়। কিন্তু বন্যার কারণে শুধুমাত্র দাওয়ায় বসে মাছ ধরা নয়, এসব কাজেও সুবিধা এসে গেছে। ডাঙাই নেই, হাঁটি কোথা এখন? ডোঙা একেবারে মক্কেলের ঘরের দেয়ালে লাগিয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে সিঁধ কাটা চলে। ভগবান যখন এতই সদয়, বানের জল থাকতে থাকতে কাজগুলো সমাধা করে ফেলবে। কিন্তু পুঁটে চক্কোত্তির বাড়ির কাজে বাগড়া পড়ল। নেত্য দাইকে নিয়ে এসেছে, সকলে রাত জাগছে। সেই খবরটাই দিয়েছিল দীনুর বাপ সুখময় প টোয়ারকে।

কলকে উপুড় করে পচা ঠকাস করে ঘা দিল মাটিতে। তামাক পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। দু-চোখ এতক্ষণে স্পষ্টভাবে মেলে সাহেবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে: পাটোয়ার বাড়ি তো অনেকখানি দূরে। তোমাদের এ বয়সে অবিশ্যি কিছু নয়। তবু যে রাত্তিরবেলা চলে এলে, বাঞ্ছাখানা কি শুনি?

মনোগত বাঞ্ছা প্রথম দেখাতেই বলে ফেলতে সাহস হয় না। ভাব বুঝে নিতে হবে আগে। সাহেব বলে, নাম শোনা আছে অনেক। গাঁয়ের উপর এসে পড়েছি, তাই ভাবলাম দেখাশোনা করে আসা যাক। উঠবেন না, উঠতে হবে না। কলকেটা আমায় দেন দেখি, আমি সেজে দিই।

বুড়োকে উঠতে দেয় না। কলকে একরকম হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সাহেব তামাক সাজতে বসে।

ছোকরার খাতির দেখে পচার কণ্ঠ কিছু প্রসন্ন: নাম শুনেছ আমার—কার কাছে শুনলে? কি শুনেছ, কেবলই তো নিন্দেমন্দ হ্যাঁ?

হাঁটুর মাঝ থেকে উৎসাহ ভরে একটুখানি ঘাড় তুলেছে তো ঘাড়ের কাঁপুনি। কাঁপুনির চোটে কথাই বেরোয় না। আবার যথাস্থানে ঘাড় রেখে বলে, আত্মীয় কুটুম্ব আপনপর মরে গেলেও আজ আমার নাম করতে চায় না। নিজের ছেলে দুটোই তাই, অন্যের কথা কী বলব। বাপের নামে বেটাচ্ছেলেদের লাজ লাগে, লাজে মাথা কাটা যায়।

একবার কেশে গলা সাফ করে নিয়ে বলতে লাগল: কালে কালে রেওয়াজ বদলায়—বুঝলে? আমাদের বয়সকালে ফাঁদিনথের খুব চলন। বিয়ে করে এলাম—মা নথ দিয়ে বউয়ের মুখ দেখলেন। বউ দেখি মুখ ভার করে বেড়ায় —কি না, নথের চক্কোর ছোট, ভাতের গ্রাস নথের ফুটো দিয়ে মুখে ঢোকে না, টানা দিয়ে নথ সরিয়ে ভাত খেতে হয়। শেষটা নথ ভেঙে অনেক বড় করে

গড়ে দিতে হল। গলায় হাঁসুলি পরে—প্রায় সেই মাপের। আর এখন তো নথ পরা উঠেই গেছে একেবারে। নাক ফুটিয়ে মেয়েলোকে গয়না পরতে চায় না।

শুধু গয়না বলে কেন, হালচাল সব দিক দিয়ে বদলেছে। বোম্বেটে কথাটা সংক্ষেপ করে হল বেটে। তাই থেকে বাঙাল রীতির উচ্চারণ বাইটা। পচার প্রথম বয়সে বাইটা কথার ভারি কদর ভাঁটি-অঞ্চলে। পচা বাপ পিতামহের বর্ধন উপাধি ছেঁটে বাইটা জুড়ে নিজ নামের উল্লেখ করত। এখন বাইটা নামে লোক নিচু চোখে তাকায়। দুই ছেলে বড় হয়ে আবার বর্ধন হয়েছে—শ্রীযুক্ত বাবু মুরারিমোহন বর্ধন ও শ্রীযুক্ত বাবু মুকুন্দমোহন বর্ধন। কিন্তু পিতৃনাম শতেক চেষ্টা সত্ত্বেও বাইটা মুছে পঞ্চানন বর্ধনে দাঁড় করানো যাচ্ছে না। সেইজন্যে মনোভাব, বাপ মানুষটাই ভবধাম থেকে মুছে গেলে মন্দ হয় না।

আত্মকথা বলতে বলতে পচা বাইটা উত্তেজিত হয়ে উঠে। অনুপস্থিত দুই ছেলেকে সম্বোধন করে বলে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ওহে শ্রীযুত বাবুরা, তোদের বাবুয়ানিটা নিয়ে এলো কে? জমি, ঘরবাড়ি, আওলাতপশার সবই এই বাইটার রোজগারে। এখন হয়েছে—মানুষটা আমি চলে যাই, বাকিগুলো ষোলআনা বজায় থাকুক। কলিকাল নয়তো বলেছে কেন? দুটো ছেলেই মায়ের রীতচরিত্র পেয়েছে। বেশি হল ছোটটা—সাধু হয়ে ঘর বাড়ি ছেড়ে ফুলহাটায় পড়ে থাকে। রাহু কেতু দুটোর দৃষ্টি কি না তার উপরে—ছোট বয়সে মা কানে মন্তোর দিত। বয়সকালে বউ হয়ে যে এলো, সে-ও দিচ্ছে।

রাগের চোটে লম্বা লম্বা দম নিয়ে কলকের তামাক শেষ করে ফেলল। সাহেব তন্মুহূর্তে সেজে দেয় আবার। পর পর তিন-চার ছিলিম চলল। কেউ আসে না সেকালের এক-ডাকে-চেনা মানুষটার কাছে। মানুষ পেয়ে বর্তে গেছে, সাহেবের সবিনয় কথাবার্তা বড় ভাল লাগছে। শেষের ছিলিমটা কয়েক টান টেনে পচা ভূঁয়ে রাখে না, সাহেবের হাতে এগিয়ে দেয়ঃ খাও—

সাহেব বাঁ-হাতের উপর ডান-হাত ধরে তটস্থ ভাবে হুঁকোটা নিয়ে বেড়ার গায়ে ঠেশান দিয়ে রাখল।

পচা বলে, সামনে না খাবে তো আবডালে গিয়ে খাও। হাতনের ওদিকটায় নিয়ে দু-টান টেনে এসো। তামাকটা ভাল, মিছে পুড়িয়ে নষ্ট কোরো না।

এ কথার ভালমন্দ কোন জবাব না দিয়ে একটু চুপ করে থেকে সাহেব বলে, আপনার কাছে এসেছি একখানা-দুখানা গল্প শুনব বলে।

গল্প? গল্পটল্প আমি জানি নে। আমার কাছে গল্প আছে, কে বলল তোমায়?

কোটরগত চক্ষুদুটো যথাসম্ভব বড় করে পচা বাইটা সাহেবকে দেখছে। কী রূপের ছেলে মরি মরি! দেখে চক্ষু শীতল হয়। এককালে পচা বাইটা অঞ্চল তোলপাড় করে বেড়িয়েছে। গল্পে আর কী থাকে, সে জিনিস গল্পের চেয়ে ঢের ঢের আজব। কিন্তু মন্ত্রগুপ্তি—একটা কথাও ফাঁস করতে নেই।

যতদিন কাজের ক্ষমতা থাকে, তার মধ্যে তো নয়ই। অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় শেষটা, সেরেসামলে ঢেকে জীবন কাটিয়ে একদিন অবশেষে চোখ বোজে। কোন দেশের ছোঁড়া তুমি, সেই ঢাকা ধরে টান দিতে এসেছ।

সাহেবের দিকে তাকিয়ে পড়ে কিছু নরম হয়ে পচা বলে, কিসের গল্প শুনতে চাও? ভূতের, বাঘের—?

সাহেব হেসে বলে, একটা জিনিস বাদ রাখলেন কেন? সেই গল্প বলেন যদি দুটো-পাঁচটা—

[ভাঁটি-অঞ্চলের ছেলেপুলের তিন রকমের গল্পের ঝোঁক। বাঘের গল্প, ভূতের আর চোরের গল্প। এই তিন ব্যাপার নিয়েই সদাসর্বদা চলাচল—রাজা-রানী-রাজকন্যা নিয়ে মাথাব্যথা নেই।]

সাহেব বিশদ করে বলে, এই আপনাদের আমলে যা-সমস্ত হত। আপনার মতন ডাকসাইটে গুণী মানুষ সদরে হাকিমের কাছে গিয়ে একবার করলেন—তদ্বির করে পায়ে পায়ে গিয়ে যেন ফাটকে ঢুকে পড়া—জিনিসটা আমার কেমন-কেমন লাগে।

পচা বাইটা রীতিমতো বিচলিত হয়ে উঠল: কে বলল তোমায়? এত সব খবর জোটালে তুমি কোথা থেকে?

সাহেব বলে, ফুলহাটায় ছিলাম অনেকদিন: আপনার নাতি বংশীর সঙ্গে ভাব—সে-ই সব বলত। সকলে নিন্দেমন্দ করে বলছেন, বংশী তো দেখলাম আজ্ঞামশায়ের কথায় পঞ্চমুখ।

পাঁচটা মুখে হুক্কাহুয়া করে, তার উপরে বিশ্বাস করে তুমি এত পথ ছুটে এসেছ? যাও তুমি, বিদেয় হও।

বেজার মুখে বুড়া বলে যাচ্ছে, বংশী আবার একটা মানুষ! কী বোঝে সে, আর কী বলবে? দাও-দাও—করে আমায় জ্বালিয়ে মারে। না পেরে শেয়াল-কুকুরের ডাক ধরিয়ে দিলাম। নরদেহ হলেও আসল তো ঐ। যা শালা জাতকর্ম করে বেড়াগে—

মুখে হাসির চিকচিকানি দেখে সাহেব কিছু সাহস পায়। বলে, আপনার আর এক সাগরেদ গুরুপদও বলে আপনার কথা।

গুরুপদ গিয়ে জুটেছিল? ওটা একেবারে মুখ্যু, এমন কথা বলিনে। কিন্তু যেটুকু গুণজ্ঞান তার শতেক গুণ দেমাক। সেজন্য কিছু হল না। ঐ যে আমার একবারের কথা বললে, তার জন্যে গুরুপদরও দায় আছে। আমার ফাটক হলে গুরুপদ এদিককার কাজকর্ম ছেড়ে কেনা মল্লিকের সঙ্গে জুটেছিল। সেখানে তো শুনি নৌকোর উপরে দাঁড়ে বসিয়ে রাখত, আর কোন কাজ দিত না। বয়স হয়ে গিয়ে এখন আর দাঁড়ের কাজও পারে না।

সইয়ে সইয়ে সাহেব টান দিচ্ছে, বেরুচ্ছেও কথা। বলে, গুরুপদকে সর্দার ধরে আমরা একটা কাজে গিয়েছিলাম এর মধ্যে।

শিউরে উঠে চক্ষু যথাসম্ভব বিস্ফারিত করে পচা বলে, আরে সর্বনাশ! বেরিয়ে এসেছ ভালোয় ভালোয়—এমন তো হবার কথা নয়। ওস্তাদের আশীর্বাদের জোর বলতে হবে। ওস্তাদ কে তোমার বাপু?

সাহেব মুখ চুন করে বলে, সে ভাগ্যি আর হল কোথায়? কার দয়া পাব—আশায় আশায় তল্লাট ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি। পাকেচক্রে জগবন্ধু বলাধিকারী মশায়ের কাছে গিয়ে পড়েছিলাম। তিনি তো গুরু-ওস্তাদ নন, মহাজন।

পচা বলে, ওস্তাদ না-ই হোক, তা-বড় তা-বড় ওস্তাদের কান কেটে দিতে পারে সেই মানুষ।

দেখা গেল, বলাধিকারী যেমন পচার কথায় মেতে ওঠেন, পচারও ঠিক সেই ভাব বলাধিকারীর নামে। কিন্তু পয়লা দিন আর অধিক নয়। মানুষটা রগচটা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বংশীর কাছে অনেক শুনেছে। তাড়াহুড়োর ব্যাপার নয়, ধৈর্য ধরে চেপে বসে তবে যদি কিছু আদায় হয়। তক্ষুনি ওঠে না তা বলে। নিরীহ গোছের ছাড়া-ছাড়া গল্প হল কয়েকটা। হয়তো বা পচার নিজেরই, কিন্তু বলল পরের নাম করে। যথেষ্ট হয়েছে, থাক এখন এই পর্যন্ত।

চলল এইরকম। তাড়াতাড়ি গোয়ালের কাজ সেরে নাকে-মুখে কোন গতিকে দুটো ভাত গুঁজে সাহেব চুপিসারে পাটোয়ার-বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। বাড়ির লোকে জানে, সারাদিন খাটাখাটনি করে ছোঁড়া সকাল সকাল শুয়ে পড়েছে। ওদিকেও জমে আসছে—পরের বেনামি গল্প হতে হতে এখন স্পষ্টাস্পষ্টি পচার নিজের কথা। সংসারসুদ্ধ লোকের উপর পচার রাগ—ছোটছেলে মুকুন্দর উপর সকলের বেশি। বাপের নাম পরিচয়ের লজ্জা, সেজন্য বাড়ি ছেড়ে বেরুল। কালেভদ্রে যখন বাড়ি আসে, উঠানের উপর রামায়ণের আসর বসায়। বাপের কাছেও ধর্মকথা শোনাতে যায়, এত বড় আস্পর্ধা। হুবহু মায়ের স্বভাব পেয়েছে—সেই রমণী যতকাল বেঁচে ছিল, কায়দায় পেলেই ভাল লোক হবার জন্য মাথা খুঁড়ত বাইটার কাছে। নানান ফন্দি আটত।

ছয়

নিধিরাম নাথের বাড়ি চুরি। ভাঙা কুড়েয় পড়ে থাকে লোকটা। কুষ্ঠব্যাধি—পচে গলে এক এক অঙ্গ খসে পড়ছে। একটা কবিরাজী পাঁচন কিনে খাওয়া সঙ্গতিতে কুলায় না। সেই লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে থানায় এসে চুরির ফর্দ দেয়। ফর্দ শুনে বড়বাবু-ছোটবাবু, মুন্সি-বরকন্দাজ থানাসুদ্ধ সকলের চক্ষু কপালে ওঠে। থান থান সোনার মোহর, ঘটি-ভরা রুপোর টাকা। বিধবা বোন থাকে সংসারে, সদরের উপর তার বেনামে ফলাও কাপড়ের ব্যবসা। মালিক বোন অবধি তার বিন্দুবিসর্গ খবর রাখে না। ত্রিসংসারের মধ্যে ধনসম্পত্তির খবর জানে একমাত্র কুটে-নিধিরাম।

আর জানত চোরে, যাদের ভয়ে এতদূর সামাল-সামাল করে বেড়ায়। ঠিক

এসে তুলে নিয়ে গেছে। এজাহার দিতে এসে নিধিরাম ঢিবঢাব করে বুক থাবড়ায় ঃ নিজের কাজকর্ম নিয়ে থাকি আমি—কারো সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। রোগের কষ্টে আপন ঘরে শুয়ে ছটফট করি, রাতের মধ্যে ঘুম হয় না। বলি. খুব ভাল. যক্ষি হয়ে মাল আগলাচ্ছি, চোর-ছ্যাঁচোড়ের হাত বাড়াতে হবে না। বলব কি বাবুমশায়রা, চোর যেন মাটির গন্ধ শুঁকে শুঁকে জায়গার নিরিখ করেছে। ইঞ্চি ধরে মাপ করে এসেছিল—যেখানটা মাল, ঠিক সেইটুকু গর্ত খুঁড়েছে। এক বিঘত এদিক-ওদিক নেই। তারই হাত তিনেক দূরে আমি বেহুঁশ হয়ে আছি।

থানায় তখন বটুকদাস রাউত—অত বড় ঘড়েল দারোগা হয় না। বটুকদাস বলেন, ঐ তিনটে হাত ঠেলে তোকেও কেন গর্তে ফেলে কবর দিয়ে দিল না? চিরকাল ধরে ঘুমুতিস।

নিধিরাম হাউহাউ করে কেঁদে উঠল ঃ সেইটে হলে বেঁচে যেতাম বড়বাবু। খালি ঘরে কেমন করে থাকব! মোটে ঘুমুইনে—সে সময়টা কী কালঘুমে যে ধরল আমায়।

পিছনের জানলায় আড়চোখে একটু দেখে নিয়ে বটুকদাস কথার মাঝখানে হঠাৎ বলেন, সেই থেকে তো উপোসি রয়েছিস—কিছু খেয়ে নে, ওদের বলে দিচ্ছি। তারপরে সব শোনা যাবে।

পচা বাইটা নিজের নামেই বলে এখন। হাকিমের কাছে গিয়ে কাজের ব্যাপার নিজেই স্বীকার করেছিল, সেই গল্প উঠেছে। সাহেব কৌতূহলে প্রশ্ন করে, সত্যিই তো। কুটে-নিধে মাটির নিচে মাল রেখেছে, টের পান তা কেমন করে?

সেকালের অনেক তুকতাক বলাধিকারীর কাছে শোনা আছে। মায়াঅঞ্জন —চোখে লাগিয়ে নিজে তো অদৃশ্য, সেই সঙ্গে দুটো চোখে এমন জোর আলো এসে যায়, পাতালের তলে অথবা পাহাড়ের চূড়ায় মাল লুকানো থাকলেও নজরে পড়ে যাবে। মৃচ্ছকটিক নাটকে আছে মন্ত্রপূত বীজ—ঘরে ঢুকে মেঝের উপর ফটফট করে বীজ ফুটে যাবে। মাল না থাকলে যেমনকার বীজ তেমনি। কথা-রত্নাকরে একরকম শিকড়ের উল্লেখ আছে—বাক্স-পেঁটরায় শিকড় বুলিয়ে মালের হদিস পাওয়া যায়। দশকুমারচরিতে যোগচূর্ণ আর যোগবর্তিকার কথা পাওয়া যায়। যোগচূর্ণ মায়াঅঞ্জনেরই রকমফের—চোখে লাগাতে হয়। যোগবর্তিকা জ্বালিয়ে দিলে গৃহস্থের চোখে ধাঁধাঁ লাগবে, চোর দেখতে পাবে না। কিন্তু সেই আলোয় সব বমাল চোরের নজরে পড়বে।

এসব সেকালের পুঁথিপত্রের ব্যাপার। মানুষ এখন তুকতাক শিকড়-বাকড় মানতে চায় না। হাল আমলের কায়দাটা কি? সাহেব জিজ্ঞাসা করে ঃ সত্যিই কি মাটির গন্ধ শুঁকে নিধিরামের মালের খবর বুঝে নিলেন?

গল্প অবধি পচা উঠেছে বটে, কিন্তু এমনি সব প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। অথবা

চুপচাপ গম্ভীর হয়ে পড়ে। আজকে একটা মোক্ষম তুলনা দিল হঠাৎ। সেই তুলনা সাহেবের সারাজীবন মনে থেকে গেল।

বাইটা হেসে বলল, অন্তর্যামী আমরা—তা বুঝি জানো না? আকাশের দেবতা অন্তর্যামী, আর ভবসংসারে সিঁধেল চোর। চোখে সব দেখতে পাই টের পাই সমস্ত।

বর্ণে বর্ণে সত্য, পরবর্তীকালে সাহেব খাটিয়ে দেখেছে। দরকারে লাগুক আর না লাগুক, অঞ্চলখানা নখদর্পণে রাখতে হয়। আশালতার গয়না চুরি করল, মধুসূদনের তারপরে তড়পানি: বাড়িটা আমাদের না চোরের? বাঁশতলায় দাঁড়িয়ে কেষ্টদাস শুনে এসে বলেছিল। হাসির কথা—জানে না, সেইজন্য বলে। আইন মতে স্বত্ব তোমার বটে, কিন্তু দৈবাৎ কোন এক নিশীথে পুরোপুরি অধিকার নিশিকুটুম্বর হয়ে যায়। বাড়ির খুঁটিনাটি খবর অনেক বেশি জানে সে তোমার চেয়ে। মানুষজন গরুবাছুর গাছগাছালি খানাখন্দ সমস্ত। নিজের জিনিস—সেই দেমাকে তুমি কখনো অতশত খুঁটিয়ে জানতে যাও না।

আরও আছে। তুমি শুয়ে পড়লে, তারই মধ্যে কত-কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে। দরজার মুখে হয়তো শেয়াকুলের কাঁটা, বেরুতে গিয়ে কাঁটায় জড়িয়ে পড়বে। অথবা নোংরা বস্তু কিছু—পা হড়কে রাতদুপুরে নরক-ভোগ। তার উপরে কাঁচা ঘুমের মধ্যে উঠে পড়েছ, ঘুম লেগে রয়েছে চোখে। সতর্ক সক্ষম চোরের সঙ্গে পারবে তুমি? আধিপত্য তারই তখন। মুখে তড়পালে কি হবে।

নিধিরামের সঙ্গে দুটো-চারটে কথা বলেই বটুক দারোগা বুঝেছেন, পচা বাইটার পাকা হাত রয়েছে এই কাজে। আগেভাগে ঘাঁটা দিয়ে লাভ নেই, তাতে বরঞ্চ সতর্ক করে দেওয়া হবে। বড় মাছ ধরবার যে কায়দা—বেড়াজাল দূরে দূরে নামিয়ে দিয়ে ক্রমশ আঁটো করে নিয়ে আসা। অত্যন্ত চুপিসারে সেই আয়োজন চলছে।

এমনি সময় অভাবিত সুযোগ এসে গেল। কাজের মধ্যে গুরুপদও ছিল, সুযোগ করে দিল সে-ই। এমন একখানা কাজ নামিয়ে এসে ধরাকে সরা দেখছে সে এখন। মাথায় মুকুট পরে অকস্মাৎ যেন রাজচক্রবর্তী হয়ে বসেছে—দুনিয়ার কাউকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। কুটে-নিধের বাড়ির আশপাশে ঘোরাফেরা করে। এয়ারবন্ধুদের মধ্যে বলে, কাজ করা বুঝি কেবল পয়সার জন্যে? পয়সা তো মাথায় মোট বয়েও রোজগার হয়। পয়সা আমাদের কাজের উপরি-লাভ। পাই তো ফেলে দেব না, না পেলেও হা-হুতাশ করব না। ইঁদুরের মতন ঘরের মধ্যে ঢুকে—কুটে-নিধে রোগের কষ্টে দিনরাত ছটফট করে, তাকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলে কাজ হাসিল করা হল—এইসবই তো আসল। মাটি খুঁড়ে সোনার মোহর না-উঠে যদি হাঁড়িকুড়ির চাড়াই খানকয়েক উঠত, কী আসে যায়! যে

শুনেছে ধন্য ধন্য করেছে—খোদ মক্কেল নিধেটাই বা কি বলে কানে শুনতে হবে না? না-ই যদি শুনব, কষ্ট করা কেন তবে?

অথচ গুরুপদ মক্কেলের ঘরে ঢোকে নি, বাড়ির উঠান অবধিও আসতে হয় নি তাকে। সে শুধু পাহারাদার। তা-ও পয়লা দোসরা নয়, তিন নম্বরের পাহারাদার। বাড়ির চতুঃসীমার বাইরে তার ঘোরাঘুরি। কোন লোক বাড়ির দিকে আসছে দূরে থাকতেই গুরুপদ সাড়া দিয়ে জানাবে। তাকে পার হয়ে আরও দু-জন। সেই মানুষটার এত দেমাক।

কুটে-নিধি থানায় এজাহার দিতে গেল। গুরুপদ থাকতে পারে না, অলক্ষ্যে তার পিছন ধরে চলেছে।

এয়ারবন্ধুরা অবাক হয়ে যায়ঃ সাহস বলিহারি তোর! গাঁ ছেড়ে গঞ্জের থানায় পুলিশের খপ্পরের মধ্যে গিয়ে উঠলি!

গুরুপদ বলে, অঞ্চল জুড়ে যশ গাইছে, তাতে ঠিক মন ভরল না। পথ ঘাটের কথা কানে যাচ্ছে, থানার সরকারি লোকে কি বলে শুনতে চাই।

কথা শুনবার মতলব নিয়ে গুরুপদ থানার দালানের পাশে জানলায় কান দিয়ে দাঁড়াল। বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। ক্রমশ সাহস বেড়ে যায়—জানলার কবাট একটুখানি ঠেলে দিয়ে কান ভিতর দিকে আরও বাড়াল। চতুর বটুকদাস দেখতে পেয়েছেন। নিধিরামকে বলেন, খেয়ে নে তুই কিছু, তারপরে আবার শোনা যাবে। সিপাহিদের চোখ টিপে দিলেন, দুজনে দু-দিক দিয়ে গিয়ে গুরুপদর দুটো হাত চেপে ধরেছে। সঙ্গে সঙ্গে বটুক দারোগাও গিয়ে পড়েন।

সমস্ত বীরত্ব কর্পূরের মতো উবে গিয়ে গুরুপদর কাঁদো কাঁদো অবস্থা। বলে, গঞ্জে কেনাকাটা করতে এসেছি, আমি কিছু জানিনে বড়বাবু। চেনা মানুষটা থানায় এসে উঠল—ভাবলাম, কি বলছে একটুখানি শুনে যাই।

বটুকদাস হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন ঃ তুড়ুমে নিয়ে তোল ওকে।

তুড়ুম যন্ত্রণা দেবার যন্ত্র—দুখানা জোড়া কাঠে অর্ধচন্দ্রের আকারে খাঁজ কাটা। আসামীর পা খাঁজে ঢুকিয়ে পেষণ করে। বাপ-বাপ বলে পেটের কথা ছিটকে বেরোয়।

তুড়ুমের কাছে এসে গুরুপদর আর্তনাদঃ আমি চুরি করিনি। বাপ-পিতামহ-চোদ্দপুরুষের নামে কিরে করছি। তেত্রিশ কোটি দেবতার নামে কিরে করছি।

বটুক দারোগা হুকুম দিলেন ঃ শুইয়ে ফেল তুড়ুমের উপর।

বীর গুরুপদ দারোগার পা দুটো জড়িয়ে ধরে ঃ রক্ষে করুন ধর্মবাপ। আমি করিনি, পচা বাইটা—

দারোগার কণ্ঠস্বর সঙ্গে সঙ্গে অতি মোলায়েম। কনেস্টবলকে হুকুম দিলেন ঃ গুরুপদবাবুর জন্য মিষ্টিমিঠাই নিয়ে এসো। আসুন গুরুপদবাবু, আমার ঘরে বসে খাবেন।

বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বুঝে নিয়ে বটুক-দারোগা সদলবলে পচা বাইটার বাড়ি রওনা হলেন। শেষরাত্রে পেঁ'ছে নিঃশব্দে ভোরের অপেক্ষায় আছেন। টের না পায়, তাহলে সরে পড়ার চেষ্টা করবে। ঢেঁকিশালে ঢেঁকির উপর পা ঝুলিয়ে বসে পড়লেন—

সেখানেও আশ্চর্য ব্যাপার অপেক্ষা করে আছে। সবেমাত্র বসেছেন, পচা বাইটা যেন পাতাল ফুঁড়ে উদয় হয়ে বলল, আপনি ঢেঁকিশালে এসে বসলেন—লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে বড়বাবু। গরিবমানুষ হলেও ঘরদুয়োর আছে তো এক-আধখানা।

অপ্রতিভ হয়ে গিয়ে বটুক দারোগা আরও বেশি রকম রেগে উঠলেন ঃ ধানাই পানাই করে আমায় ভুলাতে পারবে না। প্রমাণ পকেটে নিয়ে এসেছি।

পচা বলে, এই দেখুন, ভোলাতে কে চায় আপনাকে? গুরুপদ যা বলেছে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। থানায় গিয়ে আমিই একরার করতাম, তা এই দেখুন অবস্থা। পা দেখাচ্ছি, অপরাধ নেবেন না বড়বাবু। প্রমাণ না দিলে চোরের কথা বিশ্বাস করবেন কেন?

ডান-হাঁটুর কাপড় তুলে দেখাল। ফুলে ঢোল। কী সব তেল লাগিয়েছে, অতিশয় দুর্গন্ধ। পা ফেলতে পারছে না মাটিতে। টিপে না দেখে দারোগার তবু প্রত্যয় হয় না। গায়েও জ্বর।

কি হয়েছিল রে?

বন্ধুলোকের কাছে যেন খোলাখুলি গল্প করছে—পচা বাইটা বলে, বিস্তর পেয়ে গেলাম, কুটে মানুষের ঘরের মেজেয় রাজার ভাণ্ডার কে ভাবতে পারে বলুন। স্ফূর্তির চোটে পথ তাকিয়ে দেখিনি, খানায় গিয়ে পড়লাম। ভাই-বোন দুটোয় আঙ্গুল মটকে শাপশাপান্ত করছে। তারই খানিকটা ফলে গেল। গায়ের হাড়গোড় চুরমার হয়েছে বলে ঠেকে। সেই থেকে ঘরে আছি, তাড়শে জ্বর। আজকে আপনার পায়ের ধুলো পড়ল, না উঠে তো পারি নে। এই দু-পা আসতেই প্রাণ বেরিয়ে গেছে।

কাতর হয়ে পড়েছে সত্যি। দু-হাতে ডান-পা চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়েছে। একটু দম নিয়ে বলে, লোকে ভয় দেখাচ্ছে বড়বাবু, খোঁড়া হয়ে চিরকাল পড়ে থাকবি। প্রাণে বেঁচে থাকব, কাজকর্ম কিছু হবে না—তার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। সদরের বড় ডাক্তারকে একবার দেখাতে পারলে হত—কিন্তু একে মুখ্যুমানুষ আমি, তার উপরে গরিব।

পচা বিরস মুখে তাকিয়ে থাকে। খোঁড়া পা নিয়ে শয্যাশায়ী হয়ে থাকবে, অথবা পা পচে গিয়ে অক্কাই পেয়ে যাবে, এমন উপাদেয় কথা বাইটার স্বমুখে শুনেও বিশ্বাস হতে চায় না। ফোলা হাঁটু আরও খানিকটা টিপে দেখে তবে দারোগা নিঃসন্দেহ হলেন।

বললেন, থানায় চলে আয়। ওখানে গিয়ে যা করবার করব। গরুর-গাড়িতে

যত্ন করে নিয়ে যাব, কষ্ট হবে না।

থানায় যেতে পচার আপত্তি নেই, কিন্তু গরুর-গাড়িতে নয়। পথ খারাপ, চাকা খানাখন্দে গিয়ে পড়বে, ঝাঁকিতে জীবন থাকবে না।

বটুক-দারোগা প্রস্তাব করেন: পালকিতে বেহারার কাঁধে চেপে চল্ তা হলে।

পচা বাইটা রাজি হয়েও বলে, বেটাদের পালকিগুলো যেন এক-একটা পায়রার খোপ। মুশকিল হল, বড়বাবু, আমি তো গুটিসুটি হয়ে যেতে পারব না। পায়ে লাগবে।

বড়-পালকির ব্যবস্থা করছি তোর জন্যে। বিয়ের বর যে রকম পালকি চেপে যায়। ষোল বেহারা হুমহাম করে নিয়ে যাবে। তোদের বিয়ে তো পায়ে হেটে। পালকি চাপা বাকি ছিল—সেই সুখটা এদিনে হয়ে যাচ্ছে।

থানায় নিয়ে এসে সাক্ষিসাবুদের সামনে যথারীতি একরারনামা লেখাপড়া হল। চুরির যাবতীয় বৃত্তান্ত পচা গড়গড় করে বলে যায়, জেরা করতে হয় না। বুড়ো আঙুলে নিজেই কালি মাখিয়ে এগিয়ে ধরে: নিয়ে আসুন।

দলিলের উপর টিপসই দিল পচা, আঁকাবাঁকা অক্ষরে নামসইও করল।

বমাল ?

পচা মুখ টিপে হাসল এবার। বলে, বমাল চলে গেছে মহাজনের কাছে। যা আমাদের নিয়ম। তার পরের খবর জানি নে, জানবার কথাও নয়।

মহাজনটা কে বলে দাও তা হলে।

পচা বলে, নিজের উপরে ষোলআনা এক্তিয়ার, যদ্দুর খুশি বলতে পারি। নিজের বাইরে সিকিখানা কথাও পাবেন না বড়বাবু। বলতে পারেন, গুরুপদও দলের মানুষ। সব দলেই ওরকম ঘরভেদী বিভীষণ থাকে একটা-দুটো। যে অবধি বলবার সম্পূর্ণ বলে দিয়েছি, এ ছাড়া আর কিছু নেই। যা করতে হয় করুন এবারে আপনারা।

দৃঢ়কণ্ঠে কথাগুলো বলে একেবারে চুপ হয়ে গেল। খুন করলেও এর উপরে বেরুবে না, নিঃসন্দেহ সকলে। কিছু সলা-পরামর্শ চলে নিজেদের মধ্যে। বটুক বলেন, ঠিক আছে। পালের গোদাটা তো সামনের উপর থেকে সরে যাক। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করে দিই। মহাজন-ডেপুটিগুলোকে বের করে ফেলতে তখন আর দেরি হবে না।

ষোল বেহারার পালকিতে তুলে পচাকে ঘাটে নিয়ে গেল। সেখান থেকে পানসিতে খুলনার সদরে—সিবিলিয়ান ম্যাজিস্ট্রেট রিচার্ডসনের এজলাসে।

কতকালের কথা, কিন্তু আজও লোকে রিচার্ডসনের নাম করে। পাগলা সাহেব, কিন্তু মানুষটা বড় ভাল। মস্ত বনেদি ঘরে নাকি জন্ম। নিমকির সাহেব, কুট-কনসারনের সাহেব, পুলিস সাহেব ইত্যাদি নিয়ে এক খুলনার উপরেই সাহেব-মেম আট-দশটা। রিচার্ডসনের কারো সঙ্গেই তেমন মেলামেশা নেই। ঘেন্না করে তাদের। বলে, ছোট বংশে জন্ম—চেহারা মানুষের, কিন্তু বিলাতি

ঘোড়া ভেড়াই ওগ্‌লো। কোন একটা চাকরি দেবার সময় রিচার্ডসন সকলের আগে জাত-কুল জিজ্ঞাসা করে নেয়। কুলীন-সন্তান—বিশেষত মুখ্যকুলীন হলে সে মানুষের নির্ঘাৎ চাকুরি।

কাছারির আমলা-কর্মচারীর অসুখে সাহেব চিকিৎসার ব্যবস্থা দিত। অসুখ যাই হোক, ওষুধ একটি মাত্র—শ্রীফল অর্থাৎ বেল। মাথা ধরেছে—বলে, শ্রীফল খাও। কাশি হচ্ছে—বলে, শ্রীফল খাও। পেট নামছে—বলে, শ্রীফল খাও। পরের দিন। জিজ্ঞাসা করবে ঃ খেয়েছিলে শ্রীফল, আছ ভাল ?

ঘাড় নেড়ে বলতেই হবে শ্রী ফল খেয়ে নিরাময় হয়েছে।

আর ছিল—শড়কি-বন্দুক অগ্রাহ্য করে বড় বড় দাঙ্গার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ত, কিন্তু কাকের ডাক সইতে পারত না। কাক ডাকলে পাগল হয়ে উঠত। কাছারির সামনে শিরিষগাছের উপর কাকে কা-কা করে উঠেছে তো এজলাসের ভিতর মামলা করতে করতে রিচার্ডসন আর্তনাদ করে ঃ খুন করল গো, তাড়াও—তাড়াও—। নথিপত্র ছুঁড়ে ফেলে কাঁপতে কাঁপতে খাসকামরায় ঢুকে দরজা এঁটে দেয়। তিনটে চারটে মানুষ সেইজন্য বহাল হল—লাঠি ও লগি নিয়ে তারা ছুটোছুটি করে বেড়ায়, কাছারির সময়টা কোন গাছে কাক এসে বসতে না পারে।

আরও কত, বলতে গেলে মহাভারত হবে। গাইগরু কিনেছে সাহেব, কেনার সময় দুধ দশ সের দেখে নিয়েছে। কুঠিতে এসে গরু তিন-চার সেরের বেশি দেয় না। সাহেব রেগে খুন। গরুর পিঠে এবং যে গোয়ালা গাই দুইছে, তার পিঠে ছড়ির ঘা।

গোয়ালা বলে, আর আসব না—গরু দুধ না দিলে আমি কোথায় পাই ? খাস বেহারা তখন বুদ্ধি বাতলে দেয় ঃ হাঁড়িতে আগে-ভাগে দুধ রেখো, সেই হাঁড়িতে দুয়ে সাহেবের সামনে ভজিয়ে দিও। তারপরে আর কে দেখতে যাচ্ছে, তোমার দুধ ফেরত নিয়ে যাবে তুমি।

তাই। দুধ মেপে দশ সেরের জায়গায় হল বারো সেরের উপর। রিচার্ড-সন গর্বভরে বুকে থাবা দেয় ঃ দেখলে ? ছড়ির ঘায়ে দুধ বেরিয়ে গেল। গোয়ালাকে দু-টাকা বখশিস সঙ্গে সঙ্গে।

পনের দিন অন্তর বিলাতের ডাকের জাহাজ ছাড়ে কলকাতা থেকে। সেই তারিখের দিন চারেক আগে থেকে রিচার্ডসনের চিঠি লেখা শুরু হত। সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার, লিখেই যাচ্ছে। খাসকামরায় বসে বসে লিখছে, এমনি সময় মামলার রায় নেবার জন্য আমলা এসে উপস্থিত। রিচার্ডসন বলে, নথি পড়ে যাও আমি সব শুনছি।

পড়তে পড়তে একসময় আমলা চুপ করল। রিচার্ডসন বলে, কি হল, থেমে গেলে কেন ?

শেষ হয়ে গেছে হজুর।

ঘাড় না তুলে হুজুর রায় দিল : তিন মাস ফাটক, দশটাকা জরিমানা।

আশ্চর্য হয়ে আমলা বলে, খাজনার মোকদ্দমা যে হুজুর—

খিঁচিয়ে উঠে রিচার্ডসন বলে, দেওয়ানি না ফৌজদারি আগে থেকে বলবে তো সটা। আছ কি জন্যে সব ? ফাটক জরিমানা কেটে ডিসমিস লিখে নাওগে যাও।

এমনি বিস্তর গল্প রিচার্ডসনের নামে। বটুক দারোগা পচা বাইটাকে তার কাছে পাঠালেন। থানার ছোটবাবু ও কয়েকজন সিপাহি সঙ্গে এসেছে, বটুক নিজে আসেনি। পচার সঙ্গীসাথী ও বমাল বের করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে আছেন তিনি, এই সময়টা থানা ছাড়লে তদ্বিরের গোলমাল হয়ে যাবে।

রিচার্ডসন একরারনামা পড়ল। বাংলাটা ভাল শিখেছে, বলেও ভাল। আদ্যোপান্ত মনোযোগ করে পড়ে বলে, সই তোমার ?

আজ্ঞে।

যা লিখিত আছে, সমস্ত সত্য ?

পচা বাইটা অম্লানবদনে বলে, কি লিখেছে আমি বিন্দুবিসর্গ জানি নে। সই করতে বলল, করে দিলাম। পা ভেঙে বিছানায় মাসাবধি শুয়ে আছি, এর উপরে মারধোর সহ্য করার ক্ষমতা নেই হুজুর।

রিচার্ডসন দলিলটার দিকে চোখ রেখে বলে যায়, নিধিরাম নাথের বাড়ির চুরি তোমারই কাজ, সরলভাবে স্বীকার করে যাচ্ছ তুমি—

পচা বলে, বহুত দয়া যে চুরির কথা লিখেছেন। দু-মাস ছ-মাসের জেল। ডাকাতি আর সেই সঙ্গে একটা দুটো খুনের কথা লিখে দিলে তো ফাঁসিই হয়ে যেত হুজুর।

মুহূর্তকাল পচার মুখে চেয়ে থেকে খামখেয়ালি ম্যাজিস্ট্রেট বলল, কিছুই হবে না, বেকসুর খালাস তুমি।

খানিকটা ইতস্তত করে পচা বলল, আমি কিন্তু ভেবেছিলাম, হাজতে পাঠাবেন হুজুর আমায়। তৈরি হয়েই এসেছি।

কিন্তু রিচার্ডসনের মেজাজ দরাজ এখন। বলে, দোষের প্রমাণ নেই, হাজতে কেন পুরব ? মহান বৃটিশ-আইন বলে, এক-শ দোষী মুক্তি পেয়ে যাক কিন্তু একজন নির্দোষীর অঙ্গে হাত না পড়ে। আমার জাতি এই কারণে এত বড়। দারোগাদের আমি সতর্ক করব, সন্দেহের উপর মানুষকে ভবিষ্যতে কষ্ট প্রদান না করে। তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত পঞ্চানন, যথা ইচ্ছা চলে যাও।

সঙ্গের ছোট-দারোগা রাগে গরগর করছে, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে মোলায়েম কণ্ঠেই বলতে হয়। বলে, ওঠ্ গিয়ে পানসিতে, তা ছাড়া আর কোন চুলোয় যাবি ? ঘাটে পৌঁছে আবার সেই ষোল-বেহারা খুঁজব।

বটুক-দারোগাও বসে নেই। পচাকে সদরে পাঠিয়ে দিয়ে তোলপাড় লাগিয়েছে —বমাল চাই, মহাজন মানুষটাকে চাই। গুরুপদ পচা বাইটার খবর বলল,

তারপর লোকটা একেবারে ফৌত। থেকেও লাভ ছিল না। নিতান্ত বাইরের মানুষ, গূঢ় বৃত্তান্ত সে কিছু জানে না—ধুরন্ধর বটুকনাথ বুঝে নিয়েছেন সেটা ভাল মতো।

প্রতি সোমবারে এলাকার সমস্ত চৌকিদার থানায় এসে হাজিরা দেয়। বিধি এই রকম। সোনাখালির চৌকিদার এসেছে। তাকে আলাদা ডেকে বটুক দারোগা জিজ্ঞাসাবাদ করেন। পচা বাইটার বাড়ির লোকে হয়তো জানে—পচা নেই, এই সুযোগে চাপাচাপি করলে কিছু আদায় হতে পারে।

চৌকিদার বলে, বউয়ের সঙ্গে বনিবনাও নেই। পচা আর পচার মা একজোট, বউ আলাদা। সেই যে কোমরে দড়ি দিয়ে পচাকে টানতে টানতে নিয়ে এল, তার পরেই শাশুড়ী-বউয়ে তুমুল ঝগড়া। বউয়ের গলাধাক্কা দিল শাশুড়ি, বউ এখন বাপের বাড়ি গিয়ে আছে।

ভাল খবর, আশার খবর। রাগের বশে বউ বলে দিতেও পারে। বাপের বাড়ির গ্রাম দূরবর্তী নয়, এলাকার ভিতরেই। বটুক-দারোগা লোক পাঠালেন, ভাইকে সঙ্গে করে বউ থানায় চলে এলো।

অল্পবয়সি, চেহারা মন্দ নয়। ভাইটা চুপচাপ পাশে দাঁড়িয়ে। সে-ই শিখিয়ে পড়িয়ে এনেছে। দারোগার পা জড়িয়ে ধরে বউ কেঁদে পড়ল : বাঁচান বড়বাবু।

ভয় পেয়েছে, বটুক-দারোগা তার উপর আরও ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করতে চান। বলেন, আমি বাঁচাবার কে! খামখেয়ালি ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে গিয়ে পড়েছে, হাতে মাথা কাটে। তবে এখনো যদি সরলভাবে সমস্ত বলেকয়ে মালপত্র বের করে দিস, দয়া হয়ে যাবে। নইলে পাঁচ-সাত-দশ বছর অবধি ঠেলে দিতে পারে। একেবারে মাথা পাগল তো!

পুলকিত হয়ে উঠে বউ তাড়াতাড়ি বলে, তাই যেন দেয় বড়বাবু। নেহাৎ পক্ষে পাঁচটা বছরের কম না হয়।

ভাই এবারে বাকিটুকু বুঝিয়ে দিচ্ছে : ভাই-বোনে নাবালক আমরা তখন, মামা কর্তা। টাকাকড়ি খেয়ে মামা চোর পাত্তর এনে জোটালেন। কিন্তু পাত্তরের পুরো খবর মামাও বোধ হয় টের পান নি। মনের ঘেন্নায় তিন তিন বার বোন গলায় দড়ি দিতে গেছে। খুব লম্বা মেয়াদে যদি ফাটকে নিয়ে পোরে, ভেবে নেব বোন আমার বিধবা। আর ঐ বুড়ি শাশুড়ীরও তখন ডাঁট থাকবে না, কেঁচো হয়ে যাবে।

বটুক-দারোগা সঙ্গে সঙ্গে কথা ঘুরিয়ে নেন : সেই জন্যেই তো বলছি মালপত্র বের করে দিতে। পাজি আইন আজকালকার—বমাল বিনে মামলা টেঁকানো মুশকিল। হয়তো দেখবি, খালাস হয়ে বাড়ি ফিরে ডবল করে তোদের জ্বালাচ্ছে।

বউ বিপন্ন কণ্ঠে বলে, আমি তো দলের বাইরে, মালপত্রের কথা আমায় কিছু বলে না। বুড়ি মাগি জানে সব। ধরে এনে ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে ওটাকে উল্টো

করে ঝুলিয়ে দিন, পেটের কথা সব বমি হয়ে বেরুবে ।

দারোগা ভেবে নিয়ে বললেন, ভাই-বোনে যাসনে তোরা এখন। বুড়িটা আসুক। দুপুরেটা এইখানে থাক।

খুব রাজি তারা। গলাধাক্কা দিয়েছিল, খোয়ারটা দেখবে এইবার। নয়ন ভরে দেখে যাবে।

রাত দুপুর। ঘরে-বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে পচা বাইটা গল্প করছে। মুখোমুখি সাহেব। বলতে বলতে কথার মাঝখানে হঠাৎ পচা চুপ করে যায়। ফিসফিসিয়ে বলে, মানুষ—

সাহেব চোখ তুলে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে বাইরে তাকায়। বলে, দেখতে পাইনে তো।

পচা খিঁচিয়ে উঠল ঃ চোখ আছে কি তোমাদের যে দেখতে পাবে! দুনিয়া-সুদ্ধ কানা। মানুষটা ছাঁচতলা হয়ে এবারে বেড়ার দিকে যাচ্ছে। চোখের উপর ছিল তখনই দেখতে পেলে না, এখন আর তুমি কি দেখবে ?

অথচ একটিবারও পচা জায়গা থেকে নড়ে নি। নড়ে ঘুরে দেখবার কৌতূহল এখনও নেই। যেমন ছিল তেমনিভাবে বসে ভুড়ুক ভুড়ুক করে তামাক টানছে, আর বলে যাচ্ছে দৈববাণীর মতো। পচার পিঠের উপরেও বুঝি দুটো চোখ বসানো—পিঠের চোখে দেখেই যেন বলছে ।

বলে, বেড়ার গায়ে মানুষটা এইবার ঠেসান দিয়ে দাঁড়াল। চোখ রেখেছে—উঁহু, উঁকি দিয়ে কি দেখবে অন্ধকারে ? শুনছে কান পেতে ।

কিম্বা বুড়ো হয়ে মাথার গোলমাল হয়েছে পচার। মনের সন্দেহ-বাতিক। সাহেব অবহেলার ভঙ্গিতে বলে, শুনুকগে। গল্পই তো শুধু, যত ইচ্ছে শুনে যাক। কিন্তু আমি ভাবছি, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা—রাতের কুটুম আপনার উঠোনেও আসে !

বাইটা গভীর নিশ্বাস ফেলল ঃ সে একদিন ছিল। এই সোনাখালি বলে কেন, আমায় খাতির করে আশপাশের পাঁচটা-সাতটা গাঁয়ে কোন কুটুম্ব পথ হাঁটত না নিশিরাতে। সে পচা বাইটা এখন মরে আছে।

কান পেতে আবার একটু কি শোনে। বলল, বাইরের মানুষ নয়, চলনে তাই বলছে। এ বাড়ির। আমার বউ শয়তানী মরে গিয়ে হাড়ে বাতাস লাগল। অনেক দিন আরামে ছিলাম। মরণ পর্যন্ত অমনি কাটবে ভেবেছিলাম, কিন্তু আর এক শয়তানী সংসারে ভর করেছে। ইচ্ছে করে, হারামজাদির মুণ্ডুটা চিবিয়ে খাই কচকচ করে।

দাঁত একটিও নেই বৃদ্ধের গালে। সেই কারণেই বোধ করি মুণ্ডের বদলে জোরে জোরে তামাক টেনেই আক্রোশ মিটাচ্ছে।

নিঃসন্দেহে সে মানুষ মুকুন্দর বউ—সুভদ্রা। চোরের সংসারে যার বড় ঘৃণা। কোন একদিন ধর্ম-বাসা বাঁধবার আশায় স্বামীকে পাপ-সংসার থেকে

সরিয়ে দিয়েছে। বার-কয়েক কেশে নিয়ে পচা বাইটা আবার গালিগালাজ শুরু করে দিল।

বলে, যত নষ্টের গোড়া ছোটবউমা। ভাল গৃহস্থ-ঘর দেখে মেয়ে আনলাম—দুটো দিন যেতে না যেতে দেখি, মেয়ে নয় বিচ্ছু। আরও ভুল, মুকুন্দটাকে ইস্কুলে পাঠানো। বিদ্যে শিখলে পৌরুষ থাকে না, ছিটেমন্তোর দিয়ে বউ তাকে গুণ করে ফেলেছে। উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে, বাঘের মতন ডরায় বউকে। বর্ধনবাড়ি কোনদিন ধর্মকর্ম ছিল না, ওর শাশুড়িও পেরে ওঠেনি, ইচ্ছে হলে বাপের বাড়ি গিয়ে সেরে আসত। ছোটবউমা এসে ব্রত-নিয়ম, পুজো-আচ্চা ঢোকাচ্ছে। ছেলেটারও শতেক খোয়ার—আধা-বিবাগী হয়ে ফুলহাটা ইস্কুল-বাড়ি থেকে হাত পুড়িয়ে রেঁধে-বেড়ে খায়।

যত বলে উত্তেজিত হয়ে উঠে ততই। সাহেব জিজ্ঞাসা করে, এত রাত্রে ঘুরে ঘুরে বেড়ান কেন উনি?

আমি ঠিক মতন আছি না বেরিয়ে পড়েছি, সারারাত সেজন্য তক্কে তক্কে থাকে। ধর্মের পাহারাওয়ালা। ঘুমোবে না পণ করে টহল দিয়ে বেড়ায়। কিছু দেখলেই চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবে। ওরে হারামজাদি, তুই বেড়াস ডালে ডালে—আমি বেড়াই পাতায় পাতায়। রাতে বেরুব না—আবদার! অন্তত একটা বার যদি বেরুতে না পারি, তিন দিনেই তো অক্কা। সেই বেরুনো তুই ধরতে যাস কালকের কাঁচা-ফক্কোড় মেয়ে!

বিরক্তিভরে সাহেবকে হঠাৎ বলে উঠল, যা যা, চলে যা আজকে তুই। গল্প কাল-পরশু যেদিন হয় হবে। হারামজাদি ছোট বউমার কানে ঢুকলে এই সব নিয়ে খোঁটা দেবে আমায়।

সাহেবও তাই চাচ্ছে। বাইরে গিয়ে বেড়ার ধারে গিয়ে দেখবে। চোখে না দেখে এই যে পচা বলে দিল, পরখ হবে তার কথা।

সাহেব বেরিয়েছে। জমাট-বাঁধা এক টুকরো অন্ধকারও সাঁ করে সরে গেল বেড়ার কাছ থেকে। পালায় না কিন্তু, দূরে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। পথের মুখে জামরুলতলায়—ঐখান দিয়ে বাইরে যেতে হয়। সাহেবের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। শিকারি জন্তু ওত পেতে রয়েছে যেন।

আরও কিছু এগিয়ে যেতে যেচে কথা বলল সুভদ্রা-বউ। এই পাড়াগাঁ জায়গায় বউরা তো লম্বা ঘোমটা টেনে আড়ালে আবডালে বেড়াবে। কিন্তু এ বউয়ের খাপছাড়া রকমসকম। স্বল্পপরিচিত বিদেশি ছোকরা—মানুষটাকে নিজেই এসে ডাকছে। 'আপনি' বলছে প্রথম দিনটা: ও কি! দাঁড়িয়ে পড়লেন—ভয় পেয়ে গেলেন নাকি ঠাকুরপো? এই রাত্তিরে ভয় তো মেয়ে-মানুষেরই পাবার কথা।

খুকখুক করে চাপা হাসিও যেন কথার সঙ্গে। দ্রুতপায়ে সুভদ্রা-বউ

একেবারে সামনে চলে এলো। ব্যবধান বোধ করি এক বিঘতও নয়। পচার ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে ফিসফিস করে ধমক দেয়ঃ মানুষটা কান দিয়ে দেখতে পায়। কাছে না এসে কি করে কথাবার্তা বলি? আপনি ঠাকুরপো, মেয়েমানুষের মতো লাজুক। চেহারাতেও ঠিক তাই। মেয়ে যদি হতেন, কোন এক রাজপুত্তুর হরণ করে রাজবাড়ি নিয়ে তুলত। আপনি আসেন. রোজ রোজ দেখতে পাই। ক'দিন সেই বড় বৃষ্টি-বাদলা গেল, তা-ও কামাই নেই। এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে টুক করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েন। ভারি বজ্জাত চোর আপনি!

এবার হেসে সাহেব বলে, আপনিও কিন্তু বড় ঝানু গৃহস্থ! বৃষ্টি বাদলার মধ্যে সজাগ থেকে চোর পাহারা দেন। আজকে একেবারে হাতেনাতে ধরে ফেললেন।

সুভদ্রার কণ্ঠ হঠাৎ কেঁপে উঠল অন্ধকারের ভিতর। বলে, সবাই ঘুমোয়। এ বাড়িতে ঘুম নেই দুটো মানুষের! আমার আর ও ঘরের ঐ বাসি বাইটার—

না, সাহেব ভুল ভেবেছিল। তীক্ষ্ন নজর ফেলে দেখে, হাসছেই তো সুভদ্রা। বলে, শ্বশুরের নাম ধরতে নেই কিনা। আমি তাই বলি, বাসি বাইটা। জিনিস যত ভালোই হোক, বাসি হওয়ার পরে আমার শ্বশুর হয়ে যাবে। বলুন তাই কিনা।

আবার বলে, এ তবু ভাল। আমার বড়দিদির কথা শুনুন। ভাসুরের নাম তুলসি, বর হল মধু। কবিরাজি অষুধ খায়। বলে, অষুধের সঙ্গে কবিরাজ অনুপান দিয়েছে ভাসুরের রস আর আমার তেনার ছিটে। বুঝলেন তো ঠাকুরপো? মধুর ছিটে তুলসিপাতার রসে—নাম ধরতে পারে না, তাই অমন বলছে।

মুখে কাপড় দিয়ে হাসছে এবার। ঘরের মধ্যে ওদিকে পচা বাইটা নতুন এক ছিলিম চড়িয়েছে। ফড়ফড় করে হুঁকো টানার আওয়াজ।

পচা বাইটার মা'কে থানায় নিয়ে এলো। থুনথুনি বুড়ি। পচা আজকে তেমাথা-মানুষ, বুড়ি সেই সময়টা অবিকল তাই। বটুক-দারোগার কাছে এনে তাকে হাজির করল।

বউকে দেখতে পেয়ে স্থান-কাল ভুলে বুড়ি করকর করে ওঠেঃ লাজলজ্জার মাথা খেয়ে এইখানে উঠেছিস—সর্বনাশের মূলে তবে তুই? সতী নারী স্বামীর দোষ ঢেকে বেড়ায়, তুই সর্বনাশী মিছামিছি লাগিয়ে স্বামীর হাতে দড়ি দিলি! উপরওয়ালা সব দেখতে পায়,—দেখে দেখে লিখে রাখে। হাতে যেদিন পাবে, বুঝতে পারবি সেইসময়। নরকে নিয়ে ঠাসবে।

বউয়ের সংক্ষিপ্ত উত্তর। ভাইকে বলছে, চোরানি কি বলে, শোন দাদা। আমার নরকবাস, ওঁর জন্য স্বর্গধামে গদির বিছানা পেতে রেখেছে! গেলেই

তো হয় সেখানে, সৃষ্টি-সংসার রক্ষে পেয়ে যায়।

লেগে গেল শাশুড়ি-বউয়ে। ঐ থানার উপরে। স্বয়ং বড়বাবু থেকে চাকর-বাকর সবাই দাঁত মেলে পরম পরিতৃপ্তিতে শুনছে। তারপরে একসময় বটুক-দারোগার কর্তব্যের কথা স্মরণ হল : থাম, থাম! কী হচ্ছে, সরকারি অফিস নয় এটা?

হুঙ্কার দিয়ে কলহ থামিয়ে বুড়িকে বললেন, কতটুকু কী আর জানে বউ, কী বলবে! বাড়ির বউকে মায়ে-পোয়ে তোমরা তো বিশ্বাস করো না। বউ শুধু বলল, শাশুড়ি-ঠাকরুনের ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে চামচিকের মতন কড়িকাঠে ঝুলিয়ে দাও, মালের খবর বেরিয়ে আসবে। কিন্তু তুড়ুম রয়েছে আমাদের, অত বাঁধাবাঁধির দরকার কি? তুড়ুমটা কেউ একবার দেখিয়ে দাও বুড়ি-মাকে—

তুড়ুম দেখিয়ে পদ্ধতিটা সবিস্তারে বুঝিয়ে বুড়িকে আবার দারোগার কাছে নিয়ে এলো।

দেখলে?

বুড়ির কিছুমাত্র ভয়ের লক্ষণ নেই। বটুক-দারোগা হাস্যমুখে তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে তারিফ করেন : এই মা না হলে অমন ধুরন্ধর ছেলে! পাতিশিয়ালের গর্ভে মেনিবিড়াল জন্মে না কখনো।

বুড়ি বলছে, মালের খবর কিছু জানিনে বাবা। কাজটা আমার পঞ্চাননেরই নয়। ভুল খবর পেয়েছে।

খবর বাইরের মানুষের কাছ থেকে নয়। নিজেই একরার করে টিপসই নামসই দু-রকম দিয়েছে।

একরারনামার নকল আদ্যপান্ত বুড়িকে পড়ে শোনালেন। বলেন পড়েছেও সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে। যার নাম বিলাতি গোখরো! জলপানেই ওদের আধখানা করে গরু-শুয়োর লাগে, মেজাজটা কেমন এই থেকে বুঝে নাও।

বুড়ি বলে, তোমাদের যন্তোরে চাপিয়ে বাছার মুখ থেকে আবোল-তাবোল বের করে নিয়েছ। আজ চার মাস সে পায়ের ব্যথায় বিছানায় শুয়ে। সমস্ত মিথ্যে, পঞ্চানন এর মধ্যে ছিল না। যাতে সে রক্ষে পায়, তাই করে দাও বাবা। আমরা তোমার কেনা হয়ে থাকব।

শুধুমাত্র মানুষ কিনে কারো সন্তোষ লাভ হয় না—বুড়ি অতএব কথাটা স্পষ্ট করে দেয় : যাতে খালাস হয়ে আসে, তাই করে দাও। ন্যায্য গণ্ডা দিতে পঞ্চানন আমার কসুর করে না। বেরিয়ে এসে খুশি করে দেবে।

আর কী চাই। বটুক নিজে যে কথা বলতে চাচ্ছিলেন, বুড়ির মুখ দিয়ে তাই বেরুল। উঠে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে এলেন। মুখ বাড়িয়ে পচার বউকে বললেন, তোমাদের দরকার নেই, বাড়ি চলে যাও এবারে তোমরা।

আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন চেয়ারে। বলেন, এই জন্যেই তো ডাকিয়ে এনেছি মা। বুড়োমানুষ বলে আগে কষ্ট দিতে চাইনি—বউকে ডাকিয়ে

আনলাম, তাকে দিয়ে যদি হয়ে যায়। তা দেখলাম, বউটা কাজের নয়, একেবারে বাজে।

বুড়ি মিনমিন করে বলে, মাল কোথায় যে বের করব? আমরা কিছু জানিনে বড়বাবু।

বটুক বলেন, বউ যা বলল তোমার মুখেও অবিকল সেই কথা। আমাদের কিন্তু শোনা আছে বাইটা খুব মাতৃভক্ত, মাকে না বলে কিছু করে না। উপায় যখন নেই, কি হবে! পড়েছে পাগলা সাহেবের হাতে, দেবে নিশ্চয় বছর-দশেক ঠুকে। তোমার জীবনে ছেলের সঙ্গে দেখা হবে না। যাও বাড়ি চলে যাও।

কথাবার্তা শেষ করে দরজার কপাট খুলে দিয়ে দারোগা কয়েকটা ফাইল টেনে নিয়ে বসলেন। অর্থাৎ বিদায় হয়ে যাও—আমাদের যা করণীয়, করি এবার আমরা।

ক্ষণপরে চোখ তুলে বললেন, বসে আছ এখনো? বুড়োমানুষ যাবে তো এতটা পথ—

বুড়ি বলে, মামলা সত্যি তুলে নেবে তো?

বটুক-দারোগা বিরক্ত হয়ে বলেন, এক কথা কতবার বলি। মাল ফেরত ডেকে দিই, তার মুখেই শুনে যাও।

বুড়ি আর একটু ভেবে নিয়ে বলে, মুখের কথা মানিনে বাবা। ইস্টাম্বর-কাগজে লেখাপড়া করে দিক।

ইস্টাম্বর অর্থাৎ স্টাম্প। স্ট্যাম্প-কাগজে নিধিরাম দস্তুরমত দলিল করে দিক, পচার নামের মামলা তুলে নেবে। তবেই বুড়ি বিবেচনা করতে পারে। হল তাই—চার আনার স্ট্যাম্প কাগজে এগ্রিমেণ্ট হল, স্থানীয় কয়েকজন সাক্ষি হলেন। কুটে-নিধে ও থানার কয়েকজন বুড়ির সঙ্গে সোনাখালি চলল—মালের হদিস দেবে সে এইবারে।

পচা বইটাও এদিকে সদর থেকে ফিরল। ছোটবাবু বলে, শয়তানিটা দেখুন একবার। স্বেচ্ছায় সমস্ত স্বীকার করে রিচার্ডসনের কাছে ডাহা বদনাম দিয়ে এল, একরার নাকি জোর করে আদায় হয়েছে।

বটুক-দারোগা চোখ পাকিয়ে বলেন, বলেছিস এইসব?

সবিনয়ে পচা বলে, আজ্ঞে হাঁ। প্রাণ বাঁচানোর জন্য বলতে হল বড়বাবু। নয়তো রেহাই ছিল না, পাগলা সাহেব ফাটকে পুরত। সামনে নতুন মরসুম, সেই সময়টা ফাটকে ঢুকে পড়ে নবাবি করব—তা হলে কাজকর্মের কি, সংসার চলবে কিসে? ইতর-ভদ্দোর দশজনে যারা মুখের পানে চেয়ে আছে, তারাই বা কি বলবে?

বটুক বলেন, তবে বেটা একরার করতে গেলি কেন? আমাদের বেইজ্জতির জন্যে?

সে-ও প্রাণ বাঁচানোর দায়ে। সবাই বলেছে, ঘা-খানা তোর ভাল নয় পচা।

ভাল ডাক্তার দেখা, নয়তো জন্মের মতন খোঁড়া হয়ে থাকবি, ভয় হয়ে গেল বড়বাবু। বলি, সদরের সাহেব ডাক্তারের চেয়ে তো বড় হয় না। মা-কালী সুবিধা করে দিলেন, আপনার মতন মানুষ নিজে চড়াও হয়ে পড়লেন গরিবের বাড়ি। নিখরচায় ডাক্তার দেখিয়ে নেব, অথচ ফাটকে যাব না—তার কায়দাটা কি? থানায় একবার করে সদরে গিয়ে বেকবুল যাব। হাজতে পাঠিয়ে দিয়ে প্রমাণের জন্য তদন্তে আসবে, মাল বের করবার চেষ্টাচরিত্র করবে। সেইসব হতে থাকুক, পায়ের ঘা তার মধ্যে ভাল হয়ে যাবে।

নিশ্বাস ফেলে পচা বলে, এইরকমই তো হবার কথা বড়বাবু, বলুন, হয়ে আসছে কিনা বরাবর। কপালের দোষে নয়-ছয় হয়ে গেল। এত বড় একখানা মামলা সাজিয়ে সদর অবধি চালান করলেন, এক কথায় ডিসমিস। আপনাদের বেইজ্জত করেছি—বলুন দিকি, আমি না ঐ পাগলা সাহেব? সাহেবের দোষটা এখন আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছেন।

দারোগা গর্জন করে ওঠেন: অত্যাচার করে কথা বের করেছি—সাহেবের কাছে তুই বদনাম দিয়ে এলি। তা-ও পারি। মিথ্যে বলে এসেছিস, সত্যি হোক এবারে। তোকে ছাড়ব না।

পচা সকৌতুকে বলে, তুড়ুমে শোয়াবেন বুঝি বড়বাবু?

সেকালের কাহিনী বলতে বলতে আজকের বৃদ্ধ পচা বাইটা খিকখিক করে উৎকট হাসি হাসে: বটুক-দারোগা তুড়ুমের ভয় দেখিয়ে কথা বের করবে, আ আমার কপাল! টেমিটা জ্বাল দিকি সাহেব, একটা জিনিস দেখাই।

হাঁটুর কাপড় তুলে পচা কালো কালো দাগ দেখাল। বলে, টেমি ঘুরিয়ে পিঠের দাগগুলোও দেখে নে। গরম কলকেয় ছ্যাঁকা-দেওয়া—সেই সব দাগ গোল। আর চিমটে-বেড়ি পুড়িয়ে ধরে লম্বা দাগগুলো করেছে।

সাহেব অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে: ওরে বাবা!

এতেই বাবা বলিস। এসব তো আনাড়ির হাতের মোটা কাজ। গায়ে দাগ করে দিয়ে নিজেরাই শেষটা বিপদে পড়ে। ঝানুদের আলাদা কায়দা। পেটের ভিতর সিকিখানা কথা থাকতে দিল না, কিন্তু মানুষটার গায়ের উপর আঁচড়টি নেই—শ্বশুরবাড়ির খাটে শুয়ে পা দোলাচ্ছিল যেন সে এতক্ষণ। জো-সো করে একটা আসামিকে হাতকড়া পরালে তো তারপরে আর দেরি হবে না। দশ দিকে দশজনে বেরিয়ে হুড়মুড় করে একগাদা ধরে নিয়ে এলো। জিয়ানো মাছ যেমন তুলে নিয়ে আসে। কিনা, ধর্মে মতি হয়ে পয়লা লোকটা সমস্ত বলে দিয়েছে। ধর্মে যাতে মতি আসে, নানাবিধ তার কায়দাকানুন। বাইরের লোকে টের পায় না, এমন কি উপরওয়ালারাও না।

পচা বাইটার নিজেরই উপর বিস্তর রকম হয়ে গেছে। তারই দু-চারটে বলে স্মৃতি থেকে। আর তামাক টানে।

ছাই-ভরতি বস্তায় মুখ ঢুকিয়ে সেই বস্তা এঁটেসেঁটে বেঁধে দিল : নিশ্বাস নিতে গিয়ে ছাই উঠে নাক বুজে যায়। হাত-পা বেঁধে হাঁটুর নিচে বাঁশ চালিয়ে দিয়েছে ; বাঁশের দুই প্রান্ত ধরে দুজনে দোল দিচ্ছে ; দোলনে জোর দিয়ে দুমদুম করে মানুষটাকে আছড়ে মারে দরজার গায়ে। নাক ও কানের ফুটোয় লংকার গুঁড়ো দিয়ে দেয়। ঝুলিয়ে দেয় মানুষটাকে—হাতে পায়ে চুলে গোঁফে ঝোলানোর হরেক পদ্ধতি। দু-হাতের বুড়োআঙুলে দড়ি বেঁধে আড়ার সঙ্গে ঝোলায় ; শুধুমাত্র পায়ের বুড়োআঙুল মাটিতে ঠেকবে ; অজ্ঞান হয়ে যাবে এই অবস্থায়, নামিয়ে তাউত করে আবার ঝুলিয়ে দেবে ঐরকম। কাঁটার বিছানায় শোয়াবে। উপুড় করে ধরে মাটিতে মুখ ঘষবে। নখের মধ্যে বাবলাকাঁটা কিংবা সুঁচ ফোটাবে। রাতে ঘুমুতে না দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে আর প্রশ্নের পর প্রশ্ন করবে ; প্রশ্নকর্তার ঘুম ধরে গেল তো তার জায়গায় আর-একজন এসে প্রশ্ন করছে। আর-এক কায়দা—চারপায়ার সঙ্গে বেঁধে ফেলল মানুষটাকে, পা দুটো বেরিয়ে আছে ; পাকা বাঁশের লাঠি দিয়ে মারছে সেই পায়ের তলায় ; দাগ হবার শঙ্কা নেই, নির্ভাবনায় মেরে যাচ্ছে ; একজনের হাত ব্যথা করল তো আর একজন আসছে। আগুনের প্রক্রিয়া আর জলের প্রক্রিয়া : আগুনের চিহ্ন কিছু কিছু রয়ে গেছে পচা বাইটার গায়ে। সাঁড়াশি চিমটা কলকে অথবা জ্বলন্ত কাঠই গায়ে চেপে ধরে, নাক-কানের ফুটোয় গরম তেল ঢেলে দেয়। শীতের রাত্রে নগ্ন গায়ে জল ছিটিয়ে চাবুক মারে ; খানিক মার হয়ে গেলে আবার জল ছিটায়। দুজনে পাখা করে যাচ্ছে দু-দিক থেকে।

সকলের চেয়ে সাংঘাতিক হল, নাভির উপর গুবরে-পোকা ছেড়ে দেওয়া। বাটি চাপা দেওয়া আছে, পোকা যাতে বেরিয়ে না যায়। পথ না পেলে পোকা তখন নাভির মুখে শুঁড় ঢুকিয়ে গর্ত খুঁড়তে লাগল। এমনি কত! এসব পুরানো পদ্ধতি, মান্ধাতার আমল থেকে চলে আসছে। একালের ধুরন্ধরেরা আরও কত নতুন নতুন বের করছে। সকল জন্তুর মধ্যে মানুষ বুদ্ধিমান। নিজের জাত জব্দ করতে মানুষের মতন কে পারবে ?

পচা বাইটার স্পষ্ট কথা : ভয় দেখিয়ে কিছু হবে না বড়বাবু। মারধোরেও কায়দা করতে পারবেন না ! পুরোনো ঘাগি, বিস্তর ঘাটের জল খাওয়া আছে। আইনকানুন অজানা নেই। মালের খবর পাবেন না। বলেন তো আরও একবার না-হয় একরার সই করে দিচ্ছি, উপরে গিয়ে বেকবুল যাব।

বটুক-দারোগা বলেন, মালের খবর কে চাচ্ছে ? ব্যবস্থার বাকি আছে নাকি ? রিচার্ডসনের কাছে নিন্দে করে এলি, মেরে খানিকটা হাতের সুখ করব।

পচা হেসে আকুল : সুখ হবে না বড়বাবু, হাত ব্যথা হবে। যত ইচ্ছে মারুন, আমার অঙ্গে সাড় লাগবে না। চামড়ার নিচে রক্ত-মাংস নিয়ে এ লাইনের কাজকর্ম হয় না। গোড়ায় দু-চার বছর হয়তো ছিল, রক্ত-মাংস শুকিয়ে

এখন পাথর। পাথরে হাতের কিল মারুন কিংবা লাঠির বাড়ি মারুন, নিজেরই কষ্ট। দেখুন না পরখ করে। আপনার মতো অনেকেই অনেক রকম চেষ্টা করে দেখেছে, গায়ে কিছু চিহ্নও আছে। সেইগুলোই একবার চোখে দেখুন।

পিঠের ও পায়ের দাগ দেখে বটুক-দারোগা বুঝলেন, চেষ্টা করা বৃথা। এমনি সময় পচার মা কুটে-নিধে এবং পুলিসের দলটা পথের মোড়ে দেখা দিল। সোনাখালি থেকে ফিরছে। এবং উল্লাস দেখে বোঝা যায়, ষোলআনা কার্যসিদ্ধি।

বটুক-দারোগা বলেন, মালের খবর তোকে দিতে হবে না, তোর মা-বুড়ি বলে দিয়েছে। মাল নিয়ে ঐ আসছে ওরা, দেখ চেয়ে।

পচা বাইটা তিলেকমাত্র বিচলিত নয়। বলে, আমার মা দেবে খবর! বরঞ্চ বলুন আকাশের এক চাংড়া উঠোনে ভেঙে পড়েছে, ঝাঁটায় মুখে কুড়িয়ে নিয়ে এলো। সেটা তবু প্রত্যয় পেতে পারি। আমি যদি একগুণ হই মা আমার এক-শ গুণ। মায়ের গুণেই যা আমার শিক্ষাদীক্ষা।

বুড়িমানুষ পচার মা থপথপ করে আসছে, বেশ খানিকটা দূরে আছে তখনো। জমাদার স্ফূর্তির চোটে ছুটে এসে সর্বাগ্রে খবরটা দেয়ঃ কী জায়গায় সেরেছিল বড়বাবু। মাঠের মধ্যে খেজুরগাছ জড়িয়ে মস্ত বড় অশ্বত্থগাছ, তার গোড়ায় ফোকর। ফোকরের ভিতর মালসার মুখে সরা চাপা দিয়ে মাল রেখেছে। উপরে ঘাসের চাপড়া। না বলে দিলে খুঁজে বের করবে, কারও বাপের সাধ্যি নেই!

পচা বাইটা চকিতে ফিরে তাকাল। দলটা উঠানে এসে পড়েছে। পচা আর্তনাদ করে ওঠেঃ ও মা, তুমিই শেষে বের করে দিলে—তোমার এই কাজ?

বুড়ি এসে ছেলের হাত চেপে ধরল। দারোগাকে বলে, দাও বাবা, আমার পচাকে। নিয়ে চলে যাই।

ধূর্ত হাসি হেসে বটুক বলেন, নিয়ে আর যাবে কোথায়? গ্রামসুদ্ধ লোকের মোকাবেলা বমাল বের করে দিয়েছ, তুমিও বুড়ি বাদ যাচ্ছ না। মায়ে-পোয়ে সদরে একসঙ্গে চলে যাও। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একবার বেকবুল করে এসেছে পচা। মিথ্যে কথায় সাহেব ক্ষেপে যায়। আগের বার যা দিত, এবারে তার ডবল করে ঠেসে দেবে দেখো।

বুড়ি ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, দারোগার একটা কথাও যেন বুঝতে পারে না। মালসা থেকে চোরাই মাল তুলে তুলে জমাদার সকলকে দেখাচ্ছে, আর শতকণ্ঠে নিজেদের বাহাদুরির কথা বলছে।

হঠাৎ বুড়ি চিৎকার করে ওঠেঃ যাব আমি সদরে। কুটে-নিধে ইস্টাম্বর কাগজে দলিল করে দিয়েছে। দারোগা, তোমায় সাক্ষি মানব। সাহেবের কাছে বিচার চাইব।

বটুক হি-হি করে হাসেনঃ আইন জান না বুড়ি। চোরাই মামলার ফরিয়াদি মহামান্য সরকার বাহাদুর। নিধিরাম যাচ্ছেতাই লিখে দিকগে, তার কি ক্ষমতা আঁছে মামলা তুলে নেবার!

পচার মা ভেঙে পড়ল ঃ ধাপ্পা দিয়েছ বাবা বুড়োমানুষের সঙ্গে ? তোমাদের ধর্মাধর্ম নেই ? আমার পচা বেঁচে যাবে—আমি যে বড় আশায় মালিকের হেপাজতে মাল দিয়ে দিলাম।

জমাদার বলে, চোরাই মাল বের করেছ বুড়ি—পচা বাঁচলেও তোমার বাঁচন নেই। তোমায় নিয়ে ফাটকে পুরবে।

পচা গর্জন করে ওঠে ঃ ফাটকে পুরবে আমার মাকে ? মা কী জানে! এজলাসে দাঁড়িয়ে সমস্ত খুলে বলব। চোর আমিই। মাল রাখবার সময় মা কেমন করে দেখে ফেলেছিল। চোর ধরিয়ে দিল, আমার মায়ের সরকারী পুরস্কার তার জন্যে।

সেই প্রথম পচা জেল খাটতে গেল। ক্রুদ্ধ রিচার্ডসন রীতিমত ঠেসেই দিয়েছিল।

গল্প শেষ করে পচা বাইটা বলে, কথা ক্ষণে অক্ষণে পড়ে যায় রে সাহেব। বটুক-দারোগা যা বলেছিল—জেল থেকে বেরিয়ে এলাম, মা তখন নেই। মামলার রায় দিয়ে দিল. আদালতের বাইরে এনে কয়েদি-গাড়িতে আমায় টেনে তুলল। বটতলায় তখনো মা দাঁড়িয়ে আছে। মা আমার ডুকরে কেঁদে উঠল, কান্না শুনতে শুনতে চলে গেলাম। সেই আমার শেষ দেখা মায়ের সঙ্গে।

চুপ করল পচা বাইটা। ঘর অন্ধকার। সাহেব তাড়াতাড়ি আর-এক ছিলিম তামাক সেজে আনে। হুঁকা হাতে নিয়ে বাইটা বসে আছে, টানে না। মায়ের কান্না এখনো যেন শুনছে। পচাই আবার না ডুকরে কেঁদে ওঠে তার সেই মরা মায়ের মতন।

সাত

বেরিয়ে যাচ্ছে সাহেব। জামরুলতলায় ছায়ামূর্তি।

ও-ঠাকুরপো, শুনুন শুনুন। রোজ রোজ কী আপনাদের বলুন তো ? কী অত ফুসফুস গুজগুজ বাসি বাইটার সঙ্গে ?

গল্প শুনি। ভাল ভাল গল্প করেন উনি, ভারি মজাদার।

তিক্তকণ্ঠে সুভদ্রা বলে, ঐ কাজটাই পারে এখন শুধু। কবে নাকি তাল-পুকুরে হাতি ঘোড়া তলিয়ে যেত, এখন ঘটি ডোবে না। বিঘত প্রমাণ জলও নেই—ঐ যে নাম করতে পারিনে, বাসি কাদাই সার। পারে না কিছুই—জাঁক করে তবু খারাপ নামটা বজায় রেখে যাচ্ছে। ঘেন্নাপিত্তি থাকলে কেউ করে না। কবে যে মরবে হাড়-জ্বালানো বাসি বুড়ো—

সাহেবের কাছ ঘেঁষে এসে বলে, গেল-শীতকালে, জানেন ঠাকুরপো, এক দুপুরে নাড়ি বসে গেল। কনুই অবধি টিপে টিপে নাড়ি পায় না। সোয়াস্তির শ্বাস ফেলি ঃ বিধাতা সদয় হলেন বুঝি এতদিনে ! রান্নাঘরে রাত্রের জন্য মাছ

ভেজে রেখেছে। এর পরে তো ক'দিন নিরামিষ চলবে—ভাবি, ওগুলো মিছে নষ্ট হয় কেন? রান্নাঘরে ঢুকে সকলে মিলে তাড়াতাড়ি শেষ করে কাঁদবার জন্য তৈরি হয়ে আছি। আঁচলে লঙ্কার গুঁড়ো বেঁধে নিয়েছি—চোখে জল না এলে এক টিপ চোখের ভিতর দেব। ওমা, সমস্ত ফুসফাস—সন্ধ্যে নাগাত বুড়ো উঠে বসে খাই-খাই করছে। মাছগুলো সব সেঁটে দিয়েছিস, বলি, পুকুর কাটা কার পয়সায়? দেখেশুনে ভরসা ছেড়ে দিয়েছি ভাই। কচুর পাতা মুড়ি দিয়ে এসেছে, যমরাজ দেখতে পায় না। ও-বুড়ো কোনদিন মরবে না।

হঠাৎ বুঝি বউয়ের গলাটা ধরে আসে ঃ ঐ লোকের জন্য একজনকে ঘরবাড়ি ছেড়ে দেশান্তরী হতে হল। আমিও পা বাড়িয়ে আছি। বাসা করবে শিগগির —বাইটা-বাড়ির মুখে লাথি মেরে চলে যাব।

সাহেব বলে, তাঁকে আমি জানি। ভাব-সাব হয়েছে তাঁর সঙ্গে।

কেমন করে ভাই? কোথায়?

সাহেব বলে, অনেক দিন ছিলাম যে ফুলহাটায়। তাঁর পাঠের আসরে গিয়ে বসতাম। আমার ছোড়দা তিনি, আমি সাহেব-ভাই।

সুভদ্রা ব্যাকুল আগ্রহে বলে, আসুন না ঠাকুরপো রোয়াকে বসে দুটো গল্প করে যাবেন। শুনি সেখানকার কথা। ভিতর-বাড়ির ঐ রোয়াক। সকলে ঘুমুচ্ছে, টের পাবে না। এ পোড়া-বাড়িতে কথা বলার একটা মানুষ পাইনে।

পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। বুঝি বা হাতই ধরে ফেলে। সাহেবের ভয় ভয় করছে। বলে, আজ থাক বউঠান, আর একদিন।

এঁকেবেঁকে পালাল। কাজটা রপ্ত আছে ভাল মতন। পাহারাওয়ালা পারে না, গাঁয়ের বউ কি করে ধরবে!

এর পরে সাহেব আরও গভীর রাত্রে অতি সতর্কভাবে আসে, সুভদ্রা বউয়ের কবলে পড়ে না যায়। গল্পগুজব বেশ চলছে, খাতির জমেছে পচার সঙ্গে। কিন্তু আসল কাজের কিছুই হল না এতদিনে। একটু-আধটু ইঙ্গিত দিলে বাইটা-মশায় নতুন কোন জোরালো গল্প ফাঁদে।

একদিন মরীয়া হয়ে সাহেব স্পষ্টাস্পষ্টি বলে বসল, বিদ্যেসাধ্যি কিছু দিতে হবে বাইটামশায়। আশায় আশায় দূর-দুরান্তর থেকে এসেছি।

পচা উড়িয়ে দেয় একেবারে ঃ বিদ্যে? সেসব কোনকালে হজম হয়ে গেছে। কোন বিদ্যে নেই এখন। থাকলে বুঝি হেনস্থা সয়ে এদের সংসারে পড়ে থাকি! যাও তুমি, চলে যাও, আর এসো না।

ওকথা বললে শুনছিনে বাইটামশায়। খালি হাতে কেন যেতে যাব? দেবেন কিছু, তারপরে যাবার কথা।

বাইটা রেগে বলে, গায়ের জোরে আদায় করবি?

আপোষে দিলেন আর কই!

হাসতে হাসতে পা-দুটো জড়িয়ে ধরতে যায়। ধক্ করে চোখ জ্বলে উঠল বুড়োর। দুই হাঁটুর মধ্যে ঘাড় গুঁজে হুঁকো টানছিল। কলকে ছুঁড়ে মারল রাগ করে। আগুন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সাহেবের গায়েও পড়ল আংরার কয়েক টুকরো, কাপড় পুড়ে গোল গোল ছিদ্র হয়ে গেল। হাসছিল সাহেব—মুখের উপর এখনো তেমনি হাসি।

পচা বাইটা চোখ মিটমিট করে দেখছে। যেন কিছুই হয়নি—কলকে কুড়িয়ে সাহেব নতুন করে তামাক সেজে পচার হুঁকোর মাথায় বসিয়ে বলে, খান—

পচা হঠাৎ বলে, ছেঁক লেগেছে নাকি রে?

তাকিয়ে দেখে অবহেলার ভাবে সাহেব বলে, নাঃ!

ঠোলা উঠেছে ঐ যে—মিথ্যে বলছিস?

কি জানি, ঠাহর হয়নি তো—

ঘুরে বসে ঠোসকা-ওঠা জায়গাটা পচার চোখের আড়াল করল। কি ভেবে তারপর বেড়ার একটু চোঁচ ভেঙে নিয়ে ছেঁদা করে দিল ঠোসকাগুলো। জল বেরিয়ে গিয়ে চামড়া সমান হয়ে যায়, চোখে দেখে কেউ ধরতে পারবে না।

পুরো ছিলিম শেষ করে পচা প্রশ্ন করে, জ্বালা করছে না?

সাহেব একগাদা কথা বলে এবারঃ কী আশ্চর্য! দু-চারটে ফুলকি পড়েছে কি না পড়েছে, তার জন্যে ঠোলা উঠবে, জ্বালা করবে—আপনার শ্রীচরণে বসতে এসেছি তবে কোন সাহসে? শহুরে ছেলে শহরের খোপেই তা হলে পড়ে থাকতাম, ভাঁটিমুলুকে আসতাম না।

দন্তহীন মাড়িতে পচা একগাল হাসল। হুঁকো রেখে দিয়ে এইবারে সে শুয়ে পড়ে। বলে, রাত হয়েছে, ঘরে চলে যা। আর একদিন তোর কথা শুনব।

শুয়ে পড়েছে কুণ্ডলী হয়ে—সোজা হয়ে শোবার শক্তি নেই? বাইটার মুখে হাসি দেখে সাহেবের বড় স্ফূর্তি। পাশে বসে মোলায়েম হাতে পা টিপতে লাগল।

পচা বলে, ওকি রে?

পদসেবা করতে দিন। আমি তো কিছু চাচ্ছিনে।

বেটাচ্ছেলে বড় সেয়ানা তুই! ভারি নাছোড়বান্দা!

আর কোন উচ্চবাচ্য না করে পচা চোখ বোঁজে। বুড়োমানুষের ঘুম বেশিক্ষণ থাকে না, ক্ষণপরে চোখ মেলল। সাহেবের নিরলস হাত চলেছে।

নড়েচড়ে উঠে পচা বলে, আওয়াজ শুনতে পাস?

সাহেব কান পাতে। নিঃসাড় হয়ে শোনার চেষ্টা করে। মৃদু শব্দ একটু কানে আসে বটে। বলে, দেখে আসি—

পচা বাইটা বলে, না দেখেই বলে দিচ্ছি। কুকুর ঘুমুচ্ছে জামরুলতলার উত্তরে। তাই কিনা মিলিয়ে দেখ গিয়ে।

আবার বলে, কাজ করতে হলে কান ভাল রকম রপ্ত চাই। সেই শিক্ষা

সকলের আগে। রাত্রিবেলার কাজ—যত ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, ততই ভাল। ধরে নিবি চোখ দুটো নেই একেবারে, একটু-আধটু যা দেখিস সেটা উপরি। হতচ্ছাড়া চোখ ভুল জিনিস দেখিয়ে ক্ষতিই করে অনেক সময়, কান কিন্তু কখনো ভুল করবে না। চোখ বুজে কান খাড়া রেখে ঘোরাফেরা করবি—কানে শুনে বলে দিতে হবে কোনখানে কি ঘটছে। বলতে হবে কুকুর, না বিড়াল, না মানুষ। না আর কোন জীবজন্তু। বলতে হবে ঘুমন্ত না জেগে রয়েছে।

বিদ্যার ভূমিকা শুরু হয়ে গেল তবে। পচা বাইটার মতো গুরু—সাহেবের কত বড় কপালজোর। খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর পচা বলে, চলে যা এখন তুই, কাল আসিস। আরও বেশি রাত করে আসবি। দুপুর-রাতে শিয়াল ডেকে যায় প্রহর বাদে ফের আবার ডাকে। সেই তিন প্রহরের ডাকের মুখে এসে পড়বি। ছোট বউ হারামজাদি সেই সময়টুকু অঘোরে ঘুমায়। ভালরকম পরখ করা আছে আমার। আসবি খুব চুপিসারে। পা পড়ছে, কিন্তু পাতা পড়ার আওয়াজটুকু নেই। দাওয়ার কাছে এসে দাঁড়াবি—ডাকবিনে, দুয়োরে টোকা দিবিনে, কিছু না। যা বললাম ঠিক ঠিক সেই নিয়মে আসবি।

পরের রাত্রে সাহেব এলো যেমন পচা বলে দিয়েছে। তিন প্রহর রাত্রে এত চুপিসারে এলো, অথচ যেইমাত্র উঠানে পা পড়া পচা সহজভাবে উঠে দরজা খুলে দেয়। কানে দেখতে পায়, সুভদ্রা বলেছিল। থ হয়ে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে সাহেব ঐ কান দুখানার মহিমা ভাবছে। ঘাসে একটা ফড়িং লাফানোর যে শব্দ, তা-ও তো সে হতে দেয়নি।

পচা বলে, পায়ের শব্দ না-ই হল! মাটির উপর পা পড়ে, বাতাসে তার দোলা লাগে—চেষ্টা করলে সেটুকু কেন শোনা যাবে না। সবুর কর না, তুইও শুনবি একদিন।

সগর্বে বলে, বড়বিদ্যে তবে আর বলে কেন? ইস্কুল-পাঠশালার বিদ্যে তো সোজা জিনিস। সে বিদ্যের কাজ যে একেবারে চলে না, এমন নয়। বেশির ভাগই তো করছে তাই। কিন্তু বিস্তর ভড়ং আর কায়দাকৌশল খাটাতে হয়। আমাদের বিদ্যেটা সোজা হলে মানুষ লেখাপড়ায় না গিয়ে সোজাসুজি সিঁধেল হয়ে যেত।

সাহেব যথারীতি তামাক সেজে দিয়েছে। মউজ করে ছিলিমটা শেষ করে হুঁকো রেখে দিয়ে পচা বলে, শোন, পিঠে খাওয়াব বলে রাত করে আজ আসতে বললাম। ঘুমুচ্ছে এখন ছোটবউমা—

সাহেব বাধা দিয়ে বলে, ছোট বউ-ঠাকরুন ঘুমোন না যে মোটে! টহল দিয়ে বেড়ান—আপনিই সেদিন বললেন।

ইচ্ছেটা তাই বটে। কিন্তু একেবারে না ঘুমিয়ে পারে কেউ? আমায় পর্যন্ত ঘুমুতে হয়! একদণ্ড হোক আর আধদণ্ড হোক, না ঘুমিয়ে পার নেই। যে

ঘুমোয় নিজেই হয়তো সে টের পায় না—ভাবছে, জেগে রয়েছি। ছোটবউমা সত্যি ঘুমই ঘুমুচ্ছে নিজের কানে সঠিক শুনে এলাম। কাল বেটি চাল কুটেছে, সারাক্ষণ বসে বসে আজ পুলিপিঠে বানাল। এমনি হাড়বজ্জাত, কিন্তু রান্না-বান্নায় খাসা হাত। হরেক শিল্পকর্মও জানে, ঐসব নিয়ে থাকে। পুলিপিঠে বাসি করে খেতে ভাল, রান্নাঘরে তালাচাবি এঁটে রেখেছে। কুকুর উঠে এইবার কড়াই সুদ্ধ খেয়ে যাবে, মরবে কাল কপাল চাপড়ে।

তড়াক করে পচা খাড়া হয়ে দাঁড়াল। এমনি তো ত্রিভঙ্গ-মুরারি—শুয়ে পড়ে থাকে বেশির ভাগ সময়, উঠবার সময়টা আর একজনে ধরে তুলে দিলে ভাল হয়। কাজের বেলা সেই মানুষ দাঁড়িয়েছে যেন সোজা এক তালগাছ—দেহে একটুকু বাঁকচুর নেই। একেবারে আলাদা মানুষ। কোটরের ভিতর প্রায়-বিলুপ্ত চোখ দুটোও যেন বড় হয়ে উঁচুর দিকে বেরিয়ে এসেছে। উঠানে নেমে পড়েই পচা বাইটা সাঁ করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পিঠের কড়াইয়ের আংটা দুহাতে ধরে ক্ষণ পরে ফিরে আসে। সাহেবকে নিয়ে বসে পড়ল কড়াইয়ের ধারে। বলে, কত সব ভালমন্দ রাঁধে ছোটবউমা—তা বেল পাকলে কাকের কি? আকণ্ঠ নিজে গিলবে, আর মুরারির বাচ্চা-গুলোকে গেলাবে। ভাসুরপো-ভাসুরঝির পল্টনটাকে খাওয়ায় খুব। এইসব হয়ে বাড়তি যা রইল, বাড়ির অন্য সকলের। আমার নামে রে-রে করে ওঠে: এত বয়স অবধি বিস্তর তো খেয়েছে, শুয়ে শুয়ে তাই এখন জাবর কাটুক। বিচারটা দেখ একবার। সারাটা দিন ধরে রকমারি রান্নার বাস নাকে আসবে, বুড়ো হয়েছি বলে কোন-কিছু দাঁতে কাটবার এক্তিয়ার নেই। আমিও তক্কে তক্কে থাকি—দিনমান গিয়ে আসুক না রাত্তির। আমার যেটা সময়, তাই এসে যাক। এক পেটের ভিতর ছাড়া অন্য কোনখানে মাল রেখে রক্ষে করতে পারবিনে।

সাহেবের উপর হুমকি দিয়ে ওঠে: নেমন্তন্ন করে আনলাম, খাচ্ছিস তুই কোথায়? অন্ধকার বলে এ চোখ ফাঁকি দিতে পারবিনে। বাটি ভরে কেউ সাজিয়ে দেবে না, কড়াই থেকে থাবা থাবা তুলে ঝটপট খেয়ে নে।

সাহেব বলে, আপনি খান।

খাব না তো শুধু দানসত্র করবার জন্য কষ্ট করে নিয়ে এলাম? ঠিক খেয়ে যাচ্ছি—চোখ তোর চোখা নয় বলে দেখতে পাস না। ঘাবড়াস নে, হবে। চোখ আমারই কি একদিনে ফুটেছিল?

কিন্তু যে সামান্য দেখতে পাচ্ছে, তাতেই সাহেব তাজ্জব। কথাটা ভদ্রতা করে বলেছিল। কী খাওয়া রে বাবা খুনখুনে বুড়োমানুষটার! গবগব করে খাচ্ছে—কে বুঝি মুখ থেকে এক্ষুনি কেড়ে নিয়ে যাবে, এমনিতরো ভাব। দাঁতের অভাবে গিলে খাচ্ছে, চিবানোর কষ্ট করতে হয় না এই এক সুবিধা। বড় চুষি-গুলো গিলবার সময় কোঁৎ-কোঁৎ আওয়াজ। সাহেবের বারংবার চমক লাগে, গলায়

আটকে চোখ উল্টে পড়ে বুঝি এইবার।

এবারে উল্টো কথাই বলছে, তাড়া কিসের? আস্তে আস্তে খান বাইটা-মশায়। রয়ে সয়ে।

পুলিপিঠে ততক্ষণে সাবাড় হয়ে গেছে। খেয়েছে নেহাৎপক্ষে সাহেবের ডবল। হেঁচকি তুলে মুখের ভিতর যা একটু-আধটু ছিল, উদরস্থ করে নিয়ে পচা বলে, কাজের নিয়মই এই। শিখে নে। মাল এসে পড়লে যত তাড়াতাড়ি পারিস পাচার করবি, মায়া করে রেখে দিবি নে। আহা, চেটেমুছে খাস কেন রে, কড়াইয়ে কিছু ছড়ানো থাক। কুকুর হয়ে খেয়ে গেলাম যে আমরা।

খলখল করে পচা হাসে: হারামজাদি ছোটবউমা মরবে কাল বকুনি খেয়ে। মনের ভুলে দুয়োর দেয়নি, বড়বউমা তাই ধরে নেবে, কুকুর ঢুকেছে বলে হাঁড়িকুঁড়ি ফেলবে। গুরুজন শ্বশুরকে হেনস্থা করে—মুখের বকুনি না হয়ে ওকে যদি ধরে ধরে ঠেঙাত, সুখ হত আমার।

সাহেব তখন অন্য কথা ভাবছে। বলে, গিয়েই তো অমনি পিঠেসুদ্ধ কড়াই বের করে আনলেন। তালা খুললেন কেমন করে—মন্তোরের গুনে না অন্য কোন কায়দায়? শাস্ত্রে আছে, মন্তোরে দরজা আপনাআপনি খুলে যায়। গাছের পাতা ছোঁয়ালেও খোলে।

কৌতূহলী পচা বাইটা নড়েচড়ে ভাল হয়ে বসে: বটে বটে! বলা-ধিকারীর কাছ থেকে শাস্তরে পোক্ত হয়ে এসেছিস। বল দেখি দুটো-পাঁচটা কথা শুনে নিই।

শাস্ত্রচর্চা চলে কিছুক্ষণ, শাস্ত্রের বিবিধ উপাখ্যান। ষণ্মুখকল্পের পথ-সংক্ষেপকথা—যে পদ্ধতিতে যোজন পথ লহমায় অতিক্রম করে, যোজন দূরের মানুষ আকর্ষণ করে আনে। বিদ্যা-হরণের কথা—অন্যের বিদ্যা নষ্ট করে দেবার অকাট্য প্রক্রিয়া। মায়াঅঞ্জনের কথা—যে বস্তু চোখে পরে চোর বাতাসের মতন মিলিয়ে যায়। সকলের চোখে সে অদৃশ্য, তার নিজের চোখ এখন শত-গুণ প্রখর। রাজা ব্রাহ্মণ বৈশ্য নৃত্যগীত রঙ্গোপজীবী চোখের জোরে সকলকে বশে এনে ইচ্ছাসুখে সে হরণ করতে পারে।

এক চোরকে নিয়ে কী কাণ্ড! মায়াঅঞ্জন পরে চুরি করতে ঢুকেছে। বুঝতে পারছে বাড়ির লোক, ধরবার উপায় নেই। একজনে বুদ্ধি করে তখন দুঃখের গল্প ফাঁদল—চোরের মায়ের মৃত্যুকথা। ইনিয়েবিনিয়ে বলছে। মায়ের শোক উথলে ওঠে চোরের, দরদর করে জল পড়ছে। চোখের জলে অঞ্জন ধুয়ে গেল। এইবারে যাবি কোথা চাঁদ—ঝাঁপিয়ে পড়ে সকলে চোরের উপর।

মহাকুলীন রৌহিনের কথা—পিতৃকুল-মাতৃকুল উভয় কুলই যার কীর্তিমান। বাপ পাখির মতন যে কোন ঘরবাড়িতে ঢুকে পড়বার ক্ষমতা রাখে। নিজে রৌহিনের হরিণ ময়ূর থেকে আরম্ভ করে যে কোন জন্তুজানোয়ার পাখপাখালির ডাকের নকল করতে পারে। যে বিদ্যার সামান্য কিছু পচা বাইটা নাতিকে

শিখিয়েছে। রৌহিনেয় উপাখ্যানে চৌরমন্ত্রের কথা আছে—যারা চোর ধরতে বেরিয়েছে, মন্ত্র পড়ে তাদেরই মধ্যে মারামারি বাধানো যায়। চোর ধরার কাজ মুলতুবি থাকে তখন।

ভরা পেটে পচা বাইটার মেজাজটা প্রসন্ন। সাহেবের মুখে অনেকক্ষণ ধরে শুনল। বলে, আমার কিন্তু মন্তোরতন্তোর নয় সাহেব। আঙুল দিয়ে রান্নাঘরের তালা খুলেছি।

বলতে লাগল, মন্তোর ঢের ঢের শেখা আছে। নিদালি মন্তোর, চাবি খোলার মন্তোর, কুকুরের মাড়ি আঁটার মন্তোর—কত রকমের কত জিনিস, লেখা-জোখা নেই। একটা বয়স ছিল, যার মুখে যা শুনেছি—সঙ্গে সঙ্গে শিখে নিতাম। দুটো চারটের বেশি খাটিয়ে দেখিনি। শুধু মন্তোরে কি হবে—প্রক্রিয়া আছে, উচ্চারণের কায়দা আছে। উপযুক্ত গুরু না থাকলে রপ্ত করা যায় না। একালের ত্যাঁদোড় মানুষের উপর মন্তোর খাটেও না আর তেমন। না-ই বা হল মন্তোর—এমন হাত-পা কান-নাক-চোখ রয়েছে, গাছগাছড়া শিকড়-বাকড় রয়েছে, মন্তোরের উপর দিয়ে যায় এ সমস্ত। আমার কাজকর্ম এই সব নিয়ে।

রান্নাঘরে ঢুকে যাওয়ার কৌশল বলে দিল। অতি সহজ। চাবিওয়ালা তালা মেরামত করতে এসে যেমন করে তালা খোলে। উকো ঘষে পিছন দিককার বল্টুগুলো ক্ষইয়ে ফেল, একটু চাপেই পাতখানা উঠে আসবে। আঙুলে ভিতরের কল ঘুরিয়ে দিলেই তালা খুলে পড়ল। কাজকর্ম অন্তে পিছন দিককার পাতা চেপে দিয়ে যেমন তালা তেমনি আবার ঝুলিয়ে দাও। কেউ কিছু ধরতে পারে না।

সেই পাকা ব্যবস্থা হয়ে আছে। যেদিন খুশি পচা ঢুকে পড়ে। ব্যবস্থাটা গোড়ায় ক্ষিধের তাড়নাতেই করে নিতে হয়েছিল। এখন সব ঘরে সর্বত্র স্বচ্ছন্দ গমনাগমনের ব্যবস্থা। প্রতিটি বাক্স-পেঁটরার তালার পিছনে উকো ঘষে মোলায়েম করা আছে, গা-চাবির ইস্কুপ সব আলগা। বাড়ির এতগুলো লোকের কারও চোখে তার একটা ধরা পড়ে না।

মোক্ষম এক তত্ত্ব শোনাল বহুদর্শী ওস্তাদ। মানুষ জাতটাই হল তালকানা—অভ্যাসের দাস। ধরিয়ে না দিলে চোখে পড়বে না। ঘরে হয়তো তিন-চারটে দরজা—একটা তার মধ্যে বন্ধই থাকে সর্বদা। ঘরে জো-সো করে একবার ঢুকে, সেই দরজার খিল খুলে রেখে এসো। রাত্রে শোধার সময় চালু দরজায় খিল ডবল করে দেবে, ছিটকিনি আঁটবে। বন্ধ দরজার দিকে ফিরেও তাকাবে না। তালার ব্যাপারেও তাই—চাবি আঁটছে-খুলছে, তাতেই খুশি। উল্টো করে ঘুরিয়ে ধরে পিছন দিক দেখতে যাবে না।

গর্ব ভরে পচা বলে, ঐ যে কোন্ রৌহিনেয়র বাপের কথা বললে—পাখির মতন ঢুকছে বেরুচ্ছে, আমিও তাই। এই বয়সে—এখনো রোজ রাত্রে। বাড়ির অন্ধিসন্ধি জুড়ে।

বাড়িটা পচার নয় বুঝি? এইসব ঘরবাড়ি জমিজিরেত বাগান-পুকুর তার

রোজগারে হয় নি ? বুড়ো হয়ে পড়েছে বলে শত্রুপক্ষ বেদখল করে নিয়েছে। শত্রু তার নিজের ছেলে, ছেলের বউ, নাতি-নাতনি এবং অন্য যারা ভোগে-সুখে রয়েছে তারই গড়া বাস্তুর উপরে। দোচালা খোড়োঘরখানার ভিতর তাকে আটক রেখে সকলে নেচেকুঁদে বেড়ায়। দিনমানে সকলকে দেখিয়ে বুড়োমানুষটা চুপচাপ তক্তাপোশে পড়ে থাকে। রাত্রির শেষ প্রহরে, ছোটবউ সুভদ্রা অবধি যে সময়টা নিষুপ্ত, বন্দিত্ব ঝেড়ে ফেলে সেকালের পচা বাইটা উঠে পড়ে তখন। নিজের জায়গায় বিচরণ করে। যে ঘরে ইচ্ছা ঢুকে পড়ে, বাক্স-পেঁটরার মধ্যে যেটা খুশি খুলে ফেলে। হাতের আর মনের সুখ করে নিয়ে আবার রেখে দেয়। মরার পরে প্রেতাত্মা নাকি নিশিরাত্রে অলক্ষ্যে এমনি ঘোরাফেরা করে। পচা বাইটার তাই হয়েছে—মৃত্যুলোকেরই প্রাণী সে এখন। শ্মশানের বদলে বাইরের দোচালা ঘরটুকুতে সকলে মিলে তাকে বিসর্জন দিয়েছে।

আজকে সাহেব নিঃশব্দে সহজভাবে উঠানে বেরিয়ে এলো। বর্ধনবাড়ি নিশুতি। ছোটবউও ঘুমিয়ে গেছে বাইটামশায়ের হিসাব মতো। সত্যি তাই, উঠানের কোন প্রান্তে ছায়ামূর্তি নেই।

আট

বালগোপালের মূর্তি—দিব্যি বড়সড়, ফুটফুটে বাচ্চাছেলের মত। টানা চোখ, হাসি-হাসি মুখ। দুষ্টামির ভাব মুখের উপর। অর্থাৎ ফাঁক পেলেই ননীচুরির কর্মে লেগে পড়েন আর কি চতুর ঠাকুর। সুধামুখীর বড় ভাল লাগে। গোপাল সকৌতুকে যেন তার দিকে তাকাচ্ছে। খানিকটা দূরে গিয়ে সুধামুখী মুখ ফিরিয়ে দেখে। ডাকছে যেন তাকে ঃ মা আমি বাড়ি যাব। সত্যি সত্যি ঠোঁট নড়ছে। মাটির পুতুল ডাকাডাকি করছে—তাই কখনও হয় ! তবু স্থির থাকতে পারে না, পায়ে পায়ে ফিরে আসে আবার দোকানে। দোকানিকে বলে, পয়সা এখন কাছে নেই। এ গোপাল অন্য কেউ যেন নিয়ে না যায়। বাসা থেকে পয়সা নিয়ে আসছি।

বাসায় যেন পয়সার ভাণ্ডার—মুঠো করে এনে দিলেই হল। পারুলের কাছে ধার করতে হয়। ঘরের একটা কোণ এবং সেই দিককার দেয়ালটায় বালতি বালতি গঙ্গাজল এনে ঢালে। জলচৌকিটা গঙ্গায় নিয়ে রগড়ে রগড়ে ধোয়। অশুচি লেশমাত্র লেগে না থাকে। জলচৌকির উপর ঘরের ঐ কোণটায় গোপাল এনে বসাল। ঘুরে ফিরে এপাশে-ওপাশে সুধামুখী কত রকম করে দেখে। দেখে দেখে দু-চোখের আশ মেটে না।

এই এখন সকলের বড় কাজ সুধামুখীর। গোপাল নিয়ে পড়ে আছে। কাপড় পরাচ্ছে, জামা পরাচ্ছে। টিপ পরাচ্ছে কপালে। পুঁতির মালা গেঁথে গেঁথে রকমারি গয়না বানাচ্ছে—সে গয়না একবার পরায়, একবার খোলে। সন্ধ্যার পরে শুইয়ে দেয়, সকালবেলা তুলে বসায়। মাটির বস্তু বলে স্নানটা

চালানো যাচ্ছে না। আমতলার দিকে গাঁদা-দোপাটি ফুলগাছ কয়েকটা—ফুল তুলে জলচৌকির উপর সাজিয়ে দেয়। খেলনা-রেকাবি ভরে ভোগ সাজিয়ে গোপালের মুখের কাছে ধরে।

এই খেলা চলেছে অহরহ। মেয়েগুলো চোখ-ঠারাঠারি করে: যৌবন চিরকালের নয় রে ভাই। বৃদ্ধ হলে আমরা তপস্বিনী হই। হতেই হবে যদি না সময় থাকতে আখের গুছিয়ে নিতে পারি।

পারুল ঝংকার দিয়ে এসে পড়ে: কাণ্ডখানা কি দিদি, সমস্ত ছেড়েছুড়ে সন্ন্যাসিনী হতে চাও?

সুধামুখী বলে, ছাড়ছি কোনটা রে! তুই রাণীর এত খবরদারি করিস সন্ন্যাসিনী তুইও তবে। যেখানে যত মা আছে সবাই সন্ন্যাসিনী।

এর পিছনে কত আশাভঙ্গের কথা! নিভৃতে ভাবতে গিয়ে পারুলের চোখে জল এসে যায়। তার রাণীর সঙ্গে সুধামুখী গোপালের তুলনা করল। ঠাকুর নয়, সন্তান। সংসারের বড় সাধ ঐ হতভাগীর। সংসার যতবার আঁকড়ে ধরতে যায়, লাথি খেয়ে ফেরে। গোড়া থেকেই ধরো না। বিয়ে হল—বলিষ্ঠ পৌরুষময় বর, লেখাপড়া জানা। সন্ধ্যারাত্রে বর নিয়ে মনের আনন্দে শুয়েছে, শেষরাত্রে কলেরা। পরদিন বেলা শেষ না হতেই বর চিতায় উঠল। তারপরে ভরা যৌবনের দিনে আর একজন উদয় হয়ে মনপ্রাণ রাঙিয়ে তুলল। বিপদের ইঙ্গিত বুঝে সুধামুখী বলে, বিয়েটা তাড়াতাড়ি হোক তবে—ভিনজাত, রেজিস্ট্রি বিয়ে হোক। সে মানুষ বলে, বিলাত-দেশ নয়, বিয়েতেও কলংক ঘুচবে না, বিষ খাও।

দায়ী যখন দুজনেই, দুজনকে খেতে হবে একসঙ্গে।

সাইনাইড বিষ সংগ্রহ হয়েছে। কিঞ্চিৎ মুখে দিয়ে সুধামুখী কৌটা ধরে এগিয়ে দিল: এব রে তুমি।

সে-মানুষ কৌটা ছুঁড়ে পিঠটান। ধরতে পারলে সুধামুখী তার প্রাণটাও বুঝি সঙ্গে নিয়ে যাবে! প্রাণ নিত না ঠিকই, অমন প্রাণ ঘৃণার বস্তু—যা কতক ঝ্যাংরা মারত। আর সেই বস্তু বিষও নয়, সৈন্ধবনুনের গুঁড়ো। বেঁচে রইল সুধাময়ী। সে মানুষ ভেবেছিল চুকেবুকে গেছে—শেষটা গর্ভের মেয়ে মেরে নিষ্কলংক হতে হল। জলে ভেসে এসে আবার একদিন ছেলে কোলে উঠল, কষ্ট করে বড় করল তাকে। পাখা বেরিয়ে সেই ছেলেও এখন তেপান্তরের মুলুকে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

সুধামুখী হেসে বলে, এবারের গোপাল ছেলেটা আমার বড় সুশীল। ছুট-ফট করে না, বায়নাক্কা নেই কোনরকম। যা বলি চুপচাপ শুধু শুনে যায়। বসিয়ে দিলে বসে থাকে, শুইয়ে দিলে শোয়।

পারুল বলে, সাহেব তেপান্তরে ঘুরুক আর যা-ই করুক দিদি, মায়া এখনো ষোল আনা তোমার উপর। কালও তো শুনলাম মনিঅর্ডার এসেছে।

স্নিগ্ধ চোখে গোপালের দিকে চেয়ে সুধামুখী বলে, এই ছেলে বড় হোক,

দেখিস তখন। ঘর ছেড়ে এক পা নড়বে না—যা কিছু আমার দরকার, ঘরে বসেই সমস্ত দেবে।

আর এক বড় কাজ—গোপালকে গান শোনানো। অতি মধুর গলা। সুরেই প্রাণ কেড়ে নেয়, তার উপর শিশু ঠাকুরের কাছে আজেবাজে গান চলে না—মহাজনদের রচিত পদাবলী-কীর্তন। গানের চর্চায় সুধামুখী উঠে-পড়ে লেগেছে—ভাল গান কত দূর ভাল গেয়ে প্রাণ মাতানো যায় দিবারাত্রি সেই সাধনা। তখন যেন সম্বিত থাকে না—দু-চোখের জল বয়ানে ধারা হয়ে পড়ে। বস্তিবাড়ির যে যেখানে ছিল, কাজকর্ম ফেলে সুধামুখীর ঘরের সামনে ভিড় করে তখন।

গানের নামডাক বস্তির বাইরেও যাচ্ছে। বেশি করে ছড়িয়ে পড়ছে এবার। জন-কয়েক এসে প্রস্তাব করে, খোল-কত্তাল একতারা-হারমোনিয়াম নিয়ে পুরো-পুরি কীর্তনের দল করি আসুন। পুণ্যি আছে পয়সাকড়িও আছে। গোপাল একলা কেন শুনবেন, মানুষজন সবাই শুনুক আসর জমিয়ে বসে। থালা ভরে পেলা দিক।

নফরকেষ্ট কলকাতায় ফিরেছে। ক্রমশ কালীঘাট-টালিগঞ্জ-চেতলায় তার নিজের কোটে এসে পড়ল। গাবতলির হাটে সাহেব সেই নিরুদ্দেশ হল—সাহেবকে ফেলে সুধামুখীর সামনে আসতে ভরসা পায়নি। এখানে ওখানে অনেকদিন গেছে—অবশেষে মরীয়া হয়ে একদিন আড্ডির বস্তিতে ঢুকে পড়ে। শহরে এসে একে একে পুরানো নেশার টান ধরছে, সধামুখীকে বাদ দিয়ে কত-দিন পারবে?

পড়বে গিয়ে তো তোপের মুখে—সেই সময় কি বলে কোন্ কৌশলে মাথা বাঁচবে, অনেক দিন ধরে মনে মনে মহড়া দিয়ে নিয়েছে। নিরীহ মুখের প্রথম কথা: কেমন আছে সব, সাহেবের খবর কি? অর্থাৎ সাহেবের পালানোর-বৃত্তান্ত ঘুণাক্ষরে নফরকেষ্ট জানে না—কোনরকম যোগাযোগ নেই দুজনের ভিতর।

কিন্তু দেখা সর্বপ্রথম রানীর সঙ্গে। বড় বড় চোখ মেলে মুহূর্তকাল রানী অবাক হয়ে থাকে। ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে বুঝি একটু। তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়।

রানী তো রাজরানী। সেদিনকার একফোঁটা মেয়েটাকে একেবারে চেনা যায় না। বিধাতাপুরুষ নতুন করে গড়ে-পিটে বানিয়েছেন। সাজপোশাকে-গয়নায় পারুল সাজিয়েছেও বটে আদরের ধনকে। ঝুনঝুন করে পায়ের তোড়ার আওয়াজ তুলে রাজরাজেশ্বরীর মতো রানী এসে দাঁড়াল। এবং সারাপথ নফর যা তালিম দিয়ে এসেছে, সেই কথাগুলোই কেড়ে নিয়ে রানী বলে, সাহেব-দার খবর কি?

নেই বুঝি সে এখানে? নফরকেষ্ট আকাশ থেকে পড়েঃ আমি তো মা অনেকদিন বাইরে বাইরে। আমি কি করে জানব তার খবর?

সে আর তুমি একই দিনে বেরুলে। সবাই বলে, তুমি সঙ্গে নিয়ে গেছ।

ঠিক এই কথাগুলোই সুধামুখীর মুখ থেকে শোনবার কথা। বলছে রানী। নফরকেষ্টও জবাব নিয়ে তৈরি। রাগ করে চেঁচিয়ে উঠতে হয় এর জবাবেঃ না, না—একশ' বার বলছি, না। আমার পথে আমি গেছি-- সে যদি গিয়ে থাকে, তার আলাদা পথ। কত আমার আপন কিনা, সঙ্গে করে নিয়ে যাবে! কারো সে আপন নয়, চরম স্বার্থপর ছোঁড়া—

আরও বিস্তর কথা ঠিক করা আছে। অনেকক্ষণ ধরে বলা চলে। কিন্তু রানী আঁচলে অবিরত চোখ মুছছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। এই সেদিন মেয়েটাকে জন্মাতে দেখল, কোলেপিঠে নিয়ে বেড়িয়েছে কত! মনটা কেমন কেমন করে উঠল নফরকেষ্টর, গলা দিয়ে ভিন্ন সুর বেরিয়ে আসেঃ হয়েছে কি তোর রানী?

রানী ঝুপ করে মাটিতে নফরার পায়ের উপর পড়ল। দু পায়ে মাথা কুটছেঃ জান তো বলে দাও নফর-মেসো। আমার বড্ড দরকার।

হাঁড়িকাঠে ঢুকিয়ে কালীমন্দিরের সামনে পাঁঠা বলি দেয়। বলির পাঁঠাই বুঝি মানুষের গলায় আর্তনাদ করছে। বলির পরে কবন্ধ পশুর ধড়ফড়ানি— সে বস্তু খানিকটা যেন রানীর ঐ মাথা কোটার মতো। কালীঘাটের মানুষ— মন্দিরে গেলেই বলি চোখে পড়ে। তুলনাটা তাই আপনাআপনি মনে এসে যায়। রানীকে তুলে ধরে সস্নেহে নফরকেষ্ট বলে, ওরে পাগলী, বলবি তো সব কিছু! তাকে না পাস আমি তো আছি, সাহেবের আপন-জন। বল্ কি হয়েছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে রানী বলে, কিছু আমি বলতে পারব না। সাহেব-দা'কে চাই। এ-বাড়ি আমি থাকব না, আমায় সে নিয়ে যাক।

নফরকেষ্ট ভ্রূভঙ্গি করে বলে, ভবঘুরে বাউণ্ডুলে একটা—সে কোথা নিয়ে যাবে তোকে?

যেখানে তার খুশি। আমি কি ভাল জায়গা চাইছি, ভাল খেতে পরতে চাইছি? খবর জানো তো বলে দাও নফর মেসো, তোমার পায়ে পড়ি।

আবার পা ধরতে যায়। এমনি সময় গলা শুনেই বুঝি সুধামুখী বেরিয়ে এল। পলকে রানী পালিয়ে যায়। কথাবার্তা কিছু কানে গিয়ে থাকবে সুধামুখীর। বলে, রানী অমন করে ছুটল কেন?

এতকাল অদর্শনের পর নফরকেষ্ট ফিরছে, সে সম্বন্ধে একটি কথা নয়। পুরানো ব্যাপার—এর চেয়ে আরো বেশি দিন সে বাইরে থেকে এসেছে। জিজ্ঞাসা করলে জবাব একটা পাওয়া যাবে—সত্যি জবাব নয়। এতক্ষণ সুধামুখী গোপালের কাছে ছিল—আজেবাজে কথা-কথান্তর ভাল লাগবে না। রানীর কথা জিজ্ঞাসা করেঃ

বলছে কি রানী ?

সাহেবের খবর নিচ্ছিল। সাহেব কোথায় আছে, আমি কেমন করে বলব ? কালীঘাটে নেই, তাই তো জানতাম না।

সুযোগ পেয়ে তালিম-দেওয়া কথাগুলো শুনিয়ে দেয় সুধামুখীকে। শুনিয়ে সোয়াস্তি পেল। সুধামুখী বলে, যেখানে থাকুক ভালই আছে, রোজগারপত্তর করছে। তিনবার এর মধ্যে মনিঅর্ডারে টাকা পাঠিয়েছে। অল্প টাকা—কিন্তু মনে করে পাঠাচ্ছে তো। আমায় তার মনে আছে।

নফরকেষ্ট কৌতূহলী হয়ে ওঠে ঃ তবে তো তুমি সব জান। রানী তোমার কাছে জেনে নিলে পারে। কোথায় আছে সাহেব এখন ?

ঠিকানা জানিনে, চিঠিপত্র লেখে না। মনিঅর্ডারের কুপনে কত কিছু লেখা যায়, খরচা লাগে না—কিন্তু সাহেব লেখে নাম আর টাকার অঙ্ক। পিওনকে ধরলাম ঃ ফরমে প্রেরকের কোন ঠিকানা আছে ? চিঠি দিলাম, ভুয়ো ঠিকানা সেটা, শিলমোহরের অনেক ঘা খেয়ে সে চিঠি অনেকদিন পরে ফেরত এলো। সেই পোস্টাপিসের অধীন সে-নামের কোন গ্রাম নেই।

ঘরের মধ্যে গিয়ে নফরকেষ্ট কুপন উল্টে-পাল্টে দেখে। নাম-সই সাহেবের ছয় টাকা চার আনা। পর পর তিন মাস পাঠিয়েছে। টাকা বরাবরই ছয়, আনায় হেরফের—কোনবার কিঞ্চিৎ বেশি, কোনবার কম। সাহেব কোন মাইনের কাজ-কর্ম ধরেছে নিশ্চয় এখন।

সহসা মন্তব্য করে ওঠে ঃ বেটা বাপ-মায়ের স্বভাবখানা পেয়েছে।

সুধামুখী চমক খেয়ে বলে, কারা ওর বাপ-মা জানতে পেরেছ নাকি ?

মানুষ জানিনে, কিন্তু স্বভাব জানি বটে। একফোঁটা মায়ামমতা নেই তাদের। থাকলে আপন-ছেলের গলা টিপে জলে ফেলতে পারত না। এমন ছেলে—পর অপর হয়েও আমরা তার জন্য আকুপাকু করে মরি।

সজোরে নিশ্বাস ফেলে আবার বলে, সাহেব ঠিক তাই। একফোঁটা মায়ামমতা নেই ওর মনে। কারো সে আপন নয়।

সুধামুখী ঘাড় নেড়ে প্রবল আপত্তি করে বলে, অমন কথা মুখেও এনো না নফর। মায়ায় ভরা আমার সাহেব। যেখানেই থাকুক, ভুলতে পারে না। ঘাটে-পথে শ্মশানের ভিতরেও দেখেছি। জানে আমার অভাব-অনটনের কথা—মুখ ফুটে চাইতে হয়নি—যা কিছু থাকে, মুঠো ভরে দেয়। কী দিল, তাকিয়েও দেখে না।

নফরকেষ্ট লুফে নিয়ে বলে, আমারও ঠিক সেই কথা। টাকাপয়সা বলে এক তিল ওর মায়া নেই। দেখ না, আনা অবধি মনিঅর্ডার করেছে। পয়সার মনিঅর্ডারের নিয়ম নেই, সেইজন্যে পারে নি। যখন কাছাকাছি ছিল, পকেট উল্টে উজাড় করে তোমায় ঢেলে দিত। নোংরা আবর্জনা সরিয়ে দিয়ে যেন সাফ-সাফাই হল। মানুষের বেলাতেও ঠিক তাই। যত এই দিচ্ছে—তুমি

ভাবো মায়ায় পড়ে, আমি জানি দয়া করে। কোনমানুষ কোনদিন ওর আপন হবে না। উদাসী সাধু-ফকিরের মতো। সংসারে না থেকে ও-ছেলে ভগবানের পথেও যেতে পারত।

সুধামুখী সহসা তিক্ত হয়ে বলে ওঠে, কিন্তু নিয়ে তো নিলে তোমার চুরির পথে—

নফরকেষ্ট বলে, ভাল চোর আর সাচ্চা সাধুতে তেমন কিছু তফাত দেখিনে। ভালো চোরের আশেপাশে থেকে বুঝে-সমঝে এলাম। কারিগর চোর থলিসুদ্ধ ডেপুটির দিকে ছুঁড়ে দিল। ডেপুটি দিল মহাজনের কাছে। সিঁধকাঠি ধরে যা নেবার সোজাসুজি আমরা নিয়ে নিই। মক্কেলও ক্ষতির হিসাব সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যায়। অলিগলির চোরাপথে বেমালুম পরের মাল পাচার করে মুখে সাধু সাধু বুলি কপচায়, তাদের চেয়ে অনেক ভাল চোর ছ্যাঁচোড় আমরা।

নয়

পিঠে খেয়ে পরের দিন বিষম কাণ্ড। হয়তো বা সুভদ্রা-বউয়ের শাপমন্যি এর মূলে। পেট ছেড়ে দিল বুড়োমানুষ পচার। সঙ্গে বমি। বড়বউয়েরই দেখা যাচ্ছে বা-একটু দয়ামায়া। কিন্তু গিন্নিবান্নি মানুষ, এক দঙ্গল ছেলেপুলের মা, ভাঁড়ারের চাবির গোছা আঁচলে বেঁধে এঘর-ওঘর করে বেড়ায়। সময় কোথা শ্বশুরের কাছে বসবার? এসে তবু ঘুরে যায় এক-একবার, মাহিন্দারকে করকচি-ডাব পেড়ে মুখ কেটে দিতে বলে। জায়গাটাও একবার-দুবার নিজ হাতে সাফ করে দিয়ে গেছে। আর ছোটবউ সুভদ্রার গতিক দেখ—বাঁজা মানুষ, কাজ খুঁজে পায় না তো কার্পেটের উপর উল দিয়ে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি তুলছে। শ্বশুরের ঘরে তবু একবার উঁকি দিতেও যায় না।

পরের রাত্রে সাহেব এসে দেখে এই ব্যাপার। ভয় হয়। মানুষটার জন্য নয় ঠিক—এ হেন গুণীমানুষ মরে গেলে বিদ্যাটাও যে তার সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যাবে। মন নরম হয়েছে, একটু-আধটু করে মুখ খুলছিল—খাড়া করে তুলতেই হবে যেমন করে হোক।

বড়ছেলে মুরারি জমিদারি-কাছারির নায়েব। কাছারির কাজকর্ম সেরে অধিক রাত্রে বাড়ি ফিরল সে। জিজ্ঞাসা করে, অসুখ কেমন? মিনমিন করে বড়বউ কি একটা জবাব দিল—শোনা যায় না এত দূরের ঘরের ভিতর থেকে। খাওয়া-দাওয়া সেরে পান চিবোতে চিবোতে কোঠাঘরে গিয়ে মুরারি শুয়ে পড়ল। অপর ছেলে মুকুন্দ বাড়ি থাকলে বোধকরি জিজ্ঞাসাটুকুও করত না—চোর বাপের উপর এতদূর বিতৃষ্ণা! কিন্তু সাহেবের কথা আলাদা। পচা বাইটা বাপ নয় তার, ওস্তাদ। বিদ্যা আদায়ের ফিকিরে আছে। বিদ্যাটুকু পাওয়া হয়ে যাক, তারপরে পচা বাইটা তুমি অর্ধেক-মড়া হয়ে ঘরের তক্তাপোশে পড়ে আছ, কিংবা পুরোপুরি মরে চিতার উপর চড়েছ, বয়ে গেছে চোখ তুলে দেখতে।

রাত্রিটা পাটোয়ার-বাড়ি ফেরা চলবে না। পচার সাড়া সেই, আলো জেলে সাহেব সতর্ক চোখে ঠায় বসে আছে। কী করছে আর কী না করছে! কর-কচির জল খাওয়ায় ঝিনুকে করে, বার্লি খাওয়ায়, পাখা করে। একরকম হাত পেতেই মুখের বমি ধরছে। মাদুর নোংরা করে রেখেছে, ধোওয়ার জন্য ঐ রাত্রে পুকুর ঘাটে নিয়ে গেল।

নিশাচরী ঠিক এসে দাঁড়িয়েছে পাড়ের উপর। একনজর দেখে নিয়ে বলে ওঠে, ছিঃ—ছিঃ!

সাহেব চমকে তাকায়ঃ কি বলছেন বউঠান?

অমন স্বর্গের চেহারা নিয়ে নরক ঘাঁটতে ঘেন্না করে না ঠাকুরপো?

সাহেব তিক্তকণ্ঠে বলে, নরক হতে দিয়েছেন কেন? কাজটা তো আপনা-দেরই। দুর্গন্ধে ঘরের ভিতর তিষ্ঠানো যায় না। বাইটামশায়ের বেহুঁশ অবস্থা—ফেলে যেতেও পারি নে।

অন্যদিনই বা কি করে থাকো ভেবে অবাক হই। ভেদবমির কথা বাদ দিয়ে মানুষটারই তো বেশি দুর্গন্ধ। একজনে সেই দুর্গন্ধে ঘরবাড়ি ছেড়েই সরে পড়ল। নামের মধ্যেও দুর্গন্ধ। বাহাদুর বলি শ্বশুরের বাপ-মাকে, জন্ম থেকেই কেমন করে বুঝে ফেলে নামকরণ করেছিলেন। টাটকা নয়, তাজা নয়—একেবারে সেই নাম, আমি যাকে বাসি বলে থাকি।

ভিজে মাদুর সাহেব উঠানের আড়ে ঝুলিয়ে দেয়, জলটা এইখানে ঝরে যাক। 'আপনি' থেকে কখন তুমিতে এসেছে, কি জন্যে এসেছে—তা সে জানে না।

সুভদ্রা বলে, কেমন বেঁধে শত্রুতায় লেগেছে, কেন বল দিকি? যমরাজ ভয়ে ও-লোকের কাছ ঘেঁষেন না—হয়তো দেখবেন, যে মহিষ চড়ে এসেছেন, কোন্ ফাঁকে চুরি হয়ে গেছে সেটা। চোরকে সবাই ডরায়। আমার বাবাই কেবল ডরাল না। বসে, স্থবির হয়ে পড়েছে, ক'টা দিন আর! মানুষটা গেলে জমি-জিরেত দালানকোঠায় তো দাগ লেগে থাকবে না। পায়ের উপর পা দিয়ে ভোগ করিস। সে-ও তো হয়ে গেল আজ—

বিড়বিড় করে হিসাব করে নিয়ে কান্নার সুরে বলে উঠল, ও ঠাকুরপো, আট বছর হয়ে গেছে। আট-আটটা বছর ঐ এক ঘরে এক বিছানায় এক ভাবে পড়ে রয়েছে।

মানুষটার এখন-তখন অবস্থা, পুত্রবধূ সেই সময়টা হিসাব নিয়ে পড়েছে। কান জ্বালা করে শুনতে। দ্রুতপায়ে সাহেব ঘরে ঢুকে গেল। সুভদ্রা মরে গেলেও ঢুকবে না—যে কথা ঐ বলল, ভেদবমির ভয়ে নয়, মানুষটারই দুর্গন্ধে। নিরাপদ দুর্গ অতএব—ঢুকে পড়ে সাহেব নিশ্চিন্ত।

সকালবেলা কাজের গরজে পাটোয়ার-বাড়ি ফিরতে হল কিন্তু সাহেবের মন পড়ে থাকে পচার কাছে। খেতে দিচ্ছে, মাইনে দিচ্ছে দীনু পাটোয়ার, তার কাজ ফেলে দিনমানে আসা চলে না। সন্ধ্যা হতে না হতে গরুর জাবনা দায়সারা

গোছ মেখে দিয়ে পালায়। তিন-চার দিন চলল সেই এক অবস্থা। বড় শক্ত বুড়ো—যমরাজ সাহসে ভর করে এবারে বোধকরি দোরগড়া অবধি এসেছিলেন, নিরাশ হয়ে ফিরতে হল।

এরই ভিতর সুভদ্রা আবার একদিন সাহেবকে ধরেছিল। টিপিটিপি বাড়ি ঢুকছে, সেই সময়টা—বাইটার ঘরে ঢুকে পড়বার আগেই। বলে, আমারও পালটা শত্রুতা তোমার সঙ্গে। বাসি বাইটার সঙ্গে ভাব জমিয়েছ, মতলব তোমার ভাল নয়। জব্দ তোমায় করবই—এবাড়ি আসা যাতে বন্ধ হয় তাই করব। ভেবেছিলাম, কোনদিন রাত দুপুরে চিৎকার করে বড়-বর্ধনের কানে তুলে দেব—তুমি আমার হাত ধরে টানাটানি করছ। বাড়িসুদ্ধ রে রে করে এসে পড়ে উচিত শিক্ষা দেবে।

সেদিন জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার মধ্যে সুভদ্রা কি রকম তাকাচ্ছে—মাথা খারাপ বোধহয় বউটার। হাত ধরে আজই না টানাটানি করে এবং মুলতুবি চিৎকারটা জুড়ে দেয়।

সুভদ্রা বলে, ভেবেছিলাম এমনি কত কি। কিন্তু ফিকির পেয়ে বড়-বর্ধন আমাকেও তো দূর করে দেবে বাড়ি থেকে। কলঙ্ক রটাবে। জমিদারি সেরেস্তার ঘুঘু নায়েব—চাচ্ছেও ঠিক এই জিনিস। ভাইটা সরেছে, আমি সরে গেলে একচ্ছত্র অধিপতি। ঠাকুরপো, আমি বড় দুঃখী।

গর্জন করে উঠেছিল, মুহূর্তে কেঁদে পড়ে চোখে আঁচল দেয়। মাথার গোলমাল ঠিকই। বলে আমায় কেউ দুচক্ষে দেখতে পারে না। যার উপর মেয়েমানুষের সকল নির্ভর, সে মানুষটা পর্যন্ত বিরূপ। ভাসুর সেই জন্যে জো পেয়ে গেছে। বাপ মা দুজনেই গত হয়েছে, ভাইও একটা নেই। বাপের ভিটেয় ঘুঘু চরে বেড়ায়। পা বাড়ানোর জায়গা নেই এত বড় দুনিয়ার উপরে। হাত ধরে টানাটানি কিংবা চিৎকার করে কলঙ্ক রটানো—তার মধ্যেও হয়তো সাহেব দাঁড়াতে পারত। কিন্তু হেন অবস্থায় পালানো ছাড়া উপায় নেই। তারও চোখ ভিজে আসবে, কেলেঙ্কারি ঘটে যাবে। পাশ কাটিয়ে একছুটে সাহেব পচার ঘরে ঢুকে পড়ে। সেই নিরাপদ দুর্গে।

ক'দিনের সেবাশুশ্রূষায় বড়বউয়ের সঙ্গেও সাহেবের পরিচয় হয়েছে। বড়বউ প্রস্তাব করে: দিনমানেও ক'টা দিন থাকো না। তা হলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

সাহেব বলে সংকট পার হয়ে গেছে, আর ভয় নেই।

বুড়োমানুষের ব্যাপার কিছু বলা যায় না। চোখে দেখছ দিব্যি ভাল, নাড়ি ধরে হয়তো বা নাড়ি মেলে না। শতেক কাজ আমার—ভাল করে একবার তাকিয়েও দেখতে পারিনে। গা কাঁপে—দেখাশোনার অভাবে ভাল মন্দ কিছু হয়ে গেলে চিরকাল মনের মধ্যে কাঁটা ফুটবে।

সাহেব অবাক হয়ে তাকাল। বাড়ির মধ্যে আছে তবে এমনি ধারা কথা বলার একজন। বড়বউ বলছে, থাকো এসে তুমি। এইখানে চাট্টি খেয়ে

নিও। পাটোয়ারদের বলেকয়ে কাপড়-গামছা নিয়ে চলে এসো। ভাল করে সেরে উঠলে চলে যেও।

ভালই হল, সাহেবের, শাপে বর হয়ে গেল। এককথায় সে রাজি। ভ্রূভঙ্গি করে বলে, বলাবলির ধার ধারিনে। কী এমন চাকরি গো! গরু রাখা আর ধানের হিসাব রাখা—আবাদ অঞ্চলে এখন যার উঠোনে গিয়ে দাঁড়াব, সে-ই চাকরি দেবে।

সৌদামিনী নামে এক বিধবা মেয়ে রাঁধাবাড়ার কাজ করে—মুরারি-মুকুন্দর বোন হয় কি রকম সম্পর্কে। এক দুপুরে পচার ঘরে ভাতের থালা দিয়ে ফিরে যাচ্ছে, মুরারির নজরে পড়ে গেল। সকালবেলার কাছারি সেরে বাড়ি ফিরছে সে তখন। দ্রুতপায়ে চলে এসে সৌদামিনীর পথ আটকে জিজ্ঞাসা করে, ভাত কোথায় দিয়ে এলি?

দুই থালা যেন দেখলাম—

ধরা পড়ে সৌদামিনী চুপ করে থাকে। ছাইয়ের মতো মুখ নিয়ে বড়বউ এগিয়ে এল। স্বামীকে যমের মতো ডরায়। কৈফিয়তের ভাবে বলে, ঐ যে ছেলেটা—দেখেছ তুমি তাকে, একটা থালায় করে তাকেও চাট্টি দিতে বললাম। রাত নেই দিন নেই যা সেবাটা করল—ওরই জন্যে এ যাত্রা রক্ষে হয়ে গেল। ভাবলাম, গৃহস্থবাড়ি দুপুরে বেলা না খেয়ে থাকবে, সেটা ভাল হয় না—

ধমক দিয়ে মুরারি থামিয়ে দিল : ভাবনাটা আমার জন্যে রাখলেই হত। মরিনি আমি, দুপুরে ফিরে এসে আমিও তো খাব।

স্ত্রীর দিকে কঠিন দৃষ্টি হেনে সেই ধুলো-পায়ে বাপের ঘরে উঠল। পচা আর সাহেব সামনা-সামনি বসে খাচ্ছে।

অসুখ তো সেরে গেছে, এখনো ছোঁড়া তুই কি জন্যে ঘুরঘুর করিস? কি মতলব? কাজকর্ম নেই কিছু তোর?

তম্বি সাহেবের উপর। সাহেব বলার আগে পচা তাড়াতাড়ি জবাব দিয়ে দেয় : কই আর সারল। ধরে বসাতে হয়, ধরে তুলে বাইরে নিতে হয়—

মুরারি বলে, অসুখ নয়, সেটা বয়সের দোষ। ঐ একটু ধরে তোলার অজুহাতে ছোঁড়া তুই থালা থালা ভাত ওড়াবি? অত মজা চলবে না। ভাতে পয়সা লাগে, ভাত এম্নি আসে না।

সাহেবের চোখ দুটো ধক্ করে জ্বলে ওঠে। কিন্তু রোগশীর্ণ পচার দিকে চেয়ে সামলে নিল। ঠাণ্ডা গলায় বলে, উনি বলেন সেই জন্যে রয়েছি। দরকার না থাকলে তক্ষুনি বিদায় হয়ে যাব।

মুরারি খিঁচিয়ে উঠল : উনি আর বলবেন না কেন। গতর খাটিয়ে পয়সা আনতে হয় না, অনন্তশয্যায় চিত হয়ে আছেন। শুয়ে শুয়ে গল্প করার মানুষ পেয়ে গেছেন একটা। কিন্তু এর পরেও যদি পড়ে থাকিস, ভাত পাবিনে। উপোসি থাকতে হবে।

সাহেব গজর গজর করে : বার বার খাওয়ার খোঁটা, মানুষ যেন এই বাড়িতেই শুধু খেয়ে থাকে। খেয়ে খেয়েই এতখানি বয়স হয়েছে, এখান থেকে চলে গিয়ে তখনো খাব। খেতে কে চেয়েছে? এতদিনের আসাযাওয়া—খেয়েই আসি বরাবর। খাতির করে বলা হল খাওয়ার জন্যে, ভাত বেড়ে সামনের উপর ধরা হল। মা-লক্ষ্মীর ভাত কে ছুঁড়ে ফেলবে?

কী না জানি ঘটে যায়, মুরারির পিছু পিছু বড়বউও চলে এসেছে। তার উদ্দেশে মুরারি দন্ত-কড়মড়ি করে : কার ভাত কে বেড়ে পাঠায়। খাওয়াতে ইচ্ছে হয়, তোমার বাপের বাড়ি নিয়ে গিয়ে যত খুশি অতিথিসেবা করোগে। হাঁসের মতন গণ্ডা গণ্ডা বাচ্চা দিচ্ছে, দিয়েই চলেছে—তাদের গেলাতে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। তার উপরে অতিথি! লজ্জাঘেন্নাও নেই।

ঝড়তুফান বড়বউয়ের উপরে প্রায়ই বয়ে যায়, নতুন কিছু নয়। চুপ করে সে দাঁড়িয়ে আছে, খাওয়া হলে থালা দুটো তুলে নিয়ে যাবে। রাগের ঝাল মিটিয়ে মুরারিও চলে যাচ্ছিল—

এমন সময় বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত। সুভদ্রার কণ্ঠ—বাইরের দাওয়ায় কখন সে এসেছে, হঠাৎ বেমন মেজাজ হারিয়ে ফেলে। ভাসুর বলে মান্য করে না। সৌদামিনী যদিচ কোনদিকে নেই, বলছে তবু তাকেই উদ্দেশ করে। মুরারি থ হয়ে শোনে। বলে, ছোড়দি, আমার নাম তুমি কি জন্যে চেপে গেলে? ওঁদের গণ্ডা গণ্ডা বাচ্চা, আমার একটাও নয়। একজন কেন, এক গণ্ডা-দুগণ্ডা অতিথিসেবার এক্তিয়ার আছে আমার। দিদি নয়, আমিই ভাত বেড়ে পাঠিয়েছি তোমার হাত দিয়ে। খুলে বললে না কেন ভাসুরঠাকুরকে—

মুরারি নিস্তব্ধ হয়ে থাকে এক মুহূর্ত। তারপর খলখল করে হেসে ওঠে। অদৃশ্য সৌদামিনীকে সে-ও সম্বোধন করে : ওরে সদু, বলে দে, ভাসুর হয়ে ভাদ্রবধূর সঙ্গে কোন্দল করি কেমন করে? কুকুরে মানুষ কামড়ায়, তাই বলে মানুষ কখনো কুকুর কামড়ায় না। বলে দে, পৈতৃক জমাজমি এক কাঠাও বজায় নেই ওদের। খাজনা না দিলে জমিদারে জমি নিলাম করে। সেই নিলাম বড়বউ স্ত্রীধনে খরিদ করে নিয়েছে। বাড়িসুদ্ধ তারই খাচ্ছি এখন। ছোটবউমা নিজেই অতিথি—অতিথি আবার অতিথি আনবে কেমন করে?

শেষ করে চলে যাচ্ছিল, আবার কিছু মোক্ষম কথা মনে এলো। ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, মহা বিদ্বান আমার মাস্টার ভাই, মাস গেলে খাতায় সই করে পঁচিশ টাকা, পায় সত্যি সত্যি পনের কি আঠারো। একবেলা ভাত আর একবেলা চিঁড়েমুড়ি খায়—দু-বেলা ভাতের সঙ্গতি নেই। বিবেচক ভগবান তাই বুঝেই ওদের কোলে-কাঁকালে দিলেন না। ছেলেপুলে হয়নি তবু রক্ষে। দেমাক করতে মানা করে দে সদু, ভাঙা ক্যানেস্তারা পিটিয়ে বেড়ালে লোকে হাসে।

যথোচিত প্রতিহিংসা নিয়ে মুরারি হেলতে দুলতে জামাজুতো ছাড়তে চলল। উঠানের উপর সুভদ্রা পাগলের মতো চুল ছিঁড়ছে, বুক থাবড়াচ্ছে, হাপুসনয়নে

কাঁদছে ঃ রোজগার দেখে বিচার হয় না। ধর্মপথে থেকে না খেয়েও সুখ। কাছারির ফুটো গোমস্তা হয়ে চাঁদের মুখে থুতু ফেলতে যান। তার কিছু নয়—থুতু ফেরত এসে নিজের মুখে পড়ছে।

বড়বউ দ্রুত এসে সুভদ্রাকে জড়িয়ে ধরে ঃ ভিতরে চল্‌ রে ছোট, উঠোনে দাঁড়িয়ে লোক হাসাস নে। বিদেশি ছেলে একটা রয়েছে—তোদের ঝগড়াঝাটি দেখে সে-ই বা কী ভাবছে!

সুভদ্রা কেঁদে পড়ে ঃ ছোটভাইকে ফাঁকি দিয়ে সম্পত্তি বেনামি করে নিয়েছেন—বেহায়ার মতন তাই আবার জাঁক করে বলা। চোরের বেটা জুয়াচোর—কিন্তু গুরুজন বলে মুখের উপর কিছুই তো বলতে পারলাম না দিদি।

বড়বউ তাড়াতাড়ি হাত চাপা দেয় সুভদ্রার মুখে। বলে, বেনামি না আরো কিছু! আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বলে, ভাইয়ের যা মতিগতি, সম্পত্তি কোন দিন মঠ-মন্দিরে দিয়ে বিবাগি হয়ে বেরুবে। ছোটবউমার তখন উপায়টা কি? কায়দা করে তাই বেঁধে রাখা—ঘরের সম্পত্তি পরের হাতে না চলে যায়।

দু-হাতে জড়িয়ে ধরে বড়বউ টেনে নিয়ে চলল। কানের কাছে বোঝাতে বোঝাতে যাচ্ছে ঃ বিষয়সম্পত্তির ব্যাপার ওরা ভাইয়ে ভাইয়ে বুঝুকগে। পরের বাড়ির মেয়ে আমাদের কি? আবার তা-ও বলি, ভাসুরের কাছে অমন ক্যাট-ক্যাট করে বলা তোর ঠিক হয়নি। এক কথায় দশ কথা উঠে পড়ল। কর্তামানুষ ওরা, পুরুষমানুষ—যেমন খুশি যাক বলে। অতিথি-সেবা হবে না—ওঃ, ঠেকাবে এসে! সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পাহারা দেবে! আজকে হঠাৎ চোখে পড়েছে, তাই বলে বুঝি ছেড়ে দেবো! যা করবার, করে যাব আমরা।

গোলমাল ঠাণ্ডা হয়ে গেলে সাহেব হি-হি করে হাসে ঃ কলকাতার বড় বড় হোটেলে উঁকি দিয়ে দেখেছি—খাওয়ার সময়টা বাজনা বাজে, নাচ হয়। আমাদেরও তাই একদফা হয়ে গেল।

পচাও হেসে বলে, সব অঙ্গের ভিতর কানের খাটনি আজকাল বেশি। ভাবছি, একজোড়া শোলার ছিপি সুতোয় বেঁধে কানে ঝুলিয়ে রাখব। গোলমালের সময়টা ফুটোয় ছিপি আঁটা থাকবে। কাজের মুখে সেটা খুলে ফেলব।

বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে খেয়ে ক্লান্তিতে পচা বাইটা শুয়ে পড়েছিলো। হঠাৎ সে উঠে বসে—বসা ঐ মানুষের পক্ষে যতটা সম্ভব। দুই হাঁটুর ভিতর থেকে জ্বলজ্বল করে সাহেবের দিকে চেয়ে বলে, কান রপ্ত করতে বলেছিলাম, কদ্দুর কি কি হল বল্‌।

করপোরেশন-ইস্কুলে পড়বার সময় বাড়িতে অংক করতে দিত। মাস্টার হুংকার দিয়ে ক্লাসে ঢুকত ঃ হয়েছে টাস্ক? পচা বাইটার ভঙ্গিটা অবিকল তাই।

সাহেবও সেই আমলের মতো মুখ কাঁচুমাচু করে বলে, হল আর তেমন কই! আপনার অসুখ হয়ে পড়ল, ফাঁকই তো পেলাম না।

পচা বলে, আজকেই এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যা। আমার বড়ছেলে যা বলে গেল।

নিজের আখের তাড়াতাড়ি গ‍ুছিয়ে নে। পনের-বিশ দিন পরে আসিস, পরখ করে দেখব।

সাহেব আমতা-আমতা করে, আপনি এখনও ভাল করে সেরে ওঠেন নি বাইটামশায়।

এবারে পচা রেগে উঠল ঃ তাতে তোর কি ? তোর মাথাব্যথা কিসের ? বড়-ছেলের বাক্যি কানে শ‍ুনলি, ছোটবউয়ের মধ‍ু-মাখা বোলও শনে থাকিস। আপন লোক হয়ে তারা ঐ রকম করে, তোর কোন দায়টা পড়েছে বল দিকি ?

দম নিয়ে আবার বলে, আমার কাছে ঠায় না বসে ঘ‍ুরে ঘ‍ুরে বেড়া। যেখানে কথাবার্তা, সেইখানে কান পাতবি। নিশ্বাসের শব্দ শ‍ুনবি মন স্থির করে। দিনেরাত্রে সব সময় মান‍ুষ ঘ‍ুম‍ুচ্ছে—প‍ুর‍ুষমান‍ুষ মেয়েমান‍ুষ ব‍ুড়োমান‍ুষ বাচ্চামান‍ুষ কাছে গিয়ে চোখ ব‍ুজে নিশ্বাসের তফাত ব‍ুঝে নিবি। গাঢ় ঘ‍ুম পাতলা ঘ‍ুম, সাচ্চা ঘ‍ুম মেকি ঘ‍ুম—নিশ্বাস সব আলাদা আলাদা। শ‍ুধ‍ু মান‍ুষ হলেও হবে না—কুকুর-বিড়াল গর‍ু-ছাগল যত রকম জীব আছে, নিশ্বাস চিনে ধরতে হবে। ধারালো দুখানা কান তৈরি হল তো কাজের বারো আনা শেখা হয়ে গেল। যেমন যেমন বললাম সেই মতো করে হপ্তা দুই পরে আসিস।

হ‍ুঁ—বলে কি বলতে গিয়ে সাহেব চুপ করে যায়। কোমল কণ্ঠে পচা বলে, কি রে ?

ম‍ুখের দিকে একনজর তাকিয়ে দেখে সাহেব ভয়ে ভয়ে বলে, যে রকম বললেন—কান খাটিয়ে ঘ‍ুরে বেড়াব এখন থেকে। কিন্তু থাকতে চাই এই জায়গায়, আপনার পাদপদ্মে। গ‍ুর‍ু বলে মান্য দিয়েছি—পদসেবা করব, নিত্যি-দিন ম‍ুখের কথা শ‍ুনব। বিস্তর শিক্ষা তাতে। খাব না এ-বাড়ি, এত কথা কথান্তরের পরে ভাতের দলা গলা দিয়ে নামবে না—

বলে চলেছে এমনি। পচা অন্য কি ভাবছে। কথার মাঝখানে বলে উঠল, মার খেতে পারিস কেমন তুই ? কিল-চড়-ঘ‍ুসিতে লাগে ?

সাহেবের চমক লাগে। মারের কথা উঠল কেন হঠাৎ ? কাছারির নায়েব ম‍ুরারি বর্ধনের হাতে লেঠেল-বরকন্দাজ বিস্তর। তারই একদল জ‍ুটিয়ে বোধহয় মারধোর দেবার তালে আছে। হায় রে হায়, কিলচড় সাহেব কবে খেল যে ফলাফল বলবে ! কিল তো কিল, চোখ রাঙিয়ে একটা কথা বলার জো ছিল কারো ! সেই একদিনের ব্যাপার—চালাঘর তুলে নফরকেষ্ট শ‍ুইয়ে পরখ করবে, ভয় পেয়ে সাহেব স‍ুধাম‍ুখীর কাছে ছুটে গেল ! কী আগ‍ুন তখন তার দুচোখে—কপিল ম‍ুনি চোখের আগ‍ুনে সগরপ‍ুত্রদের ভস্ম করেছিলেন, নফরকেষ্টও ভস্ম হত আর খানিক দাঁড়িয়ে থাকলে। বাঘিনীর মতো আগলে রেখে স‍ুধাম‍ুখী তাকে অপদার্থ করে দিয়েছে—

পচা প্রশ্ন করে ঃ চোরের দশদিন, গৃহস্থের একদিন। কোনদিনই ধরা পড়বি না, এমন কথা হলফ করে বলার জো নেই। ধরে তো ফেলল—কি করবে

বল্ দিকি সকলের আগে ?

সহজ প্রশ্ন, সোজা জবাব। সাহেব বলে, মারবে—

ঘাড় নেড়ে পচা সায় দেয়ঃ তাই। গৃহস্থ মারবে, মারবার লোভে বাইরের মানুষ দুড়দাড় করে ছুটে আসবে। মানুষ মেরে যত সুখ, এমন কিছুতে নয়। মানুষই তখন আর নেই—চোর—মারধোর সেরে হাত বেঁধে চোরকে তো থানায় জমা দিয়ে এল। সেখানেও মার, সে মারের হরেক কায়দা। সামলাতে না পেরে আনাড়ি চোর একরার করে বসে—দলের কথা মালের কথা বলে দেয়।

সেই সর্বনাশ না ঘটতে পারে—বড়বিদ্যার গোড়ার পাঠ তাই। মারখাওয়া শিখে নেওয়া। শিক্ষার পদ্ধতি আছে দস্তুরমতো—দলের মধ্যে এ ওকে পেটায়। হাত দিয়ে—ক্রমশ, লাঠি-বেত বাঁশ যা হাতের কাছে মেলে। পিটিয়ে রক্ত বের করবে। অনভ্যাসে গোড়ার দিকে গা-গতর ব্যথা হবে, মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়েও পড়তে পারে। রপ্ত হয়ে গেলে তখন আর কিছু না—আদর করে হাত বুলাচ্ছে যেন গায়ের উপর।

পচা বলে, যন্ত্রণা মারগুতোনে নেই—যন্ত্রণা ভয়ের। মারের সময় কত ব্যথাই না জানি লাগবে—ভয়টা সেই। সাধুরা পেরেকের শয্যায় শুয়েবসে থাকে, বৈশাখের ঠা-ঠা রোদ্দুরে বসে আগুন পোহায়, মাঘের রাতে ঠাণ্ডা দীঘিতে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে ধ্যান করে ! গাজনের সন্ন্যাসী পিঠে বড়সি গেঁথে বাঁই-বাঁই করে চড়কগাছে পাক খায়। হয় কি করে এসব ?

সাহেব মৃদুকণ্ঠে বলে, ভগবানের দয়া সাধু-সন্ন্যাসীর উপর—

কথা শেষ করতে না দিয়ে পচা বলে ওঠে, সাধু আর চোর এক গোত্রের আমরা—উনিশ আর বিশ।

পচা বাইটার কথা সেদিন হেঁয়ালির মতো ঠেকল। পরে সাহেব মিলিয়ে দেখেছে। বলাধিকারীও এমনি কথা বলতেন। শরীরের কষ্ট নিয়ে সাধু-সন্ন্যাসীর ভ্রূক্ষেপ নেই, চোরেরও ঠিক তাই। সাধুরা সত্যনিষ্ঠ, নিজ দলের মধ্যে চোরও তাই। বেচাল দেখলে সঙ্গে সঙ্গে দল-ছাড়া করবে। খাঁটি সাধু কামিনী-কাঞ্চনে বিরাগী, মোক্ষলাভ তাঁর সাধনা। চোর এইখানটা একটি ধাপ নিচে—কামিনীতে বিরাগী, কাঞ্চনের সাধনা তার। কাঞ্চনের ধাপ কাটিয়ে আর একটু উঠলেই নিষ্কলঙ্ক ষোল আনা সাধু। রত্নাকর বাল্মিকী হয়ে যান—যদু-মধুর হতে হলে জন্মান্তরের তপস্যা লাগবে।

কিন্তু এ-সব পরবর্তীকালে ধীর মস্তিষ্কের বিচার। মার খাওয়ার গুণগান করছে ওস্তাদ পচা। ভাল রকম মার খেতে পারলে শুধুমাত্র তারই গুনে বেঁচে আসা যায়—

সে কেমন ?

ধরে ফেলে গৃহস্থ তো ঠেঙানি জুড়ল। পাড়া প্রতিবেশীরাও কোমর বেঁধে লেগে গেছে। চোরের কি কর্তব্য তখন ? মারধোর অল্পে যাতে না থামে,

সেইটে দেখতে হবে। মারুক, ক্রমাগত মেরে যাক। ক্লান্ত হয়ে মানুষের দম ফুরিয়ে এসেছে, রাগের ঝাঁঝ কমছে, ঝানু কারিগর সেই মুখটায় দুটো-পাঁচটা ফোড়ন কেটে রাগ বাড়িয়ে দেবে। পুরো জোর দিয়ে আবার লেগে যাক। নিজেও ক্ষণে ক্ষণে আছাড় খেয়ে পড়বে, চোট লেগে যাতে কেটেকুটে যায়। পাঁচ-সাত জায়গায় রক্ত বের করতে পারলে আর কথা নেই। বেকসুর খালাস।

কেন ?

অধীর কণ্ঠে বাইটা বলল, কী মুশকিল। কাজটা যে বে-আইনী। সরকারের নিয়মে হাতে মারার কারো এক্তিয়ার নেই। হাকিম রায় দিলে গুণেগুণে বেতের সেই কয়েকটা ঘা গড়বে, একটি তার বেশি হবার জো নেই। অথচ মারে সবাই—তলা থেকে উপর অবধি। জানেও সকলে। কিন্তু আইনের ইজ্জত আছে—দাগ রেখে কেউ মারবে না। ধরলে বেকবুল যাবে। সেই দাগ অঙ্গঅঙ্গে গেঁথে রয়েছে—দারোগা-হাকিম কোন্ ছার, তুই তো রাজচক্রবর্তী তখন। যারা মেরেছে তারা চোরের অধম—থানা-পুলিশ করবার শখ নেই তাদের। গোলমাল না করে আপোসে যদি সরে পড়িস, তারা নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। চাই কি টাকাটা সিকেটাও হাতে তুলে দিতে রাজি।

অনেক কথাবার্তা হল। ভাতঘুম ধরেছে এবার, বাইটার চোখ বুজে আসে। সাহেব উঠে পড়ল, পাটোয়ার-বাড়ি একবার ঘুরে দেখে আসবে।

পচা বলে, সুঁচটা পড়লেই কানের সাড় হবে, আর পাহাড় ভেঙে পড়লেও গায়ের সাড় হবে না—শিক্ষা বলি তাকে। সে পাকা-লোক আজকাল আর দেখিনে। তোর হবে সাহেব, তোর কাজকর্ম দেখেশুনে তবে আমি যেন চোখ বুজি।

দশ

যা আন্দাজ করেছে তাই—চারদিন গরহাজির থাকার দরুন সাহেব বরখাস্ত। দীনু পাটোয়ার নতুন রাখাল রেখেছে। তবে ভাঁটি-অঞ্চলে শিক্ষিত মানুষের অকুলান বলে গোমস্তার কাজ এখনো খালি। শুধুমাত্র সেইটুকু হতে পারে। মাইনে গোমস্তাগিরি বাবদে ছিল তিন। দুরকমের কাজ একসঙ্গে—ধরে নিলাম তাই পাইকারি দর। এখন এই চাকরির জন্য কত হওয়া উচিত, তুমিই বল সাহেব। সাড়ে-তিন—কি বলো ? কাগজ-কলমের কাজ হল বাবুভেয়ের কাজ—দর কিছু বেশিই হবে। মাইনে ঐ সাড়ে তিন সাব্যস্ত রইল।

সাহেব বলে পুরানো পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দেন পাটোয়ারমশায়। এখানে থাকব না, চাকরি সকালবেলা এসে করে যাব।

দিব্যি হল। টাকাপয়সা যা ছিল সুধামুখীকে মনিঅর্ডার করে একেবারে শূন্য হাত। আবার কিছু নগদ এসে পড়ল হাতে। সকল দিকে চমৎকার। নিজ রোজগারের ভাত—তক্কে তক্কে থাকতে হবে না, মুরারির বর্ণন কখন এসে

ধরে ফেলে।

পচাকে এসে বলে, চুকিয়ে-বুকিয়ে চলে এলাম। শোব আপনার ঘরে, যেমন যেমন বলবেন করে যাব। চাট্টি করে চাল ফুটিয়ে নেবো—এদের বাড়িতেও নয়। সীমানার বাইরে পথের ধারে জামরুলতলায়।

বাড়ি আজ ওদেরই বটে! ফোঁস করে পচা এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঃ জীয়ন্তে মড়া হয়ে ওদের বাড়ি পড়ে আছি। গতর থাকলে আমিও আলাদা চাল ফুটিয়ে নিতাম। ওদের ভাত না গিলে আমার যে উপায় নেই।

সেই ব্যবস্থা। জামরুলতলায় পরদিন সাহেব ভাত চাপিয়েছে। তিনটে মাটির ঢেলা উনুনের তিনটে দিক, তার উপরে মেটেহাঁড়ি। পুকুরঘাটে স্নান করে সুভদ্রা কলসি নিয়ে হেলতে দুলতে ফিরছে। কাঁখের কলসির মতো দেহের কানায় কানায় ভরা যৌবন—চলনের সঙ্গে সে যৌবনও ছলকে ছলকে পড়ে যেন। সাহেবকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যায়, ঘাড় লম্বা করে দেখে।

কি হচ্ছে ঠাকুরপো? রান্না করছ ওখানে?

হুড়কো পার হয়ে ঘাসবন মাড়িয়ে জামরুল তলায় চলে আসে ঃ রান্নার বিদ্যেও জানা আছে তোমার? ঠাকুরপোর সঙ্গে যার বিয়ে হবে সে বড় ভাগ্য-ধরী। ঠাকুরপো রেঁধেবেড়ে খাওয়াবে, সে মেয়ে বিনুনি বেঁধে আলতা পরে খাটে বসে পা দোলাবে। মাটিতে পা ছোঁয়াতে হবে না। তোমার সংসারে আজ আমার নেমন্তন্ন ভাই। রান্না হলে পাতা পেতে বসে যাব।

সাহেব জবাব দিল না, শুকনো ডাল-পাতা খুঁটে খুঁটে উনুনে দিচ্ছে। পাশে দাঁড়িয়ে সুভদ্রা বলে, কি রাঁধছ গো?

ভাত, কাঁচকলা-ভাতে, ঝিঙে-ভাতে—

উঃ, যজ্ঞিবাড়ির খাওয়া একেবারে! সহসা উত্তেজিত হয়ে উঠল ঃ হবে আর কোন্ ছাই, পাবে কি কোথায়? আমাদের বাড়ি পাত পাড়বে না, এমনি খেয়েই চলবে বুঝি বরাবর?

সাহেব বলে, মন্দ হল কিসে? দু-খানা তরকারি। তার উপরে কাগজিলেবু আর কাঁচালঙ্কা তুলে এনেছি একজনের বাগান থেকে। ওকি, জল আমি ইচ্ছে করে কম দিয়েছি, ফ্যান গালবার হ্যাঙ্গামে যাব না তো! ও কি, ও কি, ও কি—

হুড়হুড় করে কাঁখের কলসি উপুড় করে দিয়েছে সুভদ্রা। ভাতের হাঁড়ি জলে ভরতি। ঢেলার উনুন ভেসে গেল জলস্রোতে। সুভদ্রাও সেই সঙ্গে খিল-খিল করে হাসে। হাসিতে ভেঙে পড়ে।

হাসি থামিয়ে হঠাৎ সে গম্ভীর হয়ে যায় ঃ বাড়াবাড়ি হচ্ছে ঠাকুরপো। বর্ধনবাড়িতে থেকে জঙ্গলে বসে রান্না করে খাবে, লোকের চোখে কি রকম ঠেকবে বলো তো! এসব হবে না। খাবে যেমন এই ক'দিন খেয়ে যাচ্ছ।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে সাহেব বলে, বড়বাবুর ঐ সব কথার পরে এ বাড়ির ভাত গলা দিয়ে নামবে না।

সুভদ্রা বলে, সদু ঠাকুরঝি ভাত আনবে না, আমি নিজের হাতে এনে দেবো। তবু যদি আটকে যায় হাত বুলাব গলার উপর। ঠিক নেমে যাবে তখন।

বলতে বলতে লঘুকণ্ঠ কঠিন হয়ে ওঠে : বড়বাবু যখন বাড়ি থাকে, ঠিক সেই সময়টা তার চোখের উপর দিয়ে ভাত বেড়ে আনব। আমি এ বাড়ির কেউ নই, ওদের দয়ায় ভাত খাচ্ছি—তার একটা ভাল রকম বোঝাবুঝি হওয়া দরকার।

কিন্তু বোঝাবুঝি আমায় দিয়ে কেন বউঠান?

তা ছাড়া মানুষ কোথা আমার? মা নেই, বাপ নেই, একটা ভাই পর্যন্ত নেই! বরের ঘাড়ে ভূত চেপে তাকে বাড়ি ছাড়া করেছে।

দাঁতে-দাঁত চেপে বলে, ভুল বললাম। ভূত নয়, ভগবান চেপেছে। মরুকগে ছাই। কিন্তু তোমায় সামনে করে বড়বাবু বলেছে, তোমাকেই নিত্যি দু-বেলা খাইয়ে তবে সে কথার খণ্ডন হবে। দিক তুলে পিঁড়ি থেকে, দেখি কত বড় ক্ষমতা! এ জিনিস তো অন্য কাউকে খাইয়ে হবে না ভাই।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে অধীর কণ্ঠে সুভদ্রা বলে, উঠলে না এখনো?

দু-হাতে হাঁড়িটা তুলে আছাড় মেরে ভেঙে দিল, আধ-সিদ্ধ ভাত ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। বলে, রাগের পুরুষ, ঢের রাগ দেখানো হয়েছে। চলে এসো বলছি—

এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে, খপ করে সাহেবের হাত এঁটে ধরল। সাহেব স্তম্ভিত। দাঁড়াতে হল হাতকড়ি-পরানো এক চোরের মতোই।

ফিক করে সুভদ্রা হেসে পড়ে : দেখ, তুমি আমার হাত ধরেছ বলে চেঁচাব বলেছিলাম। উল্টোটা হয়ে পড়ে : তোমার বদলে আমাকেই ধরতে হল শেষটা। ধরিয়ে তবে ছাড়লে—তুমি কম লোক! চেঁচাও এবারে—

সৌদামিনী বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বলে, কি করছ ছোটবউ? এক ফোঁটা জল নেই বাড়ি। কলসি নিয়ে ওখানে কি তোমার?

সুভদ্রা হাত ছেড়ে দিয়েছে। সাহেব বলে, সদু-দিদি কি ভাবল বলুন দিকি?

সুভদ্রা সহজভাবে বলে, কি করে বলি! তোমার রূপে মজে গেছি, তা-ও ভাবতে পারে। শ্বশুর চোর, ভাসুর ফেরেববাজ, বর পলাতক—সে বাড়ির বউ নষ্টদুষ্ট হবে, অবাক হবার কি!

কালীঘাট থাকতে কথকতা শুনত খুব সাহেব। রামায়ণ-মহাভারত পাঠ হত তা-ও শুনত। পুরাণের ঘটনা মনে আসে। কোন জাঁদরেল ঋষি বা রাজা, তপস্যায় যখন বড় বেশি এগিয়ে যান, রম্ভা-মেনকা-উর্বশীরা আদা-জল খেয়ে লাগে তপোভঙ্গের জন্য। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারলেই সিদ্ধি। সাহেবের সিদ্ধির পথে এসে দাঁড়িয়েছে ছোটবউ সুভদ্রা। চেহারা সকলে ভাল ভাল করে সেই চেহারা কাল হয়ে দাঁড়াল। কালীঘাটে একটা মেয়ের মুখে এসিড ঢেলে

দিয়েছিল—প্রণয়ের রেশারেশি ব্যাপারে। বেঁচে উঠল মেয়েটা, কিন্তু মুখের দিকে তাকানো যায় না। প্রণয়ীরা তখন সব ভেগে পড়ল। সাহেব ভাবছে তার মুখেও কেউ অ্যাসিড ঢেলে চেহারা পুড়িয়ে-জ্বালিয়ে দিয়ে যেত!

সেই দুপুরে ভাতের থালা সুভদ্রা নিজে নিয়ে এলো। জল ছিটিয়ে পিঁড়ি পেতে গেলাস দিয়ে পরিপাটি করে আগে ঠাঁই করে গেছে। ঘরের ভিতরে নয়—বাইরের দাওয়ায়। কাছারি থেকে মুরারির আসার সময় হল—ভাগ্যবশে যদি এসে পড়ে, নয়নভরে দেখবে। প্রকাণ্ড বগিথালা, ভাতও প্রচুর, মোচার আকারে ঠেসে ঠেসে বাড়া। বাটিতে বাটিতে রকমারি তরকারি সাজিয়ে এনেছে। ভাতের থালা নামিয়ে চতুর্দিকে বাটিগুলো সাজিয়ে সুভদ্রা ডাক দেয়: চলে এসো ঠাকুরপো—

সেইমাত্র স্নান সেরে সাহেব উঠানে ভিজে কাপড় মেলে দিচ্ছে। সুভদ্রা বলে, দুটো তরকারি আমি রেঁধেছি। আর সব সদু-ঠাকুরঝি। ঠাকুরঝির রান্না আগে খেয়েছ। আমার কোন্ দুটো চেখে বলে দেবে।

সাহেব আঁতকে ওঠে: সর্বনাশ, এত ভাত কে খাবে?

বসে পড় না তুমি। ভাত বেশি নয়, আগে থাকতে চেঁচিও না।

সামনের উপর সুভদ্রা চেপে বসল। কালীঘাটের সুধামুখী এমনি বসতে যেত, রাগ করে উঠত সাহেব। ভাত ফেলে উঠে পড়বার ভয় দেখাত। আজকে অনেক দিন পরে এত দূরের মুলুকে এসে আবার সেই ব্যাপার।

বিড়বিড় করে সুভদ্রা বলছে, এ পোড়া বাড়িতে কোন জিনিস কাউকে প্রাণ ভরে খাওয়াবার জো আছে! বড়জা যেখানেই থাকুক ছুটে এসে পড়বে। মুখ-মিষ্টি মানুষটা হাড়কঞ্জুষ। নিজের হাতে ভাত বেড়ে মাছ-তরকারি ভাগ করতে বসবে—অন্যের উপর ভরসা হয় না পাছে সে বেশি দিয়ে ফেলে। যত আঁটি-সাটি পরের বেলা—নিজের পেটের একগাদা পঙ্গপাল, তাদেরই কেবল গণ্ডে গণ্ডে গেলাবে। বদহজমে সবগুলো সলতে হয়ে যাচ্ছে, তবু ছাড়বে না। তোমার ভাত বাড়ার সময় বড়দি'কে ঘেঁসতে দিইনি। খাওয়ার সময় এই যেমন আছি, তখনও এমনি আগলে বসে ভাত-ব্যঞ্জন সাজিয়েছি। ট্যাসট্যাস করে মুখের উপর বলি, সেজন্য ভয় করে আমায়। স্পষ্টাস্পষ্টি কিছু বলতে পারল না, ছট-ফট করে বেড়িয়েছে।

সাহেব সকাতরে বলে, কিছু ভাত তুলে নেন বউঠান। মা-লক্ষ্মীকে ফেলা-ছড়া করতে নেই। লাগলে আবার চেয়ে নেব।

চাইতেই হবে তোমার। সে আমি জানি। আরম্ভ করে দাও, তখন বুঝবে।

কথা কানেই নেয় না। কেমন এক রহস্য-ভরা হাসি হাসছে সুভদ্রা। ভাত ভেঙে নিয়ে সাহেব হাসির কারণ বুঝতে পারে। ভাত অল্পই, বাড়াভাতের

ভিতরে সাত-আটখানা মাছের দাগা। মাছ ভাতের তলে ঢাকা দিয়ে নিয়ে এসেছে।

সাহেব স্তম্ভিত হয়ে বলে, এত মাছ খেতে হবে ?

সুভদ্রা বলে, দুই ভাই ওরা, সমান শরিক। ছোট শরিকের প্রাপ্য নিতে পারিনে বলে বট্‌ঠাকুর আস্পর্ধা পেয়ে যাচ্ছেন। ওদের দশ-দশটা ছেলেমেয়ে কতগুলো করে খায় হিসাব করো দিকি।

সাহেব বলে, সেই দশখানা মুখের খাওয়া আমায় দিয়ে খাইয়ে শরিকানা বজায় রাখবেন ?

দশই বা কেন ! তার উপরে ও-তরফের বট্‌ঠাকুর নিজে রয়েছেন। আমাদের হা-ঘরে মানুষটা একবেলা ভাতে-ভাত খেয়ে ভিনগাঁয়ে গড়ে রয়েছে। তার হিসাবটাও ধরবে এই সঙ্গে।

সাহেব বলে, এতজনের খাওয়া একলা পেটে সামাল দিতে পারব না। মরে যাব বউঠান, রক্ষে করুন।

আমার যে একজনই ভাই। একলার বেশি কোথা পাই ?

গলাটা কেঁপে উঠল বুঝি সুভদ্রার। সঙ্গে সঙ্গে সুর বদলে তাড়া দিয়ে ওঠে: মাছ ক'খানা ফেলে রেখেছ কোন আক্কেলে শুনি ? বড়গিন্নী দেখতে পেলে পুটপুট করে বট্‌ঠাকুরের কাছে লাগাবে। ছুতো পেয়ে সে মানুষ চেঁচিয়ে জানান দেবে। যে কলঙ্ক এড়াতে চাইছ সেইটেই ঘটে যাবে। কিনা, ভালবাসার মানুষকে চুরি করে মাছ খাওয়াচ্ছি। ভাত চাপা দিয়ে দাও, যেমন করে নিয়ে এসেছি। আস্ত এক-একখানা মুখের ভিতর দিয়ে তাড়াতাড়ি শেষ করো। পুরুষমানুষ হয়ে এটুকুও না পারবে তো বাসি বাইটার কাছে ঘোরাঘুরি কি জন্যে ? বাড়ি ফিরে গিয়ে মাথায় ঘোমটা টেনে আমাদের মতন বউ হয়ে বোসোগে।

ফিসফিসানি কথা—পচা বাইটার কিন্তু কান এড়ায়নি। ঘরের মধ্যে থেকে সে বলে, খেতে বসলি বুঝি সাহেব ? রোগা মানুষ আমারও যে খিদে পেয়ে গেছে। আমার ভাত কে এনে দেয় !

সুভদ্রা অমনি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে: রোজ যে-মানুষ এনে দেয় : তাকে ডাকলেই তো হয়। আমি কবে দিয়ে থাকি, আমায় কেন ঠেশ দিয়ে বলা ?

সদয় হয়ে নিজেই ডেকে দেয়: ঠাকুরঝি, অ সদু-ঠাকুরঝি, ভাতের জন্য মূর্ছা যায় এদিকে মানুষ। কখন ভাত দেবে ?

সৌদামিনী সাড়া দেয় না। কোথায় কোন কাজে আছে, বাড়ির ভিতরেই নেই হয়তো। পচা বাইটা ছেলেমানুষের মতো কাঁদছে: যমের দুয়োর থেকে ফিরে এলাম, তা বলেও কারো দয়ামায়া নেই। রোগা মানুষটা না খেয়ে পড়ে আছে, গলা ফাটিয়ে চেঁচামেচি করে সেটা মনে করিয়ে দিতে হবে। কানে শুনেও সাড়া দেবে না।

সুভদ্রা টিপ্পনী কাটে ঃ দুয়োর থেকে ফিরে আসতে কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল ? ঢুকে পড়লেই তো হত।

ক্ষেপে গিয়ে পচা বলে, হারামজাদির কথা শোন একবার। জন্মের পরে বাচ্চাকে মধু খাওয়ায়, তোকে বেয়ান নিমপাতা বেটে খাইয়েছিল।

নিঃশব্দে হেসে হেসে সুভদ্রা যেন পরমানন্দে উপভোগ করছে। সাহেবকে বলে, দোষ কিন্তু তোমারই ঠাকুরপো। এ যাত্রায় যমের হাত থেকে ছিনিয়ে আনা তুমি ছাড়া কারো সাধ্য হত না। মানুষটার কষ্টের জন্য দায়ী তুমি। নিজে কষ্ট পায়, বাড়িসুদ্ধ লোককে জ্বালাতন করে মারে।

পচা গজরাচ্ছে ঃ এত কথা কিসের—সদুকেই বা ডাকাডাকি কেন ? মুঠোখানেক ভাত নিজে এনে দিলে হাতে কুড়িকুষ্ঠ হবে নাকি ?

হতেও পারে, হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। ভাললোকের সেবায় পুণ্য। পাপীর সেবা মানেই তো পাপকে জিইয়ে রাখা বেশিদিন ধরে।

আর যাবে কোথায়! অসুখ থেকে উঠলে কি হয়, মুখের জোরটা দিব্যি আছে। রে-রে করে উঠল ঃ ওরে আমার পুণ্যির বস্তা! চোখে দেখতে হয় না আমার, এমনিই সব টের পাই। শোন তবে লো রাই, কুলের কথা কই—

আর হাসিতে ফেটে পড়ে এদিকে সুভদ্রা। দু-কানে হাত চাপা দিয়ে খিলখিল করে হেসে বলে, চালাও না, চালিয়ে যাও শ্বশুরঠাকুর—

সাহেবকে বলে, শুনে নাও ঠাকুরপো, কী সমস্ত বিশেষণ আমার !

সাহেব ধমকের সুরে বলে, শ্বশুর গুরুজন—তাঁকেই বা আপনি কেন অমন করে বলেন ?

সুভদ্রা পাড়াগাঁয়ের চলতি মোটা রসিকতা করে একটা ঃ আর লোকের শ্বশুর গুরুজন, আমাদের ইনি গরুজন।

হাসতে হাসতে হঠাৎ যেন আগুন ধরে যায় সুভদ্রার কণ্ঠে। বলে, দশের মধ্যে মুখ তুলতে পারিনে। বাইটাদের বউ বলে চোখ টেপাটেপি করে। ঐ মানুষের ছেলে হওয়ার ঘেন্নায় তোমার ছোড়দা দেশান্তরী হয়ে রইল, চোখেই তো দেখে এসেছ ভাই। অতবড় কাছারির নায়েব বট্‌ঠাকুর খরচা করে দালান কোঠা বানিয়েও বাড়ির নাম বর্ধন-বাড়ি করে তুলতে পারলেন না, সেই চিরকেলে বাইটা-বাড়ি রয়ে গেল। মানুষটা মরে পুড়ে ছাই না হলে কলঙ্কের মোচন নেই।

বলে যাচ্ছিল সুভদ্রা এক সুরে। হঠাৎ সাহেবের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে, বলতাম না এত সব ঠাকুরপো। মুশকিল হয়েছে, গাঁদালি-পাতার ঝোল রান্না হয় নি। ঐ ছাড়া কবিরাজ আর কোন তরকারি দেবে না। সদু-ঠাকুরঝির খেয়াল ছিল না—বাগানে বাগানে এখন সে গাঁদালিপাতা খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঝগড়াঝাটি গালিগালাজে ভুলে আছে, নইলে ক্ষিধে-ক্ষিধে করে পাগল করে তুলত। যতক্ষণ ঠাকুরঝি না আসে আমায় এমনি চালিয়ে যেতে হবে।

গালির স্রোত অবিশ্রান্ত চলেছে। নির্বিকার সুভদ্রা। এক-একবার বড় অসহ্য হয়ে ওঠে, দু-হাতে সেইসময় কান চাপা দেয়। হাসি-ভরা মুখে মৃদুকণ্ঠে গল্প করছে সাহেবের সঙ্গে, খাওয়ায় ফাঁকি দিয়ে উঠে না পড়ে সতর্ক চোখে সেদিকে দৃষ্টি রেখেছে। একবার মনে হল, গালির তেমন যেন আর বাঁধন নেই। সৌদামিনী এখনো ফিরল না—বুড়োমানুষের দম ফুরাল নাকি?

ভাণ্ডার সুভদ্রার জোগানেই থাকে। মুখ টিপে একটুখানি হেসে ঘরের মধ্যে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, শোন ঠাকুরপো, কচি মেয়ে এ-বাড়ির বউ হয়ে এলাম। শাশুড়ি বেঁচে নেই, ভালবেসে শ্বশুর নিজে এই সোনার চুড় পরিয়ে দিল। বলে, শাশুড়ির হাতের জিনিসটা, তোমার নাম করে রেখে গেছে ছোট-বউমা। ভাবি, সত্যিই বা! বড়দির কাছে পরে টের পেলাম, সমস্ত মিথ্যে, বউ-পরিচয় হবে বলে টাটকা সিঁধ কেটে এনেছে। কোন আটকুড়ো বাড়ির অপয়া জিনিস—বাড়ির উঠানে পা দিতে না দিতে তাই হাতে পরিয়ে দিল। বাঁজা নাম আমার সেইজন্যে ঘুচল না।

এত কুৎসা-গালিগালাজে যা হয় নি—নিজের এই কথায় সুভদ্রা-বউয়ের চোখ দুটো ছলছল করে আসে। বলে, বাসি বাইটার কি! দুই বেটার বউ—একটার যেমন হল না, আর একজনে তেমনি গণ্ডায় গণ্ডায় উশুল করে দিচ্ছে। বছর বছর দিয়ে যাচ্ছে। হাঁস-মুরগির মতো। বলব কি ভাই—অন্ধকারে দরদালানে পা ফেলতে ভয় বরে। কোন্ দিকে পড়ে আছে—পা চাপিয়ে না বসি। আর আমার নিজের ঘর—সে ঘরে জগঝম্প পেটাও, ট্যাঁ করে উঠবার কেউ নেই।

পচার গর্জন উঠল: ফেরত দিয়ে দে হারামজাদি আমার গয়না। নিরেট সোনার জিনিস, একগাদা পাথর বসানো। অপয়া যদি তো হাতে নিয়ে ঘুরিস কেন রে? ভোগ-ব্যাভার করবি, মুখে এদিকে শতেক নিন্দে—আচ্ছা, আমিও দেখে নেব কতদিন রাখতে পারিস হাতে। না দেখে ছাড়ব না।

আর সুভদ্রা এ-সব কথায় নেই, সৌদামিনীকে দেখতে পেয়ে চুপ করে গেছে। রান্নাঘরে সে গাঁদালির ঝোল রাঁধুক, ক্রোধের জের অন্তত ততক্ষণ অবধি চলবে। সাহেবকে নিয়ে পড়ল আবার। বলে, কী তুমি ভাই, গলা দিয়ে যে ঢুকতে চায় না, গলার নলি নিরেট বুঝি তোমার? মাছ তো তিন-চারটে বাকি। বড়গিন্নী আসছে—যা আছে মুখে পুরে ফেল। শিগগির, শিগগির—। জিভ দিয়ে টাকরায় ফিরিয়ে এনে খুশি মতন এর পর জাবর কেটো।

সুভদ্রাকে বাঁচানোর জন্য করতে হল তাই সাহেবকে। মিছেকথা—কোথায় বড়বউ! ফাঁকিজুকি দিয়ে খাইয়ে সুভদ্রা হি-হি করে হাসে। থালা শেষ হল তো সুভদ্রা তাড়াতাড়ি জামবাটি ভরে দুধ গরম করে নিয়ে আসে। দুধের মধ্যে মর্তমান কলা আর ফেনি বাতাসা।

বলে তাকিয়ে কি দেখ? ঢকঢক করে চুমুক দিয়ে ফেল। হিসেব করে দেখ, বড়গিন্নির দশ বাচ্চায় মিলে কত সের দুধ টানে। তার উপরে বটঠাকুরের

গোঁফ ভিজিয়ে ক্ষীর খাওয়া আছে। আমি সেখানে কী পেলাম ?

আর, ঘরের বাক্যবাণ অবিশ্রান্ত বাইরে এসে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ছে। গাঁদালি-ঝোল আর ভাত এসে পড়লে তবে সেটা বন্ধ।

সিঁধের কথা উঠল।

পচা বলে, সাত রকম সিঁধের কথা বললি তুই—মোটে সাত ?

সাহেব বলে, আমি কি জানি আর কি বলব। বলাধিকারী বলেছেন। কথা তাঁর নয়। পুরানো সংস্কৃত নাটকের বর্ণনা।

ছিল তাই হয়তো সেকালে। এখন সিঁধ আর সাতের মধ্যে নেই। সাত কেন, সত্তরেও কুলাবে না। এক এক দলের কাজ এক এক কায়দায়। আজে-বাজে লোক তফাত ধরতে পারে না। অনেক দলের আবার হাতে লেখা নিজস্ব বই থাকে। গোড়ার কোন মুরুব্বির মুখ থেকে লিখে নিয়েছিল, তার উপরে কাটকুট চলে আসে। ওস্তাদ সেই জিনিস শিষ্য-সাগরেদের কাছে পড়ে শোনান, কায়দাগুলো হাতে-কলমে দেখিয়ে দেন। এ-দল ও-দলের মধ্যে কাজের ফারাক হবেই, যার চোখ আছে, সে বলে দিতে পারে। আমার একদিন ছিল তাই, কাজ দেখে কারিগর বুঝতে পারতাম। এখন নজরের জোর নেই, খবরাখবরও রাখতে পারিনে আর তেমন।

নিশ্বাস ছেড়ে পচা বাইটা আপন মনে হুঁকা টানতে লাগল। মুখ তুলে আবার বলে, বঙ্কু দারোগা সবে নতুন এসেছে। আমার কাজকর্মের কথা শুনেছে—পিছনে লাগেনি তখন অবধি, ভাব রেখে চলে। এই সোনাখালিরই এক বাড়ি সিঁধ—দারোগা নিজে হদ্দমুদ্দ দেখে শেষে আমায় ডাকল। তাতিয়ে দিচ্ছে: তোমার গাঁয়ের উপর অন্য কারিগর ঢুকল, আস্পর্ধাটা বোঝ বাইটা।

সাহেবও অবাক এতবড় আস্পর্ধার কথা শুনে। নিয়ম হল, এক চোরের গাঁয়ে অন্য চোর ঢুকবে না। এই সাথে চোরের গাঁয়ের লোক রাত্রিবেলা নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। দুয়োর খুলে রাখলেও ক্ষতি নেই।

অবাক হয়ে সাহেব বলে, আপনার গাঁয়ে এসে সিঁধ কাটে এমনটা হয় কি করে বাইটামশায় ?

পচা বলে, বলছি তো সেই কথা, শোন। অন্যায় করেছে ঠিক, কিন্তু আমিই তার বিহিত করব। দারোগা এর মধ্যে ঢুকে পড়ে উপরওয়ালার কাছে নিজের পশার বাড়াবে, কেন সেই নিমিত্তের ভাগী হতে যাবো ?

বঙ্কুদাস প্রস্তাব করলেন, কারিগরের নামটা বলো বাইটা, দুয়ে মিলে সায়েস্তা করে দিই।

পচা আকাশ থেকে পড়ে: আমি কি করে জানব বলুন? টের পেলে কি হতে দিতাম ?

দারোগার কাছে ঘাড় নেড়ে এলো। কিন্তু কাজের ধারা দেখে পচা বুঝেছে,

কারিগর মনোসি আকুন্দি ছাড়া কেউ নয়। দো-চালা বাংলাঘর তার ভারি পছন্দ। বাড়ির সাত-আটখানা ঘর, সমস্ত তাই—চৌরিঘর সে বাঁধে না। সিঁধেরও হুবহু সেই ঢং—বাংলাঘর আড়াআড়ি যেমন দেখতে হয়।

আকুন্দির কাছে গিয়ে পড়ল ঃ আমার পড়শির উঠোনে কোন সাহসে তুমি চলে যাও ?

আকুন্দি বলে, সে জায়গায় তুমি ঢুকবে না, অন্য কেউ ঢুকতে পাবে না—মজা হল বেশ গৃহস্থর। রাজরাজড়ারা গড় বানিয়ে থাকত, সেইরকমটা হয়ে দাঁড়াল। দল তো আজকাল গাঁয়ে গাঁয়ে—যেখানে যাব সেখানকার কারিগর এসে ঠিক এই কথা বলবে। সিঁধকাঠি তবে তো গাঙের জলে বিসর্জন দিয়ে ঘরে উঠতে হয়।

ক্ষুব্ধ পচা বলেছিল, বাইটা আর আজেবাজে কারিগর এক হল তোমার কাছে ?

আকুন্দি খাতির করত পচাকে, মনে মনে লজ্জা পেয়ে গেল। তখন চুপ করে রইল। ক'দিন পরে শোনা গেল, বমাল সমস্ত মণ্ডলের দাওয়ায় রাতারাতি ফেরত রেখে গেছে।

গল্প করতে করতে হঠাৎ পচা এক প্রশ্ন করে বসে ঃ জবাব দে সাহেব, দেখি জ্ঞানবুদ্ধি তোর কেমন। সিঁধ কাটা সারা, অপর যা-কিছু করণীয়, সমস্ত হয়ে গেছে। এবারে কারিগর নিজে তুই সিঁধে ঢুকবি। কি ভাবে সেটা—মাথা আগে দিবি না পা ?

গুণীরা এই নিয়ে বিস্তর মাথা ঘামিয়েছেন। মতভেদ আছে, সুবিধা-অসুবিধা উভয় দিকেই। প্রাচীন তিব্বতী পুঁথিতে আছে, সিঁধের গর্তে চোর মাথা দিতে যাচ্ছে, সর্দার হাঁ-হাঁ করে ওঠে ঃ পরের ঘরে পা দুটোই ঢুকবে আগে। পচা বাইটারও সেই মত—সকল অঙ্গের আগে পা চালান করে দেওয়া। ঢোকার আগে নানান রকমে তুমি পরখ করে নিয়েছ, তা হলেও এক-একটা ঘাগি গৃহস্থ থাকে ধাপ্পায় তাদের ভোলানো যায় না। চোর ধরবে বলে বাপে-বেটায়, ধরো, সিঁধের পাশে ঘুণ হয়ে বসে আছে। উঠছে পা উঁচু হয়ে—উঠুক, উঠতে দাও। বেশ খানিকটা উঠে গেছে—দুই পা দুজনে চেপে ধরল অমনি 'কালী' 'কালী' বলে।

সেই উৎকট অবস্থাটা মনে মনে কল্পনা করে পচা বাইটা খিকখিক করে হাসে। বলে, গৃহস্থ চোরের পদধারণ করে আছে, গুরুঠাকুর ঘরে এলে যেমন হয়। কত বড় ইজ্জত, দেখ ভেবে সাহেব।

একচোট হেসে নিয়ে পচা বলে, গৃহস্থ পা এঁটে ধরেছে, বাইরে থেকে ডেপুটি ওদিকে কারিগরের মাথা ধরে টান। ঘরের মধ্যে নিয়ে তুলতে না পারে। পাহারাদার খোঁজদার—যারা সব এদিক-ওদিক ছিল, তারাও ধরেছে ডেপুটির সঙ্গে। কারিগরকে নিয়ে যেন দড়ি-টানাটানি—একবার বাইরের দিকে খানিকটা আসে, ঢুকে যায় আবার খানিকটা ভিতর দিকে। পা আগে দিয়েছিল তাই রক্ষে—এতক্ষণ ধরে এই কাণ্ড চলছে, কারিগরের তবু নিশানাদিহি হয় নি।

মুণ্ডু বাইরের দিকে, মুণ্ডু না দেখতে পেলে মানুষ চেনে কি করে ? ধরা যাক, শেষ পর্যন্ত হেরেই গেল এরা—গৃহস্থর টানের চোটে কারিগর ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, ঠেকানোর কোনরকম উপায় নেই। তখন কি করতে হবে বল্।

কোন্ জবাব দিতে গিয়ে বেকুব হবে, ওস্তাদের খিঁচুনি খাবে—সাহেব একেবারে চুপচাপ রইল। পচা নিজেই তখন বলে দেয়। যা বলল—সর্বনাশ! কানে শুনেই সাহেবের আপাদমস্তক হিম হয়ে গেল।

কথার কথা নয়, কাপ্তেন কেনা মল্লিক সত্যি সত্যি তাই করেছিল। না করে উপায় ছিল না। ঈশ্বর মান্না পুরানো লোক, মল্লিকের দলের পাকা সিঁধেল। এ হেন কারিগরকেও একবার সিঁধের মুখে ধরে ফেলল, পা ধরে হিড়হিড় করে ভিতরে নিয়ে তুলছে। ডেপুটি তখন হেসোদার এক কোপে মুণ্ডু কেটে নিয়ে দৌড়। খাও কলা গৃহস্থ। উল্টে কাটা-ধড় নিয়ে পুলিশের হাঙ্গামা। দলের একজন গেল, দুঃখের ব্যাপার নিশ্চয়ই···কিন্তু মানুষটা চিনলে গোটা দল ধরেই টান পড়ত, অন্ন যেত বহুজনের। ঐরকম অবস্থায় পড়ে বিবেচক কারিগর নিজেই কত সময় বলে, গায়ের বলে পেরে উঠবিনে তোরা. মুণ্ডু নিয়ে সরে পড়্—

সাহেবের মুখ ছাইয়ের মত সাদা। ভাব দেখে পচা খুশিই বরঞ্চ। বলে, আমারও এ-সব গরপছন্দ। মল্লিকটা চোর নয়, ডাকাতও নয়—দোঁ আঁশলা একরকম। আমাদের কাজ হল—মাল বেমালুম সরে আসবে, মানুষের গায়ে কাঁটাখানাও বিঁধবে না। সে মানুষ দলের হোক আর মক্কেলেরই হোক।

সাহেবের দু-গালে মৃদুমৃদু চাপড় মারে ঃ গুম হয়ে রইলি কেন ? ধরে নে কিছুই হয়নি, মক্কেলরা ঘরের মধ্যে বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে। নির্গোলে তুই তো সিঁধে ঢুকে গেছিস—তারপর ?

সাহেব সসঙ্কোচে বলে, সেকালের কায়দা একটু-আধটু বলতে পারি—পুঁথি-পুরাণে যা আছে। বলাধিকারী মশায়ের কাছে শুনতাম। সিঁধে ঢুকে পড়ে শর্বিলক সকলের আগে ঘরের দরজা খুলে দেয়—নির্গমের পথ।

পচা ঘাড় দুলিয়ে বলে, এখনও তাই। তার আগেও কিন্তু কাজকর্ম আছে।

সাহেব বলল, আগ্নেয়-কীট ছাড়ল, দীপশিখার চারিপাশে ঘুরে ঘুরে পাখার ঝাপটায় পোকা আলো নিভিয়ে দেয়। তারপরে বীজ ছড়িয়ে দেয় ঘরের মেজেয়। চোরের ভয়ে আর রাজার ভয়ে ধনরত্ন লোকে মেজেয় পুঁতত—সেইখানকার বীজ ফটফট করে ফুটে যাবে।

হেসে উঠে সাহেব কথাটা ফলাও করে দেয় ঃ রাজা আর চোর দুটোরই ভয় তখন। রাজা মানে যদি জমিদার-চকদার দারোগা-চৌকিদার বলেন, বেশি ভয় এখনো তাদের নিয়েই।

পচা সায় দিয়ে বলে, আমরা যদি হই ট্যাংরা-পুঁটি তারা রাঘব-বোয়াল। সাবেক বীজ ছড়ানোর নিয়মটা আজও ঠিক চালু রয়েছে—আমরা ছড়াই মটরকলাই।

ঘরে ঢুকবার প্রণালীটা পচা সবিস্তারে বোঝাচ্ছে। পা থেকে উঠতে উঠতে আস্তে আস্তে গোটা দেহটা উঠে গেল। সোজা উঠে দাঁড়াতে নেই, উঠতে গিয়ে ঠকাস করে হয়তো মাথায় ঘা লাগল, কিম্বা মাথার ঘায়ে একটা কিছু পড়ে গেল আওয়াজ করে। গুটিসুটি হয়ে বসবি একটুখানি। মুঠোখানেক মটরকলাই ছড়িয়ে দিয়ে কান পাতবি। আওয়াজ সূক্ষ্ম বটে কিন্তু কারিগরের কানে ফাঁকি পড়ে না। কলাই মাটিতে পড়লে একরকম আওয়াজ, কাঠের বাক্সে একরকম। টিনের তোরঙ্গ খাট-বিছানা—প্রতিটি জিনিসের আলাদা আওয়াজ। ঘরের কোন্ দিকে কি রয়েছে, মোটামুটি আন্দাজে এসে গেল। কলাই আর এক রকমের আছে, সাদা রং-করা। ছড়িয়ে দে তাই একেবারে। অন্ধকার ইতিমধ্যেই চোখ সয়ে এসেছে, সাদা জিনিস দিব্যি দেখা যাচ্ছে। কতটা উঁচুতে কোন্ মাল তাও এবার বোঝা গেল। ঠান্ডা মাথায় নির্ভয়ে লেগে যা এই-বারে।

সাহেব অঘোর ঘুম ঘুমাচ্ছে। গভীর রাত্রে পচা বাইটা নিঃশব্দে তক্তাপোশ থেকে নেমে তার গায়ে হাত দিল: চল্—

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সাহেব বলল, কোথা?

পচা খিঁচিয়ে ওঠে: গুরু ধরেছিস তো তর্ক করবি নে। বলছি যেতে, তাই চল্—

দূর বেশি নয়, বেশি হাঁটবার তাগত হয়নি এখনো পচার। কোন দিন হবে কিনা কে জানে! গোটা দুই বাঁশবন পার হয়ে পরামাণিকদের বাড়ি। সেই বাড়ি ঢুকে পড়ল।

ফিসফিসিয়ে পচা বলে, টিপে টিপে হাঁটনা এবারে—বেড়ালের চলাচল। বেড়ালের পায়ে ঠিক যেন তুলোর গদি। কেমন করে ইঁদুর ধরে, দেখেছিস ঠাহর করে? গর্তের পাশে চুপটি করে আছে। গদির গুণে ইঁদুর টের পায় না। যেই বেরুল ঝাঁপিয়ে অমনি টুঁটি কামড়ে ধরে। চোরের পা-ও সেইমতো চতুর। হাঁটছিস, তার শব্দ নেই। পাঁই-পাঁই করে দৌড়াচ্ছিস উঁচু-নিচু মাঠ-জঙ্গল ভেঙে—তিল পরিমাণ শব্দ হবে না, হোঁচট খাবিনে। পায়ের তলায় তোরও যেন এক বিঘত পুরু গদি। দেহের সর্বঅঙ্গ শাসনে এনে ফেলতে হবে, হুকুমের গোলাম—যাকে যেমন বলবি সেইমত তামিল করে যাবে। এই যেদিন হবে—জানলি, বিদ্যা রপ্ত হয়েছে কিছু। বড় কঠিন বিদ্যা—সেই জন্যে বড়-বিদ্যা বলে।

শর্বিলকের গুণগরিমার কথা সাহেবের মনে পড়ে যায়। হাজার দুই বছর আগেকার কীর্তিমান সেই চোর! চলনে বিড়াল, ধাবনে মৃগ, ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে বাজপাখি। মানুষ সজাগ কি সুপ্ত শুঁকে শুঁকে ধরে ফেলে কুকুরের মতো। সরে পড়বার সময় সাপ। ম্যাজিকের মতন পলকের মধ্যে চেহারা ও পোষাক বদলে ফেলে। নানান ভাষায় কথা বলে—স্বয়ং বাগ্‌দেবী বুঝি চোরের

সজ্জায়। রাত্রিবেলায় দীপের মতো উজ্জ্বল। সংকটে ঘোড়ার মত অবিচল। ডাঙায় ঘোড়া, জলে নৌকা, স্থিরতায় পর্বত। যখন ঘিরে ফেলেছে, তখন সে গরুড়তুল্য। খরগোসের মতন চটুল চোখে চারিদিক সে দেখে নেয়। কেড়ে নেবার বেলায় নেকড়েবাঘ, বল-পরীক্ষার মুখে সিংহ। এত গুণ এক দেহে নিয়ে তবেই সে এত বড় চোর হয়েছে।

এগারো

আগে আগে পচা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। ফিসফিসিয়ে বলে, ফাঁকা জায়গা এড়িয়ে চলবি। ফাঁকায় যমরাজ হাঁ করে আছেন—ফাঁকা না ধোঁকা। সাপে গর্ত খোঁজে, আমরা অবশ্য অতদূর পেরে উঠিনে—গাছতলায় অন্ধকারে আড়াল-আবডাল খুঁজে নিই।

যাচ্ছেও ঠিক তাই। অপথ-কুপথ ভেঙে। ঘরকানাচে এসে থমকে দাঁড়াল: এইখানটা মনে কর সিঁধ কাটতে হবে। বেড়ার ওধারে খাট-তক্তপোশ বাক্স-পেঁটরা নেই, পরিষ্কার মেঝে। খোঁজদার দেখেশুনে এই জায়গা পছন্দ করে গিয়েছে। কি করবি এবারে সাহেব?

সাহেব থতমত খেয়ে বলে, কাটতে লেগে যাব—আবার কি!

এমনি ভাবে বসে? হায় হায়, কী বোঝালাম তবে এতক্ষণ ধরে! বাড়ির কেউ যদি বেরোয়, সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়বে একটা লোক ঐখানটায় বসে কি করছে। পথ-চলতি লোকও দেখতে পাবে।

হতভম্ব হয়ে সাহেব বলে, তবে কি করব?

ফাঁকটা মেরে দিবি সকলের আগে। পাতাসুদ্ধ বড় ডাল এনে পুঁতে দিলি, তার আড়ালে বসে বসে কাজ। লোকে কারিগর দেখতে পাবে না, দেখবে গাছ একটা।

কিন্তু বাড়ির লোক জানে, ফাঁকা জায়গা—গাছগাছালি নেই ওখানে।

আচমকা ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে, সেটা মনে রাখিস। তখন অত তালিম করে দেখার হুঁশ থাকে না।

কানাচ ঘুরে দুজনে উঠানে এসে পড়ল। রাত ঝিমঝিম করছে, নিষুপ্ত বাড়ি। দাওয়ার ধারে গিয়ে পচা বলে, উঠে পড়। বেড়ায় গিয়ে কান পাত। বিদ্যার পরীক্ষা হবে।

শীর্ণ হাতের একটা আঙুল তাক করে ব্যঙ্গের সুরে পচা বলে, ধড়াস-ধড়াস করছে যে বুকের ভিতরটা অ্যাঁ, বাড়ি চল তাহলে। কাজ নেই।

সাহেব রীতিমত অপমান বোধ করে: লাইনের নতুন মানুষ নাকি? [illegible]তার মতো জায়গায় [illegible] বেড়িয়েছি, ভিড়ের কামরার শুয়ে বসে [illegible] কাজ করেছি। [illegible] হয়ে গেছে গ্রামময় সোরগোল তুলে। জগবন্ধু বলাধিকারী হেন মানুষ কাজ দেখে তাজ্জব।

তিনি তো আপনার হদিস দিয়ে দিলেন ।

মুখে এই বলছে, মনে মনে কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেছে। এত বড় ওস্তাদের সামনে পরীক্ষা—ধুকপুকানি আসে বই কি? কিন্তু বুকের ভিতরের খবর এ-মানুষ টের পান কি করে? সে-ও কি কানের গুণে?

পচা বলে, ভয় নেই। মন্তোর বলে দিচ্ছি, নিদালি মন্তোর। জেগে থাকলে ঘুমে ঢলে পড়বে। কাঁচা ঘুম হলে ঘুম গাঢ় হবে। আমি দাঁড়িয়ে পাহারায় আছি। গুরু কাড়লি যখন, গুরুর উপর ভরসা রাখিস ।

পায়ের নখে একটু মাটি তুলে নিয়ে পচা বাইটা মন্ত্র পড়ছে। পুজোআচ্চার মতন অংবং নয়। তড়বড় করে পড়ে যাচ্ছে। বাংলা ঠিকই, কিন্তু একটা কথাও বুঝতে পারা যায় না। মন্ত্র পড়ে মাটি ছুঁড়ে দিল ঘরের দিকে। বলে, চলে যা, ঘুমিয়ে গেছে। ভয় করিস নে, ভয় থাকলে কি নিয়ে আসতাম সঙ্গে করে?

লজ্জা পেয়ে সাহেব দাওয়ায় উঠে বেড়ার গায়ে কান পেতে দাঁড়াল। পচা বাইটা সুড়ুৎ করে সরে আবার এক গাছতলায়। গিয়ে কেবল দাঁড়ানো নয়, গুঁড়ির গায়ে জোঁকের মতন লেপটে আছে। সেই গাছতলায় দৈবাত কেউ এসে পড়লেও মানুষ বলে ঠাহর পাবে না, গাছের গুঁড়ি ভাববে।

কাজ সেরে সাহেব সেখানে এল। বাড়ির সীমানা ছেড়ে ওস্তাদ-সাকরেদ দ্রুতপায়ে বেরিয়ে পড়ে। অগণ্য বাঁশঝাড়, জোনাকি ফুটছে নিভছে, নিবিড় অন্ধকার জায়গাটা। সেখানে এসে দাঁড়াল ।

আসল পরীক্ষা এইবারে : ঘরে ক'জন ?

সাহেব বলে, দু-জন।

ঠিক করে বলছ বটে ?

সাহেব দৃঢ়স্বরে বলে, হ্যাঁ, দু-রকমের নিশ্বাস ঘরের মধ্যে। এতক্ষণ ধরে, শুনে এলাম। দু-রকম ছাড়া তিন রকম নয়, এক রকমও নয়। তবে মানুষ নয় দু-জনাই, একটি ওর মধ্যে বিড়াল। বিড়াল ঘুমুলে ঘু-উ-উ—একটা শব্দ হয়। পাটোয়ার বাড়ি অনেকগুলো পোষ্য বিড়াল—শব্দটা ওখান থেকে চিনে নিয়েছি ।

ভারি প্রসন্ন পচা। পিঠে হাত বুলিয়ে বলে, সাবাস ব্যাটা! মানুষ এক জনই বটে। মানুষ ঘরে ঢুকে যখন দুয়োর দিল, বাঁশতলা থেকে আমি তাক করেছিলাম তোকে আজ পরখ করব বলে। কী মানুষ দেখে বলতে পারিস কি না ।

মেয়েমানুষ। সধবা ।

পচা প্রশ্ন করে, পুরুষ নয় কেন? সধবাই বা কেন বলছিস ?

পাশ ফিরলেই চুড়ির আওয়াজ। বিধবা বা পুরুষ হলে হাতে চুড়ি থাকত না।

ভাল, ভাল। ঠিক বলেছিস। উল্লাসে ডগমগ হয়ে পচা বলে, সেই লোকের

বয়সটা কী রকম বলতে পারিস ? ছোট মেয়ে, না ভরভরন্ত যুবতী, না থুত্থুড়ে বুড়ি ? পারবি নে বলতে। দু-দিনে চার-দিনে, দু-মাসে চার মাসে কেউ পারে না। যতখানি বলেছিস, তাই তো তাজ্জব হয়ে গেছি। খাটতে হবে বাবা, বড় কঠিন সাধনা। তুই ঠিক পারবি। অন্তিম বয়সে আজ আমার বড় আহ্লাদ —ছেলের মতো ছেলে একটা পেয়েছি এতদিনে।

এত প্রসন্ন যে পয়লা পাঠ সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গেল—শুভ এই নিশি রাত্রি থেকে। ঘরের মধ্যে ঢুকে পচা বাইটা নিজ হাতে দরজায় খিল দিয়ে তক্তাপোষের উপর জুত করে বসল। সাহেবকে দেখিয়ে দেয়ঃ বোস—

সকলের বড় শিক্ষা হল নিশ্বাস থেকে মানুষ চেনা। বেড়ার ঘর হলে বেড়ার উপর কান রেখে নিশ্বাস শোনে, পাকা দালান-কোঠা হলে দুয়োর-জানলার ফুটোয় কান পাতে। দুয়োর-জানলা নিশ্ছিদ্র করে এঁটেছে তো সিঁধ কাটা ছাড়া উপায় নেই। শুধুমাত্র নিশ্বাস পরখের জন্যে সিঁধ—কারিগর হেন ক্ষেত্রে পা নয়, মাথা কিছুদূর অবধি ঢুকিয়ে ঝিম হয়ে থাকবে। নিশ্বাস শুনবে ঘরের লোকের। কজন মানুষ নিশ্বাসের ফারাক থেকে গুণতি হয়ে যাবে। কার ঘুম কি রকম, গাঢ় কি পাতলা—বুড়োমানুষের ঘুম পাতলা, জোয়ানযুবা ও ছেলে-পুলের গাঢ় ঘুম। এত সমস্ত বিচার—সর্বশেষে ঘরে ঢোকা। পরের ঘরে অমনি উঠে পড়লেই হল না।

আরও আছে। ছেলেপুলে নিতান্ত কাঁচ-কাঁচা থাকলে বিপদ—ক্ষণে ক্ষণে কেঁদে উঠে অন্যের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। কাঁচা বয়সের চনমনে মেয়ে-বউর ঘুম অতি পাতলা। বয়সের দোষে ছটফট করে, উঠে বসে এক-একবার বিছানার উপর। নষ্টদুষ্ট হয় তো আরও গোলমাল। এমন মেয়েমানুষ যে ঘরে আছে—মুরুব্বিরা বলেন, হীরেমুক্তোর পাহাড় পড়ে থাকলেও সেখানে ঢুকবে না।

বহুদর্শী প্রাচীনদের কথা কারিগরে বর্ণে বর্ণে পালন করে। তবে বাঁধা সড়ক হল সাধারণ দশজনের জন্য—আসল গুণী যারা, তাদের কথা আলাদা। কোন নিয়ম বাঁধতে পারে না তাদের, অবস্থা বিশেষে নিজের পথ দেখে নেয়! নিষিদ্ধ পথেই বরঞ্চ সহজে কাজ হাসিল করে। যেমন এই সাহেব—শিক্ষা শেষ করে ওস্তাদের দেওয়া কাঠি প্রথম হাতে পেয়েছে। কাঁচা বয়সের বউ-মেয়ের গা ছুঁতে মানা—সাহেব কিন্তু অবাধে আশালতার পাশে শুয়ে গায়ের গয়না ধীরে-সুস্থে একটা একটা করে খুলে নিল। আশালতাই হাত বাড়িয়ে, কান বাড়িয়ে গলা বাড়িয়ে কাজের সুবিধা করে দিয়ে কৃতকৃতার্থ হয়ে যাচ্ছে। আর এক বাড়ির কথা বলি—

নাম-ধাম বলা যাবে না, মহামানী গৃহস্থ। কাঁচা-বাড়ি, তবে মাটির উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। বাড়ির স্ত্রীলোকেরা চন্দ্র-সূর্য অবশ্য দেখতে পান, কিন্তু নরলোকের কেউ না দেখে সেজন্য কড়াকড়ির অন্ত নেই। গিন্নি-ঠাকরুনের বয়স সত্তর উত্তীর্ণ হবার পর তবে কর্তা অনুমতি দিয়েছেন—এখন তিনি মাথায় দীর্ঘ

ঘোমটা টেনে দায়ে-বেদায়ে বাইরের লোকের সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে একটা-দুটো কথা বলেন। এমনি বাড়ি। বাড়ির জামাই শ্বশুরবাড়ি এসেছে আজ ক'দিন। মেয়ে অতএব সাজসজ্জা করে গয়নাগাঁটি যেখানে যা আছে অঙ্গে চাপিয়ে বরের কাছে শোয়। খোঁজদার দেখেশুনে গিয়ে আদ্যোপান্ত বলছে। ঐ গয়নার বোঝা থেকে মেয়েটাকে যতদূর সম্ভব মুক্তি দিতে হবে।

এক প্রহর রাত না হতেই নিশিকুটুম্বরা ঘরের কানাচে আস্তানা নিয়েছে। খেয়েদেয়ে জামাই ঘরে এসেছে, শুয়ে উসখুস করছে। বউ আসেই না। অনেক পরে বাড়িসুদ্ধ খাওয়াদাওয়া চুকে গেলে তখন বউ মৃদু পায়ে আসছে। কাচনির বেড়া বলে সুবিধা—বেড়ায় চোখ-কান দুটো ইন্দ্রিয়ই পেতেছে সাহেব। ভারি লজ্জাবতী মেয়ে তো—বরের কাছেও মুখ খুলতে পারে না লজ্জায় ভেঙে পড়েছে। খোঁজদার উল্টো রকম বলেছিল কিন্তু। আলো নিভিয়ে দিল। খানিকক্ষণ পরে ঘুমুচ্ছেন দুজনে বিভোর হয়ে। যেখানটা সিঁধ হবে, জায়গা নিরিখ করা আছে। কাঠি হাতে নিয়ে ডেপুটি তৈরি—ইসারা পেলেই খোঁচ দেয়। সে ইসারা আসে না কিছুতে। ভোগান্তি কতক্ষণ ধরে আছে না জানি। ডেপুটি নিজেও একবার সাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে শুনে এল—স্বামী-স্ত্রী যেন পাল্লা দিয়ে ভোঁস-ভোঁস করছে, ঘরে তৃতীয় কেউ নেই। তবু কিন্তু বেড়া ছেড়ে সাহেব নড়ে না, সেই এক জায়গায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে। হুকুমহাকাম দেয় না কিছু।

অবশেষে একসময় সাহেব এসে ডেপুটির হাত ধরে টানে: সিঁধ হবে না, কাঠি বরঞ্চ পাহারাদারের জিম্মায় দিয়ে চলে এসো। কাজই হবে না এ-বাড়ি, আয়োজন বিফল—ডেপুটি ভাবছে এই সব। কিন্তু সাহেবর মুখে রহস্যময় হাসি, কাজে বেকুব হলে এমনধারা হয় না। ডেপুটিকে পাশে নিয়ে চুপচাপ বসে রয়েছে—যেন দুটো মাটির ঢিবি অথবা দুখানা গাছের গুঁড়ি। অনেকক্ষণ কাটল। খুট করে মৃদু একটু আওয়াজ হয়ে ঘরের দরজা খুলে যায়। দরজা ভেজিয়ে রেখে নিশিরাত্রের অন্ধকারে বাড়ির মেয়ে যেন বাতাস হয়ে মিলিয়ে গেল। খোঁজদার ঠিক খবরই দিয়েছে বটে—নষ্ট মেয়ে নাগরের কাছে গেল। এ সময়টা ভয়-ডর থাকেনা। কিন্তু অন্য কেউ না জানুক, স্বর্গের অন্তর্যামী আর মর্ত্যের চোর—এ দুয়ের চোখে পড়বেই। লুকিয়ে ছিল সাহেব এরই জন্যে —টুক করে ঘরের ভিতর গিয়ে বালিশের তলা থেকে মাল নিয়ে যথাপূর্ব দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে এলো।

এক কণিকা ধুলোমাটি গায়ে লাগল না। কানের গুণে টের পেয়েছে, জামাই আর মেয়ের মধ্যে একটা ঘুম মেকি। ঘুমের ভান করে আছে মেয়ে, বরের ঘুম এঁটে এলে বেরিয়ে পড়বে। এত গয়না বাইরে আনতে সাহস হয়নি —কে আর জানবে, বালিশের নিচে খুলে রেখেচে। বেড়ার গায়ে সাহেবের তীক্ষ্ণ কান অন্ধকারে গয়না খুলে রাখার ব্যাপারও ঠিক ঠিক বলে দিয়েছে।

আনাড়ি কারিগর হলে হেন ক্ষেত্রে সর্বনাশ ঘটিয়ে বসে। ঘরের মানুষ ঘুমন্ত ভেবে যে-ই না সিঁধ কেটে ঢুকে পড়েছে, পরিত্রাহি চেঁচিয়ে মেয়েটা পাড়া মাথায় করত। মুরুব্বিদের এই জন্যেই বারণ ঃ কচি-শিশু, রোগি, বুড়োমানুষ, লুচ্চাপুরুষ আর নষ্ট মেয়ের ঘর সতত এড়িয়ে চলবে।

অনেক পরের বৃত্তান্ত এ সমস্ত। সাহেবকে পচা নিশ্বাস পাঠের কথা বলছে। নির্ভুল যে পড়তে পারে, সেই কারিগরের ভাবনার কিছু নেই। পা আগে যাবে না মাথা, তার জন্যে সে বিতর্ক নয়। সিঁধের গর্ত থেকে সোজা মাথা তুলে বীরের মতো সে ঘরে উদয় হবে।

সাহেব মাঝখানে বলে উঠল, নিদালি মন্তরটা ভাল করে শুনি একবার।

বলাধিকারীর কাছে প্রাচীন সংস্কৃত মন্ত্র শুনেছে। চোর চক্রবর্তী পুঁথির পদ্যও জানে। ভাঁটি অঞ্চলের নিজস্ব নিদালিটা পরামাণিক-বাড়ি পচা তড়বড় করে পড়ে এলো; সেটা ভাল করে একবার শুনে নেবে সাহেব। শুনে মুখস্থ করবে, দরকার হলে লিখে নেবে কাগজে। বলে, ধীরে ধীরে বলে যান বাইটা-মশায়, কথাগুলো শুনি।

নিদ্রাউলি নিদ্রাউলি
নাকের শোয়াসে তুললাম মণ্ডপের ধূলি।
ঘরে ঘুমের কুকুর-বিড়ালি
জলে ঘুমায় রউ,
নিদালি-মন্তোরের গুণে
ঘুমাইয়া থাক গিরস্তর বেটা-বউ।

অতি-সাধারণ ছড়া একটা। পচা বলে, নাকের নিশ্বাস টেনে মণ্ডপের (মন্ডপের) ধুলো তিনবার তোলবার কথা। আমি যা পায়ের নখে তুলেছিলাম। সেকালে মুরুব্বিরা নাকেই তুলতেন—অকর্মা অপদার্থ আমরা, সে বুকের জোর কোথা পাব? শ্বাসের টানে ধুলো ওঠে না, মন্তোরও খাটে না আর তেমন।

সাহেব বলে, রউ হল তো রুইমাছ?

পচা বাইটা ঘাড় নেড়ে সায় দিল। বলে মানে নিয়ে কিন্তু কথা নয়। কথা-গুলোর মধ্যে তেমন কিছু নেই, হাঁকডাক করে রাস্তার মানুষকে শোনাতে পারি। পড়াটাই আসল, পড়ার একটু হেরফের হলে মন্তোরে কাজ হবে না। বড় শক্ত কাজ। তেমন গুণীলোক এখন কম। সেই জন্যে বলি, মন্তোরে ভরসা না রেখে ক্রিয়াকর্মের উপর জোরটা বেশি দিবি তুই।

মাসখানেক ধরে দিবানিশি ক্রিয়াকর্মের ব্যাপারই চলল। সাহেব কোথায় থাকে কি করে, দৈনন্দিন খাওয়াদাওয়ার দায়টা বা কি ভাবে নিষ্পন্ন হয়, এ সব খবর অন্য কেউ জানে না। একলা পচা বাইটাই জানে বোধহয়। পচার ঘরে

সে শোয়। অনেক রাত্রে আসে, তারপর দরজা বন্ধ করে ফুসফুস গুজগুজ চলে দু-জনে। কৌতূহলী সুভদ্রা লুকিয়ে চুরিয়ে শোনবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কানদুটো পাকাপোক্ত নয়, বাইরে থেকে কিছু বুঝতে পারে না।

একদিন রাত্রে বড় জ্যোৎস্না। পাখিগুলো অবধি দিনমান ভেবে বাসার মধ্যে ডেকে উঠছে। কামিনী গাছ থোপা থোপা সাদা ফুলে ভেঙে পড়েছে—ডাল পাতা প্রায় অদৃশ্য। ফুলের গন্ধে সারা বাড়ি আমোদ করেছে। সাহেব আসছে—সুভদ্রা-বউ তক্কে তক্কে ছিল—চিলের মতো ঝাপটা মেরে তার হাত এঁটে ধরে। চোরের হাতে হাতকড়ি পড়লে যেমন হয়—টেনে নিয়ে চলল হিড়হিড় করে। সর্বনেশে ব্যাপার। পরিষ্কার দিনমানের মতন চারিদিক ফুটফুট করছে—নামেই শুধু রাত্রি। সাহস বেড়ে বেড়ে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে সুভদ্রা! আর সাহেবের এমন অবস্থা—টানাটানি করে হাত ছাড়িয়ে নেবে, সে ভরসা হয় না! শব্দ পেয়ে বাড়ির কেউ হয়তো জেগে উঠবে। দেখতে পেলে এ বাড়ি থেকে চিরকালের মতো বিদায়! মুরারি বর্ধন চাচ্ছেও তাই। হৈ-হল্লা করে সাহেবের সঙ্গে ছোটবউ সুভদ্রারও ঘাড় ধাক্কা দেওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে পূজনীয় ভাসুরঠাকুর।

সাহেবের এত সব চিন্তা, বউটার তিলপরিমাণ ভরডর থাকে যদি! হেসে হেসে সর্ব অঙ্গে দোলন দিয়ে বলে, চোর ধরেছি গো। নিত্যি নিত্যি আসা-যাওয়া, আজকে তোমার রক্ষে নেই ঠাকুরপো।

হাত ছাড়ুন বউঠান, কেউ দেখে ফেলবে।

বেপরোয়া সুভদ্রা সকৌতুকে মুখ নাচিয়ে বলে, দেখলে আমার কি! অবলা মেয়েমানুষের সাত খুন মাপ। বলে দেব, তুমিই হাত ধরে টানছ। পুরুষেই তো করে। আমাদের এই উল্টো রীত, মেয়ে হয়ে টানতে হল পুরুষকে—সে কেউ বিশ্বাস করবে না। ফাঁকা উঠোনের উপর তুমিই তো দেখার সুবিধা করে দিচ্ছ। অন্য কেউ না হোক বাসি বাইটা দেখছে ঠিক চেয়ে চেয়ে।

ফিক করে হেসে বলে, দেখলে কী-ই বা! চোরাই কাণ্ডবাণ্ড—চোরের বাড়ি সেটা বেমানান কিসে? চোরে চোরে লেগে গেছে—চোর বউয়ে আর চোর শ্বশুরে! বাসি বাইটা বরাবর পরের মাল চুরি করে নিজের ঘরে তুলেছে এবারে তার মালটা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছি।

সাহেব শিউরে উঠে বলে, নিয়ে যাচ্ছেন নাকি আমায়?

সেই তো ভাল। ঢুকিয়ে নিয়ে একবার দরজা দিতে পারলে কারও আর নজর যাবে না। ও কি, ভয়ে যে মুখ শুখাল তোমার! বাঘের গুহা নয়—আমার ঐ কোঠাঘর, যেখানে আমি থাকি।

শিকার কামড়ে ধরে বাঘ কুমিরে যেমন হিড়হিড় করে নিয়ে যায়, সুভদ্রা তেমনি চলল। মেয়েমানুষের কোমল হাতে সাঁড়াশির আঁটুনি—কুমিরের কামড়ের মতোই সে মুষ্টি খুলে পালাবার উপায় নেই। নিয়ে চলল বাড়ির ভিতর। জল্লাদ

আসামিকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যায়, সাহেবের সেই অবস্থা। শীতের রাত্রে দস্তুর মতো ঘাম দেখা দিয়েছে।

মুখের দিক চেয়ে বুঝি সুভদ্রার করুণা হল। হাসতে হাসতে বলে, বেশ, না-ই হল ঘরে। ঘরের সামনে বারাণ্ডায় গিয়ে বসিগে। ভয় নেই গো, লেপ ফেলে বাইরে এসে আমাদের লীলাখেলা দেখবে, এত দায় কারো পড়ে নি।

বলতে বলতে থেমে যায়। কণ্ঠ বুঝি কাঁপল একটুখানি, সাহেবের তাই মনে হল। বলে, দায়টা যার হত, সে মানুষ কোন মুলুকে পড়ে রয়েছে। সারা-রাত আমি যদি ধেই ধেই করে নেচে বেড়াই, এ বাড়ির কেউ চোখ তুলে দেখতে আসবে না।

কোঠাঘরের সামনে টিনের চাল-দেওয়া বারাণ্ডা, সেইখানে নিয়ে বসাল। ঘরে ঢোকানোর প্রস্তাব, মনে হচ্ছে, নিতান্তই ভয় দেখানো। বারাণ্ডার উপর মাদুর পাতা, কাঁথার ডালা পাশে। ঘুম নেই তো বউটার চোখে হতে পারে, নিরালা বারাণ্ডায় দিনের মতন এই চাঁদের আলোয় বসে বসে কাঁথা সেলাই করছিল। খেয়ালের বসে কাঁথা ফেলে উঠে পচা বাইটার ঘরের অন্তরালে ওত পেতে দাঁড়াল।

সেই কাঁথার ডালা হাতড়ে ছবি বের করে একটা। কাপড়ের উপর চিকন কাজ। বলে তমি ভয় পেয়ে গেলে ঠাকুরপো, রাত দুপুরে মেয়েমানুষের কোন্ মতলব না জানি। সাধু স্বামীর সতী নারী আমি—তোমারই পাপ মন বলে খারাপ জিনিস ভাবলে। এই ছবিটা আজকে শেষ করেছি। কাকে দেখাই বলো? এ বাড়ির মেয়েলোকে বোঝে রাঁধাবাড়া আর ছেলেপিলের নাওয়ানো-খাওয়ানো, পুরুষে বোঝে টাকাকড়ি বিষয়আশয়। তোমায় সেইজন্য ধরে নিয়ে এলাম।

সাহেব পুরো বিশ্বাস করে নি। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলে, আমিই যে সমঝদার লোক, জানলেন কিসে?

জানিনে তো—জানব কেমন করে? এসব করো না তাই—ভালো জিনিস একটা শেষ হলে কাউকে না দেখিয়ে সোয়াস্তি হয় না। মন আনচান করে—

কাপড়ের সেই ছবি সুভদ্রা মেলে ধরল সাহেবের চোখের উপর। বলে, খেটেছি কত দেখ। সুতোর রং মিলিয়ে মিলিয়ে সরু সুতোর ফোঁড়—চোখ দুটো আমার অন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। এ বাড়ি যারা আছে, এ জিনিসে হাত ছোঁয়াবে ভাবতে গেলেই গা-ঘিনঘিন করে। ভালমন্দ তোমার কিছুই জানি নে, চেহারায় দেখতে পাই সোনার পদ্ম। তাই কেমন ইচ্ছে হল। বোঝ না বোঝ, অমন হাতে ছবি আমার নোংরা হয়ে যাবে না।

শিল্পী-মানুষ বটে সুভদ্রা-বউ। কালীঘাটের দরিদ্র মাতাল পটুয়ারা পট এঁকে এক পয়সা দু-পয়সায় বিক্রি করে। সাহেব দেখেছে সে বস্তু। হাল আমলে ফ্যাসন হয়েছে—বাবুলোকে মোড়ের মাথায় গাড়ি রেখে গলিতে ঢোকেন, এক

পয়সার পট দরাজ হাতে এক আনা মূল্যে কিনে নিয়ে যান। সুভদ্রাও দেখি জাত পটুয়া একটি। ফুলবাবু তাকিয়া ঠেশ দিয়ে গড়াগড়া টানছে, বাবরি চুলে টেড়ি, কোঁচা লুটিয়ে পড়েছে ফরাসের উপর, একটা টিয়াপাখি খাঁচায় করে বাবুর কাছে বেচতে নিয়ে এসেছে। কাপড়ের উপর সুতোর বুনানিতে তুলেছে এই সব।

কেমন হয়েছে ?

কী সুন্দর, মরি মরি! আপনার ক্ষমতা দেখে অবাক লাগে বউঠান।

খোশামুদির কথা নয়, শতকণ্ঠে তারিপ করবার মতো। কাছে এনে, কখনো বা দূরে সরিয়ে, অনেকভাবে দেখে সাহেব। দূরে নিলে কে বলবে সুতোয় বুনে বুনে তোলা। কাগজের উপরে এঁকেছে মনে হয়।

আনন্দে ডগমগ সুভদ্রা। বলে, তুলি ধরে কাগজেও এঁকেছি ঠাকুরপো। ঘরে কোন ঝামেলা নেই—না ছেলেমেয়ে, না কেউ। আমার মতো ভাগ্যবতী কে! দিনরাতের সময় কাটতে চায় না—কি করব, ছবি আঁকি বসে বসে। গাদা গাদা এঁকেছি।

সাহেব বলে, ছোড়দা জানেন ?

মাণ্টার মানুষ, ছেলে ঠেঙিয়ে খায়। যেটুকু ফাঁক, ভগবানের নাম নিয়ে পরকালের কাজ করে। তার কি গরজ এ সবে ? লজ্জার মাথা খেয়ে তা-ও একবার গিয়েছিলাম দেখাতে। একেবারে কাঁচা বয়স তখন—বড় আনন্দ করে দেখাচ্ছিলাম। তা বলল কি জানো ঠাকুরপো—ছাই-ভস্ম জিনিস কি জন্যে আঁকতে যাও, আঁকবে তো ঠাকুর-দেবতাদের আঁকো। আঁকবার সময়টা অন্তত তাঁদের চিন্তা মনে আসবে। বলি, সেটা কি ধর্মকর্মের বয়স, ঠাকুরদেবতা আসবে কেন তখন ?

বলতে বলতে সুভদ্রা থেমে পড়ে। কথায় যেন হঠাৎ আগুন ধরে গেল। বলে, তারপরে আর দেখাইনে। পাবোই বা কোথা, ফুলহাটায় তেড়ে ধরে দেখাতে যাব নাকি ? ঠাকুরদেবতা এখনো আসে না। কি করেছেন তাঁরা আমার, কেন আঁকতে যাব ?

দ্রুতপায়ে ঘরে ঢুকে গেল—কান্না সামলাতে না কি করতে ? সাহেব অবাক। মুহূর্ত পরে বেরিয়ে এলো নিজের আঁকা একগাদা ছবি নিয়ে। পালকি চড়ে সমারোহ করে বিয়ের বর আসছে। গৃহস্থবাড়ির উঠানে বাচ্চা ছেলেপুলের কুমির-কুমির খেলা। হরি-সংকীর্তনের আসর। বাসরঘরের বর-কনে—মেয়েরা বাসর জাগছে। যা সমস্ত চোখে দেখেছে, ছবিতে ধরে রাখতে চেয়েছে। আজ পাড়াগাঁয়ের সাধারণ এক বউয়ের মধ্যে এমন গুণ লুকানো আছে, কে ভাবতে পারে ?

ছবি দেখতে দেখতে মনের মেঘ কেটে গেছে। মুখ টিপে হেসে সুভদ্রা বলে, তোমার ছোড়দার হাতে উল্কি আছে—

সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বলে, বাঁ-হাতে আছে। আপনি এঁকে দিয়েছেন বুঝি? দিব্যি ছবিটা—

বড্ড ধারালো চোখ তোমার ঠাকুরপো। অন্যের চোখে পড়বে খানিকটা ধ্যাবড়া কালির পোঁছ। মানুষটার গায়ের রঙে আর ছবির রঙে মিলে-মিশে একাকার হয়ে আছে।

সাহেব বলে, ঠাকুর-দেবতায় মন নেই বলছেন, কিন্তু সেই উল্কির ছবি কেষ্ট ঠাকুরের। মুখে মুরলী, ত্রিভঙ্গ হয়ে কদমতলায় দাঁড়িয়ে আছেন।

মানুষটা সাধ করে আমায় বলল, খুশি হবে বলে করে দিলাম। বিয়ের অল্প দিন পরে—সে একদিন গিয়েছে—বিয়ে তো করোনি ঠাকুরপো! ও-মানুষকেও সেই সময়টা যেন পাগলামিতে পেয়েছিল। বলল, যে ঠাকুর তোমার পছন্দ তাই এঁকে দাও। তোমার ছোড়দা কেষ্টঠাকুরই তখন, আমি রাধিকা। মুরলীর ডাক লাগে না, হাঁচি-কাশির একটু আওয়াজ পেলেই যেখানে থাকি কাজকর্ম ফেলে ছুটে গিয়ে পড়ি। আমার কেষ্টঠাকুরের হাতে কেষ্টমূর্তিই ভালো, সুচ ফুটিয়ে ফুটিয়ে ছবি করে দিলাম। এত আস্তে ফোটাচ্ছি, তাই যেন আমার নিজেরই গায়ে বিঁধছে। নতুন বয়সের বর-বউ কিনা তখন—সে এক কাণ্ড!

থেমে একটু দম নিয়ে সুভদ্রা আবার বলে, তোমার ছোড়দা-ও পাল্টা শোধ দিয়ে দিল আমার উপর। ছবি নয়, ছবি-টবি আসে না ও-হাতে—বুকের মাঝ-খানটায়, পরিষ্কার অক্ষরে লিখে দিল, রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, হরগৌরী। ঠাকুর-ঠাকরুন জোড়ায়-জোড়ায়। আজও আছে। তুমি আমায় খারাপ বলে সন্দেহ করলে, একবার ঝোঁক হয়েছিল বুক খুলে দেখিয়ে দিই। সাহস হল না ভাই। চোখ তোমার বড্ড ধারালো, বুকের নিচেটাও দেখে ফেল যদি। সেখানটা খালি, ধু-ধু করছে তেপান্তরের মতো—

কথা ঘুরিয়ে প্রলুব্ধ কণ্ঠে সহসা বলে ওঠে, তোমার হাতে দিই না উল্কি করে। এমন ধবধবে হাতের উপর ছবি কাকে বলে দেখিয়ে দেবো। কাপড়ের ছবিটা তোমার পছন্দ, এটাই পুরোপুরি তুলে দিই। ধরে ধরে মনের মতন করে আঁকব—তাই করি ঠাকুরপো, অ্যাঁ?

সবুর মানে না। এক ছুটে রঙ নিয়ে এসে তখনই বসে যায় আর কি! সাহেবের হাত ধরে নিরিখ করে দেখছে।

হাত সরিয়ে নিয়ে সাহেব বলে, আমার নয় বউঠান। ছোড়দার বাঁ-হাতে এঁকেছেন, ডান-হাতেও আর একটা এঁকে দিন। কথা দিচ্ছি, আমি এনে হাজির করে দেবো। কেষ্টঠাকুর করেছেন, এবারে মহেশ্বর। সত্যিই ভোলা মহেশ্বর মানুষটি।

উঁহু, হনুমানজী। রাম-ভক্তিতে হনুমানকে ছাড়িয়ে যায়। ধরা পাই তো লেজওয়ালা হনুমান আঁকব এবারে।

হাসতে গিয়ে সুভদ্রা জ্বলে ওঠে। বলে, তিন তিন জোড়া দেবদেবী লিখে

বুক আমার নামাবলী করেছে। পেলে তাকে লেখাগুলো নষ্ট করে দিতে বলি। রঙ ঢেলে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ধ্যাবড়া করে দিক। আয়না ধরে আমিও কত চেষ্টা করেছি—নিজে নিজে হয় না। মানুষটাকে যারা পর করে দিয়েছে, তাদের নাম রাত্রি-দিন বুকে রাখতে বুক আমার জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। কী যে যন্ত্রণা ঠাকুর-পো—

ফস করে বলে বসে, তুমি করে দেবে তো বলো—

সাহেবের মুখ শুকাল, বুকের মধ্যে ঢিবঢিব করছে। বদ্ধ উন্মাদ—কাণ্ডজ্ঞান নেই, লোকলজ্জা নেই। পাগলা-গারদের বাইরে কেন রাখে এদের? রাগ হয় মুকুন্দর উপর। ভেড়াকান্ত মাস্টারমশায় পরিবার ধর্মের-ষাঁড়ের মতো ছেড়ে সরে পড়েছে—সঙ্গে রাখতে না পারে তো পিটুনি দিয়ে সায়েস্তা করে রেখে যাক।

তাকিয়ে দেখে, সুভদ্রা নিঃশব্দে দু-চোখে হাসছে। বলে, ঠাট্টা করলাম একটা। সাধু স্বামীর সতীসাধ্বী বউ—বুক দেখাতে গেলাম আর কি! কিন্তু রঙ নিয়ে যে বসে রইলাম, হাত সরালে কিসের ভয়ে? দারোগা-পুলিশ ভয় করো না, তাদের চেয়ে আমি বেশি ভয়ের লোক?

সাহেব আমতা-আমতা করে বলে, ভয় কেন হবে? উল্কি পরা আমি ভালবাসিনে।

ভয় নয়, তবে ঘেন্না। তোমার মতন ফর্সা মানুষ নই। কাছে বসে সূঁচ ধরে কাজ করব, ছোঁয়াছুঁয়িতে ধবধবে রঙ ময়লা হয়ে যাবে, সেই ঘেন্না তোমার? জানি, জানি। চোর কিনা তুমি—গায়ের উপর চিহ্ন রাখতে চাও না। এক চিহ্ন—জেল থেকে লোহা পুড়িয়ে চোর দেগে দেবে। তার পাশে আমার হাতের ছবি মানাবে কেন?

সাহেব এতটুকু হয়ে গিয়ে বলে, মিছামিছি আপনি ঝগড়া করছেন বউঠান—

ঝগড়া কে বলেছে, হাসি-মস্করা একটুকু। জানো ঠাকুরপো, দৃষ্টিতে আমার অভিশাপ আছে। যার কাছে আবদার করে একটা কিছু বলতে যাই, সে মানুষ সঙ্গে সঙ্গে পাষাণ। পাষাণের মতো অসাড় আর কঠিন। যেমন এই তুমি হয়ে গেলে। এটা কিছু নতুন নয় আমার জীবনে।

এই ক'দিনে সাহেবকে কী চোখে দেখেছে, নিশিরাত্রে সুভদ্রা-বউ তার সামনে ভেঙে পড়ে। বলে, পাষাণের কাছে লজ্জা নেই—খুলে বলি আজকে তোমায়। বিয়ে যখন হল, কিছুই বুঝিনে—পুতুল-খেলার বয়স তখন আমার। খেলার মন নিয়ে হাতে উল্কি এঁকে দিলাম, ও-মানুষ আমার বুকে লিখল। তারপরে একদিন দেখি বিশ্বসংসার রঙে রঙে ভরে গেছে। হায় আমার কপাল —মানুষটি তার মধ্যে কবে যে পাষাণ হয়ে গেছে টের পাইনি। লজ্জা-অপমান না মেনে পাগল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি তার উপর—দেখি, ঠোঁট নড়ছে বিড়বিড় করে। জোর করি তো ঠোঁট নড়া বেড়ে যায় আরও। কি মন্তোর পড়ছ গো? বলে, মন চঞ্চল হয়ে আসে কিনা—রাম-নামে মোহ কাটাই। রাতের বেলা ভয়ের

জায়গায় রাম-রাম করে আমরা পথ চলি, ঠিক তাই। আমি তার কাছে পেত্নি-শাকচুন্নি। কিন্তু এ পেত্নি যে রাম-নামে ডরায় না। উপদ্রব অসহ্য হয়ে উঠলে শেষটা একদিন ঘর-বাড়ি ছেড়ে পিঠটান।

সাহেব অবাক হয়ে বলে, বংশীর কাছে যে শুনলাম—

কথাটা সুভদ্রাই শেষ করে দিল: শুনেছ, ধর্মের কলকাঠি আমি নেড়েছি। আমার বুদ্ধিতে বাড়ি ছেড়েছে। দু-জনে একদিন বাসা করে ধর্মভাবে সংসার করব, সেই আমার মতলব।

সাহেব সায় দিয়ে বলে, সকলে তাই জানে। বাইটামশায় অবধি সেই কথা বলেন।

আমি হতে দিয়েছি তাই। পাপের নামে নাক সিঁটকে সকলকে অকথা-কুকথা বলে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ঘুরে বেড়াই। জীবনে কিছুই তো পেলাম না, ঐ একটু মিথ্যে রটনা আমার পাওনা: তাঁহাবাজ বউ আমি, বরকে নাকে-দড়ি দিয়ে ঘোরাই। দেমাক নিয়ে মাথা খাড়া করে আছি, নইলে তো কোনকালে মরে যেতাম—

হাসি-মস্করার কথা, অতএব হাসতে লাগল সুভদ্রা খিলখিল করে। কিন্তু সাহেব যে আর পারে না, ছুটে পালাবে। বুঝি জল এসে যায় চোখে। তার সেই চিরকালের রোগ।

বারো

আচ্ছা বিপদ হল দেখি। পচা বাইটার কাছে সাহেবের না এসে উপায় নেই, কিন্তু সুভদ্রা-বউ কোন্‌খানে ওত পেতে আছে কে জানে! ছোঁ মেরে হাত ধরবে এঁটে, হিড়হিড় করে টানবে। সে রাত্রে বারাণ্ডা অবধি গিয়ে ছাড় হয়েছিল, টানাটানি করে ঘরেই পুরে ফেলবে হয়তো এবার।

বর্ধন-বাড়ির বাদুরে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। হঠাৎ দেখে তিনটা মানুষ! কাছাকাছি এলে চিনল, মুরারি বর্ধন এবং আগে-পিছে কাছারির দুই পাইক—মহাদেব সিং আর ভীম সর্দার। চোত কিস্তি চলছে, সাল-তামামি সামনে। খাজনাকড়ি কষে আদায়ের সময় এই। সোনাখালি তালুকের মালিক চৌধুরী কর্তা চলে আসছেন দিন কয়েকের মধ্যে, কাছারি-বাড়ি চেপে বসে নিজে তিনি আদায়পত্রের তদারক করবেন। বরাবরই আসেন এই সময়টা। বকেয়া বাকি বেশি দেখলে বকাবকি করেন: পান খেয়ে নিজেরা পেট মোটা করে বসে আছ—আদায় হবে কি! পান অর্থে ঘুষ। বুড়ো চৌধুরী আবার গুণগ্রাহীও বটে—আদায় ভাল হলে দরাজ বখশিস। মুরারি নায়েব দু-তিন বছর পেয়েছে, এবারও প্রত্যাশা রাখে। দোর্দণ্ডপ্রতাপে কাজকর্ম চলেছে, কাজের চাপে বাড়ি ফিরতে বেশি রাত্রি হয়। নায়েব গোমস্তাকে লোকে তো ভাল চোখে দেখে না—রাত্রিবেলার চলাচলে তাই বেশি সতর্ক হতে হয়। মহাদেবের হাতে পাঁচ-হাতি

লাঠি, ভীমের কাঁধে গাদা-বন্দুক।

ভীম সর্দারের আগে নজরে পড়েছে। হাঁক দিয়ে ওঠে ঃ কে ওখানে ?

সাহেব বলে, আমি। নায়েব মশায় আমায় খুব চেনেন।

এই ছোঁড়ারই পক্ষ নিয়ে ভাদ্রবউ অপমান করেছিল। মুরারি জ্বলে উঠল সাহেবকে দেখে। ধমক দিয়ে বলে, যা যা—চিনিনে তোকে! ভারি আমার গুরুঠাকুর কিনা, তাই চিনে রাখতে হবে। গাঁয়ের উপর কি মতলবে এখনো তুই ঘোরাফেরা করিস ? আমি জানি চলে গেছিস বিদায় হয়ে।

সাহেব বলে, গৃহস্থ-বাড়ি কাজ করছি, মরশুম সারা করে তবে তো যাব। রাগ করেন কেন, বাইরে বাইরে তো থাচ্ছি এখন, শুই গিয়ে বাইটামশায়ের কাছে।

কেষ্টোর মাথায় টোকা। মুহূর্তে মুরারি একেবারে গুটিয়ে যায়। দু-দুজন নিম্ন কর্মচারী, কাছারির পাইক—তাদের সামনে কথা বাড়াবে না। খাচ্ছে একটা মানুষ, তার ভাতের থালার সামনে গিয়ে ঝগড়াঝাটি করেছিল—ধান-চালের এই আবাদ অঞ্চলে সেটা অতিশয় নিন্দার ব্যাপার। অন্তরালে এরাই গিয়ে হাসাহাসি করবে ঃ নায়েব কী কঞ্জুষ রে—অতিথকে দুটো খেতে দিয়েছে বলে ভাদ্রবউয়ের সঙ্গে ধুন্দুমার।

সাহেবই বলতে বলতে চলেছে, শুয়ে থাকি আপনার বাবার কাছে। তাঁরই কথায় বড়বাবু। বুড়োমানুষের কখন কি ঘটে বলা যায় না। রাত্তিরবেলা উঠতে গিয়ে হয়তো বা আছাড় খেয়ে পড়লেন। আমায় তাই বললেন, দিনমানে কাজকর্ম, রাত্রে তো কিছু নয়। পাটোয়ার বাড়ি থেকে রাত্রে এসে আমার কাছে শুবি। খাওয়া-দাওয়া সেরেই বেরোই, শুধুমাত্র শুয়ে থাকা ওখানে।

শুনতেই পায় না আর মুরারি, দুকানে বুঝি ছিপি-আঁটা। বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে পাইক দুটো ফিরে গেল। হনহন করে মুরারি ভিতরে চলল, ফিরেও তাকায় না। পচার কামরায় সাহেব ঢুকে পড়ে! আর কিসের ভয়, আর কি করতে পার বউঠান ?

কৌশলটা চালু হল এবার থেকে—মুরারির পিছন ধরে আসা! কাছারির আশে পাশে সাহেব অপেক্ষা করে। মুরারি বেরিয়ে পড়লে পিছু নেয়। দূরে দূরে থাকে, বাড়ি ঢুকবার মুখে দ্রুত এসে একত্র হয়।

গুরু-শিষ্যে চুপিসারে কথাবার্তা। পচা নিজের কথা বলছে।

একবার হল কি—গৃহস্থ টের পেয়ে তাড়া করেছে। তিন স্যাঙাত আমরা। গহিন গাঙ পড়েছে সামনে, বিষম তুফান। কুমির-কামট গাঙে গিজগিজ করছে, সে জলে পা ঠেকালে রক্ষে নেই। খেয়া নৌকো শিকল করে, শক্ত তালা এঁটে মাঝিমাল্লা ঘুমুচ্ছে নৌকোর উপর—

পচার প্রশ্ন ঃ কী করলাম বল দিকি তখন ?

সাহেব বলে, তালাটা খুলে ফেললেন কায়দাকৌশল করে। কিম্বা ভেঙেই

ফেললেন।

ঘুমুচ্ছে ওরা নৌকোর উপরে—জেগে উঠবে যে! জেগে উঠে চেঁচামেচি করবে; ডাকাত নই, চোর আমরা—সেটা খেয়াল রাখিস।

দেমাক করে জোর দিয়ে পচা বলে, আমরা চোর, বুদ্ধির ব্যাপারি। গায়ের জোরে নয়, কলকৌশলে কাজ। কী করলাম বল্ ভেবে চিন্তে।

ভেবে সাহেব কূল পায় না, চুপ করে থাকে।

মোরগ ডাক ডেকে উঠলাম। তাই শুনে পাড়ার যত মোরগ ডাকতে লাগল। এক সাঙাত বাগানে ঢুকে কাক ডাকল। এ-গাছে ওগাছে কাকে অমনি কা-কা করে উঠল রাত পুইয়েছে ভেবে। মাথায় বোঝা তুলে তখন আমরা খেয়ার মাঝিকে ডাকছিঃ পাইকার ব্যাপারি—পাঁচ ক্রোশ গিয়ে আমরা হাট ধরব। নৌকো শিগগির খুলে দাও। দুপুর রাত্রি এমনি কায়দায় সকাল করে নিয়ে হাসতে হাসতে পার হয়ে চলে গেলাম।

জন্তু-জানোয়ার পাখ-পাখালির ডাক ভাল করে শিখে নিতে হয়। শিয়ালের ডাক সর্বাগ্রে। ভাব করতে হয় জীবজন্তুর সঙ্গে, কাজের দায়ে সময় বিশেষ জন্তু হতে হয়। ডাক আবার সকলের মুখে আসে না। বংশীটা পারে ভাল। সে শালা কিন্তু কদর বোঝে না, হেলাফেলার জিনিস মনে করে।

সাহেবকে নিয়ে সেই একরাত্রে কর্মকার বাড়ি গিয়েছিল। শিক্ষা এগুনোর সঙ্গে সঙ্গে পচা এখন হামেশাই বেরিয়ে পড়ে। কঠিন বিদ্যা—শুধুমাত্র মুখের উপদেশে হয় না। নানান জায়গায় ঘোরে দুজনে—সোনাখালির বাইরেও। অনেক বাড়ি চলাচল। মোটরগাড়ি আর পাকাবাড়ি। যে বাড়ি একজন দুজন বেওয়া-বিধবা থাকে, আবার যে বাড়ি কিলবিল করে মানুষজন। যে-বাড়ির বিশেষ পাহারার জন্য গ্রাম্য চৌকিদারের সঙ্গে পৃথক বন্দোবস্ত, যে-বাড়ি বাঘা বাঘা কুকুর। আবার এমন বাড়িও—যেখানে ঢেঁকিশালে শব্দ-সাড়া করে ঢেঁকির পাড় পাড়লেও ভয়ে মানুষ ঘর থেকে বেরুবে না।

সরকারি চৌকিদার কিম্বা মাইনে-করা দারোয়ান এমন কিছু ভয়ের বস্তু নয়। বন্দোবস্তের উপর বন্দোবস্ত চলে, টাকার খেলায় ভাব জমানো যায়। সামাল কুকুর নিয়ে। যে-বাড়ি কুকুর থাকে, রাতের কুটুম হঠাৎ সেখানে ঢুকবে না। আগে থেকে হয়তো বা ছ-মাস এক বছর থেকে ব্যবস্থা চালাতে হয়। ছলে-ছুতোয় দিনমানে যাবে সে-বাড়ি। ধরো, তলবদার হয়ে গেলে গৃহস্থের আমগাছ, জামগাছ, খেজুরগাছ চেলা করতে। করাতি হয়ে গেলে গাছ ফেড়ে তক্তা বানাতে। ব্যাপারি হয়ে গেলে ধানের দরাদরি করতে। জীবজন্তু যেন তোমার বড় প্রিয়, এমনিভাবে তু-উ-উ করে ডাকবে কুকুর। নিজে ভাত রান্না করে খাবে গৃহস্থ বাড়ি, কিম্বা ভাত চেয়ে-চিন্তে খাবে—সেই ভাতের আধাআধি দিয়ে দেবে কুকুরের মুখে। কুকুরের গায়ে হাত বুলাবে। যতদিন না ভাল রকম চেনা-

পরিচয় হচ্ছে, রাত্রিবেলা গিয়ে পড়া ঠিক নয়।

পচা বলে, গভীর মনোযোগে সাহেব প্রতিটি পদ্ধতি শুনে নিচ্ছে। একবার বলে মাড়ি আঁটার কী মন্তোর আছে শুনেছি—

পচা একটু হেসে বলে, মন্তোরে এত সব হাঙ্গামা নেই। ধুলো পড়ে ছুঁড়ে দিলে জীবের গায়ে, সঙ্গে সঙ্গে মাড়ি এঁটে গেল। আওয়াজ বেরুবে না। মাড়ি ফাঁক করে খেতেও পারবে না। কাজ হয়ে গেলে সেইজন্যে ছাড়-মন্তোর পড়ে কারিগরে মাড়ি খুলে দিয়ে যায়।

সাহেবের ধক করে নফরকেষ্টর কথা মনে পড়ে। শুধুমাত্র এই মন্তোরটা শেখা থাকলে তাকে কিছু ভাবতে হত না, ছোটভাইয়ের বাসায় পরমানন্দে জীবন কেটে যেত। কারখানা থেকে ফিরে সন্ধ্যার পর বউয়ের মাড়ি এঁটে দিত, ঝগড়াঝাটি বন্ধ। সকালে কারখানা যাবার মুখে মাড়ি খুলে দিয়ে সরে পড়ত। শুধু নফরা বলে কেন, কত ভাল ভাল সংসারি লোকের উপকার হত মন্তোরটা জানা থাকলে!

পচা বলে চলেছে, মন্তোর আছে ঠিকই, সে মন্তোর খাটাতে পারলে হয়। একালের আনাড়ি মানুষে পেরে ওঠে না। মন্তোরের চেয়ে দ্রব্যগুণে এখন আমাদের বেশি ভরসা।

পোষা বিড়াল বেশি সতর্ক কুকুরের চেয়ে। ঘরে বিড়াল ঘুমিয়ে আছে—সিঁধের মুখে, যত নিঃসাড়েই ওঠ, বিড়াল জেগে উঠে লাফ দিয়ে পড়বে। তার জন্যে ভাবনার কিছু নেই, গৃহস্থ চোখ মেলবে না। বিড়ালের স্বভাবই এই। ইঁদুর গর্ত থেকে বেরুলে বিড়াল লাফ দেয়। আরশুলা-টিকটিকি দেখলেও। বিড়াল লাফালে গৃহস্থ জাগে না।

একদিন—সমস্তটা দিন ধরে পচা বাইটা ভারি ব্যস্ত। কামরায় দুয়োর দিয়ে খুটখাট করছে, জিনিসপত্র নড়াচ্ছে সরাচ্ছে। নিশিরাত্রে সাহেব এসে দাওয়ায় পা দিয়েছে, পচা বেরিয়ে এসে শক্ত করে তার চোখ বাঁধল। তারপর ঘরের ভিতর নিয়ে আসে। টিনের পোর্টম্যাণ্টো বেতের তোরঙ্গ সারি সারি সাজানো।

টোকা দে সাহেব। খুব আস্তে—তুই কেবল শুনবি, অন্য কানে পৌঁছবে না। গৃহস্থ শুনতে পেলে তো ক্যাঁক করে টুটি চেপে ধরবে। চোখে দেখছিস না, কান দুটো খোলা। টোকা দিয়ে শুনে শুনে বল, কী আছে এসবের ভিতর।

শিক্ষা কত রকমের দেখ। মোটা মেহনতের কাজ যেমন, তীক্ষ্ণ অনুভূতির কাজও তেমনি। বড়-বিদ্যা বলে জাঁক করে এমনি এমনি নয়।

কানের উপর ভর করো মা দক্ষিণাকালী! পরীক্ষায় পারবে বোধ হয় সাহেব। একটায় বলে, কাপড়চোপড় আছে। কি করে জানলি রে তুই? আওয়াজটা শুনুন বাইটামশায়, ঢ্যাব ঢ্যাব করছে।

বেতের প্যাটরায় ঘা দিয়ে বলে, ঘটি-বাটি আছে। গয়নাগাঁটিও থাকতে পারে। খনখনে আওয়াজ।

চোখ খুলে বাক্সর ডালা তুলে মিলিয়ে দেখ্ এবার—

যা বলেছে, ঠিক ঠিক তাই। পচা বাইটা আনন্দে থই পায় না। বলে, বয়স থাকলে তোকে আজ কাঁধে তুলে নাচতাম রে সাহেব। জনম শেষ করে এসে এদ্দিনে সাগরেদ একটা পেলাম বটে! এত হেনস্থা সয়ে বোধকরি এইজন্যেই বেঁচে রয়েছি। রাতের কুটুম আমরা—অন্ধকারে কাজকর্ম। যত অন্ধকার ততই ভালো। সে অন্ধকারে চোখের কাজ নেই, চোখ কানা হলেই বা কি! কাজ কানের আর হাত-পায়ের। নাকেরও কখনো-সখনো। বাক্সর উপর টোকা দিয়ে আওয়াজের তফাতে ভিতরের মাল চেনা—বাজে লোকের ক্ষমতা নেই, গুণী কারিগরেই পারবে শুধু।

আদর করে সাহেবের পিঠ ঠুকে দেয়। নিতান্ত আপনজনের মতো প্রশ্ন করে: বড্ড কাজের ছেলে তুই বাছা, বাপ কি কাজ করে?

জবাব কি আছে সাহেবের! দুনিয়ার সকল লোক ভাগ্যবান—বাপ-মা ভাই-বোন, জাতি-কুল শতেক রকমের পরিচয় তাদের। সাহেবের পরিচয় শুধু-মাত্র সে নিজে। লোকে নাকি মরার পরে বায়ুভূত হয়ে ভাসে, জীবন থাকতেই সাহেব নিরালম্ব হয়ে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

পচা বলে, তুই না বলিস, আমি ঠিক বলে দিতে পারি। মহাগুণী তোর বাপ। গুণীর বেটা, নইলে এইটুকু বয়সে এত ক্ষমতা সম্ভব না। হয় সে হাকিম-দারোগা নয়তো পয়লা নম্বরের বাটপাড়। মাঝামাঝি মানুষ কখনো নয়।

শিকড়বাকড়, লতাপাতার শিক্ষা এর পরে। বনে-বাদাড়ে নিয়ে গিয়ে পচা বাইটা নানা রকমের গাছগুল্ম চেনায়। পচা পেয়েছিল গুরুর কাছ থেকে। তিনিও আবার তাঁর গুরুর কাছ থেকে। এমনি হয়ে আসছে। পুলিস অশেষ চেষ্টা করেও হদিস পায় নি। গুণী জনকয়েকের মাত্র জানা—তাদের পেটে সাঁড়াশি ঢুকিয়েও কথা বের করা যায় না। এক রকমের পাতা জঙ্গল থেকে তুলে ছায়া-ছায়া জায়গায় শুকিয়ে রাখে। ঘরে ঢুকে কিছু পাতা খাটের তলে রেখে আগুন ধরিয়ে দাও—যে খাটে মক্কেলরা শুয়েছে। আগুনটা নিভিয়ে দাও এবারে, ধোঁয়া বেরোক, ধোঁয়া তাদের নাকের ভিতরে যাক। মধুর আলস্যে সর্বদেহ আচ্ছন্ন হয়ে আসে, স্নায়ুতন্ত্রীতে ঝিমঝিম বাজনা বাজে যেন। আরও আছে—সেই পাতার বিড়ি কারিগরের মুখে। দ্রুত হাতে কাজ করে যাচ্ছে, তীক্ষ্ন কান রয়েছে মক্কেলের নিশ্বাসের ওঠা-নামায়। পাতলা ঘুম বুঝলে বিড়িতে টান দিয়ে পরিমাণ মতো ধোঁয়া ছাড়বে নাকে। সর্বস্ব লোপাট হয়ে গেল, সারাক্ষণ মক্কেল তবু মিষ্টি স্বপ্ন দেখছে। সাহেব ঠিক এমনিটাই করেছিল জুড়নপুরে আশালতার পাশে শুয়ে।

সিঁধকাঠির দাবি এবার সাহেবের। পচা বলে, কাঠি বুঝি ইচ্ছেই করলেই ধরা যায়! ধঁরলে কি আর হাত পুড়ে যাচ্ছে—সে কথা নয়। কিন্তু ওস্তাদ

সাগরেদের হাতে তুলে দিল, সে কাঠির দাম অনেক। সে কাঠির ঘা যেখানে মারবি, মা-কালীর দয়ায় ঝুরঝুর করে সোনাদানা খসে আসবে। কান দেখেছি তোর সাহেব, হাত দু-খানা একবার পরখ করে দেখতে দে। উতরে যাস তো কাঠির কথা তখন বিবেচনা করা যাবে।

কাঠি অভাবে খন্তা। পচা বলে, খেলতে জানলে কানাকড়িতে খেলা যায় রে বেটা। কাঁচাঘরে ছোটখাট একটু কাজ—খন্তাতেই হয়ে যাবে। গুরুপদ ঢালিকে দিয়ে খোঁজ এনেছি।

সাহেব সবিস্ময়ে বলে, কোন গুরুপদ ?

হ্যাঁরে হ্যাঁ, সেই লোক। সর্দার হয়ে তোদের নিয়ে কাজে বেরিয়েছিল। পারে না হেলে ধরতে, ছুটল সে গোখরোর পিছনে। সে-ও সাগরেদ আমার, খবর পেয়ে এসেছিল। এই কাজটার খোঁজদারি করেছে, ডেপুটি হয়েও সে সঙ্গে ঘুরবে।

পঞ্চমী তিথি, শুক্লপক্ষ। শেওলা-ভরা মজা দীঘির ধারে ধারে চলেছে পচা আর সাহেব। কেয়ার ঘন জঙ্গল, তার মধ্যে ঢুকে যায়। ভিতরটা পরিচ্ছন্ন —আজ-কালের মধ্যে সাফসাফাই হয়েছে। সাফাই করে গেছে—আবার কে ?—গুরুপদই। কেয়াবনে সাপ থাকে, সেইটা বড় সুবিধা। সাপে আর চোরে সাঙাত-সম্পর্ক—চাল-চলন একই রকম বলে বোধহয় চোরকে সাপে কিছু বলে না। অথচ সাপের ভয়ে বাইরের লোক কেউ জঙ্গলে ঢুকবে না।

গুরুপদও এসে গেল। কিছু সর্ষের তেল ও মর্তমানকলা এনেছে, উবু হয়ে বসে তেলে-কলায় চটকাতে লেগে যায়। বাইটা বলে, কাজের আগে তোর গায়ে মাখিয়ে দেবে সাহেব।

গুরুপদর দিকে চেয়ে সাহেব সকৌতুকে বলে, তিলকপুরের কাজেও ছিল বটে, কিন্তু এদ্দুর নয়।

পচা বলে, রীতিকর্ম এইসব। সকলে সব সময় মানে না। কিন্তু মানা ভালো। মুরুব্বিরা দেখেশুনে মাথা খাটিয়ে তবেই এক একটা বিধান দিয়ে গেছেন।

কাপড় ছেড়ে ল্যাঙট পরে নিয়েছে ইতিমধ্যে সাহেব। প্রয়োজনের বেশি এক ইঞ্চি বাড়তি কাপড়চোপড় থাকতে নেই, কোন প্রান্ত কেউ ধরে ফেলে বিপদ ঘটাতে পারে। ডেপুটি গুরুপদরও সেই পোশাক। সাহেবের গায়ে ডলে ডলে সে তেল-কলা মাখাচ্ছে। কেউ চোর ধরে ফেললে সড়াৎ করে পিছলে বেরুবে, রাখতে পারবে না।

তৈরি হয়ে এইবার আকাশ মুখো তাকাচ্ছে। চাঁদটুকু ডুবে গেলেই হয়।

ক'পোতায় ক'খানা ঘর ? তার মধ্যে কোন্ ঘরটা পছন্দ ? ঘরের কোন্-খানে ?

পাঁচচালা ঘরের কানাচে কাঁঠালতলায় জায়গা ঠিক করেছে। ঝোপঝাপ চারি-দিকে, ছায়ান্ধকার—কাজের পক্ষে এত সুন্দর জায়গা হয় না।

খুঁজিয়াল গুরুপদ যাবতীয় খবর মজুত রেখেছে। তবু কিন্তু কারিগর কাজের মুখে নিজে পাকচক্কোর দিয়ে বুঝেসমঝে আসবে। সাহেব টুক করে একটু মাটির ঢিল ছুঁড়ল উঠানে। তারপরে চেলা-কাঠ একখানা। সাড়া নেই। মাথার উপর দিয়ে বাদুড় একঝাঁক পতপত করে উড়ে গেল কোন্ দিকে। পা টিপে টিপে এবারে ঘরের কাছে বেড়ায় ঘা দিল মৃদু হাতে। বেড়ায় কান রাখল।

পচার কাছে এসে সবিস্ময়ে বলে, সন্ধ্যেরাত্রি—কিন্তু গাঢ় ঘুম শুনে এলাম। কান ভুল করেছে, এমন তো মনে হয় না।

ঘাড় কাত করে পচা সায় দেয়ঃ এমনিই হবে। খাওয়াদাওয়ার ঠিক পরেই এসেছি। ভাত-ঘুম এখন—ঠেসে ভাত খেয়ে শুয়ে পড়লেই ঘুম এসে যায়। বৃষ্টি না খরা, ঠান্ডা না গরম, শীতকাল না গ্রীষ্মকাল—এতসব বিচারের দরকার পড়ে না ভাতঘুমের অবস্থায়। তবে ঘুমের পরমায়ু অল্প, একটু পরেই পাতলা হয়ে আসবে। নতুন কারিগর তোদের এই সময়টা কাজ খানিক দূর এগিয়ে রাখা ভাল। শেষ ওঠানো সময় বুঝে হবে।

হুকুম দিলঃ লেগে যা সাহেব 'জয় কালী' বলে। কানের কথা অমান্য করিসনে। রাতের বেলা চোখ ভুল করে বলে কান এই সময়টা বেশি রকম সজাগ।

তিলকপুরে সিঁধের ব্যাপার ছিল না। হাতে-কলমে সিঁধের কাজ এই প্রথম। পচা বাইটা অনতিদূরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে খুঁটিনাটি সমস্ত দেখে যাচ্ছে। কয়েকটা ডাল ভেঙে এনেছে সাহেব, ডাল মাটিতে পেতে দিয়েছে। নিজের বুদ্ধিতে এনেছে, কেউ বলে দেয়নি। ঠিক এমনিটাই চাই। কাজের আদ্যন্ত ভেবে নিয়ে তবেই সাহেব খন্তা হাতে নিয়েছে।

কাচনি অর্থাৎ ছেঁচা-বাঁশের বেড়া। বেড়ার নিচে গবরাট (বাঁশের ফালি আড়ভাবে পাতা, যার উপরে বেড়া রয়েছে)। মাটির ডোয়াপোতা। খন্তায় ডোয়ার মাটি খুঁড়ছে ধীরে ধীরে—অত্যন্ত নরম হাতে। ডেপুটি গুরুপদকে নির্দেশ দিয়েছে, দু-হাতে অঞ্জলি পেতে সিঁধের নিচে সে ধরে আছে, মাটি পড়ছে হাতের উপর। অল্পসল্প বাইরে যা পড়ছে, সে মাটি আলগোছে ডালপাতায় পড়ে তাতে কোন শব্দ নেই। বাতিল হাঁড়ি একটা যোগাড় করেছে, হাতের মাটিতে হাঁড়ি ভরতি করে সন্তর্পণে দূরে নিয়ে চলেছে। যন্ত্রের মতো কাজ হচ্ছে। দেখে দেখে পচা চমৎকৃত হয়। সার্থক বটে তার শিখানো। উপদেশের কণিকামাত্র অপচয় হয় নি।

সিঁধ কেটে দেয়াল একেবারেই ফাঁক করতে নেই, কিছু বাকি রেখে দেবে। মেটে দেয়াল হলে চার-পাঁচ ইঞ্চির মতো, ইটের গাঁথনি হলে একখানা ইট। এ লাইনের বাঘা বাঘা মুরুব্বিদের এই অভিমত। মক্কেলের গভীর ঘুম দেখে কাজ শুরু করেছিলে, এখন হয়তো সে ঘুম পাতলা। বাইরের আলো হঠাৎ সিঁধের

ফাঁকে এসে মানুষটাকে চমকে দিতে পারে। সইয়ে সইয়ে অতএব কাজ।

সাহেবও তাই করছে। খন্তা রেখে বেড়ার এদিক-সেদিক কান পেতে বেড়ায়। ক্ষণকাল তারপরে চুপচাপ বসে আবার যায় বেড়ার ধারে। অর্থাৎ গতিক সুবিধের নয়। রোগির নাড়ি দেখে পেট টিপে বুকে নল বসিয়ে ডাক্তার যেমন মুখ বাঁকায়, তেমনি অবস্থা। সিঁধটুকু শেষ করা এবং মাল পাচার করা—সবশুদ্ধ বড়জোর আধ ঘণ্টার ব্যাপার। কিন্তু এমন শোনা গেছে, এরই অপেক্ষায় বসে রাত কাবার হয়ে গেল, কাজ বরবাদ। দেয়াল কেটে ফিরে যাওয়া মানে সে মক্কেলের বাড়ি অন্তত বছর খানেকের ভিতর আসা চলবে না। আজকেও তাই না ঘটে।

পচার কাছে গিয়ে বলে, কতক্ষণ আর দাঁড়াবেন? আপনি চলে যান. আমি আর গুরুপদ থাকি।

পচা বাইটা পুলকিত কণ্ঠে বলে, আমি যাচ্ছি, তোরাও চলে আয়। আজকের মতন হয়ে গেল। ঘরে না-ই ঢুকলি, এমনিতেই বুঝে নিয়েছি।

রাত থমথম করছে। ফিরে চলেছে জঙ্গলে সুঁড়িপথে। উচ্ছ্বসিত হয়ে পচা বলে, তোর বাপ বলেছিলাম দারোগা-হাকিম, নয়তো বাটপাড়। ওসব কিছু নয় সাহেব, এইবারে সঠিক হদিস পেয়েছি।

সাহেব চমকে ওঠে: আজ্ঞে?

তোর বাপ কচ্ছপ। কচ্ছপের বেটা তুই—গুটগুট করে কেমন হাত চলতে লাগল কচ্ছপের চলনের মতন।

নিজের রসিকতায় পচা বাইটা চাপাহাসি হাসে। বলে, পয়লা দিনেই যা নমুনা দেখালি, তা-বড় তা-বড় কারিগর পাকা হাতেও এমন পারে না।

চলে এমনি প্রায়ই। হাতে-কলমে কাজ করে ঘাঁতঘোঁত বুঝে নেওয়া। প্রতি কাজেই গুরুপদ ডেপুটি। পচা বলে দিয়েছে, সেই কোন আমলে আমার সঙ্গে নেমেছিল—চুলই পাকল, আর কিছু হল না। সাহেব ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে মরবার আগে শিখে নিয়ে যাও কিছু। ওপারে যমের রাজ্যে গিয়ে খেলা দেখিও। পচা তেমন যায় না—কষ্ট বেশি সইবার ক্ষমতা নেই। কাছাকাছি হলে হঠাৎ কখনো গিয়ে কিছুক্ষণ দেখে চলে আসে।

একদিন গুরুপদ হন্তদন্ত হয়ে খবর দিল, মক্কেলের ঘরে সাহেবকে আটকে ফেলেছে।

কখনো নয়। ঘরের মানুষ জেগে পড়বে, এমন ধারা কাজ সাহেব কেন করতে যাবে? উত্তেজনায় পচা খাড়া হয়ে বসল: তুমি আবার যাও গুরুপদ, ভাল করে খবরাখবর আনো। সাহেবকে আটক করবে, এ কখনো হয় না। হতে পারে—চ্যাংড়া বয়স তো—সাহেবই তাদের নিয়ে খেলাচ্ছে।

কিন্তু খবর সত্যি। সাহেব তার নিজের দোষে আটকা পড়েছে। নিঃসংশয়

হয়ে তবেই ঘরে ঢুকেছিল। মাটিতে বিছানা—মশারি টাঙিয়ে স্বামী স্ত্রী আর বাচ্চা ঘুমুচ্ছে। গরুপদ খোঁজ এনেছে, দুটো ছেলের মধ্যে বড়টাকে শাশুড়ির ঘরে দিয়ে কোলের বাচ্চা নিয়ে বউ শোয়। আজ দুপুরে পাট-বিক্রির টাকা পেয়েছে, সে টাকা ঘরেই আছে, ঘর থেকে বেরুতে পারেনি এখনো।

সিঁধ থেকে ঘরে উঠে সকলের আগে দরজার খিল খুলতে হয়। মুচ্ছকটিকের সময়েও এই নিয়ম। খিল খোলা রইল এই মাত্র—দরকার হলে যাতে দরজার প্রশস্ত পথে পালাতে পারো। দরজা ভেজানোই থাকবে, বাইরের আলো এসে নিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটায়। সাহেব যাচ্ছিল সেই দরজার দিকে। বাচ্চাটা গড়িয়ে কখন মশারির বাইরে এসেছে—পা পড়ল গিয়ে বাচ্চার ঘাড়ে। একবার ক্যাঁক করে উঠেই নিশ্চুপ।

কী সর্বনাশ! মুহূর্তে সাহেবের কেমন সব ওলটপালট হয়ে যায়। কাজ ভুলে বাচ্চাকে বুকের উপর তুলে নিয়েছে—বয়স পিছিয়ে গিয়ে সাহেব নিজেই যেন এই অচেনা বাড়ির শিশু। তাকেও খুন করতে গিয়েছিল—হাত দিয়ে গলা টিপে নয়, হয়তো বা এমনিধারা গলার উপর পা চাপিয়ে।

ধকল কাটিয়ে বাচ্চা গলা ফাটিয়ে কেঁদে উঠল। মরেনি তবে। হুঁশ পেয়ে সাহেবও সঙ্গে সঙ্গে বুক থেকে নামিয়ে রাখে। মা জেগে পড়েছে: আরে, মশারির বাইরে যে দুলদুল! পুরুষের ব্যস্ত কণ্ঠ: কাঁদে কেন, কমড়াল নাকি কিছুতে? মশারি বাইরে এসে বাচ্চা কোলে করে বসেছে। বাপ দেশলাই হাতড়াচ্ছে: বালিশের তলায় রেখেছিলাম যে, গেল কোথা?

একটি লহমা—যত কিছু করণীয় তার ভিতরে। বিছানার ওধারে দরজা—সাহেব যেখানটা এসে পড়েছে দরজা খুলে উঠানে লাফিয়ে পড়া যায়—তার পরেই দৌড়। কিন্তু ক'টা খিল না-জানি দরজায়, হুড়কো-ছিটকিনি আছে কিনা—এই সব করতে করতেই তো পিছন থেকে জাপটে ধরবে। পুরুষলোকটা হাত তিন-চারের মধ্যে। পেয়েও গেছে দেশলাই। বেড়ার কাছে মাটির প্রদীপ, কাঠি জেলে প্রদীপ ধরাল। সাহেব আর নেই।

সিঁধের দিকে নজর পড়ে পুরুষ চেঁচিয়ে ওঠে: চোর এসেছে রে—চোর, চোর! ভয় পেয়ে বউটাও হাউহাউ করে। বাড়ির লোকজন সব উঠে পড়ল, পাড়ার লোক ছুটো-ছুটি করে আসে। বিষম সোরগোল। সিঁধের মুখে আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। অন্ধিসন্ধি খুঁজছে।

একজন বলে, চোর বুঝি ঘরের মধ্যে বসে আছে ধরা দেবার জন্য। সিঁধের পথে বেরিয়ে গেছে কখন। বাচ্চা নিয়ে পড়লে তোমরা—অমন অবস্থায় আর কি করবে? চোর সেই ফাঁকে পিঠটান দিয়েছে। জিনিসপত্র কি গেল দেখ এইবারে।

না, যায়নি কিছুই। ছেলের কান্নায় পালাবার দিশা পায় না, ফুরসত পেল কখন? অবোধ বাচ্চাই আজ চোর ঠেকিয়েছে। ক্ষতি লোকসান যখন হয়নি, চোরের পিছনে ছোটবার তত বেশি গরজ নেই। ছোকরারা এদিক ওদিক দেখে

বেড়াচ্ছে। মাতব্বর মহাশয়রা দাওয়ায় চেপে বসেছেন, হুঁকো ঘুরছে হাতে হাতে, রকমারি চুরির গল্প হচ্ছে। কোন চোরের নাকি পান্তাভাত ছাড়া অন্য কিছুতে লোভ ছিল না, ভাতের লোভে রান্নাঘরে সিঁধ কেটে ঢুকত। এমনি সব গল্প।

গাঁয়ের অর্ধেক মানুষ বোধকরি দাওয়ায় জড় হয়েছে, ঘরের ভিতর বউ একলা। ছেলে এক-একবার ডুকরে ওঠে—প্রদীপ কাছে এনে বউ ঠাহর করে করে দেখছে, দুধ খাওয়াচ্ছে বুকের মধ্যে নিয়ে। কেন যে সাহেব বোকার মতন দু-হাতে তুলে নিতে গেল—দরজা খুলে অথবা সিঁধের গর্ত দিয়ে দিব্যি ঐ সময়টা বেরিয়ে যেতে পারত। যত গণ্ডগোলের মূলে কাদার মতন প্যাচপেচে বিশ্রী মনটা। মা-কালী, ভালোর জন্য সকলের দরবার—আমি কোন ছোট্টবেলা থেকে মন্দ হবার জন্য মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি করছি, সে জিনিসেও কৃপণতা তোমার।

মশারির ভিতরে সাহেব। পুরুষ বেরিয়ে এসে প্রদীপ ধরাচ্ছে, সাহেব তখন ওদিক দিয়ে নিঃসাড়ে ঢুকে গেল। আত্মরক্ষার এ ছাড়া উপায় নেই। সারা ঘর এবং তারপরে সারা বাড়ি চোর খুঁজে বেড়াল, সেই চোর তখন নরম তোষকের বিছানায় পাশবালিশ আঁকড়ে জামাইয়ের মতন আরাম করে পড়ে আছে। মশারিটা তুলে দেখবার কারো হুঁশ হল না।

ছেলে কোলে নিয়ে বউ—ছেলে ছাড়া আর কিছুই সে এখন দেখতে পাবে না। সরে পড়বার মহেন্দ্রক্ষণ এই। পুরুষ ফিরে এসে এটা-ওটা দিয়ে সিঁধের মুখ বন্ধ করবে, তারপর দরজা এঁটে ছেলে-বউ নিয়ে শোবে। তিলেক দেরি নয় সাহেব, দিব্যি তো খানিকটা গড়িয়ে নিয়েছ। এইবার—

সুবিধা আরও হল। দুধ খাইয়ে ছেলে কাঁধের উপর শুইয়ে বউ উঠে পড়ল; পায়চারি করে ঘরের এদিক-ওদিক, গুণগুণ করে পিঠের উপর থাবা দিয়ে ছেলে ঘুম পাড়ায়। এদিকে যখন পিছন করেছে—সড়াৎ করে সিঁধের গর্তে নেমে পড়ো।

ইঁদুর যেমন ঢুকে যায়, সাপ ঢোকে, শিয়াল ঢোকে, মানুষ কেন পারবে না?

তেরো

পরের দিনটা এক পা বেরুলো না সাহেব। পাটোয়ার-বাড়ি শুয়ে বসে কাটায়। বাইটার কাছেও যায় না। মুখ দেখাতেও লজ্জা।

রাত পোহাতে না পোহাতে গুরুপদ এসে হাজির। বলে, যাওনি কেন? তলব পড়েছে। এক রাত্রি না দেখে বৎসহারা গাভীর মতন হাম্বা হাম্বা করছে।

সাহেব সভয়ে প্রশ্ন করে, পরশুর ব্যাপার নিয়ে কথা হল নাকি?

হল বই কি! তোমার জুড়ি সাগরেদ বাইটামশায়ের আর নেই। ছিল না কখনো, হবেও না।

ঈর্ষার জ্বালা গুরুপদর কণ্ঠে। সাহেবের মনে হল বানিয়ে বলছে। বলে,

আটকা পড়েছিলাম, তাতে বাইটা কি বললেন ?

ইচ্ছে করে করেছিলে। আটক না হলে বেরুনোর খেলাটা দেখাও কি করে ? যেও কিন্তু আজ, তুমি না গেলে আমার উপর দোষ পড়বে।

যেমন ইদানিং হয়ে থাকে—রাত্রে পা টিপে টিপে সাহেব বাইটার ঘরের ছাঁচতলায় গিয়ে দাঁড়ায়। আবার পচারও যে নিয়ম—খুট করে দরজার খিল খুলে দেয় সঙ্গে সঙ্গে।

ঘরে পা দিতেই পচা বলে ওঠে, বাহাদুর বটে তুই ছোঁড়া !

গালির বদলে বাহবা পেয়ে সাহেব আরও ভেঙে পড়ল : আমার কিছু হবে না ওস্তাদ, জন্ম থেকে অভিশাপ আছে। আপনার সঙ্গে মিথ্যে ঘোরাঘুরি—হুকুম দিয়ে দেন, চলে যাই।

হাসিমুখে অবিচলিত কণ্ঠে পচা বলে, গুরুদক্ষিণা শোধ না করে যাবি কেমন করে ? পাওনার জন্যেই তো ডেকেছি।

শীর্ণ হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে পচা তার মাথায় রাখে। বলে, কাঁচা বয়সের তোরা নির্গোলের কাজে সুখ পাসনে, সে জানি আমি। গোলমাল কাটিয়ে বেরিয়েও তো এলি।

সাহেব অধীরভাবে ঘাড় নেড়ে বলে, সে-গোলমাল কেমন করে ঘাড়ে নিলাম, সেটাও তো শুনবেন।

ওস্তাদের কাছে ঢাকাঢাকি নেই। তা হলে বুক-ঢালা আশীর্বাদ মেলে না। ওস্তাদের আশীর্বাদ বিহনে গুণজ্ঞান সমস্ত বিফল।

আদ্যোপান্ত শুনে নিয়ে পচা—দেবে তো এইবার দূর-দূর করে তাড়িয়ে—কী আশ্চর্য, মুখ-ভরা হাসি নিয়ে উল্টে সাহেবের তারিফ করে : এই তো চাইরে ! আমরা হলাম বড় বিদ্যার ব্যাপারি। বুদ্ধির খেলা আমাদের—ডাকাত বেটাদের মতন ভোঁতা কাজকর্ম নয়। বড্ড রক্ষে হয়ে গেছে। বাচ্চাটা যদি মরত, দলের মধ্যে তোর নাম হয়ে যেত খুনে ডাকাত। চিরকালের দাগী হয়ে যেতিস। জেলখানার দাগী হওয়ায় নিন্দের কিছু নেই—এই দাগী হওয়া দলের মধ্যে, নিজের সমাজে। কেউ তখন আর সঙ্গে নিতে চাইত না : অপয়া লোক, কাজ করতে গিয়ে কোন হাঙ্গামা ঘটিয়ে বসে ঠিক নেই।

সাহেবের মাথার পাষাণ-ভার যেন নেমে গেল। পিঠে এক আদরের থাবা বসিয়ে পচা বলে, সব রকমে পরখ হয়ে গেল বাপ আমার। পুরোপুরি লেগে যা এইবার। কাঠি কাঠি করিস, গুরুদক্ষিণা শুধে এবারে কঠিন হুকুম নিয়ে নে। রাজার অট্টালিকা ফকিরের ডেরা মাছির মতন যথা ইচ্ছা নির্ভয়ে ঢুকে যাবি, বিশ মরদ মিলে চেপে ধরেও গুরুবলে আটকাতে পারবে না।

পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে সাহেব বলে, হুকুম হোক, কী রকমের দক্ষিণা—সাক্ষি থাকো ষড়ানন, সাক্ষি কালীঘাটের মা দক্ষিণাকালী, জীবনপণে সাহেব

গুরুঋণ শোধ করবে ।

পচা বাইটা বলে, ক্ষেত্তোর পাত্তোর সবই বলে দিচ্ছি। কুলের মুশল আমার দুই বেটা—মাল এনে যেদিন তুই হাতে দিবি, সকলের বড় বেটা বলে তোকে মেনে নেবো।

বাংটার পা ছুঁয়ে গদগদ কণ্ঠে সাহেব বলে, হুকুমটা হয়ে যাক—

তবু বাইটা ভূমিকা করে যাচ্ছে ঃ বড্ড কঠিন ঠাঁই বাপু। গুরুদক্ষিণা চিরকালই কঠিন হয়—একবারের বেশি তো দিতে যাচ্ছিস নে। আমার যিনি গুরু, তাঁর কি দক্ষিণা দিতে হয়েছিল শুনবি ?

পচা বাইটার গুরুর যিনি গুরু, সেই পিতামহ-গুরুটি বিষম খুঁতখুঁতে। বললেন, মাটির উপরে নরম চলাচলের আমি দাম দিইনি। ওতে পরীক্ষা হয় না।

বাইটা গুরুর কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, আজ্ঞা করুন।

মাটির উপরে নয়, গাছের মাথায় চড়ে চুরি করে আনবি। মিহি কাজ তাকেই বলে—হাত-পায়ের উপর পুরোপুরি দখল না হলে কেউ তা পেরে উঠবে না।

বড় এক জামগাছের তলায় শিষ্যকে নিয়ে উপরমুখো দেখান ঃ মগডালের উপর পাখির বাসা। ঠাহর করে দেখ, বাসায় বসে পাখি ডিমে তা দিচ্ছে। গাছে চড়বি, গাছের মাথায় চলে যাবি, হাত বাড়িয়ে পাখির পেটের নিচে থেকে ডিম পেড়ে নিয়ে আসবি। পাখি টের পাবে না, উড়ে যাবে না। যেমন ছিল, তেমনি ঠিক বসে থাকবে ।

সাহেব পরমোৎসাহে বলে ওঠে, আমিও করব তাই। সেকালের মুরুব্বিরা পেরেছেন তো আমরাই বা কেন পারব না! দিনমানে কাল বাসা খুঁজে রাখব, পাখি যেখানে ডিমে বসেছে।

পচা বলে, পাখির ডিমে আমার কী গরজ! ওটা তো কথার কথা। মান ইজ্জতের ব্যাপার—সাগরেদ হয়ে তুই আমার মান রাখবি। তোর কাছে দাবি আমার ।

দাবির কথাটা শুনে সাহেব স্তম্ভিত হয়ে যায়। ক্ষেত্র এই বাইটা-বাড়িই। পাত্র অন্য কেউ নয়—ছোটবউ সুভদ্রা। বউয়ের হাতের চুড় দুটো খুলে এনে দিতে হবে। গয়না দিয়ে শ্বশুর বউ-পরিচয় করল, প্রথম উপহারের সেই জিনিস ফেরত চায় আবার।

বলে, ডাক-হাঁক করে মুখের উপর বলে দিয়েছে—তুই তো ছিলি একদিন, ভাত খাচ্ছিলি ঐ দাওয়ায় বসে। বললাম, চুড় কতদিন হাতে রাখতে পারিস দেখে নেবো। রেখেছে তাই, হাত নেড়ে আজও ঝিলিক দিয়ে বেড়ায়। চক্ষু আমার জ্বালা করে সাহেব।

একটুখানি ইতস্তত করে সাহেব বলে, আগেভাগে জানান দেওয়া হয়েছে,—চিঠি ছেড়ে ডাকাতি করতে যায়, এ যেন তেমনি হয়ে গেল খানিকটা।

কাঁচা কাজ করে ফেলেছি, এখন সেটা বুঝি। বয়সের দোষ, মেজাজ ঠিক

থাকে না। ভালো গয়না বারো মাস দিনরাত্তির পরে থাকবার কথা নয়, কিন্তু হারামজাদির সেই থেকে আতঙ্ক হয়ে গেছে, বাক্সয় রেখে সোয়াস্তি পায় না।

অনুতপ্ত বাইটা। গুরুর মুখে সাহেব এসব শুনতে পারে না। দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল, হাতে পরে থাকুক আর যা-ই করুক, আপনার মুখ দিয়ে একবার যখন বেরিয়েছে, নির্ঘাৎ ও-চুড় চলে আসবে। আমি দায়ী রইলাম।

বাইটার দন্তহীন মাড়ি হাসির উচ্ছ্বাসে হাঁ হয়ে পড়েঃ জোর তো আমার সেই। শুয়ে পড়ে চিঁ-চিঁ করি—কোন্ অঞ্চল থেকে গাঙ-খাল ঝাঁপিয়ে হঠাৎ তুই এসে পড়লি। আমি যেন নতুন জন্ম পেয়ে গেছি বাপধন। ছোট-বউয়ের গয়না এনে দক্ষিণা শোধ করবি, তোর উপরে আমার হুকুম রইল।

সুভদ্রার নজর সব সময় সাহেবের উপর। যখন সে পচা বাইটার কাছে, বেড়ার গায়ে দুটি চোখ তাক করে আছে, টের পাওয়া যায়। এবারে সাহেবও নজর রাখছে। যেইমাত্র কোঠাঘরে ঢুকে সুভদ্রা দরজা দেয়, সাহেব সাঁ করে জানলার পাশে এসে বড় বড় মানকচু-পাতার অন্তরালে দাঁড়িয়ে পড়ে। দিব্যি এক লুকোচুরি খেলা—বাইরের অন্ধকারে ঠিকমতো জায়গা নিয়ে নির্বিঘ্নে অনেকক্ষণ ধরে নিরিখ করে দেখা চলে। শ্বশুরের শাসানিতে বউটা সত্যিই শঙ্কিত হয়েছে, ঘরে ঢুকে সকল দিক তন্নতন্ন করে দেখে নিয়ে তবে খিল আঁটবে।

দেখে যাচ্ছে সাহেব রাতের পর রাত। গোড়ায় ভড়কে গিয়েছিলঃ কাজ হবে না, ওস্তাদকে মিথ্যা আশা দিয়েছি। মজবুত গাঁথনির নতুন দেয়াল কেটে কোঠা ঘরে ঢোকা অসম্ভব। একলা একজনের পক্ষে তো বটেই। তার উপরে এই রকম সাবধানী। চুড়জোড়া যেন রাক্ষসীর প্রাণ-ভোমরা। শোবার সময় রূপকথার রাক্ষসীর মতোই কৌটোয় পুরে সন্তর্পণে বালিশের তলায় রাখে।

দেখতে দেখতে শেষটা বুদ্ধি খুলে যায়। এমন সোজা কাজ হয় না। কারিগর যেখানে সাহেব এবং মক্কেল সুভদ্রা, সেখানে ভয়ের কি আছে? দৈবাৎ যদি দেখে ফেলে, কথা জোগানোই আছেঃ উঁকি তুলবেন তো বসুন বউঠান, সেইজন্যে এসেছি। তারপরে এটা-ওটা বলে কাটান দেওয়া। মেয়েমানুষ বোঝাতে কি লাগে!

গৃহস্থঘরে মেয়ে-বউদের নিয়ম সকলকে খাইয়ে দাইয়ে নিজেরা তারপরে গল্প-গুজব করে ধীরে সুস্থে অনেকক্ষণ ধরে খায়। সুভদ্রা-বউ আলাদা গোত্রের; ঝড়ের মতন একসময় রান্নাঘরে ঢুকে থালায় চাট্টি বেড়ে নিয়ে খেয়ে দেয়ে চলে আসে। নিষ্প্রয়োজনে কথাটি বলে না কারো সঙ্গে।

আজও তেমনি খেয়ে ফিরছে, সাহেব নিঃসাড়ে পিছু নিল। সাহেব যেন ছায়া সুভদ্রার—সামনের দিকে আলো থাকলে পিছনে যে ছায়া পড়ে। সতর্ক বউ দরজায় তালা এঁটে গিয়েছিল, তালা খুলে ঘরে ঢুকল। কমজোরি হেরিকেন-লণ্ঠনের জোর বাড়িয়ে দিয়ে হাতে তুলে নিল। এবং রোজ যেমন করে—লণ্ঠন ঘুরিয়ে ঘরের অন্ধিসন্ধি দেখে বেড়াচ্ছে।

ঠিক পিছনে লেপটে আছে সাহেব—ছায়া বই কিছু নয়। ঈশ্বরের ভুলে দুটো চোখই সামনের দিকে—পিঠের উপরে যখন চোখ নেই, একলা মানুষের কাছে লুকিয়ে থাকা শক্ত হবে কেন? সুভদ্রা ঘুরছে, সাহেবও ঠিক-ঠিক ঘোরে তেমনি। ছায়ার সরে বেড়ানোর শব্দ হয় না, সাহেবেরই বা হবে কেন? তা-ই যদি হবে কী শিখল এত বড় ওস্তাদের কাছে!

নিচু হয়ে সুভদ্রা তক্তাপোশের তলাটা দেখে, ওখানে লুকিয়ে আছে কিনা কেউ। নেই—পরিষ্কার ফাঁকা জায়গা। সুভদ্রার সঙ্গে সাহেবেরও দেখা হয়ে গেল—জায়গা পছন্দসই বটে। অতএব সে-ই ঢুকে পড়ল এবার। একেবারে নিশ্চিন্ত। সুভদ্রাও নিশ্চিন্ত হয়ে দরজায় খিল আঁটে, ছিটকিনি আঁটে, হুড়কো দিয়ে দেয়। দরজার আংটা ধরে টেনে দেখে অনেকবার। চোর না ঢুকতে পারে।

দরজা এঁটে গায়ের কাপড়-চোপড় ফেলে সুভদ্রা লঘু হচ্ছে। এই রেঃ, তক্তাপোশের তলে সাহেবের বুক ঢিবঢিব করছে। এতক্ষণ যা ভাবেনি। একটা নতুন বিপদ চোখে পড়ে তার। ঘরের মধ্যে সাহেব, সুভদ্রা বোধহয় টের পেয়ে গেছে। যে রকম চতুর, টুক করে দেখে নিয়েছে কখন। সৈন্যের মতো তলোয়ার খুলে তৈরি হচ্ছে আক্রমণের জন্য? সেই মুলতুবি কাজ—বুকের নামাবলীতে কালি ঢেলে ধ্যাবড়া করতে বলবে? নিজের ইচ্ছায় ফাঁদে ঢুকে পড়েছে, যা খুশি এখন করতে পারে। কপালে সাহেব হাত দিয়ে দেখে, ঘাম ফুটেছে সত্যি সত্যি।

না, শুয়ে পড়ল সুভদ্রা। সর্বরক্ষে রে বাবা! লণ্ঠনের জোর কমিয়ে দিয়েছে। সুস্থির হয়ে সাহেব এইবার মনের ঘাড়ে কড়া চাবুক কষিয়ে দেয়ঃ এটা কি রকম হল ওহে কারিগর? সুভদ্রা নারী কি পুরুষ, বুড়ি কি যুবতী, এটা তোমার জানবার বিষয় নয়। মক্কেল মাত্র—জীবন্ত প্রাণী, এইটুকু খেয়াল রাখতে হচ্ছে কাজের কায়দা ঠিক করবার জন্যে। চুড় দুটো টিনের বাক্স কিম্বা কাঠের তাকেও থাকতে পারত, না থেকে রয়েছে সুভদ্রা-বউয়ের দুটো হাতে। এইমাত্র তফাত। নজর থাকবে শুধুমাত্র বস্তুর উপরে, তার বাইরে নয়। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য মহাভারতে একদিন অর্জুনের লক্ষ্যভেদ পড়েছিল, অবিকল সেই ব্যাপার। নজর যখন শুধুমাত্র গয়নার উপর তার বাইরে আর কিছু দেখছ না—লক্ষ্যভেদ তখনই।

যেমনটি হবার কথা—চুড় খুলে কৌটোয় ভরে সুভদ্রা পরম যত্নে বালিশের নিচে রেখেছে। তক্তাপোশের তলে সাহেব কান পেতে নিঃশ্বাস শোনে। নিদালিবিড়ির প্রক্রিয়াও আছে অল্পস্বল্প। অপারেশনের পূর্বমুহূর্তে অভিজ্ঞ ডাক্তার রোগীর অবস্থা যেমন সতর্ক হয়ে বিবেচনা করে। ঠিক সময়টিতে টিপি-টিপি বেরিয়ে লণ্ঠন একেবারে নিভিয়ে দিয়ে দরজার খিল-হুড়কো খুলবেঃ আজকে আর ভুল নয়—বাইরে পালানোর পথ সকলের আগে।

সকালবেলা ঘুম ভেঙে চুড় পরতে গিয়ে সুভদ্রা বালিশের নিচে পায় না। কৌটোসুদ্ধ লোপাট। বিছানা হাণ্ডুল-পাণ্ডুল করে খুঁজছে। নেই, নেই। দরজায় তাকিয়ে দেখে খিল-হুড়কো খোলা। আর কি, শুধু এখন কপাল চাপড়ানো! সিঁধও কাটেনি কোন দিকে। ইঁদুর-চুঁচোর রূপ ধরে নর্দমার ফুটোয় ঢুকেছে নাকি? তা ছাড়া তো পথ দেখা যায় না।

দরজার শিকল তোলা বাইরে থেকে। ঘরের ভিতর আটক করে রেখে নির্বিঘ্নে সরে পড়েছে। কাজের এ-ও বুঝি দস্তুর। সুভদ্রা দুয়োর ঝাঁকাঝাঁকি করছে, অবশেষে বড়বউয়ের কানে গেল।

ওমা, শিকল দিয়ে কে মস্করা করল?

সুভদ্রা কেঁদে পড়ে: মস্করা দেখছ দিদি, সর্বনাশ হয়েছে। চুড় চুরি হয়ে গেছে—কৌটো সুদ্ধ।

শিকল খুলে ঘরে এসেছে বড়বউ। মনে মনে তৃপ্তি। এক নারীর গায়ের গয়না অন্য নারীর চোখে কাঁটার খোঁচা মারে। এই বড়বউও একদিন এ-বাড়ি এসেছিল, শাশুড়ি তখন বেঁচে। শিঙের উপর জিলজিলে পাতের দু-গাছা চুড়ির বেশি জোটেনি। ছোট জায়ের হাতে পাথর বসানো চুড়—কেননা, সে শিক্ষিত ছেলের বউ। শাশুড়ির অবর্তমানে তখনকার দিনের রোজগেরে শ্বশুর গয়না-খানা নববধূর হাতে নিজে পরিয়ে দিলে।

উৎপাতের শান্তি এতদিনে। দরদটা সেই কারণেই বেশি করে দেখাতে হয়: সত্যিই গেছে, না তামাসা করছিস ছোট? অনেক দাম যে! সিঁধ নেই, চোর কেমন করে নেবে? মনের ভুলে কোথায় রেখেছিস, খুঁজে দেখ ভাল করে।

সুভদ্রা কাঁদতে কাঁদতে বলে, দরজায় নিজের হাতে খিল দিয়েছি দিদি। ছিটকিনি দিয়েছি, হুড়কো দিয়েছি। সমস্ত খুলে বাইরে থেকে শিকল তুলে পালিয়েছে। আবার তা-ও বলি, শোবার আগে লণ্ঠন ধরে ঘরের অন্ধিসন্ধি দেখে নিয়ে তবে দুয়োর বন্ধ করেছিলাম। আমার মনে হচ্ছে কি জান দিদি—বলব?

কৌতূহলে মুখ কাছে এনে বড়বউ বলে, কেন বলবি নে? যদি কোন উপায় থাকে, না বললে কেমন করে হবে?

দিব্যি করে বলতে পারি শয়তান বুড়োর কাজ। ঐ মানুষ ছাড়া কেউ নয়। এক মাথা ছিল—তিন-মাথা হয়ে শয়তানি তেদুনো হয়েছে। গুণীন লোক—বাতাস হতে পারে, মাছি হয়েও ঢুকে যেতে পারে। গয়না নিয়ে নেবে—হাঁক-ডাক করে কতদিন থেকে বলে বেড়াচ্ছে। তাই-ই করল।

পাগল হয়ে সুভদ্রা সেই শ্বশুরের কাছে গিয়ে পড়ে। ঝগড়াঝাঁটি নয় কথায় বাঁকা সুরও নেই। ঢিব ঢিব করে পায়ের গোড়ায় প্রণাম করে। প্রণামের শেষ নেই—প্রণামই নয়, মাথা খুঁড়ছে।

মোলায়েম কণ্ঠে পচা বাইটা প্রশ্ন করে, কি হয়েছে মা-জননী?

এমনি। পায়ের ধুলো নিতে নেই বুঝি ?

সে তো বটেই। গুরুজনের উপর ভক্তিটা বড় বেশি আমার মায়ের। ধুলো তো সব কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিলে—কথা কি আছে, এবার বলে ফেল।

শ্বশুরের মুখের দিকে সুভদ্রা আড়চোখে তাকিয়ে দেখে বিদ্রুপের হাসি। ইচ্ছে করে বাঘিনীর মতো থাবা মেরে হাসিসুদ্ধ ঐ মুখ ছিঁড়েখুঁড়ে রক্তাক্ত করে দেয়। কিন্তু রাগারাগির দিন আজ নয়। হাহাকারের মতো বলে উঠল, আহ্লাদ করে চুড়জোড়া দিয়েছিলে, সে কোথায় হারিয়ে গেল বাবা। কি হবে ?

পচা বলে, বল কি, ভাল জিনিসটা গো! কেমন করে হারাল ?

খুঁজে-পেতে এনে দাও বাবা। তোমার অনেক তুকতাক, ইচ্ছে করলেই পার। নইলে তোমার পা ছাড়ব না। লাথি মেরে ঝেড়ে ফেল, আবার এসে ধরব।

হি-হি করে পচা হাসতে লাগল: অপয়া জিনিসটা গেছে—ভালই তো, আপদ নেমেছে তোমার গা থেকে। কোল-কাঁখ ভরে আসুক এবার ছা-বাচ্চারা, বড় বউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চালাও। যে নিয়েছে, সে তোমার ভালই করল গো!

মজা দেখছে বুড়ো। বলবেই এমনি। আসাই ভুল এ মানুষের কাছে। ভরসা এখন সুভদ্রার একটি মানুষ—কেউ যদি পারে তো সেই একজন। নিরিবিলি চাই একবার তাকে। সুভদ্রা ছটফট করছে, নিজের খুশিমতো সাহেব বাইটার ঘরে আসবে, ততক্ষণ সবুর মানে না। আসে ইদানীং মুরারির সঙ্গে ব্যূহরচনা করে, সুভদ্রা যাতে নাগাল না পায়। দিনমানে পাওয়া যাবে না, জানা আছে। রাত্রির অন্ধকারে বউমানুষ একলা বেরিয়ে পড়ল। যেতে হয় তো চলে যাবে, পাটোয়ার-বাড়ি অবধি, সেইখানে আচমকা গ্রেপ্তার করবে।

সাহেবের সেই বাড়ি বাড়ি উঁকিঝুঁকি দিয়ে বেড়ানোর কাজ। এ জিনিস বরাবর বজায় রেখে যেতে হবে। মোড় ঘুরে দেখে সুভদ্রা বউ। যেন পাতাল ফুঁড়ে সুভদ্রা বউয়ের আবির্ভাব। সাহেবের একখানা হাত মুঠো করে সে জড়িয়ে ধরে: চুড়জোড়া কাল রাত্রে চুরি হয়ে গেছে। কে নিয়েছে তা-ও জানি।

সাহেব হকচকিয়ে যায়। চোর ধরে হাতে যেন হাতকড়ি পরিয়েছে। কণ্ঠে জোর নেই, কোনরকমে বলল, কে ?

আবার কে! অন্তর্জলীর মুখে এসেও স্বভাব গেল না। নিজে যা আদর করে হাতে পরিয়ে দিয়েছিল, তাই আবার করল। দিয়ে নিলে কালীঘাটের কুকুর হয়—তাই আছে ওর কপালে। গুরুজন, মান্য ব্যক্তি—আমি কিছু বলব না। কিন্তু ফিরে জন্মে বাসি বাইটা কুকুর হয়ে আধ-হাত জিভ মেলে রাস্তায় রাস্তায় হা-হা করবে। করতেই হবে।—অন্যায়ের এমনি এমনি শোধ যাবে না।

মুখের কাছে মুখ এনে কাতর দুই চোখ মেলে সুভদ্রা বলে, তুমি উদ্ধার করে দাও ঠাকুরপো।

সর্বরক্ষে বাবা, দোষ বাইটার ঘাড়ে গিয়ে পড়েছে।

অবাক হয়ে সাহেব সুভদ্রার কথারই পুনরাবৃত্তি করে ঃ উদ্ধার আমি করব ?

কেউ যদি করে দেয়, সে তুমি। আর কাকে বলব ? সুভদ্রা কেঁদে পড়ল ঃ বাড়ির মধ্যে সকলের সব আছে, আমার কি আছে বলো ? ভাসুরের কথা সেদিন নিজের কানে শুনলে—বন্দোবস্ত ঠিক করে রেখেছে, যেদিন ইচ্ছে বাড়ি থেকে দূর-দূর করে তাড়াবে। স্বামী থেকেও নেই। গ্রীষ্মের ছুটিতে আসছে তো বাড়ি—দেখো কী অবস্থা। ঘরে যেন জল-বিছুটি মারে, ছটফট করবে—কখন পালাই, কখন পালাই। কিছু নেই আমার ভাই—থাকবার মধ্যে গয়না দু-চারখানা। দুর্দিনের সম্বল। ছেলেপুলে নেই, গয়না নেড়েচেড়ে দিন কাটে। তার মধ্যে সেরা জিনিসটাই চলে গেল আমার।

মুকুন্দ আসছে, নতুন খবর সাহেবের কাছে। বলে, বাড়ি আসছেন ছোড়দা ?

আসছে বাগানের আম খেতে। নিজের হাতে পোঁতা কলমের গাছে এবারে আম ফলেছে। এককালে বাগ-বাগিচার শখ ছিল—গাছের উপর বড় দরদ। আর এই যে এক অবলা মেয়েমানুষ, বাপ-মা নেই, ভাই নেই, দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর—

কি বলতে চেয়েছিল সুভদ্রা, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে কথা শেষ করতে পারে না। টপটপ করে চোখের জল পড়ছে। দু-চার ফোঁটা সাহেবের হাতের উপর পড়ল।

একটু সামলে আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে বলে, ছুটিছাটায় আসে কখনো-সখনো। কিছু যদি বলতে গিয়েছি—লজ্জার কথা কী বলি ঠাকুরপো, বলতে গেলেই জবাব হল ঃ ভগবানের নাম করো, ক'দিনের তরে জীবন! বর-বউ এক খাটে পাশাপাশি শুয়েছি, তার মধ্যেও ভগবান। সেখানেও পাঠের আসর। বারো মাস বাইরে পড়ে থাকে, সে একরকম—এসে পড়ে আরও উৎপাত বাড়ায়। আসবে-আসবে যত শুনছি, আমার ভয় ধরে যাচ্ছে। শত্রু হাসবে, সেজন্য আলাদা থাকতে পারিনে। উল্টে এমন দেখাই, ভালবাসায় গলে গলে পড়ছি যেন। হিংসেয় যাতে লোকে জ্বলে-পুড়ে মরে আমার সুখ দেখে।

কী ঝোঁক চেপেছে, সুভদ্রা-বউ অনর্গল বকে যাচ্ছে। সাহেব আচ্ছন্ন হয়ে শোনে। হঠাৎ এক সময় সম্বিত ফিরে পেয়ে সুভদ্রা আগের কথায় চলে যায় ঃ যাকগে ভাই। ও-মানুষের কথা কেন, আমারই বা হ্যাংলামি কিসের ? তোমায় যা বললাম—ঘরের বউ যার জন্যে এই রাত্তিরে ছুটে এসেছি, লোকলজ্জার ভয় করিনি। আমার হাতের জিনিসটা—

যে হাতে গিয়ে পড়েছে বোঝেন তো বউঠান, বড্ড কঠিন ঠাঁই।

একটু ভূমিকা। সাহেব আরও বলতে যাচ্ছিল, সুভদ্রা কানে না নিয়ে এক কথায় ঘুরে দাঁড়াল। চলে যাবার উপক্রম।

সাহেব অবাক হয়ে বলে, কি হল ?

নিশ্বাস ছেড়ে সুভদ্রা বলে, ঠিক কথাই বলেছ ঠাকুরপো। কঠিন ঠাঁই। বিদেশি মানুষ, তোমার আর কী ক্ষমতা! বাইটার সঙ্গে কোনদিন কেউ পারে নি।

ওর ছেলের আশা অনেক দিন ছেড়েছি, ওর ঐ গয়নার আশাও ছাড়লাম।

মুকুন্দর কথা বলতে বলতে বউ এখন আলাদা একজন যেন : উদাস কণ্ঠস্বর। এত টান গয়নার উপর—তা ও বুঝি লোপ পেয়ে গেছে। অন্ধকার নিঃশব্দ এক-ছায়ামূর্তি ফিরে চলল।

সুভদ্রা জানে না—সাহেবও যাচ্ছে পিছু পিছু। চোখের জল হাতের উপর পড়েছিল—বউয়ের সেই কান্না চামড়া ভেদ করে শিরায় শিরায় বয়ে চলেছে। মিথ্যে তুই লড়াই করে মরিস সাহেব, মন্দ হওয়া তোর ললাটে নেই।

হঠাৎ সাহেব কথা বলে ওঠে—সেই যেমন পচা বাইটাকে বলেছিল : চুড় পাবেন আপনি বউঠান। আমি দায়ী রইলাম।

সুভদ্রা ফিরে তাকাল। সাহেব তখন নেই। ঝোপেঝাড়ে জোনাকির ঝাঁক ঝিকমিক করছে। দেবতার মতন বর দিয়ে সাহেব অদৃশ্য। অপথ-বিপথ ভেঙে তীরের বেগে বিস্তর দূরে গিয়ে পড়েছে। আপন মনে গজরাচ্ছে : ভেবেছ কি বউঠান! চুড়েই শোধ যাচ্ছে না। লোকের হাত ধরে কেঁদে কেঁদে না বেড়াতে পারো, তাই করে আমি ছাড়ব।

চৌদ্দ

কঠিন ঠাঁই—মিছে বলেনি সাহেব। চুড় কাল রাত্রেই পচার হাতে চলে গেছে। গুরুদক্ষিণা চুকিয়ে দিয়েছে, দিয়ে আর দাঁড়ায় নি। মোটামুটি নিয়মও তাই—কাজ সমাধা করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কর্মস্থল থেকে সরে পড়বে। পরে আসতে পার ভাবগতিক ভাল করে বুঝেসমঝে দেখার পর। বাইটার কাছে রোজ রাত্রে আসে—না এলে সন্দেহের কারণ ঘটতে পারে, সেই জন্যে যথারীতি আজও এসে উঠল।

পচাও অপেক্ষায় ছিল। পিঠে চাপড় মেরে বলে, বলিহারি বেটা! তুই আমার মান রাখলি। ছোটবউমা জেনে বসে আছে, কাজ আমারই। অপদার্থ ভাবত আমায় ইদানীং, গ্রাহ্যের মধ্যে আনত না। হারামজাদি আজকে এসে পায়ের গোড়ায় মাথা ঠোকে। তুই আমার নতুন ইজ্জত এনে দিলি বাবা।

সাহেব বলে, দক্ষিণান্ত হল, আশীর্বাদ দিয়ে দিন। আপনার শিক্ষার নিন্দে হবে, এমন কাজ কখনো যেন না করি।

মাথায় হাত রেখে পচা বাইটা বলে, একদিন তুই আমার অনেক উপর দিয়ে যাবি। একদিন কি বলি, এখনই তাই। ছোটবউমার গায়ের গয়না আনা আর বাঘিনীর কোলের বাচ্চা চুরি করে আনা একই জিনিস।

চুড় রেখেই সাহেব কাল চলে গিয়েছিল। সেই কথা পচা এখন তুলল। বাইরে কেউ ওত পেতে নেই—ইনিয়ে-বিনিয়ে কথাবার্তা। পচা বলে, ছায়ার সঙ্গে মিলে গিয়ে ছায়ার মতন নড়াচড়া—এক হাত পিছনে থেকেও মানুষটা টের পাচ্ছে না, মানুষ ঘুরছে-ফিরছে তুইও ঠিক-ঠিক সেই পরিমাণ ঘুরছিস—বড় শক্ত কাজ রে বাবা! চলন ষোলআনা রপ্ত না হলে হয় না। পাখির বুকের তলা

থেকে ডিম এনেছিলেন আমার গুরু, চেষ্টা করলে তুইও তা পারিস।

বাইটার পায়ে হাত দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে সাহেব বলে, আনব তাই। চলে যাবার আগে তা-ও দেখিয়ে যাব। আপনি আশীর্বাদ করুন।

আমি নরাধম পাপী মানুষ—শুনিই না দুটো-পাঁচটা ধর্মের কথা। ফাঁকতালে কিছু পুণ্যি হয়ে যাক, পাপের ভার কমুক।

রাত্রিবেলা বাড়ি বাড়ি কান পেতে বেড়ানো সাহেবের কাজ। গুরুর সেই নির্দেশ। শিক্ষার কখনো শেষ হয় না। কারিগরকে অন্তর্জলীতে নামিয়েছে, শ্মশানবন্ধুরা এসে বাঁশ ফাড়ছে, কড়ি-কলসি সংগ্রহ করছে—সেই একদণ্ডের পরমায়ুর মধ্যে হয়তো বা নতুন কিছু শিখে নেওয়া গেল। ইহলোকে কাজে না লাগুক, পরলোকে লাগতে পারে। হাসবেন না, হাসির কিছু নেই—সঠিক খবর কে দিতে পারে যে সিঁধকাঠি সেই লোকে একেবারে অনাবশ্যক?

অন্তর্যামী ভগবান আর সিঁধেল চোরে শুধুমাত্র পদ্ধতির তফাত। তিনি এক জায়গায় বসে থেকে দুনিয়ার খবর ধ্যানযোগে জেনে নেন, নড়াচড়া করতে হয় না। চোর এবাড়ি-সেবাড়ি ঘুরে ঘুরে খবর নেয়। দুধাল গাই গোয়ালে ফেরেনি বলে গৃহকর্তার হা-হুতাশ, দু-বিঘে ধান জমির দায়ে নায়েবকে পান খাওয়ানোর শলাপরামর্শ, হাঁদা মেয়েটার মাথা-ঘোরানোর মতলবে ঝানু ছোকরার গদগদ ভাব, মুমূর্ষুর শিয়রে আত্মজনের ফোঁত-ফোঁত করে কান্না, মাথার চতুর্দিকে কম্ফটার জড়িয়ে বিনা নিমন্ত্রণে কমকর্তার অজান্তে ভোজ খেয়ে আসার বাহাদুরি—এমনি সমস্ত শুনতে হয় নিত্যিদিন। আজকে মুখ বদলানো—উঁহু, কান বদলানো। অধ্যাত্মতত্ত্ব শোনা যাবে নিশিরাত্রে। অনেক কাল পরে বাড়ি এসে যুবতী রমণীর পাশে শুয়ে সংসার মায়াময়, জীবন অনিত্য—এবম্বিধ ভাল ভাল জ্ঞানের কথা।

মুকুন্দ মাস্টার গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি এসেছে। আশ্বিন মাসে পুজোর সময় এসেছিল, আর এখন এই বৈশাখের শেষে। কলমের গাছে নতুন আম ফলেছে। তাছাড়াও বুড়ো বাপ কবে আছে কবে নেই—এমনিতরো অবস্থা। পাপী বাপ হলেও আসতে হয়। সাহেবও অতএব কানাচের মানকচু-বনের কালাচাঁদ হয়ে কান পেতেছে। চোর না-ই বা বললেন আজকের দিনে—মুকুন্দ হল ছোড়দা, সুভদ্রা বউঠান, দেওর হয়ে পাতান দিয়েছে জানলার পাশে। সুভদ্রা বলেছিল, দুয়ের মাঝখানটায় ভগবান এসে পড়ে নাকি ভণ্ডুল ঘটান, দম্পতির শয্যায় পাঠের আসর বসে যায় ফুলহাটার ইস্কুল-বাড়ির মতো। সত্যি-মিথ্যে জানা যাবে এইবার। ফিসফিসানির একটি কণিকাও কান ফসকে বাদ পড়তে দেবে না।

ঘরে এলো সুভদ্রা। কাপড় ছাড়ল, চুলের বিনুনিটা খুলে দিল। বারাণ্ডায় গিয়ে ঘটির জলে মুখ-হাত-পা ধুয়ে আসে একবার। একটি কথা নেই। অন্য

দিন একলা শোয়, আজকেও যেন ঠিক তেমনি—ঘরে দ্বিতীয় মানুষ আছে বোঝবার উপায় নেই। বউ মান করেছে, তা ছোড়দা তুমিই বলো না গো মানভঞ্জনের একটা-দুটো মধুর বচন। সেই মানুষই বটে! দুই বোবার ঘরবসত, হয়েছে বেশ। কদিন ধরে খুব বৃষ্টি হয়ে গেল—ছিনেজোঁক বেরিয়েছে। সাহেবের গায়ে কত গণ্ডা লেগেছে ঠিক কি! মিছামিছি এই ভোগান্তি।

অকস্মাৎ চমকে ওঠে। কথা ফুটেছে মুখে। ভূমিকা মাত্র না করে সুভদ্রা বলে উঠল, লেখাপড়া শিখে ইস্কুলের ঐ পোড়া কাজ নিয়ে আছ কেমন করে তুমি?

দীর্ঘ অদর্শনের পর যুবতী নারীর প্রথম স্বামী-সম্ভাষণ। বলে, ইস্কুলের মুখে নুড়ো জেবলে বাড়ি চলে এসো।

মুকুন্দর মৃদুকণ্ঠ ঃ এসে?

হাটবাজার কর। জনমজুর খাটাও।

হাটবাজারে লেখাপড়া লাগে না। যদি কিছু লাগে সে ঐ ইস্কুলের কাজেই।

লেখাপড়াও তাহলে চুলোর আগুনে দিয়ে এসো।

জজসাহেবের রায়ের মতন অসংকোচ দ্বিধাহীন। পচা বাইটারও অবিকল এই কথা—দেখা যাচ্ছে, একটা ব্যাপারে অন্তত শ্বশুরে-বউয়ে মতদ্বৈধ নেই। ছেলে ইস্কুলে পাঠিয়ে ভুল করেছে, পচা শতকণ্ঠে স্বীকার করে। উপায় থাকলে পেটের বিদ্যা উগরে বের করে দিত। সুভদ্রাও সেই কাজে পরমানন্দে যোগ দিত শ্বশুরের সঙ্গে।

বেচারি মুকুন্দর দশা দেখে সাহেবও এখন তাদের সঙ্গে একমত। লেখাপড়া অতি পাজি জিনিস—মানুষের ভিতরে পদার্থ রাখে না। মিনমিনে মেনি-বিড়াল করে দেয়। মুরারি লেখাপড়ার ধার ধারে না, সে কারণে পুরুষসিংহ হয়ে বিচরণ করে। পান থেকে চুন খসুক তো একটুখানি, হুংকারে বাড়ি সচকিত করবে। স্বামীর আতঙ্কে বড়বউ থরহরি কম্পমান। কম্পনের রীতিমতো হেতু আছে—এতগুলো সন্তানের জননী এবং বাড়ির গৃহিণী হওয়া সত্ত্বেও মুরারি সর্বসমক্ষে পায়ের চটি খুলে পটাপট ঘা বসিয়ে দেয়, দৃকপাত করে না। আর সেই মুরারির সহোদর ভাই মুকুন্দ আকৈশোর চোখের উপর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখেও বউয়ের পাশে যেন ফৌজদারি মামলার আসামি।

সুভদ্রা গর্জন করছে ঃ ঝাড়ু মারি তোমার বিদ্যের মুখে। বট্‌ঠাকুরের কী লেখাপড়া, কিন্তু তোমার মতন বিদ্বান ভাইকে শতেক বার বেচতে-কিনতে পারেন। জাঁক করে গলা ফাটিয়ে বলেনও তাই—

গলা ভিজে আসে পরক্ষণে। গর্জনের পর বৃষ্টি নামে বুঝি। বলে, বলাবলির কি, কাজেও তো তাই। আমাদের অংশের জমাজমি নিলামে তুলে কিনে নিয়েছে। কে দেখছে! এর পরে দুয়োরে দুয়োরে ভিক্ষে করা ভাগ্যে আছে আমার।

মুকুন্দ আগের কথাটার জবাব দিল এতক্ষণে ঃ দাদার মাইনে কত জান?

আমার অর্ধেকেরও কম। দশ টাকা।

হোক দশ টাকা। দুহাত ভরে রমারম খরচ করে যাচ্ছেন, দশজনে কত মান্য গণ্য করে।

মুকুন্দ বলে যাচ্ছে, সেই মাইনেও মাসে মাসে নয়—চৈত্র মাসে সালতামামির সময় একেবারে বারো দশকে এক'শ বিশ টাকা নিয়ে নেন। খুচরো খুচরো নিজেই নিতে চান না।

সুভদ্রা বলে, জমে থাকে। একসঙ্গে ভারী হলে কাজে লাগানো যায়। কী দরকার, মাইনেও ছাড়াও কত রকমের রোজগার! তোমার মতন নয় যে গোণা-গুণতি পঁচিশের উপর একখানা সিকিও নয়। তা-ও তো শুনি পুরোপুরি দেয় না।

মুকুন্দ বলে, সে রোজগার হল চুরির। কিন্তু হয়েছে কি বল তো—চুরির কাজে তোমার যে বড় ঘৃণা!

সে ঘৃণা এখনো। ওকে চুরি বলে না, উপরি। কেউ তার জন্য চোর বলে না।

ঘৃণা চুরির উপরে নয় তবে, চোর নামটার উপরে?

এই কথায় সুভদ্রা ক্ষেপে গেল: শ্বশুর গুরুজন, পায়ে মাথা রেখে শতেক-বার প্রণাম করি। তবু সিঁধেল-চোর ছাড়া তিনি কিছু নন। তাঁর বেটা হয়ে তোমার এত শুচিবাই কেন জিজ্ঞাসা করি। বট্‌ঠাকুরের একটা নখের যোগ্যতা তোমার নেই, মুখের শুধু বড় বড় বুকনি।

কণ্ঠ কান্নায় ভারি হয়ে আসে: বড়গিন্নি দেমাকে মটমট করে। ইচ্ছাসুখে খরচ করছে—হবে না কেন? ছেলেপুলের জামা-জুতো এক থাকতে আর কিনে দেয়। ঘরের দুধ আছে, তার উপর নগদ পয়সায় আলাদা দুধ যোগান করেছে। রাতদিন গণ্ডেগণ্ডে গিলিয়ে এমন করেছে, কোন বাচ্চার পেটের অসুখ ছাড়ে না।

আমাদের যা-ই হোক সে ভাবনা নেই। দেবা-দেবী দু-জনা—খরচটা কিসের!

কথা ক'টি মুকুন্দর মুখ দিয়ে বেরিয়েছে কি না বেরিয়েছে—তার যাবে কোথা? আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে: ঐ বুঝেই তো ছেলেপুলে এলো না। তারা দেবতা, আকাশের উপর থেকে দেখতে পায়। আমার কোলে আসবে কি না খেয়ে শুকিয়ে পাকাটি হয়ে মরে যেতে?

রণ-দুন্দুভি। এর পরে আর না জমে যায় কোথায়? দ্বৈরথ সমরের কথা পুঁথি-পুরাণে শোনা যায়, সে বোধহয় এই বস্তু। সে এমন, কাঠের পুতুলেরও বুঝি নড়েচড়ে উঠতে হয়। বিদ্যা-শিক্ষা সত্ত্বেও মুকুন্দ একেবারে পুতুল নয়। অসহ্য হয়ে এক সময় তড়াক করে উঠে পড়ল। দরজা খুলছে।

সুভদ্রা হুংকার দিল: যাচ্ছ কোথা শুনি?

ঢেঁকিশালে কি গোয়ালে—কোন্‌খানে ঠাঁই হয় দেখি। বিস্তর পথ হেঁটে এসেছি, কষ্ট হয়েছে, না ঘুমোলে মারা পড়ব।

খিল-হুড়কো খুলে মুকুন্দ কবাট টেনে দেখে, বাইরে থেকে শিকল দেওয়া।

সুভদ্রা বলে, ধাক্কাধাক্কি করে কেলেঙ্কারি বাড়িও না। যথেষ্ট হয়েছে, শুয়ে পড়ো এসে।

কেলেঙ্কারির ভয়েই বোধহয় সুভদ্রার গলা অনেকখানি খাদে নেমে এসেছে। বলে, রাগের পুরুষ অনেক রাগ দেখিয়েছ, শোও দিকি এবারে।

দরজায় শিকল দিয়ে গেছে—আবার কে, সাহেব ছাড়া? লড়াই কতক্ষণ চলে ঠিক-ঠিকানা নেই—শিকল দিয়ে ইতিমধ্যে সে নিত্যকার রোঁদে বেরিয়েছে। থাকুক এক খাঁচায় বন্দী হয়ে। লড়াইটা প্রায় এখন একতরফা, এই বড় ভরসা। সুভদ্রা যতই হোক দুর্বলা নারী, খুব বেশিক্ষণ দম রাখতে পারবে না। সাহেব আবার ঘুরে এসে দেখবে।

রাতদুপুরে শিয়াল ডেকে গেল, সেই সময় সাহেব পুনশ্চ মানকচু-বনে। কলহ নয়, এখন কথাবার্তা। মুকুন্দর গলা প্রথম কানে আসে: চঞ্চল হয়ো না ভদ্রা, ধর্মপথে থাক, মঙ্গল সুনিশ্চিত।

সুভদ্রা বলে, আছি তো। পোড়া ধর্ম চোখে দেখে কই? মঙ্গল না ঘোড়ার ডিম! বয়স চলে যায়, সাধআহ্লাদের দেখা পেলাম না কিছু জীবনে।

মুকুন্দ প্রবোধ দেয়: পাবে। সৎকর্মের ফল মিলবেই। এ জীবনে না হল তো পরজন্মে—,

সুভদ্রা-বউ ক্ষেপে গিয়ে বলে, আমি পরজন্ম মানি নে—

মুকুন্দ বলে, নাস্তিকের কথা বলছ যে ভদ্রা।

সাহেব শুনে যাচ্ছে জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে। চোর হয়ে শুনছে সে—চোরের আর মড়ার কথা বলার উপায় নেই। নয়তো চিৎকার করে বলাধিকারীর কয়েকটা কথা শুনিয়ে দিত: পরজন্ম মানে যারা গাড়োল—নিতান্ত অপদার্থ যারা। এ জীবনে কিছুই পেলো না তো কোন এক আন্দাজি ভবিষ্যতের আশ্বাস খোঁজে। কল্পনায় এক সর্বময় বিধাতা বানিয়ে নিজের অক্ষমতার দায় সেই কর্তার উপর চাপিয়ে দেয়।

সুভদ্রা বলছে, ধনদৌলত সুখ-শান্তি যশ মান সাধুভাবে হবার জো নেই আজকাল।

হতে পারে খানিকটা সত্যি। মুকুন্দর কণ্ঠ হাহাকারের মতো শোনাচ্ছে: কিন্তু মিথ্যাকে মেনে নিয়ে হাত-পা ছেড়ে যদি বসি, মানুষের উপায় তবে কি রইল?

উপায়ও বলাধিকারী বলেছেন। কাল আলাদা তো মাপের কাঠিও কেন বদলাবে না? পাপ-পুণ্য উল্টে-পাল্টে ফেল। সেকালে যেটা পাপ ছিল, আজকের সেটা পুণ্য। পুরানো পুণ্যকে তেমনি ধরে নাও পাপ। যত গোলযোগ চুকেবুকে যাবে।

মোটের উপর সাহেব যা ভেবে চলে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখে ঠিক ঠিক তাই। তখনকার ব্যাঘ্র গর্জন সম্প্রতি বিড়ালের মিউমিউয়ে দাঁড়িয়েছে। পাপপুণ্য ধর্মাধর্মের বিচার চলছে। সবুর করো, আরও নামবে। দুটো প্রাণ মজে গিয়ে

সানাইয়ের সুর বেরুবে দেখো। সবুর করো আরও খানিক।

পরমানন্দে সাহেব আবার টহল দিতে বেরুল।

ফিরে এলো ভোররাত্রি তখন, আকাশে শুকতারা জ্বলজ্বল করছে। মৃদু কণ্ঠগুঞ্জন—কান খাড়া করে থাকতে হয় দস্তুরমতো। কী কাণ্ড রে বাবা—পলকমাত্র ঘুমোয় নি। এই যে বলছিলে মাণ্টারমশায়, পথ হেঁটে কণ্ট হয়েছে, ঘুমানোর দরকার। ছি-ছি, নতুন বিয়ের বরবউকে হার মানিয়ে দিলে তোমরা!

মুকুন্দ বলছে, আর বেশি দিন নয়, বাসা করে থাকব দুজনে। সুবিধামতো একটা বাড়ির জোগাড় হলে হয়।

সুভদ্রা চপল কণ্ঠে বলে, যে সে বাড়ি নয়—তেমহলা অট্টালিকা চাই আমার জন্যে। আর গোটাকুড়িক দাস-দাসী। বাড়ি শুধু নয়, দাস-দাসীরও জোগাড় দেখো।

মুকুন্দ বলে, ঠাট্টা করছ ভদ্রা। সঙ্গতি নেই বলে মনে বড় লাগে! তবে পড়ানোয় নামযশ হয়েছে, টুইশানি পাব। ইস্কুলের পঁচিশ টাকার উপর সকাল সন্ধ্যা দু বেলার টুইশানিতে আরও বিশ-পঁচিশ এসে যাবে।

সুভদ্রা গাঢ় স্বরে বলে, না। সারাদিনের খাটনির পর রাত্রে আবার বাড়ি বাড়ি টুইশানি করে বেড়াবে, আমি তা হতে দেবো না। পাঠের আসর বসবে তখন। এক-গাঁ মানুষ জুটিয়ে নয়—সে আসরে আমি একলা। তোমার মুখে ধর্মকথা একা একা শুনব। পঁচিশ টাকা তো বাঁধা আছে, তার উপর পাঁচ-দশ হলে রাজার হালে চলে যাবে। না হলেই বা কি! দু-জনের একলা সংসার—খরচটা কিসের?

পথে এসো বাছাধনেরা! যা চেয়েছিল, ষোলআনাই তবে মিলে গেল। ভোর হয়ে আসে, পাখপাখালি ডাকছে। খুট করে দরজার শিকল খুলে দিয়ে সাহেব উল্লাসে লাফাতে লাফাতে পাটোয়ার-বাড়ির বাসায় চলল এবার। আর কাজ নেই, নিশ্চিন্তে এবার শুয়ে পড়বে।

ভাবতে ভাল লাগে, কোন এক কৌতুকী দেবতা সকলের অলক্ষ্যে নিশুতি রাতে হানা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। সৃষ্টিসংসার-জোড়া ছেলেমেয়ে—চোখের জল মুছে হাসি ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন ঘরে ঘরে। রাত পোহালে কে কোথায় ধরে ফেলে—তাড়াতাড়ি বৈকুণ্ঠে ফিরলেন দিনমানে এসে পড়বার আগে।

আজগুবি অলীক ভাবনা আমার! দেবতা তো ক্ষীরোদ-সমুদ্রে শীতল পদ্মপত্রের শয্যায় আরামের ঘুম ঘুমাচ্ছেন। এক অভাগিনী গ্রামবধূ এবং ততোধিক অভাগ্য ধার্মিক স্বামীটির জন্য কারো যদি নিশ্বাস পড়ে থাকে—ত্রিলোক-বিধাতা ভগবান নারায়ণ নন তিনি, নিশির কুটুম এক চোর।

শিক্ষানুবিশী শেষ। দক্ষিণান্ত হয়ে গেছে, গুরু প্রসন্ন। পাখির বুকের তলা থেকে ডিম চুরি করে এনে দেখাবে সাহেব—সেটা হল বাহাদুরি, ওস্তাদ বাইটার

তাক লাগিয়ে দেওয়া। তার আগে—এখনই সাহেব কাঠির পুরো হকদার।

হুকো টানছে পচা বাইটা। জোরে এক সুখটান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলে, আজকাল যে-না সেই কাঠি ধরছে, গুরুর হুকুম নিয়ে ধরে কজনা ? আমার ওস্তাদ নতুন কাঠি হাতে তুলে দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, বাইটা বলে ডাকলেন। বাপ-পিতামহের বর্ধন গিয়ে বাইটা হলাম সেইক্ষণ থেকে। সারাজন্ম বুক ফুলিয়ে বাইটা পরিচয় দিয়ে এসেছি।

নীতিনিয়ম মেনে ওস্তাদের আশীর্বাদ নিয়ে কাঠি ধরলে অসাধ্যসাধন করা যায়। আজকালকার দিনে কেউ বড় মানে না, সেকালে অক্ষরে অক্ষরে মানত। কাঁচা কাজ কারবার সেই জন্য চতুর্দিকে—চুরি কি ডাকাতি তফাত করা যায় না। সিঁধের গর্তে পা দুটো না ছোঁয়াতেই, এমন তো হামেশাই ঘটে, এক গণ্ডা লোক কারিগরের ঘাড়ে চেপে পড়ল। অথবা সারারাত ভূতের খাটনি খেটে কারিগর নিয়ে এলো একটা ফুটো ঘটি আর খান দুই-তিন ছেঁড়া কাপড়। সেকালে এমন হত না।

বাইটা বলে, কমসে-কম তিরিশ বছর ঘোরাফেরা করছে ঐ গুরুপদ। ভক্তি আছে খুব—মুখ ফুটে বলতে হয় না, হাঁ করলেই ছুটে এসে পড়ে। কাঠির কথা সে-ও বলে মাঝে মাঝে। আরে বাপু, ও জিনিস খাতিরে হয় না—এলেম দেখিয়ে আদায় করতে হয়ঃ গুরুপদকে দিইনি, আপন নাতি বংশীকেও দিতে পারলাম না। তুই সাহেব ক'দিন এসে নিজের জোরে আদায় করে নিচ্ছিস। হাতে ধরে তোকে দিয়ে দেবো। গুরুপদকে আজ আসতে বলেছি। ছটফট করিসনে, বোস একটু। সে এসে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, কাঠির বায়না দিয়ে আসবি।

ফড়ফড় করে তামাক টানে কিছুক্ষণ। হুঁকো থেকে মুখ তুলে প্রশ্ন করে, কোন্ মুলুকে কাজ ধরবি, ভেবেছিস কিছু ? ডাঙা-রাজ্যে দেশেঘরে ফিরে যাবি, না এখানে ?

সাহেব বলে, বলাধিকারী বলে রেখেছেন, কাপ্তেন কেনা মল্লিকের দলে ঢুকিয়ে দেবেন।

মল্লিকের নামে বুড়ো ক্ষেপে যায়। আর একদিনের মতন কলকে ছুঁড়ে মারেই বা ! বলে, গাধার গাধা ওটা। চোর না ডাকাতও না—দোআঁসলা। কলাকৌশল জানে না, জানে কেবল মারধোর আর খুনোখুনি। মল্লিক আবার কারিগর নাকি ! গামছা বোনে, চট বোনে, মলমলে হাত দিতে ভয় পায়। বলুক দেখি কোন্ মিহি কাজটা করেছে জীবনে ! যত-কিছু শিখলি, ওর সঙ্গে ঘুরলে সব বরবাদ হয়ে যাবে।

আরও অনেক রাত্রে সাহেব গুরুপদর সঙ্গে সিঁধকাঠির বন্দোবস্তে বেরুল। অনেক দূরের গ্রাম, তিন-চার ক্রোশ তো বটেই। জলে নেমে খালই পার হতে

হল তিন-চারটা। পৌঁছুতে রাত্রি প্রায় শেষ।

গ্রামে ঢুকবার আগে থেকেই কানে আওয়াজ আসে—ঠনাঠন, ঠনাঠন। নেহাইর উপর লোহা পিটছে। সন্ধ্যারাত্রে খাওয়া সেরে একটুখানি বিশ্রাম নিয়ে রাত দুপুর থেকেই হাপর জ্বালিয়ে বসেছে! কাজের দস্তুর এই।

নবশাখ কর্মকার-শ্রেণীর এরা নয়। ঢোকরা। দা-কুড়ালও গড়ে—পেটের দায়ে গড়তে হয় বটে, কিন্তু নিরীহ কাজে উৎসাহ নেই। বন্দুক গড়ত এককালে এদের বাপঠাকুর্দারা। দেশি গাদা-বন্দুক ঘরে ঘরে তখন—গুলি হল জালের কাঠি। আর এদেরই কামারশালে বানানো ছররা। ইদানীং পুলিস কড়া হয়ে বিনি-পাশের বন্দুক রাখতে দেয় না। ঘরে ঘরে তল্লাসি করে বন্দুক বাজেয়াপ্ত করে, মালিককে জেলে নিয়ে পোরে। কত বন্দুক মাটির নিচে পুঁতে ফেলেছে পুলিসের ভয়ে—সে বন্দুক কোনদিন কাজে লাগানো চলবে না, খদ্দের হলেন তো মাটি থেকে তুলে বেচে দিতে পারে! কিন্তু বন্দুক মানেই তো বিপদ—পয়সা খরচা করে আপনিই বা কেন যাবেন বিপদ কিনতে? নতুন বন্দুক গড়া একেবারে অচল, পুরানো ভাল ভাল জিনিস মরচে ধরে লয় পাচ্ছে।

বন্দুক গড়ে না, কিন্তু সে জায়গায় আর এক লাভজনক ব্যবসা জমে উঠেছে। সিঁধকাঠি গড়ানো। মোটামুটি টাকা পাঁচেক নেবে উৎকৃষ্ট একখানা কাঠির জন্য। সিঁধকাঠির অর্ডার আসে—সে ভারি মজার ব্যাপার। চোরে কামারে সাক্ষাৎ নেই—সাক্ষাৎ হওয়া বিধি নয়। রেওয়াজটা চিরকাল ধরে চলে আসছে। এই যেমন কামারশালের পাশ কাটিয়ে সাহেব আর গুরুপদ নিবারণ ঢোকরার নাতি যুধিষ্ঠিরের বাড়ি গিয়ে উঠল। অত্যন্ত চুপিসারে—ঢোকরা-বাড়িতেই যেন এরা সিঁধ কাটবে। নিয়ম এই। বাড়ি চুপচাপ, যুধিষ্ঠিরের প্রৌঢ় বয়সের নতুন-বউ সাঁঝ লাগতে লাগতে রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে ঘরে গিয়ে দরজা দেয়। দরজার পাশে কুলুঙ্গি আছে দেখুন—ত্রিভুজাকৃতি ছোট্ট ফোকর! তার ভিতরে টাকা রেখে সরে পড়ুন আপনারা। রুপোর কাঁচা-টাকা, কাগজের নোট হলে হবে না। সকালবেলা দরজা খুলে যুধিষ্ঠিরের বউ সেই ফোকরে হাত দেবে সকলের আগে। পেয়ে গেল হয়তো পাঁচ টাকা। অথবা দশ টাকা একসঙ্গে—দু-খানা কাটির জন্য। ঠিক সাতদিনের দিন রাত্রিবেলা আবার এসে দেখবেন, নতুন-তৈরি চকচকে সিঁধকাঠি কুলুঙ্গির নিচে দেয়ালের গায়ে ঠেশান দেওয়া আছে আপনার জন্য। নিয়মের কখনো অন্যথা হবে না। চোরাই লাইনে যারা আছে, সত্যপথে তাদের কাজকারবার। শুধু এক থলেদার ছাড়া—কিছু বাজে লোক ঢুকে পড়ে থলেদার-সমাজের বদনাম করে দিয়েছে।

কাজ চুকিয়ে ফেরার পথে সাহেব ও গুরুপদ কামারশালের অদূরে অন্ধকারে থমকে দাঁড়ায়। চোখ মেলে চেয়ে দেখবারই বস্তু। ফুঁসছে হাপর, টানে টানে আগুন জ্বলে ওঠে। লোহারের কালোকোলো দেহের উপর লাল আগুন ঝিলিক খেলে যায়। প্রধান কারিগর যুধিষ্ঠির ডগমগে লোহা সাঁড়াশি দিয়ে একহাতে

নেহাইয়ের উপর ধরেছে, অন্য হাতে ছোট হাতুড়ির ঘায়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গড়নের রূপ দিচ্ছে। আর এক মরদ দু-হাতে প্রকাণ্ড হাতুড়ি তুলে সর্বশক্তিতে ঘা দিচ্ছে, অগ্নিবর্ণ লোহা তারা কেটে ছিটকে ছিটকে পড়ে। আরও কিছুদিন পরে কাঠির জন্য রৈ-রৈ পড়ে যাবে—দুর্গাপুজো অন্তে কাঠি নিয়ে দলে দলে বেরুবে। এত ফরমাস আসবে, মাল জুগিয়ে পারা যাবে না। কাজ তাই এগিয়ে রাখছে। এখন এই অবধি থাকল, টাকা হাতে পেয়ে বস্তুটা একটু আধটু পিটিয়ে উকো ঘষে ঝকঝকে করে দিলে হয়ে যাবে।

কামারশালা আরও কত। কিন্তু যুধিষ্ঠির ঢোকরার নামডাক সকলের বেশি। এই নাম পিতৃপুরুষ থেকে এসেছে, নিবারণ ঢোকরার আমল থেকে। খদ্দেরের অন্ত নেই। মাঝরাত্রি থেকে পহরবেলা অবধি সে নেহাই-হাপরের পাশে। কাজ ছেড়ে স্নান করে ফ্যানসাভাত খেয়ে ঘুমুবে। উঠবে সন্ধ্যার আগে। আরও একবার স্নান এবং তারপর গুরুভোজন। এতক্ষণে এইবারে একটু ফুরসত। বয়স কাটিয়ে যুধিষ্ঠির নতুন সাঙা করে এনেছে—বউয়ের সঙ্গে কথাবার্তা ফষ্টিনষ্টি কামারশালে কাজে বসবার আগ পর্যন্ত।

সাতদিনের দিন—ধৈর্য ধরতে পারে না আর সাহেব, সন্ধ্যা হতে না হতে কাঠি আনতে বেরুল। একা—গুরুপদর প্রয়োজন নেই। সঙ্গে থাকলে তার মন খারাপ হবে। সাঁঝ থেকে সকালের মধ্যে কোন এক সময়ে গেলেই হল। সিঁধকাঠি তৈরি হয়ে আছে।

রাজার হাতে রাজদণ্ড উঠেছে যেন। কী আনন্দ, কী আনন্দ! দুনিয়া জুড়ে রাজ্যপাট, দুনিয়ার মানুষ প্রজাপাটক। রাজদণ্ড হাতে যেখানে খুশি চলে যাবে, যে জিনিস ইচ্ছা তুলে নিয়ে আসবে। নিশাকালে নিশুতি রাজ্যের রাজা। দিনমানের রাজারা জাগ্রত মানুষের কাছে খাজনা-ট্যাক্স আদায় করে। এরা আদায়ে আসে সেই সব মানুষ ঘুমিয়ে পড়বার পর।

পনের

কাছারিবাড়ির পাশ দিয়ে সাহেব চলেছে, কানে এলো মুকুন্দর গলা। সুর করে মুকুন্দ রামায়ণ পাঠ করছে, ফুলহাটার ইস্কুলবাড়িতে করত যেমন। পথের উপর দাঁড়িয়ে সাহেব শোনে। পাইক-বরকন্দাজগুলোর অবিরত দৌড়ঝাঁপ এবং ক্ষেতেল প্রজাদের ব্যাপারি ডেকে যে-কোন মূল্যে গোলার ধান ছেড়ে দেওয়া—এই দুটোর ব্যাপারে কদিন থেকেই বোঝা যাচ্ছে, খোদ মালিক চৌধুরি-কর্তার মহালে শুভাগমন হয়েছে। মুরারির এখন নিশ্বাসটা ফেলার ফুরসত নেই। দিন-মানে বাড়ি যায় না, রাত্রেও যেতে পারে না সকল দিন। কাছারিবাড়ি পড়ে থাকে।

চৌধুরি-কর্তা এমনিই ধার্মিক লোক, তার উপর কিস্তির আদায়পত্র আশাতীত রকমের ভাল হওয়ায় ভগবানের উপর ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠেছেন। সারাদিনের

ঐহিক কাজকর্মে মন পঙ্কিল হয়, সন্ধ্যার পরে কিছু না কিছু সৎপ্রসঙ্গের ব্যবস্থা। দিন দুই-তিন ভাগবত পাঠ করে গেছেন দূর-গ্রাম থেকে এক অধ্যাপক এসে। হরি-সংকীর্তন কালী-কীর্তন এবং বালক-কীর্তনও হয়ে গেছে। মুরারি তখন ভাইয়ের নাম প্রস্তাব করে। ছুটিতে বাড়ি এসেছে—বড় সুন্দর পাঠ করে, বড় মিঠে গলা। মুকুন্দকে বলে-কয়ে সে-ই এনে বসিয়েছে।

অনেকদিন পরে শুনছে সাহেব। আহা-মরি প্রাণ কেড়ে নেয়। মুকুন্দ আজ বড্ড জমিয়েছে, ফুলহাটার চেয়েও চমৎকার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁহাতক পারা যায়। উরুতে বাঁধা সিঁধকাটি ঝোপের ভিতর সামাল করে রেখে সে কাছারিবাড়ি ঢুকে পড়ল। নিজের ইচ্ছায় ঢুকেছে তা বোধহয় না—পাঠের সুর টেনেহিঁচড়ে তাকে ভিতরে নিয়ে তুলল।

আসর কোথা? বাইরের লোক একজনও নয়—চৌধুরি-কর্তার সঙ্গে একত্র পাঠ শুনবে আবাদের প্রজাপাটকের মধ্যে এত বড় তাগদ কারো নেই। কাছারির লোকজন সব—জন আষ্টেক সর্বসাকুল্যে। জায়গাও অতি সংকীর্ণ। দক্ষিণ দিককার দাওয়াটা তক্তা ও কাঠকুটোয় বোঝাই—কিছু কাঠকুটো সরিয়ে দিয়ে ঘেঁসাঘেঁসি হয়ে সকলে বসেছে। দেওয়ালের গায়ে জলচৌকি পেতে মুকুন্দর বেদি। কেন্দ্রস্থলে চৌধুরী—স্থূলকায় বিশালবপু ব্যক্তি, জায়গার সিকি ভাগ একলাই তিনি দখল নিয়ে বসেছেন।

সাহেব সসঙ্কোচে সকলের পিছনে বসল। মুরারি চেয়ে চেয়ে দেখে। এই ছোঁড়াটার হয়ে ভাদ্রবধূ কলহ করেছিল, সে রাগ মনে গাঁথা আছে। ভীম সর্দারকে ইসারা করে দিল, ভীম এসে বলে, নেমে যাও—

কেন?

বাইরের কেউ থাকতে পাবে না, শুধু নিজেরা।

সাহেব শুনছে মুগ্ধ হয়ে। রসভঙ্গে বিরক্ত হয়ে বলে, আমিও বাইরের নই।

মকুন্দ তাকিয়ে পড়ল। হাসিমুখ, খুশি হয়েছে শ্রোতার মধ্যে সাহেবকে পেয়ে।

ঘাড় বাঁকিয়ে সাহেব মুকুন্দকে দেখিয়ে বলে, বাইরের মানুষ নই আমি। পাঠ করছেন, উনি আমার ছোড়দা। জিজ্ঞেস করে দেখ।

পাঠের আসন থেকে মুকুন্দ বলে ওঠে, ভক্তমানুষ—থাকুক না!

সামনে মুখ করে চৌধুরি-কর্তা শুনছিলেন। মুখ ফেরালেন তিনি। সাহেবকে দেখে দু-চোখে আর পলক পড়ে না। মুগ্ধ হয়ে দেখছেন। বলেন, কি হয়েছে, কি বলছ তোমরা? ছেলেটা কে?

আত্মসমর্থনে মুরারি তাড়াতাড়ি বলে, বলা নেই কওয়া নেই, হুট করে ঢুকে পড়ল—ওটা ইয়ে। মানে বাজে লোকের ভিড় হয়ে যাচ্ছে—

বলতে যাচ্ছিল, ওটা চোর—। ঠোঁটের উপর চেপে নিল। নিজের বাপ চোর, সেই কথা উঠে পড়তে পারে। মুখে না বললেও মনে মনে কি আর বলবে

না ? পিতৃ-কলঙ্কের দায়ে নিখরচার দুটো গালিগালাজও করবার জো নেই।

চৌধুরী-কর্তা বলেন, ভাল কথা শুনতে এসেছে, শুনুক না বসে বসে। আমাদের শোনা তাতে কম হয়ে যাবে নাকি ? বড্ড হিংসুটে বাপু তোমরা, কী রকম জড়সড় হয়ে আছে—এগিয়ে এসো ছোকরা, এইখানটা এসো বোসো।

কর্তা বসেছেন,—অদূরে মুরারি নায়েব—দুজনের মাঝের জায়গা দেখিয়ে দিলেন সাহেবকে। হাত ধরে টেনে বসালেন। লক্ষ্মণের শক্তিশেল পালা। শক্তিশেলে লক্ষ্মণ নিহত। তুমুল কান্নাকাটি শবদেহ ঘিরে।

জমেছে খুব, নম্র হয়ে সকলে শুনছে। চৌধুরী-কর্তা এক সময়ে চঞ্চল হয়ে নড়েচড়ে উঠলেন : ক'টা বাজল বল দিকি ?

খাজাঞ্চী সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হৈ করে ওঠে : সংক্ষেপে সারো মাস্টার। কর্তাবাবুর বাঁধা টাইমের খাওয়া। সাড়ে ন'টায়। নিয়মের মধ্যে আছেন বলেই, বলতে নেই, দেহখানা অটুট রয়েছে।

মুকুন্দ বিপন্ন মুখে তাকাল। আঃ—বলে চৌধুরি কর্তা খাজাঞ্চীকে নিরস্ত করেন : এ কি তোমার সেহা-কষচা—পান খাইয়ে খুশি করল তো বকেয়া-সুদ বাদ দিয়ে হিসাব সংক্ষপে করে দিলে। চারাগাছ বড় হবে, ফুলফল ধরবে—তার জন্যে সময় দিতে হবে বই কি ! চেপে খাটো করা যায় না এ জিনিস। কিন্তু আমি বলি কি মাস্টার—

চৌধুরী-কর্তার রায় শোনবার জন্য মুকুন্দ পাঠ বন্ধ করে তাকাল।

আমি বলছি ঠাকুর লক্ষ্মণ শেলবিদ্ধ হয়ে মরে আছেন, হনুমান পাঠিয়ে তড়িঘড়ি বিশল্যকরণী এনে প্রাণ পাইয়ে দাও। উঠে বসুন। তক্ষুনি কিছু আর রণে যেতে পারছেন না। শোক-টোক এখনো যাদের বাকি আছে, সেই সময়টা হতে পারবে। আমি এই ফাঁকে দুটো মুখে দিয়ে নেবো।

মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে মুকুন্দ বলে, যে আজ্ঞে।

কর্তামশায় কারণটাও বুঝিয়ে দিলেন : লক্ষ্মণ মরে রইলেন, সে অবস্থায় কেমন করে খেতে যাই বলো। খাওয়া যায় না, পাপ হয়। প্রাণটা সেজন্য আগে পাইয়ে দিতে বলছি। খাওয়াদাওয়া সেরে পরের কথা শুনব। বড্ড ভাল পাঠ হে তোমার।

মুরারির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বাজে কটা ?

ঘড়ি তো বেদির উপরে—

চৌধুরি কর্তাও তাই দেখেছেন। ঘড়ি মুকুন্দর পাশে ছিল, প্রয়োজন মতো সে সময় দেখবে। এখন আর দেখা যাচ্ছে না।

মুরারি ব্যাকুল হয়ে বলে, যে ঘড়িটা আপনি আমায় খেলাত দিলেন। কত দামের জিনিস—টাকার দামে বলছি নে। আপনি হাতে করে দিলেন, সে যে হীরে-জহরতের দাম—

চৌধুরী-কর্তা বলেন, টাকার দামেও ফেলনা নয়। কুরুভাইজার-ঘড়ি, বনেদি

জিনিস। জলচৌকির আশেপাশে পড়ে গেল কিনা দেখ।

ঠাকুর লক্ষ্মণ রইলেন আপাতত মৃত অবস্থায়। ঘড়ির জন্য খোঁজ খোঁজ পড়েছে তন্ন তন্ন করে দেখা হচ্ছে। নেই কোথাও।

অপমানে জ্বলছেন চৌধুরী কর্তা। তাঁর কাছারবাড়ি তাঁরই চোখের উপর জিনিসটা লোপাট। কিন্তু কণ্ঠস্বরে জ্বালার লেশমাত্র নেই। বলেন, সবাই ভাল লোক আমরা, চোর কেউ নই। মনের ভুলে নিয়ে নিতে পারি। পারি কেন নিয়েছি নিশ্চয় কেউ না কেউ। সকলে আমরা জামা কাপড়-চোপড় ঝেড়ে দেখিয়ে দেব ঘড়ি থাকলে বেরিয়ে পড়বে। আমি সকলের আগে—

হাঁ-হাঁ করে ওঠে সবাইঃ সে কী কথা। আপনি কেন, জিনিস তো আপনারই—

ততক্ষণে চৌধুরি-কর্তা উঠে দাঁড়িয়ে জামা খুলে নগ্নগাত্র হয়েছেন। তাই শুধু নয় মুরারির হাতখানা ধরে কোমরের চতুর্দিকে একবার ঘুরিয়ে দিলেনঃ আমার পকেট নেই, কোমরের গাঁটেও নেই। খুশি তো এবার? এক এক করে সকলে দেখিয়ে দাও।

খাজাঞ্চী উঠে দাঁড়িয়ে জামা খুলছে। মুরারি সাহেবের দিকে কটমট করে চেয়ে বলে, এর পরে তুই—

সাহেব ফিক করে হেসে ফেলেঃ আজ্ঞে না, আপনি। আপনি নায়েব মানুষ—মনিব মশায়ের পরেই আপনার পালা। উঁচু থেকে ক্রমে নেমে আসবে।

এমনি সময়ে এক কাণ্ড। জলচৌকির বেদি থেকে মুকুন্দ নেমে পড়েছে। দাওয়া থেকে উঠানে নামল।

ওকি, কোথায় চললে মাস্টার?

হুঁ—হুঁ, যাচ্ছি—অর্থহীন অস্পষ্ট কিছু বলে মুকুন্দ পা চালিয়ে দেয়।

চৌধুরী-কর্তা গর্জন করে ওঠেনঃ যেতে দিও না, নিয়ে এসো আমার সামনে। শিক্ষিত লোক, ইস্কুলের মাস্টার—ছি-ছি!

খাজাঞ্চী বলে, কোন, কোন বাপের বেটা, সেটা দেখবেন তো—

এইটুকু বলে ফেলেই জিভ কেটে চুপ হয়ে যায়। নায়েব মুরারি বর্ধনের বাপও যে সেইজন। চৌধুরি-কর্তা সদরে ফিরে গেলে মুরারিই-তো সর্বময়। হঠাৎ কি রকমে বেফাঁস কথা বেরিয়ে গেল।

ভীম সর্দার আর মহাদেব সিং দুই বরকন্দাজ দুটো হাত ধরে ফেলে হিড়হিড় করে মুকুন্দকে দাওয়ার উপর তুলল। একটু আগে বেদিতে বসে তন্ময় হয়ে পাঠ করছিল, চোর হয়ে সেইখানে এসে দাঁড়িয়েছে। কী লজ্জা, কী লজ্জা! লজ্জা কাছারির নায়েব মুরারীরও। ভাইয়ের পাঠের প্রসঙ্গ কর্তার কাছে সেই তুলেছিল। ভাবখানা হল—খাজনা আদায়ের ব্যাপারে আমার ক্ষমতা দেখেছ, ভাইয়ের মুখে পাঠ শোন একদিন। ধর্ম অর্থ দুই বর্গের ধুরন্ধর

আমরা দু-ভাই। এর ফলে বুড়ো মনিবের কাছে খাতিরটা বেশি হবে। কিন্তু বরবাদ সমস্ত। হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়াল।

মুকুন্দর গায়ে সাদা কামিজ, তার উপরে ছিটের হাত-কাটা ফতুয়া। বৈশাখের দিনেও সকলকে একটা-কিছু গায়ে রাখতে হয়েছে চৌধুরি-কর্তার সামনে নিতান্ত খালি গায়ে থাকা চলে না বলেই। কতক্ষণে বাড়ি ফিরে বোঝা নামাবে, সেই চিন্তা। আর মুকুন্দ মাস্টার দেখ ডবল চাপান দিয়ে এসেছে। ফতুয়ার সবগুলো বোতাম আঁটা। গোড়ায় এই নিয়ে ঠাট্টাতামাসা হয়েছিল একটু। এখন চোখ ঠারছে: বেশি জামা পরে কি এমনি? পরেছে পকেটের দরকারে। ঠাঁইয়ের অভাবে বমাল ফেলে না যেতে হয়।

চৌধুরি-কর্তা বললেন, জামা খুলে ফেল।

মুকুন্দ দুটো হাত ফতুয়ার উপর চেপে ধরে। বোতাম খুলতে দেবে না। কিছুতে না। এর পরে তিল পরিমাণ সংশয় থাকে না। চোরাই ঘড়ি রেখেছে ফতুয়ার নিচে কামিজের বুক-পকেটের ভিতর।

নিজে খুলছে না তো দুই বরকন্দাজকে হুকুম দিলেন চৌধুরি-কর্তা। মাস্টারি করে, ছেলেপুলে মানুষ করার ব্রত নিয়েছে, মুখে ধর্মের খই ফোটে। দয়ামায়া নেই এই সব ভণ্ডের উপর।

এতগুলি লোকের মধ্যে সাহেবই কেবল ছটফট করছে: কী আশ্চর্য, ছোড়দাকে এরা চোর বানাল! কিছুই জানেন না উনি, কিছু করেননি—

চৌধুরি-কর্তা চোখ পাকিয়ে পড়তে থতমত খেয়ে সাহেব থেমে যায়।

ভীম সর্দার মুকুন্দর হাত দুটো পিছনে নিয়ে সজোরে এঁটে ধরে আছে, মহাদেব পটপট করে ফতুয়ার বোতাম খুলছে। এর পরেই হাত ঢুকিয়ে দেবে সার্টের বুকপকেটে—

হরি, হরি! পকেট নেই যে। পকেট সুদ্ধ খাবলাখানেক কিসে যেন ছিঁড়ে খেয়েছে। জীর্ণ শতছিন্ন কামিজ—উপরে ফতুয়া চাপা থাকায় বোঝা যায় না। ডবল জামা পরার রহস্যটা মালুম হল এবার। শুধু ফতুয়া গায়ে ভদ্রসমাজে বিচরণ চলে না, আবার কামিজের মধ্যভাগ দেখতে দেওয়াও হাস্যকর। গ্রীষ্মের কষ্ট তুচ্ছ করে মানের দায়ে এই ডবল বোঝা চাপানো।

আর ঠিক এমনি সময়ে বিস্মিত মুরারি বলে, ঘড়িটা দেখছি আমারই পকেটে। কেমন করে এলো?

উড়তে উড়তে ঢুকে পড়েছে। বুড়ো চৌধুরি খিঁচিয়ে উঠলেন: মনের ভুলে নিজে পকেটে পুরে সবসুদ্ধ নাজেহাল করলে। ধার্মিক শিক্ষিত মানুষটাকে ডেকে নিয়ে এসে অপমানের একশেষ করলাম। এমন সুন্দর পাঠ একেবারে মাটি। খাওয়ারও দেরি হল—খাবোই না আজ আমি। উপোস করে অপরাধের খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত হোক।

মুরারি বেকুব হয়ে গিয়ে খাজাঞ্চীকে বলে, ঘড়ি কেমন করে পকেটে আসে

বুঝতে পারছিনে! নিজে আমি কখনো তুলিনি, অত ভুলো মন নয় আমার।

অবমানিত মুকুন্দর দু-চোখে টপটপ জল পড়ছে। ফতুয়া হাতে তুলে সাহেব বলে, পরে নাও ছোড়দা। সে-ই পরিয়ে বোতাম সমস্ত এঁটে দিল।

খাজাঞ্চী বলে, অমনধারা কেন করলে মাস্টার? ছুটে পালালে, জামা খুলতে দেবে না কিছুতে—তাতেই তো সন্দেহ দাঁড়াল।

মুকুন্দর চোখের জল, সাহেবের জামা পরানো—চৌধুরি-কর্তা এতক্ষণ নিঃশব্দে দেখে যাচ্ছিলেন। জবাবটা তিনিই দিলেন: এ ছাড়া আর কি করবে? পালানো সামান্য কথা—ছুটে গিয়ে কাছারির পুকুরে ঝাঁপ দিতেও পারত। যাক প্রাণ রোক মান। মানই তো আমাদের জামাকাপড়ে—তার বড় কি আছে? তুমি আমি চোর আমরা সকলেই, কাপড়চোপড় আর ভালো ভালো বকুনির বাহারে রেহাই পেয়ে যাই।

সকলের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে সাহেব এসে মুকুন্দর হাত ধরল: চলো ছোড়দা—

খাজাঞ্চী বলে ওঠে, পাঠ তো শেষ হয়নি।

চৌধুরী-কর্তা এবারও জবাব দেন: গলা দিয়ে বেরুবে না এখন পাঠ। গলাটা মানুষের কিনা, গ্রামোফোন-রেকর্ড হলে কথা ছিল না।

কিন্তু লক্ষ্মণ যে মরা অবস্থায় পড়ে রইলেন—

বেঁচে ওঠা ঠাকুরের অদৃষ্টে নেই। আমরাই বাঁচতে দিলাম না। ভারী গলায় চৌধুরি বলতে লাগলেন, ধিক্কার দিচ্ছি আমি নিজেকে। শঠ-তস্কর দেখে দেখে এমন হয়েছে, মানুষ বিশ্বাস করতে পারিনে। চোত-বোশেখে বছর বছর সোনাখালির মহালে আসি। কতকাল ধরে আসছি। মুকুন্দর জীবনের কোন খবর জানতে আমার বাকি নেই। আসল সময়ে তবু তাকে চোর ভেবে বসলাম।

মুকুন্দর দিকে চেয়ে বললেন, পাঠ শেষ হতে রাত্রি হবে—শুধু মুখে যেতে দেবো না বলে ব্যবস্থা রেখেছিলাম। কিন্তু কোন মুখে তোমায় খেতে বলি! খাবেই বা কেন? চলে যাও তুমি বাবা, আর আটকাব না।

মুকুন্দ আর সাহেব বেরিয়ে পড়ে। সাহেব বলে, দোষটা আমারই ছোড়দা, আমার দোষে তোমার হেনস্থা। খেলা করতে গিয়েছিলাম একটু। বড়দা একদিন বউঠানকে ট্যাঙস-ট্যাঙস করে শোনাল আমারই কারণে। সেই রাগ পোষা ছিল। ঘড়িটা তুলে মুঠোয় রেখেছিলাম, কায়দা বুঝে তারপর বড়দার পকেটে ফেললাম। অপদস্থ হবে সকলের সামনে। ভেবেছি চৌধুরির ঘড়ি, সামনের উপর জল-চৌকিতে তিনি রেখেছেন। আন্দাজ আমার মিছেও নয়। কিন্তু সে ঘড়ি বড়দাকে বখশিস দিয়েছেন, কেমন করে বুঝব।

নিশ্বাস ফেলে মুকুন্দ বলে, রক্ত কথা বলে, দেখলে তো সাহেব? চোরের বাড়ি বলে পৈতৃক ঘরবাড়ি ছেড়ে ভাগনে বংশীর কাছে উঠলাম, সেখানেও

কানাঘুষো। সব ছেড়ে ইস্কুলের শিক্ষক হয়ে আছি, যার চেয়ে ভাল কাজ হয় না। লোকের কিন্তু তবু ভাবতে আটকায় না।

সাহেব তিক্ত কণ্ঠে বলে, ভাববেই তো। নতুন অভিধানে কথার সব মানে পালটে গেছে—বলাধিকারী বলেন। শিক্ষক মানেই গরিব লোক। এ বাজারে গরিব হওয়া মানে মানুষটা এমন অপদার্থ, চোর হবারও ক্ষমতা নেই। চোর ভেবে তো সম্মানই করল তোমায়। তার উপরে সাধু নাম একটা আছে তোমার। সাধু মানেই ভণ্ড।

বর্ধন-বাড়ির উঠান অবধি সাহেব সঙ্গে এলো। মুকুন্দ বাড়ির ভিতর চলে যায়। পেঁৗছে দিয়ে নিশ্চিন্তে সাহেব বাসায় ফিরছে। পচা বাইটার ঘরে আজ আর ঢোকা হল না। সিঁধকাঠি সেই ঝোপের ভিতর পড়ে আছে, মুকুন্দর সামনে তুলে আনতে পারে নি। দাম দিয়ে কাঠি আনা হয়েছে এইমাত্র, সে কাঠি গুরু পচা বাইটা হাতে তুলে দেবে, আর ষড়ানন ও মা-কালীর দোহাই পেড়ে সাগরেদের বিজয় কামনা করবে। আজকে আর হল না—নিয়মরীতি কাল এসে সারবে। আসা-যাওয়ার অসুবিধা নেই এখন, দিনে রাত্রে যখন খুশি আসে। বিদায় নেবার আগে যত-কিছু জানবার যত-কিছু শোনবার জেনে-শুনে যাচ্ছে। সুভদ্রা-বউ আর ওত পেতে থাকে না, নিজের সুখ নিয়ে মজে আছে।

ঠিক দুপুরে বাতাসে যেন আগুনের হল্কা বয়ে যাচ্ছে। বাইটা-বাড়ি নিঝুম। যে যার ঘরে দরজা এঁটে পড়েছে। খাওয়ার পরে পচা বাইটাও একটু তক্তাপোশে গড়িয়ে পড়েছিল। ঘুম আসে না, তক্ষুনি আবার উঠল। তামাক সেজে নিয়ে চৌকির উপর বেড়া ঠেসান নিয়ে মেজেয় পা ছড়িয়ে আয়েশ করে বসে পড়েছে। কি মনে হল, একটা পা চৌকির তলায় ঢুকিয়ে দেয় খানিকটা। আলগা মাটি পায়ে ঠেকে, কী ব্যাপার! এবারে হাত ঢুকিয়ে দিল। ইঁদুরে মাটি তুলে ডাঁই করেছে—

হুঁকো ছুঁড়ে ফেলে পাগলের মতো মাটির মেজেয় বসে পড়ে এক ধাক্কায় চৌকিটা সরিয়ে দেয়। যা ভেবেছে—ইঁদুর নয়, চোর। চোর এসে সর্বনাশ করে গেছে। সুভদ্রার হাতের চুড় কৌটোসুদ্ধ এইখানে মাটির তলে পুঁতেছিল। খালি কৌটো গড়াচ্ছে একপাশে।

স্তম্ভিত হয়ে থাকে, নিজের চোখ দুটো যেন বিশ্বাস করতে পারে না। হায় রে বাইটা, এত ভোগান্তি ছিল তোমার কপালে! অন্তিম বয়সে অক্ষম অকর্মণ্য হয়ে পড়ে বিস্তর রকমে নাজেহাল হচ্ছে। কিন্তু এই লাঞ্ছনার সঙ্গে কোনকিছুর তুলনা হয় না।

বাকি দিনটুকু সেই এক জায়গায় একভাবে পচা বসে। মাথায় হাত দিয়ে আছে বসে একা একা। এমন বেঁচে থাকার কি লাভ? যমরাজের উদ্দেশে

কেবলই বলছে, পোড়া ঠাকুর, এদিকে পানে চোখ তুলে তোমার মহিষটা দাও ছুটিয়ে, উদ্ধার বরে নিয়ে যাও।

কাল দুপুরে সাহেব এসেছিল, অনেকক্ষণ থেকে তারপর কাঠি আনতে চলে গেল। কাঠি নিয়ে রাত্রিবেলা আসবার কথা। দেখা নেই সেই থেকে। পায়নি নাকি কাঠি? এমন হবার কথা নয়। আকাশে চন্দ্র-সূর্যের কাজের গাফিলতি হতে পারে, যুধিষ্ঠির ঢোকরার হবে না। এই নিয়েও খানিকটা চিন্তা। যাদের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ, রোজগারের ক্ষমতা পড়ে গিয়ে তারা সব পর হয়ে পড়েছে। সাহেবই এখন আপন মানুষ—দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র আপন। প্রতিক্ষণ সাহেবকে ভাবছে। সাহেবের কাছে না বলা পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই। না আসে তো নিজেই তার খোঁজে বেরুবে।

দিনের আলো থাকতে পথ হাঁটতে পারে না। বয়সকালে তবু কিছু পারত, বুড়ো হয়ে এখন একেবারেই না। দিনমানের কড়া রোদে চোখ ঝলসে দেয়, মাটির পথ জলা জায়গা বলে ঠেকে। রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি খুলে যায়—বাদুড়-পেঁচা-চামচিকের যে দস্তুর।

সন্ধ্যা গড়িয়ে পড়ল। কষ্ট হচ্ছে বিষম। কী আশ্চর্য, পা দুটো জড়িয়ে আসে। অপমানের আঘাতে একটা দিনের মধ্যেই আধাআধি মৃত্যু হয়েছে যেন। বেড়া থেকে একটা বাঁশের খোঁটা খুলে নিয়ে লাঠির মতন ভর দিয়ে চলে। বুড়ো বাইটা লাঠি ঠুক-ঠুক করে যাচ্ছে—হায় রে হায়, উড়ন-তুবড়ির মতো যে মানুষ একদিন জলে-ডাঙায় ঝিলিক দিয়ে বেড়িয়েছে।

খানিকটা দূর গিয়ে বড্ড হাঁপ ধরে গেছে। পথের ধারে দূর্বাবন পেয়ে গড়িয়ে পড়ল তার উপরে। কে মানুষটা আসে? যার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে সে-ই। সাহেব। সাহেব, তুই এসে গেছিস বাবা? মা-কালীকে ডাকছি, তোকে তিনি এই পথে খেদিয়ে নিয়ে এলেন। আমায় বেশি কষ্ট করতে হল না।

সাহেব বসে পড়ে বাইটার মাথা কোলের উপর তুলে নিল।

তোরই খোঁজে যাচ্ছিলাম রে সাহেব। আজকে আমার বুক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

সাহেব কিন্তু মুচকি হেসে বলে, কেন ওস্তাদ?

আমি আর বেঁচে নেই এখন, মরে গেছি। নিশ্চয় মরেছি। বুকে একটা ধুকপুকানি থাকলেই বেঁচে থাকা হয় না রে। বাইটা জ্যান্ত থাকলে নজরের সুমুখ দিয়ে কখনো জিনিস পাচার হতে পারত না।

দম নিয়ে পচা আবার বলতে লাগল, মেজের মাটি খুঁড়ে ছোটবউমার সেই গয়না নিয়ে গেছে, তুই যা আমায় গুরুদক্ষিণা দিয়ে এলি। রাতে আমি ঘুমুইনে, কাজ না থাকলেও ঘুম আসে না। খানিক খানিক চোখ বুজে ঝিম হয়ে থাকি, কিন্তু কুটোগাছটি নড়লে টের পেয়ে যাই। চিরকালের গরব আজ ভেঙে গেল সাহেব।

কেঁদে ফেলবে যেন বুড়ো, গলার স্বর তেমনি। সাহেব বলে, কাজ রাত্রি-বেলা হয়নি ওস্তাদ। তা হলে কানে পড়ে যেত। দিনমানের কাজ—

পচা বাইটা তীক্ষ্ন চোখে তাকিয়ে পড়ে: বলিস কি রে ?

সাহেব এক সুরে বলে যাচ্ছে, চৌকির উপর বসে বেড়া ঠেসান দিয়ে তামাক খান, সেই সময়টা কাজ হয়েছে। এক দিনে নয়, সাত-আট দিন ধরে।

তুই কি করে জানলি ? তবে কি—

সগর্বে বুকে থাবা মেরে সাহেব বলে, আপনার মতন গুরু যে পেয়েছে, দুনিয়ার তার অসাধ্য কি আছে ? এটা কেন বোঝেন না, ও-রকম মিহি কাজ এক আপনি নিজে পারেন, আর যদি কেউ পারে সে আপনার সাগরেদ। সৃষ্টি-সংসারে এর বাইরে অন্য কেউ পারবে না। একটু একটু করে খোঁড়া হয়েছে সাত-আট দিন ধরে। কাল বিকালে সারা হল। মাল কাপড়ের নিচে নিয়ে চোখের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেলাম, ঘুণাক্ষরে আপনি টের পেলেন না ওস্তাদ।

সেই মাল একটা দিন ও একটা রাত্রি সাহেব নিজের হেপাজতে রেখেছে। এমন যে পচা বাইটা, তার মনেও সন্দেহের বাষ্পটুকু আসে নি। এমনধারা পরিপাটি নিখুঁত কাজ—সেকালের কথা জানিনে, একালের ক'টা কারিগর করতে পারে ? বাহাদুরি যেটা দেখাবার, হয়ে গেল। গয়না সাহেব আবার পচার কাছে নিয়ে যাচ্ছিল। পথের উপর এই দেখা। আর নিয়েছে যুধিষ্ঠিরের গড়া নতুন সিঁধকাঠি। পাঠ নেওয়ার কাজ ষোলআনা সারা, বাইটা মশায় এবারে নিজ হাতে কাঠি তুলে দেবেন। শিরে গুরুর আশীর্বাদ আর হাতে গুরুদত্ত সিঁধকাঠি নিয়ে এদেশ সেদেশ চরে বেড়ানো এবার থেকে।

সাহেব বলে, কাঁচা মাটি দেখে ধরলাম. মেজের তলে মাল রয়েছে। ডিম সরানোর কথা হচ্ছিল—ভাবলাম, এ কাজটা বা খাটো কিসে তার চেয়ে ? লেগে পড়লাম আপনারই দোহাই পেড়ে। চৌকির উপর বসে আপনি তামাক খান আর গল্প করেন, পায়ের কাছে বসে বসে শুনি আমি। সেই সময় এক হাতে পদসেবা করছি, আর এক হাতে চৌকির নিচে টিপিটিপি খুঁড়ে যাচ্ছি ছুরি দিয়ে। মাটি খুঁড়ি, চলে যাবার সময় আলগা মাটি গর্তে ফেলে ভরাট করে যাই। কাল বিকালে কাজ শেষ, কৌটো পেয়ে গেলাম। তার পরে আর ভরাট করিনি, মাটি ছড়িয়ে রেখে গেলাম যাতে নজরে আসে। নয়তো কত দিনে টের পেতেন, ঠিক কি !

পরাজয়ের দুঃখ ভুলে পচা মুগ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে, আমারই আসনের নিচে কাজ, আমি তার ভাঁজটুকু জানলাম না। মরি মরি, হাত হয়েছে বটে একখানা ! হাত না পাখির পালক !

সাহেব বলে, খুশি করতে পেরেছি তবে ? পাখির বুকের তলা থেকে ডিম আনার সামিল হল কিনা বলুন এবারে ওস্তাদ।

পচা উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলে, তার অনেক বেশি। আমার কান অনেক খর পাখির চেয়ে।

চুড়জোড়া সাহেব গাঁজিয়ার মধ্যে ভরে কোমরে বেঁধে এনেছে। পচার হাতটা কাপড়ের উপর দিয়ে সেই জায়গায় ঘুরিয়ে দিল। বলে, পায়ে বাঁধা কাঠিও আছে। বাড়ি চলুন, ঘরে গিয়ে এসব বের করব।

যেতে যেতে পচা বলে, গয়না তোরই এখন, আমার কোন দাবি নেই। দক্ষিণা পেয়ে গেছি। রাখতে যদি না পেরে থাকি, সে দোষ আমার। নিজের ক্ষমতায় জিনে নিয়েছিস। বিক্রি কর, দানসত্র করে দে, গাঙের জলে ছুঁড়ে ফেল—যা খুশি করতে পারিস। বলবার কিছু নেই।

চপল কণ্ঠে আবার বলে, জিনিসটা ভাল রে! আমি বলি, বিয়ে করে বউয়ের হাতে পরিয়ে দিস। রেখে দে যত্ন করে।

পচা বাইটার পিছনে সাহেব নিঃশব্দে ভাবতে ভাবতে চলেছে। উঠানে পা দিয়ে সুভদ্রা-বউকে দেখতে পাওয়া যায়। কোঠাঘরের বারান্দার উপর এদিক পানে তাকিয়ে আছে। হাতছানি দিল সাহেবকে।

সে সুভদ্রা নয় আর এখন। নির্ভয়ে চলে যাওয়া যায়। আরও কোন কোন রাত্রে মানকচু-বনে দাঁড়িয়ে সাহেব শুনে এসেছে—স্বামীর সোহাগিনী বউ। সাহেবের সঙ্গে—এবং অনুমান করা যায়, বাড়ির সকলের সঙ্গেই মিষ্টিমধুর সম্পর্ক তার।

সুভদ্রা ডাক দিল, একটা কথা শুনে যেও ঠাকুরপো।

সাহেবও উত্তরে দেয়ঃ যাচ্ছি বউঠান।

পচার ঘরে ঢুকে পায়ে-বাঁধা সিঁধকাঠি খুলে রাখল। চুড় বের করল কোমরের গাঁজিয়া থেকে। বলে, দানসত্র করবার হুকুমও দিয়েছেন ওস্তাদ, আমি তাই করব। যার গয়না তাকেই দিয়ে আসি। আদর করে আপনিই তো একদিন হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন। সত্যি সত্যি কক্ষনো ফেরত চান নি, জেদ বজায় রাখা নিয়ে কথা। সেটা হয়ে গেছে। সর্বদা চোখে চোখে রেখেও ঠেকাতে পারে নি। বউঠান জানে, কাজ আপনারই। বড় মিথ্যাও নয়, আপনার কাজটা আমার হাত দিয়ে করালেন। করিয়ে নিয়ে মান বাড়ালেন আমার।

বলতে বলতে সাহেব মলিন মুখে নিঃশ্বাস ফেলেঃ গয়নাখানার জন্যে বউ-ঠান কান্নাকাটি করলেন, মনটা সেই থেকে কেমন হয়ে আছে। কেমন করে কদিনে আমি যে এই মনের দফা নিকেশ করব! করবই। সোনাখালি আজকে আমার শেষ দিন। এ দিনটায় কারো মনে দুঃখ রেখে যেতে ইচ্ছে করছে না। কি হুকুম আপনার ওস্তাদ?

ওস্তাদের সায় নিয়ে সাহেব সুভদ্রা-বউয়ের কাছে গেল। বারাণ্ডার নিচে দাঁড়িয়েছে।

সুভদ্রা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে, কাছারিবাড়ি গেছে তোমার ছোড়দা। চৌধুরি-কর্তা সকাল থেকে ডাকাডাকি করছে, দু-দুবার বরকন্দাজ এসে গেছে। আমি

মানা করলাম ঃ কক্ষনো না, অমন হেনস্থা যেখানে থুতু ফেলতেও তাদের কাছে যাবে না। দুপুরে বট্‌ঠাকুর খেতে এসে বললেন, না গেলে বুড়োমানুষটা বলে দিয়েছে নিজে সে চলে আসবে। এর পরেও গোঁ ধরে থাকলে মনিব চটে যাবে, অন্তত বড়ভাইয়ের মুখ চেয়েও যেতে হবে একটিবার। কি করব ঠাকুরপো—বলে দিলাম, রোদ পড়লে সন্ধ্যার পর যাবে। দেখা দিয়েই চলে আসবে। অনেকক্ষণ গেছে, এখনো ফেরে না। ক'খানা লুচি ভেজেছিলাম, ঠাণ্ডা হয়ে ন্যাকড়ার মতো হয়ে গেল।

সাহেব দুষ্টামি করে বলে, সেই একদিন নামাবলী মুছবার কথা হয়েছিল, মনে পড়ে বউঠান।

সুভদ্রা আকাশ থেকে পড়ে ঃ ওমা, কবে ? কিসের নামাবলী ভাই ?

সাহেব মুখ টিপে হেসে বলে, রাধা-কৃষ্ণ রাম-সীতা হর-গৌরী—জোড়ায় জোড়ায় যত দেবদেবী আছেন। বুক জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিল, ছোড়-দা এসে সব মুছে দেবেন—ভুলে গেলেন সমস্ত কথা ?

সুভদ্রা শিউরে উঠে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বলে, ভুলে ওসব উচ্চারণ করবে না, পাপ হয়। বেশ তো আছেন দেবদেবীরা, আমার বুকখানা জুড়ে আছেন। তোমার ছোড়দা'কে বলব—তার নামটাও লিখে দেবে ঐ সব নামের নিচে।

যে জন্যে সাহেব এসেছে—হাসিমুখে চুড়জোড়া বের করে ধরল ঃ গয়না নিয়ে নিন বউঠান। কথা দিয়েছিলাম—দেখুন, উদ্ধার করে আনলাম। নিন, পরে ফেলুন। ছোড়দা এলে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবেন।

বারাণ্ডার প্রান্তে রেখে দিয়েছে। তুলে নিতে আসছিল সুভদ্রা, এমনি সময় কাছারি-বাড়ির ফেরত মুকুন্দ উঠানে ঢুকল। ছেলেমানুষের মতো সুভদ্রা একছুটে তার কাছে চলে যায় ঃ অত ডাকাডাকি কেন গো ?

মুকুন্দ বলে, ইস্কুলের কাজ ছাড়িয়ে চৌধুরীকর্তা আমায় নিয়ে যেতে চান। হাত ধরে অনেক করে বললেন। জাপান থেকে শিখে এসে ও'র ছেলে চিরুনির ফ্যাক্টরী করেছে—ডাইনে-বাঁয়ে চুরি হচ্ছে, সামলাতে পারলে না। ছেলে কাজ বোঝে, কারবার একেবারে বোঝে না। ম্যানেজার করে আমার উপর ঐ দিকটা ছেড়ে দিতে চাচ্ছেন।

সুভদ্রা হেসে বলে, তুমিই যেন কত বোঝ! চিরটা কাল মাস্টারি করছ—

চৌধুরিকর্তা চাচ্ছেন তাই। যারা রয়েছে তারা সব ঝানু লোক, বড্ড বেশী রকম বোঝে। কম বোঝে এমনি সৎমানুষ চান তিনি। আমার পাঠ শুনে খেতে গিয়েছেন। ম্যানেজারের কোয়ার্টার ও'দের বাড়ির কাছাকাছি। হাত ধরে বললেন, যে ক'দিন বাঁচি, সন্ধ্যাবেলাটা একটু একটু ভগবৎকথা শুনতে পাবো, সে-ই আমার বড় লাভের ব্যাপার। বুড়োমানুষ নাছোড়বান্দা হয়ে ধরেছেন।

সাহেব উল্লসিত হয়ে বলে, কারখানার ম্যানেজার আমাদের ছোড়দা, শহরের

উপর বাসা ! বউঠানের কত সাধ, বাসা করে দুজনে থাকবেন।

মুকুন্দ বলে, সেইটে জানি বলেই নিমরাজি হয়ে এলাম। দেখা যাক ভাল করে ভেবেচিন্তে যুক্তিপরামর্শ করে—

কিন্তু যে লোকের সাধ মেটাবার জন্য ভাবনাচিন্তা, নিতান্ত উদাসীন ভাব তার যেন, এত কথার একটিও বুঝি কানে গেল না। ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে সুভদ্রা ঃ গিয়েছ সেই কখন। সেখানে এতক্ষণ বকবক করে এলে, বাড়ি এসেও তাই। হাত-পা ধুয়ে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে চলে এসো। খাবার দিচ্ছি।

তাড়া খেয়ে মুকুন্দ জলের বালতির দিকে যায়। খাবার দিতে সুভদ্রা রান্না-ঘরে ছুটল। সাহেব পিছনে ডাক দেয় ঃ গয়না পড়ে রইল বউঠান। তুলে রেখে দিন।

ও, হ্যাঁ—

মনে পড়ে গেল সুভদ্রার, কয়েক পা ফিরে এসে চুড়জোড়া বাঁ-হাতে তুলে নিল। এত দামের গয়নাখানা—কোঠাঘরে যে সামাল করে রেখে আসবে তা নয়, দুটো আঙ্গুলে ঝুলিয়ে অমনি রান্নাঘরে চলল। কত কষ্ট করে কত রকম কলকৌশল খাটিয়ে জিনিসটা উদ্ধার করে আনা—অকৃতজ্ঞ বউ তার জন্য সাহেবকে একটা মুখের কথা বলল না। মুখের দিকে তাকালই না একবার ভাল করে। বরকে খেতে দিতে হবে, বড় ব্যস্ত এখন।

ক্রোধ হওয়া উচিত, উল্টে হাসির আলোয় সাহেবের মুখ চিকচিক করে। ওস্তাদের হাত থেকে আজকেই সিঁধকাঠি পেয়েছে—কাঠি ধরে ঘরে ঘরে সে নাকি মন্দ করে বেড়াবে। তোমায় দিয়ে তা হবে না সাহেব। কাজ করতে পারা যায়। কিন্তু মন্দ করা বড্ড শক্ত।

ঠিক এই রাত্রে অনেক দূরে কালীঘাটের ফণী আড্ডির বস্তিতে হুলস্থূল কাণ্ড। রাণী গলায়-দড়ি দিয়েছে—পারুলের বড় আদরের মেয়ে রাণী। মাটকোঠার প্রান্তে যেখানটা পারুলের ঘর ছিল, সেখানে এখন দোতলা পাকা-দালান উঠেছে রাণীর জন্য। উপরের এক কুঠুরি, নিচে এক কুঠুরি এবং সিঁড়ি। উপরের ঘর রাণীর, নিচের ঘরে মা পারুল থাকে। রাণীর এখন গা-ভরা গয়না—ছেলেবয়সের মতন ঝুটো গয়না নয়, আসল গিনিসোনার জিনিস। এত সুখ নিয়ে হতচ্ছাড়ি মেয়ে আত্মহত্যা করতে গেল।

ছাতের কড়িকাঠ অবধি নাগাল পায় না, খাটের উপরে তাই টুল বসিয়েছে। শাড়ির এক প্রান্ত কড়িকাঠে বেঁধে অন্য প্রান্ত গেরো দিয়েছে নিজের গলায়। পায়ের ধাক্কায় টুল উল্টে দিয়ে তারপর ঝুল খেয়ে পড়ল। কাজের যেমন দস্তুর। খবরাখবর নিয়েছে—সরকার বাহাদুর ফাঁসিতে লটকান, সে পদ্ধতিও মোটামুটি এই।

কাজেঁর কিন্তু খুঁত থেকে গিয়েছিল। টুলের উপর দাঁড়িয়ে ঠিক মতো হাত পেঁছিয়নি, কড়িকাঠের বাঁধন আলগা রয়ে গেল। রাণী বুঝতে পারেনি সেটা।

যেই মাত্র ঝুল খেয়ে পড়া, বাঁধন খুলে ধপ করে সে মেজের পড়ে গেল। গলায় ফাঁস এঁটে গিয়ে গোঙানি। বিষম গুমট আজকে, হাওয়ার লেশমাত্র নেই। পারুল ঘরে শুতে পারেনি, সিঁড়ির ধারে রোয়াকের উপর মাদুর বিছিয়ে পড়েছিল। ঘরে না শুয়ে ভাগ্যিস ছিল আজ বাইরে! সশব্দে টুল এবং মানুষ পড়ে যাওয়া, পর মুহূর্তে দম-আটকানো গলায় বীভৎস ঘড়ঘড়ানি—ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে আর্তনাদ করে পারুল উপরে ছুটল। জানালা খোলা। জ্যোৎস্না তেরছা হয়ে পড়েছে ঘরের মধ্যে, সে আলোয় সঠিক কিছু ঠাহর হচ্ছে না। জানালার গরাদের উপর পারুল মাথাভাঙাভাঙি করছে: রাণী, ওরে রাণী, কি হয়েছে? জবাব দে মা, দোর খোল—

সব ঘরের সকল মানুষ এসে পড়ল। দমাদম লাথি দরজার উপর। খিল ভেঙে পাল্লা খুলে পড়ে। এই আর এক ভুল রাণীর। মরবার তাড়ায় শুধুমাত্র খিল এঁটেছে, হুড়কো দিতে মনে নেই। তা হলে এত সহজে হত না।

আলো কোথা? আলো নিয়ে এসো শিগগির! গলার ফাঁস খোল। খোলা যাচ্ছে না তো কেটে ফেল কাপড়ের ওখানটা—

স্পষ্টাস্পষ্টি কলহ নয় বটে—কথা-কাটাকাটি, মুখ আঁধার করে বেড়ানো, চোখের জল ফেলা ইদানীং লেগেই আছে মা ও মেয়ের মধ্যে। কিন্তু এত বড় কাণ্ড করে বসবে, স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি পারুল। ভারি চাপা মেয়ে—ভাবে যতখানি, বলে তার অতি সামান্য। গণ্ডগোলটা শুরু হয়েছে ফণী আড্ডি মরে গিয়ে মলয়কুমার আঢ্য মাটকোঠার যখন নতুন মালিক হল। সাহেবদের দলের সেই ঝিঙে ছোঁড়াটা মলয়কুমার এখন।

ফণী আড্ডির তিন ছেলে—ঝিঙে সকলের ছোট। প্রথম পক্ষ গত হবার পর ফণী দ্বিতীয় সংসার করেছিল, সে বউয়ের ছেলেপুলে হয়নি। ফণী যতদিন বেঁচে ছিল, বউছেলেরা সামনে আড়ালে শতেক কুচ্ছো করেছে—হাড়কঞ্জুষ মানুষ, নাম করলে হাঁড়ি ফেটে যায়, এমনি কত। মরে যাবার পর এখন গদগদ অবস্থা—এমন বিচক্ষণ মানুষ হয় না। এবং চরম আত্মত্যাগী—পুরো মাপের কাপড় পরেনি জীবনে, আটহাতি ধুতি হাঁটুর উপর তুলে ঘুরে বেড়াত, শীত গ্রীষ্মে একটিমাত্র গলাবন্ধ সুতি-কোট। না খেলে প্রাণরক্ষা হয় না—ঈশ্বরের এই বিদ্‌ঘুটে নিয়মের জন্য যেটুকু নইলে নয় তাই খেয়েছে, বউ-ছেলেদের খাইয়েছে। বয়স হলে অনেকের ধর্মে মতি যায়, দানধ্যানে পয়সা নষ্ট করে। ফণী আড্ডি মরে চিতার ছাই হল, কালীঘাটের পীঠস্থানে থাকা সত্ত্বেও মানুষটার কাছে ধর্ম ঘেঁষতে পারেনি। ফলে হিসাবপত্র করে দেখা গেল, সম্পত্তি ও নগদ টাকাকড়ির পাহাড় জমিয়ে গেছে বউ-ছেলেপুলের জন্য

দ্বিতীয় পক্ষের বউ বোধকরি পুরুত-ঠাকুরের প্ররোচনায় প্রস্তাব করলেন: এত যখন রেখে গেছেন, শ্রাদ্ধটা ঘটা করে হোক। ব্রাহ্মণপণ্ডিত আত্মীয়স্বজন ছাড়াও কালীঘাটের কাঙালি ডেকে লুচি-হালুয়া খাইয়ে দেবো।

বড়ছেলে শিউরে আপত্তি করে ওঠে ঃ ক্ষেপেছ মা—

মৃতে ভুরিভোজনের নিয়ম, ঠাকুরমশায় বললেন। আত্মা তৃপ্তি পায়।

তেমন ছেঁদো আত্মা আমার বাবার নয়। খাওয়ানো দেখলে উল্টে ছটফট করবেন স্বর্গধাম থেকে। চাই কি, ভূত হয়ে নেমে এসে ঘাড় মটকে শোধ নিয়ে যেতে পারেন।

শ্রাদ্ধ অতএব নমো-নমো করে সারা হল। আলিপুরের এক মোক্তার ফণীর ভগ্নিপতি। এক জায়গায় সকলকে ডেকে মোক্তারমশায় বললেন, ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই—আজ না হোক, কাল তো হবেই। আমি বলি, নিজেদের মধ্যে আপোষে ভাগবাঁটোয়ারা করে নাও। আপোষ না করলে পরিণামে লাঠালাঠি, মামলা-মোকদ্দমা—আদালতের আমরাই ভাগাভাগি করে নেবো, তোমাদের ভাগ্যে মুলোর ডাঁটা।

তিনিই মধ্যবর্তী হয়ে বাঁটোয়ারা করতে বসলেন। নগদ টাকার ব্যাপারে হাঙ্গামা নেই, সকলের সমান। সম্পত্তির সাড়ে-তিন ভাগ—তিন ভাগ তিন ছেলের, আধা ভাগটা বিধবার। নিয়ম হল, ছোটজন সকলের আগে পছন্দ করবে। মোক্তার বলেন, কোন্ ভাগটা নিবি রে ঝিঙে, ভেবেচিন্তে দেখ।

ঝিঙে গরম হয়ে বলে, বড় হয়েছি পিশেমশায়, ঝিঙে-ঝিঙে করবেন না। মলয়কুমার—

মোক্তার একগাল হেসে বলেন, বড় বুঝি এক্ষুনি হলি! কালও তো কতবার ঝিঙে বলে ডেকেছি।

বড়ভাই বলে, অতগুলো টাকা নগদ নগদ হাতে এসে গেল, বড় হতে তারপরে কি আর দেরি হয়? কিন্তু তোর পোশাকি নাম তো ষষ্ঠীকুমার, সাত জন্ম ধরে ভাবলেও বাবার মাথায় মলয়কুমার আসত না—

মেজভাই টিপ্পনী কাটে ঃ নতুন সাবালক হয়ে মিষ্টি নাম নিল আর কি পছন্দ করে—

বড়ভাই বলে, তাই বুঝি? মলয়কুমার তবে নিতে গেলি কেন রে, ওর চেয়ে আরও মিষ্টি তো কত আছে! মিহিরকুমার, কিম্বা রসগোল্লাকুমার—

মোটের উপর ঝিঙে বলা চলবে না আর এখন—বাবু মলয়কুমার আঢ্য। টালিগঞ্জের একটা একতলা বাড়ি এবং আদিগঙ্গার তীরবর্তী মাটকোঠার মালিক সে এখন। মালিক হয়ে বস্তিতে আসা-যাওয়া বেড়ে গেছে খুব। আগে আসত ময়লা কাপড়ে খালি পায়ে, এখন সিল্কের চাদর উড়িয়ে জুতো মসমস করে। সেন্টের গন্ধে বাতাস ভরে যায়। পারুল হঠাৎ মা হয়ে গেছে তার—ভক্তিমান পুত্র যখন-তখন মা-মা করে পারুলের ঘরে ঢুকে পড়ে। ফিসিরফিসির গুজুরগুজুর দুজনে। ভবিষ্যতের নানা মতলব—মাটকোঠা ভেঙে পাকাকোঠা হবে এখানে—আজেবাজে ঘুণে-খাওয়া ভাড়াটে গুলোকে দূর করে তাড়াবে।

একদিন বলল, তোমার ঘর আর পাশের ঐ জায়গাটুকু রাণীর নামে লিখে

দেব ভাবছি। ওকে রাজি করাও মা, আমি বলতে গেলে তিরিক্ষি হয়ে ওঠে।

পারুল এতটুকু হয়ে বলে, আপন ভাল পাগলেও বোঝে। ঐ রকম একগুঁয়ে বাবা, ওর কথায় কিছু মনে কোরো না—

বড়ঘরের পাশে জিনিসপত্রে ঠাসা ছোট্ট ঘরটা দেখিয়ে পারুল আবার বলে, বড় হয়ে গেছে তো এখন, ঐ পায়রাখোপের মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে থাকতে মন-মেজাজ আরও বিগড়ে যায়। সকলে দেখছে কত সাজানোগোছান ঘর—

এই জন্যে? মলয়কুমার দরাজ হয়ে বলে, সোজাসুজি বললেই তো পারে। মন গুমরে থাকে কেন?

অতএব গোটা বস্তি ভেঙে দিয়ে দালান-কোঠা যেদিন হয় হবে, রাণীর পাকাঘর এখনই চাই। বিবেচক পিতৃদেব নগদ টাকা রেখে গেছেন—হচ্ছে অসুবিধাও নেই। মাটির উপরেই বা থাকবে কেন রাণী, তার ঘর দোতলায়। নিচের তলায় পারুল, পাশ দিয়ে সিঁড়ি। রাণী এখন সকলের চেয়ে উঁচুতে। ঘরের জানলা দিয়ে মায়ের মন্দির, আদিগঙ্গার পুল দেখা যায়। কত সুখ রাণীর!

সেই সুখের ঘরে ক'টা দিন বসবাস করে রাণী মরতে গেল। রাজপুরে তোলপাড়।

ষোল

সাহেবকে আরো কয়েকটা দিন সোনাখালি থেকে যেতে হল। সুভদ্রা-বউ ছাড়তে চায় না: ছটফট কর কেন ঠাকুরপো? বউ যেন তাকিয়ে নিশ্বাস ফেলছে, তেমনি ভাবখানা তোমার।

মুকুন্দ সেই সঙ্গে যোগ দেয়: আহা, থাকোই না। তোমার সঙ্গে কথা বলে সুখ পাই। যেমন রূপের দেহ, ভিতরেও মনটা তেমনি রূপময়।

আবার দীননাথ পাটোয়ারও বলে, ধানের ক'টা মোটা লেনদেন আছে। এদ্দিন রইলে তো আরও ক'টা দিন থাকো। কাজগুলো সারা করে মাইনে-পত্তোর চুকিয়ে নিয়ে নাচতে নাচতে চলে যাও বাপধন। ধান নেবে না যখন, মাইনের সঙ্গে এক শলি ধানের দাম ধরে দেবো।

স্ফূর্তির চোটে সত্যি সত্যি নাচতে মন যায়। চলে যাচ্ছে সাহেব। গুরুপদর বাড়িটা একবার হয়ে যাবে, অনেক করে বলেছে। বাড়ি দূরবর্তী নয়, তিন চার ক্রোশের ভিতরে। বিপদে আছে বেচারি তিলকপুরের সেই ব্যাপারটা নিয়ে। দারোগা বড় জ্বালাতন করছে। লংকাকাণ্ড কবে হয়ে গেছে, আজও সেই লেজের আগুন নিভল না। সেই সমস্ত কথাবার্তাই হবে। এবং বউয়ের হাতের রান্না ভাত চাট্টি খাইয়ে দেবে বলেছে। অপূর্ব রাঁধে নাকি গুরুপদর বউ।

পথের মাঝখানে হঠাৎ বংশী। ফুলহাটা থেকে বোধহয় হেঁটে হেঁটেই আসছে। বংশী বলে, গুরুপদর কাছে যাচ্ছ তুমি? বাড়ি যেতে হবে না, এতক্ষণে

সে ঘাটে চলে গেছে। আমিও সেখানে যাচ্ছি।

কেমন রহস্যদৃষ্টিতে তাকায়ঃ ক'দিন থেকে তোমার কথাই ভাবছি। সাহেবকে যদি পাওয়া যেত। অনেক করে চেয়েছিলাম, মা-কালী তাই মিলিয়ে দিলেন। চলো—

সাহেব অবাক হয়ে বলে, কোথায় ?

ঘাটে। গুরুপদ সেখানে। আর একজনের সঙ্গে চেনা হবে—ধোনাই মিস্ত্রি। দেখনি তুমি তাকে, কাজের মানুষ।

বংশীর সাজ-পোশাকে বড় বাহার। সাহেব বলে, তুমিই যে সেই বংশী, চিনতে পারিনে। বলি, এ আমাদের সাঙাত বংশী নয়, কোন বড়মানুষের বেটা, বড় ঘরের লোক বংশীধরবাবু।

বংশী হেসে বলে, নেমন্তন্নে যাচ্ছি, বাবু হয়ে কি করি! জাঁকজমকের বিয়ে, আমরা সব বরযাত্রী। গুরুপদ ধোনাই আর আমি তিনজন ছিলাম, তোমায় নিয়ে গণ্ডা পুরল।

সাহেবের হাত জড়িয়ে ধরেছে। টেনেই নিয়ে যায়। ছাড়ানোর চেষ্টা করে সাহেব বলে, আচ্ছা পাগল! বিয়েবাড়ি গন্ধে গন্ধে গিয়ে উঠব ? মানুষ আজকাল ত্যাঁদোড় হয়ে গেছে, ভোজের সময় তক্কেতক্কে থাকে। বিনি-নেমন্তন্নে গিয়ে বসলে পিটিয়ে পিঠ ভেঙে দেবে।

ঘাট অদূরে, দু-পা যেতেই পৌঁছে গেল। সেই লোকটা—ধোনাই মিস্ত্রি, অপেক্ষা করছে। বলে, নৌকো এ ঘাটে পাওয়া গেল না বংশী। গুরুপদ বরুই-তলার ঘাটে গেছে। আমি তোমার জন্য দাঁড়িয়ে—

সাহেব জিজ্ঞাসা করেঃ নেমন্তন্ন কোথায় বংশী ?

মামুদ আলি মোল্লার ছেলের বিয়ে।

বংশীর সঙ্গে ধোনাই-এর চোখাচোখি হল। বুঝে নিয়ে ধোনাই একগাল হেসে ঐ সঙ্গে জুড়ে দেয়ঃ গ্রাম মাদুরপলতা। বুড়িভদ্রা থেকে তেঘরায় খাল নেমে গেছে, সেইখানটা।

সাহেব চমকে ওঠেঃ ওরে বাবা!

বংশী অভয় দিয়ে বলে, নৌকোয় যাচ্ছি, বাবা বলবার কি হল গো ?. বিয়েবাড়ির রশিখানেক আগে নেমে গুটগুট করে গিয়ে উঠব।

অতএব বরুইতলার ঘাটে চলেছে। যেতে যেতে কথাবার্তা। ধোনাই মিস্ত্রি বলছে, ভাল অবস্থা করে ফেলেছে মামুদ আলি। নতুন দালান দিচ্ছে। বড় দলের হাটে গিয়ে বিয়ের বাজার করল, হাটবেসাতি দেখে যত লোকের তাক লেগে যায়।

মিটিমিটি হেসে বংশী বলে, জাতের বায়নাক্কা নেই আমাদের, কে হিন্দু কে মুসলমান বুঝিনে। সব বাড়ি যাই আমরা। আয়োজন ভাল থাকলেই হল, নেমন্তন্ন লাগে না।

ব্যাপার বুঝতে সাহেবের বাকি নেই। হাসাহাসি চলছে তো চলতে থাকুক তাই এখন। নৌকো পেয়ে ভালই হল—গুরুপদর সঙ্গে কথাবার্তা সেরে ফুলহাটায় বলাধিকারীর কাছে যাবার মতলব। মাদুরপলতার মাঝপথে নেমে গেলে অনেক কম হাঁটতে হবে।

বয়ুইতলা এসে গেল। দূর থেকে গুরুপদকে দেখা যায়। ঘুরছে ঘাটের এমুড়ো-ওমুড়ো—ঘুরেই বেড়াচ্ছে। মাঝি-দাঁড়ি কারো সঙ্গে কথাবার্তা নেই, চুপচাপ ঘুরছে। এদের দেখে দ্রুতপদে কাছে এলো।

সাহেব পুলকিত স্বরে বলে, ওস্তাদের সঙ্গে কাজকর্ম সারা হয়ে গেল তোমাদের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে। চলে যাচ্ছি। তোমার বাড়ি যাচ্ছিলাম গুরুপদ।

গুরুপদর জবাবের আগেই বংশী প্রশ্ন করে: নৌকোর কি হল?

না, এখানেও নেই।

ধোনাই মিস্ত্রি বলে, কোথায় তবে?

নৌকোর ভার গুরুপদর উপরে। সে বলে, আছে, কোথাও না কোথাও। ঠিক বের করে ফেলব। বলি খোঁড়া নও তো কেউ। বাবুভেয়ে মানুষও নও। তবে আর কি! দাসপাড়ার ঘাটে যাই এবারে।

ঘোরাঘুরি হল দাসপাড়ার ঘাটে। সেখানেও নেই।

হাঁসখালি গিয়েই দেখা যাক তবে?

সাহেব বিরক্ত হয়ে বলে, নৌকা ঠিক করেছ—সে নৌকা কোথায় থাকবে, মাঝির সঙ্গে বলাকওয়া নেই? হেঁটেই তো এতক্ষণে প্রায় মাদুরপলতায় পৌঁছানো যেত।

কয়েকটা গাঁয়ে আরও কতকগুলো ঘাট ঘুরে মিলল অবশেষে নৌকো। জেলেডিঙি ডাঙার সঙ্গে কাছি-করা—মানুষজন নেই, বোঠে রয়েছে। অর্থাৎ ডিঙি বেঁধে কাছাকাছি কোন একখানে গিয়েছে।

সর্বশেষ মানুষ গুরুপদ জোরে ধাক্কা দিয়ে ডিঙি স্রোতের মুখে ফেলল। জল ঝাঁপিয়ে নিজেও উঠে পড়ে। একটা বোঠে নিজে তুলে নিয়ে তাড়া দেয়: হাত-পা কোলে করে রইল সব? বোঠে ধরো, জোরে জোরে মারো—

ধোনাই মিস্ত্রি বলে, রাতদুপুরে নেমন্তন্ন, তাড়াতাড়ির কি আছে?

গুরুপদ বলে, না, ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলো তবে। ধরতে পারলে জেলেরা ডাঙায় নামিয়ে নিয়ে পুজো করবে!

সাহেব ভয়ের ভঙ্গি করে বলে, বল কি গো—অ্যাঁ, ভালমানুষ হেঁটে হেঁটে চলেছি—খাতির করে এমনি নৌকোয় এনে তুললে। তোমার মাতব্বরিতে বড় ভয় গুরুপদ, সেই তিলকপুরের মতন না হয়।

যেমন বিয়ে তার তেমনি মন্তোর। বংশী দাঁত বের করে হাসে: দানধ্যান তীর্থধম্মের মাঝে তো যাচ্ছিনে যে নৌকোর ন্যায্য ভাড়া মিটিয়ে দশের আশীর্বাদ কুড়িয়ে বেরুব।

শরদ্‌পদ বলে, মবলগ খরচ সামনে। খামোকা কেন টাকা দিয়ে নৌকো-ভাড়া করতে যাই ? এক একটা পয়সা এখন বাপের হাড় আমাদের কাছে।

সাঁ-সাঁ করে ডিঙি চলেছে। সাহেব বলে, আমি তোমাদের নেমন্তন্নে যাচ্ছিনে। বন্দাধিকারী মশায়ের কাছে যাব, সেখান থেকে হয়তো বা দেশেঘরে একবার। আবার কবে দেখা হবে—দু-চারটে কথাবার্তার জন্য নৌকোয় উঠেছি। নৌকো ওপারে নিয়ে ধরবে, নেমে চলে যাব।

বংশী ঘাড় নেড়ে বলে, মাইরি আর কি! একবার যখন তুলতে পেরেছি, ছাড়াছাড়ি নেই।

সাহেব কিছু বিরক্ত হয়ে বলে, জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে যাব তা হলে সেটা তো ঠেকাতে পারছ না।

সাহেবের মনেপ্রাণে আপত্তি। বন্দাধিকারীকে বলেকয়ে যাবে চলে কালীঘাট। সুধামুখীকে দেখে আসবে। আর রাণীকে। মন বড় টেনেছে। কিন্তু সকলের বেশি দরকার কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে আসা। ইষ্টদেবী কালিকা। তার মধ্যে প্রধান হলেন কালীঘাটের দক্ষিণাকালী, আর বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী। কাজকর্মে হাত লাগানো কালীক্ষেত্রে পুজো চড়িয়ে আসার পর।

সাহেব বলে, ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে—এমন হয় না। তৈরি-টৈরি হয়ে আসি আগে—তার পরে।

বংশী মিনতি করে বলে, এইবারটা মান রাখো ভাই সাহেব। বিয়ে-বাড়িটা সেরে দিয়ে যেখানে খুশি চলে যাও। যোনাইয়ের সাচ্চা খবর, এক বাড়িতেই কাজ হয়ে যাবে। নইলে প্রাণে মারা পড়ব আমরা।

মামুদ আলির বাড়ি না গেলে এরা মারা পড়বে—জিনিসটা মাথায় ঢোকে না। সাহেব অবাক হয়ে তাকাল।

বংশী বলে চলেছে, বউটা বরাবরই খ্যাচর-খ্যাচর করে। হালফিল আবার ছেলের মা হয়ে পাগলা হয়ে গেছে একেবারে। ছেলেমেয়ে তিন তিনটে গিয়ে ঐ একগুঁড়ো। সেই বাচ্চার মাথায় হাত রেখে দিব্যি করিয়ে নিল—অসৎ কাজে আর নয়, ভাল হয়ে থাকব। ছিলামও ভাল। কাজের কথা কেউ বলতে এলে সঙ্গে সঙ্গে হাঁকিয়ে দিয়েছি। কিন্তু দিব্যি আমায় রাখতে দিল না। নেমন্তন্নের নাম করে বউকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়েছি। সাজ-পোশাকের বোঝা সেইজন্য আরো বেশি করে চাপাতে হল। মোটে যাতে সন্দেহ না হয়।

কণ্ঠ কান্নায় ভেঙে আসে। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে সামলে নিয়ে বংশী বলে, জীবনে আর অসৎ পথ মাড়াব না ঠিক করেছিলাম। চাষবাস করব, খেটেখুটে গরিব ভাবে থাকব। হতে দেবে তাই ? গরলগাছির দারোগা থানার উপর ডাকিয়ে নিয়ে খোলাখুলি বলে দিল। বয়স হয়েছে, চাকরি ছাড়বে এইবার, দেশের বাড়ি দালানকোঠা তুলে ধর্মকর্ম নিয়ে থাকবে। শেষ কামড় সেই বাবদে—আমার নামে ধরেছে এক-শ টাকা। কত কান্নাকাটি করলাম—

এক-শ'র একটা টাকা মাপ হল না। চাষবাস করে ফালতু এক-শ কোথায় পাই? সময়ও সংক্ষেপ—নতুন ফসল ওঠা অবধি সবুর মানবে না। তাড়িঘাড়ি আদায় দিতে হবে।

ধোনাই বলে, আমার নামে দশ। জন-পনেরোর এমনি দশ করে ধরেছে। বংশীর মতন দাগি নই, ধরাছোঁওয়া পাচ্ছে না, সেইজন্য সস্তা। ছিলাম না দাগি, কিন্তু কদ্দিন আর? দাগি না হলে হক-না-হক ট্যাক্স ধরতে পারে না যে!

গুরুপদ বলে, আমারও এক-শ। এক কাজের কাজি বলে বংশীর আর আমার এক অংক। সেই যে তিলকপুরের গন্ধ আমাদের দু-জনের গায়ে। তুমি বেঁচে গেছ সাহেব, বিদেশি মানুষ বলে তোমার নিশানা পায়নি!

সাহেব আর জেদ করে না। দারোগা নিশানা না পেলেও তিলকপুরের দায়-দায়িত্ব নিঃশেষ হয়ে যায় না। তার উপরে বংশীর এই হাত-ধরাধরি ও চোখের জল। তুষ্টুরাম ফাটকে গেছে, বংশী আর গুরুপদর নাম সে-ই নাকি ফাঁস করে দিয়েছে।

সাহেব অবাক হয়ে বলে, তুষ্টু এমন কাজ করল? তারই জন্যে তো যাওয়া। ঢিল মেরে তার কপাল ফাটানোর শোধ তুলব—মনে মনে আমার ছিল সেই মতলব।

থানায় বংশীকে ডাকিয়ে বুড়ো-দারোগা কথা আদায়ের কায়দাটা খোলাখুলি বলে দিলেন— সন্দেহের কিছু নেই। বাহাদুরি জাহির করে বললেন, চাকরি শেষ হয়ে যাচ্ছে এখন আর বলতে বাধা কি! কতরকম মাথা খেলাতে হয়—তোদের সায়েস্তা করতে গিয়ে তোদের উপর দিয়ে যেতে হয় আমাদের।

তুষ্টুরাম এবং ভিন্ন ভিন্ন কেসের আরও তিন-চারটে আসামি এক লক-আপে। মামুলি কায়দাকানুন করে দেখা হয়েছে—কাজ হল না। তখন দারোগার নিজের আবিষ্কার, অব্যর্থ মুষ্টিযোগ—

রাত্রিবেলা, বাইরের লোকজন একটিও আর থানায় নেই। লক-আপের তালা খুলে সিপাহিসহ দারোগা নিজে এসে হুঙ্কার ছাড়লেন: চুনের ঘরে নিয়ে যাও ওটাকে।

যার দিকে আঙুল তুললেন, সে মানুষ তুষ্টুরাম নয়। তুষ্টুর চোখের উপরে সেই আসামিকে টেনেহিঁচড়ে বের করে নিয়ে গেল।

নাম চুনের ঘর, কিন্তু এক কণিকা চুন নেই। আসামির পেটের ভিতরে কথা আদায় হয় সেখানে। একসময় রেওয়াজ ছিল—চুনের বস্তায় মুখ ঢুকিয়ে বেঁধে রাখত, নিশ্বাসের সঙ্গে চুন উঠে নাক-মুখ বোঝাই হয়ে যেত। এখন ঢের বেশি ফলপ্রদ পদ্ধতি বেরিয়েছে, সেকালের চুনের বস্তা বাঁধা বাতিল। ঘরের কেবল সেই পুরানো নামটা রয়েছে।

হুকুম দিলেন: চুনের ঘরে নিয়ে যন্ত্রআত্তি চালাওগে। নরম হয়ে এলে

খবর পাঠিও।

বলে দারোগা সম্ভবত বিশেষ কোন জরুরি কাজে বসে গেলেন। যন্ত্রআত্তি শুরু হয়েছে ওদিকে। সেই যন্ত্রের যৎকিঞ্চিৎ কানে এসে লক-আপের ভিতর তুণ্টুরামের রক্ত হিম হয়ে যায়। দমাদম লাঠি পড়ছে আসামির বেওয়ারিশ দেহটার উপর। লাঠি চার-পাঁচখানা অন্তত—তেমনিধারা আওয়াজ। আর সেই সঙ্গে বাবা রে, মা রে প্রাণান্তক চিৎকার। তারপর সমস্ত চুপচাপ। ক্ষণ পরে সিপাহির ভয়ার্ত কণ্ঠ শোনা যায়ঃ বড়বাবু, নড়েচড়ে না যে—

সে কি রে?

চটি ফটফট করে ছুটলেন দারোগা চুনের ঘরেঃ কী সর্বনাশ, একেবারে শেষ করে দিয়েছিস?

সিপাহি বলে, পাঁচ হাতের কাজ, পাঁচজনে পাঁচ দিক থেকে পিটেছে—সকলে হাতের ওজন রাখতে পারে না। এখন কি হবে, বলুন বড়বাবু।

হবে কচু! মাকড় মারলে ধোকড় হবে। ঠিক ঠিক মরে থাকে তো কুয়ো-সই করে দে, আবার কি! ও-মাসেও তো হয়েছিল একটা।

সুস্পষ্ট অবিচল কণ্ঠ—রাত্রির নৈঃশব্দে প্রতিটি শব্দ তুণ্টুরামের কানে আসছে। পরক্ষণেই কুয়োর মধ্যে ঝপ করে একটা ভারী বস্তু পড়ার শব্দ।

দারোগার পরবর্তী হুকুমঃ চোর বেটাকে নিয়ে আয় এবারে। ওটাকেও শেষ করা হোক, কে আবার আদালতের হাঙ্গামায় যাবে!

খুন করার পরেই মানুষের নাকি খুনে পেয়ে যায় কখনো কখনো। ক্রমাগত খুন করে যেতে ইচ্ছে করে। দারোগার তাই হয়েছে। এবারে তুণ্টুরামের পালা।

চুনের ঘরে তুণ্টুরামকে নিয়ে এলো, দুপাশে দুই সিপাহি বজ্রমুষ্টিতে হাত এঁটে ধরেছে।

তিলকপুরে তোর সঙ্গে কে কে ছিল? বাঁচতে চাস তো বল্ খুলে সমস্ত—

বুড়ো-দারোগা বংশীকে বলেন, আর হেসে খুন হন। অনেক কাল আগে-কার আরও এক ঘটনা বললেন তিনি। ঠিক এইরকম ব্যাপার। সদরের নিকটবর্তী পাইকগাছা থানায় তখন তিনি। সদরে বেনামি চিঠি গেল, দারোগা অমুক আসামিকে খুন করে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। অগস্তি সাহেব সেই সময় জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট। সে লোকের প্রতাপে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়। বাদার একটা বড় দাঙ্গার ব্যাপারে সাহেব সরেজমিন তদন্তে বেরিয়েছিলেন, পাইকগাছার ঘাটে বোট বেঁধে হঠাৎ নেমে পড়লেন। দারোগাকে বলেন, অমুক গ্রামের অমুক মানুষটাকে খুন করে লাস গুম করেছ তুমি—

দারোগা হাসিমুখে সহজভাবে বললেন, এবেলাটা দয়া করে ঘাটে থাকতে আজ্ঞা হয় হুজুর, বিকালে জবাব দেবো।

জমাঁদার ঘোড়া নিয়ে ছুটল। গ্রাম থেকে মানুষটাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে থানায় এনে হাজির করল।

দারোগা বললেন, এই লোক হুজুর যাকে আমি খুন করে গাঙে ভাসিয়েছিলাম।

মানুষটা কসম খেয়ে বলে, খুনের কথা কি হুজুর, আমার গায়ে একটা আঙুল ঠেকায়নি কেউ। নির্দোষ বুঝে বড়বাবু একপেট খাইয়ে থানা থেকে ছেড়ে ছিলেন, পরমানন্দে সেই থেকে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছি।

খলখল করে হেসে বুড়ো-দারোগা এবার বংশীর কাছে রহস্যভেদ করেন: বুঝলে না? বস্তার মধ্যে খড়, চার-পাঁচজনে খড়ের বস্তায় লাঠি পেটাত। চেঁচামেচি কান্নাকাটি করত চৌকিদার একজন—বিস্তর মহলা দিয়ে তাকে শেখানো। তারপর কুয়োর জলে ভারী জিনিস কিছু ফেলে দেওয়া। যাত্রার পালায় করে, তেমনি জিনিস আর কি!

ধাপ্পায় পড়ে বোকারাম তুচ্ছু নাম বলে ফেলেছে, তাকে দোষ দিয়ে আর কি হবে? এইবারে দারোগা এদের সব নিয়ে পড়লেন। তিলকপুরের অপরাধী বংশী ও গুরুপদ মাত্র নয়—গোটা এলাকা ধরে টানাটানি। দশধারা রুজু হবে। ফৌজদারি কার্যবিধির একশ-দশ ধারা অনুযায়ী মামলা—চলতি কথায় দশধারা। ষোল আনা সাচ্চা আর কটা মানুষ—দায়ে দরকারে ঘটিটা কি কুড়ালখানা কিম্বা পরের ক্ষেতের কলা-কচু সবাই নিয়ে থাকে। কোন কারণে দারোগা বিগড়াল তো দিল এক দশধারা ঠুকে। অমুক অমুক লোকের রীতি প্রকৃতি খারাপ, খাওয়া-পরা চালানোর কোন সাধু পন্থা নজরে পড়ে না—এমনিধারা সন্দেহের উপর মামলা। দেশসুদ্ধ মানুষ সাক্ষি। শীতকালে হাকিমরা মফস্বলে বেরোন, মামলার শুনানি সেই সময়—গাঁয়ের উপর কোন এক অস্থায়ী ক্যাম্পে। জগৎবেড় জালে দিল তো সকলকে জড়িয়ে, যে পারে সে তদ্বির করে বেরিয়ে যাক। তদ্বির ঐ দারোগারই কাছে—নোট গুণে এবং টাকা বাজিয়ে তদ্বির করে এসো। যেমন এবারে বংশীর তদ্বির সাব্যস্ত হয়েছে এক-শ টাকা, ধোনাই মিস্ত্রির দশ। তদ্বির সারা হলে আসামির লিস্টি থেকে নাম তুলে নেবে। সেটা যদি সম্ভব না না হয়, সাক্ষিদের উল্টোপাল্টা বলিয়ে বেকসুর খালাস আদায় করে আনবে হাকিমের কাছ থেকে। পাকা কোঠাবাড়ি বানানোর খরচা সামান্য নয়—শোনা যাচ্ছে, পঞ্চাশ-ষাটটা নাম জড়াতে হয়েছে এবার।

বোঠে ফেলে বংশী খপ করে সাহেবের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে: মাকালীর দিব্যি করে বলছি, মামলা ঠেকাতে যা লাগে তার উপরে সিকি পয়সার লোভ করব না। পুরো এক-শ টাকাও চাচ্ছি নে আমি। তিন বিঘে ধান জমি আর গাইগরুটার খদ্দের দেখে এসেছি। তাতে অর্ধেক আন্দাজ উঠবে। গুরুপদও ধারকর্য করে কতক জোগাড় করে ফেলেছে। সবসুদ্ধ মোটের উপর শ দেড়েক হলেই আমাদের হয়ে যাবে। তার উপরে যত কিছু তোমার। এই চুক্তি—মাঙনা খাটাতে যাব কেন বলো।

বংশী বোঠে মারে, আর বিড়বিড় করে দুঃখের কথা শোনায়। গাইগরু বিক্রির বন্দোবস্ত করে এসেছে। আট আনা মূল্যে এইটুকু এক নুলেবাছুর কিনে অনেক যত্নে এত বড়টা করল। বয়স হয়ে গিয়ে গাবিন হয় না, আশা একরকম ছেড়ে দিয়েছিল। এতদিন পরে এইবারে প্রথম বাছুর হল। বংশীর বউ বলে, হয়েছে আমার বাচ্চার কপালে—বাচ্চাছেলে দুধ খাবে বলেই গরুর দেবতা মাণিকপীর এতকাল বাদে বাছুর দিলেন। ঘরের গাইয়ের দুধ পেয়ে বলতে নেই, ছেলে বেশ ইয়ে মতন হয়েছে। বাচ্চার ভরপেট হয়ে এক একদিন বাপের পাত অবধি দুধ এসে পড়ে। গাই-বিক্রির কথা বউকে ঘুণাক্ষরে জানানো যাবে না। কৌশলটা সে ভেবে রেখেছে। গাঁয়ের বাইরে কোনখানে গরু বেঁধে আসবে সন্ধ্যার পর গরুর দড়ি খন্দেরের হাতে তুলে দিয়ে টাকা নিয়ে নেবে। গরু ফিরছে না—বউ জানবে হারিয়ে গেছে। লোক-দেখানো খোঁজাখুঁজিও হবে কয়েকটা দিন—মনে মনে বংশী সমস্ত ছকে রেখেছে।

গুরুপদ হঠাৎ গর্জে উঠল: ঐ যে থানায় থানায় দারোগা-জমাদার পুষে রেখেছে, ওরাই মানুষকে ভাল থাকতে দেবে না। ঘর থেকে তাড়িয়ে বের করে। ওদের বিদায় করুক, চুরি-ছ্যাঁচড়ামি দেখো আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

কী বলছ তুমি ঢালির পো! সরল মানুষ ধোনাই মিস্ত্রি ঘোর প্যাঁচের কথা বোঝে না। বলে, দারোগা পোষে তো চোর ঠেকানোর জন্যেই—

গুরুপদ বলে, আর দারোগা চোর পোষে চাকরি ঠেকানোর জন্য। তালুক-গাঁতি কিনবার জন্য, দালান-কোঠা দেবার জন্য। চোরের অনটন পড়ল চাপ দিয়ে ভাল গৃহস্থকে চোর বানিয়ে নেয়।

আঘাটায় ডিঙি বেঁধেছে, গাঁ নিশুতি হবে সেই অপেক্ষায় আছে। আহা-মরি কী চমৎকার রাত্রি! কৃষ্ণপক্ষ, তার উপর মেঘ থমথম করছে আকাশে। কোন দিকে বৃষ্টি হচ্ছে, ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া। গরমকালে হঠাৎ যদি ঠাণ্ডা পড়ে যায়, তেমনি রাত্রি কাজকর্মের পক্ষে প্রশস্ত। মানুষ শুতে না শুতে ঘুমিয়ে পড়বে। সে বড় গাঢ় ঘুম—মরণের দোসর। এমনি রাত্রে যে কারিগর ঘরে বসে থাকে, ওস্তাদের শাপশাপান্ত আছে: সেই অপদার্থ কাঠি ফেলে কলম ধরে কেন বাবু হয়ে যায় না?

ঘুটঘুটে অন্ধকার। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে গায়ে। ধোনাই মিস্ত্রি সকলকে মক্কেলের বাড়ি হাজির করে দিল। মামুদ আলি লোকটা সত্যি পয়সা করেছে। চাষীর যাতে পয়সা এলে পর পর চার লক্ষণে প্রকাশ পাবে। উৎকৃষ্ট হালবলদ সর্বাগ্রে—সে এমন, কাজ ফেলে মাঠের যত চাষা আসবে বলদের গায়ে একবার করে হাত বুলিয়ে যেতে। বলদ হল তো ঘোড়া—হেঁটে বেড়ানো পোষাচ্ছে না আর তখন, ঘোড়ার পিঠে গমনাগমন। ঘোড়ার পর বউ—একটা সকলেরই থাকে, কোন ঐশ্বর্যের চিহ্ন নয়, বিয়ে বা নিকে করে যাও যতগুলো সম্ভব। এবং সর্বশেষ পাকাদালান। মামুদ আলির চার দফাই হয়ে গেল। দালান দিয়েছে

—একতলায় শেষ নয়, ছাদের উপরে দোতলায় ঘর। সম্পূর্ণ হয়নি, দরজা-জানলা ও পলস্তারার কাজ বাকি হতে হতে বিয়ে এসে পড়ায় কাজকর্ম বন্ধ এখন দিন কতক। সিঁড়ি বাইরের দিকে, তারও ইটগুলো মাত্র বসানো হয়েছে। উঠতে পারা যায় এই পর্যন্ত। ধোনাই মিস্ত্রি গাঁথনির কাজে জোগাড় দিত, বাড়ির অন্ধি-সন্ধি তার নখদর্পণে।

বংশী অবাক হয়ে বলে, কী বিয়েবাড়ি রে বাবা! দেড় পহর হতে না হতে আলো নেভানো। ভেবেছিলাম কতক্ষণ না নজর ধরে বসে থাকতে হয়।

ধোনাই বলে, ছেলের বিয়ে যে! দুপুরবেলা বর নিয়ে সব মেয়ের বাড়ি রওনা হয়ে গেছে। বউ এসে পড়বার পর তখনই এ বাড়ি বাজনা-বাদ্যি হৈ-হল্লা খানাপিনা। ঢেল আয়োজন করেছে. পাঁচ সাত গাঁয়ের স্বজাত ভিনজাত আত্মীয় কুটুম্ব সকলের নেমন্তন্ন।

সাহেব ফিক করে হেসে ফেলে: রাতের কুটুম আমাদের ভোজ সকল কুটুম্বের আগে—

ভাঁড়ার উপরের ঘরে। জিনিসপত্র কেনাকাটা করে সেখানে এনে রেখেছে। ওস্তাদ বলেন, আগে বেরুনো, পরে ঢোকা। মানে হল, ঢোকবার আগে বেরুনোর বন্দোবস্তটা নিখুঁত হয় যেন। দোতলায় উঠবার নামে তা-বড় তা-বড় কারিগরও আঁতকে ওঠে। কিন্তু সাহেব বেপরোয়া—অন্তত আজকের এই দিনটা। সাঙাতের কথায় এসেছে—তাদেরই কাজ। বংশীর আবার এ-কথাতেও আপত্তি: আমাদের কাজ হল কিসে? কাজটা বুড়ো দারোগার—তাঁরই দালানকোঠা হবে। ধরতে পারলে নিয়ে তুলবে তাঁরই কাছে তো—তিনি কি আর বিবেচনা করবেন না?

কিন্তু হলে হবে কি—সিঁড়ির উপর মানুষ শুয়ে আছে আড় হয়ে। তাতে কি ডরায়! 'চলনে বিড়াল, সরে পড়ায় সাপ'। দুটো সিঁড়ি বাদ দিয়ে পুনশ্চ একজন। তাকেও পার হল। আরও কিছু গিয়ে চাতালের উপর একগাদা মানুষ পাশাপাশি। কাজের বাড়ি মানুষ অনেক জমেছে। বৃষ্টি বাদলার মধ্যে জায়গার অভাবে সিঁড়িতেই শুয়ে পড়েছে। এত ডিঙিয়ে যাওয়া অসম্ভব—হনুমান না হলে হয় না। বেকুব হয়ে ফিরতে হল। খানিক দূরে এসে দেখে ধোনাই মিস্ত্রি নেই। যায় কোথা ধোনাইটা আচমকা এমন দল ছেড়ে?

বৃষ্টি তেমনি লেগেছে। টিপটিপ করে পড়ছিল—মুষলধারে এলো। ভিজে জবজবে। অনতিদূরে গোয়ালবাড়ি কাদের। একদৌড়ে ছাঁদতলায় গিয়ে দাঁড়াল।

বংশী সাহেবের গা টেপে: ভিতরে মানুষ।

গোয়াল লোকে যেমন-তেমন করে ঘেরে, গরু না বেরুলেই হল। মশা তাড়ানোর জন্য সাঁজাল দিয়ে গেছে। আগুন গনগন করছে। সেই আগুন ঘিরে বসে ক'জনে হাত-পা সেঁকছে।

হেন ক্ষেত্রে টিপিটিপি সরে পড়া উচিত। কিন্তু সাহেবকে বজ্জাতি-বুদ্ধিতে

পেয়ে বসল—হাঁক দিয়ে ওঠে : কারা ওখানে?

বংশী সন্ত্রস্ত হয়ে হাত টানছে পালাবার জন্য। সাহেব গ্রাহ্যের মধ্যে নেয় না।

কি করো তোমরা?

মিনমিনে গলায় জবাব আসে : খোলাট পাহারা দিচ্ছি।

সত্যি বটে, গোয়ালের ওদিকটায় গোলা, ধান তোলার খোলাট। গলার সুর আরও চড়িয়ে সাহেব ধমক দেয় : কে পাঠাল তোমাদের পাহারা দিতে? এসো, এদিকে চলে এসো, দেখে নিই—

লোকগুলো একলাফে উঠে পড়ে দৌড়।

সাহেব হি-হি করে হাসতে হাসতে বলে, দেখলে, আমি কেমন বুঝতে পারি। আমরাই মজা করে হাত-পা সেঁকি এবার। বাদলা রাতে ওরাও কাজকর্মে বেরিয়ে পড়েছে।

বংশী তিক্তস্বরে বলে, বেরিয়েছে ওরা দারোগার ঠেলায়—আমি দিব্যি করে বলতে পারি। এলাকা জুড়ে জাল বেড় দিয়েছে। মুখ ঢেকে পালাল, নয়তো ঠিক চেনা মানুষ বেরুত। একই দশধারা মামলার আসামী। ষাটটা নাম জড়িয়েছে, কেউ কি বাদ আছে এবারে?

গনগনে আগুন দেখে গুরুপদর তামাকের পিপাসা পেয়ে গেছে। বলে, কলকে-তামাক পেলে দু-টান টেনে নিতাম, ঠাণ্ডায় কাঁপুনি ধরে গেছে গো—

ডিঙিতে ফিরে দেখল, ধোনাই ইতিমধ্যে এসে গেছে। গুরুপদ সর্বাগ্রে নারিকেলখোসার নুড়ি পাকাতে লেগে যায়। তামাক টেনে চাঙ্গা না হয়ে বোঠেয় সে হাত দিচ্ছে না।

বংশী ধোনাইকে প্রশ্ন করে : ডুব মেরেছিলে কোথা?

বোঠের গায়ে জল ঠেলতে ঠেলতে ধোনাই বলে, চিল পড়লে কুটোগাছটি না নিয়ে ওঠে না। সেই নিয়ম আমার, খালি হাতে ফিরিনে।

একটা চটের থলি পা দিয়ে ঠেলে দিল। হাত ঢুকাল বংশী—আর দু-জন পরমাগ্রহে চেয়ে রয়েছে। বেরুচ্ছে একে একে হাত-করাত, বাটালি, রেঁদা, আগর, সরবালি—মামুদ আলির নতুন দালানে ছুতোরমিস্ত্রি কাজ করে, কাজের শেষে যন্ত্রপাতি থলি ভরে রেখে যায়। পুরানো ক্ষয়া জিনিস, রোজ রোজ ঘাড়ে করে নিয়ে যাবার মতন কিছু নয়। অন্য বমাল না পেয়ে ঐ ছুতোরের থলিতে ধোনাই এর নজর গিয়ে পড়ল।

খান দুই বাঁক এগিয়ে ধোনাই আবার এক কাণ্ড করে। পাশখালির মোহানায় জেলেডিঙি বাঁধা। ভাঁটা লাগলে জাল ধরবে, ততক্ষণ জেলেরা সুখ করে ঘুমিয়ে নিচ্ছে। হেসো-দা দিয়ে ধোনাই কাছিতে দিল পোঁছ। বনবন করে নৌকো পাক খাচ্ছে, লোকগুলো তবু জাগে না। চৈত্রের গাজনে চড়ক,

গাছে ঘুরছে, তেমনি একটা কিছু ভাবছে হয়তো। গুড়োর উপর বেউটিজাল— জালগাছি তুলে নিয়ে ধোনাই জেলেডিঙিতে সজোরে ধাক্কা দিল। চলে যাক মাঝ-গাঙের দুরন্ত টানে। এখন জেগে পড়লেও ঐ টান কাটিয়ে পিছু নিতে পারবে না।

সাহের রাগ করে ওঠে ঃ জাল ওদের ভাতভিত্তি, সেই জিনিস নিয়ে নিলে তুমি?

ধোনাই হি-হি করে হাসে ঃ বেঁচেবর্তে সুভালাভালি ঘরে ফিরলে তবে তো ভাত! সে আর হচ্ছে না। ডুবে মরবে দয়ে পড়ে, ডুবে গিয়ে তবে যদি ঘুম ভাঙে!

হুঁকো চলছে হাতে হাতে। দু-চার টান টেনে তাড়াতাড়ি গরম হয়ে নেবার গরজ। ধোনাই সাহেবের দিকে হাত বাড়ায় ঃ আমায় দাও—

হুঁকোর মাথা থেকে কলকে নামিয়ে সাহেব তার দিকে দিল ঃ হুঁকো পাবে না, ছোটজাত তুমি—

সাহেব জাত-জাত করছে—আর দু-জন অবাক হয়ে গেছে। সেই সাহেব, একদিন যে তুণ্টু ডোমকে হিড়-হিড় করে দাওয়ার উপর তুলেছিল। গুরুপদ বলে, কাজের মধ্যে জাত-বেজাত কী আবার! ও জিনিস গাঁয়ে ঘরে ফেলে এসেছি। ঘরে ফিরে গেরস্ত-মানুষ হয়ে ফোঁপর -দালালি করব—সেই সময় তুলে নেবো।

সাহেব বলে, জাত কাজের মধ্যেও আছে। গরিব মেরে ছ্যাঁচড়া কাজকর্ম— সেই দিকে ধোনাই মিস্ত্রির ঝোঁক। ছুতোরের যন্ত্রপাতি হাতিয়ে আনল, জেলের জাল নিল। আমরা চোর, ধোনাই ছিঁচকে। ঘটিচোর বাটিচোর সেই দলের। হুঁকো দিলে জল মরে যাবে, জল বদলে ফেলতে হবে।

কলকে স্পর্শ করে না ধোনাই। দুঃখ পেয়েছে, মুখ ফিরিয়ে ঝপাঝপ বোঠে মারছে। বংশী তার হয়ে বলে উঠে ঃ বেশ করেছে ধোনাই। গরিব না মেরে লাখপতি কোটিপতি পাই কোথা এখন? মামুদ আলিকে মনে করে এলাম, সে লোক তো ফেঁসে গেল। খালি হাতে ফেরার চেয়ে পাঁচটা টাকাও যদি আসে, খানিক তবু এগোল। তোমার নিজের কিছু নয়—ফাঁকে ফাঁকে আছ, দয়া করতে এসেছ, আমাদের দায়টা কেমন করে তুমি বুঝবে?

আগের কথার খেই ধরে বংশী আবার বলছে, পাঁচ টাকা না হয়ে পাঁচ সিকে হলেই বা কে দেয়? এক-একটা দিন চলে যায় মাথায় যেন একটা করে মুগুরের ঘা দিয়ে। মাথার উপর দশধারা যদি না ঝুলত, হীরামাণিক মাঠে পড়ে শুকোলেও বাচ্চা ফেলে ঘর থেকে বেরুতাম না। কী বলব সাহেব—কুটুম্ব বাড়ি গিয়েও এখন ফালুক-ফালুক করি। চুল আঁচড়াতে চিরুনি দিয়েছে, সেটাও পকেটে ফেললাম। এক-শ টাকার কোন না এক আনার পয়সা উশুল হয়ে আসবে।

মা-কালীকে কাতর হয়ে ডাকছে ঃ চলনসই একটা ঘর জুটিয়ে দাও মাগো।

তারপর কে আর কাক চিলের মতন ঠোকর দিয়ে বেড়ায়! আর দশটা গৃহস্থের মতো আমরাও বাড়ি গিয়ে উঠব।

চোর-ডাকাত-ঠগীর ইষ্টদেবী কালিকাঠাকরুন নিজে নাকি অদর্শন থেকে ভক্তদলের কাজকর্মের চালনা করেন। কিন্তু আজকের ব্যাপারে দেবীর চাড় দেখা যাচ্ছে না, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা রাত পেয়ে তিনিই বা ঘুমিয়ে পড়লেন!

আরও কয়েকটা জায়গায় নামল তারা ডিঙি থেকে। আশায় আশায় এগিয়ে যায়। এক উঠানে পা দিয়েছে কি, সাহেবের পিঠে যেন চাবুক পড়ে।

এসো, শিগগির বেরিয়ে এসো—। হাতের কাছে যাকে পেল, তাকেও টেনে বের করে আনে।

সকলে হকচকিয়ে গেছে। বংশী বলে, ভয় পেলে কেন সাহেব?

গৃহস্থ জেগে পড়লে টের পেতে মজা।

সে তো সব গৃহস্থ রে! কে কবে আমাদের ফুলচন্দন দিয়ে ডাকাডাকি করে?

সাহেব বলে, এরা তাই করত। আসতে আজ্ঞা হয় চোরমশায়রা। এসেই যখন পড়েছেন, দান করে যান কিছু।

কথা বড় মিথ্যা নয়। বড়লোক ক'জন—দুনিয়াই তো এরা সব। দিনমানে দশের মাঝে অত বোঝা যায় না বুঝতে দেয় না মানুষে, ঢেকেঢুকে সেরে-সামলে বেড়ায়। রাত্রিবেলা আপন জনদের ভিতর খাওয়া-দাওয়া সাজগোজ কথাবার্তা অসাবধান—নিরাবরণ। ঈশ্বরের খবর জানি নে, কিন্তু চোরের কাছে আসল অবস্থা চাপা থাকে না।

গাঙে-খালে অকারণ ঘুরে ঘুরে মন ভারী সকলের। সাহেবই কেবল হাসি-খুশি। তার কিছু খারাপ লাগছে না। এক সময় বলে উঠল, হারুন-অল-রশিদ ছিলেন বাগদাদের খলিফা। তাঁরই মতন হল। উজির-নাজির নিয়ে ছদ্মবেশে সারারাত ঘুরে প্রজাপাটকের খবর নিতেন। আমাদেরও তাই কিনা, বলো ভেবে? এই যত দেখছি, প্রজাপাটক আমাদের। দিনমানে ভিন্ন রাজা—রাত্তির নিশুতি হলে মুলুক জুড়ে আমাদের রাজত্ব হয়ে যায়। যেখানে খুশি যাই—ত্যাঁদোড় প্রজারা নিজের ইচ্ছেয় দেবে না তো রাজকর ইচ্ছে মতো নিজের হাতে তুলে নিয়ে আসি।

একটু চুপ করে থেকে বলে, যত প্রজা এই দেখে এলাম—নিতে পারা গেল না তো দিয়ে আসাই উচিত। শুধুই নিলে রাজার রাজত্ব থাকে না, দিতে হয় অবস্থাবিশেষে। ভাল ভাল মুরুব্বি চোর দিতেন সেকালে। অপহারবর্মনের কথা ওঠে—চুরি করতেন তিনি গরিবকে ধনী, আর ধনীকে গরিব করবার জন্য। এক রকমের গুঁটিখেলা আর কি—ঝাঁকি দিয়ে চিৎ-গুঁটিকে উপুড় আর উপুড়-গুঁটিকে চিৎ-করা।

সাহেবের রঙ্গরসে কারো কান নেই, নিজের ঝোঁকে সে বকবক করছে।

আবার বিপদ, ক্ষিদে পেয়ে গেছে বিষম। ক্ষিদের দোষ নেই—জোয়ানপুরুষ, মরা নাড়ি কোনটার নয়। কোন্ দুপুরে চাট্টি মুখে দিয়ে বেরিয়েছে—এক মামুদ আলির বাড়ি হয়েই ফিরবার কথা, ক্ষিধে ঠেকাবার উপায় ভেবে আসেনি। এখন যত ভাবছে, পেটের মধ্যে তত দাউদাউ করে ওঠে। ধোনাই মিস্ত্রি খাওয়ার গল্প করে ঃ রাতের কাজে বেরিয়ে কাদের রান্নাঘরে ঢুকে এক খোরা পান্তা মেরে দিয়ে এসেছিল একবার। পান্তাভাত আর কাসুন্দি।

গুরুপদ চটে উঠল ঃ সাহেব ঠিক বলেছে, সত্যি তুই ছোটজাত। নজর নিচু। সেই রান্নাঘরে ঢুকলি, খেয়েও এলি। পান্তাভাত তবে কি জন্য খাবি, পোলোয়া-কালিয়া খেয়ে এলি নে কেন হতচ্ছাড়া ?

ধোনাই অবাক হয়ে বলে, পোলায়া-কালিয়া রেঁধে রাখে বুঝি—খেয়ে এসে তার গল্প করব ?

সাহেব হাসতে লাগল ঃ না খেয়েও গল্প হয় রে ধোনাই। পোলোয়া খায় তো বাবুভেয়েরা। মুখের গল্পে আমাদের সুখ।

গুরুপদ সাহেবের সুরে দোহার দেয় ঃ সত্যবাদী যুধিষ্ঠির আমার—সত্যি বই মিথ্যে মুখে আসে না ! নজর ছোট, ঐ যা বললাম। গল্পের খাওয়া—তাও পান্তার উপর উঠতে পারে না।

বংশীও আসরে নামে। পোলাও না হোক,—পাঁচ-সাতখানা তরকারি এবং পিঠেপায়েসে চতুর্দিকে সাজানো বাড়া-ভাত সে খেয়ে এসেছে। সত্যি সত্যি খেয়েছে, বানানো কথা নয়।

শিবপুজো বলে আছে এক ব্যাপার। সন্ধ্যাবেলা বনের ধারে গলবস্ত্র হয়ে শিয়ালকে নিমন্ত্রণ করে আসতে হয়। তারপরে থালায় ভাত বেড়ে বাটিতে বাটিতে ব্যঞ্জন সাজিয়ে কোন ফাঁকা জায়গায় রেখে গৃহস্থ শুয়ে পড়ে। বনের শিয়াল চুপিসারে এসে খেয়ে যায়। পুঁথিপত্রে চোর পুজোর এমনি কোন বিধান থাকত যদি ! না থাকুক, বংশীই শিয়াল হয়ে সেবার শিবাভোগ খেয়ে এসেছিল।

গাঙ ছেড়ে ডিঙি খালে ঢুকে পড়েছে। সরু জলপথ—এর ঘরের কানাচ দিয়ে ওর বোধন তলার নিচে দিয়ে। গলা ছেড়ে দিয়ে মানুষ এপার ওপারে দিব্যি গল্পগুজব করতে পারে। চুপ, একটি কথা নয় ! বোঠে খুব নরম হাতে ধরো এবার—

পালাকীর্তন একবাড়ি—এত রাত্রেও চলেছে। উঠানে পাল খাটিয়ে হেরিকেন ঝুলিয়ে দিয়েছে, খাল থেকে নজরে পড়ে। বোঠে ফেলে সাহেব উঠে দাঁড়ায়, ডিঙি লাগাতে বলে। না লাগালে ডাঙায় লাফ দিয়ে পড়বে, এমনিতরো ভাব।

ধোনাই বলে, এই দেখ। পেটে বাপান্ত করছে—ঠাকুরের নামে কি ক্ষিধে মরবে ?

বংশী সাহেবের পক্ষে ঃ চলোই না—শুনে আসি। কান পচে যাবে না। বেয়ে

বেয়ে শুধু হাতই ব্যথা—খিধে না মরুক, জিরানো যাবে তো একটুখানি।

বলে, ছোটমামা সাহেবকে বলত ভক্ত মানুষ। রোখ যখন চেপেছে, ঠেকানো যাবে না। তবে একটি কথা, লেপটে থেকো না সাহেব—একটু শুনেই চলে আসবে।

কিন্তু উল্টো বুঝেছে সাহেবকে। গলা বাড়িয়ে আসরে একবার উঁকি দিয়ে দেখে সাহেব অন্য দিকে পা চালায়। কত বাড়ির কত উঠানে গেল। হারুন-অল-রশিদের নগর-পরিক্রমা। এক-একটা ঘর ধরে চক্কোর দিল কত সময়। মাটিতে পা ছোঁয় না যেন, মাটির পরে ভেসে বেড়াচ্ছে।

এরা তিনজন পিছনে—দূরে দূরে। সমস্ত পাড়াটাই ঘোরা হয়ে গেল। কাঠির কাজ আজ নয়। গুরুর হাতের কাঠি বউনির মুখে যত্রতত্র বের করা চলবে না। হাতের মাথায় যা আসবে, তাই কেবল তুলে নেওয়া। রাই কুড়িয়ে বেল—সে রাইয়ের একটি দানাই বা মেলে কই?

তবু সাহেব খুশি। নিকানো-আঙিনা ঘরদুয়ার গোয়াল-ঢেঁকিশালা ঘুরে ঘুরে দেখে—দিনমানের মানুষ যেখানে সংসার-ধর্ম করে, ছেলেপুলেরা খেলাধুলা করে, মেয়েরা ব্রতনিয়ম করে, বিয়েথাওয়া অন্নপ্রাশন কথকতা হয় যেখানে। দেবতার পীঠস্থানের মতো পুণ্যময় আশ্চর্য জায়গা—দেখে কিছুতে সাহেবের আশ মেটে না।

এক সময় বংশীর কানে কানে বলে, এ গাঁয়ের মানুষগুলো হুঁশিয়ার খুব—পুণ্যি করতে গিয়েছে ষোলআনা সামাল হয়ে। ঘরে ঘরে তালা, তালার চাবি আঁচলে গিঁট দিয়ে তবে বসে হরিনাম শুনছে। পাহারার মানুষও রেখে এসেছে কেউ কেউ। তোমরা দেখনি, আমি দেখে এড়িয়ে এসেছি।

বংশী বিরস মুখে বলে, আমাদের যাত্রাটাই অপয়া। চলো নৌকোয় ফিরি—

যে উঠানে গাওনা হচ্ছে, সর্বশেষ এবার সেই বাড়ির ভিতর ঢুকল। সামনের ঘরটা খোলা। এবার অসাবধান—বাড়ির উপর গাঁয়ের তাবৎ মানুষ, সেই সাহসে বোধহয়। সাহেব আর বংশী ঘরে ঢুকে গেল। অন্য দুজন বাইরের পাহারায়।

ধামা-ঝুড়ি ডালা-কুলো যত আজেবাজে জিনিস। বড়ির হাঁড়ি, আমসত্তর হাঁড়ি, আমসির ভাঁড়। মাচার উপরে উঠে পড়ল। তোষক-বালিশ-লেপ গাদা করা—কী বাহারের বিছানা মরি-মরি! সাহেব সেই যখন শ্মশানে শয়নঘর বানিয়েছিল, মড়ার সঙ্গে এমনি বস্তু দেখতে পেত।

বিছানা উল্টেপাল্টে টিনের পোর্টম্যান্টো পাওয়া গেল। চাবি-আঁটা। এই তবে আসল বস্তু—নজরে না পড়ে সেজন্য বালিশ ঢেকে দিয়েছে। একটু চাড় দিতে পুরানো বাক্সর পতরের জোড় খুলে গেল। ধোপদুরস্ত কাপড়ে ঠাসা—দামি দামি বেনারসিও। 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই'—ছেঁড়া বিছানা দেখে দুত্তোর বলে চলে যায়নি ভাগ্যিস।

কত বড় আঁচলা রে বাবা, কত শ' টাকা না জানি দাম! সাহেব বলে, এ শাড়িটা বিক্রি করা হবে না, বউকে দিও বংশী। খুশি হবে।

বংশী আঁতকে উঠল: সর্বনাশ, জেরা করে করে সব বের করে ফেলবে, আস্ত রাখবে না আমায়। বিক্রি কেন হবে, তুমি রেখে দাও সাহেব। তোমার বউ এলে পরাবে।

কৌতূহলে এরই মধ্যে একটু ভাঁজ খুলল। বউকে পরানোর বস্তুই বটে! ছিঁড়ে জাল-জাল হয়ে গেছে, বিগত পরিমাণ আস্ত নেই। সলতে পাকানোর ন্যাকড়া অথবা গোবর নিকানোর ন্যাতা ছাড়া অন্য কাজে আসবে না। ছেঁড়া কাপড়গুলো এমন যত্নে কেন রাখা, অতিসঞ্চয়ী গৃহস্থই শুধু বলতে পারে। বেনারসি ফ্যাসফ্যাস করে ছিঁড়ে সাহেব শতেক ফালি করে। যত আক্রোশের শোধ তুলছে শাড়ির উপর।

স্ত্রী-কণ্ঠে কোন দিয়ে বলে উঠল: কারা ওখানে?

সাহেব চেপে থাকতে পারে না। গলায় বিকৃত আওয়াজ তুলে বলে, ছেঁড়া ত্যানা কার জনে পুঁজি করে রেখেছ? এই বেনারসি পরে শ্মশানে যাবার বুঝি সাধ?

এর পরেই তো চেঁচিয়ে ওঠা, এবং আসর ভেঙে মানুষের হৈ-হৈ করে পড়বার কথা। হয়ে থাকবে তাই। সাহেবরা কিছু জানে না, ডিঙি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে।

সতের

সকাল হল।

হারুন-অল-রসিদ ও তস্য উজির-নাজিরগণ রাতভোর রাজ্য দর্শন করে ঘুরেছেন। রাজকর সেই ছুতোরের যন্ত্রপাতি ও জেলের জাল—তার উপরে আর ওঠেনি। তবে ক্ষিধের ব্যবস্থা যা-হোক কিছু হয়েছিল বটে। কুকুরের অনুগ্রহে। মানুষ নয়, কুকুর।

কুকুর সে-বাড়ি একটা নয়, বোধকরি এক গণ্ডা দেড় গণ্ডা। যেই পা দিয়েছে, চতুর্দিকে থেকে গ-গ করে এসে পড়ল। দৌড়, দৌড়। কুকুরগুলোও তাড়া করেছে। সর্বনেশে কাণ্ড! মুরুব্বিরা এইজন্য মাথা-ভাঙাভাঙি করেন: যথোচিত বন্দোবস্ত বিনা কখনো কেউ কাজে না নামে। গোঁয়ার্তুমিতে নিজের আখের নষ্ট এবং বৃত্তির বদনাম। সেই ব্যাপারই হতে যাচ্ছিল কাল রাত্রে।

কুকুরের তাড়ায় উঠি-কি-পড়ি ছুটেছে। গ্রাম ছেড়ে মাঠে পড়ল। ঝোপঝাড় পেয়ে তার মধ্যে ঢুকে গেল! সন্ধান করতে না পেরে কুকুর আরও খানিক ডাকাডাকি করে ফিরল। তারপরেও অনেকক্ষণ এরা নিঃসাড়।

ঢোকবার সময় ঠাহর হয়নি—ভয় কেটে গিয়ে দেখে, আখের ঝাড়ের ভিতর ঢুকেছে। কুকুরকে তখন উপকারী বলে মনে হয়। ক্ষিধেয় ছন্নছাড়া হয়ে

ঘুরছিল, কুকুরই আখের ক্ষেতে তাড়িয়ে তুলে দিল। ঘেউ ঘেউ করছিল, এবারে তার মানে পাওয়া যায় ঃ চক্ষুহীন মুর্খের দল, খাদ্য বুঝি লোকের রান্নাঘর ছাড়া থাকতে নেই ? কত খাবি, প্রাণভরে খেয়ে নে।

আখ ভেঙে ভেঙে দেদার খেয়েছে। এক জিনিসে ক্ষিধে-তেষ্টা উভয়ের শান্তি।

রাত্রি গিয়ে এবারে দিনমান। গোনে ছুটে চলেছে ডিঙি। চার মরদে আয়োজন করে বেরিয়েছে—কাজের ষোলআনা সমাধা না হওয়া অবধি এ ডিঙির মুখ ফেরাবে না। অর্থাৎ দারোগার টাকা পুরোপুরি যতক্ষণ না আসছে। বংশীদের হয়ে গিয়ে টাকা বাড়তি থাকে তো অন্য যারা ভিন্ন দল হয়ে বেরিয়েছে, তাদেরও দিয়ে দেবে। দশধারা যাতে অঙ্কুরেই বিনাশ পায়।

দিগ্বিজয়-যাত্রার মনোভাব ঃ মারো বোঠে—শাবাস! জোরে মারো, আরও জোরে—। বোঠে মারা নয়, যেন বিয়ের বরণ করা হচ্ছে। কী গো মরদ-মশায়রা –

ধোনাই কাতর স্বরে বলে, উপোসি থেকে কত আর হবে ?

ভাতের বদলে একটা আস্ত পাহাড় গলাধঃকরণ করলেও এদের উপোস। সাহেব গান ধরে বসল অকস্মাৎ। গানে পুত্রশোক ভোলায়, ভাতের শোক যাবে না ? কালীঘাটের বস্তির ঘরে ঘরে এই সব গান উঠত। মুক্ত গাঙের উপর সাহেব আজ ক্ষণে ক্ষণে গলা ছেড়ে দিচ্ছে ঃ

> কাদের কুলের বউ গো তুমি কাদের কুলের বউ,
> জল আনতে যাচ্ছ একা, সঙ্গে নাইক কেউ।
> যাচ্ছ তুমি হেসে হেসে, কাঁদতে হবে অবশেষে,
> কলসি তোমার যাবে ভেসে, লাগবে প্রেমের ঢেউ।

গান হাসিহল্লা হেনক্ষেত্রে ভালই। স্ফূর্তিবাজ চারটে ছোঁড়া চলেছে—লোকে ভাববে। খারাপ অভিসন্ধি থাকলে এমন হৈ-হৈ করে না। চুপিসাড়ে যায়।

বেলা চড়ে যেতে পেটে আবার সোরগোল উঠল। ক্ষণে ক্ষণে ক্ষিধে দিয়ে বিধাতা মানুষের সঙ্গে শত্রুতা সেধেছেন। নয়তো ভাবনার কী ছিল! বংশী একটুখানি ভেবে বলে, টেনে চলো দিকি। বাবুপুকুরে কুটুম্ব আছে, ধর্মদাস গরাই। সম্পর্কে মামাতো শালা। অতিথি হইগে, খাতির না করে পারবে না।

ধোনাই বলে, বাবুপুকুর কি এখানে! হাতে-পায়ে খিল ধরে বোঠের মুঠো আলগা হয়ে আসছে। পেটে কিছু না পড়লে আমি বাপু শুয়ে পড়ব।

সকলের মনের কথাই মোটামুটি এই। গুরুপদ প্রস্তাব করে ঃ বমাল কিছু ছেড়ে দেওয়া যাক। খোরাকি খরচার মতন। খালিপেটে খাটা যায় না।

এদের মাল হাটে-বাজারে নেওয়া যাবে না। সংসারে খারাপ মানুষ আছে তো কিছু কিছু, মাথা-গরম ধর্মধ্বজী মানুষ – হল্লা তুলে তারা ধরিয়ে দিতে পারে। এ মালের জন্য আলাদা মানুষ—থলেদার বলে তাদের। থলেদার ফলাও কাজ-কর্ম ধরলে তখন মহাজন। জগবন্ধু বলাধিকারী যেমন। গুরুপদর চেনা এক

খন্দেদার কাছাকাছি থাকে—নবনী ধাড়া। নবনীকান্তের চোটার কারবার। নিকারিরা মাছের ডালি মাথায় বয়ে হাটে হাটে বিক্রি করে—টাকা প্রতি দৈনিক এক আনা সুদে নবনী মূলধনের যোগান দেয়। সেইটে প্রকাশ্য, তদুপরি এই গুপ্ত লেনদেন।

ডিঙিতে রইল সাহেব আর বংশী, গুরুপদ ধোনাইকে নিয়ে চলল। ধোনাইর কাঁধে বেউটিজাল, গুরুপদর হাতে চটের থলি। বাড়ির কাছাকাছি বটে, তাই বলে কি ঘাটের উপর? হাঁটতে হাঁটতে বেলা মাথার উপর এলো। তবু ভাগ্য, নবনীকান্ত বাড়ি আছে, সুদ আদায়ে বেরিয়ে পড়েনি। চোটার সুদ দিন-কে-দিন তুলে নিতে হয়।

গুরুপদবাবু যে! পথ ভুলে নাকি? আমি যে পয়সা দিই সে বুঝি ঘষা? বাজারে চলে না?

গুরুপদ আমতা-আমতা করে বলে, কাজকর্ম নেই—খালি হাতে এসে কি হবে?

চেহারায় তো তেলটি-ফুলটি। চাকরি-বাকরি নিয়েছ—লাট সাহেব মারা গিয়েছিল, সেই চাকরিটা নাকি?

হেসে ওঠে নবনী হি-হি করে। বলে, ঘরে মুড়কি আছে—খাবে?

অতিশয় প্রয়োজন। কিন্তু নৌকোর দুজনকে ফেলে খাওয়া চলবে না। এ-ও দলের নিয়ম। গুরুপদ বলে, দাও চাট্টি। এখানে খাব না, কোঁচড়ে করে নিয়ে যাই।

নবনীকান্ত বলে, কি এনেছ, দিয়ে দাও। দেখেশুনে রেখে আসি।

থলির মালপত্র বের করে। নবনী এক নজর দেখেই মুখস্থর মতো দাম বলে যায়, করাত সাত আনা, আগর আট আনা, বাটালি চার আনা, রেঁদা পাঁচ আনা, একুশে দাঁড়াল গিয়ে—

গুরুপদ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে, কোহিনুর হীরে আনলেও আনার মধ্যে থাকবে। তোমার কাছে কখনো টাকা পুরতে দেখলাম না ধাড়ার পো। হাতকরাত বাজারে একখানা কিনতে যাও—কম-সে-কম সাত-আট টাকা। হোক পুরোনো, তা বলে কি—

নবনী তাড়াতাড়ি বলে, পুরো টাকাই দিতাম আলি। কিন্তু করাতের তিনটে দাঁত যে ভাঙা। তিন আনা হিসাবে তিন-তিরিক্কে ন-আনা বাদ দিয়ে দেখ, এবারে কত দাঁড়ায়।

ধোনাই মিস্ত্রির কাঁধের জালের দিকে আঙুল তুলে বলে, দেখি, হাতে দাও—

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল, টাকা কেন—তারও উপরে দেওয়া যেত। পাঁচ সিকে অবধি উঠে যেতাম। কতগুলো ঘর ছেঁড়া, চেয়ে দেখ। ঘরপিছু দুটো করে পয়সা হলেও পাঁচ-ছ' আনা বাদ চলে যাবে।

ধোনাই একটানে জাল ছিনিয়ে আবার কাঁধে তুলল : যা নিয়েছ, একটা বেলার খোরাকি হবে। জাল থাকুক, গাঙে-খালে মাছ মারব।

নবনীকান্তও এবার অতিশয় কড়া। বলে, নিতে হয় তো জাল সুদ্ধ নিয়ে নেবো। কখানা বাতিল লোহা নিয়ে পয়সা গুণে দেবো, এত বোকা পাওনি। বয়স হয়ে গিয়ে ছেড়েও দিয়েছি এসব কাজকর্ম। ধর্মপথে থেকে চোটার সুদ যা দু-চার পয়সা আসে, তাতেই পেট চলে যায়।

থলিসুদ্ধ ঠেলে দিয়ে নবনী উঠে পড়ল। অন্দরের দিকে হাঁক দিয়ে ওঠে : তেল পাঠিয়ে দাও গো। বেলা হয়ে গেছে, চান করে ফেলি।

অর্থাৎ কথাবার্তার শেষ। রাজি থাক মাল দিয়ে মূল্য নাও, নয় তো উঠে পড়ো এইবার।

গুরুপদ বিশুষ্ক মুখে বলে, নিয়ে যাও। গরজ বুঝেছ, আর কি রক্ষে রাখবে তুমি! যা দিচ্ছ, সে-ও অনেক দয়া।

আজেবাজে মন্তব্য কানে না নিয়ে নবনী বলে, একুনে তা হলে কত কত দাঁড়াল, জুড়ে গেঁথে বলো।

গুরুপদ বলে, দাম ধরেছ তুমি। জুড়তে হয় ভাঙতে হয় তুমিই করো সব। যা দেবার দাও, বিদায় হয়ে যাই।

টাকা ও রেজগিতে নবনী দাম দিয়ে দেয়, গুরুপদ তাকিয়েও দেখে না, মুঠো করে নিয়ে গামছার কোণে বাঁধল।

নবনী বলে, গুণে নিলে না?

জবাব ধোনাই মিস্ত্রি দিল : বেশী দেবার পাত্তর তুমি নও। কম হলে তো বলবে, সেইটেই উচিত দাম।

সাঙাত বড্ড রেগেছে গো! টেনে টেনে নবনী বলে, বিনি পুঁজির ব্যবসা তোমাদের। দাম নিয়ে তো পগার পার—আমি শালা মরি এবারে। মাল ঘরে রেখে সোয়াস্তি নেই, কোন ফিকিরে কোথায় পাচার করি। থানায় টের পেলে নির্দোষী আমারই হাতে-দড়ি পড়বে।

পথে এসে ধোনাই বোমার মতো ফেটে পড়ে : যা মুখ দিয়ে বেরুল, তাই ফলিয়ে দাও হে মা-কালী। হাতে-দড়ি দিয়ে বেটাকে টানতে টানতে নিয়ে যাক। চার চারটে মানুষ সারারাত তল্লাট চষে বেড়ালাম, মোট বওয়ার মজুরিটাও দিল না গো!

গুরুপদ বলে, দূর দূর, কাজের নিকুচি করেছে! যত বাটপাড় মিলে ভাগাভাগি করে নেয়, আমাদের কপালে কাঁচকলা! ঘেন্নায় সিঁধকাঠি গাঙে ছুঁড়ে দিতে ইচ্ছে করে। তা হবে কি করে—পেটের জ্বালা, পোড়ারমুখো সিপাই-দারোগার জ্বালা—

*

মুড়কি পেটে পড়ে এখন আলস্য লাগছে।

ভাত রান্না হাঙ্গামার কাজ। চাল-ডাল-নুন-মশলা কেনো, কাঠকুটো কুড়োও, উনুন ধরাও, জল ঢালো, ফ্যান গালো—হরেক রকমের প্রক্রিয়া। প্রায় এক দুর্গোৎসবের ব্যাপার।

ধোনাই মিস্ত্রিই এবারে বলছে, বাবুপুকুর দশক্রোশ বিশক্রোশ নয় গো—দেখতে দেখতে গিয়ে পড়ব। বংশীর শালা-কুটুম্বর বাড়ি, যা একখানা খাতির পাওয়া যাবে।—

গুরুপদ জোগান দেয়ঃ এয়ারবন্ধু নিয়ে বোনাই এসে হাজির। হাত-পা ধুয়ে বসতে না বসতেই তো জলখাবার একপ্রস্থ—

ধোনাই বলে, কুটুম্বদের পথের কষ্ট হয়েছে—সন্ধ্যেটা গড়িয়ে যেতেই অমনি থালায় ভাত, চতুর্দিকে দশখানা তরকারি সাজানো—

রোসো—। বংশী বিড়বিড় করে হিসাব করছিল। ঘাড় নেড়ে বলে, উঁহু, সন্ধ্যের পরেই কি করে হয়! শনিবার তো আজ বাবুপুকুরের হাটবার—হাটের ভাল মাছটা না খাইয়ে ছাড়বে? তার উপরে ধর্মদাস এই সেদিন মেয়ের বিয়ে দিয়ে এককাঁড়ি পণের টাকা পেয়েছে—

কুটুম্ব বাড়ি পেঁছে উল্টোটাই শোনা যায়। নিতান্ত দায়ে পড়ে মেয়ের বিয়ে দেওয়া। বংশীদের হাত-পা ধোয়ার জল দিয়ে তামাক সেজে এনে ধর্মদাস সবিস্তারে আলাপ-সালাপ করছে। বড় দুর্দিন এবারে। অন্য বছর গোলা ভরতি হয়ে বাড়তি ধান আউড়িতে রাখতে হয়, এবারে ক্ষেতের বাঁধ ভেঙে নোনা-জল ঢুকে সমস্ত বরবাদ। খোরাকি ধানের অভাবেই সাত তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিল, অন্তত আর দুটো বছর রেখে খানিকটা সেয়ানা করতে পারলে পণের টাকা ডবল হয়ে যেত।

এরই মধ্যে একবার জিজ্ঞাসা করেঃ যাওয়া হচ্ছে কোন্‌দিকে কুটুম্বমশায়রা?

জবাব ঠিক করাই আছে। বংশী বলে, যাওয়া নয়—ফেরা হচ্ছে। দক্ষিণের আবাদে ধান কাটতে গিয়েছিলাম।

খিকখিক করে হাসি ওদিকে উঠানের ছাঁচতলায়। মানুষটা কখন এসে দাঁড়িয়েছে, টের পায়নি। ঐ মানুষ এখানে জানলে ভুলেও বাবুপুকুরের ছায়া মাড়াত না। দফাদার রতনমাণিক। চৌকিদার আট-দশ জনের মাথার উপর এক একটি দফাদার থাকে। কিন্তু শুধু দফাদারে রতনমাণিকের পরিচয় হয় না। ইচ্ছে করলেই যেন সে হাতে মাথা কাটতে পারে, এমনিতরো ভাব। তলোয়ার লাগে না, এবং সেজন্য কারো কাছে সে কৈফিয়তের ভাগীও নয়।

হেসে উঠে রতনমাণিক বলে, ধান কাটতে কোন মুলুকে যাওয়া হয়েছিল বংশীধর? ধান কেমন উঠল? বলি দায়দেনা সব মিটে যাবে তো?

দফাদার সেই গরলগাছি থানার এলাকার, যেখানে থেকে বুড়ো দারোগা দশ-ধারার পঁ্যাচ কষছে। সমস্ত জানে সে, আবরু রেখে প্রশ্নটা করল। বংশীও শুকমুখে হুঁ-হাঁ দিচ্ছে। আবার এই সময় ধর্মদাসের ছোট ভাই দুটো—কেষ্ট-

দাস আর রামদাস বাড়ি ফিরল—তারাও এসে কাছে দাঁড়ায়। কি কেলেঙ্কারি ঘটে এইবারে সকলের সামনে।

রতনমাণিকই কিন্তু ঠেকিয়ে দিল। ধর্মদাসের হাত ধরে টেনে বলে : চলো বেয়াই মশায়, হাটে এর পরে কিছু থাকবে না। কথাবার্তা থাক এখন—পালিয়ে যাচ্ছে না কেউ, সারা রাত্তির ধরে যত খুশি হতে পারবে।

খবরটা জানা ছিল না, এই রতনের ছেলের সঙ্গেই ধর্মদাস মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। নতুন কুটুম্ব এলে হাটে যাবে, দশগাঁয়ের মানুষের মধ্যে দু-হাতে খরচ পত্র করে সচ্ছলতা দেখাবে, গৃহস্থ মানা করবে কিন্তু কানে নেবেনা—এইসব হল দস্তুর। হাট ভেঙে যাবার আশঙ্কায় দুই বেয়াই হনহন করে বেরুল।

বংশী বেজার মুখে বলে, ও বেটা এসে জুটেছে—হাটের পথে পুটপুট করে আমাদের কুলের কথা বলবে। কুটুম্বর কাছে মুখ দেখানো যাবে না, সরে পড়ি এই ফাঁকে।

বসে ছিল ধোনাই মিস্ত্রি, ধপাস করে শুয়ে পড়ল মাদুরে।

কী হল ধোনাই ?

ভাতের চেহারাই ভুলে গেছি বাবা। এক পেট ঠেসে তারপর যা বলো রাজি আছি। খাওয়ার ডাক এলে উঠব, তার আগে কপিকলে বেঁধেও কেউ উঠাতে পারবে না।

গুরুপদরও সেই কথা : মুখ দেখতে না পার বংশী, কোঁচার খুঁট খুলে ঘোমটা ঢেকে বসে থাকো। গুরুমশায়কে গুরু বলে, ডাক্তারবাবুকে ডাক্তার বলে—কারো কিছু হয় না, চোর বললে আমাদেরই বা লজ্জা কেন হবে ?

মোটের উপর ভাত এরা খাবেই ধর্মদাসের বাড়ি। না খেয়ে নড়বে না। নিরিবিলি পেয়ে কাজকর্মের কথা হয়। কালকের রাতটা মিছা খাটনিতে গেল। আন্দাজি কাজের রকম এই। জুয়াখেলার মতন—প্রায়ই লাগে না, বিপদের ঝুঁকি পদে পদে। মুরুব্বিরা তাই পই-পই করে মানা করেন। ভাল কাজ লাগাবার আগে অনেকদিন ধরে তোড়জোড় করতে হয়। উৎকৃষ্ট খুঁজিয়াল চাই—যে মানুষ ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। এ-গ্রাম সে-গ্রাম এ-বাড়ি সে-বাড়ি খোঁজখবর নেবে, ভাব জমাবে লোকের সঙ্গে।

গুরুপদ ও ধোনাই মিস্ত্রি লাইনের পুরানো লোক—দুজন দুই পারে ঢুঁড়ে বেড়াতে পারে। কিন্তু নৌকো বাওয়া রান্নাবান্না কাজের কারিগরি—এত সমস্ত বাকি দুজনে হয় না। ডিঙিখানা অশ্বমেধের ঘোড়ার মতন এদেশে-সেদেশে ছোটা-বার বাসনা—বাড়তি মানুষ জুটিয়ে নাও তাহলে।

হাটুরে দুজনে হাট করে ফিরে এলো। বেসাতি রান্নাঘরের পৈঠায় নামিয়ে রতনমাণিক চেঁচামেচি করে : বংশী, ঘুমুলে নাকি তোমরা ?

ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। সাড়া দিলে যদি আবার সেই আগের সুরের কথা আরম্ভ করে দেয়! ধর্মদাসের ভাই কেষ্টদাস কথায় কথায় ইতিমধ্যে

বলেছে, রাতটুকু পোহালেই রতনমাণিক চলে যাচ্ছে, সরকারি মানুষের বসে বসে কুটুম্ব-ভাতা খাবার সময় নেই। অতএব যেমন-তেমন ভাবে রাতটুকু কাটিয়ে দেওয়া।

কত জিনিস কেনাকাটা করলাম, একবার চোখে দেখবে না তোমরা? ডাকতে ডাকতে রতনমাণিক কাছে চলে এসেছে। বেসাতির জিনিস না দেখিয়ে যেন সোয়াস্তি নেই। বলে, নলেন-পাটালি পেয়ে গেলাম। ভারি, কতদিন পরে একসঙ্গে এত জনে মিলেছি—দুধ-পাটালি খাওয়া যাবে আমোদ করে। আর এক নতুন জিনিস—ফুলকপি। খুলনা থেকে এক দোকানদার নিয়ে এসেছিল, ডবল দাম ধরে দিয়ে তার কাছ থেকে কিনলাম।

ভালবাসায় গদগদ অবস্থা। বংশী অবাক হয়ে দেখছে। নিজ এলাকার মধ্যে যে দফাদারকে দেখে, এখানকার রতনমাণিক সে মানুষ নয়। কথাবার্তার ধরন, এমন কি কণ্ঠস্বর অবধি আলাদা। ধর্মদাসও তটস্থ হয়ে আছে—আদর যত্নের তিল পরিমাণ ত্রুটি না ঘটে। হাট থেকে ফিরে এসে খাতিরটা আরও যেন বেড়েছে ধর্মদাস তো এই—ভাই দুটোও মুকিয়ে আছে। হাঁ করতেই কেষ্টদাস দৌড়ে পান-জল এনে দেয়, রামদাস কলকেয় আগুন দিয়ে ফুঁ দিতে দিতে নিয়ে আসে। রান্নাঘরে সমারোহ করে রান্নাবান্না হচ্ছে—ছ্যাঁকছোক আওয়াজ, ফোড়নের গন্ধ। হেসে ধর্মদাস বলে, এক হল কুটুম্বের বাড়িতে গেলে সুখ, আর হল কুটুম্ব বাড়ি এলে সুখ। শাকটা মাছটা তোমরা খাবে, আমরাও বাদ পড়ব না। ক'টা দিন সেইজন্যে আটকে রাখব, 'যাবো' বললেই ছাড় পাবে না।

কাল রাতে ও আজ দুপুরে ভাত জোটেনি—একবেলায় এখন তিন বেলার শোধ তুলে নিল। বৈঠকঘরে তোষক-বালিশ-চাদর এসে পড়েছে—চারজনের আলাদা ব্যবস্থা। বিছানাপত্র সমস্ত দিয়ে বাড়ির লোকে সুনিশ্চিত শুধু-মাদুরে গড়াচ্ছে। আরামে চোখও বুজেছে—

রতনমাণিক ভিতর-বাড়ি শুয়ে ছিল, পা টিপে টিপে সে এসে হাজির: ঘুমুলে নাকি বংশী ভাই? দুটো কথা বলবার জন্য সেই কখন থেকে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াচ্ছি। বড়বাবু আবার আমায় ফুলহাটা পাঠালেন। গিয়ে দেখি, বাড়ি-ছাড়া তুমি। কোথায় গিয়েছ, বউও সঠিক কিছু বলতে পারে না।

বংশী বলে, বলেকয়ে সময় নিয়েই তো এলাম। তবু বড়বাবুর সোয়াস্তি নেই। তাগাদার পর তাগাদা।

রতনমাণিক হেসে বলে, জলের তলের মাছ আর পরের হাতের ধন মুঠোয় না আসা পর্যন্ত সোয়াস্তি কিসের! কিন্তু সেজন্য নয়। একটা জিনিস বড়বাবু হুঁশ করিয়ে দিতে বললেন। তা ছাড়া আমার নিজেরও কিছু বলবার আছে—

বংশী আগের কথা ধরে বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে যাচ্ছে, আমাদের কি জমিদারি তালুকদারি আছে যে ইচ্ছে মতন সিন্দুক খুলে মুঠো মুঠো দিয়ে দেবো?

রোজগারপত্তরে বেরিয়েছি। বললে, বাড়িছাড়া আমি—ঘেন্নায় সব ছেড়েছুড়ে বাড়িই তো ছিলাম। থাকতে দিলে কই তোমরা? যা-কিছু পাবো নৈবিদ্য সাজিয়ে তোমার বড়বাবুকে নিবেদন করে আসতে হবে।

রতনমাণিক প্রবল বেগে ঘাড় নাড়েঃ কথাই তো আমার তাই। শুধু বড়বাবুতে ফল হবে না। দুর্গা বলো কালী বলো সকল বড়-ঠাকুরের পুজোর সঙ্গে ষষ্ঠীপুজো। ষষ্ঠীর নৈবিদ্য বাদ না পড়ে, খেয়াল রেখো ভাই।

ঠাণ্ডা করবার জন্য বংশীকে রতনমাণিক বোঝাচ্ছেঃ ভগবান হাত দিয়েছেন পা দিয়েছেন কাজকর্ম ছেড়ে বাড়ি কেন বসে থাকতে যাবে? দু-হাতে কাজ করে যাও যতদিন শক্তিসামর্থ্য আছে। তবে হ্যাঁ, বিচার-বিবেচনা থাকবে নিশ্চয় কাজের। বিবেচনায় ভুল করেই তোমরা ফ্যাসাদে পড়ে যাও।

গরলগাছি আর ঝিনুকপোতা দুই থানার পাশাপাশি এলাকা। রতনমাণিকের স্বার্থ গরলগাছি নিয়ে। কণ্ঠে তার ক্রমশ ধমকের সুর এসে গেলঃ দশধারার জন্য বড়বাবুকে দুষে বেড়াও, কিন্তু তোমরাই তো করাচ্ছ তাঁকে দিয়ে। না করে উপায় নেই, এমনি অবস্থায় এনে ফেলেছে। নজর-খাটো কতকগুলো হুটকো ছোঁড়া কাজের জায়গা চিনে রেখেছে শুধু গরলগাছির এলাকাটুকু। এর বাইরে যেন দুনিয়া নেই। বদনাম হয় গরলগাছির, ঝিনুকপোতা বগল বাজিয়ে বেড়ায়। সদর থেকে হুড়ো এলে বড়বাবু তখন আর চোখ বুজে থাকেন কি করে?

বংশী ক্লান্ত স্বরে বলে, বলছি দফাদার ভাই, জো-সো করে এবারটা ছাড়ান করে দাও। কোন তালে আর নেই, গরলগাছি ঝিনুকপোতা কোনদিকে জীবনে পা বাড়াব না।

রতনমাণিক গালে হাত দিয়ে বলে, এই দেখ—বললাম এক কথা, তুমি বুঝলে উল্টো? গরলগাছিতে বিস্তর হয়ে গেছে, সকলে এবারে ঝিনুকপোতা ধরো। ঝিনুকপোতার দর্প চূর্ণ করে দাও। এই জিনিসটা হুঁশ করিয়ে দিতে বড়বাবু আমায় ফুলহাটা পাঠালেন। তোমরা সব তার আগেই বেরিয়ে পড়েছ।

অনেকক্ষণ ধরে বিস্তর কথাবার্তা। পুলিশ আর চোর—পক্ষ হল দুটো। হামেশাই পরস্পরের মুখোমুখি হতে হয়। যত-কিছু গণ্ডগোল যথোচিত বুঝসমঝের অভাবে। ভোরবেলা রতনমাণিক চলে যাচ্ছে। বংশীদের ডেকে তুলে জনে-জনের কাছে বিদায় নিয়ে গেল। নিতান্ত মায়ের পেটের ভাই হলেও লোকে এত দূর করে না।

আরও খানিক বেলা হলে গৃহকর্তা ধর্মদাস কোথা থেকে খাসিছাগল টানতে টানতে এনে জিওলগাছে বাঁধল। বলে, চলে যাবে—মাইরি আর কি! সরকারি মানুষ বেহাই মশায়কে ছাড়লাম বলে তোমাদেরও? এবেলা তো কিছুতে নয়। খাসি দিয়ে দুপুরবেলা চাট্টি সেবা হোক, তারপরে দেখা যাবে।

এতক্ষণ সশব্দে হচ্ছিল, হঠাৎ কণ্ঠস্বর নেমে গিয়ে শোনা যায় কি না যায়।

গলা খাঁকারি দিয়ে ধর্মদাস বলে, একটা কথা বলি ভায়ারা। শোন, সকলকেই বলছি। ক্ষেতখামারের কাজ মিটে গিয়ে ভাই দুটো বসে আছে। তোমরা সাথী করে ওদের নিয়ে যাও। বড্ড ধরেছে।

বংশী বলে, এখন কোথা নিয়ে যাব? কাজ অন্তে ঘরে ফিরছি তো আমরা।

ধর্মদাস ফিক করে হাসল: কালা নই, কানাও নই ভায়া। নিজের চোখ দিয়ে দেখি, নিজের কানে শুনি। যেটুকু যা বাকি ছিল, বেহাই মশায় খুলে বলল। ধাপ্পা দাও কেন?

ব্যাপার সমস্ত ফাঁস হয়ে গেছে। বংশী তবু কিছু ইতস্তত করে: এত বড় মানী গৃহস্থ তোমরা। কাজটা তো ভাল নয়—

নির্বিকার ধর্মদাস বলে, ভাল কি মন্দ কে জানতে যাচ্ছে! ঘরে ঘরে দেখগে এই। কলিযুগ তবে আর বলছে কেন! তা-না না-না করো কেন, সত্যি গুণের ভাই ওরা আমার। নয়তো বলতে যেতাম না। কেষ্টদাসের আবার বড় মধুর গানের গলা—সে গানে মানুষ কোন্ ছার, বনের পশু অবধি মজে যায়। কিন্তু মজলে কি হবে, পয়সা তো দেবে না সে বাবদ।

চার সাঙাতে সলাপরামর্শ হল। বিধি-মতন কাজ করতে হলে মানুষ তো দরকারই। ছোকরা দুটো লাইনে একেবারে নতুন—কিন্তু কাজ করতে করতেই শিখবে মানুষে। আপাতত দায়িত্বের কাজ নয়, বোঠে মারা থেকে শুরু। ডিঙি বাইবে, আর চোখ মেলে কাজ দেখবে। ডাঙায় নেমে বড়জোর পাহারায় দাঁড়াতে পারে দায়ে-দরকারে। মায়ের নাম স্মরণ করে চলুক তবে কেষ্টদাস আর রামদাস।

ছ-জন নিয়ে দলটা নেহাৎ মন্দ দাঁড়াল না। স্বচ্ছন্দে এবার নাবালে নেমে যাওয়া যায়। সেখানে গহিন নদী, ঘোর তুফান। কিন্তু ফসলে ভরা মাঠ—যার মানে হল গৃহস্থর গোলায় ধান, বাক্সে টাকা। কাজকর্মের বড় সুন্দর ক্ষেত্র—লোক-মুখে শোনা আছে।

দূরের পথ, কিছু বন্দোবস্ত সেরে নেবার দরকার তাড়াতাড়ি। বাঁশ ফেড়ে ডিঙির উপর চালি করে নিল শোওয়া-বসার সুবিধার জন্য। দরমার ছই ভগ্ন হয়ে গিয়েছিল, তালিতুলি দিয়ে নিল। অস্ত্র নেওয়া হল হাতের মাথায় যা-কিছু পাওয়া যায়—রামদা লেজা সাবল লাঠি ছোরা। কাঠি তো অঙ্গের সাথী। কেষ্টদাস তার গোপীযন্ত্রটা নিয়েছে। পাপের ভারবোঝা যখন বেশি বেশি লাগবে, কৃষ্ণকথা দিয়ে বোঝা খানিক হালকা করে নেবে। হঠাৎ কি মনে হল—বোষ্টমপাড়ায় গিয়ে কণ্ঠী জোগাড় করে নিয়ে এলো একজোড়া।

সাহেব হেসে বলে, তা বেশ হল, কাঠি-সাবল-লেজার মতো এ জিনিসও সরঞ্জাম কাজের।

রাতদুপুরে ডিঙিতে উঠে পড়ল। শেষরাত্রে জো এসে গেলে রওনা। জ্যোৎস্না উঠে গেল, গাছপালার মাথা ঝিকমিক করছে। আজকে ক্ষতি নেই, আকাশের

চাঁদ আরও কয়েকটা দিন এই রকম জ্বালাবে। তারপরে অমাবস্যা, পুরো অন্ধকার। পেঁচা ডেকে উঠল কোনদিকে। প্রথম বোঠে জলে পড়ল—ঝপ! বোঠের পর বোঠে—ঝপাঝপ ঝপাঝপ। স্রোতের আগে আগে ছুটেছে ডিঙি।

সকালবেলা গুরুপদ আর ধোনাই দু-পারে নেমে গেল। হেঁটে হেঁটে খোঁজদারি করে বেড়াক। সন্ধ্যার পর ফিরবে নৌকোয়। দরকার পড়লে দিনমানে ফিরতেও বাধা নেই। কোন পথ ধরে নৌকোর চলাচল, কোন্‌খানে চাপান দেওয়া—আগের রাত্রে মোটামুটি ঠিক হয়ে যায়। দোহাই ষড়ানন ঠাকুর, দোহাই মা নিশিকালী, মুখ রেখো এবারে।

গোন-বেগোনের বাছবিচার নেই, ডিঙি চলবে। উজান মুখে টান কাটিয়ে এগুনো যাচ্ছে না, বোঠে মেরে হাত ব্যথা—গুণের দড়ি নিয়ে লাফিয়ে পড়ুক ওরা দু-ভাই। জলজঙ্গল কাঁটা-কাদা বুঝিনে—যতক্ষণ দিনের আলো তার মধ্যে থামাথামি নেই।

গাজি বদর-বদর!

আঠারো

ডাঙার মানুষ জলে ভাসছে। হল কত দিন? কে জানে, পাঁজিপুঁথি ধরে কে হিসাব করতে গেছে? দিন-কুড়িক হতে পারে। এক মাস হলেও অবাক হবার নেই। বংশীর তো মনে হচ্ছে এক বছর। বাচ্চাছেলের জন্য মন টানছে। বংশীর এক খুড়তুতো ভাইকে বাদাবনে বাঘে তাড়া করেছিল। জলে ঝাঁপ দিল সে প্রাণ বাঁচাতে। বংশীরও ঠিক তাই। তিন-তিনটে মারা গিয়ে ঐ বাচ্চা, কিন্তু কোলে-কাঁখে নিয়ে ঘরবসত করবার জো নেই। বাঘ চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছে, ডাঙায় উঠলে ক্যাঁক করে টুঁটি চেপে ধরবে। বাঘ নয়, বাঘের বেশি—গরলগাছির বড়ো-দারোগা।

গাঙ-খাল গাঁ-গ্রাম কত ঘুরল। দুই তীরে দুই ভগ্নদূত ছুটোছুটি করে খবর খুঁজছে। সন্ধ্যাবেলা একত্র হয়। নাকে-মুখে যা-হোক দুটো গুঁজে তারপর কাজে বেরুনো। গৃহস্থের অজ্ঞাতে কুটুম্বর দল উঠানে ঘরকানাচে নানান অন্ধিসন্ধিতে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ায়। যাত্রা খারাপ, কিছুতে কিছু হচ্ছে না। খোরাকি খরচটা কোন রকমে ওঠে, এই পর্যন্ত।

শখ করে কাজে ছুটি নিয়ে নিল হয়তো কোন একদিন। অজানা গাঁয়ের হাটের মধ্যে ঘোরাঘুরি ও কেনাকাটা করে বেড়াল। কোন বাড়ি যাত্রাগান খুব জমেছে—চাষীদের ভিড়ের মধ্যে মাথা গুঁজে গান শুনতে বসল। দলটার মধ্যে সবচেয়ে স্ফূর্তি সাহেবের। কাজকারবার না হোক, প্রাণ ভরে দেখাশোনা হয়ে যাচ্ছে। রকমারি মানুষজন দেখছে, মাঠঘাট বনজঙ্গল দেখে বেড়াচ্ছে। পোড়ামাটি শহুরে জায়গায় ছেলেবয়স কাটিয়ে এসেছে, যা দেখে সবই যেন তাজ্জব লাগে। বংশী আর গুরুপদ চটে যায়। পরের দায়ে এসেছে কিনা, দায়টা

নিজের হলে আহা-ওহো করে স্বভাবের শোভা দেখবার পুলক হত না।

শিক্ষাটা নতুন করে হল, যথানিয়ম বিধিব্যবস্থা ছাড়া কাজ হয় না। মুরুব্বিদের কঠিন নিষেধ অকারণ নয়। কপাল ভাল তাই বড় রকমের বিপদ আসেনি, কিন্তু অপদস্থ হতে হয়েছে অনেকে। সিঁধ কেটে দেখা গেল বিশাল ছাপবাক্স গর্তের সমস্ত মুখটা জুড়ে। বাক্সর উপর মানুষ শুয়ে আছে, সে হাঁক দিয়ে উঠল: খসখস করে কি? কে ওখানে? বুদ্ধি করে বংশী কিচমিচ করে ইঁদুর ডাকল। ঘুমের মধ্যে বিরক্তি ভরে মানুষটা বলে, দেখাচ্ছি কাল মজা, জাঁতিকল পাতব। ইঁদুর হয়ে বেঁচে এলো, নয়তো ভোগান্তি ছিল সেদিন। আর এক রাতে আয়োজন করে পাকা দেওয়াল কাটতে গেছে, যন্ত্র ফিরে ফিরে আসে—যেন লোহার পিঠে লোহার ঘা পড়েছে। কী ব্যাপার? সাবধানী গৃহকর্তা জানলার নিচে—চোরের যেখানটা সিঁধ খোঁড়ার সম্ভাবনা—চুনসুরকির বদলে মাটি দিয়ে গেঁথে দিয়েছে। মাটি অর্থাৎ সিমেন্ট। নাও, হল তো—হিমরাত্রে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এবার ডিঙিতে ফিরে চুপচাপ শুয়ে পড়ো। বিচক্ষণ খুঁজিয়াল থাকলে এমন হয় না। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের মতো মানুষ ফুলহাটার উপর – তাঁকে একটিবার বলে দেখলে না কেন বংশী? এক মাস দু-মাস এমন কি বছরও ঘুরে যায় ক্ষুদিরামের এক-একখানা কাজ গড়ে তুলতে। গড়াপেটা সারা করে কারিগরকে জানান দিয়ে দেয়, কারিগর নিশ্চিন্তে নামিয়ে নিয়ে আসে। সে চুরি রীতিমত এক শিল্পকর্ম। সকালবেলা পড়শিরা এসে মুগ্ধ হয়ে দেখে। কানে শুনে দূর-দূরান্তরের মানুষ দেখবার জন্যে ছোটে। বুদ্ধি অধ্যবসায় আর পরিশ্রম যার পিছনে, তার বড় মর্যাদা। সে আপনি মহৎকর্মে প্রয়োগ করুন, আর চোরাই কাজে লাগান। আর এরা যা করছে—ছিঃ! কাজই তো নয়, জুয়াখেলা।

দিন যায়, শেষটা মরীয়া হয়ে উঠল। লাইনের যত-কিছু নীতি-নিয়ম, ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়। সাহেব সকলের চেয়ে বেশি বেপরোয়া। ওস্তাদের ছাড়পত্র নিয়ে প্রথম যাত্রায় বেকুব হয়ে ফিরবে না কিছুতেই নয়। আরও একটি বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে—নতুন ছোঁড়া দুটোর একটি—কেষ্টদাস। কালে কালে সে সাহেবেরই দোসর হয়ে উঠবে, সন্দেহ নেই।

কানাইডাঙার গাঙ্গুলিবাড়ি। শ্রীমন্ত লক্ষ্মীমন্ত বলবন্ত—এমনি সব ভাইদের নাম। আরও একটি আছে—অনন্ত। গুরুপদর খবর: সাকুল্যে কতগুলো ভাই, সঠিক বলা যাবে না. একটা দিনে এর বেশি হয় না।

অনন্তর বয়স কম, এই বছর তার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে তুখোড়। হাকিমের পেস্কার। যে হাকিমকে নিয়ে কাজকর্ম, রোজগারের হিসাবে অনন্ত বারকয়েক কিনে ফেলতে পারে তাঁকে। গায়ের জামায় ফরমায়েস দিয়ে পাঁচ ছ'টা পকেট বানাতে হয়, মামুলি তিন পকেটে কুলায়

না। কোর্টে যাবার সময় ফাঁকা পকেট, সন্ধ্যায় বাসায় ফিরবার সময় রেজগির ভারে পকেটগুলো ছিঁড়ে পড়বার দাখিল। আইন-আদালতের জন্মকাল থেকে অলিখিত নিয়ম চলে আসছে কোন্ কাজের কি প্রকার তদ্বির। বাঁ-হাত ঘুরিয়ে পিঠের দিকে বাড়ানোই রয়েছে—পয়সা-দুয়ানি সিকি-আধুলি পড়া মাত্র মুঠো হয়ে পকেটে ঢুকে পলকের মধ্যে আবার পূর্বস্থানে। যন্ত্রবৎ এই প্রক্রিয়া সমস্তটা দিন। হাকিম মুখ একটু বাড়ালেই সমস্ত নজরে পড়ে যাবে। ছেলেরা আড়াল করে তামাক খায়—হুঁকোর ফড়ফড়ানি কানে আসে, কিন্তু তাকিয়ে দেখতে নেই। তেমনি ব্যাপার। এমনও হতে পারে, ঈর্ষা ও অনুতাপের বশে মুখ গুঁজে থাকেন হাকিমমহাশয়ঃ হায় রে, বাঁধামাইনের হাকিম না হয়ে হাকিমের পেস্কার হলাম না কেন যাবতীয় লেখাপড়া কর্মনাশার জলে দিয়ে?

এ হেন পেস্কারের চাকরি অনন্তর। খুলনা থেকে কাল বাড়ি এসেছে কদিনের ছুটিতে। বাদার ইজারা নিয়েছে বড়ভাই লক্ষ্মীকান্ত, বন কাটার জন্য জনমজুর লাগিয়েছে। শহর থেকে অনন্তই বন্দোবস্ত করে দিয়েছে, টাকাকড়ির দায়ও তার উপরে।

গুরুপদ খোঁজ এনে দিল। ঘোরাঘুরিতে ক্লান্ত হয়ে ডিঙির চালিতে সে শুয়ে পড়েছে। আর রইল রামদাস। দুজনকে ডিঙিতে রেখে কালী-নাম স্মরণ করে অন্যেরা বেরিয়ে পড়ল। পথ বাতলে দিয়েছে গুরুপদ—সেই পথে অদৃশ্য রূপে মা-জননী আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলো। কাজের সময় সিঁধকাঠিতে ভর করো মা, কাঠি হবে বজ্রের মতন। সিঁধের মুখে কুবেরের ভাণ্ডার জড় করে রেখো মা—

কী যেন ঠাণ্ডা মতন পায়ের উপর। সাপ? না, কোলাব্যাং একটা। লাফ দিয়ে এসে পড়ল, আবার চলে গেল। কুঠির দীঘিতে সোলমাছ ধরতে গিয়ে সাপই পায়ে উঠেছিল। সাপে ছোবল দিলেও এ সময়টা হুল্লোড় করবার জো নেই, নিঃশব্দে ধীর পায়ে সরে যেতে হবে। রান্নাঘরের কানাচে কাচনির বেড়ায় চোখ রেখেছে সাহেব আর বংশী। কানে শুনছে ভিতরের কথা, চোখে দেখছে ভিতরের মানুষ।

বড় সংসার এক গাদা মেয়েলোক। গিন্নি যাকে বলা যায়, বয়স হলেও বেশ হাসি-খুশি মানুষটা।

নতুন-বউকেও ভাত দিয়ে দাও নমি। বাবুদের দাওয়ায় ঠাঁই হচ্ছে, নতুন-বউ ঘরের মধ্যে বসে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিক।

নতুন-বউ সলজ্জে বলে, না দিদি, আগে খাব কেন? তোমরা যখন খাবে তখন। সকলে একসঙ্গে।

[সাহেব বলছে, নাও না খেয়ে বাপু, বড়র কথা শুনতে হয় আর কষ্ট দিও না। শীতটা বড্ড পড়েছে। খেয়ে নিয়ে এবার শুয়ে পড়োগে যাও।

বলছে সাহেব মনে মনে, ঘর-কানাচের ঝোপজঙ্গলে দাঁড়িয়ে।]

সেই বড়-জা হেসে নতুন-বউকে বলে, তোমার যে ভাই কাল থেকে চাকরি চলছে—আপিসের হাজরে। ছোটবাবু চারদিনের জন্যে এসেছে—মিনিটের দাম হাজার হাজার, ঘণ্টার দাম লাখ।

নমি মেয়েটা বলে, অঙ্কে ভুল হয়ে গেল কিন্তু বড়বউদি—

একি ধারাপাতের অঙ্ক যে পাঁচ দুনো দশ ছয় দুনো বারো হতেই হবে। ঐ বয়সে এদের অঙ্ক আলাদা—

আরও কি সব বলতে যাচ্ছিল, থেমে গিয়ে নমির দিকে একবার তাকিয়ে তাড়াতাড়ি ভাত বাড়তে বসল।

নমি বিধবা। আহা ন্যাড়া হাত—নরুনপাড় ধুতি পরনে।

সেই ছোটবাবুই বুঝি ঘরে ঢুকল। ছোটবাবু অর্থাৎ অনন্ত। সকলের অলক্ষ্যে নতুন বউয়ের দিকে চোরা চাউনি হানা—মানুষটা অনন্ত না হয়ে পারে না।

বড়বউ বলে, দাওয়ায় পিঁড়ি পড়েছে ঠাকুরপো। সকলকে ডেকেডুকে নিয়ে খেতে বোসোগে। রাত করো না, যাও।

ফিক করে হেসে বলে, ভাবনা নেই ভাই, নতুনকেও খাইয়ে দিচ্ছি।

অনন্ত পুলকিত কণ্ঠে নিস্পৃহ ভাব দেখায়ঃ ভারি মাথাব্যথা কি না তোমার নতুনের জন্যে! গিয়েই তো পড়ে পড়ে ঘুমুবে।

বটে! কাল রাত্রে বাড়ি শুদ্ধ লোক তো ঘুমুতে পারিনে। তুমি একলাই তবে বকবক করছিলে?

[ঘর-কানাচে সাহেব মনে মনে গরম হচ্ছে। দেওর-ভাজে ন্যাকা-ন্যাকা কথাবার্তা কতক্ষণ চালাবে শুনি? মশাও জো পেয়ে গেছে—মজা করে রক্ত খাচ্ছে, চাপড়টা দেবার উপায় নেই।]

অনন্ত বলছে, নমিতাকে নার্স-ট্রেনিং-এ ঢোকালে কেমন হয় বড়বউদি? হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডের সঙ্গে খাতির আছে। তাঁকে ধরেছি, হয়ে যেতে পারে। দাদাদের বললাম, কারো অমত নেই। তোমরা কি বলো শুনি এবার। নার্স হলে নিজের পায়ে দাঁড়াবার উপায় হয় একটা।

নিজেই নমিতা গোলযোগ করে ওঠে সকলের আগেঃ আমি যাব না; কক্ষনো না। হাসপাতাল অনাচারের রাজ্যি, ম্লেচ্ছ কাণ্ডবাণ্ড সেখানে।

বড়বউ বোঝাতে যায়ঃ তুমি নিজে ভাল থাকলেই হল ঠাকুরঝি। অত ছোঁয়াছুঁয়ি বাচবিচার চলে না আজকালকার দিনে।

অনন্ত বলছে, এখনই পনর টাকা করে পাবি। পাশ করলেই হাসপাতালে নিয়ে নেবে, মাইনে সঙ্গে সঙ্গে ডবল। তিরিশটাকা। তুই যা চালাকচতুর, পাশ করতে একটুও আটকাবে না।

বড়বউ চোখ বড় বড় করে বলে, তিরিশ টাকা—ওমা, সে যে এককাঁড়ি টাকা। ভেবে দেখ নমি, ইচ্ছাসুখ খরচপত্তর করবে, কারো কথার তলে থাকতে

হবে না—

অনন্ত বলে, তিরিশেই শেষ নাকি, বাড়বে না মাইনে? তার উপরে প্রাইভেট প্রাকটিশ—

ঘাড় নেড়ে নমিতা ঝেড়ে ফেলে দেয়ঃ আমি যাব না। মেয়েলোক খারাপ হয়ে যায় বাইরের কাজে বেরিয়ে—

বলতে বলতে কাঁদো কাঁদো হয়ে ওঠেঃ লাথি-ঝাঁটা মেরে যদি তাড়িয়ে দাও বউদি, পরের বাড়ি তখন ধান ভেনে বাসন মেজে আমার একবেলার ভাতের জোগাড় করে নেবো। তবু আমি বাপের গাঁ ছেড়ে নড়ব না।

বড়বউ মরমে মরে গিয়ে বলে, ছি-ছি এমন কথা মুখ দিয়ে বেরোয় কেমন করে ঠাকুরঝি? তোমারই ভবিষ্যৎ ভেবে বলা। ঘরবাড়ি তোমাদের—তোমাদের ভাইবোনের। পরের মেয়ে আমরা—তাড়াতে হয়, আমাদেরই তাড়িয়ে দেবে।

[ভাল জ্বালা হল দেখছি! সাহেব রাগে গরগর করছেঃ বলি, মশা কি ঘরের ভিতরের পথ চেনে, না, বাইরের যত উৎপাত? ভবিষ্যৎ মুলতুবি রেখে চাট্টি চাট্টি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড় এবারে। ঘুমিয়ে পড়।]

বড়বউ ক্ষুব্ধ স্বরে অনন্তকে বলে, যে ক'টা দিন বাড়ি আছ ঠাকুরপো, নমির কথা কক্ষনো মুখের আগায় আনবে না। খেতে বোসোগে যাও, ভাত নিয়ে যাচ্ছি।

যাবার মুখে অনন্ত খোঁচা দিয়ে বলল, নাঃ ঘেন্না ধরালি নমি। ব্যবস্থা একটা হতে যাচ্ছিল—কপালে দুঃখ থাকলে কে খণ্ডাবে?

কপালের দুঃখ তুমি কি শোনাচ্ছ ছোড়দা, অহরহ বুকের মধ্যে রাবণের চিতা জ্বলছে। দুঃখের কপাল না হলে মায়ের পেটের বোনকে সরানোর জন্য তোমরাই বা অজুহাত খুঁজে বেড়াবে কেন?

নমিতা হাউহাউ করে কেঁদে পড়ল। বেকুব হয়ে অনন্ত পালাবার দিশা পায় না।

আরও খানিক পরে রান্নাঘরের দাওয়ায় পুরুষরা খেতে বসেছে। বড়বউ মেজবউ পরিবেশন করছে। নমিতা জল পুরে গ্লাস এনে দেয়, নুন দেয় থালার পাশে পাশে। বাড়িতে একপাল বিড়াল—থালার বস্তু থাবা বাড়িয়ে টেনে খায়। বিড়াল তাড়ানো একটা বড় কাজ নমিতার। জোর-জবরদস্তি করে নতুন বউকেও ওদিকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছে।

সর্বশেষে বড়বউ বলে, ঠাকুরঝি, তুমি কি খাবে?

নমিতা হেসে হেসে বলছে, হীরের ভাত সোনার ডালনা রুপোর চচ্চড়ি—

বড়বউ ঢোক গিলে বলে, কত রকমের রান্নাবান্না—বলছিলাম, তুমি কি দুটো মুড়ি চিবিয়েই পড়ে থাকবে?

নমিতা বলে, সে-ও তো অনাচার। তোমাদের জেদে পড়ে করতে হয়।

ভাতে মুড়িতে তফাত কতটুকু ? চাল সিদ্ধ না হয়ে চাল ভাজা।

বড়বউ ভয়ে ভয়ে বলে, দিন দিন শুকিয়ে সলতে হয়ে যাচ্ছো। আয়না ধরে দেখ না তো—তা হলে টের পেতে। ভাতে মুড়িতে তফাত যদি না থাকে, দুটি ভাতই নাহয়—

কথা শেষ হতে না দিয়ে নমিতা গর্জন করে উঠে ঃ দু-বেলা ভাত খাব বিধবা হয়ে ? জীবনে এই হল—মরণ হয়ে পরের জন্মে ভাল থাকব, তাও হতে দেবে না তোমরা ?

বড়বউ ভ্রূভঙ্গি করে, বলে ভারি আমার বিধবা রে! উনিশ বছরের এক-ফোঁটা মেয়ে—আমার ভোলার চেয়েও দু-বছরের ছোট। সাত ছেলের মা সত্তর-বছরের বুড়ি কতজনা মাছ-মাংস খেয়ে দফা সারছে, উনি বিধবাগিরি ফলাতে এসেছেন! রাখো ওসব।

গলা খাটো করে বলে, তোমার মেজপিসিমা মাছ খেতেন। বউ হয়ে এসে আমি নিজের চোখে দেখেছি। গুরুজনের নামে মিছে কথা বলি তো মুখে যেন আমার পোকা পড়ে।

নমিতা হাহাকার করে উঠল যেন ঃ বোলো না বড় বউদি, তোমার পায়ে পড়ি —কানে শুনলেও মহাপাপ। যার যা খুশি করুক, মরে গেলেও আমার দ্বারা অনাচার হবে না। আবার যদি বলেছ, মুড়িও খাব না কিন্তু, ঘরে গিয়ে সটান শুয়ে পড়ব।

বিরক্ত হয়ে সাহেব উঠে পড়ল। কথাবার্তা ও আহারাদি চলতে থাকুক, তত ক্ষণে আর একটা চক্কোর দিয়ে আসবে। বেড়ার গায়ে বংশী একা রইল।

ধোনাই মিস্ত্রি কেষ্টদাস পাহারাদার—ধোনাই বাড়ির সীমানায় পগারের পাশে, কেষ্টদাস খানিকটা দূরে। এক সাংঘাতিক খবর বলল ধোনাই। মুখে কাপড়-ঢাকা লোক এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি দিয়ে এইমাত্র বাড়ি ঢুকে গেল।

চোর তাতে সন্দেহ কি! শীতকালে থানায় থানায় এখন দশধারার তোড়-জোড়। এ কাজে মুনাফা দুদিক দিয়ে—যশ, অর্থ দুরকমেই। চোর ছ্যাঁচোড় জালে ঘিরছে বলে উপরওয়ালা বাহবা দিচ্ছে, লিস্টির নাম কাটানোর জন্য নিচের থেকেও তদ্বির আসছে। ঐ মানুষের হতে পারে, তাদেরই মতন দায়গ্রস্ত চোর একটি।

ধোনাই হতাশ ভাবে বলে, কাজ নেই, বংশীকে নিয়ে এসো সাহেব, চলে যাওয়া যাক।

সাহেব বলে, অনন্ত গাঙ্গুলির বাক্সভরা টাকা—গায়ের অর্ধেক রক্ত মশার পেটে দিয়ে খালি হাতে ফিরব ?

সে দুঃখ ধোনাইয়েরও। সাহেব প্রশ্ন করে, গেল কোন দিকে লোকটা ?

হাত দিয়ে দিক নির্দেশ করে ধোনাই বলে, পলক ফেলতে না ফেলতে যেন বাতাস হয়ে মিলিয়ে গেল। আমাদের চেয়ে ঢের ঢের পাকা। ভালরকম খোঁজ-

দারি ঐ কারিগরের পিছনে।

কি ভেবে সাহেব ঘর-কানাচে বংশীর কাছে যায় না, পা টিপে টিপে সেই চোরের পথে চলল।

বেড়ার গায়ে বংশী মগ্ন হয়ে আছে। নতুন-বউ মুখে না না করে, আর গোগ্রাসে খেয়ে যায়, খাওয়া সেরে সে অনেকক্ষণ উঠে গেছে। পুরুষদেরও শেষ। অন্য বউরা খাচ্ছে এবার। নমিতা পাথরবাটিতে মুড়ি-গুড় আর নারকেল-কোরা নিয়ে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে অনেকখানি দূরে বসেছে।

[ওরে বাবা, কত খায় মেয়েলোকে! চটপট সেরে নাও মা-লক্ষ্মীরা। রাত পোহায়ে যায়, আমাদের কাজকর্ম কখন হবে এর পরে?]

হয় কি করে তাড়াতাড়ি! এর কথা তার কথা, এই বাড়িতেই নতুন-বউয়ের বেশরম কাণ্ডবাণ্ড। পাড়াপড়শির বিবিধ কেচ্ছাকাহিনী। মুখ তো একখানা বই নয়—সেই মুখে খাবো না রসের ঝর্ণা ঝরাবে? বিধাতার উচিত ছিল, মেয়েলোকের মাথার চতুর্দিকে গোটা পাঁচ-সাত মুখ বসিয়ে দেওয়া। তবে সামাল দিতে পারত।

আর শুদ্ধাচারিণী নমিতাসুন্দরীর ভাবখানা দেখ। মুড়ি চিবাতে চিবাতে অকৃত্রিম আনন্দে উদ্ভাসিত বদনে রসের গল্প শুনে যাচ্ছে। হঠাৎ কী যেন হল তার—গল্পের ভিতর দিয়ে অনাচার লেগে যাচ্ছে, তাই বোধহয় খেয়াল হল এতক্ষণে। দু-চার মুঠো গালে ফেলে তড়াক করে সে উঠে পড়ল। একেবারে নিজের ঘরে। ঘরে গিয়ে সশব্দে দুয়ার এঁটে দেয়। অনাচার তেড়ে এসে ধরে না ফেলে।

বংশী সেইভাবে বসে রয়েছে, হয়তো বা ভুলেই গেছে কাজের কথা। সাহেব এসেছে, পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—খেয়াল করতে পারেনি। সাহেব হাত ধরে টানল তো বলে, রোসো না।

ফিসফিস করে উল্লসিত মুখে বলে, ভাল ঘরের মেয়েছেলেদের কথাবার্তা শুনে নাও একটু। ধান ভেনে আর বাসন মেজে মেজে আমাদের মেয়েলোকের রসকষ কিছু থাকে না।

রাতদুপুরে নিরিবিলি খেতে খেতে মেয়ে-বউদের দুরন্ত আসর। ফুলহাটায় মুকুন্দ মাস্টারের আসর নয়—বউয়ের তাড়নায় কুইনিন গেলার মতো বংশী যেখানে বিরস মুখে কিছুক্ষণ বসে আসত। এ জায়গা থেকে থেকে টেনে বের করতে সাহেবকে অনেক বেগ পেতে হল।

দুপুর রাতের ঐ যে নতুন আগন্তুক—চোর না হয়ে কিন্তু পুলিসও হতে পারে। খুব সম্ভব তাই। সাহেবদের খবর কোনরকমে জানতে পেরে ওত পেতেছে। এই বাড়ি কাজ করতে যাওয়া উচিত হবে না আর এখন।

সাহেবকে বংশী বলে, তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে ? নৌকোয় চলো।

তোমরা যেতে লাগো। ঘুমোবার জন্যে কি রাত ? ঘুরে ঘুরে খানিকটা দেখেশুনে যাই।

কেষ্টদাসকে ডেকে বলে, থাকবি নাকি রে আমার সঙ্গে ?

কেষ্টদাস আনন্দে গলে যায়।

অন্য দু-জন চলে গেলে কেষ্টদাসকে সাহেব ফিসফিস করে বলে, ধোনাই যেখানটা ছিল, সেইখানে চলে যা তুই। পাহারায় থাকবি। দেখি কিছু করা যায় কিনা।

রহস্যময় সাহেবের চালচলন। মনে মনে কোন এক মতলব ছকেছে। সাঁ করে সে দালানের পাশে চলে গেল। একটা জানলায় কান পাতল। অনেকক্ষণ ধরে আছে, নিশ্বাসটাও বুঝি পড়ে না। একসময় অবশেষে টিপিটিপি সরে এসে —বনতুলসির ঝাড় কতকগুলো, তার ভিতরে বসে পড়ল।

আরো কতক্ষণ কাটল। যে ঘরে সাহেব কান পেতেছিল, তারই একটা দরজা নিঃসাড়ে খুলে গেল একটুখানি। হতেই হবে—এরই জন্য সাহেব ঝোপের ভিতর অপেক্ষায় আছে। মাথায় আলোয়ান-জড়ানো মানুষটা বেরিয়ে আসে। এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে অতি সন্তর্পণে পা ফেলছে। সেই আগন্তুক—ধোনাই মিস্ত্রি এরই কথা বলছিল। আসছে এদিকেই।

হাঁটনা দেখে যে না সে-ই বলবে চোর। সাহেব টিপিটিপি পিছু নিল। সুয়োগ বুঝে আচমকা এক ধাক্কা। ঝুপ করে বসে পড়ল মানুষটা—সকলের আগে দু-হাতে মুখ ঢেকেছে। হাতে সম্পূর্ণ ঢাকে না তো মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে।

বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান—

ছেড়ে দাও বাবা, আর আসব না।

লক্ষ্মীবাবুকে ডেকে তুলি আগে। হাঁক দিয়ে পাড়াপড়শি জড় করি। ছেড়ে দিতে বলে তো তখন সে কথা।

জোর করে উল্টে ফেলেছে। ফুলবাবু—কোঁচানো ধুতি, সিল্কের চুড়িদার পাঞ্জাবি, চুলে ফুলেল তেল।

কান মলছি নাক মলছি বাবা, এমন কর্ম আর হবে না। কেঁদে ফেলল মানুষটা। বলে, কে বাবা তুমি ?

লক্ষ্মীবাবুর বন-কাটা মানুষ। বেলদার। বাড়িতে চোর হাঁটাহাঁটি করছে, আমায় তাই পাহারায় বসিয়েছে।

আমি চোর নই। দেখতে তো পাচ্ছ—চোরের মতো লাগে আমায় ?

সাহেব বলে, সে বিচার লক্ষ্মীবাবুর কাছে। ডেকে তুলি বাবুকে। বাড়ির মানুষ পাড়ার মানুষ এসে পড়ুক—বলি, নিজের ইচ্ছেয় উঠবে, না রুন্দা মেরে তুলতে হবে ?

লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে সাহেবের সামনে আধুলি বের করে ধরল: পানটান খেও ভাই। আমি এবারে আসি—

দাঁতে দাঁতে রেখে সাহেব চাপা তর্জন করে: গন্ধমাদন নিয়ে তো চলেছ, আমার পানের বেলা আধুলি ?

বলা নেই কওয়া নেই, লোকটার লম্বা ঝুল-পকেটে হাত ঢুকিয়ে পুঁটলি বের করে ফেলল। রুমালে বাঁধা গয়না।

লোকটা ব্যাকুল হয়ে ছিনিয়ে নিতে যায়: অবলা বেওয়া মানুষের জিনিস দায়ে পড়ে খবর পাঠিয়েছিল, বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছি। হাতের আংটি খুলে দিচ্ছি—আমার নিজের জিনিস। এই নিয়ে রেহাই দিয়ে যাও বাপধন।

ততক্ষণে অপর পকেট হাতড়ে বেরুল—নোট ভেবেছিল সাহেব, তা নয়—চিঠি একখানা। খামের চিঠি।

সাহেব বলে, অবলার প্রেমপত্তোর কখনো বুঝি পকেট-ছাড়া করো না ? দলিল তোমার, কাজ হাসিলের অস্তোর—উঁ ?

লোকটা যেন আকাশ থেকে পড়ে: এ সব কি বলো তুমি ?

না জেনে কি বলছি ? আরও বলছি, কলকাতায় পালানোর জন্য ফুসলানি দিচ্ছ অবলা বেওয়া মানুষকে।

গলা কেঁপে যায় সাহেবের। বলল, শখ একদিন মিটে যাবে। তখন তো গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে—আদিগঙ্গায়, নয়তো বড়-গঙ্গায়।

লোকটা বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। সাহেব বলছে, আড্ডির বস্তি নয়তো সোনাগাছি।

দেহে যেন দৈত্য ভর করে বসল হঠাৎ। পা ছুঁড়ে সজোরে লাথি দেয়। ছাড়া লোকটা কৃতকৃতার্থ, একছুটে পালিয়ে গেল।

কিন্তু কী হয়েছে সাহেবের—আশার অতীত লাভ, হাতে মুঠোয় এত দামের জিনিস, তবু কেমন আচ্ছন্ন হয়ে রইল। কেষ্টদাসের কাছে এসেও একটি কথা বলে না, হাত ধরে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল।

চলেছে। খালের ঘাটে ডিঙি—পা চলেছে সেইদিকে। হঠাৎ এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ল। বলে, দেশলাই আছে কেষ্টদাস ? ধরা দিকি।

কেষ্টদাস দেশলাই আর দুটো বিড়ি বের করল একটা বিড়ি সাহেবের হাতে দেয়। বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে সাহেব বলে, কাঠি ধরাতে বললাম, বিড়ি কে তোর কাছে চেয়েছে ?

কাঠি ধরিয়ে সেই চিঠি বের করে। প্রেমের চিঠি—পড়ার আগে জানলায় কান রেখেই সেটা বুঝে নিয়েছে। ডাকের চিঠি নয়, কারও হাত দিয়ে পাঠিয়েছিল। প্রেমরসে কী পরিমাণ হাবুডুবু খেলে মেয়েলোক হয়েও এমন মরীয়া হয়ে ওঠে !

গোটা গোটা অক্ষর—সুধামুখীর ঠিক এমনি লেখার ছাঁদ। সুধামুখী প্রথম

বয়সে এক লম্পটকে এমনি লিখত—হতে পারে, দুই যুগ পরে তারই একখানা হাতে এসে পড়ল। সাংঘাতিক চিঠি—অন্ধকার ঘরে কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছে না, তখন হয়তো মিনমিন করে বলা যায়। কিন্তু ধীরেসুস্থে কলমের অক্ষরে আসে কেমন করে এই সব কথা ?

আসতে পারে মাথা একেবারে যখন বিগড়ে যায়, জীবনে হঠাৎ এক এক মুহূর্ত আসে, মানুষ তখন দুরন্ত পাগল। আর যাই হোক, হাসাহাসি কিম্বা লাঠালাঠি কোরো না পাগল নিয়ে। পারো তো চোখের জল ফেলো।

তুই যেতে লাগ কেষ্টদাস। ডিঙি ছাড়বার আগেই আমি গিয়ে পড়ব।

কেষ্টদাস বলে, একলা কেন ? থাকি না আমি সঙ্গে—

কথার উপরে কথা ! খুব যে আস্পর্ধা এই ক'দিনের মধ্যে।

তাড়া খেয়ে কেষ্টদাস এতটুকু হয়ে গেল। সাহেবই তাকে সকলের বেশি টানে। কাজে নিষ্ফল হয়ে মেজাজ তার এখন বিগড়ে আছে।

আবার সাহেব গাঙ্গুলি-বাড়ি ঢুকে পড়ল। ঘরের দরজায় গিয়ে টোকা দেয়ঃ টুক-টুক-টুক। সে মানুষটা যখন ঘরে ঢোকে, কায়দাটা অলক্ষ্যে দেখে নিয়েছে। টুক-টুক-টুক তিনবার, একটুখানি থেমে আবার টুক-টুক-টুক—

দরজা খুলে গেল। ফিসফিস করে প্রশ্ন ঃ ফিরে এলে যে বড় ?

সাহেব আলাদা রকম গলায় বলে, তুমিই তো টেনে আনলে। পিদিমটা জ্বালো একবার দেখি—

এমনি সুরে হুবহু এই কথাগুলোই একটু আগে হয়ে গেছে—আলো জ্বেলে মুখটুকু দেখে নিয়ে সেই পুরুষের কণ্ঠ গদগদ হল। সাহেব জানলায় দাঁড়িয়ে প্রতিটি কথা শুনেছে। কলকাতা গিয়ে একখানা ঘর নিয়ে দুয়ের অভিন্ন হয়ে থাকবার পরামর্শ। পরামর্শ পাকা হয়ে গিয়ে তারপর প্রদীপ ধরে ক'খানা গয়না রুমালে বেঁধে ফেলা কলকাতার বন্দোবস্তের জন্য। ব্যাপার দেখে তৃতীয় ব্যক্তি সাহেবের বুঝতে বাকি থাকে না, অতিশয় গভীর এই প্রেম—ছিপে মাছ ধরার মতন সেই গভীর থেকে টাকাপয়সা গয়নাগাটি দীর্ঘকাল ধরে টেনে টেনে তোলা হচ্ছে।

সাহেব বলছে, ছুটে এলাম তোমায় দেখব বলে—

আবার দেখবে কি ? এক্ষতণ ধরে এই তো এত হয়ে গেল !

সোহাগে নমিতা গলে গলে যাচ্ছে। মুখ না দেখা যাক, কথার সুরে বোঝা যায়।

দরজা খুলে বিছানার উপর নমিতা আলসে গড়িয়ে পড়েছে।

হচ্ছে গো, হচ্ছে। সবুর সয় না মোটে তোমার !

শিয়রে পিলসুজ, তোষকের নিচে দেশলাই। আলো জ্বালতে জ্বালতে নমিতা বলে, কী মানুষ রে বাবা ! এই তো গেলে—ভয়ডর একটু যদি থাকে।

কথা শেষ হয় না, চোখ বড় বড় করে সে তাকিয়ে পড়ে। মুখ ছাইয়ের মতো সাদা। ছোরা উঁচিয়ে ডাকাত গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে। আলো পড়ে ছোরা চকচক করে উঠল।

ভয় সাহেবেরও। সর্বদেহ শিরশির করে ওঠে, আলনা থেকে চাদর তুলে নমিতার উপর ছুঁড়ে দেয়ঃ গায়ে দাও আগে। একটি শব্দ করেছ কি কুচ করে মুণ্ডু কেটে নিয়ে চলে যাব। এই কর্ম অনেক করা আছে। তুমি তো পুঁচকে মেয়েমানুষ, কত কত জোয়ানমরদ সাবাড় করেছি।

নমিতা কেঁদে পড়েঃ ধর্মবাপ তুমি আমার—

সন্তানের মরশুম পড়ে গেছে আজকের যাত্রায়। ঐ লোকটাও বাপ বলেছিল, 'বাবা—' বলে দে ছুট। ছেলে আর মেয়ে—কী গুণেরই সন্তান দুটি! নমিতা আরও কী সব বলতে যাচ্ছিল, সাহেব তাড়া দিলঃ চোপ! কি আছে তোমার, বের করে দাও—

কিচ্ছু নেই। মিছে কথা বলছি নে। বাক্সর চাবি দিচ্ছি, খুলে দেখ। আড়াই টাকা কি এগারো সিকে আছে কৌটোর মধ্যে। নিয়ে নাও সমস্ত, নিয়ে চলে যাও।

গয়নাপত্তোর?

বিধবা মানুষের গয়না কী থাকবে বাবা। চাবি দিয়েছি—সত্যি কি মিথ্যে, দেখ খুঁজে তন্নতন্ন করে।

খোঁজাখুঁজি কি—গোটা বাক্স উপুড় করে জিনিসপত্র ঢেলে ছড়িয়ে দিয়েছে। কিছু পুরানো কাপড়চোপড় ছাড়া সত্যিই নেই আর কিছু।

সাহেব ফিকফিক করে হাসে, কী দুষ্টামিতে পেয়ে গেল হঠাৎ। বলে, মাল না থাক, মানুষটা তুমি রয়েছ খাটখানা জুড়ে। পুণ্যের শরীর, আচারবিচার নিয়ে আছ—

বাক্সের জিনিসপত্র পায়ে ঠেলে দিয়ে সত্যি সত্যি সে আলুথালু নমিতার দিকে এগোয়ঃ দেখ তাকিয়ে একবার। চেহারাখানা পছন্দর নয়—বলো না গো!

অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে নমিতা। সাহেব দাঁড়িয়ে পড়ে কঠিন কণ্ঠে বলল, তা বটে, সেয়ানা চোর সে জিনিসও নিয়ে নিয়েছে—কিছু ফেলে যায়নি। রজনীকান্ত নয় সে জন—প্রাণকান্ত।

চিঠির উপরে নাম পেয়ে গেছে, সেই নাম বলল। রাগে রাগে সেই চিঠি ও গয়নার পুঁটলি তুলে ধরে দেখায়ঃ তোমার রজনীকান্ত দিয়ে গেছে—

সেই মুহূর্তে এক কাণ্ড। নমিতা উঠে পড়ে যেন উন্মাদ হয়ে সাহেবের পা ধরতে যায়। থরথর করে কাঁপছে। বড় বড় দুটো চোখে ধারা গড়ায়।

দিয়ে দাও ধর্মবাপ আমার। গয়না না দেবে তো চিঠিটা আমায় দাও।

ততক্ষণে সাহেব উধাও। বাড়ির বাইরে অনেকটা দূরে চলে গেছে। দাঁড়াল হঠাৎ—দাঁড়িয়ে পড়ে ভাবে। নমিতার কান্নার চেহারা চোখের উপরে

ভাসছে। দুশ্চারিণীর স্বল্পাবরণ দেহটার উপর কেমন যেন সুধামুখীর ছায়া পড়েছে। মায়ে-খেদানো সাহেবের মা হয়ে যে সুধামুখী একদিন নদীর কাদা থেকে বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়েছিল। নমিতার মধ্যে সেই মা-সুধামুখী।

পায়ে পায়ে ফিরে চলল আবার গাঙ্গুলিবাড়ি। কেষ্টদাসকে সরিয়ে দিয়েছে —দরজায় টোকা দিয়ে বেকুব হয় না কি হয়, কায়দাটা আগেভাগে দেখাতে চায়নি। সরে গিয়েছে ভাগ্যিস, নয়তো এই গয়নার পুঁটলি ফেরত দেওয়া চাউর হয়ে যেত, দলের মধ্যে নিন্দেমন্দ ও ঝগড়াঝাটি হত। ফেরত দিতে যাচ্ছে নমিতার ঘরে নয়, অনন্ত গাঙ্গুলি যে ঘরে শুয়েছে সেখানে—বন্ধ দরজার চৌকাঠের উপর। পুঁটলি রাখল, আর ঐ চিঠি। উড়েটুড়ে যাবে সেই শঙ্কায় ইটের টুকরো চাপা দিয়ে দিল চিঠির উপর। সকালবেলা অনন্ত দোর খুলে বাইরে এসে দেখতে পাবে—পড়বে চিঠি খুলে, বিমুগ্ধ হতভাগী মেয়েটার সামান্য সম্বল গয়না ক'খানা তুলেপেড়ে রাখবে। তারপরে চুলের মুঠো ধরে নিয়ে গিয়ে খুলনার হাসপাতালে নার্সগিরিতে ঢোকাবে। এবং রজনীকান্তের খোঁজ করে উত্তম-মধ্যম দেবে। হোক না হোক, ভাবতে দোষ কিসের? দামি মাল মুঠোয় পেয়ে বোকার মতন ফেলে দিয়ে গেলাম—কিন্তু একটা সুধামুখী আশাভঙ্গ হয়ে আকুলি-বিকুলি করতে লাগল, তার মজাটাই বা মন্দ কি! ভবিষ্যৎ পৃথিবীর একটা সুধামুখী তবু কম হয়ে গেল।

কিছুদিন পরে জুড়নপুরের আশালতার গয়নায় দশধারার দায় মিটে যাবার পর বংশীর কাছে চুপি চুপি সাহেব এই দিনের গল্প করেছিল। বেহিসাবি দুঃসাহসিক কাজ—যে মুরুব্বির কানে যাবে শতকণ্ঠে তিনি ধিক ধিক করবেন। মানা রয়েছে: নষ্ট মেয়েমানুষ যে-বাড়ি এবং লুচ্চো পুরুষের যেখানে আনা-গোনা, কদাপি সেখানে যাবে না। হীরেমাণিক পড়ে থাকলেও না। সাহেব ঢুকল কিনা সেই লম্পটের ভেক ধরে। রঙ্গরসিকতাও হল—

সাহেব দুঃখ করে বলছে, দু-মুখো সাপ দেখেছ বংশী, মানুষও তেমনি সব দু-মুখো। বাইরে দেখতে একটা মুখ, পেটে পেটে দুটো। অনাচারের ভয়ে শহরে নার্স হতে যাবে না, আসল কারণ বৃন্দাবনলীলায় তা হলে ভণ্ডুল ঘটে যায়। লীলাটা নির্ঝঞ্ঝাটে জমবে বলেই কলকাতা পালাচ্ছে। তাই দেখ, এক গলার নলি দিয়ে কেমন দু-রকম কথা বেরোয়। রান্নাঘরে ভাই-ভাজদের সঙ্গে একরকম, শোবার ঘরে পিরীতের জনের সঙ্গে অন্য। এক মুখওয়ালা দেখলাম কাজলীবালা একটি, শুনেছি বলাধিকারীর ব্রাহ্মণী ছিলেন আর একজন। ক'জন এমন আছেন, আঙুলে গণা যায়। ওঁরা নিতান্তই একা—একঘরে হয়ে থেকে সারাজীবন দুঃখই পেয়ে যান।

সমস্ত শুনে বংশীও দোষ দেয়: শেষরক্ষা যখন করেছিলে নিয়মকানুনের কথা আমি ধরব না। কিন্তু চোর হয়ে তুমি যে পুলিশের কাজ করলে সাহেব!

গাঙ্গুলিবাড়ির জবর চোরটাকে ধরিয়ে দিয়ে এলে।

বংশী বলে কি—যে শুনবে, সে-ই বলবে এমনি। চোরের কুলের কলঙ্ক। পুলিশের কাজ যদি বলতে হয় এই একবারে তার শেষ নয়। কতবার হয়েছে জীবনে। আপনা-আপনি কেমন হয়ে যায়—জন্মসূত্রে পাওয়া ভালোমানুষি মনের মধ্যে চেঁচামেচি জুড়ে দেয়, চেষ্টা করেও সাহেব রোধ করতে পারে না। একবার তো রীতিমতো রোমহর্ষক কাণ্ড—কুমির-চোর ধরা। পুলিশের বাপের সাধ্য ছিল না, সাহেব গিয়ে পড়ে সেই চোর ধরল।

উনিশ

চোরের কাজ নিশাকালে। নিশির কুটুম তাই বলে। দিনমানে যারা করে, তারা চোর নয়, ছিঁচকে। চোরের সমাজে অন্ত্যজ। দায়ে পড়ে এবারে এদের বাছ-বিচার নেই। দিন চলে যাচ্ছে—দারোগার দাবী না মেটালে জুড়ে দেবে দশধারায়। একবার জড়িয়ে পড়লে বেরিয়ে আসা সহজ নয়। দারোগা তখন নিজে কোমর বেঁধে লাগলেও সহজ হবে না।

যত দিন যায় মরীয়া হয়ে উঠছে ততই। এক দুপুরে দেখা যায়, ধোনাই মিস্ত্রি নদীর কূল ধরে ছুটতে ছুটতে আসছে। হাত তুলে ডিঙি থামিয়ে কাদা-জল ভেঙে সে উঠে পড়ল। খবর আছে! কলাবুনিয়ায় ঠাকুরদাস কুণ্ডুর বাড়ি। কুণ্ডুমশায় ধনী-মানী গৃহস্থ। বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার—রাবণের গোষ্ঠী-বিশেষ। অবস্থা ভাল হলেও বাড়িতে দালানকোঠার হাঙ্গামা নেই, মেটেঘর। কতদিকে কত ঘর, গণে পারা যাবে না। গোলকধাঁধাঁ বিশেষ। রাত্রিবেলা কাজ-কর্মের নিয়ম, কিন্তু সে নিয়ম এ বাড়ি চলবে না। যাকিছু দিনমানে। জোয়ান পুরুষ জন কুড়িক অন্তত, সবাই এখন ভুঁইক্ষেতের কাজে বেরিয়েছে। সন্ধ্যায় ফিরবে। এক কুড়ি দৈত্যসম মানুষ ঘরে আর দাওয়ায় পড়ে ভোঁস ভোঁস করে কামারের হাপরের মতো নিশ্বাস ছাড়ছে—আওয়াজ কানে শুনেই চোরের হৃৎকম্প লাগে, কাজকর্ম হবে কেমন করে সেই অবস্থায়? ফিরে পালাবে সে উপায়ও নেই, গোলকধাঁধাঁর মতো অন্ধকার, আনাচে-কানাচে শতেক বার পাক খেয়ে মরবে। অতএব যা-কিছু সেরে ফেলতে হবে সূর্যিঠাকুর পাটে বসবার আগে, মরদেরা ঘরে না ফিরতে। কি করবে দেখ এবার সকলে ভেবেচিন্তে বিচার-বিবেচনা করে। সাহেব, তুমিই তো একটা দিনমানের খবর চেয়েছিলে—খবর নিয়ে তাই ছুটতে ছুটতে আসছি।

সাহেব বলে, শুনতে পেলি, ওরে কেষ্টদাস?

গোপীযন্ত্র হাতে কেষ্টদাস সঙ্গে সঙ্গে ছইয়ের নিচে থেকে বেরিয়ে আসে। কণ্ঠী এনেছে মুঠোয় করে, সাহেব তার গলায় বেড় দিয়ে বেঁধে দেয়। নৌকোয় বসে বসে দুজনে রকমারি মতলব করে, তারই একটা খাটিয়ে দেখবে এখন।

ঠাকুরদাস কুণ্ডুর বাড়ি ঢুকে বোষ্টমঠাকুর তান ছাড়ল: হরি বলো মনরসনা

ওরে তুই বাঁচবি ক'দিন ? ভিক্ষে পাই চাট্টি মা-ঠাকরুন—

ঠাকুরদাসের স্ত্রী বড়গিন্নি রে-রে করে ওঠেন ঃ বাড়িতে অসুখবিসুখ, ভিক্ষে দেওয়া যাবে না বাবাঠাকুর। ভিক্ষে দেয় লোকে সকালবেলা, সন্ধ্যের এসে ভিক্ষে চায় এমন তো শুনিনি রে বাবা। এই দেখ, ম্যাচ-ম্যাচ করে একেবারে তুলসিতলায় এসেছে। ওরে ভোলা—

মাহিন্দার ডাকছেন হাঁকিয়ে দেবার জন্যে। নিরুদ্বিগ্ন কেষ্টদাস ততক্ষণে তুলসিমঞ্চের সামনে নিকানো আঙিনার উপর বসে পড়ে গোপীযন্ত্রে গাবগুবাগুব আওয়াজ তুলে চক্ষু বুঁজে পদাবলী-কীর্তন ধরল একখানা। আহা-মরি গলাখানা, প্রাণ কেড়ে নেয়।

কোথায় সন্ধ্যা, বিকালবেলা সবে এখন। গিন্নিবান্নি বউমেয়ে ছেলেপুলে যে যেখানে ছিল একে-দুয়ে এসে জুটছে। গা ধোওয়া, জল আনা, গরুর ফ্যান দেওয়া, বাসন মাজা, বাচ্চাদের খাওয়ানো-ধোয়ানো—এসময়কার যাবতীয় কাজ বন্ধ। সুরের লহরী খেলে যাচ্ছে কিশোর বাবাজীর কণ্ঠে। পর পর তিনখানা হয়ে গেল – গোষ্ঠলীলা, মানভঞ্জন আর রাই-উন্মাদিনী – ফরমাস তবু থামে না ঃ আর একখানা হোক বাবাজী।

বড়গিন্নিই এখন সকলকে সামলাচ্ছেন ঃ হবে বই কি, আবার হবে। জিরোতে দে একটুখানি তোরা। সেবা কিছু হবে না বাবাঠাকুর ? বাবাঠাকুর না বলে বাছাঠাকুর বলতে ইচ্ছে করে। খই-চিড়ে-নারকোলসন্দেশ আছে – দেবো ?

বাবাজি কেষ্টদাস ঘাড় নাড়ে ঃ দিনমানে একহারী মা-ঠাকরুন। ঠাকুর যা কিছু জুটিয়ে দিয়েছেন, এক পাট হয়ে গিয়েছে। সাঁজ গড়িয়ে গেলে আবার কিছু মুখে ঠেকাব। আমি বলি, আজেবাজে খেয়ে ক্ষিধে মারব না – যদি দুটো চাল ফুটিয়ে নেবার ব্যবস্থা করে দেন।

বড়গিন্নি লুফে নিয়ে বলেন, তাই হবে গো বাবা। ভাত, ডাল আর একখানা তরকারি। শেষ পাতে একটু গব্যও দিতে পারব – ঘরের গাইয়ের দুধ, গাছের সবরিকলা, ছাঁচবাতাসা –

অত হাঙ্গামায় কে যাচ্ছে মা-জননী ? গরিব মানুষ – দু-বেলা চাট্টি আলুনি ভাত জুটলে বর্তে যাই –

বড়গিন্নি নাছোড়বান্দা ঃ অন্যখানে কি খাও বাবাজী, সে আমরা দেখতে যাইনে। গৃহস্থবাড়ির উপর আধ-উপোসি পড়ে থাকতে কেন দেবো ?

সে যা হয় হবে – সন্ধ্যেটা আগে পার হয়ে যাক। গানও হবে, অনেক হবে। বিশ্রামের মধ্যে কেষ্টদাস ইতিমধ্যে গল্প জুড়ে দিয়েছে। নিজের কথা। হাটে এসে এক বৈরাগীর আখড়ায় গানে মজে গিয়েছিল। গানে বসলে আর হুঁশ থাকে না। সঙ্গীরা খুঁজেপেতে না পেয়ে নৌকা ছেড়ে চলে গেছে। হেঁটে হেঁটে ঘরে ফিরছে সে এখন। পয়সাকড়ি শূন্য, তা বলে ভাবনার কি ! রাধাবল্লভের সংসার – মুখে দুটি অন্ন, রাতের একটু আশ্রয় তিনিই জুটিয়ে দেবেন। না হয়

না-ই দিলেন গাছের তলায় নামগানে বসব, কোন দিক দিয়ে রাত পোহায়ে যাবে টেরই পাবো না।

হতে হতে অনেক পুরানো কথা — পথে-ঘাটে দিন কাটানো ও রাত পোহানোর নানান বিচিত্র কাহিনী। গানের গলা শুধু নয়, গল্প বাঁধতেও জানে বটে কেষ্টদাস; গল্প করে, আর সতর্ক চোখে বারম্বার ঠাহর করে দেখে, বাড়ির সকলে এসে জুটেছে তো এই জায়গায় — একটা কেউ ছিটকে পড়ে নেই কোনদিকে? টেনে রাখতে হবে আরও খানিকক্ষণ। গল্পে হোক, গানে হোক, হাতে দড়ি পড়ার মতো আবদ্ধ হয়ে থাকবে এখানটা। শুনছে সকলে তাজ্জব হয়ে। কেষ্টদাস দেখে নিয়েছে, সাঁ করে একজন অনতিদূরের চৌকিঘরে ঢুকে পড়ল। কে আবার — সাহেব ছাড়া অন্য কেউ নয়।

কুটোগাছটা নড়লে যে আওয়াজ, সাহেবের চলাচলে সেটুকু নেই। পা ফেলে চলে না, মাটির গায়ে যেন ভেসে ভেসে বেড়ায়। সিঁধের কাজে নারাজ এবারের যাত্রায়। বলে, ওস্তাদ যা হাতে তুলে দিয়েছ, সে জিনিস কি আদাড়ে-আঁস্তাকুড়ে বের করব? তার জন্যে চাই ভাল ক্ষেত্র, উত্তম বন্দোবস্ত। এখানে বিনা সরঞ্জামে যদ্দুর যা হাতড়ে নেওয়া যায়।

সেই মতলব নিয়ে এসেছে ঠাকুরদাস কুণ্ডুর বাড়ি।

চৌরিঘরে ঢুকে গিয়ে সাহেব পিছন-দরজা খুলে দিল। ক্ষিপ্র হাতে কাজ চলছে। গল্পের জোর আলগা হয়ে আসে বুঝে দরাজ গলায় গান জুড়ল আবার। নিমাই-সন্ন্যাস। বড় মোক্ষম পালা। শচীমাতার দুঃখে চোখের জলে ভাসবে না, এতদূর পাষাণহৃদয় অন্তত স্ত্রীলোকের মধ্যে নেই।

গান শেষ করে পশ্চিম-আকাশে মুখ তুলে কেষ্টদাস বলে, এইবারে মা-ঠাকরুনরা একটিবার ছেড়ে দেবেন। পুকুরঘাটে হাত-পা ধুয়ে জপটা সেরে আসি। এসে উনুন ধরাব। ভালই হল। কর্তারা সব এর মধ্যে এসে যাবেন। নামগান তাঁরাও শুনবেন দু-একখানা।

পুকুরঘাটের নাম করে কেষ্টদাস ছুটতে ছুটতে নৌকোয় এসে বলে, কষে বাও এবারে। গান গেয়ে গল্প করে বিস্তার খাটনি খেটে এসেছে, তা বলে উত্তেজনার মুখে ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাকতে পারে না। গোপীযন্ত্র ফেলে নিজেও বোঠে তুলে নিল। যা কিছু লভ্য হল, নিয়েথুয়ে দৌড় দাও এবারে। নৌকো নিয়ে দৌড়।

খান দুই বাঁক পার হয়ে গিয়ে নিশ্চিন্ত কেষ্টদাস বলে, পড়ল কিছু জালে?

সবাই নিজেদের লোক, ঠারেঠোরে বলবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, সহজ ভাবের কথা মুখে আসে না। বলছে, মাছটাছ হল কিছু?

সাহেবের সঙ্গে ডেপুটি ছিল বংশী, পাহারাদার ধোনাই। রামদাস নৌকোর পাহারায় ছিল। গুরুপদ নেই, থাকবার কথাও নয়, ওপারের দিকটা খোঁজদারি করে বেড়াচ্ছে। বংশীই ঘাড় কাত করে কেষ্টদাসের কথার জবাব দেয়: হ্যাঁ—

সাহেব দেমাক করে বলে, পালা তুলে পুকুর তুই সাফসাফাই করে দিলি,

আমি লোকটা খেওন ফেললাম্ মাছ হবে না কি রকম !

তার মানে, বিস্তর জায়গায় বেকুব হয়ে এসে এইবারটা হয়েছে। পুলকিত কেষ্টদাস প্রশ্ন করে, রুই-কাতলা ?

ধোনাই মিস্ত্রি বলে, মনে তো হয় তাই—

সাহেব বলে, রুই হোক, কাতলা হোক, একটাই। একের বেশি দুই নয়। পাটার চালি উঁচু করে দেখ্।

দেখে নেয় কেষ্টদাস বস্তুটা। মাঝারি সাইজের কাঠের বাক্স—তিন জায়গায় তালা ঝুলছে। খোলা সহজ হবে না, ভাঙতে হবে।

বংশী বলে, কাপড়-চোপড় বাসনকোসন আরও কত কি ছিল, সেসব আমরা ছুঁতে যাইনি। এই এক জিনিস বয়ে আনতেই তিন তিনটে মরদ হিমসিম খেয়ে গেলাম—অন্য দিকে চোখ মেলে কি করব ?

বাক্সের ভিতরটা না দেখা পর্যন্ত মনে কারো সোয়াস্তি নেই। কিন্তু আপাতত হয়ে উঠছে না। কাটাখালির মুখে সন্ধ্যার পর ডিঙি বেঁধে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা—গুরুপদ ওপারের খবরাখবর নিয়ে এসে গেছে সেখানে এতক্ষণ। পথের মাঝে এই কাজটা পড়ে দেরি করিয়ে দিল। তাড়িয়ে চলো ভাইসব দেরি হয়ে গেছে। গুরুপদকে তুলে নিয়ে তারপর কোন নিরালা ঠাঁই খুঁজে তবে বাক্স খোলা।

বাঁক ঘুরে যেতে জোর পিঠেন বাতাস। গাঙেরও টান খুব। বড় আরামের যাওয়া এবারে—বোঠে জলের উপর ছুঁয়ে আছে, তরতর করে ডিঙি ছুটছে। নিম্ন কণ্ঠে গল্পগুজব করে সকলে, তামাক খায়। মনের স্ফূর্তিতে নাচতে ইচ্ছে করে।

বাক্সের ভিতরে কি, ধোনাই আর বংশীতে তাই নিয়ে তর্ক। ধোনাই বলে, লোহালক্কড়—কুড়াল-কোদাল, দা-বঁটি। ঐটুকু এক বাক্স আনতে জীবন বেরিয়ে গেছে। লোহা ছাড়া এমন হয় না।

বংশী বলে, পাথরের জিনিস নয় কেন ? শিল-নোড়া, জাঁতা—

সাহেবের কানে পড়তে সে ধমক দিয়ে উঠল : আচ্ছা ছোট মন তোমাদের ! আন্দাজই যখন, সোনাদানা মনে আসে না কেন ? লোহা বলো, পাথর বলো, সোনার চেয়ে ভারী কি আছে ?

রামদাস তামাক খাচ্ছিল। হুঁকো থেকে মুখ তুলে বলে, তিনটে তালা লাগিয়েছে—ঠিকই তো, পাথর-লোহা তালা দিয়ে রাখতে যাবে কেন ? বাক্স সোনায় ভরা, খোলা হলে তখন দেখবে।

সাহেব হেসে আরও একপদ চড়িয়ে দেয় : শুধু সোনা কেন, সেই সঙ্গে মণি-মুক্তো থাকতে দোষ কি ?

বংশী বলে, দারোগা মুন্সি জমাদার সকলকে একবাটি দু-বাটি করে সোনা দিয়ে দেবো। দিয়ে খত লিখিয়ে নেবো, কারো নামে কোনদিন দশধারা মামলা না

গাঁথে। থানাওয়ালাদের খুশি করে তারপর নিজেরা এক একতাল হাতে নিয়ে বাড়ি গিয়ে উঠব। ইহজন্মে আর কাঠি ছোঁব না। উঠানের বাইরেই যাব না মোটে, ছেলে কাঁধে করে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াব।

মহানন্দে আগডুম-বাগডুম বকে চলেছে। রামদাস হুঁকো এগিয়ে ধরে বংশীর দিকে ঃ তামাক খাও বংশী—

বংশী হাতও বাড়িয়েছে নেবার জন্য। ঠকাস করে হুঁকো-কলকে পড়ে যায়, আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তামাক মাথায় উঠে গেছে এখন—কালো একটা রেখা ছুটে আসছে না? দেখ তো, দেখ দিকি ঠাহর করে—ধনুক থেকে যেন তীর ছুঁড়ে দিয়েছে, এমনি বেগে আসছে। কাঁপা গলায় বংশী বলে, দেখ না—ঐ দেখ—

ধোনাই মিস্ত্রি বলে, গাঙের উপর সোজাসুজি বেয়ে পারা যাবে না, ধরে ফেলবে এক্ষুনি—

হতে পারে ঠাকুরদাস কুণ্ডুর লোক। অথবা পিটেল। পেট্রোল-পুলিশ নৌকো এবং মোটরলঞ্চ নিয়ে জলপথ পাহারা দিয়ে বেড়ায়—চলতি নাম পিটেল। ফাঁকা নদীতে পিটেলের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কিছু দূরে সরু খাল একটা নজরে আসে। খালে ঢুকে পড়ে গা-ঢাকা দেওয়া—সেই একমাত্র উপায়। নতুন আমদানি হলেও কেষ্টদাসের এমন কিছু নয়—কিন্তু রামদাসের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। তারও চেয়ে বেশি বংশীর। বমাল সমেত পেয়ে গেলে কত বছর ঠেসে দেবে, ঠিকঠিকানা নেই। বউকে বলে এসেছে কুটুমবাড়ি চললাম—এখন যে কুটুম্বর বাড়ি পাকাপাকি ঘরবসতের গতিক। আবার যেদিন বাড়ি যাবে, বাচ্চা ছেলে বড় হয়ে গেছে তখন। বাপ বলে চিনবে না। পরিচয় দিলে তখনও চোর বাপকে চিনতে চাইবে না।

এত কথা লহমার মধ্যে মনে খেলে যায়। সেই পিছনের বস্তুটা জলের উপর একটা কালো ফোঁটার মতো দেখাচ্ছিল—এইবারে পুরোপুরি নৌকো হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছিপ-নৌকো—বাইচ খেলায় যে বস্তু নামায়। বাতাসের আগে চলে। একটি লহমা—খালের মধ্যে ঢুকে পড়তে যেটুকু দেরি। হতে পারে, ছিপনৌকো তাদের ঠাহর করতে পারেনি, যেমন আসছে সোজা গাঙ ধরে বেরিয়ে যাবে। আশা করা যাক এমনি—আশা একটা তো চাই।

খালে ঢুকতে গিয়ে—কী সর্বনাশ! দুই প্রকাণ্ড ভাউলে-নৌকো দুই দিকে বেঁধে রেখেছে। জল-পুলিশের এই কায়দা—বাহির-গাঙে তাড়া করে খালে এনে ঢোকায়। ডিঙি যেই মাত্র ঢুকে যাবে, দুদিকের ভাউলে আড়াআড়ি হয়ে সরু খালের মুখে আটকাবে। বনের হাতি তাড়িয়ে তুড়িয়ে খেদায় ঢুকিয়ে যেমন মুখ আটকে দেয়। এমনিতরো কাজে মার্কামারা সরকারি সাদা বোটের কদাচিৎ ব্যবহার। বুঝতে পেরে মানুষ তো সতর্ক হয়ে যাবে। সাধারণ নৌকো ভাড়া করে পিটেল ওত পেতে থাকে, যেমন এই ভাউলে দুটো। পিছু নেয় সে-ও সাধারণ

নৌকো ছুটিয়ে। যেমন ঐ ছিপ নৌকো। মাঝিমাল্লার সাজে যারা রয়েছে, জাঁদরেল পুলিশের লোক তারা। লোক-দেখানো দাঁড় টানে হাল বায়, পাশে গুলি-ভরা বন্দুক। দরকার হলে মুহূর্তে নিজমূর্তি নিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে উঠবে।

চোখাচোখি নিজেদের মধ্যে। মতলব ঠিক হয়ে গেছে। ছুটছিল ডিঙি, গতি থামিয়ে দিল। বোঠে সবগুলো জলের উপর তুলে ধরেছে—নৌকো চলে কি না চলে। কাড়ালের দিকে ছইয়ের অন্তরালে বাক্সটা তুলে ধরে নামিয়ে দিল গহিন গাঙের জলে।

বমাল লোপাট—আর এখন কি করতে পারিস? বংশী আর ধোনাই মিস্ত্রি দাগি দুটো লোক আছে বটে ডিঙিতে—কিন্তু তাদের কি অন্য কাজকর্ম থাকতে নেই? হাটবাজারে কিম্বা আত্মীয়-কুটুম্বর গাঁয়ে যেতে পারে না? ঠিক কথাই তো আছে—ধান কাটতে গিয়েছিলাম দক্ষিণের নাবালে; কাজকর্ম শেষ, হেলতে দুলতে এবার ঘরে ফিরছি। লেজা-সড়কির কথা যদি বলো—বাঘকুমিরের মুখে পড়ি না চোর ডাকাতের হাতে পড়ি, আপদবিপদের জন্য রাখতে হয় দু-একখানা। সবাই রাখে।

খালে না ঢুকে বড় গাঙ ধরেই চলল। বমাল ফেলে হালকা হয়েছে, আর এখন কিসের ভয়? পিছনের ছিপ ক্রমশ কাছে এসে পড়ছে, সাহেব একনজরে সেদিকে তাকিয়ে। কান খাড়া।

বাক্সর শোক ধোনাই ভুলতে পারছে না। নৌকোয় নামানোর সময় হাত ছেঁচে গিয়েছে, ফুলে উঠেছে ক'টা আঙুল। একবার সে আঙুলের দিকে তাকায়, একবার অতল জলের দিকে। আর বিড়বিড় করে কেষ্টদাসের সঙ্গে দুঃখ করে। এমনি সময় সাহেব বংশীকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, শোন দিকি ভাল করে। কি শুনতে পাও?

মনে হয় বটে, ছিপের মানুষ কাছাকাছি হয়ে বোঠে মারার কায়দা বদলেছে। বোঠের মুখে যেন কথা বলতে চায়—যার নাম চোর সংজ্ঞা। ঠিকমতো হচ্ছে না। হতে পারে কাঁচা-হাতের চেষ্টা।

বংশীর এক বাচ্চা মারা গেলে চিতায় পুড়িয়ে গাঙের জলে দিয়েছিল। আজকের এই বাক্স-বিসর্জনের ব্যাপারটা সেদিনের মতোই সে নিঃশব্দে চোখ মেলে দেখেছে। এতক্ষণে হায়-হায় করে উঠল: মিছামিছি গেল জিনিসটা! ভাল করে চেয়ে দেখলে না, পাগল হয়ে উঠলে যেন তোমরা।

ধোনাই বলে উঠল, সোনা বেচে পয়সার পাহাড় হত রে! গোলায় যদি রাখতাম, গোলা ভরতি হয়ে যেত। অঁ্যা, কেষ্টদাস?

কেষ্টদাসকে সালিশ মানল। বাক্স ফেলার প্রধান উদ্যোগী সাহেব—তার দিকে কেষ্টদাস একবার তাকায়। লজ্জা পেয়ে হাসছে সাহেব মৃদু মৃদু। কেষ্টদাস উল্টো কথা বলে: সোনা না ঘোড়ার ডিম! অতগুলো বউয়ের

কারো গায়ে সোনার গয়না দেখতে পেলাম না। সোনা কখনো কুন্ডুরা চোখে দেখেছে! শিলনোড়া দা-কুড়ুল এই সব। বাক্স খুলে দেখে আমরাই তো ফেলে দিতাম, একটু আগে না হয় ফেলা হয়ে গেছে।

কেষ্টদাস হেসে উঠে বলে, এইরকম তুমিও বুঝে রাখ না। মন ঠান্ডা হবে।

ছিপ আরও কাছে এসে গেছে। এখন আর সন্দেহমাত্র নেই। সাহেব প্রবোধ দিয়ে বলে, মুশড়ে গেলে যে তোমরা! রাজার ভান্ডার একটা, চোরের ভান্ডার রাজ্য জুড়ে। বাক্স গেছে, সিন্দুক এসে পড়বে দেখো। ধনসম্পত্তি যতদিন লোকের ঘরে আছে, আমাদেরও আছে। শুধু এনে ফেলার অপেক্ষা।

বংশীর পিঠে এক থাবা ঝেড়ে দিয়ে চাঙ্গা করে: বেরিয়েছি যখন, তোমার দশধারা ঠেকাবোই। গুরুর দেওয়া সরঞ্জাম আমার গায়ে, সেই জিনিস ছুঁয়ে কিরে করছি। কালনাগ-সাপের মাথায় মণি যদি খুলে আনতে হয়, তাই নিয়ে আসব তোমার কাজে।

যে কথা বলল, সত্যি সত্যি করেও ছিল তাই। সদ্য বিয়ের বউ আশালতার গায়ের কাছে শুয়ে একটা একটা করে গয়না খুলে আনল। মন্ত্র পড়ে কালনাগের মাথার মণি নিয়ে আসা এর চেয়ে কঠিন কিছু নয়।

ছিপ এখন একেবারে কাছে। হঠাৎ সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে হাঁক দিয়ে ওঠে: কারা যাও তোমরা? মুখ ঘুরিয়ে মুচকি হেসে বলে, মজা করি একটু।

ছিপনৌকো থেকে মিনমিনে গলার জবাব আসে: ব্যাপারি—

কোন্ জায়গার ব্যাপারি? কি নাম? কিসের বাণিজ্য? সারবন্দি খাড়া হয়ে সব দাঁড়াও।

ডিঙির সাঙাতদের ফিসফিস করে বলে, ওরা চোর—আমরাই যেন পিটেল-পুলিশ। ছদ্মবেশ ধরে যাচ্ছি।

ছিপ নৌকোর বাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। শলাপরামর্শ করছে ওরা নিজেদের মধ্যে। হুকুম-মাফিক কেউ উঠে দাঁড়ায় না।

চাপা গলায় বংশী তর্জন করে: অবাক কান্ড, এই সময়টা রঙ্গরস লাগল তোমার! এত বড় লোকসানও মনে লাগে না, কী মানুষ তুমি বলো দিকি—যোগীঋষি না কাঠপাথর?

সাহেব একমুখ হাসি নিয়ে ছিপের উদ্দেশ্যে হুঙ্কার দেয়: হল কি তোমাদের, কথা কানে যায় না বুঝি?

দাঁড়িয়ে পড়ত তারা ঠিকই, কিন্তু বংশী মজাটা পুরোপুরি হতে দিল না। এ রকম হাসিমস্করা বড় বিপজ্জনক। তুমি আজ করলে, ওরাও কোনদিন অন্য কারো সঙ্গে করবে। রীতিনিয়ম তো উঠে যাবে এমনি হলে। তাড়াতাড়ি বোঠে তুলে নিয়ে বংশী জলে বাড়ি দেয়। গাবতলির হাটের নিচে সাহেবের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনে যেমন করেছিল। এ কাজে বংশীর জুড়ি নেই।

বাড়ির পর বাড়ি। টেলিগ্রাফ-যন্ত্রে টরে-টক্কার মধ্যে কথা—জলে বোঠে

মেরে মাঝিমাল্লাও তেমনি কথার চালান দেয়। ঝিমিয়ে-পড়া ছিপ মুহূর্তে চকিত হয়ে উঠল। তরতর করে ডিঙির পাশে এসে গায়ে গায়ে লাগায়। পরিচয় হয়ে গেল, ভাইয়ে ভাইয়ে একেবারে গলাগলি এখন।

নিতান্ত উপমার কথাও নয়। বংশী আর চাঁদমিঞা একই দলে কাজ করে এসেছে। গোড়ার দিকে চাঁদমিঞার রাগ যে না হয়েছিল এমন নয়। পুরানো সাঙাত পেয়ে ভুলে গেল। পান-তামাকের লেনদেন এ-নৌকোয় ও-নৌকোয়। দশরকম সুখ-দুঃখের কথাবার্তা। খালের মুখের জোড়া-ভাউলের বৃত্তান্তও চাঁদমিঞার কাছে পাওয়া গেল। ব্যাপারি-নৌকো সত্যি সত্যি। হাটে হাটে মাল গস্ত করে বেড়াচ্ছে। পরশুদিন গাবতলির হাট থেকে-চাঁদমিঞা নজর ধরে আছে, ফাঁকায় পেলে একটু মোচড় দিয়ে দেখবে। কিন্তু হল না, হবার উপায় নেই—

ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে চাঁদমিঞা বলে, এই আজ বিকেলেই পিটেলের নৌকো দেখলাম। ওরা এবার বড্ড লেগেছে। পুলিসের দিকে এক চোখ এক কান আর মক্কেলের দিকে একচোখ এক কান—ভাগাভাগি করে কাজকর্ম হয় কখনো? দূর, দূর! কারিগর না হতে গিয়ে যদি পুলিস হতাম, অনেক ছিল ভাল। অনেক বেশি রোজগার।

একটা গাঙের মুখে এসে চাঁদমিঞা ডাইনে ঘুরল। এরা ছুটেছে কাটাখালি মুখো।

কাটাখালিতে গুরুপদ সেই সন্ধ্যা থেকে অপেক্ষায় আছে। কাজের কিছু নয় মক্কেলের খবরাখবর নেই, শুধু-শুধু হয়রানি। তার উপরে হোঁচট খেয়ে সে ভূঁইয়ের আল থেকে কাঁটাবনে পড়েছিল, গণ্ডা দশেক কাঁটা ফুটে আছে পায়ে। মন মেজাজ তিরিক্ষি। বাক্স ফেলার বৃত্তান্ত শুনে এই মারে তো এই মারে। বলে, বিধাতাপুরুষ হামেশাই মানুষকে দেয় না, জন্মের মধ্যে একবার হয়তো দিল। হাতের লক্ষ্মী বিসর্জন দিয়ে এলে, আমি বাপু নেই আর তোমাদের সঙ্গে। অপয়া তোমরা সব। তিলকপুরে সেবারে জান নিয়ে কোন গতিকে ফিরেছিলাম—এবারে আরও সাংঘাতিক হবে, বুঝতে পারছি।

মক্কেলের অভাবে রাত্রে বেরুনো হল না। কাটাখালি খেজুরবনের পাশে চাপান দিয়ে রইল। গুরুপদ একটি কথা বলল না কারো সঙ্গে, শেষরাত্রে নেমে বাড়ির পথে হাঁটল।

কেষ্টদাস বলে, যাকগে, বয়ে গেল। বুড়োবয়সে কষ্ট করে পারে না, ঘরেও মনটা টেনেছে—তাই একটা ছুতো।

কিন্তু প্রধান উদ্যোগী বংশীও মিইয়ে গেছে। লক্ষ্যহীন ঘোরাঘুরি আর নয়। মুনাফা নেই—বরঞ্চ পিটেল—পুলিসের যা খবর, বিপদ আসতে পারে যে-কোন মুহূর্তে। দশধারার মামলা কাঁধে ঝুলছিল, দিন সংক্ষেপ হয়ে এখন মাথায় পড়েছে। মরীয়া হয়ে একবারের সর্বশেষ চেষ্টা। ফুলহাটায় যাই চলো, বলাধিকারী মশায়ের শরণ নিইগে। তিনি ছাড়া সুরাহা হবে না। বলাধিকারী

থাকবেন মাথার উপরে, ক্ষুদিরাম ভট্টচার্য হবে খুঁজিয়াল। ক্ষুদিরামকে ধরে পড়ব গিয়ে, দায় জানাব। দয়া আছে মানুষটার। দয়ার চেয়ে বড় – দুঃসাহসের কাজে নামবার ঝোঁক। এখনো – এই বয়সে।

বলাধিকারী ডাকলেন, এরা কি বলছে শুনে যান একটু ভটচাজমশায়। বড্ড ধরাপাড়া করছে।

ডাকাডাকিতে ক্ষুদিরাম এলো। বংশীর দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, টহলদারি শেষ হল – বেগ মিটেছে তো ভাল করে? রাত পোহাতে তা হলে কাকের ডাকই লাগে, পেঁচার ডাকে হয় না কি বলো?

অতএব দলের ভিতরের আজেবাজে কথাবার্তাগুলোও ক্ষুদিরাম জেনে বসে আছে। হাতের পাতায় বিধাতাপুরুষের হিজিবিজি গড়গড় করে পড়ে যায়—ও-মানুষের সঙ্গে কে পারবে? কান পেতে শুনতে হয় না, মুখে তাকিয়েই সে বোঝে।

গুরুপদর উপর রাগটা বেশি। ক্ষুদিরাম বলে ডাকো একবার ঢালির পো'কে। এখন সে কী বলে শোনা যাক।

নেই, কেটে পড়েছে। কাতর হয়ে বংশী বলে, দায় উদ্ধার করতেই হবে ভট-চাজমশায়। পাদপদ্মে এসে পড়েছি, লাথি মারলেও নড়ব না।

সত্যি সত্যি পা চেপে ধরতে যায়। দুপা পিছিয়ে গিয়ে ক্ষুদিরাম বলে, এক্ষুনি তার কি! তোমাদের দায় বলে ক্ষেত্তোরখানা অমনি তো আকাশ থেকে পড়ছে না। খুঁজেপেতে দেখব, সময় লাগবে।

জগবন্ধু বলাধিকারী, দেখা যায়, এদের পক্ষেই আছেন। তিনি সুপারিশ করেন: রাখুন দিকি! আকাশের গ্রহনক্ষত্রগুলো নখের আগায় নিয়ে ঘোরেন। তাদের খবর টপাটপ বলে দেন। এইটুকু অঞ্চলের মধ্যে যেমন-তেমন একখানা ক্ষেত্তোরের খোঁজে আপনার এক যুগ বারো বছর লাগবে! ঘেন্নার কথা আর বলবেন না, হাসবে লোকে।

আর কথা না বাড়িয়ে ক্ষুদিরাম চোখ বুঁজে মুহূর্তকাল চুপ করে রইল। তারপর মুখস্থ করার মতো বলে যায়, নবগ্রাম সেনদের বাড়ি। কাজখানা আজ-কেই নামানো চলে। উঁহু, আজ ঠিক হবে না। সেনদের সাবেকি দালানকোঠা —দেয়াল কমপক্ষে আড়াই হাত পুরু। দেয়াল কাটতেই রাত কাবার। কোন দরকার নেই, সবুর করো পাঁচটা সাতটা দিন। মক্কেল জুড়নপুরে ফিরে যাক। মেটে-ঘর সেখানে—দোআঁশলা মাটি। একটু একটু জল ছিটালে মাটি মাখনের মতো আপনি গলে আসবে।

সগর্বে বলাধিকারী সকলের দিকে চেয়ে বলেন, দেখ আমি কি মিথ্যে বলেছি? অথচ দু-তিন মাসের মধ্যে ভটচাজমশায় গাঁয়ের বাইরে যাননি। না, তারও বেশি, কালীপুজোর পর থেকেই তো বেরোননি।

ঘোনাই মিস্ত্রি অবাক হয়ে বলে, মুলুকের খবরও গণেপড়ে বলে দিলে ?

হাসতে হাসতে ক্ষুদিরামই তখন রহস্যভেদ করে ঃ না হে বাপু। আমি কিছু গণতে যায়নি, মক্কেলরা গণাতে এসেছিল।

গণাতে এসেছিল এক মেয়েওয়ালা। পাত্র নবগ্রাম সেনবাড়ির শঙ্করানন্দ। প্রথম পক্ষ গত হতে না হতে ভাগাড়ে গরু মরলে কাক-শকুনের যেমন হয়, কন্যা-দায়গ্রস্ত লোকের হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে।

কোষ্ঠি হাতে করে এক কন্যাপক্ষ উপস্থিত ঃ সেনরা পাঁজিপুঁথি বড় মানে। রাজযোটক হলে এক পয়সা পণ লাগবে না। আপনি ব্যবস্থা করে দিন সামুদ্রিকাচার্য মশায়।

ক্ষুদিরাম বলে, পাত্রের কুষ্ঠিও নিয়ে আসুন। না মিলিয়ে যোটক বিচার কেমন করে হবে ?

দেবে না, ঘুঘু আছে সেদিক দিয়ে। পাত্রের কুষ্ঠি তারা হাতে রেখে দিয়েছে। যা-কিছু এই কনের কুষ্ঠি থেকেই। সেই জনেই তো আসা আপনার কাছে। কুষ্ঠিটা মেরামত করে পুরানো তুলট কাগজে লিখে দেবেন—পাত্রের কুষ্ঠি যেমনই হোক. রাজযোটক হয়ে দাঁড়ায় যেন।

ক্ষুদিরামের মুখ দেখে কি বুঝল কে জানে। জোর দিয়ে বলে কেন হবে না ? রানী ভবানী, সুরেন বাড়ুয্যে চাই কি আকবর বাদশা—গোটাকয়েক দিক-পাল মানুষের ছক থেকে জুড়েতেড়ে বসিয়ে দিন। কনের কুষ্ঠি দেখে ছেলে-ওয়ালারা হাঁ হয়ে যাবে, লগ্নপত্তোর করতে সবুর সইবে না।

দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র, কালোকুৎসিৎ চেহারা, দুটো গজদন্ত ওষ্ঠ ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে, চুলও পেকেছে দু-চারটে। কিন্তু হলে হবে কি—শঙ্করানন্দ সেনবাড়ির ছেলে। আর এক মস্ত কথা, আগের বউ সন্তান রেখে যায়নি, অঢেল গয়না রেখে গেছে আপাদমস্তক পরেও যা শেষ করা যায় না।

ক্ষুদিরাম সোজাসুজি ঘাড় নেড়ে দিল ঃ কুষ্ঠি জাল করা আমার দ্বারা হবে না।

জাল কেন বলেন ? অরক্ষণীয়া মেয়ে কাঁধে – যাতে নামাতে পারি, তার জন্য এদিক-সেদিক খানিকটা মেরামত করে দেওয়া। করে তো সবাই।

তাদের কাছে যান।

কাজটা যে নিখুঁত চাই। সেনরা বড্ড ঘড়েল, ধরে না ফেলে। আপনি ছাড়া কারো উপর ভরসা হয় না। যে রকম দক্ষিণায় পোষায়, তার জন্য আটকাবে না।

ক্ষুদিরাম হাত বাড়িয়ে বাইরের পথ দেখিয়ে দেয় ঃ চলে যান, এক্ষুনি –

যেতে যেতে কন্যার পিতা কটু মন্তব্য করে ঃ কী আমার ধর্মঠাকুর রে ! কলি তরাতে এসেছেন – আরও যদি না জানতাম !

ক্ষুদিরাম নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে, আমি লোকটা মেকি। কিন্তু সামান্য একটু বিদ্যে নিয়ে আছি জেনেশুনে তার মধ্যে ভেজাল ঢোকাতে পারব না।

এই মানুষটির সঙ্গেই ক'দিন পরে আবার দেখা হয়ে গেল। কৌতূহলী ক্ষুদিরাম জিজ্ঞাসা করে ঃ কুণ্ঠি মেরামত হল আপনার ?

এখন হয়ে কি হবে! আপনার জন্যেই তো মশায়! মর্মান্তিক ক্রোধে ক্ষুদিরামের উপর সে খিঁচিয়ে উঠল ঃ আপনাকে না পেয়ে খুলনায় জ্যোতির্ভূষণমশায় অবধি ধাওয়া করতে হল। ফিরে এসে শুনি, জুড়নপুরের এক মেয়ের জন্য এর মধ্যে গেঁথে ফেলে দিয়েছে। লগ্নপত্তোর দিনক্ষণ নেমন্তন্ন-আমন্তন্ন সারা।

বিয়ের তারিখ এগারোই—সেই লোকের কাছেই শুনেছিল। কর গুণে ক্ষুদিরাম এবার হিসাব করছে ঃ আর আজকে হল ষোলই। পাঁচ দিন বিয়ে হয়ে গেছে। কনে এখন শ্বশুরবাড়ি—নবগ্রামে। বিয়ের যাত্রায় কদ্দিন আর থাকবে ? আরও চারটে পাঁচটা দিন ধরো। তারপরে মক্কেল জুড়নপুর যাবে। কাজ সেইখানে।

বংশী আবদারের সুরে বলে, খোঁজ দিয়েই হল না। আপনাকে যেতে হবে ভটচাজমশায়, সাথে সঙ্গে থাকবেন। শিরে সংক্রান্তি আমাদের, তড়িঘড়ি ভালো কাজ নামাতেই হবে একখানা।

ক্ষুদিরাম লুফে নিয়ে বলে যাবোই তো। জবর কাজ—হাজারে একটা আসে এমন। ঘরে বসে থাকতে মনই বা মানবে কেন ? কিন্তু কারিগরের বুকে বল আছে তো ? ঢলঢলে ছুঁড়ি, ভরভরন্ত যৌবন—তার ঘরে ঢুকে গয়না নিয়ে আসা।

ধোনাই মিস্ত্রি বলে ওঠে, ওস্তাদের যে দিব্যি দেওয়া—

ক্ষুদিরাম মুখ ঘুরিয়ে সাহেবের দিকে চেয়ে বলে, তোমাদের নয়, আমি সাহেবকে বলছি। ঘর নয় সে টাকশাল। রুপো-তামা নয়, শুধুই সোনা। বিয়ের কনের গা থেকে সোনা ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে আসা।

সাহেব জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে। বংশী শিউরে উঠে বলে, ডবকা মেয়ের গায়ে হাত।

সাহেব মৃদু মন্তব্য করে ঃ বিয়ে হয়েছে সে মেয়ের, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তো অর্ধেক-বুড়ি।

বলাধিকারী এতক্ষণে এইবার বললেন, কায়দাটা হল, বরের মতন টুক করে সেই মেয়ের পাশে শুয়ে পড়বে। মন দুলবে না গা কাঁপবে না বড্ড কঠিন কাজ। ধরো, ঘুমের মধ্যে হাত বাড়িয়ে সে তোমায় গায়ের উপর টানল—

অবহেলার ভাবে সাহেব বলে, দীঘির পাড়ে কালকেউটে পায়ে উঠেছিল। তাতেও গা কাঁপল না, মেয়েমানুষে কি হবে ?

বলাধিকারী বলেন, জেগে চেঁচিয়ে উঠতে পারে। ও বয়সের মেয়ের ঘুম বড় পাতলা।

সাহেব বলে, বাইটা মশায়ের ব্যবস্থা আছে। নিদালি-পাতা—বড় মোক্ষম জিনিস। পাতার বিড়িও মুখে নেবো। সকলের উপরে এই আমার রয়েছে—

হাত দুটো তুলে ধরে দু-হাতের আঙুল সগর্বে সঞ্চালন করে: দশ আঙুলে এই আমার দশ-দশটা কিংকর। আঙুল বুলিয়ে ঘুম পাড়াতে পারি। এ জিনিসও ওস্তাদের কাছে পাওয়া। পরখ হোক না বলাধিকারী মশায়, শুয়ে পড়ুন আপনি, ঘুম পাড়িয়ে দিই।

ওস্তাদের উদ্দেশ্যে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে সাহেব হাঁটুর কাপড় সরিয়ে পায়ে বাঁধা কাঠিতে হাত ঠেকায়। বলে, ওস্তাদ হাতে তুলে দিয়েছেন, শক্ত কাজেই এ জিনিষের বউনি। আশীর্বাদ করুন বলাধিকারীমশায়, জিতে এসে আবার আপনার পায়ের ধুলো নেবো।

কুড়ি

কাজের মতো কাজ একখানা আশালতার গায়ের গয়না খুলে আনা। আগে যেসব হয়েছে তার কোনটি কাজ নয়, খেলা – কাজের নিয়মকানুন না মেনে হুট করে ঝাঁপিয়ে পড়া কোন একখানে। সিঁধকাঠি যদি হয় রাজদণ্ড, রাজদণ্ড হাতে সাহেবের প্রথম প্রবেশ জুড়নপুরে আশালতার ঘরে। সিঁধের কাজও এই প্রথম।

কাজে নেমে জয়জয়কার। বলাধিকারী শতকণ্ঠে তারিপ করেছেন। তা-বড় তা-বড় পুরানো কারিগরের মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে। হিংসা সকলের: ছোকরা-মানুষ লাইনে এসেই কী তাজ্জব দেখাল! যারা এই কর্মে চুল পাকিয়ে ফেলল, তারাও এমন জিনিস ভাবতে পারে না। বিশ্বাসই করে না অনেকে। বলে, হতে পারে না, বাজে কথা।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত হৈ-হৈ, সে কেমন ঝিম-ধরা হয়ে আছে। যুবতী নারীর গায়ে বিষ, সে রাত্রে বিষের ছোঁয়া লাগল। জ্বলুনির সেই থেকে বিরাম নেই। বুঝি যৌবনের জ্বলুনি। ছুতো করে সাহেব জুড়নপুর গেল—রাতে যে মক্কেল মাত্র, দিনমানে নারীর রূপে দেখবে তাকে। গিয়ে আবার নতুন গোলমাল রেলের কামরার সেই মা-জননী, সর্বনাশ তাঁদেরই করে এসেছে। সবিস্তারে মা গয়না-চুরির কথা বলতে লাগলেন: রাজরানীর সাজে তারা বউ পাঠাল ভাববে, বাপের বাড়ির লোক অভাবে পড়ে গয়না বেচে খেয়েছে। সেই মুহূর্তে এক মতলব আসে সাহেবের মনে: বলাধিকারীর ব্যবস্থায় গয়না এতক্ষণে গলে টাকা হয়ে গেছে। আবার এক রাত্রে এই বাড়ি এসে চুরি করে নগদ টাকা রেখে গেলে কেমন হয়? চোর মানুষের কাজ হরণ করে নেওয়া। সাহেব উল্টো ভাবছে: দিয়ে যাবে টাকা এখানে এসে। দশকুমার-চরিতের

রাজপুত্র অপহারবর্মণ যা করতেন—

সে কাহিনীও বলাধিকারীর কাছে শোনা। চম্পা শহরে বিস্তর ধনী। কৃপণের জাসু তারা, হাতে জল গলে না। অপহারবর্মণের রোখ চাপল : ধন-ঐশ্বর্য নিতান্তই নশ্বর, ধনের অহংকার অবিধেয়—এই সত্য প্রমাণ করে দেবেন তিনি। মুখের যুক্তিতে নয়, কাজে খাটিয়ে। রাজপুত্র যেমন শাস্ত্রজ্ঞ, চৌরকলার অনুশীলনে ঘুঘু-চোরও তেমনি। ধনীর টাকাকড়ি চুরি করে ভিক্ষুকদের দিলেন। পাশা উল্টে গেল—ভিক্ষুকরাই ধনী এখন, আগের দিনের ধনীজন ভিক্ষাপাত্র হাতে আগের দিনের ভিক্ষুকদের কাছে যায়। অপহারবর্মণ মজা দেখেন।

সাহেবও করবে তাই – বড়লোকের বাক্স বাক্স টাকা অভাবীদের ঘরে পেঁছে দেবে। এবং আশালতার মায়ের ঘরে সকলের আগে দু-চার বাক্স।

জুড়নপুর থেকে সাহেব ফুলহাটা ফিরছে উলুখড়ের আঁটি মাথায় নিয়ে। লোকে দেখে নিরীহ খড়—আঁটির ভিতরে লেজা-সড়কি-কাঠি। সারাপথ তখন এইসব চিন্তা : টাকা রেখে আসব চুপিসারে নিশিরাত্রে গিয়ে। টাকা হলেই গয়না – আশালতার হাতে কঙ্কণ উঠবে আবার, গলায় নেকলেস। সর্বঅঙ্গে গয়না পরে যুবতী মেয়ে আরও কত ঝকমক করবে।

ফুলহাটা এসে সুধামুখীর চিঠি। সুধামুখী গলা ফাটিয়ে 'সাহেব' 'সাহেব' করে ডাকছে যেন চিঠির লেখায়। সেই এক সময়ে লণ্ঠন হাতে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে যেমন ডেকে বেড়াত। চিঠিতে সুধামুখী টাকা চায়নি, তবু কিন্তু সাহেব বখরার টাকা-আনা সমস্ত তার নামে পাঠিয়ে এলো। নতুন বাসা ভাড়া নিতে যাচ্ছে – বিস্তর খরচ যে তার এখন। বাসা নেবে বরানগরের দিকে, ফণী আড্ডির বস্তির মানুষ যে জায়গার হদিস পাবে না। গণ্ডা গণ্ডা কনে দেখে বেড়াচ্ছে – কত রূপের কত ঢঙের সব কনে – সাহেবকে পেলেই কনে একটা পছন্দ করে ঘরে এনে তোলে। সে ঘরে বুঝি গোলপাতার ছাউনি আশালতাদের মতো, সে বাড়ির উঠানে লাউয়ের মাচা, সে উঠানের পাশে ডোবার কলমিঝাড়ের মধ্যে পাতিহাঁস ভেসে ভেসে বেড়ায়।

সাহেবের কাজ দেখে ক্ষুদিরামের নতুন উৎসাহ। নিজে উদ্যোগ করে বার কয়েক ইতিমধ্যে বাইরে চক্কোর দিয়ে এলো। ভাল ভাল সব খবর। একটা দুটো তার মধ্যে বাছাই করে ভাল দিনক্ষণ দেখে বেরিয়ে পড়া যাক। পয় যাচ্ছে এ সময়টা যা করতে হয় এখনই।

সাহেবের কিন্তু স্ফূর্তি নেই। চুপচাপ শুনে যায়। চাপাচাপি করো তো 'হুঁ' দিয়ে সরে পড়ল।

কেষ্টদাসও মেতে গিয়েছে। বাবুপুকুর থেকে ছুটে ছুটে সাহেবের কাছে এসে পড়ে। বলে, জলে দাঁড়িয়ে ধান কেটে কেটে হাত-পা সব হেজে গিয়েছিল, কাজে এসে বেঁচেছি। মটকায় চড়তে বলো, গাঙ ঝাঁপাতে বলো, কিছুতে

আমি পিছপাও নই। চলো বেরিয়ে পড়ি।

সাহেব হাঁকিয়ে দেয়ঃ নিত্যি নিত্যি কেন এসে জ্বালাতন করিস? সময় হলে খবর পাবি।

বলাধিকারী একদিন বললেন, জল-পুলিস বড্ড লেগেছে। জলের কাজ বাদ দিয়ে ডাঙার কাজ ধর্‌। ডাঙায় মানুষ দু-চারখানা খেল দেখে নিক। উচিতও বটে। গাঙ-খাল নেই বলেই সে দেশের মানুষ বঞ্চিত হয়ে থাকবে, এ কেমন কথা! আবার ডাঙায় যখন কড়াকড়ি হবে, জলে নেমে পড়বি। হতে হতে মরশুম এসে যাবে, কেনা মল্লিকের নলে ভিড়ে যাবি তখন।

আবার বলেন, যে দরের কাজকর্ম তোর, নলে গিয়ে নতুন আর কি শিখবি? দু-এক মরশুম তবু ঘুরে আসা ভালো। বহুজন নিয়ে মিলেমিশে কাজকর্ম—সে-ও একটা দেখবার বস্তু বই কি!

বংশী এসে এসে তাগাদা দেয়ঃ বেরিয়ে পড়া যাক সাহেব-ভাই। পায়ে হেঁটে ডাঙায় ঘুরব। ভটচাজ বলছিল গুণরাজকাটি গাঁয়ের কথা। খুন-খুনে এক বুড়োমানুষ যক্ষির মতো ভাণ্ডার আগলে আছে—

সাহেব ধমক দিয়ে ওঠেঃ এত যে দিব্যিদিশেলা, দায় মিটলে ঘরের বার হবো না। দায় মিটিয়ে দিয়েছি, এখন আবার উসখুস করো কেন? তোমার বউকে বলে দিচ্ছি দাঁড়াও।

হঠাৎ সে ঝুঁকে পড়ে বলাধিকারীর দুই পায়ে হাত রাখলঃ আমি চলে যাচ্ছি—

কোথায়?

কালীঘাটে মন টেনেছে।

সে কি, পাকাপাকি চললি—আর আসবিনে?

সাহেব বলে, তা-ও হতে পারে। এখন ঠিক বলা যাচ্ছে না।

বলাধিকারী বিমর্ষ হলেনঃ কিন্তু তোর বিদ্যে তো শহরে-বাজারে খাটাবার নয়। শহরে হল তাস-পাশা খেলার মতো—দু-পাঁচ হাত জায়গার মধ্যে একঘণ্টা দুঘণ্টার ব্যাপার। তুই যে দিগ্বিজয়ী বাহিনী নিয়ে ডাঙা-ডহর গাঁ-গ্রাম তোলপাড় করে বেড়াবি।

সাহেব চুপ করে আছে।

মৃদু হেসে বলাধিকারী এবার বলেন, মনটা টানলে কে, সেই কোন রানী বুঝি?

সাহেব ঘাড় নেড়ে বলে, মা—

কালীঘাটের মা দক্ষিণাকালী। বলাধিকারীর হাত দুটো আপনি কপালে উঠে যায়ঃ বেশ বেশ! কাজে নেমে মায়ের পাদবন্দনা করবি, এই তো উচিত। মা তোর মঙ্গল করুন। আবার আসিস।

সাহেব বলে, চিঠি যার কাছ থেকে এসেছে—সুধামুখী দাসী। আমার

সেই মায়ের কাছে যাচ্ছি।

মা যে নেই তোর ?

সাহেব গাঢ় স্বরে বলল, মা না থাকলে এত বড়টা হলাম কি করে ? মা ছাড়া কে এমন আনচান করে চিঠি লেখে ?

চাকরিতে আছি, ভাবনাচিন্তা কোরো না। ছুটি নিয়ে যাব চলে বৈশাখ মাসের দিকে। টাকা পাঠাচ্ছি। নতুন বাসার বায়না দিতে হয় তো দিও—।

আর কি, দুঃখের দিনের শেষ ! পোস্টকার্ডের এই চিঠি তার প্রমাণ। ইংরেজি ঠিকানা, ভিতরের লেখাটা সাহেবেরই। চিঠি সুধামুখী আঁচলে বেঁধে নিয়ে বেড়ায়। ভাবের জন—পুরুষ হোক, মেয়ে হোক—পেলেই গিঁঠ খুলে চিঠি বের করে ঃ পড়ো দিকি কি লিখেছে, আমি ঠিক ঠাহর করতে পারি নে।

যাকে পড়তে দিয়েছে সে হয়তো বলল, কেন, দিব্যি তো পরিষ্কার লেখা। পড়তে পারছ না কেন ? লিখতে পড়তে তো জানো তুমি।

জানতাম। অনভ্যাসে এখন ভুল হয়ে যায়। চোখেরও জোর নেই তেমন। বুড়ো হয়ে যাচ্ছি না ?

সে লোক হয়তো সাহেবের বৃত্তান্ত কিছু জানে না। জিজ্ঞাসা করল, কে লিখেছে ?

ছেলে—চাকরে ছেলে আমার। ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ আনব, এর পর নাতিপুতি আসবে। বলছি তো তাই—চোখ এখন অন্ধ হয়ে গেলেই বা কি !

সাহেব চাকরি করছে, ছুটি নিয়ে বাড়ি আসছে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ুক। জানুক সর্বজনে। শত্রু হিংসায় জ্বলুক। চিঠি পড়িয়ে পড়িয়ে সুধামখী সৌভাগ্য জাহির করে বেড়ায়।

সেই চাকরে ছেলের আসলে কোন লাটসাহেবের চাকরি, বুঝতে সেটা বাকি নেই। মা-ছেলের সম্বন্ধ যখন, মায়ের মন আপনা-আপনি সব টের পায়। তার উপরে নফরকেষ্ট—ভালমানুষ ঐ লোকের কাছে হুমকি দিয়ে কথা বের করা কঠিন নয়। বড় দুঃসময় যাচ্ছে নফরা হতভাগার—একলা পড়ে গিয়ে রোজগারপত্তর বন্ধ। অতএব আবার সে ভাল হবার চেষ্টায় লেগেছে, নিমাইকেষ্টর বাসায় যাতায়াত করে। কিন্তু মুশকিল সে পথেও—নিমাইয়ের শ্বশুর রিটায়ার করেছেন, কথার তেমন ধার-ভার নেই। তবু চেষ্টা হচ্ছে চাকরির। আপাতত নফরার তাঁতের মাকুর দশা। হাওড়ার বাসায় আছে, খরচার জন্য চাপাচাপি করলে কালীঘাট সরে পড়ল। সুধামুখীই বা কাঁহাতক খাওয়াতে পারে ? পুনশ্চ হাওড়ায়। এই চলেছে। সাহেব এলে সুধাময়ী চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে নফরার এই পরিণাম। নতুন বাসায় যাবার দিন সাহেবও গঙ্গায় ডুব দিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে। ভাল হবে সাহেব, গৃহস্থ মানুষ হবে।

বিগ্রহের জায়গাটুকু ধোয়ামোছা করতে করতে সুধামুখী একলাই পাগলের

মতো বকবক করে : ননীচোরা ঠাকুর, তুমি যা আমার সাহেবও ঠিক তাই। আমি যে কী করি! চোর তোমরা দু-জনেই। চোরের মা আমি।

সংসারের লোভে জীবনভোর সে আকুলিবিকুলি করেছে। বর মরে গেল— তারপরে যে এলো, সেই মানুষ বিষ খাবার ব্যবস্থা দিল। বিষ না খেয়েই মারা পড়ল সুধামুখী।

উঁহু, মরেছে কোথা? ভেবেছিল মরে গেছে, কিন্তু সহজ নয় মরা জিনিসটা। প্রাণের ধুকধুকানি কিছুতে থামতে চায় না। এক পাগল আসত সুধামুখীদের বেলেঘাটার পাড়ায়। কী রকম তার বদ্ধ বিশ্বাস, মরবে না। কিছুতে। জনে জনের কাছে কান্নাকাটি করত : কী সর্বনাশ, চিরকাল আমায় বেঁচে থাকতে হবে! কলির শেষ পৃথিবী লয় হবে, আমি তবু থেকে যাব। ডাক্তার-কবিরাজের কাছে গিয়ে ধর্না দিত : কি খেয়ে কেমন করে মরতে পারি বলে দাও। পাগলের কথায় লোকে হাসাহাসি করত। ডাকত : ও পাগল, শোন, আমি মরার কায়দা বলে দেবো। তার আগে এই চালের বস্তাটা আমার বাড়ি পেঁাছে দাও দিকি। মরবার লোভে পাগল তাই করত। সেই গতিক সকলের। বুঝতে পারিনে তাই—নইলে পাগলের মতোই আতঙ্ক হবার কথা। দেখ না, ঠাণ্ডা-বাবুর সেই আমের অংকুর কত বড় হয়ে ডালে ডালে এবার আম ফলেছে। এ নিয়তি সর্বজীবের বেঁচে থাকবার ছটফটানি। একটু আলোর রেখা পেলে সেই দিকে মুখ বাড়ায়।

গোপাল, তুমি আমার ঘর-জোড়া হয়ে আছ। সাহেব আমার বুক-জোড়া। সে আবার ঘরে আসবে, চিঠি লিখেছে। ভয় করে, রেশারেশি না হয় দু-ভায়ে। বাইরে তার নিন্দে, কিন্তু আসলে সে ভালো মানুষ। দেবতার মতন মানুষ।

সাহেবের চিঠির পরে সুধামুখীর তিলেক সোয়াস্তি নেই। ঘোর বেগে আবার পাত্রী দেখতে লেগেছে। কুমারী মেয়ে চোখে পড়লেই সাহেবের পাশে মনে মনে দাঁড় করিয়ে দেখে।

ফুটফুটে এক মেয়ে ঘাটে দেখল একদিন। সঙ্গে বর্ষীয়সী বিধবা। বিধবা গঙ্গাস্নান করছে, মেয়েটা সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে। সুধামুখী পুঁথি পড়ার মতো করে দেখে। আহা, লক্ষ্মীঠাকরুনটি! কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, নাম কী তোমার মা?

মেয়েটা বলল, সুশীলা।

সুশীলা – কি? কোন জাত, পদবি কী তোমাদের মা?

মৃদুকণ্ঠে মেয়েটা বলে, কায়স্থ –

সুধামুখী ভাবে : অকাট্য প্রমাণ সহ একজনে, ধরো উদয় হল সাহেবের বাপ হয়ে। দস্তুরমতো সচ্ছল অবস্থা, এবং সেই লোক জাতে কায়স্থ। সুশীলার বাপের কাছে সাহেবের বাপ চলে যাবে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে : ছেলের এই চেহারা,

রোজগারপত্তর এই, বাড়ির অবস্থা এই রকম – নগদে গয়নায় কত দেবেন বলুন? মেয়ে ভাল আপনার, কমসম করেই নেওয়া যাবে।

ক'দিন পরে আর একটা মেয়ে চোখে ধরল। মুখের গড়ন বোধকরি আগের সেই সুশীলার চেয়েও ভালো। মুখের হাসি আরও ভালো – আহা-হা, কী সুন্দর হাসিটুকু!

কি নাম তোমার মা? কোন্ জাত?

জাতে সুবর্ণবণিক।

সাহেবের বাপ অতএব কায়স্থ না হয়ে সুবর্ণবণিকই হোক তবে। ঠিকঠাক একজন বাপ না থাকায় এই বড় সুবিধা। যে মেয়েটা সবচেয়ে পছন্দসই, তার জাতকুল মিলিয়ে বাপ হোক না কেন সাহেবের!

আদিগঙ্গার কিনারে ফণী আড্ডির বদলে এখন মলয়কুমারের বস্তি। আর দুদিন পরেই তো রাণী-মলয়ের বস্তি আইনসম্মত ভাবে। নতুন নতুন সব বাসিন্দা – পুরানোর মধ্যে রাণী-পারুল তো থাকবেই, আর আছে সুধামুখী। সে-ও যাই যাই করছে। যেতে হত অনেক আগেই, না গিয়ে উপায় ছিল না – শুধু গলাখানির জোরে আছে। ঠাকুরের ভজন ও কীর্তন গেয়ে গেয়ে সে গলার আরও যেন বাহার খুলছে। এইটুকু না থাকলে ঘর ছেড়ে দিয়ে কবে এদ্দিন গৃহস্থবাড়ি বাসন-মাজার কাজ ধরত। অথবা মন্দিরের বাইরে কাঙালিদের মধ্যে গামছা পেড়ে ঠাঁই নিত। এ লাইনে বয়স হয়ে যাবার পরে যা দস্তুর।

কিন্তু গান শুনবার লোকও দিনকে দিন কমে এসে শূন্যে দাঁড়ানোর গতিক। নতুন বাঁধুনির গান চলে আজকাল, নতুন সুর, নতুন ঢঙ। এমনও হয়েছে, সুধামুখী তন্গত হয়ে গাইতে গাইতে হঠাৎ চোখ তুলে দেখে, হাসছে শ্রোতাদের কেউ কেউ। একবার দেখেছিল, একজনে কানে হাত চাপা দিয়েছে – গান তবু শেষ করতে হল পেটের দায়ে। গান শোনার লোক এখন দাঁড়িয়েছে বুড়ো আধ-বুড়ো কয়েকটি লোক। পুরানো দিনের সেই আংটিবাবুকেও কিছুকাল থেকে আবার দেখা যাচ্ছে। চোখ বুঁজে নিঃশব্দে বসে শোনেন, গান শেষ হয়ে গেলেও নিবিষ্ট হয়ে থাকেন খানিকক্ষণ। অবশেষে কথা ফোটে: মরি মরি! মুরলীধর নিজে তোমার কণ্ঠে ভর করেন. ঐশীশক্তি ছাড়া এমন হয় না। একালে আসল গুণীর তো আদর নেই। বন্দোবস্তের ঢাকীরা জয়ঢাক পেটাতে লাগে, কান বাঁচানোর দায়ে লোকে তখন 'বাহবা' 'বাহবা' করে।

এমনি সব বলে বালিশের তলে কিছু রেখে দিয়ে আংটিবাবু পা চালিয়ে বেরিয়ে পড়েন। আগেও এই করতেন, সুধামুখীর হাতে হাতে কোনদিন কিছু দেননি। কিন্তু আগে যা রেখে যেতেন, ইদানীং তার সিকিও নয়। অবস্থা পড়ে গিয়েছে, চেহারা ও পোশাকআশাকে বোঝা যায়। আঙুলে আংটি অবশ্য পুরোডজনই – নয়তো আর আংটিবাবু কিসের? কম দিচ্ছেন বলে সুধামুখীর

ক্ষোভ নেই—টাকার দিকে যা কমতি, প্রশংসায় তার অনেক বেশী পুষিয়ে দেন। এঁরা এই কয়েকজন গত হলে একবারে নিখরচায় গাইতে চাইলেও তো শোনবার মানুষ জোটানো যাবে না।

কপাল খুলল হঠাৎ একদিন—সারা জন্মে যা কখনো ঘটেনি। মুজরার বায়না দিতে এলো। তদ্বির আংটিবাবুরই—যে লোক এসেছে, তার কাছে সবিস্তারে শোনা যায়। কত দয়া মানুষটির! বিদ্রূপ করে ঢাক পেটানোর কথা বলেছিলেন, সেই কাজ নিজেই করেছেন সুধামুখীর জন্য। জলসা পাতিপুকুরের এক বাগানে। বিরাট ব্যাপার, নামজাদা গুণীরা সব আছেন, যাঁরা শুনবেন তাঁরাও রীতিমত সমঝদার। দশ টাকা এখন দিয়ে যাচ্ছে, আর চল্লিশ সেইদিন। এবং আংটিবাবু নিঃসংশয়, শিরোপাও বিস্তর মিলবে। সুবর্ণময় ভবিষ্যৎ। একবার নাম পড়ে গেলে বায়না নিয়ে তখন কূল পাওয়া যায় না। টাকার অংকটাও এক লাফে দুনো তেদুনো। দেদার কুড়িয়ে যাও। টাকার অনেক দরকার—সাহেবের বিয়ে, নতুন বাসায় সংসার গোছানো।

যত দিন ঘনিয়ে আসে, ভয়ে কাঁপে। ভাল না মন্দ করলেন আংটিবাবু কে জানে? মেতে গিয়েছে সুধামুখী, সর্বক্ষণ গানের তালিম। একমাত্র শ্রোতা ঠাকুর গোপাল। কেমন লাগল বলো গোপাল? জীবনে একবার এই দিন পেলাম, মানে মানে যেন ফিরতে পারি। কাল তো শুনেছ আর আজ শুনলে—কোনটা ভাল দুয়ের মধ্যে?

মাটির দেহ গোপালের, সেই রক্ষা। অহোরাত্রি গান শুনে শুনে নয়তো কানে তালা ধরে যেত। পুরানো বেনারসি শাড়ি রিপু করিয়ে কাচিয়ে এনে রেখেছে সুধামুখী। গয়না নতুন করে আমরুলপাতায় ঘষেছে। দিনের দিন সন্ধ্যাবেলা মোটরগাড়ি গলির মোড়ে রেখে সুধামুখীকে তুলে নিতে এলো—সেই লোকটাই এসেছে, যে এসে বায়নার টাকা দিয়ে গিয়েছিল। একদৃষ্টে সে তাকিয়ে থাকে, এ যেন আলাদা সুধামুখী। গায়ের রং একেবারে বিপরীত। বয়সটা অবধি বিশ-পঁচিশ বছর পিছিয়ে নিয়েছে। মুক্তোর সিঁথিপাটি কপালে, নাকে টানা-দেওয়া নথ, কানে ঝুমকো, দু-বাহুতে মোটা অনন্ত, কোমরে বিছাহার, গলায় সাতনরি। সাজসজ্জা ও গয়নাগাঁটিতে ঝলমল করছে। ভেক নইলে ভিখ মেলে না—আংটিবাবু বলে পাঠিয়েছিলেন, এই লোকও বার বার বলেছিল। উপদেশ সুধামুখী অক্ষরে অক্ষরে মান্য করেছে। অত বড় আসরে বসবার মতো চেহারা দাঁড় করাতে নাকের জলে চোখের জলে হয়েছে আজ সমস্তটা দিন।

নিষ্পলক খানিকক্ষণ তাকিয়ে লোকটা ফিক করে হেসে ফেলে: মাসি, তুমি মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবে সকলের।

মুশকিল হল, নফরকেষ্টটা জ্বর হয়ে বিকালবেলা এসে পড়েছে। জ্বরে আইঢাই করছে। শিয়রের কাছে এক কলসি জল আর গেলাস রেখে সুধামুখী

বলে, তেষ্টা পেলে খেও। পারুলকে বলে যাচ্ছি, খবর নেবে। খাওয়াদাওয়া নেই যখন দোরে খিল দিয়ে দাও। এক্ষুনি। আমি এলে খুলে দিও। দেড়টা দুটোর মধ্যে এসে যাচ্ছি, কি বলেন বাবু ?

লোকটা বলে, অত কেন হবে ? খুব বেশি তো এগারোটা। বাছা বাছা ভদ্দোরলোক—হৈ-হুল্লোড়ের মানুষ কেউ নয়।

সর্বশেষে সুধামুখী গোপালের কাছে বিদায় নেয়ঃ গোপাল, আসি তবে বাবা। আজকের রাতটুকুন একলা তুমি। তোমার বড়ভাই আসছে—সে আমার বড়ঠাকুর। রক্তমাংসে ছেলে যে অমন সুন্দর হয়, সে তুমি না দেখলে বুঝবে না।

বিড়বিড় করে আবার বলে, লোকে কি বলবে—নয়তো কোলে করে নিয়ে যেতাম আমার ঠাকুর। অদর্শনে সঙ্গে সঙ্গে তুমি থেকো, একা আমার ভয় করবে। এখানে এই যেমন, সেখানেও সামনের উপর থাকবে তুমি। চোখ বুঁজে যেন দেখতে পাই। তুমি থাকলে তবে আমার ভরসা।

রাত কেটে গেল, সুধামুখী ফেরে না। পরের দিন রোদ উঠে গেছে, তখনও দেখা নেই। নফরকেষ্ট ব্যস্ত হয়ে পারুলকে ডেকে বলল। দুপুর গড়িয়ে যায়, কষ্টেসৃষ্টে তখন বিছানা থেকে উঠে ঐ পারুলকে সঙ্গে নিয়ে থানায় খবর লিখিয়ে দিয়ে এলো।

দিন কেটে গিয়ে আবার সন্ধ্যা। পুলিস এলো চারজন। বরানগরের বাজার ছাড়িয়ে খানিকটা ভিতর দিকে গিয়ে এক পোড়ো বাগানের ভিতর স্ত্রীলোকের লাস পাওয়া গেছে। লাস সনাক্ত হয়নি, মর্গে নিয়ে রেখেছে। দেখে যাও তোমাদের মানুষ কি না।

পারুল আর্তনাদ করে ওঠেঃ নিশ্চয় দিদি। সেই হতভাগী ছাড়া অন্য কেউ নয়। ভালোঘরের মেয়ে—গত জন্মের মহাপাতকে নরকবাস করছিল। নরকপুরী ছাড়বার জন্য ছটফট করত, এতদিনে পেরেছে। একেবারে চলে গেল।

সন্ধ্যায় সাজ-সাজ এখন ঘরে ঘরে। ভিড় করে এসে মেয়েরা সব শোনে। কেউ হায়-হায় করে, কেউ বা প্রবোধ দেয়ঃ দিদি হতে যাবে কেন, দেখ গিয়ে অন্য কেউ। যা-হোক কিছু বলে দ্রুত যে যার ঘরে চলে যায়। অসম্ভব কিসে, আশ্চর্য হবার কি আছে ? নিয়েছে অস্বাভাবিক উদ্ভট জীবিকা—মৃত্যু স্বভাবের নিয়মে না-ই যদি আসে, সে নালিশ কে শুনতে যাবে ?

ঘোড়ারগাড়ি নিয়ে এলো পুলিসের তরফ থেকে। শাড়ির উপরে ছিটের চাদর জড়িয়ে পারুল বেরিয়ে এলো। সে যাবে। নফরকেষ্টও ধুঁকতে ধুঁকতে পারুলের গায়ে ভর দিয়ে গাড়িতে উঠে বসে। রানীও চলল সেই মোড় অবধি। পারুল বলে, তুই কেন আবার, ছেলেমানুষ তুই কি দেখতে যাবি ? চলে যা মা, রাস্তার উপর দাঁড়াবিনে এখন। মলয় কখন এসে যাবে, সে রাগ করবে।

রানী নিরুত্তরে বাড়ি ফেরে। দোতলায় নিজের ঘরে যায় না। সুধামুখীর ঘরের সামনে অন্ধকার নির্জন দাওয়ায় অনেক রাত্রি অবধি একাকী বসে রইল।

লাস ঘরের বারাণ্ডার উপর কাপড়-ঢাকা রয়েছে। মুখের কাপড় সরিয়ে দিল। সুধামুখীই বটে। মুদ্রিত চোখ। গলায় কোপ মেরেছিল আচমকা পিছন দিক থেকে। পুলিশের একজন নিরিখ করে দেখে তাই বললেন।

বলেন, চিঠি নিয়ে লোক গিয়েছিল, সেই চিঠি খুঁজে বের করতে হবে। তাতে যদি কিছু হদিস মেলে। আংটি নাম কারো হয় না। পুরানো যাতায়াত বলছ—আসল নামটা কেউ কোনদিন জিজ্ঞাসা করো নি?

পারুল বলে, খাঁটি নাম আমাদের কাছে কেউ বলে না। মেকি নাম বানিয়ে বলবে, কী হবে শুনে? চেহারায় চিনতে পারব। আর এক নিশানা বলতে পারি, বাবুর দু-হাতে এক গাদা আংটি।

আংটি কী আর আঙুলে রেখেছে? বাগানের মধ্যে কতকগুলো আংটি পাওয়া গেল। মজাটা হল, সবগুলোই মেকি। সোনা নয়, গিল্টি। হীরে নয়, কাচ। ঝকমকিয়ে তোদের কাছে পশার জমাতো।

একটুখানি চিন্তা করে তিনি আবার বলেন, ঝগড়াঝাটি হয়েছিল কিছু জানিস? কিম্বা প্রণয়ের রেশারেশি? পুরানো জানাশোনার মধ্যে খুনখারাপি—উদ্দেশ্য কি হতে পারে?

পারুল বলে, দিদির এক-গা গয়না পরা ছিল। চেয়ে দেখুন হাত-গলা নাক-কান এখন সব ন্যাড়া। গয়নার লোভে মেরেছে।

লুফে নিয়ে নফরকেষ্ট বলে, সে-ও মেকি হুজুর। আমি কিনে দিয়েছিলাম। গিল্টি পরে ঠসক করে বেড়াত। ব্যবসাই এই। মানুষটা কিন্তু মেকি ছিল না।

এরই দিন দশেক পরে সাহেব এসে উপস্থিত। ফিরল কতদিন পরে কত অঞ্চল ঘুরে। পারুল দেখতে পেয়ে উঠানের উপর এসে কেঁদে পড়েঃ সাহেব এসেছিস—ক'টা দিন আগে আসতে পারলি নে? ওদিকে নয়। কেউ নেই ও-ঘরে, তালা দেওয়া। তালা দিয়ে নফরকেষ্ট সেই বেরিয়েছে আর আসেনি। শুনিস নি কিছু? আমার ঘরে আয় বাবা—

আঁচলে বারম্বার চোখ মোছে, আবার ভরে যায়। বলে, সংসারের দুয়োরে চিরদিন দিদি মাথা ঠুকে ঠুকে গেল, দুয়োর খুলল না। আমায় সব বলত, আমার মতন কেউ তাকে জানে না।

সাহেব পাষাণমূর্তির মতো শুনছে। কান্না দেখে তারও চোখে জল। চিরকেলে প্যাচপেচে মন—এ মনের কিছুতে শাসন হল না। এতক্ষণে রানী দেখেছে, তরতর করে নেমে এসে সে হাত জড়িয়ে ধরল। মায়ের দিকে ভ্রূকুটি করে বলে, তেতেপুড়ে এলো, থাম তুমি এখন মা। উপরে চলো সাহেব-দা হাত-পা ধুয়ে জিরোবে।

শুনতে কিছুই আর বাকী নেই। চোখের জল পড়ো-পড়ো, ঠিক সেই সময়টা

রানী এসে পড়ল। হঠাৎ কী রকম হয়ে যায়, খল-খল করে সাহেব হেসে ওঠে। বলে, জানিস রানী, কষ্টিপাথর নিয়ে ঠিক ওরা গয়না কষতে গিয়েছিল। পাথরে দাগ ওঠে না। কী বেকুব, কী বেকুব! নিজের গাল চড়াচ্ছিল বোধহয় —কী বলিস, অ্যাঁ?

রানী ব্যাকুল হয়ে হাত চাপা দেয় সাহেবের মুখে: থাক, থাক—আমার ঘরে চলো। কাঁদতে হবে না, হাসতেও হবে না তোমায়।

একুশ

উপরের ঘরে রানী খাটের উপর ধবধবে বিছানায় নিয়ে বসাল। বলে, কদ্দুর থেকে কত কষ্ট করে এলে সাহেব-দা। খেয়েদেয়ে সারা বেলাটা গড়াও।

জানালাগুলো খুলে দিল। ছত্রাকার আমগাছ। সেই একফোঁটা অঙ্কুর বড় হয়ে আজ আকাশ ঢেকেছে—দোতলার উপরে বসে সেটা আরও ভাল বোঝা যায়। থোলো থোলো গুটির ভারে ডাল বুঝি ভেঙে পড়ে। আর, ও-পাশের জানলায় একবার দেখ না তাকিয়ে। গঙ্গা। ভরা জোয়ার এখন গঙ্গায়, কানায় কানায় জল।

রানী চোখ বড় বড় করে বলে, তবু তো গুটি কত ঝরে পড়েছে। ছোঁড়াগুলো পাঁচিলের ওদিক থেকে ঢিল ছোঁড়ে, কখনো বা পাঁচিলে উঠে ডাল ঝাঁকায়। অন্যের কথা বলি কেন, আমিই কি কম? জানলার গায়ের এই ডালখানায় পাতা দেখবার জো ছিল না। হাত বাড়িয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে সব শেষ করেছি। নুন আর লঙ্কা দিয়ে কাঁচাআম খেতে বড় মজা।

হাসে একটু রানী। হাসলে দুই গালের উপর ছোট্ট দুটি টোল পড়ে, সুন্দর দেখায়। বলে, সেই সময় তোমার কথা বড্ড মনে হত সাহেব-দা। কোন দেশে কোথায় আছ—গাছের প্রথম ফল ধরল, তুমি দেখলে না। ভাবতাম, পাকবার আগে যেন এসে পড়। হল তাই সত্যি সত্যি। আমি খাটিয়ে দেখেছি সাহেব-দা, খুব একমনে যদি কিছু চাও ঠিক তাই পেয়ে যাবে।

না—। ঝাঁকি দিয়ে সাহেব ঘাড় তুলে তাকাল রানীর দিকে। তুমি পাও রানী, তাই বলে সকলে নয়। মা তো চেয়েছিল আমায় কাছে কাছে রাখবে, বিয়ে দিয়ে সংসারী করবে, ছেলে-বউ নিয়ে সংসারের গিন্নী হয়ে থাকবে। বিধাতার কাছে মাথা কুটে কুটে চেয়েছে—চিরকাল ধরে ঐ তার সাধ। কিন্তু কী পেয়ে গেল তার জীবনে?

গর্জন করে উঠল যেন অলক্ষ্য ক্রুর ভাগ্যনিয়ন্তার উপর। চিড়িয়াখানায় খাঁচার বাঘ যেমন গরাদের বাইরে থেকে উত্যক্তকারী নিরাপদ মানুষের দিকে তাকিয়ে গর্জন করে। সর্বনাশ, রানীর এতক্ষণের এত সব বকুনি বৃথা? সুধামুখীর প্রসঙ্গ আবার না ওঠে, একথা-সেকথায় রানী ভুলিয়েভালিয়ে রাখছিল। ছোট শিশুকে নিয়ে মা যেমন করে। সাহেবকে এখন যেন অসহায় শিশুর বেশি

ভাবতে পারছে না।

চতুর্দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সাহেব ঐশ্বর্য দেখছিল। লঘুকণ্ঠে এবার বলে, ঝকঝকে এমন কোঠাঘর খাটপালঙ্ক গয়নাগাঁটি একমনে চেয়েছিলে তুমি রাণী, ঠিক তাই পেয়ে গেছ। তাই বলে কি সকলে? তোমার এই বয়সে কটা দিনের মধ্যে কার এত ভাগ্য খোলে বলো। জন্ম থেকে মাটকোঠার ঘরে— দেখেছি তোমাদের তো কম নয়।

ঘুরে এসে কথাটা তারই উপর পড়বে, রানী ভাবতে পারেনি। কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকার মেয়ে নয়। লজ্জা সে গায়ে মাখে না, জোরে জোরে ঘাড় দুলিয়ে সমস্ত মেনে নিল। বলে, বয়সের কথা কি বলো সাহেব-দা, ভাগ্য আমার কি আজ নতুন খুলেছে? কতটুকু তখন—তুমিই মন্তোর শিখিয়ে দিলে, ইচ্ছা-বর পেয়ে গেলাম আমি। যেটা ইচ্ছা করব, তক্ষুনি তাই পেয়ে যাই। মা-কালী জোগাচ্ছেন। চুলের ফিতে, কাঁটা, গন্ধতেল—জোগাতে জোগাতে দেবীর প্রাণান্তপরিচ্ছেদ।

রানী খিলখিল করে হেসে ওঠে। সে হাসির ছোঁয়াচ লেগে যায় সাহেবের ঠোঁটে। বলে, মা-কালীকে দিয়ে শেষটা পায়ের জুতো বইয়ে ছাড়লে রানী, তুমি কম পাষাণ্ডী!

রানী ঝংকার দিয়ে ওঠে: আচমকা তুমি-তুমি শুরু করলে কি জন্যে বলো তো? যেন আমি কেণ্টবিণ্টু মানুষ। আগের মতো তুইতোকারি করবে তো করো, নয় তো আমি চলে যাচ্ছি। কান জ্বালা করে।

রাণীর মুখে চেয়ে একটু হেসে সাহেব আগের কথার জের ধরে বলে, তোর গয়না চুরি করেছিলাম রানী, লাইনে সেই আমার হাতে খড়ি। তোর কানের ইহুদি-মাকড়ি। ঝুটো গয়না, দাম পুরো টাকাও নয়। হলে হবে কি—ছোট্ট মানুষের সাধের জিনিষটা নিয়ে আমার উপর অভিশাপ লেগে গেল। চোর আমি সেইদিন থেকে।

চোর না আরো-কিছু! ভ্রুভঙ্গি করে রানী সাহেবের কথা একেবারে উড়িয়ে দেয়। বলে, চুরি করলে বটে সাহেব দা, কিন্তু চোর হতে পারো নি। হয়ে গেলে দেবতা। সত্যযুগের মতন জাগ্রতা দেবতা—চাইতে না চাইতে ভক্তের বাঞ্ছাপূরণ। এ কালের মতন কালা-দেবতা কানা-দেবতা নয়।

সাহেব বলে, জাগ্রত দেবতা কী নাকালটাই হলেন জুতো চুরি করতে গিয়ে? প্রাণ যাবার দাখিল। তোর আবদার কুলোতে গিয়ে কী করেছি আর না করেছি রানী। কারো কাছে সে-সব বলবার কথা নয়, ভাবতে গিয়ে নিজেরই লজ্জা করে।

মুচকি মুচকি হাসে রানী। দেমাক করে বলে, বোঝ ক্ষমতা। এঘরে-ওঘরে এখন সব নতুন মেয়ে, তারা হিংসায় জ্বলে। বলছিল, মালিকবাবুকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাও, তাজ্জব কাণ্ডবাণ্ড তোমার। মনে মনে হাসি আমি—ওরাই

নতুন দেখছে, আমার কাছে নতুন-কিছু নয়। খাটপালঙ্ক কোঠাঘর গয়নাগাঁটির খোঁটা দিলে, কিন্তু সেই এককোঁটা বয়সে তুমিই তো অভ্যাস ধরিয়ে দিয়েছ সাহেব-দা। যা-কিছু চেয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে এসে গেছে।

সমস্ত দিন সাহেব পড়ে আছে। কতকাল পরে আরামের একটু নিশ্চিন্ত বিছানা পেল। নিচে পারুলের ঘরে রানী। পা টিপে টিপে এসেছে দু-একবার, দরকার সেরে তক্ষুনি আবার চলে গেছে। সাহেবকে ডাকে নি। বিভোর হয়ে সে ঘুমোচ্ছে, দেখলে কষ্ট হয়। আহা ঘুমাক।

সন্ধ্যার পর সিঁড়ি দিয়ে উঠে কে যেন চাপা গলায় 'রানী' 'রানী' করে ডাকছে বাইরে থেকে, মানুষটা ঘরে আসে নি। সাহেব ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। আলো দিয়ে গেছে ঘরে, জোর কমানো। তাই তো, কাজকর্মের সময় ওদের! তাড়াতাড়ি জামা গায়ে চড়াচ্ছে, কোন এক দিকে বেরিয়ে পড়বে। এটা কোন নতুন ব্যাপার নয়। এই বাড়িতেই ছিল, শিশুকাল থেকে এই তো বরাবর করে এসেছে। অভ্যাস আছে।

'রানী' 'রানী' করছে—নিচের ঘর থেকে ছুটে এসে রানী লোকটাকে ধরল। বিরক্ত স্বরে বলে, ভাই এসেছে আমার—বলে দিলাম তো। মায়ের এক বোনের ছেলে। সংসারধর্ম থাকতে নেই বুঝি আমাদের, মানুষ নই আমি? আজকের দিনটা ছাড়ো।

লোকটা এরপর কি বলল, শোনা যায় না। সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। অনতিপরে অতি সন্তর্পণে দরজা ঠেলে রানী ঘরে উঁকি দেয়। সাহেব বেরিয়ে যায় তো দু-হাতে দুই পাল্লা ধরে পথ আটকে দাঁড়াল।

অপ্রতিভ সুরে সাহেব বলে, রাত হয়ে গেছে, টের পাই নি। রোজগারপত্তর আজ তোর চুলোয় গেল। সরে যা, পথ ছাড়।

রীতিমতো লড়াইয়ের ভঙ্গি মেয়েটার। বলে, এক পা নেমেছে তো মাথা খুঁড়ে মরব আমি। সিঁড়ির উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ব। জানো, তা পারি। গলায় দড়ি দিয়েছিলাম শোন নি, দরকার হলে আবার তেমনি পারব। সেবারে হেরে এসেছি বলে বারবার হারব না। দয়া হবে নিশ্চয় যমরাজের।

সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে পড়ে। সুধামুখীর পরেও আছে তবে পথ আটকানোর মানুষ! রানীর রাগ দেখে হাসে মিটিমিটি। বলে, জামা জুতো পরে মাথায় টেড়ি কেটে তৈরি হয়েছি যে। জামা খুলব না, টেড়িও ভাঙব না। রাতটা তোর তো গেছেই—চল্ তা হলে দুজনে যাই। মা-কালী দর্শন করে আসি। কালীঘাট এসে সকলের আগে মা-কালী দর্শনের কথা। আমাদের লাইনের তাই নিয়ম, না করলে দোষঘাট হয়। আমি তা মানি নি—মা-কালীর আগে মা দর্শন করতে এসেছিলাম।

আমি যাব, বোস একটুখানি—। রানী ঝলকিত হয়ে উঠল। বলে, মায়ের

আরতি কতদিন দেখিনি সাহেব-দা। নর্দমার পাঁকে ডুবে থাকি সে সময়টা মন্দিরে যাই কেমন করে? আজকে যখন ছুটি করে দিলে তুমিই সঙ্গে করে নেবে।

নিচের ঘরে সাহেব গিয়ে বসল। পারুল শতকণ্ঠে মলয়কুমারের ঐশ্বর্য ও দরাজ মেজাজের কথা বলছে। মলয়কুমার অর্থাৎ ঝিঙে। এমনি সময় রানী নেমে এসে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

কী সাজ সেজেছে মরি মরি! পলক পড়ে না চোখে। সাহেব বলে, শুধু রানী ডাকলে মানাবে না রে! মহারানী—রাজরাজেশ্বরী। কত সুন্দর হয়েছিস তুই, কী জৌলুষ! সাজগোজ করে এলি—রূপ তাই বেশী করে মালুম হচ্ছে।

উঠান পার হয়ে গলিতে পড়েছে তখন রানীর মুখে ছলাৎ করে রক্ত নেমে এলো। মুখ-ভরা হাসি নিয়ে বলে, পা চালিয়ে চলো সাহেব-দা, কুচ্ছো করতে হবে না ইনিয়ে-বিনিয়ে।

সাহেব বলে, তোর গোলাপফুলের মুখ রাঙা হয়ে একেবারে রক্তজবা হয়ে উঠল রে! সত্যি রানী, অপরূপ হয়েছিস তুই। ডিগডিগ করে বেড়াতিস, তখন কি জানি একদিন এমনি হয়ে উঠবি!

রানী এবার ঝগড়া করেঃ রাঙা হয় রাগে—তোমার মুখেও এই সমস্ত শুনে। নিত্যদিন কতজনাই বলে থাকে, তুমি কেন তাদের দলে হবে সাহেব-দা? তুমি বলছ—তখন মনে হয় ধরণী দ্বিধা লোক, ঢুকে পড়ি তার মধ্যে।

মন্দিরের কাছাকাছি এসে বড্ড ভিড়। সেই একবয়সে কত ঘোরাঘুরি করত এইসব জায়গায়। ভিড় ঠেলে চলেছে। লোকে তাকিয়ে দেখে।

সাহেবের কানের কাছে মুখ নিয়ে রানী বলে, কি ভাবছে ওরা সব, বলো তো—

নিরীহভাবে সাহেব বলে, ঠাকুর দেখতে যাচ্ছি—আবার কি!

রানী খিলখিল করে হাসেঃ কী বোকা তুমি সাহেব-দা! আমি বুঝি তাই জিজ্ঞাসা করলাম। তোমায় আমায় কী সম্পর্ক ভাবছে ওরা বলো—

ভাবছে, চাকর সঙ্গে নিয়ে কোন মহারানী যাচ্ছেন। মা-কালী দর্শনের পর দোকানে কেনাকাটা হবে, চাকর বয়ে নিয়ে আসবে।

যাও—। রাগ করে রানী মুখ ঘুরিয়ে নিল।

অন্যায়টা কি বলেছি! তোর ঝলমলে সাজগোজ গা-ভরা গয়না, তার পাশে আমার এই আধ-ময়লা ছেঁড়া কামিজ, তালি দেওয়া জুতো—লোকে অন্য কি ভাবতে পারে?

রানী বলে, যে রূপ নিয়ে এসেছ সাহেব-দা, সাজগোজ যে লজ্জা পেয়ে যায় তোমার গায়ে উঠতে। বিধাতা আমাদের বঞ্চিত করেছে, নিজের হাতে তাই পূরণ করি। তোমায় চাকর ভাববে, হায় আমার কপাল!

বলতে বলতে কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে উঠল। বলে, ওরা যা ভাবছে, তাই তো সত্যি সত্যি হবার কথা ছিল। নজর করেছ বোধ হয়—ভিড় কাটাতে কতবার

আমি তোমার গায়ের উপর পড়লাম। দেখিয়ে ইচ্ছে করেই। মানুষ কাছাকাছি হলেই তোমার দিকে এলিয়ে পড়েছি। যা হতে পারল না, কোনদিন আর হবে না, একটুখানি আমি সেই সাধ মিটিয়ে নিলাম। দেখুক লোকে গৃহস্থঘরের আর দশটা ছেলে-বউর মতো আমরাও যেন একজোড়া। আমার এই হ্যাংলা-পনায় রাগ করো না সাহেব-দা। পথের পাশে ঐ যত কাঙালি দেখছ, ছেঁড়া ন্যাকড়া-সামনে বিছিয়ে বসে আছে—আমি ওদেরই একটি।

দু-হাতে মুখ ঢাকল রানী। বলে ফেলে লজ্জা হল? কিম্বা বুঝি জল এসে গেছে চোখে। এত দুঃখকষ্ট দিয়েও বিধাতার যেন তৃপ্তি নেই, জল দিয়ে ধুয়ে ধুয়ে দুঃখ আরও শাণিত করে দেন।

মন্দিরের আরতি দেখে তারপরেও একজুটি হয়ে বেড়াচ্ছে দু-জনা। ফিরতে মন নেই, ঘরসংসার-পালানো একজোড়া ছেলেমেয়ে। ঘুরে ঘুরে তারপরে পাড়ার ঘাটের চাতালে এসে বসল। নির্জন, আবছা অন্ধকার।

সাহেব বলে, মনে পড়ে রানী, এই চাতালে বসে বসে নৌকো দেখতাম। তুইও এসে বসতিস। ভাঁটির দেশে কথা শুনতাম মাঝিমাল্লার মুখে। কপাল গুণে তারপর সেই দেশেই গিয়ে পড়তে হল।

রানী কি ভাবছিল। ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, সেই এসেছ সাহেব-দা, আগে কেন এলে না।

সাহেব বলে, সেই তো দুঃখ আমার ভাই। দুনিয়ায় লক্ষকোটি মানুষ, কিন্তু ভালবাসার মানুষ একটি-দুটি। দুটো হপ্তা আগেও যদি আসতাম। মা চলে যাবার আগে।

রানী বলে, তারও আগে সাহেব-দা, আমি মরে যাবার আগে।

হেঁয়ালির মতন লাগে। রানীই আবার বলছে, শাড়ি গলায় বেঁধে কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়েছিলাম গিঁঠ খুলে গেল, তবু আমার বাঁচা হল না। মরে গিয়ে পেত্নিশাকচুন্নি হয়ে বেড়াই। যে রানী তখন দেখতে, সে আর নেই। আজকে সব বলি সাহেব-দা, অনেক কেঁদেছি তোমার জন্যে। 'সাহেব-দা' 'সাহেব-দা' কত ডেকেছি। কত রাত গেছে, সারাক্ষণ ছটফট করেছি। তারপরে মরে গেলাম। সাজসজ্জা আমি চাইনি সাহেব-দা, জ্যান্ত থাকতে চেয়েছিলাম। এখানে ডাকলে নাকি ইচ্ছের জিনিস পাওয়া যায়—ছাই, ছাই! সেই মিথ্যে আমিই আবার নিজের মুখে বললাম! মিথ্যের পেশা নিয়েছি কিনা, মিথ্যে বলে যেতে বাধে না।

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে আবার বলে, তুমি যদি থাকতে সাহেব-দা, একচোট ঝগড়া করা যেত সুধা-মাসিমার সঙ্গে। কনে খুঁজে খুঁজে হয়রান, সকলকে বলতেন ভাল মেয়ের জন্য। আর একটা যে মেয়ে একই বাড়িতে পায়ে পায়ে ঘুরছে, তার দিকে চোখ পড়ে না। পিদিমের নিচে অন্ধকার। কেন তা-ও জানি।

এমন মেয়ে চাই কুলেশীলে রূপে-গুণে কোন বিচারে যার খুঁত বেরুবে না। কিন্তু ছেলেটাই বা কি—জাতে বুঝি সে নৈকষ্যকুলীন, পেশায় বুঝি টুলোপণ্ডিত?

কণ্ঠস্বরে রীতিমত উত্তাপ। সাহেব সায় দিয়ে বলে, ঠিকই তো! কিন্তু ঝগড়াটা আমার জন্য আটকে রইল কেন? করলেই তো হত।

গালে হাত দিয়ে রানী বলে, ওমা নিজের বিয়ের কথা মেয়েয় বুঝি বলতে পারে! বলাতাম তোমায় দিয়ে। আমাদের ছোট্টবেলায় বর-বউ বলে কি জন্য ওরা ক্ষেপাত! তোমায় দলে পেলে দাবি ঠিক আদায় করে ছাড়তাম। তা হলে আমি কি মরতাম সাহেব-দা, না সুধা-মাসির অমনধারা বেঘোরে প্রাণ যেত? ছেলের-বউ আর সংসার নিয়েই মজে থাকতেন, জলসার নাম করে খুনেরা তাঁকে ফাঁদে নিয়ে ফেলতে পারত না।

সাহেব স্তব্ধ হয়ে শুনল। তারপরেও কী ভাবে একটুখানি। বলে উঠল, দু-জনে কি সংসার হয় না রানী? কপালে নেই, মা আমার চোখে দেখতে পাবে না। আমরাই গিয়ে ঘর বাঁধিগে।

ছিঃ! রানী ঘাড় নাড়ল ঃ হয় না সাহেব-দা। বোলো না ও-কথা, শুনলেও পাপ। কাক-চিলে ঠুকরে ঠুকরে খেয়েছে, সে জিনিষে দেবতার নৈবেদ্য হয় না।

সাহেব বলে, কে বলে দেবতা? মিথ্যে কথা। মিথ্যে বদনাম দিবিনে রানী, মানা করছি।

চোখের জলের মধ্যে হেসে রানী বলে, দেবতা তুমি আজ হয়েছ! আমার ছেলেবয়সের বিধাতাপুরুষ তুমি। চোখ পাকিয়ে যতই হুঙ্কার দাও, সে আসন কেড়ে নেবার ক্ষমতা নেই তোমার।

অধীর কণ্ঠে সাহেব বলে, দেবতা আমি নই, চোর। লোকে ঘেন্না করে, পুলিশে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ায়। চোরের সেরা চোর—একালের চোর-চক্রবর্তী।

রানী বলে, আমি মানিনে—

চোর-চক্রবর্তী রাজার পালঙ্ক থেকে রাজরানী চুরি করে নিয়েছিল। ঝিঙের খাট থেকে তোকেও চুরি করব, মানিস কি না দেখা যাবে তখন।

করবে? করো না তাই সাহেব-দা—

কৌতূহলে মেতে উঠল রানী সেই সব দিনের ছেলেমানুষ রানীর মতন। মেকি ইহুদি-মার্কাড় নয়—পাথর-বসানো দামী ইয়ারিং দুটো ঘাটের ক্ষীণ আলোয় ক্ষণে ক্ষণে ঝলমলিয়ে ওঠে। বলতে হল চোর-চক্রবর্তীর গল্প—ঘুমন্ত রাজরানীকে চুরি করে নিয়ে চিঁড়েকুটির ঘরে শুইয়ে দেওয়া। ছোট্ট খুকীর মতো রাণী হাততালি দিয়ে ওঠে ঃ পারো যদি, ক্ষমতা বুঝব তোমার সাহেব-দা। চোর বলো যা বলো ঘাড় হেঁট করে তখন মেনে নেবো। করো দিকি তাই। কালীমন্দিরের পিছনে বটতলায় কুটে-বুড়ি একটা বসে থাকে,.এনে শুইয়ে দেবে ঝিঙের পাশে।

সকালবেলা বিশু দেখে আঁতকে উঠবে।

সাহেব হেসে বলে, কুটে-বুড়ি না হয় রইল, কিন্তু তোমায় কোথা যেতে হবে ভাবতে পারো? এই শহর, দোতলার সাজানো কোঠাঘর, গদির পালঙ্ক থেকে চোর-চক্রবর্তী নিয়ে চলল কত গাঙ-খাল গাঁ-গ্রাম বিল-মাঠ পার হয়ে ভাঁটির দেশে—জঙ্গলের পাশে ছোট্ট কুঁড়েঘর বাঁধল। কুমির রোদ পোহায় চরের উপর, সন্ধ্যার পর বাঘ হামলা দেয়, চোত-বোশেখের ঝড়বাতাস যখন-তখন ঘরের ঝুঁটি ধরে ঝাঁকায়। জলের সমুদ্দুর চারিদিকে, সে জলের একফোঁটা মুখে দেবার উপায় নেই। কলসিতে চাল থেকেও হয়তো বা রান্না হল না মিঠাজলের অভাবে—

রানী আকুল হয়ে বলে, অমন করে লোভ দেখিয়ো না সাহেব-দা। আমি পাগল হয়ে যাবো।

সাহেব সবিস্ময়ে বলে, লোভ কি বলিস রে! আমি তো ভয় দেখাচ্ছি। ভয় পাস না, কী দুঃসাহসী মেয়ে তুই!

জবাবে রানী একটি কথাও না বলে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ল। অন্ধকারে যেন চাপা কান্নার আওয়াজ।

রানীর পিঠের উপর হাতখানা রেখে মৃদুস্বরে সাহেব ডাকল: রানী—

সাড়া মেলে না।

কী আমি বললাম তোকে! এই হাসিস, এই কাঁদিস, হয়েছে কি তোর শুনি?

মুখ তুলে রানী যেন হাহাকার করে উঠল: ভাড়াটে-ঘরের মেয়েগুলো হিংসা করে—কিন্তু কী আমি পেলাম, বলো তো সাহেব-দা। খাট আর কোঠা-ঘর আর গয়নাগাঁটি আর আঁস্তাকুড়ের ময়লা আর উনুনের ছাই? এই নিয়ে তুমিও আমায় খোঁটা দিলে। কিন্তু একটা ভিখারি মেয়ের যা আছে, তা-ও যে আমার নেই। আমার বয়সের কত মেয়ে মন্দিরে দেখলে। শাশুড়ি-ননদ জা-জাউলিরা সঙ্গে করে এনেছে। কিম্বা বরকে নিয়ে একলা চলে এসেছে, কোলে হয়তো দুধের বাচ্চাটা। চোখের সামনে ফরফর করে ঘুরে বেড়াতে লাগল—আমি কখনো ওদের একজন হতে পারব না।

কান্নায় ভেঙে পড়ল রানী। পাড়ার ঘাটে একটাও মানুষ নেই—রানী আর সাহেব। হঠাৎ সাহেবের কিরকম হয়ে যায়—জুড়নপুরের যুবতী নারীর গায়ের বিষ নিয়ে এসেছিল, তাই বুঝি দপ করে দেহে-মনে আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে। গভীর আলিঙ্গনে রানীকে সে বুকের মধ্যে তুলে ধরল।

রানী বোধ করি আচ্ছন্ন হয়েছিল লহমার জন্যে। সম্বিত পেয়ে নড়েচড়ে ওঠে: ছিঃ সাহেব-দা, তুমি এই?

ভর্ৎসনা সাহেব গায়ে মাখে না। অধীর উত্তপ্ত কণ্ঠে বলে, দেবতা বানাবিনে আমায়, খবরদার! আমি মানুষ।

ততক্ষণে ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে আলিঙ্গনমুক্ত রানী উঠে পড়েছে। কাঁপছে

সবদেহে থরথর করে ঃ ছি-ছি ;

উদ্যত ফণা সাপের মতন সাহেব গর্জায় ঃ কেন, তোমায় তো পয়সা ফেলে কেনা যায়। যে না সে-ই কেনে। ঝিঙে কিনেছে, আমি কিনতে পারিনে? কত টাকা দাম তোমার?

সাহেব যেন পাগল হয়ে গেছে। পকেটে টাকাপয়সা নোট যা ছিল, মুঠো করে ছুঁড়ে দেয়! বাঁধানো চাতালে ঝনঝন করে ছড়িয়ে পড়ে। বলে, কত? দাম কত তোমার শুনি?

রানী কেঁদে সাহেবের পায়ের উপর পড়ল। বলে, রাগ কোরো না সাহেব-দা। তুমি যে আপন আমার, পথের খদ্দেরে যা করে আপন লোকে কেন তা করবে?

ঢিবঢিব করে মাথাটা কোটে। মুখ তুলল, দু-গালে জলের ধারা নেমেছে। রাগ গিয়ে সাহেবের অনুতাপ হচ্ছে। আর লজ্জা। চুপচাপ রইল খানিকক্ষণ। বলতে হয়, তাই যেন অবশেষে বলে, কে আমি তোর রানী, কিসে আপন হলাম?

শুনতে চাও? বর—ছোটবেলায় যা সবাই বলত। তুমি বর, কলঙ্কিনী বউ আমি তোমার। আমায় ঘেন্না করো। ঝাঁটা মারো তো পিঠ পেতে দেবো, আদর আমি কেমন করে সইব?

ঢং ঢং করে ওপারের জেলখানার পেটাঘড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজে। বেজেই চলেছে—বোধকরি বারোটা। উঠে দাঁড়িয়ে রানী সাহেবের হাত ধরল ঃ চলো বাড়ি যাই। যা তোমার হকের দাবি, চোরের মতন তাই চুরি করে নেবে, খদ্দের হয়ে পয়সা দিয়ে কিনবে, এ আমার সহ্য হয় না সাহেব-দা।

বাড়িতে পারুলের ঘরে ছোটখাটো এক কুরুক্ষেত্র। উঠানে পা দিতেই বীররস কানে এসে গেল। রানী ফিসফিস করে বলে, ঝিঙে এসে পড়েছে। তুমি এসেছ টের পেয়ে গেছে কেমন করে। অনেক করে ছুটি চেয়ে নিয়েছিলাম, সে ছুটি বাতিল।

পায়ের শব্দ পেয়েই ঝিঙে দ্রুত বেড়িয়ে এলো। কটমট করে একনজর সাহেবের দিকে চেয়ে রানীর হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে উপরে নিয়ে চলল। একবার রানী তাকিয়েছে বুঝি নিচের দিকে—হেঁচকা টানে ঘরের মধ্যে নিয়ে দড়াম করে দরজা এঁটে দিল। সাহেবের শৈশবের পরমবন্ধু ঝিঙে, এত দিনের পরে দেখা—যা-কিছু মোলাকাত একবার ঐ চোখের দৃষ্টি হেনেই সারা করে গেল।

পারুল সজল চোখে ডাকে ঃ ঘরে আয় বাবা সাহেব। আমাদের খোয়ারটা দেখলি? মলয়কুমার ক্ষেপে গেছে। মলয়কুমার না কচুপড়া—সেই ঝিঙে শয়তানটা। বাপের টাকা পেয়ে কপালের শিং গজিয়েছে, কথায় কথায় ঢুঁশ মারতে আসে। সন্ধ্যেবেলা রানী বলেকয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল। সন্দ করে

আবার এসেছে। হেনস্থা আছে আজ আমার রানীর কপালে।

সাহেব বলে, দু-চারটে কথা আমারও কানে গেছে, তোমাদের যেন গরু ছাগলের মতো পুষছে। ঘাড় ধরবার জন্য হাত নিশপিশ করেছিল কিন্তু দেখলাম, বড্ড আপন মানুষ তোমাদের। বিস্তর কষ্টে নিজেকে সামলেছি।

বলতে বলতে আগুন হয়ে উঠল: একদলের মানুষ ছিলাম, দেখাসাক্ষাৎ না করে কি ছাড়ব? বেরুবে তো সকালবেলা—তোমাদের বাড়িতে কিছু নয়, পিছন পিছন গিয়ে পথের উপরে ধরে জিভখানা একটানে উপড়ে নেবো। নিয়ে বরঞ্চ সেই জিভ দেখিয়ে যাব তোমাদের।

শিউরে উঠে পারুল না-না—করে উঠল। লাঞ্ছনার জ্বালা নিভে গিয়ে এখন ভয়। বলে, না রে সাহেব, ঝগড়াঝাটি করতে যাসনে। দেখা করেও কাজ নেই ওর সঙ্গে।

সাহেব বলে, ভয় কিসের মাসি? দুনিয়ার উপর কি আছে আমার শুনি, কে-ই বা আছে? যাদের কিছু নেই, তাদের ভয়ও নেই। আমার সে কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ক্ষতি তোর নয় বাবা, রানীর। বাড়িটা করে দিয়েছে। দলিল লেখাপড়া হয়েছে—এখনো সই হয় নি, রেজেস্ট্রী করে দেয়নি। পড়শি তো কখনো অন্যের ভাল দেখতে পারে না—সকলে কান ভাঙানি দিচ্ছে। এই যে তোর সঙ্গে একটু বেরিয়েছিল—ঠিক কেউ খবর পাঠিয়ে দিয়েছে, নয়তো টের পাবে কেমন করে?

খেতে দিয়েছে সাহেবকে। তার মধ্যে পারুল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, থাকবি দিনকতক, না যে-দেশে ছিলি সেখানেই ফিরে যাবি?

সাহেব তো পা বাড়িয়েই আছে—রাত কতক্ষণে পোহায়, সেই অপেক্ষা। মুখে উল্টো কথা বলে মজা করে। ঘাড় নেড়ে বলে, ক্ষেপেছ মাসি, এমন শহর-জায়গা ছেড়ে নোনা রাজ্যে কে মরতে যায়! কাঁধে শনি চেপে আমায় তাড়িয়ে বের করেছিল। ভোগান্তি অনেক হয়েছে, আর নয়।

যেমনটা ভেবেছে ঠিক তাই। পারুলের মুখ এতটুকু হয়ে গেল। মুখে তবু হাসির ভাব করে বলে, নিজের জায়গা তোর। এসে পড়েছিস তো থাক্ যে ক'টা দিন ভাল লাগে। আমি বলি, দিদিই যখন নেই বস্তিতে কেন পড়ে থাকতে যাবি? জায়গার এমন মহিমা, সাধু-পরমহংস থাকলেও বদমায়েস বলে নাম পড়ে যায়। ভালো পাড়ার কত ঘরবাড়ি রয়েছে, বড়রাস্তার উপর ভালো ভালো সব হোটেল—

সাহেব নিরুত্তরে খাওয়া শেষ করে হাতমুখ ধুয়ে ভালমানুষের ভাবে বলে তোমার চাবির থোলোটা একবার দাও মাসি—

কেন রে?

আমাদের ঘরটায় তালা দিয়ে গেছে, কোন একটা চাবি যদি খেটে যায়।

নয় তো তালাই ভাঙব। ঘর যখন রয়েছে, হোটেল খুঁজতে যাই কেন ?

পারুল মরমে মরে যায়ঃ আমি কি তাই বললাম রে, এই বুঝলি শেষটা ? তালা খুলতে হয় যা করতে হয়, এক্ষুনি তার কি ? ঐ দেখ, রানী মাদুর-বালিশ পেতে রেখে গেছে, তোকে উপরের ঘরে দিয়ে এইখানে আমার ঘরে সে শুত। ঝিঙে এসে পড়ে সব ভণ্ডুল করে দিল।

গভীর নিশ্বাস ফেলে পারুল বলে, এইটুকু বাচ্চা থেকে এত বড়টা হলি চোখের উপর। কপালে হল না—আমি তো ছেলে করে নিতে চেয়েছিলাম। এমন খাসা ঘর থাকতে আমিই কি তোকে বাইরে ছাড়তাম ? কিন্তু ঐ যে-কথা বললি তুই—গোয়াল করে দিয়ে গরুর মতন রেখেছে আমাদের। দলিলটা ভালোয় ভালোয় হয়ে যাক, জবাব তারপরে। সেদিন তোকেই লাগবে বাবা। জিভে অনেক বিষ ছড়িয়েছে, সত্যি সত্যি জিভ উপড়ে শোধ দিবি। এই ক'টা দিন চেপেচুপে থাক—তা ছাড়া উপায় নেই।

পরম দার্শনিক তত্ত্ব পারুলের মুখেঃ বুঝে দেখ্, মানুষের বলশক্তি রূপ-যৌবন দু-দিনের, কিন্তু ঘরবাড়ি বিষয়আশয় চিরকালের। দিদির হাতে-গাঁটে যদি জোর থাকত, জলসার নামে অমন ছুটে পড়ত না। আমার কপালেও একদিন তাই হবে যদি না আখের গুছিয়ে চলি। আমার রানীরও তাই।

সাহেব তখন বলে, ভোরে চলে যাচ্ছি মাসি। এ-বাড়ি বলে নয়, কালীঘাটেই থাকব না।

পারুল আন্তরিক দুঃখে বলল, কালীঘাট ছাড়তে তো বলিনি বাবা। কাছাকাছি থাকলে এক-আধ দিন তবু চোখের দেখা দেখতে পাবো। এই পাড়া ছাড়া কি জায়গা নেই, এ ছাড়া কি বাড়ি নেই, ঝিঙেটার সামনাসামনি না গেলেই হল। দৈবাৎ যদি দেখা হয়, রানীকে আর আমাকে আচ্ছা করে গালমন্দ করবি। বলবি যে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। তাতে ভালই হবে আমার রানীর।

সজোরে ঘাড় নেড়ে সাহেব বলে, রক্ষে করো মাসি। তোমাদের কালীক্ষেত্র ঠাকুর-দেবতার জায়গা—মা-কালীর আশেপাশে ঊনকোটি দেবতা। আমাকেও এক দেবতা বানানোর রোখ পড়েছে, মানুষ থাকতে দেবে না। এত দেবতার ভিতরে ভিড় বাড়িয়ে কি হবে ? কালীঘাটে নয়, কলকাতা শহরেই আর নয়। সাহেব বলে যে ছিল, সেই মানুষটা মরে গেছে। ঝিঙেকে তাই বোলো।

পারুলের নিচের ঘরে রানীর পাতা মাদুরে শুয়েছে সাহেব। এক ঘুমের পর উঠে পড়ল। সন্তর্পণে দরজা খুলে বেরোয়। পারুল জানতে পারে না—জানবে তো ওস্তাদের কাছে কোন্ ছাই শিখেছে এতদিন ধরে ? দোতলার বন্ধদ্বার ঘরের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে পড়ে। মনে মনে বলে, চললাম ভাই রানী। আমি মরে গেছি—পারুল-মাসি ঝিঙেকে বলবে। তুইও তাই

সত্যি বলে জেনে রাখ। তোর ঘরবাড়ি হোক, সুখশান্তি হোক। কাল রাত্রের মতো চোখে যেন আর কখনো জল না পড়ে।

চোখ বুঝি ভিজে আসে। কড়া হয়ে মনের উপর চোখ রাঙায়ঃ খবরদার!

নিঃশব্দে দ্রুতপায়ে লম্বা উঠানের ফালি পার হয়ে দরজা খুলে গলিতে গিয়ে পড়ল। 'চলনে বিড়াল'—সারি সারি খুপরিঘরের ভাড়াটে বাসিন্দা ঘুণাক্ষরে কেউ টের পায় না।

গলির শেষে বড়রাস্তায় না গিয়ে উল্টো দিকের আঁস্তাকুড় আবর্জনা ভেঙে আদিগঙ্গার কিনারে পড়ে। বড়রাস্তা এড়িয়ে চলাই ভাল। কনস্টেবলরা এসময়টা যদিচ চোখ বুজে বুজে পাহারা দেয়, তা হলেও দুর্জনের মুখোমুখি হবার কি দরকার?

ঘরবাড়ির বাধা পেয়ে গঙ্গার গর্ভ দিয়ে যেতে হচ্ছে। পায়ে পায়ে মাটি বসে যায়। আবছা অন্ধকার। জোয়ার এসেছে, জল বাড়ছে। পায়ের কাছে জল খলবল করে। একদিন বা দু-দিন বয়সের শিশুকে এই নদীস্রোতে বোঁটা-ছেঁড়া পাতার মতন কে ভাসিয়ে দিয়েছিল। বড় হয়েও ভাসছে। রানী ও অন্যদের সঙ্গে কুমির-কুমির খেলত, উঠানটুকু হত নদী—ঠিক তেমনি ডাঙার নদীতেই সাহেব জীবনভোর ভেসে ভেসে চলল। পায়ে মাটি পেল না।

একটা ঘরের পিছনে এসে থমকে দাঁড়ায়। খিলখিল খিলখিল তরঙ্গিত হাসি—হাসি স্রোত হয়ে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। যে কণ্ঠের হাসি, সে মেয়ে ঠিক যুবতী আর রূপবতী। আশালতা আর রানীর দোসর। চোখে না-ই বা দেখি, রূপসী না হলে হাসি এত মিষ্টি হয় না। অন্ধকার ঘরে সারারাত্রি না ঘুমিয়ে মনের মানুষের সঙ্গে গলাগলি শুয়ে সেই মেয়ে ফষ্টিনষ্টি করছে। ঘরে ঘরে কত জনা এমনি—কত পুরুষ কত মেয়ে গায়ে-গায়ে এক হয়ে আছে!

মনকে তাড়া দেয়ঃ খবরদার, খবরদার! দ্রুত পা চালিয়ে দেরিটুকু পুষিয়ে নেয়। সবজি গাড়ি ধরবে কালীঘাট স্টেশনে গিয়ে। শেষরাত্রে গাঁ-গ্রাম থেকে মাছ ও শাকসবজি বয়ে এনে হাজির করে, শহরের মানুষ চক্ষু মুছে বাজারে গিয়ে যত টাটকা জিনিস পায়। নাম সেইজন্যে সবজি গাড়ি। ঐ ট্রেনে শিয়ালদা—পিঠ পিঠ আবার খুলনার ট্রেন। শহর আজ যেন চাবুক উঁচিয়ে সাহেবকে তাড়া করেছে।

তারার ঝিকিমিকি আকাশে। অনেক দূরে অস্পষ্ট কালীমন্দিরের চূড়া দেখা গেল। হাতজোড় করে সাহেব কপালে ঠেকায়ঃ যাচ্ছি মা, আর আসব না—

আর্তনাদ শুনে হঠাৎ চমক লাগল। মহাশ্মশান—সেই শ্মশানে কে-একজন মাথা কুটে কুটে কাঁদছেঃ ওগো তুমি কোথায় গেলে, তোমায় ছেড়ে থাকব কেমন করে? কত রাত্রি কাটিয়েছে এইখানে, এমন কত কান্না শুনেছে! সুধামুখীকে লাসঘর থেকে এই শ্মশানে এনে দাহ করেছিল। গরিব নফরকেষ্ট

ধারধোর করে এবং নিজের সামান্য সম্বল খরচ করে সুধামুখীর শেষ-কাজ করেছে, তাতে কোন ত্রুটি হতে দেয়নি। মন্দির উদ্দেশ করে যা বলেছিল, ঠিক ঠিক সেই কথাগুলো আবার সাহেবের মুখে এসে যায়ঃ চলে যাচ্ছি মাগো—

ঘরগৃহস্থালীর আনাচকানাচ দিয়ে মানুষের হাসিকান্নার পাশ কাটিয়ে দ্রুতপায়ে সাহেব ছুটেছে। তারপরে ট্রেন। দিনমান এখন, রোদ চড়ে উঠেছে। দু-পাশের জীবনযাত্রা সড়াক-সড়াক করে অন্তরালে চলে যায়। মাঠে লাঙল চষছে। মাল বোঝাই গরুর-গাড়ি চলেছে কাঁচা-রাস্তায়। ঘাটে চান করছে বউঝিরা। খোলা আটচালার পাঠশালে পড়ুয়ার দল। সাহেব এদের কেউ নয়, চোখে দেখে যায় শুধু। দেখলই কেবল সারা জীবন—নিশিকুটুম্ব রয়ে গেল, দিনমানের কুটুম্ব কখনো কারো হল না।

বাইশ

সেই প্রথমবার সাহেব খুলনার ঘাট থেকে বলাধিকারীর নৌকোয় গিয়েছিল। সে রকম মহাশয়-মানুষ প্রতিবারে মেলে না। সস্তায় শেয়ারের নৌকোও ঘাটে নেই! না-ই বা থাকল, ভাবনার কি? বিবেচক ভগবান পা দিয়ে রেখেছেন। একখানা নয়, দু-দুখানা। হেঁটে চলো সেই ভগবানের পৃথিবী দেখতে দেখতে। অসুবিধা যাওয়ার ব্যাপারে নয়—গিয়ে উঠবে কোনখানে সেই হল ভাবনা।

হাঁটতে হাঁটতে দিন-পাঁচ-ছয় পয়ে গুরুপদর বাড়ি।

সাহেব হঠাৎ কোথা থেকে?

গুরুপদ বেজার হয়ে আছে। একসঙ্গে দুনিয়া চষে বেড়িয়ে মুনাফার কাজ জুড়নপুরের দিনেই সে ফাঁক পড়ে গেল। দোষ তার নিজের। কিন্তু কারণ যা-ই হোক, অন্যের ভালো দেখে বুক চড়বড় করে না এমন নিরেট বুক কার?

হঠাৎ কি মনে করে সাহেব?

সেই যে নেমন্তন্ন করেছিলে বাইটা-বাড়ি থাকবার সময়—

ভালোই তো, বড় আহ্লাদের কথা। বিপদ হল, ঢেঁকিতে বউয়ের হাত ছেঁচে গিয়েছে। সে আবার ডানহাতটা—বাঁ-হাত হলে বলতাম, চুলোয় যাকগে। রান্নাবান্না বিনে সংসার আমার অচল।

আসল কথাটা বুঝতে বাকি থাকে না। তবু ভয় দেখাবার জন্য সাহেব বেশি করে বলে, ভালো রাঁধতে পারি গুরুপদ ভাই। যদ্দিন হাত না সারছে, আমিই তা হলে থেকে যাই।

ঘরের মধ্যে গুরুপদর বউ, সেখান থেকে সে করকর করে ওঠেঃ হাত ছেঁচে গিয়ে কোন্ কাজটার কসুর হচ্ছে শুনি? পুরুষের কাজ চাল এনে দেওয়া, আমার কাজ পিণ্ডি সেদ্ধ করা। ওর কাজ ও করুক, আমারটা না হলে তখন যেন বলতে আসে।

অতএব সেই গোড়া থেকেই ধরতে হবে। চাল আনা থেকে। হোক তবে তাই। ধামা নিয়ে আমার সঙ্গে চলো গুরুপদ।

ভানকিরা ধান ভেনে চাল বিক্রি করে। এক ভানকির কাছ থেকে চাল কিনে চালের ধামা গুরুপদর হাতে দিয়ে সাহেব হনহন করে চলে যায়।

চললে আবার কোথা ?

সাহেব বলে, তোমার বউ যখন রাঁধতে পারবে, আর আমায় কি দরকার ? আমি সোনাখালি যাই। বেলা হয়নি, দেখতে দেখতে গিয়ে পড়ব।

শোননি বুঝি ? সোনাখালির সে সোনা নেই। ফোঁস করে নিশ্বাস পড়ল গুরুপদর ঃ বাইটা চলে গেলেন। বিদ্যের পাহাড়। কী তুমি দেমাক করো সাহেব—পেয়েছ সেই পাহাড়ের পাথর দু-চার টুকরো। আমাদের তা-ও নয়। সব বিদ্যে কাঁধে বয়ে নিয়ে গেলেন। স্বর্গ-নরক যেখানেই যান, সে জায়গায় এখন সামাল-সামাল পড়ে গেছে।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সাহেব ঃ বলো কি গুরুপদ, কি হয়েছিল ?

নাড়ি ফেটেই গেলেন। রোগ জিজ্ঞাসা করলে বলব, খাওয়া। আমরা সব না খেয়ে মরি, পচা খেয়ে মরলেন।

মৃত্যুকাহিনী সবিস্তারে শোনা গেল। বাড়িতে যজ্ঞি, মুরারির ছোট ছেলেটার অন্নপ্রাশন। ভিয়ান হয়েছে ময়রা রসগোল্লা বানিয়ে চিনির রসে ফেলে চলে গেছে। বুড়ো বাইটার ভয়ে ভাঁড়ারঘরে তালাবন্ধ করে রাখা। কিন্তু ও-মানুষ যদি ইচ্ছে করে, ত্রিভুবনের মধ্যে কে ঠেকাবে ? রসগোল্লা রস সমেত সাপটেছে। পেটে গিয়ে সেই জিনিস ফুলতে লাগল। গুরুপদর স্থির বিশ্বাস, পেটের ভিতরের নাড়ি ফেটে গিয়েছিল। ট্যাপামাছের মুখে ফুঁ দিয়ে ছেলেরা যেমন পেট ফাটায়।

তবে আর কি, সোনাখালিরও সম্পর্ক শেষ। স্রোতে ভাসছে সাহেব—তৃণগুচ্ছ মুঠোয় ধরে একটু জিরিয়ে নেয়, তার মধ্যে আবার একটা ছিঁড়ল।

ডাইনে সোনাখালির পথ ধরেছিল, ঘুরে বাঁয়ের দিকে মোড় নিল। এ পথ ফুলহাটার। বলাধিকারী আর বংশীর কি গতিক, দেখা যাক গিয়ে।

সেখানে খবর ভালো। ফুলহাটায় পা দিয়ে কুঠিবাড়ির কাছে বংশীর সঙ্গে দেখা। আস্ত কলাগাছ কাঁধে নিয়ে চলেছে, কুচিকুচি করে কেটে গরুর জাবনায় দেবে। ঘোর সংসারী বংশী। সাহেবকে ধরে এই টানাটানি ঃ চলো, আমাদের বাড়ি থাকবে। বউ তোমার কথা বলে—

সাহেব শিহরণের ভঙ্গি করে বলে, ওরে বাবা ! যা দারোগা-বউ তোমার, ঠেঙানি দেবে কায়দায় মধ্যে পেলে।

যদিচ রঙ্গরসিকতা, বউয়ের নিন্দায় মর্মাহত হয়ে বংশী বলে, গিয়ে দেখই না ঠেঙানি দেয়—না আসন পেতে পা ধোবার জল দেয়, পান-তামাক দেয়, ভাত-ব্যঞ্জন দেয়।

বংশীর সুখসৌভাগ্যের কথা শুনতে শুনতে সাহেব যাচ্ছে। দশধারার

বিপদ গেছে, যথোচিত বন্দোবস্ত পেয়ে বুড়ো-দারোগা বংশীর নাম তুলে নিয়েছে আসামির লিস্টি থেকে। বউ-ছেলে, গরু-বাছুর, জমি-জিরেত ছাড়া কিছু সে জানে না। জানবেও না আর এ জীবনে। সাহেব হতেই সমস্ত, বউ অহরহ সেকথা বলে। দেখা হলে বাড়ি নিয়ে যেতে বলেছে। গুরুঠাকুরের মতো আদরযত্ন করবে, দেখতে পাবে।

শতকণ্ঠে বউয়ের গুণগান। কানে শোনে সাহেব, আর বংশীকে দেখতে দেখতে যায়। ক্ষমতা আছে সত্যিই বউয়ের—বংশীর চেহারায় রীতিমতন চিকন আভা। দিনরাত এত খাটনি খাটে, তথাপি যেন ভুঁড়ির লক্ষণ। শুকনো কাঠে কুসুম-মঞ্জরী।

কিন্তু বংশীর বাড়ির দিকে না গিয়ে সাহেব সোজাসুজি চলল।

কি হল ?

তোমার কথা শুনে ভয় ধরে গেল বংশী। তোমার নিজের দশাও চোখে দেখছি।

দশাটা মন্দকি দেখলে ?

সাহেব বলে, মন্দ নয়—ভালো। বাগে পেলে তোমার বউ আমাকেই ভালো বানিয়ে দেবে।

বংশী বলে, ভালো হওয়াই তো ভালো রে—

সাহেব রেগে যায় ঃ কষ্ট করে এতসব শিখলাম কেন তবে ? কু-ডাক ডেকো না বংশী মন্দ আমি হবোই। আলবৎ হবো—চেষ্টায় কী না হয়! কে আছে আমার, ভালো হবার কী দায় পড়েছে, কোন দুঃখে আমি ভালো হাত যাব ?

হনহন করে সোজা একেবারে বলাধিকারীর বাড়ি।

এসে গেছিস, ভাবছিলাম তোরই কথা। সাহেবের কানের কাছে হাসিহাসি মুখ এনে বলাধিকারী সুখবর দিলেন ঃ নতুন মরসুম এইবার, নতুন কাজকর্মের বিলি-ব্যবস্থা। কাপ্তেন কেনা মল্লিক এর মধ্যে একদিন এখানে এসে হাজির। মানুষটা গুণের কদর জানে, মুখের গল্প শুনেই লাফিয়ে উঠল ঃ কোথায় সে সাহেব, খবর করে এনে দিন।

বলছেন, দুদিনেই সুনজরে পড়বি তুই। ধাঁ-ধাঁ করে উন্নতি, কোন বেটা রুখতে পারবে না। নতুন মানুষ বলে এবারে না-ই হল, আগামী সন থেকে কোন একটা দলের সর্দারি দিয়ে দেবে। মজা করে এখন খাওয়া-দাওয়া কর, ঘুমো। মরসুম পড়ে তখন ছুটোছুটির অন্ত থাকবে না।

কাপ্তেন কেনারাম মল্লিক। ধুরন্ধর কাপ্তেন বেচা মল্লিক ছিল, তারই কনিষ্ঠ। কাপ্তেন তো কতই আছে কত জায়গায়, কিন্তু কেনারাম দ্বিতীয় নেই। এলাহি কাজকারবার। বউ চার-চারটে। পুরো বর্ষাকালটা বাড়ি থেকে চার বউয়ের সঙ্গে একত্র সংসার। দুর্গাপুজা অন্তে বিজয়া দশমীর পরের দিন দশেরা—

কাজের সূচনা ঐ দিন।

রাতদুপুরে কেনারামের বাড়ি বহু লোকের মীটিং। মীটিং বলে না এরা, পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত পাকা ব্যবস্থা করে দেবে, তার পরেই শুভদিন দেখে নানান নল ও দলে ভাগ হয়ে বিষয়কর্মে বেরুনো। কেনারামের বুড়ি-মা এখনো বেঁচে—মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে নিজেও সে বেরোয়। পানসি নিয়ে গাঙে খালে ঘুরে সকলের তদ্বির-তদারক করে বেড়ায়। বড়বউ বাদে অন্য তিন বউয়ের কোন একটা অন্তত থাকবে নৌকোয়। বড়বউ গিন্নিমানুষ—সে বাড়ি না থাকলে সংসার অচল। বড়বউয়ের যাওয়া কখনো সম্ভব নয়।

পঞ্চায়েত জমজমাট। মনে তো হয়, অতিশয় অমায়িক মানুষ কেনারাম। সকলের কথা শুনছে, হেসে কথাবার্তা বলছে সকলের সঙ্গে। অথচ কাজের দরকারে এই কেনারাম নাকি নিজ দলের কারিগর ঈশ্বর মান্নার মুণ্ডু কেটে নিয়ে সরে পড়েছিল। মন টলেনি, হাত কাঁপে নি। খোদ পচা বাইটা বলেছিল সাহেবকে, গল্প অতএব মিথ্যা হতে পারে না।

চারখানা গাঁয়ের বাছা বাছা মরদের জমায়েত। মেয়েলোকও আছে—যারা বেরিয়ে পড়বে, তাদেরই ঘরের কিছু মেয়েছেলে। এবং মেয়েলোক এলে কোলের বাচ্চাও ফেলে আসবে না—বাচ্চারাও পঞ্চায়েতের জরুরি বৈঠকে। কারা সব যাবে, রোজগারের ভাগ-বাঁটোয়ারা কেমন হবে এবারে, কোন লোকের কি রকম অংশ—মরসুমের মুখে যাবতীয় বন্দোবস্ত পাকা করে বেরুতে হয়। পরিণামে যাতে কথা কথান্তর না হয়, গণ্ডগোল না বাধে। অনেক নলে ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম সব নলের একরকম নয়। ভাগের সেইজন্যে রকমফের।

প্রতি নলে ওস্তাদ একজন করে। কাজের যাবতীয় বুঝসমঝ তার কাছে—সিঁধ কাটা, মাল সরানো, লাঠি বা লেজা চালানো, যেমন যেটির প্রয়োজন। কোথায় কোন্ কায়দায় চলাচল—সাপের মতন বুকে হেঁটে, কিম্বা বাঘের মতন হামলা দিয়ে? সাধারণ নিয়মের যে ভাগ তার উপরে একটা বিশেষ ভাগ সেই লোকটার নামে—যাকে বলে ওস্তাদ-ভাগ। সকল কাজেই ওস্তাদ যে হাজির থাকবে, এমন নিয়ম নয়। ওস্তাদ বিহনে সর্দার তখন দলের কর্তা। প্রেসিডেণ্ট গরহাজির হলে ভাইস-প্রেসিডেণ্টকে চেয়ারে বসায়, তেমনি আর কি! সর্দারেরও বিশেষ ভাগ একটা—পরিমানে, অবশ্য অনেক কম ওস্তাদ-ভাগের চেয়ে। বড় বড় নলে আবার জমাদার বলে পদ থাকে সর্দারের উপরে। অ্যাডিসন্যাল বা অতিরিক্ত ওস্তাদ। আছে মহাজন। সে মানুষ ঘরে বসে থাকে, এক পা-ও বাইরে যায় না, কিন্তু দায়দায়িত্ব কাঁধে বিস্তর। কাপ্তেন কেনা মল্লিকের এত প্রতিপত্তি বলাধিকারী মহাশয়ের মতন বিচক্ষণ মহাজন পৃষ্ঠপোষক আছেন বলেই। নলের মানুষ যতদিন না ফিরছে, বাড়ির দরকার মতন মহাজন টাকাটা সিকেটা জুগিয়ে যাবে। মরদ ফিরে এলে হিসাবপত্র হবে। সুদ লাগে না—কিন্তু মহাজনি ভাগ আছে, সুদের উপর দিয়ে যায় সেটা। আর আছে খুঁজিয়াল

—যারা খোঁজখবর এনে দেয়। অর্থাৎ স্পাই। এ কাজে ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের জুড়ি নেই। নিতান্ত খাতির-উপরোধ ছাড়া এখন আর বেরোয় না। কিন্তু বয়স গেলেও ক্ষমতা পুরোদস্তুর বজায় আছে। বেরুল তো একখানা দু-খানা তাজ্জব কাজ গেঁথে আনবে—সে কাজের চেহারা দেখে হাল আমলের তরুণ খুঁজিয়ালদের চক্ষু কপালে উঠে যায়।

নানান ধরনের ভাগিদার। পঞ্চায়েত বছর বছর সকলের হিস্যা ঠিক করে দেয়। মরসুমের সুবিধা অসুবিধা নিয়েও রকমারি বিবেচনা। কেউ হয়তো মারা পড়ল বিভূঁয়ে—রোগপীড়ায় মরতে পারে অথবা খুনজখম হয়ে। তেমন ক্ষেত্রে বাড়ির লোকের প্রাপ্য কি? খুনজখমে বেশি পাওনা—মরেই যদি, জ্বর-ওলাওঠায় না মরে যেন খুন হয়ে মরে, মনে মনে প্রিয়জনের এই বাসনা। যে বাড়ি দ্বিতীয় পুরুষ নেই—মানুষটা বেরিয়ে গেলে গুষ্টের মেয়েমানুষ পড়ে থাকবে, সে বাড়ির মেয়েমানুষই পঞ্চায়েতে চলে এসেছে পাওনাগণ্ডার কথা স্বকর্ণে শুনে যাবে বলে।

বাছা বাছা মরদ নিয়ে পঞ্চায়েত, কিন্তু খবর ইতরভদ্র সকলের জানা। রটনা একটা চালু করা আছে—মরদেরা নাবালে ধান কাটতে যাচ্ছে। আর কতক যাচ্ছে নাকি ব্যাপার-বাণিজ্যে—নৌকোয় যাবে তারা। কেনারাম মল্লিক চলেছে নিজের আবাদ তদারকি কাজে—ক্ষেতের ধান খোলাটে তুলে পাইকারদের মেপে দিয়ে নগদ তংকা গনে নিয়ে ফিরবে। থানা দূরবর্তী, পুরো বেলার পথ। তা বলে কৈলাস থেকে ভোলানাথ নেমে এসে দারোগা হয়ে বসেন নি—দেশসুদ্ধ মানুষ জানে, তিনিই বা না জানবেন কেন? ধান কাটার কথা শুনে দারোগা মুখ টিপে হাসেন অন্তরঙ্গ মহলে: কাটবে তো কিছু বটেই—ক্ষেতের ধান না হল, ঘরের দেয়াল।

ব্যস, মুখের ঐ মন্তব্যেই শেষ। এলাকার ভিতরে চুরিচামারি হবার শংকা নেই। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা কেনা মল্লিকের জায়গায় ঢুঁ মারতে আসবে? দারোগা সেটা নিঃসংশয়ে জেনেবুঝে আছেন, তাবৎ গ্রামবাসীও জানে। তার উপরে কেনারাম অতিশয় বিবেচক ব্যক্তি—অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী যার যেমন প্রাপ্য ঘরে বসেই ঠিক ঠিক পেয়ে যাচ্ছেন। চুপচাপ থেকে লাভ বই লোকসান নেই কারো পক্ষে।

উল্টে বাইরের কত গ্রাম এসে কেনারামের কাছে ধন্না দিয়ে পড়ে, কী দোষে তারা বছরের পর বছর বাদ পড়ে থাকবে, তাদের নিয়েও আলাদা দল গড়া হোক। কিন্তু এলাকা বাড়াতে কেনারাম রাজি নয়: তামাম মুলুক জুড়ে নিয়ে সামাল দেব কেমন করে? কেনারাম ছাড়া কি কাপ্তেন নেই? অন্যদের ধরো গিয়ে।

হালফিল কয়েকটা মরসুম ডোকরাদের গ্রাম থেকেও ধরাধরি চলছে। ডোকরা—যারা সিঁধকাঠি লেজা-সড়কি বানানোর ওস্তাদ। এবারের পঞ্চায়েতে —চোখে দেখেও বিশ্বাস হবার কথা নয়—সকলের বড় কারিগর যুধিষ্ঠির নিজে

এসে উপস্থিত।

কেনা মল্লিক অবাক হয়ে বলে, তুমি এর মধ্যে কেন? রাতদিন খাটনি খেটেও খদ্দের সামাল দিয়ে পারো না—তোমার কোন অভাবটা আছে শুনি?

যুধিষ্ঠির বলে, পয়সাকড়ির অভাব নয় মহারাজ। মরসুম লেগে গেলে আমার সব খদ্দের তো বেরিয়ে পড়বে, কাজকর্মেরই অভাব এইবার। সেইজন্যে আসতে হল। এখন গৃহস্থের দা-কুড়াল গড়ানো, আর নয়তো হাত-পা কোলে করে বসে থাকা। কোনটাই আমি পারিনে।

তার হাতের গড়া কাঠি নিয়ে নলের মানুষ দেশদেশান্তর বেরিয়ে চলল, যুধিষ্ঠির ডোকরার মন উড়ু-উড়ু। দা-কুড়াল ইত্যাদি গড়বার জন্য আছেন কর্মকার-মশায়েরা। ভালো জাত তাঁরা—নবশাখের অন্তর্গত। বিদ্যে শিখে তাঁদের কতজনা শহরে গিয়ে দালান-কোঠা দিচ্ছেন। ঘরব্যাভারি দা-কুড়ালের কাজ যুধিষ্ঠিরও চেষ্টা করে দেখেছে। গত বছর দেখেছে, তার আগেও দেখেছে অনেক। এই কাজে হাপর টানতে গিয়ে সর্বদেহ ঝিমিয়ে আসে কেমন। নেহাই-এর উপর তপ্তলোহা পিটতে লক্ষ্য ভুল হয়ে গিয়ে এদিক-ওদিক বাড়ি পড়ে। পিটতে পিটতে অন্যমনস্ক হয়ঃ তারই হাতের যন্ত্র নিয়ে কত কারিগর রাজভাণ্ডার পলকে উজাড় করে আনছে, তার অস্ত্র হাতে করে নিঃশঙ্কে কত জনে পায়তারা কষে বেড়াচ্ছে এই নিশিরাত্রে, আর সে এখানে চালাঘরে বসে বসে শ্বাসরোগীর নিশ্বাসের মতো একটানা হাপরের আওয়াজ শোনে। হঠাৎ খেয়াল হয়, হাপর টানা বন্ধ হয়ে গেছে কখন, কাঠকয়লার আগুন নিভে গেছে। আবার নতুন করে ধরাতে মন যায় না, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। এমনি হয়ে দাঁড়িয়েছে যুধিষ্ঠিরের অবস্থা।

তাই সে কেনা মল্লিকের কাছে নাছোড়বান্দা হয়ে পড়লঃ মহারাজ, আমার হাতেরও একখানা কাজ পরখ করতে আজ্ঞা হোক। দিয়ে দেখুন একটিবার। গরপছন্দ হলে আয়েন্দা সন আর কিছু বলব না। লোহাই পিটে যাব, দা-কুড়ুল বঁটি-খন্তা গড়াব।

কেনা মল্লিক বলে, হাতের কাজ তো হরবখত দেখাচ্ছ। মুলুক-জোড়া তোমার কাঠির নাম। তোমার গড়া কাঠি হাতে তুললে সাধুমহান্তেরও হাত সুড়সুড় করে। কার ঘরের দেয়াল কাটি, এই তখন মনের অবস্থা।

বলতে বলতে মল্লিক হেসে ফেলেঃ এত দেখাচ্ছ, আবার কোন গুণ পরখ করতে বলো এর উপরে?

যুধিষ্ঠির বলে, কাঠি গড়ে দিই—সে কাঠি ধরতেও পারি মহারাজ। হুকুম হয়ে যাক, আমিও বেরিয়ে পড়ি নলের সঙ্গে। বিনি কাজে ঘরে থাকা যায় না।

যুধিষ্ঠির সম্প্রতি নতুন এক নম্বর সাঙা করেছে। ব্যাপারটা কেনা মল্লিক জানে। বলল, কাজ না থাকাই তো ভাল। সাঙার বউর সঙ্গে বসে বসে ফষ্টি-নষ্টি করবে।

এই ডোকরা জাত হিন্দু কি মুসলমান, বলা কঠিন। হিন্দু দেবদেবী নিয়ে নাম, কালীপুজো করে। কিন্তু সাঙা চলে এদের মধ্যে, মরার পর কবর দেয়।

কেনা মল্লিক পঞ্চায়েতের সর্বদিক নজর ঘুরিয়ে বলে, কথা শোন ডোকরার পো'র। কাজ নেই বলে নতুন বউ ঘরে ফেলে বেরিয়ে পড়বে।

যুধিষ্ঠির বলে, আমি যাব, আর বউ বুঝি ঘরে পড়ে থাকবে? সে যাচ্ছে তিলসোনার জগদ্ধাত্রীপুজোর মেলায়। আমার বেরুনো তো তারই ঠেলায় চৌ-পহর খিচখিচ করেঃ চালের নিচে বসে বারোমাস ঠুকঠুক করবে বাইরের কাজ ধরবে না—এ কেমনধারা পুরুষমানুষ।

তখন মালুম হল। যুধিষ্ঠিরের যাওয়া নিজের ইচ্ছেয় ততটা নয়—সাঙার বউ তাড়িয়ে তুলেছে। আগের বউগুলো ভদ্রপাড়ার বউঝি'র মতো—ঘরে থেকে রাঁধাবাড়া ও সংসারধর্ম করে আসছে। বুড়োবয়েসের সোহাগী বউ তাতে রাজী নয়—চিরকালের জাতব্যবসা ধরবে। সে হল ভিড়ের মধ্যে পকেট মারা এবং দিনে রাত্রে অন্য দশরকমের অভব্য রোজগার। ডোকরা মেয়েদের স্বভাবগত ক্ষমতা, মা-ঠাকুরমা হতে চলে আসছে—শিখে নিতে হয় না কিছু।

পঞ্চায়েতের কাজ এক রাত্রে মিটল না। পরের রাত্রেও বসতে হয়। বেরুনো কালী-নিরঞ্জনের পরের দিন। খড়ি পেতে আচার্যি ঠাকুর দিন সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। জঙ্গলের মধ্যে বিরিঞ্চি-মন্দির বলে একটা জায়গা—বিরিঞ্চি বা কোন নামেরই বিগ্রহ নেই সেখানে। মন্দিরও নেই—পাতলা পাতলা সেকেলে ইটের স্তূপ, দেওয়ালের তিনটে দিকের খানিকটা মাত্র খাড়া। রাবিশ সরিয়ে সেখানে ভাঙা-চোরা বেদি বের করেছে, কালী-প্রতিমার স্থাপনা সেই বেদির উপর।

পুজো নিশিরাত্রে—কালীপুজোর যেমন যেমন বিধি। পাঁঠাবলি অনেক-গুলো, তার সঙ্গে মহিষও একটা। সে এক কাণ্ড! সন্ধ্যে থেকে মহিষটার শিঙে আর ঠ্যাঙে দড়ি টানা দিয়ে শুইয়ে ফেলে দুই মরদ গলার দুই দিকে ঘি মালিশ করছে। মালিশে চামড়া নরম নয়। অত বড় জীবটা এক কোপে কাটতে হবে, কোপে দুখণ্ড না হলে সর্বনাশ—সেজন্য বিস্তর রকম তদ্বির। সকলের উপরে অবশ্য দেবীর করুণা। তাঁর ইচ্ছা না হলে বাধা পড়ে যাবে, মেলেতুকে যত ধারই থাকুক আর কামার যতই বলবান হোক।

বলিদান সমাধার আগে পর্যন্ত কেনা মল্লিকের সোয়াস্তি নেই। প্রতিমার সামনে করযোড়ে অবিরাম মা-মা—করছে। চার বউ তার ডাইনে বাঁয়ে। তারপর উল্লাসের চিৎকারঃ নির্বিঘ্নে হয়ে গেছে, তুষ্ট হয়ে দেবী বলি গ্রহণ করেছেন। পূর্ণসিদ্ধি। রক্তজবা নিজে এবার অঞ্জলি দিল।

পুজো শেষ। পুরুত এবং বাইরের যারা ছিল বিদায় হয়ে গেল। পুজোর যাবতীয় উপকরণ সরিয়ে নিয়ে গেছে। আসল কাজ এইবারে। শুধুমাত্র নিজেদের লোক ক'টি। তক্ষক ডেকে উঠল অরণ্যের কোনখানে। বারকয়েক

ডেকে ডেকে থেমে যায়। একেবারে নিঃশব্দ, গাছের পাতাটি পড়লে কানে পাওয়া যাবে এবার। মস্তবড় মাটির প্রদীপ জ্বলছে দেবীপ্রতিমার সামনে। বাতাসে আলো কাঁপে—চারটে সলতে একসঙ্গে ধরানো, সেইজন্য নিভে যায় না। কাঁপছে আলো ঘন ডাল-পাতার উপর। নিরেট অন্ধকারের গায়ে বাঘের মতন ডোরা কেটে যাচ্ছে। আলো পড়ছে বলির রক্তস্রোতের উপর। নিরুদ্ধশ্বাস থমথমে ভাব চতুর্দিকে।

কাপ্তেন কেনা মল্লিক হাঁক দিয়ে উঠল : সামনে চলে এসো তোমরা।

আবছা আবছা এতক্ষণ দু-পাঁচটিকে দেখা যাচ্ছিল। তারা এগিয়ে এলো। তারপর আরও সব আসতে থাকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল, একসঙ্গে এত মানুষ ছিল অন্ধকারে! গাছগাছালি আর গায়ের রঙে অন্ধকারের মধ্যে এক হয়ে মিলে ছিল।

এগিয়ে এসে মানুষ বলির রক্ত আঙ্গুলে চুবিয়ে ফোঁটা দেয় কপালে। প্রতিমার পদতলে হাত রেখে মন্ত্রের মতো বলে যায়, এক-দল আর এক-দল। দলের খবর বাইরে যাবে না, গলা কাটলেও কথা বেরুবে না।

প্রসাদী পাঁঠার পাকশাক ওখানেই। ফুর্তিফার্তি সারারাত্রি ধরে। সকাল-বেলা চোখ লাল করে সব ঘরে ফেরে। সারাদিন ঘুমোয়।

সন্ধ্যার কিছু আগে যাত্রা—আচার্যি ঠাকুর ঘণ্টা-মিনিট ধরে বলে দিয়েছেন। সাহেবও একটা নলের সঙ্গে। কালীঘাটের সম্পর্ক চুকিয়ে-বুকিয়ে এসে ভাঁটি অঞ্চলের নল বেঁধে এই ভেসে পড়ল। নদীর ভাঁটায় থোপা থোপা কেউটেফেনা ভেসে যায়, তেমনি।

কাক ডেকে উঠল না? ডালে বসে কাক ডাকছে। নলের সর্দার পিছিয়ে ছিল, উৎসাহে ছুটে চলে আসে। সাহেবকে সামনে পেয়ে বলে, দেখ দিকি পুকুর যেন ঐখানে। সেই রকম মনে হয়।

সাহেব এগিয়ে দেখে বলল, পুকুর কোথা? ডোবা একটা—

জল আছে, তা হলেই হল।

পুকুর-ধারে গাছের উপর কাক ডাকা ভারি সুলক্ষণ। স্ফূর্তি সকলের। সর্দার বলে, জল রয়েছে তখন পুকুর ছাড়া কী! জঙ্গলের মধ্যে তোমাদের জন্য দীঘি কেটে ঘাট বাঁধিয়ে কে দিচ্ছে! কাক ডেকেছে, কাজের বড্ড জুত এবারে।

আর একবার কাক দেখার ঘটনা পুরানো কারিগরদের মনে এসে যায়। কাপ্তেন নিজেই সেবার একটা নলের সর্দার হয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বর মান্নাকে বলল, গাছটা জলের ধারে কিনা দেখে এসো। জলে ঠিকই—একটা মহিষ কাদাজলে অর্ধেক গা ডুবিয়ে আরামে পড়ে আছে। জলে ও ডাঙায় মেকো-কাঁকড়া কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। ঈশ্বর পাড়ের কাছে গিয়েছে, আর কাক সেই সময়টা একটা

কাঁকড়া ঠোঁটে নিয়ে মহিষের পিঠে বসল। সাংঘাতিক দৃশ্য। নিঃসন্দেহ এরই ফলে ঈশ্বর হেন পাকা সিঁধেলকে সিঁধের ভিতর জাপটে ধরল। এবং পরিণামে প্রাণ গেল গুণী মানুষটার।

পরে যখন আচার্য ঠাকুরের কানে ঈশ্বরের এই বৃত্তান্ত গেল, তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন: জলের ধারে কাক ডাকল—কানে শুনে নিলে, ঐ পর্যন্ত। সেই কাক উড়ে কোথায় বসে—কী দরকার ছিল তাকিয়ে দেখবার! দেখতে গিয়েই সর্বনাশ। মহিষ শুয়োর বা মড়ার উপর কাক বসেছে—চোখে দেখে সেই চক্ষু শতেকবার গঙ্গাজলে ধুয়ে ফেললেও দুর্ভোগ এড়ানো যাবে না। শাস্ত্রে এই রকম বলে।

সেই ঠেকে শিখল। কাকের দিকে চোখ তুলে না চেয়ে দলের মানুষ দ্রুত এগিয়ে যায়। চলেছে। খাল পার হতে ভোর হয়ে এলো। ওপারে চৌমাথা একটি—নানান দিকে পথ বেরিয়ে গেছে। চৌমাথার উপর দাঁড়িয়ে পড়ল—চার পথের কোন্‌টা ধরে যাবার হুকুম আসে দেখ। এদিক-ওদিক তাকায় আর ভাবে।

থুতু ফেলে সর্দার বাঁ-দিককার পথে। উন্মত্ত কালী, বাঁয়ের পথ ধরি কিনা বলো।

দেবীর সম্মতি থাকলে শিয়াল ডেকে উঠবে জঙ্গলের কোনখানে। সেই সংকেত। চুপচাপ কান পেতে আছে।

অপেক্ষায় কাটে কিছুক্ষণ। সাড়া আসে না। সর্দার ব্যাকুল হয়ে বলে, যাবো কোন্ দিকে, ঠিকঠাক বলে দাও। ঝুলিয়ে রেখো না। কানা-খোঁড়া বেওয়া-বিধবা বাচ্চা-বুড়ো বিস্তর পুষ্যি। ঘরবাড়ি ফেলে যাচ্ছে মরদেরা, বাড়ির লোকের খাওয়াপরা আছে। মুখ ঘুরিয়ে থাকলে হবে না মা-জননী। বলে দাও, বলে দাও—

থুতু ফেলে এবারে ডানদিকে। নিঃশব্দ। নিশ্বাসও বুঝি পড়ে না কারো। শিয়াল ডেকে উঠল। অনতি পরে। হয়েছে, হয়েছে—মিলে গেছে হুকুম।

স্ফূর্তিতে যাত্রা এবার। চোরা-যাত্রা। দক্ষিণে অর্থাৎ আরও নাবালে নেমে চলল এই দল। নানান দল এমনি নানা দিকে—দেশ-দেশান্তর বিজয়ের সৈন্যবাহিনী যেন। সেনাপতি মা-কালী। অলক্ষ্যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে আছেন, হুকুম-হাকাম যত কিছু তিনিই দিচ্ছেন। সর্দার একজন উপলক্ষ মাত্র। অনাচার অনিয়ম না ঘটে, সতর্ক থেকো। ধনদৌলতের পাহাড় নিয়ে ঘরের মানুষ ঠিক ফিরে আসবে।

তেইশ

চোর-যাত্রা। এ যাত্রার বিরাম হল না সাহেব-চোরের জীবনে। বুড়ো হয়ে এক সময় জবুথবু হয়ে পড়ল সাহেব—সোনাখালি এসে গুরু পচা বাইটাকে যে অবস্থায় দেখেছিল। সেই বয়সকালের কথা ভাবে বসে বসে, ছোঁড়াদের

কাছে সে আমলের গল্প করে। ঘরবাড়ি পথঘাট গাঙখাল নিয়ে বিশাল ভাঁটিঅঞ্চল যেন মাঠ একখানা, সেই মাঠের উপর খেলা করে করেই জীবন কাটিয়ে দিল। কাজের এমন নাম ডাক—সাহেব নিজে কিন্তু খেলার বেশি ভাবতে চায় না। খুব বেশি তো কাজ-কাজ খেলা।

বংশীর বাড়ি একটা আস্তানা, দায়ে-বেদায়ে সাহেব সেখানে এসে ওঠে, বংশীর বউ আদর-যত্ন করে। বাইরের দিকে আলাদা চালাঘর বেঁধে দিয়েছে তার জন্য। সঞ্চয় একটি পয়সাও নেই। নাকি অভিশাপ আছে চোরের সুখ-সম্পত্তি দালানকোঠা হতে পারবে না। অভিশাপটা সাহেবের বেলা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। সে জন্য দোষের ভাগী যদি কাউকে করতে হয়, সে সাহেব নিজে। হাতে পয়সা এলেই ছটফট করে। পয়সা যেন পোকা হয়ে কামড়ায়। চিরটি কাল ধরে এই চলল। কোন্ উচ্ছৃংখল স্বৈরিণী অজানা মায়ের কাছ থেকেই বুঝি উত্তরাধিকার।

পয়লা মরসুম শেষ করে ফিরল—সেইবারের এক ঘটনা বলি। শুনলে হাসি-মস্করা করবে লোকে, বিশ্বাসই করতে চাইবে না। বংশীর চালাঘরে এসে আছে। কাজকর্ম মাঝামাঝি রকমের, কিন্তু নামযশ নিয়ে এসেছে খুব। পচা বাইটার শিক্ষা আর বলাধিকারীর আশীর্বাদ ষোলআনা সার্থক। হিসাবপত্র হয়ে ইতিমধ্যেই বখরার টাকাপয়সা এসে পড়ল। এইবারে মহাবিপদ। নামযশ থাকুক, এবং আরও বৃদ্ধি হোক, কিন্তু টাকা নিয়ে এখন কি উপায়? বংশীর বউ কক্ষনো এ জিনিস ছোঁবে না—মনের মতন করে সংসার গড়ে তুলেছে, তার উপরে পাপের দাগ লেগে যাবে। সুধামুখী নেই, নফরকেষ্টও নেই। টাকা পাঠিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট হবে, দুনিয়ার উপর এমন একটা নাম খুঁজে পায় না।

আষাঢ় মাস। বর্ষাটা চেপে পড়েছে আজ ক'দিন। এমনি সময় বাবুপুকুরের কেষ্টদাস ভিজতে ভিজতে সাহেবের চালাঘরে এসে উঠল। সম্পর্কে বংশীর শালা—সেই সুবাদে কুটুম্ববাড়ি বেড়াতে এসেছে। বর্ষাকালে ক্ষেতখামারের কাজ বন্ধ, এই সময়টা কুটুম্ববাড়ি ঘোরা ভাঁটিঅঞ্চলের রেওয়াজ। কুটুম্বে কুটুম্বে অনেক সময় পথের উপর ঠোকাঠুকি হয়। অর্থাৎ আমি যার বাড়ি চলেছি, সেই কুটুম্ব আবার আমার বাড়ি মুখো রওনা হয়ে পড়েছে—আমিও কুটুম্ব তার বটে। কুটুম্ব প্রীতির কারণ উভয়ত একই—আমার ঘরে তণ্ডুলাভাব, তার ঘরেও তাই। দেখা হয়ে উভয় মুখে একই প্রকার অমায়িক হাসি: ফুরসত পেলাম তো খবরাখবর নিতে বেরিয়েছি। হাসি মুখের উপরে, কিন্তু বুকের নিচে ধড়াস-ধড়াস করছে: মিষ্টালাপ পথে দাঁড়িয়ে অনন্তকাল চালানো যাবে না—দু-জনের মধ্যে কে এখন ঘরমুখো ফেরে সঙ্গে কুটুম্বমানুষটি নিয়ে?

কেষ্টদাসের অবশ্য এ ব্যাপার নয়। মা-লক্ষ্মী এবারটা অফুরন্ত ঢেলেছেন, ধান এখনো গোলার আধাআধি। আসল গোলমালটা নিজের মনের মধ্যে। আর সেই আগের কেষ্টদাস নেই—যে বাঘ রক্তের স্বাদ পেয়েছে, ভাঁটার খালে

মাছ ধরে খেতে তার ঘৃণা লাগে। লাঙলের মুঠোয় হাত ছোঁয়ালেই ঝি-ঝি করে হাত জ্বালা করে এখন কেষ্টদাসের। ভাইয়েদের চাপাচাপিতে ধান রোয়াটা যা হোক করে হয়েছে। কাটবার মুখে আবার না ক্ষেতে নামতে হয়, সেইজন্য ফুলহাটা এসেছে। এবং কুটুম্বর কাছে না গিয়ে সোজা ঢুকে পড়েছে সাহেবের চালাঘরে।

এ মরসুমে ছাড়ছিনে সাহেব ভাই, তোমার পিছন ধরে চলে যাব।

সাহেব সঙ্গে সঙ্গে কাজ দিয়ে দিল। বলে, একটা খোঁজদারি করে আয় দিকি কেমন পারিস। জুড়নপুরে সেই আমাদের পুরানো মক্কেলবাড়ি—

কেষ্টদাস অবাক হয়ে বলে, এক বাড়ি দু'বার যাওয়ার নাকি নিয়ম নেই?

সগর্বে সাহেব বলে, আমার ভিন্ন নিয়ম। যুবতী নারী কারিগরে কেউটে-সাপের মতো এড়িয়ে চলে, ওঝা হয়ে সাপ আমি বশ করে ফেললাম।

দিন চারেক পরে কেষ্টদাস ঘুরে এলো। খবর ভাল নয়। পঙ্গু বুড়োকর্তা কার্তিক মাসে দেহ রেখেছেন। বাপ মরে ষোলআনা কর্তা হওয়ার পর মধুসূদন সংসারের কুটোগাছটি ভাঙে না। অহোরাত্রি অন্যায়ের সঙ্গে লড়ে বেড়াচ্ছে। গন্ধ একটু পেলে হল—পাড়ায় হোক, গ্রামে হোক, এমনকি ভিন্ন গ্রামে হলেও ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়বে। কলিযুগ ঘুচিয়ে দুনিয়ায় সত্যযুগ না এনে ছাড়াছাড়ি নেই। ফলে গোটা পাঁচ-সাত ফৌজদারি মামলার আসামি ইতিমধ্যেই, এবং সংসার একেবারে অচল। বাগানের আম-কাঁঠালগাছ ও বাঁশ বিক্রি কোনরকমে চলছে। মা তাই নিয়ে কি বলতে গিয়েছিলেন। তুমুল হয়ে উঠল, গর্ভ-ধারিণীর সম্পর্কে নানা বিচিত্র বিশেষণ প্রয়োগ হতে থাকল। শান্তিলতা মায়ের পক্ষ হয়ে লড়তে গেল তো মধুসূদন রামদা নিয়ে তাড়া করল—কেটেই ফেলবে তাকে। মা-বোন যতই হোক ন্যায়-ধর্মের চেয়ে আপন নয়। যায় যাক পরিবার-পরিজন, জমি-জিরেত, আওলাত-পশার—ধর্মটা বজায় থাকুক। মা তখন সোমত্ত মেয়ে শান্তিলতাকে নিয়ে ভাইয়ের বাড়ি চলে গেলেন। কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে নৌকোয় উঠলেন। জীবনে আর এমন ছেলের ভাত খাবেন না। পাড়া-পড়শি সকলের কাছে কেঁদে বলে গেলেন।

সাহেব গুম হয়ে শুনল। জুড়নপুরের ঘরের দাওয়ায় জামাই-ভোগ খেতে বসেছিল—তারই ক'টা দিন মাত্র আগে সেই ঘরেই সিঁধ কেটে গিয়েছে। মা-ঠাকরুন সর্বনাশের ঘটনা সব বললেন: বড়লোক কুটুম্ব গা-ভরা গয়নায় বউকে রাজরানী সাজিয়ে পাঠিয়েছে—তারা ভাববে, গরিব বাপ-ভাই গয়না বেচে খেয়েছে অভাবে পড়ে। শুনে কষ্ট হয়, বমাল ফেরত দিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু গয়না তো গলে টাকা হয়ে গেছে তখন। সে টাকাও সুকর্মে খরচ হল—বংশী ও অন্য পাঁচজনার কাজে। আজকে খানিকটা ঋণ শোধ করা যায়, কিন্তু মা-ঠাকরুনকে পাওয়া যাবে কোথা? এই এক মজা দেখা যায়, যার নাম মনে পড়ে সেজন নাগালের বাইরে। টাকা জলে ফেলে ভারমুক্ত হতে হবে হয়তো বা

শেষ পর্যন্ত।

আশালতার কিছু খবর নিলে কেষ্টদাস ?—বাড়ির সেই বড়মেয়েটা ?

কেষ্টদাস বলে, নবগ্রামে বরের ঘর করছে।

এটা অবশ্য জানা-ই। সোমত্ত বউ বাপের বাড়ি ফেলে রাখবে তো শঙ্করানন্দ সেন দ্বিতীয় পক্ষ করতে গেল কেন ?

কিন্তু তার বেশিও আছে। কেষ্টদাস ঘুরে ঘুরে নানাসূত্রে খবর জোগাড় করেছে। গয়না-চুরি নিয়ে কেলেঙ্কারি কাণ্ড। কাঁচা-বাড়িতে চুরি হয়ে যায়, সেজন্য জুড়নপুরে তারা আর বউ পাঠাবে না। গয়না খুলে রেখেও পাঠানো চলে না। কমপক্ষে সেরখানেক সোনা গায়ে পরে বেড়াবে, নইলে আর সেন-বাড়ির বউ কিসের! অর্থাৎ মা-ঠাকরুন সাহেবকে যা বলেছিলেন, বর্ণে বর্ণে তাই তাই খেটেছে। সন্দেহ করেছে গরিব কুটুম্বদের।

কেষ্টদাস বলে, দালানকোঠা যদি সেখানে হয়, তবেই নাকি বউ জুড়নপুরে পাঠাবে। সে আর হয়েছে! কাঁচা ভিটেয় চাল ক'খানা ক'দিন খাড়া থাকে, তাই দেখ। বুঝলে সাহেব-দা, বাড়ির লক্ষ্মী হলেন গিন্নিমা। ক'মাস তো গেছেন, এরই মধ্যে সব যেন উড়েপুড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে। গাঁয়ের লোকে এই কথা বলতে লাগল। নিজের চোখেও দেখলাম। লক্ষীমন্ত গেরস্থালি দেখে এসেছি, আজকে হতচ্ছাড়া চেহারা।

খুঁজিয়ালের এ হেন খবরে কারিগরের তো হাত-পা ছেড়ে বসে পড়বার কথা। সাহেবের উল্টে রোখ চড়ে যায়ঃ মধু-বেটার ফের ঘর কাটব। চল কেষ্টদাস, তুই আর আমি, বেশি লোকের গরজ নেই।

বংশী কাজের মধ্যে নেই, কিন্তু কৌতূহল আছে—পরামর্শের মধ্যে বসে বসে শোনে। সে বলে উঠল, ঘর কেটে কষ্ট করতে যাব কেন ? তোমার কাজ তো জানলা দিয়েও হবে।

মিটিমিটি হেসে কথাটা বিশদ করে দেয়ঃ দয়ার মানুষ তুমি—দুঃখকষ্ট দেখে উল্টে মক্কেলকেই তো দিয়ে আসবে। সে কাজ জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দিলেও তো হতে পারবে। তা মন্দ হবে না—মাকে দেবার জন্য ছোঁকছোঁক করছিলে, মায়ের বদলে ছেলেয় পাবে।

দয়ার মানুষ না আরো কিছু! কী শত্রুতা তোমার সঙ্গে বংশী, বদনাম কেন রটাচ্ছ শুনি ?

বলেই ধবক করে সাহেবের মনে পড়ে যায়, রটনা নয়—মা-ঠাকরুনের মুখে দুঃখের কথা শুনে এসে বংশীকে সে নিজেই বলেছিল সে-বাড়ি কিছু দিয়ে আসা যায় কিনা ? সেই ছেঁদো কথা হতভাগা বংশী মনে গেঁথে রেখেছে।

চটেমটে উঠে সাহেব বলে, মাকে বাড়ি থেকে দূর করে দেয়, ছোটবোনকে কাটতে যায়—সিঁধ কেটে ঘরে ঢুকে নচ্ছার মানুষটার কান দুটো আমি কেটে আনব।

বংশী এবার উচ্চহাসি হেসে উঠল : তা পারো তুমি, কান কাটারই সম্বন্ধ সে মানুষের সঙ্গে।

কেষ্টদাস বলে, কি রকম—কি রকম ?

বংশী বলে, তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ, ঠিক তাই। শালা-ভগ্নিপতি। তোমার আমি কান মলতে পারি—কান কেটে নিলেও সম্পর্কে বাধে না। সাহেবে আর মধুবাবুতেও তাই। বোনাই হয়ে শুনেছিল যে বোনের খাটে। একটা রাতের হলেও সম্পর্ক কিছু থেকে যায় বইকি !

সাহেবকে বলে, কান কোন্ কায়দায় কাটবে ভেবেছ কিছু সাহেব-ভাই ? বোনের বেলা তো বর হয়েছিলে। সিঁধ কেটে এবারে তুমি বউ সেজে মধুর কোলের মধ্যে শুয়ে পড়বে। আদর-সোহাগ করতে করতে অজান্তে দেবে কানে পোঁচ বসিয়ে।

কেষ্টদাস হি-হি করে হাসে। সাহেব বলে, হাসিস কেন রে ? পুরুষের কান কাটার চেয়ে মেয়েমানুষের গা থেকে গয়না খোলা অনেক বেশি শক্ত। তা-ই পেরে এসেছি। গাঙে চান করতে করতে কামটে পা কেটে নেয়। মানুষটা ডাঙায় উঠে খোঁজে, পা কোথায় গেল আর একটা ? কামটের যেমন দাঁত, আমার তেমনি হল হাত। সকালবেলা উঠে মধু হাত বুলিয়ে দেখবে, কান কোথা গেল আমার ?

পরের দিন গাবতলির হাট। হাটুরে মানুষ হয়ে সাহেব আর কেষ্টদাস শেয়ারের নৌকোয় উঠে পড়ল। গাবতলি নেমে সেখান থেকে হাঁটনা।

বিড়ি-দেশলাই কিনতে কেষ্টদাস হাটের ভিতর গেছে, ভিড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে সাহেব অপেক্ষা করছে। এমনি সময় এক কাণ্ড।

অন্ধ নাচার বাবা, একটা আধেলা দিয়ে যাও, ভগবান ভাল করবেন, দাও বাবা আধেলা—গাছতলায় এক ভিখারির একটা আর্তনাদ। কানে তালা ধরিয়ে দেয়, শান্তিতে একটু দাঁড়ানোর জো নেই। সাহেব চলে যায় সেখানে।

আধেলা কেন, গোটা পয়সা দেবো। কোন্ পা-খানা খুঁড়িয়ে হাঁটি, সেইটে যদি তুমি বলতে পারো।

একদম দেখতে পাইনে বাবা—

পুরো আনি যদি দিই ?

এত বড় লোভনীয় প্রস্তাবে যখন দৃষ্টি খোলে না, লোকটা অন্ধ সত্যিই। এই সব গাঁ-গ্রামের লোক শহরের ফেরেব্বাজি তেমন বোঝে না। মুঠো ভরে সাহেব পয়সা নয়, আনিও নয়—নোট দিয়ে দিল তার হাতে।

গামছায় জড়িয়ে নিয়ে চলে যা।

অন্ধ বলে, কী দিলে বাবা ?

সাহেব গর্জন করে উঠল : পালা বলছি এখান থেকে। আর কোনদিন দেখি তো গলা কেটে দু-খণ্ড করব। খুনে ডাকাত আমি।

ভয়ে ভয়ে লোকটা উঠে পড়ল। আজেবাজে কাগজ ভেবেছে। নিয়ে গিয়ে অন্য কাউকে দেখাবে। ধোঁকা দিয়ে সেই লোক গাপ করতে পারে। করে করবে—অন্ধটাই বা কী এখন আপন লোক? আপন লোক অভাবে জলে ফেলে দিলেও ক্ষতি ছিল না। —ধরে নেওয়া যাক তাই।

বিড়ি কিনে কেষ্টদাস ফিরল। ট্যাকের বোঝা হালকা হয়ে সাহেব এখন লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে।

কেষ্টদাস বলে, জুড়নপুর ওদিকে তো নয়—

সাহেব বলে, ভেবে দেখলাম মধু যা মানুষ, কান কাটলে তার আরও গরব বাড়বে। হাটের মানুষ মেরে কপাল ফাটিয়ে দিল, সেই কপালের ফুটো দেখিয়ে বলে জয়পতাকা। কান কাটলে কাটা-কান গলায় ঝুলিয়ে হয়তো বলবে মেডেল। কাজ নেই, নবগ্রামের সেন-বাড়ি যাওয়া যাক। ভদ্রলোক তারা, ভাল মুনাফা হবে।

কেষ্টদাস থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েঃ সেখানে তো যাইনি সাহেব-দা। যেতে বলোনি। শোনা আছে, মস্ত বাড়ি, কাজ বড্ড শক্ত।

সাহেব বলে, সেকালে রাজরাজড়ারা দুর্গ বানাত, সেই কায়দায় বাড়ি। যাইনি আমিও। ক্ষুদিরাম ভটচাজ জানে না হেন জায়গা নেই। তার কাছে শুনেছিলাম একদিন। মস্ত বাড়িতেই তো কাজের জুত—মক্কেলের ডর থাকে না, বেহুঁশ হয়ে ঘুমোয়।

সাহেবের কণ্ঠে সহসা যেন আগুন ধরে যায়ঃ শঙ্করানন্দ সেনের ঘরে ঢুকে দেখিয়ে আসব, গয়না পরিয়ে বউ পাকা-দালানে নিজের পাশে রাখলেও সে গয়না থাকে না। গরিব কুটুম্বদের চোর অপবাদ দিয়েছে, সে পাপের ভোগান্তি হওয়া চাই।

কেষ্টদাসের দিকে চেয়ে বলে, বড় বাড়ি বলে ভয় করে তো ফিরে যা তুই। কাজ আমি একলাও পারি।

এক একখানা কাজ নামানো সহজ নয়। পিছনে অনেক দিনের খাটনি, বিস্তর সাধনা। নিপাট ভালমানুষ হয়ে ঘোরাঘুরি করছে—চোখজোড়া আর কানজোড়া কিন্তু উঁচানো—একগণ্ডা সুঁচাল তীরের মতো। রাতের পর রাত মক্কেলের আনাচে-কানাচে। চোর দেখছে সকলকে, টের পাচ্ছে সকলের কথা—তার কথা কেউ জানতে পারে না। চোরও তাই অন্তর্যামী—অন্তরীক্ষবাসী অলক্ষ্য দেবতার সঙ্গে তফাত বড় বেশি নেই।

বুড়ো বয়সে অথর্ব হয়ে পড়ে সাহেব-চোর এই বয়সকালের কথা ভাবত। রোজগারের মন কোন কালেই নয়—যেন এক রকমের খেলা। প্রেতলোকের দিন নাকি গোটা কৃষ্ণপক্ষটা, রাত্রি শুক্লপক্ষ। দেবলোকের দিন শীতের ছয়মাস, বাকি ছয়মাস রাত্রি। সাহেবের দিনরাত্রিও তেমনি উল্টোপাল্টা। অন্য মানুষের যখন রাত্রি, তার সেই সময়টা দিনমান। কাজ বলো, আর খেলাই বলো সাহেব

তখন বেরিয়ে পড়েছে। আর বেরিয়েছে পেঁচা, বাদুড়, চামচিকে, সাপ, বাঘ। এবং অনুমান করা যায় ভূত-প্রেতরাও। আকাশে আলো ফুটে যেইমাত্র মানুষজন আড়মোড়া ভাঙছে, তাড়াতাড়ি আবার কোটরে ঢুকে যায়। সন্ধ্যার আগে আর উদ্দেশ নেই।

নবগ্রামে এত আক্রোশভরে গিয়ে সেদিন যা হল, সে এক খেলাই। সাবেকি অট্টালিকা সেনদের। জানলা নেই—আলো আসবার জন্য ছাতের কাছাকাছি ঘুলঘুলি এক একটা। যত বেঁটে মানুষই হও, সাধ্য কি দরজা দিয়ে খাড়া হয়ে ঢুকবে—ঘাড় নোয়াতেই হবে। কবাটের তক্তা বিঘতখানেক পুরু, গায়ে গায়ে গুলপেরেক বসানো। কুড়াল মারলেও কোপ বসবে না, কুড়াল ফিরে আসবে। ডাকাতের ভয়ে সেকালের বড়লোকেরা এমনি ঘরবাড়ি বানাত। বাড়িটা যখন অটুট অভগ্ন ছিল—ডাকাত কি, একটা ইঁদুর-আরশুলা অবধি ঢুকতে পারত না।

এখন আর চকমিলানো আঁটোসাটো বাড়ি নয়। বাইরের দেয়াল কতক আপনি ভেঙে পড়েছে, কতক বা শরিকেরা নিজ নিজ সুবিধা মতন ভেঙে বাড়ির মুখ এদিক-সেদিক বের করে নিয়েছে। একটা বাড়ি ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গোটা দশেকে দাঁড়িয়েছে।

গোড়ার কয়েকটা দিন খোঁজদারিতে গেল। কেষ্টদাসের গানের গলা এখানেও খুব কাজ দিয়েছে। বাইরের উঠানে বোধনপিঁড়িতে বসে বিনা ভূমিকায় সে রামপ্রসাদী গান ধরল একটা। একটু পরে দাসী গোছের একজন এসে ডাকে: বাড়ির ভিতর এসো বাছা, মায়েরা সব শুনতে চাচ্ছেন। প্রত্যাশাও ঠিক এই। সেনবাড়ির অন্তঃপুরের সবগুলো স্ত্রীলোকই বোধহয় কেষ্টদাসের চতুর্দিকে। আশালতার বর্ণনা দিয়েছে সাহেব, কোন্‌জন আশালতা বুঝতে আটকায় না। কপালক্রমে আশালতার শোবার ঘরটা চোখের সামনেই—খোলা দরজায় ভিতর দেখা যাচ্ছে। কোন্ পাশে খাট, কোথায় বাক্স, পেঁটরা, কোন্ দিকটা একেবারে খালি। একখানা কালীকীর্তনেই এতদূর এগিয়ে দিল। মায়ের দয়া বিনে এমন হয় না, বন্দোবস্ত মা-ই সব করে দিলেন।

সেনবাড়ির দেয়ালে কাটির ঘা বোধকরি এই প্রথম। বাইটামশায় হাতে তুলে দিয়েছে, সেই পবিত্র সিঁধকাঠি। কাঠির গুণে এবং মা-কালীর দয়ায় পুরানো ইট ধুলোর মতন গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে পড়েছে। মাখনে গড়া এক পাহাড় —তার ভিতরে সুড়ঙ্গ কেটে চলেছে যেন। পাহাড়ই সত্যি—সারা রাত্রি কেটে কেটেও বুঝি দেয়ালের অন্ত মিলবে না। মালিনীর ঘর থেকে সুড়ঙ্গ কেটে সুন্দর বিদ্যার ঘরে গেল—তেমনি দীর্ঘ সিঁধ। তবে বসবার জায়গাটা বড় পছন্দসই, দেয়ালের গা অবধি ভাঁটকালকাসুন্দের নিবিড় জঙ্গল। সারা রাত্রি কেন, সারা বছর ধরে কেটে গেলেও কেউ উঁকি দিয়ে দেখবে না। কেটে যাচ্ছে সাহেব। কেষ্টদাস দু-হাতে ইটের গুঁড়ো সরিয়ে সরিয়ে স্তূপাকার করছে।

ভিতরের মানুষের হালচাল না বুঝে সিঁধের মুখ খুলবে না—মুরুব্বি-মশায়রা বলেন। সে মুরুব্বি সেনবাড়ি দেখেন নি। জানলা-দরজার বিচিত্র বন্দোবস্তে কারিগর এখানে অসহায়। নিশ্ছিদ্র ঘরের ভিতরে কামানের লড়াই হতে থাকলেও বাইরে মালুম হবে না। মরীয়া হয়ে সাহেব ওধারে একটু ফোকর বের করে গর্তে মাথা ঢুকিয়ে নিঃসাড় হয়ে রইল।

আছে তো আছে-ই। কী এত শুনছে কে জানে, নড়াচড়া নেই—হার্টফেল করে মানুষ হঠাৎ মারা পড়ে, তেমনি কোন ব্যাপার নয় তো? অবশেষে অনেকক্ষণ পরে মাথা বের করল। কেষ্টদাসকে বলে, ডবকা বউ আর বুড়ো বরে বহুৎ-আচ্ছা জমিয়েছে। ঝগড়াঝাটি এবারে।

কত গণ্ডা জোঁক গায়ে লেগেছে দিনমানে বোঝা যাবে। অন্ধকারে সাহেবের মুখ দেখা যায় না—কিন্তু কণ্ঠস্বরে বিরক্তি নেই, স্ফূর্তির ভাব। স্বামী-স্ত্রী দু-জনে নিশিরাত্রি অবধি না ঘুমিয়ে বকবক করে কাজের ভণ্ডুল ঘটিয়ে সাহেবকে যেন কৃত-কৃতার্থ করেছে।

আবার অনেকক্ষণ পরে—ঘড়ির ঘণ্টা-মিনিট ধরে কে বলবে—কিন্তু সে অনেকক্ষণ। কান পেতে আবার একটু শুনে কাঠির দুটো-একটা ঘায়ে সিঁধ শেষ করে সাহেব ঘরে ঢুকে গেল। ডেপুটি কেষ্টদাস ছুটে গিয়ে দরজার সামনে তৈরি হয়ে দাঁড়ায়। দরজা খুলে কারিগরে মাল পাচার করবে এইবার, মাল নিয়ে সে সরে পড়বে।

কোথায়! সিঁধের পথেই সাহেব তক্ষুনি বেরিয়ে এলো। কেষ্টদাসের হাত ধরে টেনে বলে, চল্। আজ হবে না, জেগে রয়েছে।

আজকে ফিরে যাচ্ছি, কাল এসে আবার হবে—তেমন ব্যাপার এসব কাজে হয় না। যাওয়া তো একেবারে চুকিয়ে বুকিয়ে চলে যাওয়া। জাগ্রত মানুষের ঘরে ঢুকে বেকুব হয়ে বেরিয়ে আসা—এমন কাঁচা-ভুল শিক্ষানবিশ চোরে তো করবে না!

কেষ্টদাস ধমকের সুরে বলে, কী ঘোড়ার ডিম তবে অতক্ষণ ধরে শুনলে?

সাহেব হি-হি করে হাসে। আসল কথা খুলে বলা যায় না। কী করবে—ঠিক কাজের সময়টা খেলায় পেয়ে বসল যে হঠাৎ! ঘরে দুটো মানুষ—আশালতা আর শঙ্করানন্দ। দু-জনেই ঘুমিয়ে। তার আগে বেশ একচোট বচসা হয়েছে। ওটা কিছু নয়—প্রণয়ের বাড়াবাড়ি অবস্থায় হয় এমনি। আখ পিষলে তবেই মিষ্টি রস বের হয়। নিজের ঘর না-ই হল, পরের ঘরে ঘুরে ঘুরে সাহেব শিখেছে—সংসারী দশজনার চেয়ে বেশি শিক্ষা তার। বচসা করে আশালতা খাট ছেড়ে মেজের উপর আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। পুরুষের শাস্তি এর উপর আর হয় না। অভাগা শঙ্করানন্দ অনেকক্ষণ খাটের বিছানায় আইঢাই করেছে, ফোঁসফোঁস করে নিশ্বাসও ছুঁড়েছে যুবতী বউকে তাক করে। বড় কঠিন মেয়ে, কিছুতে ঘায়েল হল না উল্টে সে ঘুমিয়ে পড়ল। রণে পরাস্ত শঙ্করানন্দ কি

করবে—প্রুরুষমানুষ হয়ে মেজেয় নেমে পড়ে কেমন করে? সে যেন একেবারে দন্তে তৃণ ধারণ করার ব্যাপার দাঁড়িয়ে যায়। অগত্যা সে-ও ঘুমাল। সত্যি সত্যি ঘুমিয়েছে—ভালরকম বুঝে নিয়ে তবে সাহেব ঘরে ঢুকল।

রোখে রোখে ঢুকে পড়েছিল। জুড়নপুরে তোমাদের বউয়ের গয়না চোরই নিয়ে নিয়েছে, দুর্গের মতো শক্ত ইমারতেও সে চোর ঠেকানো যায় না। হাতে-নাতে দেখিয়ে যাবে সেই জেদ নিয়ে এসেছিল সাহেব। অলক্ষ্যের মা-চামুণ্ডাও যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলেন—স্বামীর পাশ ছেড়ে আশালতা শুয়েছে এসে ঠিক সিঁধের গায়ে। ঘুমের মধ্যে একখানা হাত এসে পড়ে গর্তের কিনারায়! হাত নয় গো, স্বর্ণলতা—হাত বেড় দিয়ে থোপায় থোপায় স্বর্ণফুল ফুটে আছে। চুড়ির গোছা ঝিনঝিন বাজে নড়াচড়ায়, আঙুলের হীরার আংটি অন্ধকারে ঝিকমিক করে। বাঁক, মানতাসা, কঙ্কণ—কত কি গয়না! ডাল থেকে ফুল তোলার মতন নিয়ে নিলেই হল। ঘরে না ঢুকে সিঁধের গর্ত থেকে হাত বাড়ালেও নাগাল পাওয়া যায়।

আরও আছে। ঘুমের ঘোরে আলুথালু আশালতা। সাহেবের চোখ অন্ধকারেও জ্বলে, হঠাৎ বুঝি নিশ্বাসে তার আগুন ধরে গেল। রানীর সেই যে হাত চেপে ধরেছিল, সেদিনের মতোই বিদ্যুৎ-শিহরণ। দেহপণ্যা রানী দেবতা বলে তার মুখে চাবুক কষিয়েছিল। ভয় পেয়ে আজকে নিজে থেকেই সাহেব শামুকের মতন সিঁধের ভিতরে ঢুকে পড়ল। ক্ষণকাল চুপ থেকে মিউমিউ করে বিড়াল-ডাক ডাকে সেখান থেকে। ফলটা কি রকম দাঁড়াল—মুখ একটুখানি উঁচু করে তুলে পিটপিট করে দেখে নেয়। সুড়ুৎ করে পুনশ্চ ঢুকে পড়ে গর্তে। খেলায় পেয়ে বসেছে।

বিড়ালে বড় ভয় আশালতার, বিড়াল দেখলেই সে তিড়িং করে ছিটকে পড়ে। জুড়নপুরে সাহেব দেখে এসেছিল। আবার এই ক'দিনের খোঁজদারিতে দেখল। যা ভেবেছে, ঠিক তাই। ঘরে যেন বাঘ ঢুকেছে—ধড়মড়িয়ে উঠে অস্ফুট আর্তনাদ করে কাঁপতে কাঁপতে আশালতা খাটের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুখ গুঁজল বরের বুকে। কলহ, কান্না এবং অতঃপর আলাপ বন্ধ ও শয্যাত্যাগ—পর্বগুলো একের পর এক এগিয়ে চলেছে সন্ধ্যারাত্রি থেকে। আর বাইরে ততক্ষণ অন্য দুটো প্রাণীর যাবতীয় দেহরক্ত জোঁকে ও মশায় শুষে খাচ্ছে। বার কতক বিড়াল ডাক ডেকে মন্ত্রের কাজ হল—পলকে মানভঙ্গ ও সন্ধিস্থাপনা। যুবতীকে বুকের মধ্যে পেয়েছে শঙ্করানন্দ। জুটি হয়ে ঘুমাক এখন, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখুক। সাহেব-চোরের কাজ পণ্ড, কিন্তু মজা হল বিস্তর। হাসি-হাসি মুখ করে সে সিঁধ থেকে বাইরে বেরুল।

কেষ্টদাস ক্লান্তপায়ে পিছন পিছন ফিরেছে। মনের দুঃখ সামলাতে পারে না। বলে উঠল, মানুষই যখন জেগে, কি জন্যে তুমি পুরো ফুটো কাটতে গেলে? ঘরে ঢুকতে গেলেই বা কেন?

বলা যাবে না কাউকে লজ্জার কথা। সাহেব এড়িয়ে যায়ঃ গাছের সবগুলো ফল কি পাকে, দু-পাঁচটা ঝরে যায়। মন খারাপ করিসনে, চল্। আবার একদিন পুষিয়ে দেবো।

এমনি খেলা কতবার হয়েছে! অন্যের কাছে বলার কথা নয়। বুড়ো হয়ে ইদানীং গল্প করে, তাই লোকে জানতে পারছে। যে-বাড়ি কাজ হয়ে গেল, অন্য কারিগরে ভুলেও সে পথ মাড়ায় না। সাহেবের ভিন্ন রীতি। একবার দু'বার যাবেই সে মক্কেলের বাড়ি। কত যত্নে কাজ নামানো ফলাফলটা নিজ কানে না শুনে সুখ নেই। অন্যদের টাকাপয়সা হলেই হল, সাহেব জানতে চায় কাজের কারিগরি নিয়ে কি বলছে লোকে।

এক বাড়ি অমনি দাঁড়িয়ে শুনছে। পড়শিরা সব জুটেছে। মক্কেল দশাসই জোয়ান। তিন-চার দিন কেটে গেছে—বামালের শোক সামলে নিয়ে মানুষটা এখন বীরত্বের কথা বলছেঃ জিনিস একটাও কি থাকত? ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ঘুসি খেয়ে মাজা বাঁকাতে বাঁকাতে চোর পালাল।

একতরফা বকে যাচ্ছে, অসম্ভব মুখ বুঁজে থাকা। সাহেব বলে ওঠে, আঁ-আঁ করে তো তক্তপোশের তলায় ঢুকে গেলে। ঘুসি কি সেখান থেকে?

বলেই দৌড় বনজঙ্গল ভেঙে। লোকে তাড়া করল। যে শুনবে সে-ই তো টিটকারি দেবে সাহেবকে, বোকা বলবে। কিন্তু ঘুসি খেয়ে পালিয়ে এসেছে—সে-ই বা এমন অপবাদ কি করে সহ্য করে।

আর একবার।

বউটা সমবয়সী এক মেয়ের কাছে কেঁদে কেঁদে বলছিল—সাহেব কান পেতে শুনেছে। বলে, ধানশীষ-হারছড়া চোরে নিয়ে গেল। আমার মা দিয়েছিল। মা মারা গেছে, আর কোনদিন কেউ আদর করে দেবে না। নতুন উঠেছে ঐ জিনিস, খুলনা থেকে একজনেরা গড়িয়ে আনল। বলল, তোর গলায় আরও ভাল মানাবে। ভাঙাচুরো গুঁড়োগাড়া যা-কিছু সোনা ছিল, স্যাকরা ডেকে দিয়ে দিল। বানির টাকা কী কষ্টে যে শোধ করেছিল মা—

বউয়ের কণ্ঠরুদ্ধ হয়। আর বাইরে সাহেবের অনেক বেশি—দুচোখে ধারা গড়াচ্ছে। মা কোনদিন ছিল না তার—ইচ্ছে করে হাত বাড়িয়ে কোন জিনিস কেউ তাকে দেয় নি। তার পৃথিবী অন্য সকলের থেকে আলাদা। ধানশীষ-হার তখন থলেদারেরর হাতে গিয়ে পড়েছে। সহজে ফেরত দেবার মানুষ কি সে-জন—সাহেব কেবল তার পা দুটোই ধরে নি। উদ্ধার করে তারপর আবার বিস্তর পথ হেঁটে বউয়ের ঘরে হারছড়া ছুঁড়ে দিল। ছেলেবেলা রাণীর মাকড়ি ছুঁড়ে দিয়েছিল—এ বয়সেও সেই ছেলেমানুষী দেখলে লোকে হেসে খুন হবে। কাউকে তাই বলতে পারেনি। এখন বলে।

বাহাদ্বরির কাজও কি নেই, দশের কাছে যা জাঁক করে বলা যায় ? লোকের মুখে মুখে সত্যি মিথ্যে ভালো মন্দ অনেক জিনিস তার নামে চলেছে। সাহেব চোরের নামে লোকে তটস্থ, ছড়া বেঁধেছে কত তার নামে ! সেই কুমির চোর ধরার সময়টা কী হাততালি দিল কতক ! চোর হয়ে সাহেব পুলিসের কাজ করে দিল। তা-বড়-তা-বড় পুলিস থ হয়ে গিয়েছিল, এ হেন তাজ্জব কাণ্ড কী করে মাথায় ঢোকে লোকটার ! এখন সবাই ভুলে গেছে। মানুষের নিয়ম হল, মন্দটাই মনে রাখে, ভাল জিনিস চট করে ভুলে যায়।

ভাঁটিঅঞ্চলের এক গাঙের বাঁকে মা-গঙ্গার আবির্ভাব হয়। চিরকাল ধরে হয়ে আসছে। উৎকট নোনাজল সেই ক'টা দিন গঙ্গাজলের মহিমা লাভ করে। আসল যে পতিতপাবনী, তিনি অনেক দূরের। বাদার মানুষ সেখান কেমন করে যায়—নিয়ে যাবে কে, টাকাপয়সাও বা কোথা ? দয়াময়ী সেজন্য নিজে চলে আসেন পতিত তরাতে। বছরের মধ্যে দশটা দিন—ভাদ্রের শুক্লা একাদশী থেকে পূর্ণিমা, ফাল্গুনেরও তাই। এই দিনগুলোয় জায়গাটা মহাতীর্থ হয়ে যায়, গঙ্গাস্নানের জন্য অঞ্চল ভেঙে মানুষ আসে। প্রকাণ্ড মেলা বসে যায় নদীর কিনারে।

ভাদ্রের ভরা গাঙে অত্যধিক ভিড়ে খেয়া ডুবল একবার। মানুষ এখানে জলচরও বটে, পেট থেকে পড়ে শিশু হাঁটতে শেখার সঙ্গে সঙ্গে, সাঁতারও শেখে। কিন্তু হলে হবে কি—হাঙর-কুমির পোকার মতন জল ছেয়ে আছে, তাদের মচ্ছব লেগে গেল। অনেক মরল। মেলা শেষ হবার পরেও অনেক দিন ধরে জেলের জালে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ওঠে। সরকার থেকে হাটে হাটে কাড়া দিল : হাঙর-কুমির মারলে পুরস্কার। পুরস্কার পাচ্ছেও অনেক।

ফকিরচাঁদ জেলে জালের ওস্তাদ। জলেই স্ফূর্তি, শক্ত ডাঙার মাটিতে চলেফিরে বেড়ানোয় বরঞ্চ অসুবিধা লাগে তার। কুচো-চিংড়ির কারবার—খটি আছে, চিংড়ি শুকিয়ে সেখানে বস্তাবন্দি হয়। হাঙর দুটো-একটা বরাবরই ফকিরচাঁদ নিজের প্রয়োজনে সেরে আসছে। চিংড়ি ধরবার বড় কায়দা—সরু খালের মুখ পাটা দিয়ে দেয় ; মাছ বেরুতে না পারে। হাঙর পচিয়ে ফেলে দেয় জলে, হাঙরের প্রকাণ্ড মুখটা হাঁ করিয়ে রাখে। পচা মাংসের গন্ধে চিংড়ি সেই মুখের মধ্যে ঢুকে পড়ে। গাদা হয়ে যায়। ছাঁকনি দিয়ে সব চিংড়ি তুলে নিল তো আবার এসে জমে। দিনরাত্রি বারম্বার এই রকম তুলছে। খালের যেখানে যত চিংড়ি, আলোয় পোকা পড়ার মতন চলে আসে। চিংড়ি ধরার কাজেও তাই হাঙরের গরজ।

তার উপরে সরকারি পুরস্কারের খাতির-সম্মান ও টাকা। চিংড়ির কাজ আপাতত মুলতুবি রেখে ফকিরচাঁদ হাঙর মারতে লেগে গেল। মেরেছেও পর পর কতকগুলো—সরকারি মহলে নাম হয়ে গেল ফকিরচাঁদের, উৎসাহ-বর্ধনের জন্য তাকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হল একটা। ইতিমধ্যে ফকিরচাঁদ আবিষ্কার

করে ফেলল, পুরস্কারের টাকার চেয়েও অনেক মূল্যবৃদ্ধি ঘটে গেছে হাঙরের। মরা হাঙরের পেটে যেন শক্ত শক্ত কী জিনিস—কৌতূহলে পেট চিরে গয়না পেয়ে গেল। মেলার স্ত্রীলোক চোয়ালে কেটে গিলেছে—হাড়মাস হজম হয়ে গয়না জমে রয়েছে পেটে।

সোনারূপোর এই আজব ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়ে গেল। তারপর থেকে ফকিরচাঁদ পাগল হয়ে হাঙর মেরে বেড়ায়। গয়নার লোভে। শেষটা আর গয়না মেলে না। মেলা ফুরিয়ে গেছে, গয়না-পরা রমণী হাঙরে আর পাবে কোথা ? হাঙরই অমিল—ফকিরচাঁদ পায় না, অন্যেরাও নয়। হয় মরে নিঃশেষ হয়েছে অথবা অন্য যেখানে মেলা চলছে সেইখানে চলে গেছে ভালো খাদ্যের লোভে।

শেষেরটাই ঠিক। ফাল্গুনের মেলা জমলে আবার হাঙরের উৎপাত। সময় বুঝে চলে এসেছে। পর পর কয়েকটা নিয়ে গেল। তখন আর দূরের দিকে মানুষ যায় না, ঘাটে দাঁড়িয়ে মাথায় খানিকটা জল থাবড়ে দিয়ে গঙ্গাস্নানের কাজ সংক্ষেপে সেরে নেয়। তাতেও রেহাই হয় না, ঘাটে এসেই সকলের মধ্য থেকে টুক্ করে একটাকে জলতলে ডুবিয়ে নেয়। এবারের হাঙর বিষম চতুর। বড় দুঃসাহসী !

সাহেব এসে পড়েছে মেলাক্ষেত্রে। মেলায় কিছু কাজ নামিয়ে যাবে, এই অভিপ্রায়। দেশদেশান্তরের বিস্তর নৌকো ঘাটে বেঁধে আছে, সেইসব নৌকোয় কাজ হতে পারবে।

এসে দেখে হাঙরের কাণ্ড। অতিশয় চতুর হাঙর, আবার রুচিবানও বটে। শুধুমাত্র স্ত্রীলোক নিয়েছে, পুরুষের গায়ে আঁচড়টি পড়ে নি। স্ত্রীলোকের মধ্যেও আবার বেওয়া-বিধবার কাছ ঘেঁসে না—গয়নাগাটি পরে ঝলমল করে যেসব মেয়ে-বউ। দশ বাঁক বিশ বাক পরে ভাসন্ত দু-একটা শবদেহ পাওয়া গেল—সর্ব অঙ্গ ঠিকঠাক আছে, গায়ের গয়নাই কেবল নেই।

সাহেবও স্ত্রীলোক হল। আহা, কী রূপসী বউটা গো ! খরচপত্র মন্দ হল না, কিন্তু উপায় কি, সত্যিকারের মেয়েমানুষ নয়—সোহাগ করে কে তাকে শাড়ি-গয়না দেবে ? পিতলের কানঝাপটা একজোড়া কিনল মেলার দোকান থেকে। জবর গয়না—কান দুটোর পুরো আয়তন ঢেকে গেছে। ভারী ভারী দুই কঙ্কণ দু-হাতে ঝিকমিক করছে। শাড়ির নিচে আরও কত কি আছে, দেখা যাচ্ছে না। বাইরের একখানা দুখানার এই নমুনা।

গাঁ-ঘরের নির্বোধ বউমানুষ—সাঁতার কাটতে কাটতে দূরের গাঙে গিয়ে পড়ে। কতজনে মানা করল—বউটা কালা, না কি গো ? শুনতেই পায় না কোন-কিছু। জল কেটে চলেছে। এবং যে ভয় করা গিয়েছিল—হাঙর ঠিক ধরে ফেলেছে। বউও জাপটে ধরেছে হাঙর। হুটোপুটি, কেউ কাউকে ছাড়ে না—জলের তলে ভুড়ভুড়ি কাটছে হাঙরে আর বউয়ে। মেলার যত মানুষ নদীর

ধারে এসে জমেছে। অনেক লড়ালড়ির পর বউ অবশেষে জলের উপর ভেসে উঠল। এবং হাঙরকেও ভাসিয়ে তবে ছাড়ল।

হাঙর সেই ফকিরচাঁদ জেলে—কী সাংঘাতিক ব্যাপার! মেলার ঘাটে নৌকোর ভিড়—ফকিরচাঁদ দূর থেকে ডুব-সাঁতার দিয়ে কোন একটা নৌকোর নিচে আশ্রয় নিত, তীক্ষ্ন নজর ফেলত চতুর্দিকে। মক্কেল একটি তাক করে দিয়ে দিত আবার ডুব—আচমকা টানে মানুষকে কায়দা করে জলের নিচে দিয়ে সাঁ-সাঁ করে ছুটত। কুমিরও ঠিক এই প্রণালীতে শিকার ধরে। ফকির জেলে জলতলে দম বন্ধ করে বিস্তর সময় থাকতে পারে, অন্য মানুষের ততক্ষণে দু-বার তিনবার মরা হয়ে যায়। নিরিবিলি নিরাপদ জায়গায় উঠে গয়না খুলে নিয়ে মক্কেলটাকে তারপর জলে ফেলে দেয় আম খেয়ে আঁটি ছুঁড়ে ফেলার মতন।

মেলার মানুষ পরমোৎসাহে ফকিরচাঁদকে নিয়ে পড়েছে। মানুষটা ছিল অতি নিরীহ, কুচো-চিংড়ি ধরত খালে খালে, পাঁচ বছুরে ছেলেটার সঙ্গেও আজ্ঞে-আপনি করে কথা বলত। লোভ বেড়ে গেল হাঙর মারতে গিয়ে। কুচো-চিংড়ি থেকে হাঙর, হাঙর থেকে মেয়েমানুষ। হাঙরের পেটে যখন গয়না মেলে না কি করবে—নিজেকেই তখন হাঙর হতে হল।

ঝাঁকাঝাঁকি চলছে ফকিরচাঁদকে নিয়ে, জনতা পেটের কথা আদায় করছে। সাহেব ফাঁক বুঝে সরে পড়েছে। হাতের ও মুখের বেগ সম্পূর্ণ মিটে যাবার পর জনতার হুঁশ হল: প্রাণ তুচ্ছ করে এত বড় কাজ করলেন, ছদ্মবেশধারী সেই সজ্জন মানুষটিকে দেখা যাচ্ছে না তো? গেলেন কোথা তিনি? মেরামতের জন্য ডিঙি একটা উপুড় করে রেখেছে খানিকটা দূরে, সাহেব-চোর সুড়ুৎ করে তার নিচে গিয়ে আরামে শুয়ে পড়েছে। আর তাকে কেউ পাবে না। দেবতারা নরহিতের জন্য কখনো দেহধারণ করেন, কাজ অন্তে বাতাসে মিশে যান। সাহেবও যেন তাই।

চব্বিশ

সাহেব-চোরের বুড়োবয়সের এই সব গল্প—বিশ্বাস যদি না করেন, নিরুপায়। সারা জন্ম কত মক্কেলের কত মাল পাচার করেছে!. আকাশের তারা, পাতালের বালির মতো সাহেবের মক্কেল গোনাগুণতিতে আসবে না। গল্প শুনতে শুনতে কৌতূহলী একজন প্রশ্ন করেছিল, এত মক্কেলের মধ্যে সকলের বড় কে সাহেব? কার ছিল সবচেয়ে দামি মাল?

সাহেব নিজের গায়ে থাবা মেরে দেখাল: আমি।

সকলের বড় মক্কেল সে নিজেই, যা কিছু তার ছিল নিজেই সে চুরি করেছে। আশ্চর্য দেহ-রূপ নিয়ে এসেছিল, সেই বস্তু অবধি। অন্য ব্যাপার সঠিক জানিনে, এই কথাটা সাহেব কিন্তু খাঁটি সত্যি বলেছে।

অক্ষম অথর্ব সে এখন। বিষ-হারানো ঢোঁড়া, লোকে বলে। মাঝে মাঝে

জিরিয়ে নেবার প্রয়োজনে বংশীর বাড়ি এসে পড়ে। বংশী মারা গেছে—বউ আছে, সে কখনো 'না' বলে না। সাহেবের উপর করুণা—মনে মনে একটা কৃতজ্ঞতার ভাবও ঘটে। সাহেব না হলে সেবারের দশধারায় নির্ঘাৎ বংশীর জেল। পাপচক্রের ফেরে একবার পড়লে জীবন থাকতে রেহাই মেলে না, ছেলে-বউ নাতিনাতনী নিয়ে এই জমজমাট সংসার কখনো হতে পারত না। সেই সব মনে রেখেছে বংশীর বউ। বাইরের চালাঘরখানায় ঢুকে পড়ে সাহেব নিজের বাড়ির মতন মাদুর বিছিয়ে নেয়। বংশীর বউ কলকেয় আগুন দিয়ে ফুঁ দিতে দিতে নিয়ে আসে।

বছর কয়েক পরে বংশীর বউও মারা গেল। সাহেব মরবে না, মরণে ভয়। বিধাতাপুরুষ যা পরমায়ু দিয়েছেন, তার থেকে সিকি বেলাও কমতি হতে দেবে না। হপ্তায় হপ্তায় থানায় গিয়ে এত্তেলা দিতে হয়—বৈশাখের রোদ, আষাঢ়ের বৃষ্টি কিম্বা মাঘের শীত বলে রেহাই নেই। যমালয়েও এমনি তো চিত্রগুপ্তের অফিসে হাজিরা দিতে হবে, ডাঙস মারবে, নরকে নিয়ে ঠাসবে। আরও কি কি করবে সঠিক জানা নেই। সরকারের জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসামি একদিন ফেরত আসে, তার কাছে জেলের ভিতরের ব্যাপার শোনা যায়, শুনে শুনে ভয় ভাঙে। নিজের যখন যাবার সময় আসে, জেনেবুঝে তৈরি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যমালয়ের সেই বড়-জেলখানা থেকে কোনদিন কেউ ফেরত এলো না, সেখানকার গতিক একেবারে জানা নেই। এখানে এই, সেখানকার না জানি আরও কোন ভয়াবহ ব্যাপার। কায়ক্লেশে অতএব যত দিন সম্ভব মরণে দেরি করিয়ে দেওয়া।

বংশীর ছেলেরা সব সমর্থ হয়েছে—তাদেরই এখন ছেলেমেয়ে। বংশীর বদনাম ছিল—ছেলেরা চায় না কোনরকম তার ছোঁয়া লেগে থাকে। ধুয়েমুছে সব সাফসাফাই করেছে—সেদিনের সম্পর্কে সাহেবও কেন আর চালাঘর জুড়ে থাকবে। রাত্রে বাড়ির উপর চৌকিদারের আনাগোনা ভাল কথা নয়। মা-বুড়ি বর্তমান থাকতে কিছু বলবার জো ছিল না, সাহেবকে যেন বাঘিনীর সন্তানের মতো আগলে থাকত। মায়ের উপরে কথা বলবে, এত সাহস কার? সে বাধা সরেছে এতদিনে।

বড়ছেলের পেটে কিছু বিদ্যে আছে, সে ভাল সদালাপী। বিনয়ীও বটে। চালাঘরে ঢুকে পড়ে যথোচিত ভক্তিশ্রদ্ধা দেখিয়ে বলে, আমাদের বাবা নেই, তুমি আছ খুড়োমশায়। পর্বতের আড়ালে রয়েছি। কিন্তু পোড়া লোকের চোখ টাটাচ্ছে, সেটা বুঝি আর চলতে দেয় না।

সাহেবের মুখ শুকাল। কানাঘুসো চলছিল, আজকে এইবারে স্পষ্টা-স্পষ্টি। মিনমিন করে বলে, কি হয়েছে, কে কি বলল বাবা?

বাইরে শুধু নয়, ঘরের লোকগুলোও কম! পরের মেয়েদের বউ করে ঘরে আনলে—তারা অবধি শতেক রকম শোনাচ্ছে। ভয় ঢুকে গেছে, এই আর কি!

পেটের মেয়েরা সেয়ানা হচ্ছে, বিয়েথাওয়া দিতে হবে, নানান জায়গা থেকে সম্বন্ধও আসছে—

শুধুমাত্র শেষ কথা ক'টিই যেন কানে ঢুকল। মুখের উপর হাসি টেনে এনে সাহেব উল্লাস প্রকাশ করেঃ শঙ্করী-পটলির সম্বন্ধ আসছে? বাঃ বাঃ, বড় আনন্দের কথা—ওরা বড় ভালো।

হলে কি হবে? ঐ সম্বন্ধ অবধি—আসে আর ভেঙে যায়, এগুতে পারে না। সেই জন্যে বলি, তুমি একটা আলাদা আস্তানা দেখে নাও খুড়োমশায়। এ গাঁয়ের ভিতর না হওয়াই ভাল। নইলে বিয়ে গাঁথবে না।

বলে দিল দিব্যি এক কথায়। হায় রে হায়, তোমাদের খুড়োমশায়টির জন্য কত গাঁয়ে কত কোঠা-বালাখানা বানিয়ে রেখেছে, একটু শুধু দেখে নেবার অপেক্ষা। ইচ্ছে করেই যেন গড়িমসি করছি, ভাবখানা এই রকম।

ভক্তিমান বাবাজীবন প্রবোধ দিয়ে বলে, থাকো গিয়ে কোনখানে। মেয়ে ক'টার বিয়ে হয়ে যাক, নিজের জায়গায় তখন ফিরে এসো।

ব্যস, নিশ্চিন্ত। তিন ভাইয়ের একুনে সাত মেয়ে। সব কটার বিয়ে হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে আরও সাতটার যে জন্ম হবে না, এমন কথাও কেউ বলতে পারে না। হয়ে যাক সব বিয়ে থাওয়া, বাঁধা জায়গা তারপরে তো রইলোই।

জবাব দাও খুড়োমশায়—

এ হেন সদ্বিবেচনার পরে অন্য কোন জবাব হতে পারে? সাহেব বলে, যাবো তাই।

কবে যাচ্ছ? গাঁয়ের মানুষ ভাংচি দেয়ঃ চোর পোষে ওরা বাড়িতে, চোরের রোজগারে খায়। এমন বাড়ির মেয়ে কে নিতে যাবে বলো। এই মাসের ভিতরেই যাবে তুমি খুড়োমশায়। শঙ্করীর নতুন একটা সম্বন্ধ আসছে। অনেক গেছে, এটা কিছুতেই বরবাদ হতে দেব না।

হাকিমের রায় দেবার মতন সুর। পরক্ষণেই হেসে ওঠেঃ চোরের রোজগারে খাই আমরা—কথা শোন একবার! কোন্ আমলে তালপুকুর ছিলো, সেটাই লোকে মনে করে রেখেছে। আমাদের খাইয়ে দরকার নেই—বিড়িটা-আসটাও যদি নিজের রোজগারে খেতে, দিনের মধ্যে কোন না দশ ছিলিম তামাক আমাদের বেঁচে যেত।

থানা চার ক্রোশ পথ। তার উপরে তিনটে খাল পার হতে হয় এবং একটা বড় গাঙ। 'সারা পথ দৌড়াদৌড়ি, খেয়াঘাটে গড়াগড়ি'—শুধুমাত্র খেয়ার পারাপারেই পুরো বেলা লেগে যায়।

তার উপরে আছে—খোঁড়া একটা পা। কতকাল আগে তিলকপুরে রাখালপতির গোলা থেকে সেই লাফ দিয়েছিল, পা মচকেছিল তখন। উত্তেজনার মুখে সেদিন আর টের পায় নি। এবং যতদিন বয়স ও কাজকর্ম ছিল, তার মধ্যেও খেয়াল করেনি তেমন। বুড়ো হয়ে পড়ে মচকানো পায়ে বাত ভর করেছে,

অমাবস্যা-পূর্ণিমায় হাঁটু ফুলে ঢোল।

তবু যা-হোক চলছিল। বংশীর বউ গত হবার পর বাবাজীবন এখন দিনের মধ্যে পাঁচবার সাতবার চালাঘরে গিয়ে খুড়োমশায়ের খবরাখবর নিচ্ছে। বউরা ঢপ করে ভাতের কাঁসর রেখে শুনিয়ে শুনিয়ে আর্তনাদ করেঃ পিণ্ডি বয়ে বয়ে পারি নে বাবা। এক মাসের কড়ার ছিল, সে মাস কবে পার হয়ে গেছে।

এর পরে একদিন ভাত আর আসে না। সাহেব ডাকাডাকি করে, কিন্তু তিনটে বউ একসঙ্গে কালা হয়ে গেছে। সাহেবের শোনাশুনি নেই—ভাত আনিয়ে তবে ছাড়ল। দুপুরবেলার ভাত রান্নাঘর থেকে এসে পৌঁছল সন্ধ্যার পর।

পরের হপ্তায় থানায় এসে সাহেব দারোগার কাছে হাতজোড় করে দাঁড়ায়ঃ দয়া করুন দয়াময়।

হল কি রে?

বংশীর বাড়ীর বৃত্তান্ত সাহেব আদ্যোপান্ত বলল ঃ খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, চেয়েচিন্তে চলছে। গাছের আম-কাঁঠাল পেকেছে, তাই রক্ষে। কিন্তু সে আর ক'দিন।

দারোগা নীতিবচন ছাড়েঃ সৎপথে গেলিনে, আখের বুঝলিনে। দুনিয়ার মানুষ খেয়ে-পরে সুখ-স্বচ্ছন্দে আছে, পাপীলোক বলেই তো খোয়ার তোদের।

তা বটে! সুখেই আছে বটে মানুষ—আর যদি নিজে চোখে না দেখা থাকত! সাহেবের ঠোঁট পর্যন্ত প্রতিবাদ এসেছিল, চেপে নিল। চোরে আর দারোগায় তফাৎ আছে বই কি! চোর হল সর্বজনার—ধনীর বাড়ি গরিবের বাড়ি চোরের আনাগোনা সর্বত্র। দারোগা শুধুমাত্র ধনীজনের। ডাকাতও তাই। ডাকাত আর দারোগা সমগোত্রের—বড়লোক দেখে দেখে মক্কেল বাছাই করে। খেয়েপরে সকলেই আরামে অছে—এমনধারা কথা মুখে আসে তাই। চোর-সাহেবের কোন বাড়ি বাদ দিলে চলে না। এক এক বাড়ি এমনও ঘটেছে —পরের দিনের খোরাকির চাল রেখে আসতে হল। নইলে ছা-বাচ্চা সবসুদ্ধ উপোস।

দারোগা বলছে, বুড়ো হয়ে গেছিস, আর কেন? ঠাকুর-দেবতার নাম নে, ধর্মপথে চল্ এবার থেকে—

কথার মাঝখানে সাহেব বলে ওঠে, যাচ্ছিলাম তাই হুজুর—

তা কি হল? ধর্ম দাড়ি অবধি এসে আর বুঝি এগোল না।

হাসি-বিদ্রূপ সাহেব কানে নেয় না। বলে, সত্যি সত্যি ভালো হতে যাচ্ছিলাম। বংশী বউয়ের ঠেলায়। না হয়ে উপায় ছিল না। জানেন না হুজুর, বড় শক্ত মেয়েমানুষ। বংশী হেন মানুষটাকেও শেষ অবধি এমনি করেছিল, দাওয়া থেকে উঠানে নামতে হলে জিজ্ঞাসা করে হুকুম নিয়ে নিত। বংশী গেল, তারপর আমায় নিয়ে পড়ল। ঐ এক স্বভাব ছিল, ভালো না করে যেন বংশীর

বউয়ের ভাত হজম হত না।

কাতর হয়ে কাকুতিমিনতি করেঃ ভালো হয়েই থাকতে চাই বাকি কটা দিন। ছুটাছুটিতে ঘেন্না ধরে গেছে। হুজুর তার ব্যবস্থা করে দিন।

দারোগা ঠিক ধরতে পারে না। সাহেব তাড়াতাড়ি বলে, নির্ঝঞ্ঝাটে যাতে খাওয়া-থাকাটা চলে। পাদপদ্মে সেই আমার দরকার।

দারোগা খিঁচিয়ে ওঠেঃ তবে আর কি—থানার উপর অন্নসত্র খুলে বসি! সরকার আমাদের সেজন্য রেখেছে।

থানায় না-ই হল, সত্র আছে বই কি! যার নাম জেলখানা। সাহেব এবারে মরিয়া হয়ে মনের মতলব স্পষ্টাস্পষ্টি বলল। দারোগার পা জড়িয়ে ধরতে যায়ঃ তারই একটা বন্দোবস্ত পাব, আশা করে এসেছি। হাতে আপনাদের কত রকমের কায়দাকানুন, দয়া হলেই হয়ে যাবে।

আস্পর্ধা দেখে দারোগা চোখ পাকিয়ে পড়েঃ দয়াটা কি জন্যে হবে বল দিকি? দয়ার পাত্রাপাত্র থাকবে না? জেলখানা পিঁজরাপোল নয়, যত বুড়ো-হাবড়া জুটে খাবেদাবে আর ঝিমোবে, সরকার সেজন্য বানিয়ে রাখে নি। সক্ষম সমর্থ মানুষের জায়গা। হতিস জোয়ানযুবো, বিবেচনা করে দেখতাম। দিতাম দশধারা ঠুকে, কি অন্য কিছু করতাম।

বলতে বলতে স্বর কড়া হয়ে উঠলঃ আমার এলাকা ঠাণ্ডা। জেলের লোভে যদি কিছু বেচাল করতে গেছিস, পিটিয়েই শেষ করব। মামলা জুড়ে হাকিমের দরজায় নিয়ে যাব, স্বপ্নেও মনে ভাবিস নে। পোকামাকড় মারতে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট লাগে না।

আরও চলত নিশ্চয়। একটা লোক এই সময় তেল মাখাতে এলো। দশাসই জোয়ান পুরুষ—সেই একদা নফরকেষ্ট ছিল, তারই দোসর। জামা-গেঞ্জি খুলে দারোগা উঠানে জলচৌকির উপর বসে পড়ল। কোলকাতার আস্তাবলে সহিস ঘোড়ার ডলাইমলাই করে, সাহেব ছোট বয়সে অনেক দেখেছে। অবিকল তাই। খানিকটা ঘষাঘষির পর সশব্দে থাবা মারে ঘোড়ার পিঠে। এ লোকটাও তেমনি করছে। দেখছে সাহেব তাকিয়ে, যেদিন আসতে দেখতে পায়। স্নানের আগে এসে পরম যত্নে দারোগাকে তেল মাখায়, পয়সা-কড়ির কথা ওঠে না। পয়সা কী আবার, দারোগার দেহ স্পর্শ করে তেল মাখাচ্ছে, তাতেই কৃতকৃতার্থ। একলা এই তেল-মাখানো মানুষটি নয়—ভালোমন্দ অনেক জনেরই আনাগোনা। অনুগত-আশ্রিতের অন্ত নেই। বিস্তর জন ঘুরঘুর করে বেড়ায়, কোন একটা কাজে ডেকে ধন্য করে যদি থানার মানুষ। জীবনভোর সাহেব তো কত ঘরেই ঘুরল, কত রকমের মানুষ দেখেছে সংসারে—দারোগার মতন সুখ কারো নয়। নতুন জন্মে বিধাতাপুরুষ যদি বলেন, সেবারে বিস্তর দুঃখকষ্ট পেয়েছিলি সাহেব—এ জন্মে কি হতে চাস? সাহেব এক কথায় বলে দেবে দারোগা।

সামনে পুকুর। তেল মাখানো শেষ হলে গামছা কোমরে বেঁধে দারোগা

জলে নেমে পড়ল। সাঁতার কাটে খানিক। তারপর বাঁধানো ঘাটের উপর বসে রগড়ে রগড়ে গায়ের তেল তুলে ফেলছে। সাহেব সেই একখানে বসে। দারোগার সাফ জবাব পেয়ে বড্ড মুসড়ে পড়েছে সে। নিরুপায়—চোখের সামনে অন্ধকার। শাস্ত্রের প্রসঙ্গে বলাধিকারী বলতেন, নানা মুনির নানা মত। দারোগাদেরও তাই। অনেককাল আগে আলাদা এক দারোগা—উমাপদ দারোগা—তাঁর কাছেও সাহেব একরকম চেষ্টা করেছিল। সেবারে হল না কাঁচা-বয়সের দোষে। আজকেও নয়—বুড়ো-বয়সের দোষে। কোন বয়সেই না হবে তো সরকার উঁচু পাঁচিলের অমন সব আহা-মরি ঘরবাড়ি বানিয়ে রেখেছে ইঁদুর-চামচিকের বসবাসের জন্যে? সাহেবের এত নামডাক—সে তুলনায় জেলের বিশ্রাম ঘটেছে অতিশয় সামান্য!

নবীন বয়স তখন। হাতেনাতে ধরে সাহেবকে থানায় নিয়ে চলল। আগে পিছে গ্রামবাসীরা। চোরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কিম্বা সমারোহে বর চলেছে বর-যাত্রীর দল নিয়ে—পয়লা নজরে বুঝতে পারবে না। উমাপদ দারোগা সেই সময়টা থানায় নেই। সাহেব-চোরকে ধরা সামান্য ব্যাপার নয়—মাতব্বরেরা বসে আছে দারোগাকে স্বমুখে শুনিয়ে বাহাদুরী নেবে। একটা তদন্তে বেরিয়েছিল উমাপদ—

আকাশের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে সাহেব বেলার আন্দাজ নেয়। উমাপদ থানায় ফিরল, এমনি বেলাই তখন। পুকুরও একটি ছিল সেই জায়গায়, পাতি-হাঁস প্যাঁকপ্যাঁক করছিল। অনেক দিন হলেও ঝাপসা রকম মনে পড়ে যায়।

সাহেবকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধেছে। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে উমাপদ সোজা তার কাছে এলো। আপাদমস্তক দেখল কয়েকবার। তারপর বোমার মতো ফেটে পড়ে—চোর-সাহেবের উপর নয়, যারা চোর ধরে এনেছে তাদের উপর।

ঠায় বসে কেন সব? বলি মতলবখানা কি? চোর ধরে থানার হেপাজতে পেঁছে দিলে—তারপরেও কোন কাজ থাকতে পারে তোমাদের? জেল-ফাঁস-দ্বীপান্তর যা দিতে হয় সরকার বাহাদুর আছেন, সরকারি আইন আছে, তারাই সব করবে। ভিড় বাড়িও না—যাও, বিদেয় হয়ে যাও সব।

চোখ পাকিয়ে প্রবল হুংকার। চোর ধরে এনে তারাই যেন অপরাধ করেছে। জেল-দ্বীপান্তরের কথা হল—দেরি করলে উমাপদ তাদেরই উপর বোধহয় সেই ব্যবস্থা করবে।

পলক ফেলতে না ফেলতে থানার উঠান খালি। আছে সাহেব আর উমাপদ। উমাপদ একদৃষ্টে চেয়ে বোধকরি সাহেবের দেহলাবণ্যই দেখছে। ভারী গোঁফের নিচে থেকে সহসা শাঁখের আওয়াজ বেরিয়ে এলো: তুই তো সাহেব। এ সমস্ত কি ব্যাপার?

আজ্ঞে, আর করব না।

রীতিমত ধমক এবারে : কি করবিনে? চুরিচামারি—মুখ দিয়েছে ভগবান, যা-খুশি একখানা বলে দিলেই হল! কেমন?

অর্থাৎ বিশ্বাস করে নি উমাপদ দারোগা। দারোগা বলে কি, একটা শিশুও তো বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এ ছাড়া জবাবই বা কি দিতে পারে? হেন ক্ষেত্রে সকলে যা বলে সাহেবও তাই বলছে।

কনস্টেবল ডেকে উমাপদ সাহেবের হাতের বাঁধন খুলে দিতে বলল। শিউরে উঠে বলে, বেঁধেছে কী রকম! বুনো হাতিও লোকে এমন করে বাঁধে না। পাষণ্ড বেটারা।

সঙ্গে সঙ্গে সশব্দ হাসির তোড়ে উমাপদ দারোগার গোঁফজোড়া আন্দোলিত হতে লাগল : চুরি করবি নে—এটা কি বললি হতভাগা। ধরা পড়বি নে, সেই কথা বল্।

আজ্ঞে না, চুরিই করব না।

তা হলে চলবে কিসে রে?

সাহেব বলে, ধর্মপথে থেকে ক্ষুদকুড়ো যা জোটে তাতেই একরকম চালিয়ে নেবো।

চোখ বড় বড় করে উমাপদ দারোগা বলে, কী সর্বনাশ! এত বড় ডাকসাইটে সাহেব—তোরও ধর্মে মতি? দুনিয়ায় ভরসার কিছু রইল না। তুই না হয় চালিয়ে নিবি, বলি আমাদের চলবে কিসে? যা বেটারা সব সাধু হয়ে—চাকরি খুইয়ে আমরাই তবে সিঁধকাঠি নিয়ে বেরুই?

তারপরে গলা নামিয়ে বলল : ঢং খুব দেখালি, চলে যা এইবার। ওরা সব রাস্তা-পথে গেল, পাটক্ষেতের মধ্যে দিয়ে গুটিগুটি বেরিয়ে পড়্ তুই। দেখতে পেলে খচ্চরগুলো আবার ধরে নিয়ে আসবে।

এত কাণ্ডের পর উমাপদ দারোগা এক কথায় ছেড়ে দিচ্ছে, কানে শুনেও সাহেব বিশ্বাস করতে পারে না। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

উমাপদ ব্যঙ্গের সুরে বলে, যেতে মন চাইছে না, জেলে মন টেনেছে বুঝি? জেলের বড্ড সুখ শুনেছিস, সত্যাগ্রহ করে থাকবি? জোয়ান বয়স, কাজকর্মের সময়—লজ্জা করে না এখন বুড়োহাবড়ার মতন জেলে গিয়ে ঢুকতে? সে তদ্বির বুড়ো-বয়সে, খেটে খাবার তাগত যখন থাকবে না।

একটু থেমে আবার বলে, সরকার জেলখানা করেছেনও সেইজন্যে। চোর সাধু সবাই সরকারের প্রজা—সকলের কথাই ভাবতে হয়। যেদিন অক্ষম অথর্ব হয়ে পড়বি, তখনকার আশ্রয়। কিন্তু কাঁচা বয়সেও তোরা যদি বসে বসে জেলের ভাত ওড়াবি, সরকার দুদিনে ফতুর হয়ে যাবেন যে।

উমাপদ দারোগার বিবেচনা ছিল, ভদ্রতাও ছিল। বাসাঘরের দিকে তাকিয়ে হাঁক দিয়ে উঠল : চিঁড়ে-টিঁড়ে দিয়ে যা রে বড় কারিগরকে। পেট খালি থাকতে নড়বে না—

দারোগার বাসা থেকে জামবাটি ভরতি চিঁড়ে-নারকেলকোরা-গুড় এসে পড়ল। ভরপেট খেল সাহেব বসে বসে। ঘটিতে জল দিয়েছে, ঢকঢক করে পুরো ঘটি মুখে ঢালল। খেয়ে পরিতুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণ-দারোগাকে ভক্তিযুক্ত হয়ে প্রণাম করে সাহেব উঠে পড়ল।

আশীর্বাদ করে উমাপদ বলে, ধর্ম রেখে কাজ করে যা। ভগবান সহায় থাকবেন, আপদ-বিপদ ঘটবে না। ন্যায্যের বেশি লোভ করিসনে। যার যে রকম পাওনাগণ্ডা ঠিক মতো দিয়ে দিবি।

বলাধিকারী মশায়ের কথাও এই। অন্যের ভাগ বুঝসমঝ করে দিয়ে তবে নিজেরটা। বড়বড় মুরুব্বি সবাই এই কথা বলবে।

উমাপদ আবার বলে, ভাল ভাল কারিগরে আমাদের প্রাপ্য আপনা থেকে হিসাব করে দিয়ে যায়, মুখ ফুটে চাইতে হয় না। দেশভুঁই ছেড়ে পড়ে থাকি, সে তো সত্যি সত্যি সরকারি শুখো মাইনে ষাটটে টাকার জন্যে নয়। সোনার-চাঁদ তোরা সব রয়েছিস, সেই ভরসায়। নিজেরা খাবি, দশজনকে প্রতিপালন করবি। তা নয়, জেলে ঢোকবার সাধ কাঁচাবয়সে! তোকে চিনতাম না, কিন্তু তোর কাজের ধারা জানতে কিছু বাকি নেই। ওসব হবে-টবে না, সাফ কথা আমার। বুড়োথুত্থুড়ে হলে আসিস, জেলের আবদার সেই সময় শোনা যাবে। কথা দেওয়া রইল।

স্পষ্টভাষী ছিল উমাপদ, মানুষটা এক কথার। সে থাকলে নিশ্চয় কথা রাখত। কিন্তু গোড়ার হিসেবেই তো গোলমাল। উমাপদ দারোগা দেড়বয়সি ছিল আমার—আমিই আজ এমন বুড়ো, কথা রাখবার জন্য থানার উপর এতকাল সে কেমন করে থাকতে পারে? কাজকর্ম ছেড়ে কবে বিদায় হয়ে গেছে। খুব সম্ভব ধরাধামেই নেই।

স্নান সেরে এতক্ষণে দারোগা উঠে আসছে। সাহেব গিয়ে ঘাটের কাছে দাঁড়াল।

এখনো আছিস তুই?

সাহেব বলে, তবে হুজুর হুকুম দিয়ে দিন, আপনার এলাকা ছেড়ে চলে যাই। কালীঘাটের গঙ্গাতীরে—

ধর্মে মতি হয়ে গেল তো? আত্মপ্রসাদে ফেটে পড়ে দারোগা। বলে, হতেই হবে। আমি যদ্দিন থানার উপরে আছি, একলা তুই নোস, সব চোরছ্যাঁচোড়ের ধার্মিক হয়ে যেতে হবে। যখন যে থানায় গিয়েছি, ধর্মের বান বয়ে গেছে।

সাহেব বলে, তা নয়, জন্মসূত্রে আমি কালীঘাটে। মরণের পরেও দেহ আদিগঙ্গায় ভাসাবে, সেই আমার বড় সাধ।

দারোগা সহাস্যে ঘাড় দোলায়: সে কি আর বুঝিনে বাপু? বড্ড চোখে চোখে রেখেছি, কাজকর্মের জুত নেই। বাইরে গিয়ে হাত-পা খেলাবি, সেই

মতলব। আমার মতন করে কে তোদের ঠেকাতে যাবে ?

সাহেব জিভ কেটে বলে, কী যে বলেন হুজুর! শরীরের এই হাল হয়েছে, তা ছাড়া—পায়ের দিকে তাকাতে বলি কোন্ সাহসে ?—একখানা পা একেবারে জখম। একঘুমের রাত থাকতে বেরিয়ে পড়ি, পায়ের দোষে তা-ও এক একদিন দেরি হয়ে যায়। হুজুর তাই নিয়ে মারধোর করতে যান।

হাতের লাঠিখানা পড়ে গিয়েছিল, তুলতে গিয়ে থরথর করে হাত কাঁপে. হাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সাহেব জল-ভরা চোখে বলে. দেখুন কী দশা হয়েছে চেয়ে দেখুন একবার।

যত অনুনয়বিনয় করছে, দারোগার হাসি তত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বলে, একে দিনমান তায় আমার চোখের উপরে। হাতের কাঁপুনি হবে বইকি! রাত্তিরবেলা ঐ হাতে হাতির বল আসে, সিঁধকাঠি ধরে মোটা মোটা দেয়াল কেটে ফেলিস। খোঁড়া পা তখন ঘোড়ার মতন চক্কোর দিয়ে বেড়ায়। ভাঁওতা দিবিনে, বুঝলি ? তোর কীর্তিকথা সরকারি দপ্তরে মজুত হয়ে আছে। থানায় যে যখন নতুন আসে, চোখ বুলিয়ে দেখে নেয়। জানতে আর-কিছু বাকি থাকে না।

কথায় ছেদ টেনে দারোগা রান্নাঘরের দিকে চলল। জমাদারকে হাঁক দিয়ে বলে, টিপসইটা নিয়ে ছুটি দিয়ে দাও। এদ্দুর যাবে তো আবার ফিরে।

পথে বেরুল সাহেব। দারোগা খেতে বসেছে। তারপরে ঘুম। দুনিয়া লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলেও খাওয়ার পরে লম্বা একটা ঘুম চাই। উঁকি দিয়ে দিয়ে সাহেবের চোখ রপ্ত—গরজ না থাকলেও অভ্যাস বশে সকলের সব কথা জানা হয়ে যায়। খাইয়ে-মানুষ এই দারোগাটি—এবং হাটবার আজকে, পহরবেলা থেকে হাট জমেছে। খাওয়া অতএব আজ রীতিমত গুরুতর। অন্য একজন আয়েস করে খাচ্ছে—কথাটা যতবার মনে ওঠে, ক্ষিধেটা ততই যেন দেহ ধরে ঝাঁকুনি দেয়। ক্ষিধে যেন ডাকাত—চেপে ধরেছে সাহেবকে। কবলমুক্ত হয়ে ছুটে পালাবে, কিন্তু পেরে ওঠে না অক্ষম অথর্ব মানুষ। সাহেবকে রেহাই দিয়ে ক্ষিধে ঢুকে পড়ুক ঐ দারোগার রান্নাঘরে যেখানে ভুরিভোজনের আয়োজন। সেকালে ছিল, গৃহস্থবাড়ি গিয়ে উঠলেই কিছু না হোক ভাতচাট্টি আসবেই মুখের কাছে। অতিথি অনাহারে ফিরলে গৃহস্থের অকল্যাণ। জুড়ুনপুরে রাতের কুটুম্বিতায় মেয়ের গায়ের গয়না হরে নিল, দিনমানে সেই বাড়ি অষ্টব্যঞ্জন সাজিয়ে ভাত বেড়ে আনে। ছাড়লেন না কিছুতে মা। এমনিই ছিল। সমস্ত সুখ এখন উড়েপুড়ে গেছে। চোর-ডাকাতের এমন যে জেলখানা, তার ফটকও খুলতে চায় না। শতেক রকম বায়নাক্কা। দুর্মূল্যের দিনকাল—নিখরচায় সরকারি অন্নের লোভে সাধুসজ্জনরাও কোন এক অজুহাত নিয়ে ঢুকে পড়েন। তাঁরাও ভিড় জমাচ্ছেন—ভালোয় মন্দয় তফাৎটা কি তবে ? সাহেব তবে কষ্ট করে মন্দ হতে গেল কেন ?

পঁচিশ

হাট-ফিরতি নৌকা যাচ্ছে। গাঙের কূলে সাহেব হাত তুলে দাঁড়ায়ঃ যাবে কোথায় মাঝি ?

খান পাঁচ-সাত নৌকা বহর সাজিয়ে যাচ্ছে, যার খুশি জবাব দিক। দিল তাই একজনেঃ কানাইডাঙা—

আমি কানাইডাঙা যাবো। একটুখানি ধরো বাবা, তুলে নাও।

মাঝি বলেছে কানাইডাঙার নাম। যদি বলত বাদাবন কিম্বা খুলনা শহর কিম্বা রসাতল—সাহেবের ঠিক একই কথাঃ যাবো সেখানে। সব জায়গাই সমান নিষ্ঠুর—ঠাঁই দেবে না কেউ, পেটে খাওয়াবে না। এদের নৌকোয় তবু কালীঘাট মুখো খানিক পথ এগিয়ে যাওয়া হবে। কালীঘাটে রানী থাকে। ধু-ধু করা তেপান্তরের বিলে একটুকু ছায়া। কোন প্রেমিক সুধামুখীর মতন ইতিমধ্যে রানীকেও যদি কেটে গিয়ে থাকে, তবে অবশ্য চুকেবুকে গেল।

নদীকূলে দাঁড়িয়ে সাহেব কাতর হয়ে ডাকছেঃ খোঁড়া মানুষকে দয়া করো বাবা, বেঘোরে ফেলে যেও না।

ডাঙার দিকে মাঝি নৌকা ঘুরাল। হয়েছে দয়া। কাঁচা বয়সে চেহারাখানায় কাজ দিত। এখন বোধ করি ফুরফুরে দাড়িতে। তার উপরে রয়েছে খোঁড়া পা একখানা। চিনতে পারোনি বাছাধন—সাহেব আমি, সাহেব-চোর। নামটা কানে গেলেই হাতের বৈঠা ঠকাস করে পড়ে যাবে। আপাদমস্তক তাকাবে। পাকা চুল-দাড়ির এই নিরীহ মূর্তিটা মনে হবে ছদ্মবেশ—তাকিয়ে তাকিয়ে পোশাক-চাপা বন্যজন্তুটাকে খুঁজবে। সাহেব নাম আর সাহেব-চোরের পুরানো কীর্তিগুলোই কাল হয়েছে। ভাঁটিঅঞ্চল ছেড়ে সেই জন্যেই আরও বেশি করে পালাতে চায়। কলকাতা শহর সমুদ্রবিশেষ। কোন এক সাহেব ছিল কোন এক কালে, আবার একদিন সে ফিরে এসে ফুটপাথের উপর মুখ থুবড়ে মরে রইল, বেওয়ারিশ লাস মড়া-কাটা ঘরে চালান করে দিল, এসব খবর নিয়ে শহরের মানুষের মাথাব্যাথা নেই।

চলল অতএব সাহেব কানাইডাঙা। নামটা চেনা-চেনা ঠেকে। মাঝিমাল্লারা গেঁয়ো মানুষ—নৌকায় চুপ করে থাকতে দেয় না, খুঁটিয়ে পরিচয় নিচ্ছে। হঠাৎ কানাইডাঙার যাবতীয় ঘটনা মনে পড়ে গেল। বহুকাল আগে এই গাঁয়ে গাঙ্গুলিমশায়দের বাড়ি ছোটখাট একটু কাজ নামিয়েছিল। লক্ষ্মীমন্ত বলবন্ত বুদ্ধিমন্ত অনন্ত—ভাইয়ের সব নাম। নিষ্ঠাবতী বিধবা বোন নমি। মাঝির জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে সাহেব এক মর্মান্তিক গল্প ফাঁদলঃ জন্ম থেকেই দুঃখ-কষ্ট—মা'কে কেটে ফেলল, বাপ নিরুদ্দেশ সেই থেকে। বউ নষ্ট। সংসার হল না. বিবাগী হয়ে তাই পথে পথে বেড়াই। খুলনায় অনন্ত গাঙ্গুলি পেস্কার-

মশায়ের সঙ্গে এক সময় পরিচয় হয়েছিল, তাঁর কানাইডাঙার বাড়ি তিনি যেতে বলেছিলেন। তোমরা যখন দয়া করলে মাঝি, সেইখানেই তবে গিয়ে উঠি। না করলে অন্য কোন দিকে চলে যেতাম।

ঘাটে পৌঁছতে সন্ধ্যা। নৌকা ঘাটে বেঁধে হাটুরে-মানুষ মাঝিমাল্লা সব চলে গেল। সাহেবও চলল। আম-কাঁঠাল ও পুকুরের জলে পেট ভরে, কিন্তু ভাতের তৃষ্ণা যায় না। মা-কালী, ভাত জুটিয়ে দাও চাট্টি। বৈশাখের পুণ্যমাসে গৃহস্থ শিবাপুজো করে—ভাতব্যঞ্জন সাজিয়ে বাইরে রেখে দেয় শিয়ালের খাওয়ার জন্য। বংশী একবার যা খেয়ে এসেছিল। তেমনি কোন এক শিবা-ভক্ত বাড়িও পাওয়া যায় না!

বর্ধিষ্ণু বড় গ্রাম কানাইডাঙা, দালানকোঠা অনেক। গাঙ্গুলি-বাড়ি কোন পথে, এতকাল বাদে ঠাহর হয় না। গিয়ে লাভও নেই অমন ভিড়ের জায়গায়। বয়স আর অনভ্যাসের দরুন হাত-পা খেলবে না। সরঞ্জাম নেই—খেলাবেই বা কোন বস্তু হাতে দিয়ে? ছুটতেও তো পারবে না, তাড়া করলে মুখ থুবড়ে পড়বে। উৎকৃষ্ট কাজের শক্তি নেই, খচরো এক-আধটা জুটিয়ে দাও মা-কালী। স্টিমারে সার্চলাইট ফেলে—তেমনি সাহেব এদিক-সেদিক দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে টিপিটিপি চলেছে।

চলেছে, চলেছে—কত পথ এসেছে, আন্দাজ নেই। গ্রাম বুঝি শেষ হয়ে এলো। তেপান্তর বিলের প্রান্তে ভাঁট-আশশ্যাওড়ার জঙ্গল, বাঁশঝাড়, আম-বাগান। ভিতরে ঘরও যেন একটা। এককালে রাত্রিবেলা চোখ দুটো জ্বলত, সে চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। এগিয়ে দেখে ঘরই বটে। টেমির আলো জানলা দিয়ে গাছগাছালির উপর পড়েছে। আলো নিরিখ করে সাহেব ঘরের কানাচে এসে দাঁড়াল।

ছিটের বেড়া, কাঠের চৌখুপি জানলা। ভিতরে উঁকিঝুঁকি দিয়ে পুলকের সীমা থাকে না। মা-কালীর দয়া। উপোসি ভক্তের কষ্ট দেখে শিবাপুজো না হোক, ঠিক তেমনি নির্বিঘ্ন ক্ষেত্র জুটিয়ে দিলেন। মায়ের দয়া নইলে এমন হয় না।

টেমির আলোর সামনে ছোট-ছেলে আর ছোট-মেয়ে। বাঁশঝাড়ে ক্যাচকোঁচ আওয়াজ—ভূতপ্রেত দৈত্যদানো বুঝি দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। গুটিসুটি হয়ে দুটিতে গায়ে গায়ে বসে। মেয়েটা বলে, মামামণি আসছে। দেখ না, ঠিক আসছে এইবার।

সাহেব চমকে যায়ঃ দেখে ফেলল নাকি—তাকে দেখে বলেছে?

ছেলেটা বয়সে কিছু বড়। তড়াক করে সে উঠে দাঁড়াল। বলে, দূর, কোথায় কে? ডালপালা পড়ল কি বেঙে লাফ দিল, সেই শব্দ।

জানলায় উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে নিয়ে বলে, ভয় পেয়েছিস তুই সোনা। দু-দু'জন আমরা, কিসের ভয়? আমার ভয় করে না—পুরুষমানুষ, একলা থাকলেই বা কি।

সোনা মিনমিন করে বলে, ভয় কে বলল, ভয় কেন হবে ?

সাহসের প্রমাণ স্বরূপ আরও জুড়ে দেয় ঃ দু'জনই বা কেন, ভগবান আছেন না ? আকাশের উপরে ভগবান রয়েছেন। একবার নেমে যদি আসেন, বেশ হয়। না রে ঘণ্টু ?

হু-হু করে হাওয়া আসে বিলের দিক থেকে। আকাশে চাঁদ। চতুর্দিকে সাহেব চক্কোর দিয়ে দেখল—না, অন্য কেউ নেই। শুধু ঐ ছেলে আর ঐ মেয়ে। বাড়ির যা দশা, তাতে ঐ দুই প্রাণীর উপরে থাকতে পারে বড় জোর ফুটো-কলসি ফাটা-থালা ভাঙা-গেলাস দু'চারটে ছেঁড়া কাপড়চোপড়। বাপরে বাপ, এই সম্বল নিয়েও দেখি চোরের ভয়। সাহসের পাল্লাপাল্লি শেষ করে দুটিতে সুর করে এবার চোর-তাড়ানি শ্লোক ধরল ঃ

চোর-চোরানি বাঁশের পাতা
চোর এলে তার কাটব মাথা।
হুটুরপুটুর লোটা কান
চৌকিদারি ঘরউঠান ।
নয়া লাঙল পুরানো ইশ
বন্দিলাম দশ দিশ,
বন্দিলাম শ্রিরাম-লক্ষণে
ঘুরে বেড়াক চোর উঠানে।

শ্লোক এমনি তো বিষম কড়া, তায় রিনেঝিনে কাঁচ গলার পাঠ। চোরের রক্ষে আছে ! গেলেই তো মাথা কাটবে, উঠানে ঘুরে ঘুরে না বেড়িয়ে উপায়টা কি ! ঘোরে সাহেব এদিক-সেদিক, আর ঘরের কাছে বারম্বার এসে কথা শুনবার জন্য প্রলুব্ধ কান পাতে। নিয়মও এই বটে। ওস্তাদের হুকুম ঃ কাজের আগে এক দণ্ডের খোঁজ তিন দণ্ড ধরে নেবে, কাজে নেমে তিন দণ্ডের কাজ এক দণ্ডে সারবে। সতর্ক দৃষ্টিতে ঘুরে ঘুরে দেখছে কাছে-পিঠে মানুষ আছে কিনা। সব চেয়ে কাছের বাড়ি কত দূরে।

শ্লোক পড়তে পড়তে সোনা চেঁচিয়ে ওঠে ঃ ঘণ্টু রে, ওই দেখ—

প্রতি বছরই দেখে আসছে। দেখে দেখে এত বড় হয়েছে, তবু কিন্তু ভয় ঘোচে না। উঠান শেষ হয়ে কিছু ঝোপঝাড় ও উলুক্ষেত, তারপরে ফাঁকা বিল। বিল শুকনো। মাঘ মাসে ধান কাটা শেষ হয়ে গোড়াগুলো পড়ে আছে, তাকে বলে নাড়া। ক্ষেতে এবার লাঙল নামবার সময় হল, নাড়ায় আগুন দিয়ে চাষীরা ক্ষেত সাফ করে। নাড়ার ছাই সারও বটে—লাঙলের মুখে মাটির সঙ্গে ছাই মিশে গিয়ে ফসলের তেজ বাড়ায়।

ক্ষেত ছেড়ে গ্রামে উঠবার সময় সন্ধ্যাবেলা নাড়ায় আগুন দিয়ে গেছে। ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে বিলের বাতাসে এক সময় দপ করে জ্বলে ওঠে। সারা রাত্রি বিলময় খণ্ড খণ্ড আগুন। সেই বস্তু দেখে ভারি ভারি জোয়ানপুরুষ আঁতকে

ওঠে, এরা তো ছেলেমানুষ! আলেয়ার দল বুঝি চরে বেড়াচ্ছে ঐ—চোর-ডাকাত বাঘ-ভালুক এমন কি ভূতপেত্নির চেয়েও সাংঘাতিক আলেয়া। বিল জুড়ে বিস্তর কুয়া, কুয়ার ধারে কসাড় শোলাবন। দিনমানে আলেয়ারা কুয়ার জল অথবা শোলাবনে লুকিয়ে থাকে, রাত হলে তেপান্তরে চরতে বেরোয়। আলেয়ার চেহারাও মোটামুটি আন্দাজ আছে—কালোরঙের বিশাল গোলাকার বস্তু, গড়িয়ে গড়িয়ে বেড়ায়। অবয়বের মধ্যে শুধু প্রকাণ্ড মুখ, এবং চকচকে ছোরার মতো দাঁত দু'পাটি। হাঁ করে ঘন-ঘন—মুখের ভিতর থেকে সেই সময় ভলকে ভলকে আগুন বেরোয়। নাড়ার আগুনও আছে বটে—কিন্তু ভাঁটিঅঞ্চলের আবালবৃদ্ধ সকলে জানে, অসংখ্য জায়গায় ঐ যত জ্বলছে সবগুলোই তার আগুন নয়—আলেয়া। কোনটা আগুন কোনটা আলেয়া রাত্রির বিলে তফাত ধরবার জো নেই। চলতে চলতে পথ হারিয়ে পথিকের ধন্দ লেগে যায়। আলো দেখে ভাবে গ্রাম সেই দিকে। অথবা লণ্ঠন নিয়ে কেউ গ্রামের দিকে চলেছে। আশায় আশায় ছোটে। কাছে এসে দেখে কিছুই নয়, নীরন্ধ্র আঁধার। দপ করে ভিন্ন একখানে জ্বলে ওঠে তখনই। ছুটল সেইদিকে। না, কিছুই নয়। আবার, আবার। একবার এদিক একবার সেদিক ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। অসহায় অবসন্ন ভয়ার্ত মানুষটা এক সময় মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। মজা তখন—সারা বিলের যেখানে যত আলেয়া কিলবিল করে মুমূর্ষুকে ঘিরে ধরে, শত শত মুখ লাগিয়ে সর্বাঙ্গের রক্ত শোষে। রক্তপানের পর বিষম স্ফুর্তি—মদ খেয়ে মাতালের হয় যেমনধারা।

এক একদিন গভীর রাত্রে বিলের বাতাস প্রবল হয়ে ঝড় বইতে থাকে। আগুনের শিখা বাতাসে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়—আগুন সেদিন ঘোড়সওয়ার হয়ে বিল জুড়ে ছুটোছুটি করছে। কিছু নয়—ভোজের পরে সেই স্ফূর্তির ব্যাপার। বীভৎস নাচানাচি। গাঁয়ের মানুষ বিলের দিকে তাকিয়ে তখন নিশ্বাস ফেলে: আহা, কোন্ মায়ের ছেলে ঘর শূন্য করে পড়ল গো আজ রাত্রে! দিনমানে দেহ খুঁজে না-ও পেতে পারো। রক্তহীন খেলাটা খানিক লোফালুফি করে খেলার শেষে আলেয়ারা নাড়ার আগুনে ঠেলে দিয়ে গেছে।

ঘরে ঘরে বড়দের এমনি বলাবলি—এরা তো দুই শিশু। জানলা দিয়ে বাতাস ঢুকে টেমির আলো কাঁপে, বেড়ার গায়ে ছায়ারা নড়াচড়া করে ওঠে। ছায়া ওদেরই, ঘরের এটা ওটা জিনিসপত্রের।

কাঁপতে কাঁপতে সোনা আঙুল দেখায়: ঐ দেখ রে ঘণ্টু, কারা সব এসেছে—

মাঝ-বিলের ভয় এবারে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েছে। আজব চেহারার একাপাল জীব ভয় দেখাচ্ছে ছোটমানুষদের। সোনার চেয়ে ঘণ্টু বছর দুয়েকের বড়। বড় হওয়ার দায়িত্ব বশে যথাসম্ভব সে সাহস দিচ্ছে: কিচ্ছু নয়, ভয়ের কি আছে? দেখ্ না দেয়ালে হাত বুলিয়ে। দেখে আয়—

জানলার কাছে সাহেব কান রেখে আছে। সর্বশুভ। দুটি ছাড়া তৃতীয় মানুষ নেই, নিঃসন্দেহ এখন। খোড়োবাড়ি একটা কাছাকাছি দেখে এসেছে, তা-ও জনমানবশূন্য। মরেহেজে গেছে সে-বাড়ির লোক, অথবা বিদেশ-বিভুঁয়ে থাকে? ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা ছাড়া এত দূর সম্ভব না। সর্বরকমে নির্বিঘ্ন করে কাজখানা তিনি গেঁথে রেখেছেন।

কারিগরের যেটুকু করণীয়, সেরে ফেলুক এইবারে তবে। নিমেষমাত্র লাগবে। ঘরে ঢুকে এক হাতে ছেলেটার আর এক হাতে মেয়েটার টুঁটি টিপে ধরে—। উঁহু, উল্টো ফ্যাসাদ তাতে। বন্ধ ঘরেই কেঁপে মরছে, বীরমূর্তি দেখলে গোঁ-গোঁ আওয়াজ তুলে অজ্ঞান হয়ে পড়বে ঠিক। তখন খোঁজো জলের ঘটি কোথায়, শিয়রে বসে পড়ে জল থাবড়াও—

ঘরে ঢুকবার কায়দা ভাবছে। সিঁধকাঠি নেই—যা-কিছু দরজার পথে। বাইরে থেকে ঘা দিয়ে দরজার খিল ভাংবে। চুরি নয় ডাকাতি—তা-ও করতে হচ্ছে, হায়রে হায়, দুটো অবোধ শিশুর উপরে। বাইটামশায়, স্বর্গনরক যেখানেই থাকো, আজকের কাজ চেয়ে দেখো না। আমগাছ-তলায় ভিটার উপরে ঢেঁকি—বোধ করি ঢেঁকিশাল ছিল ওখানটা। ঢেঁকির ঘায়ে ডাকাত গৃহস্থর দরজা ভাঙে—এটা খুব চলতি রেওয়াজ। পুরো ঢেঁকি একলা সাহেব কেমন করে তুলবে—হেয়াখানাও পড়ে আছে একদিকে। কাঠের দণ্ড ঢেঁকির মাথার দিকে লাগানো থাকে, তার নাম ছেয়া। অনেক কষ্টে সাহেব ছেয়া কাঁধে তুলে নিল, ঘা দিতে হবে দরজায়। ভারী জিনিসের আঘাত ভিন্ন খিল ভাঙে না। কোমর বেঁকে যায়, এগোতে গিয়ে টলে পড়বার অবস্থা। অলক্ষ্যে হাতে ধরে নাও আমায় মা-নিশিকালী।

লজ্জা করে চেপে থাকতে পারে না আর সোনা। বলে উঠল, আমার ভয় করছে ঘণ্টু।

কিসের ভয়! বললাম তো, ছায়া ওঁরা সব। সত্যি কিনা, হাত বুলিয়ে দেখ্ বেড়ার উপর।

প্রবোধ দিতে গিয়ে ঘণ্টুর নিজেরই গলা জড়িয়ে আসছে, হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপে। বলে, যতক্ষণ ঘরের মধ্যে আছি, কারও কিছু করবার ক্ষমতা নেই। ঘর হল বন্ধনতলা, বাস্তুপুজো হয় ঘরের মধ্যে। বাইরেই ওঁদের জারিজুরি, ভিতরে সেঁদোবার জোটি নেই। ঠাকুর লক্ষণ তো, ঘরদোর কিছু নয়; একটু গণ্ডি মাত্র কেটে দিয়েছিলেন। অমন যে শমনদমন রাবণরাজা—সাধ্যি হল না তার ভিতরে যাবার। ভুলিয়েভালিয়ে সীতাকে বাইরে এনে তবে সীতা-হরণ। রাম-নাম কর্ সোনা, ভয় থাকবে না।

বলে সোনা কি করে সে অপেক্ষায় না থেকে ঘণ্টু নিজেই তারস্বরে রাম-রাম করে।

সোনা বলে, ভয় কিন্তু তোরও হয়েছে ঘণ্টু—

যাঃ!

হয়েছে। বুঝতে পারছিসনে।

ঘণ্টুর মুখে আর জোর প্রতিবাদ আসে না। আমতা-আমতা করে বলে দাদু এখনো এলেন না। দুজনে একা একা তো—

দু'জন কিসে? আরও আছেন—আকাশের ভগবান। এবারে সোনাই সাহস দেয় ঘণ্টুকে ঃ ভগবান উপর থেকে আমাদের দেখছেন।

ঘণ্টু অধীর হয়ে বলে ওঠে, দেখে শুধু শুধু কি হবে? দাদুর দেরি হচ্ছে—আসুন না ভগবান একটু নেমে। সত্যযুগে তো কথায় কথায় আসতেন।

ঠিক এমনি সময় আওয়াজ বাইরে। ঢেঁকির ছেয়া কাঁধ থেকে সাহেব ধপাস করে ফেলে ছিল। নয়তো নিজেই আছাড় খেয়ে পড়ত। সোনার কি হল—ভয় ভেঙে গিয়ে দ্রুত জানলায় চলে আসে। আম-ডালের ফাঁকে জ্যোৎস্না এসে, পড়েছে। জ্যোৎস্নার আলপনা উঠানে। তার উপরে মানুষ একজন। লম্বা দেহ। মাটিতে চলাচল যেন অভ্যাস নয়, মাটি পায়ে ফুটছে। দাওয়ার পৈঠার দিকে মানুষটা টলতে টলতে যাচ্ছে।

ও ঘণ্টু, মানুষ এসেছে রে, মানুষ!

মানুষই বটে। মানুষ দেখে সোনার বড় আহ্লাদ। ঘণ্টুর হাত ধরে টানে, সে-ও দেখুক এসে জানলায়। নিঃশব্দে এ ওর মুখে তাকালে। দেখ্ দেখ্ কী আশ্চর্য, মানুষটা দাওয়ায় উঠবেন। পৈঠার দিকে যাচ্ছেন ঐ।

ফিসফিসিয়ে সোনা জিজ্ঞাসা করে ঃ কে রে ঘণ্টু?

ঘণ্টু গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়ল ঃ ভূত-টুতও অনেক সময় কিন্তু নরমূর্তি ধরে আসে।

সোনার সে বিশ্বাস নয়। সে ভাবছে অন্য। আকাশের ভগবানের কাছে কাকুতি-মিনতি করছিল, তিনিই বোধহয়। ভূত বলছে ঘণ্টু, কিন্তু ভগবান হতেই বা বাধা কিসের?

জানলায় চোখ দিয়ে নিবিষ্ট হয়ে দেখে। চলেছেন দেখেশুনে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে। হবেই তো এমনি। মাটির উপর পা দিয়ে চলা অভ্যাস নয়, আমাদের মতন লাফিয়ে লাফিয়ে যাবেন কেমন করে?

ঠাহর করে দেখে সোনা হাসিমুখে ঘণ্টুর দিকে ফিরল ঃ না রে, ভূত কক্ষনো নয়। চাঁদের আলোয় উঠানের উপর ছায়া ফেলে যাচ্ছেন যে! চেয়ে দেখ।

যুক্তি অকাট্য। সবাই জানে, অপদেবতার ছায়া নেই! তাদের চেনবার নিরিখ হল এই। সোনা ছায়া দেখেছে, ঘণ্টুকে দেখাল।

ভূত সম্পর্কে নিঃশঙ্ক হয়ে এবারে ঘণ্টু বলে, তবে বোধহয় চোর—

সোনা বিরক্ত হয়ে প্রতিবাদ করে ঃ চোর কেমন করে হবে? মানুষ একেবারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—দুই হাত, দুটো চোখ, নাক, মুখ—কোনটা নেই? মামামণি

যেমন মানুষ, ইনিও তাই।

সে-ও একটা কথা বটে! তা ছাড়া চোরতাড়ানি পড়ে চোরের পথ আটক করে দিয়েছে। চোর হলে সারা রাত উঠানের উপর ঘুরতে হবে, দাওয়ায় উঠতে হবে না বাহাধনের। সে-ও এক পরীক্ষা!

সোনা বলে, ঐ যে তুই ভগবানকে আসতে বললি, সত্যযুগের নাম করে খোঁটাও দিলি আবার। লাজে-লজ্জায় তাই আসতে হয়েছে।

ধৈর্য ধরতে পারে না সোনা। প্রশ্ন করেঃ কে?

সাহেব থতমত খেয়ে যায়। মিষ্টি কচি গলা—অন্তরাত্মা তবু কেঁপে ওঠে। জবাব হাতড়ে পায় না! জড়িত কণ্ঠে বলে, আমি—আমি—

দেবতাগোঁসাইরা বেশি কথা বলেন না। আত্মপরিচয় দেবেন না তো, বেশি বললে মিথ্যে বলতে হয়। বুদ্ধিমানে ঐ সামান্য থেকেই বুঝে নেবে।

ইতিমধ্যে জবাব কিছু ঠিক হয়েছে। সাহেব বলে, বিদেশি মানুষ আমি, তোমাদের অতিথি—

রামায়ণ-মহাভারতের সব কথা জানা এদের। ভাঁটির দেশের কোন ছেলে-মেয়ে না জানে? সোনা বলে, রামচন্দ্র—বুঝলি রে ঘণ্টু? গুহকের বাড়ি রাম হঠাৎ এমনি অতিথি হয়েছিলেন।

ঘণ্টু প্রণিধান করে বলে, দূর! রাম কত বড় বীর—খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছেন দেখিস না? রাম বুঝি খোঁড়া?

ঐ রীতি-ঠাকুর-দেবতার। খোঁড়া হয়ে, কানা হয়ে, দেখা দেন। ষোলআনা আসল মূর্তি হলে সে তেজ লোকে সামলাতে পারবে কেন?

আড়ালে পড়ে গেল এই সময় সাহেব। জানলায় ভাল দেখা যায় না তো সোনা খিল খুলে সন্তর্পণে দরজা একটু ফাঁক করে দেখে। বলে, ঠিক বলেছিস রে ঘণ্টু। রামচন্দ্র নয়, বাল্মীকি মুনি। রামায়ণের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখ, একেবারে আসল। তেমনি দাড়ি, তেমনি বড় বড় চুল। রামচন্দ্র বাল্মীকিকে পাঠিয়ে দিলেন।

মুখ বাড়িয়ে এবারে সোজাসুজি ডাক দিলঃ আমাদের ভয় করছে। এসে বসবে একটু? অতিথি হয়েছে, খেতেও দেবো। দু'জন আছি – আমি আর ঘণ্টু। আমরা বাইরে যাব না কিন্তু—ঘর ছেড়ে এক পা-ও বেরুব না। তুমি চলে এসো।

দুই বাচ্চা ছেলে-মেয়ে ঘরের ভিতর ডেকে নিচ্ছে। দরজা ভাঙতে হল না, কোন রকম ঝামেলা নেই, আপনা-আপনি সব হয়ে যাচ্ছে মন্ত্রের মতন। সাহেব-চোরকে ঘরে ডাকছে, হেন তাজ্জব কাণ্ড ভাবতেও পারে না কেউ। মা-কালীর করুণা। কত কাল হয়ে গেল মা, কালীঘাটের কালীক্ষেত্র ছেড়ে এসেছি—ভাঁটি অঞ্চল তো ভিন্ন এক দুনিয়া—অনাথ অধম সন্তানকে এত দূরেও নজর ফেলে দেখছ।

ঘরের মধ্যে এসে সাহেব এদিক-ওদিক তাকায়। যা ভেবেছে—দৈন্যের

অবস্থা, জিনিসপত্র বলতে থালা-ঘটি-বাটি আর প্রকাণ্ড এক টিনের তোরঙ্গ। খাসা ফুটফুটে মেয়েটা কিন্তু, আট-হাতি নীলাম্বরী পরে গিন্নিবান্নির মতো দেখাচ্ছে···আরে আরে, হার চিকচিক করছে গলায়—হারের সঙ্গে লকেট। কেমিকেল নয়, আসল সোনা—নজর হেনেই সাহেব বলতে পারে। সেদিন নেই—সেই যে রানীর ঝুটো-মাকড়ি মুঠোয় নিয়ে বুড়ো-স্যাকরার কাছে গিয়েছিল। থলেদার যত ছ্যাচড়াই হোক, এ জিনিস একশটি টাকা না দিয়ে পারবে না। ভাল থলেদার হলে অনেক বেশি দেবে। যে ক'টা দিন জীবনের মেয়াদ আছে, এতেই চলে যাবে। আর কিছু করতে হবে না।.

সাহেব জিজ্ঞাসা করে, বাড়ির অন্য সবাই কোথা ?

ঘণ্টু বলে, একজন তো মোটে—আমার দাদু। সোনার হলেন মামামণি। আমার বাপ-মা কেউ নেই—ঐ দাদু ! সোনার মা নেই, বাপ আছে—সে বাপ এখানে থাকে না।

বকবক করে ঘণ্টু আরও বিস্তর পরিচয় দিয়ে যায়ঃ গাঙ্গুলি-বাড়ি দাদু কাজ করে। ফিরতে এক-একদিন রাত হয়ে যায়, ততক্ষণ গোপলার মা থাকে। আজ গোপলার মা রান্না করছিল—এমনি সময় খবর এলো, গোয়ালে গরু তুলতে গিয়ে গোপলাকে ষাঁড়ে ঢুঁশ মেরেছে। গোপলার মা বেরুল। দুজন আমরা একা।

ক্ষিধে পেয়েছে, বাচ্চা- ছেলে তো—নির্ভয় হয়ে ঘণ্টুর এতক্ষণে সেটার হুঁশ হল। সোনার দিকে চেয়ে অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলে, ভাত-ডাল সবই তো এঘরে। খেয়ে নিলে হয় কিন্তু।

আর দেরি কেন সাহেব। এক টানে মেয়ের গলার হার ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ো। মরুক দুটোয় চেঁচিয়ে। ডাকভরের মধ্যে মানুষ নেই। মানুষ জমতে জমতে তার মধ্যে তুমি বিল পাড়ি দিয়েছ।

ঘণ্টু বলে চলেছে, গোপলার মা থাকলে খাওয়া কখন হয়ে যেত। পিঁড়ি পেতে গেলাসে জল পুরে সুন্দর করে সে ভাত বেড়ে দেয়।

সোনাকেই যেন ঠেশ দিয়ে বলা নতুন মানুষটির সামনে।

সোনা ঝগড়া করেঃ জল পুরে পিঁড়ি পেতে আমি বুঝি দিইনে কখনো ? গোপলার মা-র চেয়ে ভালো ভাত বাড়ি আমি।

এবং প্রমাণস্বরূপ তখনই সশব্দে দুটো পিঁড়ি ফেলে হাড়ি টেনে এনে সাহেবকে সাক্ষি রেখেই যেন ভাত বাড়তে বসল। একমনে ভাত চেপে চেপে মোচার মতো মাথা সরু করে তুলছে।

কাজকর্মের মধ্যে কাঁধের কাপড় পড়ে যায় একবার, সোনার হার বেরিয়ে টেমির আলোয় ঝিকমিকিয়ে ওঠে। লহমার দেরি নয় সাহেব। মা-নিশিকালী সামনে এনে ধরেছেন, ছিঁড়ে নাও গাছের ফলের মতো।

মাদুরে বসেছিল সাহেব, তড়াক করে উঠে সেই ভাতের জায়গায় সোনার কাছে

চলে গেল। হাত বাড়িয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা বাঁ-হাতের ছোঁ মেরে ধরে ফেলে সাহেবের হাত। ধরে এই টান—কী টান রে বাবা, কত শক্তি ধরে এইটুকু মেয়ে, থানার সিপাহির কড়কড়ে মুঠোর চেয়ে শক্ত।

হকচকিয়ে গিয়ে সাহেব বলল, কী হচ্ছে?

পিঁড়ি দেখিয়ে সোনা হুকুমের সুরে বলে, বসে পড়ো। খাবে, অতিথি যে তুমি। অপর পিঁড়ির দিকে নির্দেশ করে ঘণ্টুকে বলে, তুইও বোস। দু'জনে খেয়ে নে তোরা।

কত বড় গিন্নি যেন! হাতা কেটে কেটে ডাল দিচ্ছে। ঘাড় বেঁকিয়ে ঘণ্টুকে বলে, ভাত বাড়া কেমন হয়েছে বললিনে যে ঘণ্টু? গোপলার মা-র চেয়ে ভাল কি না বল।

কৃপাময়ী মা-জননী! সারা দিন পেটে দানা পড়ে নি, সেই ব্যবস্থা জননী সকলের আগে করে দিলেন। পিঁড়ির উপর বসে সাহেব ভাত ভেঙে নিয়েছে। পিঁড়িতে বসে ভাত খায় নি কতদিন—কালীঘাট থেকে পালিয়ে বেরুল। নফর-কেষ্টর সঙ্গে, তারপরে পিঁড়ি এই প্রথম। উঁহু আর একবার—জুড়ানপুরে আশালতার বাপের বাড়ি। সেই বাড়ির মা পাশে দাঁড়িয়ে খাওয়াচ্ছিলেন, আশার বোন শান্তিলতা পিঁড়ি পেতে ঠাঁই করে দিয়েছিল। না না, আরও তো আছে। সুভদ্রা বউ পিঁড়ি পেতে ভাত বেড়ে সামনে বসে খাওয়াত।

ভাত নয়, পাথরের কুচি যেন। গরুর মুখে দিলে মুখ ফিরিয়ে নেবে। সারা দিনের পর সেই ভাতই অমৃত সাহেবের কাছে। খেতে খেতে বুড়োমানুষ সাহেবের দুচোখ জলে ঝাপসা হয়ে আসে। গর্ভধারিণী মা গলা টিপে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছিল, বংশীর বাড়ির বউরা খাওয়া বন্ধ করে পথে তাড়িয়ে দিল। তাই বলে জগৎটা কী করলি হারামজাদিরা! দুনিয়া জুড়ে আমার মা ছড়ানো। আশালতার বুড়ি মা ছিলেন, আবার একফোঁটা এই সোনা মেয়েটাও। মা হবার বাছ-বিচার নেই—হঠাৎ কোন একখান থেকে বেরিয়ে পড়ে। বয়সেও ধরা যায় না।

ঘণ্টু বলে, তুই বসলিনে কেন সোনা?

পরে—

আবার পরে কেন? ক্ষিধে নেই?

বা রে, মেয়েলোক না আমি? মেয়েরা তো পরে খায়। খেয়ে ওঠ তোমরা, আমি তার পরে।

কোন দিকে না তাকিয়ে সাহেব গবগব করে খেয়ে যাচ্ছে। নিরুপদ্রবে ভাত খাওয়া দস্তুরমতো বাবু হয়ে বসে। বলে, ডাল দে আর একটু।

সোনা নড়ে না। বিরক্তভাবে মুখ তুলে সাহেব হতভম্ব হয়ে যায়। খাচ্ছে সে—থালা থেকে ভাত তুলে মুখে তোলা অবধি যাবতীয় প্রক্রিয়া সোনা নিষ্পলক চোখে দেখছে। ঘণ্টুরও তাই—নিজের খাওয়া ভুলে হাঁ করে সাহেবের দিকে

তাকিয়ে। বড় আরামে খেয়ে যাচ্ছে, পরিমাণের তাই আন্দাজ করতে পারে নি। খাওয়াটা অসঙ্গত রকম বেশি হয়ে গেছে।

খাওয়া থামিয়ে সলজ্জে সাহেব বলে, এই যাঃ আমিই সমস্ত খেয়ে ফেললাম।

সোনা সকরুণ হেসে বলে, ডাল যা ছিল তোমায় দিয়েছি। আর চাইলে হবে না।

সাহেব, কি জানি কেন, হঠাৎ রেগে উঠল ঃ কেন আমায় খেতে বসালি তবে ? এ কি তোর মেনিবিড়াল যে চুক-চুক করে ডাকলি আধ-ঝিনুক দুধ পরিতোষ হয়ে খেয়ে চলে গেল। খেয়েছি, বেশ করেছি। আরও খাব, যতক্ষণ পেটে ধরে খেয়ে যাব।

বলতে বলতে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল পিঁড়ি থেকে। হাত-মুখ ধুয়ে মাদুরে গিয়ে বসল। ভাগ্যিস মুখ তুলেছিল, নইলে যা গতিক—একটি কণিকাও তো পড়ে থাকত না মেয়েটার জন্যে।

ঘণ্টুর খাওয়াও শেষ। এমনি সময় জোর বাতাস দিল। উঠানের আম-তলায় টুপটাপ টুপটাপ আম পড়ে একঝাঁক।

ঘণ্টু ছটফট করে ঃ তলায় অনেক আম পড়ে আছে, সেই সন্ধ্যে থেকে পড়ছে। সোনা যে ভয় পায়—সেই জন্যে দুয়োর খুলতে পারিনি।

সে ভয় কোন অতীতের কথা। আগন্তুক নতুন মানুষের সামনে ভীরু অপবাদ সোনা ঘাড় পেতে নেবে কেন ? মুখের ভাত ক'টা গিলে ফেলে সোনা তাড়াতাড়ি বলে, ভয় আমার না তোর ?

বেটাছেলে—আমার নাকি ভয়। বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে ঘণ্টু সাহেবকেই সাক্ষি মানল ঃ বলে কি শোন। দেখাই তা হলে—একলাই গিয়ে কুড়িয়ে আনি, দাঁড়াতে হবে না। এ তো ঘরের উঠোন—একা একা বড়বাগ পর্যন্ত গিয়ে আম কুড়োতে পারি।

দরজার কবাট আলগা করে দিল দু-দিকে। জ্যোৎস্না ফটফুট করছে। তিড়িং করে ঘণ্টু দাওয়ায় পড়ল। সেখান থেকে উঠানে। পেয়েছে আম কয়েকটা। আরও খুঁজছে।

সোনা একেবারে একা। এইবারে সাহেব নিজমূর্তি ধরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ো, মজা বুঝুক সাহেব-চোরকে ঘরে ডেকে আনার। কিন্তু একলা আছে বলেই কাজে ঝাঁপ দিতে হবে, তার মানেটা কি ! না হয় দু'জনই হল—মেয়েটা আর ছেলেটা। দুটো ছেলেমানুষকে কায়দা করতে পারব না, সত্যিই কি এমন দশা আজ আমার ? ক্ষিধের অন্ন সামনে নিয়ে বসেছে, খাওয়ার মধ্যে ভণ্ডুল দিতে নেই। অতি-বড় শত্রু হলেও নয়। মেয়েটার গলার হার ধরতে গেলে হাতের মধ্যেই এসে রয়েছে। থালার ভাত ক'টা শেষ হতে দাও, পলকের মধ্যে ছিঁড়ে নিয়ে বেরুবো।

উল্টে সাহেব অভিভাবকের মতো ঘণ্টুকে ডাকাডাকি করছে ঃ এই দেখ, ম্যাচ-ম্যাচ করে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরছে। ঘরে আয়। উড়ো-কাল এখন, সাপ-খোপ জন্তু-জানোয়ার বেরোয়। সাপ না হল, চেলা-বিছেয় তো কামড়াতে পারে।

সোনাও ডাকছে, যা পেয়েছিস নিয়ে চলে আয়। সকালবেলা দুজনে মিলে ভালো করে কুড়োব!

খাওয়া শেষ করে হাত ধুয়ে—যায় কোথা রে সোনা? বাইরে কোথাও নয়—তক্তাপোশের বিছানা থেকে ছোট্ট বালিশটা নিয়ে ঝুপ করে সাহেবের মাদুরে শুয়ে পড়ল। ঘুম ধরেছে বুঝি— না, কি? কাঁচ তুলতুলে হাত একটা এসে পড়েছে সাহেবের কোলে। গলার হার গায়ে ফুটছে। মা-কালীই তো করাচ্ছেন সোনাকে দিয়ে—হাত বাড়িয়ে ছিঁড়ে নিতে আলস্য, হায় সেজন্য গায়ের উপরে লেপটে ধরেছেন। গিনিসোনার জিনিস—লকেটে দামি পাথর বসানো। সাহেবের গা শিরশির করে ওঠে। কিন্তু হল কি বল, হাত একেবারে অসাড়! পা খোঁড়া, হাত দুটোও কি নুলো হয়ে গেল বুড়ো হয়ে? কী সর্বনাশ!

মেয়েটা আবদার করে ঃ গল্প বলো একটা। মামামণির কাছে গল্প শুনতে শুনতে আমরা ঘুমোই।

ভারি মজা তো! গল্প না হলে মহারানীর ঘুম হবে না—বকবক করে চালাও এবারে গল্প। সাহেব-চোর গল্প বলার লোক, এমন আজগুবি কথা কোনদিন কেউ ভাবেনি। সাহেব নিজেও না। মা-মরা মেয়ে বলে মাতুলমশায় আদর দিয়ে মাথায় তুলেছে। ইচ্ছে করে থাপ্পড় কষে গল্প শোনার শখ ঘুচিয়ে দেয়।

করে ঠিক বিপরীত। সাহেব হেন মানুষের কণ্ঠে স্বর যতদূর মোলায়েম করা সম্ভব, তেমনিভাবে বলে, কিসের গল্প শুনবি?

সোনা বলে, ভূতের—

ঘণ্টু ছুটে এসে সাহেবের গা ঘেঁসে ওপাশে শুয়ে পড়ল। সোনাকে তাড়া দিয়ে ওঠে ঃ রাত্তিরবেলা ওসব কি? বাঘের গল্প হবে।

সোনাও ছাড়বার পাত্র নয় ঃ বাঘের তো নামই করে না কেউ রাত্তিরে। চরে ফিরে বেড়ায় – নাম করলে ভাবে, ডাকছে বুঝি কেউ। ঘরের মধ্যে চলে আসে। তবে তুমি চোরের গল্প করো—

চোরও তো মনে ভাবতে পারে –

সাহেব ভাবছিল, আজেবাজে গল্পে হুঁ-হাঁ দিতে দিতে এখুনি ঘুমিয়ে যাবে, নির্গোলে কাজ সেরে বেরুবে তখন। চোরের নামে চমকে উঠল।

ঘণ্টু বলছে, চোরও ভাবতে পারে তাকে ডাকছে। ঘরে ঢুকে পড়বে। রাত্তিরবেলা চোরেও তো চরেফিরে বেড়ায়।

এইবারে সাহেব বলবার কথা পেয়ে যায়। বেজার মুখে বলে, হুঁ, চরতে

দিল আর কি ! সে এককালে ছিল বটে ! এখন বিশ হাত অন্তর থানা. পাড়ায় পাড়ায় চৌকিদারের উপরে দফাদার।

বলে কী ফ্যাসাদে পড়ল। চোখ বুঁজে ছিল সোনা _ কৌতূহলে চোখ মেলে বলে, আমায় দেখাবে চোর ? কিরকম দেখতে তারা – বাঘের মতন, সাপের মতন ?

বলেছে মেয়েটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। বুকে হেঁটে সিঁধের গর্তের ভিতর দিয়ে চোর ঘরে উঠল – তখন সে সাপ বই আর কি ! বাড়ির লোকে টের পেয়ে হৈ-হৈ করে বেরিয়েছে – নিরুপায় চোর হঠাৎ তখন বাঘ হয়ে হামলা দিয়ে পড়ে। আরও আছে। পালাচ্ছে চোর _ দৌড় দৌড় ! চোর এবার হরিণ। দৌড়ে গিয়ে ঝপ্‌পাস করে গাঙে পড়ল, জোয়ারের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। চোর এবারে কুমির। ভবসংসারে যত জন্তু-জানোয়ার, সমস্ত মিলিমিশে তবেই এই একটা চোর।

ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে সোনা। হঠাৎ সোজাসুজি প্রশ্ন : তুমি কে ?

সাহেবের মুখ শুকাল। কাঠগড়ার আসামি যেন উকিলের জেরায় পড়েছে। চটপট মিথ্যে আত্মপরিচয় বানিয়ে কত কত জায়গায় বেঁচে এসেছে, রক্ষে নেই আজকের এই একফোঁটা মেয়ের কাছে। কথা বেরোয় না মুখে, আমতা আমতা করছে : আমি, আমি—

মেয়েটাই আবার উদ্ধার করে দিল। হাসছে ফিক-ফিক করে। বলে, ঘণ্টু বলছিল ভূত। ভূত মানুষের রূপ ধরে আসে—তাই বলে কি এমন খাসা মানুষ ! ঘণ্টু বোকা—না ?

ঘণ্টু বলে, আর তুই বললি দেবতা। শুধু-মানুষই বা কেন হবে না ?

তর্কে পারবে সোনার সঙ্গে ! বলে, মানুষ হয়েও দেবতা বুঝি হওয়া যায় না। ওঁরা সব কি ছিলেন শুনি ?

বেড়ার গায়ে নানান ছবি আঠা দিয়ে আঁটা। কীর্তি এদুজনেরই। ছবি নিয়েছে রামায়ণ থেকে, মহাভারত থেকে—রামের হরধনুভঙ্গ, কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণার্জুন, এমনি সব। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ছবিও এর মধ্যে। আঙুল তুলে সোনা এইসব দেখিয়ে দিল।

আরে সর্বনাশ, মনে মনে সাহেব শতেক বার জিভ কাটে। সাহেবের কথার মধ্যে লক্ষ্মীছাড়ি মেয়ে এঁদের সব দেখায়। অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল সাহেবের। জীবনে মারগুতোন কত খেয়েছে, তাতে এমন হয়নি। মারের কষ্ট এতদুর নয়। রানীর ফাইফরমাস জোগান দিয়ে ছেলেবেলায় দিন কয়েক দেবতা হয়েছিল। কোন নির্ণিরীক্ষ স্থানের আসল-দেবতা মহাপাপীকে সেদিন বুঝি অভিশাপ দিলেন—বুড়োবয়সে মরতে বসেও এখনো শাপমুক্তি ঘটেনি।

তবে দেখ্‌ কেমনধারা এই দেবতা ! দেবতার লীলাখেলা মনের মধ্যে চিরজন্ম গাঁথা হয়ে থাকবে। শুয়ে পড়েছে সোনা একেবারে গায়ের উপর, হাঁ করে কথা

শ্নছে, হাত এগিয়ে গলার হার সাহেব শক্ত মুঠোয় ধরেছে—

খোলা দরজায় সেই সময় মানুষ ঢুকে পড়ল। নাটকীয় আবির্ভাব। ঘণ্টু ধড়মড় করে উঠে বলে, দাদু—। সোনা এক কাণ্ড করে—গলার হার খুলে চক্ষের পলকে মাদুরের নিচে ঢুকিয়ে দিল।

সাহেব পাথর হয়ে গেছে। চিনতে মুহূর্তকাল দেরি হয় না—মধুসূদন। আশালতার ভাই—জুড়ানপুরের সত্যসন্ধ গোঁয়ার মানুষটা। ন্যায়ের নামে অঞ্চল সুদ্ধ যে লড়ে বেড়াত। কপালের উপর সেই আঘাতের দাগ, যাকে বলে জয়তিলক। সাহেবের চেয়ে অনেক বেশি বয়স, দেহ নুয়ে পড়েছে। কিন্তু রাজার রাজমুকুটের মতো কপালের ক্ষত হাজার মানুষের মধ্যে আলাদা করে চিনিয়ে দিচ্ছে।

মধুসূদন তাকিয়ে পড়ে সাহেবের দিকে। সাহেব নির্ভয়। কতক্ষণেরই বা দেখা সেই রেলের কামরার মধ্যে! বছর ধরে দেখা থাকলেও আজ চিনত না। নতুন বয়স তখন—যে দেহরূপ ছিল, জ্বলেপুড়ে তার চিহ্নমাত্র অবশেষ নেই। বলিরেখা সারা মুখে জাল বুনে রাত্রি-জাগা কাহিনীগুলো দুর্বোধ্য অক্ষরে লিখে দিয়েছে। তার উপরে আকণ্ঠ চুল-দাড়ি। যে বিধাতাপুরুষ এত যত্নে গড়েপিঠে ভবধামে পাঠিয়েছিলেন, তিনি পর্যন্ত সাহেবকে আজ চিনতে পারবেন না। দেখুক মধুসূদন যতক্ষণ খুশি। সুধামুখী বেঁচে থাকলে চেহারা দেখে সে-ও বোধকরি চিনত না।

মধুসূদন বলে, কে তুমি? ঘণ্টুর দিকে চেয়ে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করে: কে রে?

ঘণ্টুর আগে সোনা-ই গড়গড় বলে, ভয় করছিল মামামণি। ইনি যাচ্ছিলেন, ডাকাডাকি করে নিয়ে এলাম। বড্ড ভালো। কত সব গল্প হল এতক্ষণ ধরে।

যা-কিছু বলা উচিত, সোনা একাই কেমন গুছিয়েগাছিয়ে বলে যায়। ঘণ্টু বলে, এত দেরি করলে কেন দাদু?

বিয়ের কাজকর্ম বাবুদের বাড়ি। আজকে তবু তো আসতে পেরেছি—কাল বউভাত, কাল আর ছেড়ে দেবে না।

তারপর মধুসূদন বলে, খেয়েছিস তোরা?

ঘণ্টু বলে, ডাল নেমে গেছে, সেই সময়টা গোপলার খবর এলো—

বলতে বলতে আরও কি বলে বসে—বোকা ঘণ্টুকে বিশ্বাস নেই—নিজেরা না খেয়ে অতিথি খাইয়েছে, বেরিয়ে না পড়ে কথাটা। সোনা আগ বাড়িয়ে বেশি বেশি করে বলে, খেয়ে পেট টনটন করছে মামামণি। শুয়েই পড়লাম খাওয়ার চোটে।

ভয়ানক রকম খেয়েছে তার প্রমাণস্বরূপ প্রাণপণ চেষ্টায় ঢেকুরও তুলল একটা।

সাহেব উঠে পড়ল। দাওয়ায় নেমে বলে, তোমার মামামণি এসে গেছেন, যাচ্ছি এবারে সোনা।

আজেবাজে কথায় কাজ নষ্ট করে এলো। নিজের গাল চড়াতে ইচ্ছে করে সাহেবের। তবে একটা মুনাফা, ভাত খেয়ে এসেছে—পিঁড়ি পেতে বাবু হয়ে পরিতৃপ্তির ভাত খাওয়া। যাচ্ছে, আর বিড়বিড় করে মা-কালীর উদ্দেশে তার চিরকালের অনুযোগ জানায়ঃ পরমায়ু শেষ হয়ে আসে, সাচ্চা-মন্দ তবু হতে দিলে না। সত্যপথের পথিক মধুসূদন, অসত্যের সঙ্গে চিরকাল লড়ে বেড়ায়। তার দুর্গতির মানে বোঝা যায়—এখন কষ্ট, পরিণামে স্বর্গসুখ। কিন্তু আমার কি—ইহকালে এই হেনস্থা, পরলোকের জন্য যমদূত তো মুকিয়েই আছে। নাকের নিশ্বাসটুকু বন্ধ হলেই চুলের মুঠি ধরে কুম্ভীপাক-নরকে নাকানি-চোবানি খাওয়াবে।

ছাব্বিশ

আজকে হল না তো কাল—কাল রাত্রে সুনিশ্চিত। মধুসূদন কাল ঘরে ফিরবে না, ধীরেসুস্থে কাজ করতে পারবে। সমস্তটা দিন সাহেব, ঠিক কানাই-ডাঙা গাঁয়ের উপর না হয়ে, এদিক-সেদিক ঘুরল। জুড়নপুরের বাস ছেড়ে মধু-সূধন অনেক দিন এখানে ঘর বেঁধেছে—খোঁজখবর পেতে অসুবিধা নেই। পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি এক কাঠাও নেই এখন, মামলা মোকদ্দমায় গেছে। শত্রুকে লোকে অভিশাপ দেয় ঘরে যেন মামলা ঢোকে—জুড়নপুর থাকতে মধুসূদন ফৌজ-দারির ফৌজদারি লড়ে বেড়িয়েছে। তার উপরে যমের মার—ছেলে ছেলের বউ তিন দিনের আগপাছ বসন্ত রোগে মারা গেল। স্ত্রী আর একফোঁটা নাতি-টাকে নিয়ে পেটের দায়ে অবশেষে এইখানে এসে কাজ নিয়েছে—গাঙ্গুলিদের গোমস্তাগিরি। মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে ন্যায়ধর্মের খ্যাতিটা সদর অবধি ছড়িয়েছিল, পেস্কার অনন্ত গাঙ্গুলি ডেকে তাকে কাজটা দিল। দুঃখের আরো আছে—স্ত্রী মারা গেল বছর কয়েক পরে, এসে জুটল অনাথ ভাগনীটা। হবে না হবে না করে আশালতার বেশি বয়সের মেয়ে—ঐ সোনা। সাহেবের মতোই সোনা মায়ের মুখ দেখেনি, প্রসব হতে গিয়ে আশালতা মারা গেল। শঙ্করানন্দ বিবাগী হয়ে সেই থেকে পথে পথে ঘোরে, শ্মশানে শবসাধনা করে এমনও শোনা যায়।

পরের সন্ধ্যায় সাহেব তাড়তাড়ি চলে এসেছে। গৌরচন্দ্রিকা নয়, চটপট কাজ হাসিল করে সরে পড়বে।

ঘণ্টু বলে, গোপলার মা আছে, সোনার আজ ভয় করবে না।

শুকনো মুখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে সাহেব বলে কই গোপলার মা, কোথায় সে?

ছ্যাঁৎছোৎ করছে রান্নাঘরে, শুনতে পাও না? রাঁধছে।

দেখতে পেয়ে সোনা ছুটে এসে হাত জড়িয়ে ধরেঃ কাল শুধু ডাল-ভাত খেয়ে গেছে, খাবে কিন্তু আজ। মামামণি আসবে না, অনেকক্ষণ ধরে আমরা গল্প করব।

সেকালে সেই আশালতার মা ছোট্ট নাতনিটির মধ্যে যেন কথা বলে উঠলেন। খাওয়ানোর জন্যে তিনিও আঁকুপাকু করেছিলেন একদিন। কিন্তু যে কাজে এসেছে—সোনার গলা যে খালি!

ব্যাকুল হয়ে বলে, হার কি হল তোর?

সোনা বলে, হার পরে আমায় ভাল দেখাচ্ছিল না? বলো তুমি—

খুব ভালো। যেন রাজকন্যে—

মিছাও বড় নয়। রূপবতী বলে থাকি আমরা শুধু একটা মেয়ে ধরেই নয়—সে মেয়ের গায়ে গয়না পরনের কাপড়চোপড় পায়ের আলতা কপালের টিপ এক-সঙ্গে সমস্ত মিলিয়ে মিশিয়ে। ঝুটো-মাকড়ি পরেই বা রানীর কী বাহার খুলত! সব মেয়েরই তাই।

সাহেব বলে, হার খুলে রাখতে গেলি কেন রে? না-ই পরবি তো গয়না কিসের!

মুখ ম্লান করে আশালতার মেয়ে বলে, হার আমার নয়। মামামণি পরশুদিন এনেছে, ঐখানে রেখে দিয়েছে।

বাঁশের খুঁটির উপরটা দেখায়। খুঁটির খোলে যখন তুলে রাখছে, পিটপিট করে আমি দেখে নিলাম। ঘণ্টু গাছে চড়তে পারে, কাল ঐ খুঁটিতে উঠে পেড়ে দিয়েছিল। আর দেবে না, বজ্জাতি করছে আজ।

ঘণ্টু বলে, টের পেলে দাদু মেরে ফেলবে। কাল তো ধরেই ফেলত আর একটু হলে। তাড়াতাড়ি মাদুরের তলে গুঁজে দিল। তবু আক্কেল হয় না।

সোনা কাকুতিমিনতি করেঃ আজকে তো আসবেই না মামামণি। একটি-বার দে। উনি এত ভাল বলছেন, হার পরে দেখিই না একটু আয়নায়। তক্ষুনি আবার খুলে দেবো। বিদ্যের কিরে—এই বন্ধনতলায় বসে দিব্যি করছি।

ঘণ্টু গুম হয়ে আছে। সোনা তখন সাহেবকে বলে, তুমি উঠতে পারো না? দেখো, পড়ে যেও না আবার—

দেহ জীর্ণ, পা খোড়া—তবু কাজের মধ্যে আর এক মূর্তি। লম্ফ দিয়ে সাহেব উঠে গেল উপরে। হাতের মুঠোয় লকেটসুদ্ধ হার। একশ টাকা কি—দাম তিন-চারশ'র নিচে নয়।

দুয়োর খোলা, বেরিয়ে পড়লেই হয় এবার। কিন্তু গলা বাড়িয়ে আছে অবোধ মেয়েটা। মেয়ে আশালতার—অনেক কাল আগে যার যৌবন-ভরা দেহ বঞ্চনা করে গয়না খুলে খুলে নিয়েছিল। চোর হয়ে গয়না কেবল খুলে খুলেই নিলে সাহেব, চোখ বোজবার আগে একজন কাউকে পরিয়ে দেখবে না! হায় রে

হায়, সাহেব-চোরেরও সাধ !

হার পরিয়ে সত্যি সত্যি সুন্দর দেখায় সোনাকে। আশালতা ছিল নিশি-রাত্রের ঘুমন্ত মেয়ে, তার মেয়ে সাঁজের বেলা হার গলায় পরে আয়নায় দেখছে। আর এক ছোট্ট মেয়ের মুখ মনে এলো—পোশাকের দোকানে মোমের পুতুলের মতো বড় ঘরের মেয়েটা, সঙ্গে দুর্গাপ্রতিমার মতো তার মা। নফরকেষ্টর হাতের খেলায় পছন্দর জামা খুলে দিতে হল মেয়ের গা থেকে। বড়দের বেলা আটকায় না, ছোটমানুষের গায়ের জিনিস খোলা বড় কঠিন কাজ।

আজও করতে হত তাই। সাহেব নিশ্চয় করত। কিন্তু মা-কালী বড্ড বাঁচিয়ে দিলেন।

মধুসূদন রাত্রের মধ্যে ফিরবে না—এরই মধ্যে এসে পড়ল। আগেপিছে বোধকরি গাঁয়ের অর্ধেক মানুষ—কোমরে দড়ি বেঁধে হৈ-হৈ করে তাকে নিয়ে এলো। দস্তুরমতো মারধোর হয়েছে—মুখের একটা দিক ফুলে চোখ একেবারে ঢেকে গিয়েছে। কপালের পুরানো দাগটার নিচে। যৌবনে চৌকিদার ঠেঙানোর ঐ দাগ – অন্তিম বয়সে না-জানি কোন অন্যায় রুখতে গিয়ে আবার নতুন জয়-পতাকা জুটিয়ে আনল।

সেই মূর্তি দেখে সোনা ডুকরে কেঁদে মামামণির দিকে ছুটে যায়। গাঙ্গুলি বাড়ির ছোটবাবু অনন্ত পুরোবর্তী। সে ধমক দিয়ে উঠল ঃ এই ও তফাত যা-সরে যা –

ফণা-তোলা সাপের মতো ফোঁস করে ওঠে। ভীষণ এক বাচ্চা-গোখরো।

কেন বেঁধেছে আমার মামামণিকে ? দড়ি খোল কষ্ট হচ্ছে—

ঝাঁপিয়ে পড়ে সোনা মধুসূদনের উপর। দড়ি ধরে টানাটানি করে ঃ খুলে দাও, খুলে দাও। গরু-ছাগলের মতো কি জন্যে মামামণিকে বেঁধে আনবে ?

অনন্ত খিঁচিয়ে ওঠে ঃ চোর-ছ্যাঁচোড়কে বাঁধবে না তো ফুলের মালা পরিয়ে পুজো করবে ?

চোর !

যেন চাবুক খেয়ে সোনা পিছিয়ে আসে। খানিকটা সরে এসে সবিস্ময়ে মধুসূদনের দিকে চায়। যেন এক নতুন মানুষ দেখছে। অনতিস্ফুটকণ্ঠে বলে, চোর মামামণি ?

ভিড়ের থেকে কে যেন বলল, না না, এ মানুষ চুরি করবে, তাই কখনো হয় ! ভিতরে অন্য-কিছু আছে !

অনন্ত বলে, আমিও তাই ভেবেছিলাম। অন্য সবাইকে সন্দেহ করেছি – যে মানুষ অন্যায়ের সঙ্গে লড়ে সর্বস্ব খুইয়েছে, তার কথা মনে আসে কি করে ? কিন্তু আমার আড়াই বছরের মেয়ে দেখিয়ে দিল – সে তো আর মিছে কথা বলবে না। হাকিমের সামনে আইডেণ্টিফিকেশন-প্যারেড হয়, তেমনি ব্যাপার আমাদের বাড়ি। পরে অবশ্য নিজেও স্বীকার করল – অভাবে পড়ে নাকি করে

ফেলেছে।

স্বীকারটা কি ভাবে করল, মুখের উপরেই তার সুস্পষ্ট চিহ্ন। এত মানুষের ভিতর বোধ করি কিছু লজ্জা হয়েছে অনন্তর। বলে, ভাল বংশের একজন মুরুব্বি মানুষ – তাঁর কাণ্ড দেখে মেজাজ থাকে না। অভাবের কথা আমাদের বললেই হত, মাইনে কিছু বাড়িয়ে দিতাম। তাই অসৎপথে মতি যাবে – ছিঃ ছিঃ।

বলছে অন্য কেউ নয় খুলনা কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত পেস্কার অনন্ত গাঙ্গুলি। ভিড়ের লোকেরাও যা মুখে আসে বলছে। ভণ্ড পামরের উপর সকলেরই জাত ক্রোধ (নিজের প্রতিচ্ছবি পায় বলে নাকি)।

সোনার পলক পড়ে না, একদৃষ্টে চোর দেখছে। কই, চোর হয়েও এক তিল বদল হয়নি, মামামণির। মুখের দিকে অবোধ করুণ চোখদুটো তুলে আবার প্রশ্ন করে মামামণি, তুমি চোর?

চোরাই-মালের খোঁজে তোলপাড় ওদিকে। মধুসূদন খুঁটির মাথা দেখিয়ে দিয়েছে, নেই সে বস্তু। বারম্বার হুংকার দিচ্ছে অনন্তঃ কোথায় বের করো শিগগির। ঘরের জিনিসপত্র তচনছ করছে, রান্নাঘরের হাঁড়িকুড়ি ভাঙছে। বস্তায় চাল ছিল চাট্টি – উঠানে ধুলোর মধ্যে ছড়িয়ে দিল।

সোনা হঠাৎ অনন্তর কাছে ছুটে গিয়ে পড়ে। দু-চোখে ধারা গড়াচ্ছে, কাতর দৃষ্টি মেলে কেঁদে কেঁদে বলে, মামামণি চোর নয়। ওদের বলে দাও ছোটবাবু, মামার বাঁধন খুলে দিক।

কাপড়ের নিচের হার খপ করে এঁটে ধরে অনন্ত চেঁচিয়ে ওঠেঃ এই যে – দেখ তোমরা। আড়াইবছুরে মেয়ে আমার ঠিক ঠিক চোর ধরিয়ে দিল। এই সে জিনিস।

সাহেব ইতিমধ্যে গা-ঢাকা দিয়েছে। আমতলা পার হয়ে ঝোপের ভিতরে চলে যায়। কয়েক পা গিয়েই বিল। খুশি মতন আ'লের আড়ালে বসে পড়লে, মানুষ কোন ছার, যমদূতেও খুঁজে পায় না। কিন্তু পা দুটো কে যেন আটকে দিল। এই বীরত্বের আসরে কথাবার্তা কেউ খাটো গলায় বলছে না। চোরের নামে মধুসূদনের যে উৎকট ঘৃণা! ট্রেনের কামরার সেই কথাগুলোঃ চোরের অল্পস্বল্প শাস্তি নয় – ফাঁসি লটকে গাছে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

সেই মানুষটা নিজেই আজ চোর হয়ে যাচ্ছে!

হার হাতে নিয়ে অনন্ত গর্জায়ঃ লকেটে নাম লেখা আছে, এই দেখ। আমার মেয়ের হার চুরি করে ভাগনির গলায় পরানো হয়েছে।

সাহেব এসে বলে পেন্নাম হই গাঙ্গুলিমশায়। ও হার আমি পরিয়ে দিয়েছি। বল্‌রে সোনা, কে পরিয়েছে। সত্যি কথা বলবি। সাহেব আমি। নাম শোনেনি?

[মা-কালী, মন্দ হবার জন্য ছোট বয়স থেকে মাথা খুঁড়ছি—দুনিয়া জুড়ে

সকলের ভাল করে বেড়াচ্ছ, আমার বেলা মন্দটুকুও সরল না তোমার !]

জরায় জীর্ণ বুকের উপর থাবা মেরে সাহেব বলে, আমি সাহেব-চোর। কাজখানা দেখেও বুঝল না কেউ ?

সোনার দিকে চেয়ে হেসে বলে, চোর দেখতে চেয়েছিলে খুকি, দেখে নাও। চোখ বড় বড় করে দেখ। এত বড় চোর তল্লাটে আর নেই।

জনতার আক্রোশ ফেটে পড়ে। মাথা ঘুরে সাহেব পড়ে যায়। মসীময় করাল স্রোত—ধাক্কা মেরে যেন তার মধ্যে ফেলে দিল। বিশ্বসংসার ডুবে গেছে সেই আবর্তে। তীরের বেগে সাহেব ভেসে চলল। অন্ধকারের সমুদ্রে নিয়ে ফেলবে লহমার মধ্যে। সাহেব আঁকুপাঁকু করে। মরলে হবে না—যমদূত সেখানেও ডাণ্ডস নিয়ে তৈরি। সে নাকি আরও নিদারুণ ! বাঁচতেই হবে, না বাঁচলে রক্ষা নেই।

যেন বাতাসে খবর হয়ে গেল, সাহেব-চোরকে ধরে গাঙ্গুলি-বাড়ি নিয়ে আটক করেছে। যজ্ঞিবাড়ি এমনিই বিস্তর লোক, এখন লোকারণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকলে মধুসূদনের পক্ষে। ন্যায়ের জন্য জীবন দেয় মানুষটা, কপালের উপর সেই জয়তিলক বয়ে বেড়চ্ছে—নির্যাতনের চোটে কী একটা কথা বলল, সেইটেই মেনে নিতে হবে।

অনন্ত বলছে, মধুবাবু ছাড়া কাছাকাছি অন্য কেউ আসেনি, আমি বিশেষ খোঁজখবর নিয়েছি—

বড়ভাই লক্ষীকান্ত চটে গিয়ে বলেন, মধুসূদন না হয়ে আমি যদি কাছাকাছি থাকতাম, আমাকেও ঠেঙাতে ঐ রকম ?

লজ্জিত অনন্ত বলে, মধুবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছে। ব্যস্ত হয়ো না দাদা। পঁচিশটা টাকা দিয়ে দেব। মলম-টলম লাগিয়ে দু-দিনে ঘা সেরে নেবেন।

এমনি সময় নমিতা বেরিয়ে এলো। আহ্নিকে বসেছিল, সেজন্য দেরি। সরে গিয়ে সকলে পথ করে দেয়। বয়সে প্রৌঢ়া হয়ে শুচিবাই আরও বেড়েছে, বকের মতন লম্বা পা ফেলে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে এসে দাঁড়াল। গাঙ্গুলিবাড়ির সম্ভ্রম বিবেচনা করে বুদ্ধিমান অনন্ত প্রেমপত্র ও গয়নার ব্যাপার চেপে গিয়েছিল সেবার। বাড়ির মধ্যে গোপন তর্জন-গর্জন হয়ে থাকবে, বাইরে কিছুই প্রকাশ নেই।

নমিতার চোখ বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে ওঠে : মাগো মা, কী সাংঘাতিক চোর মচ্ছবের বাড়ি ঢুকে টিপিটিপি কাজ সেরে পালাল, কারো একটিবার চোখে পড়ল না।

সাহেব প্রাণপণ চেষ্টায় চোখ খুলে নমিতাকে দেখে। টিপিটিপি আরও যে একদিন ঢুকেছিলাম পুণ্যবতী ঠাকরুন, চিনতে পারো না ? চোখে ধারা

গড়িয়েছিল, পা ধরতে যাচ্ছিলে, ধর্মবাপ বলেছিলে।

কিন্তু দুই ঠোঁট একত্র করে দাঁতে দাঁত চেপে সে নিঃশব্দে চেয়ে রইল। ভালোরা ভালোই থেকে যান—দাগি মানুষ আমরা সজ্জনদের কলঙ্কের দাগ ভাগ করে নেবো। ভালো তো সবাই—যতক্ষণ না ধরা পড়ে যাচ্ছে। সে ধরা ক-জনেই বা পড়ে!

জনতার ভালো লোকেরা শাস্তির নানান রকম পন্থা বলছে। কেউ বলে, আর এক-পা খোঁড়া করে হাত দুটো মুচড়ে ভেঙে নুলো করে ছেড়ে দাও।

অন্য জনে জুড়ে দিল ঃ তারপর বস্তায় পুরে ডাঙা-মুলুকে ফেলে দিয়ে এসো। বেড়াল যেমন বাড়ি থেকে বিদায় করে।

চোরের উপর আক্রোশ সর্বজনার। আর এক ভালো লোক বলে, ডাঙা-মুলুক জ্বালিয়েপুড়িয়ে মারবে, নুলো করে দিয়ে ঠেকাবে না। বস্তায় মুখ বেঁধে মাঝগাঙে ফেলে দিয়ে এসো, আপদের শান্তি!

কোন যুক্তি খাটল না। চোরের কপালটা ভালো। থানার ছোটদারোগা পাশের গাঁয়ে তদন্তে এসেছিল, সাহেব-চোরের কথা শুনে নাম কেনবার লোভে দলবল নিয়ে এসে পড়ল। খাতা বের করে সকলের মুকাবেলা নাম-ধাম-বিবরণ লিখে নিচ্ছে।

নাম কি তোর?

গণেশচন্দ্র পাল—

সাকিন?

সাহেব চুপ করে থাকে। একটু যেন হাসির ঝিলিক মুখের উপরে ঃ

সাকিন বলিস না কেন রে? ভাল চাস যদি, ঠিক ঠিক জবাব দিয়ে যা।

সাহেব বলে, একটা সাকিন পাকা আছে হুজুর, সেই মাত্র জানি। এখানে নয়, ওপারে গিয়ে। কুম্ভীপাক-নরক। দুনিয়ার উপর আমার কোন সাকিন নেই।

কি লিখে নিল দারোগা, কে জানে। লিখে সাক্ষিদের সই নেওয়া হল। কাজ চুকিয়ে, আসামি নিয়ে চলে যাচ্ছে এবার। নমিতা কি কাজে একটু ভিতর দিকে গিয়েছিল, ছুটে এসে পড়ে ঃ খাওয়া হল না যে!

দারোগা একগাল হেসে বলে, ব্যস্ত হতে হবে না। আপনাদেরই তো খাচ্ছি। তদন্তে যেখানে গিয়েছিলাম, তারা ছাড়ল না। গলায় গলায় হচ্ছে। নেমন্তন্ন তোলা রইল দিদি, আর একদিন এসে হবে।

নমিতা বলে, আপনার না হল দারোগাবাবু, এ মানুষ যে উপোসি। বাড়িতে বউভাত, নতুন বউ জনে জনের পাতে ভাত দিয়ে বেড়াল—

চোরের পাতেও ভাত দেবেন নাকি?

আবদারের সুরে নমিতা বলে, আপনাকে একটু বসতেই হবে। একমুঠো না খাইয়ে আমি ছাড়তে পারব না।

চোখ বুঁজে সাহেব দেয়াল ঠেস দিয়ে ছিল, চকিতে চোখ মেলে তাকায়। দুশ্চারিনী ভণ্ড স্ত্রীলোকটির কণ্ঠের মধ্যেও আশালতার মা কথা বলে উঠলেন। যেন সুধামুখীর গলা, বউঠান সুভদ্রার গলা। বলাধিকারীকে মনে পড়ে অনেক দিনের পর। স্ত্রী ভুবনেশ্বরীকে দেখেছেন, কাজলীবালাকে দেখেছেন, হুন্দমুন্দ নিজেও চেষ্টা করছেন। একদিন বুঝি বড় হতাশ হয়েই কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল ঃ মানুষ জাতটারই দোষ রে! চেষ্টা যতই করো, মন্দ হবার জো নেই। সুধামুখীর ঘরে ঠাণ্ডাবাবুও নাকি এমনি সব বলতেন ঃ অমৃতের পুত্র—মরতে সবাই গররাজি।

উৎসব-বাতির পেট্রোমাক্স আলোয় তাকিয়ে দেখল, নমিতার বড় বড় চোখের সজল দৃষ্টি তার উপরে। মারের চোটে ঝিম হয়েছিল সাহেব, স্ফূর্তি পেয়ে হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ভালোর অভিশাপ একলা তার উপরেই নয়। এ জীবনে বিস্তর ভালো চোখে পড়েছে। যাদের দেখেনি তাদের মধ্যেও কত না-জানি রয়েছে। দেখে যাদের মন্দ ভেবেছে—তিলকপুরের মন্দাঠাকরুন যেমন—আজকে মনে হচ্ছে, ঢং দেখিয়ে তারা মন্দ সেজে বেড়ায়। দায়ের মুখে ভালো মূর্তিটা বেরিয়ে পড়বে। অমৃতের বেটা-বেটি সব, ভালো না হয়ে উপায় আছে? মানুষ যতকাল আছে, জাতের স্বধর্ম বয়ে বেড়াতে হবে।

॥ শেষ ॥
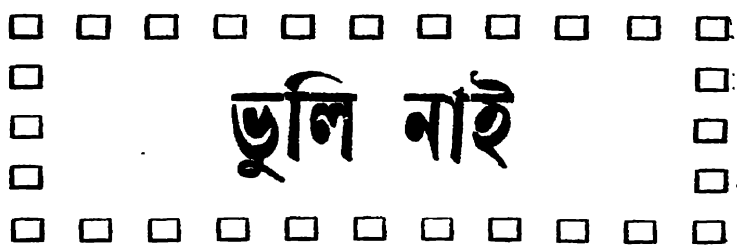
ভুলি নাই

মনোজ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো
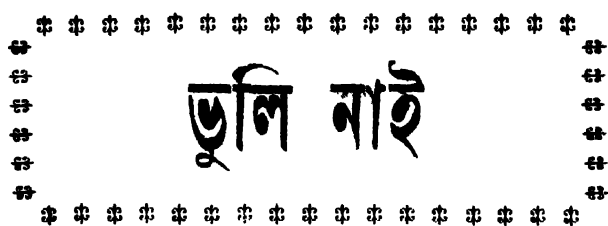
[উপন্যাস]

[রচনাকাল ১৩৫০]

কুন্তল-দা, তোমাদের ভুলিনি। পথে-ঘাটে ট্রামে-বাসে নিরুদ্বিগ্ন মানুষগুলোকে দেখি, খাচ্ছেদাচ্ছে, অফিস করছে, রোগে ভুগে নির্বিবাদে মরে যাচ্ছে। দিব্যি আছে। আমিও ওদের একজন হয়ে থাকব, মল্লিকার মুখ চেয়ে কতবার ঠিক করেছি। কিন্তু পারি কই ? নিঃশব্দ রাত্রে তোমরা এসে হাজির হও, ফিস-ফিস কথাবার্তা···আমার পাতানো বউ নিরু হাসতে হাসতে এসে দাঁড়ায়··· অভিমানাহত আনন্দ আসে···স্তব্ধমূর্তি সোমনাথের ছায়া দেখে তাড়াতাড়ি যুক্তকরে প্রণাম করি···জগৎ দত্ত, উমারানী, মায়া, সরোজ পাকড়াশি—জানা অজানা কত সাথী যেন যুগান্তরের ঘুম ভেঙে উঠে আসেন।

ভুলবার জো আছে তোমাদের ?

আমার বাপ হলেন নীলকান্ত রায়। অমন ডাকসাইটের প্রিন্সিপাল তখনকার দিনে কোন মফস্বল কলেজে ছিল না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হয়, আমি তখন ছেলেমানুষ। মনে পড়ে, সেদিন রাখিবন্ধন—কোন বাড়ি রান্না হয়নি, অরন্ধন-ব্রত পালিত হচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায় ছেলে-বুড়ো স্বদেশী গান করছে, এ ওকে হলদে রাখি পরিয়ে দিচ্ছে। আমরা কলেজ-সংলগ্ন কোয়ার্টারে থাকি। গোলমাল হবে মনে করে মা ইস্কুলে যেতে দেয়নি, তাই স্ফূর্তির অবধি নেই। শত কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উঠল ; ছুটে সদর-দরজায় গেলাম।

প্রকাণ্ড মিছিল করে ছেলেরা বেরিয়ে যাচ্ছে। আচম্বিতে বাধা পড়ল, বাবা অফিস-ঘরের বারান্দায় এসে গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলেন, কুন্তল, শোন এদিকে—

সাড়ে চার'শ ছেলের মধ্যে কারও ক্ষমতা ছিল না, এ ডাক অমান্য করতে পারে। সেই আমি প্রথম দেখলাম কুন্তল-দাকে। বারান্দায় উঠে বাবাকে প্রণাম করে নিঃসঙ্কোচে দাঁড়ালেন। আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছিল, কী যে আছে ওঁর অদৃষ্টে! আজও মনে আছে সে ছবিটা।

ছাত্রের এ রকম বলিষ্ঠ ভঙ্গির সঙ্গে—বাবা বলে নয়, কলেজ-সম্পর্কিত কেউ কোনদিন পরিচিত নন। ভ্রূকুঞ্চিত করে বাবা বললেন, ব্যাপার কি কুন্তল ?

আপনার কলেজ ভেঙে নিয়ে যাব বলে এসেছি। বন্দেমাতরম্ বলতে দেবে না, সার্কুলার দিয়েছে। প্রাণে এ অপমান সইছে না।

সকলে হতবাক্। এই ভয়লেশহীন ছেলেটার মাথায় বজ্রপাত হল বলে—দু-এক ঘণ্টায় হোক বা দু-এক দিনের মধ্যে হোক—কারও এ সম্বন্ধে লেশমাত্র সংশয় রইল না। আর একটা কথাও না বলে বাবা নিজের ঘরে চলে গেলেন। গণ্ডগোল ও চিৎকার অতঃপর একেবারে বন্ধ হয়ে গেল, অনেক ছেলে সুড়-সুড় করে ক্লাসে ঢুকল। অবশিষ্ট বোধ করি জন পঞ্চাশ নিয়ে কুন্তল-দা দৃঢ়পদে

বেরিয়ে গেলেন। কলেজ-সীমানার বাইরে অনেক রাত্রি অবধি সভা চলল, মাঝে মাঝে বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল।

পরদিন অভাবিত ব্যাপার—দেখি আমাদের বৈঠকখানায় কুন্তল-দা এসে বসেছেন। আর পাঁচ-সাত জন বাইরে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হল। সে সব কথার কিছু মনে নেই, মনে রাখবার বয়সও তখন আমার নয়। নানা ছুতোয় আমি ঘরের মধ্যে এসে অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধায় ঐ প্রদীপ্ত মুখ কিশোরটিকে বারংবার দেখেছিলাম। শেষ কথাটি মনে আছে, বাবা বলছেন, বড় কঠিন পথ—পারবে তোমরা ?

পারব মাস্টার মশাই, আপনি আশীর্বাদ করুন।

একজনও যদি ফিরে এস, আমাকে পাবে না তোমাদের মধ্যে।

কলেজের সেক্রেটারী ছিলেন স্থানীয় সরকারি উকিল। তিনি খুব সহানুভূতি দেখিয়ে বাবাকে বললেন, আপনার মানা না শুনে বেরিয়ে গেল ? বড় অন্যায় কথা—

বাবা বললেন, মানা আমি করি নি। ব্যাপারটা শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

ভদ্রলোক বললেন, যাই হোক—মোটের উপর ঐ একই দাঁড়াল। দলের চাঁই ক'টার নাম লিখে দিন তো—

কাকে ফেলে কার নাম লিখি মশাই ? ভীতু দু-চারটে হয়তো ক্লাসে গিয়েছিল, কিন্তু মনে মনে তারাও ঐ দলের। আর সত্যি বলতে কি—আপনার আমারই কি কম বেজেছে ? নেহাৎ বুড়ো হয়ে পড়েছি বলে চেঁচাই নে—

সেক্রেটারি মুখ লাল করে বললেন, কলেজে ছেলে না থাকায় আপনি খুশি হয়েছেন দেখতে পাচ্ছি।

ছেলে নেই বলে আমার এদ্দিনের গোলামি খসে গেল, এর জন্যে সত্যি খুশি হওয়া উচিত। এতগুলো টাকার মায়া নিজের ইচ্ছায় ত্যাগ করা মুশকিল হয়ে পড়ত।

এক কথায় বাবা চাকরি ছাড়লেন ; শপথ ভেঙে ছেলেরা ফিরে আসে কিনা, দেখবার জন্য অপেক্ষা করে রইলেন না। স্ট্রাইক অবশ্য বেশি দিন টেঁকে নি, প্রায় সবাই কলেজে ফিরে এসেছিল—কুন্তল-দা পর্যন্ত। কিন্তু আর একটা পথে যে ঐ সঙ্গে যাত্রা শুরু হয়ে গেল, জীবনান্ত অবধি কারও ওঁদের ফিরে তাকাবার ফুরসৎ হল না।

জেলার কালেক্টর পর্যন্ত হাতে ধরে বাবাকে অনুরোধ করলেন, তিনি শুনলেন না। বাড়ির মধ্যেও তুমুল ঝড় উঠল। বাবা হাসিমুখে সকলকে নিরস্ত করতেন ; বলতেন, আমার ছেলেরা জীবন দিচ্ছে—আর মাস মাস নগদ তঙ্কা গুনে নিয়ে কি করে আমি রাজভোগে থাকি বল।

সব জায়গায় এমনই এত খাতির, তার উপর চাকরি ছাড়ার ব্যাপারে বাবা দেবতাবিশেষ হয়ে দাঁড়ালেন। যেখানে স্বদেশি সভা, সেখানেই তাঁকে যেতে হয়। নিতান্ত অপারগ হয়ে দু-এক ক্ষেত্রে যদি 'না' বলেছেন, পা জড়িয়ে ধরে একরকম জবরদস্তি করে পাল্কিতে তুলে নিজেরা তাঁকে বয়ে নিয়ে যেত। বস্তুত ছেলেরা একেবারে ক্ষেপে গিয়েছিল। কুন্তল-দা প্রভৃতিকে ভীষণ রকম শাস্তি দেবার জন্যে জল্পনা-কল্পনা হচ্ছিল, গতিক দেখে সেসব স্থগিত রইল। সেক্রেটারি একদিন কুন্তল-দাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি না যাওয়ায় শেষকালে উকিলবাবু নিজেই নাকি খুব গোপনে তাঁর হস্টেল-ঘরে আসেন। একথা কুন্তল-দার কাছে শোনা—অতএব মিথ্যা হতে পারে না। শুভার্থী অভিভাবকের মতো স্নেহের স্বরে তিনি বলেছিলেন, তোমরা রাজনীতি করতে যাচ্ছ, অন্যায় কিছু নয়, তার একটা কালাকাল আছে তো! এখন শিক্ষার সময়, লেখাপড়া শিখে মানুষ হও। বয়স হলে রাজনীতি কোরো—

কুন্তল-দা জবাব দিলেন, আপনার রাজনীতি আর আমার রাজনীতি একেবারে আলাদা স্তর। আপনার রাজনীতির মানে টাকাকড়ি, মোটরগাড়ি, সরকারি খেতাব, সাহেবসুবোর কাছে প্রতিপত্তি, কাউন্সিলের মেম্বার হওয়া—আর আমাদের রাজনীতি হল অন্ধকার জেল, বেত খাওয়া, আপনার জনের সঙ্গ থেকে চিরবঞ্চনা, দ্বীপান্তর, হয়তো বা ফাঁসের দড়ি। আপনার ঐ বয়স অবধি টিকে থাকা কপালে নেই। যদি থাকে, তখন হয়তো আপনার রাজনীতিই করব।

বিপাকে পড়ে এমন কথাও উকিলবাবু হজম করে নিলেন, কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। কলেজের খাতায় যথারীতি কুন্তল-দার নাম রইল। পড়াশুনোর সময় নেই, সে ইচ্ছাও নেই—তবু নিতান্ত কাজের গরজে কলেজের আওতায় পড়ে থাকা। নূতন বছরে নূতন নূতন ছেলেরা আসে, দেখতে দেখতে তাদের মধ্যে কুন্তল-দার সম্পর্কে সম্ভব-অসম্ভব নানা কাহিনী ছড়িয়ে যায়,—তাঁর কাছে যাবার জন্য, তাঁর কথা শুনবার জন্য, এক ছত্র লেখা চিঠি পাবার জন্য সকলে ব্যগ্র। নূতন এক প্রিন্সিপ্যাল এলেন, কুন্তল-দাকে ঘাঁটাতে তিনি সাহস করতেন না—ছেলেদের সর্বদা কড়া শাসনে রাখতেন, যেন তারা লেখাপড়ায় অধিক মন-সংযোগ করে, আড্ডা দিয়ে না বেড়ায়—ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রকারান্তরে কুন্তল-দার সঙ্গে মিশতে মানা করে দেওয়া আর কি।

তখন কুন্তল-দা হস্টেল ছেড়ে কাছাকাছি গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে বাসা নিলেন, ছেলেদের যাতে অসুবিধা না ঘটে। একবার বামালসুদ্ধ ধরা পড়লেন। জেল হল। ঐ সঙ্গে কলেজে থেকেও নাম কাটা গেল।

সেই প্রথম ধরা পড়ে তিনি এক কীর্তি করেছিলেন, শুনেছি। পরবর্তী

কালে ঐ প্রসঙ্গে উঠলে কুন্তল-দা হাসতেন, আর যাঃ—বলে আমাদের তাড়া দিতেন। তাঁকে হাজতে আটকে রেখেছিল। সারারাত্রি তিনি দেওয়ালে মাথা কুটেছিলেন। সকালে দেখা গেল, রক্তারক্তি ব্যাপার। বৃত্তান্ত কি? তিনি কানে শুনেছেন, কর্তাদের নাকি নানা রকম মিষ্টি ও তেতো ব্যবস্থা আছে —যার জন্য এর আগে অনেক ছেলে দলের কথা ফাঁস করে দিয়েছে। সে যে কি ব্যাপার, কোন আন্দাজ ছিল না—পাছে তিনিও ঐরকম ফাঁদে আটকা পড়েন, তাই কুন্তল-দা মরতে চেয়েছিলেন···

স্বীকারোক্তির কথায় মনে পড়ে, আমাদের সরোজ পাকড়াশির কথা। গুলি-বেঁধা অবস্থায় সে ধরা পড়ে। প্রশ্ন হল, কি জান তুমি? দিনের পর দিন দলবদ্ধ হয়ে এসে তাকে উত্যক্ত করে. বল, তুমি কি জান?

অবশেষে একদিন সরোজ বলল, শুনবেন, না দেখবেন?

ওরা এ ওর মুখে তাকায়।

দেখুন তবে—শ্লথ হাত দু'খানা সরোজ বুকের উপর আনল—হয়তো কোন গোপন চিঠিপত্র আছে—নিঃশ্বাস নিরুদ্ধ করে ওরা প্রতীক্ষা করছে। কি? ও কি? একটানে সরোজ ব্যাণ্ডেজ ছিঁড়ে ফেলে। রক্ত তীরবেগে ছুটছে। সে অচৈতন্য হয়ে পড়ল; চেতনা আর ফেরেনি।

ঐ সরোজের মা—কী হিংস্র মেয়েমানুষ! সরোজের মা বলে আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত. মাথায় থাকুন তিনি—কিন্তু মোটেই সুবিধের লোক ছিলেন না, আমাদের যেন দাঁতে পিশে ফেলতে চাইতেন, অহরহ আঙুল মটকে বন্দোমাতরম্-ওয়ালাদের উদ্দেশ্যে গালি পাড়তেন, চেঁচামেচি করে একদিন হিরণকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন আর কি! অথচ তাঁর দু'টি ছেলেমেয়ে এই পথের পথিক হয়ে গেল, অত সতর্ক থেকেও মা-ঠাকরুন ঘরের আগুন সামলাতে পারলেন না···

শান্তিদিদির কথা মনে পড়ে। তাঁর স্বামী পুলিশের মধ্যে নামজাদা লোক; এদিকে অত্যন্ত অমায়িক ও ভদ্র। তাঁর বিশ্বাস-প্রবণতার দরুণ আমাদের হিরণ পালাবার সুবিধা পেয়েছিল। তাকে ধরবার জন্য ভদ্রলোক তোলপাড় করে বেড়াচ্ছিল। নারায়ণতলায় গিয়ে শান্তিদিদিকে সেই সময় গোপনে বলতে শুনেছি, ধরলে দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দেবে ঠাকুর, যেন ধরা না পড়ে।

তোমার বরের চাকরী থাকবে না তা হলে।

শান্তিদিদি বললেন, একবেলা আধপেটা খেয়ে থাকব ভাই···

আবার কুন্তল দার মাকে দেখেছি, আমাদের দলসুদ্ধ সকলের মা। ছেলে চোখের সামনে তিলে তিলে মারা গেল, মায়ের মুখের স্নিগ্ধ হাসি কোনদিন

নিষ্প্রভ হতে দেখলাম না। বরঞ্চ সুরমাই এসে এক একদিন রাগারাগি করত, আপনি পাষাণ—

আমরা অনেকেই সেখানে বসে, সুরমা বলেছিল, নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখছেন কুন্তল-দা, সেখানে সবাই সুখী—সবাই ভোগী। কিন্তু আপনি নিজে কি ভোগ করে গেলেন, বলুন তো—

কুন্তল-দা চাপা মানুষ; কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেদিন কি হল—যেন মনের দরজা খুলে গেল। গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন, এরজন্য আমারও কষ্ট হয় বোন। অনেকের অনেক দিনের জমানো অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত হল আমাদের উপর দিয়ে। সংসার আমার জন্য নয়—শান্তি বল, সুখ বল, কিছুই আমি নিলাম না—পথে পথে ভেসে গেলাম। এই ভেসে যাওয়ার বদলে তোমাদের লক্ষ লক্ষ সংসার যেন আনন্দে ভরে ওঠে। নইলে বৃথাই আমাদের আত্মবঞ্চনা।

শোন আর এক গল্প। জেলে ছিলাম সে সময়টা। ভোরবেলা মিষ্টি রিনরিনে কণ্ঠে শুনতে পেলাম, যাচ্ছি দাদা, আপনারা দোয়া করুণ। আর একজন বলছে, নমস্কার—ভুলবেন না। স্বাধীন দেশে আবার আমরা জন্মাব।

দুই বন্ধু তারা, এর আগে চোখে চোখে তাদের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম! দুজনে দৌড় দিল, কে আগে ফাঁসের দড়ি গলায় পরতে পারে!···

এদের দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। স্বাধীনতার আজ অভিনব সংজ্ঞা পেয়েছি। পন্থাও নূতনতম। তবু কি ভুলতে পারি—ছবি হয়ে এরা মনের মধ্যে জলজল করে। বুড়ো হয়েছি, তোমরা দাদা বলে ডাক, উৎসুক মুখে বল, আগাগোড়া একটানা শুনতে চাও। কিন্তু বলি কি করে ভাই? প্রথম বয়সে স্বপ্ন নিয়ে পথে বেরিয়েছি, জীবনভোর তো প্রতীক্ষায় রয়ে গেলাম, আসছে···আসছে···আসছে···। দিন যখন আসবে, স্মৃতি যদি তখন একেবারে মরে না যায়, দস্তুরমতো আসর করে জাঁকিয়ে সকল কথা শোনাব। সবুর কর সে ক'টা দিন।

রানী

রানীর অপমৃত্যু হয়েছে, এই আমরা জানতাম। হয়েছেও তাই! বলছি শোন।

পুরী গিয়েছিলাম।

যাওয়ার কিছু ঠিক ছিল না, মেজমামাই যেতেন। তিনি রেলে কাজ করেন, পাশ পেয়েছিলেন। হঠাৎ বাতের অসুখ বেড়ে শয্যাশায়ী হলেন। তখন আমাকে ভরসা দিয়ে বললেন, তুমি যাও শঙ্কর, পাশটা নষ্ট হবে কেন! রেলের কেউ জিজ্ঞাসা করলে স্রেফ আমার নাম বলে দিও—কে কাকে চেনে?···

আর আমাদের রায়বাহাদুর রয়েছেন সেখানে, গিয়ে দেখা কোরো—কোন রকম অসুবিধা হবে না।

রায়বাহাদুর হলেন অনন্তপ্রসাদ চক্রবর্তী। তোমাদের মনে পড়বে কিনা জানি না, তাঁর বুড়ো বয়সে বিয়ে করা নিয়ে সেবারে খবরের কাগজে অনেক টীকা-টিপ্পনী হয়েছিল। ছেলেদের সঙ্গে ঐ নিয়ে খুব গণ্ডগোল হয়, এবং রায়বাহাদুরের সন্দেহ—ঐ লেখালেখির ব্যাপারে তাদের যোগসাজস ছিল। এখন অবশ্য সব মিটে গেছে। এক রকম সেই থেকেই রায়বাহাদুর নূতন বৌ এবং আগের পক্ষের কচি ছেলে-মেয়েগুলো নিয়ে পুরীতে বাস করছেন। তাঁর এক ছেলে যতীশ্বর মেজমামার কলেজের বন্ধু– অভিন্নহৃদয় বললে হয়। এখন আবার এক অফিসে কাজ করছেন। ওঁদের কলকাতার বাড়িতে মেজমামার আড্ডা।

পুরী পৌঁছলাম সকালবেলা। একটা হোটেলে গিয়ে উঠলাম। বিকালে রায়বাহাদুরের খোঁজে বেরিয়েছি। বহুকাল আছেন, অনেকেই চেনে দেখলাম। চক্রতীর্থের দিকে খানিকটা গিয়ে বাঁহাতি এক রাস্তা, সারি সারি বিস্তর ঝাউগাছ, তার মধ্যে প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডওয়ালা দোতলা বাড়ি।

রায়বাহাদুর বাইরের ঘরে ছিলেন, বেরোবার তোড়জোড় হচ্ছিল। ইনভ্যালিড চেয়ার এসেছে, দু'জন চাকর দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে ছেলেপুলের পাল। একটি মহিলাও ছিলেন—নিশ্চয় দ্বিতীয় পক্ষের সেই স্ত্রী। আমায় ঢুকতে দেখে তিনি ভিতরে চলে গেলেন—তবু দামী সেণ্টের গন্ধে ঘর আমোদ করে রেখেছে। বুড়ো বয়সের বউ কি না! রায়বাহাদুর বিরক্তভাবে আমার দিকে চাইলেন, অস্থিচর্মসার বিসদৃশ রকমের লম্বা মুখ—সাড়াশব্দ না দিয়ে এ রকম ভাবে ঢুকে পড়া উচিত হয়নি, বুঝতে পারলাম।

কি চাই তোমার ?

জবাব না দিয়ে যতীশ্বরবাবুর চিঠিখানা তাঁর হাতে দিলাম।

চিঠি, খালি চিঠি···। বিড়-বিড় করে বকতে বকতে পকেট হাতড়ে চশমা বের করলেন। এক নজর পড়ে অবহেলার সঙ্গে ফেলে দিলেন। রুক্ষ গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, তা কি করতে হবে আমায় ?

কিছু না। বলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমি বেরিয়ে এলাম। বড্ড রাগ হল, এ ধরনের মানুষগুলোই এই রকম! আমি কি চাকরি চাচ্ছি, না ওঁর বাড়িতে অন্ন ধ্বংস করবার মতলবে এসেছি ? এমন জায়গায় মানুষ আসে, মেজমামার যেমন কাণ্ড!

আর ও-মুখো যাই না। হোটেলেই শুয়ে বসে গল্প করে কাটাই, সন্ধ্যার দিকে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাই। স্বর্গদ্বারের ওদিকে যে জায়গাটাকে গৌরবাটসাহি বলে, সেখানে লোকজন বড় বেশি যায় না। আমি একদিন গিয়েছি সেদিকে। দেখি বালির উপর চেয়ার পেতে রায়বাহাদুর বসে আছেন। আমি হন-হন করে এগিয়ে গেলাম, তাকালাম না। ফিরবার মুখে দেখলাম, তাঁর স্ত্রীও এসেছেন—বাড়ি ফিরবার উদ্যোগ হচ্ছে।

এর পর মাঝে মাঝে ওদিকে যাই। ঐ একটা জায়গাতেই তাঁরা রোজ এসে বসেন। সেই আমলের খবরের কাগজে লিখেছিল—'একটি পরমা-সুন্দরী কিশোরী বৃদ্ধের লালসায় আত্মাহুতি দিল'…এমনি কত-কি! তাই মহিলাটিকে দেখবার ঔৎসুক্য আছে, আড়চোখে দেখবার চেষ্টা করি। কিন্তু সন্ধ্যার পর ঘোর হয়ে গেলে তবে তিনি আসেন, সুবিধা হয় না। একদিন অবশেষে দেখে ফেললাম। গাড়ি রাস্তায় রেখে বালি ভেঙে তিনি আসছিলেন; একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। চমকে উঠলাম। এ মুখ যে আমার চেনা—খুব চেনা মনে হচ্ছে। অথচ ধরতে পারছি না, মনে পড়ে না—যেন পূর্বজন্মের পরিচিত কেউ, এ জন্মের নয়। মহিলাটিরও আমার দিকে নজর পড়ল, তাড়াতাড়ি মাথায় আঁচল টেনে মুখ ফিরিয়ে তিনি চলে গেলেন।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে লাগলাম। তারপর মনে হল, রানীর মুখের সঙ্গে এঁর আশ্চর্য মিল। কিন্তু রানী কি করে হবে? রানীর অপমৃত্যু হয়েছে। তার সম্বন্ধে সকল কৌতূহলের অবসান হয়ে গেছে।

আলো নিবিয়ে শুয়েছি, ঘর অন্ধকার। হঠাৎ অন্ধকারের পর্দা উঠে যায়… কাল পিছুতে পিছুতে বছর-তিরিশ পিছিয়ে গেল। সেই যখন আমরা থাকতাম হস্টেলে। হস্টেল মানে গোলপাতার ঘর, মাটির মেঝে। শীতকালে মাটিতে শুতাম, বর্ষার সময় বাঁশের মাচা তৈরি করে নেওয়া হত—ঠাণ্ডার জন্য নয়, পিছনের জঙ্গল থেকে রাত্রিবেলা সাপ উঠত, সেই আশঙ্কায়। কুন্তল-দা ফোর্থ ইয়ারে পড়তেন—কি রকম 'পড়তেন' সে তো আগেই শুনেছ ভাই। ফোর্থ ইয়ারের খাতায় নাম ছিল, কয়েক বছর ধরেই ছিল। তাঁর বাড়ি থেকে টাকা আসত হস্টেলের ঠিকানায়, তখন তিনি হস্টেল ছেড়েছেন। ওখান থেকে ক্রোশ-খানেক দূরে দ্বারিক চাটুজ্জে নামে এক ব্রাহ্মণের বাড়ি ছেলে পড়িয়ে খাওয়া-থাকা পান। বাড়ির লোক জানত, হস্টেলে আছেন, তারা তদনুযায়ী টাকা পাঠাত। সে টাকা দিয়ে কুন্তল-দা…না, যাকগে সেকথা। তখন আমার আশ্চর্য লাগত, দুঃখও হত। কত কষ্ট যে করতেন কুন্তল-দা! দ্বারিক চাটুজ্জের অবস্থা সুবিধের নয়—চাকর বাকর ছিল না, খাওয়ার পর কুন্তল-দাকে

এঁটো পাড়তে হত, বাসন মাজতে হত। আর সে কি খাওয়া! সমস্ত বসন্তকাল ধরে চলত সজনের খাড়া, তার পরেই কাঁঠালবিচি আর নটের ডাঁটা একেবারে আশ্বিন অবধি।

কলেজের পর আমরা প্রায়ই যেতাম কুন্তল-দার ওখানে, রবিবারের দিন তো নিশ্চয়ই। রানী অর্থাৎ উমারানীর সঙ্গে চেনাশোনা সেখানেই, সে ঐ বাড়ির মেয়ে। বয়স আঠার-উনিশ—তবু বিয়ে হয়নি। ওঁরা কুলীন, পালটি ঘর খোঁজ করে মেয়ের বিয়ে দেওয়া একটু কঠিন ব্যাপার। আর সেরকম টাকা-পয়সা থাকলে অবশ্য আলাদা কথা।

রবিবারে রবিবারে সেখানে নানা রকম বই পড়া হত—গীতা, আনন্দমঠ, বিবেকানন্দ ও দেউস্করের বই—এই সমস্ত। কুন্তল দার হুকুম ছিল, প্রত্যেক দিনই সবাইকে গীতা পড়তে হবে। যার যেখানে খটকা লাগত, দাগ দিয়ে রেখে দিত; রবিবারের দিন কুন্তল-দা তার মানে বুঝিয়ে দিতেন—একেবারে নিজের মতো করে, ছাপানো বাংলা ব্যাখ্যার সঙ্গে তা মেলে না। এসব পড়াশুনার মধ্যে আমরা এক-একদিন দেখতাম—কুন্তল-দাও দেখেছেন নিশ্চয়—রানী কামরার মধ্যে বসে তদ্গত হয়ে শুনছে, তার যেন সম্বিৎ নেই। সে ছবি আজও মনে করতে পারি। মনে রেখ, পাড়াগাঁ জায়গা, আর রানীরাও কিছু বড়লোক নয়—সেজন্য পর্দার কড়াকড়ি ছিল না, সহজ ভাবেই সে আমাদের সঙ্গে মিশত। একেবারে বাড়ির গায়ে ভৈরব নদী, মাঝে মাঝে আমরা নদীর ঘাটে বসতাম। তখন লক্ষ্য করেছি, রানী জল আনা, কাপড়-কাচা এই রকম নানা ছুতো করে বারবার সেখানে আসা যাওয়া করত।

বর্ষার সময়টা একদিন সকাল থেকে খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। আমার এ রকম হয়েছিল, কলেজ না থাকায় দুপুরবেলা হস্টেলে বসে কিছুতে সোয়াস্তি পেতাম না। ভিজতে ভিজতে গিয়ে উঠলাম সেই চালাঘরখানায়, যেখানে কুন্তল-দার অনন্তশয্যা বারো মাস তিরিশ দিন পাতাই থাকত। একে মেঘলা দিন, তার উপর সে-ঘরে জানালার হাঙ্গামা না থাকায় ভিতরটা আঁধার আঁধার হয়ে ছিল। ঘরে ঢুকে প্রথমটা শুধু কুন্তল-দাকে দেখতে পেলাম—খুব গম্ভীর হয়ে বিছানার উপর বসে আছেন। তারপর অবাক হয়ে গেলাম—এ রকমটা আর কোনদিন হয়নি—দেখি মেজের উপর মুখ নিচু করে রয়েছে রানী, দু'চোখ দিয়ে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। কুন্তল-দা বললেন, এই যে শঙ্কর এসে গেছিস। ভালো হয়েছে, বোস। পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন। বসতেই আমার ডান হাতখানা মুঠোর মধ্যে নিলেন। চুপচাপ, কথাবার্তা নেই—তিনি বিচলিত হয়েছেন বুঝতে পারছি।

এমন অবস্থায় আমি যে কি করব, বুঝতে পারি নে—কাকে কি বলব। একটু পরে কুন্তল-দা বললেন, আচ্ছা শঙ্করই বলুক, তোমাকে দিয়ে আমাদের কি কাজ হবে? আমি তো ভেবে পাই নে। তুমি মিথ্যে দুঃখ করছ রানী।

উমারানী কান্নার সুরে বলে, আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না, তাই বলুন। ভাবছেন, আমাকে দলে নিলে দেশের কাজ পণ্ড হয়ে যাবে।

কুন্তল-দা আমার দিকে চেয়ে বললেন, আচ্ছা এক পাগল! একটু বুঝিয়ে দে তো শঙ্কর।

আবার নিজেই বোঝাতে লাগলেন, দেশ মানে কি খানিকটা মাটি আর দুটো গাছপালা? দেশ হচ্ছে তোমরা সকলে মিলে। স্বাধীন দেশে তোমরা স্বচ্ছন্দে থাকবে, তাই আমরা খেটে মরছি। বিনা লাভে কেউ কখনো কষ্ট করে···বল, তুমিই বল। তার চেয়ে শোন—যখন ছেলেপুলে হবে, একটা-দুটো আমাদের দিও। দেশ-উদ্ধার তো এক দিনে হয়ে যাচ্ছে না।

রানী তর্ক করে, আর তোমরা? তোমরা বুঝি দেশের মানুষ নও কুন্তল-দা? তোমরা যে না খেয়েদেয়ে জীবনের মায়া না করে এই রকম ভাবে বেড়াচ্ছ—

কুন্তল-দা হো-হো করে হেসে কথা উড়িয়ে দিলেন। বললেন, দেখ একবার। এই জন্যে তোমাদের নিতে চাই না। তোমরা এলে মহা আয়োজনে খাওয়াতে বসে যাবে, জীবনের সম্বন্ধে যাতে মায়া করি তার সদুপদেশ ছাড়বে। ঐ-সব বুঝেই স্বামীজী কামিনী-কাঞ্চন সম্পর্কে সাবধান করে গেছেন।

দেওয়ালে বিবেকানন্দের ছবি, পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, গেরুয়া পাগড়ি—বীরমূর্তি। কুন্তল দা সেই দিকে হাস্যমুখে চেয়ে রইলেন। আমাকে বললেন, আর যে কাউকে দেখছি নে। বৃষ্টি বাদলায় সাহেবদের পরে রাগ হঠাৎ কমে গেল নাকি?

উমারানী এই সময় কথা বলে উঠল। বলে, আমি আপনাকে একটা প্রণাম করব কুন্তল-দা? তাতেও কি আপত্তি আছে?

কুন্তল-দা যেন চমকে উঠলেন। আমার দিকে চেয়ে সহজভাবে বলতে লাগলেন, বুঝলি শঙ্কর, দেশ স্বাধীন হলে আমায় যদি তোরা রাজা করিস—এই সেন্টিমেণ্টাল মেয়েগুলোকে সকলের আগে আন্দামান পাঠাব।···শোন রানী, তোমার বাবাকে আমি বলে দেব কিন্তু—সত্যি বলে দেব। বামুনের মেয়ে হয়ে কায়েতকে প্রণাম করছ, জাত জন্ম রইল না আর!

কিন্তু আমি কুন্তল-দার সঙ্গে হাসতে পারলাম না। রানী যে কিরকমভাবে কুন্তল-দার পায়ে মাথা রেখে নিস্পন্দ হয়ে রইল, সে কেমন করে বোঝাই? অনেকক্ষণ পরে উঠে মুখ নিচু করে নিঃশব্দে সে বেরিয়ে গেল।

এরই দিন কয়েক পরে, দেখলাম, রানী আর হাসি ধরে রাখতে পারে না, যেন পাখির মতো হাওয়ায় উড়ছে। আমি উঠানে পা দিতেই ছুটে এসে কানে কানে বলে, শুনছ শঙ্কর-দা, কুন্তল-দা রাজি হয়েছেন, আমায় কাজ করতে দেবেন।

কুন্তল-দা বললেন, আগে পরীক্ষা দাও দিকি, তারপর সে-কথা।

বলুন, কি করব?

রানী তখনই প্রস্তুত।

চট করে চাট্টি মুড়ি ভেজে আন। বর্ষার দিনে খাসা লাগবে।

রানী ছুটে চলল। কিন্তু সন্দেহ করেছে, মুখ ফিরিয়ে বলল, আমায় এখান থেকে সরাতে চান?

কিছুক্ষণের মধ্যে গরম মুড়ি এল। অত তাড়াতাড়ি কি করে করল জানি না। মহানন্দে আমরা থালার চারপাশে বসে গেলাম।

কুন্তল-দা হেসে বললেন, দলের মধ্যে তোমার রইল এই মুড়ি ভাজার কাজ। খুব বড় কাজ এইটে—জান?

কিন্তু ওর চেয়েও বড় কাজ সে পেয়েছিল।

একদিন রাত্রে ঘুমচ্ছি, এমন সময় ধাক্কাধাক্কিতে দোর খুললাম। বাইরে কুন্তল-দা বাইকে করে এসেছেন, চোখ জ্বলছে। আমায় বললেন, শোন—খবর পেয়েছি, পুলিসে বাড়ি ঘেরাও করেছে, ভোর রাতে সার্চ হবে। কিছু মাল সরাবার দরকার। ওপারে জগৎ দত্তর ওখানে—পৌঁছে দিতে হবে। তুই আমাদের খালিশপুরের ঘাটে গিয়ে নৌকো ঠিক করে গাবতলায় দাঁড়িয়ে থাকবি। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে মাল পৌঁছবে—বুঝলি? আমি বাড়ি চললাম।

অতএব নৌকা ঠিক করে যথাস্থানে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। অমাবস্যার কাছাকাছি একটা তিথি, তার উপর আকাশে মেঘ করেছে—বড় ভয়ানক অন্ধকার। ভৈরবে জোয়ার এসেছে, কোটালের টান। দেখতে দেখতে সেই গাবতলা অবধি জল এসে পৌঁছল। চেয়েই আছি—অনেকক্ষণ পরে দেখি, রাস্তা দিয়ে নয়—বাগানের ছায়ায় ছায়ায় ঘোমটা-ঢাকা আবছা মূর্তি দ্রুতপদে আসছে। কাছাকাছি এসেছে, এমন সময় কোন্ দিক দিয়ে হঠাৎ জন দুই-তিন তার পথ আটকাল।

দাঁড়াও, কোথায় যাচ্ছ?

আলো ফেলেছে মুখের উপর। আমার জায়গা থেকে যতটা দেখা যায়, দেখলাম—অতি নির্ভীক অপূর্ব উমারানীর মুখ। বলল, ঘাটে যাচ্ছি।

কেন ?

ঝাঁঝালো স্বরে রানী জবাব দিল, একটু জিরোব বলে। বাবা বকেছে বড্ড। পথ ছাড়ুন।

তোমাকে থানায় যেতে হবে।

কিন্তু থানায় সে গেল না। তাদের পাশ কাটিয়ে চক্ষের পলকে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোটালের টানে স্তুতীব্র স্রোত চলেছে, তার উপর একই রকম অন্ধকার। আমি গাবতলা থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়লাম।

খবর পেলাম, সকালবেলা দ্বারিক চাটুজ্জের বাড়ি সত্যিই সার্চ হয়েছিল, কিছু পাওয়া যায় নি। পাওয়া যাবে না, সে তো জানতামই। বেলা একটা-দেড়টার সময় কুন্তল-দা হস্টেলে এলেন। আমায় বললেন, কলেজে যাচ্ছিস? আজ আর যাস নে শঙ্কর. কামাই কর্। চল্ দুজনে বেড়িয়ে আসি।

ঠিক দুপুরে বেড়াবার সময় নয়। আর কুন্তল-দার যে-রকম উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, বেড়াবার মতো অবস্থাও নয়, বুঝতে পারি। একটু দূরে খালের উপর একটা কাঠের পুল। তারই উপর কুন্তল-দা বসে পড়লেন, আমাকে বসালেন। বললেন, কি রকম সাহস আর বুদ্ধি মেয়েটার! দলটা তো সে-ই বাঁচাল। বাড়ি থেকে সাঁ করে বেরিয়ে গেল, তখন ওরা বুঝতে পারে নি। আর মেয়ে-মানুষের স্ববিধা আছে, হঠাৎ কেউ ধরতেও পারে না।

আমি বললাম, রানীর বাবা খুব বকেছিলেন বুঝি ?

কুন্তল-দা বললেন, সে তো হরদম চলেছে। আমাকেও নোটিশ দিয়ে রেখেছেন ভাদ্র মাস কাটলে বিদায় হতে হবে। কিন্তু বকাবকির জন্য জলে ডুবে আত্মহত্যা করবে, এরা কি সেই ধরনের মেয়ে? তোর হাতে যখন দিতে পারল না, রানী ঠিক ভেবেছিল—সাঁতার দিয়ে ও-ই জগৎ দত্তের কাছে যাবে। তা পারে নি, আমি ওপার থেকেই আসছি। আহা, কাজের জন্য এমন করত বেচারি—গোড়াতেই চলে গেল!

অনেকক্ষণ ধরে এই সব কথাবার্তা হল। বলতে বলতে একবার কুন্তল দা চোখ মুছে ফেললেন। পাষাণে জল আছে, এই প্রথম দেখলাম।

রানীর কথা কতদিন ভেবেছি! পাড়াগাঁয়ের স্বল্পশিক্ষিতা সাধারণ মেয়ে কী-ই বা বুঝত, কতটুকু জানত—আঁধার রাতে নির্ভয়ে ভৈরবে ঝাঁপিয়ে পড়ল, পুলিসের টর্চ-আলোয় তার শেষ মুহূর্তের চেহারা কেবল আমিই দেখেছিলাম। সে আবার ভৈরবের জলশয্যা থেকে উঠেছে, এবং অন্ততপক্ষে দু-শ ভরি পরিমাণ জড়োয়ার-গহনায় সর্বাঙ্গ মুড়ে রায়বাহাদুরের ঘর আলো করে আছে, এ একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। অথচ নিজের চোখ দুটোকেই বা অবিশ্বাস করি কি করে ?

পরদিন গিয়ে পথের উপরে দাঁড়িয়ে রইলাম। দূর থেকে দেখছি, রায়বাহাদুর যথারীতি সমুদ্রের ধারে চেয়ারখানিতে উবু হয়ে আছেন। মহিলাটি এলেন—সে রানীই। আমায় দেখে একটু আগেই গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। বলে, শঙ্কর-দা, কবে এলে এখানে? কোথায় উঠেছ?

আমি বললাম, রানী, উমারানী, তুমি বেঁচে আছ?

রানী হেসে বলে, দস্তুরমতো, বেঁচে আছি। আমার স্বামী কত বড়মানুষ—যেমন টাকায় বড়, তেমনি বয়সে। মস্ত খেতাব, প্রকাণ্ড জমিদার।

কথা বলতে বলতে দুজনে এগিয়ে চলেছি। রানী বলে, সেদিন এক নজর দেখেই চিনেছিলাম, তুমি কিন্তু চেননি।

আমি বললাম, চিনলেও যার অপমৃত্যু হয়েছে জানি, তার সঙ্গে হঠাৎ কথা বলতে সাহস হবে কি করে?

রানী খিলখিল করে হেসে উঠল। বয়স হয়েছে রানীর, কত মোটা হয়ে গেছে, তবু আগেকার মতো হাসির সেই রকম মিষ্টি আওয়াজ, গালের উপর তেমনি টোল পড়ে। বলে, তা হলে আমি ভূত হয়ে চলছি তোমার সঙ্গে? তা সত্যি। আমি কি স্বপ্নেও জানতাম, এত সুখ আমার কপালে আছে!

গম্ভীর হয়ে গেল। আর খানিকটা এসে বলে, এবার সরে যাও শঙ্কর-দা। আমার সঙ্গে আর কেউ কথাবার্তা বলছে দেখলে রাগারাগি করবে। বুড়ো হয়ে মেজাজের ঠিক নেই। এমন ভাব দেখাবে, যেন আমাদের চেনাজানা নেই। কাল সকালবেলা একবার আসবে এদিকে? অত্যন্ত করুণ চোখে চেয়ে সে বলতে লাগল, যদি আসতে পার শঙ্কর-দা—মন্দিরে যাবার নাম করে, আমি চলে আসব। কত কথা জমে আছে বুকের মধ্যে···বুক ফেটে বেরুতে চাচ্ছে।

সকালবেলা নিরিবিলি বসে অনেক কথা হল। রানীর বিয়ের কাহিনী শুনলাম। অনন্তপ্রসাদ তখন খুলনায় ডেপুটি। এরই আগে এক দুর্ঘটনা হয়ে গেছে, হঠাৎ কলেরা হয়ে তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী সতীলোকে চলে গেছেন। থাকল একপাল ছেলেপুলে। অনন্ত সরকারী কাজ নিয়ে ব্যস্ত কে তাদের দেখে, তাঁকেই বা কে সেবা-যত্ন করে! ঝি-চাকর দিয়ে ঠিক হয়ে ওঠে না, মহা মুশকিলে পড়ে গেলেন, ভেবে কূলকিনারা পান না। আত্মীয়েরা বিয়ে করতে বলেন, কিন্তু বিয়ে বললেই তো হয় না! তাঁরা শ্রোত্রীয়, এমনি সাধারণ ভাবে একবার বিয়ে করার মেয়ে পাওয়া কঠিন—তার উপর এতগুলো ছেলেপুলে থাকা অবস্থায়, এই বয়সে···চুল সমস্ত পেকে সাদা হয়ে গেছে। লোকে বলে, বাংলাদেশে মেয়ে সস্তা; তবু তো কোনো মেয়ের বাপ এগোয় না!

কিন্তু ভগবদ্বিশ্বাসী লোক—সকল কাজের মধ্যেও তিনি সন্ধ্যা আহ্নিক করতে ভুল হয় না—ভগবানই উপায় করে দিলেন। একদিন গিয়েছিলেন বাগেরহাট অঞ্চলে একটা তদন্ত করতে। নৌকা করে ফিরছেন। শেষ রাত। একজন দাঁড়ি দাঁড় তুলে আ-হা-হা করে উঠল।

কি, কি ব্যাপার?

মানুষ একটা ডুবে যাচ্ছে।

অনন্ত বেরিয়ে এসে তাড়াতাড়ি টর্চ ফেললেন জলে। কে একজন জলে দাপাদাপি করছে, হয়তো নৌকার কাছাকাছি আসবার মতলব, কিন্তু পারছে না—তার হাত-পা যেন অসাড় হয়ে এসেছে, সাঁতার দেবার জো নেই। দাঁড়িরা লাফিয়ে পড়ল। সেখানটা চরের মতো জায়গা, জল বেশি নয়। তোলা হল।

অনেক কষ্টে রানীর চেতনা হল। অনন্ত তাকে খুলনার বাসায় নিয়ে তুললেন। বিকেলের দিকে দ্বারিক চাটুজ্জেকে খবর দিয়ে আনা হল।

অনন্ত বললেন, গোলমালে কাজ কি বলুন। আপনার গ্রামের মধ্যেও তো নানা কথা উঠেছে, মেয়ের বিয়ে দেওয়া শক্ত হবে। তার চেয়ে আমাকেই সমর্পণ করুন। কাক-পক্ষীও জানতে পারবে না।

আপনাকে? দ্বারিক ইতস্তত করতে লাগলেন।

তা নইলে কিন্তু জেলে নিয়ে পুরবে। ওর কোমরের সঙ্গে রিভলবার বাঁধা ছিল। জেলের চেয়ে কি আমার ঘর করা খারাপ হবে? বুঝে দেখুন ব্যাপারটা। মানী ঘরের মেয়ে—খবরের কাগজে নাম বেরুবে, আর এই প্রসঙ্গে সত্যি-মিথ্যে কত কি রটে যাবে।

বাপ নিরুত্তর হলেন। রানী বললে, হোক জেল, আমার জেলই ভালো।

মৃদু হেসে অনন্ত বললেন, তা হলে অ্যালুমিনিয়ামের কৌটোয় শীলমোহর করে যে কাগজগুলো যত্ন করে নিয়ে যাচ্ছিলে, তা-ও পুলিসের হাতে পড়বে। তাতে তুমি একা নও—দলসুদ্ধ জালে পড়বে।

রানী রেগে আগুন হয়ে উঠল।

সেটাও পেয়েছেন? আমি ভাবলাম জলে পড়ে গেছে। দিন আমাকে, দিন বলছি—

অনন্ত পাকা লোক···ছেলেমানুষের রাগ দেখে তাঁর হাসি আরও বেড়ে যায়। বললেন, তাড়াতাড়ি কি! আমার কাছে থাকা যা, তোমার কাছে থাকাও তাই।···আচ্ছা বউভাতের দিন দেব। অবশ্য সে পর্যন্ত যদি এগোয়। আর নইলে দিয়ে আসব থানায়।

বউভাতের দিনও অনন্ত দেননি সে কাগজগুলো। রানী মাঝে মাঝে

চাইত, অনন্ত দেব-দেব করতেন। তখনও তাঁর ভয় ঘোচেনি, জিনিসটা হাতে পেলে রানী কি এই রকম সেবাযত্ন করবে! এখন অনেক বছর হয়ে গেছে, চাইলে হয়তো দিয়ে দেন, কিন্তু রানীরই খেয়াল হয় না। কী হবে তা দিয়ে? দেশের রাষ্ট্র-সংগ্রামে সে এক বিচিত্র অধ্যায়। কাগজগুলো হয়তো ছিন্ন বিবর্ণ হয়ে পড়ে আছে আয়রণ-সেফের এক কোণে। কিংবা হয়তো নেই।

গল্প শেষ করে রানী চুপ করে কীসব ভাবে। তারপর জিজ্ঞাসা করে, কুন্তল-দা কোথায় এখন?

বললাম, জানি না।

কথাটা মিথ্যা জেনেও বললাম না। কুন্তল-দা মারা গেছেন। কেউ জানে না, অমন বিরাট প্রাণ বরানগরের এক এঁদো গলির আধো অন্ধকারে কেমন করে আস্তে আস্তে মৃত্যুতে মিলিয়ে গেল। কিন্তু সেসব খবর দিয়ে লাভ কি? কুন্তল-দা পৃথিবীতে নেই—রানীর মনের মধ্যেও সেরকম ভাব নেই, বুঝতে পারছি।

তারপর আমার নিজের কথাও অনেক হল। রানী বলে, যতীশ্বরের চিঠি নিয়ে এসেছিলে, তবে আর কি! সেই সূত্রে আজকে আবার যেও আমাদের বাড়ি। আমি ওঁর সামনেই তোমার সঙ্গে আলাপ করব, তোমাকে রাত্রে খাবার কথা বলব। সেই গরম-গরম মুড়ি ভেজে দিতাম। উঃ, কতদিন দেখিনি তোমাদের কাউকে। যাবে তো?

ঘাড় নেড়ে বিদায় নিলাম। বিকেলে যেতে বলেছে, রানী নিমন্ত্রণ করবে। এখন বড়লোকের বউ—মুড়ি খাওয়াবে না, আয়োজন গুরুতর হবে নিশ্চয়। হোটেলের ঘ্যাঁট খেয়ে এই কদিনে অরুচি জন্মে গেছে। কিন্তু চলতে চলতে সাব্যস্ত করলাম, যাব না ওদের বাড়ি। বরঞ্চ আর যাতে দেখা না হয়, পুরী ছেড়েই চলে যাব। এই ক'টা দিন ভুলে যাই—রানীর অপমৃত্যু হয়েছে, এই কথাই থাক আমার মনে। গাঢ় আঁধারের মধ্যে বিনা দ্বিধায় করাল ভৈরবে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল—পুলিসের টর্চের আলোয় সেই ছবি দেখেছিলাম, সেইখানে রানীর কাহিনীর সমাপ্তি হয়ে থাক।

আনন্দকিশোর

এক সাধু মহারাজের গল্প বলছি এবার, আমাদের আনন্দকিশোর। তোমাদের হাসি পাবে, আবার চোখে জলও আসবে নিশ্চয়।

কুন্তল-দা তখন তৃতীয়বার জেল খেটে বেরিয়ে এসেছেন। কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক পুরোপুরি চুকে গেছে। এবার শহরে আস্তানা গাড়বার ভয়ানক দরকার।

বাবা তখন বেঁচে। তাঁকে বললাম, মফস্বল কলেজে পড়াশুনা কিছু হয় না। এতদিন যা হোক চলেছে, এখন বি-এ পড়ার সময় কলকাতা না গেলে নির্ঘাৎ ফেল হব।

বাবা হেসে সম্মতি দিলেন। ব্যাপারটা তিনি আন্দাজ করেছিলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। মহাস্ফূর্তিতে শহরে এলাম। কলেজে ভর্তি হয়েছি। বিকেল বেলা প্রায় রোজই বরানগরের নদীর কাছাকাছি একতলা ভাড়া বাড়ির ছাতে গিয়ে সকলে জুটি। কখন বিকাল হবে, সেজন্য মন পড়ে থাকে। কেবল কুন্তল-দা নয়, ঐ বাড়িতে মা থাকেন। কুন্তল-দার মা—তোমার আমার সকলের মা—অসীম ধৈর্যের মূর্তি। হাসিমুখে মা আমাদের আহ্বান করতেন। তাই তো ভাবি, অমন মা না হলে কুন্তল-দার মতো ছেলে জন্মায়!

মাস দুয়েক পরের কথা। একদিন দেখি, সবাই এসেছে—কুন্তল-দা নেই। সন্ধ্যার পর তিনি এলেন—সঙ্গে বছর কুড়ি বয়সের ফুটফুটে একটা ছেলে। অবাক হয়ে চেয়ে আছি। কুন্তল-দা বললেন, বড্ড নাছোড়বান্দা—কী করা যায় বল! কিন্তু খাসা বেহালা বাজায়।···বেহালাটা আননি বুঝি আনন্দকিশোর?

বেহালা না এনে যেন মস্ত অপরাধ করে বসেছে, এমনিভাবে ছেলেটি ঘাড় নিচু করে রইল।

এই বেহালা পরে একদিন শুনেছিলাম। যতক্ষণ বাজনা চলছিল, চেয়ার ঠুকে ঘাড় নেড়ে কুন্তল-দার সে কী তারিফ! তারপর বললেন, কেমন, ভাল লাগল না? সত্যি বল—

হুঁ, এখন লাগছে—খুবই ভাল লাগছে। থেমেছে বলে।

কুন্তল-দা আনন্দকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, তুমি কিছু মনে কোরো না ভাই। ওরা সব অসুর—সুরের কি বুঝবে?

হিরণ বলল, স্বদেশি ছেড়ে এবার যাত্রার দল খুলে দাও কুন্তল-দা, চৌরঙ্গি-পাড়ায় গাওনা শুরু কর, ইংরেজ ডাক ছেড়ে পালাবে।

বেহালা বাক্সবন্দি করে আনন্দ ম্লানমুখে নেমে চলল। কুন্তল দা ডাকলেন, হল কি তোমার? শোন—শোন।

আনন্দ মুখ ফিরিয়ে বলে আপনার সমস্ত ফাঁকি কুন্তল-দা। বাজনা খারাপ হয়েছে, বেশ হয়েছে। বাজাতে তো আসিনি। কাজ চাচ্ছি, সে সম্বন্ধে একটা কথা নেই—

মজা লাগছিল বেশ। আমি গিয়ে আনন্দর হাত ধরলাম।

কাজ? কী কাজ করবে ভাই? গায়ে দেখছি তো হাড়-মাংস নেই, তুলো দিয়ে তৈরি বুঝি। কী কী করতে পার, বল—

কুন্তল-দা বললেন, পারে ঐ বেহালা বাজাতে আর ঝগড়া করতে। দিন-রাত আমার সঙ্গে ঝগড়া করছে, বলে—কাজ দিন, কাজ দিন—

আনন্দ বলল, ঝগড়া না করলে আপনি কি শায়েস্তা হন কুন্তল-দা? আপনি বড্ড একচোখো।

আমরা স্তম্ভিত হয়ে থাকি, বলে কি! কুন্তল-দাকে এতবড় কথা বলবার সাহস ওর হল কি করে? কুন্তল-দা মৃদু মৃদু হাসছিলেন। বললেন, শুনলি শঙ্কর? কথার শ্রী দেখ। এই রকম যখন-তখন গালি দেয়।

অতএব বুঝে ফেললাম, ঐ হতভাগারও মরণ হয়েছে আমাদের মতো। নিতান্ত কচি নিষ্পাপ মুখখানার দিকে চেয়ে নিশ্বাস পড়ল। কুন্তল-দার মতো হইনি এখনো, চোখের জল বুকের নিশ্বাস একটু-আধটু আছে। বললাম, অন্যায় বলেনি কুন্তল-দা।

তোমাদেরও এই মত নাকি?

হ্যাঁ, সত্যি, তুমি একচোখো। এত বছর গুরুমাস্য দিয়ে আসছি, আর আজ কোত্থেকে একরত্তি ঐ ননীর পুতুল জুটিয়ে আনলে, এনেই কোল বাড়িয়ে দিলে। এতে হিংসে হয় না?

কুন্তল-দা ভালোমানুষের মতো আমায় দেখিয়ে বললেন, আনন্দ, এই হল সেক্রেটারি। ও যতক্ষণ না দেবে, কেউ কোনো কাজ পায় না। একে ধর, কিছুতেই ছাড়বে না, বুঝলে?

তাই বিশ্বাস করল ছেলেটা। তারপর সে যে কী মুশকিল, তোমাদের কী বোঝাই ভাই। সকাল নেই, দুপুর নেই, যখন-তখন গিয়ে ধরণা দেয়। আর ঐ এক কথা, কাজ দিন।

অবশেষে কুন্তল-দাকে ধরে পড়লাম, আর পারি না। দোহাই দাদা বাঁচাও—

কুন্তল-দা হেসে উঠলেন। কেমন জব্দ। নিন্দে করবি আমার? নাকে খত দে আগে!

ভাদ্র মাস পড়ল। খবরের কাগজে যথারীতি বন্যার খবর বেরুচ্ছে। নানারকম সমিতি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে—হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে রাস্তায় গান গেয়ে গেয়ে বন্যাত্রাণ করে বেড়াচ্ছে। এই সময় কয়েকটা দিন আমি গ্রামে ঘুরে এলাম। কেন তা বলব না। যা হোক একটা আন্দাজ করে নাও। সবাই জানত, জন্মাষ্টমীর ছুটিতে বাবাকে দেখতে গিয়েছিলাম। চাষাপাড়ায় ঘুরে বেড়াতাম। আলাপ করে দেখেছি, দুবেলা ভাত খাওয়া এবং আস্ত

অথণ্ড কাপড় পরা মানবজীবনের চরম বিলাসিতা বলে তারা জেনে রেখেছে।

সেই সব কথাই হচ্ছিল। বললাম, মানুষ সব না খেয়ে মরছে।

কুন্তল-দা বললেন, মরুক।

বাড়িয়ে বলছি ভাবছেন? মোটেই নয়। চালের দর কত জানেন?

অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে কুন্তল-দা বললেন, আমি তো তাই বলছি। মরে যাক। খাওয়ার মানুষ না থাকলে চালের দর কমবে।

হিরণ রাগ করে বলে, তুমি পাষাণ—একেবারে পাষাণ—

সেটা কি আজ জেনেছ? বলতে বলতে কুন্তল-দা কি রকম অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। বললেন, ও-কথা সকলের আগে বলেছিলেন আমার ঠাকুরমা। তিনি আমায় মানুষ করেছিলেন, দেখা হলেই কাঁদা-কাটা করতেন। সেই ঠাকুরমা মৃত্যুশয্যায়—খবর এল। আমি বাড়ি গেলাম না—চললাম কুঠির বস্তিতে।

আনন্দকিশোরও ছিল সেখানে, সে আমার হাত ধরে বারান্দায় নিয়ে গেল। চুপি-চুপি বলে, এইবার আমায় কাজ দিতে হবে শঙ্কর-দা, নয় তো আপনার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবো।

হয়েছে কী?

আপনার ঐ চাষাদের ব্যবস্থা আমি করব।

মড়া পোড়াবার ব্যবস্থা?

জিভ কেটে আনন্দ বলল, ছি ছি—কী যে বলেন! ওদের বাঁচাব। কত টাকা আদায় করে আনব দেখবেন।

কুন্তল-দা কী সব বললেন—শুনেছ তো?

ও আমি মানি না। ওঁর জুড়ি ভূ-ভারতে নেই। ঐ কি ওঁর মনের কথা হতে পারে? কখনো নয়।

অবোধ ছেলে! মানুষটার মতো ভূ-ভারতে নেই, কিন্তু মনটি ধরে নিয়েছে তোমার আমার দশজনের মতো! বড় বড় চোখ মেলে পরম আগ্রহে আনন্দ আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। বলে, একটা বার বিশ্বাস করে দেখুন না। প্রাণের আমি পরোয়া করি না। শুধু একটা।

হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিল। হাসি চেপে বললাম, রিভলবার?

দিয়ে দেখুন একবার। কাজ করতে না পারি ফিরিয়ে নেবেন—

আনন্দ আমার পিছু-পিছু চলেছে। গলির মোড়ে এসে দোতলার ঘরটা দেখিয়ে দিলাম। আলো জ্বলছে, অর্গানের আওয়াজ আসছে। কানে কানে বললাম, সোজা উপরে চলে যাবে, বুঝলে? ঝি-চাকরেরা নিচে। বাড়িতে আছে একটি মাত্র মেয়ে—আর সবাই নেমতন্নে গেছে। পারবে তো?

ঘাড় নেড়ে আনন্দ বলল, খুব-খুব···একটা তো মেয়ে! ও আর শক্ত কি? আপনি তবে এইখানে দাঁড়ান—

দাঁড়াতে হবে? ফিরবার সময় ভূতের ভয় করবে বুঝি!

তার মুখ লাল হয়ে উঠল, গ্যাসের আলোয় দেখতে পেলাম। চলে যান, আপনি চলে যান শঙ্কর দা—না, কিছুতেই থাকতে পারবেন না।

হাসতে হাসতে পার্কের কোণে বেঞ্চির উপর বসি। এই একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। পার্কে জল জমেছে। মনে ভাবলাম, কাঁহাতক এ রকম ভিজে মরব। বাড়ি গিয়ে শুইগে। চেনা মানুষ – চেনা বাড়ি—জলে পড়ে নি তো।

বাড়িটা সরোজ পাকড়াশির, সরোজের কথা আগেই বলেছি ভাই—আমাদের সেই সরোজ। মাস তিনেক আগে তাকে জেলে নিয়ে পুরেছে। নিরুপমাও প্রায় সেই সঙ্গে কলেজে ইস্তফা দিয়েছে। দাদার তাড়নার ভয় নেই, হস্টেল ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি এসে বসেছে।

পরের দিন ঐ গল্প হচ্ছিল। নিরু এসেছে—সে বড় একটা আসে না—কিন্তু বিশেষ করে ঐ রোমাঞ্চকর স্বদেশি ডাকাতির গল্প বলবার জন্য এসেছিল। হেসে হেসে এবং রীতিমত ডালপালা সংযোগ করে সে বলছিল। যা মেয়ে নিরুপমা—কোনো কথা সহজ করে বলা তার কুষ্ঠিতে নেই। আর আনন্দের সঙ্গে এর আগে জানাশোনাও হয় নি—

নিরু বলে, জানতে লেগেছিল মোটে এক মিনিট। একটা কথায় বুঝে ফেললাম, ডাকাত নয়—অত্যন্ত ভদ্রলোক, সাধুসজ্জন অমায়িক ব্যক্তি। দোতলায় উঠে দস্ত করে তো আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন···

আনন্দ বলল, অত গয়না পরতে নেই। দু চারখানা দিয়ে দিন—

নিরু নাকি জবাব দিল, আপনি পরবেন? সাধ হয়েছে?

বিরক্ত কণ্ঠে আনন্দ বলে, ওসব শুনতে আসি নি। চাঁদা চাচ্ছি দেশের জন্য—

চাঁদা তো লোকে দু-চার আনা আদায় করে হোস্টেলে গিয়ে চপ-কাটলেট খায়। আস্ত গয়না চাচ্ছেন আপনি, দালানকোঠা বানাবেন বুঝি?

আনন্দ রিভলবার বের করে।

কী ওটা? বেশ তো! দেখি—দেখি—

নিরীহ মুখে নিরু এগিয়ে আসে। এসে একেবারে ঘাড়ের উপর পড়ে আর কি! অজানা অচেনা পরের বাড়ির এই রকম একটা কিশোরী মেয়ে—আনন্দের মুশকিলটা বোঝ একবার। সে পিছিয়ে যায়। পিছুতে পিছুতে ভিতরের দিককার দরজা অবধি গিয়ে পড়ে।

নিরু তবু রেহাই দেয় না। বলে, দুয়োর বন্ধ—যাবেন কী করে?

আমি যাচ্ছি কে বললে ?

ওঃ যাবেন না, থাকবেন বুঝি ? তাহলে বসুন। বড্ড হাঁপিয়ে গেছেন। শরবত আনব ?

আনন্দ যথাসম্ভব কঠিন হয়ে বলে, এ ঘর থেকে আপনার বেরুনো হবে না। বুঝতে পারছি, পুলিসে খবর দিতে চান—

নিরু খিলখিল করে হেসে ওঠে, হাসি আর থামতেই চায় না। বলে, রামোঃ! আপনি ভালো লোক—সাধু মহারাজ—পুলিস ডেকে আপনাকে বিব্রত করব, আমার পরকালের ভয় নেই ?

যা ভাবছেন, আমি তা নই—

মনের ভাবনা বুঝতে পারেন ? কী ভাবছি বলুন না, সত্যি বলুন—

হতভাগা মেয়েটা করল কি একেবারে তার হাত ধরে বসল। এক রকম জোর করেই আনন্দকে সোফার উপর বসিয়ে দিল। বলে, গান শুনবেন ? চুপচাপ বসে শুনুন। নড়বেন কি চেঁচিয়ে পুলিসে ধরিয়ে দেব।

নিরু অর্গানের ধারে গিয়ে বসল। আনন্দ বলে, বাঃ রে, আমাকে বোকা বানাতে চান ?

না না। আপনাকে কি আর বানাতে হয় !

আনন্দ উঠে দাঁড়াল। রুক্ষ কণ্ঠে বলল, এ সবে আমায় ভোলাতে পারবেন না, বুঝলেন ?

ভোলাতে যাব ! বাপ রে, আমার ভয় করে না বুঝি ! এই চুড়িগুলোর পরে আপনার ঝোঁক তো ! খুলে দিচ্ছি—পকেটে রাখুন। আর আমিও ঘর থেকে নড়ছি নে। তাহলে গান শুনতে আপত্তি নেই তো ?

নিরু চুড়ি খুলে আনন্দের সামনে রাখল। বলে, এই দু-গাছা মাত্র দু-হাতে রইল। তাতে আপত্তি আছে ? বলুন—

এবার আনন্দ সত্যিই চটে উঠল।

আচ্ছা মেয়ে তো আপনি ! ভয় করেন না ?

মুখ ভারী করে নিরু বলে, মিছিমিছি বকবেন না বলছি। ভয় না পেয়ে মেয়েলোক কখনো গায়ের গয়না খুলে দেয় ? আমি ভয় পেয়েছি, সত্যি বলছি, দিব্যি করে বলছি—

আনন্দ বলে, ভয় পেতে আপনার বয়ে গেছে। টিপি টিপি হাসছেন, আমি বুঝি না কিছু।

রাগ করে সে বেরিয়ে এল। পিছু থেকে নিরু ডাকাডাকি করে, চুড়ি পড়ে রইল যে ! নিয়ে যান—

আনন্দ চেয়েও দেখল না।

গল্প শুনে সবাই হাসে, হিরণের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। বলে, এই রকম ঠাট্টা-তামাশায় মেতে যাচ্ছ শঙ্কর—জান, আমাদের এসব খেলা নয়।

নিরু ঘাড় নেড়ে বলে, নয়ই তো। তাই বলি কুন্তল-দাকে—ঐ সব সাধু মহাপুরুষ নিয়ে আসছেন, ওরা কি করবে শুনি?

কুন্তল-দা চুপচাপ বসেছিলেন। বললেন, না—সাধুমানুষ থাকবে কেন, কেবল তোমরা থাকলেই হবে! পৃথিবীর মাটি এখনো নরম আছে, আনন্দকে দেখলে সে-কথা মনে পড়ে যায়।

এমন সময় আনন্দ এল সেখানে। নিরুকে দেখে থমকে দাঁড়াল। নিরু বলে, চিনতে পারেন?

আনন্দ রাগ করে বলে, না—

আমি তো দিব্যি চিনে ফেলেছি।

সে জানি। চিনতেন আগে থেকেই। এঁরা বলে দিয়েছেন। এ একটা ষড়যন্ত্র আমি ধরতে পারিনি।

একটু চুপ করে থেকে আনন্দ আবার বলে, রিভলবারের সামনে দেমাক করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, সে মেয়ে আমাদেরই দলের। বাইরের কারো অত ভরসা হয় না। আমারই বুঝে নেওয়া উচিত ছিল।

আমি বললাম, না আনন্দ, রিভলভারই আদপে নয়। তোমার হাতে যা ছিল, ও জিনিস মুর্গিহাটায় পাওয়া যায়। টাকা আড়াই দাম।

কুন্তল-দা হেসে বললেন, পরীক্ষায় হেরে গেছ আনন্দ-ভাই। আর কোনো দিন কিন্তু ও-সব ছাই-পাঁশ চাইতে পারবে না। ওদের মতো বাজে মানুষ কি তুমি! বুঝে দেখ, একটা মেয়েকেই তো ভয় দেখাতে পারলে না।

হুঁ মেয়ে! ভয়ানক মেয়ে! বলে আনন্দ গুম হয়ে বসে পড়ল।

নিরু আমাকে চুপিচুপি বলে, সাধু মহারাজের মুখখানা দেখ একবার। দুঃখ হয়েছে। হবারই কথা। সত্যিকারের রিভলভার কেন দিলে না শঙ্কর-দা—তাতেও বিপদ ছিল না, হলপ করে বলতে পারি। তোমারই অন্যায়—

আর তোমারও, নিরু। তুমি যদি একটুখানিও ভয় পেতে, এত কষ্ট ওর কখনো হত না।

তখন কুন্তল-দার সঙ্গে কথা হচ্ছে আনন্দর। কুন্তল-দা তাকে প্রায় বুকের মধ্যে এনে স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, তোর খুব মনে লেগেছে—না?

না। বলে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আনন্দ প্রাণপণে চোখের জল সামলাতে লাগল।

কুন্তল-দা আমার দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, তোমাদের সঙ্গে আর মিশবে না আমার এই ভাইটি। দুঃখকষ্টও নিজে বুক পেতে নেয়—কাউকে দুঃখ দিতে পারে না।

আনন্দ ফিসফিস করে কুন্তল-দার কানে কানে বলে, আর আপনিও—

বলিস কি! নতুন কথা শেখাচ্ছিস যে! পুলিশের রিপোর্ট দেখে আয় তো—

আনন্দ নিবিড় করে তাঁর হাত দুখানা ধরে। বলে, পুলিস মিথ্যে লিখেছে। আপনার কত মায়া! আমি জানিনে বুঝি!

কুন্তল-দা হো-হো করে তুমুল হাসি হেসে উঠলেন। বললেন, শুনেছ তোমরা? আমাকে নতুন সার্টিফিকেট দিচ্ছে—আমার নাকি ভয়ানক মায়া। আমার ঠাকুরমার গল্পটা শোনেনি বোধহয়।

আনন্দ বলে, শুনেছি দাদা। কুঠির বস্তিতে মানুষগুলোকে জানোয়ারের মতো রেখেছিল। আপনার মতো দরদ কার! তাদের দুঃখে ঠাকুরমাকেও শেষ দেখা দেখতে পারেননি।

জানোয়ারের জন্য মানুষের দুঃখ? কী যে বলিস—

হয় না?

কুন্তল-দা নির্মম কণ্ঠে বললেন, না। দরদ বলিস—যা বলিস, যদি কিছু আমার থাকে, সমস্ত আগামী দিনের সোনার মানুষের জন্য। শিরদাঁড়া-ভাঙা ভার-বওয়া গরু-গাধার জন্য আমি এতটুকু ভাবিনে।

উষ্ণ কণ্ঠে আনন্দ বলল, তবে ঠাকুরমার কাছে না গিয়ে বস্তিতে ছুটেছিলেন কেন?

হাঙ্গামা বেধেছিল, সেটা যাতে মিটে না যায়। আগুন আমি নেবাতে চাইনে।

দেশের বুকে দাবানল জ্বালিয়ে আপনার আনন্দ?

কুন্তল-দা হা-হা করে হাসতে লাগলেন। বললেন, হঁযা, ভাঙা ডাল ঝড়ে-নড়া গাছ সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে যাক। তারপর এই শ্মশান আবার সবুজ হয়ে উঠবে।

অস্ফুট আর্তনাদ করে আনন্দ দু-হাতে মুখ ঢাকল। সে যে কী রকম অসহায়ের অবস্থা, তোমাদের বোঝাতে পারব না। কুন্তল-দা স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, নিরুপমা ঠিক নাম দিয়েছে, সাধু মহারাজ। তুমি কোনো আশ্রমে চলে যাও আনন্দ। জানাশোনা আছে, আমি বলে দিতে পারি।

কুন্তল-দা ফেরারি হলেন এই সময়টায়। ও রকম অবাক বিস্ময়ে তাকাচ্ছ

কেন তোমরা? সে ভয়ানক কিছু নয়। নিরুদের দোতলায় দিবি পড়ে পড়ে ঘুমুতেন। নিরুর চোখের উপরে—কাজেই বুঝতে পারছ, অসুবিধা কোনো কিছুরই হবার জো ছিল না—মায় গদির বিছানা ও নেটের মশারি পর্যন্ত। কেবল এক একদিন অনেক রাত্রে পালিয়ে বরানগরে চলে আসতেন। আমরা রাগারাগি করতাম, বলতাম, সুখে থাকতে তোমায় ভূতে কিলোয় দাদা। একদিন মরবে—

কুন্তল-দা মুখ শুকনো করে বলতেন, তাই তো—তোমরা ভাবিয়ে তুললে। সর্বনাশ! একদিন নাকি মরব। একেবারে আপ্তবাক্যের মতো শোনাচ্ছে হে—

আনন্দ সেই থেকে বড় একটা আসত না। এলেও কোণের দিকে মুখ নিচু করে চুপচাপ থাকত, কোনো রকম কাজের কথা উঠলেই সরে পড়ত। তারপর একেবারে ডুব দিল।

মাস আষ্টেক দেখি নি তাকে। একদিন খুব ভোরবেলা আমার ঘরে এল প্রেতের মতো একজন। কথা না বললে চিনবার জো নেই—কী বীভৎস চেহারা!

চমকে উঠলাম, আনন্দ—তুমি?

সে হাসতে লাগল।

এ কী হয়েছে রে? কোথায় ছিলে এদ্দিন?

হাসপাতালে ছিলাম শঙ্কর-দা। ভালো থাকলে কি দেখতে পেতেন না? আপনারা আমাকে যতই ঘৃণা করুন, ঠিক আসতাম।

আমি বললাম, ঘৃণা করি না ভাই। কিন্তু সোনার মতো মুখ পুড়ে যে—

হনুমান হয়ে গেছে, না? হাসিমুখে সে বলতে লাগল, আমি বড্ড খুশি হয়েছি। এই মুখের জন্য কত ঠাট্টা করেছেন। বলতেন, মেয়েমানুষ···আরও কত কি! এবার?

কি ব্যাপার বল তো?

বাজি তৈরি করতে গিয়েছিলাম।

কি বাজি, ঠিক করে বল—লুকিও না।

অভিমানের সুরে আনন্দ বলতে লাগল, সে যাই হোক—আপনাদের তা শুনে দরকার কি শঙ্কর দা? আপনারা তো ভরসা করতে পারেন নি! আমি নিজে যদি কিছু করে থাকি। দেখুন—এবার আর মেয়েলি মুখ নেই তো?

আমি বললাম, মনটা তো বদলায় নি। তুমি যাও—লেখাপড়া কর গিয়ে। এ পথ ছেড়ে দাও।

আনন্দ স্তব্ধ হয়ে রইল খানিক। তারপর কাছে এসে হঠাৎ পায়ের ধুলো

নিল। বলে, তাই ঠিক। চললাম শঙ্কর-দা—আর কোনো দিন আপনাদের কাছে আসব না।

আবার ক-দিন ছিলাম না কলকাতায়। এসেই নিরুদের ওখানে গিয়েছি। কুন্তল-দা বললেন, আমি যে মরে গিয়েছি শঙ্কর। আজকের কাগজে দেখিস নি?

সে কি?

এই দেখ—

কাগজে কুন্তল সরকারের মৃত্যু-সংবাদ পড়লাম। শ্যামবাজারের এক বাড়িতে পুলিশের সঙ্গে স্বদেশিওয়ালাদের গুলি-ছোঁড়াছুঁড়ি হয়—ফলে কয়েকজন মারা পড়ে, তার মধ্যে কুন্তল সরকারও আছে।

সন্ধ্যাবেলা সমস্ত খবর নিয়ে ফিরলাম। নিরু বলে, আমাদের সেই সাধু মহারাজ, শঙ্কর-দা?

হ্যাঁ। কোত্থেকে কুন্তল-দার নামে ক'খানা চিঠি যোগাড় করেছিল। তাই পকেটে রেখে দিয়েছে। মুখ পুড়িয়ে আগেই এমন করে রেখেছে যে চেনবার জো নেই—

পাষাণ কুন্তল দা, তবু যেন তাঁর স্বর একটু কাঁপল। কিংবা হয়তো আমারই ভুল—ঐ হিমালয় ঝড়-ঝাপটায় কাঁপবার বস্তু নয়। বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন, মৃদুকণ্ঠে বললেন, বোকা ছেলে! অত সহজে কি কুন্তল সরকারকে ঠেকানো যায়? মিছেই মারা পড়লি।

নিরু এত জ্বালাত, বিদ্রূপ করত—চোখের জল এখন আর তার বাধা মানছে না। বলল, একটা ফুল আগুনে পুড়ে গেল কুন্তল-দা।

কুন্তল-দা বললেন, নূতন সূর্য উঠবেই। তার আগে আনন্দ গেল, আমিও যাব—এইরকম কত চলে যাবে। কাঁদতে গেলে চলে কি বোন?

সূর্য আজ উঠেছে। কুন্তল-দা নেই। পনের বছর আগে নিরুপমার বৃত্তান্তটা গোড়া থেকে বলে নিই শোনো। নিরুপমার সঙ্গে নিবিড়তম সম্পর্ক কি না—সে আমার বউ। কিন্তু খবরদার ভাই, মল্লিকার কানে কথাটা না যায়। সে জেলে যায় নি, কিন্তু ঘরে বসে যা সয়েছে তা তোমার আমার চেয়ে কম নয়। কী জানি, মল্লিকা কি মনে করে বসবে—আমার সেই ভয়।

নিরুপমা

তখন শ্যামবাজারের এক গলির মধ্যে ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছি। সেই গলির একটা বিশেষ বাড়ির কাছাকাছি আমাদের দু-একজনের থাকার দরকার। মাস

করো ভাই, আজকের দিনে এর বেশি কিছু বলতে পারব না। মোটের উপর সকাল-সন্ধ্যা খোঁজাখুঁজির বিরাম ছিল না। কিন্তু গলির লোকগুলো অকস্মাৎ যেন বিষম বড়লোক হয়ে উঠেছে, বাড়ি ভাড়া দেওয়ার গরজ কারও নেই। ঘর পেলাম না, কিন্তু পেয়ে গেলাম নিরুপমাকে।

মেয়েটাকে এক নজর দেখলাম। লম্বা-চওড়া গড়ন। তখন সন্ধ্যাবেলা, মই ঘাড়ে করে মিউনিসিপ্যালিটির লোক গ্যাস জেলে জেলে বেড়াচ্ছিল। বটতলায় সিঁদুর মাখা অনেকগুলি পাথর। তারই সামনে তাদের ছোট্ট দোতলা বাড়িটা। বাড়ি ঢুকে কোনো দিকে না চেয়ে সে দরজা বন্ধ করে দিল।

মাথায় এক মতলব এসে গেল। মেয়েটাকে যদি দলে টানতে পারি, ঘর না পেলেও চলবে। পিছু নিলাম। কয়েকটা দিন কেটে গেল। একদিন কলেজ-ফেরতা সে গটগট করে চলেছে, আমি খুব সন্তর্পণে দূরে দূরে যাচ্ছি, গলিতে ঢুকে সে চোখের আড়াল হয়ে গেল। মিনিট খানেক পরে আমি মোড় ফিরে যেই ঢুকেছি- দেখি, একটা বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে চুপ করে নিরুপমা দাঁড়িয়ে আছে আমার অপেক্ষায়। একেবারে রণ-রঙ্গিণী মূর্তি—রক্ষার মধ্যে হাতে কিছু নেই খান দুই-তিন মোটা বই ছাড়া।

পিছু নিয়েছ কেন তুমি ?

আমি বললাম, পথ কি কারও একলার ?

বল কি জন্যে ?

ভদ্রলোককে যে ভাবে অনুরোধ করতে হয় সেইভাবে বলুন, তবে জবাব দেব।

আপনি ভদ্রলোক ?

কি রকম ফিটফাট জামা-কাপড় পরে আছি—ভদ্রলোক মনে হয় না ? দেখুন না—চেয়ে দেখুন একবার—

নিরুপমা মুখ একেবারে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। ইতিমধ্যে অবশ্য অনেকবারই সে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়েছে—দেখা বললে ঠিক হয় না, দৃষ্টি দিয়ে আগুন বুলিয়ে দিয়েছে। ব্যঙ্গের সুরে সে বলে, বাংলাদেশ কি না—আপনাদের তাই ভদ্রলোক বলে।

সব দেশেই আমরা ভদ্রলোক। অসহায় মেয়েকে সঙ্গে করে বাড়ি এগিয়ে দিচ্ছি—এ কাজ বীরধর্মের কোঠায় পড়ে, জানেন ?

আমি অসহায় ?

নিশ্চয়। একলা চলেছেন, বিশেষ তো অস্ত্রসস্ত্র দেখছি নে। ধরুন, যদি কেউ আপনার একখানা হাত চেপে ধরে—

মুখ ফেরাল নিরুপমা। বলে, আমি চেঁচিয়ে উঠব। আমাদের পাড়া—

এতটুকু বয়স থেকে এখানে মানুষ—

তার আগে যদি মুখ বেঁধে ফেলে। হঠাৎ পিছন থেকে এসে আমার গলার এই চাদরটার মতো একটা কিছু দিয়ে মুখ বাঁধা তো শক্ত কিছু নয়।

নিরুপমা দাঁড়িয়ে যায়।

আপনার মতলব কি ?

আমি হেসে বললাম, আর যাই হোক, মুখ বাঁধা কিংবা হাত ধরাধরির জন্য চারটে থেকে দাঁড়িয়ে ছিলাম না।

তাদের বাড়ির সামনে এসে পড়েছি। দরজায় দাঁড়িয়ে সে বলে, আসবেন?

না।

ভয় করছে ?

আমি বললাম, ভয়ের নমুনা দেখছেন কিছু ? রণে আর প্রেমে ভয় করলে চলে না।

এবার সে উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে উঠল। অসাধারণ মেয়ে—এই প্রথম আলাপে টের পেলাম। বলে, ইস্—সাংঘাতিক তো।

কিন্তু প্রেম নয়।

তবে বুঝি রণ ? কার সঙ্গে—আমারই সঙ্গে নাকি ?

প্রথম আলাপে না-ই শুনলেন সে কথা। কাল বিকেলে আবার আমি সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকব।

পরদিন দেখা হল। তার পরদিনও। মনে রেখো, সেটা পঁচিশ ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা, এখনকার চেয়ে কড়াকড়ি ঢের বেশি ছিল। এক ধরনের কাজ মেয়েদের দিয়ে ভাল হয়, আমাদের মধ্যে দু-চারটি মেয়ের দরকার, পথে ঘাটে তাই ঐ রকম ওত পেতে থাকতে হত। নিরুর বাড়ি সম্বন্ধে যা শুনলাম, সে একেবারে আশাতীত। দুই ভাই আর বোনটি ; আর আছেন বুড়ো মা, তাঁর চোখে ধুলো দেওয়া শক্ত কিছু নয়। ছোট ভাই নাবালক, আর বড় হলেন—নাম তো আগেই করেছি, সরোজ পাকড়াশি।

আমাদের সরোজ ? কুন্তল-দা বললেন, সরোজের বোন, তাই বল। এমন ইস্পাতের মেয়ে যেখানে-সেখানে পেয়ে যাবে, আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম।

তোমার সরোজকে আমরা দেখিনি তো।

কুন্তল-দা বললেন, দেখবে কি ? ক টা দিনই বা জেলের বাইরে থাকে !

একটু চুপ করে থেকে বলতে লাগলেন, হতভাগাটা বলে কি জান ? ছ-টা মাস থাকতে দিক, তুড়ি মেরে দেশ স্বাধীন করব। তা কর্তারা ছ-টা দিনও

তাকে বাইরে রেখে সোয়াস্তি পান না।···বেশ হয়েছে, মেয়েটা একমনে এবার কাজে লাগুক।

কিন্তু মোটে আমাদের আমলই দেয় না কুন্তল দা—

বস্তুত নিরুপমা জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। বলে, মিথ্যা কথা, আপনারা সব ধাপ্পাবাজ—আমি ও-সব একতিল বিশ্বাস করি নে।

আমি বলি, এমন সব ঘনিষ্ঠ বিশেষণ প্রয়োগ করছ নিরু, এর মধ্যে এতখানি প্রত্যাশা করি নি।

নিরু কালো বড় বড় চোখ দুটো মেলে খানিক চেয়ে থাকে। শেষে বলে, বেশ, নিয়ে আসুন একদিন কুন্তল-দাকে। আমাদের বাড়ি নেমতন্ন রইল। তিনি নিজের মুখে বলবেন—

ঘাড় নেড়ে বলি, এখন তা হতে পারে না।

কেন? কলকাতায় নেই? কোথায় তিনি?

সরোজের বোনকে এটাও বোঝাবার দরকার যে, এ সমস্ত জিজ্ঞাসা করতে নেই?

নিরুর উচ্ছ্বাস থেমে যায়। লজ্জিত হয়ে সে চুপ করে।

আমি বললাম, অত সহজে কুন্তল-দাকে পাওয়া যায় না।

কি করতে হয়?

সাধনা। দেখছ না, সরকার বাহাদুর বছরের পর বছর কি অসামান্য সাধনায় লেগে আছেন!

আমি তো সরকারের কেউ নই।

অতএব একদিন দেখা পাবে। তাঁর কাজে লেগে যাও।

নিরু বলল, অন্তত একছত্র হুকুম চাই তাঁর হাতের।···মানে, তাঁকেই মানি, একমাত্র তাঁকে। আপনাদের কাউকে নয়।

বরানগরে সেই একতলার বাড়িতে তখন একটা তুলোর গুদাম হয়েছে। গুদামের পিছনটায় আধ-অন্ধকারে কুন্তল-দা বইয়ের গাদার মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকতেন। যে ধুনারীর গুদাম, সে আমাদেরই একজন। সে ঘরে যে মানুষ থাকে, বাইরে থেকে বোঝবার জো ছিল না। একদিন ক-জনে একসঙ্গে হয়েছিলাম। কুন্তল-দা বললেন, মেয়েটা নেমন্তন্ন করেছে, তা যাই না কেন—একদিন ভালমন্দ খেয়ে আসি।

সবাই প্রবল ভাবে ঘাড় নাড়ে: না—না—না—

তিনি হেসে বললেন, হিংসুটের দল তোমরা, আমার ভাল কি দেখতে পার?"

:দাও, তবে একটুকরো কাগজই দাও—

এবং তৎক্ষণাৎ শুরু করলেন, শ্রীচরণাম্বুজেষু—

আমরা হেসে উঠতে কুন্তল-দা কলম তুলে বললেন, কি, হল কি তোমাদের? ও কি লিখছ? সতের-আঠার বছরের একরত্তি একটা মেয়ে যে নিরুপমা—

চিঠি নিরুপমার কাছে পৌঁছল। তারপর দেমাকে তার মাটিতে পা পড়ে না। বলে, দেখুন শঙ্কর-দা, খাতিরটা দেখুন একবার! আমি হলাম শ্রদ্ধাস্পদা। কুন্তল-দার সার্টিফিকেট—অতএব আপনারাও শ্রদ্ধা করবেন। বুঝলেন তো?

আবার বলে, আপনাদেরও উনি এই রকম লেখেন নাকি?

আমি বললাম, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাই নি, তেমন ভাগ্য হবে কোত্থেকে। বিবেকানন্দর চোখ দিয়ে দেশ দেখছেন ওঁরা—অনাত্মীয় মেয়ের ঐ একটি মাত্র মূর্তি ওঁদের কাছে।

মোটের উপর যা চেয়েছিলাম—হল। নিরুকে পাওয়া গেল।...এখন সে বেঁচে নেই। আহা যদি থাকত! তুমি আমি সকলে আজ মাথা তুলে দাঁড়াতে চাচ্ছি, এ সমস্ত দেখে কত উৎসাহ হত তার! তার নির্ভীকতা তখনকার দিনে আমাদের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল।

মাস দুই পরে একদিন আমাদের আস্তানায় সে যেন আকাশ ফুঁড়ে উদয় হল। অনেক রাত্রি ছাদের উপর অল্প অল্প জ্যোৎস্না এসে পড়েছে, কথাবার্তা হচ্ছিল, সব বন্ধ হয়ে গেল। কোথা থেকে কি করে জানল, কে-ই বা দুয়োর খুলে দিল। তারপর দেখি, হিরণ পিছনে রয়েছে।

নিরু জুতো খুলতে খুলতে সকলকে এক নজর দেখল। তারপর কুন্তল-দার পায়ে গিয়ে প্রণাম করল। আমার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বলে, কেমন শঙ্কর-দা চিনতে পেরেছি কি-না বলুন—

আমি বললাম, আগে দেখেছিলে?

নিরু বলে, কক্ষনো নয়, সূর্যকে কি চিনে রাখতে হয়? হাজার লোকের মধ্যেও ওঁকে বেছে নিতে এক মিনিটও লাগে না।

কুন্তল-দা বললেন, সর্বনাশ, বল কি গো! ভয় ধরিয়ে দিলে।

নিরু বলে, আপনার ভয় আছে নাকি?

আমি বলি, ওঁর নেই—আমাদের আছে।...শুনে রাখলে তো? অতএব ঘর থেকে তোমার বেরুনো চলবে না—এক পা-ও নয়—

কুন্তল-দা বললেন, কেন—বেরুলে হবে কি?

চিনে ফেলবে। ধরে নিয়ে জেলে আটকাবে।

তোমরাই বা কী এমন স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছ! নিরু, জানিস নে বোন—

জীবনে এরা ঘেন্না ধরিয়ে দিল। কোন কাজ করতে দেবে না, কোথাও যেতে দেবে না—এ রকম বেঁচে লাভ কি ?

নিরুপমা কুন্তল-দার পায়ের কাছে বসে পড়ল! আমরা এদিকে রাগে জ্বলছি। কুন্তল-দা না থাকলে সেইখানেই হিরণের টুঁটি চেপে ধরতাম। আমরা এত সাবধান করে মরি, আর হতভাগা মেয়েটাকে এনে জোটাল এই জায়গায়।

চোখ-ইশারায় হিরণকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছি—দেখি, কুন্তল দাও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, হিরণের দোষ কি ?

ও, তুমি বলে দিয়েছিলে ?

কুন্তল-দা রাগতভাবে বলে উঠলেন, না বলে উপায় ছিল! যত সব বদরাগী মানুষ নিয়ে দল গড়বে, দোষের বেলা হরিণ আর কুন্তল-দা।

নিরুপমার কানে যেতে সে মাথা নিচু করল। আমরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠি, ইতিমধ্যে এমন কি ঘটে গিয়েছে যার জন্য তাড়াতাড়ি কুন্তল-দা হিরণকে পাঠালেন। রাত্রিবেলা আমরা সবাই তো আসব—পরামর্শের সবুরটুকুও সইল না!

আবার বসে পড়ে তিনি নিরুকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, দুঃখ পাচ্ছ কেন বোন, তোমার দোষ কি, তুমি কেবল থানা অবধি গিয়েছিলে, আমরা হলে মহানন্দটাকে শেষ করে ফেলতাম।

নিরু জিজ্ঞাসা করে, আপনি মানুষ মারতে পারেন কুন্তল-দা ?

কুন্তল-দার যেন কানে ঢুকল না, তিনি বলে চলেছেন।

আমি বলি, এসব কথা কেন নিরু ? ছিঃ—

নিরু ঘাড় নেড়ে বলে, উনি মোটে পারেনই না, আমি বলে দিচ্ছি। এত যাঁর স্নেহ—

কুন্তল-দা বললেন, তুমি পার ?

মানুষ পারি না, জানোয়ার পারি। অন্তত পারা উচিত।

একটু চুপ করে থেকে নিরুপমা বলতে লাগল, একদিন এ দেশে জানোয়ারের বাড়াবাড়ি হয়েছিল। মা-বোনেরা স্নেহ দিয়ে লালন করেছিল তাদের। স্নেহ না দিয়ে মুখে বিষ তুলে দিলে ঠিক হত। হলে আজকের এ-রকম দিন আসত না। সেই রকম জানোয়ার একটা হচ্ছে আপনাদের মহানন্দ—

কুন্তল-দা বললেন, মহানন্দ তো আমাদের নয়—

আমি বললাম, বিশ্বাস করতে চায় না কুন্তল-দা, আমার সঙ্গে সে কী তর্ক!

মহানন্দের সঙ্গে ইস্কুলে কিছুদিন পড়েছিলাম। সেই থেকে আমাদের দু-একজনের সঙ্গে তার অল্পস্বল্প পরিচয়। মহানন্দ তাই নিয়ে গালগল্প করে;

বেড়াত। নিরুদের সঙ্গে তার দূরসম্পর্কের কি রকম একটু আত্মীয়তা ছিল। সেই দিনই সকালবেলা নিরু আমাকে খুব জেরা করছিল—আপনি যে বলেন, কুন্তল-দা এখানে নেই ?

ছিলেন না। এসেছেন ক-দিন হল।

মিথ্যে কথা। তিনি বরাবর রয়েছেন। মহানন্দ-কাকা বললেন।

উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করি, সর্বনাশ—ওর সঙ্গে এ-সব কথা হয় নাকি ? বাজে লোক।

নিরুপমা বলে, বাজে লোক হলে কুন্তল-দা নিয়েছেন ?

কুন্তল-দা তাকে চেনেনই না

বল্লেন কি ! কুন্তল-দা গয়না চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, সে চিঠি পর্যন্ত রয়েছে—

গায়ে পরবেন বলে ?

নিরু বিরক্ত হয়ে বলে, পরবেন কে বলেছে ? হয়তো কাজে লাগাবেন বিক্রি করে বা বন্ধক দিয়ে—

তালুক নিলাম হচ্ছে বুঝি কুন্তল-দার—মেয়েমানুষের গয়না বন্ধক দেবেন ?

কিন্তু টাকার কি গরজ নেই ?

আছে। সে সামান্য ব্যাপার। আমরা বন্যাত্রাণ-সমিতি গড়িনি নিরু, যে তোমার কাছে দয়ার দান চাইতে যাব।

নিরু ক্ষণকাল যেন নিস্পন্দ হয়ে থাকে। তারপর বলে, মহানন্দ কাকা বলল, কুন্তল-দার সঙ্গে দেখাশোনা করিয়ে দেবে, তাঁর বাড়ি নিয়ে যাবে—

সাবধান নিরুপমা, কুন্তল-দার বাড়ি বলে তোমাকে থানায় নিয়ে তুলবে। খুব সাবধান।

থানায় মহানন্দ যায়নি, নিরু নিজে গিয়েছিল। বোকা মেয়ে !

সেই যে কবে কুন্তল-দার দু-ছত্র লেখা দিয়েছিলাম, তারই সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেছে। তারপর গয়না-চুরির জন্য রাগের মাথায় ডায়েরি করে এসেছে মহানন্দের নামে।

নিরু বলে, বেশ করেছি। দেশের কথা বলে আর সেই সঙ্গে অত বড় লোকের নাম জড়িয়ে মানুষ ঠকিয়ে বেড়ায়, ওর শাস্তি হবে না ?

কুন্তল দা বললেন, ওর আগে হত তোমারই। টের পেতে যদি ঠিক সময়ে খবরটা না পেতাম—

নিরু আশ্চর্য হয়ে তাঁর দিকে তাকাল। তিনি বলতে লাগলেন, ডায়েরি করে মনের আনন্দে বাড়ি ফিরলে। এনকোয়ারির সময় মহানন্দ ওদিকে সত্য-মিথ্যা এঁকরাশ বলে মনের ঝাল ঝেড়েছে। ভ্যাগিস খবর এসে গেল, হিরণকে

দিয়ে তাই তোমায় গ্রেপ্তার করে এনেছি। বাড়িতে এতক্ষণ তোলপাড় চলছে।

আজ দিন তিনেক কুন্তল-দা একেবারে চৌকাঠ পার হন নি, অথচ খবর ঠিক ঠিক এসে যাচ্ছে। ইদানিং আর আমরা এত আশ্চর্য হই না। তিনি বলতে লাগলেন, গ্রেপ্তার—বুঝলে তো নিরু? হাতে বেড়ি, পায়ে বেড়ি—তোমার আর কোথাও যাওয়া হবে না।

নিরু মৃদু কণ্ঠে বলে, সবে ভাইয়ের জন্য আমি খাবার করতে বসেছিলাম। আজ ঠাকুর আসে নি কিনা!

ও সব ভেবো না। তোমার ভাইয়ের খাবারের বন্দোবস্ত হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কিন্তু তোমার কি বন্দোবস্ত করি বল তো? বড্ড ভাবিয়ে তুললে।

নিরু রইল চিলেকোঠায়, আমরা ক'জন দোতলায়।

পরদিন নিরু জিজ্ঞাসা করে, কদ্দিন আটকে রাখবেন কুন্তল-দা?

কুন্তল-দা বললেন, দু-বছর, দশ বছর হয়তো বা চিরকাল—

অধীরকণ্ঠে নিরু বলে, সে আমি পারব না। ভাবছেন কেন, কোন চার্জ তো নেই—আর আমার কাছ থেকে কথা বের করবে, সে মানুষ ভূ-ভারতে জন্মায় নি।

কুন্তল-দা বললেন, তা পারবে না জানি···কিন্তু কোনো দিন যদি শুনি তুমি বিষ খেয়েছ! তোমার মতো মেয়েকে ছেড়ে দিতে পারি নে—কিছুতেই না। তুমি বোঝ না তোমার দাম অনেক।

আরও দিন দশেক কেটেছে। ইতিমধ্যে কিছুকালের মতো ঐ বাড়ির আস্তানা গুটাবার আবশ্যক হয়ে পড়ল। কুন্তল-দা বলছিলেন, যত মুশকিল তোমাকে নিয়ে বোন। স্ত্রী হয়ে কারও অন্দর মহলে ঢুকে পড় দিকি। তা হলে নিরাপদ।

নিরু ঘাড় নেড়ে বলে, না।

কেন?

এমন মানুষ কে আছে যাকে স্বামী বলতে শরমে বাধে না।

শোন একবার দাম্ভিক মেয়েটার কথা! আবার কুন্তল দা তার কথাতেই সায় দিয়ে গেলেন, তা সত্যি। কিন্তু সত্যিকার স্ত্রী হতে যাবে কেন? সাজতে হবে, যেমন যাত্রা-থিয়েটারে হয়ে থাকে—

খিলখিল করে হেসে নিরুপমা বলে, তাই বলুন। তা পারব, খুব পারব। বলেন তো শঙ্কর-দারই স্ত্রী হয়ে ঘোমটা দিয়ে বসি।···দাঁড়ান শঙ্কর-দা, শুনুন—কথাটা শুনে যান।

আঃ নিরু ! সে সময়টা ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। নিরু হাসতে হাসতে পথ আটকাল, তার পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম।

সমস্ত দিন বড় খাটুনি গেল। সন্ধ্যার পর ফিরেই শুয়ে পড়েছি। নিঃসাড় হয়ে ঘুমোচ্ছি, হঠাৎ মাথা ধরে জোরে জোরে নাড়া দিচ্ছে।

কে ?

বউ, আপনার বউ গো—

প্রথমটা বুঝতে পারি নি, ঘোমটা-টানা কি না ! কথাও বলছে ফিসফিস করে নববিবাহিতা লজ্জাবতী বউটির মতো। শেষে চিনলাম। ঘুম এমন এঁটে এসেছে যে চোখ মেলতে পারি নে। বিরক্ত হয়ে বললাম, তা এত রাত্রে কেন ?··· না নিরু, বড্ড জালাতন কর তুমি। বউ হও, যা হও—কাল দেখা যাবে। এখন যাও বিরক্ত করো না।

কুন্তল-দার হুকুম, এক্ষুনি—

সত্যি ?

শুভস্য শীঘ্রম্। নইলে কালই হয়তো শুনবেন দ্বীপান্তরে নিয়ে গেছে। তখন বউ পাবেন কোথায়—বানর খুঁজে বেড়াতে হবে আন্দামানের সাগর বাঁধবার জন্য।

খুঁজতে হবে না, সে তো এই সামনেই। ঘুমন্ত মানুষ বলে করুণা নেই, রাত দুপুরে এসে আঁচড়াতে লেগেছে।

অভিমানের সুরে নিরু বলে, মুখের উপর এ-রকম বললে দুঃখ হয় না বুঝি ! সত্যি কি আমি বানরের মতো দেখতে ? বলুন ?

দেখে বলতে হলে তো চোখ মেলতে হয়। উপায় কি ? তাছাড়া কুন্তল-দার নাম করেছে। চেয়ে দেখি, সে তৈরী। বাইরে অপেক্ষমান কুন্তল-দা। তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিলাম। আকাশে তারা ঝিকমিক করছে। স্তিমিত গ্যাসের আলো। কুন্তল-দা খানিকটা সঙ্গে গিয়ে ফিরে চলে গেলেন। দুজনে নিঃশব্দে চলেছি।

ভাল চাকরি হল আমার ! নিরুকে অন্দরবর্তী করে স্বামী-পরিচয়ে আছি, দূর-দূরান্তরে যাবার হুকুম নেই। একদিন কুন্তল-দা এলেন। নাছোড়বান্দা হয়ে ধরলাম, মানুষের জেল হয়—দু-মাস হোক, ছ-মাস হোক তার একটা মেয়াদ থাকে। আমার মুক্তি কবে হবে বলুন।

হল কত দিন ?

রাগ করে বলি, দেখ না হিসাব করে। তিন মাস পুরে গেছে। টবের গাছ আগলে থাকা আমার দ্বারা পোষাবে না, স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।

আমার ভাব দেখে কুন্তল-দা মৃদু মৃদু হাসেন। বলেন, আচ্ছা—থাক আর ক'টা দিন। দেখি আর কাউকে।

কাউকে পাবে না। আমার মতো গাধা কি দুনিয়ায় আর একটা আছে ?

যেখানে থাকতাম, সেটা আধা-শহরগোছের একটা জায়গা। সেদিন সন্ধ্যা থেকে বড় ঝড়বৃষ্টি। অনেক রাত্রে দরজার শিকল ঝনঝনিয়ে উঠল। নিরু ডাকছে। কি ব্যাপার ? দরজা খুলে দেখি, তার হাতে হেরিকেনের আলো, কাঁখে ঝুড়ি ; আমাদের পেছনের বাগানে বিস্তর আম পড়েছে শঙ্কর-দা। চল কুড়িয়ে আনি।

রাগের সীমা রইল না। বললাম, হ্যাঁ—এই সমস্ত করে বেড়াই। কাল থেকে তুমি কোমর বেঁধে আমের আমসি করতে লেগে যাও। আর বল তো গোয়াল বেঁধে দু-চারটে গোরু পুষবার বন্দোবস্ত করি।

তার হাসিমুখ মুহূর্তে ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। হেরিকেনের ক্ষীণ আলোতেও স্পষ্ট দেখতে পেলাম। পায়ের নখে মেজেয় দাগ দিতে দিতে সে বলে, আমি কি করব বলুন ? আমার কি দোষ ?

দোষ কারও নয়। চুপ করে শুয়ে থাকগে। কাটা ঘায়ে নুন দিতে এস না, এইটুকু দয়া কর। এ রকম থাকতে তোমার ফুর্তি লাগছে, আমার কান্না পায়।

ঝুড়িটা ধপ করে নামিয়ে রেখে নিরু ফিরে চলল। বলে, আপনি চলে যান, কালই—বুঝলেন ?

আমি বললাম, তোমার কথায় এখানে আমি আসি নি নিরু, তোমার কথায় যেতেও পারি নে। যাঁর হুকুমের দরকার তাঁকে জানিয়েছি। ছাড়া পেলে এক মিনিটও দেরি করব না।

তা হলে আমিই যাব কাল। আর একটা দিনও নয়। কুন্তল-দা দাঁড়িয়ে হুকুম দিলেও না।

দরজার সামনে গিয়ে সে এক মুহূর্ত দাঁড়ায়। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলে, ফুর্তির কথা বলছিলেন, খুব ফুর্তি দেখছেন ! দেখবার চোখ কি আছে আপনার ? আমিই কি এ জীবন চেয়েছিলাম ? মনের ভুলে একটুখানি হেসে ফেলেছি, মাপ করবেন।

দড়াম করে সে দরজায় হুড়কো এঁটে দিল।

আমি গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু নিরুর কথাগুলো বার বার মনে আসছে, তার বিষণ্ণ চেহারাটা যেন চোখে দেখছি। গৃহস্থ-ঘরের ভাবপ্রবণ মেয়ে, লেখাপড়া

শিখছিল, তারপর দেশের কাজ করবে বলে, সর্বস্ব ছেড়ে চলে এসেছে। এই নির্বান্ধব পুরী তার বুকে পাথর হয়ে চেপে থাকে। সমস্ত দিন আর দশটা বউ-ঝির মতো ঘরের কাজে নানা রকম ফাইফরমাস মুখ বুজে খাটে। নিষুতি রাতে অভিনয়ের খোলসটা একটু খুলতে চেয়েছিল, ছুটোছুটি করে আম কুড়োত, হাসত, আবোল তাবোল বকত খানিকটা···কী এমন অপরাধ যে এত কথা শুনিয়ে দিলাম, বেচারি মুখ চুন করে চলে গেল।

শুয়ে থাকতে পারি নে, নিরুর ঘরের সামনে এসে ডাকাডাকি করলাম। সাড়া নেই। সাড়া পাওয়া যাবে না জানি। ঝুড়ি নিয়ে একলা বেরুলাম। সকালে রাগ পড়ে যাবে, ঝুড়ি-ভরতি আম দেখে খুশি হবে সেই সময়। তখন বাতাস থেমেছে, মাঝে মাঝে বৃষ্টির ঝাপটা আসছে। আমার এক পিসতুত বোন জয়া-দিদির কথা মনে পড়ছিল। ছেলেবেলায় পাঠশালা পালিয়ে তাঁর সঙ্গে ছুটোছুটি করে আম কুড়োতাম। সে-সব দিন কোথায় চলে গেছে! আজ আমি শঙ্কর রায়, দলের ছেলেমেয়েদের অতি শ্রদ্ধেয় শঙ্কর-দা গভীর রাত্রে আম কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি, এ দৃশ্য কেউ দেখলে কি রকম ব্যাপার হবে আন্দাজ কর তো!

ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছিল। নিরুর সামনে পড়তে সে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় ছিলেন রাত্রে?

কেন, ঘরে। এই তো উঠে আসছি।

সে হয়তো শেষ রাতে কখন এসে শুয়েছেন। আমি একবার উঠেছিলাম। দেখি, দুয়োর হাঁ হাঁ করছে।

হাঁ, তা বটে। কিন্তু বেশ ছিলাম হে—অত্যন্ত আরামে···মানে স্প্রিঙের খাটে শুয়েছি তো, যেন গলে যায়—

নিরু শান্তভাবে বলে, কোন্ জায়গায়?

চটপট মিথ্যে বানিয়ে বলা অভ্যাস করে আয়ত্ত করেছি, কিন্তু নিরুর সামনে কথা আটকে যায়। বললাম, ছিলাম গলির মোড়ের বাড়িটায়। করব কি··· কাপড় ভিজে গেল, ওদের কাছ থেকে একটা শুকনো কাপড় চেয়ে নিয়ে—

বাড়িটা কার, সেই কথা জিজ্ঞাসা করছি।

রাগ করে বলি, কার বাড়ি—কি বৃত্তান্ত, মুখস্থ করে আসিনি। অত শত বলতে পারব না।

নিরু বলে, আমি পারব। ছিলেন রান্নাঘরে। কাপড়ের ট্রাঙ্ক আমার ঘরে কি-না—তাই উনুনে কাঠ দিয়ে আগুন করেছেন, ভিজে কাপড় বসে বসে গায়ে শুকিয়েছেন। আমাকে ডেকে কাপড় চাইলে কি অপমান হত?

আবার বলে, সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া করে রওনা হব। আপনি কি যাবেন কলকাতা অবধি ?

আমি বললাম, যাওয়া-যাওয়া করছ, কী এমন বলা হয়েছে শুনি ? মন খারাপ হলে মানুষ কত কি বলে! এই নিয়ে কুন্তল-দার কাছে একশ'খানা করে লাগাবে তো ?

কিচ্ছু বলব না কুন্তল-দাকে। আপনি না যান, একাই চলে যাব। তিলে তিলে আপনাকে মেরে ফেলতে চাই নে—

আমি বললাম, তা বইকি! স্বাধীন হয়ে গেছ, কুন্তল-দাকে বলবে কেন ? ···কিন্তু ঝগড়া পরে কোরো। আমি দাঁড়াতে পারি নে, মাথা ছিঁড়ে পড়ছে। কুইনাইনের বড়ি থাকে তো শিগগির গোটা দুই বের করে দাও, জ্বর আসতে পারে।

কুইনাইনে জ্বর ঠেকাল না। সেই গিয়ে শুয়ে পড়লাম, আর অনেক দিনের খবর জানি নে। অসুখের মধ্যে এমন অসহায় মানুষ! মাসখানেক পরে এক দিন কেউ কোথাও নেই, খাট থেকে নেমে দাঁড়িয়েছি। লক্ষ্য দেয়াল অবধি— ঐ দেয়ালে যেখানে বালির জমাট উঠে অনেকটা মানুষের মুখাকৃতি হয়েছে, ঐ জায়গা আমি ছোঁব। ঠিক পারব।···পারছি, হাঁ, হাঁটতে তো পারছি! ও-ঘরে পায়ের শব্দ। রুগ্ন কণ্ঠ উল্লাসে জোরালো হয়ে ওঠে, নিরু দেখ নিরুপমা—

নিরু জানলায় মুখ বাড়িয়ে দেখে।

এ কি কাণ্ড আপনার ?

হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। নিরু ছুটে এল। আমাদের দলের এক ছোকরা ডাক্তারি পাশ, তাকে এনে রাখা হয়েছিল, সে এল।

একটু পরে স্বাভাবিক হয়ে উঠলাম। নিরু তখনও আছে। বড় কড়া শাসন তার আজকাল। বার বার মিনতি করে বলি, লক্ষ্মী নিরু, খেতে দাও একটা আম। কাঁচা আম কুড়োতে গিয়ে এই দশা। এখন পেকেছে, টুকটুকে আম ঝুড়ি ঝুড়ি ঘরে রয়েছে, মিষ্টি দেখে বেছেগুছে একটা দাও, কিচ্ছু হবে না।

নিরু ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, তা বই কি! ডাক্তার কি বলেছে জানেন ?

কিচ্ছু বলে নি, তোমার বানানো কথা। আমাকে খেতে না দেবার ষড়যন্ত্র।

নিরু তর্ক করে না। বলে, বেশ তাই—

নির্বিকার মুখে সে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝনাৎ করে শিকল পড়ল।

দুয়ারে শিকল দিলে যে ?

বাইরে থেকে নিরু বলে, এ-ঘরে এত আম তো চট করে সরানো যাবে না, আপনাকে আটকে রাখাই সোজা।

কে তোমাকে মাতব্বরি করতে বলে? তুমি কে? আমার আপনার কেউ নও—

নিরু জবাব দেয়, আমি আপনার কেউ, তা বলেছি কোন দিন?

তুমি শত্রু, আমাকে মেরে ফেলবার মতলব তোমার।

বেশ, তাই। ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করুন তো—আমি বার্লি চড়িয়ে আসি।

ঝগড়াঝাটির ক্লান্তিতে চোখ বুজে পড়ে আছি। কুন্তল-দার গলা শুনতে পেলাম। তিনি আজ এসেছেন বুঝি, ও ঘরে কথাবার্তা হচ্ছে। কুন্তল-দা বলছেন ঢাকার ব্যাপারে আর দেরি করা চলে না বোন। শঙ্কর কাল অন্নপথ্য করছে, আর কি! দু'টি ছেলেকে আমি এখানে পাঠিয়ে দেব, তারা দেখাশুনো করবে।

না, না—আর কয়েকটা দিন ছুটি দিন আমাকে···এই দিন দশেক, ভাত খেয়ে কেমন থাকেন, না দেখে যাই কেমন করে?

মুশকিল, এই ক'দিনের জন্য আবার একজনকে পাঠাব?

তাই করুন দাদা। তারপর আমি গিয়ে পড়ব, সমস্ত ভার মাথায় তুলে নেব—

কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি নিরু, সাবধান। তুমি জান না বোন, তোমার কত দাম। তোমায় ছাড়তে পারব না, শঙ্করের খাতিরেও না।

রাগ জল হয়ে গেল। মনে আনন্দের তুফান উঠেছে। সত্যি, অসুখের মধ্যে মন এমন দুর্বল হয়ে যায়। আধঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি যেন অনেক দূরে থেকে মিষ্টি গান ভেসে আসছে। বিশ্বাস কর ভাই, বাড়িয়ে বলছি নে, সেদিন কত কি ভাবতে লাগলাম! যেন পৃথিবী থেকে দুঃখ-দৈন্য চলে গেছে, মানুষ অনন্ত শান্তিতে রয়েছে। সাম্রাজ্য নিয়ে হানাহানি—সে যেন অতীত যুগের বিভীষিকা।

শিকল খুলে কুন্তল-দা দেখতে এলেন। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম।

দেখুন অত্যাচার! একেবারে কয়েদ করে রেখেছে।

সামান্য দু-এক কথা জিজ্ঞেস করে কুন্তল-দা উঠলেন। বড় ব্যস্ত। দুটো খেয়ে তখনই চলে যাবেন। বার্লির বাটি হাতে নিরুপমা এল। বললাম নিরু, আমরা চেয়েছি পৃথিবীকে ভাল করে ভোগ করব।

নিরু বলে, বেশ তো, তাই করবেন।

কাছে আসতে হাতে ধরে ফেললাম নিরুপমার।

দেখ, নাগা সন্ন্যাসী আমরা নই; নিবৃত্তির সাধনা আমাদের নয়।

আমার চোখে কি ছিল, এক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে হাসিমুখে নিরু সায় দেয়: হুঁ হুঁ—

আমাদের দুজনের বিয়ে হোক।

বেশ।

তাহলে কুন্তল-দা যাবার আগে তাঁকে বলো।

আচ্ছা। বলে নিরু চলে গেল। একটু পরেই ফিরল। হাতে আইস-ব্যাগ। কুন্তল-দা আসছেন। ডাক্তারকে খুঁজলাম। তিনি নেই।

ডাক্তার?

নিরু বলে, শুয়ে পড়ুন দিকি। আপনার মাথায় আইস-ব্যাগ বসিয়ে দিই—

কেন?

মাথা ঠাণ্ডা হবে। মাথার ব্যারাম না হলে অমন আবোল-তাবোল কেউ বকে?

কুন্তল-দা আসতে নিরুপমা বলল, এ গাড়িতে যাওয়া হবে কি করে? পরেরটায় যাব। একটু গুছিয়ে নিতে হবে। 'ওঠ' বললে মেয়েমানুষের যাওয়া কি করে চলে?

তুমি যাচ্ছ তা হলে?

হ্যাঁ, কালই ঢাকায় চলে যাই, তারপর আর যেখানে যেতে বলেন।

আমি কাতর কণ্ঠে বললাম, আর ক'টা দিন থেকে যাও নিরু। আমার রোগ এখনও সারেনি।

নিরু বলে, আমি থাকলে বেড়েই চলবে।

দেখ, যদি মরে যাই?

বড্ড দুঃখ হবে। আহা গালি দেবার আর ঝগড়া করবার এমন মানুষটাও চলে গেল।

কাল আমি অন্নপথ্য করব। এই একটা দিনও থাকতে পার না?

না।

যাবার আগে নিরু প্রণাম করতে এল। আমি মুখ ফিরিয়ে রইলাম। সে পায়ের গোড়ায় মাথা রাখল। আমি পা সরিয়ে নিলাম। পায়ের দিকে চেয়ে দেখি জলের দাগ। নিরুপমা কেঁদেছে। ও মেয়েও কাঁদতে জানে তাহলে!

ঘোড়ার গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেলাম। গাড়ির মধ্যে নিরু আর কুন্তল-দা সামনাসামনি বসে চলেছেন। তেঁতুলগাছের আড়ালে গাড়ি অদৃশ্য হল, আওয়াজ কানে আসে না···

সোমনাথ ও মায়া

জগৎ দত্তের কথা নিয়ে মহাকাব্য লেখা যায়, কিন্তু লিখছে কে? লেখায়

যেদিন সময় হবে সেদিন অতীতের সাক্ষী আমরা যে ক'জন আছি আমাদের শক্তি থাকবে কি? আমরা বেঁচে থাকব তো? এখনই স্মৃতি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

সেদিন দুপুরে কালী সিংহের মহাভারতখানা নামিয়ে নিয়ে বসেছিলাম। এত পড়াশুনো ছিল বাবার, তার মধ্যেও এই বই তিনি নিয়মিত পড়তেন। বাবা মারা যাবার পর থেকে তাকের উপর তোলা ছিল। পাতা উলটাতে উলটাতে তার মধ্যে পেলাম, পুরনো কয়েক টুকরো খবরের কাগজ—আলপিনে গাঁথা, এখানে সেখানে লাল কালির দাগ দেওয়া। মনে পড়ে গেল, আমিই এই সব টুকরো কেটে রেখে দিয়েছিলাম। কোন্ বিস্মৃত যুগের কথা, সে সব মানুষ নেই, সে পৃথিবী নেই, কাগজ বিশ্রী বিবর্ণ হয়ে গেছে, পড়াই মুশকিল।

জজ এজলাসে আসিয়া বসিলেন। রায় কি দিবেন পূর্বাহ্ণেই অনুমান করা গিয়াছিল। কিন্তু আসামী জগৎলাল কাঠগোড়ায় চেয়ারের উপর নিতান্ত নির্লিপ্তের ন্যায় বসিয়া আছে। আলস্যে মাঝে মাঝে তাহার তন্দ্রাবেশ হইতেছে—এইরূপ একটি ভাব।

বহু বাগাড়ম্বরের পর হুকুম জানিতে পারা গেল, ফাঁসি। জগৎ হাসিমুখে জজকে নমস্কার করিল। জজ বলিলেন, আপনি আপিল করিতে পারেন। দরকার নেই—বলিয়া জগৎ প্রবল হাস্য করিতে লাগিল।

মল্লিকা এসেছে, আমার কাঁধের উপর ঝুঁকে সে-ও পড়ছিল। বলে উঠল, ধন্য।

তার মুখের দিকে তাকালাম। এই ধরনের কথা শুনলে সচরাচর আমি হেসে উঠে তাকে অপ্রতিভ করি। কিন্তু আজ পারলাম না। মনে পড়ল, আমি আর কুন্তল-দাও সেদিন আদালতের এক কোণে দাঁড়িয়েছিলাম। জগতের হাসি দেখে সেই পাথরের মানুষটি পর্যন্ত অস্ফুট স্বরে মল্লিকারই মতো ঐরকম একটা কি বলেছিলেন।

মল্লিকা বলে, কুন্তল-দার দলের ছেলে?

জগতের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চাই। দায়ে পড়ে সংক্ষেপ-করা কাহিনীর মধ্যে না-ই বা তাকে আনলাম! বললাম, এর চেয়েও তার বড় পরিচয় আছে। জগতের বাবা হলেন সোমনাথ দত্ত।

বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে মল্লিকা বলে, বল কি? হাত জোড় করে সে নমস্কার করল।

তুমি তাঁকে দেখেছ নাকি মল্লিকা?

মল্লিকা বলে, না। কিন্তু ভগবানকেও তো দেখিনি।

ভগবান নিয়ে টানা-হেঁচড়া কেন?···সে আমলে লোকে ওঁদের সম্বন্ধে কি বলাবলি করত, জান?

কি?

ভয়ঙ্কর বাঘের দল। হাসতে হাসতে ঐ রকম যারা প্রাণ নিয়ে খেলা করতে পারে, তারা কক্ষনো মানুষ নয়।

মল্লিকা বলে, হাসতে হাসতে একদিন যারা এত বড় দেশটার সর্বনাশ করেছিল, তারাও মানুষ ছিল না। ভয়ানক পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভয়ঙ্করই হয়ে থাকে।

বারান্দায় গিয়ে বসেছি। উঠোনের উপরে রাস্তা, তার ওদিকে মাঠ··· কাশের সাদা ফুলে ফুলে সমস্ত মাঠ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। খররৌদ্রে হঠাৎ চোখে ধাঁধাঁ লাগে, মনে হয় সামনে দুস্তর বালু-সমুদ্র।

মল্লিকা এসে পাশে আলসের উপর বসল। বলে, সোমনাথকে দেখেছ তুমি?

কত! প্রথম দেখি, জগতের বিয়ের দিন। বৈঠকখানায় ঘুমিয়ে আছি, জগৎ বাসর ঘর থেকে পালিয়ে এল সেখানে—

নাছোড়বান্দা মল্লিকা, তার তাগিদে স্মৃতির সাগর মন্থর করতে হয়। নিজে আর কতটুকুই বা জানি, মায়ার মুখে যেমন শুনেছি সেই রকম বললাম। মায়া আমার মামাতো বোন, খালিশপুর থেকে মাইল তিনেক দূরে ওদের বাড়ি। কলেজে ঢুকে গোড়ায় জগতের সঙ্গে হস্টেলের এক ঘরে পাশাপাশি থাকতাম। কুন্তল-দার হুকুমে রাত দুপুরে হস্টেল পালিয়ে কতবার ভৈরব পাড়ি দিয়েছি! একবার ডিঙি ডুবে গেল, সাঁতরে ওপারে উঠে জগতের প্রতীক্ষায় ভোরবেলা অবধি চাঁদাকাঁটার ঝাড়ের পাশে বসে হি-হি করে কেঁপেছিলাম। জগৎ টানের চোটে দু'বাঁক এগিয়ে গিয়ে উঠেছিল। এর থেকে মোটামুটি বুঝতে পারছ, আমাদের বন্ধুত্বটা ছিল কি রকম। আমাদের সঙ্গে সে মায়াদের বাড়ি অনেকবার গিয়েছে। আর এরই প্রায় বছর দুই আগে থেকে সোমনাথ ফেরারি ছিলেন। কাজেই জগতের অভিভাবক সে নিজেই। জুত হয়ে গেল। আমি যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলাম।

মল্লিকা মুখ ঘুরিয়ে বলে, তুমি উপলক্ষ। যোগাযোগ নিজেরাই করেছিল. ভালবাসার বিয়ে, বুঝতে পারছি।

সে যাই হোক, শুভকর্ম তো নির্বিঘ্নে হল। পাড়াগাঁয়ের বিয়ের ব্যাপারে সাধারণত যত রাত্রি হয়ে থাকে, এখানে হাঙ্গামা চুকেছিল তার অনেক আগে। তার কারণ, মায়ার বাবা কলকাতায় এক জমিদারের বাড়ি চাকরি করতেন,

সেখান থেকেই রসুয়ে-বামুন এবং খাটনির লোকজন নিয়ে এসেছিলেন, গাঁয়ের লোকের উপর নির্ভর করেননি। মাঘ মাসের শেষ, দারুণ শীত পড়েছে, বাড়িসুদ্ধ সবাই লেপের নিচে ঢুকেছে, বিয়ে বাড়ি বলে বুঝবার জো নেই।

মায়ার ঘুম আসছিল না। কেন, যদি জিজ্ঞাসা কর মল্লিকা তা হলে আমাদের বিয়ের দিনটা মনে করে দেখ। দেশসেবক বলে সবাই হৈ-চৈ করে বেদীর উপর বসায়, কিন্তু ভেবে দেখ ঘরোয়া ব্যাপারে সবাই আমরা এক রকম। তুমি উসখুস করছিলে. সেণ্ট পড়ে চোখ জ্বালা করছে। আমি তখন—

মল্লিকা আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে এদিক-ওদিক তাকায়। বলে, হচ্ছে ভাললোকের কথা। ওর মধ্যে ঐ সব ছাই-ভস্ম আনছ কেন বলো তো···

তারপর একটু ঘুমের আবিল এসেছে মায়ার! কাপড়ে টান পড়ায় সে চমকে উঠল। দেখে, চুপিচুপি গাঁটছড়া খুলে ফেলেছে। দরজা খুলে জগৎ সন্তর্পণে চোরের মতো বেরুল। মায়ার বড় ভয় করে, বাসর ঘর থেকে এ রকম বেরুনো অস্বাভাবিক এবং অত্যন্ত অলক্ষণের কথা। মায়ার চোখ ফেটে জল আসে আর কি! জগৎ গেছে তো গেছে, ফিরবার নামটি নেই। অনেকক্ষণ পরে পায়ের শব্দ পেয়ে মায়া চোখ বুজল, ঠিক যেন বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছে।

কুলুঙ্গিতে রেড়ির তেলের দীপ জ্বলছিল। মায়া চোখ মিট-মিট করে দেখে। জগৎ শোয় না, একটু ইতস্তত করে, তারপর মায়ার গা ধরে নাড়া দেয়, শোন··· ওঠ তো একটিবার—

কপট ঘুম ভেঙে মায়া বলে, কি?

কিছু খাবার এনে দিতে পার লক্ষীটি?

বিয়ের রাতে এই তাদের কথা। মায়া বলে, কোথায় পাব? সব রয়েছে ভাঁড়ারে চাবি দেওয়া। আর লোকে দেখলেই বা বলবে কি!

জগতের মুখের দিকে চেয়ে সে ফিক করে হেসে উঠল। বলে, খাবারের চেষ্টায় রান্নাঘরে গিয়েছিলে নাকি? যেমন লাজুক, একবার টের পাও। থালা ভরে এত খাবার দিয়েছিল, কিচ্ছু খাওনি বোধহয়।

জগৎ বলে, ঠাট্টা নয় মায়া, সত্যি বড় দরকার। ভাঁড়ার হোক, যে জায়গা হোক—তুমি না পার, ঘরটা শুধু দেখিয়ে দিয়ে যাও।

তার ভাব দেখে উদ্বিগ্ন মায়া বলে, হয়েছে কি?

বাবা এসেছেন।

কোথায় তিনি?

জগৎ বলে, আশীর্বাদ করবেন বলে এসেছেন। কেউ জানতে না পারে, খবরদার!

মায়া বলে, সে জানি। কিন্তু বাইরে কোথায় তাঁকে রেখে এলে এই শীতের মধ্যে? ওঁর কষ্ট হচ্ছে।

ম্লান হেসে জগৎ বলে, লেপ-কাঁথা শাল-দোশালা নিয়ে পুলিস তো দিনরাতই ঘুরে বেড়াচ্ছে। নাগাল পাচ্ছে না বলেই এত কষ্ট।

অন্ধকারে আতাতলায় দাঁড়িয়েছিলেন সোমনাথ। নিঃশব্দ রাত্রি, কনকনে বাতাস বইছে, আকাশের তারাগুলোও যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। অযত্নে অত্যাচারে বয়সের চেয়ে অনেক বুড়ো দেখায় সোমনাথকে। খালি গা, সাজ-পোশাকের মধ্যে একটা তুলোর জামা আর সুতি চাদর।

মায়া গড় হয়ে প্রণাম করল। বলে, আসুন বাবা—

সোমনাথ চমকে উঠলেন। এই রকম ভাবে মায়া চলে আসবে, তিনি প্রত্যাশা করেননি। বললেন, অভ্যর্থনা করতে এসেছ···বোকা মেয়ে, আর সবাইকে ডেকে তুলছ নাকি?

কাউকে ডাকিনি বাবা। সে-বুদ্ধি আছে। ঘরের মধ্যে চলে আসুন, কেউ টের পাবে না।

আমায় ঘরে নিলে বিপদ আছে, জান?

মায়া বললে, ফাঁকি দিলে শুনব না। আঁধারে আপনাকে দেখতে পেলাম না, আলোয় নিয়ে দেখব, প্রাণ ভরে পায়ের ধুলো নেব বাবা।

হাত ধরে সে সোমনাথকে ঘরের ভিতরে নিয়ে এল। চুপি-চুপি জগৎকে বলে, সত্যি—খাওয়ানোর কি করা যায় বল তো?

জগৎ বলে, তোমাদের ঘর-বাড়ি, তোমরা যদি না পার···আমি হলাম নতুন মানুষ, তার উপর জামাই—

মায়া বলে, আমিও তো এই দিন চার-পাঁচ কনে হয়েই আছি। কোথায় কি রেখে দিয়েছে, আমার সঙ্গে যুক্তি করে তো করেনি, কোথায় এখন খুঁজে বেড়াই?

একটুখানি ভেবে মায়া বলল, এক কাজ করতে পার? শঙ্কর-দাকে তুলে নিয়ে এস। তিনি সমস্ত জানেন, তিনি উপায় করতে পারবেন।

মল্লিকা বলে, তখনই তোমার ডাক পড়ল?

ডাক কি বলছ। দিব্বি আয়েসের ঘুম ঘুমোচ্ছি, জগৎ এসে পিঠের উপর দমাদ্দম ঘুষি চালাতে লাগল। বলে, ওর হতভাগা, বাবাকে দেখবি তো চলে আয় শিগগির।

মল্লিকা বলে, তারপর?

ভাঁড়ার জগুকাকার হেপাজতে। ভিয়েন-ঘরে চৌকির উপর পড়ে তিনি নাক ডাকাচ্ছিলেন। পৈতেয় বাঁধা চাবির গোছা, সাফাই হাতে সরিয়ে নেওয়া গেল। মিষ্টিমিঠাই প্রায় শেষ, হাঁড়ি তিন-চার মুখে নেকড়া বেঁধে চালির উপর তোলা ফুলশয্যার তত্ত্বের জন্য। তাই থেকে কিছু মায়াকে এনে দিলাম। সযত্নে শ্বশুরের সামনে সে রেকাবি সাজিয়ে দিল।

গল্পে গল্পে জানা গেল, তিনদিন খেজুর-রস আর পুকুরের জল ছাড়া আর কিছু জোটেনি সোমনাথের। কতক্ষণ ধরে কত রকমের কথাবার্তা হল। খালে জোয়ার এল। জেলেদের নৌকা ছাড়বার উদ্যোগ হচ্ছে, তাই সাড়া-শব্দ আসছে। সেই সময় তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

মায়া বলল, উঃ, কী কনকনে বাতাস! যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

সোমনাথ বললেন, ভারি তো! এরচেয়ে কত ঝড়-বাতাস মাথার উপর দিয়ে গেছে, জান?

কিন্তু কেন যায়, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

মৃদু হেসে সোমনাথ বলেন, আমার এমনি সব মায়াবিনী মা-লক্ষ্মীদের গায়ে যাতে ঝাপটাও কোনদিন না লাগে সেইজন্য।

আমার দিকে তাকিয়ে মায়া বলে, বাইরে কি রকম অন্ধকার, দেখছ শঙ্কর-দা?

সোমনাথ বললেন, সেই তো ভাল মা, আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে দিব্যি চলে যাব, কেউ দেখতে পাবে না।

তিনি চলে গেছেন। তারপর কি হল মায়ার, আর শুতে যায় না, জানালার ধারে বসে রইল সেই বিয়ের কনে। আমি আর জগৎ খাটের উপর বসে আছি, আমাদের বলবার মতো কথা জোগাচ্ছে না। খানিকটা পরে বাইরে চলে এলাম।

পরদিন মায়ার মুশকিলটা একবার বুঝে দেখ মল্লিকা। এইসব ব্যাপারে সমস্ত রাত ঘুম হয়নি—তার উপর মশার উৎপাত, মুখখানা রাঙা করে দিয়েছে। বেচারা যেখানে বসে, সেইখানেই চোখ বুজে ঝিমিয়ে পড়ে। মায়ার মা অর্থাৎ আমার মাসীমা পর্যন্ত মুখ টিপে হেসেছিলেন, আমি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু—

মল্লিকা কিন্তু আমার এসব কথা শুনছিল না, সে খবরের কাগজের একটি টুকরো নিয়ে পড়তে শুরু করেছে:

"গতকল্য জগৎলাল দত্তের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, হুকুমের পরও তাহার দেহের ওজন বাড়িতেছিল। ফাঁসির পূর্বরাত্রেও সে নাকি অকাতরে

ঘুমাইয়াছিল। সকালবেলা জেলের কর্মচারী তাহাকে ডাকিতে গিয়া দেখেন সে তখনো নিদ্রাচ্ছন্ন। অনেক ডাকাডাকির পর সে লজ্জিত স্বরে কহিল, সময় হইয়া গিয়াছে বুঝি ? আমার একটু গীতা পড়িয়া লইবার ইচ্ছা ছিল, তাহা আর হইল না। আচ্ছা চলুন—

তাড়াতাড়ি সে গেঞ্জি গায়ে দিল। চশমাটি মুছিয়া সে চোখে দিল, তারপর হাসিতে হাসিতে চলিল, যেন নিমন্ত্রণ খাইতে চলিয়াছে।

অপরাহ্নে জেলের ফটকে বিপুল জনতা হইল। জগৎলালের দূর সম্পর্কের এক খুড়া কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে মৃতদেহ গ্রহণ করিলেন। শোভাযাত্রা সহকারে উহা শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। চিতাভস্মের জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। ঐ রাত্রে নাকি বহু গৃহে অরন্ধন-ব্রত পালিত হইয়াছিল।

জগৎলালের বৃদ্ধ পিতা ও স্ত্রী এখন কাশীধামে আছেন। কর্তৃপক্ষ সংবাদ দিয়াছিলেন, তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা কলিকাতায় আসেন নাই।”

মল্লিকা মন্তব্য করে, বাজে কথা। বয়ে গেছে ওদের খবর দিতে।

আমি নিজেও মায়ার নামে তার করেছিলাম মল্লিকা, যদি দেখাটা হয়। সমস্ত চুকে-বুকে গেল, কেউ এল না। তারপর পেলাম মায়ার এক চিঠি, আমাকে বিশেষ করে যেতে লিখেছে। গিয়ে দেখি, আর এক তাজ্জব।

মল্লিকা বলে, কি ?

মায়ার সিঁথিতে সিঁদুর, পরনে শাড়ি, হাত-ভরা সোনার চুড়ি ঝিকমিক করছে।

বল কি !

সত্যি কথা।

অস্ফুট স্বরে মল্লিকা বলল, বেহায়া—

কে বেহায়া ? মায়া ?

মল্লিকা রাগতভাবে বলল, অমন স্বামী—শেষ দেখা দেখতে এল না। তার উপর ঐরকম ভাবে অন্তত তোমার সামনে আসতে একটু লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল।

শুধু মল্লিকা নয়, সবাই তোমরা ঐ এক কথাই বলবে। কি বল ভাই ? আচ্ছা, শোন শেষ অবধি।

বাঙালীটোলায় মায়াদের বাসা। গলির গলি, তস্য গলি ! টাঙাওয়ালারও ঘণ্টা তিনেক লাগল খুঁজে বের করতে। বেলা তখন ন'টা এই রকম হবে। আমায় দেখে সোমনাথ অবাক হয়ে গেলেন। আমিও দেখে চিনতে পারি নে।

লোহার শরীর ছিল, শুকিয়ে কঞ্চির মতো হয়ে গেছেন। তামাক খাচ্ছেন আর খকখক করে কাশছেন।

হবে না? ঐ তো একমাত্র ছেলে!

আমায় যে আসবার জন্য চিঠি দিয়েছে, সে-কথা মায়া সোমনাথকে জানায় নি। বললাম, আপনার নাকি ভয়ানক অসুখ কাকাবাবু?

সোমনাথ বললেন, তাই লিখেছে বুঝি। বুড়ো ছেলের মা কিনা, অল্পেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু তাকে দেখছি নে যে!

সোমনাথ বললেন, সিংহিদের মেয়েকে সেলাই শেখাতে গেছে। এসে তারপর রান্নাবান্না করবে।

গলা নামিয়ে বলতে লাগলেন, ভাল হয়েছে বাবা, এই ফাঁকে তুটো কথা বলে নিই তোমাকে। আমি বউমাকে কিছু জানতে দিইনি। জানতে পারলে, একেবারে মরে যাবে। সে জানে, জগতের তিন বছরের জেল হয়েছে। তুমি টেলিগ্রাম করেছিলে, আমি তা দিইনি, গাপ করে ফেলেছি।

মল্লিকা সোয়াস্তি পেল। বলে, তাই বল! নইলে জেনে শুনে মেয়েমানুষ ঐ রকম অবস্থায় সেজে-গুজে থাকতে পারে?

খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে সোমনাথ বলে উঠলেন। তারপর?···শেষ হয়ে গেছে, সে তো জানি। বল দিকি একটু সেইসব কথা। ভাল করে একটা নিঃশ্বাস ফেলবার সাহস হয় না বাবা, পাছে ধরে ফেলে। যে রকম চালাক মেয়ে বউমা! সিংহিদের মেয়েটার সঙ্গে চলে গেছেন, বল তো এই ফাঁকে।

আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। আমি আর কথা বলতে পারি না, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আছি। সোমনাথ বলেন, কাঁদছ শঙ্কর? ছিঃ! শোন তবে। আমার বড়দাদার তুই ছেলে, অমল আর কমল। বেকার অবস্থায় তিন বছর ঘুরে অমলের শেষে যক্ষ্মা হল, নিমতলার ঘাটে এখন শান্তি পেয়েছে! আর কমলও মরেছে; লেখাপড়া শিখেছিল কিন্তু ভাত জোটাতে না পেরে গাঁজা-গুলি খেয়ে বেঁচে আছে কোনখানে। আমার জগৎ তো এদের চেয়ে ভাল গেছে।

পায়ের ধুলো নিয়ে বললাম, এই নরম মাটির দেশে আপনার জগতের মতো ছেলে জন্মাল কি করে, তাই ভাবি কাকাবাবু!

সোমনাথ এই সময় ইসারা করতে লাগলেন, যেন আনন্দের আতিশয্যেই হো-হো করে হেসে উঠলেন। সোমনাথের সম্বন্ধে অনেক অসম্ভব কাহিনী শুনেছো তোমরা, আমি নিজের চোখে এই একটা দেখলাম। মায়া ফিরে

এসেছে। সোমনাথ বলতে লাগলেন, আমার কী এমন অসুখ বউমা শঙ্করকে এতটা পথ টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এলে। অবিশ্যি, একটা সুবিধা হল, জগতের সব খবর ওর নিজের মুখে শোনা যাবে। সেই সব কথাই ও আরম্ভ করেছিল।

মায়ার মুখ মুহূর্তে সাদা হয়ে গেল। বলে, কি কথা? কথাবার্তা থাকগে এখন!

আমি বললাম, শাস্তিতে আছে সে।

সোমনাথ বলে দিলেন, আর তিন বছর জেল হবার সে খবরটা শুনিয়ে দাও।

মুখস্থ কথার মতো বললাম, রায় বেরিয়েছে—তিন বছরের জেল।

আবার সোমনাথ হেসে উঠলেন : বুঝলে বউমা মোটে তিন বছর। ও তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

মায়াও হাসতে লাগল। বলে, তা ঠিক। তিন বছর আর ক'টা দিন। আপনি অমন কত তিন বছর তো আন্দামানে ছিলেন। তা হলে দেখুন বাবা, আমি গোড়া থেকে বলছি মামলা নিয়ে এতো যে হৈ-চৈ হল—

সোমনাথ বললেন, পর্বতের মূষিক-প্রসব। জজ একবর্ণও বিশ্বাস করল না। রায়ে কি বলেছে শঙ্কর? সেই যে তুমি বলতে যাচ্ছিলে? শঙ্কর খাঁটি খবর রাখে, বউমা।

মায়া বলে, তা তো বটেই। এক দলের ওঁরা। তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে কতকটা হুকুমের ভাবে বলে, রায়ের কথা পরে হবে দাদা। এতদূর থেকে এলে, আগে কলতলায় চল, গায়ে যে এক ইঞ্চি ধুলো জড়িয়ে গেছে।

কোথায় ধুলো? এসেছি কি এখন? হাত-পা ধুয়ে এসে বসেছি।

মায়া রাগ করে ওঠে। তুমি বড্ড তর্ক কর শঙ্কর-দা। ধুলো রয়েছে, নয়তো কি মিছে কথা বলছি? মাথার চুল অবধি ধুলোয় রাঙা হয়ে গেছে। এস—

কলতলা সামনে, কিন্তু আমাকে মায়া বারান্দা দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যায়! বললাম, তোমার শ্বশুর একেবারে অথর্ব হয়ে গেছেন দেখছি, চলে ফিরে বেড়াতে পারেন না বুঝি?

ভাগ্যিস্!

তার মানে?

এ রকম না হলে বাঁচতে পারতাম না। তারপর মায়া অন্য কথা পাড়ল। বলে, কি রকম করে এলে শঙ্কর-দা? উড়ে এলে নাকি?

দিব্যি টাঙায় চড়ে। সিংহিদের বাড়ি না গেলে জানতে পারতে, এক মাইল দূর থেকেও ঝড়ঝড় আওয়াজ পেতে।

মায়া বলে, তুমি আসছ—তোমার চিঠি পেয়েছি, বয়ে গেছে আমার সিংহিদের

ওখানে যেতে। বাবাকে ঐরকম বুঝিয়েছিলাম। সিংহিদের মেয়েটার সঙ্গে তাদের মোটর নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে এই এতক্ষণ হা-পিত্যেশ বসে—

আমি যে কাশী স্টেশনে নেমে চলে এসেছি।

শেষকালে আমারও তাই মনে হল। তোমার কিন্তু খুব বুদ্ধি শঙ্কর-দা।

কেন ?

তোমায় সামাল করে দেব বলে ছোটাছুটি করে স্টেশনে গিয়েছিলাম। কী ভয় যে হয়েছিল তোমাদের মুখোমুখি দেখে, তুমি কিন্তু আন্দাজে বুঝে নিয়েছ।

মায়ার গলার স্বর ভারি হয়ে আসে। বলতে লাগল, আমি একটা খবরের কাগজ বাড়িতে আনতে দিই নে শঙ্কর-দা, এই গয়না আর শাড়ির বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি। হু হু করে বুকের মধ্যে, তবু হাসিমুখে মিথ্যে কথা বলে যাই। বাবা চিরটাকাল কত নির্যাতন সয়েছেন জান তো! যে গিয়েছে সে আর ফিরবে না। কিন্তু খবর শুনলে বাবা কাটা-কবুতরের মতো চোখের সামনে ছটফট করে মারা যাবেন।

রান্নাঘরে বসে চা খাচ্ছি, মায়া রুটি সেঁকছে। বলে, খবরদার শঙ্কর-দা, বাবা যেন ঘুণাক্ষরে কিছু না জানতে পারেন।

না, তা পারবেন না।

তুমি বেশি দিন থেকো না শঙ্কর-দা, কখন হয়তো কথায় কথায় বলে ফেলবে। দু-একদিনের মধ্যে চলে যাও—

যাব! কিন্তু চিঠি লিখে আনলেই বা কেন ?

মায়া বলল, সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে চল সারনাথেই যাই। নতুন একটা মন্দির হয়েছে।

আমি বললাম, হাঁ, দেখবার জিনিস বটে! কিন্তু আজকে থাক, আজ বড় ক্লান্ত।

চোখের কোণে দু-ফোঁটা জল জমেছিল, বাঁ-হাতে মুছে ফেলে মায়া বলল, দেখতে নয়, মন্দিরের চাতালটা বড় ঠাণ্ডা। ঐখানে বসে বসে তোমার কাছ থেকে সব শুনব। না কেঁদে কেঁদে আমি যে মরে যাচ্ছি দাদা। তোমায় এইজন্য চিঠি লিখে আনিয়েছি।

বিকেলবেলা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, আমরা রওনা হবার তোড়-জোড় করছি, গোলমাল বাধালেন সোমনাথ। বললেন, ভাল হয়েছে। এ গাড়িতে আমি ঘুরে আসি। মন্দির তো উড়ে পালাচ্ছে না বউমা, আর একদিন যেও।

আপনি বেরুবেন ?

সোমনাথ বললেন, এক বাঙালি প্রফেসার পাঁচটার সময় চায়ে ডেকেছে. আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনবে বলে। অনেকবার এসে ধরাপড়া করে গেছে।

মায়ার দিকে একনজর চেয়ে আমি বললাম, তাহলে এই গাড়িতে আপনি চলে যান। আমরা রাস্তা থেকে আর একটা ডেকে নেব।

সোমনাথ হেসে বললেন, তবেই হয়েছে! যা চোরের উপদ্রব, বাড়ি দেখবে কে? আর তোমাকেও তো চাই শঙ্কর,—বুড়ো হয়েছি, নিজের উপর কি ভরসা আছে।

বোঝ ব্যাপারটা, সোমনাথের মুখে এই কথা! তাই তো কামনা করি, আর বুড়ো হবার আগেই যেন আমরা মরে যাই। মায়া বিশেষ আপত্তি করল না। তাই হোক শঙ্কর-দা। আমি থাকি বাড়িতে—

শহর ছাড়িয়ে ফাঁকায় এসে সোমনাথ আমার হাত ধরে নামালেন। বললেন, এবার বল দিকি আমার খোকার কথা—

মুখ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাই।

বললাম, পাঁচটা বাজে যে! প্রফেসার অপেক্ষা করছেন।

ও সব মিথ্যে কথা। খোকার কথা শুনব বলে এসেছি।

বুড়োর বিশীর্ণ গণ্ড বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। স্বদেশি-যুগের সর্বত্যাগী নেতা—তাঁর নাম সকলের মুখে মুখে ফেরে, তিনি করলেন কি—সেই ধূলিমলিন পথের ধারে আমগাছের শিকড়ের উপর বসে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে লাগলেন। আর কেউ দেখে নি, দেখলাম কেবল আমি।

ফিরবার পথে তিনি বারম্বার সাবধান করে দিলেন বড্ড চালাক মেয়ে আমার বৌমা, খবরদার! সে বেটি বুঝতে পারে নি তো কিছু?

ঘাড় নেড়ে জবাব দিই, না।

বাড়ি আসতে মায়া জিজ্ঞেস করে, কি রকম মজলিস হল বাবা?

উৎফুল্ল কণ্ঠে সোমনাথ বললেন, আমি ভেবেছিলাম, এমনি দু-চার জন। মস্ত বড় ব্যাপার—ঘর ভরে গিয়েছিল। তোমার একা একা খুব কষ্ট হয়েছে—না মা?

মায়া হেসে বলে, একা থাকতে আমার বয়ে গেছে। সিংহি-বাড়ির মেয়েরা এসেছিল—খুব তাস আর কড়াই ভাজা চললো। এই একটু আগে তারা চলে গেছে।

বারান্দায় নিয়ে এসে আমায় চুপি-চুপি বলে, অভিনয়ের এই খোলসগুলো ছেড়ে একটুখানি বেঁচেছিলাম দাদা। কিন্তু যে রকম গল্প করা বাতিক তোমার—কিছু বলে ফেলে নি তো?

—জবাব দিই, না কিছু না।

সে রাত্রেই কাশী ছেড়ে এলাম

কুন্তল-দার মৃত্যু

বরানগরের ছাতটিতে যথারীতি আমরা গিয়ে জুটেছিলাম। আস্তিন গুটিয়ে মাদুরের উপর সশব্দে এক কিল মেরে কুন্তল-দা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দিলেন, আর তিন বৎসরে দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে।

এক কোণে মা হাসিমুখে চেয়েছিলেন। কুন্তল-দার মা, আমাদের সকলের মা। মায়ের কোলের কাছটিতে সুরমা। হঠাৎ সুরমা সোজা হয়ে বসে এসরাজে ঝনঝন আঙুল চালাতে শুরু করে। কুন্তল-দা তাড়া দিয়ে ওঠেন, থাম—

মা বললেন, তার চেয়ে তোরাই চেঁচামেচি থামা। আমার মায়ের হাতের বাজনা শুনেছিস কোনদিন?

এটা কি বাজনার সময়?

মা বললেন, কেন নয় শুনি?

কুন্তল-দা বলেন, ঘরে আগুন লেগেছে, সব জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে—

সুরমা খিল-খিল করে হেসে উঠল। বলে, ঘরে নয়—গোয়ালে। আওয়াজ আমাদের উপরতলা অবধি গেছে।

হিরণ হাতমুখ নেড়ে আপত্তি জানায়। বলে, গোয়াল মানে? আমরা তবে কি—শোন কুন্তল, উনি আমাদের গরু বলছেন।

সুরমা বলল, সত্যি সত্যি আমার বুকের মধ্যে কাঁপছিল। না জানি কি ভয়ানক ব্যাপার! একদম ছুটে এসেছি।

অর্থাৎ তুমি একটা ভয়ানক মিথ্যুক। ছুটে এসেছে, এসরাজ হাতে নিয়ে তো?

সুরমা তর্কে হারবার মেয়ে নয়।

এই এসরাজই খাড়া করলে লাঠি হতে পারে।

ব্যঙ্গের সুরে কুন্তল-দা বলেন, তা ঠিক। কিন্তু করবে কে?

তোমরা?

রাগে মুখ লাল করে সুরমা বলে, পারি কি-না পরখ করে দেখেছেন।

করছি, কাছে এস।

তারপর বলা নেই কওয়া নেই, একটা আলপনি তুলে নিয়ে কুন্তল-দা তার সুন্দর শুভ্র-আঙুলে ফুটিয়ে দিলেন। মা হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, করিস কি, ওরে ডাকাত ছেলে? দেখ দেখি কাণ্ডটা—

কুন্তল-দা বললেন, সামান্য একটা আলপিন, মা। বোমা নয়, মেসিনগান নয়। ইঃ, রক্ত বেরিয়ে গেল দেখছি!

কোথায় রক্ত? সুরমার বিরক্ত মুখ এতক্ষণে স্বচ্ছ হাসিতে ভরে গেছে। কুন্তল-দার এরকম পাগলামি আমরা আগেও দেখেছি। এমন গম্ভীর মানুষ, কিন্তু মাঝে মাঝে একটি শিশু যেন তাঁর মধ্যে খেলা করে বেড়ায়। সুরমা বলে, রক্ত কোথায় মাগো? রক্ত নয়, মধু।

আচ্ছা, দাও তো মধুর ফোঁটা কপালে পরিয়ে।

মা রাগ করে ওঠেন, বাহাদুরি কত! তিলক পরে সব জয়যাত্রায় বেরুবি নাকি?

সুরমার টিপ্পনীও সঙ্গে সঙ্গে। গোছাখানেক চুল কেটে দিতে হবে না কুন্তল-দা? মহাবীরদের ধনুকের ছিলা হবে?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, এ চলবে না কুন্তল-দা। যাই বল, তোমার এ তিলক-টিলক একেবারে সেকেলে।

এতে আমাদের তো কিছু নয় শঙ্কর, এ কেবল ওরই জন্যে। কুন্তল-দার স্বর গম্ভীর হয়ে ওঠে। বলেন ফোঁটা পরে কেউ বাঘ-সিংহ হয় না—সে তোমরা জান, সবাই জানে। কিন্তু যে হাতে ফোঁটা পরিয়ে দেবে সে হাতে এসরাজ ধরতে ওর লজ্জা করবে।

সুরমা জ্বলে উঠল। গান-বাজনা আমোদ-আহ্লাদ কিছু থাকবে না, দেশের মানুষ সন্ন্যাসী হয়ে যাবে, এই আপনাদের সাধনা। দেশটাকে মরুভূমি বানাতে চান?

কুন্তল-দা বলেন, আমরা চাই ঐশ্বর্যবান দেশ। সকলে ভাল খাবে, ভাল পরবে। আর তার জন্য পরকাল অবধি অপেক্ষা করতেও বলি নে, মোটে এই তিনটে বছর। আমরা যা বলি, সেই মতো কাজ কর তো সকলে—

সন্ধ্যার পর সুরমা আবার এসেছে। ঘরে কুন্তল-দা। এসব পরে সুরমার মুখে শুনেছি; তার মুখে শোনা কাহিনী আমি নিজের মতো করে বলে যাচ্ছি। শেষের মাসখানেক ছাড়া মাঝের ব্যাপারে আমার কোন যোগাযোগ নেই।

মেঝের উপর ছড়ানো ছিল কুন্তল-দার কাপড়-জামা টুকিটাকি জিনিস-পত্রের বাণ্ডিল। একটা টিনের বাক্সে তিনি সমস্তগুলো ভরতি করার চেষ্টায় ছিলেন। সুরমার পায়ের শব্দে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, কি?

এসরাজ ফেলে দিয়েছি—

ওঃ! বলে কুন্তল-দা আবার নিজের কাজে লেগে গেলেন।

সুরমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানি · দেখে। শেষে বলল, সুঁচের ছেঁদায় হাতী ঢুকবে না, গায়ের জোর যতই থাক। সরুন।

কুন্তল-দা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আবার সাবধান করে দেন, সমস্ত দরকারি; কিছু যেন বাদ পড়ে না—

সমস্ত? এটা? এটাও? স্তূপের ভিতর থেকে বেরুতে লাগল ছেঁড়া গেঞ্জি, মাথা-ভাঙা ফাউন্টেন পেন মায় একটা পাখার বাঁট পর্যন্ত।

এসব এর মধ্যে এল কি করে?

এমনি এসে জোটে। সংসারে সব অকেজো কি বাদ দিয়ে চলে যায়? একটুখানি স্তব্ধ হয়ে সুরমা কুন্তল-দার জবাবের প্রত্যাশা করল। তারপর মুখ তুলে উত্তপ্ত কণ্ঠে বলে, কিন্তু আপনি পারেন। আপনার পথে আপনার সঙ্গে ছুটতে গিয়ে যারা পেরে উঠল না, ধুলোর মধ্যে তাদের ধাক্কা দিয়ে ফেলতে আপনার এতটুকুও বাধে না। আপনি তো মানুষ নন।

কুন্তল-দা বলেন, আমি জানোয়ার?

না পাথর—

তারপর সুরমা প্রশ্ন করে, ভোরে, চলে যাচ্ছেন?

হাঁ।

কোথায়?

কুন্তল-দা উত্তর দেন না।

সুরমা অধীরভাবে বলতে লাগল, তার মানে—বলবেন না, আমায় বিশ্বাস করে তা বলতে পারেন না! বেশ। ফিরবেন কতদিনে, সেটা বলতে আপত্তি আছে?

সুরমার উত্তেজনায় কুন্তল-দা মৃদু-মৃদু হাসতে থাকেন। বলেন, আমি তা জানি নাকি?

আপনি কিছু জানেন না! একটা কথা কেবল চূড়ান্ত করে জেনে রেখেছেন, তিন বছরে দেশ স্বাধীন হবে। আপনার হিসাবে ভুল হয় না!

মাইনে দিয়ে কলেজে পড়েছি, ভুল হলেই হল? অকস্মাৎ কুন্তল-দার কণ্ঠ অতি মধুর ও স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। বললেন, কেন আমাদের কথা এত ভাব সুরমা?

ক'টিই বা ছেলে, হয়তো কয়েক হাজার—

সুরমা বলে, কেন ভাবব না? এই তো, এই মাটিরই মানুষ,—অথচ দেশের পরে অত ভালবাসা কোথা থেকে আসে? কোথায় পায় এমন মনের জোর? এদের এক একজন যে এক একটা জাতের নতুন ইতিহাস গড়ে তুলতে পারে! একটু চুপ করে থেকে নিঃশ্বাস ফেলে আবার বলে, অথচ ক'জনই বা এদের জানে।

কুন্তল-দা গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, না-ই বা জানল। কিন্তু এদের অত ভালবাসা আজকে সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। বোন, মনের চেহারা যে দেখা যায় না—তাহলে দেখতে শান্ত সুস্থ লোক একটাও আজ এতবড় দেশের মধ্যে নেই।

কেউ নেই?

না। নতুন সূর্য উঠেছে, মানুষ চোখ বুজে থাকতে পারে কতক্ষণ?

দু'জনে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। সুরমা সহসা আনত হয়ে কুন্তল-দার পায়ে প্রণাম করতে যায়। কুন্তল-দা সভয়ে পিছিয়ে গেলেন।

এই দেখ মুশকিল। পাথর বলে গালি দিলে, এবার পাথরের দেবতা বানাতে চাও বুঝি! না—না—না—

তারপর কতদিন গেল, কুন্তল-দার পাত্তা নেই। ইতিমধ্যে সুরমা দু-দুটো পাশ করেছে, একটায় স্কলারশিপও পেয়েছে। বাগবাজারের দিকে এখন নতুন বাড়ি হয়েছে, তারা সেখানে থাকে। মায়ের সঙ্গে তাই ইদানীং বড় একটা দেখা হয় না. তিনি সেই বালি-খসা পুরানো বাড়িতেই থাকেন। ছেলে নেই, কিন্তু মুখে সেই রকম হাসিটি আছে। পরের ছেলে আমরা অনেকে গিয়ে মায়ের ভালবাসা ভাগ করে নেই।

এরই মধ্যে একবার সুরমার মাসিমারা বড় মেয়ের বিয়ে দিতে কলকাতায় এলেন। মেসোমশায় সাব-রেজিস্ট্রার, কিছুকাল আগে ঢাকার দিকে গাঁয়ে বদলি হয়েছেন। এদের পাড়াতেই বাসা তাঁদের।

সকালবেলা সুরমা এবং মাসিমার মেজ মেয়ে আভা এক সঙ্গে গল্পগুজব করছে; জুতোর ভয়ানক রকম আওয়াজে মুখে ফিরিয়ে দেখে, এক গোরা সৈন্য ঘরে ঢুকছে। দালানটা আগাগোড়া মার্চ করে এসে সে এক লম্বা মিলিটারি সেলাম দিল।

আভা চেয়ে দেখে খিল-খিল করে হেসে উঠল। বলে, রাঙাদি ভাই, ভয় পেয়েছিস? বাঘ নয়—বাঘের মাসি, মিউ মিউ করে। আমাদের বিনয় দা!

ছেলেটির কথা ইতিপূর্বেও হয়েছে তাদের মধ্যে। সে হস্টেলে থাকে, এবার এম এ. দেবে, আভাদের পরিবারের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, আভার মাকে মা বলে ডাকে।

বিনয় অপ্রতিভ হয়ে গেছে। সে ভুল করেছিল; ভেবেছিল, আভা আর তার দিদি হাসি। একটা-কিছু বলে সে পালাবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু আভা ছাড়ে না।

সেলাম দিলে বিনয়-দা, তা সাহেব যে মুখ ফিরিয়ে রইল!

বিনয় বলে, কোথায় সাহেব?

মোটে দেখতেও পাওনি ?

সুরমার মুখ লাল হল। এই রকম একটা শলাপরামর্শ চলেছে, সে আন্দাজে বুঝতে পেরেছে। সুরমার বাপ ছেলেটিকে বড্ড পছন্দ করেছেন। কিন্তু এখন এই বিনয়ের সামনে আভাটার কিছু করবার জো নেই কি-না, সে তাই খুব মজা পেয়ে গেছে। বলে, দেখ তো চারিদিকে খুঁজে, শাড়িটাড়ি জড়িয়ে সাহেব ছদ্মবেশে আছেন কি-না !

বিনয় বলল, সাহেব-টাহেব মানিনে। আমি কারো গোলাম নই।

আভা বলে, এখন না থাক, বাঙালির ছেলে যখন,—হতে তো হবেই। খামোখা মনিব চটিয়ে রেখো না। আর সে তুমি নিজেই বেশ জান। নইলে সেলামের রিহার্সাল দিয়ে রেখেছ কার জন্যে শুনি ?

বিনয় চটে যায়। বলে, কাচ আর হীরের তফাত বুঝতে বুদ্ধি লাগে বুঝলে ? ওকে সাহেব-সেলাম বলে না—আমাদের রেজিমেন্টে সবচেয়ে নমস্য কেউ এলে—

হাসির চোটে আভা কথা শেষ করতে দিল না। বলে, ঠিক, ঠিক—এ রকম নমস্য আর কে তোমার আছে ? কিন্তু এই যাত্রা-দলের পোষাকটা খুলে ফেলে এবার ভদ্রলোক হয়ে এস দিকি !

বিনয় বলে, য়ুনিভার্সিটি ট্রেনিং-কোরের পোশাক—যাত্রার পোশাক বললে প্যাঁচে পড়বে, জেল হয়ে যেতে পারে। ভোরবেলা ময়দানে যেতে হয়েছিল ; এই ফিরছি, রীতিমত প্যারেড হল—

আভা বলে, বাঁশের বন্দুক নিয়ে ?

বিনয় রাগ করে বেরিয়ে গেল।

আভার হাসি আরও উচ্ছ্বসিত হয়। বলে, কেমন মানুষ বল রাঙা-দি ? একটুতে রেগে যায়—রাগাতে মজা খুব। কিন্তু বুদ্ধি আছে—

এরই পাশাপাশি আজ কুন্তল-দাকে মনে পড়ে। কত ধৈর্য, কত সাহস—কিন্তু রাগাতে একটা মিনিটও লাগে না, তখন মনে হয় একেবারে ছেলেমানুষটি। হেমন্তের এই স্নিগ্ধ সকালবেলায় হয়তো কোন দূর-দুর্গম গ্রামপ্রান্তে—কোন্ জেলায় জঙ্গলে পাহাড়ের ধারে এখন তাঁরা কি ভাবছেন ? কবে উঠবে আকাশে তাঁদের অনেক প্রতীক্ষার নতুন সূর্য, ঘরের ছেলে সব আবার ঘরে আসবেন।

আভারা রইল প্রায় মাস তিনেক। যাবার ক'দিন আগে থেকে সে সুরমাকে বড় ধরে বসল, চল্ না ভাই—রাঙাদি, দিনকতক থেকে আসবি। বড়-দিদি বরের সঙ্গে ছুটল, কার সঙ্গে যে ঝগড়া করব !

আবার তাদের সেই জায়গাটারও অতি চমকপ্রদ বর্ণনা দিতে শুরু করল।

ব্রহ্মপুত্র থেকে বেরিয়েছে প্রকাণ্ড এক খাল। তারই কিনারে ওদের বাসা। জোয়ারের সময় জানালার নিচে জল ছল-ছল করে। ছাত থেকে দেখা যায়, অনেক দূর কালো মেঘনা—নৌকা দেখা যায় না, যেন সারবন্দি হাজার হাজার পাল মেঘনার উপর দিয়ে বুক ফুলিয়ে চলেছে।

এমনি আরও কত কি। সুরমা চঞ্চল হয়ে ওঠে, কিন্তু বাবার মত পাওয়া যায় না। মা-হারা মেয়েকে তিনি কাছছাড়া হতে দেন না।

কিন্তু বছর দেড়েক পরে সেই বাবাই সদয় হয়ে উঠলেন। বললেন, চল—হরিলাল বার বার লিখছেন যখন, ঘুরেই আসা যাক একবার। আর ঐ রকম খোলা-হাওয়ায় আমার শরীরের উপকার হবে।

সুরমা বলে. শরীরের ভাবনায় তো তোমার ঘুম নেই, বাবা। আসল কথাটা কি? আপদ-বিদায়ের আবার নতুন ষড়যন্ত্র হচ্ছে বুঝি?

বাবা বললেন, তা-ই যদি হয় সে-ও তো শরীরের জন্য। বয়স কম হল না, যদি হঠাৎ আজকে চোখ বুজি—

বুঝেছি। আমি তোমার ভার-বোঝা, কাঁধ থেকে না নামিয়ে শান্তি নেই। যেখানে হোক—

বাবা রীতিমত চটে ওঠেন, যেখানে হোক মানে? বিনয় কি যে-সে ছেলে? হাজারে অমন একটা মেলে না। হরিলাল লিখেছেন, তার বাপ-মাও ওখানে। যোগাযোগটা দেখ একবার।

তারপর পাশে বসিয়ে ছোট খুকুটির মতো সুরমার মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন। বললেন, বুঝে দেখ মা, আমার মনেও তো সাধ-বাসনা আছে। তোর মা চলে গেলেন···বাড়ি সেই থেকে অন্ধকার। চুনের কলি ফেরাইনি, দরকারের বেশি একটা আলো জ্বালাইনি কোনদিন।

সুরমার বড় ব্যথার জায়গাটিতে আঘাত পড়ল! বাপের খুশিমুখ দেখার জন্য সে পারে না, এমন কাজ নেই।

•

ঢাকা থেকে মোটরলঞ্চে ওরা গিয়ে পৌঁছল। প্রকাণ্ড এক বট-গাছের নিচে ঘাট। লঞ্চের আওয়াজ পেয়ে সবাই ছুটেছে, আভাও এসেছে—সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। সুরমা কাছে গিয়ে তাকে একেবারে জড়িয়ে ধরল। বাসা ঠিক খালের উপর না হলেও কাছাকাছি বটে। এদিকে সেদিকে সেকালের ভাঙাচোরা অট্টালিকা—পাতলা ইটের টুকরো স্তূপাকার হয়ে আছে।

আভার কানে কানে সুরমা বলে, তোদের সোনাগাঁয়ে সোনা নেই, কেবল ঢিল-পাটকেল।

আভা বলে, সোনা কি রাস্তায় ফেলে রাখবার জিনিস ?

অনেক দূরে সাদা রঙের একতলা খানকয়েক বাড়ি, সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, সোনা, ঐখানে মজুত আছে রাঙা-দি—

ঐটে বাসা ওদের ?

ওটা হল থানা, পিছনে কোয়ার্টার। সোনা পুলিশের হেফাজতে আছে—নিশ্চিন্তে থাকবে ভাই।

তোর বিনয়-দা পুলিশ হয়েছেন?—সুরমা একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

আভা বলে, নতুন বলেই গাঁয়ে আসতে হয়েছে। বাবা বলেছিলেন ওঁর যা বিদ্যেবুদ্ধি—একটু পাকা হলে সদরের মাথা হয়ে উঠবেন, ভাবনার কিছু থাকবে না।

ম্লান হেসে সুরমা বলে, যা বলেছিস আভা! দেশের এ কি হয়েছে আজকাল, ছেলেমেয়ে নিয়ে ভাবনা আর কিছুতেই ঘোচে না। ছেলে নিয়ে বাপের দুশ্চিন্তা …স্ত্রী নিয়ে স্বামীর দুশ্চিন্তা—কে কখন কি করে বসে। তবে হাঁ পুলিশ হলে নিশ্চিন্ত! সেগুনকাঠে ঘুন ধরার জো নেই।

বিকালে এরা খালের ধারে বেড়াত। বেড়াবার মতোই জায়গা। পাকা রাস্তা খালের ধারে ধারে চলে গিয়েছে সেই মেঘনা অবধি। বর্ষার খরস্রোত সুতীব্র ব্রহ্মপুত্রের দিকে একখানা নদী চলেছে—কিনারের শরবন থর-থর করে কাঁপে। ওপারে দিগন্ত-বিসারী ধান আর পাটক্ষেত! যতদূর নজর চলে—সতেজ সবুজ শ্রী।

একদিন বেড়াতে বেড়াতে তারা অনেকটা দূর গিয়ে পড়েছে। সন্ধ্যা হয়-হয়। ভয়ের অবশ্য কারণ নেই, সঙ্গে রামচরণ আছে—পুরানো চাকর, গায়ে বল-শক্তিও খুব। একটা বাঁক ঘুরতেই দেখে, তেঁতুলতলার জঙ্গলের ধারে বিনয় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে—

আভা আশ্চর্য হয়ে বলে, এখানে ?

কপালে হাত দিয়ে বিনয় বলে, অদৃষ্ট! কি করব বল—খোঁজে খোঁজে আসতে হয়।

সুরমা বলে, কিন্তু মন বলে যে বস্তুটা আছে বিনয়বাবু, তাকে তেড়ে ধরতে গেলে বিগড়ে পালায়।

বিনয় জিভ কাটল। সর্বনাশ! আপনার পিছু নিয়েছি, তাই ভাবছেন তাহলে এটির কি দরকার ছিল, বলুন তো ?

কাপড়ের নিচে কোমরে রিভলবার বাঁধা ছিল, সন্তর্পণে খুলে দেখাল। তারপর দুঃখিত স্বরে বলতে লাগল, পুলিশে কাজ নিয়েছি—তাই বোধহয় এবার

এসে অবধি মন ভারি করে আছেন। পুলিশ না হয়ে পাটের মহাজন হলে খুব খুশি হতেন। তবুও আমরা দোষীর সাজা দিই, তাদের মতো নিরীহ নির্দোষ চাষীদের রক্ত শুষে মারি নে—

সুরমা হেসে বলে, না—পাটের মহাজনের উপরও আমার অচলা ভক্তি নেই। কিন্তু এখানে কাউকে তাড়া করে ফিরছেন ?

একটু ইতস্তত করে বিনয় বলে, এক-আধটি নয়, আস্ত-একটা দল। আর তারা চোর ছ্যাঁচোড়ও নয়—

স্বদেশি ডাকাত ?

বিনয় বলে, ডাকাতির কোন খবর পাওয়া যায় নি, মিথ্যে বদনাম দেব কেন। তবে স্বদেশি বটে—জ্বলন্ত আগুন।

আগ্রহের স্বরে সুরমা জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা ধরা পড়লে তাদের কি ফাঁসি হবে ?

বিনয় বলে, আপনি কি ভাবেন বলুন তো ? ফাঁসি, কি অত সোজা ? কোন চার্জ নেই তাদের বিরুদ্ধে।

তবে ?

ঐ যে বললাম, ওরা আগুন। কখন খাণ্ডব-দাহন হয়, উপরওয়ালার হুকুমে তাই চোখে-চোখে রাখবার নিয়ম।

এরই দিন পাঁচ-সাত পরে একেবারে এক অসম্ভব কাণ্ড! বিনয়ের মা ভাবী পুত্রবধূকে ভাল করে দেখবেন বুঝি, আভা আর সুরমাকে বাসায় নিমন্ত্রণ করেছেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে খানিকটা রাত হল। এরা সব ফিরে আসছে। আঁধারের মধ্যে কে একজন জিজ্ঞাসা করল, থানাটা কোন দিকে ?

রামচরণ সকলের আগে। নিরুৎসুক কণ্ঠে সে জবাব দিল, ডান হাতি চলে যাও বাপু।

আকাশ-ভরা মেঘ, গাঢ় আঁধার। লোকটা হঠাৎ কাশতে শুরু করল। সে কি কাশি, যেন হাপরের আওয়াজ হচ্ছে, পাঁজরার হাড়গুলো এইবার বাঁধন খুলে ছড়িয়ে পড়বে। সুরমার হাতে টর্চ, এক একবার টিপে পথ দেখে নিচ্ছিল— আলো সে লোকটার মুখের উপর ফেলল। এক মুহূর্ত, তারপর আর একবার। বিদ্যুতাহতের মতো সে থমকে দাঁড়াল। আবার আলো ফেলল সেদিকে—

আভা বলে, দাঁড়ালি কেন রাঙা-দি ?

লোকটির দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সুরমা ডাকল, আমাদের সঙ্গে আসুন, আমরা পৌঁছে দেব—

উৎকট কাশির ফাঁকে কোন রকমে লোকটা বলে, আপনারা তো বাসায় ফিরছেন—

দরকার হলে ডাইনেও যাওয়া যাবে। কিন্তু এই সুরসুটি আঁধারে আপনি সমস্ত রাত ডাইনে ছুটোছুটি করলেও থানায় পৌঁছবেন মনে করেন ?

সুরমার ব্যগ্রতায় অবাক হয়ে আভা এসে তার হাত ধরল। সুরমা ফিসফিস করে বলে, কুন্তল-দা—

তাদের মধ্যে অনেক গল্প হয়েছে কুন্তল-দার সম্বন্ধে। কুন্তল-দার সঙ্গে চেনা পরিচয় আছে—সমবয়সীর মধ্যে এ একটা কত বড় গর্ব! আভা পিছনে তাকাল। অতি মন্থর পায়ে ছায়ামূর্তিটি আসছে। হঠাৎ কুন্তল-দা বলে ওঠেন, যাচ্ছি বটে, আমায় কিন্তু বড্ড খিদে পেয়েছে।

সুরমা বলে, থানায় পোলাও কালিয়া সাজিয়ে নিয়ে আছে বুঝি ?

কুন্তল-দা জবাব দেন, তা বলে নিতান্ত তাচ্ছিল্য করবে না, তা-ও জেনে রাখবেন।

বাড়ি এসে দেখে সবাই নিঃসাড়ে ঘুমাচ্ছে। এই রাতে পথের আপদ জুটিয়ে আনায় রামচরণ খুব বিরক্ত হয়েছে। তিক্ত কণ্ঠে বলল যাও ঠাকরুনরা, ঘরে গিয়ে দুয়োর দাওগে। লাটসাহেবকে থানায় তুলে দিয়ে আসি!

আভা বলে, না—বৈঠকখানার পাশের ঘরটা খুলে দে। আর পা ধোবার জল নিয়ে আয়।

কুন্তল-দা সুরমাকে চেনেন নি। অন্ধকার রাত্রিবেলা, অনেকদিন দেখা নেই। তাছাড়া, ও-মানুষটার কাছে তুমি আমি সকলে একেবারে স্রোতের মতো, যতক্ষণ সামনে আছি দেখছেন, আড়াল হলে আর কেউ নই।

আশ্চর্য হয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, কার বাড়ি এটা ? আপনাদের মতলব কি, এখানে আপনি আটকে রাখতে চান নাকি ?

সুরমা বলে, রাত্রিটা তো বটে! খিদে পেয়েছে, তা কিছু খেয়ে জিরোতে জিরোতেই তো সকাল হবে। অত ভয় কিসের ? কি এমন সোনা-রূপো গায়ে পরে আছেন—

আভার কানে কানে বলে, গায়ে নয়—মনের মধ্যে ওঁর কত সোনা—সোনার পাহাড় রে আভা! পথের ধুলোয় সত্যি সত্যি এখানে সোনা কুড়িয়ে পেলাম।

দু বোন ছুটোছুটি করে খাবারের যোগাড়ে গেল। কি আর থাকবে এমন সময়—খই আর একটুখানি দুধ। কাঁধের উপর একখানা কোঁচান ধুতি এবং দু-হাতে দুটো বাটি নিয়ে আভা বলে, রাঙা-দি, তুই ভাই জলের গেলাস নিয়ে আয়। দেরি করিস নে—

সুরমার তবু একটু দেরী হল। চোখ-মুখ মুছে শান্ত হয়ে সে ঘরে ঢুকল।

বলে, খাওয়া হল, এবার শুয়ে পড়ুন—বিছানা হয়ে গেছে। তারপর তাঁর বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে বলল, আমায় কি একেবারে চিনতে পারলেন না, কুন্তল-দা?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একটুখানি চেয়ে কুন্তল-দার মুখে হাসি ফুটল। সুরমা বলতে লাগল, ঐ গোঁফ-দাড়ি আর উস্কো-খুস্কো পাগলের মত চেহারা, আমি তবু এক নজরে চিনে নিয়েছি।

কুন্তল-দা বললেন, গলা শুনে আমারও চেনা-চেনা লাগছিল হে। তখন তোমার চোখে আলো, আমার চোখে অন্ধকার। তাছাড়া এই রকম জায়গায় এই অবস্থায়···কথাটা বোঝ একবার—চলে এসেছি, সে-ও তো কম দিন হল না।

কতদিন? বলুন তো হিসেব করে। এত দুঃখের মধ্যেও সুরমার কণ্ঠে, কৌতুকের রেশ বেজে ওঠে। বলে, আপনার তিন বছরের আর কত বাকী কুন্তল-দা?

কুন্তল-দা খাড়া হয়ে বসলেন, বিশীর্ণ মুখের উপরে কোটরাগত চক্ষু দুটি জলজল করে ওঠে। বলেন, তিন না হয় তিরিশ হবে! তাতে কি আসে যায়। আমি মিথ্যা কথা বলছি মনে কর? ঘর-বাড়ি আপন জন ছেড়ে মিথ্যার পিছনে পথে পথে ঘুরছি, আমি বোকা?

সুরমা তাঁর পাশে গিয়ে পিঠের নিচে বালিশ গুঁজে দিল। কপালে মাথায় অতি ধীরে ধীরে সে হাত বুলিয়ে দেয়। বলে, ঘাট মানছি দাদা, আপনার বুদ্ধির জোড়া নেই। এবার লক্ষ্মী হয়ে শুয়ে পড়ুন দিকি।

আভা বলে, কিন্তু আপনি তো ইচ্ছে করে জেলে যাচ্ছেন। স্বাধীনতার চেষ্টায় ইস্তফা তাহলে?

আমি যাচ্ছি, সবাই যাবে না। জেলে কটা লোক ধরে? জেলের পাঁচিলে কি মত আটকায়—কোন দেশে কেউ পেরেছে?

আভা তর্ক করে, সত্যি সত্যি যদি এত ভরসা, তবে আপনিই বা যেতে চান কেন শুনি?

ইচ্ছে করে বুঝি! কুন্তল-দার কণ্ঠে অভিমানের সুর ধ্বনিত হল। বললেন, এতদিনে এত কষ্টের পর একটু বিশ্রাম নিতে যাচ্ছি, অমনি তোমরা নানা কথা বলবে। দেখ তো, এ শরীরে কি কাজ করা যায়?

রাগ করে গায়ের শতছিন্ন জামাটি খুলে ফেললেন। শীর্ণ দেহ বললে কিছুই বলা হয় না, বীভৎস চেহারা। করুণাকে ছাপিয়ে ঘৃণাই যেন মনের মধ্যে মাথা তুলতে চায়। কুন্তল-দা বলেন, দেখ তো চেয়ে, টর্চ আছে—ফেলে দেখ। আমি কি ফাঁকি দিয়ে সরে পড়ছি?

আভা তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিল। বলে, দাদা আপনি আমায়

চেনেন না। কিন্তু আমি জানি, ফাঁকি আপনি দিতে পারেন না, আপনার মধ্যে একতিল ফাঁকি নেই। আপনি কত বড়—

এ কথায় কুন্তল-দার রাগ থাকে না, হেসে ফেলে বললেন, তা বুঝেছি। এর মধ্যে ও-সমস্ত হয়ে গেছে? সুরমাকে দেখিয়ে বলেন, ওর একটা কথাও বিশ্বাস করো না ভাই, আমার বড্ড বদনাম রটায়, আমাদের কথা রাতদিন ভাবে।

সুরমা বলে, আপনারা যে ভোলবার নন, ভুলি কেমন করে? না ভেবে উপায় কি বলুন? আপনার হয়তো মনে নেই দাদা, আপনি বলেছিলেন, এখানে এই মাটির ধুলোয় ছোট-বড় সকলের মধ্যে সুখের বন্যা আসবে, কারও আর দুঃখ থাকবে না। ঘরের ছেলে সব আবার ঘরে আসবে। আমি যে প্রতিটি কথা বিশ্বাস করে দিন গুনছি।

আবেগে তার কণ্ঠ বুজে আসে। কুন্তল-দা স্তব্ধ নির্নিমেষ চোখে চেয়ে থাকেন। তারপর গভীর কণ্ঠে বলেন, সেদিন আসবেই বোন, তার কোন ভুল নেই। একটু হয়তো দেরী হয়ে গেল। আমি দেখব না—কিন্তু তোমরা দেখবে। এই কথাটা নিশ্চিন্ত জেনে রেখো তোমার এই দাদারাই দেশের মধ্যে শেষ দুখীর দল।

রবিবার। সকালবেলা—খুব সকালে সুরমার বাপ আর মেসো বেড়াতে বেরিয়েছেন। ছুটির দিনে একটু বিশেষ খাওয়া-দাওয়া হয়, কর্তা নিজে কেনাকাটা করেন, জেলেপাড়া ঘুরে সওদা করে বাড়ি ফিরতে দুপুর হয়ে যাবে।

দুই বোন ঘুম থেকে উঠে বাইরে এসে দেখে, কুন্তল-দা হাত পা ধুয়ে বারান্দায় এসে বসেছেন। বললেন, খানিকটা চুন আনতে পার ভাই, গা গতর আর আস্ত নেই, খুঁচে খেয়েছে।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সুরমা প্রশ্ন করল, কে?

আমারই প্রজাবর্গ, যাদের অধিকারে ভাগ বসিয়েছিলাম। এই আমরা যেমন খোঁচাখুঁচি করি সরকার বাহাদুরকে, এই রকম আর কি! বলে তিনি হো হো করে করে হেসে উঠলেন। বলতে লাগলেন, ঐসব পাটের ক্ষেত দেখতে পাচ্ছ ওরই মধ্যে আমার রাজাসন পড়েছিল—একেবারে মেঘনা অবধি একেশ্বর রাজ্য। দিনে বিশ পঁচিশটা জোঁক ছাড়াতে হত, এছাড়া আর কোন অসুবিধা ছিল না। তোফা ছিলাম, কিন্তু অদৃষ্ট দেখ—আকাশের দেবতা বাদী হয়ে কিছুতেই টি কতে দিল না।

কুন্তল-দার ভঙ্গি দেখে এরাও হেসে ফেলে। সেই পাটের ক্ষেতের গল্প শুরু হল। দুটি বিমুগ্ধ শ্রোতার সামনে কতকাল পরে তিনি প্রাণ খুলে গল্প করছেন,

এ যেন আয়ুর প্রান্তে-এসে-পড়া অবসাদগ্রস্ত রোগশীর্ণ আমাদের কুন্তল-দা নন, আর কেউ—

থালের ওপারে এই পাটক্ষেতে যতদূর তাকাও, ক্ষেতের পর ক্ষেত চলেছে। সতেজ পাটচারা, জায়গায় জায়গায় একটা কেন দুটো আড়াইটে মানুষকেও ছাড়িয়ে যায়। তারই মধ্যে যেখানে খুশি ঢুকে পড়ে, খানিকটা পাট ভেঙে শুয়ে বসে দিব্যি সারাটা দিন কাটিয়ে দাও। তারপর রাত হলে চুপি চুপি বেরিয়ে পড় —খালে জল রয়েছে, স্বচ্ছন্দে স্নান করতে পার। তালতলায় এ সময়টা দু-একটা পাকা তাল পাওয়া যায়, কপালে থাকলে গ্রামের মধ্যে কারও হেঁসেলে উৎকৃষ্টতর জিনিসও কিছু মিলতে পারে! এর উপর কুন্তলদার আবার বাবুয়ানা আছে. রাতে রাতে নারকেল পাতা কুড়িয়ে দিব্যি এক গদি তৈরী করে ফেলেছেন। ছিল তো চমৎকার, কিন্তু শেষাশেষি বর্ষা বড্ড চেপে পড়ল, নারকেল পাতা পচে ডাঁটাগুলি কেবল রইল, ক্ষেতের উপর একহাত জল! জ্বর মাস ছয়েক ধরেই চলছিল। শেষে মোটে ছাড়ে না, কাশতে গেলে দলা-দলা রক্ত বেরোয়। এইসব নানা ঝঞ্ঝাটে পড়ে তবেই তিনি থানায় চেপে পড়বার ফিকির বের করেছেন।

কথার মাঝখানে সগর্বে কুন্তল-দা জিজ্ঞাসা করলেন, আনারস খেয়ে থাক তোমরা? বুকে থাবা মেরে বলেন, আমি—আমি খাই—

আভা বলে, এটা তো আনারসের সময় নয়। কলকাতায় মেলে তা, বলে এখানে কি—

হ্যাঁ এখানেও। বদরগঞ্জের হাট তো শনিবারে—গেল শনির আগের শনিতে আনারস খেয়েছি। একটা নয়, একজোড়া—এখনও ঢেকুর উঠছে।

সুরমা বলে, আনারসের লোভে হাটে ঢুকে পড়েছিলেন নাকি?

না হে, লোকে এসে ভেট দিয়ে গেল। কিন্তু হাটে ঢোকাই ভাল ছিল দেখছি। আদর করে চাই কি গাড়ি-পাল্কিতে তুলে আমায় থানা পৌঁছে দিত। তোমাদের খোশামোদ করতে হত না। তারপর ব্যস্ত হয়ে বলেন, তোমরা উদ্যোগ করছ না। এ ভাল কথা নয়। আমাকে রাখায় বিপদ আছে জান?

সুরমা বলে, রামোঃ, সে বুঝি জানি নে? থানা—এই এক্ষুনি এখানে এসে হাজির হবে, দেখবেন। কুন্তল-দার কপালে হাত রেখে বলে, এইবার কিন্তু জ্বরটা একেবারে ছেড়ে গেছে।

কুন্তল-দা বলেন, কিন্তু মায়া ছাড়তে পারবে না, আবার আসবে। সত্যি সুরমা, আজ কি ভাল লাগছে, কি বলব! তা বলে মরাটাকে আর কেয়ার করি নে। লোকে তো মরে ভূত হয়, আমি জ্যান্ত থাকতেই খুব প্র্যাকটিস করে

নিয়েছি। মরে গেলে কোন রকম অসুবিধা হবে না। তোমাদের চলাফেরা দিনের বেলা, আমি বেড়াতাম রাতের অন্ধকারে। বল, ভূতের সগোত্র হলাম কি-না? আনারস দিয়েছিল তারা ভূতকে, মানুষে চাইলে মানুষে কি সহজে দেয়?

আনারসের কথা বলতে গিয়ে কুন্তল-দা হেসে খুন। কি অন্ধকার তখন! কৃষ্ণপক্ষের রাত, এমনি দিনে তো মজা! কুন্তল-দা পাটক্ষেত থেকে বেরিয়ে রাস্তার উপর ধীর পায়ে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন···তারপর শ্মশানঘাটের কাছে এলেন। রাস্তায় খানিকটা দূরে চরের কিনারায় শ্মশান। একটা মড়া পুড়ছে, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। রাস্তার পাশে উল্টে রাখা এক পুরানো নৌকা মেরামতের জন্যে রয়েছে। শ্মশানবৈরাগ্যের মতো একটা কিছু হল বোধ হয়—কুন্তল-দা ঐ নৌকার উপর চুপচাপ বসে মড়া পোড়ানো দেখতে লাগলেন। মানুষজন কেউ নেই এ-দিকটায়, শ্মশানের আমগাছতলায় অনেকে তামাক খাচ্ছে, গল্পগুজব করছে, সে-সব অল্প অল্প কানে আসছে। হাটুরে লোকও সব চলে গেছে; একটি দল কেবল কি জন্য পিছিয়ে পড়েছিল, তারাই হন-হন করে যাচ্ছিল। চিতা দেখে একজন বলে, ও মুচিপাড়ার আমদানি; পাড়াটা সাফ হয়ে গেল গো! ওলাবিবি রোজ তিন-চারটে করে নিচ্ছেন।

আর একজন বলে, গুনে দেখ্ তো রে—মানুষ আমাদের ভিতর যেন কম হয়ে যাচ্ছে।

যেন বাড়ে না, সেইটে ভাল করে নজর রাখিস। মাঝে মাঝে ওরাই আবার পিছু নেন কি-না।

তারপর খুব একটা উদ্বিগ্ন স্বর। সত্যি, মিলছে না তো! মানুষ এগার জন।

তিনবার গোনা হল।

তাই তো, তাই তো! বেশ খানিকটা গোলমাল উঠল। শেষে একজন বলল, বোকারা নিজেকে বাদ দিয়ে সব গুণছিস যে!

কিন্তু তা সত্ত্বেও রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। কুন্তল-দা অন্ধকারে না দেখেও শব্দ-সাড়ায় টের পাচ্ছেন, এ-ওর পাশ কাটিয়ে আগে যেতে চাচ্ছে, শ্মশানের এইখানটায় কেউ পিছনে থাকবে না। কুন্তল-দার ছেলেমানুষি চাড়া দিয়ে উঠল, তা ছাড়া খিদেও পেয়েছে খুব। নাকিসুরে বলেন, এই আমায় কিছু দিয়ে যাঁ। আমি খাঁব।

আর যায় কোথায়, তুমুল চিৎকার!···কে কার ঘাড়ে পড়ে, কাঁধের ধামা-ঝুড়ি কতকগুলো ঠিকরে পড়ল। শ্মশানে মড়া পোড়াচ্ছিল, সেই লোকগুলো 'কি' 'কি'—বলতে বলতে এই দিকে ছুটল।

নাঃ, থাকতে দিল না আর। নৌকা থেকে লাফিয়ে কুন্তল-দা দৌড় দিলেন। পায়ে ঠেকল আনারস, অকালের ফল, কে আশা করে কিনেছিল। সেদিন পাটক্ষেতের ভিতর নারিকেল পাতার গদিতে বসে সমারোহে আনারস ভোজ চলল।

বিনয় এসে বলে, আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন কেন? রামচরণ বলল, কি নাকি বড্ড জরুরী ব্যাপার।

সুরমা বলে, এই আমার দাদা। আলাপ করিয়ে দেব।

বিনয় হাসিমুখে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দেয়।

সুরমা বলে,—না—সেই যে অতি-নমস্তের জন্য আপনাদের একরকম মিলিটারি-স্যালুট আছে—আমার দাদা কি সাধারণ মানুষ?

কুন্তল-দা রাগ করে ওঠেন, আবার?

বিনয় চোখের ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করে। কুন্তল-দা বলেন, বিশ্বাস করবেন না—ও-সব নিন্দুকের কথা, সামান্য মানুষ ছাড়া আর কি। আমি কুন্তল সরকার, ধরা দেবার জন্য ছটফট করে বেড়াচ্ছি।

বিনয় বিস্ময়ে অবাক হয়ে থাকে। তারপর হেসে বলে, তাই যদি হয়—ভাগ্যে আমার পদোন্নতি আছে দেখছি।

আভা থাকতে পারে না, বিনয়ের কানে বলে, খুব—খু-উ-ব! বেশ হিসেব করে সমঝে চল দিকি, রাঙা-দির খোপাসুদ্ধ মাথাটা গড়াতে গড়াতে তোমার শ্রীপদযুগলের নিচে গিয়ে পড়বে।

বিনয় বলতে লাগল, কিন্তু বিশ্বাস হতে চায় না কুন্তল-দা—আপনার এ রকম সুবুদ্ধি—অনুতাপ নাকি?

অনুতাপ? রুগ্ন অশক্ত কুন্তল-দার চোখ জলে ওঠে। বলেন, পাপ করলে অনুতাপ আসে, পাপ তো করিনি।

প্রবল কাশি এসে কথা আটকে যায়। সুরমা ছুটে এসে বাতাস করতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে কাশি থামল, তখন তাঁর সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে।

সুরমা ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, বিনয়বাবু, দাদা আমার বিশ্রাম নিতে চান। কাল তো আপনি কলকাতা যাচ্ছেন, ওঁকে নিয়ে যান। তাহলে নির্বিঘ্নে যেতে পারেন। এ আপনি সহজে পারবেন।

বিনয় সভয়ে বলে, বাপরে!

পারেন না?

বিনয় বলে, পারি, কিন্তু উচিত হবে না। আর ইনি নিজেই যখন জেলে যেতে প্রস্তুত—

সুরমা রাগ করে বলে, কিন্তু আমরা তো নই।

রাগ দেখে কুন্তল-দা হাসতে লাগলেন। শান্ত কণ্ঠে বললেন, এই দেখ বোন, মিছেমিছি ঝগড়া বাধাচ্ছ। একটা-দুটো কুন্তলের জন্য ব্যস্ত হবার দিন কি আছে? বীরপূজা ততদিন চলে, যখন এক-আধটা মানুষকে আলাদা করে বেদির উপর তোলা যায়। এ রকম কুন্তল সরকার এখন ঘরে ঘরে। ঠগ বাছতে গেলে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে।

বিনয়ের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, অনেক ভেবেচিন্তে এই মতলব করা গেছে বিনয়বাবু। অকেজো হয়ে গেছি, এবার সরকার বাহাদুরের ঘাড়ে চেপে পড়াই ভালো। খেয়েদেয়ে ফুর্তি করে দিন কটা দিব্যি কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

সুরমার রাগ বেড়ে যায়। জেলখানা পিঁজরাপোল নাকি?

কুন্তল-দা বলেন, ঠিক তাই। যে গরু লাঙ্গল বয় না, কোন দিনই বইতে পারবে না, তাকে পিঁজরাপোলে দিতে হয়। এই রোগা দেহটা নিয়ে আমি অপরের কাঁধে চেপে থাকি কোন্ লজ্জায় বল তো বোন?

সুরমা বলল, বিনয়বাবু আপনার উপরওয়ালারা গোটা মানুষটিকে চাচ্ছেন— শুধু ঐ হাড় কখানা নিশ্চয় নয়। তাছাড়া, আপনি তো বলেছেন, এঁদের উপর চার্জ কিছু নেই।

তা বটে! বিনয় চুপ করে ভাবতে লাগল। শেষে বলে, আপনি যখন বলছেন, তাই হবে।

সুরমা বলে, আপনিও বুঝে দেখুন। বরানগরে ওঁর মা রয়েছেন। আমরাও ফিরে যাচ্ছি, আর কদ্দিন থাকব এখানে! আরও ভাই-বন্ধুরা আছেন। কুন্তল-দার জন্য না হলেও, উনিও এক মায়ের এক ছেলে—মায়ের কথা ভাবতে হবে তো!

বিনয় বলল, তাই ঠিক রইল। আপনি যখন বলছেন।

বিনয় চলে গেলে কুন্তল-দা বললেন, শেষ পর্যন্ত ঘরেই পাঠালে?···এখনও জ্বর এল না; আজ খাসা লাগছে। আজকাল এসরাজ বাজিয়ে থাক সুরমা?

কেন বাজাব না? আপনার ভয়ে নাকি। দিন-রাত বাজাই।

কুন্তল-দা আপন মনে হাসতে লাগলেন। বলেন, সুরমা, একদিন তোমার আঙুলে আলপিন ফুটিয়েছিলাম। কি পাগলই ছিলাম তখন! সে-সমস্ত ভুলে গেছ, না?

হ্যাঁ হ্যাঁ—ভুলেছি বৈ-কি! একি আপনারা যে, কাঁটার দাগ চিরজীবনে মিলায় না?

সুরমার ঠোঁট দুটি থরথর করে কেঁপে উঠল, সে মুখ ফেরাল।

কুন্তল-দা আবার জিজ্ঞাসা করেন, বিয়ে হয়ে গেছে নাকি?

কেন যাবে না শুনি? আমি তো সন্ন্যাসী-ফকির নই।

আভা বলল, হয়নি এখনও, হবে। সাতাশে অগ্রহায়ণ—ঐ বিনয় দাদার সঙ্গে। পাকাপাকি হয়ে যায়নি অবিশ্যি।

কুন্তল-দা ভয়ানক খুশি হয়ে উঠলেন। বললেন, বেশ, বেশ। আমাকে নেমতন্ন করো কিন্তু। কলকাতায় হবে নিশ্চয়। সন্দেশ, রসগোল্লা, চপ, কাটলেট—কতদিন খাইনি ওসব।

সুরমা সামলাতে পারল না, ছুটে পালায়।

সেই পুরানো ঘর, পুরানো তক্তাপোশ, গলির ধারে পুরানো জানলাটি। আমরা সবাই আবার জুটেছি। হিরণ, আকবর আলি, নবীন—সকলে আসে। সুরমাও রোজ অন্তত একটিবার এসে দেখে যায়।

সকালবেলা কেউ নেই, একলা আমি মাথার কাছে বসে বাতাস করছিলাম। কুন্তল-দা বাইরের দিকে মুখ করে শুয়েছিলেন। মৃদু পায়ে এসে ঘরে ঢুকল সুরমা।

এসো বোন, এসো···মানুষ না দেখলে ভাল লাগে না। কোথায় যাব, মানুষ সেখানে আছে কি না আছে, তাই ভাবি। উঁহু, বিছানার উপর নয়, চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসো।

সুরমা নতমুখে আমি যে নেমতন্ন করতে এলাম।

তা বটে···সাতাশে এসে পড়েছে। আমার ক্যালেণ্ডারের পাতাটা ছেঁড়া হয়নি। প্রজাপতি মার্কা চিঠি আরও ডুটো এসেছে। ঐ সাদা বাড়িটায় মেরাপ বাঁধছে, জানলায় বসে দেখি।

হাসিমুখে সুরমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, হাঁ বোন, তোমরা যেন দল বেঁধে ষড়যন্ত্র করেছ—সাতাশের পর কুমার-কুমারী কেউ আর থাকবে না?

সুরমা বলে, আপনাকে যেতে হবে কিন্তু।

আমি! ডাক্তারে কি বলে শোননি! বিয়েবাড়ি, আত্মীয়-কুটুম্বরা আসবেন, তার মধ্যে তো যাওয়া চলে না। আমি এখান থেকেই আশীর্বাদ করব।

সুরমা বলে, না—বোনের কাছে ভাই যাবেই, আত্মীয় কুটুম্বের অপছন্দ হলে তাঁরা আসবেন না। আমি সাবধান করে নিয়ে যাব, খুব যত্নে রাখব। ডুদিন আগে যেতে হবে আপনাকে।

কুন্তল-দা বললেন, তোমার এসরাজ সেই অবধি পড়ে রয়েছে সুরমা। ধুলোবালি জমে গেছে, নিয়ে যাও। কেন বাজাবে না—কি হয়েছে? বিশেষ এই আমোদের সময়।

ধরা গলায় সুরমা বলে, নিয়ে যাব দাদা, লোক পাঠিয়ে দেব।

তাই দিও। আমার উপর রাগ করে আছ সেই থেকে? আরে, আমি একটা পাগল।

সে যাবার পরে আরও কতক্ষণ এসেন্সের মাদক সৌরভে ঘরের বাতাস মন্থর রইল। মা এসে বললেন, এমন চুপচাপ শুয়ে আছিস কেন বাবা? একটু ঘোরাফেরা কর তো ভাল।

কুন্তল-দা বললেন, ঘুরতে ভাল লাগে না মা।

আমার দিকে তাকিয়ে মা বললেন, শঙ্কর, সেই আগেকার মতো ওকে টেনেটুনে চিলের ছাতে নিয়ে বসো না কেন? রাতদিন পড়ে থাকে। দেখে দেখে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।

কুন্তল-দা বললেন, অভ্যাস করে নাও মা। ছাতে বসে শলা-পরামর্শ কতকাল ধরে তো হল, এবার বন্ধ হয়ে গেল, ঠেকাতে পারলে না—তুমি না, আমার আর আর ছেলেরা না, ডাক্তারেও নয়।

মা চেয়ে আছেন তাঁর দিকে, আমিও দেখছি। মুখখানা কী পাংশু দেখাচ্ছে···স্থির প্রভাহীন চোখ দুটি কোন দুর্নিরীক্ষের দিকে ভেসে বেড়াচ্ছে।

যেন আমাদের কুন্তল-দা চেয়ে চেয়ে দেখছেন, জীবনের অপরূপ বৈচিত্র্য। কত আশা কত আনন্দ মঞ্জরিত ফুলের মতো ধরণীর মাটিতে ঝরে পড়ছে। কত রৌদ্রালোক, মেঘমেদুর আকাশের কত স্বপ্ন মানুষের চোখে! মৃত্যু-পথিক শীতল তুহিনাচ্ছন্ন পথ থেকে ডান হাত তুলে আগামী দিনের সুখী ধরিত্রীকে নমস্কার জানাচ্ছেন।

সুরমা বিয়েয় নিয়ে যাবে কি, তার দিন তিনেক আগে থেকে কুন্তল-দা একেবারে সংজ্ঞাহীন। ডাক্তার, মা আর আমরা দিনরাত পালা করে কাছে আছি। সন্ধ্যার দিকে একবার কুন্তল-দার জ্ঞান হল। উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কে আছ তোমরা?

সবাই।

সুরমা এসরাজ নিয়ে এসেছে?

কে জবাব দেবে? আজকে বিয়ের দিন, তার কাছে কি খবর পাঠানো যায়? আমার ছ্যাঁৎ করে মনে পড়ে গেল, অনেক বছর আগেকার সেই বিকেলবেলার কথা। আমরা আটজন ছিলাম—আজও সবাই আছে, এসরাজও আছে, সুরমা নেই। কুন্তল-দা চীৎকার করে উঠলেন, সুরমা, আর ইউ দেয়ার? স্পিক।

ঝনঝন এসেরাজ বেজে ওঠে। তীব্রগতিতে আঙুল চালাচ্ছি। আর কখনো বাজাই নি, অনভ্যস্ত আঙুল ছিঁড়ে যাচ্ছে যেন, তবু বাজাতে হবে। শক্ত শক্ত অনেক কাজ করেছি জীবনে, কিন্তু আজকের এই বাজানো কঠিনতম কর্তব্য। সুরের ঝঙ্কারে ঘর ভরে উঠল। মৃত্যু-পথযাত্রীর বিশীর্ণ মুখে হাসি ফুটে উঠল।

গো অন, গো অন, সুরমা—

শান্ত মুখে মা গরম জলের সেঁক দিচ্ছেন, সকলে নিঃশব্দে ফাইফরমাশ খাটছে। তারপর গম্ভীর গলায় ডাক্তার বলে উঠলেন, স্টপ—

বাজনা থামালাম।

ডাক্তার বললেন, আর কাজ নেই, আর শুনবেন না ইনি।

তিনি ও ঘরে সাবান নিয়ে হাত ধুতে গেলেন। এসরাজটা খাপে ভরে ধীরে ধীরে কুন্তল-দার মাথার কাছে রাখলাম। ঘরে ম্লানায়মান আলোয় অকস্মাৎ মনে হল, শুধু সুরমাই নয়—আনন্দকিশোর, নিরুপমা, জগৎ দত্ত, হিরণ, রানী—সব্বাই আমরা এক জায়গায় বসে আছি, আমরা দলশুদ্ধ এসেছি।

মল্লিকা

মল্লিকার কথা বলে প্রসঙ্গ শেষ করি!

স্বদেশী আমলে আমি ছেলেমানুষ, ইস্কুলে পড়ি। বাবা চাকরি ছেড়ে তো ক্ষেপে উঠলেন। সে গল্প গোড়ায় বলেছি। নিশান উড়িয়ে দল বেঁধে এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে সভা করতে যেতেন, বক্তৃতা করতেন। বাড়ির কাজকর্ম সব দেখত যদু, জাতে নমঃশূদ্র, আসল কর্তা যেন সে-ই।

একদিন খুব সকালে বাবা আমাকে ডেকে তুললেন। যদু ও বাড়ির আরও অনেকে আগে থেকে দাঁড়িয়ে আছে। হলদে রঙের এক-এক টুকরো সুতো নিয়ে তিনি সকলের হাতে বেঁধে দিলেন। বললেন, আমার হাতেও তোমরা কেউ বেঁধে দাও। যদু তুমিই দাও। কলমের খোঁচায় ওরা দেশের মাটি ভাগ করেছে, তা বলে মানুষ আমরা কি পৃথক হয়ে যাব?

সারা সকালটা ধরে কোলাকুলি চলে। যদু কিন্তু মোটের উপর খুশি নয়। সে বলে, দেখ বাবু, চাকরি, ছেড়ে এই সব তো করে বেড়াচ্ছ, উদিকে ছিটেফোঁটা যা আছে—আদায়পত্তোর কিছু হচ্ছে না, বিষয় আশায় চুলোয় যাবে কিন্তু। এই সব হাঙ্গামার দরকার কি শুনি?

বাবা বললেন দরকার নেই? আচ্ছা বাপু, তো ছাঁচতলায় বেড়া দিয়ে কেউ কেউ যদি দুটো ভাগ করে বলে, এ-দিকটায় তুই থাকবি, ও-দিকটায় মানী থাকবে—চুপ করে থাকতে পারিস? আমরা ঝগড়া-ঝাঁটি করি ভাব করি নিজেরা করব—তুমি বাপু কে হে, বাইরে থেকে মাতব্বরি করছ?

এর অনেক দিন পরে আর কিছু বড় হয়ে বাবার বক্তৃতা শুনেছি। তার এক একটা কথা আজও যেন গান হয়ে কানে বাজে। মানুষের বিজয়-ঘোষণা···আঘাত-অপমানের মধ্যে মাথা উঁচু করে বেড়ানোর সঙ্কল্প···এমনি ধরনের সব কথা।

তারপর মল্লিকা এল। ষোল-সতের বছরের অজানা-অচেনা মেয়ে—সর্বাঙ্গ রূপ ভরা আর একমুখ হাসি···সে হাসি কারণে অকারণে ঝরণার জলের মতো ঝরে পড়ে। নতুন মেয়ে পেয়ে বাবারও বাইরের ঘোরাঘুরি খানিকটা কমে এল।

একবার রাখিবন্ধনের দিন সকাল সকাল স্নান করে আমরা সকলে এসে দাঁড়িয়েছি।

কই বাবা, রাখি বাঁধবে না?

বাবা হেসে বললেন, মনে মনে সব বাঁধন পড়েছে—টুকরো দেশ তাই জোড় লেগে গেছে। বাইরের রাখির আর দরকার নেই। একটু চুপ করে থেকে বলতে লাগলেন, ম্যাকলিন সাহেব কুন্তলের কথা শুনে বলেছিল, ফুলের মত নরম দেহ, কিন্তু ভিতরটা যেন ইস্পাত—এইসব ছোকরা এ-দেশে এল কি করে, রায়? আমি জবাব দিলাম, সাহেব, রয়াল-বেঙ্গল-টাইগারের দেশ এটা—জগতে এদের জুড়ি নেই।

আনন্দে গৌরবে বাবার গৌর মুখখানি জ্বলজ্বল করতে লাগল।

তারপর তিনি গত হলেন। আইন পড়ার নাম করে তখন কলকাতায় আছি। কিন্তু সে তাহা মিথ্যা। কলেজমুখোই হই নে। মল্লিকার সম্বন্ধে যে নেশা লাগে নি এমন নয়। স্বদেশী করি বলে কি মানুষ নই? শনিবারে প্রায়ই বাড়ি আসি। আরও সুবিধা হ'ল, আমার উপর একটু বিশেষ কাজের ভার পড়ল, কাজটা আমাদেরই ঐ অঞ্চলে।

আমার ধরন-ধারণ যদুর ভাল লাগে না। সে কটমট করে তাকায়। কৈফিয়ৎ হিসাবে বলি, যদু ভাই, একা একা তুই কদিকে সামলাবি? আমার তো একটা বুদ্ধি-বিবেচনা আছে। তাই আসা যাওয়া করছি।

কাটখোট্টা যদু এ সব কথায় ভোলে না, ঘাড় নেড়ে সোজা জবাব দেয়, না ভাইধন, আমার সুখে কাজ নেই। এ-রকম ইস্কুল-পালাপালি করো না আর; মানুষ হয়ে এসে একেবারে আমায় ছুটি দিও।

কিন্তু আসা বন্ধ করবার জো নেই যখন, যথাসম্ভব তাকে পাশ কাটিয়ে বেড়াই।

একবার সোমবারের দিন সকালবেলা ঠিক ফেরবার মুখে মেঘ করল, ঝড়-জল হওয়া অসম্ভব ছিল না। স্টেশন প্রায় মাইল চারেক পথ—ও রকম অবস্থায় কাপড়চোপড় ভিজে গেলে কলেজে যাওয়া চুলোয় যাক—বড় রকম একটা অসুখ-বিসুখও হতে পারত। কিন্তু যদু এসব বুঝবে না। দুপুরে খাওয়ার সময়টা মুখোমুখি পড়ে গেলাম। যদু বলে, এবারে পুরোপুরি ইস্তফা দিয়ে এলে ভাইধন? তা ভাল—নিজের কাজকর্ম নিজে দেখ গে, আমি সরে পড়ি।

অপরাধীর ভাবে বলি, আচ্ছা, এ অবস্থায় যাই কি করে বুঝে দেখ—

যদু বলে, ও, চিড়িয়াখানার খাঁচা ভেঙে বাঘ বেরিয়েছে—

বেরিয়ে তার ছুটো এসে গাঁয়ে ঢুকছে। তুই সেই সকাল থেকে তক্কে তক্কে আছিস, আর ওদিকে ঘরের মধ্যে আর এক নম্বর তিনি ওৎ পেতে রয়েছেন।

যদুর মুখ হাসিতে ভরে যায়। তবেই দেখ ভাইধন, আমার একরত্তি ঐ বউঠাকরুনের—খালি বিদ্যে নয়, বুদ্ধিও কত! বুকের উপর থাবা দিয়ে সগর্বে বলে, আমি—এই আমি খুঁজে পেতে এনেছিলাম, ঠাকুর আমার মান রেখেছেন।

তোর আর তোর বউঠাকরুনের জ্বালায় আমি দেশান্তরী হয়ে যাব, মোটে বাড়ি আসব না।

যদু ভয় পায় না, মহানন্দে বলে, সেই তো! বাপের বেটা হও ভাইধন। কর্তাই বা ক-দিন বাড়ি থাকতেন! কত বিদ্যে শিখেছিলেন, শেষকালে তাই তো মানুষ কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক থেকে এসে কথা শোনাবার জন্য ধরে নিয়ে যেত। হুঁ-হুঁ—বাড়ি থাকলে তোমাকে সেরেস্তায় বসতে হবে, হাটবাজার করতে হবে—

এই সময় এক কাণ্ড হয়ে গেল। যদুর ম্যালেরিয়া ধরেছিল। দিন দশেক ভুগে সবে ভাত খেয়েছে। ফসল কাটার সময়, নিতান্ত না দেখলে নয়—মাঠের দিকে যাচ্ছিল সেইসব তদারক করতে। থানার উপর দিয়ে রাস্তা। দেখে, গোকুল মোড়ল আর তার ভাইপো শুকনো মুখে বসে আছে; সামনে চেয়ারের উপর দারোগাবাবু। একটা কথা কাটাকাটি চলছিল। গোকুল সম্পর্কে তার পিসতুত ভাইরাভাই—ভাব-সাবও আছে। হাত নেড়ে গোকুল তাকে ডাকল। যদু বারান্দায় উঠে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করে. সকালবেলা পীঠস্থানে—কি হয়েছে রে?

গোকুল বলে, কাল রাত্রে আমার সর্বস্ব চুরি গেছে। দক্ষিণের ঘরে সিঁদ কেটেছে, আবার রান্নাঘরেরও হাত দেড়েক বেড়া খসিয়ে ফেলেছে—পিতল-কাঁসা ঘরে এক টুকরো নেই। আজকে কলার পাতায় ভাত খেতে হবে।

দারোগা ঘাড় নেড়ে বললেন, যা-ই বল মোড়লের পো, হিসেব করে দেখলাম পাঁচটা টাকার কম কিছুতেই হয় না। এখন না পার, বরঞ্চ দুপুরের ইদিকে জমা দিয়ে যেও—নির্ভাবনায় যাও, সন্ধ্যা নাগাদ আমরা গিয়ে হাজির হব।

গোকুলের চোখ ফেটে জল বেরুবার মতো হল। হুজুর, বিশ্বাস করছেন না—কি আর বলি! ঘরে একটা তামার পয়সা অবধি রেখে যায়নি।

যদুর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, এই এজাহার দিতে এসে বড্ড মুশকিলে পড়লাম! দারোগাবাবু নিজে না গেলে কিছুতে হবে না, অথচ কোথায় তার পালকি-ভাড়া, কোথায় কনেস্টেবলের বারবরদারি—এত টাকা এখন পাই কোথায়?

বাবার সঙ্গে যদু ঝগড়া করত, তবু তাঁরই ভাতে মানুষ। কে জানত তলে তলে তাঁর বিদ্যা সে আয়ত্ত করেছে! যদুর মুখ কালো হয়ে উঠল, উগ্র কণ্ঠে বলে, কেন, তোমার গরু-বাছুর নেই গোকুল?

দারোগার দিকে তাকিয়ে বলে, সে তো ঠিক কথা! চোরেরা এত সমস্ত নিয়ে গেল, আর হুজুরের বেলায় ফক্কিকার! উনি না গেলে হবে কি করে? গরু বন্ধক দিয়ে রাহা-খরচের যোগাড় করগে—

দারোগা আগুন হয়ে উঠলেন। তুমি কে হে ফাজলামি করতে এসেছ? বেরোও—এই মহাদেব সিং, নিকাল দেও উসকো—

যদু উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলে, আমরাই যাচ্ছি। সোজা সদরে চলে যাব, সে পথ চিনি। চল ভাই, বন্দেমাতরম্—

দারোগা হাঁকলেন, সদরে আমরা পাঠাব। তোদের চিনে যেতে হবে না। পাকড়ো—

দুপুরের পর গোকুল এসে চুপি চুপি মল্লিকাকে বলে গেল, যদুকে নিদারুণ মার মেরেছে, মেরে এখন অতুল ডাক্তারের উঠানে দেবদারু গাছে বেঁধে রেখেছে।

অতুল ডাক্তারের বাড়ি থানার লাগোয়া। ডাক্তারের সঙ্গে দারোগার গলায় গলায় ভাব এবং কু-লোকে রটনা করে, ভালবাসাটা নিতান্ত নিষ্কামও নয়। মল্লিকা প্রথমটা হতভম্ব হয়ে যায়। পাড়ার দু-চার জনের চেষ্টায় সাক্ষাতের বন্দোবস্ত হল। মল্লিকা চাদরে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে থানায় চলল, সঙ্গে যদুর মেয়ে মানী আর এক জ্ঞাতি-ভাসুরের ছেলে। আসামীকে তখন গারদঘরে রাখা হয়েছে। পিছনে উত্তরের রোয়াকে মল্লিকারা বসল।

হাতকড়ি লাগানো যদুর চেহারা দেখে মল্লিকার চোখে জল আসে।

এ কি করে বসলে মোড়ল-দাদু?

স্বর্গীয় কর্তার কথাগুলোই যদু মুখস্থের মতো বলে যায়।

কেন, অন্যায়টা কিসের? বন্দেমাতরম্ বলেছি, মাকে ডেকেছি—ছেলের মুখ চেপে ধরে মাকে ডাকতে দেবে না, এ আমরা মানব কেন?

দফাদার করালীচরণ এই গ্রামের বাসিন্দা, আমাদের সদর-পুকুরের ধারে বাড়ি। তাকে ডাকিয়ে এনে মল্লিকা বলে, মোড়ল-দাদাকে এবার ছেড়ে দাও। সবে জ্বর থেকে উঠেছে, দুর্বল শরীর—তার উপর দুপুরে কিছু খায়নি—

করালী বলে, দেমাক করে খায়নি। চিঁড়ে দেওয়া হল, তা ছড়িয়ে ফেলল। বুঝে দেখ তো মা, থানার পরে এসে হল্লা করে—ওর সাহসটা কি! বড়বাবু ওকে সদরে চালান দেবেন। দিন কতক জেলের ঘানি ঘুরিয়ে আসুক, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

মল্লিকা আশ্চর্য হয়ে বলে, বন্দেমাতরমের জন্য জেল?

করালী হেসে ওঠে।

কি জানি, কি জন্যে! তুমি মা, ঘরে যাও—ওকে ছাড়া হবে না।

যদুও বলে, ঘরে যাও বউঠাকরুন। এরা কি সহজে ছাড়বার লোক? দুপুরে কতকগুলো সাক্ষি এনে কি-সব তালিম দিচ্ছিল—একটু একটু কানে গেল। আমি নাকি ভয়ানক ভয়ানক কাজ করেছি। তুমি ভাইধনকে চিঠি লিখে দিও। মাস পাঁচ-ছয় পরেই আসছি—ভাবনা নেই। মল্লিকা চোখ মুছে বলে, সদর তো দশ-বারো ক্রোশ পথ। মোড়ল-দাদু এই রোগা শরীরে যাবে কিসে?

করালী হাসতে লাগল। বলে, আসামীর জন্যে কি পক্ষিরাজের বন্দোবস্ত

হবে? এই—জোছনা উঠলে রওনা হবে, সঙ্গে চার-পাঁচ জন কনস্টেবল থাকবে, পৌঁছুতে দুপুরও লাগবে না। দারোগাবাবু সকালবেলা পালকিতে রওনা হবেন, বন্দোবস্ত হয়ে গেছে।

মল্লিকা দৃঢ়কণ্ঠে বলে, আমার মোড়ল-দাদুও পালকিতে যাবে।

করালী দাঁত বের করে হাসে। বলে, ষোল বেহারার?

তা দূরের পথ—বেহারা কিছু বেশী চাই বই কি।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে করালী হাসির জের টানতে সাহস পায় না। বলে, আচ্ছা মা দারোগাবাবুকে বলিগে—

হ্যাঁ বলোগে। রোগা মানুষকে বার ক্রোশ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেলে হাড় ক'খানাও আস্ত থাকবে না। সে হবে না। তুমি বল পালকির খরচা আমরাই দেব।

রাত্রিবেলা থানা থেকে খবর এল, পালকির সম্বন্ধে দারোগাবাবুর আপত্তি নেই, সকালেই রওনা হয়ে যাবে। তবে বারোটা বেহারার দরুন চব্বিশ টাকা এক্ষুণি পাঠিয়ে দেওয়া চাই।

পাড়াগাঁয়ে যখন-তখন অত টাকা মেলে না। মল্লিকা হাতের একগাছা বালা খুলে যদুর মেয়ের হাতে দিল। বলে, পোদ্দারের দোকানে ছুটে যা মানী, বন্ধক দিগে, বিক্রী করে, যে ভাবে হোক—টাকা নিয়ে আয়।

বালা হাতে মানী ইতস্তত করে। মল্লিকা তাড়া দিয়ে ওঠে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি, মানুষের চেয়ে কি গয়না বড়?

তা অবশ্য নয়, এবং বালা নিয়ে মানী চলেও গেল। তবু মল্লিকা অনেকক্ষণ পর্যন্ত সুস্থির হতে পারে না। এই বালা তার শাশুড়ী হাতে পরতেন, সেকেলে জিনিস। শাশুড়ীকে সে চোখে দেখেনি—তিনি চিতায় উঠলে কর্তা খুলে রেখেছিলেন, মল্লিকা এলে তাকে পরিয়ে দেন। আবার সে যেদিন চিতায় উঠবে, হয়তো আর একজন সজল চোখে খুলে বেখে দিত। কিন্তু সে তো হল না—

আমার কাছে মল্লিকা চিঠি লিখল। সব কথাই খুলে লিখেছিল। তিন দিনের দিন বাড়ি এসে পেঁছিলাম।

হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে মল্লিকা বলে, দেখ তুমি রাগ করবে। ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ করে বসলাম, সব লিখেছি—সেইটে কেবল লিখিনি।

কি?

মল্লিকা বাঁ-হাতখানা উঁচু করে দেখাল।

হাসিমুখে বলি, গয়নার শোক লেগেছে?

অশ্রুজড়িত স্বরে মল্লিকা বলে, এ যে আমার হীরে-মাণিক-কোহিনুরের চেয়ে বেশি! তুমি তো জান···আচ্ছা, অন্যায় হয়নি আমার?

নিশ্চয়, এক-শ বার—

মল্লিকা এতটুকু হয়ে যায়, বলে, বাবা বেঁচে থাকলে কত দুঃখ করতেন তিনি।

বাবার কথা উঠলে গর্বে বুক ভরে যায়। স্বাধীনতা আমরা অনেক কাল হারিয়েছি, কিন্তু মনে মনে আজও মরিনি—সে কেবল ঐ নমস্তেরা প্রাণের আগুন পুরুষ থেকে পুরুষান্তর জ্বালিয়ে যাচ্ছেন বলে। বললাম, বাবা যা মানুষ—হয়তো বলতেন, বউমা, এ তুমি কি করেছ!—মানুষের হাতে হলদে রাখি পরিয়ে বেড়াতাম, তুমি যে একটা হাতের বালা খুলে এক সঙ্গে হাজার মানুষের মনের উপরে রাখি পরিয়ে দিলে।

মল্লিকা লজ্জিত হয় একটু। বলে, এই দেখ তোমার কানেও গেছে তা হলে। সত্যি, এই অঞ্চল জুড়ে আমি মা হয়ে বসেছি।

তাই তো বলছি, ঘোরতর অন্যায়। আমি বেচারা কিছু খবর রাখি নে, কলকাতায় বসে পেনাল কোড মুখস্থ করে মরি। এখন পথ চলতে লোকে আঙুল দেখিয়ে বলছে, ঐ মল্লিকা-মায়ের স্বামী যাচ্ছে। এতে ইজ্জত থাকে?

মল্লিকা ছেলেমানুষের মতো হাততালি দিয়ে ওঠে। বেশ হয়েছে—এতকাল তোমরা মাথায় চড়ে থাকতে, এখন থেকে আমার নামে তোমার পরিচয়।

দৃঢ় কণ্ঠে বললাম, ইজ্জত আমি বজায় রাখবই।

কি করবে?

একলা তোমায় দেমাক করতে দেব বুঝি! আমিও পাশে পাশে থাকব। হাজার মানুষের মধ্যেই এখন থেকে আমার কাজ।

আদর করে তাকে কাছে টেনে আনলাম। বলি, বাবার ঐ ছবির সামনে যেমন ছোট্ট এতটুকু তুমি এই আমার বুকের মধ্যে রয়েছ, তেমনি থাকবে রোজ—চিরকাল—বুড়ো হয়ে মরে যাওয়া অবধি। লোকে বলবে—নীলকান্ত রায়ের ছেলে ঐ শঙ্কর, রায়-বাড়ির বউ ঐ মল্লিকা···কেমন? বাবার কাজ—এখানকার সকল মানুষের কাজ আর আমি একা নই—দুজনে মিলে করব আমরা।

মল্লিকা তদ্গত চোখে ছবির দিকে চেয়ে থাকে, তারপর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উপুড় হয়ে প্রণাম করতে আসে। দেখ কাণ্ড, মেয়েরা এত অল্পে অভিভূত হয়ে পড়ে।

তাকে ধরে ফেললাম!

রাগে রাগে থানায় গিয়ে উঠি। দারোগাকে বললাম, আপনি নতুন এসেছেন, জানেন না। যদু মোড়ল আমার বাড়ি থাকে, ওর বাপও আমাদের কাজ করত—

দারোগা আপ্যায়ন করে বসালেন। বলেন, এসে পড়েছেন—বেশ হয়েছে মশাই। আমাদেরই বা গণ্ডগোলের গরজ কি? তবে এ-ও বলি, ছাইভস্ম কেস—কতদূর কি গড়াত? কথায় বলে স্ত্রী-বুদ্ধি···তাঁরা পালকি-বেহারার টাকা যোগাতে পারলেন, কিন্তু কনস্টেবলগুলোর দরুন কিছু ধরে দিলে তখনই যে খতম হয়ে যেত। ওর আধা খরচও লাগত না মশাই।

ব্যাপারটা কি বলুন তো?

দারোগা বলেন, পিঁপড়েগুলোর পাখনা উঠেছে, দেখেননি! থানায় এসে

চেঁচিয়ে গেল। সরকারী অফিস—সরকার এসব শায়েস্তা করতে জানে, করবেও। কিন্তু ছোটলোকে এই রকম বাড় বাড়লে ভদ্রলোকেরা টিঁকবেন কি করে, ভাবুন তো! আরে মশাই নিচু হয়ে না-ই যদি থাকবে তো ভগবানকে বলে-কয়ে আমার আপনার মতো বামুন হয়ে জন্মাল না কেন?

বললাম, আপনার কাছে ভাগবত-ভাষ্য শুনতে আসিনি দারোগাবাবু। নীলকান্ত রায়ের নাম নিশ্চয় শুনেছেন। আপনাদের নেকনজর তো ছিলই, তার উপর খাওয়া-ছোঁয়ার বাচবিচার নেই বলে সমাজেও তিনি পাঁচ বছর একঘরে হয়েছিলেন। আমি তাঁর ছেলে—যদু চাকর নয়, আমার বড় ভাই।

তা না হলে এই রকম কাঁধে চড়ে বসে! আপনারা দেশটা ডোবাবেন।

রূঢ় কণ্ঠে বলি, আজ্ঞে না, আপনারাই। শুধু দেশ নয়, বৃটিশ সরকারের সেবা করছেন, তাদেরও। সোজা কথায় বলি, পান-টান খাওয়ার সিকি পয়সা প্রত্যাশা করবেন না—মিথ্যে মামলা তুলে নিন।

দারোগা চটে উঠলেন। মিথ্যে কি রকম? ডাক্তারবাবুর গাছ থেকে চুরি করে নারকেল পাড়েনি?

না। তার কারণ অতুল ডাক্তারের নারকেলগাছই নেই।

আছে না আছে, সে-বিচার কোর্ট করবে।

তা করবে। আপাতত আমিও কিছু করে যাই। দারোগার গলায় ছিল কম্ফর্টার জড়ানো, রাগের মাথায় কম্ফর্টার ধরে এক হেঁচকা টান দিয়ে তারপর ছেড়ে দিয়ে এলাম। মাছি মেরে লাভটা কি।

তারপর হুলুস্থুল কাণ্ড। যদু ছাড়া পেল, কিন্তু স্বদেশি ব্যাপারে বাবার সুনাম এবং তার সঙ্গে এই ঘটনা যোগ হয়ে নানা দফায় সেবার আমার মোট দেড় বছর জেল হয়ে গেল। সে-আমলের খবরের কাগজে এসব কথা উঠেছিল, একটা কাগজে এক মল্লিকার নামেই দেড় কলম লেখা বেরুল—"মল্লিকা-কুসুমের মতো যিনি স্নিগ্ধ সৌরভে গৃহকোণ আমোদিত করিতেন, হতভাগ্য সন্তানবর্গের কল্যাণকল্পে তিনি আজ স্বদেশ-গগনে সবিতৃরূপ সমুদিত হইয়াছেন, এইবার নব-প্রভাতের অভ্যুদয় হইতে চলিল"···ইত্যাদি। মোটের উপর সমস্ত মিলে ব্যাপার এমন গড়াল, যে বেহারারা যদুর পালকি বয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তারা একদিন এসে পাই-পয়সা অবধি ভাড়া ফিরিয়ে দিয়ে গেল। সকলের যুক্তি-পরামর্শে বালা বিক্রির টাকায় রায়বাড়ির মণ্ডপে একটা নৈশ-বিদ্যালয় খোলা হয়। কুন্তল-দার ছাতে যেমন আমরা আড্ডা জমাতাম কতকটা তাই আর কি! চাষীরা সন্ধ্যার পর বই-সেলেট নিয়ে আসে। মল্লিকা এইসব নিয়ে যেন পাগল হয়ে উঠল। ছোট ছেলেমেয়েদের সে নিজে পড়ায়।

জেল থেকে বেরুবার দিন ছেলেরা যথারীতি ফুলের মালা নিয়ে ফটকে বসে আছে, ভিড় ঠেলে মল্লিকা আর যদু এগোবার ভরসা পায় না। দুটো দিন যে বাড়িতে স্থির হয়ে থাকব, তার ফুরসৎ দেয় না তারা; এখানে সমিতি, ওখানে বৈঠক—নিঃশ্বাস ফেলতে পারি নে।···আবার পুলিশে ধরে, যথারীতি মামলা-

মোকদ্দমার পর জেল। শেষাশেষি আর কোর্টের দরকার হয় না, সোজা ডিটেনশন ক্যাম্পে চালান হয়ে যাই। কুন্তল-দার দলের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, এখন আর এ কথা গোপন ছিল না।

তখন বীরভূমের এক গ্রামে থাকতে দিয়েছিল। পুলিশ দুবেলা এসে তদারক করে যেত। গ্রামের লোক দস্তুরমতো হিংসা করত আমাকে। কাজকর্ম নেই, খাওয়া দাওয়া তোফা চলছে, সব সময় ধোপদুরস্ত কাপড়। মাঝে মাঝে বাজারে যাই সওদা করতে। মাছওয়ালাকে দর জিজ্ঞাসা করলে সে যদি বলে বারো আনা, ঝনাৎ করে পুরো টাকাটা ফেলে দিয়ে মাছ তুলে নিই। সে অবাক হয়ে থাকে।

একদিন লোকটা চুপি চুপি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল, কি করলে এইরকম বন্দীবাবু হওয়া যায়—বলুন তো বাবু? অনেকখানি বিদ্যে শিখতে হয়—না?

বাড়ির চিঠি আসে মাঝে মাঝে। মল্লিকা নিজের কথা কিছু লেখে না—তাছাড়া সকল খবরই দেয়। মানীর বিয়ে হয়ে গেছে, জামাইটি লেখাপড়াও জানে একটু আধটু, সে-ই এখন যদুর বাড়িতে এসে আছে, চাষ-বাস দেখে। যদুকে খুব তারা টান টানি করছে. তাকে আর আমাদের বাড়ি থাকতে দেবে না···

একদিন মল্লিকার চোখ ফেটে সত্যি সত্যি জল এসেছিল। মানীই পরে বলেছে একথা।

আচ্ছা তোর বাবাকে যে নিয়ে যাবি মানী, এই পুরীর মধ্যে একা একা আমি থাকব কি করে?

মানী বলে, বাবা বুড়ো হয়ে গেছেন, আর কত খাটবেন বলো।

তোর বাবাকে বুঝি বড্ড খাটাই?

মানী সমস্ত জানে, তার লজ্জা হয়। বলে. না খুড়িমা, তেমন কথা কে বলেছে? আসলে হল, বাবা এখানে থাকলে নানান কথা উঠে সমাজে মাথা নীচু হয়ে যায়। তাই তোমাদের জামাই বলেছে, সমাজের সকলকে ছেড়ে দিয়ে তিনটে মানুষ আলাদা থাকা যায় না তো!

জামাই সঙ্গে ছিল। তার সুর এরকম মোলায়েম নয়। বলে, কোথায় মানুষ? আমরা তো তোমাদের কাছে কুকুরের সামিল। আমাদের ঘরে ঢুকতে দাও?

ম্লান হাসি হেসে মল্লিকা বলে, দিই কি না, ওকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ দিকি অমূল্য।

মানী সামলে নেবার ভাবে তাড়াতাড়ি বলল, তোমরা দাও, কিন্তু সবাই দেয় না কি-না—সেই কথাই বলছে খুড়িমা।

দিন-কাল বদলে যাচ্ছে, যারা দেয় না তারাও দেবে।

অমূল্য আগুন হয়ে ওঠে, দয়া? দয়া চাই নে, আমরা আলাদা থাকব। কোম্পানি বন্দোবস্ত করে দিয়েছে, দালান-কোঠা চাকরি-বাকরি সব বখরা হয়ে যাবে···খাসা হয়েছে—

কিন্তু তাতে ভালবাসা হবে না, তফাতটাই শুধু বাড়বে। একটা নিঃশ্বাস ফেলে মল্লিকা বলে, এদের অনেক দোষ আছে মানি, তবু এদেরই মধ্যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ছেলে মানুষের অপমান প্রাণ দিয়ে বুঝেছে। এই বাড়িরই একটা লোক সব ছেড়েছুড়ে আজও ভেসে বেড়াচ্ছে···হ্যাঁ রে মানী, আজকাল তোর খুড়োমশায়কে একেবারে ভুলে গেছিস, না?

মানী লজ্জিত হয়ে সরে যায়। অমূল্য তখন চলল শ্বশুরের কাছে। মণ্ডপের সামনেটায় একটা নিড়ানি নিয়ে যদু ঘাস তুলছিল। সেখানে আর একদফা বচসা হল। অনেকক্ষণ পরে রান্নাবান্না হয়ে গেলে মল্লিকা গিয়ে দেখল, যদু ঘাসের উপর মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে।

মল্লিকা বলে, আর কেন মোড়ল দাদু? আমরা উঁচু জাত—ওদের যে ঘেন্না করি! কেউ আর ইস্কুলে পড়তে আসবে না, ঘাস তুলে পথঘাট যতই সাফ করে রাখ না কেন—

যদু বলে, তাই তো বউঠাকরুন, নতুন কথা শুনি—তোমরা আর আমরা একেবারে পর, কোন সম্পর্ক নেই—

থাকবে কি করে? কোম্পানি দাগ কেটে মার্কা মেরে দিয়েছে যে! এদিক-ওদিক হবার জো আছে?

সেইদিন মল্লিকা এক চিঠি লেখে আমাকে। যা কখনো হয় নি—দু-শ মাইল দূর থেকে কার কান্না শুনতে পেলাম। চিঠির প্রতিটি অক্ষর যেন কান্না। লিখেছে, অবস্থা ভাল নয়, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। স্বদেশী আমলের কথা শুনেছি, কিন্তু এমন দুর্দিন আর কখনো আসে নি। আমার এদিকে ক্ষেত-খামার খাঁ খাঁ করছে, ভয়ানক আজন্মা, লোকে এবার খেতে পাবে না···

যদুকে শেষ পর্যন্ত একরকম জোর-জবরদস্তি করেই নমঃশূদ্র-পাড়ায় নিয়ে গেল। মল্লিকা একা থাকে। এক-একদিন যদু সন্ধ্যার পর গা ঢাকা দিয়ে আসে, বেশিক্ষণ থাকতে ভরসা পায় না, খবরাখবর নিয়ে সরে পড়ে।

মাস ছয়েক পরে একদিন যদু ঘরের মধ্যে এসে চেপে বসল, বলে, ইঃ আমার কুটুম্বেরা! ভাত দেবার কেউ নয়, কিল মারবার গোঁসাই। বুঝলে বউঠাকরুণ, দুপুরে আজ লবডঙ্গা হয়েছে।

মল্লিকা শিউরে ওঠে, সে কি?

তিক্ত কণ্ঠে যদু বলে, জুটবে কোথা থেকে? তের বিঘের বড় বন্দটা পতিত রয়েছে। তার কি চেষ্টা আছে? নবাবপুত্তুর তেড়ি কেটে লম্বা লম্বা বুলি আউড়ে বেড়াবে, সন্ধ্যার পর জুটবে গিয়ে অশ্বিনীনাথের গাঁজার আড্ডায়। গলা নামিয়ে চুপি চুপি বলে, আবার শুনি রাত্তিরে এদিক-ওদিক বেরুচ্ছে। পয়সার খাঁকতি, নেশার টান। শেষকালে জেলে-টেলে না যায়, তাহলে মানীর কষ্টের পার থাকবে না।

মল্লিকা বলে, এই আমার মতো?

যদু নাকি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিল, হঃ তোমার মতো! তুমি তো ভাগ্যধরী

বউঠাকরুণ, ঐ হারামজাদার কথার মধ্যে তুমি আমার ভাইধনকে টেনে আনলে ?

ভাতের থালা সামনে আসতে যদু গ্রাসের পর গ্রাস মুখে পোরে। কেবল যে দুপুরে খায়নি, সে-রকম মনে হয় না। হয়তো আরও কত বেলা—কত দিন, তার ঠিক কি ! মল্লিকার মনটা বড় খারাপ হয়ে রইল, রাত্রে খুব জ্বর এল। জ্বর এইরকম প্রায়ই হয়। ভাবনায় ভাবনায় কিছুতেই ঘুম আসে না। আলো জ্বেলে তখন আমাকে চিঠি লেখে, আর থাকতে পারি নে, তুমি চলে এসো—

এই সময়টা নতুন ভারত-শাসন আইন পাশ হল, স্বাধীনতার পথে নাকি বড় একটা লম্ফ দিলাম ! বড়লোকের বাড়ির আয়েশি কর্তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন। খবরের কাগজে কলমের পর কলম তাঁদের অলৌকিক ত্যাগের বিবরণ বেরুতে লাগল। পুলকে রোমাঞ্চিত হতে হয়,—ডজন ডজন এরকম অবিসম্বাদী দেশনেতা রয়েছেন, ভাবনা কি আমাদের ? তাঁদের ভোট যোগাড় করতে আমাদের মতো জেলফেরত ছন্নছাড়ার দল কোমর বেঁধে লেগে গেল।

এই উপলক্ষে আমরা কয়েকজন আচম্বিতে ছাড়া পেয়ে গেলাম। আমাদের লাভ এইটুকু। প্রথম যে ট্রেন পাওয়া গেল, তাতে উঠে বসলাম।

সন্ধ্যার পর বড় কনকনে শীত—বাতাসের যেন দাঁত হয়েছে, গ্রামের কুকুরটা অবধি এরই মধ্যে খেজুর রস জ্বাল-দেওয়া উনানের ধারে গুটি-সুটি হয়ে শুয়েছে। এমনি সময়ে স্বল্পালোকিত স্টেশনে নেমে আমি এদিক ওদিক তাকাচ্ছি।

কোথায় যাবেন বাবু ?

আমাদের গ্রামের নাম করলাম। বিছানার মোট ও সুটকেসটা দেখিয়ে বলি, বোঝা ভারী হবে না।

উঁহু ভারী কেন হবে ? শোলার আঁটি। চার আনা লাগবে—ষোলটি পয়সা, আধলা কম নয়।

টিকিটবাবু আলো হাতে সেই দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন।

নতুন লোক দেখেছে, ঠগ-বেটারা অমনি ছুরি শানাচ্ছে। বলি, ষোলটি পয়সা কখনো দেখেছিস এক জায়গায় ? আপনি ব্যস্ত হবেন না, এগিয়ে দেখুন, কতজনে হা-পিত্যেশ করে আছে। চার পয়সা কি বড় জোর ছ-পয়সা।

লোকটা বলে, পাক্কা দু-ক্রোশ পথ, খাল পেরুতে হবে, মোটে ছ-পয়সা ?

তাইতো সবাই যাচ্ছে।

তবে আমিও যাব।

বোঝা মাথায় নিয়ে দ্রুতপদে চলল।

পাকা রাস্তা ছেড়ে আমরা সুঁড়িপথে নামলাম। খুব জ্যোৎস্না ফুটেছে, মাঠ গাছপালা ঝুপসি-ঝুপসি জঙ্গলগুলো অনেকদিন পরে চোখে অপরূপ ঠেকছে।

তোমার নামটা ভাই ?

তাঁ-ও-ছ পয়সার মধ্যে ?

চুপ করে যাই। মনে মনে ভাবি, ঐ তো রোগা চেহারার মানুষ, দুটো

বোঝা বয়ে খুব কষ্ট হয়েছে, মেজাজ তাই বিগড়ে গেছে। সহানুভূতির সুরে বললাম, এই ইয়ে···সুটকেসটা বরং আমার হাতে দাও দিকি।

বিরক্ত মুখে লোকটা বলে, তা হলে পয়সা তিনটে কম দেবে তো? পথ ছেড়ে এবার আমবাগানে ঢুকে পড়ল।

ওদিকে কেন রে?

লোকটি বলে, এইখানে দাঁড়াও বাবু, জল খেয়ে আসি একটু।

এত শীতে জল?

সে রুখে উঠল। জলও খাওয়া যাবে না? বাগানের দিকটায় জল, কতক্ষণ লাগবে!

মনে পড়ল, একটা খালের মতো আছে বটে এদিকে। চৈত্র মাসে একদম শুকিয়ে যায়, বর্ষায় হিঞ্চে-কলমি নিয়ে জেগে ওঠে, জলের চেয়ে শেওলাই বেশী। ছেলেবেলায় এইখানে দু-চার বার পুঁটিমাছ ধরতে এসেছি।

দাঁড়ালাম। আবার ভাবি দাঁড়িয়েই বা কি হবে! লোকটার গতিক সুবিধে লাগছে না। বাগানের মধ্যে খানিকটা গিয়ে একটা উঁচু জমি, সেখান থেকে বেশ দেখা গেল। চেঁচিয়ে ডাক দিলাম, জল খাবি—তা খালের মাঝখানে কি করিস?

আজ্ঞে ঘাটের জল ঘোলা।

কোমর জল হয়ে গেছে, এখনও এগুচ্ছিস?

জবাব না দিয়ে লোকটা ক্ষিপ্রবেগে শেওলা ছিঁড়ে পথ করতে লাগল। আমি বন-জঙ্গল ভেঙে সোজা খালের কিনারে ছুটলাম। ততক্ষণ সে ওপারে উঠে দৌড় দিয়েছে।

হেসে উঠি। পারবি নে বাপু, সাত বছর আটকা ছিলাম, তা পায়ে বাত ধরেছে ভাবিস নে। আচ্ছা, যত জোরে পারিস ছোট, আমিও ছুটছি।

নতুন করে আর শেওলা ছিঁড়তে হল না, চক্ষের পলকে খাল পার হয়ে প্রায় রশি দুই গিয়ে লোকটাকে জাপটে ধরলাম।

সুটকেশ ফেলে লোকটা কোমর থেকে বার করল এক ছুরি। ধস্তাধস্তি চলল খানিকটা। হেসে বললাম, ও ছুরিতে মাছ কোটা যায়, মানুষ কাটা যায় না, বুঝলি? হাত ধরে মুচড়ে দিতে ছুরি পড়ে গেল, লোকটা আর্তনাদ করে উঠল।

গ্রামের ধারে এসে পড়েছি। চেঁচামেচিতে লোক ছুটে গেল।

কি হয়েছে? কি হয়েছে?

লোকটা অসঙ্কোচে বলে, মেরে ফেলেছে ভাই রে, হাতখানা মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে। তেষ্টার জল খেতে দেয় না। যেই বলেছি গোপালদার ঐ বাড়ি হয়ে একটুখানি ঘরে যাই—

বোঝা গেল, তার বাড়ি এই গ্রামেই। ছোকরাদের মধ্যে তিন-চার জন বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এল। বলে, ঐ রকম! ভদ্দোরলোক কি না, আমাদের

ওরা জানোয়ার ভাবে। পড়ে পড়ে তুই মার খেলি, জবাবটা কি আমাদের জন্য মুলতুবি রেখেছিস?

ব্যাপার তুমুল হত নিঃসন্দেহে! কিন্তু ওরই মধ্যে আধবুড়ো একজনকে চেনাচেনা ঠেকল। চৈতন্য মোড়ল না? কুশখালি এসে পড়েছি যে, বুঝতে পারি নি।

চৈতন্য মোড়ল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। গোঁফ-দাড়িতে ভরা আমার মুখ চিনেও চিনতে পারে না।

আমি রায়-কর্তার ছেলে গো—শঙ্কর।

চৈতন্য বলে, সর্বনাশ! এদ্দিন পরে এলে? সেই লোকটার দিকে তাকিয়ে হেসে বলে, মেরে থাকে মেরেছে, বেশ করেছে। ইনি মারলে দোষ হয় না, সম্পর্কে তোর খুড়শ্বশুর।

চৈতন্য পরিচয় করিয়ে দেয়, এ হল তোমাদেরই যদু মোড়লের জামাই। ওরে অমূল্য পেন্নাম কর্—

অমূল্য গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই সময়ে এসে পড়লেন জমিদারি কাছারির নায়েব, সঙ্গে চারজন বরকন্দাজ। তিনিও এই ট্রেনে নেমেছেন। বরাবর রাস্তা ধরে যাচ্ছিলেন, হৈ-চৈ শুনে কি ব্যাপার জানতে এসেছেন।

কী হে? একেবারে থেমে গেল সব! এই যে অমূল্যচন্দোরও রয়েছে দেখছি।

যারা বেশি বীরত্ব দেখাচ্ছিল তাদের আর পাত্তা নেই, কোন্ দিকে সরে পড়েছে, যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে। নজরে পড়ে গিয়ে অমূল্য ঘাড় নীচু করে রইল।

আমার দিকে চেয়ে নায়েব বললেন, জামা যে রক্তে ভেসে যাচ্ছে! খুলুন দেখি, এঃ মশায়—

পিঠে এক জায়গায় লম্বালম্বি চিরে গেছে। সেদিকে এতক্ষণ কারও নজর পড়ে নি! একজন বরকন্দাজ ছুরিখানা কুড়িয়ে নিল।

নায়েব বোমার মতো ফেটে পড়লেন। ব্রহ্মরক্ত পাত করেছিস, ভিটেয় ঘুঘু চরাব। শ্রাদ্ধের বন্দোবস্ত তো হবেই ভালো করে, কাল গিয়ে ফৌজদারি চড়াব। কালাপানি ঘুরিয়ে আনব, তবে আমার নাম মন্মথ শিকদার হ্যাঁ—

আমার হাত ধরে টানতে টানতে বলেন, চলে আসুন মশায়। আমি আছি, কোনো শালার উড়বার জো নাই। দায়ঝক্কি সমস্ত আমার। চৈতন্য মোড়ল বাবুর জিনিস দুটো তোমার জিম্মায় রইল, পৌঁছে দিও। কাছারি গিয়ে ডাক্তার ডেকে আগে তো ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হোক!

রাস্তায় এসে মন্মথ মনের উল্লাস চাপতে পারেন না, হাসতে হাসতে বলেন, একটুখানি ছাল উঠে গেছে মশায়। ডাক্তার লাগবে না হাতী! তবে সাক্ষী হিসেবে ডাক্তার একটা চাই বটে—ডবল ফী ধরে দিলেই হয়ে যাবে, বন্দোবস্ত আছে।

চুপচাপ কয়েক পা গিয়ে আবার শুরু করলেন, ঐ অমূল্য বেটা হল পালের গোদা। আরে বাপু, মাতব্বর হবি ভাল কথা—গুছিয়ে চলতে পারলে দু-দশ টাকা আসেও। কিন্তু ঘর থেকে কিছু আগাম বের করতে হয়। সব ব্যবসায় ঐ এক রীতি। তোর হল ভাঁড়ে মা ভবানী, মুটেগিরি করবি—শুধু বামুন-কায়েতদের মুণ্ডপাত করে বেড়ালে কি শেষরক্ষে হবে?

জিজ্ঞাসা করলাম, এদিকে বুঝি ঐ-সমস্ত খুব আন্দোলন হচ্ছে।

নায়েব বললেন, হবে না? না দেবার কথা বড় মিষ্টি কি না! সব শেয়ালে এক রা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বামুন-কায়েত ওসব কিছু নয়, নায়েব মশায়। ওদের রাগ আসলে চড়া খাজনা আর জুলুমের উপর। সেইটেই এখন জাত-বেজাতের কথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

নায়েব প্রতিবাদ করে উঠলেন, সেই আহ্লাদে থাকুন মশায়। একবার আনাচ-কানাচ থেকে শুনে আসবেন দিকি ওদের কথা।

এত সব ওরা তো তলিয়ে বোঝে না!

বুঝুক না বুঝুক, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই। আমরা কি ছেড়ে কথা কইব? আর তা-ও বলি, ধর্ম আছেন। নইলে দেখুন না কেন, দেওয়ানিতে আঠার মাসে বছর, আজ এক মাস ছুটোছুটি করে সময় বের করতে পারছি নে, কোত্থেকে পথের মানুষ আপনি এসে এই কাণ্ড। এর নাম ফৌজদারী মামলা, একেবারে কাঁচাখেগো দেবতা। সকালবেলা টক করে থানায় একখানি এজাহার ঝেড়ে দিয়ে সেকেণ্ড ট্রেনে সদরে সোজা মোক্তারের বাড়ি···কি মশাই, আবার এত রাত্রে বাড়ি যাবেন কি করতে? কাছারিতে দুটো শাক-ভাত খেয়ে ভোরবেলা বরঞ্চ এই পথে অমনি—

সোজাই চললাম আমি। ব্যস্ত হয়ে নায়েব ডাকছেন, তাহলে সকালবেলা আসছেন তো? না, আবার লোক পাঠাতে হবে?

আমি মামলা করব না।

তার মানে?

ফিরে দাঁড়িয়ে বলি, ভেবে দেখলাম নায়েব মশায়, দোষ আমারই। পেটে ভাত নেই, শীতের রাত্রে চারমাইল মোট বয়ে আনছে—মজুরি ছ-পয়সা। এতে মেজাজ খারাপ হলে দোষ দেব কার? আমি যদি বলতাম, চার আনাই পাবি বাপ, সেইটে ন্যায্য—আর তার উপর যদি এসব হত—

নায়েব শেষ করতে দেন না, গর্জন করে ওঠেন, তা বুঝেছি, আপনারা ঘরের ঢেঁকি সব কুমীর হয়ে উঠেছেন, তাই এইসব হাঙ্গামা।

হাঙ্গামা-হুজুত না হলেই বা আপনাদের দু-পয়সা আসে কিসে? হাতবাক্স কোলে করে নেহাৎ একেবারে দুর্গানাম লিখতে কি কাছারি এসে বসেছেন? বলুন সত্যি কি না?

চাঁদের আলোয় উঠানে বাদামতলায় এসে দাঁড়াই।

দুয়োর খোল, ও যদু—

এই উঠানে কত সন্ধ্যায় কত ছুটাছুটি করেছি, মা তখন বেঁচে। বাদামতলার এইখানটায় বিয়ের পর মল্লিকার পালকি এনে নামিয়েছিল। আজ যেন নতুন অতিথি, সবাই অবিশ্বাস করছে। এতকাল পরে ফিরে এসে মনে হচ্ছে, গ্রামের চেনা মানুষেরা বদলে গেছে, একেবারে নতুন পৃথিবী।

যদুভাই, শুনতে পাচ্ছ না ? আমি—আমি—

মল্লিকার জ্বর। লেপের নিচে এক রকম বেহুঁশ হয়েছিল, ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। ঘরে ঢুকে চমকে উঠি। ঠাণ্ডার ভয়ে দরজা-জানলা বন্ধ···মিটমিটে প্রদীপ···ভাঙাচোরা দেয়ালের ফাঁক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আরশুলা উড়ছে···বিশীর্ণ ভয়াবহ মুখ মল্লিকার। জ্যোৎস্না-পরিপ্লাবিত পথ অতিক্রম করে যেন কালো গহ্বরের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। হাত বাড়িয়ে দিলাম মল্লিকার দিকে। জীবন এসে কি মৃত্যুকে আদর করে ডাকল ?

কেমন আছ ?

ভাল, খুব ভাল ! এই কদিন একটু জ্বর হয়েছে।

কদিন না, ক'বছর বল।

হোকগে। ম্যালেরিয়া জ্বর—ঐ রকম ভোগায়। মল্লিকা উঠতে গিয়ে মাথা ঘুরে বসে পড়ে। কী-ই বা বয়স তার, তবু চুলে পাক ধরেছে, কুঞ্চন-রেখা পড়েছে সুকোমল মুখটির উপর। সেই ছিপছিপে হাসিমুখ মেয়েটি, চোখে-মুখে চঞ্চলতা—এখন কথা বলে কত আস্তে, হাঁটতে পারে না—কষ্ট হয়। বলল, মোড়ল-দাদু একা-একা কি যে করছে ! আগে একটা খবর দিলে না, বেশ লোক ?

বললাম, বড্ড মনে-প্রাণে চেয়েছিলে কি না, তাই হঠাৎ ছেড়ে দিল। চিঠিখানা পেয়ে অবধি এমন হয়েছিল মল্লিকা, খবর দেবার দেরি সইল না—ছুটে এসেছি।

এত দয়া—এমন শত্রুতা আর কার আছে বল। বলে মল্লিকা প্রগল্‌ভা হাসি হাসল।

যদু দেখা দিল। কুলোয় করে চিঁড়ে-পাটালি আর জামবাটি-ভরা দুধ এনেছে। সে থমকে দাঁড়ায়—রক্তের দাগ কেন ?

মল্লিকা বলে, দেখি—এদিকে ফেরো তো !

হেসে উড়িয়ে দিই, দেখবার কি আছে ? কাঁটায় ছড়ে গেছে, গরম জামায় চুপসে গিয়ে ঐ রকম দেখাচ্ছে।

আহা-হা, তাহলে আগে একটু আইডিন—

উঁহু, সকলের আগে এইটি। যদুর হাত থেকে এক রকম কেড়ে নিয়েই খেতে বসলাম। তারপর ইচ্ছে করে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাই।

আচ্ছা—আমি যখন ডাকছি, গলা শুনে কি ভাবলে মল্লিকা ?

মল্লিকা বলে, অনভ্যাস হয়ে গেছে, ঠিক ধরতে পারিনি। ভয় হল, চোর-চোর বুঝি !

চোর এসে হাঁকাহাঁকি করে গেরস্ত জাগাচ্ছে—বুদ্ধি আছে দেখছি।

হেসে উঠলাম। তারপর বলি, চোর না হই, দাগি তো বটে! বাড়ি এলাম, কিন্তু ক'দিনই বা থাকব!

মল্লিকা গম্ভীর হয়ে গেল।—যদি বলি, যেতে দেব না আর—বাড়ি থেকে বেরুতেই দেব না?

এমন তো বলনি কোনদিন—

মল্লিকা বলে, তখন ছেলেমানুষ ছিলাম, একটা কথাও কি গুছিয়ে বলতে পারতাম ছাই!···সত্যি, আমি ঠিক করেছি, তোমাকে আর বাইরে বাইরে থাকতে দেওয়া হবে না।

তবে ঘরেই থাকব।

হ্যাঁ, নতুন ভাবনা আজ মনে মনে, ঘরে থাকা এখন কাজ আমাদের। কার্তিক কামার, এরফান ঘরামি, বুধো শেখ, আমাদের ঐ অমূল্য, চৈতন্য মোড়ল—কেউ বাদ নেই, সকলকে নিয়ে আমাদের ঘর।

খাওয়া শেষ হল। হাত ধুয়ে হাসতে হাসতে খাটের উপর এসে বসি।

মল্লিকা ঠিক বিশ্বাস করেনি।—সত্যি বলছ গ্রামে থাকবে? তাহলে তোমার দেশের কাজ?

এই গ্রামও কি দেশ নয়? এরা সকলে, তুমি—দেশের মানুষ নও বলো।

মল্লিকা সহজভাবে নিল কথাটাকে। বলে, তা সত্যি! ধর, তুমি তো জীবনটা এক রকম এই পথেই দিলে। আরও মানুষ রয়েছে, তারা যাক না।

ঠিক কথা। তবে যায় না যে!

হয়তো ভাবে, মিছে আত্মবলি দেওয়া। এ-জাতের কি কিছু হবে? ক'দিন থাকো, দেখবে অবস্থা। দেশের ছেলেমেয়ে এতকাল এত দুঃখ স্বীকার করে কত কি করতে চেয়েছিল, সব চুরমার হয়ে গেছে।

মল্লিকার গলা ভারী হয়ে এল, সে এক দিকে মুখ ফেরাল। আমিও সহসা জবাব দিতে পারিনে। শেষে বললাম, পথের বাধা তো আসবেই মল্লিকা। বাধা শক্ত হচ্ছে, তাতেই মনে হয়, সূর্য উঠল বলে। যোগী-ঋষিরা শব-সাধনা করেন, শেষ রাত্রেই ডাকিনীর উপদ্রবটা বেশি হয়। গল্প শোননি?

মল্লিকার দিকে ব্যথাভরা দৃষ্টিতে চেয়ে আছি। আবার বলি, মল্লিকা, তোমার শাঁখা সম্বল, রোগা দেহ; আমিও বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। সংসারের উপান্তে এসে দাঁড়িয়েছি—শ্মশানের উপর এবার ঘর বাঁধা হল না। কিন্তু ফুল ফুটবে—এ অবশ্যম্ভাবী, আমাদের এত কষ্ট বিফলে যাবে না।

সকাল না হতে দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা পড়তে লাগল। খিল খুলে দেখল, মানী, অমূল্য, চৈতন মোড়ল এবং আরও দু-তিনজন এসেছে। এরাই তাকে মারবে বলে শাসিয়ে বেড়ায়, কুশখালির দিকে যাবার উপায় নেই, জামায়ের সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে পর্যন্ত পর হয়ে গেছে। কিন্তু অবাক কাণ্ড—সেই

জামাই পরম ভক্তিমান হয়ে সকলের আগে-ভাগে ঢিপ করে যদুকে প্রণাম করল, পা আর ছাড়তেই চায় না।

চৈতন্য বলে; লজ্জায় আসতে চাচ্ছিল না। আমি বলি, ভয় রায়কর্তার ছেলেকে নিয়ে তো নয় এর মধ্যে শিকদার ঢুকে পড়েছে। আস্ত কালিঠাকুর—ডাহা মিথ্যের উপর চুনকাম করে। এবারে এমন জুত পেয়ে গেছে, শুধু অমূল্য কি—পাড়াটা সুদ্ধ চষে ফেলবে।

যদু উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, কি হয়েছে? কি করেছে অমূল্য?

খুড়োমশায় বলেন নি কিছু? মানী কেঁদেই ফেলল। বুঝলে চৈতন-দা, এ-ও ঐ শিকদারের বুদ্ধি। বাবার কানে গেলে একটা খাতির-উপরোধের ব্যাপার হবে, একদম তাই চেপে গিয়েছেন। বেরিয়ে গেছেন নাকি?

যদু বলে, চেঁচাস নে, ওরা ঘুমুচ্ছে ঐ ঘরে। বউঠাকরুনের রাতে ঘুম হয় না, এখন বোধহয় একটু চোখ বুজেছে।

কিন্তু কেউ আমরা ঘুমিয়ে নেই। শুনছি।

চৈতন নিঃশ্বাস ফেলে বলে, তবু রক্ষে। রওনা হবার আগে আসা গেছে। আর তোকেও বলি অমূল্য, পই-পই করে বারণ করেছি—গায়ে-গতরে খাট্, অধর্ম কাজগুলো ছেড়ে দে—বিশেষ করে নায়েব যখন আদা জল খেয়ে লেগেছে—

কথায় কথায় যদু সব শুনল। হঠাৎ একসঙ্গে সকলে চুপ করে যায়, নিঃশব্দে আমি গিয়ে দাঁড়িয়েছি তাদের মধ্যে।

রুষ্ট কণ্ঠে যদু বলে, এমন মিথ্যুক হয়েছে ভাইধন, ছুরির খোঁচা খেয়ে স্বচ্ছন্দে বলল কাঁটায় ছড়ে গেছে?

কাঁটা নয় কি মানুষ? কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে ফেলবার বন্দোবস্ত হয়েছে। সমঝে চলো। শেষ পর্যন্ত কিন্তু উভয়কেই আস্তাকুঁড়ে যেতে হবে।

হো-হো করে হেসে উঠি।

যদু আরও জ্বলে উঠে। হেসো না, আমার গায়ে জল-বিছুটি মারছে। হারামজাদা শেষকালে খুনে হয়ে দাঁড়াল! যা ইচ্ছে করুক গে শিকদার, তুমিও থানায় চলে যাও ভাইধন। কিসের জামাই? জামাই? জামাই বলে খাতির করো না।

জামাই না হোক, আমার দেশের মানুষ তো—খাতির আমাকে করতেই হবে। বলতে বলতে দুইহাতে যদুকে তুলে ধরলাম। ঝেড়ে ফেলুক সে মনের গ্লানি। বলি, বড় ভাইয়ের মতো আমায় মানুষ করলি যদু-ভাই, বাবার কাছে এতটুকু বয়স থেকে আছিস—তুই আজ ঐ কথা বললি? তোর বউঠাকুরুন আঁধার ঘরে একা একা ধুঁকছে, আমারও কয়েদখানায় জীবনটা কেটে গেল—এ-সব শুধু কি নিজেদের জন্য, বামুন-কায়েতের জন্য, এই মোড়লদের জন্য নয়? যাদের চিনি নে কোন দিন দেখব না—তারাও বড় হবে, মানুষ হবে, জীবন দিয়ে কি আমরা এই চাই নি? বল যদু ভাই, বল—আমি মিথ্যে বলছি কি না?

বুড়ো যদু আজকের নয়—বলতে গিয়ে হাহাকার করে উঠে।

কে ভাবে এ-সব ভাইধন ? একদল কেবল আর এক দলকে উস্কিয়ে দিচ্ছে বই তো নয় ! কোথাকার ভট্‌চাজ্জিরা নতুন পাঁতি দিয়েছে—এখন থেকে তুমি আমার কেউ নও, আমি তোমার কেউ হলাম না। আজ যদি কর্তা থাকতেন !

আমরা তো আছি, মোড়ল দাত্‌। তাকিয়ে দেখে সবাই শিউরে উঠল। মল্লিকা উঠে এসেছে, পা টলছে, কালিমাখা কোটরাগত ছুটি চোখে যেন আলো ফুটছে। সামনের বেঞ্চির কোণে ধপ করে সে বসে পড়ল। বলতে লাগল, সেবার মাটি ভাগ করেছিল, এবার মানুষ ভাগ করছে। সেবারে সহ্য করি নি, এবারেও করব না। বসো তোমরা, মিষ্টিমুখ করে যেতে হবে। নিমু ময়রার দোকানে একটিবার যেতে পারবে মোড়ল-দাত্‌ ?

খানিক পরে আবার মল্লিকা বেরিয়ে এল, হাতে হলদে সুতো ! বলে, আমার শ্বশুর এ-সব তুলে রেখে গিয়েছিলেন। এসে, তোমরা, পরতে হবে। তুমি এস··· তুমি···তুমি···

অমূল্য কেবল মুখ ভারী করে থাকে। বলে, আমার হাতখানা মুচড়ে একেবারে ভেঙে দিয়েছে, এই হাতে পরব রাখী ?

আমি বললাম, কি করি—শুধু হাতখানাই হাতের মাথায় পেলাম যে ! মনের নাগাল পাই নে, নইলে বিষ-ভরা মনটাই মুচড়ে ভেঙে দিতাম।

মানুষের মন ছাপিয়ে বিষ উপচে পড়ছে আজ চারদিকে। কালরাত্রির প্রহর গুণছি, সামনে নির্মল প্রসন্ন প্রভাত। সমস্ত গ্লানি ঘুচে যাবে তখন।

কুপখালির চাষীদের মধ্যে আজকাল আমার খুব যাতায়াত। তাই নিয়ে নানাজনে নানা টিপ্পনী কাটে।

দারোগা বলে, এবারে শায়েস্তা হয়ে এসেছেন শঙ্করবাবু। চুলে পাক ধরেছে কি-না, কত দিন ? তা ভালো, পথটা নির্ঝঞ্ঝাট—

রাজ্যেশ্বর নামে গ্রামে একজন তালুকদার আছেন, সম্পর্কে তিনি আমার খুড়ো। হঠাৎ কেন জানি না বড় সদয় হলেন আমার উপর। একদিন তিনি ডেকে বললেন, কলকাতায় গিয়ে একটা কিছু বাগিয়ে বসো দিকি বাবাজীবন, তবে বলব বাহাদুর। সাহেবদের বল, একটা ভাল চাকরি দিন স্যার, নইলে আবার ডবল করে স্বদেশিতে লেগে যাব কিন্তু। এতখানি বয়স ধরে দেখছি, কত লোক গুছিয়ে নিল এইসব করে। তুমিই বা কেন ছাড়বে ?

আর ঐ নায়েব মন্মথ শিকদার বলেন, চাষীপাড়ায় ঘুরে ঘুরে আমরা জমিদারের খাজনার তাগিদ দিই, কলাটা মূলোটা আদায় করি। আপনি যে অহরহ ঘুরছেন মশাই, আপনাদের ভারতমাতার স্বাধীনতাও আদায় হবে কি ঐ পাড়া থেকে ?

হ্যাঁ ভাই, আসল ঘাঁটি ধরেছি। সত্যিকার স্বাধীনতাই আনব আমরা গ্রামে শহরে—সকলের মধ্যে। মিথ্যে ভয় থেকে স্বাধীনতা, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার স্বাধীনতা, মানুষের মতো বেঁচে থাকবার স্বাধীনতা, রাজ্যেশ্বর কোম্পানিকে এসেম্বলিতে পাঠিয়ে ইংরেজের বিপক্ষে কড়া কড়া বক্তৃতা করানো, আর তাঁর আত্মীয় পরিজনদের জন্য ভালো ভালো কতকগুলো চাকরি বাগানোর স্বাধীনতা নয়।

শোন, শোন, আমার সেই স্বাধীন সুখী ভাবী ধরিত্রীর স্বপ্ন। মানুষে মানুষে বিরোধ নিঃশেষ হয়েছে, শোষক-শোষিত হাত মিলিয়েছে, জনে জনের মুখে হাসি, চারিদিকের পঙ্গু উঠে বসেছে—ঐ দেখ। প্রাণে তাদের আশার বিদ্যুৎ।

গোরু ও মানুষ ছিল প্রায় এক ধরনের; প্রহার-পীড়নে মাথা তুলত না—নিঃশব্দে সয়ে যেত. অসহ্য হলে মুখ থুবড়ে পড়ত। জীবনের উন্মাদনা জেগেছে সেইসব মানুষের মধ্যে, মুখ তুলে উল্লাসে তারা ঐশ্বর্যবতী ধরণীর দিকে চাইছে।

মল্লিকা তর্ক তোলে, এই ধর আমাদের যদু, টাকার তো সে কামনা করে না। দরিদ্র জীবনই তার কাছে ভালো—

ভাল তো অনেকেরই কাছে। দারিদ্র্যের গর্ব নিয়ে নিঃশব্দে মরতে পারে।

মল্লিকা বলে, কিন্তু অমূল্যর পাশাপাশি তাকে দেখ। কত শান্তি মোড়ল-দাদুর জীবনে!

জীবন নয়, ওটা মৃত্যু। মৃত্যুর মতো শান্তি কি কিছু আছে!

কিন্তু সবাই ভোগের প্রত্যাশী হলে জগতের হানাহানি কি বেড়ে যাবে না?

না মল্লিকা, না। ধরণী কৃপণ নয়, অনন্ত তার সম্পদ। মানুষের প্রয়োজন মতো খাবার আছে, সকলের থাকবার জায়গাও আছে,—নেই কেবল মানুষের লোভের জায়গা।

যেন বাতাসে শোনা যাচ্ছে, দিন আসছে ঐ। সব সমান···আলো-হাওয়া, পৃথিবীর বুকের রসে সিঞ্চিত শস্য-সম্পদ, গোপন মণিকোঠায় রেখে-দেওয়া কয়লা-ইস্পাত একলা কারো নয়। মেরে মেরে একের হাত চোস্ত হয়ে গেছে, আর একজনেরও মার না খেলে পিঠ উসখুস করে—এ অবিচারের শেষ হয়ে এল। বিরোধ অপ্রীতি দূর হয়ে যাবে। শান্তি আসবে, শ্রী ফিরবে। বিবাদের মধ্যে কত অন্যায় করেছি! রক্তপাত হয়েছে, আপন-পর কত লোকের চোখের জল ঝরছে! নতুন দিনে কারও এসব মনে থাকবে না। প্রভাতের আলোয় রাত্রির দুঃস্বপ্ন ভুলে যাব ভাই—

শেষ

চীন দেখে এলাম (১ম পর্ব)

দুই পুরানো পড়শি—মহাচীন আর বিশাল ভারত। হাজার হাজার বছর ধরে অচ্ছিন্ন সৌহার্দ্য। ইতিহাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে কত শতবার আমাদের গমনাগমন চলেছে। রণদুর্মদ সৈন্যবাহিনী নয়, প্রবীণ বিদগ্ধজন—হাতে জ্ঞানের মশাল, আনন্দ ও শান্তির পরম আশ্বাস। জ্ঞানগৌরবে দেদীপ্যমান আত্মসমাহিত সুপ্রাচীন দুটি দেশ। নির্লোভ আত্মসন্তুষ্ট।

ক্যান্টনে বুদ্ধ মন্দিরের প্রাঙ্গণে বটগাছ দেখলাম—শ্রমণ সগর্বে বললেন, ভারতবর্ষ থেকে এনে এ সব গাছ হাজার বছর আগে পোঁতা। আর বটগাছ শুধুই নয়—পুণ্য ও অহিংসার প্রতীক ঐ ভগবান বুদ্ধকে সর্বসমর্পণ করে দেবতা জ্ঞানে তাঁরা পুজো করে আসছেন। হ্যাংচাউয়ে, শুনে এলাম, হ্রদ-পরিকীর্ণ একটা গোটা পাহাড়ই উড়ে এসেছে ভারত থেকে। সাঁইত্রিশটা দেশের মানুষ পিকিনে জমায়েত হয়েছিল। আদর আপ্যায়নের অবধি নেই—কিন্তু ভারতের খাতিরটাই যেন সব চেয়ে বেশী। ঠারেঠোরে এই কথাই প্রকট, আহা—তোমাদের কথা আলাদা, তোমরা হলে একেবারে আপনার লোক। হয়তো বা বাজারে ভিড়ের মধ্যে গিয়ে পড়েছি, সাধারণ লোক বিদেশীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে—ভাষা জানি নে, কিন্তু সর্বাগ্রে একটি কথা রপ্ত করে নিয়েছিলাম—ইন্দু, অর্থাৎ আমরা ভারতীয়। উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে জনতার মুখে উল্লাসের ঝিকিমিকি। মুহূর্তে তাদের হৃদয়ের মানুষ।

পাঁচতারার আলোয় বিভাসিত নূতন-চীন চাক্ষুষ দেখে এলাম। স্থবিরত্বের খোলস ঝেড়ে ফেলেছে। চিরকালের বোঝা বওয়া নুব্জপৃষ্ঠ মানুষগুলোর অপরূপ বীরমূর্তি। লোহার নাল বাঁধা পঙ্গুপদ ছিল যে মেয়েগুলো—তাদের দাপাদাপিতে অস্থির আজ চীনের ভূমিতল।

(১)

নিমন্ত্রণটা এলো অপ্রত্যাশিতভাবে। আমাকে শান্তি-সম্মেলনে প্রতিনিধি করা হয়েছে। কেন হে বাপু? ভেবে চিন্তে তো কোন গুণের হদিশ পাইনে। রাজনীতি করিনে, কোন দলে নেই। পড়ি এবং লিখি। যা সত্যি বলে মনে হয়, সেটাই লিখে প্রকাশ করি—কোন দাদার ধার ধারিনে যে, যুক্তি-পরামর্শ করে রেখে ঢেকে লিখতে হবে। এত সমস্ত ধুরন্ধর ব্যক্তি যাবার জন্য তদ্বির তাগাদা করছেন, তাঁদের ভিড় ঠেলে এ অভাজনের নাম ওঠে কেমন করে?

যে বন্ধুরা এসেছিলেন, তাঁরা বললেন, আমরা যেতে পারছিনে—কিন্তু জানতে চাই সমস্ত কথা। যান আপনি—ফিরে এসে লিখবেন। সত্যি খবরগুলো পাবো, এই আমাদের প্রত্যাশা রইল।

তথাস্তু। মনে মনে ভারি লোভ ছিল—যে তাজ্জব কথা শুনি, কার না লোভ করে বলুন। এই এক বিচিত্র ব্যাপার দেখতে পাই—আমার জীবনের বাসনার জিনিসগুলো কেমন আপনা-আপনি জুটে যায়। কত যে পেলাম, তার অবধি নেই! ভাবতে গিয়ে অবাক হয়ে যাই।

১৮ই সেপ্টেম্বর রওনা হওয়ার তারিখ। একেবারে দিনক্ষণ সাব্যস্ত করে দিল্লী থেকে ওরা প্যান আমেরিকান প্লেনে জায়গা করে রেখেছেন। কিন্তু পাসপোর্টে ভিসার ব্যাপার

চীন (১ম)—১

আছে—সরকারি ফাইলের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক চলেছে আমাদের। টেলিফোনে আর্তনাদ করছি: কি মশায়, পণ্ড করে দেবেন নাকি?

থানায় গিয়ে বললাম, এনকোয়ারিটা তাড়াতাড়ি সমাধা করে দিন। খবর এখনো যদি থাকে তো দেখবেন, কংগ্রেসের কথাও আছে অনেক বইয়ে—সেকালের সেই ত্যাগব্রতী সংগ্রামশীল কংগ্রেস।

খুব ভদ্রতা করলেন তাঁরা। ভরসা দিলেন: না না—আমাদের এখানে আটকা পড়ে থাকবে না। কালকের মধ্যেই সেরে দিচ্ছি। তার পরে কপাল আপনার।

দিল্লি থেকে টেলিগ্রাম এলো ভারত গভর্নমেন্ট পশ্চিমবঙ্গ কর্তাদের পাসপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জাঁদরেল একজন অফিসার—আমার পরম স্নেহভাজন তিনি—পাসপোর্ট হাতে নিয়ে এসে হাজির। আর তরুণ বন্ধুরা তদ্বির করছিলেন—তাঁরাও ফোন করলেন: পেয়ে গেছেন পাসপোর্ট? এক্ষুনি তৈরি হন।

কিন্তু ওঠ বললেই বোঁচকা কাঁধে বেরুব—অতখানি মুক্তপুরুষ নই আমি। সবুর করো, দুটো-একটা ফাঁক দাও। আঠারোই অন্য কাউকে পাঠিয়ে দাও আমার জায়গায়।

তাই হল। ২১শে যাবার পাকাপাকি ব্যবস্থা—মাঝে তিনটে দিন। একুশে রাত্রিবেলা প্লেন ছাড়বে, টমাস কুক থেকে বলে দিল। এ নিয়েও বিভ্রাট হতে যাচ্ছিল। হেল্থ-সার্টিফিকেট ও ভিসা ইত্যাদির জন্য অশেষ হাঙ্গামা ও টানাপোড়েন চলল শনিবার (২০শে) সমস্তটা দিন ধরে। কি ভাগ্যে ঐ পথে একবার প্যান-আমেরিকান এয়ার অফিসে গেলাম। জানা গেল, প্লেন ছাড়ছে সেই দিনই। রাত্রি সাড়ে-বারোটা, অতএব বিধানমতে তারিখটা একুশে হয়ে যাচ্ছে। রাত্রি দশটায় চৌরঙ্গি এয়ার-অফিসে হাজির হওয়া গেল। পাসপোর্ট দেখে শুনে সাহেব ফিরিয়ে দিল।

আপনার যাওয়া হবে না।

অপরাধ?

হংকঙে নামবেন তার ছাড়পত্র কই? এ তো দেখছি চীন ও দশটা আজেবাজে দেশের নাম লিখে দিয়েছে। হংকং না হয়ে যাবেন কী করে।

কিন্তু অতগুলো টাকা গুনে নিয়ে টিকিট দিয়ে দিল—তারা একবার দেখল না।

টমাস কুক ভুল করতে পারে, আমরা পারিনে। পরশু সোমবার দিন চেষ্টা করবেন—কিছু বাদ-সাদ দিয়ে ভাড়ার টাকা ফেরত দিয়ে দেব।

সাহেব মুখ ঘুরিয়ে পরের জনকে নিয়ে পড়ল।

আকাশ-পথে ঢের ঢের ঘুরেছি, কিন্তু এমন মুশকিলে তো পড়িনি। লটবহর কাঁধে করে কোন্ লজ্জায় বাড়ি ফিরি এখন।

সাহেব!

দুঃখিত। আমাদের কিছু করবার নেই। হংকং লিখিয়ে নিয়ে আসুন, তার পর কথা শুনব।

নিশিরাত্রে পাসপোর্ট-সংশোধনের জন্য কে জেগে রয়েছে কোন্খানে? ব্যাপারটা হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল।

'কমনওয়েলথ কান্ট্রিস' বলে এই যে রয়েছে—হংকং নিশ্চয় এরই মধ্যে পড়ে যাবে।

সাহেব সচকিত হয়ে ঘাড় ফেরাল।

আছে নাকি? কোথায়?

ঐ কথা কটা রবার স্ট্যাম্পে ছাপা ছিল, বাকি সমস্ত হাতের লেখায়। কি না কি ছাপা আছে—পড়ে দেখেনি সেটা।

ঠিকই আছে তবে। বড় দুঃখিত।

তবে যে সাহেব ভুল হয় না তোমার।

সাহেব যেন শুনতেই পেল না আমার কথা। মাল ওজন করতে বলল লোককে। আমার অনেক বই নিয়ে যাচ্ছি পিকিন য়ুনিভার্সিটিতে দেবো বলে। একটা প্যাকেট দেবব্রত শাস্ত্রীর কাছে গছিয়ে দিলাম—তা সত্ত্বেও ওজন কিছু বেশি হচ্ছে। কিন্তু সাহেব দৃকপাত করল না, আমার দিকে তাকালই না আর মুখ তুলে।

বাস এগারোটায় ওখান থেকে এরোড্রোমে রওনা হবে—হা হতোহস্মি! প্লেনের নাকি খবর নেই। বারোটা বাজল, একটা বাজল—বসেই আছি, ঝিমুচ্ছি বসে বসে।

চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে অহরহ পরিভ্রমণ করে। আরও কিছু নতুন উপগ্রহ জুটেছে —তার মধ্যে পি· এ· এ·, বি· ও· এ· সি ইত্যাদি কোম্পানির প্লেনগুলি। চাঁদের মতো এদের গতিও সুনির্দিষ্ট—কোন্ কক্ষপথে কোথায় কখন উদয় হবে, টাইম টেবিলে ঘণ্টা মিনিট ধরে ছাপা আছে। কি গোলযোগ ঘটেছে আজকে, প্লেন এসে পৌঁছচ্ছে না। নাঃ, ঈশ্বরের ব্যবস্থা অনেক ভালো মানুষের চেয়ে—চাঁদের টাইম-টেবলে কখনো তো গোলমাল দেখিনে!

রাত প্রায় দুটো। ফোন বেজে উঠল। উঠুন—উঠে পড়ুন বাসে। খবর হয়েছে।

ঘনান্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। প্রবল ধারায় জল নামল এইবার। বন্ধ দরজা-জানলা কলকাতা শহরের রাস্তায় অসহায় আলোগুলো জলে ভিজতে লাগল। ঝড়-জল মাথায় করে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাস ছুটছে।

ঘুমন্ত নগর-সীমান্তে সদাজাগ্রত দমদম। আকাশে উজ্জ্বল সতর্ক আলোর মালা চোখ মেলে আহ্বান করছে আকাশচারী আগন্তুকদের। আসছে যাচ্ছে সমুদ্র-পর্বত দেশ-দেশান্তর পার হয়ে—দিন-রাত্রির মধ্যে তার আর বিরাম নেই। পৃথিবীটা এখানে অতি-সঙ্কীর্ণ—আমেরিকা আর ইংলণ্ড নিতান্তই এপাড়া-ওপাড়া। দেয়ালে নানা দেশের পোস্টার হাতছানি দিয়ে ডাকে। লাউড-স্পীকার যখন তখন হাঁক দিচ্ছে, কায়রোর যাত্রীরা উঠুন এবার···চলে আসুন সিঙ্গাপুর···

দীর্ঘকায় শীর্ণদেহ এক বৃদ্ধ এলেন—কণ্ঠে মালার বোঝা, পিছনে অগণ্য লোক। ইনিও যাবেন আমাদের সঙ্গে? খালি পা, গান্ধিটুপি মাথায়—তুষারশুভ্র খদ্দরের ধুতি-কোর্তা পরনে। পিকিনের বিষম শীত—এই সজ্জায় সেখানে টিকবেন ইনি কেমন করে?

এঁর সঙ্গে চলেছেন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক গুজরাটের উমাশঙ্কর যোশি এবং অধ্যাপক যশোবন্ত প্রাণশঙ্কর শুকলা (গুজরাট বিদ্যাসভা)। পরে একদিন তাঁদের কাছে সবিস্তারে শুনেছিলাম সত্তর বছরের এই বুড়োমানুষটির কথা। রবিশঙ্কর ব্যাস—গুজরাটের আবালবৃদ্ধ সকলের কাছে মহারাজ নামে খ্যাত। গান্ধিজি তাঁকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করতেন—তিনিও গান্ধিজির পরম অনুরাগী। জন-উন্নয়ন বিশেষ করে হরিজন-সম্পর্কীয় কাজে নিবেদিতপ্রাণ। বল্লভভাই প্যাটেলের নামে ইস্কুল করেছেন।

মহারাজ শান্তি-সম্মেলনে যাচ্ছেন। পথের মধ্যেও লোকে কথা শুনতে চেয়েছে, তাই স্টেশনে স্টেশনে বক্তৃতা করে এসেছেন—কেন অতদূরে পিকিনের শান্তি সম্মেলনে যাচ্ছেন এই বয়সে। নিখিল পৃথিবীতে কখনো আর সংগ্রাম হবে না—এই চেষ্টা হোক আজ সকল দেশের সর্ব মানুষের। গান্ধিজিরও এই বাণী। কলকাতা শহরেও গোটা দশেক সভায় বলতে হয়েছে মহারাজকে। সেকালের রাজা-মহারাজেরই সম্মান পাচ্ছেন, দেখতে পেলাম। কাস্টমসের আড়গড়ার মধ্যে ঢুকেছেন,তখনো মালা দিচ্ছে ওদিক থেকে।

রাত্রির অন্ধকারে অবিরল বৃষ্টিজলের মধ্যে প্লেন সগর্জনে আকাশে উড়ল। অতিকায়

রুপার বিমান,—মেঘ ভেদ করে উঁচুতে, অনেক উঁচুতে চাঁদ-তারার এলাকায় ঢুং মেরে এরা ওড়ে। সাধারণ আর দশটা প্লেনের মতো মানুষের দৃষ্টি-সীমানার মধ্যে উড়ে বেড়ানো অপমানজনক এই-জাতীয় প্লেনের কাছে। ঝড়-জল দেখলে সেই স্তর ছাড়িয়ে আরও উপরে গিয়ে ওঠে, সেখানে গোলমাল বুঝলে নেমে এলো হয় তা বা খানিকটা। আপদ-বিপদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে জঠর-অভ্যন্তরে মানুষ ও মালপত্র নিয়ে মহাব্যোমে দিনরাত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।

তারা দেখা যায় কাচ দিয়ে—তারারা মিটমিট তাকিয়ে দেখছে। চোখ বুঁজে এল। হোস্টেস এসে চেয়ার নামিয়ে গায়ের উপর কম্বল ঢাকা দিয়ে গেল। চোখে না লাগে সেজন্য পাশের আলো নেবানো। মাঝখানের কয়েকটা আলো ক্ষীণ ভাবে জ্বলছে শুধু। ধরণীর অনেক উর্ধ্বে কত জনপদ অরণ্য পর্বত লঙ্ঘন করে রাত্রির শেষযানে গর্জন করতে করতে প্লেন ছুটছে।

ঘুম ভাঙল এক সময়। অলস চক্ষু মেলে পাশের কাচ দিয়ে তাকালাম। তখন উপলব্ধি হল, ঘরবাড়ি নয়—আকাশের উপরে শুয়ে শুয়ে চলেছি। খাড়া হয়ে বসলাম, চেয়ারটা দিলাম খাড়া করে। জানলা দিয়ে ভালো করে তাকাচ্ছি। ফর্সা হয়ে গেছে —সোনার রোদে ঝলমল করছে আকাশ। হাত-ঘড়িতে ছ'টা। উঃ, কত উঁচুতে এখন! মেঘপুঞ্জের উপর দিয়ে উড়ছি। ঘুমুচ্ছে পরম শান্ত মেঘদল আরাম করে রোদে পিঠ দিয়ে। ছোট্ট খাতাখানায় লিখে রাখছি। তুলি দিয়ে এঁকে রাখবার মতো ছবিটা। সে হয়তো হোসেন সাহেব (বম্বের শিল্পী মকবুল হোসেন) করছেন, আমার শক্তি নেই।

প্লেন নিচুতে নামছে। ভুবনের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত ছুটছিলাম এতক্ষণ—ক্রমশ নদী আর খালের রেখা প্রকট হতে লাগল। হাল্কা ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ—যেন পেঁজা-তুলো বিছিয়ে দিয়েছে আকাশ জুড়ে।

ব্যাঙককে নামছি এবার। মাটি আরো স্পষ্ট হচ্ছে! সুদীর্ঘ সরলরেখার মতো সংখ্যাতীত খাল—দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি বিস্তারিত। কয়েকটি মাত্র আঁকাবাঁকা—সেইগুলো স্বাভাবিক নদী, মাটি কেটে বানানো নয়। পুরোপুরি জ্যামিতির দেশ। চতুর্ভুজ ত্রিভুজ—সমস্ত ভূমিতল যেন টানা-টানা রেখায় ভাগ করা। আমাদের গ্রাম্য ইস্কুলে কাঁদনমাস্টার মশায় ব্লাকবোর্ডের উপর দাগ কেটে জ্যামিতি শেখাতেন—উপর থেকে সারা দেশটা তেমনি ছক-কাটা দেখায়।

অনেকেই জানলায় ঝুঁকে থাইল্যাণ্ড দেখছেন। 'শ্যাম' নামে জেনে এসেছি এ দেশকে এতকাল—চারিদিকে সুশ্যামল রূপ—ঐ নামই আপনি মুখে এসে যায়। অজস্র ধানক্ষেত—শেষ নেই, সীমা নেই। মাঝে মাঝে ঝুপসি গাছপালা—সুশোভন, শ্রেণীবদ্ধ। কাত হয়েছে প্লেন—কোমরে বেল্ট-বাঁধা, পড়ে যাবার ভয় নেই। নদী-নালা পথ-ঘাট ঘর-উঠোন—সমস্ত পৃথিবীটাই যেন কাত হয়ে পড়েছে এক দিকে। আরও নিচুতে নামছে প্লেন —খেলাঘরের মতো অগণিত ঘর-বাড়ি। না, আর লেখা চলবে না—ভূমিলগ্ন হল এবার···

দেখ কাণ্ড! ব্যাঙ্কক-এরোড্রোমের ঘড়িতে সাড়ে আটটা বেজে রয়েছে। ঘড়িতে দম দেওয়া আমারও অভ্যাস নয়, প্রায়ই বন্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু সে হল একলা একটি মানুষের ব্যাপার। এত লোকের আসা-যাওয়া এখানে—ছি-ছি, এইটুকু হুঁশজ্ঞান নেই! আমাকে হার মানিয়ে দিয়েছে এরা!

না হে, ঠিকই আছে। সূর্যের পথ বেয়ে পুবের দিকে উজান চলেছি আমরা। আমার ভারতে সাতটা এখন—এ রাজ্যে সাতটা বাজিয়ে দিয়ে সূর্য পশ্চিমে ছুটেছে দেড় ঘণ্টা আগে। চলেছি আমরা যে-সব ঘণ্টা-মুহূর্ত অতীত হয়ে গেছে সেই অঞ্চলে।

এমনি করে যদি যেতে থাকি। যেতে যেতে—ক্রমাগত গিয়ে—পৌঁছব কি জীবনের অতীত দিনগুলোয়, কৈশোর ও বাল্যের পরম বিস্মৃতির মধ্যে যে মণি-মাণিক্যগুলো ফেলে এসেছি বহুবর্ষ আগে ?

আজ সকালে অনেক মজুর কাজ করছে, খোঁড়াখুঁড়ি চলছে চতুর্দ্দিকে। ভাল রাস্তা হবে নতুন আরও ঘর উঠবে—তারই আয়োজন। আমার গ্রামের বিলে রৌদ্র-বৃষ্টির মধ্যে চাষীরা যেমন টোকা মাথায় কাজ করে, এখানকার মজুরদের মাথায় অবিকল সেই বস্তু। ব্যাঙ্ককে নেমে ফটো তুলবেন না কেউ খবরদার—প্লেনের ভিতর থেকেই বলে দিয়েছে। সত্যিই তো—কার কি মতলব বলা যায় না। আর আমরা হলাম এক নম্বর দাগি আসামি—নতুন-চীনে চলেছি। কম্যুনিস্টরা সেখানকার কর্তা। বললে কি হবে যে আমি লেখক মাত্র—রাজনীতিক নই। গল্প উপন্যাসে ভেবে-চিন্তে মিথ্যে কথা লেখার অভ্যাস আছে বটে, কিন্তু বেপোরোয়া মিথ্যা বলতে বুক কাঁপে। তাই রাজনীতি ধাতে সইল না ; রাজ্যপাট জুটল না, কলম পিশে খেতে হচ্ছে।

ছবি মনে আসছে, নেতাজি যেদিন নামলেন এখানে। হাজার হাজার মানুষ ভিড় করে এসেছিল বাইরের ঐ জায়গায়। আমারা ঘুণাক্ষরে জানতে পারিনি যে অনতিদূরে এত উৎসব সমারোহ ; আমাদের মুক্তির জন্য দেশি ফৌজ দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলটা জুড়ে কুচ কাওয়াজ করে বেড়াচ্ছে। চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এই বিমুক্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে গৌরবময় সেই অতীত ছবিটা মনে আনবার চেষ্টা করি।

কটমট করে তাকাচ্ছে এরোড্রোমের এক অফিসার। পেন্সিলে যৎসামান্য দাগ বুলাচ্ছি—সেই জন্যেই নাকি ? না ও হতে পারে, মনের মিথ্যে সন্দেহ হয়তো। থাক গে, কাজ নেই এখন আর লিখে। এই রৌদ্রালোকিত দ্বীপময় মহা-ভারতের ছবি মনের পরতে আঁকা রইল—আর কী প্রয়োজন ?

বিশ্রামাদির পর প্লেনের খোপে ঢুকে পড়েছি আবার। নতুন যাত্রীও উঠল এখান থেকে, কয়েকটি মেয়ে পুরুষ বিদায় দিতে এসেছে। রুমাল নাড়ছে তারা বেড়ার ওধারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে। একটা মেয়ে বড় সুন্দরী—বারম্বার চোখে রুমাল দিচ্ছে, কান্নায়-ভেজা করুন চোখের দৃষ্টি। আমরাও সেই অভিনন্দন গ্রহণ করলাম নিজেদের মনে করে, কাঁচের এধারে তাদের উদ্দেশ্যে রুমাল নাড়ছে আমাদের কেউ কেউ। প্লেন আবার আকাশে উঠে গেল।

অনেক বেলা—কিন্তু হাতঘড়িতে মাত্র সাতটা-পঞ্চাশ। ঘড়ি মেলাবো না এখন। আরও দূরে যাচ্ছি—হংকঙে সাড়ে-তিন ঘন্টার তফাত ভারতের সঙ্গে। সেইখানে একেবারে কাঁটা ঘুরাবো।

সিটের লাগোয়া একটুখানি টেবিল তৈরী করে নেবার ব্যবস্থা আছে। তার উপরে খাতা রেখে লিখে যাচ্ছি। পাশে পট্টনায়ক, ওড়িয়ার লোক—তিনিও লেখক। ওধারে মবলঙ্কর—তার ব্যাগের উপর পার্লামেন্টের মাননীয় স্পিকার, পরিচয় দেখে চমকে গিয়েছিলাম। পরে টের পেলাম স্পিকারের ছেলে তিনি। বাপের ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। মবলঙ্কর বারম্বার তাকাচ্ছেন আমার দিকে। অর্থাৎ, আকাশে উঠেও লেখা ছাড়ে না—কেমনতরো কলমবাজ হে ? তাই বটে। দীনেশ সেন মশায়কে শ্মশানে নিয়ে দেখা গিয়েছিল, তর্জনী ও বুড়োআঙুলে কালির দাগ। দুটো দিন আগেও তিনি লিখেছিলেন। তাঁর নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের তুলনা করতে চাইনে। মবলঙ্করকে বললাম, সাদা কাগজে বিস্তর কালি মাখিয়েছি—মরবার কালেও কিছু তার কলঙ্কচিহ্ন নিয়ে যবো, এইমাত্র কামনা।

মেঘ ভেদ করে ছুটেছি। বেলা দশটা তখন আমার ঘড়িতে। কত জনপদ কত পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে সমুদ্রের উপর এলাম। সুনীল প্রশান্ত মহাসাগর—এতটুকু বিক্ষেপ নেই। অন্তত উপর থেকে দেখতে পাচ্ছিনে। পরে একদিন পিকিন হোটেল খেতে খেতে আমাদের সহযাত্রী এক মহিলা এই সময় কার কথা বলছিলেন, মা গো! সমুদ্রের উপর দিয়ে যখন প্লেন যাচ্ছে, আমি তো ভয়ে কাঁটা। এখানে যদি পড়ে, তবে আর ফিরে যেতে হবে না। আমি জবাব দিয়েছিলাম, তা ঠিক। ডাঙায় যদি প্লেন ভেঙে পড়ে, বেরিয়ে এসে কোন এক বাড়ীর অতিথি হওয়া যেতো—কী বলেন?

ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেল। মহাব্যোমে ভাসতে ভাসতে আরাম করে গরম পরিজ খাচ্ছি। ভারি একটা অদ্ভুত কথা মনে আসে—কী মজা, ক্ষুধায় বিবর্ণ বিক্ষুব্ধ ধরিত্রী হাত বাড়িয়ে নাগাল পাবে না আমাদের। কিংবা বাজপাখির মতো পৃথিবী থেকে আরাম-আনন্দ ছোঁ মেরে নিয়ে নানান দেশের কয়েকটি বিচিত্র মানুষ শূন্যলোকে সংসার রচনা করেছি। অদূরে একজোড়া মোটা সাহেব মেম। মেমটিকে প্রথম দর্শনে লাবণ্য ও যৌবনবতী মনে হয়েছিল। তখন বেলা আটটা। এখন সাড়ে-দশটায় কপালে বলিচিহ্ন প্রকট হয়েছে, রূপ-যৌবন ঝরে পড়ে গেছে। বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি একবার লাউঞ্জে গিয়ে ঘুরে এলো। একেবারে প্রস্ফুটযৌবন—আগের চেয়েও চমকদার। ওদের লাবণ্য ভ্যানিটি ব্যাগে কৌটো ভরতি প্রচ্ছন্ন থাকে। সাহেব আর মেম দু'জনেই, দেখছি বাঁ হাতে কাজকর্ম করে। রাজযোটক আর কি! রাঙানো নখ মেম সাহেবের—আবার উখো জাতীয় এক বস্তুতে সাহেব নখ ঘসে ঘসে সাফ করে নিচ্ছে। আর কী কাজ এখন ওদের?

পাইলটের ঘর থেকে বার্তা এলো। প্লেন গতি বদলাবে এবার—চলছিল পূব দক্ষিণে, এবার থেকে পূব উত্তরে। নিচে তাকিয়ে দেখ প্রবাল দ্বীপপুঞ্জ। একটু নিচু দিয়েই চলেছে, যাতে সকলে দেখতে পায়। ঝুঁকে পড়েছিল সকলে জানলা দিয়ে। সমুদ্র-জলের উপর বুঝি অজস্র মুক্তা ছড়িয়ে রেখেছে, রৌদ্র-লোকে ঝিকমিক করছে। ঠিক নামই দিয়েছে মুক্তা দ্বীপপুঞ্জ।

চীন আর ভারত নিতান্ত পাড়াপড়শি। এবাড়ি ওবাড়ির মাঝখানে একটু খানি পাঁচিল—হিমালয় পর্বত। প্রাচীনেরা সমুদ্র দিয়ে যেতেন, আবার ঐ পাঁচিল গলেও যাতায়াত করতেন। বৌদ্ধ শ্রমণরা এবং হুয়েন সাং, ফা-হিয়ান প্রভৃতির নখদর্পণে ছিল ঐ সোজা পথ। পশ্চিমি অক্টোপাসরা তারপর ভারত, চীন ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া শত পাকে বেঁধে ফেলল—সোজা পথ একেবারে অগম্য হয়ে উঠল তখন থেকে। আর বন্ধ হল চিরকালের সহজ মেলা-মেশা। পাছে এরা সব একজোট হয়ে যায়, এই ভয়ে হয়তো। যুদ্ধের সময়টা সংক্ষিপ্ত পথ বেরিয়েছিল, আকাশ-পথে প্রায় ছ'ঘণ্টায় কলকাতা থেকে চীন পেঁছানো যেত। রাস্তাও তৈরি হয়েছিল আসাম ও বর্মা হয়ে চীন অবধি। সে সব বাতিল; এখন ব্রিটিশ-এলাকা হংকং ঘুরে চীন যেতে হয়। যাওয়া উচিত সোজাসুজি উত্তর মুখো—কিন্তু আমরা যাই দক্ষিণ পূর্বে, তারপর উত্তর-পূর্বে এবং হংকং পেঁছে পশ্চিমমুখো সেখান থেকে। অর্থাৎ নাক দেখানো হচ্ছে কান ও মাথাটা বেড় দিয়ে।

হংকঙের কাছাকাছি একটু বিপদ। চারিদিক ঘনান্ধকার। দিন-দুপুরে অকস্মাৎ দুপুর-রাত্রি নেমেছে। প্লেন উঠছে, নামছে। ঝড়-বাদলের সঙ্গে লড়াই চলছে ভিতর থেকে বুঝতে পারছি। গোত্তা মারছে ঝড়ের উপর, ঘূর্ণি গর্তের মধ্যে পড়ে হুহু করে নেমে যাচ্ছে এক—একবার। যাত্রীদের মুখ শুকনো নামতে নমেতে মাটিতে পড়ে যাব

নাকি এমনি ভাবে? মাটিই বা কোথায়, সমুদ্র-জল। অনেক নিচুতে নেমে এসেছে এবার। সমুদ্রের প্রান্তসীমা দেখা দিয়েছে। পাহাড়—ধাপে ধাপে অগণ্য ঘর-বাড়ি, আকাশ ছোঁয়া বড় বড় প্রাসাদ সমুদ্রের খাড়িতে সংখ্যাতীত নৌকা-জাহাজ, এপারে ওপারে বিচিত্র জনপদ। হংকঙে এসে গেছে তবে। ঐ তো বিমানঘাটি। মানুষজন সুস্পষ্ট দেখছি, চলাফেরা করছে। শহরের উপরে চক্রাকারে ঘুরছি আমরা—মৃত্যুর পর নিরালম্ব প্রেতদলের মতো। প্লেন আবার উঁচুতে উঠে দূরে চলে গেল। আধ ঘণ্টারও বেশ এমনি লক্ষ্য হীন ঘুরে ঘুরে ফাঁক বুঝে এক সময় নেমে পড়ল। ঠিক হংকং নয়, হংকঙের উল্টো পারে—কাই-তেক বিমানঘাটি। ঘড়িতে একটা। সাড়ে-তিন ঘণ্টা এগিয়ে সাড়ে-চার করে দিলাম।

কাস্টমসের আড়গড়া পার হয়ে বেরুচ্ছি—

আসুন। ভারত থেকে আসছেন আপনারা? ক'জন আজকে! উঠে পড়ুন ঐ বাসে। প্যান-আমেরিকান এয়ার-টারমিন্যাল নিয়ে যাবে। আমরা থাকব সেখানে। পথে অসুবিধা হয়নি তো? আচ্ছা—হোটেলে গিয়ে কথাবার্তা হবে। কয়েকটি চীনা যুবক। ইংরেজি ভাষায় তাঁরা আপ্যায়ন করলেন। সিংহুয়া সংবাদ প্রতিষ্ঠানের লোক—হংকঙে অভ্যর্থনার ভার এদের উপর।

২

ছোট্ট দ্বীপ হংকং। দ্বীপের আসল নাম ভিক্টোরিয়া। চীনের মূল ভূখণ্ড আর দ্বীপের ব্যবধান অতি সামান্য। মাইল দুয়েক হবে বড় জোর। এপারে জায়গাটার আসল নাম কৌলুন। এখানেই আছি আমরা—কৌলুন হোটেলে। এই কৌলুন—এবং চীনের মূল ভূমির আরও মাইল ত্রিশেক ব্রিটিশের দখলে। অবাধ বন্দর হংকং—আমদানি জিনিসপত্রের উপর ট্যাক্স লাগে না, তাই অকল্পিত রূপ সস্তা। কিন্তু নতুন কারো পক্ষে সুবিধা নেওয়া শক্ত। দোকানদারদের চক্ষুলজ্জার বালাই নেই—ডবল কি তারওবেশি দর তো হেঁকে বসল তার পর কত কমাবে কমাও। এক নজর দেখেই খদ্দেরের ধরন বুঝতে পারে। গায়ক ক্ষিতীশ বসু ছিলেন আমাদের দলে—তিনি এক ঘড়ি কিনলেন। ঘড়ির গায়ে দর সাঁটা আছে পঁয়ষট্টি ডলার—সম্ভ্রান্ত দোকান, সিকি পয়সাও নাকি ওর থেকে কম হবার জো নেই। সেই ঘড়ি শেষ অবধি রফা-নিষ্পত্তি হল একত্রিশ ডলারে। সকলেই জিনিসপত্র কিনেছি দরাদরি করে—তবু শেষ পর্যন্ত খুঁতখুঁতানি থেকে যায়, আরও হয়তো কমে পাওয়া যেত।

এই আন্তর্জাতিক বন্দরে হাজার রকম মানুষের আনাগোনা। যেখানে সেখানে বিজ্ঞপ্তি ঝুলছে—পকেটমার সাবধান! খেয়া ষ্টিমারে পার হব, ভাড়া কত জিজ্ঞাসা করছি—কাউণ্টারের ভদ্রলোক বললেন, ব্যাগ সামাল করুন আগে। কৌলুন হোটেলের ম্যানেজার দম্ভোক্তি করলেন, মানিব্যাগটা অমনি আলতোভাবে রেখে খানিকক্ষণ ঘুরে আসুন তো রাস্তায়—তার পরেও ব্যাগ যদি আপনার থাকে, তবে বলব বিষম বাহাদুর।

শুধু কি ওঁরাই, দেশ-বিদেশের যত বেপরোয়া আর স্ফূর্তিবাজেরা এসে জোটে। আগের সাংহাইও ছিল এমনি—নতুন চীন ঝেঁটিয়ে পরিচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাই ময়লা আরো বেশি জমেছে এখানে। ভাল লোক যে নেই, তা বলিনে,; কিন্তু পাপচক্ষে দেখতে পেলাম না। হৈ হুল্লোড় চলছে অহোরাত্রি। মদ ভারি সস্তা এবং মালেও অতি চমৎকার—এমনটি নাকি ত্রিভুবনে আর নেই। আমি নিতান্তই 'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস'—তাই হলপ করে কিছু বলতে পারব না। তবে রসিক জনে বলেন, স্বমুখে শ্রবণ করেছি। আর পণ্যমেয়েদের ভিড়ে দিনমানেই পথে চলা দায়। এটা স্বচক্ষে দেখা।

যাবার সময় একটা রাত্র মাত্র, কিন্তু ফিরতি মুখে পাঁচ-পাঁচটা দিন এখানে কাটাতে হয়েছিল কলকাতার প্লেন না পাওয়ায়। সেই সময় আসল মূর্তি দেখেছি। পালাই-পালাই ডাক ছেড়েছিলাম। অথচ চীন ভূমিতে দিন চল্লিশেক কাটিয়ে এসেছি—বলুক না ওরা, আরও গিয়ে থাকতে রাজি আছি। হংকঙের ব্যাপার আগেভাগে তাড়াতাড়ি সেরে নিচ্ছি। চীনের প্রোজ্জ্বল কাহিনী শেষ করে তখন এসব বলবার আর রুচি হবে না। আমেরিকান ডলার ভাঙিয়ে হাতে বিস্তর টাকা। সমস্ত নিঃশেষে খরচ করতে হবে, এই মহৎ সঙ্কল্প নিয়ে পথে বেরিয়েছি। আমি ক্ষিতীশ, শিল্পপতি বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী নীলিমা দেবী এবং মাদ্রাজের সিনেমা-ডিরেক্টর কৃষ্ণস্বামী। ঘোরা-ঘুরিই সার, কিছুই কেনা যাচ্ছে না—দর শুনে আঁতকে উঠতে হয়।

বৈদ্যনাথ এমনি সময় আঙুল দেখালেন, ভারতীয় পতাকা উড়ছে। নির্ঘাৎ সেখানে ভারতের মানুষ থাকে। সওদার ব্যাপারে তাঁরা সাহায্য করবেন। তাই বটে! একটা ব্যাঙ্ক—ঢুকেই পারেখ মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হল। অত্যন্ত ভদ্র ও সদাশয়। হংকঙের পথে-ঘাটে সহযাত্রী হয়ে আমাদের প্রচুর সাহায্য করেছেন। একটি বাঙালীও আছেন—শ্রীযুক্ত মিত্র। কিন্তু কী কারণে জানিনে, তাঁকে তেমন কাছাকাছি পাওয়া গেল না।

রূপসী হংকং। স্টার কোম্পানির খেয়া-স্টীমার অবিরত এপার-ওপার করেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় দুটো ক্লাস—স্টিমারে ঢুকবার পথও দুটো। প্রথম পথে ঠিক উপরে পেঁছে যাবেন, দ্বিতীয় পথে নিচের তলায়। ঢুকবার পথে ভাড়াটা দিয়ে যান জানলার খোপে, তার পর জাহাজে চেপে বসুন। বসবার আরামপ্রদ ব্যবস্থা। কতলোক যে পারাপার হচ্ছে, তার সীমাসংখ্যা নেই। এ ছাড়া মোটর-লঞ্চ ও অন্যান্য খেয়ার ব্যবস্থা আছে এদিকে-সেদিকে। ইচ্ছে হলে মোটর-লঞ্চ নিয়ে বেরোন প্রমোদ-ভ্রমণে—ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া ঠিক করা আছে। পাহাড়ের উত্তুঙ্গ চূড়ায় অসংখ্য অট্টালিকা। ট্রাম আছে সেই চূড়া অবধি পেঁছিবার—মোটরের পথও আছে। ট্রামে যাওয়াটা ভারি মজার। পারেখ সঙ্গী আছেন—তার কথামতো রাত্রিবেলা চলেছি। আলোকোজ্জ্বল এপার-ওপারের শহর ও সমুদ্র অপরূপ দেখাচ্ছে।

এই পিক-ট্রাম [Peak Tram] এক বিস্ময়কর শিল্পকীর্তি। জায়গায় জায়গায় রাস্তা একেবারে খাড়া উঠে গেছে—আমরা কাত হয়ে পড়েছি বেঞ্চিতে। পাতলা জামা গায়ে ছিল—পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে উপরে উঠে হি-হি করে শীতে কাঁপছি। কন্‌কনে হাওয়া বইছে গিরি-চূড়ায়। কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে দেখলাম। নেমে আবার উষ্ণলোকে এসে বাঁচি।

আর এক দ্রষ্টব্য স্থান টাইগার পার্ক। সেখানে বুদ্ধ-মন্দির আছে—টাইগারপ্যাগোডা নামে খ্যাত। প্রচুর বৈভবশালী এক চীনা ব্যবসায়ীর কীর্তি, ভদ্রলোকের বাড়িও এই পার্কের মধ্যে। কাজ শেষ হয়নি, যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ চালাবেন এই তার ইচ্ছা। প্রতি বছর নিয়মিত ভাবে কাজ চলেছে। শুনলাম, সিঙ্গাপুরে তাঁর বড় ব্যবসা—সেখানে অবিকল এই রকম আর একটা পার্ক তৈরী হয়েছে। বাঘ, ড্রাগন—এসব অতি পবিত্র। চীন অঞ্চলে বাঘের নাম জুড়ে দেওয়া হয়েছে সেই জন্যে। পাহাড়ের উপর পাথর কেটে তৈরি। দেব-দেবীর মূর্তি—ওঁদের পৌরাণিক দেব দেবীর সঙ্গে আমাদের দেবতাদের আশ্চর্য রকম মিল। দেয়ালে দেয়ালে অসংখ্য ছবি—আর বিস্তর সদুপদেশ। জুয়াখেলা, আফিং-চরস খাওয়া ও গণিকা-সঙ্গের দোষ দেখানো হয়েছে ছবির মধ্য দিয়ে। নতুন-চীনে এসব পথের পথিক কেউ নেই আজকাল, হংকং বলেই ছবি দেখানোর প্রয়োজন হয়েছে। পাপ করলে মৃত্যুর পর কি রকম নরকভোগ করতে হয়, নানা বীভৎস মূর্তির

মাধ্যমে তা-ও আছে। বাংলা দেশে পটুয়ারা পটের শেষ দিকে পাপের শাস্তি—সেই ব্যাপার।

সওদা করতে গিয়ে এক চীনা দোকানদারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। পিকিন থেকে ফিরছি শুনে বলল, আচ্ছা কী দেখে এলে—

পাঁচ-দশ মিনিটে বলবার বস্তু নয়। তবু বললাম দু-এক কথা। হংকং আর আসল চীনে কতটুকুই বা দূরত্ব! অথচ কিছুই মেলে না—আকাশ আর পাতালের পার্থক্য। তোমরা যেন চীনের মানুষ নও এ আর একটা দেশ। দোকানি বলল, বাছাই করা কতগুলো জিনিস তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছে, আসল কিছুই জানো না। লোকের ভারি কষ্ট, সব-কিছু ওরা কেড়েকুড়ে নিচ্ছে।

গলায় আঙুল ঘুরিয়ে কাটবার ভঙ্গিতে বলল, টাকা-পয়সা থাকলেই সাবাড় করে দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে—

এসব নতুন নয়, দেশে থাকতেও এমন অনেক শুনেছি। উ-ইয়ুন-চু'র সঙ্গে একত্র বেড়ালাম, একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া (সম্প্রতি মারা গিয়েছেন, কিছু দিন আগে যে চীনা সাংস্কৃতিক দল এসেছিলেন, তাঁদের কাছে শুনলাম। আহা, অতি মহাশয় লোক!) পাঁচটা ফ্যাক্টরির মালিক অথচ নতুন-চীনের বিশিষ্টদের একজন তিনি—অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য। এমন ধনী আরও অনেক আছেন। তবে বেপরোয়া মুনাফা লুঠবার উপায় নেই—এই যা। কিন্তু শুনছে কে? প্রোপাগাণ্ডার বিচিত্র মহিমা—অতি নিখুঁত তার কারুকর্ম। কান ও মন এমন বিষিয়ে দেয় যে এত কাছে থেকেও সত্যি খবর এরা শুনতে পায় না।

আবেগে একটা কথা না বলে পারিনে। ঐ যে মেয়েগুলো সেজেগুজে রং মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে—দিন নেই রাত নেই, শীত নেই, বর্ষা নেই, নানান দেশের বদমায়েশরা কয়েকটা ডলার ছুঁড়ে দিয়ে ছিনিমিনি খেলছে ওদের নিয়ে—ওরা তোমার নিজের জাত নয়, চোখের উপরে দেখছ তবু অপমান গায়ে বেঁধে না তোমাদের?

লোকটা জবাব দিল না, হিসাবপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমার মুখের দিকে আর তাকাবে না বুঝতে পারছি। কী-ই বা আছে জবাব দেবার!...কোন জন্মে আমি কোট-প্যাণ্টলুন পরিনে, এবারে চীনের বন্ধুরা এক গরম স্যুট উপহার দিয়েছে। বাক্সবন্দি ছিল জিনিসটা। হংকঙে এসে দুদিন পরে সেটা পরলাম। পিকিনের অত শীত ধুতি-পাঞ্জাবী-আলোয়ানে কাটিয়ে দিয়েছি, আর হংকঙের প্রায়-গরম আবহাওয়ায় ঐ ভারি উষ্ণ সজ্জা গায়ে চাপিয়ে সাহেব সাজবার প্রয়োজন হল।

বুদ্ধিটা ক্ষিতীশের। মাল ওজন করতে গিয়েছিলাম এয়ার-অফিসে। চক্ষু কপালে উঠল। ত্রিশ কিলোগ্রাম বেখরচায় নিয়ে যেতে পারব। সেটা বাদ দিয়েও এত ওজন উঠেছে যে অতিরিক্ত শ' দুয়েক টাকা মালের ভাড়া দিতে হবে। অনেক জিনিস উপহার পেয়েছি, আরও অনেক কিনেছি ওঁদের উপহারের টাকায়। সাতটা বইয়ের প্যাকেট তবু ডাকযোগে পাঠিয়ে এসেছি পিকিন থেকে।

কমাও—যে উপায়ে যত পারো ওজন কমিয়ে ফেল। ক্ষিতীশ বলল, ধুতি পাঞ্জাবির কি-ই বা ওজন—ওই স্যুটে সজ্জিত হয়ে কাঁধে ওভারকোট চাপিয়ে প্লেনে উঠবেন, তাতে বিস্তর ওজন কমে যাবে।

চমৎকার যুক্তি। কিন্তু স্যুট পরা আগে ভাগে একটু রপ্ত করে নেবার দরকার। নতুন চীনের সার্বজনীন পোশাক এই রকম—কাটছাট অবিকল তাই। আমিই বলেছিলাম দেবে তো দাও তোমাদেরই মতন। পোশাক পরে তোমাদের এই বিপুল উদ্দী-

পনার ছোঁয়াচ যদি লাগে মনে।

সাজসজ্জা সমাপন করে বেরুনো গেল। হোটেলের লোকজন কেমন কেমন চোখে আমার দিকে তাকায়। রাস্তায় পড়েছি, সেখানেও তাই। ভালই তো, পোশাকের দৌলতেই না হয় হংকং শহরে একটু অসাধারণ হওয়া গেল।

ব্যাপার কিন্তু আরো কিঞ্চিৎ ঘোরালো। এয়ার টার্মিনাসে প্লেনের খবরা খবর নিতে গিয়েছি। জাতে ইংরেজ কি ইয়াঙ্কি জানিনে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, মাও সে তুঙের তুমি খুব বন্ধু বুঝি?

বিরক্ত হয়ে বললাম, নিশ্চয়। নতুন-চীন যে দেখবে, সেই তাঁর বন্ধু হয়ে যাবে।

সে কিছু বলল না আর, নিজের মনে কাজ করতে লাগল। এক চীনা কর্মচারী এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত দিল। আর একজনকে কী বলছে আমার অবোধ্য ভাষায়। অবস্থাটা অপমানজনক মনে হল। কাঁধ থেকে সজোরে লোকটার হাত ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, কী বলতে চাও তুমি!

গটমট করে বেরিয়ে এলাম।

প্যাং টাক-সেং সিংহুয়া সাংবাদিক দলের নেতৃস্থানীয়—হংচঙে ওদেরই তত্ত্বাবধানে আছি। তাকে ঘটনাটা বললাম। প্যাং গম্ভীর হল। বলে, ও পোশাক খুলে রাখো —প্লেনে উঠবার সময় পোরো। তার আগে দরকার নেই। চারিদিকে কত শত্রু ঘুরছে, কত দেশের গুপ্তচর! বেশি প্রকট হয়ে কাজ নেই এ জায়গায়।

স্তব্ধ হয়ে রইল এক মুহূর্ত। তারপর ধীরে ধীরে বলে, হংকং আমাদের নয়। দেখ না, আমরাই কি রকম অতিথি-জনের মতো রয়েছি।

ভৌগোলিক হিসাবে এক বটে, হংকং তবু চীন নয়। আমাদের যেমন পণ্ডিচেরি বা গোয়া—উঁহু, এর চাইতে নিঃসম্পর্কিত। ১৯৫০ অব্দে বিরাট ষড়যন্ত্র হয়েছিল নতুন চীনের নায়কদের মেরে ফেলবার জন্য। তার উদ্ভব শুনতে পেলাম, এই জায়গাতেই। কোন্ মানুষ কী মতলবে ঘুরছে, কে বলবে? কোরিয়ার লড়াইয়ে চীনের ভল্যান্টিয়ার-দের উপর বোমা মেরে সৈন্যরা এইখানে হাত পা মেলে বিশ্রাম নেয়। তার জন্য, আরামপ্রদ ঘরবাড়ি ও নানাবিধ ব্যবস্থা রয়েছে। কত মতবাদের খবরের কাগজ, খবরের যোগানদারই বা কত বিচিত্র ধরনের। হংকঙেই এক কাগজে বেরিয়েছিল, পিকিনের শান্তি সম্মেলনটা কম্যুনিষ্টদের একটা হৈ চৈ মাত্র। মলোটভ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। খবর তৈরি করতে জানে বটে। চিরজন্ম তো গল্প উপন্যাস লিখে গেলাম—কিন্তু লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করি, এতদূর কল্পনার দৌড় আমাদের নেই।

হংকং চীন নয়—নতুন চীনে পা ছোঁয়াবার আগেই টের পেয়েছিলাম। হোটেলে সেই একটি রাত কাটিয়ে গিয়েছিলাম—তখন ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল, পট্টনায়ক পাশের শয্যায় বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছেন। চারতলার বারান্দার অনেক নীচে পিচ-ঢালা ঝকঝকে রাস্তা। সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম অনেকক্ষণ। ওপারে পাহাড়ের উপরে লাল নীল সাদা আলোর বিচিত্র মালা পরে হংকং শহর রূপের বিভায় বিত্ত আর আনন্দ পিয়াসী দূর দূরান্তরের মানুষজনকে হাতছানি দিয়ে প্রলুব্ধ করছে।

মোটরের সুতীব্র হেডলাইট জ্বলে উঠল হঠাৎ। সেই আলোয় দেখলাম, বৃষ্টি-স্নাত রাস্তার উপর সৈন্য আর মেয়ে কতকগুলো। আর রিকশা ছুটোছুটি করছে শিকার ধরবারি আশায়। রিক্সাওয়ালারা জাতে চীনা, কালো হাফপ্যান্টপরা—আলোয় ঝকমক করছে তাদের ফরসা গায়ের রং। অন্তরাত্মা অবধি কেঁপে ওঠে। নিশিরাত্রে মনে হল, শহর নয়, ভয়াল অরণ্য, ডোরা-কাটা বাঘের দল রক্ত ক্ষুধায় ক্ষেপে উঠেছে।

দরিদ্র সর্বরিক্ত হতভাগ্য মেয়েরা, আর লালসাদুর্বল কাপুরুষ যুবার দল। অবিরল বৃষ্টিধারার মধ্যে উচ্ছৃংখল নরনারীর উৎকট হাস্যধ্বনিতে আকাশব্যাপ্ত হাহাকার উঠেছে যেন। প্রশান্ত মহাসমুদ্রতীরে আলো ঝলমল রূপসী হংকং নগরীর নিঃসহায় নিশীথ ক্রন্দন।

(৩)

সমুদ্রের পাড়ি। পারঘাটার এ-ধারে রেলস্টেশন। জলের একেবারে উপরে স্টেশনটা। সকালে ৭-২০ মিনিটে ট্রেন ছাড়ল।

খাড়ির কিনারা ধরে গাড়ী চলেছে। ডানদিকে জল, বাঁদিকে শহর। শহর শেষ হয়ে বস্তি অঞ্চল। জলাশয় ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে। দুই পাহাড়ের মাঝখানে এসে পড়ছি। পাহাড়, পাহাড়—দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে আছে রক্তাভ পাহাড়ের সারি। সহসা অবারিত হয়ে গেল ডানহাতের দিকটা। বিস্তীর্ণ জলরাশি—জলের উপর নৌকা-স্টিমার। কী গাড় নীল জল! সীমাহীন প্রশান্ত মহাসাগর হাত বাড়িয়ে মহাচীনের এক মুঠো মাটি আঁকড়ে ধরেছে। তারই নাম হংকং।

নাদুসনুদুস কার্তিক ঠাকুরটি—আজ্ঞে না, খাঁটি নাম কিছুতেই বলছি নে। বাপ-মা ঠাহর পান নি, ভাবীকালে ছেলের চেহারা এমন খুলবে। তাই অন্য একটা নাম রেখে-ছিলেন। কার্তিকই ভদ্রলোকের নাম হওয়া উচিত।

একদিককার বেঞ্চি থেকে কার্তিক ঘাড় লম্বা করে ঝুঁকে পড়ল।

কী লিখছেন?

খরচগুলো টুকে রাখছি—

খরচ আবার কি? হেঁ-হেঁ, ও বললে কী শুনি? আমি তবু ট্রাউসার কিনলাম আঠারো ডলারে। আপনি কৃপণের জাসু, খরচ করার ভয়ে বেরুলেন না মোটে। দেখেছেন আমার ট্রাউসার?

আমি একা নই এবং শুধুমাত্র ভারতীয়েরা নয়। কার্তিকের ট্রাউসার অনেক জনকে দেখতে হয়েছে। এবং শুনতে হয়েছে দাঁও মেরে ঐ বস্তু আঠারো ডলারে কেনবার আদ্যন্ত ইতিহাস। সেই ব্যাপার আবার উঠে পড়ে বুঝি! ভয়ে ভয়ে মুখ তুলে তাকালাম।

না, কার্তিকের মতি এখন অন্যদিকে। বলে, বই লিখছেন তা বুঝতে পেরেছি। আমার কথা লিখবেন কিন্তু।

ভোঁতা-বুদ্ধি এই মানুষগুলোর ভারি ঝোঁক, ফাঁকতালে নাম করে নেবার। নামের নেশায় কোন এক মওকায় হঠাৎ বীরত্বের কাজও করে বসে। কিন্তু আপাতত হাত এড়ানোর দরকার। মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। বললাম, শ—মশায়ও এক ট্রাউসার কিনেছেন। বেশ ভালো জিনিস।

দেখেছেন আপনি, ভালো আমার চেয়ে?

তাই তো মনে হল—

ব্যস। মুহূর্তে উধাও। শ—ওদিকে, কামরার একেবারে শেষ প্রান্তে। অতএব নিশ্চিন্ত আপাতত।

পাহাড় আরো ঘনীভূত হয়েছে। টানেল পার হচ্ছি মাঝে মাঝে। একটা টানেল অত্যন্ত বড়। আলো জ্বলে উঠল কামরার মধ্যে। চলেছে তো চলেইছে—শেষ আর হতে চায় না টানেল।

স্টেশন—কী নাম? চীনা অক্ষর—ইংরেজিতেও লেখা আছে ওদিকে। সা দিত।

একটা মেয়ে ঐ পাহাড়ের উপর পা ছড়িয়ে বসে রেলগাড়ি দেখছে। জেলে জাল ফেলছে খাড়ির জলে। পাল-তোলা কত নৌকো যাচ্ছে সারবন্দি—মেঘনার উপর দিয়ে এমনি-ধারা বহর দেখছি। কলাগাছ, ঝাউগাছ। নাম না-জানা রকমারি গাছের জঙ্গল কলকে-ফুলের মতো হলদে হলদে ফুলে আলো হয়ে আছে। পাহাড়ের গা বেয়ে পিচ-ঢালা এক পথ উঠে গেছে কচ্ছপের সমসৃণ পিঠের মতো। খাড়ি চওড়া হচ্ছে ক্রমশ। বাঁদিকের উত্তুঙ্গ পাহাড় থেকে কলোচ্ছলিত ঝরনা এ-পাথর থেকে ও-পাথরে নাচতে নাচতে নেমে এসে আমাদের রেললাইনের নিচে গুঁড়ি মেরে খাড়ির জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে—পাটনার দৈনিক 'নবরাষ্ট্রের' সম্পাদক দেবব্রত শাস্ত্রী। শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল কংগ্রেসের কাজ করেছেন ; এখন আর কংগ্রেসে নেই। চমৎকার মানুষ, আমার সঙ্গে খাতির জমেছে কলকাতা থেকেই। একবার গিয়ে তাঁর কাছে দাঁড়ালাম।

শাস্ত্রী বলেন, স্বর্গ না পাতাল—কোথায় চলেছি বলুন তো ?

জবাব দিলাম, মর্তেই নিঃসন্দেহে। জড়বাদীর দেশ বলে মাটি কিছু কঠিন হতে পারে।

সারা দেশ রক্তে ভেসেছে এই তো সেদিন অবধি—

মাটিতে দাগ আছে কি না, খুঁজে দেখতে হবে। এত দেশের এতগুলো কড়া চোখ নিশ্চয়ই এড়াতে পারবে না।

মনোভাব অনেকেরই এমনই। কৌতূহল, সন্দেহ—একটু-আধটু আতংকও যে নেই, এমন কথা হলপ করে বলতে পারি নে। সবজান্তা হিতৈষীদের অভাব নেই, ঘরে বসেই এক এক দিক্‌পাল। যাত্রার মুখে তাঁরা মুষলধারে সদুপদেশ ছেড়েছেন।

সমাজতান্ত্রিক নতুন ব্যবস্থা—দেশজোড়া দেখবে শুধু এক বিরাট মেশিন, মানুষ-গুলো সেই মেশিনের ইস্ক্রুপ-নাট। ব্যক্তি-সত্তা বলে কিছু আর নেই। কথাবার্তা সামাল হয়ে বোলো হে, দেখে বুঝে চলাফেরা কোরো। বেফাঁস কিছু ঘটলে কচ করে মুণ্ডটা ধড় থেকে নামিয়ে নিতে বাধে না ওদের…

কত রকমের উদ্ভট ধারণা। শুধু প্রয়োজন ছাড়া আর কিছু নেই নাকি সেখানে। ফুলের মধ্যে হয়তো ফুলকপি—মানুষের যা ক্ষুধা-নিবৃত্তির কাজে লাগে। হাসি আনন্দ-হীন উৎকট বস্তু সর্বময়। যাওয়া পণ্ডশ্রম ওসব দেশে। রীতিমতো ওজনদার পর্দায় ঘেরা চতুর্দিক। সে পর্দার যেটুকু ওরা প্রয়োজন মাফিক তুলে ধরবে, ঝাপসা ঝাপসা আলোয় তাই দেখে এসো। আর শুনে এসো দম দেওয়া পুতুলের মতো কলের মানুষ-গুলোর মুখে কয়েকটি শেখানো কথা। এই মাত্র, এর বেশি নয়।

সে যাই হোক, আর যে লেখা চলে না। প্লেন নয়, রেলগাড়ি। জোরে ছুটেছে। যে চীনে চলেছি, হাতের বাংলা অক্ষর এখন থেকেই তার লিপির প্রতিরূপ নিতে শুরু করেছে। লেখা অবশ্য চালিয়ে যেতে পারি, কিন্তু পড়ে দেবে কে ?…

পাহাড় জমে আসছে, খাড়ির ওপারেও পাহাড়। ক্রমশ পাহাড়-ঘেরা হ্রদ হয়ে দাঁড়াল ঐ খাড়ি। পাহাড়ের ছায়া পড়ে মসীকৃষ্ণ দেখাচ্ছে জলের রং। জলের নীচে থেকেও ছোট ছোট পাহাড় মাথা উঁচু করছে। পাহাড়ের গায়ে একেবারে হেলান দিয়ে ঘুমুচ্ছে এক নিশ্চল স্টিমার—চিমনি দিয়ে মৃদু ধোঁয়া উড়ছে ঘুমন্ত জনের শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো।

তারপর কখন এক সময়ে হ্রদ থেকে দূরবর্তী হয়ে পড়েছি, জল আর কোন দিকে নেই। সমতল জনপদ, একটা দুটো পাহাড় কদাচিৎ। স্টেশন, হাট বাজার, ইস্কুল-মাঠ সাঁ সাঁ করে পার হয়ে যাচ্ছি। সীমান্তে এসে গাড়ির গতি স্তব্ধ হল। আর এগোবার এক্তিয়ার নেই।

লাউ-হ্ন—স্টেশনের নাম। ব্রিটিশ-প্রভুত্বের শেষ। মহাচীনের প্রান্তভাগে কীটদষ্ট কয়েকটা টুকরো এমনি রয়ে গেছে এখনো। অনেক দিন ধরে বিস্তর আরাম করেছে, যাই যাই করে হাই তুলছে।

ছোট্ট খাল। খালের উপর পুল। খাল-পারে অনেক দূর অবধি কাঁটাতারে ঘেরা। নতুন-চীনের আরম্ভ পুলের ও-পার থেকে।

রোদ প্রখর। মালপত্র নামিয়ে স্তূপাকার করে রেখেছে। তারই মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে যে যার জিনিস দেখে নিতে ব্যস্ত। শুধু চোখের দেখা দেখলেই হল যে ঠিকমতো সমস্ত এসে পৌঁছেছে। আর কোন হাঙ্গামা নেই। এখান থেকে বয়ে নিয়ে ও-পারের গাড়িতে তোলা এবং ক্যাণ্টনে পৌঁছে দেওয়ার যাবতীয় দায়ঝক্কি ওদের। সর্বদা হাতের কাছে প্রয়োজন, গাড়ির গাদার মধ্যে দিলে চলবে না, সেই ক'টি জিনিস শুধু হাতে করে নিন।

আমি ছোট স্যুটকেসটা নিয়েছি। কে আবার ওর থেকে আজেবাজে জিনিস বের করে আলাদা ভরে দিতে যায় এখন? কিন্তু আলস্যটুকু না করলেই ভাল হত। ভাবা উচিত ছিল, এক-এলাকা থেকে একেবারে পৃথক আর এক এলাকায় ঢুকছি—পথ কিছু বেশিই হবে। আরও মুশকিল, কাস্টমসের নানা আগড় অতিক্রম করে গজেন্দ্রগমনে এগুতে হচ্ছে। মাথায় চড়বড়ে রোদ—ছুটে গিয়ে উঠব ও-পারে, তার জো নেই।

পুলের মাঝামাঝি এসে পিছনে তাকাই একবার। ছোট্ট খাল—এপারে-ওপারে তবু কি দুস্তর ব্যবধান! কার্তিক পাশে এসে পড়েছে। বলে উঠল, ট্রাউসার পনেরো ডলারে কিনেছে বটে, কিন্তু কাপড় অতি খেলো। সওদায় আমার সঙ্গে পারবে? উনি তো শ—, ওঁদের মাথা রাজাগোপালাচারীকে ডেকে নিয়ে আসুন না!

পুল পেরিয়ে নতুন-চীনের মাটিতে পা দিলাম। উঁচু টিলার উপর এখানে একজন ওখানে একজন বন্দুকধারী সৈন্য ঘাঁটি আগলাচ্ছে। নিচের মাঠে শুয়ে বসে ছিল একদল —গায়ে পোষাক কিন্তু হাতে অস্ত্র লেই। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে তারা হাততালি দিচ্ছে। হাততালি দিয়ে অভ্যর্থনা করছে আমাদের। আর ওদিকে তারের বেড়ার ওধারে পদ্মবন। পদ্মফুলের সময় এখন নয়, ডাঁটার উপর বড়বড় পাতা ছত্রাকারে মেলা। দুলছে প্রসন্ন বাতাসে।

না দাদা, ঠকিয়েছে আমায়। তাই ভাবছিলাম এতক্ষণ ধরে। কাপড় হয় তো উনিশ-বিশ—গালে চড় মেরে আমার কাছ থেকে আঠারো ডলার নিয়ে নিল। ট্রাউসারের দাম পনের-ষোলর বেশি হতেই পারে না।

দ্রুত হেঁটে দূরবর্তী হই কার্তিকের কাছ থেকে। এ হাহাকার শুনতে পারি নে। আরও যে কত ঠকে যাচ্ছ, হুঁশ নেই। দূরবিস্তৃত প্রান্তর, প্রান্তর-শেষে ছবির মতন ঐ সব ঘরবাড়ি, উদার সূর্যালোক, আনন্দ-ভাসিত পদ্মবন—তিন ডলারের শোকে আচ্ছন্ন হয়ে আছ, কিছুই এ সব তাকিয়ে দেখলে না একটি বার! রাজ-মহারাজাদের অভ্যাগম হচ্ছে—এমনি খাতির। উঁহু, ভুল বললাম—অনেক কালের অদেখা আপন মানুষদের পেয়ে এরা উল্লাসে মেতে গিয়েছে। তাই বটে! প্রশান্ত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইদানীং যারা চীনের তটে উঠেছে, লুঠেরা প্রায় সবাই; আফিঙের মৌতাতে অজ্ঞান করে রেখে সর্বস্ব পাচার করে দিত নানান দিকে। আজকের এই ব্যাপার নিতান্ত অভিনব। সাঁইত্রিশটা দেশের নির্বিরোধী মানুষেরা শলা করতে আসছে, আনন্দ এবং মান-ইজ্জত নিয়ে কী করে সকলে শান্তিতে বেঁচে থাকতে পারে।

বাজনা বাজছে। শিল্পী পিকাসোর পরিকল্পিত সুবৃহৎ কবুতরের ছবি—তারই

নীচে দিয়ে তোরণদ্বার অতিক্রম করে এগিয়ে এলাম। স্টেশনের নাম সেন-চুন। মোভি-ক্যামেরায় চলন্ত ছবি নিচ্ছে। দুজন মহিলা ছিলেন, কাঁতিক এগিয়ে তাঁদের কাছে জুটল। হাত নেড়ে ব্যস্ত ভাবে কী কথা বলছে। আমি কিন্তু জানি। কথোপকথন লোক-দেখান—আসল দরকার বুঝতে পেরেছি। মেয়েদের সঙ্গে ক্যামেরার মুখে দাঁড়াবে। মেয়েদের খাতিরে ক্যামেরা নিশ্চয় একটু বেশীক্ষণ থাকবে ওদের উপর, কাঁতিক ঐ সঙ্গে ভালমতো ছবিতে উঠবে।

স্টেশনে পা দিয়েই তাজ্জব। ওয়েটিংরুম না লাইব্রেরি? টানা-টেবিলের ধারে বেঞ্চি, লোকে সারি সারি বসে পড়েছে। বই সাজানো আছে একদিকে, রেল-কোম্পানীর লোক আছে লেনদেন ও খবরদারির জন্য। মহাব্যস্ত তারা। চীনা ভাষা অবোধ্য, উল্টেপাল্টে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে বোঝা গেল, শিশুপাঠ্য থেকে উঁচু রাজনীতি-সংক্রান্ত—সকল রকমের বই আছে। কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্টালিন প্রভৃতির ছবি থেকে আন্দাজ করা যাচ্ছে মার্কসবাদ ও কম্যুনিজমের বই বিস্তর। একেবারে চুপচাপ—মাটিতে সুঁচ ফেললে বুঝি শোনা যাবে। হৈ-হুল্লোড়ের জায়গা স্টেশন—কিন্তু এই প্রান্তটুকুতে যেন ধ্যানস্তব্ধ তপস্যার ক্ষেত্র বানিয়েছে। ট্রেনে যাবার জন্য স্টেশনে এসেছে, গাড়ীর দেরি আছে—আহা, মিছে সময় নষ্ট করে হবে কী? পড়ো বসে বসে—শিখে নাও এই ফাঁকে যতটুকু পারো।

সবাই যে পড়ছে, তা নয়। পড়তে জানেও না কত জন! ক্যারামবোর্ড আছে ভূমিতে নয়—খানিকটা উঁচুতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলতে হয়। খেলছে কয়েকজন চারিদিক ঘিরে। আর ওদিকে সারি সারি বেঞ্চি পাতা, পিছনে ঠেশ দেবার ব্যবস্থা আছে। আমাদের ইস্কুলে যেমন ক্লাস সাজানো থাকে। অনেকে বসে আছে সেখানে। যাত্রীদের মালপত্র একদিকে পাশাপাশি সাজানো। শৃঙ্খলা সর্বত্র।

দেয়ালে দেয়ালে ছবি ও পোস্টার। ইতস্তত নয়, সাজাবার পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি আছে। শিক্ষার সঙ্গে শিল্পরুচির অপরূপ সমন্বয়। আছে খবরের কাগজ—বোর্ডে ক্লিপ দিয়ে আঁটা। নতুন চীন ডাকহাঁক করে সকলকে শোনাতে চায়—কী মাণিক্য সে পেয়েছে, আর কী কী সে পেতে চায়। এই সীমান্ত-স্টেশন থেকেই তার শুরু।

আর এক বিস্ময়—স্টেশন জায়গা, এত মানুষের আনাগোনা, কিন্তু ধুলো-ময়লা নেইই কোনখানে। ছোট্ট মেয়েটা কমলালেবু খেল—আরে আরে, খোসা নিয়ে গুট-গুট করে যায় কোথা ওদিকে? আবর্জনা ফেলবার জায়গা আছে—উপরে ঢাকনি, ঢাকনির সঙ্গে কাঠের লম্বা হাতল। হাতল ধরে ঢাকনি খুলে লেবুর খোসা তার মধ্যে ফেলে আবার ঢাকা দিল। থুতু ফেলছে, তাও এই সব জায়গায়। কেমন অসোয়াস্তি লাগে। নিতান্তই রেললাইন পাশে, তাই ধরে নিচ্ছ স্টেশন। নইলে বাস-ঘর—কিংবা বা ঠাকুর ঘর বললেই বা ঠেকায় কে? ভয় হয়, কেউ আবার জুতো খুলতে না বলে বসে।

এদিকে—

ভদ্রলোক ইংরেজী জানেন না—হাত নেড়ে হাস্যমুখে পাশের হলঘর দেখাচ্ছেন, ঢুকে পড়তে ইশারা করছেন।

নিচু নিচু টেবিলে কেক স্যাণ্ডউইচ রকমারী ফল লেমন স্কোয়াশ ইত্যাদি। চা নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে জনে-জনের কাছে। ঢোকাবার কারণ বোঝা যাচ্ছে; মুখের বাক্য নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু বাক্যবিদ্‌ও একজন এসে পড়লেন।

দাঁড়িয়ে আছেন আপনি ?

এতক্ষণ বসে বসে এলাম। আবার এই ঘরের ভিতর ঠায় বসিয়ে রাখবেন, দেখতে শুনতে দেবেন না ?

দেখবেন বই কি। দোষত্রুটিও দেখিয়ে দেবেন, এই আমরা চাই। কিন্তু কষ্ট করে এলেন, এখন বিশ্রাম নিন।

বললাম, সকালে হংকং থেকে আচ্ছা একদফা সেরে ট্রেনে উঠেছি। তুলার বাক্সে যেমন করে আঙুর আনে, সারা পথ তেমনি করে তো নিয়ে এলেন। বলছেন যখন, কষ্ট কিছু করেছি নিশ্চয়। কিন্তু ভেবে পাচ্ছি নে। দয়া করে যদি একটু ধরিয়ে দেন কী কষ্ট করেছি, তদনুপাতে বসে বসে হাঁপাতে থাকি, আর সরবৎ গিলি···

এক বর্ষীয়সী স্টেশনে আসছেন—পিঠের সঙ্গে বাচ্চা বাঁধা, আর এক বাচ্চাকে হাতে ধরে হাঁটিয়ে আনছেন। পিছনে এক তরুণী—ছোট বোনই হবে আগের জনের। হাতে ঘড়ি, চোখে চশমা—ছিমছাম আধুনিকা, কিন্তু কাণ্ড দেখুন—কাঁধে এক বাঁক, বাঁকের দুই প্রান্তে গন্ধমাদন তুল্য দুই বোঝা। দিন দুপুরে অন্তত পক্ষে শ দুই-তিন চক্ষুর সামনে প্রকাশ্য স্টেশনের উপর আধুনিকা বাঁকে ঝুলিয়ে বোঝা নিয়ে আসছে—ভ্যানিটি-ব্যাগে বইতেই ঘাম বেরিয়ে যায় 'পল্লবিনী-লতেব' ললনা দর্শনে অভ্যস্ত আমাদের দৃষ্টিতে পলক পড়ে না।

না, দেখেছিলাম একবার গোবরডাঙা স্টেশনে। পায়ে মল ও আলতা মাথায় দেড়গজি ঘোমটা, এক বউ ট্রাঙ্ক ঘাড়ে করে নিয়ে চলছে। আগে আগে যাচ্ছে স্বামীপ্রবর—হাতে ছড়ি, মুখে বিড়ি, ফাঁপানো টেড়ি মাথায়। ছড়ি তুলে হুঙ্কার দিয়ে উঠল বউ পিছিয়ে পড়েছে বলে। গাড়ীর কামরায় বসে সেই একবার দেখেছিলাম। কিন্তু এখানে ছড়িধারী মার্তণ্ড-মূর্তি দেখছি না কাউকে কাছে-পিঠে। আর বোঝা বয়ে মেয়েটা একটু যে কাতর হয়েছে, তার কোন চিহ্ন নেই। বরঞ্চ 'রণং দেহি' দৃষ্টি। দাও না আর গোটা দুই বোঝা এর উপর, ডরাই নাকি—চোখে মুখে এমনি ভাব প্রকট। দুম করে বোঝা নামাল, রাখল সে দুটো সাজিয়ে। হাতঘড়ি এক নজর দেখে টিকিট করতে চলল।

স্বাস্থ্যান্বিত উজ্জ্বল মেয়েগুলোর এমনি প্রতাপ নতুন-চীনের পথে-ঘাটে সর্বত্র। ওয়াং-সিও-মেই-কে তাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম·· থাকগে, এখন। একথা পরে হবে। ছোট স্টেশন ছিল। এখন প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে, সম্প্রসারিত হচ্ছে নানান দিকে। অনেক লোক খাটছে, দিনকে-দিন ভোল বদলে যাচ্ছে। আমাদের জিনিসপত্র এনে ফেলেছে। এইবার একটু কাজ—কোন্ জিনিসটা কার, বলে দেওয়া। ওদের নিজ ভাষায় নাম লিখে নিয়ে যথাব্যবস্থা করবে। ক্যান্টনের হোটেলে গিয়ে দেখতে পাবেন, ঘরের তাকে আপনার বাক্স-বোঁচকা সাজানো রয়েছে।

দাদা, রাখবেন তো আমায় ?

কার্তিক এসে অনুনয় করছে। অবাক হয়ে বলি, মারছে কে আপনাকে ? আর মারে যদি, আমিই কোন্ শক্তি ধরি রুখবার ?

কার্তিক বলে, আপনি মালিক—সর্বশক্তিমান। সমস্ত আপনার হাতে—হাতেই ঐ কলমের ডগায়। এত টুকছেন, আমার কথাও টুকে নেবেন। বইয়ে যেন বাদ না পড়ি।

হুড়মুড় করে ট্রেন এসে পড়ল। ট্রেন এলো কামরা-ভর্তি কলহাস্য আর প্রাণ-চাঞ্চল্য নিয়ে। ট্রেন এসে আমাদের কাছে যেন উপুড় করে দিল নতুন-চীনের বিচিত্র উল্লাস। গাড়ি থামতে না থামতে ছড়িয়ে পড়ল প্লাটফরমে, আমাদের বসবার ঘরে, আমাদের

সকলের মনে মনে।

কলেজের ছাত্র-ছাত্রী—টাটকা গ্র্যাজুয়েট আছে কয়েকটি। অতিথিদের দেখা-শুনা ও দোভাষির কাজ করবে। ভার পেয়ে কৃতার্থ হয়েছে, এমনি ভাব পরে আরো কত ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছে—তাদের এ-কাজে আনা হয় নি, যেহেতু তারা বিদেশি ভাষা-বিভাগের (foreign language department) নয়। বেচারিরা সেজন্য মরমে মরে আছে।

সাঁইত্রিশটা দেশের প্রায় পৌনে চার শ' অতিথি—এমনি হাজার তিনেক ছাত্র-ছাত্রী তাদের আপ্যায়নের জন্যে এসেছে। পড়াশুনা মুলতুবি রেখে ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে। নানা জায়গায় ছড়িয়ে রাখা হয়েছে তাদের, যেখানে যেখানে অতিথিদের পা পড়বে। সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি অবশ্য পিকিন, কাজের দক্ষতাও তাদের সর্বাধিক। দিন নেই রাত নেই, শীত নেই বর্ষা নেই, সময় নেই অসময় নেই—ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে আছে। পান থেকে কারো চুন না খসে, এমনি সতর্কতা।

ঐ ট্রেনই আমাদের বয়ে নিয়ে যাবে ক্যাণ্টনে। দাঁড়িয়ে আছে। উঠুন, উঠে পড়ুন এবার দয়া করে। ছেলে আর মেয়েগুলো ঘিরে নিয়ে আমাদের গাড়িতে তুলল। ওরাও চলল সঙ্গে। শুধুমাত্র বিদেশীয় হওয়ার গুণে এতখানি খাতির মেলে, আগে কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছি ?

গাড়ি ছাড়ল। পিছে তাকালাম একবার। ব্রিটিশ-এলাকা একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে। দুই রাজ্যের মাঝখানে ছোট্ট একটু খাল—অথচ আকাশ ও পাতালের ব্যবধান। যেন নিশ্বাস লাগল গায়ে; নিশ্বাসের মতন হাওয়া। হাওয়া আসে ওপারের লাউ-হু স্টেশনের দিক থেকে। ঝুর-ঝুর করে পাতা ঝরে প্লাটফরমের গাছটার। রৌদ্র-দীপ্ত আকাশের নিচে মনে হল রূপগরবিনী হংকং ঈর্ষান্বিত চোখে তাকাচ্ছে নতুন-চীনের দিকে। মূলভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আরামেই ছিল মোটের উপর। একটিমাত্র ব্রিটিশ-মনিবের মন জুগিয়ে এসেছে—চীনের মতো বারোভূতের হাতে ভোগান্তি হয়নি। আজকে শতক বৎসর পরে টনটন করে উঠেছে বুঝি পুরোনো নাড়ি-ছেঁড়া বেদনা !

(৪)

ট্রেনে দুটো ক্লাস—নরম আর শক্ত। নরম ক্লাসের বেঞ্চিতে গদি-আঁটা, ভাড়া কিছু বেশি। শক্ত ক্লাসে শুধু কাঠ। তফাৎ এই মাত্র, আর কিছু নয়। যাত্রীরা চা পায় বিনামূল্যে। খাও বা না খাও সামনে চা রয়েছে ; ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ঢেলে নিয়ে চা-পাতায় আবার গরম জল দিয়ে যাচ্ছে। নরম বা শক্ত ক্লাস বলে কোন বাছবিচার নেই। টানা-পথ গিয়েছে আমাদের খোপগুলোর পাশ দিয়ে—ইঞ্জিন থেকে শেষ অবধি এই পথে যাতায়াত চলে। লাউড-স্পীকার প্রতি কামরায়—মাঝে মাঝে গান হচ্ছে যাত্রীদের খুশি রাখবার জন্য। কাজের কথাও হচ্ছে—অমুক স্টেশন আসছে এবার, এক মিনিট থামবে, যারা নামবে তৈরী হও এখন থেকে। কিংবা অমুক পাহাড় দেখ ঐ ডান দিকে। অমুক নদীর পুল। লড়ায়ের সময় বিশ জন মুক্তিসৈন্য আশ্রয় নিয়েছিল এই পুলের নিচে—কী কষ্ট তাদের, কী কষ্ট !

ট্রেনে যে-অঞ্চল অতিক্রম করছে, সেটা চিনিয়ে দিয়ে যাচ্ছে এমনি করে। ভুগোল আর ইতিহাস পুঁথির পাতায় মাত্র নয়—জীবন্ত হয়ে উঠছে চোখের সামনে। আমরা চীনা ভাষা বুঝি না, বোকার মতো হাঁ করে থাকি—ওরাই সদয় হয়ে যা-কিছু মানে বলে দেয়। কিন্তু কত আর বলবে ! নানা জনের নানা প্রশ্নে টগবগ করে মুখে খই ফুটছে। চতুর্মুখের চারটে করে মুখ হলেও তো থই পেতো না।

সত্যি, এ কী অমোঘ সঙ্কল্প ! শতকরা আশিজন ছিল অশিক্ষিত—তাদের একটি প্রাণীকে আর অজ্ঞ থাকতে দেবে না। সেন-চুন স্টেশনে পা দিয়ে দেখেছিলাম, গাড়ির মধ্যেও ঠিক সেই ব্যাপার। ইস্কুলে কলেজ য়ুনিভার্সিটি তো আছেই। পথযাত্রী, এখন একটু ফাঁক পেয়েছে, শিখে নাও যেটুকু পারো।

পরে দেখেছি, এ নীতি চীনের সর্বত্র। ভোরবেলা—হ্যাংচাউয়ে হ্রদের কিনারে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সারি সারি নৌকো বাঁধা। নৌকো চালায় মেয়েরাই বেশির ভাগ। চড়নদার বেলায় আসবে। হাতে কাজ নেই—কী করবে, গলুয়ের সঙ্গে আঁটা কাঠের বাক্স থেকে বই বের করে নিয়ে পড়তে লাগল। রাত বারোটায় বাসে চড়ে পিকিনের পথে শেষ দিনের শান্তি সম্মেলনে যাচ্ছি, রাস্তার ধারে আলো জেলে ঐ বাঘা শীতের মধ্যে বয়স্কেরা লেখাপড়া করছে। দিনমানে সময় পায় না, লেখাপড়া শিখতেই তো হবে—রাত বারোটায় এসে জমেছে। গিয়েছি এক গ্রামে। বেলা দুপুর। ভয়াবহ চিৎকার আসছে এক বাড়ির উঠোন থেকে। কী ব্যাপার ? একদল সৈন্য বিশ্রামের জন্য আছে, সেখানেই হাঁকডাক করে তারা পাঠ অভ্যাস করছে। নিরক্ষর ছিল। অল্প ক'দিনের মধ্যে শিখে নিতে হবে। তাই উৎসাহ ও বিক্রমের অবধি নেই। যাক গে, পরের কথা —এ সব পরে হবে। ঝকমক করছে গাড়ির কামরাগুলো, বেঞ্চির উপরে পাটভাঙা চাদর পাতা। দুপুরের ভুরি-ভোজনের ব্যবস্থা চলতি ট্রেনে—আমিষ নিরামিষ যেমন খুশি ! খেয়েদেয়ে ঝিমুনি আসছে। কিন্তু, না—অপরাধ মনে করি এ জায়গায় ঘুমানো। জীবনের এত বছর অতীত হয়েছে, অর্ধেক তার তো ঘুমিয়েই কাটালাম। আজকে জাগ্রত থাক দুই চক্ষু। ট্রেন ছুটছে মাটি কাঁপিয়ে। গ্রাম ঘরবাড়ি মাঠঘাট নদীনালায় শ্যামশ্রী নতুন-চীনের হাস্যাননই দেখতে পাচ্ছি চতুর্দিকে। বন্ধুজনেরা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, অনেক—অনেক রক্তস্রোতে ভেসে আজকের এ দিনে এরা পৌঁছেছে। সকলের মুখে নজর করি, এক-একটা স্টেশনের প্ল্যাটফরমে তাকাই এদিক-ওদিক। রক্তের দাগ লেগে থাকে যদি কোথাও !

দক্ষিণ-চীনের এই অঞ্চল বাংলাদেশ বলে বারংবার ভুল হয়ে যায়—ঠিক পূর্ববাংলা। বাঁশঝাড় গ্রামের ধারে। কলাগাছ, পেঁপেগাছ, কলাইক্ষেত। জলা জায়গায় কত পদ্মবন ! নিঃসীম ধানক্ষেত। পাটক্ষেতও অনেক। আমাদের পাটের জিনিসের পুরানো খদ্দের চীন। মতলব ভাল নয় তবে তো—দেদার পাট চাষ করছে। নানা এক্জিবিশনে গিয়ে দেখেছি, কোথায় কত পাটকল হয়েছে তার হিসাব। পাটের জিনিসের উৎপাদন অতি দ্রুত বাড়ছে। তৈরী জিনিসের নমুনাও দেখিয়েছে। ঢাকা-ময়মনসিঙের মতো উৎকৃষ্ট নয় যদিচ, তবুও দিব্যি কাজ চলবে। পাকিস্তানি বন্ধুদের সঙ্গে একত্রে গিয়েছিলাম এক এক্জিবিশনে। উভয় তরফ থেকে চোখ টেপাটিপি করি—হায় রে, এ বাজারটা হাতছাড়া হয়ে গেল ! আগে জানতাম, পাট বাংলার একচেটিয়া। সে গর্ব নির্মমভাবে ভেঙে দিচ্ছে নানান জায়গা থেকে।

দীর্ঘ-দেহ এবং দীর্ঘ-দাড়ি মকবুল হোসেন—মাথায় কালো টুপি। বম্বের নাম-করা চিত্রকর। তিনি স্কেচ করে চলেছেন পাতার পর পাতা। ছেলেমেয়েরা ঘিরে ধরেছে। স্বচ্ছ হাসি সর্বদা তাঁর মুখের উপর—সেই হাসি হাসতে হাসতে এগিয়ে দিলেন স্কেচগুলো। ওরা দেখছে, মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকাতাকি করছে পরস্পরের দিকে। হাতে হাতে ঘুরছে ছবি।

হঠাৎ দেখি, হোসেন সাহেবকে ছেড়ে আমার দিকে ধাওয়া করেছে। কৌশলটা তাঁরই—আমি এক লম্বা-চওড়া লেখক ইত্যাদি বলে থাকবেন। হাতে কলম, সিঁদের

মুখে চোর ধরবার গতিক। ছেলেমেয়ের দঙ্গল হটিয়ে দিয়ে হোসেন আবার কাজে মনোযোগ দিয়েছেন। দু চোখে যা দেখেন, মহামূল্য মনিরত্নের মতো খাতায় তুলে নিতে চান।

কিন্তু আমার ছবি নয়, কলমের লেখা। তা-ও বাংলা অক্ষরে। এই দেখে বুঝবে কোন জন?

একটি মেয়ে তবু নাছোড়বান্দা।

কী লিখেছ পড়ো না একটুখানি!

তোমাদের কথা—

আমাদের নিয়ে আবার লেখা যায় নাকি?

ভাবীকালের মহাচীন তোমরা। তোমাদের জন্যেই চারিদিকের সকল আয়োজন। অবহেলার বস্তু তোমরা কিসে?

ঘাড় নেড়ে আবদারের সুরে বলল, বাজে কথা রাখো। নবেল আর গল্প লেখো, আমরা শুনেছি। কাদের নিয়ে তোমার গল্প বলো তাই।

ফুটন্ত ফুলের মতো মুখখানা দুই করতলে ন্যস্ত করে উৎসুক চোখে চেয়ে আছে। জবাব দিতেই হয়।

বাংলা দেশের মানুষ নিয়ে। তাদের হাসি-অশ্রু, ঘর-গৃহস্থালি, রাগ অনুরাগের গল্প। আর আছে আমাদের স্বাধীনতার লড়াইয়ের কথা। কংগ্রেস আর দেশের মানুষ ইংরেজের সঙ্গে কতকাল ধরে অসম যুদ্ধ চালাল—শুনেছ কংগ্রেসের নাম?

কংগ্রেসের কথা অতি সামান্য জানে। বেশী শুনেছে নেহরুর নাম। আর সবচেয়ে বেশি জানে টেগোর অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে। বিদেশী ভাষার ছাত্র-ছাত্রী বলেই সম্ভবত।

বলছিলাম, আমাদের ছেলেমেয়েরা—তোমাদেরই মতো এমনি বয়স—হাসিমুখে ফাঁসিকাঠে চড়েছে, গুলির মুখে প্রাণ দিয়েছে। ব্যাক্তিজীবনের সুখদুঃখ কপালের ঘামের মতো তারা মুছে ফেলেছিল দেশের মুক্তির জন্য। তাদের চোখ ছলছলিয়ে উঠল, স্পষ্ট দেখলাম। হাজার হাজার মাইল দূরে ভিন্ন দেশের মেয়ে—সেখানকার চাঁদ সূর্য্যিও বুঝি আলাদা। আর সেই চলন্ত ট্রেনের মধ্যে ঐটুকু সময়ে আমাদের সর্বত্যাগী-দেরই কথা কী-ই বা বলতে পেরেছি! তবু কাঁদল। ধরা গলায় বলে, বলো আরও তাদের কথা। ভাল করে শুনি।

খাতা এগিয়ে দিই। তোমার নামটা লেখো এখানে।

চীনা অক্ষরে লিখল। পাশে ইংরেজি বানানে লিখল আবার। ওং-উন (Wong Oyun)। কয়েক ঘণ্টার সঙ্গিনী সমব্যথিনী মেয়েটার হাতের লেখা ঝিকমিক করছে আমার ছোট্ট খাতাখানায়।

পরে এক সময়ে জিজ্ঞাসা করি, কেঁদেছিলে কেন?

ওং-ঔন মুখ ফিরিয়ে নিল। অত স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ, তবু নজর তুলে কথার জবাব দিতে পারে না।

তোমার দেশেরও কত ছেলে মেয়ে গেছে অমনি!

মেয়েটা বলে, অনেক—অনেক—আকাশের তারার মতো অগণ্য। কিন্তু তাদের জন্য কাঁদব কেন? তারা যা চেয়েছিল, সে তো পাওয়া যাচ্ছে—

স্বচ্ছন্দ শান্ত কণ্ঠে কথাগুলো বলল। স্তব্ধ হয়ে রইলাম। ফসল ভরা মাঠের মধ্য দিয়ে গাড়ি ছুটছে। দিগ্‌ব্যাপ্ত সবুজ শীশে আজকের জনমনের আনন্দোচ্ছ্বাস ঢেউ দিয়ে যাচ্ছে যেন। ওদের মানস-স্বপ্ন মঞ্জরিত হল এত দিনে?

হবে আমাদেরও। এ আমি একান্তভাবে জানি। বললাম সে কথা। ইংরেজ তামাম জাতটাকে মজ্জাশূন্য করে রেখে গেছে। উঠে দাঁড়াতে কিছু সময় লাগবে। পড়ে থাকব না আর। দুঃখ নিশার অন্তে স্বাধীন বিমুক্ত দুই পুরনো প্রতিবেশী আবার আজ নতুন করে পরিচয় স্থাপন করতে এসেছি।

লড়াই চলছে চীনের সীমান্তে—কোরিয়ার—ইয়েলু নদী পার হয়ে গিয়ে। তাই বা কেন—ইয়েলুর এ পারেও পড়েছে সাংঘাতিক বোমা। সে থাক গে, দেশে ফিরে গিয়ে অনেক সকালবেলা চায়ের বাটি ও খবরের কাগজ নিয়ে আলোচনা চালানো যেতে পারবে। আর এক বিষম লড়াই হচ্ছে সমস্ত চীন জুড়ে, এমন গ্রাম নেই যেখানে লড়াই না আছে। ঘরোয়া যুদ্ধ—বিস্তারিত ব্যাপারটা অনেক বিদেশির চোখ এড়িয়ে যায়, কিন্তু ফলাফল অতি প্রত্যক্ষ। রেলপথের দু পাশে ঐ দেখতে দেখতে যাচ্ছি।

আচ্ছা, জ্ঞান হবার পর থেকেই যে চীনে দুর্ভিক্ষের কথা শুনে আসছি, দুর্ভিক্ষের চাঁদা দিয়েছি কতবার—হঠাৎ সে দেশ আড়তদারি ফেঁদে বসল কিসে? চাল বিক্রি করছে। পিকিনে ভারতীয় দূতাবাসে দেখা করতে গেলাম। সে সময়টা তাঁরা ভারি ব্যস্ত। বললেন কিছু চাল খরিদের তালে আছি এদের কাছ থেকে। পিকিন ছাড়বার মুখে আবার যখন গিয়েছি, চাল গস্ত করা হয়ে গেছে। বহুবিস্তীর্ণ দেশের সংখ্যাতীত মুখে ভাত জুগিয়ে আরও বিক্রি করে, এত চাল চীন পায় কোথায়?

ঐ যা বললাম—লড়াইয়ের ফল। লড়াইয়ে মানুষ সাফ হয়ে যায়, খাদ্যের আর প্রয়োজন থাকে না। এ লড়াইয়ে কিন্তু তা নয়। মানুষ বিষম জীবন্ত হয়ে উঠেছে, ভীষণ খাচ্ছে। এত খেয়েও ফুরোয় না, তাই বাজারে দিচ্ছে। সেই সচ্ছলতা আমরা দেখে এসেছি।

দেখুন—দেখুন না তাকিয়ে—

আঙুল দিয়ে দেখায় ওরা। ফসলের ক্ষেত রেলের পাটি ছোঁব ছোঁব করছে। এক ছিটে জায়গা বাদ দিতে চায় না।

বললাম, দুই পাটির ফাঁকে ওখানেও তো কিছু আর্জানো যেত। গোলআলু কি ব্যাঙের ছাতা? ওটুকু বাদ দিলে কেন? তা কী হয়েছে—রেলগাড়ি গড়গড় করে উপর দিয়ে চলে যেত। এ কিন্তু জমির অন্যায় অপচয়।

ঠাট্টা করে বললাম, কিন্তু গতিক এমনই বটে। পাগল হয়ে চাষে নেমেছে। খানাখন্দ ভরাট করছে। পাহাড়ের উপরে কেটে চৌরস করে সেখানেও চাষ। যে ফসল যেখানে ফলানো যায়।

চীনদেশের অফুরন্ত জমি, কিন্তু নিজের বলতে এক ছটাক জমি ছিল না অধিকাংশ লোকের। জমির মালিক জমিদার কিংবা ধনী চাষী—ঈশ্বর যেন তাদের ইজারা দিয়ে দিয়েছেন। চড়া খাজনায় জমি বন্দোবস্ত নিতে হত ওদের কাছ থেকে, কিংবা মজুর খাটত অন্যের ভুঁইয়ে। ঋণ করত মহাজনের কাছে—সে ঋণ যথানিয়মে লাফিয়ে লাফিয়ে পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠত। মাটির সন্তানের দুর্ভোগে কুপিতা ভূমিলক্ষ্মী বিগড়ে গেলেন, রুগ্ন অশক্ত শিরদাঁড়া-ভাঙা চাষীর জমিতে ফসল ফলে না। দেশ জুড়ে নিরন্নের হাহাকার। সরকারি প্রচার-যন্ত্র হাঁকড়াচ্ছে—জনবৃদ্ধি ঘটছে, অত খাদ্য আসবে কোত্থেকে? ধান-গম ছেড়ে ঘাসপাতা খাও বেশী করে। বিদেশের তুষ-ভুষি আনা হচ্ছে জাহাজ বোঝাই করে। উনিশ শ'পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের এই চীনের সঙ্গে আমাদেরও কয়েক বছর আগেকার অবস্থা দেখুন দিকি মিলিয়ে।

জমিদারের সঙ্গে চাষাভুষোর রোমহর্ষক নানা শর্ত—এ ব্যাপারে চীন আমাদের

অনেক দূর ছাড়িয়ে ছিল। খাজনার উপরে এটা-ওটা দেওয়া, বেগার খাটা—ওসব তো ছিলই। আমাদের এখানে আছে, ওদেরও ছিল। আর যা ছিল আমাদের লোক শুনে কানে আঙুল দেবে। নতুন লাউ ফললে কি প্রথম গাই বিয়োলে মনিবের ভোগে দিতে হয়। নিজের স্ত্রী-কন্যার সম্পর্কেও অনেক ক্ষেত্রে ছিল অমনি বিধি।

কিন্তু এসব নিতান্ত অতীতের কথা। তিনটে বছরেই যেন অনেক পুরানো ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের মানুষ শিউরে ওঠে বিভীষিকার সে সব দিন মনে করতে গিয়ে। মুক্তির অবাধ আলো, নব জীবনের আনন্দস্বাদ। আর কী লড়াই, কী লড়াই! গ্রামে ঢুকছ—পথের মোড়ে ও নানা প্রকাশ্য জায়গায় দেখতে পাবে লড়াইয়ের বীরদের ছবি। কৃষক-বীর, শ্রমিক-বীর। ক্ষেতে দেড়া-ফসল ফলিয়েছে—চারদিকে সেই বীরের জয়জয়াকার। খবরের কাগজে ছবি উঠছে, নাম বেরুচ্ছে। সরকার পুরস্কার দিচ্ছে, আরামের প্রাসাদে পাঠাচ্ছে কিছুদিনের জন্য। রাজা-মহারাজা এবং বড় বড় ধনীরা ঐ সব প্রাসাদ বানিয়েছিলেন—স্ফূর্তির তুফান বইত অহোরাত্রি। নির্ধন গ্রাম্য চাষী, সর্ব অঙ্গে এখনো সেদিনের দারিদ্র্য-লাঞ্ছনা—প্যালেসে গিয়ে তারা গদিতে শুচ্ছে, কৌচে বসে তাস-দাবা খেলছে। শুধু বিলাস-সম্ভোগই নয়—কত ইজ্জত। চাষীরা তাই প্রাণপাত খাটে। আর, মা লক্ষ্মী চুপিসাড়ে হিমালয় পার হয়ে গিয়ে ঐ নিরীশ্বর দেশে আঁচল বিছিয়ে বসেছেন। আমাদের ভাণ্ডে বুঝি মা-ভবানী?

সন্ধ্যা হল। আকাশে মেঘের ঘন ঘটা। ক্যাণ্টনের আর দেরি নেই। পূর্ববর্তী শহরতলির স্টেশনে গাড়ি থামল। জায়গাটার নাম—না, পড়বার উপায় নেই—এখন শুধুমাত্র চীনা অক্ষরে। ইংরেজি পরিচারিকা বন্ধ চীনভূমিতে প্রবেশের পর থেকেই। স্টেশনের পাশে এক-সাইজে-কাটা টুকরো কাঠ স্তূপীকৃত। দেশলাইয়ের কারখানা আছে তার জন্য। এরা যত দেশলাই জ্বালায়, আর যত সিগারেট পোড়ায়, সমস্ত স্বদেশে তৈরী। গাড়ি ধীরে ধীরে চলল ক্যাণ্টন অভিমুখে।

ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি নামল। গান কানে আসছে বৃষ্টি-বাদলার অবিরল আওয়াজ ছাপিয়ে। বহুকণ্ঠে সমবেত গান। সুর থেকে আন্দাজ পাচ্ছি, এ গান শুনেছি সঙ্গীদের মুখে। ট্রেনে তাদের গান করতে বলা হল, তারাও পাল্টা ভারতীয় গান শুনতে চাইল। উভয় তরফের গান হয়েছিলি কয়েকটা। তার মধ্যে এই গানও শুনেছি। গানের মানে বুঝিয়ে দিয়েছিল—আমার খাতায় লিখেও দিয়েছে ইংরেজি বানানে। 'পৃথিবীর মানুষ এক হও, এক হও। সকল মানুষের একটিমাত্র হৃদয়—'

থামল গাড়ী। সংবর্ধনার অপরূপ ব্যবস্থা। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে—বছর বারো-চোদ্দ বয়স—সারবন্দি প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে। পরিচ্ছন্ন বেশ, গলায় লাল রুমাল বাঁধা—সাদা কামিজ কালো হাফ প্যাণ্ট। হাস্যবিম্বিত মুখ, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা। ইয়ং-প্যায়োনিয়র এরা এক-একজন। আমরা কামরা থেকে নামছি, ওদের এক একটি এগিয়ে এসে প্রায় ব্রতচারী কায়দায় হাত তুলে অভিনন্দন জানাচ্ছে। ফুলের মালা নয়, তোড়া দেওয়ার রীতি। তোড়া হাতে দিয়ে তারপর ডান হাত জড়িয়ে ধরল। এগিয়ে চলেছি। আমার পিছনে যিনি নামলেন, তিনিও ঠিক এমনি। তাঁর পিছনে যিনি, তিনিও।

ছবিটা কল্পনা করুন। সন্ধ্যার আঁধার ঘনতর হয়েছে মেঘছায়ায়। বৃষ্টি পড়ছে। চারিদিক বিমন্দ্রিত শত শত কণ্ঠের ঐক্য-সঙ্গীতে। হাত ধরে নিয়ে চলেছে, প্রবীণ কর্তাব্যক্তিরা কেউ নয়—এই শিশুরা, ভাবী দিনের চীন। মিছিল করে চলেছি। উপহার-পাওয়া ফুলের তোড়া বুকের উপর, ডান হাতখানা কোমল মুঠির মধ্যে নিয়ে চীনভূমিতে পথ দেখিয়ে চলেছে—সে-ও পরম শুচি ফুল একটি। বিশিষ্টেরাও এসেছেন অবশ্য

স্টেশনে—আপাতত তাঁরা অবান্তর। ছেলেমেয়েদের দক্ষিণে ঐ দূরে দূরে চলেছেন তাঁরা, দরকারমতো দুটো-একটা কথার জোগান দিচ্ছেন।

আরও এগিয়ে আসতে হাততালি উঠল। হাততালি দিয়ে ক্যাণ্টনের মানুষ আবাহন করছে। গান চলছে। আলো দিয়ে সাজিয়েছে সারা স্টেশন আর রাস্তার অনেক দূর অবধি। সৈন্যদল সারবন্দি দূরে দাঁড়িয়ে গান করছে। সৈন্যরা শুধু বন্দুক মারে না, গানও গায় তা হলে! গান গেয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা করতে স্টেশনে জমায়েত হয়েছে। গান গাইছে ছাত্র-ছাত্রী, ফ্যাক্টরির কর্মী, ক্যাণ্টনের অগণ্য নাগরিকদল। গম্ভীর স্বস্তি-মন্ত্র। 'পৃথিবীর মানুষ এক হও সকলে, মানুষের দুঃখ বিদূরিত হোক, কল্যাণ আসুক সর্বত্র…'

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ভুলে গেলাম, বিদেশে এসেছি কয়েক হাজার মাইল দূরবর্তী বাংলাদেশ থেকে। এ-ও আমার আপন ভূমি, চারিপাশের এই সব মানুষ আমার আপনার। মহাচীনকে ভালবেসে ফেললাম সেই মুহূর্তে, আমাদের চিরকালের সম্পর্ক নতুন করে চেতনায় এলো। মনের সমস্ত আকুতি দিয়ে কামনা করলাম, কোন অমঙ্গল কখনো যেন স্পর্শ না করে এই শিশুদের! বোমা না পড়ে এদের মাথায়, রক্ত না ঝরে মাটির উপর। পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হোক—সূর্যের আলোর মতো এদের সোনার হাসি ছড়াক দিগ্‌দিগন্তে।

আমার হাত ধরে যাচ্ছে মেয়েটি—দোভাষিকে দিয়ে তার নাম জিজ্ঞাসা করলাম। ওয়াই-মিঁয়া। ডাকলাম নাম ধরে। ওয়াই-মিঁয়া, তুমি ওয়াই-মিঁয়া? সরল নিষ্পাপ মুখ তুলে সে মধুর হাসি হাসল।

স্টেশনেই জলযোগের ব্যবস্থা। তা-বড় তা-বড় যাঁরা এসেছেন, এতক্ষণে তাঁদের পরিচয় পেলাম। শহরের মেয়র, ডেপুটি মেয়র, শান্তি-কমিটির প্রেসিডেণ্ট, বড় বড় ব্যবসাদার ইত্যাদি। বেশভূষায় কিন্তু ঠাহর করবার উপায় নেই—মামুলি গলাবন্ধ-কোট ও প্যাণ্ট।

অপেক্ষামান মোটর স্টেশনের বাইরে। ছোট্ট সঙ্গিনীর হাতে হাত দিয়ে এসেছি, এইবার বিচ্ছিন্ন হব। হাত ঝাঁকাচ্ছে, বারম্বার ঝাঁকাচ্ছে—কচি তুল-তুলে হাতটুকুতে যত জোর আছে, সমস্ত দিয়ে শেকহ্যাণ্ড করছে। ছাড়বে না—ছাড়তে কিছুতেই চায় না। তারপর মোটরে উঠে বসলাম। জীবনে কোনদিন চোখে দেখব না ওয়াই-মিঁয়াকে। নামটা রয়েছে খাতায়।

গাড়ী হোটেলে নিয়ে চলল। পার্ল নদীর উত্তর তীরে আই চুং হোটেল। ১৯৩৭ অব্দে তৈরি, পনের তলা প্রকাণ্ড বাড়ী। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল, এবার প্রবল ধারাবর্ষণের মধ্যে ভিজতে ভিজতে অবিচল জনতা তখনো গাইছে। গান ক্রমশ দূরবর্তী হয়ে একসময়ে মিলিয়ে গেল। হোটেলের ঘরে গভীর রাত্রি অবধি মনে তার অনুরণন শুনেছি। এক হও, একপ্রাণ হও সমস্ত মানুষ…

৫

আশ্চর্য মেয়ে পেরিন। ক্ষীণ দেহ কিন্তু অসীম কর্মোদ্যম। প্রস্তুতি কমিটির ডেপুটি সেক্রেটারি-জেনারেল রমেশচন্দ্রের সঙ্গে বিয়ে হয়ে পেরিন রমেশচন্দ্র হয়েছেন। সে ভদ্রলোক তো আগেভাগে পিকিনে গিয়ে সম্মেলনের কাজে মেতে আছেন। পেরিন চলেছেন আমাদের সঙ্গে। কিংবা বলতে পারি আমাদেরই নিয়ে চলেছেন সঙ্গে করে। যাত্রা-পথে অজান্তে কোন সময় সকলের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

হোটেলে এসেই পেরিন বললেন, ঘরে গিয়ে দেখুন, মালপত্র ঠিক মতো পৌঁছেছে

কিনা। সকালবেলা প্লেন—ওগুলো এক্ষুনি আবার ওজন হবে।

পিকিন প্রায় দেড় হাজার মাইল ক্যান্টন থেকে। ঠিক ছিল না, ট্রেনে যাওয়া হবে কি প্লেনে। স্টেশনেও ওখানকার কর্তারা সঠিক বলতে পারেন নি। এখন খবর হল, প্লেন পৌঁছে গেছে অতিথি নিয়ে যাবার জন্য। কালকের কয়েকজন পড়ে আছেন ত্রিশঙ্কুর অবস্থায়, তাঁরাও যাবেন। কিন্তু এত মানুষ, মাল একটা প্লেন একসঙ্গে বইতে পারবে না, আজকে কেউ কেউ তাই থেকে যাবেন। তাঁদের নিয়ে যাবেন পরশু। কপাল ভালো, আমাকে আজকের দলে ফেলেছেন। কিন্তু কপাল মন্দ যে প্লেনের ব্যবস্থা হল। ট্রেনে গেলে কত দেশ দেখতে দেখতে কত মানুষের সঙ্গে পরিচয় করে তিন চার দিন ধরে খুশমেজাজে যাওয়া চলত। এ-পথে সাধারণের জন্য বিমান চলাচলের ব্যবস্থা নেই। হয়ে ওঠেনি—প্লেনের ঘাটতি আছে মনে হয়। এক দিক দিয়ে ভারতীয় আমরা জিতে আছি। জিত আর কত! শীতে চামড়া চৌচির হলেও ওদের এক আঙুল ক্রিম জোটে না—আর আমাদের মেয়েগুলো, অহরহ দেখতে পাচ্ছেন, কটকট কালো মুখে পক্ক আপেলের আভা ধরাচ্ছে।

বাজে কথা থাক। সারাদিন ধকল গেছে, স্নান করে ঠাণ্ডা হই আগে। আমি আর পট্টনায়ক—দুজনের কোণের ঘরে জায়গা। বাথরুমে তাকের উপর আনকোরা নতুন টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, চুলে মাখাবার ভেসিলিন এবং ভেবেছিলাম গন্ধতেল—তা নয়, অডিকলোনের শিশি। সমস্ত দু-দফা করে। দরজার কাছে ঘাসের সুরম্য চটি দু-জোড়া, পায়ে দিয়ে ঘর-বারান্দায় ঘুরঘুর করে বেড়ান—এই আর কি! মাত্র একটা রাতের মামলা—সকালেই কাঁহা-কাঁহা মুলুক চলে যাচ্ছি। তারই জন্য এত! ভেবেছে কি বলুন তো? একেবারে ন্যাড়া হাত-পা নিয়ে ওদের মুলুকে এসেছি? দুই ব্যক্তি আমরা—অতএব দু-সেট করে প্রতিটি জিনিস। কিন্তু টুথপেস্টটাও কি এক টিউব থেকে নেওয়া চলত না? অডিকোলন দু-শিশিরই বা প্রয়োজন কিসে?

আথিত্যের এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র ক্যান্টনে নয়, চীনের সর্বত্র। যে হোটেলে গিয়েছি, সেখানেই। পিকিন ছাড়া তিন চার দিনের বেশি থাকতে হয় নি কোথাও। ও-সব জিনিস স্পর্শ করি নি, নিজেদের সঙ্গে ছিল—সামান্য ক্ষণের জন্য নষ্ট করে আসব কেন ওদের জিনিস?

বুদ্ধিমান করিৎকর্মা ব্যক্তিও ছিলেন অবশ্য। একদা একজনের ব্যাগ থেকে চিঠির কাগজ বের করতে গিয়ে চীনা-অক্ষর মুদ্রিত টুথব্রাশ বেরিয়ে পড়ল। হোটেলের মাল ভ্রমবশত তাঁর ব্যাগে ঢুকে পড়েছে। সে ভদ্রলোক কিন্তু ভারতীয় নন, দিব্যি করে বলছি। নিজেদের গালমন্দ করি—কিন্তু আমাদের লজ্জা দিতে পারেন এমন বহুতর ধুরন্ধর আছেন ভুবনে।

স্নানের মধ্যেই শুনতে পাচ্ছি হাঙ্গামাগুলো তাড়াতাড়ি চুকিয়ে নেবার জোর তাগিদ। অথিতিদের সম্মাননায় ভোজের আয়োজন—সময় হয়ে গেছে, ভোজের আসরে যেতে হবে এখনই।

আবার শুনেছি, পট্টনায়কের কাছে কে-একজন প্রশ্ন করেছেন আমার নাম ধরে। ক্যান্টন শহরে অপরিচিত কণ্ঠে আমার নাম—তাই তো, কেউ-কেটা ব্যক্তি আমি তো তবে!

খালি গা, ভিজে কাপড়চোপড়—সেই অবস্থায় বেরিয়ে এলাম। কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি—খাস বাংলা জবানে বললেন, আপনিই? পরিচয় করতে এলাম—আমি ক্ষিতীশ বোস। গান গাই। কাল থেকে আটক হয়ে আছি হোটেলে। আপনাদের সঙ্গে এক প্লেনে যাবো।

পরের দিন থেকে ক্ষিতীশ চীন-ভ্রমণে আমার নিত্যসঙ্গী। এক ঘরে থেকেছি। পিকিন, সাংহাই, হ্যাংচাউ—প্রায় সর্বত্র। ছাড়াছাড়ি দমদম এরোড্রোমে ফিরে এসে।

ধুতি পরে গায়ে খোপদুরস্ত পাঞ্জাবি ঢুকিয়ে কাঁধের উপর শাল চাপিয়ে ভোজ-সভার মধ্যে জাঁকিয়ে বসা গেল। ভদ্রতা বজায় রেখে আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে সকলে আজব পোশাক দেখছে। পাশের চেয়ারে ক্যাণ্টন শান্তি-কমিটির সেক্রেটারী। নিজের কাপড়-চোপড়ের দিকে একবার নজর বুলিয়ে সগর্বে বললাম, আমাদের জাতীয় পোশাক।

কিন্তু ভারতীয় মানুষ আরো তো দেখছি। তাঁদের এ সজ্জা নয়—দৃষ্টির হুল সইতে পারেন না বলে কড়া কোট-পাতলুনে তাঁরা অঙ্গ ঢেকে বেড়ান। লেখক মানুষ আমি—লোক না পোক—মানুষ গ্রাহ্য করি নে। তা হলে কি আজব গল্প ছাপার অক্ষরে ছাড়তে পারতাম?

খাঁটি চীনা পদ্ধতির ভোজ, খৃষ্টপূর্ব আমল থেকে ধারা চলে আসছে। সাজানো উপকরণ দেখেই উদর আঁতকে ওঠে। পঁচিশ-ত্রিশ পদ তো হবেই—ভাজা-ভুজিগুলো আবার হিসাবে ধরা হয় না। বিশ্বসংসারে হেন বস্তু নেই, ভোজের টেবিলে যা একবার দেখা না দেবে। নিরামিষের মধ্যে প্রধান হল ব্যাঙের ছাতা ও বাঁশের কোড়। আছে সুবৃহৎ পাত্রে চার-পাঁচ-সেরা এক-একটা অখণ্ড ভেটকি বা ঐ জাতীয় মাছ। দৃষ্টি-পাতেই রোমাঞ্চ হয়। জন চারেক মিলে চক্ষের পলকে ঐ বিশাল বস্তু শেষ করে ফেলছে। এহ বাহ্য, আসলে পৌঁছান নি কিন্তু এখনো। বন্ধুরা আমাকে হরবখত প্রশ্ন করেন, চীনাদের মূল-খাদ্য কি—চাল না গম? উঁহু, কোনটাই নয়—আসল হল মাংস। ভাত-রুটি ওগুলো ভোজন-শেষে মুখশুদ্ধির উপকরণ।

ভূচর খেচর জলচর—জীবব্রহ্মের সর্ব স্বরূপে এদের সমান আসক্তি। ব্যাং-আরশুলা সাপ-শুয়োর থেকে ইস্তক মা-ভগবতী। এক হাতে দুটি মাত্র শলাকার সাহায্যে কঠিন তরল যাবতীয় বস্তু অবিরত মুখের গহ্বরে চালান করছে। এ-ও এক তাজ্জব দৃশ্য। খাওয়া দেখতে দেখতে ম্যাজিক দেখার স্ফূর্তি পাওয়া যায়। আমাদের কেউ কেউ এ ব্যাপারে রপ্ত হয়ে উঠলেন দিন কয়েকের মধ্যে। ভারতীয় প্রতিভা যে কত উচ্চগ্রামের, তার একটি পরিচয়।

অসমর্থের জন্য অনুকল্প ব্যবস্থাও আছে—কাঁটা-চামচে। দু-পাঁচ দিন শলাকা-চালনার পাঠ নিয়েছি অনেকেই আমরা। মুখে নির্বিকার হাসি—যেন ভারি একটা রসিকতা হচ্ছে। আমাদের সেই কার্তিক—মনে আছে তো? ফড়িঙে পোকা ধরার মতো দুটি কাঠিতে মুরগির ঠ্যাং সাপটে ফেলেছে মিনিট কয়েক ধস্তাধস্তির পর। চতুর্দিকে একবার তাকিয়ে নিল—অর্থাৎ দেখুন একবার সর্বজনে চক্ষু মেলে। তুলেছেও মুখের কাছাকাছি—হাঁ করেছে—হা ঈশ্বর? মাংসের টুকরো ছিটকে গিয়ে পড়বি তো পড়, তার সুবিখ্যাত আঠারো ডলারের ট্রাউজারের উপর।

সে যাই হোক, ধরা-বাঁধা কিছু নেই—কেউ মাথায় দিব্যি দিচ্ছে না, ঐ প্রণালীতে খেতেই হবে। উপকরণ সম্পর্কেও তাই। পচা গজালমাছ কি হাঙরের কাঁটার ঝোল যদি বাদ দাও, জেলে-ফাঁসে যেতে হবে না। মারাত্মক বিপদ হল, ভোজনপর্ব সমাধা হতে নিদেনপক্ষে ঘণ্টা তিনেকের ধাক্কা। আরম্ভ হয় ভদ্রতাসঙ্গত মৃদু ভাবে, রাশ ক্রমশ আলগা হয়ে আসে। চীন-ভারত মৈত্রীর নামে এক পেগ শেষ হল—ভরে দিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তিলেকের তরে গেলাস খালি থাকতে দেওয়া যেন অপরাধ। ওরা ভরে ভরে দিচ্ছে, আপনি অবিশ্রাম শেষ করে যান। বিশ্বশান্তির নামে খান এক পাত্র,

খান অতিথিদের সম্মাননায়, উদ্যোক্তারাই বা বাদ যাবেন কেন, তাঁদের সমৃদ্ধি কামনা করে অথিতিদের থেকে প্রস্তাব করুন টোস্ট। চলেছে তো চলেছে—অন্তহীন প্রবাহ। এ হেন ভোজের অনুষ্ঠান হামেশাই ঘটে না, এই বাঁচোয়া। কোন নতুন জায়গায় গিয়ে পৌঁছলে অথবা বিশেষ কোন ব্যাপার ঘটলে। ভাতের সঙ্গে আমরা ডাল খাই, ভোজের সঙ্গে সুরাও তেমনি ওদের কাছে। খাচ্ছে সেটা কিছু নয়, কেউ খাচ্ছে না—সেটাই পরমাশ্চর্য ব্যাপার। তেমন নাকি নেশাও হয় না ঐ বস্তুতে। স্বীকার করছি আমি কাপুরুষ ব্যক্তি—যাচাই করে দেখবার সাহস হয় নি। এর জন্য ঝঞ্ঝাট কম পোহাতে হয়েছে। মদের বদলে গেলাসে অরেঞ্জ স্কোয়াশ ঢেলে স্বাস্থ্য ও সৌভাগ্য পান করতাম। আমাদের দলপতি ডক্টর কিচলুও। রক্ষা এই, এই প্রকার কমবখ্‌ত নিতান্ত গোনাগুন্তি। সামান্য কয়েকটি মানুষে রস-ভঙ্গের কারণ ঘটত না।

রান্না বহু বিচিত্র রকমের। অর্ধেক তৈরি করে অতিথিদের ভোজে বসিয়ে দেয়—তার পর এক একটা তরকারি শেষ করে গরমা গরম নিয়ে আসে। অত্যুষ্ণ এক বস্তু বড় পাত্রে করে এনে রাখল; পিছনে আর একজন আসে কড়াই ভরতি ফুটন্ত ঝোল নিয়ে। ঝোল ঢেলে দিল পাত্রের উপর। ছাঁত করে ঐ টেবিলের উপরই ফুটে উঠল একটুখানি। আমাদের ব্যঞ্জন সম্বরা দেওয়া আর কি? চামচে কেটে এবারে নিজ হাতে নিয়ে নিন যতটা প্রয়োজন।

বড় বড় ভোজ, চার পাঁচ'শ মানুষ এক সঙ্গে খাচ্ছে, সেখানেও এই রীতি। কত লোক খাটছে না জানি, কি পদ্ধতিতে রান্নাবান্না করছে—ইচ্ছে করত রান্নাঘরে উঁকিঝুঁকি দিতে। কিন্তু বিদেশের মহামান্য অতিথি—লজ্জায় বাধে। পরে একদিনের কথা। এক ভোজে খুব দেমাক করছিলাম, যে যা-ই করুক—আমি বেছেগুছে সাত্ত্বিক খাওয়া খেয়ে এসেছি বরাবর। মেষ কিংবা মুরগি—তার ওদিকে যাই নি।

অধ্যাপক হুয়া (যতদূর মনে পড়ে, পিকিন য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক এই ভদ্রলোক) খুব হাসতে লাগলেন।

কোন চিজ কখন রসনা বেয়ে উদরে ঢুকছে, সব কি টের পেয়েছে ভায়া? এই ধরো, ভাজা-আরশুলার গুঁড়ো অতি উপাদেয় মশলা, ঐ গুঁড়ো ব্যঞ্জনে দু-চার টিপ ছড়িয়ে দিলে সেই স্বাদ ইহজন্মে জিভ থেকে মোছে না। এমন বস্তু থেকে মান্য অতিথিদের বঞ্চিত করেছি, এই কি হতে পারে কখনো?

বলেন কী!

গোঁড়ামি আছে নাকি?

সত্যি কিংবা রসিকতা ঠিক ধরতে পারলাম না। আমতা-আমতা করে জবাব দিই, তা নয়। অত্যন্ত যদি ভাল লেগে যায়, দেশে ফিরে কোথায় পাবো বলুন আরশুলাচূর্ণ, কেউটের কাটলেট, অথবা হাঙরের সুপ? ঐ ভয়ে এগুতে ভরসা পাই নি।

ওরা কিন্তু লজ্জিত নয় কিছুমাত্র। বাহাদুরি দেখায়, আজেবাজে আরও দশটা হাস্যকর খাদ্যের মিছামিছি নাম করে।

বলে, সব খাই আমরা। বিষটিষ না হয়, আর চিবানো গেলেই হল। কোন কিছু অকারণে নষ্ট হতে দেওয়া সামাজিক পাপ। তা সে মানুষ পশু পাখি কীটপতঙ্গ যা-ই হোক না কেন। সকলেরই মূল্য আছে।

তাই। চোর-ডাকাত, খুনি গুণ্ডা—ওরা বলে, তৈরি করে নিতে পারলে সকলেই অতি প্রয়োজনীয় সমাজের পক্ষে। জন্মপাপী কেউ নেই। গায়ে কালি লাগার মতো—চেষ্টা করে ধুয়ে-মুছে সাফসাফাই হওয়া যায়। তাই মৃত্যুদণ্ড দিয়েও মেরে ফেলে

না সঙ্গে সঙ্গে। থাকো জেলের মধ্যে এক বছর দু-বছর। ভাল ভাল লোক যাচ্ছে তাদের কাছে, শিক্ষা দিচ্ছে, হিতকথা আলোচনা করছে। রিপোর্ট নিচ্ছে দণ্ডিতের মনোভাব সম্পর্কে। শোধরাচ্ছে যদি বোঝা যায় আরও সময় দেবে—প্রাণদণ্ড মকুব হয়ে দীর্ঘ কারাবাস। তারও মেয়াদ কমবে নৈতিক উন্নতির অনুপাত ক্রমে। আহা, জীবন নিলে সবই তো চুকেবুকে গেল—সমাজের কাজে লাগতে পারে বেঁচেবর্তে থাকলে। দেখাই যাক না চেষ্টা করে।

এমনি সকল ক্ষেত্রে। কুয়োমিনটাঙের সঙ্গে মারাত্মক লড়াই করে তবে দেশের দখল পেয়েছে। কোন ইতর কাজে পিছপাও হয়নি কুয়োমিনটাঙ অধিকার বজায় রাখবার জন্য। বিদেশিরা যা করেছে, স্বদেশীয় শত্রুদের অপরাধ তার চেয়ে বেশিই। রেল রাস্তা উপড়েছে, পুল ভেঙেছে, কয়লার খনিতে কাদামাটি পুরে নষ্ট করে গেছে চলে যাবার সময়। কিছু কিছু তার নিদর্শনও আমাদের দেখাল। এত যারা ক্ষতি করেছে, সে দলের বহুতর পাণ্ডা আজ বড় বড় সরকারী চাকুরে—অনেক জরুরি বিভাগের অধিনায়ক। নতুন চীন গড়ে তোলবার কাজে তাদের উদ্যম ও আন্তরিকতা কারো চেয়ে কম নয়। একদা ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে যাদের উৎকট শত্রু বলে ভেবেছিল, আজকে অভেদাত্মা তাদের সঙ্গে। তিন বছরের * মহাচীন তাই বিশ্বজনের তাক লাগিয়ে দিয়েছে। সবাই এসো, আন্তরিকতার সঙ্গে দেশ গড়তে লেগে যাও—সকলের কাছে সে আহ্বান পাঠিয়েছে।

প্রথম এই চীনের সামাজিক ভোজে বসেছি। বিচিত্র অভিজ্ঞতা। এ-পাশে বিশিষ্ট কেউ, ও-পাশে দোভাষি, মাঝখানে আমরা এক-এক জন। অবিরত সওয়াল জবাব চলছে। ফৌজদারি আদালত হার মেনে যায়। থাকব সামান্য কয়েকটা দিন—মহাচীনের যতদূর জেনে যেতে পারি তার মধ্যে। সাঁইত্রিশটা দেশের পৌনে চার শ' মানুষ মাসাধিক কাল জেরা করে বেড়িয়েছি। খাওয়ার টেবিলেও বিরাম নেই, খেতে খেতেই খাতা বের করে টুকছি। দেশস্থ বুদ্ধিমানেরা তবু খেদোক্তি করেন, কিছু জানতে দেয় নি রে—অভিনয় করে বোকা বুঝিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে খাওয়া শেষ করে রাতদুপুরে ঘরে এলাম। সকাল বেলা চলে যাচ্ছি। আর নয়, শুয়ে পড়ো। ঘুমিয়ে পড়ো তাড়াতাড়ি। নতুন চীনের প্রথম রাত্রি। সারাদিন আনন্দ-ভাসিত যত মুখ দেখছি, অন্ধকারে সকলে যেন ঝিলিক হানছে। আরও আছে। বইয়ে পড়েছি আর শুনেছি যাদের কাহিনী। নামহীন যে শত-সহস্রের শবস্তূপ সিঁড়ি হয়েছে আজকের এ দিনে পৌঁছবার...

পুরানো কথা কিঞ্চিৎ অবধান করুন।

সাত-সমুদ্র পারে ইউরোপের বন্দরে ফিরিঙ্গিরা বহর সাজাচ্ছে। রাজা-রানীর কাছে দরখাস্ত করে, হুকুম দাও—ব্যাপার-বাণিজ্য করে আসি। তা পরের দেশে চরে খেয়ে বেড়াবে, বেশ তো, ভালই তো—এতে আর আপত্তির কি? ছাড়পত্র মিলল। রে-রে করে ছড়িয়ে পড়ে বণিকেরা নানান দেশে। বিশেষ করে এশিয়ার নির্বিরোধ সমৃদ্ধ সুপ্রাচীন দেশগুলোর উপর।

রেশম আর পোর্সিলেনের লোভে এসে পড়ল চীনে। চারুচিত্র-আঁকা যে কাগজ এঁটে ইউরোপ দেয়ালের বাহার করত, তা-ও এখানকার। চীন তার বদলে কিনত ঘড়ি, টুকিটাকি শৌখিন জিনিস। কিন্তু ঘড়ি আর কত কেনা যায় বলুন? প্রাচীন সভ্যতা ও শিল্পের দেশ চীন—বিদেশি ব্যাপারির কাছ থেকে কেনবার মতন জিনিস কী আছে?

* আমরা ১৯৫২ অব্দে চীনে যাই।

অতএব রুপো খরচ করতে হবে চীন থেকে যদি কিছু কিনতে চাও। রুপোর ভাণ্ডার চলে যাচ্ছে চীনে, রুপো দিয়ে দিয়ে য়ুরোপ গরিব হয়ে যাচ্ছে। এ কেমনধারা ব্যবসা ? খোঁজো কোন বস্তু, যা বদলাবদলি চলে। পুঁজি ভাঙতে হয় না যাতে।

ব্রিটিশরা অবশেষে পেয়ে গেল তেমনি বস্তু—আফিঙ। আফিঙের মৌতাতে ঝিমোক পড়ে পড়ে চীন—চীনের মালে ভরা সাজিয়ে ব্যাপারি-জাহাজ ততক্ষণ দেশ-দেশান্তর পাড়ি দেবে। হাওয়া ঘুরে গেল। আগে অজস্র রুপো চীনে আসছিল, এখন তামাম জিনিস-পত্র দিয়েও আফিঙের দাম শোধ হয় না। স্রোতের জলের মতো রুপো চীন থেকে চলে যাচ্ছে বাইরে।

তখন টনক নড়ল। নেশায় পড়ে গোল্লায় যায় এত বড় একটা জাত! দুই কোটি আফিঙখোর দেশের মধ্যে—দু-পাঁচ শ' নয়। আফিঙের আমদানি নিষিদ্ধ হল। কিন্তু ও বললে কে শোনে ? ইংরেজ ইতিমধ্যে ভারতের আফিঙ একচেটিয়া করে বসেছে। তোমার না থাক, গরজ যে আমাদের। জবরদস্তি করে কেনাবো। আইনে না হোক, বে-আইনে চলবে আফিঙের আমদানি।

আরও এক ব্যাপার। ভারতবর্ষ মুঠোয় পুরে টাকার কুমির হয়ে পড়েছে ইংরেজ। কলকারখানায় বিলাত ভরে গেছে; পাহাড় জমেছে তৈরি জিনিসপত্রে। খদ্দের চাই—পৃথিবী চুঁড়ছে খদ্দেরের চেষ্টায়। এত বড় চীনদেশ—আয়তনে গোটা য়ুরোপের চেয়ে বড়। চুঁ মারল সেখানে, চীন, তোমায় খদ্দের হতে হবে।

চীনের কবুল জবাব। সবই মোটামুটি আছে আমাদের—আমরা কিনব না। তাই বললে কী হয়—ছি! অত বড় দেশ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, মাল নিয়ে আমরা তবে যাই কোথায় ?

মিশনের পর মিশন আসছে। কখনো নরম সুর, কখনো গরম। শেষ মিশনের কর্তা লর্ড নেপিয়ারের প্রায় অর্ধচন্দ্র-প্রাপ্তি ক্যাণ্টন থেকে। ওদিকে আফিঙ আর আফিঙ—চোরাই আফিঙের ঠেলায় দেশ উৎসন্নে যাবার জোগাড়।

১৮৩৯। বিশ হাজার আফিঙের বাক্স চুরমার করে দেওয়া হল এইখানে—ঐতিহাসিক এই ক্যাণ্টন বন্দরে। চোরাকারবারিরা ব্রিটিশ ও আমেরিকার মানুষ—স্বদেশীয় সরকারের কাছে তারা হায় হায় করে পড়ল। কী অন্যায়, কী অন্যায়!

বেশ, ভাল কথায় শুনছ না—কামানের মুখেই তবে রফা নিষ্পত্তি! ব্রিটিশ যুদ্ধ-ঘোষণা করল, আমেরিকা সহায়। যুদ্ধান্তে নানকিনের সন্ধি। হংকং নিয়ে নিল ব্রিটিশ। অবাধ-ব্যবসায়ের পত্তন হল ক্যাণ্টন সাংহাই ইত্যাদি বন্দরে। যুদ্ধের যাবতীয় খরচ চীনকে দিতে হবে। এই হল আফিঙ যুদ্ধ। চীনের দরজা খুলে দেওয়া হল দেশ বিদেশের লুঠেরার সামনে!

মাঞ্চু-রাজারা দেশের মালিক। লড়াইয়ে হেরে তাদের ইজ্জত গিয়েছে। লোকের তেমন আস্থা বা আতঙ্ক নেই রাজার সম্পর্কে! সর্বনাশ, সাধারণ মানুষ শেষটায় ক্ষমতা পেয়ে যাবে নাকি ? রাজরাজড়ারা সময়-বিশেষ অল্প অল্প বীরত্ব দেখালেও আসলে তাঁরা লোক ভালো, শেষ পর্যন্ত সামলে যান। তখন বিদেশিরাই আবার নিজ স্বার্থে মাঞ্চু রাজার পিঠ চাপড়ায়। তোমার পিছনে আছি আমরা, আর আমাদের কামান বন্দুক! এমন ধাতানি জুড়ে দাও যেন একটা মানুষ কোন দিকে মাথা তুলতে না পারে।

তবু চাষীদের মাঝ থেকে বিদ্রোহ উঠল। তাইপিং বিদ্রোহ। নেতাকে সকলে বলে 'স্বর্গের রাজপুত্র'। জোয়ান অব আর্কের মতো চাষীর ছেলে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ

পেয়েছেন। 'শান্তির রাজত্ব' বানাবেন তিনি। সাদামাঠা অতিসরল তাঁর বক্তব্য—সকলে খাবে পরবে, জমি ও টাকাকড়ি সকলের হবে, সব মানুষ সমান। আজকের মাও সে-তুঙের কথা এরই রকমফের কি না, দেখুন ভেবে।

রাজশক্তি বিপন্ন—রাজার সঙ্গে যত দহরম মহরম থাক, এমন মওকা বিদেশিরা ছেড়ে দেবে কেন? এটা দাও, ওটা দাও—রাজার কাছ থেকে নানা সুবিধা আদায় করে নিচ্ছে। এরই মধ্যে একবার পিকিন শহরটা লুঠপাট করে কিঞ্চিৎ নগদ মুনাফাও হল। তারপর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সকলে দাঁড়াল তাইপিং গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে। খৃীষ্টভক্ত মহাধার্মিক মিশনারীরা আগে থেকেই তাইপিঙের আতিথ্যে আছেন। খুব খাচ্ছেন দাচ্ছেন, তোয়াজে আছেন। তাঁরা গোপনে খবরাখবর জোগান। তাইপিং দল যত অতিথিবৎসল হোক, চাষা-ভুষো তো বটে। তারা রাজ্যপাট চালাবে, এটা কেমন করে সহ্য হয়? দেশময় রক্ত-বন্যা। কৃষক-নেতা সেই স্বর্গের রাজপুত্র আত্মহত্যা করে বাঁচলেন তো তাঁর শিশু-পুত্রকে কেটে রাগের শোধ নিল। পরিবারসুদ্ধ খতম—বংশে বাতি দিতে কেউ রইল না।

উনিশ শতকের শেষ গণ-অভ্যুত্থান—বক্সার-বিদ্রোহ। সাহিত্যিক দাদামশায় কেদার-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই বিদ্রোহ-দমন ব্যাপারে ইংরেজ-সরকার চীনে পাঠিয়েছিল। রাজা হলেন বিদেশিদের যো-হুকুম তাঁবেদার, ভাল ভাল বন্দর বিদেশিরা নিয়ে নিয়েছে, রাজকরের বেশির ভাগ বিদেশির ট্যাঁকে যাচ্ছে লড়াইয়ের খরচের বাবদ। বন্যার জলে জমিজিরেত ঘরবাড়ি ভাসছে, ট্যাক্সের দায়ে মাথা বিক্রি। মানুষের দুঃখের অবধি নেই।

প্রতিকার চাই। প্রতিরোধ করতেই হবে। গুপ্ত-সমিতি চারিদিকে। শাসন-নীতির সামান্যতম বিরুদ্ধতা প্রকাশ্যে করবার জো ছিল না। বিশেষত চাষীর তরফ থেকে। এরা চাইল রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ তো বটেই—বিদেশিরও নির্বাসন। পশ্চিমি বণিক আর মাঞ্চু-রাজা সবাই ওরা এক জাতের।

রাজার তরফ থেকে তখন বিষম এক চাল চালল। চীনের আসল দুষমন হল বিদেশিরা—আমরা এই মাঞ্চু-রাজারা নই। বিদেশি আপদগুলোই যত দুঃখ-কষ্টের কারণ, ওদের তাড়াবার জন্যে রাজশক্তি সকল রকম সাহায্য করবে। এক হয়ে লড়বে রাজা ও প্রজা।

রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে আক্রোশ, সেটাও এমনিভাবে চালান করে দেওয়া হল বিদেশির অভিমুখে। মোট আটটা বিদেশি শক্তি—সকলে একত্র হল। হেরে গেল চীন। দেশ-শাসনের পুরোপুরি দায়িত্ব তারা নিল না। নলচে আড়াল দিয়ে তামাক খাওয়ার মতো রাজাকে খাড়া রাখতে হবে সামনে। বুড়ি রাণীকে বাতিল করে তার দু-বছর বয়সের হামাগুড়ি-দেওয়া ছেলেকে রাজতক্তে বসাল। হেনরি পিউ-ই তার নাম—শেষ মাঞ্চু-সম্রাট।

রাজতন্ত্র খতম হল আরও পরে—১৯১২ অব্দে, সান-ইয়াৎ-সেন যখন সর্বমান্য দেশনেতা।

(৬)

রাত আছে তখনো। কড়া নাড়ছে। ঘুম ভেঙে চমকে উঠি।

কে?

দরজা খুললাম। পেরিন ঘুমোন নি। জাগিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন ঘরে ঘরে। 'উঠে সকলে তৈরি হও। রওনা হতে হবে।

আর যেই দরজা খোলা পেয়েছে, একজন সঙ্গে সঙ্গে ঢুকল চা এবং ফলমূল ইত্যাদি

নিয়ে। সেবা করুন কিঞ্চিৎ। পেট খালি থাকলে ধকল সামলাবেন কী করে?

পট্টনায়ককে ডেকে দিলাম।

লেগে যাও ভাই। শেষরাত্রে সাজিয়ে এনেছে—ফেলে গেলে ওরা দুঃখ করবে। দু ঢোক চা গিলে তাড়াতাড়ি আমি স্যুটকেশ খুলে বসলাম। ছোট স্যুটকেশের অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বড়টায় ভরে হালকা করে নেবো। কাল বেশ ভোগান্তি হয়েছে আলস্যের দরুন।

কাজ সেরে বাথরুমে যাচ্ছি স্নানাদি সমাপনের জন্য। হবার জো আছে? পুনশ্চ তলব, চলে আসুন—

কোথায় গো?

ব্রেকফাস্ট তৈরি—কিছু খেয়ে যান।

আর এই যে—এটা কি হল? এখন অবধি সাপটে ওঠা যায় নি—

বিছানার খাওয়া—এই আবার ধর্তব্যের মধ্যে নাকি? অনেক দূরের পথ। মনোরম ভাবে ঠেসে খেয়ে নিন, নইলে কিন্তু কষ্ট হবে।

অতএব ব্রেকফাস্টে গিয়ে বসলাম। সে পর্ব সমাধা করে লাউঞ্জে এসেছি—বসবেন না আর। দরজায় গাড়ি, একেবারে গাড়িতে উঠে জুত করে বসুন।

ঘরে যাবো যে একবার। ছোট-স্যুটকেশ হাতে নিয়ে নেবো।

সে কি আর আছে? এরোড্রোমে পেঁছে গেল এতক্ষণ।

চাই যে আমার সেটা। পথের দরকারি জিনিস তার ভিতর।

লিফটে উঠে পড়লাম। একপাশে আলাদা রাখা ছিল, স্বচক্ষে দেখে আসি। না, কিছুই নেই। সমস্ত নিয়ে গেছে। ঘর খাঁ খাঁ করছে।

নন্দীকে ধরলাম। এ বড় মুশকিল! লোকগুলো যেন মানুষ নয়, ঘড়ির কাঁটা। ওদের সঙ্গে তাল রাখি কেমন করে?

নন্দী অভয় দিলেন, পিকিন গিয়ে পেয়ে যাবেন। ভাবনা নেই।

আমার খাতাপত্তর যে ওর মধ্যে। এতখানি পথ হাই তুলে কাটিয়ে শেষটা হাতির মুণ্ড হয়তো গণেশের ধড়ে চাপাবো ভ্রমণ-কথা লিখবার সময়।

আচ্ছা—এরোড্রোমে চলুন। দেবো বের করে আপনার স্যুটকেশ।

নিশ্চিন্ত হলাম। নন্দী হলেন দলের একজন সেক্রেটারি—দস্তুর-মতো ক্ষমতা ধরেন, আমাদের মতো হেলাফেলার মানুষ নন। ওঁদেরই তাঁবে আছি—উঠতে বললে উঠি, শুতে বললে শুই। চুপি-চুপি নিবেদন করি, একুনে কত জন সেক্রেটারি—সেটা জিজ্ঞাসা করলে বিপদ। চেষ্টা করেছি, কিন্তু গুণে কূল পাই নি। এক-এক জন উদয় হয়ে হুকুম ঝাড়ছেন। কে বটেন ঐ মহাশয়? সেক্রেটারি। পিকিনে পেঁছে হপ্তাখানেক কেটে গেল সেক্রেটারিবর্গের মুখ চিনতে। পাঞ্জাব-বঙ্গ-গুর্জর-মহারাষ্ট্র সকল দেশেরই আছেন। পুরুষ আছেন মেয়ে আছেন। তবে এটা বলা যায়, সেক্রেটারির সংখ্যা প্রতিনিধির চেয়ে কম। বেশি হলেও দোষ ছিল না। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি হতে পারে তো এতে আর আপত্তি কিসের?

এরোড্রোম শহর থেকে খানিকটা দূরে পাহাড়তলি জায়গায়। ঘাসবন হয়ে আছে গ্যাংওয়ের উপর। আকাশ-চারণ খুব যে চালু এমত মনে হয় না। গাড়ি থেকে নামিয়ে ওরা সমাদরে টেবিলের সামনে বসাল। সেই এক ব্যাপার। ফলের গাদা, চা, কফি, স্যাণ্ডুইচ, নানাবিধ শীতল পানীয়।

এক সকরুণ মিনতি। সেবা করুন। দূরের পথ পিকিন—কখন পেঁছচ্ছেন

ঠিক নেই—

ছাড়বে কখন বলো তো ?

তাও বলা যাচ্ছে না। কী করবেন বসে বসে—খেতে থাকুন।

নন্দী প্রতিশ্রুতি ভোলেন নি। একে বলছেন, ওর কাছে দরবার করেছেন—শেষটা হতাশ হয়ে এসে বললেন, জিনিসপত্তোর প্লেনে উঠে গেছে। পিকিনের আগে উপায় নেই।

সর্বনাশ! আমি কি করি তাহলে ?

লেখার প্যাড থেকে তিনি খান তিনেক পাতা ছিঁড়ে দিলেন। এতেই যাহোক করে চালিয়ে নিন আপাতত।

চীনাবন্ধু একজন ছিলেন পাশে। হেসে উঠে তিনি বলেন, কী মুখ বেজার করছেন। খান।

হায় ভগবান, পাকস্থলীর সঙ্গে একটা অতিরিক্ত থলি দিতে যদি। উটের যেমন আছে। তাহলে নিদেন পক্ষে বছরের খাদ্য আকণ্ঠ বোঝাই করে দেশে ফিরতাম। কত আঙুর আপেল পচিয়ে এসেছি, ভাবতে গিয়ে এখন রসনা লালায়িত হয়ে ওঠে।

আর কী বলব—আমাকে নিয়েই কি যত গোলমাল!

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছি হোটেল থেকে। ভাবলাম সময় তো অঢেল—নতুন ঝকঝকে বাথরুম, চান-টানগুলো সেরে নেওয়া যাক এই ফাঁকে।

বেশিক্ষণ যায়নি। এরই মধ্যে কেমন মনে হল, বসবার ঘরটা নিঃশব্দ হয়ে গেছে, মানুষজনের সাড়া নেই। বেরিয়ে এসে—যা ভেবেছি তাই—এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। কা কস্য পরিবেদনা! প্লেন ছাড়া অবশ্য চাট্টিখানি কথা নয়, আগে অনেক রকম পাঁয়তারা ভাঁজতে হয়। আরও এগিয়ে উঁকিঝুঁকি দিতে এরোড্রোমের একজনের সঙ্গে দেখা।

সবাই উঠে গেছে, আপনি পড়ে আছেন যে!

সগর্জনে প্রপেলার ঘুরছে। আমাকে ফেলে প্লেন চলল তবে তো সত্যিই। দৌড়চ্ছি। আমার আগে সেই লোকও দৌড়চ্ছেন। চিৎকার করছেন, রোখো—রোখো। কেউ শুনছে, তেমন লক্ষণ নেই। প্লেনের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে তিনি প্রচুর হাত-পা ছুঁড়তে লাগলেন পাইলটের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য, তারপর আমার দিকে ফিরে হাতের ইঙ্গিতে দৌড়াতে নিষেধ করলেন। অর্থাৎ ওরা দেখতে পেয়েছে, আর ভয় নেই। জোর কমতে কমতে প্রপেলার বন্ধ হয়ে গেল। প্লেনের দরজা বন্ধ, সিঁড়ি সরিয়ে নিয়েছে, মিনিট খানেকের মধ্যেই খুলতে শুরু করল। আবার সিঁড়ি লাগিয়ে দেওয়া হল। দস্তুরমতো শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তখন আমার। একটা সিটে ধপাস করে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগলাম। তারপর সামলে নিয়ে অভিমান ভরে পাশের ব্যক্তিকে বললাম, বেশ কিন্তু আপনারা! একটা লোক তেপান্তরে পড়ে রইল, কারো তা হুঁশ হল না? পথের উপর মারা পড়লে পায়ের ধাক্কায় মড়া ঠেলে এগিয়ে চলে যাবেন, সেই রকম দেখছি।

আকাশলোকে উড়তে উড়তে নন্দীর দেওয়া চিঠির কাগজে যা লিখেছিলাম, কতকটা তার অবিকল তুলে দিচ্ছি। একটা কথারও এদিক-ওদিক করিনি—২৩ সেপ্টেম্বর '৫২, বেলা ১০টা। দূরের পাল্লা, ট্রেনে যেতে দিন তিনেক লাগে। তাই উড়ে চলেছি। পার্ল নদী পার হয়ে ছুটেছি উত্তরমুখো। মহাচীন, সুপ্রাচীন কাল থেকে আমার ভারতবর্ষের কত মহাজন, দিন, মাস, বৎসর ধরে তোমার ভূমির উপর পথ অতিবাহন করেছেন। আমরা নূতন কালের যাত্রী—তোমর দিগন্তপ্রসার আকাশের উপরে উড়ে চলেছি।

উপরে, কত উপরে। নিচে কিছু দেখা যায় না। কলঙ্কলেশহীন সাদা মেঘপুঞ্জ—সেই শ্বেত সমুদ্রে ভেসে ভেসে চলেছি। আমার বাম দিকে সূর্য ম্লান রৌদ্রের কর-বিস্তার করছে—আর এ দিকে-ওদিকে যতদূর তাকাই অনন্ত অপার মেঘসমুদ্র। ঈষৎ তরঙ্গ উঠেছে সেই সমুদ্রে, আবার মনে হচ্ছে দুধ-সাগর—দুধ ঢেলে দিয়েছে সমস্ত অন্তরীক্ষে; দুধেরই ফেনা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। ভাসমান হিমশিলার মতো ঐ কয়েকটি মেঘস্তূপ। দুধসাগর ফুঁড়ে ক্ষীরের পাহাড় উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে নাকি? আকাশপথে কত ঘুরেছি, কিন্তু এমনটা দেখি নি কখনো। উত্তর-মেরুর অভিমুখে চলেছি—তুষার-লুপ্ত মেরুলোকের কথা কেতাবে পড়া যায়, এ যেন সেই বস্তু।

তন্দ্রা মতো এসেছিল। অপরাধ নেই, কাল রাতে ভোজ খেয়ে সাড়ে-এগারোটায় শয্যা নিয়েছি। রাত থাকতে উঠে গোছগাছ করতে হয়েছে। ওরই মধ্যে চা এবং ফল ইত্যাদি এনে দিয়েছে কামরায়। আবার ব্রেকফাস্ট সাড়ে-ছটায়। এরোড্রোমেও ব্যবস্থা ছিল, একাধিকবার গলাধঃকরণ করতে হয়েছে। প্লেনের মেয়েটি এখানেও নিবেদন করছে, কিঞ্চিৎ চলবে কিনা? পরের দেশে এসে পর-খাদ্য পেয়ে ক্ষিধে অসম্ভব রকম দেখছি অনেক জনের। আমি ঐ মহাশয়দের পদনখের যোগ্য নই। খেয়েই যাচ্ছেন তাঁরা—প্রাণপণ প্রয়াসে খাচ্ছেন। সাধ্য কী পাল্লা চালাতে পারি! আপোসে হার মেনে বসে আছি। মেয়েটা বারংবার বলছে। কফি খেয়ে মান রক্ষা করলাম। চিত্র-বিচিত্র গেলাসে কফি এনে দিল। কাগজের গেলাস—খাওয়ার পর ফেলে দিতে হয়, কিন্তু এমন মনোরম ছবি ঐ স্বল্পস্থায়ী জিনিসে যে গেলাসটা সযত্নে মোড়ক করে বাক্সে তুলতে ইচ্ছে করে।

চারিদিক এখন রোদে বিভাসিত। স্বচ্ছ সুন্দর আকাশ। আবার চোখ বুজেছি। হঠাৎ এক অপরূপ অনুভূতি—চোখ মেলে দেখি, মেয়েটা এক পাতলা কম্বল আমার পায়ের উপর দিয়ে চারপশে পরম যত্নে মুড়ে দিচ্ছে। আর ইতিমধ্যেই কোন সময় চেয়ারের ঠেশান নামিয়ে আরামে ঘুমের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অনেকদিন আগে, মা যখন ছিলেন—ঘুমন্ত ছেলে এমনি যত্ন পেত। আজকে এই ভিন্ন দেশে তুমি কোন মমতাময়ী আমাদের এমন স্নেহ দিচ্ছ। শুধু সামাজিক কর্তব্য—তার বেশী নয়? ভাবতে মন চাচ্ছে না।

পাইলটের ঘর থেকে স্লিপ এলো—কুনাং প্রদেশ, চেয়ারম্যান মাও-সে-তুঙের দেশের উপর দিয়ে যাচ্ছি। বিচিত্র নিসর্গ দৃশ্য। প্লেন যাচ্ছিল দশ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে—নেমে নিচুতে এল। নিঃসীম সবুজ পাহাড়—আঁকাবাঁকা নদীরেখা—সবুজের মধ্যে সাদা ঝিকিমিকি। সুদীর্ঘ অজগরগুলো ঘুমুচ্ছে যেন পাহাড়ের কোলে রোদ পোহাতে পোহাতে। ধোঁয়ার মত এক দমক মেঘ এসে দৃশ্যটা ঢেকে দিল একবার। মেঘ সরে গেল—খণ্ড খণ্ড মেঘ পেঁজাতুলোর মতো বিচ্ছিন্ন ভেসে বেড়াচ্ছে আমাদের অনেক নিচে। সামনে আবার দুস্তর মেঘসমুদ্র। হয়তো তারই মধ্যে গিয়ে পড়বে এখনই···

স্লিপ এলো, ১১-১৭ মিনিটে হ্যাঙকাউ পৌঁছচ্ছি। আবহাওয়া সুন্দর। এরোড্রোমটা উ-চ্যাং নামক জায়গায়; সেটা হ্যাঙকাউ-এর আড়পার।

সওদাগর ছোকরাটি প্লেনে উঠেই চোখ বুজেছেন, এবং অনন্তনিদ্রা দিচ্ছেন। তাঁর কোনদিকে লক্ষ্য নেই। ট্রেনেও দেখেছি একই ব্যাপার—গাড়িতে ওঠা মাত্র ঘুমিয়ে পড়েন। আর খাওয়ার আহ্বান এলে চোখ মেলে অগোণে খেতে শুরু করে দেন। সাতে-পাঁচে কোন তালে নেই। এক বন্ধু বলছিলেন, আপনারা নানান বড় বড় কথা বলেন—তার মধ্যে উনি থই পান না। অতএব, ঘুমিয়ে থাকাই নিরাপদ। ঘুম না

এলে চোখ বুজে নিঃসাড়ে থাকেন।

ক্ষিতীশ ধরে পড়ল, বাংলা গান সে গাইবে—তার ইংরেজি অনুবাদ করে দিতে হবে। নইলে বুঝবে কে? অন্যে পরে কা কথা—আমাদের অবাঙালিরাও তো হাঁ করে চেয়ে থাকবেন। আরে দূর, এখন এই প্লেনের মধ্যে হয় নাকি? পিকিনে গিয়ে বসি আগে জুত করে। কিন্তু নাছোড়বান্দা ক্ষিতীশ।

সরস্বতী মুখাগ্রে এলেন সহসা। গানের এক-এক পদ শুনছি, আর গড় গড় করে ইংরেজি বলে যাচ্ছি। আড়াই মিনিটে খতম। তার মানে, নিরঙ্কুশ অবস্থা—বাংলা আর ইংরেজি পাশাপাশি মিলিয়ে কে দেখতে যাচ্ছে বলুন? বিদ্যে ধরা পড়বার ভয় নেই—অনুবাদটা শ্রীতিসুখকর। এবং মূলের সঙ্গে তা ভাসা ভাসা থাকলেই হল।...

চীনের বৃহত্তম নদী ইয়াংসি। তারই তীরে হ্যাংকাউ। প্লেন যেখানটা নামল, সে এক মাঠ—উলুঘাসে ভরা। এরোড্রোম কে বলবে তাকে? মাঠের মধ্যে খানিকটা জায়গা সাফসাফাই করে নিয়েছে। ভাঙাচোরা গ্যাংওয়ে—কোন গতিকে অতি সাবধানে ওঠানামা করতে হয়। বিশ্বযুদ্ধের সময় দায়ে পড়ে তাড়াহুড়োর মধ্যে তৈরী। তারপর শুনতে পেলাম, কুয়োমিংটাং চলে যাবার সময় নষ্ট করে দিয়েছিল। এমন একটা নয়—অনেক জিনিসই। সমস্ত আবার নতুন করে গড়তে হচ্ছে। শান্তি সম্মেলনের ব্যাপারে ক্যান্টন পিকিন বিশেষ প্লেনের যাতায়াত চলছে, বিমানঘাঁটির কর্মতৎপরতা তাই বেড়েছে এই ক'দিন।

অনেকগুলো মোটরগাড়ি। প্লেন নামবার সময় লক্ষ্য করেছি। ভূতলে পা দিতেই যথারীতি ফুলের তোড়া নিয়ে অভ্যর্থনা। প্রচুর হাততালি।

একজন বা দু'জন এক-এক মোটরে। শহরে নিয়ে যাবে নাকি? নদীর দু-পারেই শহর, প্লেন থেকে দেখেছি। কিন্তু দূর অনেকটা যে এখান থেকে। তা নিয়ে যাও যেখানে তোমাদের খুশি। শুধু মাঝপথে আবার গিলতে বসিও না দোহাই।

সিকি মাইলও হবে না—মোটরগুলো মাঠের সীমানায় গিয়ে থামল। নতুন বাড়ি তুলছে, আরও তুলছে। এয়ার অফিস ও লোকজনের বসবার জায়গা। স্বচ্ছন্দে এটুকু হেঁটে আসতে পারতাম, কিন্তু অতিথির পা মাটির উপরে উঠবে পড়বে, এ কেমন কথা! আর যা আশঙ্কা করেছিলাম—ঘরের মধ্যে নিয়ে বসাল, সামনে টেবিল, টেবিলের উপর খাদ্যসম্ভার।

করজোড়ে নিবেদন করলাম, নিতান্ত অক্ষম, নিরুপায়—মাপ করতে হবে। তাই হয় নাকি? শান্তির সৈনিক আপনারা—নারাজ হলে চলবে কেন? সময় নেই যে একটা দিন আটকে রেখে দেখিয়ে শুনিয়ে দিই, মন খুলে দুটো কথা বলি। এর উপরে একটু কিছু মুখে না দিয়ে যদি চলে যান, আমাদের ভারি দুঃখ হবে।

ভদ্রতার মামুলি বকুনি নয়, প্রতিটি কথা আন্তরিকতায় স্নিগ্ধ। নির্গত হচ্ছে মুখ থেকে নয়, অন্তর থেকে। এমন নিবিড় আথিত্য একান্তরূপে আমাদের প্রাচ্যের। পথে প্রান্তরে অচেনা আত্মীয়েরা বাৎসল্য বিছিয়ে আহ্বান করেন।

সময় বেশি নেই, প্লেন ছাড়বে আবার এখনই। ক্ষিতীশ গান ধরল। সুদূর-বিস্তৃত ইয়াংসির শীতল হাওয়ায় সুরতরঙ্গ খেলে বেড়াচ্ছে। শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শুনছে। শেষ হল গান। ইংরাজিতে আমি গানের মর্ম বললাম। দোভাষি ছেলেটি চীনা ভাষায় বুঝিয়ে দিল সকলকে। করতালি ধ্বনি।

নিরলস ক্ষিতীশ। গানে তার আপত্তি নেই। শেষ হয়ে গেল .ওদের একজন হাত

ধরে টানে।

আর নয়, এবারে রওনা—

মোটরগাড়ি নিয়ে গেল প্লেনের পাশটিতে। আকাশে উঠলাম আবার। এক পাক ঘুরে ইয়াংসি মহানদীর উপর। বিপুল বহুব্যাপ্ত জলরাশি। সমস্ত সুস্পষ্ট দেখছি। বাঁধ দিয়ে নদীর বন্যারোধ করা হয়েছে। দিগ্ ব্যাপ্ত চর। চরের এখানে ওখানে ক্ষেত, সরু নদী মাঝে মাঝে চর কেটে বেরিয়ে গেছে। শস্যশ্যামায়িত রূপ দেখে দুচোখ প্রসন্ন হয়। ঘরবাড়িতে ভরা এক একটা জায়গা—গ্রাম ওগুলো। কতগুলো গ্রাম। ঐ নদীচরে, কে গুনে বলবে?

দালানকোঠার ছাত নজরে পড়ছে। অতএব সমৃদ্ধিমান জনপদ। সুদীর্ঘ রাজপথ গেছে গ্রামগুলি সংযুক্ত করে। টুকরো কাগজে বর্ণনা লিখে রাখলাম—কোন একদিন এই লেখা পড়তে পড়তে চরমভূমির পরিপূর্ণ ছবি মনে ভাসবে। ইয়াংসি আর দেখা যায় না, পাহাড়ের আড়ালে পড়ে গেছে। চলেছি, চলেছি…· ·কতদূর আর পিকিনের!

লাঞ্চের সময়টা এবারে আর কোন ওজর গ্রাহ্য হল না। মুরগির ঠ্যাং, আর কিসের মাংস, ডিম, কাঁকড়ার একটা উপাদেয় তরকারি, নানা রকম ফল। খাওয়া শেষ করে কাচের জানলায় অলস দৃষ্টি বিস্তারিত করে বসলাম…

বেলা পড়ে এসেছে। ঘণ্টা বাজল, চীনা লেখা ফুটে উঠেছে সামনের দেওয়ালে অর্থাৎ পেটি বাঁধো, পিকিন নিকটবর্তী, প্লেন নামবে। বড় নদীর উপর দিয়ে যাচ্ছে। গেরুয়া বালুবেলা, ঘোলা জল। শহর দেখা যাচ্ছে। রেললাইনে, নদীর উপরে পুল, জলস্রোত দুর্বার বেগে চলেছে…

(৭)

পিকিনে নামলাম, তখন সন্ধ্যা আসন্ন। ফুলের তোড়া সহ তেমনি শিশুরা। বিশিষ্টরা অনতিদূরে। ভারত-দূতাবাস থেকে এসেছেন শ্রীযুক্ত পরাঞ্জপে। মারাঠি যুবা—সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও কর্মিষ্ঠ। চীনকে ভালবাসেন মনে প্রাণে, তার সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি পরম প্রীতিপর। পিকিনে বছর পাঁচেক আছেন, দূতাবাসের চাকরি সম্প্রতি পেয়েছেন। আমাদের এক তরুণ বন্ধু সতীরঞ্জন সেন শান্তিনিকেতন থেকে চীনে গিয়েছিলেন—এঁরা দুজনে সতীর্থ। সতীরঞ্জন আমার সম্পর্কে খান কয়েক চিঠি দিয়েছিলেন, পরাঞ্জপের নামও ছিল। কিন্তু বিমানঘাঁটির ব্যস্ততার মধ্যে পরিচয় এখন সম্ভব হল না।

ভারতীয় দলের অনেকে আগে গিয়ে পেঁচেছেন—তাঁরাও এই বিমানঘাঁটি অবধি এসেছেন। পরিচয়ের দু-চারটে কথার পরে সেই ব্যাপার—খেতে বসে যাও এবার—

শ্রীমতী আচার্য এগিয়ে এসে আপত্তি জানান। আর সবাই খাক, ক্ষিতীশের খেলে চলবে না। দলের মধ্যে সবে-ধন এ একটি গায়ক। ক'দিন আগে এসে ওঁরা মহা বিপদে পড়েছেন। চীনা মেয়েগুলো অস্থির করে মারছে। গান শোনাও তোমরা—ভারতের গান। গানের পর গান তারাই গাইছে, ভারতীয়রা মুখ ভোঁতা করে আছেন। কিন্তু কেন? গান গায় না, হেন মানুষ নেই। ম্যালেরিয়া জ্বর, প্রেমোদয় কিম্বা ভূতের ভয় হলে গেয়ে থাকেন না আপনার গান? তারই দু-একখানা ছাড়লেই হত! খামোকা হার স্বীকার করার মানে হয় না।

আমরা তো খাওয়ার টেবিলে জাঁকিয়ে বসেছি, আর ওদিকটায় নাচ-গান। বাংলা গান ও চীনা গানে মেশামেশি, ভারত ও চীনের ছেলেমেয়ে হাত-ধরাধরি করে নাচছে। ওরা চীনা ধরেছে, এরা এখন হুঁ-হা করে গলা মেলাচ্ছে সেই সঙ্গে; আবার বাংলা

গানের সময় ওদের সেই ব্যাপার। অই দেখলাম—ভাষার পার্থক্য কিছুই নয়, ভূমির ব্যবধানও মিলনের বাধা হয় না। মন একমুখী হলে নিমেষে মিল হয়ে যায়।

চেয়ে চেয়ে দেখি, অজ পাড়াগাঁর—শহরের নিশানা নেই কোন দিকে। তরিতরকারির ক্ষেত, ধানবন। কৃষকদের বাড়ি—মাঝে মাঝে টালি-ছাওয়া পাকাবাড়িও দেখা যাচ্ছে।

এমনি চলতে চলতে আমাদের বাস রেল-রাস্তা পার হয়ে বিশাল পাঁচিলের দরজায় এসে দাঁড়াল। বড্ড ভিড়। ভিড় কাটিয়ে ধীরে ধীরে ঢুকলাম ভিতরে। আসল পিকিন পাঁচিলের চৌহদ্দির মধ্যে; পাঁচিলের বাইরেটা শহরতলি বলা যায়। খুব বড় দরজা পাঁচিলে—বড় দরজার দু-পাশে দুটো ছোট দরজা। উপরে চৌকি—নগর-প্রহরার ব্যবস্থা সেখানে।

কী পাঁচিল রে বাবা! যেমন উঁচু, তেমনি চওড়া। কোন যুগে লয় পাবে না। ময়দানবেরা বানিয়েছে। হবে না কেন, সপ্তআশ্চর্যের মধ্যে একটা হল মহাপ্রাচীর—সে তো এদেরই কীর্তি। স্থাপত্য শিল্পে মহা ওস্তাদ। কোন শিল্পেই বা নয়? আর দু-এক দিনের মধ্যেই টের পেলাম, সেকালের ময়দানব নতুন-চীনে আবার মাথা চাড়া দিয়েছে। বড় বড় ইমারত, রেললাইন, নদীর বাঁধ, পুল-রাস্তা যেন মন্ত্রবলে অবিশ্বাস্য রূপ কম সময়ে গড়ে তুলেছে। যেমন একটা দেখলাম—শান্তি হোটেল। আটতলা বাড়ি, আধুনিক সকল রকম আরামের ব্যবস্থা বিশাল অট্টালিকায়। নবীনতম অলঙ্করণ ও রূপসজ্জা। মতলবটা উঠেছিল শান্তি সম্মেলনের ব্যবস্থা উপলক্ষে। বাইরে থেকে বিস্তর অতিথি আসছেন, একমাত্র পিকিন হোটেলে সকলেরই ঠাঁই হবে না। অতএব বানাও নতুন হোটেল-বাড়ি। তিন মাস সময় দেওয়া হল। কিসে লাগবে অত সময় —পঁচাত্তর দিনের মধ্যে সমস্ত শেষ।

মন্ত্রটা কি, জানতে চেয়েছি। বহু জনের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। বিশাল দেশের অগণ্য নরনারীর মধ্যে নতুন প্রাণের উন্মাদনা। দেশটা যে তাদেরই সমস্ত সত্তা দিয়ে বুঝেছে—এতদিন খেটে এসেছে—খাটনির যা মজুরি, তার বেশি প্রত্যাশা ছিল না। আজকের প্রাপ্তি অনেক বেশি—শুধুমাত্র নিজের জন্য নয়, খাটছে নিজের দেশের জন্য। কাজ করে টাকা পাচ্ছে আর পাচ্ছে দেশ-সেবার আনন্দ। পরিশ্রম তাই দ্বিগুণ করেও কাতর হয় না।

যাক সে কথা। পাঁচিল পার হয়ে তো পিকিনে ঢুকলাম। পিকিন-মানুষের কথা পড়েছি—পাঁচ লক্ষ বছরের পুরানো কঙ্কাল। সেই কঙ্কালের সঙ্গে পাওয়া গেল পাথরের অস্ত্রশস্ত্র এবং অগ্নি-ব্যবহারের নিদর্শন। পিকিনের কিছু দূরে চৌকৌতিয়েন নামক জায়গায়। মানবিক সভ্যতা এবং চীনজাতি যে কত পুরানো—তার ধারণাতীত পরিচয় মিলল।

আদি শহর খ্রীস্ট-জন্মের সাড়ে এগারো শ' বছর আগে তৈরি। তার পরে হাত-ফেরতা হয়েছে কত বার, কত রূপান্তরিত হয়েছে! নামও পালটেছে। রাজধানী এধারে-ওধারে সরেছে নানা শতাব্দীর রাষ্ট্র বিপর্যয়ের সঙ্গে। মিলে-মিশে সমস্ত এখন এক হয়েছে, পিকিন তাই এত বড়।

পাঁচিল ঘিরে তবু ঠেকানো যায় নি আততায়ীদের। এই সেদিনের ব্যাপার, ১৯০০ অব্দ। ইংরেজ, আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স, রুশ, জার্মানি, ইটালি, অষ্ট্রিয়া—আট জাত মিলে শহর লুঠ করল। জাপানিরা লড়াই চালাল এই জায়গায় ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ অবধি। আরও কত দুর্যোগ এমনি। অধিবাসীরাও রুখে দাঁড়িয়েছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে। রক্ত দিয়েছে। বেদনা ও গৌরবের অপরূপ স্মৃতি-রঞ্জিত মহাপ্রাচীন নগর

এই পিকিন।

টানা দেওয়াল রাস্তার একদিকে। চলেছে তো চলেইছে।

কি ওটা? কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলাম।

নিষিদ্ধ শহর (Forbidden City)। ওর মধ্যে অগণ্য প্রাসাদ, প্রমোদ উদ্যান, কৃত্রিম পাহাড়, লেক—পৃথিবীর যাবতীয় নিসর্গ-বৈচিত্র সযত্নে বিরচিত হয়েছে। রাজারা থাকতেন আর থাকত তাঁদের অগুন্তি পত্নী ও উপপত্নী। রাজার প্রসাদধন্য ভাগ্যবতীরা প্রথম তারুণ্যে আমোদ-উৎসবের মধ্যে একদিন এই রহস্যপ্রাচীরের অন্তরালবর্তী হত, বাইরে আসা ঘটত না জীবনে আর কোন দিন। মরার পরেও নয়—ওরই মধ্যে গোরস্থান। আমাদের বনেদি বধূর একটুখানি তবু সুবিধা, মড়া পোড়াবার বাবদে নদীকূলে নিয়ে আসে—খোলা হাওয়া গায়ে লাগে সেই সময়। চীনা রাজবধূদের মরেও ছাড়ান নেই। বিশ্বের যাবতীয় শোভা-সৌন্দর্যের নমুনা তাই নিষিদ্ধ-শহরের ভিতরে। সুন্দরী ধরিত্রী দেখার সুখ করে নাও জায়গাটুকুর মধ্যে বিচরণ করে।

জনসাধারণ ঢুকতে পেতো নিষিদ্ধ-শহরের বাইরের দিকে সামান্য দূর অবধি। পিকিন শহরের ভিতর দেওয়াল-ঘেরা আর এক শহর।

আজকে দিন পালটেছে। অবাধ গতি সেখানে সকলের। মিউজিয়াম, লাইব্রেরী, সান-ইয়াত-সেন পার্ক, শ্রমিকের আরাম প্রাসাদ—অসংখ্য রকমের প্রতিষ্ঠান। নতুন-চীনের কলহাস্যে মুখরিত সেকালের নিষিদ্ধ-শহর।

বিচিত্র বৃহৎ ফটক। মাও-সে-তুঙের প্রকাণ্ড ছবি সেখানে। স্বর্গীয় শান্তির বিচিত্র ফটক। মাও সে-তুঙের প্রকাণ্ড ছবি সেখানে। স্বর্গীয় শান্তির দ্বার (Gate of Heavenly Peace); চীনা নাম—তিয়েন-আন-মেন। পিকিনের কেন্দ্রভূমি। দেয়াল ফুঁড়ে পাঁচটা ফটক পাশাপাশি। ফটকের উপর তলায় হল, সুপ্রশস্ত অলিন্দ। সামনে পরিখা, পরিখার বড় কবিত্বভরা নাম—সোনালি জলের নদী। মার্বেল পাথরের পাঁচটা সেতু দরজার সামনা-সামনি। লোহার খুঁটির উপর পাঁচতারার নিশান—মাও সে-তুঙ ঐ নিশান টাঙিয়েছিলেন ১লা অক্টোবর, ১৯৪৯। আরও এক নতুন স্তম্ভ তৈরি হচ্ছে মুক্তি-সংগ্রামে যারা মারা গেল তাদের স্মৃতিতে।

সামনে পার্ক। এটাও ছিল নিষিদ্ধ অঞ্চলের মধ্যে। রাজার দেহরক্ষীরা থাকত। এখন বিমুক্ত। বহু রক্তাক্ত ইতিহাস আছে এই জায়গার।

তিয়েন-আন মেনে নতুন করে রঙ ধরাচ্ছে, ১লা অক্টোবর সমারোহ হবে তার জন্য। ঐ বিশাল অলিন্দের উপর দাঁড়াবেন নতুন-চীনের নায়কবৃন্দ—দাঁড়িয়ে জনগণের উল্লাস দেখবেন, অভিবাদন গ্রহণ করবেন।

আর অদূরে সাত-তলা আকাশচুম্বী অট্টালিকা—ঐ হল পিকিন-হোটেল। আমাদের জায়গা ওখানে।

(৮)

ডক্টর কিচলু কোথায়—আমাদের দলপতি?

হোটেলে পা দিয়েই খোঁজ করছি। বাতের ব্যথায় তিনি শয্যাশায়ী—ঘরে আছেন।

সুইচ টিপতে আলো জ্বলে ঘর বিভাসিত হল।

দূর থেকে দেখেছি তাঁকে কয়েক বার। আর আশৈশব জেনে এসেছি, অনেক উঁচুর মানুষ। পাঞ্জাব-কংগ্রেস বলতে সেকালে ছিল দুটি মানুষ—সত্যপাল আর কিচলু। তাঁদের গেপ্তার করল (৯ই এপ্রিল, ১৯১৯)। অমৃতসরে হরতাল—একটা বিড়ির দোকান অবধি খোলা নেই। বটে, ইংরেজের কামানে মরচে ধরে নি—মজা বোঝ তবে!

১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের কুয়া ভরতি মড়ার গাদায়, রক্তের ধারায় তৃণভূমি রাঙা। তারপর আহিমাচল-কুমারিকা মেতে উঠল গান্ধিজীর নেতৃত্বে।

আইন-ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে কিচলু ঝাঁপিয়ে পড়লেন আন্দোলনে। যাবজ্জীবন কারাগার। কিন্তু আটকে রাখা গেল না অত কাল একটানা; জনদাবিতে ছেড়ে দিতে হল। তা একেবারে না হল তো ছয় বারে। দশ বছর জেলে কাটালেন মোটমাট। তারপর এলো পাকিস্তানের আন্দোলন। দেশ বিভাগ তিনি স্বীকার করলেন না, তাই খুন করতে গেল। অমৃতসর থেকে তখন দিল্লিতে আস্তানা। সেখানে হাঙ্গামা তো কাশ্মীরে। প্রাণভয়ে মত বদলান নি, অর্থ ও নেতৃত্ব প্রলুব্ধ করে নি কখনো। সেই কিচলু। মানুষের হিতে অতন্দ্রিতসাধনা। এতবার জেল, এত নির্যাতিন, আত্মীয়, বন্ধু সহকর্মি—প্রায় সকলে পরিত্যাগ করল, নিন্দা লাঞ্ছনার অন্ত নেই—নির্বিকার ডক্টর কিচলু। যৌবন-প্রৌঢ়ত্ব থেকে একটিমাত্র পথ ধরে বার্ধক্যে উত্তীর্ণ হয়ে এলেন—কংগ্রেসের পথ।

ভারতের শান্তি-আন্দোলনে সকলের পুরোভাগে তিনি। নিঃসংশয়ে জেনে রেখেছেন, রাজনীতি-পঙ্কের উপর এই স্ফুট-কমল। সকল মানুষ শান্তি ও সম্প্রীতিতে থাকবে, প্রভু বুদ্ধ থেকে মহাত্মা গান্ধি—একই জীবন-সাধনা সকলের।

বয়স ও শরীরের গ্লানি অবহেলা করে কিচলু চলে এসেছেন এতদূর এই পিকিনে। শয্যার উপর উঠে বসে সোল্লাসে বললেন, এসো, এসো—

এসো বাচ্চা—বলে আহ্বান করলেন। এমন ভাল লাগে কথার মাঝে 'মাই চাইল্ড' আদরের সম্ভাষণ। তারুণ্য কবে পার হয়ে এসেছি, মা-বাপ ওপারে, এমন ডাক ডাকবার মানুষ কই? আজ সন্ধ্যায় সুদূর পিকিন শহরে কিচলুর কণ্ঠে যেন অতীত গুরুজনেরা কথা বলে উঠলেন।

পেরিনকে বললেন, লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি পথের উপরে—আর একজনের এদিকে যে ঘুম ছিল না।

কটাক্ষ হল রমেশচন্দ্রের দিকে। নবোঢ়া দুটি ছেলেমেয়ে বিচ্ছেদের পর মিলিত হয়েছেন—ভাবখানা এমনি। বৃহৎ কাজের ফাঁকে ফাঁকে স্নেহমধুর এমনি রহস্যালাপ চলে।

ঘুম নেই রমেশচন্দ্রের, কথাটা কিন্তু মিথ্যা নয়। সাঁইত্রিশটা দেশের প্রতিনিধি আসছেন আসন্ন সম্মেলনে…ইতিহাসে অশ্রুতপূর্ব। সেই দায়িত্ব কাঁধে চেপে রয়েছে, দু-চোখ এক হয়ে ঘুমোবার ভরসা পাবে কি করে?

আমার হাত জড়িয়ে ধরে কিচলু বলতে লাগলেন, তুমি বাঙালি…বাংলার মানুষ পেলে আমার বড় আনন্দ হয়। ভারতকে পথ দেখিয়েছে বাংলাদেশ। সকলের মুখে একবার নজর বুলিয়ে বললেন, বাংলাই আমার রাজনীতির অনুপ্রেরণা দিয়েছে। বাংলার কাছে ঋণের অন্ত নেই।

তাজ্জব লাগল। ঋণ অনেকেরই অনেক রকম থাকে, বেমালুম চেপে যাওয়াই তো রীতি। মলিন মুখে এক ব্যক্তি 'তা বটে! তা বটে!' গোছের হাসি হাসছেন। ভদ্রলোকের মনোবেদনা বুঝতে পারছি…কিন্তু মুখ চেপে ধরে দলের দলপতিকে থামানো যায়ই বা কি করে?

প্রসঙ্গ পালটাল অবশেষে।

কিচলু বললেন, ভারতীয়দের সম্পর্কে সকলের বড্ড আশা। সব চেয়ে বড় দল আমাদের, সম্মেলনেও তেমনি কিছু বিশেষ স্থান নিতে হবে।

গোলমেলে কথা এসে পড়েছে…খাওয়া-দাওয়া, দেখাশুনো এবং আমোদস্ফূর্তি মাত্র নয়, পৃথিবীর সকল জাতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে দায়িত্বের কাজও করতে হবে অনেক-কিছু।

সে যাক, পরের কথা পরে হবে। নমস্কার সেরে এইবার কেটে পড়া উচিত। খাওয়ার ঘরে যাই চলো, সময় হয়ে গেছে। কোন্ দিকে?

কি রকম খাবে, সেইটে ঠিক করো—

কি চাও? নৈকষ্য বিলাতি খানায় রুচি থাকে তো সাততলার উপর। চক্ষু বুজে লিফটে উঠে পড়ো, সেখানে নিয়ে তুলবে। বিরাট ভোজনশালা, টেবিলগুলো সরিয়ে দিয়ে অক্লেশে ফুটবল খেলার গড়ের-মাঠ বানানো যায়। এমন ঘরেও না কুলোয় তো পাশে আর একটি আছে। পানশালা ওদিকে…মাল টানো ও বিলিয়ার্ড খেলো। যতক্ষণ দমে কুলোয় খাও এবং খেলে যাও…দাম দেবার হাঙ্গামা নেই। অথবা প্রশস্ত ফাঁকা ছাদের উপর দাঁড়িয়ে স্মরণাতীত কাল থেকে গড়ে-ওঠা সুপ্রাচীন নগর নিরীক্ষণ করো। রঙিন টালিতে ছাওয়া চৈনিক পদ্ধতির সংখ্যাতীত ঘরবাড়ি, মন্দিরের উঁচু চূড়া, পেই হাই পার্কে তিব্বতী লামার সমাধির উপর আকাশভেদী চৈত্য, আর হালফিলের ঐ একটি বৃহৎ ব্যাপার—পীস হোটেল। রাত্রিবেলা ছাদ থেকে ভারি বাহার পিকিন শহরের—আকাশের তারার মালা যেন চারিদিকে ছিটকে পড়েছে, মাটির উপরে ঝিকমিক করে তারা জ্বলছে।

চীনা মতে যদি খেতে যাও, নেমে পড়ো সর্বনিম্নতলে—সুপ্রশস্ত ড্রইংরুম অতিক্রম করে। কোন্ বেলা কোথায় ইচ্ছা করবে, পূর্বাহ্ণে কাউকে বলতে হবে না—কিছুই তোমার করণীয় নেই। যথা ইচ্ছা ঢুকে টেবিলে বসে পড়ো, হুকুম করো যত এবং যে-রকম খুশি। খাওয়ার পরে একটা বিল নিয়ে আসবে—কিসের কত দাম কিছু তুমি জানো না। জানার প্রয়োজনও নেই। এক লক্ষ দেড় লক্ষ যা হোক একটা অঙ্কপাত করে এনেছে—নিচে সই মেরে খালাস। নিজে না পারো, যে কেউ পেন্সিলে নিয়ে একটু হিজিবিজি করে দিক।

এমন দরাজ ব্যবস্থা আমার দেশে কেন চালু হয় না-রে! মহাশ্রদ্ধেয় মহাদেবদার গল্প শুনেছি—খবরের-কাগজে কাজ করতেন, সেই সুবাদে ডাইং ক্লিনিঙেও মাংনা কাপড় কাচতেন। নয়তো—রোস বেটা, লিখব তোর নামে এক কলম। কিন্তু হোটেলে যদৃচ্ছা খেয়ে একটি মাত্র নাম-সই-এর ওয়াস্তা—এ ব্যাপার সম্ভব সত্যযুগে। আর ঐ দেখে এলাম নতুন-চীনে।

কিন্তু কথাটা উঠল যা নিয়ে—এক বেলায় এক টেবিলে বসে এক লক্ষ দেড় লক্ষ ইয়ুয়ান উদরস্থ করছি। এর উপর শোনা গেল, সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে নগদ হাতখরচাও গুঁজে দিয়ে গেছে—প্রতি জনের দশ লক্ষ হিসাবে। কোন সুলগ্নে যাত্রা গো—চীনের মাটিতে পা দিতে না দিতেই (লক্ষপতি বলে গালি দেবেন না) অনেক লক্ষের অধিকারী। আমাদের দেশে হয়েছে যেন চড়ুইপাখির খড়কুটো-সংগ্রহ—দু-টাকা সাত আনা রোজগার, সাত সিকে খরচ; সারা জীবনে একত্র করলাম দু-শ' সাতান্ন টাকা চোদ্দ আনা তিন পাই। আর ওখানে দশ-বিশ হাজারের নিচে কথাই নেই। সওয়া মাসে যা খরচ করে এসেছি, ইনকামট্যাক্স-কর্তাদের মাথাঘুরে যাবে সেই টাকার অঙ্ক শুনলে।

হয়তো বাজারে যাচ্ছি কয়েক জনে মিলে খেয়ালমাফিক সওদা করতে।

এই যাঃ, মানিব্যাগ ফেলে এসেছি। টাকা বেশি আছে তোমার কাছে?

কোথায়! দু-আড়াই লাখ হবে বড় জোর—তাতে কি হবে? আড়াই লাখের বাজার ভদ্রলোকে আবার কি করবে! ক্ষুণ্ণ মনে ফিরতে হল অর্ধপথ থেকে। দাম লিখে জিনিসের গায়ে সেঁটে রাখবার নিয়ম ও-দেশে—তার উপরে কানাকড়ির দরদস্তুর চলে না। ওয়ান-টু ইত্যাকার আন্তর্জাতিক সংখ্যায় লেখা দাম—দেশি বিদেশি কারো বুঝতে আটকায় না। আমিও এটা ওটা কিনে এনেছিলাম বন্ধুবান্ধবদের জন্য। দামের কাগজ আঁটাই ছিল জিনিসের গায়ে, ছিঁড়ে ফেলতে যেন ভুলে গিয়েছি। বন্ধুরা চমকে ওঠেন—কি কাণ্ড, দশ হাজার এটার দাম? এত খরচ করে নিয়ে এলে?

প্রেম-গদগদকণ্ঠে বলি, তা কি হবে—তুমি তো পর নও! চীনের একটা স্মরণচিহ্ন—জীবনে হয়তো আর যাবো না—টাকার মায়া করলে চলবে কেন?

চুপি-চুপি বলছি, দশ হাজারের ঐ মহার্ঘ বস্তুর আমাদের হিসাবে দাম দাঁড়িয়েছে দু-টাকা এক আনার মতো। আটচল্লিশ শ চীনা ইয়ুয়ানে এক টাকা। কিন্তু চেপে যান—খবরদার, যেন চাউর হয়ে না পড়ে আমার বন্ধুজনের মধ্যে। পশার ভেস্তে যাবে।

চীন থেকে ফেরার মুখে সাংহাই ক্যাণ্টনে দু-হাতে বাজার করছি। নিজে করছি, ওখানকার তরুন বন্ধুরাও করে দিচ্ছেন। চীনা ইয়ুয়ান শেষ করে ফেলতে হবে। শেষ অবধি হাজার ছয়ে ঠেকে গেল। ওরা বলে, এতে আর কী-ই বা পাওয়া যাবে—রেখে দিন। হাজার দুয়েক ওর থেকে ঔদার্য বশে দিয়ে দিলাম ক্ষিতীশকে। হাজার চারেক আছে এখনো। অর্ধেক কিংবা সিকি পরিমাণ টাকায় নিয়ে নিন না কেন (ভারতের টাকা অবশ্য)! কত সস্তায় যাচ্ছে—কিনবেন? আর কিনেছেন! বোকার মতো আগেই ফাঁস করে দিয়ে বসে আছি।

আমাদের তো এই। আগের খবর কিঞ্চিৎ শুনুন। সতীরঞ্জন সেনের কথা বলেছি—তাঁরা অনেক বেশী ভাগ্যবান। ১৯৪৭ অব্দে ভারত গবর্নমেণ্ট পাঠিয়েছিলেন তাঁদের। দশ জন ছাত্র পেঁছিলেন তো সাংহাইয়ে। হাতখরচা ইত্যাদির জন্য প্রত্যেকে দশটা করে টাকা দিলেন চীনা ইয়ুয়ানে ভাঙিয়ে আনবার জন্য। লোক তো গেছেই—অনেকক্ষণ পরে রিক্সায় করে ফিরে এল বিশাল এক বস্তা নিয়ে। বস্তাবন্দি নোট। কাঁধে বয়ে আনতে পারে নি, রিক্সা করে আনতে হল। বস্তা খুলে সর্বাগ্রে রিক্সা-ভাড়া তো চুকিয়ে দিলেন কোটিখানেক। তার পরে ঐ নোটের গাদা গুণে মিলিয়ে নেওয়া। সে কী বিপদ! দশ জনে ভাগে ভাগে গুনছেন—কোটি কোটির ব্যাপার—প্রতি বারে আলাদা একএক রকম হয়। ঘণ্টা কয়েক ধস্তাধস্তি করে তাঁরা হাল ছেড়ে দিলেন। ব্যাঙ্ক থেকে যা লিখে দিয়েছে, তাই ধরে নেওয়া গেল। আমাদের অতটা ভাগ্য হয় নি। কোটি কোটি নয়, তবে কোটির কাছাকাছি নাড়াচাড়া করে এসেছি বটে, গালগল্প বলে ঠেকছে! কিন্তু সতীরঞ্জনের মুখে স্বকর্ণে শুনে তবে লিখছি। আন্দাজ করুন অবস্থার ভয়াবহতা। সাধারণের ক্রয় শক্তি একেবারে লোপ পেয়েছে—কিনতে পারে, আঙুলে-গণা-যায় এমন কয়েকটি ভাগ্যবান। আর খরচ চালাবার জন্য সরকারি ছাপাখানায় দেদার নোট ছেপে যাচ্ছে। গতিক এমনি, ছেলেপিলে হাতের লেখার কাগজ পায় না নোট ছাপানোর কাগজের এমনি টান পড়ছে। নতুন-চীন খতিয়ে দেখেছে, কুয়োমিনটাং যুদ্ধপূর্ব আমলের চেয়ে ১,৭৬৮,000,000000 গুণ বেশি নোট চালু করে গেছে। তাড়া খেয়ে পালিয়ে যাবার মুখেও তারা বগল বাজাচ্ছিল, বিজীর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর ক'দিন চলবে গণতন্ত্রী সরকার? মাও সে-তুঙকেও পাততাড়ি গুটোতে হবে।

সতীরঞ্জনেরই আর একটি গল্প। ওরা পিকিনে তখন। কুয়োমিনটাঙের টলমল

অবস্থা—মুক্তি সৈন্য আসছে ঝড়ের বেগে। পাওয়ার-হাউসে বিশৃংখলা—বিদ্যুৎ সরবরাহ যে কোন মুহূর্তে বন্ধ হবে। সতীরঞ্জন গিয়েছেন দু'দিনের জন্য এক টিন কেরোসিন কিনে রাখবেন বলে। এক দোকানে দর নিলেন। যাচাই করতে আর এক দোকানে গিয়ে দেখলেন, সেখানকার দর অনেক বেশি। প্রথম দোকানে এলেন আবার। এবার এরা যে-দর হাঁকল সেটা দ্বিতীয় দোকানকে ছাড়িয়ে গেল।

দোকানি বলল, কিনতে হয় তো এক্ষুনি নিয়ে যান। সাড়ে-দশটায় এখন এই দর। দশ মিনিট পরে শুনবেন আর এক রকম।

এমনি কাণ্ড। চীনা মুদ্রার উপর লোকের এক তিল আস্থা নেই। হেন ইনফ্লেশন পৃথিবীর কোন রাজ্যে কখনো ঘটে নি। এক গৃহস্থের কথা শুনলাম। ভদ্রলোক মিতব্যয়ী, কায়ক্লেশে খরচাপত্র চালিয়ে যৎসামান্য সঞ্চয় করে এসেছেন বছর বছর। বুড়ো হয়ে পড়েছেন, জীবনের বাকি কয়টা দিন পুঁজি ভেঙে ভেঙে খাবেন। কুয়োমিনটাঙের শেষ সময় তখন। মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন তিনি। হিসাব করে দেখা গেল, সারা জীবনের সঞ্চয় একটা মুরগির আণ্ডা কিনতেই খতম হয়ে যায়। আজকে বিলকুল সামলে নিয়েছে। সামলাতে পেরেছে, তাই চীন বেঁচে গেল। আর এত বড় অসাধ্যসাধন যারা করতে পারে, তামাম বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জোট পাকিয়েও তাঁদের মারতে পারবে না।

ইনফ্লেশন দমনের পদ্ধতি শুনুন তবে কিছু কিছু। সে আমলে যা হয়েছিল আর এঁরা যা করেছেন। অবস্থা এমন, মাইনে হাতে পাওয়া মাত্রই লোকে জিনিস কিনে ফেলবে। দরকারে লাগবে কিনা, সে বিবেচনা করতে গেলে হবে না। চাল মিলল না তো কিনে ফেলুন বিশ গ্রোস ইস্ক্রুপ, নয় তো কাপড় কাচা সাবান দু-পেটি। মোটের উপর টাকা হাতে রাখবেন না—তাহলে সর্বনাশ—হু-হু করে নেমে যাচ্ছে টাকার ক্রয়মূল্য। কাল হয়তো দেখবেন, সাবান এক পেটি মাত্র পাওয়া যাচ্ছে ঐ টাকায়।

অথবা কিনে রাখুন সোনা-রুপো। রুপোর মুদ্রা বাজারে নেই, মানুষে সিন্দুকে পুরেছে। কালে ভদ্রে দুটো-পাঁচটা বেরুলো তো তার পিলে-চমকানো দর। বাজারে যা সগৌরবে চলছে সে হল আমেরিকান ডলার। নামে চীন দেশ এবং স্বাধীনও বটে, কিন্তু টাকার বাজারে আধিপত্য আমেরিকার। এক্সচেঞ্জের একটা সরকারি হার নির্দিষ্ট আছে—কিন্তু সে হল ঐ পাঠ্য বইয়ে থাকে 'সদা সত্য কথা কহিবে' তারই মতন এক নীতিকথা। কেউ মানে না, জানেও না বড় বেশি লোক। আমেরিকান ডলারও কাগজ বটে—কিন্তু তার অশেষ ইজ্জত, রীতিমতো দরদস্তুর করে কিনতে হয় সে বস্তু। শহরে গ্রামে সর্বত্র তাই সংখ্যাতীত মজুতদার। সাধারণের দুঃখকষ্ট সীমাহীন হয়ে পড়ল। ব্যাঙ্ক অথবা জাতীয় ধনাগারে লক্ষ্মী নয়—তাঁর পেঁচার বসতি। পেঁচার স্তূপীকৃত ঝরা পাখনা—ছাপা নোটের হিমালয় পর্বত।

তেড়ে ফুড়ে কুয়োমিনটাং আইন করল, সোনারুপো আটকে রাখা বেআইনি—ভিন দেশের মুদ্রাও চলবে না। ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দাও। এ-আইন অমান্য করা দেশদ্রোহিতা—চরম দণ্ড হবে অপরাধীর।

কা কস্য পরিবেদনা! বাজার এত গরম—কে যাচ্ছে ঐ সরকারি বাঁধা-দামে জমা দিতে? ফাঁসিতে লটকানো হল দু-একটাকে। কিছুতে কিছু হয় না। শুধু আইন করে দায় খালাস হয় না, আইন লোকে মানতে পারে এমন অবস্থায় সৃষ্টি করতে হয়। সোনা-রুপো এবং আমেরিকান ডলার ভাঙিয়ে ধরুন বিশ কোটি ইয়ুয়ান নিয়ে এলাম। সেই বিশ কোটি আগামীকাল তো বিশ লক্ষের দামে নেমে যাবে। তখন?

নতুন চীনের পদ্ধতি শুনুন এবার। সোনা রুপো এবং আমেরিকান ডলার সরকারি

ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দাও। ব্যাঙ্কের দর দেওয়া হল কালোবাজারের চেয়ে কিছু বেশিই। একটা জিনিস তবু বাকি থেকে যায়। আজকে আমার নামে যে পরিমাণ চীনা ইয়ুয়ান জমা পড়ল, কাল যদি তার দাম কমে যায়? অর্থাৎ জিনিসপত্রের দাম চড়ে, কম জিনিস পাওয়া যায় ঐ মুদ্রায়? সে ব্যবস্থাও হল। জমা দেবার সময় টাকার অঙ্কের পাশে ঐ তারিখের চাল-কাপড়-তেলের দামও লেখা রইল। ব্যাঙ্ক থেকে যেদিন টাকা তুলবে, জিনিসের দর যদি ডবল হয়ে থাকে, তোমার জমা টাকাও ডবল হয়ে গেছে, এই রকম গণ্য হবে। তার উপরে নিয়মমাফিক সুদ তো আছেই।

মাসের পর মাস চলল এই নিয়মে। কালোবাজার অচল। লোকের আস্থা ফিরে এলো জাতীয় অর্থনীতির উপর। নতুন-চীন ইনফ্লেশন পুরোপুরি সামলে নিয়েছে। দরের এখন উঠানামা নেই। কনট্রোলের আবশ্যক নেই কোনখানে। সেদিনের পরম দুর্গতির একটুখানি স্মরণ চিহ্ন রয়েছে—নোটের উপর ছাপা মোটা অঙ্ক। ব্যস, আর কিছু নয়।

সতীরঞ্জন প্রভৃতির কাছে শোনা কাহিনী। সুনিশ্চিত ধ্বংস থেকে জাতি বেঁচে গেল এমনই নানা কৌশল ও বিচক্ষণতায়। শাপে বর হল। সোনা-রুপো আটক পড়ে গিয়ে এবং বিদেশি মুদ্রা চালু হয়ে একদা চীনের সর্বনাশ ঘটেছিল—এখন সমস্ত গবর্নমেণ্টের হাতে এসে গেছে। বাইরের বাজারে নতুন চীনের তাই ইজ্জত হয়েছে। দেশ-পরিগঠনের জন্যে বিদেশি যন্ত্রপাতি ও মালপত্র কিনবার আর দারিদ্র্যতা নেই।

কিন্তু কি কথায় কতদূরে এসে পড়লাম! দু-লাখ পাঁচ-লাখ অহরহ পকেটে নিয়ে ঘুরেছি—আর এখন? কাজ নেই, গুমর ফাঁক হয়ে যাবে।

(৯)

পিকিনের সেই প্রথম সন্ধ্যা। শ্যাম রাখি না কুল রাখি—অর্থাৎ সাত তলার উপর বিলাতি মতে অথবা একতলায় চীনা পদ্ধতিতে সেবা গ্রহণ করব, সে সমস্যা আজকের দিনটাই নয়। নতুন এসেছি, অতএব নিয়ম মাফিক ভোজ খেতে হল। ভোজ-পর্ব সমাধা করে বেরিয়ে পড়লাম ক'জনে।

হোটেলের প্রাঙ্গণে কত যে মোটর, তার সীমাসংখ্যা নেই। মোটরের সংখ্যা কমই এখানে। একজন রসিকতা করে বললেন, যে ক'টা আছে সব বুঝি অতিথি-পরিচর্যায় এনে মজুত করেছে।

জন চার পাঁচ হাঁ হাঁ করে এসে পড়ল।

যাবেন কোথাও?

উঁহু, এই সামনের দিকে একটুখানি পায়চারি করছি।

এদিক-ওদিক চাইতে ফাঁক বুঝে একসময় রাস্তায় নেমে পড়লাম। হাঁটতে চাই। কিন্তু টের পেলে রক্ষা নেই, মোটরের ব্যূহ ঘিরে ফেলবে।

একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বেশ ঠাণ্ডা। খান তিন-চার বাড়ির পরে অপেরা হাউস। উঁকিঝুঁকি দিচ্ছি সেখানে। কর্মচারি একজন দরজা আটকে কী বলল।

জানি রে বাপু টিকিট না হলে ঢোকা যায় না। ঢুকে বসবার মন মেজাজ এখন নেই। রাতের পিকিন দেখে বেড়াব।

এক ভদ্রলোক, দেখি তাড়া করেছেন আমাদের। নতুন জায়গা, গতিক বুঝি নে—কোন রকম দোষ-ঘাট হল নাকি? ইংরেজি বলেন তিনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলার মতো। আমাদেরই সমগোত্রীয়, শুনে অতএব উল্লাস বোধ করি।

টিকিট চেয়েছিল আপনাদের কাছে। ঐটে নিয়ম কি না। তা আসুন আপনারা

—টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

আজকে দেখব না।

সকরুণ মিনতি করে তিনি বলেন, বিলক্ষণ! আমাদের দোরগোড়া অবধি এলেন… সে কি হয় কখনো?

মাপ করুন, আর হবেনা এমনটি। কেউ-কেটা ব্যক্তি এখন, বুঝতে পেরেছি। চলা-ফেরা অতঃপর মাপজোপ করে করতে হবে।

অনেক কষ্টে হাত ছাড়ানো গেল। দোকান-পাট বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু দরজা খোলা। ১লা অক্টোবর জাতীয় উৎসব—তিন বছর আগে মাও-সে-তুং ঐ দিন মুক্তির পতাকা তুলেছিলেন, নিপীড়িত চীন সকল কালিমা মুছে পাঁচ-তারার আলোয় মাথা তুলে দাঁড়াল। সেই আয়োজনের ধুম লেগেছে। মানুষজন মহাব্যস্ত। আমাদের অবোধ্য চীনা অক্ষরে কত কি লিখছে কাপড়ের উপর, পিচবোর্ড কেটে তার উপর রং করে হাজার হাজার শান্তির কপোত বানাচ্ছে। নানা রঙের কাগজ কেটে স্তূপীকৃত করছে, ফুল হবে নানান রকমের। উৎসব-দিনের অনেক বাকি, কিন্তু মানুষ মেতে উঠেছে এখন থেকেই। এক ঘরে তিন জন আমরা…আমি, ক্ষিতীশ আর মীরাটের এক জাঁদরেল উকিল ব্রজরাজ কিশোর। উকিলবাবুটি ফর্সা লম্বা, মাথায় টাক · চোস্ত ইংরেজী বলেন। দু-জনের ঘরে কিছু অতিরিক্ত আসবাব ঢুকিয়ে তিনের জায়গা হয়েছে। কি করবে, নতুন তৈরি শান্তি হোটেলও ভরাট হয়ে গেছে—এত অতিথির জায়গা কোথা? জানলার কাছে নিরিবিলি দিকটা আমি দখল করে নিলাম। জানলা হলেও ওদিকের ঘরে আটকা—আলো বড়-একটা আসে না। হোটেলের সব চেয়ে খারাপ ঘর—সেইটেই আমাদের কপালে পড়ে গেল।

তা হোক ঘাবড়াবার কি আছে, ঘরে থাকি আর কতটুকু? ওখানে চলো, এটা দেখ, ঐ কনফারেন্সে যাও…লেগেই আছে একটা-না-একটা। আমি এসেছি নতুন চীন দেখতে, এই কম সময়ের মধ্যে দেখে-শুনে যথাসম্ভব আলাপ-পরিচয় করে যাবো। হাত-পা মেলে জিরোতে এবং খেতে যারা এসেছেন, উৎকৃষ্ট ঘরে বহাল-তবিয়তে শুয়ে শুয়ে তাঁরা আরাম করুন গে।

ঘরের সুখটা শুনুন এবারে। শয্যার পাশে ফোন। শুয়ে-শুয়ে তামাম পিকিন শহরের সঙ্গে মোলাকাত করুন। শিয়রে সুইচ—শীতের দেশে পাখার চল নেই—এন্তার আলো জ্বালুন আর আলো নেভান। আর আছে বোতাম সুইচের পাশে। বোতামে আঙুল ছোঁয়ানো মাত্র দরজায় টোকা পড়বে, মৃদু কণ্ঠস্বর শুনতে পাবেন, আসতে পারি?

তারপরে যা খুশি লোকটাকে ফরমাশ করুন—আকাশের চাঁদ, বাঘের দুধ এই জাতীয় কয়েকটা বস্তু বাদ দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে এনে হাজির করবে। সুচ-সুতো-বোতাম-আঠা-খাম-কাগজ ইস্তক সাণ্ডুইচ-কফি আইসক্রীম…রাত দুপুরে মুরগির কাটলেট অবধি। সোফা ও নিচু-টেবিল ঘরের কেন্দ্রদেশে। সেই টেবিলে অহরহ দেখবেন ফলের গাদা, নানা জাতীয় কেক, চকোলেট, সিগারেট ইত্যাদি। অব্যবহারে বাসি হয়ে গেলে তা বদল করে আবার টাটকা এনে দিচ্ছে। এক রকম আঙুর—রক্তাভ রং, সুমিষ্ট ও চমৎকার গন্ধ, টকের লেশমাত্র নেই। উত্তর চীনের কোন কোন অংশে ফলে। ঐ আঙুর এক চালান এসেছিল হোটেলে। তার পরে আর কোন আঙুর মুখে রোচে না। ঐ লাল আঙুর যদি আনতে পারো বাপু, তা হলে গোটা কয়েক দাঁতে কাটতে পারি। শোনা মাত্র শশব্যস্তে বেরিয়ে যায়। সে কালের বর্ষীয়সীরা গুরুঠাকুর সম্পর্কে

এমনি তটস্থ হতেন জানি—গুরু চটলে পরকালের দরজায় তালা পড়বে। এখানেও প্রায় তাই। অতিথি আমরা, শান্তি-সৈনিক—সর্বোপরি ভারতীয়। গ্রহস্পর্শ ঘটেছে। খুঁজে খুঁজে অতএব থোলো দুই লাল আঙুর জোগাড় করে আনল। কাতর হয়ে বলে মিলছে না এখন। কালকে দিনমানে…কত যেন অপরাধ করে বসেছে, লজ্জার সীমা-পরিসীমা নেই—মুখ-চোখের ভাব এমনিধারা। অতএব ক্ষমা করে ফেলে ঐ দু-থোলো অর্থাৎ আধসেরখানেক আঙুরে মুখশুদ্ধি করে নেওয়া যাক, কি বলেন? রাগ করে থাকাটা কিছু নয়।

হোটেলের এই কর্মীদের সম্পর্কে কিছুতে বলতে গেলে, সত্যি, শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে। চাকর বলতে সরম লাগে—নতুন-চীন পরিগঠনের তারাও মহাকর্মী। নানা দেশবাসী ও মেজাজের অতগুলো অতিথির কী সেবাই না করেছে। হাসি ছাড়া মুখ দেখি নি কখনো। যেন ওরা আঁধার মুখ করতে জানে না।

সকালবেলা ঘর থেকে বেরিয়ে করিডর অতিক্রম করে লিফটে যাচ্ছি। হাসিমুখের অভিবাদন আসছে এদিক-ওদিক থেকে। লিফটম্যান প্রসন্ন হাস্যে বলে, গুড-মর্নিং। দূর-আকাশে সূর্য হাসছে, এর মুখেও সেই ঝিকিমিকি।

ঐ যে বললাম—বিশ্রাম ছিল না একটুও। সারা দিনমান এবং রাত দুপুর অবধি এটা-ওটা লেগেই আছে। ঠাসা প্রোগ্রাম তুরকি-নাচন নাচিয়ে ছাড়ছে। বঙ্গদেশের কিঞ্চিৎ আয়েশি মানুষ আমরা, হতভাগারা বুঝবে না তা কিছুতে। চল্লিশ দিনে চল্লিশ মাসের দেখা দেখিয়ে দিয়েছে। ছিমছাম থাকা বরদাস্ত করতে পারি নে—কেমন যেন পালিশ-করা কাঠের পুতুলের মতো মনে হয় নিজেকে। জামা-কাপড় বই কাগজ বিছানা-পত্র মহানন্দে হাণ্ডুল-পাণ্ডুল করব, নইলে জীবন-ধারণের সুখ কী? ঘর ছেড়ে যখন বাইরে চলে যাই, মনে হবে, গজ-কচ্ছপের লড়াই হয়ে গেছে এইখানে একটু আগে। মনিব্যাগ এবং বিশ ত্রিশ-চল্লিশ হাজারের নোটও ছড়িয়ে রয়েছে অনেক দিন। ফিরে এসে অবাক হয়ে যেতাম। যেন পাল্লা চলেছে—আমরা কত ছড়াতে পারি আর ওরা কত গোছাতে পারে। কত যে ফুলের তোড়া পেতাম—একটা ছাগল থাকলে খেয়ে খেয়ে মুটিয়ে স্বচ্ছন্দে মোষ হতে পারত। অবহেলার সেই সব ফুলের তোড়া, ওরা করত কী—কোত্থেকে ফুলদানি জোগাড় করে টেবিলের উপর পরম যত্নে সাজিয়ে রেখে দিত। বিছানায় সদ্য-পাটভাঙা চাদর, বাথরুমে নতুন সাবান, নতুন একদফা তোয়ালে। কতক্ষণ ছিলাম না—সযত্ন পরিমার্জনায় ঘরের যেন নতুন রূপ খুলে দিয়েছে।

বিদেশি মানুষগুলো কয়েকটা দিন ছিল তোমাদের আশ্রয়ে। আর কোন দিন দেখা হবে না জীবনে। এমন করে আপন করে নিলে—দূরে বসে আজ নিশিরাত্রে এই কাহিনী লিখতে লিখতে মন স্নেহাসিক্ত হয়ে উঠছে…

যেদিন পিকিন-হোটেল ছেড়ে চলে যাব, সকলে উসখুস করছি—কী দেওয়া যায় ওদের? কয়েক লক্ষ ইয়ুয়ান কিংবা ভারত থেকে নিয়ে-যাওয়া কোন জিনিস? উঁহুঁ—কিছুই নয়, ওতে নাকি নীতিহীনতা দেখা দিতে পারে, প্রাপ্তির লোভে সেবায় হয়তো মানুষ বিশেষে কম বেশি হবে ভবিষ্যতে। আর ওরাও প্রত্যাশা করে না। দিয়ে দেখুন, স্পর্শ করবে না উপহারের জিনিস—কথায় বোঝাতে পারে না তো, এক অদ্ভুত ধরনের হাসি হাসবে।

অথচ—পিছিয়ে যান দিকি কয়েকটা বছর। ঐ চীনেরই রণক্ষেত্রে সৈন্য আহত হয়ে আর্তনাদ করছে, বিনা বখশিশে কেউ তাকে ছোঁবে না। ছুটছে—যে-লোকের কাছে মোটা রকম প্রত্যাশা আছে। এ আমার মনগড়া কথা নয়—শতেক দৃষ্টান্ত রয়েছে.

ছাপা বইয়েও এবং বিবিধ বিস্তর কাহিনীতে। আর পশ্চিম ইউরোপীয় অঞ্চলে একটু দৃষ্টিপাতকরুন—এবং তাদের তল্পিবাহক আমাদের দেশি হোটেলগুলোর দিকেও। এক টাকা খাওয়ার চার্জ ধরল তো টীপস্ লাগবে অন্যূন অষ্টগণ্ডা।

না—নতুন-চীনে এ সমস্ত একেবারে নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু ভালবাসা, হাতে হাতে স্নেহস্পর্শ, আলিঙ্গন? তাদের এক-একজনকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে আমরা ঋণ স্বীকার করে এসেছি।

(১০)

প্রাতঃরাশের পর চিঠিপত্র লেখা শেষ করতে দশটা। আমাদের জন্য আলাদা পোস্টাপিস বসেছে নিচের তলায় ড্রয়িং রুমের এক পাশে। গাদা গাদা কাগজ-খাম ঘরের টেবিলে। তাতে না কুলায়, পোস্টাপিসে এসে হাত পাতলে যত খুশি পেয়ে যাবেন। দেদার লিখে যান—যদৃচ্ছা লিখে দিয়ে দিন পোস্টাপিস ওয়ালাদের কাছে, মালপত্র পাঠাতে পারেন দু-সেরি পাঁচ-সেরি প্যাকেট বেঁধে বেঁধে। হিজিবিজি-লেখা একটা শ্লিপ ওঁরা এগিয়ে দেবেন, খানাঘরের মতন এখানেও স্লিপের উপর সই মেরে ছুটি। তারও করা যায়—খরচ পড়ে শুনলাম কথা প্রতি টাকা পাঁচেক (ভারতীয় টাকা ওঁদের ইয়ুয়ান নয়)। তা সে যা-ই লাগুক, সে টাকাও গৌরী সেনের—অতএব আমাদের কি ভাবনা? কেবল (cable) করছেনও অনেক, খবরাখবর পাঠাচ্ছেন। প্রেমপত্রাদি ছাড়ছেন না বোধহয়। ছাড়লেও ও-তরফ থেকে আপত্তি হবে না, চক্ষু বুজে পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু অতিথিদের আক্কেল বিবেচনা আছে তো!

দশটা বেজে গেল। বেরুনো হবে এবার। বাস অপেক্ষমান। দোভাষি ছেলে-মেয়েরা ভাগ করে নিয়েছে, কারা সামলাবে কোন্ দলকে। নতুন বয়স—অফুরন্ত তাদের অধ্যবসায়, সময় মতো ঠিক নিয়ে বের করবে। সময় মেপে প্রতিটি কাজ—প্রোগ্রামের একটু এদিক-ওদিক হতে দেবে না। সাগর পাহাড় পার-হয়ে-আসা অবোধ মানুষগুলোর গার্জেন হয়ে স্ফূর্তির অবধি নেই। এটা দেখায়, ওটা বোঝায়—নিজেরা যা বোঝে না, তা ও বোঝাতে ছাড়ে না।

এ কোথায়—তোমাদের কেমন ধারা য়ুনিভার্সিটি গো?

সঙ্কীর্ণ লোহার গেট পার হয়ে বাস ভিতরের প্রাঙ্গণে ঢুকল—যেন জেলের মধ্যে পুরেছে। ব্যাপার তাই বটে। চিয়াং-কাই-শেকের আমলে কম্যাণ্ডার-ইন চীফ থাকত এখানে আর তার প্রধান দলবল। তাই এতে উঁচু পাঁচিল—এমন উদ্ধত লৌহদ্বার। বড় এক পুকুর—বরফ-পড়া রাতে কত কম্যুনিস্টকে ঐ পুকুরে চুবিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করেছে।

হেসে হেসে দেখাচ্ছে আমায় সুইং ইঞা-মিং। নতুন গ্র্যাজুয়েট হয়েছে মেয়েটা—গোলালো মুখ, চোখে নিকেলের চশমা, মিষ্টি হাসে কথায় কথায়। আজকে নবীন কলের ছেলেমেয়ের হাস্যোল্লাসে পুরানো কলঙ্ক ধুয়ে মুছে গেছে। এ যেন আর এক জায়গা, এরা সব আর এক মানুষ।

পিপল্‌স্ য়্যুনিভার্সিটি। শুধু কেতাবি বিদ্যা নয়, দেশ গড়ে তোলার শিক্ষা দেওয়া হয় এখানে। ফ্যাক্টরিতে কাজ করছ, কৃতিত্ব কোন এক বিষয়ে—এসে থেকে যাও এখানে মাস তিনেক। খুব ভাল করে শিখে যাও তোমার সেই জিনিসটা। বছরে এমনি এসে এসে পাকাপোক্ত কর্মী হয়ে যায়। মাইনে-পত্তোর দেয় ফ্যাক্টরি।

আনকোরা প্রতিষ্ঠান—১৯৫০ অব্দে তৈরি। কলকাতায় পুরাতন ইলিসিয়াম রো'র বাড়িটায় গান্ধি-আশ্রম প্রতিষ্ঠা হলে যা হত—সেই ব্যাপার আর কি। ইস্কুল,

নার্সারি ইস্কুল, কলেজ য়্যুনিভার্সিটিতে সারা দেশ ছেয়ে দিচ্ছে এরা এই নতুন আমলে। এক পিকিন শহরেই গোটা চারেক য়্যুনিভার্সিটির খবর পেলাম। লম্বা টেবিলের এদিকে-ওদিকে সকলে বসেছি। য়্যুনিভার্সিটির কর্তারা আছেন। আছেন কয়েকজন শ্রমিক-বীর—ফ্যাক্টরির কাজে দেশের ধনোৎপাদনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে চ্যান্সেলার, ভাইস চ্যান্সেলার প্রভৃতির সমতুল্য আসন ঐ বীরবর্গের। চা ইত্যাদি যথারীতি সম্মুখ ভাগে। পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এক-একজন উঠে দাঁড়াই, সেক্রেটারি নাম ধাম ও ক্রিয়াকর্ম শুনিয়ে দেন। আর হাততালি।

একটি ভারতীয় মেয়ে—চক্রেশ জৈন। আমাদের দলের সে নয়, পিকিনে থাকে। বাপ জগদীশ জৈন পিকিন-বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দির অধ্যাপক। ভারত থেকে অধ্যাপক মশায়কে নিয়ে গেছে। মেয়ে বাপের সঙ্গে। সে-ও হিন্দি পড়ায়, আর বাপের খবরদারি করে। দূর বিদেশে অধ্যাপক জৈনের মা হয়ে বসেছে।

জৈনকে চিনলেন তো? সে-আমলে কাগজে পড়েছিলেন, বেশ খানিকটা হৈ-চৈ হয়েছিল ব্যাপারটা নিয়ে। গান্ধিজীকে হত্যার ষড়যন্ত্র দৈবক্রমে ইনি কিছু জানতে পারেন। পুলিশকে জানিয়েও ছিলেন সে কথা। পুলিশ তেমন আমলের মধ্যে আনে নি, এত বড় সর্বনাশ ঘটে গেল তাই। এই নিয়ে অধ্যাপক জৈন বই লিখেছিলেন 'আই কুড নট সেভ বাপুজী' বাপুকে বাঁচাতে পারলাম না।

এতগুলো দেশের মানুষ পেয়ে বর্তে গেছে চক্রেশ। চোখে-মুখে কথা বলে মেয়েটা —কথার তুবড়ি ফোটাচ্ছে। মাস-ছয়েক ধরে জমে ওঠা সমস্ত কথা এক সঙ্গে বলে ফেলতে চায়। ইংরেজি বলছে সুপ্রচুর, চীনা বলে, হিন্দি বলছে। আর ছটফটে এমন —একটা মিনিট স্থির হয়ে বসা তার কুষ্ঠিতে লেখা নেই।

নিয়মমাফিক বক্তৃতা দিয়ে শুরু। চ্যান্সেলার সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক—লিখিত-বক্তৃতায় ঢালাও ধন্যবাদ দিলেন সকলকে। বললেন, নতুন য়্যুনিভার্সিটি স্থাপনার যাবতীয় ইতিহাস ও কাজকর্মের কথা। তার পরে ভাইস-চ্যান্সেলার। প্রশ্নের পর প্রশ্ন আমাদের তরফ থেকে। কত ছাত্র, কতগুলো ক্লাস, শিক্ষনীয় বিষয় কী কী? তাবৎ ব্যবস্থা বুঝে নিতে চাই ঐ এক চেয়ারে বসে বসে।

এবারে নিয়ে চললেন একজিবিশন-ঘরে। নতুন চীনের কর্মোৎসাহের পরিচয় থরে থরে সাজানো। একটা ঘরে চীন-বিপ্লবের জ্বলন্ত ও সুবিস্তৃত ইতিহাস। দরজা দিয়ে ঢুকে পায়ে পায়ে এগোচ্ছি। এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়। কত ছবি, কাহিনী, কত রকমের কাগজপত্র। মুক্তি-ফৌজ ঝোড়ো রাতে নিঃসীম নদী পার হয়ে যাচ্ছে—তার ভয়াবহ ছবি। যে শহীদেরা প্রাণ দিল তাদের কতজনের ছবি, টুকিটাকি তাদের ব্যবহারের জিনিসপত্র। এ সমস্ত অভিভূত করে আমাকে, আমাদের সর্বত্যাগী ছেলেমেয়েদের কথা পাশাপাশি মনে পড়ে যায়।

ভারতীয় দলের পরামর্শ-সভা বিকালবেলা। এ সভা লেগেই আছে—পথের কষ্টে কাল বড় ক্লান্ত ছিলাম, আমাদের ক'জনকে রেহাই দিয়েছিল তাই। হোটেলের প্রশস্ত একটা ঘরে একসঙ্গে মিলেছি।

শান্তি-সম্মেলন পঁচিশে অর্থাৎ আগামী কাল থেকে বসবার কথা। ক'দিন চলবার পরে ১লা অক্টোবর বন্ধ থাকত ওদের জাতীয় উৎসবের দরুন। উৎসব অন্তে আবার চলত।

বানচাল হচ্ছে এই ব্যবস্থা। কত দেশের কত মানুষ একত্র জমবে—বহু জনে এখনো পথে পড়ে, এসে পৌঁছতে পারে নি। আসছে তারা অনেক কষ্ট করে। কাছাকাছি এই জাপানের কথা ধরুন। ছাড়পত্র অনেকেরই ভাগ্যে হয় নি, কয়েক জনে শুধু পেয়েছে।

মানুষগুলোও নাছোড়বান্দা—সমুদ্রটুকুর ওপারে অপরূপ আনন্দ-সমাবেশ—ছাড়পত্র দিলে না, তা বলে কি পড়ে থাকবে দ্বীপের চৌহদ্দির মধ্যে? সমুদ্র সাঁতরে পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়—কি কৌশলে বন্দুকবেয়নটের সতর্ক পাহারা এড়িয়ে এ-তটে এসে পেঁছিবে, খোদায় মালুম। গবর্নমেণ্ট খুব নাকি তড়পাচ্ছে—দেশে ফিরতে হবে না? দেখে নেবে আবার যখন ওদের খপ্পরের মধ্যে পাবে।

আরও আসছে—বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নানা অঞ্চল থেকে। আগে তো ভাবা যায় নি, শান্তি-সম্মেলনের মতো এমন নিরীহ অনুষ্ঠান সম্পর্কেও কর্তাদের এতখানি দ্বিধা-সন্দেহ। পথ তবু কিছুতে রুখতে পারল না—আসছে তারা, এসে পড়ল বলে। নদী-সমুদ্র পাহাড় জঙ্গল পার হয়ে পায়ে হেঁটে আসছে—তারিখ মতো তাই এসে পেঁছাতে পারছে না। ছাড়পত্র ধারী ভাগ্যবানদের মারফতে খবর পাঠিয়েছে, যাচ্ছি গো, সবুর করো কয়েকটা দিন ভাই। এত কষ্টে হাজির হয়ে শেষটা না দেখতে হয় শলা-পরামর্শ অন্তে যে যার কোটে ফিরে গেছে।

তাই তারিখ পেছুল জাতীয় উৎসব চুকে যাক, সম্মেলন তার পরের দিন থেকে চলবে। অবিচ্ছেদ্য আট-দশ দিন ধরে চলতে পারবে, মাঝে কোন বিরতির দরকার হবে না। ২রা অক্টোবর তারিখটা ভারতীয় পঞ্জিকার নির্ঘণ্ট মতে—পরম শুভও বটে—গান্ধিজীর জন্মদিন। অধুনাতন পৃথিবীতে শান্তির সাধনায় প্রাণপাত করছেন অমন আর কে? এই ভাল হল—গান্ধিজী ধরায় এলেন, সেই পুণ্য দিনে শান্তি সম্মেলনের আরম্ভ।

আবার এক মতলব হচ্ছে—

কার্তিক কানে কানে খবরটা দিল। এত দেশের এত মানুষ জুটেছে—বলুন দিকি, আমাদেরই কি মাথা মোটা সকলের চেয়ে? তারা তো রা কাড়ে না, নোটের বাণ্ডিলে পকেট মোটা করে দিব্যি গোঁফে তা দিয়ে বেড়াচ্ছে।

সাব্যস্ত হয়েছে, দশ লক্ষ করে ঐ যে সকলকে হাতখরচা দিয়েছে, ভরেতীয় দল ও-টাকা নেবে না। অন্তর্যামীর মতো মনের কথা বুঝে নিয়ে অবিরত জিনিসপত্রের যোগান দিচ্ছ, হাতখরচ করব—তার ফাঁক রেখেছ কোথা?

শুনে ও-পক্ষ তো হাঁ হাঁ করে ওঠেন।

আমাদের চিরকালের প্রথা—অতিথি এলে খাওয়া-দাওয়া শুধু নয়, সম্মান-দক্ষিণা দিতে হয়। হাজার বছর ধরে হয়ে আসছে। ভারতেও আছে নিশ্চয় এমনি-কিছু। থাকতেই হবে। প্রাচ্য আতিথ্যের রীতি এই।

কুয়োমিনটাং আমলে ছিল না—ছেড়ে দিন মহাশয়, সে কথা। সকল পাট উঠে গিয়েছিল সে দুর্দিনে। যখন দিন পেয়েছি রীতিপর্ব একে একে সমস্ত বহাল হবে। নতুন-চীনে দেশ বিদেশের মানুষ প্রথম এই একসঙ্গে পায়ের ধুলো দিলেন, কিছুই তো করা হল না—অতি-সামান্য এতটুকুও যদি গ্রহণ না করেন, আমরা মরমে মরে যাবো।

এর উপর তর্ক চলে না। নেওয়া হল টাকা, বাঁটোয়ারা হল। চুপিচুপি ঠিক রইল, হজম করা হবে না—ফেরত দিতে হবে কয়েকটা দিন পরে কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে।

হল তাই। সকলে অবশ্য পুরোপুরি দিতে পারেন নি, খরচ হয়ে গিয়েছিল কিছু কিছু। সমস্ত একত্র করে দান করা হল শিশুমঙ্গল সমিতিতে। কেমন! তোমাদের নিয়েছি যখন, আমাদের এ-দানও নিতে হবে। নইলে মর্মাহত হতে জানি আমরাও।

হাতখরচের টাকা ফেরত দেওয়া হল এমনি ভাবে। সাঁইত্রিশটা দেশের মধ্যে ভারতীয়েরাই দিল শুধু। ঐ যেমন কার্তিক বলল—অন্য সবাই উচ্চবাচ্য না করে পকেটস্থ করলেন।

পুরের দিন, অর্থাৎ পঁচিশে। সম্মেলন যখন হচ্ছে না, দেখাশুনো করে বেড়াও। ঘরে পড়ে থাকবে কেন—চীনকে দেখে বুঝে নাও, প্রাচীন সম্পর্কটা ঝালিয়ে নাও পরস্পরের মধ্যে! এটাও কাজ সকলের—আমি বলি, সকলের বড় কাজ।

গ্রীষ্মপ্রাসাদে (Summer Palace) যাচ্ছি। বরাবর-ওখানে রাজরাজড়ারা গিয়েছেন সান-ইয়াৎ-সেনের অভ্যুদয়ের আগে পর্যন্ত। তাঁরা যেতেন ঘোড়ায় পালকিতে—আমরা বাসে। চারখানা ঝকঝকে নতুন বাসে মিছিল করে চলেছি।চানটান সেরে নিয়েছি, মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া ওখানে। আটশ বছর ধরে যে ঘরে কেবল রাজ-রাণীরা খেয়ে এসেছেন, সেইখানে আজ আমাদের পাত পাড়বে। বুঝুন। সারা দিনমান কাটবে ওখানে—সারাদিন ঘুরেও নাকি নমো-নমো করে দেখা হবে, এমনি বৃহৎ জায়গা।

শহরের বাইরে জায়গাটা—দূর কম নয়। বাসে ঘণ্টাখানেক লাগল। সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় বলে উঠলেন, দেখছেন—একটা পাখি নেই কোনদিকে।

সত্যিই তো! এত পথ এলাম, এত গাছগাছালি—পাখি উড়তে দেখি নি, কোথাও। আমার বাংলা দেশের মতো পাখির ডাক ভেসে আসে না অলক্ষ্য থেকে।

সুবোধ বন্দ্যো—ব্যাক্তিটিকে মালুম হচ্ছে তো? বিধান-সভার সভ্য—খবরের কাগজে হামেশাই যার নাম পাচ্ছেন। চোখ ও মন খোলা—প্রতিটি জিনিস জেনে বুঝে নিতে অসীম চেষ্টাপর তিনি।

বেলা সওয়া দশটা! বাস থেকে প্রাসাস দ্বারে নামলাম। ব্রোঞ্জের বিশাল সিংহ পাহারা দিচ্ছে। অদূরে 'দীর্ঘায়ু ও দয়ার হল'। ঘরবাড়ি, পথ-পাহাড়, অলিন্দ, দরজা, জীপ—সকল বস্তুরই এক-একটা-বিচিত্র নাম। কয়েকটা ধাপ উঠে ভিতরে পেঁছিতে হবে। রাজবাড়ি কি না—সিঁড়ি থেকেই অভিনবতা শুরু। ধাপ দু-পাশে—মাঝখানটা ঢালু হয়ে উঠেছে। বিশাল ড্রাগন খোদাই-করা সেখানে।

দু-পাশের সিঁড়ি দিয়ে সকলে উঠছেন। আমরা কয়েক জন মাঝের ঢালু পথে ড্রাগন-দেহের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে। নতুন কায়দায় উঠে যাওয়ার বাহাদুরি আর কি!

চক্রেশ এসেছে দলের সঙ্গে। বলল, আরে সর্বনাশ—মুণ্ড কাটা যাবে যে!

স্তম্ভিত হলাম। আর যাই হোক, স্কন্ধকাটা হয়ে দেশে ফিরব কোন্ লজ্জায়? মুণ্ড নেই দেখে বন্ধুসজ্জন বলবেন কি?

খিল-খিল করে তরঙ্গিত হাসি হাসতে লাগল চক্রেশ।

বলে, হাসছি বটে আজ। হাসি বেরিয়ে যেত সেই আমলের কেউ দেখতে পেলে। মাঝখানের ঐ জায়গা দিয়ে যাবে শুধু রাজশিবিকা। শিবিকায় রাজা থাকবেন—অপর কেউ নয়। অপরে পা ছোঁয়ালে তক্ষুনি গর্দান। রাজার পথে চলবে এত বড় আস্পর্ধা!

বাজে লোকের পথ হল দু-পাশের ঐ ধাপগুলো। বাজে মানে কি আপনি আমি? রানী, রাজপুত্র, মন্ত্রী, সেনাপতি—ওরাই সব। ভারী দরের মানুষ ছাড়া এখানে ঢুকবার জো ছিল না। কুয়োমিনটাং আমলেও—এই সেদিন অবধি। এখন খোলা দরজা। যে-কেউ এসে দেখ, শোন, ঘুরে বেড়াও।

মহারানীর অফিসঘর। প্রাঙ্গণ ও অলিন্দে নানা জীব-জানোয়ার ব্রোঞ্জ ও নানা ধাতুতে গড়া। ড্রাগন, ময়ূর সু-নি নামক অবাস্তব পৌরাণিক জীব। বড় বড় পাত্র অগ্নিভয়ে জল রাখবার জন্য। ঘরের মাঝখানে সিংহাসন। দু-পাশে দুই হাঁসের মাথায় বাতিদান, ধূপদান। দশম শতাব্দীর তৈরী সিল্কের বিচিত্র কারুকর্ম শান্ত সমাহিত প্রভু বুদ্ধের মূর্তি একটি প্রান্ত জুড়ে⋯

এই গ্রীষ্মপ্রাসাদ বাইরে থেকে সামান্য, প্রায় সাধারণ—বোঝা যায় না, এত বস্তু আছে ভিতরে। পাথর-কাটা পথ অতিক্রম করে এসে হঠাৎ দেখি সুবিশাল লেক। জল সমুদ্রের মতো গাঢ় নীল—চোখ জুড়িয়ে যায়। তিন ভাগই জল এখানে, একভাগ মাত্র ডাঙা। লেক ঐ তো হল—তা ছাড়া পদ্ম-ভরা কত পুকুর। খালও আছে—জেডপ্রস্রবণের জল নিয়ে আসা হয়েছে পাহাড়ের গোড়া থেকে খাল খুঁড়ে। উঁহু, খাল কেন হবে—নদী। নামটা শুনবেন? সোনালী জলের নদী।

যত এগোই, বিস্ময়ের পর বিস্ময় উন্মোচিত হতে থাকে। এত বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য ধারণায় আসে না। দূর-পাহাড়ের উপর ঘর -বাড়ি দেখা যায়-ওগুলোও গ্রীষ্মপ্রাসাদ এলাকার মধ্যে। নেই যে কোনটা? পাহাড়, দ্বীপ, সেতু,মণ্ডপ, জয়স্তম্ভ কক্ষ, অলিন্দ, পার্ক, ছাতে-ঢাকা রাস্তা—এবং পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় বিশাল বুদ্ধ-মন্দির। না জানি কোন কবির নামকরণ। গোটা জায়গাটারই এক সময়ই নাম হয়েছিল—'স্বচ্ছ ঢেউয়ের পার্ক'; এই ফটকের নাম 'রঙিন মেঘের দরজা'; লেকের মধ্যে রয়েছে 'পরী-দেশের দ্বীপ'; পাহাড়ের উপরে 'ভালোবাসার শিখর'। একটা ঘর 'সুবাসের বাস'—লতায় পাতায় অপরূপ সাজানো; নাকে শুঁকতে হয় না—চোখের দৃষ্টিতেই বুঝি সুবাসের আঘ্রাণ পাওয়া যায়। লেকের কিনারায় পদ্মবনের পাশে 'বাসন্তী-মণ্ডপ' হাতছানি দিয়ে ডাকে বসন্তরাত্রে অলস বিশ্রামের জন্য।

পৃথিবীখ্যাত অপরূপ এই প্রমোদনগরী। আট'শ বছরে কত রাজা কত রাজবংশের বিলয় ঘটেছে, নগরী রচনা অব্যাহত থেকেছে তবু। আগুনে পুড়িয়েছে ইংরেজ আর ফরাসি, ভেঙে চুরমার করেছে আটটা দুশমন জাত একত্র হয়ে—আবার নতুন ইমারত গড়ে উঠেছে ভগ্নস্তূপের উপর। সর্বশেষ রানী বিচিত্র ষড়যন্ত্র জাল বুনতেন এই প্রাসাদে বসে। কত পাপ অন্যায়, কুট কৌশল, বন্দীত্ব, বিষপান। এক-আধ দিন নয়—সাতচল্লিশ বছর নানান কৌশলে তিনি রাজত্ব করে গেলেন।

পদ্ম আর বাঁশবন দেখে ক্যান্টনের পথের কথা মনে পড়ে যায়। ব্যাপারও তাই। সেকালের এক দুঃসাহসী রাজা (চে-লুং) ইয়াংসি পার হয়ে গিয়েছিলেন দক্ষিণ-চীনে। সেখানকার নিসর্গ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে দক্ষিণের গাছপালা আমদানি করে এই উদ্যান সাজিয়েছেন। নানা জাতীয় বামনগাছ—পাঁচ-সাত শ' বছরের বাড়বৃদ্ধি কুল্যে হাত-খানেক। জাপান ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও হেন বস্তু দেখা যায় না। এই গাছ-লালনের কৌশল এরাই শুধু জানে।

লেকের আগে অন্য নাম ছিল, এখন কুরেমিন লেক। ছোট ছিল, কেটে বড় করেছে। সেই মাটি পাহাড়ের গায়ে পড়ে পাহাড়েরও আয়তন বেড়েছে। জলের মাঝখানে 'পরীদেশের দ্বীপ'—ঘরবাড়ি ও গাছগাছালি মেশামিশি হয়ে আছে বিচিত্র রূপে। মার্বেল পাথরের তৈরী সতের-খিলানের সেতু। হুড়োহুড়ি করে সেতুর উপর দিয়ে ছুটলাম সকলে দ্বীপের দিকে। চার সিংহ সেতুমুখ পাহারা দিচ্ছে—ভয় নেই, ভয় নেই। পাথরের সিংহ।

লেকের উপর পাহাড়ের গায়ে মার্বেলের নৌকা। দুশ' বছর আগে তৈরি—তখন ছিল শুধুই নৌকো—বাড়িয়ে ও ঘষামাজা করে দোতলা জাহাজের রূপ দিয়েছে ১৮৯২ অব্দে। অযত্নে অবহেলায় পড়ে ছিল, নতুন আমলে পরিপাটি হয়েছে আবার।

পাহাড়ে উঠছি এবার—বুদ্ধমন্দিরে। উঠতে উঠতে ক্লান্ত হয়ে গেছি। পথ সংকীর্ণ। খানিকটা জায়গায় সিঁড়ির মতো—ফাঁকা-ফাঁকা টেরা বাঁকা সিঁড়ি। মন্দি-রের পথ বলেই বোধহয় এমনি—অনায়াসপ্রাপ্তিতে পুণ্য নেই। আরে, হাত ধরতে

আসে যে মেয়েগুলো! এক-এক ফোঁটা কলেজের মেয়ে পাহাড়ের এই দুরারোহ পথ—ভারি আস্পর্ধা বাপু তোমাদের! রাগ করে জোর পায়ে ওদের আগে গিয়ে উঠি। এই তো সেদিন অবধি পায়ে ছোট লোহার জুতো পরিয়ে রাখত, এতটুকু পা নিয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হয় যাতে। মেয়েমানুষ খোঁড়া হয়ে বেশ নাচের ঠমকে চলবে, সেই তো শোভা। সানইয়াৎ-সেন প্রাচীন বনেদি রীতি রহিত করে চিরকালের বামনদের মনে চাঁদ ছোঁয়ার স্বপ্ন জাগিয়ে দিলেন। তাই দেখুন, দুর্গম গিরিপথে দাপাদাপি করছে সাহসিকা-দল। আজ কিনা হাত ধরে আমাদের গিরিশীর্ষে নিয়ে তুলবে বলে।

উপরে মন্দিরের নিম্নদেশে আর-এক মন্দির। নয় তলা ছিল—ইংরেজ ও ফরাসীরা ভেঙে দেয়। এখন চার তলা মাত্র। কপিলাবস্তুর রাজপুত্র সন্ন্যাসী বহু সহস্র ক্রোশ দূরে অটল মহিমায় দাঁড়িয়ে আছেন—দুই প্রধান শিষ্য দুপাশে। মণিমাণিক্য হীরা-জহরতে সাজানো ছিল বিগ্রহ, ঠিক সামনে ঐখানটায় ছিল অতি-বৃহৎ আয়না—দেখুন, চেয়ে দেখুন, নিদর্শন রয়েছে তার। —তিক্তকণ্ঠে দোভাষী মেয়েটা বলে, সেই লুঠেরারা ভেঙে ফেলেছে আয়না, মণিমাণিক্য ডাকাতি করে নিয়ে গেছে। সারা দেশ জুড়ে বার বার এমনি অত্যাচারের ঢেউ বয়ে গেছে। বলতে পারেন, কেন এমন হয়?

বেলা গড়িয়ে আসে। দেখার শেষ নেই। পা টলমল করছে, তবু বসতে মন চায় না। দু-চোখ ভরে দেখে নিই আর যেটুকু সময় আছে। চিরজন্মের এই দেখা…

রাজার জন্মদিন উৎসব হত এই ঘরটায়। ঐ চেয়ার আর ঐ টেবিল কাঠের তৈরী, আয়তনও এমন-কিছু বড় নয়। নিয়ে যাও দিকি সরিয়ে। হেঁ-হেঁ, দশ-বিশের কর্ম নয়—সাত শ' মানুষ লাগাতে হবে, তবে নড়বে।

লুঠপাঠ হয়ে গিয়েও যা এখনো আছে, স্বদেশি বিদেশি সকলের চোখ ঠিকরে যায়। হাতির দাঁতের তৈরী একটা মাছ দেখুন কত বড়। দেখুন, প্রাচীন শিল্পী ফ্যান-আন-ইয়া'র অপরূপ চিত্রমালা। আর ওদিকে মাটির কাজ, গালার কাজ, চন্দনকাঠের কাজ। কারু-শোভিত আসবাপত্র, অলঙ্কার, ছাত থেকে ঝুলানো রকমারি বাতিদান…কত আর লিখব! লিখতে গেলে দেখা হয় না, পিছিয়ে পড়ি। এই সব কক্ষ-অলিন্দ মণ্ডপ-চত্বরের গোলকধাঁধার মধ্যে রাজমাতা রাজকন্যারা কোথায় যেন বেড়াতে বেরিয়েছেন—এক্ষুনি আসবেন ফিরে—তেমনি ভাবে চারিদিক পরিপাটি করে সাজানো। তাঁদের অনুপস্থিতে তাড়াতাড়ি চোখের দেখা দেখে নিচ্ছি আমরা।

শেষ রানীর পোশাক বদলানোর ঘর। কত পোশাক রে বাপু—দেওয়ালে কত রকমের আয়না! চন্দনকাঠের অতিকায় পেঁটরা; মাছ রাখত, ফল রাখত, চন্দন পোড়াত—সেই সব নানা ধরনের পাত্র। সাতচল্লিশ বছরের রাজত্বে স্ফূর্তির চূড়ান্ত করে গেছে বটে! সব দেশের রাজরাজড়ার ঐ এক রীতি। আট-আটটা রান্নাবাড়ি রানী সাহেবার—গুণে দেখলাম। মহারানী যখন, তার কমে কুলাবে কেন? অমন দেড়-শ দু-শ রাঁধুনি ছিল—তারাও সামাল দিয়ে উঠতে পারত না। মারাঠি মেয়ে সরলা গুপ্তা হেসে বললেন, পোড়া কপাল আমাদের, একটা রাঁধুনি জোটে না—হাত পুড়িয়ে খেতে হয়।

রানী হতে হবে, তবে তো দু'শ রাঁধুনির রান্না খাবেন। কেরানী, চাকরানী—এই তো সকলে। শুধু মাত্র রানী কে আছেন, বলুন।

অপেরা ঘর—তেতলা-মঞ্চ। নাটকের পরী স্বর্গ অর্থাৎ উপরতলা থেকে এবং দৈত্যদানো পাতাল অর্থাৎ নিচের তলা থেকে আবির্ভূত হত মাঝের মঞ্চে। রাজ-পরিবার অভিনয় দেখতেন ঐ ঘরের ভিতর কাঠের ঝিলিমিলির অন্তরাল থেকে। এখন মিউজিয়াম—পুরানো শিল্পবস্তু সাজানো রয়েছে। একধারে বিশ্রামকক্ষ সারি সারি।

আর বাজনা বাজে না, নাটক হয় না—গহনায় শিঞ্জন নেই প্রেক্ষাকক্ষে। সিঁড়ির ধারে ছোট ঐ গাছটিতে অজস্র লাল ডালিম ফলে নির্জন গৃহাঙ্গণ আলো করে রয়েছে।

না গো, নির্জন হবে কেন, সাড়াশব্দ পাই যে ভিতরে! বিছানা, কাপড়চোপড়, থালাবাটি—উঁকি দিয়ে দেখি, মানুষও রয়েছে শুয়ে বসে। একজন দুজন নয়—বিশ্রাম ঘরগুলো সমস্ত ভর্তি। আমাদের দেখে বেরিয়ে এলো। হাততালি দিচ্ছে। সমবেত কণ্ঠে গলা মিলিয়ে বলছে—চীন-ভারত এক হও, হোপিন ওয়ানশোয়ে,শান্তি দীর্ঘজীবী হোক।

এরাই রাজা একালের। সর্বাঙ্গে দুঃখ-সংগ্রামের অগণিত ক্ষতচিহ্ন—মুখের প্রসন্ন হাসির সঙ্গে দেহের চেহারা একেবারে বেমানান। শ্রমিক-বীর এরা। কৃতিত্বের পুরস্কার —রাজকীয় প্রমোদ-নগরীতে দশটা দিন স্ফূর্তি করে যাবে। অতুল সম্মান—যখন কাজে ফিরবে সম্ভ্রমদৃষ্টিতে তাকাবে সকলে। আট শতাব্দী ধরে গড়ে-তোলা গ্রীষ্ম-প্রাসাদের সেই অপরাহ্নে নবীন কালের রাজা মহারাজারা গভীর উল্লাসে হাত ঝাঁকিয়ে বিদেশি আগন্তুকদের সংবর্ধনা জানাল…

কিন্তু আর নয়। দূতাবাসে যেতে হবে। লেকের জলে নৌকা চড়া হল না… উপায় কি, দূতাবাসে হাজিরা দিতে হবে আজকের মধ্যেই।

ছুটল বাস। বেশ লাগে, এই সুদূর শহরে একটি বাড়ির মাথায় বিশাল ত্রিবর্ণ ভারতীয় পতাকা উড়ছে। কক্ষে কক্ষে গান্ধির ছবি। নাম সই করতে হল ওঁদের খাতায়, তারপর গল্পগুজব চলল। শরবত খাওয়ালেন ওঁরা। পরাঞ্জপে কোথাও কাজে বেরিয়েছেন, দেখা হল না তাঁর সঙ্গে।

(১২)

দোতলায় লিফটের সামনাসামনি একটা ঘরে ভারতীয় দলের অফিস। দরজার পাশে নোটিশবোর্ড। হরেক রকম নোটিশ বেরুচ্ছে দিনের মধ্যে অমন বিশ বার। উঠা-নামার মুখে বোর্ডে অতি-নিশ্চয় উঁকি দিয়ে জেনে যাবেন—কী আপনার করণীয় অতঃপর। সেক্রেটারি বিস্তর—লেখাজোখারও সে জন্যে অবধি নেই। বহু সন্ন্যাসীর কর্মতৎপরতায় দরকারি জিনিসটাই অবশ্য বাদ পড়ে থাকে কখনো কখনো।

সোভিয়েট-ডেলিগেটরা নিমন্ত্রণ করেছেন ব্যাঙ্কুয়েট-হলে। সন্ধ্যার সময় খাওয়া —ফিরে এসে নোটিশ-বোর্ড থেকে অবগত হওয়া গেল। আর কুমুদিনী মেহতা মুখে বললেন, জনকয়েক সাহিত্যিকের মধ্যে মোলাকাতের চেষ্টা করা যাচ্ছে। হয়তো বা এখনই। ঘরে থাকবেন, বেরিয়ে পড়বেন না।

চোরে চোরে মাসতুত ভাই—অমন আপন-জন বিদেশ-বিভূঁয়ে আর কে? চোখ ঠেরে কুশলাদি শুধাবো, খবর কি ভায়ারা? লেখনী-পেষণের কারবার চলে কেমন ওদিকে? খাতির পাও, সভায় ডাকে, বই-টই কিনে পড়ে তো সবাই—না মুফতে বাগাবার চেষ্টা?

চারতলার ঘরখানায় কবি-সাহিত্যিক গিজগিজ করছে অর্থাৎ ডাক-সাইটে কতকগুলো মিথ্যুক আর অকর্মা জুটেছে এক জায়গায়। কথার সঙ্গে কথা জুড়ে বাজে কাজে বসে বসে তারা দিন কাটায়। শাস্ত্রের বচন-একশ' বার মিথ্যে কথা বলবে, কিন্তু না লিখ না লিখ। আর এই দুর্বৃত্তেরা (আমি, আর আমার মতন যারা গল্প-উপন্যাস লেখে) দেশ-বিদেশে বুক ফুলিয়ে প্রচার করে।

জন ত্রিশেক হবো আমরা গুণতিতে। ধুরন্ধর রাজনীতিকের স্থান নেই। অথবা তাঁরা আসবেনই না এই তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারে। আলোচনা বিশেষ ভাবে সোভিয়েত সাহিত্যিকদের সঙ্গে। তাঁর মধ্যে আছেন তুর্কি-কবি নাজিম হিকমতও। ভদ্রলোকের কবিতার গুঁতোয় তুর্কি-সরকার তেড়েফুড়ে শুধু মাত্র কবিতা নয়—কবিকেও বের করে

দিয়েছেন দেশ থেকে। অগতির গতি রাশিয়ার আশ্রয়ে তিনি আছেন। মস্কোয় বসতি।

কী সব তাগড়া জোয়ান! কলমবাজিতে উদরপূর্তি করে এমনধারা চেহারা বাগিয়েছে—আমাদের কালোবাজারিরাও যে হার মেনে যায়। নাজিম হিকমতের অনেক কবিতা বাংলায় পড়েছি—ভারি ঔৎসুক্য কবিকে দেখবার। এত বড় কবি—অতএব কিঞ্চিৎ ললনা-মোহন আহা-মরি গোছের ভাব থাকা উচিত। সে-সব একেবারে কিছু নয়, মুসড়ে গেলাম—ইয়া দশাসই জোয়ান, টকটকে ফর্সা রং। একটা পা খোঁড়া, লাঠি নিয়ে চলতে হয় সর্বদা।

ছোট ছোট দল হয়ে গেল তুবসুন, কোজেভনিকভ, হিকমত—এমনি এক-একজনকে নিয়ে। আমরা দলের নেতা খোদ অ্যানিসিমভকে নিয়ে পড়লাম। মারি তো গণ্ডার, লুঠি তো ভাণ্ডার। সাহিত্যিক ও সাহিত্যের অধ্যাপক, তার উপর সোভিয়েট-লিটারেচার সম্পাদনা করেন। দেহ গৌরবেও হিমালয় পর্বতের বড় বেশি কম যান না। (সকলের হিংসা করে মরছি, এ অধমও অবশ্য হেলাফেলার বস্তু নন আয়তনের দিক দিয়ে।)

ব্যবস্থাপনা কুমুদিনী মেহতার—তিনি পরস্পরের পরিচয় করিয়ে দিলেন। দীর্ঘকাল বিলাতে ছিলেন, জলের মত ইংরেজি বলেন। রাশিয়া গিয়েছিলেন, রুশ ভাষাতেও দিব্যি দখল। আসল দোভাষি হলেন পোপোভ—ইংরেজিনবিশ কাগজে সম্পাদক ইনিও। কথাবার্তার মধ্যে কুমুদিনী ফোড়ন দিচ্ছেন মাঝে মাঝে, দুর্বোধ্য এক-একটা জিনিস সহজ করে বোঝাবার চেষ্টা করছেন।

গোড়ায় আমি একাই শুরু করেছিলাম। একটা শোফার একপাশে আমি, মাঝে অ্যানিসিমভ, ওপাশে পোপোভ। ইণ্ডিয়ার উপন্যাসকার শুনে গভীর আন্তরিকতায় হাত জড়িয়ে ধরলেন আমার। আহা, টেগোরের দেশের লেখক তুমি, টেগোরের উত্তরাধিকারী।

মনে মনে প্রণতি জানাই গুরুদেবের উদ্দেশে। দেশে দেশে কত সম্মান ছড়িয়ে গেছ তুমি আমাদের জন্যে। আজ কতকাল পরে পিকিন হোটেলের চারতলার ঘরে মানুষগুলো ড্যাব-ড্যাব করে চেয়ে রইল—তোমার রেখে-আসা ইজ্জত সগৌরবে মাথায় তুলে নিলাম। তাই তো বলি, বাইরে না এলে দৃষ্টি খোলে না, বোঝা যায় না নিজেদের যথার্থ মূল্য। সংকীর্ণ দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে বেড়াই, কূপের ভেকের মতো ভ্রান্ত অহমিকায় স্ফীতোদর হই। তোমার বিশ্বজনীনতা একদা সমালোচকের উপহাসের বস্তু হয়েছিল—বিশ্ব যে ক্রমে ঘরের মধ্যে এসে যাচ্ছে, উঁচু হয়ে দেয়ালের বাইরে নজর তুলে দেখে নিক তারা একটি বার। বাইরে এসে উপলব্ধি হয় টেগোর-নেহরু-নেতাজির মহিমা। ইতিমধ্যে আরও অনেকেই ঝুঁকেছেন এই দিকে। সোফায় জুত হয় না—তখন নিচের কার্পেটে গোল হয়ে বসি।

অ্যানিসিমভ বললেন, আমাদের সম্বন্ধে ধারণা কি তোমাদের দেশে? বিশেষ করে তোমাদের সাহিত্যিক মহলে? অনেক রকম ভুল ধারণা জন্মাবার চেষ্টা হয়—কি বলো? আচ্ছা, এই কিছুদিন আগে এক দল গিয়েছিলেন আমাদের দেশে। কেউ কিছু লিখলেন, খবর রাখো?

নজর বন্ধ রেখে চলি, অনেকেই অবশ্য আমরা। কতক অভ্যাসের বশে, কতক বা স্বার্থের খাতিরে। কিন্তু ওখানে তা ফাঁস করতে যাই কেন? বললাম, (আর তা মিথ্যাও বড় নয়) তোমাদের সম্পর্কে বড় আগ্রহ ভারতের মানুষের। রবীন্দ্রনাথ সেই যে 'রাশিয়ার চিঠি' লিখলেন, আগ্রহ সেই থেকে সর্বব্যাপ্ত হয়েছে। বলেছ ঠিকই—

নরকের কীট বলে ঢাক বাজাবার ব্যবস্থাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু সমস্ত বিতর্ক ছেড়ে দিয়ে তোমরা যে মানব-সমাজ নিয়ে অতি-আশ্চর্য এক্সপেরিমেণ্ট করছ এবং বিস্ময়কর সাফল্যও পেয়েছে—শত চেষ্টাতেও এ সত্য লুকোনো যাবে না। চিরাচরিত ভাবনার মূলে ধরে নাড়া দিয়েছ তোমরা। শুধু মাত্র থিয়োরি নয়—হাতে-কলমে তা রূপায়িত করে দেখিয়েছ। আরো দেখাবে।

রাশিয়া থেকে ফিরে হালে যা লেখা হয়েছে, তার মধ্যে সত্যেনদা'র বইটার কথা মনে ছিল। দরাজ ভাষায় তার পরিচয় দিলাম। অ্যানিসিমভ বললেন, কে লিখেছে বললে—মজুমদার?

মজুমদার, মজুমদার, বার কয়েক বলে লেখককে মনে আনবার চেষ্টা করছেন। বললাম, রাশিয়ায় আর চীনের কথা লোকে বড় শুনতে চায়। ছেলেপুলের রূপকথায় যেমন কৌতূহল, তেমনি যেন কতকটা। সত্যেনবাবুর বইটা যে মাসিকপত্রে বেরিয়েছিল, তার সম্পাদক আমাকেও অনুরোধ করেছেন। ফিরে গিয়ে চীনের কথা ধারাবাহিক ভাবে লিখতে হবে।

অ্যানিসিমভ উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, লিখবে তুমি? মানুষে মানুষে সত্য পরিচয় হোক, সব চেয়ে বড় কাম্য এটা। বিশ্বশান্তি আসবে। আর, রাজনীতিক নয়—সাহিত্যিকেরই এ কাজ প্রধানত।

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলি, আমিও ঠিক এমনি ভাবছি। মানুষই আসল। চীনের কথা যা লিখব তাতে থাকবে না সংখ্যাতত্ত্ব বা রাজনীতিক বিশ্লেষণ। ও সব বুঝিও নে। মানুষ থাকবে আমার কাহিনী জুড়ে। সামান্য আর মহৎ যত মানুষ দেখতে পাচ্ছি, তাদের এই সুবিপুল উল্লাস আর কঠিনতম সাধনা। জমে উঠেছে আমাদেরই সব দলের চেয়ে বেশি। উমাশঙ্কর যোশি আর অধ্যাপক শুকলা এলেন এই দিকে। এলেন কেরালার লেখক জোসেফ মুণ্ডেশেরি। আর যারা ছিলেন, মনে করতে পারছি নে।

সোভিয়েট সাহিত্য পড়ো তোমরা? কোন্ কোন্ লেখক তোমাদের প্রিয়, জানতে ইচ্ছে হয়।

শুধু ঘাড় নেড়ে এবার নিস্তার নেই। তা আমরাও পিছপাও কিসে? গড়-গড় করে কতকগুলো নাম বলা গেল। এ কালের শুধু নয়, সেকালেরও। আর উমাশঙ্করের, সত্যি প্রচুর পড়াশোনা। কোন একটা ভাল বইয়ের পাতা ধরে যদি একজামিন করতে বসি, তা-ও বোধকরি তিনি হার মানবেন না।

টলস্টয়ের সম্বন্ধে বললাম, কৈশোর থেকে তাঁর লেখায় অনুপ্রেরণা পেয়ে আসছি। মহাত্মা গান্ধী আমাদের হৃদয়ের মানুষ—টলস্টয়ের আসনও দূরবর্তী নয়?

অ্যানিসিমভ উল্লসিত হলেন।

দেখ, আগামী বছর টলস্টয়ের একশ' পঁচিশ জন্মবার্ষিকী। জাঁকিয়ে উৎসব করতে চাই এই উপলক্ষে। আর বুঝতে পারছ—এ হল আসলে সাহিত্যিকদেরই অনুষ্ঠান, তাঁরা জমায়েত হবেন সব চেয়ে বেশি। ভারত থেকে অনেক সাহিত্যিককে আমরা চাই, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে তাঁরা জীবন্ত পরিচয় স্থাপন করবেন। এ ব্যাপারে আশা করি পুরোপুরি সহযোগিতা পাবো তোমাদের—

নিশ্চয়, নিশ্চয়—

ওরে পাগলা ভাত খাবি না—হাত ধোব কোথায়? আমাদের বল সেই বৃত্তান্ত। কিন্তু চেপেচুপে মনোভাব প্রকাশ করতে হয়—হ্যাংলামি বেরিয়ে না পড়ে।

তারপর এক মোক্ষম প্রশ্ন উমাশঙ্করের। যে সন্দেহ অনেক মানুষের মনে। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা নেই নাকি সোভিয়েট-রাষ্ট্রে? চিন্তার প্রকাশ যথেচ্ছ করা চলে না। সাহিত্য ফরমাশ মতন তৈরি হয়, চিত্তের স্বতঃস্ফূর্ততায় গড়ে ওঠে না। দায়িত্বশীল ব্যক্তি আপনি—আপনার মুখ থেকে ব্যাপারটা প্রাঞ্জল ভাবে জানতে চাই।

হ্যাঁ, এমনি রটনা হয় বটে। ভাল হল আপনাদের প্রশ্নটা পেয়ে।

ক্ষণকাল চুপ করে রইলেন আমাদের দিকে চেয়ে। মুখে মৃদু হাসি। বললেন, সত্য আমাদের দিকে। কিছু লুকোবার নেই কারো কাছে। পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা থাকা সম্ভব শুধুমাত্র সেইখানে, যেখানে যথার্থ গণতন্ত্র বর্তমান। সে আমাদের দেশেই।

দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, সোভিয়েটের পঁয়ত্রিশ-বর্ষব্যাপী অস্তিত্বের মূলনীতি হল, যা-কিছু ভাল সমস্ত সর্বসাধারণের সম্পত্তি। লোক আর লেখকের মধ্যে সম্পর্ক অতি নিবিড়। লোকের চিন্তা-চেষ্টাই সাহিত্যের বাণী। সাহিত্য নিতান্তই জনমনের প্রতিধ্বনি। মায়ের যেমন সন্তান সম্পর্কে প্রত্যাশা—জনগণও ঠিক তেমনি আশা করে, লেখক কর্তব্যপর হবেন—লেখার ইষ্টানিষ্ট অনুধাবন করবেন।

অ্যানিসিমভের মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা। এক গণ্ডা কলম উদ্যত হয়ে আছে, চলেছে একটি মাত্র—পোপোভের কলমটা। তিনি নোট নিচ্ছেন। বক্তা থামলে ঐ নোট দেখে তিনি ইংরেজিতে বুঝিয়ে দেবেন। তখন ছুটবে আমাদের কলমের পাল্লা। একটি কথা বাদ না পড়ে, এতটুকু হেরফের না হয়। একটি কথা অ্যানিসিমভ বারবার উচ্চারণ করছেন—'নারোড'। ঝগড়া বাড়াতে হলে আমরা 'নারদ', 'নারদ'—বলে কলহ-দেবতার আবাহন করে—সেই নামটা অবিকল। হাসি পায়, মজা লাগে। পোপোভের অনুবাদের সময় টের পাওয়া গেল, রুশীয় 'নারোড' হলেন জনগণ। ওটা কিন্তু আমাদের দেশের হলেই ঠিক হত। এত ঝগড়াঝাটি ও লাঠালাঠি পরস্পরের মধ্যে—তাঁরা যে নির্ভেজাল 'নারদ', অত্র সন্দেহে নাস্তি।

অ্যানিসিমভ বলেছিলেন, জীবন বৈচিত্র্যময়। সাহিত্য জীবন-সত্য রূপায়িত হয়, অতএব আলো-অন্ধকার নিশ্চয় থাকবে। লেখকের কর্তব্য হল সত্যের উদ্ঘাটন ও ব্যাখ্যা। এ বিষয়ে সোভিয়েট-লেখকদের চেয়ে বেশি বিমুখ কে? জোর দিয়ে বললেন, সর্বাধিক মুক্ত আমাদের লেখকেরা। সোভিয়েট-কাঠামোর ফল এটা। কেউ যখন মিথ্যা রটায়, সোভিয়েট-লেখকের স্বাধীনতা নেই—আমরা হাসি। এসে বরঞ্চ নিজের চোখে দেখ, দেখে নিঃসংশয় হও। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে। প্রশ্নটা জনগণের দাবির সঙ্গে বিজড়িত। গণতান্ত্রিক সমাজে সব চেয়ে বড় শক্তি গণদাবি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মহিমময় লেখক (রবীন্দ্রনাথের নাম একাধিকবার উচ্চারণ করলেন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে। নাম করছেন আমার দিকে তাকিয়ে। আলাপনের গোড়ার দিকে বুক চিতিয়ে বলেছিলাম—বাংলার লেখক আমি, বাংলা ভাষায় লিখি—যে ভাষায় টেগোর লিখেছেন। অর্থাৎ বঙ্গ-সাহিত্য বলতে আপাতত দু-জনকে ওরা জেনে রাখলেন —টেগোর এবং এই অধম) নিশ্চয় অবাধ সুযোগ পাবেন খুশিমতো লিখবার। কারণ তিনি জনগণের কাছাকাছি—লোকের শুভাশুভ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি প্রখর ও আবিলতাশূন্য। কিন্তু ব্যক্তিসর্বস্ব নৈরাশ্যবাদী লেখক—যিনি মানুষ চেনেন না, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ নেই যাঁর—তাঁর খেয়ালখুশি বাধা পাবে নিশ্চয়। রবীন্দ্রনাথের বই আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়ি—ভারতের আত্মার সন্ধান পাই সেখানে, ভারতের চিরকালের মানুষদের দেখি। তা বলে কি এস এলিয়টের সম্পর্কে এ কথা খাটবে না। রবীন্দ্রনাথ

একেবারে পৃথক মনোভঙ্গি নিয়ে লিখলেও সে রচনা আমাদের আদরণীয়।

আর নয়, গা তুলুন এবার। ঘোর হয়ে এলো। ভোজের আসর এখনই। এঁরা খাওয়াবেন আজ আমাদের। খাওয়া এবং বক্তৃতা আছে, কিন্তু সব চেয়ে বড়ো জিনিস হাসি-রহস্য গা এলিয়ে বসে আজেবাজে গল্পগুজব। কে বলবে, বিশ্বের এ-পাড়ায় আমাদের ঘর—আর ওরা হল ও-পাড়ার? সব বিভেদ ভুলে গিয়েছি। একটা ঘরের মধ্যে এখন আমরা এক পরিবারের লোক।

না, খাওয়ার ফিরিস্তি আর নয়। বুঝতে পারছি, পাঠকবর্গের প্রতি নিষ্ঠুরতা হচ্ছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ উপমা দিতেন পাঁজিতে দশ আড়া জল লেখে, পাঁজি নিংড়ে এক ফোঁটাও মেলে না। পিকিন-ডাকের (স্বর্গ-মর্ত্য-রসাতলে ঐ বস্তুর নাকি জুড়ি নেই) আধখানা ঠ্যাং-ও খাওয়াতে পারব না, কেন মিছে রসনা লালায়িত করা?

একদিন এক বিষম কাণ্ড হয়েছিল, তবে শুনুন।

খাওয়ার টেবিলে গল্পগুজবের মধ্যে অন্যমনস্কভাবে আমাদের একজন বললেন, জল—

গেলাসভর্তি জল (ফোটানো জল অবশ্য) দেখে চমক ভাঙল, অ্যাঁ?

জলই তো চাইলেন—

ভুল করে চেয়ে বসেছি। জল বদলে লেমনেড বা অরেঞ্জস্কোয়াশ দাও ভাই—চল্লিশ দিন চলেছে এই রকম। আদরের অতিথি—জল খাবো কেন—হ্যাঁ? আর যাই হোক, আমাদের দেশেঘরে ও-বস্তুর অভাব নেই। প্রচুর আছে।

ঘুরে ফিরে আবার ঐ খাওয়ার কথা। যাক গে, মোটামুটি একটা বিধি জেনে রাখুন শুধু। সকালে খাওয়া, দুপুরে খাওয়া, রাত্রে খাওয়া। আলোচনায় বসলে খাওয়া, ট্রেনের মধ্যে প্লেনের মধ্যে খাওয়া, যেখানে যাচ্ছি এবং যা-কিছু করছি সর্বত্রই সুবিধামতো খাওয়ার আয়োজন। খাওয়ার প্রসঙ্গ পারতপক্ষে আমি আর তুলবো না—কমা-সেমিকোলন-দাঁড়ির মতো আপনারা জায়গা বুঝে ঐ ব্যাপার মনে মনে বসিয়ে নেবেন।

রাত্রে ঘরে ঢুকবার সময় নোটিশ-বোর্ড দেখে লাফিয়ে উঠলাম, সকালবেলা স্পেশ্যাল ট্রেন যোগে বেরুনো হবে মহাপ্রাচীর দেখতে।

(১৩)

মন উড়ল কত দিন-মাস-বছর পিছিয়ে, কত দেশদেশান্তর পার হয়ে। কোথায় এই পিকিন শহর, কোথায় বা সে-কালের নিতান্ত সাধারণ জনবিরল একটি গ্রাম—ডোঙাঘাটা! মধ্য-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপের পাঠশালায় ঘিরে বসেছি প্রহ্লাদ মাস্টারমশাইকে। জগতের সপ্ত আশ্চর্যের গল্প বলছেন। শিশু-দলের চোখে মুখে আনন্দ-কৌতুক। কোন দেশে বিশালাকায় রাক্ষুসে ঘণ্টা বাজছে ঢং-ঢং করে। সুনীল সমুদ্রে ঘেরা সাইপ্রাস দ্বীপে পিত্তল মূর্তি দুই গিরি চূড়ে দুই পা রেখে অনন্তকাল দাঁড়িয়ে আছে—নৌকো-জাহাজ চলাচল করে নিচ দিয়ে। ব্যাবিলনে আকাশব্যাপ্ত সুবিশাল উদ্যান। আর ঐ মহাপ্রাচীর —"দ্বাদশটি অশ্বারোহী প্রাচীরের উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে ঘোড়া ছুটাইতে পারে—" খটাখট খটাখট ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে—গিরি-নদী-কালান্তর অতিক্রম করে ছুটছে—গ্রাম-শিশুর দৃষ্টির উপর ঝিলিক দিয়ে যায় তারা, কানে বাজে অশ্বখুরের ধ্বনি! সেই মহাপ্রাচীর চোখে দেখতে যাচ্ছি। মিলিয়ে দেখব, আমার শিশু-কল্পনার সঙ্গে কতখানি মেলে আসল বস্তু। তাই তো ভাবি, স্বপ্নেও মনে করতে পারি নি—এমনি কত কি পেলাম এই জীবনে। সত্য বলে ভাবতে ভরসা পাই নে, আমার জীবনে প্রাপ্তির এমন দুকূলব্যাপী প্রবাহ। ভাল করে চোখ কচলে স্পষ্ট চিত্তে দেখতে ভয়-ভয় করে, স্বপ্ন

হয়ে মুছে যাবে বুঝি এ সমস্ত।

সকাল পৌনে ন'টায় পিকিন স্টেশনে। বাইরের ভিতরে অপরূপ সাজিয়েছে শান্তির কপোত, পতাকা, ফুল। আর টাঙিয়ে দিয়েছে—লাল সিল্কের কাপড়ে তৈরী একরকম উৎসব-মাল্য—নাম জেনে এসেছি সা-তেং (Sa-teng)। লাউডস্পীকারে গান হচ্ছে। ছেলেমেয়ের দল সৈন্য ও মাতব্বরেরা বিদায় দিতে এসেছেন। হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন, হাততালি দিচ্ছেন একতালে। সারা স্টেশন গমগম করছে।

শহর ঘিরে যে দঢ় অত্যুচ্চ পাঁচিল আছে, স্টেশন তার বাইরে—একেবারে পাঁচিলের লাগোয়া। প্লাটফরমের পশ্চিম দিক হচ্ছে পাঁচিল। পাঁচিল থেকে কতকটা দূর অবধি বাগান, রংবেরঙের ফুল ফুটে আছে সেখানে।

স্পেশাল ট্রেন কিনা—নতুন রং-দেওয়া ঝকঝকে গাড়ি, চেয়ার টেবিল ধবধবে চাদর পাতা। প্রতি কামরার দরজার কাছে মাতব্বরদের এক-একজন দাঁড়িয়ে। শেকহ্যাণ্ড করে সমাদরে গাড়িতে তুলে দিচ্ছেন।

আলোয় চীনা অক্ষর ফুটে আছে ল্যাভেটরির সামনে। তার মানে, খালি আছে—এখন ব্যবহার করতে পারো। মানুষ ঢুকলে আলোর লেখা আর থাকবে না।

পাঁচিলের ধারে ট্রেন চলেছে। কঠিন বিশাল পাঁচিল—গিয়েছে কতদূর! এ বস্তুও কম আশ্চর্য নয়। লাইনের ওদিক গড়খাই—তার ওপাশে ঘরবাড়ি। রাজহাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে গড়খাই-এর জলে। একটা বিড়াল বসে আছে চুপচাপ। গোরু-ছাগলের পাল। ছেলেমেয়ে কোলে গ্রাম-বৃদ্ধেরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আমাদের। দুটো স্টেশন ছাড়িয়ে এলাম, একটানা পাঁচিল তবু চলছে আমাদের বাঁদিকে।

চেয়ারে হাতলের পাশে বোতাম টিপলে আংটির মতো জিনিস বেরিয়ে আসে। ঐখানে কাঁচের গেলাস বসিয়ে চা দিয়ে গেল। দুধ-চিনিবিহীন সোনার বর্ণ চা—খুব সুগন্ধ, ফুলের রেণু মেশায় ওরা চায়ের সঙ্গে।

আর একরকম আছে—সবুজ চা। জলে পাতা ফেললেই সবুজ রং হয়ে যায়। এই জাতীয় চায়ের—বিশেষ করে হ্যাংচাউ অঞ্চলে যা উৎপন্ন হয়—ভারি নামডাক।

চীনারা হল বনেদি চা-খোর। সময়-অসময় নেই, জায়গায় বাছবিচার নেই—সর্বক্ষেত্রে চা। 'চা' কথাটাও খাঁটি চীনা। আমরা দুধ-চিনি মিশিয়ে খাই শুনে ওরা হেসে খুন। ওতে স্বাদ-গন্ধ থাকে কিছু? শুধু দুধ-চিনি খেলেই তো পারো তার মধ্যে চায়ের কয়েকটা পাতা না ফেলে। ওদের ঐ চা-ভেজানো জলে গোড়ায় তেমন মউজ হত না আমাদের। পরে মজা পেয়ে গেলাম। অবোধ অতিথিজন বলে করুণা-পরবশ হয়ে যদি দুধ-চিনি দিতে আসত, আমরাই তখন না-না করে উঠতাম।

দেখ, দেখ—কত পাতিহাঁস একটা পুকুরে! যেন একরাশ শ্বেতকুসুম ফুটে আছে। পাখি নেই—কাল যে বলাবলি হচ্ছিল? কিচমিচ করে আমাদের জানান দিয়ে একঝাঁক উড়তে উড়তে সুদূরে দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

লাউড-স্পীকারে বারংবার মার্জনা চাইছে। সামনের স্টেশনে গাড়ি পাঁচমিনিট থেমে থাকবে ইঞ্জিন বদলানোর জন্য। পাহাড় অঞ্চলের শুরু—গাড়ির গতি কমবে এবার থেকে।

বিনামূল্যে যদিও—টিকিট দিয়েছিল আমাদের প্রত্যেককে, সেই টিকিট চেক করতে এলো। গটমট করে কাজ করে বেড়াচ্ছে—বাপরে বাপ, পোষাক-পরা যত সব জাঁদরেল কর্মচারী। কাছে এলে সন্দেহ হয়, ঠাহর করে দেখি। কে বটে হে তুমি? অত লাবণ্য চাপা দেওয়া আছে রেলের টুপি ও কোটপ্যাণ্টে। হাসলেই তখন ধরা পড়ে

যায়। নতুন-চীনের কর্মচঞ্চল মেয়েরা। রুপালি দাঁতে ঝিকমিকে সরল হাসি—অমন হাসতে ওরাই শুধু জানে। ড্রাইভার ছাড়া এ গাড়ির প্রতিটি কর্মচারী মেয়ে। মেয়ে-ড্রাইভারের গাড়িতেও চড়েছি এর পরে। এই বিপুল শক্তি ও মাধুর্য অন্ধকারে গুহায়িত হয়ে ছিল—এবারে ছাড়া পেয়েছে। তিনি বছরের নতুন-চীনের এমনতরো শক্তিমত্তা।

পাঁচ মিনিট তো অঢেল সময়—ট্রেন থামতে না থামতে হুড়মুড় করে নেমে পড়ল সকলে। আমার দরজার সামনে দেখি, হাত বাড়িয়ে আছে কটা-চুল, ঘোলা-চোখ লালমুখো এক সাহেব। আকারে বর্ণে পুরোপুরি সেই বস্তু—দেশে ঘরে এই সেদিন অবধি যাদের এক শ হাত এড়িয়ে চলতাম। হাত জড়িয়ে ধরল সাহেবটা, কি-একটা নাম বলল, বাড়ি নিউজিল্যাণ্ডে। সাগর থেকে নতুন-ওঠা ভূমি—তাই নিউ সি-ল্যাণ্ড বা নিউজিল্যাণ্ড। এই ভৌগোলিক ব্যাখ্যা দিয়ে বললাম, নবীনতম আর প্রাচীনতম সুদূরবর্তী দুটি ভূমিও বুঝি আজ ভালবাসায় বাঁধা পড়ল আমাদের নব সৌহার্দ্যের মধ্যে।

শুধু কি ঐ একজন? সবাই ঘুরছে ভাব করবার জন্য, যাকে পারছে পাকড়াও করছে। সে এক অভিনব ব্যাপার। সাদা আর কালো, এশিয়া আর ইয়োরোপ-আমেরিকা সেই স্টেশনের প্লাটফরমে প্রাণ খুলে পরস্পরকে জরিয়ে ধরছে।

নতুন রেল বসাচ্ছে। মহা ব্যস্ততা সেদিকটায়। সময় নেই—দুর্যোগে অনেক পিছিয়ে রয়েছি, তাড়াতাড়ি সমস্ত শুধরে নিতে হবে—এমনি একটা ভাব সর্বত্র। যন্ত্র-শক্তির তেমন তোড়জোড় নেই তো লাগাও মানুষ। শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে মানুষ হাতে কাজ করছে পরিপূর্ণ শৃঙ্খলায়। একটুকু হৈ-চৈ নেই, কি করে হতে পারে, এ-ও এক দেখে নেওয়ার জিনিস। রেলপথের ধারে টেলিগ্রাফ-লাইন—লম্বা লম্বা কাঠের গুড়ি পুঁতে পোস্ট বানিয়েছে। সিকি পয়সা ওরা অকারণ ব্যয় করবে না, অপব্যয়ের দিন এখন নয়—যা আছে তাতেই কাজ চালিয়ে নেবে।

স্টেশনের এই গ্রামটা বেশ বড়। খোলার বাড়ি বেশির ভাগ। আর দেখছি—খড় নয়, খোলাও নয়, বাঁশের বাখারির ছাউনি। ঘরবাড়ির ধাঁচ একেবারে আলাদা যেমন ছবিতে দেখে থাকেন। আমাদের দেশের সঙ্গে মেলে না।

পাহাড় দেখা যায়, বিস্তর পাহাড়। দূরের পাহাড় কাছাকাছি আসছে। পাহাড় একেবারে ঘিরে ফেলেছে আমাদের।

ঐ—ঐ যে মহাপ্রাচীর!

গাড়ি ভরতি চলেছি আমরা পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের প্রায় সমস্ত দেশ ও জগতের মানুষ। মুহূর্তে সকলে শিশু হয়ে গেলাম। কৌতূহল-ঝলকিত চোখের দৃষ্টি। জানালার ধারে ভিড়, জানালায় মুখ বাড়িয়েছি।

একেবারে কাছে এসে গেছি। এমন বস্তু ধারণায় আনা যায় না। অতিকায় এক অজগর সাপ এঁকে বেঁকে ত্রিভুবন জুড়ে রয়েছে যেন। উত্তুঙ্গ শিখর-দেশে উঠেছে, নিচে নামতে নামতে চোখের আড়াল হয়ে গেছে আবার। ট্রেন কখনো প্রাচীরের পাশ দিয়ে, কখনো বা অতিক্রম করে চলেছে। চলতে চলতে টানেল, কত প্রস্রবণ, কত বাঁকাচোরা গিরিপথ হয়ে স্টেশনে নামলাম। স্টেশনের নাম ছিং-লুঙ-ছাও।

প্লাটফরমের উল্টো দিকে পাহাড়ের ছায়ায় পূর্ণাবয়ব এক বিশাল মূর্তি। ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তিনি, নাম—সেঙ-টিন-ইউ। এই দুর্গম অঞ্চলে তাঁরই কৃতিত্বে রেলগাড়ি এসেছে, রেলওয়ে সম্পর্কে বিস্তার উন্নতি-বিধান করেছেন তিনি। মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে অদূরবর্তী মহাপ্রাচীরের দিকে একবার নজর করে দেখে নিলাম। বিস্ময় লাগে। ভাবতে পেরেছি,

কোন একদিন প্রাচীরের পদতলে এসে দাঁড়াব চূড়ায় উঠবার আয়োজনে ?

জন দশেকের এক একটি দল, সঙ্গে দোভাষি এক চীনা বন্ধু। চলে বেড়ানোরই ব্যাপার—চড়াই ভাঙতে ভাঙতে খুব মেজাজে কথাবার্তা চলে না, সেজন্য আজকে দোভাষি বেশি নেই। তবু মেয়েরা আছে দলের মধ্যে। পাহাড়ে ওঠা-নামা চাট্টিখানি কথা নয়—ভয় দেখিয়ে তাদের নিরস্ত করবার চেষ্টা হয়েছিল। তা শুনছে তারা! ছেলেরা পারে তো মেয়েরাই বা কম কিসে!

বীরত্ব দেখাবার প্রয়াসে তারাই আগে আগে আগে পথ দেখিয়ে ছুটেছে। আর ছুটেছেন আমাদের দলের রোহিনী ভাটে। মারাঠি মেয়ে, নাচেন অতি চমৎকার। পিকিনে জমিয়েছিলেন ভারতীয় নাচ দেখিয়ে। লঘু শরীর—নাচতে নাচতেই যেন পাহাড়ে উঠছেন। অথবা পাখির পাখার মতো বাতাসে আঁচল ফুলিয়ে উড়তে উড়তে যাচ্ছেন। কঠিন পাথরে পা ছোঁয় না ছোঁয়, ঝুপসি ঝুপসি জঙ্গল গাছে ঠেকে না ঠেকে —আলগোছে কেমন যেন আকাশে উঠে যাচ্ছেন।

চলেছেন গান্ধি টুপি মাথায় রবিশঙ্কর মহারাজ। খালি পায়ে এসেছিলেন প্রচণ্ড এই শীতরাজ্যে। পশমের মোজা ও জুতোর আবরণেও আমাদের পা কনকন করে—মহারাজ একজোড়া স্যাণ্ডেল ধারণ করেছেন শেষ পর্যন্ত। পলিতকেশগুম্ফ সত্তর বছরের যুবাব্যক্তিটি—পিছনে তাকাবার অভ্যাস নেই, ধীর পায়ে চলেছেন। হেসে ছাড়া কথা বলেন না, গুজরাটি এবং সামান্য হিন্দি মাত্র বলতে পারেন। সামনে-পিছনে সর্বক্ষণের দুই অনুচর—অধ্যাপক শুকলা ও উমাশঙ্কর যোশি। আমাদের কথা শুনে নিয়ে এঁরা মহারাজকে বুঝিয়ে দেন, কথা বুঝে স্মিতহাস্যে মহারাজ আনন্দ জ্ঞাপন করেন।

চলেছেন সর্দারি পৃথ্বী সিং। গান্ধিজী সর্দার বলে আহ্বান করেছিলেন; আর নামের সঙ্গে আজাদ জুড়ে জন্মভূমি পাঞ্জাব তাঁর বীর্যবত্তার পরিচয় দিত। গান্ধিজীর উপাধিটা নিয়েছেন তিনি, কিন্তু আজাদ নাম বাতিল। দীর্ঘ দেহ—বয়স হয়েছে, তা তিনি মানেন না। মানেন কী-ই বা! অমিত-শক্তি ইংরেজের প্রতাপ মেনেছেন কোন দিন? মেনেছেন সিপাহিশাস্ত্রী-ঘেরা কারাগারের কঠিন শাসন? ডিটেকটিভ উপন্যাসকে হার মানিয়ে দেয় এই মানুষটির জীবন। আন্দামানে চির-নির্বাসনে ছিলেন। বারীন্দ্র, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পুরানো বিপ্লবীদের সঙ্গে বিশেষ জানাশোনা। একদিন অকস্মাৎ উধাও আন্দামান থেকে। বৃটিশ-সরকারের হুলিয়া ছুটল দেশ-দেশান্তরে—পুলিশের মুঠো থেকে পৃথ্বী সিং পিছলে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছেন। স্থিতি হ'ল রাশিয়ায় গিয়ে। অনেক দিন পরে ফিরলেন আবার দেশে—ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন, পুলিসে পাত্তা পায় না। গান্ধিজীর সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন আত্মসমর্পণ করতে। তার পরে—ঠিক মনে পড়ছে না—আটকে রেখেছিল বোধ করি কিছুদিন। বেরিয়ে এসে গান্ধিজীর সঙ্গে তাঁর আশ্রমে রইলেন। কিন্তু চলে গেলেন বছর কয়েক পরে—আশ্রমচর্যা মনের সঙ্গে নিতে পারলেন না। গান্ধিজীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক অক্ষুন্ন রইল তবু।

এমনি সব বিপ্লবী বীরদের নিয়ে আমি উপন্যাস লিখেছি, তাঁদের প্রতি বড় অনুরাগ আমার। এ সব খবর আমিই বলি, কিংবা আর-কেউ বলে থাকবেন। কেমন একটু বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাঁর সঙ্গে। খাওয়ার সময়টা প্রায়ই এক টেবিলে বসতাম গল্পগুজবের জন্য। শান্তি-সম্মেলনের মধ্যেই এক দিন খাতা এগিয়ে দিলেন, নাম ঠিকানা লিখে দাও। খাতা ফেরত পেয়ে হাতে গুঁজে দিলেন আবার। কিছু লিখে

দাও ঐ নামের সঙ্গে। লিখলাম—মহাবিপ্লবীকে প্রণাম।

পৃথিবি সিংকে দেখতে পাচ্ছি অদূরে। শালগাছের মতো সরল সমুন্নত। খাড়া হয়ে চলেছেন। একটা জিনিস শেখেন নি জীবনে—মাথা নিচু করা। তা ঐ পাহাড়ে উঠছেন, সে অবস্থায়ও নয়।

এমনি চলেছি ট্রেনের জঠর থেকে বেরিয়ে-আসা আগন্তুক দল। পথ সংক্ষেপ করতে পাকদণ্ডীর পথ ধরেছি। দুর্গম পথ—বসে পড়ে জিরোচ্ছি ক্ষণে ক্ষণে। চারিদিকে নজর করি। আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে বিসর্পিল গতিতে উঠেছে ঐ দলের পর দল। কতক আমাদের আমাদের আগে চলে গেছে। কতক বা উঠে আসছে নিচে থেকে। পুরুষ আছে, মেয়ে আছে—একটা বাচ্চাও দেখতে পাচ্ছি সাত-আট বছরের। নানা জাতের মানুষ—পৃথিবীর কোন দেশের যে নেই, ঠিক করা শক্ত। পোশাক তাই বিচিত্র রকমের। ঝোপঝাপ ও শিলাখন্ডের আড়ালে এই একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল, বেরিয়ে আসছে আবার পরক্ষণে।

অনেক কষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে অবশেষে প্রাচীরের উপর ওঠা গেল। সপ্ত আশ্চর্যের সেরা বস্তুটি এই পায়ের তলায়। চলো এগিয়ে চলো—উঁচুর দিকে ক্রমশঃ। প্রাচীর ঐ পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়োয় গিয়ে উঠেছে। তারপরে ঢালু হয়ে নেমে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেছে। প্রহ্লাদ গুরুমশাই বলতেন, দ্বাদশটি অশ্বারোহী—আমার মনে হল, বাড়তি আরও দু-পাঁচটি সহ ঘোড়দৌড় হতে পারে এখান দিয়ে। ছাতের আলসের মতো বেশ-খানিকটা উঁচু পাঁচিলে ঘেরা দু-দিকে—উত্তম ব্যবস্থা, নিচে পড়বার আশঙ্কা নেই। পাথরের উপর পাথর গেঁথে করেছে এই কাণ্ড; উপরের দিকে সেই পাথর কেটে ইটের মতো পাতলা করে বসিয়েছে—মানুষের চলাচলে কষ্ট যাতে না হয়। এমনি টানা চলেছে—কত দূর আন্দাজ করুন দিকি? পনের শ' মাইল। কখনো পর্বতশীর্ষ, কখনো বা নিম্নতম অধিত্যকার অন্ধি-সন্ধি অতিক্রম করে। এ মহাপ্রাচীর তৈরী শুরু হয় খৃষ্টের তিনশ' বছর আগে, সম্রাট অশোকের সমকালে। পঞ্চাশ বছর লাগে শেষ করতে। সে কী আজকের কথা! কী করে সে আমলে অত উঁচুতে তুলল এত পাথর! আর কী তাজ্জব দেখুন—পাঁচিল গেঁথে দেশের সীমানা ঘিরে ফেলে দিল মোঙ্গলদের রুখবার জন্য। আমরা গোরু-ছাগল ঠেকাবার জন্য বাগানের বেড়া দিই—সেই গোছের ব্যাপার আর কি!

আলিগড়ের অধ্যাপক ডক্টর আলিম—চাপদাড়ি, সুন্দর সুগৌর চেহারা। আলসের ঠেশান দিয়ে দাঁড়িয়ে পুরানো ইতিহাস বলছিলেন তিনি। এত উদ্যম আর অধ্যবসায়ের মহাপ্রাচীর কি কাজে এল শেষ পর্যন্ত? মোঙ্গলদের ঠেকানো যায় নি, কুবলাই খাঁ এসে মহাচীনে দখল গড়লেন। আর এখনকার যুগে পাঁচিল তুলে শত্রু আটকাবো, হেন প্রস্তাব ভাবতে যাওয়াই হাস্যকর। মানুষের পাখনা হয়েছে, আকাশে উড়ে উড়ে লড়াই। মেঘের চোরাগোপ্তা পথে যাতায়াত। মহাপ্রাচীর কত নীচে মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে—এখনকার দিনে সে কিছু ধর্তব্যের বস্তু নাকি? এত মানুষ মিলে এত কাণ্ড করেছিল, কিছুই মুনাফা হল না কোন কোলে। শুধু সপ্ত আশ্চর্যের একতম হয়ে রইল—স্থাপত্যের চূড়ান্ত নিদর্শন। দেশবিদেশের মানুষ এসে দেখে যায়, প্রত্নতাত্ত্বিকের গর্বের জিনিস। প্রাচীরের উপর কতকগুলো ঘাঁটি তৈরি হয়েছিল, দেখলাম, গত লড়াইয়ের সময়—আকাশমুখী কামান বসানো হয়েছিল। দুশমনি প্লেন ঘায়েল করা হত। এখন সীমাহীন প্রশান্তি চারিদিকে—শুধু প্রাচীরের উপর ভাঙাচোরা পাথরের গাঁথনিতে ভয়ঙ্কর দিনের সামান্য দাগ লেগে আছে। দেশে থাকতে শুনেছিলাম,

জড়বাদী নতুন চীন মহাপ্রাচীর ভেঙে তছনছ করেছে ; পাথর খুলে খুলে দশ রকম কাজে লাগাচ্ছে। আরে সর্বনাশ, বাটালি মেরে একটি টুকরো-পাথর খসাতে যান দেখি। দশ রকম কৈফিয়তের তালে পড়বেন। পুরানো জিনিস নিয়ে এত দেমাক তামাম দুনিয়ায় আর কোন জাতের নেই। বাঘিনী শাবক আগলে থাকে—প্রায় সেই অবস্থা। ধর্মকর্মের বড় ধার ধারে না, তা সত্ত্বেও দেখে আসুন গিয়ে এই নতুন আমলের হাজারো রকম কর্ম-চাঞ্চল্যের মধ্যে যে-মেরামতি বৌদ্ধমন্দিরগুলো ভারা বেঁধে রাজমিস্ত্রি লাগিয়ে ঠিকঠাক করছে, অস্পষ্ট প্রাচীন দেয়ালচিত্রে নতুন করে রং ধরাচ্ছে। দেড়হাজার মাইল জোড়া-পাঁচিল, একটুখানি বস্তু নয়। তার উপর বয়সেও কত বুড়ো হল বিবেচনা করে দেখুন —প্রায় বাইশ শ' বছর। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে কত শতবার, জনপদের উত্থান-পতন ঘটেছে। অতএব দশ-বিশ জায়গায় আপনি ভেঙে পড়তে পারে, সেটা কিছু নয়। ইচ্ছে করে ভাঙা হয়েছে গোটা কয়েক জায়গায় নতুন রেল-লাইন বসাবার প্রয়োজনে। মহাপ্রাচীর এখন আর চীনের সীমান্ত নয়। প্রাচীর পার হয়ে অনেক দূরে অবধি চীনদেশ। নব জীবনের বার্তা ছুটেছে দেশের সর্ব অঞ্চলে—প্রাচীর ভেঙে রেললাইন বসিয়ে তারই পথ হয়েছে···

দলে দলে উপরে উঠে যাচ্ছে—আমরা দু'জনে বসে পড়েছি এক ধাপের উপর। আমি আর বর্ধমানের সন্তোষ খাঁ। সান্ত্বনা ও আছে অবশ্য—আমাদের নিচে ঐ কত জন বসে হাঁপাচ্ছে। অনেক দূরে উঠেছি—যত উপরেই যাই, একই ব্যাপার—কি হবে মিছামিছি দেহযন্ত্রটা খাটিয়ে? দিব্যি বসে বসে দিগ্‌ব্যাপ্ত মহাচীনের শোভা দেখা যাচ্ছে। ঘর-বাড়ি উঁকি দিচ্ছে গাছপালার ভিতর থেকে। রেল-লাইন এক সুদীর্ঘ সরীসৃপের মতো পাহাড়-জঙ্গলের ভিতর এঁকে বেঁকে শুয়ে রয়েছে। শীতল গিরিবায়ু সর্ব শরীর জুড়িয়ে দিয়ে গেল···

উচ্ছল কলহাস্য এক টুকরো। এক তরুণী লাফাতে লাফাতে উঠে এলো। ভারি সুন্দরী। অলকগুচ্ছ কপালের উপর এসে পড়েছে। এক রাশ বনফুল তুলে এনেছে পথের ধার থেকে। কী কৌতুকে পেয়ে বসেছে—ঝুঁকে পড়ে ফুলের থোলো ঘোরায় সে আমাদের দু-জনের মুখের সামনে। আরতির সময় যেমন পঞ্চপ্রদীপ ঘোরায়। কোন্ দেশের মানুষ, কি বৃত্তান্ত, কিছু জানি নে—এর আগে চোখেই দেখি নি মেয়েটাকে। বার কয়েক ফুল নেড়ে ডান দিক ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে ধুপধাপ ছুটে বেরুল। সঙ্কোচের বালাই নেই—এ কেমন ধারা উল্লাসিনী গো। ছুটতে ছুটতে নাচতে নাচতে চলে গেল। প্রাচীরের চূড়ায় চূড়ায় সঞ্চারিনী অপরূপ এক বিদ্যুল্লতা।

পরে আরও দেখেছি তাকে। কনফারেন্সের মধ্যে দেখতাম শান্ত অচপল মূর্তি। একমনে বক্তৃতা শুনছে, কদাচিৎ নোট নিচ্ছে কপোত আঁকা সবুজ পকেট বই খুলে। সাংস্কৃতিক কমিশনেও দেখেছি—রাত তিনটে বেজে গেছে, সদস্যরা উসখুস করছেন আসর ভেঙে ঘরে যাবার জন্য। কিন্তু বিতর্ক শেষ হবার আশু সম্ভবনা দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটা দুটি আঙুলে আঙুরের থোলো থেকে ফল ছিঁড়ে আলগোছে গালে ফেলছে, আর পাশের লোকটির সঙ্গে চাপা গলায় কি আলোচনা করছে। লোকটি তার স্বামী—খবরের কাগজ চালান এবং কিছু কিছু সাহিত্য চর্চা করেন। পরে এক সাহিত্যিক কনফারেন্সে খুব ভাবসাব হয়েছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে। স্বামী-স্ত্রী জোড়ে এসেছেন। পিকিন ছাড়ার আগের দিন ক্ষিতীশ আর আমি বাজার ঢুঁড়ছি—ঐ দম্পতির সঙ্গে দৈবাৎ দেখা। ভদ্রলোক নিয়মমাফিক স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মেয়েটা নিঃসংশয়ে ভুলে গেছে মহাপ্রাচীরের উপর আর একদিনের ক্ষণচাপল্য। পিকিন থেকে ওঁরা দেশে-

ঘরে ফিরছেন না, জোড় বেঁধে এখন ইয়োরোপে চললেন। এদেশ-সেদেশ ঘুরে ঢুঁ মারবেন অবশেষে ভিয়েনা-কনফারেন্সে। দেখা শুনোর পাট চুকুক, আর নয়—নিচে নেমে সবাই এবার স্টেশনে গিয়ে জুটব। আপন মনে ফিরে চলেছি আমি। প্রখর রোদে বেশ কষ্ট হচ্ছে। পথ সংক্ষেপ হবে বলে জঙ্গল-ভরা সুঁড়িপথে এসে পড়েছি। একলা এদিক-ওদিক তাকাই। উপরে ও নীচের দিকে সঙ্গীদের দেখা যাচ্ছে। কোন-একটা দলে গিয়ে জোটা কঠিন নয়। কিন্তু প্রয়োজনই বা কি? পথের আন্দাজ হয়ে গেছে—স্টেশনে ঠিক গিয়ে পেঁছাব ; হয়তো বা ঘুরপথ হবে একটু আধটু। সে এমন কিছু নয়।

কিন্তু তৃষ্ণা পেয়ে গেল যে! তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায়। এক ঢোক শীতল জল—পথ চলা নইলে অসম্ভব হয়ে উঠছে।

আঃ, মিলে গেছে! বাঁক ঘুরেই দেখি কলস্বনা ঝরনা। কপোত-চক্ষুর মতো নির্মল জল বনান্তরাল হতে বেরিয়ে উপল-বিছানো খাতে লাফিয়ে পড়ছে, তার পরে ধীর বেগে বয়ে চলেছে সংকীর্ণ ধারায়।

কোন অলক্ষ্য-দেবতা অবস্থা বুঝি মিলিয়ে দিলেন। নেমে যাচ্ছি ঝরনার দিকে। দৌড়ানো বলা যেতে পারে। আঁকা-বাঁকা পথ অতিক্রম করে ইপ্সিত জলের ধারে এসে পড়েছি, অঞ্জলি ভরে জলও তুলেছি—

চিৎকার এলো, কে যেন হুমকি দিয়ে উঠল কোথা থেকে। চমক লাগে। হাত কেঁপে অঞ্জলির ফাঁকে জল পড়ে যায়। না, মনের ভুল নয়—ছুটে আসে একটি লোক—চেঁচাচ্ছে, কথা বুঝতে পারি না, তাই প্রবল বেগে হাত মুখ নেড়ে মানা করছে। সাধারণ গ্রাম্য মানুষ—দোভাষি কিংবা আমাদের চেনা-জানা কোন প্রাণী নয়।

অবাক হয়ে আছি। কেন এমন করে? বিদেশ-বিভুঁই জায়গা। রীতি-প্রকৃতির কিছু বুঝি না এদের। লোকটা একেবারে গায়ের কাছে এসে ইশারা করছে তাকে অনুসরণ করতে। কী মতলব কে জানে! হতভম্ব হয়ে পিছু পিছু চলি।

রেল-লাইন অবধি নিয়ে এলো সঙ্গে করে। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল স্টেশনটা। সহসা হাত বাড়াল বন্ধুত্বের ভাবে, শেকহ্যাণ্ড করে ফিরল বনপথ বেয়ে। ভারি রহস্য তো! হাঁ করে চেয়ে আছি যতক্ষণ না সে নজরের আড়ালে গেল।

স্টেশনে সকলে কলরর করে ওঠেন, একা কোন দিকে কেটে পড়েছিলেন? ট্রেন ছাড়বার সময় হল।

তৃষ্ণা মেটাই তো সকলের আগে। সাদামাঠা জল চাইলাম, দিল এনে বোতলের মিনারল ওয়াটার। মন্দ কি! ঢক-ঢক পুরো গ্লাশ গলায় ঢেলে সুস্থ হয়ে বৃত্তান্ত নিবেদন করলাম।

পাগল বোধ হয় লোকটা।

দোভাষি বলে, কী সর্বনাশ! ঝরণার জল খেতে গেয়েছিলেন—জলে হয়তো বিষ।

মুখে একধরনের হাসি, ঘৃণা উপছে পড়ছে সেই হাসিতে। বলে, এক ফোঁটা তেষ্টার জল—তা-ও নির্ভয়ে মুখে দেওয়া যায় না শয়তানির ঠেলায়।

জল না ফুটিয়ে খায় না এ-তল্লাটে! স্বাস্থ্য-ব্যাপারে কড়া নজর—এটা কিন্তু ঠিক সেইজন্যে নয়। মার্কিন সৈন্য কোরিয়ায় জীবাণু-বোমা ফেলে গেছে। কিছু কিছু এ দিকেও না পড়েছে এমন নয়। এখানে-ওখানে যে-কয়েকটার সন্ধান পাওয়া গেছে, তার বাইরেরও থাকতে পারে। পদে পদে তাই এত সতর্কতা। বিদেশী মানুষ—আমি তো অত-শত জানিনে—চাষী লোক চাষ ফেলে সামাল করতে এসেছিল তাই।

স্পেশাল গাড়ি চলল আবার পিকিনমুখো। খাবার পরিবেশন করে গেল টেবিলে টেবিলে—পরিবেশকদের হাতে দস্তানা, নাকে-মুখে কাপড়ের ঢাকনি। (মোটর-ড্রাইভারদের এমনি দেখছি। ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা বাড়ি ফিরছে ধুলোর ভয়ে। তাদের নাক, মুখ ঢাকা) অপারেশনের সময় ডাক্তার-নার্সদের—যেমন দেখে থাকি আমরা। ঝাঁট দিয়ে যাচ্ছে কিছু সময় অন্তর। একবার লাউড-স্পীকারে বলল, কাচের জানলা-গুলো খুলে দাও—বাইরের বাতাস চলাচল করুক। কর্মচারী মেয়েগুলো জানলা খুলতে লাগল, আমরা সাহায্য করি। আবার এসে তারের কবাট ফেলে দেয়, মাছি আর ধুলো যাতে না ঢোকে। জীবাণু-যুদ্ধের ব্যাপার বাদ দিয়েও তামাম জাত অতিমাত্রায় স্বাস্থ্য-সজাগ হয়ে উঠেছে। প্রায় ছুঁৎমার্গীয় অবস্থা।

আমাদের বন্ধু প্রশ্ন করলেন, ছিং-লুঙ-ছাও স্টেশন কত মাইল পিকিন থেকে? জানি নে তো।—

তবে সমস্ত দিন ধরে কী লিখলেন মশাই? ট্রেনে আর স্টেশনে লিখলেন, পাঁচিলের উপর বসে লিখলেন—এই সামান্য কথাটা খোঁজ নিলেন না কারো কাছ থেকে?

ভুল হয়ে গেছে দেখছি। তা-নাই বা থাকল আমার লেখায় হিসাবপত্রের ফিরিস্তি।

শৈলেন পাল ওদিকে ধমকাচ্ছেন। এ কি হল! সিগারেটে পুড়িয়ে ফেললেন চেয়ারের চাদর।

লজ্জার কথা সত্যি। সামান্য সিগারেটটাও কায়দামাফিক ধরিয়ে টানতে পারি নে। তার উপরে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি এত দেশের এতগুলো মানুষের দিবসব্যাপী সান্নিধ্যে। বহু তীর্থনদীর বিচিত্র সঙ্গমে আকণ্ঠ মগ্ন হয়ে আছি, অত-শত হুঁশ থাকে না।

মতামত চাইতে এল রেলগাড়ির পরিচালনা সম্পর্কে। আরো কি রকম উন্নতি হতে পারে সেই পরামর্শ যদি দিতে পারি। লিখতে দিচ্ছে একটা করে ছবি-আঁকা মনোরম কাগজে। না লিখে পকেটে পুরতে লোভ হয়। কিন্তু এতগুলো চোখ!

লিখলাম, তোমাদের সঙ্গে আজকের এই মধুর ভ্রমণ চিরকাল আমার মনে থাকবে।

(১৪)

পরের দিন। ডেলিগেট-সভা চুকল তো সাংস্কৃতিক সভা। মানুষ এত বকতেও পারে। সেই আটটার মুখে জলযোগ সেরে এসে বসেছি, তারপর থেকে এই চলেছে। এত ধকল সইবে তো কলম-পেশার নির্বাক কাজ নিয়েছি কেন? অন্তত একটা হাফ-নেতা হওয়া কি যেতো না! সে পথ মাড়াই নি—এবম্বিধ মিটিং করা এবং তৎপরে খবর-ছাপানোর জন্য কাগজওয়ালাদের তোয়াজ করতে হবে, এই ভয়ে। তবে বিদ্যে এবং রুচিজ্ঞান কিছু বেশি হয়ে গেছে নেতা হওয়ার পক্ষে, এমন কথাও, আপনারা অবশ্য বলতে পারেন।

সে থাকগে। মনে মনে এতক্ষণ ধরে এক ভীষণ সংকল্প ভেঁজে নিয়েছে। রাস্তায় হাঁটব, যত্রতত্র বেড়াব। জীবনে ঘেন্না ধরে যায় ঐ এক এক ফোঁটা ছেলে মেয়েগুলোর জ্বালায়। ক্ষুদে অভিভাবক হয়ে বুড়ো বুড়ো নাবালকদের খবরদারি করে বেড়াবে। নিতান্ত অবোধ যেন আমরা এক-একটি, কিছু বুঝি না সংসারের—কোথায় কখন গোল-মাল ঘটিয়ে বসি, সেই ভয়েই সদা তটস্থ। আয়েসের সুধা-তরঙ্গে হাবুডুবু খাচ্ছি—দাও না বাপু গোলমালের চোরা বালিতে একটুখানি পা ঠেকাতে। হোক না একটু পথের গণ্ডগোল—এ রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে বেড়াই, ঠকেই আসি না হাজার কয়েক ইয়ুয়ান সওদা করতে গিয়ে। রবীন্দ্রনাথ আওড়াচ্ছি মনে মনে—'পুণ্যে পাপে সুখে

দুঃখে পতনে উত্থানে, মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে'—তা বিশ-বাইশের গরবিনী ঐ মা-জননীরা বুঝবে সেকথা !

মরিয়া আজকে, পালাবোই। তোমাদের বিনা মাতব্বরিতে বহাল তবিয়তে। বেড়াতে পারি, প্রমাণ করে ছাড়ব। ক্ষিতীশ দু'দিন ধরে একটা টাইয়ের কথা বলছে, নিজেরাই টাই কিনে চোখের উপর মেলে ধরব, কেমন—পারি না যে ?

গলা খাঁকারি দিয়ে বেরিয়ে এলাম। থুতু ফেলতে বাইরে যাচ্ছি এই আর কি। ক্ষিতীশের দিকে চোখ টিপে এসেছি। অনতিপরে সে-ও এলো।

নিচের তলায় মিটিং, এই বড় সুবিধা। অধিক আগল পেরোতে হবে না। বড়-দরজা পার হতে পারলেই লন, এবং তার পরেই রাস্তা। লনেও বিপদ থাকতে পারে। কিন্তু এই দেড় প্রহর বেলায় সকলেই প্রায় মিটিঙের তালে ব্যস্ত—সুড়ুৎ করে লনটুকু পিছলে যাওয়া যাবে না, তবে আর বড় বিদ্যার কী শিখলাম এতদিনে !

আঃ, করো কি ক্ষিতীশ! তাকিও না কোনদিকে—ঝুপ্‌ করে বসে পড়ো সোফার উপর।

দোভাষি ছাত্র একটি আসছে। না, আমাদের দিকে নয় ; আমাদের সন্দেহ করেনি। এমনি শঙ্কিত মন—সিঁদুরে মেঘ দেখলে অগ্নিকাণ্ড বলে ভাবি। সিঁড়ি বেয়ে ছোকরা তরতর করে উপরে উঠে গেল। চলে যাক একেবারে দৃষ্টির আড়ালে। আমরা বাপু নিতান্তই ক্লান্ত হয়ে বসে আছি। দুষ্ট-বুদ্ধি কিছুই নেই, জিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আবার মিটিং-ঘরে।

গেছে চলে তো ? এখন এগারোটা। একটায় লাঞ্চ—পাক্কা দু'ঘণ্টা। কাছে-পিঠেই একটা বাজার লক্ষ্য করা গেছে—মরিশন স্ট্রীটের উপর। বাজার চুঁড়বো, চলো—

কী আনন্দ! পায়ে হেঁটে বেড়ানো পিকিনের রাস্তায়—মোটরের গর্তে বসে নয়। পিকিনের পথের ধুলো লাগছে পায়ে। পায়ে নয়, জুতোর তলায়। আর ধুলোই বা কোথা—ধুলো কি থাকতে দিয়েছে কোনখানে? যাই বলুন, এ-ও এক রকমের ব্যাধি। ধুলো-ময়লা মশা-মাছি নিয়ে শুচিবাই। আমার সেজ-খুড়িমার মতো—সর্বত্র গোবর লেপে তিনি নির্ভাবনা হতেন।

চলেছি। লোকে তাকাচ্ছে আমার দিকে। উৎসাহী কেউ কেউ পিছু নিচ্ছে। একবার দাঁড়িয়েছি পথের পাশে দোকানের জানালায়। পিছন ফিরে দেখি, ভিড় জমে গেছে। ও-ফুটপাতের লোকও রাস্তা পার হয়ে আসছে। তখন মালুম হল। কৃষ্ণমূর্তি—তার উপর পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি-আলোয়ান আজব চিজ পথে বেরিয়েছে, নিতান্ত অন্ধজন ছাড়া আসবেই তো ছুটে। নিখরচায় চিড়িয়াখানার মজা! বিপদ কত দিক দিয়ে কত রকম ভেবেছি, একচক্ষু হরিণের মতো ভেবে দেখিনি তো !

একবার ওদের দিকে তাকাই, একবার বা নিজের দিকে। ফরসা মানুষদের মধ্যে দেহবর্ণ আরও যেন ঘন দেখাচ্ছে। চারু-দার কথা মনে পড়ে। ফড়খেলা হচ্ছিল যশোরের এক মেলায়। চারু-দা ইস্কাপনের উপর এক আনা ধরলেন। হল না, গুটি অন্যঘরে। আনিটা বাজেয়াপ্ত করে ফড়ওয়ালা বলে, ফরসা—! তার মানে ঐ ঘর ফাঁকা—গুটি পড়েনি। চারু-দা তৎক্ষণাৎ আর এক আনা বের করে সেই ঘরে রাখলেন। বলেন, আর একবার বলো ভাই ফরসা। পাওনা হলেও চাই নে। আমার দিকে চেয়ে 'ফরসা' আজ অবধি কেউ বলেনি!

দ্রুতপথে হাঁটছি। ভিড় পিছনে ফেলে এগিয়ে উঠব! হাঁটা আর বলি কেন, দৌড়োনো। ক্ষিতীশের কোট-পাৎলুন—গঙ্গাজলের ছিটার মতো ঐ পোশাক-মাহাত্ম্যে

তার কালো রঙের পাপ খন্ডন হয়ে যায়। গায়ে চাপিয়েছে কি সাহেব। দূর থেকে সে হাঁক পাড়ছে, দাঁড়ান—

দাঁড়িয়ে মরি আর কি ভিড়ের ঠেলায়! মানুষ-চলাচল বন্ধ হবার জোগাড়—ট্রাফিক পুলিশ শেষটা থানায় নিয়ে তুলুক! মহাকালের মতো চলতেই হবে আমায়, থামা চলবে না। সাহেব হয়ে পথে বেরিয়েছে, ভাগ্যবান তোমরা—হেলতে দুলতে ইতি-উতি দেখে শুনে গজেন্দ্র গমনে এসো।

নতুন বিপদ। একদল সৈন্য ওদিককার পথ ধরে মরিশন স্ট্রীটে পড়ছে। পথ আটকে গেছে, ওদের লাইন শেষ না হওয়া অবধি এগোবার উপায় নেই। গতিশীল ভিড়টাও থমকে দাঁড়িয়েছে আমার সঙ্গে। সৈন্যেরা কুচকাওয়াজ করে খুব সম্ভব আসন্ন উৎসবের মহড়ায় চলেছে। কিন্তু তাদের চেয়ে বেশি দ্রষ্টব্য এখন আমি—আমারই উপর সমস্তগুলো চোখ। উপায়?

চতুর্দিকে দেখে নিলাম এক নজর। সৈন্যরা যাচ্ছে তো যাচ্ছেই—পথ খালি হবার আশু সম্ভাবনা দেখি নে। বড় দোকান একটা। অকূলে ভাসমান—তৃণ কী মহীরুহ বাছবিচারের সময় নেই! যা থাকে কপালে—কাচের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম ভিতরে। আপাতত নিরাপদ তো বটেই।

আইয়ে বাবুজি—

কী আশ্চর্য! জাত-ভাইয়ের গলা—হিন্দী জবান বলছে। কী আনন্দ যে হল! ইচ্ছে করে, আধবুড়ো মানুষটাকে কাঁধে তুলে নাচাই।

বলে, বেরুমল আমার নাম। ঘর সিন্ধুদেশে। জমি-জিরেত ঘরবাড়ি সমস্ত এখন পাকিস্তানে। আপনারা আসছেন, কাগজে দেখতে পাচ্ছি। তা মশাই, আমরা পুঁটি মাছ—অত বড় মচ্ছবে মাথা সেঁধুতে ভয় পাই। জানি, এসেছেন যখন—পায়ের ধুলো একদিন পড়বেই। চিনে চিনে ঠিক এসেছেন।

এসেছি কিন্তু না চিনেই—

বেরুমল মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন।

দেখুন তাই। চিনবার কোন উপায় রাখতে দিল কি? দেশের মানুষের মুখ দেখতে পাইনে। কালেভদ্রে কেউ যদি এসে পড়ে—সেই জন্যে ধরাপাড়া করলাম, বাপু হে, তোমাদের চীনে হিজিবিজি কে বুঝবে, সাইনবোর্ডখানা ইংরেজিতে লিখিয়ে দি—'ইণ্ডিয়ান সিল্ক শপ'। তা বিদেশি হরফ চীনা-মানুষের চোখে পড়লে এদের মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়। সদর জায়গায় চীনা ছাড়া আর কোন লেখা থাকতে দেখে না। এমন গোঁড়া বামনাই দেখেছেন মশাই, ভূভারতে?

বটে তো! পথে ঘাটে এ ক'দিন যত লেখা দেখেছি সমস্ত চীনা! গোটা চার-পাঁচ ক্ষেত্রে কেবল চীনার সঙ্গে একত্র রাশিয়ান দেখেছি। চারটে কি পাঁচটা পোস্টার—তার অধিক হবে না। নিজের ভাষা ছাড়া আর-কিছু লোকের নজরে আসবে না—এ কি গোঁড়ামি। আমরা কত দরাজ, বিবেচনা করুন তা হলে। এই কলকাতা শহরে, কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বমুখ হয়ে পদচারণা করুন, বিশ্বভুবনের যাবতীয় বর্ণমালা মিছিল করে দেখা দেবে। মানি, পুরানো জাত তোমরা, অতি—পুরানো সংস্কৃতি—ঐশ্বর্যবান তোমাদের সাহিত্য। তা আমরাও কম হলাম কিসে? অত ঠেকার আমাদের নয়।

পরে আরও এক নমুনা দেখেছিলাম পিকিন ছাড়বার মুখোমুখি সময়টা। শান্তি-সম্মেলন চুকে যাবার পর যতদিন ছিলাম, শুধুমাত্র মেলামেশা—ভাবের লেনদেন। আমাদের সাহিত্যিকদের কয়েকজনকে নিয়ে একটুখানি বৈঠক হচ্ছিল। সামান্য ব্যাপার

—জন আড়েক সাকুল্যে, তন্মধ্যে দু-জন ওঁদের। ওঁরা বলছেন চীনা ভাষায়, দোভাষি ইংরেজি করে বুঝিয়ে দিচ্ছে। একটা জিনিস ঠিক বোঝাতে পারছে না, দোভাষি, লাগসই কথার জন্য হাতড়াচ্ছে। বক্তা টুক করে জুগিয়ে দিলেন কথাটা। তবে তো মানিক! জানো তোমরা ইংরেজি, ভাল রকমই জানো—এ ধকল দিচ্ছ কেন? মারফতি কথা না বলে মুখোমুখি চালাও তবে ইংরেজি।

সে হবার জো নেই। চীনা সাহিত্যিক চীনাভূমির উপর দাঁড়িয়ে ভিন্ন ভাষায় কথা বলবে—কেন, ওঁদের ভাষা-সাহিত্য কম জোরের হল কিসে? মুখের বুলি কারো খাতিরে ভিন্ন দেশের চেহারা নেবে না—গরজ থাকে তোমার বুঝে নাও তর্জমা করিয়ে। আমাদের মওলানা আজাদের ঠিক এই রীতি। উর্দু ছাড়া অ-কুলিন কোন ভাষা জিভের ডগায় ঠাঁই দেন না।

আর, আমার কথা বলা যায়—মানুষটা আমিই-বা কম কিসে? ধুতি-পাঞ্জাবি পরে এই যে লোকের দৃষ্টিশূলের খোঁচা খাচ্ছি, পোশাকের অমন হলে তো হাঙ্গামা ছিল না। হবার যো নেই—আত্মম্ভরিতা। বাঙালি মানুষ বাইরের দেশে এসেছি তো বাঙালি হয়েই ঘুরব। গরজে ভোল বদলাতে হলে সাহেবরা আমাদের দেশে, অন্ততপক্ষে সামাজিক ব্যাপারে, ধুতি পরবে না কেন?

বেরুমল বলছিলেন, শেষ অবধি কথা হল ভারতের পতাকা আঁকা থাকবে আমাদের দোকানের সাইনবোর্ডের উপরে। আমতা আমতা করে ওঁরা রাজি হলেন—ভারত-দূতাবাস থেকে যদি কিছু না বলে। তারা কি বলবে! দূতাবাসগুলোই আমার খদ্দের—নানান দেশের ওঁরা আছেন বলেই কায়ক্লেশে টিকে আছি। তাই চক্রধারী পতাকা রয়েছে দোকানের সাইনবোর্ডে, আর এক শাড়িপরা মেয়ে আঁকিয়ে রেখেছি দরজার পাশে। কিছুতে কিছু হয় না, কে দেখে এত খুঁটিনাটি নজর করে? এই আপনাকে দিয়েই বুঝুন না।

ক্ষিতীশ ঢুকছে আমার পরেই। এখানেও টাই মজুত বহুত রকমের। কর্মচারীরা চীনা—তাদের একজন দেখাচ্ছিল। বেরুমল তিন লাফে সেখানে গিয়ে পড়লেন। গোটা চারেক বাক্স বাতিল করে টাই বের করলেন একটার ভেতর থেকে। মেলে ধরে বললেন, দেখুন তাকিয়ে—আসল আমেরিকান চিজ, পঁচিশ হাজার। কাঁইকুই করবেন না, দিল খুলে গলায় বেঁধে নিন। দেশের মানুষ—দুটো পয়সা কম নেবো তো বেশি নয়।

ক্ষিতীশ দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলে, কিন্তু অন্য জায়গায় আলাদা দর দেখে এলাম। ঠিক এই রকম জিনিসই তো!

বেরুমল হেসে ওঠেন।

আরে মশাই, চাঁদ বাঁকা আর তেঁতুলও বাঁকা। তামাম পিকিন ঢুড়ে হেন বস্তু আর একটি মিলবে না। পাবেন কোথা? বাইরের আমদানি বন্ধ—অতি দরকারি জিনিস ছাড়া আনতে দেবে না। নিজেরা যা বানাচ্ছে, তাতেই চালিয়ে-চুলিয়ে নাও। দর বাঁধা—আমদানি কম বলে যে দুটো পয়সা চড়িয়ে দেবেন, সে জো নেই। বিদেশী মালে তবু শতকরা তিরিশ অবধি মুনাফা দেয়, ওদের ঘরের জিনিসের উপরে খুব বেশী হল তো বারো। খরচা-টরচা কষে সরকারি লোক দর ঠিক করে দিয়ে যায়; সেই দর সেঁটে রাখো মালের গায়ে। খদ্দের সেজে ওরাই আবার ঢুকে পড়ে মাঝে মাঝে, সাঁটা দরের হেরফের হল কিনা তদারক করে যায়। বলেন কেন, নিকুচি করেছে পোড়া দেশের ব্যাপার-বাণিজ্যের!

বেরুমলের এক কনিষ্ঠ আছেন, তিনি এসে জমেছেন! ফোড়ন দিচ্ছেন মাঝে মাঝে।

ঐ যে তিরিশ পার্সেন্ট—সে-ও কেবল কানে শুনতে। স্টেট বারো পার্সেন্ট ট্যাক্স টেনে নেয় ওর থেকে, কত থাকল তবে হিসেব করুন। চলে?

সহসা গলা নামিয়ে বলেন, বাইরের মাল বলে আমাদের সঙ্গে হিসেবের খুব কড়াকড়ি করতে পারে না—এই যা। আপন লোকের কাছে ঢাকাঢাকি কি—সামান্য হলেও আছে কিছু। কিন্তু নতুন মাল আসতে দেবে না—তা হলে ব্যবসা আর ক'দিন?

বেরুমল বেজার মুখে বললেন, পুরানো জিনিস ক'টা কেটে গেলে—ব্যস, হাত পা ধুয়ে ঘরমুখো জাহাজে ভাসব। ঘরই বা কোথায়, বেড়াবো আপনাদের দিল্লী কলকাতার পথে পথে।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। রকমারি সিল্কে ঘরের ছাত অবধি ভরতি। এই পর্বত-প্রমাণ সংগ্রহ কয়েকটা জিনিস বলে উল্লেখ করে বেরুমল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ভাবনা কিসের? আপনাদের এই মালের কাটান দিতেই তো কলি কাবার—কনিষ্ঠ বললেন, এ আর কি দেখছেন। একেবারে নস্যি মশায় আগের তুলনায়। পাশের ঐ দোকান, ওটাও আমাদের ছিল—এই দোকানের লাগোয়া। ভাড়া দিয়ে দিয়েছি। এ বাড়ি নিজস্ব আমাদের। মেয়েছেলেরা উপরে থাকে, নিচে দোকানপাট।

বেরুমল বলেন, পঞ্চাশ বছরের দোকান—এক-আধ দিনের নয়। আমি নিজেই পিকিনে রয়েছি তিরিশ বছর। হাজার হাজার চীনা, বিবেচনা করে দেখুন, আমার দেশে ভাত করে খাচ্ছে। আর এই এত বড় শহরে গোটা পাঁচ ছয় ভারতীয় দোকানের সমস্ত গেছে—শেষ আমিও যাই-যাই করছি। তখনই মশায় আঁচ করেছিলাম, চিয়াঙের দল খেদিয়ে এরা যখন এসে পড়ল। ভায়াকে বললাম, একেবারে ছেড়েছুড়ে যাওয়া ঠিক হবে না—কাঠামোটা ঠিক রেখে ওদের ভাব-সাব বুঝতে লাগো। স্বদেশের হাল দেখে আসিগে আমি। ইটখোলা করলাম আপনাদের কলকাতার কাছে সোনারপুরে। ব্যবসা জমে যায় তো সবশুদ্ধ দেশে গিয়ে পড়ব ঝাড়ু মেরে এই ছ্যাঁচড়া কারবারের মুখে। তা গেরো খারাপ মশায়। চোতমাসে এমন বৃষ্টি—খানা খুঁড়ে ইট বানিয়েছিলাম, কাঁচা ইট গুলে গিয়ে সে খানা সঙ্গে সঙ্গে ভরাট। ইটখোলা তোবা করে আবার জাহাজে চড়লাম। পুনর্মূষিক হয়ে পড়ে আছি।

দেশের মানুষ পেয়ে মনের কথা খুলে বলছেন। আমাদের সমবেদনা হওয়া উচিত, আর হচ্ছেও তা। তবু এক জায়গায় বসে কাঁহাতক এক কাঁদুনি শোনা যায়? চুপিসাড়ে বেরিয়ে এসেছি,—অনেক কৌশলের একটুখানি ছুটি। তা বেশ তো—জানাজানি হয়ে গেল, আসা যাবে আবার। আছি এখনো বেশ কিছুদিন—কতবার আসব। গরজও আছে। দু'পাঁচটা এখানকার হালকা জিনিস নিতে চাই দেশের বন্ধুবান্ধবের জন্য—কেনাকাটার ব্যবস্থা করে দিতে হবে কিন্তু।

নিশ্চয়, একশ' বার। আত্মীয়জন ভাববেন আমাদের। যা যখন দরকার পড়ে। দোকান বন্ধ থাকে তো ঐ পাশের দরজায় বোতাম টিপবেন। উপরে থাকি সকলে। একদিন খেতে হবে কিন্তু আমাদের বাড়ি; সবাইকে পায়ের ধুলো দিতে হবে। এত জনকে একসঙ্গে পাওয়া ভাগ্যে হয় না তো কখনো!

দু-ভাই ফুটপাথে নেমে এসে যে-দরজায় বোতাম টিপতে হবে, দেখিয়ে দিলেন। ঠিক বুঝতে পারিনে, কেন নিতান্তই চলে যেতে হবে এঁদের। বিদেশী সিল্ক ও অন্য বিলাস-দ্রব্যের আমদানি বন্ধ করেছে, আজকের দিনে তিলমাত্র অপচয়ের উপায় নেই সেইজন্য। তা অন্য সকলের মতো চীনা কাপড়ের কারবার ধরলেই তো হয়! মনটা ভারাক্রান্ত হল—বাঁধা দোকান ছেড়ে দিয়ে সেই তো হাজার লক্ষ উদ্বাস্তুর দলে ভিড়বেন।

এমনধারা ব্যবসা জমিয়ে নিয়ে বসবেন, সে অনেককথার কথা। কিছু গুহ্য ব্যাপার আছে হয়তো পয়লা দিনে ফাঁস করেননি শুনে নিতে হবে। সরকারি তরফের মানুষ আমাদের ঘিরে থাকেন—তাঁদের উল্টা-ভাবনা যাঁরা ভাবেন, তাঁদের কথাও শুনতে হবে বই কি! আবার ভিড় জমেছে। তা হোক, মতলব ঠাউরে ফেলেছি এবার। পালাবো না—মানুষ ওরা, বাঘ-ভালুক নয়। আর এই ফাঁক রেখে চলার দারুনই মানুষ শেষটা বাঘ-ভালুকে দাঁড়ায়।

এসো ভাই সব, এসো এগিয়ে—

থমকে দাঁড়িয়েছে, তখন নিজেই চলে যাই ওদের মধ্যে। কাঁধে হাত চাপিয়ে দিলাম একজনার। অবাক হয়ে গেছে। আর এতদিনে সর্বসাকুল্যে একটি চীনা কথা রপ্ত করেছি—সেটা ছেড়ে দিলাম এই মওকায়। ইন্দু—অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান ভারতীয় আমি। কী মোক্ষম কথা রে বাপু, মড়া বাঁচিয়ে তোলার মন্ত্র! সকলের মুখে সঙ্গে সঙ্গে অমায়িক হাসি। ভারতীয় আমরা—বুদ্ধের দেশের মানুষ ওদের ভাষায় 'হু' অর্থাৎ বর্বর। কিন্তু ভারতের মানুষ হল 'থিয়েন-চু' অর্থাৎ স্বর্গের বাসিন্দা। আজকের নয়—এ কথা পুরানো কাল থেকে চলে আসছে। ইংরেজ টুঁটি চেপে আছে—তারও মধ্যে চীনের সেই বড় বিপদের দিনে, আমাদের মেডিকেল মিশন তাবৎ দেশের ভিতর সেবা করে বেড়িয়েছে। অর্ধাসনে থেকেও দুর্ভিক্ষের চাঁদা দিয়েছি। তামাম দুনিয়া একঘরে করলেও আমরা এবং আঙুলে গণা যায় এমনি কয়েকটা দেশ ইউনো-য় লড়ে বেড়াচ্ছি নতুন-চীনের হয়ে। শক্তির দাপটে ভয় পাই নে, ঐশ্বর্যের হাতছানিতে লোভাতুর হই নি—চিরকালের কুটুম্বের পাশে সহজ আসনটি নিয়ে বসেছি। তা কুটুম্বিতা ওরা মেনে নিল ঐ একটিমাত্র কথায়; পথ-চলতি নগণ্য মানুষ হলেও সবাই ভাসা ভাসা রকমে জানে, ভারত ভাল লোক— নতুন-চীনের পরম বন্ধু।

দুটি প্রাণী—আমি আর ক্ষিতীশ—একা-একা যাচ্ছিলাম পিনিনের পথে। দেখ, কতজনে এখন আমরা! গা ঘেঁষে চলেছে, আমার আলোয়ানের প্রান্ত তুলে ধরে কাশ্মীরি কাজকর্ম দেখছে। বাজারের ভিতর ঢুকব এবার—হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে তারা। গভীর আবেগে হাত নেড়ে দিয়ে নতুন বন্ধুরা বিদায় নিল।

কোরিয়ার লড়াই কতদিন ধরে শুনছি। কতটুকু দাগ পড়েছে মনে! কাছাকাছি এসে পড়ে এখনই কিঞ্চিৎ মালুম হচ্ছে। সেই যে মহাপ্রাচীরের নীচে ঝরণার জল খেতে দিল না—হায় রে, তেষ্টার জলটুকুও হতভাগাদের নির্বিচারে মুখে দেবার জো নেই!

কোরিয়া থেকে সদ্য-ফিরে আসা একজনে আজকে বক্তৃতা দিচ্ছেন। মণিকা ফেলটন—ব্রিটিশ মহিলা। এর আগে আরও একবার গিয়েছিলেন দল বেঁধে। রণবিধ্বস্ত কোরিয়া দু-দুবার নিজের চোখে দেখে এসেছেন। পনেরো মাস আগে সেই প্রথম বারেই দেখেছেন ধ্বংসের ভয়াবহতা। শহরে একটা ইমারত আস্ত নেই। খাড়া রয়েছে হয়তো একটা থাম, কী একটুখানি দেয়াল। এক এক টুকরো নমুনা রয়ে গেছে, আগে কী ছিল তার কিছু কিছু আন্দাজ করা চলে। ঐ যেমন দেখে থাকবেন, মাটি কাটার সময় এক একটা ঢিবি রেখে দেয়, মাটির পরিমাণ হিসাব হবে বলে। ঐ সব নমুনা ইচ্ছা করেই রেখেছে কিনা কে জানে! যে, সর্বজনে দেখুক তাকিয়ে তাকিয়ে। এবং নিঃসংশয়ে বুঝে নিক—মারবার, পোড়াবার, গুঁড়োগুঁড়ো করে ভাঙার ওস্তাদি কী প্রকার সুসভ্য মানুষের। অতএব দুর্বল জাতিবৃন্দ, 'যাহা পায় তাহা খায়, যাহা শোনে তাহা করে' এবম্বিধ প্রথম ভাগে সুবোধ গোপাল হও। ঘাড় তুলতে গিয়েছ কী মারা পড়েছ।

তবু শুনুন তাজ্জব ব্যাপার। ফেলটন বলতে লাগলেন, ধূমকেতুর মতো আকাশে

উঠে দুশমন প্লেন যখন-তখন আগুন বৃষ্টি করে যাচ্ছে, মানুষে আর ভয় পায় না। গা সহা হয়ে গেছে। মরার বাড়া গাল নেই—সেই মচ্ছব চালাচ্ছ তো দিবারাত্রি। আর কী করবে হে বাপু এর উপর ?

গোটা পয়ং-ইয়ং শহর ঢুঁড়ে চারটে দেয়াল এবং তদুপরি ছাত-হেন গৃহ একটি পাবে না। তবু দেখা যাবে, ধ্বংসস্তূপের এখানে-ওখানে ঘরসংসার পেতেছে মানুষজন। মানুষ মানে মেয়েলোক, শিশু ও বুড়োরা। সমর্থ পুরুষ সবাই লড়াইয়ের কাজে। এরই মধ্যে ত্রিপল খাটিয়ে একটু ইস্কুল মতো হয়েছে, বাচ্চারা পড়ে সেখানে। পড়ে আর মনের সুখে লুকোচুরি খেলে বেড়ায় ভাঙা বাড়ির ইটকাঠের মধ্যে।

লোকে আকাশমুখো তাকায়—দেবতার করুণা চেয়ে নেয়—রোষ আর ঘৃণার দৃষ্টিতে। যে আকাশ থেকে যখন-তখন বোমা পড়ে হাস্যোচ্ছল জনপদে আগুন ধরায়, নির্বিচারে মানুষ মারে। এ সমস্ত অবশ্য জানা কথা, চোখে না দেখেও আন্দাজ করা চলে। যে খবর সকলে জানে না, সে হচ্ছে সর্বধ্বংসী আগুনের মধ্যে দুরন্ত জীবনোল্লাস। মার্কিন আধিপত্যের খানিকটা স্বাদ একবার পেয়েছিল কিনা লড়াইয়ের গোড়ার দিকটায়! এখন তারা মরিয়া।

ব্রিটিশ ও আমেরিকান কয়েকটি বন্দী গল্প করেছে মনিকা ফেলটনের কাছে। তাদের ধরে ফেলল যখন চীনারা। একে চীনা তায় কম্যুনিস্ট—মেরে ফেলবে তো নির্ঘাত। আর মরার আগে খবর বের করার জন্য যা-সব ঘটবে, আন্দাজ করতে সর্বদেহ হিম হয়ে যাচ্ছে।

এলো সেইক্ষণ। হেড-কোয়ার্টারে এনে বন্দীদের সারবন্দি দাঁড় করিয়েছে। হুকুম হল, হাত বাড়াও—

এক গুলিতে সাবাড় করবার পদ্ধতি এই। কিন্তু পেটের কথা পেটের মধ্যে রেখেই মরতে দেবে—এত দূর ভদ্র, জানা ছিল না তো। বন্দুকই বা কই সামনে? সিপাহী-সান্ত্রী কোথায়? কয়েকটি মাত্র অফিসার।

হাত বাড়াতেই অফিসারের হাত চেপে ধরেছেন জনে-জনের। শেকহ্যান্ড করছেন।

কিছু বলতে হবে না ভাই, সমস্ত জানি। কোরিয়ার যুদ্ধের জন্য দায়ী তোমরা নও। নিজেরাই কি কম ভুগেছো? যাকগে, বিশ্রাম আপাতত।

পেটের কথা ক্রমশ নিজেরাই ফাঁস করেছে। একেবারে কিছুই জানত না—ঘরবাড়ি ছেড়ে সাত সমুদ্র-পারের লড়াইয়ে ঝাঁপ দিয়েছে পৃথিবীর অশান্তি রোধ করবার জন্য। সেই রকম বুঝিয়েছিল তাদের। তারা নৃশংস নয়—মা বাপ, ভাইবোন, প্রীতিময়ী প্রণয়িণী সমস্ত ছিল একদা, ছিল য়ুনিভার্সিটির পড়াশুনো আর অফিসের চাকরি। আর ছিল রুচিবান আদর্শ-নিষ্ঠ শান্ত জীবন। রণদৈত্যের মুঠোর মধ্যে পড়ে সেই তাদের হেন জঘন্য কর্ম নেই যা করতে হয় না। তার উপরে ঔদ্ধত্য ছিল মনে মনে—এসব মানুষের সমাজের জন্য, মানুষের জন্য সমাজ-শত্রুদের শায়েস্তা করবার জন্য। আজকে আর্তনাদ করছে অন্তরের মানুষ। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। আমি নই—কিছু জানি নে আমি। আমার হাত দু'খানা দিয়ে বোমা ফেলেছে ওরা…

নিরুদ্ধ নিশ্বাসে মণিকা ফেলটনের তাবৎ কথা শোনা হল। ছবি মনে হল। ছবি যেন চোখের উপর দেখছি। এবার চলুন আর এক জায়গায়—অন্য এক ঘরে। নাকামুরা কী বলে, শুনে আসি।

হ্যাঁ, গতিক সেই রকম। পৃথিবী অতি ছোট—হাতের মুঠোয় আমলকী বিশেষ। কোরিয়া বলুন, জাপান বলুন, এবাড়ি-ওবাড়ি ছাড়া কিছু নয়। সবাই প্রতিবেশী

আমরা। পীস-হোটেল আর পিকিন-হোটেল—দুটো মাত্র জায়গার মধ্যে সকলকার আস্তানা। দিনের মধ্যে অমন দশবার দেখাশুনো হচ্ছে। ভাষা না জানি তো বয়ে গেল। তাতে বুঝি পরিচয় আটকায়? ঐ তো আজ সকালেই যে কাণ্ড হলো মরিশন স্ট্রীটের উপর বাজারে যাবার সময়। কোরিয়ার কথা শুনলাম, এবার জাপান কী বলে—শুনিগে চলুন। জাপান গবর্নমেণ্ট নয়—জাপানের মানুষ।

নাকামুরা স্ফূর্তিবাজ অভিনেতা মানুষ—চলনে-বলনে তাঁর আমেজ পাওয়া যায়। হবে না কেন? রং মেখে সাজগোজ করে বাপের পিছন ধরে পাঁচ বছুরে শিশু একদিন স্টেজে উঠলাম, আজকে বাহান্ন বছুরে বুড়ো নেচে-কুঁদে সেই রকম লোক মাতাচ্ছি। জাত ব্যবসা মশায়, বাপ-দাদাও জীবনভর এই করে গেছেন। খাসা ছিলাম কাবুকি দলে, সেটা হল পেশাদারি অপেরা—টাকা কামাও, আমোদ স্ফূর্তি করো, নাক ডেকে ঘুমোও—কোন রকম ঝামেলা নেই। সেই মানুষ আজ তামাম দুনিয়ার গুণী-জ্ঞানীদের সামনে দাঁড়িয়ে আঁতের কথা বলতে উঠেছি। হেন দুর্ভোগ স্বপ্নে ভেবেছি কোনো দিন?

লড়াই বাধল। লড়াইয়ের বাবদে যত গণ্ডগোল। কর্তারা বললেন, বাজে নাচনা-গাওনা নয়—মতলব নিয়ে লেগে পড়ো। নতুন পালা লেখানো হচ্ছে—লড়াই জিতলে ইন্দ্রধাম ধরায় নেমে আসবে, এমনি সব বিষয় নিয়ে। এমন মোক্ষম গাওনা শুরু করো, মানুষ যাতে দলে দলে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তাই সই। ঢাক কাঁধে ঝুলিয়ে দিল তো বাজিয়ে চললাম এক নাগাড়ে চার-পাঁচ বছর। কী ঝড় বয়ে গেল দেশের উপর দিয়ে, কত সর্বনাশ যে হয়ে গেল! কাগজে ক'টা কথাই বা লেখে! একটি কথাই বিশ্ববাসী সকলে জেনে রইলেন; জাপানের মতো হাড়-বজ্জাত জাত দুনিয়াদারিতে দ্বিতীয় নেই।

রামা-শ্যামা মানুষগুলোর কথা কানে যায় না যে আপনাদের! আর মন খুলে কথাও কী বলবার জো আছে? সাদা পোশাকে পুলিশ কোথায় ওৎ পেতে আছে, ক্যাঁক করে টুঁটি চেপে ধরবে। তা মশায়রা আমাদের দুর্ভাগা দেশের হয়ে একটা খবর নিবেদন করি—মার-কাট-করনেওয়ালা গোঁয়ার-গোবিন্দ জাত সত্যি সত্যি আমরা নই। কপালের ফের, তা ছাড়া আর কী বলতে পারি? ঘুরে ফিরে আমাদের দিয়ে প্রলয়-নাচন নাচাচ্ছে, কিন্তু বিশ্বাস করুন—নেচে নেচে চেরিগাছে মুকুল ফোটাবো, সেইটেই আমাদের বিশেষ পছন্দ।

তা হতে দিচ্ছে কে? দু-দুটো অ্যাটম-বোমায় ঘায়েল হয়ে আছি, তবু রেহাই দেবে না। ষড়যন্ত্র হচ্ছে, আবার ওখানে পয়লা নম্বরের ঘাঁটি করে নতুন এক লড়াই যদি বাধানো যায়। আমরাও ঠিক করেছি মশায়, ন্যাড়া আর বেলতলায় যাবে না। ঠিক করছে অবশ্য রামা-শ্যামা-যোদো-মোধোর দল—যাদের কথা খবরের কাগজে ওঠে না। কিন্তু শোনাবোই এবার আমাদের কথা। জেন শিনজা (গণনাট্য দল) গড়েছি, নাটক করি। নাটক দেখতে লোক ভেঙে পড়ে। তা হলে দেখুন, ওরাই গুরু এক হিসাবে, ওদের কথা মেনে নিয়েছি—বাজে নাচনা-গাওয়া নয়, মতলব হাসিল করতে হবে।

বাধা শতেক রকমের। হুড়মুড় করে একদিন হাজারখানেক পুলিশ এসে সমস্ত তছনছ করে দিয়ে গেল। তখন মতলব হল, দু'চারটে পালা সিনেমা-ছবিতে পাকাপোক্ত করে তুলে রাখা মন্দ নয়! ছবি তোলা চারটিখানি কথা নয়—ম্যাও ধরবে কে? দেশের মানুষদের জানান দিয়ে দাও। তা মশায় বলব কি, এক পয়সা করে লাখ টাকা উঠে গেল। চাঁদা তুলে সিনেমার ছবি—শুনেছেন এমনধারা? একবার হামলা দিল আমাদের

উপর—অভিনয় করতে দেবে না। জনতার গোলামনফর আমি—স্টেজে উঠে করজোড়ে শুধাই, কী আদেশ তোমাদের ?

শতকণ্ঠে গর্জন উঠল, চালাও। আমরা আছি—কে ধরতে আসে দেখি ?

পুলিশ প্যাট-প্যাট করে চেয়ে রইল, স্ফূর্তিতে পালা গেয়ে যাচ্ছি। গতিক বুঝে পিটটান দিল তারা অবশেষে।

হাসছে নাকামুরা নিজে, হাসাচ্ছে আমাদের। হাসতে হাসতে শিল্পীর লাঞ্ছনা ব্যক্ত করছে। আর এদিকে হাসতে গিয়ে জল ফুটে ওঠে শ্রোতাদের চোখে।

সুইং-ইএ্য-মিঁ—সেই হাসিখুশি মেয়েটা—নজর খাটো বলে চশমা ধরেছে, কিন্তু পান থেকে চুন খসলেও দেখি নজরে পড়ে।

সকালের মিটিঙে ছিলেন না—

আমতা-আমতা করে বলি, ছিলাম বই কি! নিশ্চয় ছিলাম। হাজিরার লিস্টি আছে তো—দেখ গিয়ে তার মধ্যে।

শেষ অবধি ছিলেন না।

অত মানুষের মধ্যে সেটাও ঠাহর করেছে। কিছু আশ্চর্য নয়। আমাদের আটটি দশটি পড়েছে এক-একজনের ভাগে। ছায়া হয়ে সাথেসঙ্গে ঘোরে, খেদমত করে বেড়ায়। ভাগের মানুষ সরে পড়েছে, টনক তো নড়বেই।

ধরা পড়েছি যখন, বুক ফুলিয়ে জাঁক করাই ভালো। বললাম, দু-দুটো মিটিঙের অত ভালো ভালো কথা সামলাতে পারলাম না। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল, তাই বেরিয়েছিলাম।

বললেন না কেন ? সঙ্গে যেতাম।

ওঃ, ভারি সব লাটসাহেব এসেছি কি না— যেথায় যাবো, মিছিল করে চলতে হবে !

সুইং বলে, সে কথা হচ্ছে না। ধরুন, দরকার পড়ল কাউকে কিছু বলবার। কিংবা চলতে চলতে হয়তো ভুল রাস্তায় গিয়ে পড়লেন।

তোমাদের তর্জমা ছাড়াও বলতে পারি কথা। বলবার ভাল কায়দা আজকে শিখে নিয়েছি।

বাজার থেকে অনেক জিনিস এনেছি রঙিন বেতের ব্যাগ বোঝাই করে। সগর্বে মেলে ধরলাম।

দেখ, দেখ। হাতির দাঁতের উপর কাজ-করা সিগারেট-হোল্ডার, কুল্যে দশ হাজারে। দশ দোকান ঘুরে ঘুরে কেনা—এক ইয়ুয়ান কমে নিয়ে এসো দেখি কোন-একটা জিনিস। বিনা কথায় হয়েছে এসব ?

ভ্রূভঙ্গি করে সুইং বলে, সওদায় এখানে কথা লাগে না—বোবারাও করে থাকে। কেউ ঠকাবে না, দরাদরি নেই।

শুনলেন ? আমরা বোবা—ঠেশ দিয়ে তাই বলা হল কি না। ওদের ঐ হিজিবিজির ধাঁধায় না ঢুকতে পারলে ধরে নেবে নিতান্ত অবোলা জীব। কী করে বোঝাবো বলুন নির্বুদ্ধি মেয়েটাকে—মুখে বকবক না করেও চোখের চাউনিতে তামাম কথা বলা যায়। তাই তো বলেছিলাম মরিশন স্ট্রীটের উপর। সেই ভাষায় কথা বলেছি দোকানিদের সঙ্গে। তুমি ছিলে না মাতব্বর ঠাকরুন, ভাগ্যিস ছিলে না সঙ্গে ! ঠিক করেছি, এমনি ফাঁক কাটাব যখন তখন—লায়েক হয়ে গেছি, ডরাই নে আর কোন মানুষ। চীনের মানুষগুলো তো নয়ই।

ঐ যে বলল, ঠকায় না ব্যক্তি—সবাই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। হেন তাজ্জব

বিশ্বাস করতে বলেন কলিকালে? আর আমি 'হ্যাঁ' বলে রায় দিলেও বিশ্বাস করবেন কি আপনারা বুদ্ধিমান পাঠকদল? জাতে চীনা—কলকাতার চীনাবাজার ঢুঁড়ে বিস্তর চিনে রেখেছেন ওদের। জুতো কিনতে যান ওদিকে। জুতোর দাম বিশ টাকা হেঁকে বসল তো তার সিকি পাঁচ লুপেয়া থেকেই শুরু করবেন, না কি? ইংরেজি বলবেন, বাংলা বলবেন, সাহেব-সাহেব করবেন—একবার বা আঁটকুড়ির ব্যাটা বলে নিলেন ওর ফাঁকে। নাঃ, কিনবো না এখানে—রাগ করে রাস্তায় নেমে পড়লেন। পিছন থেকে তখন ডাকল, আট লুপেয়ায় নিয়ে যাও জুতো, লোকসান করে দিচ্ছি।

দেশের দোকানে এসে বসলে সেই তারা নাকি দরাদরি একেবারে বরদাস্ত করবে না। পাতিকাক স্থান-মাহাত্ম্যে ময়ূর হয়ে পেখম ধরেছে! আচ্ছা, হাতেনাতে দেখিয়ে দেবো কাল-পরশুর মধ্যে। সুইঙের দেমাক চূর্ণ হবে।

আজ সন্ধ্যায় ভিয়েতনামের দলকে ডিনারে ডেকেছি আমরা ভারতীয়রা। এই তো আসল—মানুষজনের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়। কনফারেন্স ধুম-ধারাক্কা ব্যাপার, সর্বচক্ষুর দৃষ্টি সেই দিকে, রিপোর্টাররা লুকিয়ে আছে বক্তৃতাদির কমাটুকু বাদ না যায়। ইতিমধ্যে বিশ্বের নানান জাতের মানুষ মুখ-শোঁকা-শুঁকি করে, নিঃসংশয়ে বুঝে নিচ্ছি ভাইব্রাদার আমরা—ডাণ্ডাবাজি নিতান্তই অহেতুক। খোলা মনে পাশাপাশি বসেই মীমাংসা হতে পারে।

নিচের বাঙ্কুয়েট-হলে খাওয়া দাওয়া। আচ্ছা মজার নিমন্ত্রণ—নিমন্ত্রকদের এক তিল ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হল না। ওদের ঘরবাড়ি, ওদের লোকজন, জিনিসপত্র সমস্ত ওদের। একটিবার মুখের হুকুম ঝেড়ে খালাস। শুধু নামের বেলা আছি—খাওয়াচ্ছি নাকি আমরাই।

খবরের-কাগজে পড়েন, অতএব ভিয়েতনাম নামটায় চোখ পড়ে থাকবে। একটা গোলমেলে ব্যাপার চলেছে যেন অনেক দিন ধরে? আজ্ঞে হাঁ, নির্ব্যূঢ় স্বত্বে স্বত্ববান ও পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখলিকার সুসভ্য ফরাসি জাতি—দুর্জন ভিয়েতনামিরা গোল-মাল বাধাচ্ছে উক্ত মহাশয়দের সঙ্গে। এক অতি হাস্যকর নিয়মবিরুদ্ধ কথা বলছে—ভিয়েতনাম নাকি ভিয়েতনামবাসীদেরই। রাগ হয় না? আমার ডান দিকে বসেছে গো-গিয়া-থাম। দুটো হাত নুলো। বক্তৃতায় হাততালি দিচ্ছে নুলো করাগ্র দুটোয় শুকনো কাঠি বাজানোর মতো। আলাপ-পরিচয়ের পর পরস্পর শেকহ্যাণ্ড করছি, সে নুলো হাত ঠেকাচ্ছে আমাদের হাতে। এ দশা ছিল না তার। জাপানি হামলার সময় ফরাসিরা তো রাতারাতি জাহাজ ভাসিয়ে দরিয়া পাড়ি দিল। গেরিলা-লড়াই করেছে তখন এরা। নিরস্ত্র ও নিঃসহায়—তা হাতবোমা বানিয়েই নাস্তানাবুদ করতে লাগল জাপানিদের। একটা হাত গেল, তবু ছাড়েনি। দুটো হাতই খতম তারপরে। মুখ পুড়ে মাংস দলা-দলা হয়ে আছে। খানিকটা নিশ্চিন্ত সেই থেকে। ছেলেটাকে বার বার চেয়ে দেখছি। বীভৎস ভয়ঙ্কর মুখ, কিন্তু সাদা দাঁতের হাসির লহর খেলছে। অ্যাটম-বোমার গুঁতোয় শিরদাঁড়া-ভাঙা জাপান পালাল তো খিড়কির পথে শুড়শুড় করে, ঠাকঠমক সহ পুনশ্চ ফরাসিরা ঢুকে পড়লেন। এই যে এসে গেছি! কিন্তু কোথায় ছিলেন বীর পুঙ্গবেরা বড় ডামাডোলের সময়টা? সেই যখন জাপানিরা কুড়িয়ে-বাড়িয়ে তাবৎ চাল বাইরে সরাল, আর অনাহারে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ মরল কীটপতঙ্গের মতো? লাইনবন্দি গোরুর-গাড়ি লাস-সরাতে লাগল রাজধানী হ্যানয়ের রাস্তা থেকে—তখন মহাশয়দের টিকি দেখা যায় নি। তার পরে শ্মশানভূমির নৈঃশব্দে প্রেতদলের মতো করোটি-কঙ্কাল নিয়ে ডাংগুলি খেলার উদ্দেশ্যে আবার অভ্যুদয়?

গুয়েন-কুয়োক-ট্রি পঁচানব্বুইটা লড়াইয়ের বীর। জাপানিদের সঙ্গে লড়েছে, এখনও লড়ছে। বলে, তোমরা ভারতীয়েরা বাপু, যা হোক করে কাঁধের ভূত নামিয়েছ—কবে যে সোয়াস্তির শ্বাস ফেলব আমরা।

মঞ্জুশ্রী দেবী রবীন্দ্র-সঙ্গীত ধরলেন। পৃথিবী এমন সুন্দর, মানুষ এমন ভালো। বাংলা বোঝেন ক'জনই বা। কিন্তু প্রীতি-প্রসন্নতার আলো মুখে মুখে। সর্বব্যাপ্ত আনন্দ। এতক্ষণের আলোচনার যাবতীয় সমস্যা ও আক্ষেপ সুরতরঙ্গে ভেসে গেছে। রবীন্দ্রনাথের গান এই প্রথম শুনল ওরা, সর্বপ্রথম রণিত হল পিকিন-হোটেলের কক্ষে। গানের শেষে ভিয়েতনামের একটি মেয়ে জড়িয়ে ধরল মঞ্জুশ্রী দেবীকে। আবিষ্ট হয়ে আলিঙ্গন করছে, ছেড়ে দিতে চায় না। অপলক চোখে দেখছি আমরা। নিখিল পৃথিবীর পাহাড়-সমুদ্র যেন নিঃশেষে বিলীন হয়ে পথ ছেড়ে দিয়েছে, এক হয়ে গেছে দূরবাসী আপন মানুষেরা।

(১৫)

তার পরের দিন—২৮শে সেপ্টেম্বর। ব্রেকফাস্টে চলেছি কয়েকজন সাততলার খানাঘরে। লিফটের বোতাম টিপে অপেক্ষায় আছি।

হন্তদন্ত হয়ে এক ভদ্রলোক এলেন। আমার নাম ধরে বলছেন, অমুক বলে কেউ আছেন আপনাদের মধ্যে।

অতএব ছেড়ে দিলাম সেবারের লিফট।

পিকিন-য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক আমি—আলাপ করতে এসেছি।

চলুন তবে ঘরে গিয়ে বসিগে।

খেতে চলেছেন—খেয়েই আসুন। না হয় আমিও যাচ্ছি সেখানে, খাওয়ার টেবিলে আলাপ হবে। উঠে যান—আসছি আমি একটু পরে।

আধময়লা লম্বা মানুষটি। চৈনিক চেহারা এমন যে হতেই পারে না, এমন নয়। তার পরে জানাশোনা হল—চক্রেশের বাপ জগদীশ জৈন। হিন্দী পড়ান। মেয়ের সঙ্গে তো বিস্তর পরিচয় হয়েছে, বাপকে দেখলাম এবার। বম্বের এক কলেজের অধ্যাপক—চাকরিটা ছাড়েন নি। ছুটি নিয়ে এসেছেন। সমস্ত পরিবার বম্বে রয়েছে, এখানে শুধু বাপ আর মেয়ে।

এ মানুষকে হেলা করা চলে না। মাস ছয়েক আছেন, কত কি নতুন কথা পাওয়া যাবে এঁর কাছে!

চীনা ভাষাটা শিখেছেন তো ভাল করে?

অধ্যাপক শিউরে উঠলেন: ওরে বাবা! সে কি দু-দশ মাসের কর্ম?

দু'মাসে না হোক, দশ মাসেও হবে না?

না। সজোরে তিনি ঘাড় নাড়লেন।

অক্ষরই হাজার কয়েক। ভুল করলাম—অক্ষর নয়, লিপি। কিংবা ছবিই বলুন না। এক'একটা ছবি দিয়ে প্রকাশ।

এত প্রগতি নানান দিকে—লিপির ঐ জগদ্দল বোঝায় অসুবিধা হয় না? সহজ কিছু বেছে নিলে তো পারে। রোমক অক্ষর নিয়ে নিচ্ছে অনেক দেশে। কাজকর্ম চালানো কত সহজ হয় তাহলে।

এই আলোচনা পরে করেছিলেন অপর এক বিদগ্ধ জনের সঙ্গে। তিনি ঐ দেশীয়। খুব খানিকটা হেসে নিলেন। বললেন, অতি প্রাচীন পরিপক্ক জাত যে আমরা। আয়তনে সারা ইয়োরোপের চেয়ে বড়। ইজ্জতেও। কেউ আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারবে

না। চার হাজার বছরের খবর পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ২৮০০ বছরের পাকা ইতিহাস রয়েছে। হেন ঐতিহ্য দেখান দিকি আর কারো। অন্য সকলের যা চলে, আমাদের তা চলবে না। জান কবুল—পুরানো ঐতিহ্যের অংশটুকুও আমরা ছাড়তে পারব না।

আবার বললেন, ভাষা নিয়ে অসুবিধা আছে মানি। কিন্তু কার ঘাড়ে ক'টা মাথা, ভাষা-ত্যাগের প্রস্তাব তুলবে? তবে গবেষণা চলেছে—সহজে ভাষা শেখবার একটা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিও বেরিয়েছে। মাস তিনেকে মোটামুটি কাজ চালানোর মতো শেখা যায়।

খবরের মত খবর। পুলকিত হবার ব্যাপার নিঃসন্দেহে।

ছড়িয়ে দিন না পদ্ধতিটা। বিচিত্র আপনাদের প্রাচীন সাহিত্য ভাণ্ডার, যারা স্বাদ পেয়েছে, তারাই মজেছে। ভাল হয়েছে সংক্ষিপ্ত পথে এগিয়ে, মূঢ় জনে এবারে যদি একটু উঁকিঝুঁকি দিতে পারে।

তিনি বললেন, বাইরের লোকে এখন খুব বেশী সুবিধা করতে পারবে না। পদ্ধতিটা ধ্বনির উপর নির্ভরশীল। আমাদের বাগ্‌ভঙ্গির সঙ্গে পরিচয় থাকলে তবে হবে।

হিজিবিজি লিপির প্রবর্তনা কেমনে হল, শুনবেন নাকি একটু? সত্যি মিথ্যে জানি নে—কষ্টিপাথরে ঠুকে যদি বলেন খাদ আছে, গণেশের দিব্যি করতে পারব না। যেমন শুনেছি, তেমনি লিখে দিলাম। আপনারাও গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করুন, শুনতে পাবেন এই কাহিনী।

তখনো লিখন-শিল্পের আবিষ্কার হয়নি। লোকে দৈবজ্ঞের কাছে যায় ভবিষ্যৎ জানতে, রোগপীড়া সারাতে, গ্রহশান্তি করতে। সমস্ত শুনে নিয়ে দৈবজ্ঞ কচ্ছপের খোলা, মানুষের করোটি বা ঐ জাতীয় কিছু ফেলে দিলেন আগুনে। তারপর আগুন নিবিয়ে বস্তুগুলো বের করে আনা হল। উত্তাপে ফেটে ফেটে আঁকাবাঁকা রেখা ফুটেছে খোলার উপর। দৈবজ্ঞ ভবিষ্যৎ পড়ে গেলেন ঐ সমস্ত রেখায় চোখ বুলিয়ে। এই হল লিপিবিদ্যার আদি। রেখার মানে দৈবজ্ঞ বোঝে তো আপনি আমি চেষ্টা করলে বুঝব না কেন? অতএব সকলে লিখতে লাগল ঐ ধরনে, মানেও করতে লাগল। লিপির ধরন তাই অমন আঁকাবাঁকা।

অক্ষর নয়—ছবি। এক একটা আস্ত কথার ছবি করে দিয়েছে। একটা-দুটো টুকরো-রেখায় ছবির সংকেত। নিরিখ করে দেখুন, মালুম হবে কতক কতক। রসবোধের নমুনা দেখে অবাক হতে হয়। মানুষ—দেখুন, এক জোড়া পা। স্ত্রী—দেড় লাইনে মেয়েলোকের মতো বানিয়ে তার হাতে ঝাঁটার ইঙ্গিত। মামলা—দুটো কুকুর। কয়েদি—বাক্সের ভিতরে গুড়ি মেরে আছে মানুষ। পুজো—মানুষ হাঁটু গেড়ে আছে। পূর্বদিক—গাছের আড়ালে সূর্য। পশ্চিম—পাখীরা বাসায় ফিরছে। এমনি অজস্র।

অধ্যাপক জেনের পর পরাঞ্জপে। এসে অবধি তাঁর খোঁজ করছি, এত দিনে চোখে দেখলাম। ঝড়ের বেগে ইংরেজী বলেন। আর অমন তাজ্জব চীনা শিখেছেন—খাস চীনা মুলুকের মানুষও লজ্জা পেয়ে যায়। বড় ব্যস্ত—বসে দুটো কথা বলার ফুরসৎ নেই। এঘরে-ওঘরে ছুটোছুটি করে দেশের ভাইদের সঙ্গে আলাপ করছেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে ষাট জনের সঙ্গে মোলাকাত সেরে ড্রইংরুমে এলেন। ভারতীয় দূতাবাস চাল কিনবার তালে আছে চীনের কাছ থেকে—তার জন্য নানা স্তরে নানাবিধ আলোচনা। আরো নানা ব্যাপার। একটুও সময় নেই। কাল আসব আবার। নয় তো পরশু। আজকে মার্জনা করুন।

সাইকেলে চেপে পরাঞ্জপে সাঁ করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

চলুন যাই একজিবিশনে। নতুন-চীন কি করছে, তার কিছু নমুনা দেখে আসা যাক নিজ চোখে। এতকাল চীন যাদের তল্পি বয়ে এসেছে, জোট বেঁধে তারা তো এক ঘরে করে দিল। রোসো, দেখে নিচ্ছি—বন্ধ করছি কম্যুনিষ্ট বেটাদের হুঁকো—নাপিত বন্ধ করে। কিন্তু শাপে-বর হয়ে গেল। বাঁচতেই হবে, দাঁড়াতেই হবে নিজের পায়ে। যা দেশে-ঘরে আছে, তাই নিয়ে খুশি থাকো দেশের মানুষ। আর গড়ে তোল নতুন নতুন কারখানা, কোমর বেঁধে সর্ব-শক্তিতে লেগে যাও।

দশ বছরের বেশি ঘরোয়া লড়াই—অস্থি-মজ্জা কিছু কি আর ছিল? জিনিস পত্রের দাম লক্ষ্যগুণ বললে বিনয় করে বলা হয়। ভারী-শিল্প কমে গিয়েছিল শতকরা সতের ভাগ, ছোট শিল্প তিরিশ ভাগ, ফসল কমেছিল সিকি। সব আবার ঠিক হয়ে গেছে। তাই বা কেন—উৎপন্ন এমন বেড়েছে, কস্মিনকালে যা কেউ দেখেনি। আরও বাড়ছে দিনকে দিন। যেটা ওরা আশা করে, আশা ছাপিয়ে অনেক আরো এগিয়ে যাচ্ছে বছর বছর। কয়লা আর লোহাপাথর চালান দিত আগে, এখন নিজেরাই ইস্পাত বানাচ্ছে। দেশের শিরাউপশিরার মতো সর্বপ্রান্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে রেল-লাইন। জমি-সংস্কার করে ফেলেছে—লাঙল যাদের তাদেরই জমি। নিজের হাতে লাঙলের মুঠো ধরতে হবে তার মানে নেই অবশ্য; লোকজন দিয়েও করাতে পারো। কিন্তু ফরাসে পা ছড়িয়ে খাজনা আদায় চলবে না। দেশ-জোড়া এত বড় কাজ কটা বছরের মধ্যে যেন মন্ত্রের জোরে করছে। অথচ অস্বস্তি কত রয়েছে, ভেবে দেখুন। ঘরশত্রু বিভীষণেরা অদূরে ফরমোশায় ওত পেতে বসে আছে—তাদের পিঠের আড়ালে ভুবনের শক্তিধর মহাশয়গণ। আর শিল্পাঞ্চল অর্থাৎ দেশের প্রাণকেন্দ্রের অতি-নিকটে কোরিয়ায় তো মার-মার কাট-কাট ব্যাপার—অহরহ সেদিককার ঝামেলা পোয়াতে হচ্ছে। তার মধ্যেও এত সমস্ত—এমন হাসি আর নির্বাধ আনন্দ।

ঘুরে ঘুরে দেখছি। হেন বস্তু নেই, যেদিকে এদের নজর পড়ে নি। ছবি-আঁকা মধুগন্ধী চন্দনের পাখা থেকে ভীমকায় বয়লার। আহা, সবরকমে নাজেহাল হয়েছে এতকাল ধরে—কেউ তো ছেড়ে কথা কয় নি। বারোয়ারি ময়দা—যে পেয়েছে সে-ই ঠেসে গেছে। আজকে দিকে দিকে নবজীবনের ব্যাপ্তি। একজিবিশন ঘুরে ঘুরে ওদের নবীন স্বাস্থ্যের নিশ্বাসপ্রশ্বাস অনুভব করছি। ভাল হোক এদের—শান্তি ও সমৃদ্ধি উথলে উঠুক। এই আনন্দোচ্ছল স্বাস্থ্যোদ্ভাসিত ছেলেমেয়েদের মুখ মলিন না হয় যেন আর কখনো? আর আমি জানি, এমনি হাসি হাসবে আমাদের সন্ততিরাও! সাত্ত্বিক চেষ্টা চাই তার জন্য। দোষ আছে আমাদের মানি, গালিগালাজ করি—আত্ম-সমালোচনা বলে ধরে নেবেন। আমাদের কর্মচেষ্টা নিষ্কলঙ্ক ও ব্যাপকতর হোক। আনন্দের প্লাবন দেখে এলাম চীনে, সে আনন্দ হিমালয় ছাপিয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙে পড়ুক এখানে। প্রীতি ও সৌহার্দ্যে এপার-ওপার এক হয়ে থাক সেই প্রাচীন দিনের মতো।

কিনতে লোভ হয় নানান জিনিস। বিশেষ করে সিল্কের উপরে তোলা ছবি ও ব্যাগ। ভারি চমকদার। চক্রেশ ও তার বাপ আছেন দলে—আমাদের সঙ্গে ঘুরছেন। হাঁ-হাঁ করে উঠল মেয়েটা। এখানে নয়, আমি কিনে দেবো! যারা তৈরি করে, জানি তাদের। অর্ডার দিয়ে দেবো—আরো ভাল জিনিস হবে, অনেক ভালো—

ডায়েরির খাতা খুলে স্তব্ধ হয়ে গেছি। বিজয়া দশমী। ছাপা আছে তাই, নইলে টের পাবার কথা নয়। শানাই বাজছে যেন কোথায় অনেক দূরে। বাজছে করুণ হয়ে আবার কিশোরকালের একটি বিমুগ্ধ দিনান্ত। এয়োস্ত্রীরা জমেছেন চণ্ডী-মণ্ডপে, প্রতিমার কপালে সিঁদুর দিচ্ছেন—তারপর প্রসাদী সিঁদুর মাখাচ্ছেন এ-ওর

কপালে। অতি-কুৎসিত মেয়েটাকেও কত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে এই দশমীর দিন। উঠানে নামাল প্রতিমা। গর্জন-তেল মাখিয়ে দিয়েছে—অপরাহ্ন-আলোয় ঝিকমিক করছে। মাগো, আবার এসো—

বাড়ির গিন্নি হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন। ঠাকুর-প্রতিমা নয়, এ যেন মেয়ে। মা-খুড়ি এবং মাসিরা মিলে শ্বশুরবাড়ি পাঠালেন এই গ্রামকন্যাকে। পাশাপাশি আর-এক ছবি। ঘাটে নৌকা। ছাতিমতলায় সকলে দাঁড়িয়ে। চোখে অঝোর-ধারা বয়ে যাচ্ছে। মাগো— কাঁদিস নে মা, নিয়ে আসব তোকে সামনের অঘ্রানে—

লগি ঠেলছে মাঝি। নৌকা এগোয় কই? কলমিফুলে ভরে গেছে নদী-জল। কলমিলতারা শত বাহু মেলে আটকে আছে। এগুতে দেবে না…

তেমনি সানাই বাজে আজও যেন কোথায়? আমার সারা চৈতন্য আচ্ছন্ন করে বাজছে। হঠাৎ কে কথা বলে উঠল। চমক লাগে। ইয়ং এসে বলছে—বয়সে ছোকরা, কিন্তু দোভাষি-দলের কর্তাব্যক্তি।

পাকিস্তানের দল আসছেন। ভাবলাম, আপনিও গেছেন বুঝি এরোড্রোমে। জানি নে তো—

আপনাদের অনেকেই গেছেন। একলা চুপচাপ ঘরের মধ্যে—শরীর খারাপ নাকি?

ভাবছি নানান কথা। লিখছি।

ছবি দেখতে যাবেন? আটটায়। ভালো ছবি। হুয়ে-নদী আটক হচ্ছে। সেই সর্বনাশা নদীর বন্দিদশা দেখবেন চোখে।

না ভাই, কোথাও নয় আজকে। চিঠি লিখব।

কত চিঠি লিখলাম গভীর রাত্রি অবধি। পর্বত-সমুদ্রের ওপার থেকে প্রণাম, প্রীতি আর আলিঙ্গন সুহৃৎ-আত্মীয়দের। দক্ষিণ-দিগন্তে পাখনা মেলে মন উড়ে চলল ভারতের দিকে।

১৬

সকালবেলা নীচে নেমেছি। ড্রইংরুম হল দিনরাতের আড্ডাখানা। মহাবিটপীবৎ। এই হোটেলের কোন খোপে কে সেঁদিয়ে আছেন, জানা সহজ নয়। ড্রইংরুমে হঠাৎ দেখা মিলে যায়। বেরোবার মুখে পরস্পরের সঙ্গে খানিকটা মোলাকাত সেরে যাই আরামপ্রদ আসনে বসে। ফিরে এসেও বসি খানিকক্ষণ। অথবা ঘুরে বেড়াই ঘরের এদিক-ওদিক—বই ও ছবির দোকানে, পোস্টাপিসে, ব্যাঙ্ক। তক্কে তক্কে বেড়াচ্ছি—কাল যাঁরা পাকিস্তান থেকে এলেন, তাঁদের পাকড়াতে হবে! অন্তত একজন-দুজন—কে কে এলেন, খবব নিতে চাই। ভিন্ন দেশ বলে আলাদা দল করে এসেছেন—তবু এতগুলো দেশের মধ্যে রক্তসম্পর্কীয় অমন আর কে? বিশেষ করে যারা পূর্ব পাকিস্তানের। আমার সাত পুরুষের ভিটেবাড়ি, জন্ম থেকে সমস্ত কিশোর কাল কাটিয়েছি যেখানে। যে গাঁয়ের খানাখন্দ, জঙ্গলে গাছগুলো অবধি মুখস্থ। ঢাকা শহরের মধ্যেই বা কত বন্ধু আমার। সে আজ বিদেশ হয়ে গেছে। ভারতের দলে আছি আমরা কয়েকজন বাঙালি—আর ও-দলেও নিশ্চয় বাঙালি এসেছেন। ভাইবাদার একত্র হয়ে মনের খুশিমত খাস বাংলায় হুল্লোড় করে বুঝব।

আচকান-পরা এক ব্যক্তি—হুঁ, চেহারা ও বর্ণে স্বজাত বলে সন্দেহ করি। তবু সাবধানে এগুনো ভালো। ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করি, এই প্রথম বোধহয় দেখলাম মশায়কে?

ইলিয়াস খোন্দাকার আমার নাম—

বাস, বাস—আবার কি! দু-হাতে জাপটে ধরি। বিনামূল্যের খাদ্য খেয়ে—বলতে নেই—গায়ে কিছু তাগত লেগেছে। সদ্য-আগন্তুক আমাদের স্ফূর্তির ধকল সামলায় কি করে? অবাক হয়ে গেছে। স্বদেশি ভাষায় তখন সাহস দিই: ঢাহার থন আইছেন—সেই ডা কন ভাইডি! জোব্বা দেখে ভড়কে যাচ্ছিলাম—বুঝি বা কোন কুবলাই খাঁ তক্তাউস থেকে নেমে এলেন।

জবাব এলো—আর, ঐ পয়লা জবানেই আমি তাঁর দাদা।

আপনি চীনে এসেছেন, ঢাকা থেকেই শুনেছি দাদা।

এবং একথা-সেকথার পর—দাদা, গরম মোজা কিনতে হবে যে একজোড়া—

হবে, হবে—সেজন্য ভাবনা কি।

এই ক'দিনে আমরা পুরোপুরি লায়েক। ছোটভাইয়ের চোখ-কান ফুটিয়ে দেওয়া সম্পর্কে দাদার বিশেষ কর্তব্য আছে নিশ্চয়ই। ঠাণ্ডা হতে বলি। পিকিন একেবারে নখদর্পণে—এমনি একটা ভাব। বললাম, সমস্ত পাওয়া যাবে ভায়া, ব্যবস্থা করে দেবো, ভাবতে হবে না।

অনতি পরেই বেরুলাম ইলিয়াসকে নিয়ে। ছেলেমেয়েগুলো বা অপর কেউ জানতে না পারে। বাহাদুরির জুত হবে না তাহলে।

হাজির করেছি বাজারের ভিতর। সারা পথ তালিম দিয়ে এনেছি। হোটেলে খাবার ব্যবস্থা কখন কি রকম, ব্রেকফাস্টে কোন কোন পদ অতি-উত্তম, দেশে চিঠি দেবার প্রক্রিয়া কি, কাপড় ধোপার-বাড়ি দিতে হলে কি করতে হবে··· । কনিষ্ঠের জ্ঞানচক্ষু-উন্মীলনে চেষ্টার কসুর নেই।

জিনিস দেখুন, পছন্দ করুন, এ-দোকানে ও-দোকানে দেখে বেড়ান—কিন্তু একদামে নাকি কেনা বেচা। ঐ যে দর সাঁটা রয়েছে, মাথা খুঁড়ে মরলেও ওর থেকে পাই-ইয়ুয়ান কমবে না।

তাই বলে তো দেমাক করছিল। দেখা যাক একটু ভাল করে বাজিয়ে।

আরও ক'জনের সঙ্গে দেখা। তাঁরাও আমাদের মতো বাজার ঢুঁড়ছেন। অবসর পেলে বাজারে ঘুরে বেড়ানো নেশার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঘুরলাম অনেকক্ষণ ধরে। লাখ পাঁচেকের জিনিস পছন্দ করেছি সকলে মিলে। দোকানিকে বলি, এত মাল গস্ত করছি, দশটা হাজার কমিয়ে দাও এর থেকে বাপু। ভদ্রলোকের মান রাখা তো উচিত। উচিত কিনা বলো?

হাত-মুখ নেড়ে প্রাণপণ করছি তো বোঝাবার। কতদূর কি বুঝল কে জানে? হাসছে মিটিমিটি। হিসাব করবার একরকম যন্ত্র আছে—তারে-বাঁধা কতকগুলো গুঁটি, ফ্রেমে বসানো। সেই গুঁটির এটা এদিকে ওটা ওদিকে দ্রুত বেগে ঘুরিয়ে কি দিয়ে কি করল—সেই দিকে চেয়ে এক টুকরো বাজে কাগজে ফসফস করে লিখে যাচ্ছে। আর আমরাও এদিকে পাঁচ আর নয়ে চোদ্দ, চোদ্দ আর সাত একুশ, একুশের এক নামে হাতে দুই রয়—এমনি করে অনেক কষ্টে যখন লাখের যোগ শেষ করলাম, দেখি নির্ভুল ওদের হিসাব। কিন্তু কি পাষণ্ড দেখুন—এক ইয়ুয়ান, যার দাম এক পয়সার পঁচাত্তর ভাগ, তা-ও বাদ দেয় নি ভদ্রলোকেদের খাতির করে। ঠোঁটের উপর ঐ একটু হাসি মাখিয়েই শোধ দিল।

রাগ করে বলি, তবে বাপু চললাম। সওদা হবে না তোমার এখানে।

তখনো হাসি। কথা না বোঝায় সুখ আছে, দেখতে পাচ্ছি। যেমনধারা দেখেছি, কালা হওয়ার দরুন সেকালের এক যশস্বী সম্পাদকের সুখ। নামটাই বলে দিচ্ছি,

জলধর সেন—আমাদের জলধর-দা। লেখা ছাপানোর তাগাদার জবাব দিতে হত না তাঁকে।

দোকানদার ইতিমধ্যে আপন মনে ক্যাশ-মেমো কাটতে বসেছে। না গছিয়ে ছাড়ল না দেখা যাচ্ছে।

দশ হাজার না হোক, নিদেন পক্ষে পাঁচ। ছাড়তেই হবে কিছু। আজকে আমরা পণ করে এসেছি।

যোগ দিয়ে ঠিক সেই আগের অঙ্কে এসেছে। তার পরে—ও হরি, বাদ দিয়ে দিল পাঁচ নয়, দশ নয়—হাজার পঁচিশের মতো। ক্যাশ মেমো সগর্বে পকেটে পুরি। দেখাব সুইং-ইঞা-মিংকে। বড় যে জাঁক হচ্ছিল, খাতির উপরোধ নেই—বোবা মানুষেও সওদা করতে পারে। কী হল এই পঁচিশ হাজার বাদ দিয়ে দেওয়া?

ক্ষিতীশ আচ্ছা জমিয়ে নিয়েছে, দেখি, ওদিকে। বাজনার দোকানে ঢুকে পরখ করছিল একটা যন্ত্র। মিষ্টি হাত। লোক জমে গেল দোকানের জানলায়। তখন গান ধরল কিঞ্চিৎ। আর যাবে কোথায়? এ ব্যাজ কিনে এনে পরিয়ে দেয়, ও এসে শেকেহ্যাণ্ড করে। তারপর বাজার থেকে বেরুল তো ভক্তদল ফিরছে পিছু পিছু। সমারোহ ব্যাপার!

জাতীয় উৎসব এসে পড়েছে। যে দিকে তাকাই, সাজসজ্জার ধুম। নতুন চেহারা খুলছে অতি-পুরানো পিকিন শহরের। এখন থেকে এই—আর সেই পরম দিনে মানুষজন কি করবে আন্দাজ করতে পারিনে।

বড় বাহার বেরুমলের দোকানের। সাজানো তবু শেষ হয় নি, নিশান টাঙাচ্ছে, তার টেনে এনে আলোর মালা ঝুলিয়ে দিচ্ছে দরজা ও কাচের শো কেশের চতুর্দিক ঘিরে। মালিক দু-ভাই ফুটপাথের উপর, নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করছেন। আমাদের দেখে হৈ চৈ করে উঠলেন, আসুন—আসতে আজ্ঞা হয়—

নাছোড়বান্দা। ভিতরে নিয়ে তুললেন। এমনই হয় দূর বিদেশে দেশোয়ালি পেলে। সেই যে বলে থাকে—কোথায় নিয়ে রাখি, ভুঁয়ে রাখলে পিঁপড়েয় খাবে, মাথায় তুললে উকুনে খাবে—এ যেন সেই বৃত্তান্ত।

চা খেয়ে যেতে হবে আজকে। খুব ভাল ভাল বস্তু খাচ্ছেন জানি—কিন্তু নিজের দেশের মতো চা করে খাওয়াবো। সে জিনিস ওরা দিতে পারবে না। বেরুমল চীনা কর্মচারী একজনকে পাঠিয়ে দিলেন উপরে। মাকে বলে এসো নিজ হাতে ভাল করে চা বানাতে কলকাতার বাবুদের জন্য।

বিস্তর জিনিস কিনেছি আজকে। তর্কাতাঁকর ঠেলায় এই দেখুন সস্তা করে দিয়েছে।

ক্যাশ-মেমো বের করে ধরলাম। বেরুমল নিশ্বাস ফেলে বললেন ছিল মশায় সে সমস্ত দিন। একটা বছর আগে এলেও কিছু কিছু নমুনা পেতেন। এখন ফাক্কাকার। মাল কেনো, দাম ফেল—ব্যস, বিদেয় হয়ে যাও। একেবারে শুকনো লেনদেন—দুটো কথা-কথান্তরেরও ফাঁক রাখেনি।

এটা কি হয়েছে তবে? হাজার পঁচিশ ডিস্কাউন্ট আদায় করে ছেড়েছি, চেয়ে দেখুন।

বেরুমল বললেন, সবাই দিচ্ছে। দোকানিদের ইউনিয়ন ঠিক করেছে, উৎসবের এক হপ্তা পাঁচ পার্সেন্ট বাদ দেবে দামের উপর। তর্কাতর্কি করে থাকেন তো কথার বাজে খরচ করেছেন মশায়। বোবা মানুষ গেলেও ডিস্কাউন্ট পাবে। ফুটফুটে একটি মেয়ে

এলো। বছর আন্টেক বয়স। নাম মায়া। এরও দিদি আছে—দু'বছরের বড়।
বেরুমল বললেন, নমস্কার করো বাবুদের।

মিষ্টি রিনরিনে গলায় মায়া বলে, নমস্তে—

তারপর চা ইত্যাদির সঙ্গে বড়টিও এসে দাঁড়াল।

কি পড়ো তুমি?

ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, হিন্দি আর চীনাও।

কি সর্বনাশ! শেল শূল গদা মুষল—শিশুপাল বধের চতুরঙ্গ আয়োজন একেবারে।

বেরুমল বললেন, ফ্রেঞ্চ ইস্কুল বলে ফরাসিটা পড়তেই হবে। তাহলে কোনটা বাদ দেওয়া যায় বলুন। দূতবাসগুলোর যত ছেলেমেয়ে ঐখানে পড়ে। ইস্কুলটা স্রেফ বিদেশীদের নিয়ে। বড় মুশকিল হয় এখানে আমাদের ছেলেপুলেদের পড়াশুনোর ব্যাপারে।

আবার গল্প জমে ওঠে। সেই আঁতের ব্যথা। ব্যাপার-বাণিজ্যের সুখ একেবারে নেই মশায়। এই মরিশন স্ট্রীটে আগে সাহেব-মেমের ভিড়ে রাস্তা চলা যেত না—এখন চৌকাঠে দাঁড়িয়ে গুণুন, গণ্ডা দুই-তিনের বেশি পাবেন না সমস্ত দিনে। শখের মাল কারা কিনবে তবে বলুন? মা-ষষ্ঠির দয়ায় এরাও অনেক। তা এরা কিনবে শৌখিন আমেরিকান সিল্ক? হয়েছে আর কি!

নীলরঙের গলাবন্ধ কোট আর পাজামা। মেয়ে-পুরুষ সকলের এক পোশাক। দামে অতি সস্তা—টাকা কুড়ির মত সাকুল্যে। সুতি জিনিস—খুব টেকসই, তুলোর প্যাড-দেওয়া শীত ঠেকানোর জন্য। সরকারি কো-অপারেটিভ দোকানে পাওয়া যায়। দূর গ্রামাঞ্চল অবধি গবর্ণমেন্ট সরবরাহ করে। দুটোতেই বছর কাবার। সান-ইয়াৎ-সেনও চেষ্টা করেছিলেন এই জিনিস চালু করতে—তিনি তত জুত করতে পারেন নি। এদের আমলে দেখুন, বিলকুল সব নীল হয়ে গেছে। তা হলে বুঝুন, আমাদের খদ্দের কোথা? দূতাবাসগুলো আছে, আর কদাচিৎ ছিটকে-আসা কেউ কেউ। আর এখন তো এসবের আমদানি বন্ধ। ভাল লাগে না—আগেকার এই মজুত মাল খতম হয়ে গেলে এতকালের পাট চুকিয়ে দুর্গা বলে ভেসে পড়ি।

মাস আন্টেক আগে—সে কী কাণ্ড—ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। পাশের দোতলা দেখছেন—এক দোকানদার ঐ ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে মরল ওদের হাতে পড়বার ভয়ে। ঘোড়া-ভেড়া সব সমান, মশায়, এ পোড়া দেশে—আপন লোক বলে খাতির-উপরোধ নেই। চোরা কারবারের দায়ে চারটেকে গুলি করে মারল—তিনটে তার মধ্যে কম্যুনিস্ট, কর্তাদের ভাইব্রাদার। মেরে ফেলল তা-ও বরং ভাল—প্রাণে বাঁচিয়ে রেখে যে দাগাটা দেয়! এক রকম আছে—প্রশ্ন করে যাওয়া। মানুষটাকে শুতে দেবে না, ঘুমুতে দেবে না—একের পর এক এসে অবিরাম প্রশ্ন। কমাদাঁড়ি নেই প্রশ্নের—দিনের পর দিন পালাক্রমে চলছে। কতক্ষণ সামলানো যায়? প্রশ্নের সাঁড়াশির টানে পেটের কথা হিড়হিড় করে বেরিয়ে আসে। এই দেখছেন কোন দিকে কিছু নেই—খদ্দের সেজে এরই মধ্যে কতবার দর-দাম নিয়ে গেছে, ঠিক কি! কার ভরসায় কি করবেন, তবে বলুন। জানে-মানে সরে পড়াই উচিত।

বেরুমলের দোকান থেকে বেরিয়ে ভাবতে ভাবতে আসছি। ঐ যে খেই ধরিয়ে দিলেন—তারপর খবরাখবর নিয়ে তাজ্জব হয়ে যাই। যা হয়ে থাকে। ক্ষমতা হাতে পেয়ে মানুষের ঠিক থাকা মুশকিল। আদর্শ ধুয়ে মুছে যায়। এক বিপ্লবী দাদাকে জানি—সারা যৌবনকালে ফাঁসির দড়ি পিছলে কোন গতিকে প্রাণ নিয়ে ছিলেন, বুড়ো বয়সে

স্বাধীনতার আমলে সেই তিনি পারমিট-বাগানোর ঘুষ। এদেশে যা হয়েছে, ওদেশে হয়ে উঠেছিল প্রায় তাই। মাথা ঘুরে গেল জন কতকের।

আর অমনি ছেড়ে দিল মোক্ষম অস্ত্র—সান-ফান অর্থাৎ তিন মানার আন্দোলন। দুর্নীতি নয়, অপচয় নয়, এবং বনেদিআনা নয়। চোরা-কারবার কুলো বাজিয়ে দেশ-ছাড়া করতে হবে ; যা নইলে নয় সেইটুকু মাত্র নেবে, জিনিসের এক কণিকা নষ্ট না হয়। আর চিরকাল ধরে এই যে বাদশাহি মেজাজ দেখিয়ে আসছে একটা দল—কাজ করবে না, অন্যের শ্রমের উপর বসে বসে খাবে, ক্ষমতা ও প্রভুত্ব আঁকড়ে থাকবে কলা-কৌশলে—সমূলে উচ্ছেদ করতে হবে তাদের অনাচার।

শাসন-শক্তি ওখানে আলাদা কিছু নয়—কোন বিশেষ অঞ্চল থেকে পুলিশ-প্রহরা চাপানো হয় না জনসাধারণের উপর। ঐ বস্তু ছড়িয়ে আছে সর্বসাধারণের মধ্যে। তোমাদের গাঁয়ের কাজ, তোমাদের পাড়ার ব্যাপার তোমরাই দেখ—কার বাপু দায় পড়েছে বাইরে থেকে চৌকিদারি করবার ? না পেরে ওঠ, পিছনে পড়ে থাকবে তোমরা। পারবে সইতে হেন অপমানের দায় ? এত দুঃখ-দহনের পরেও এমন দুর্গ্রহ ! কী লজ্জা, কী লজ্জা ! টেনে বের করো দুরাচারদের জনসমাজে। মুখে চুন-কালি দাও। সমাজের শত্রু—নতুন চীনের অগ্রগমনে পথের কাঁটা।

এই হল জনসাধারণের আন্দোলন। তখন ব্যাপারি-মহল বলে, আমরাই বা কম হলাম কিসে ? ওরা হুমকি দিয়ে কালোবাজার সামলাবে—কেন নিজেরা সাবাড় করতে পারব না আমাদের ভিতরকার কালো-ভেড়াগুলোকে ? ব্যাপারিদের নিজস্ব আন্দোলন উ-ফান অর্থাৎ পাঁচ মানা। ওদের তিন, এদের হল পাঁচ—আরও দুটো বেশি। ঘুষ দেবো না, সরকারকে ঠকাবো না, সরকারি মাল চুরি-চামারি করবো না, সরকারি গোপন তথ্য ফাঁস করবো না, ট্যাক্স ফাঁকি দেবো না।

কে কি অপকাজ করেছ খুলে বলো সরল মনে। একটা তারিখ ঠিক করে দেওয়া হল—অমুক দিনের মধ্যে নিজের ইচ্ছায় দোষ-ঘাট স্বীকার করো। তা যারা করল—দেশের সামনে হা-হুতাশ করে বলল, এমনটি আর কস্মিনকালে হবে না—বকেঝকে ছেড়ে দেওয়া হল তাদের।

ওদিকে হাঁকড়াতে লাগল খবরের-কাগজ, রেডিও, মিছিল, মিটিং-স্লোগান। উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম যে দিকে চরণ ফেলবেন—হৈ হুল্লোড় পড়ে গেছে। এই তো ব্যাপার, যে মালপত্র চেপে রেখে দুটো-পাঁচটা টাকা বেশি নিয়েছে। তা মানুষ খুন করলেও কোনো দেশে এতদূর হয় না।

এই এক মজা ওখানে—উপর ওয়ালারা এক-দোকা কিছু করে না, নিজেদের কাঁধে ভার রাখে না, সকলকে নিয়ে দল জোটায়। কেন বাপু, একলা আমাদের কি ? চোরা-কারবারের দরুন দুর্ভোগ সর্বসাধারণের নয় ? সকলে নির্বিকার আর সরকারি কয়েকটা মানুষ ঢুঁ মেরে বেড়াবে—এমন হবে কেন তাহলে ? আর পড়শিরা বিগড়ে রয়েছে—হেন লক্ষ্মীছাড়া স্থানে আর যাই হোক, কালোবাজার কক্ষনো চলতে পারে না।

মামলা দায়ের হল হাজার দুয়েকের মতো। গণ-আদালতের ব্যাপার বেশির ভাগ—কম-বেশি জরিমানা দিয়ে আসামিরা ছাড়ান পেল। কিন্তু প্রাণে মারা ওর চেয়ে বোধহয় মন্দ ছিল না। কী ধিক্কার ! এই কাণ্ডের পরে আবার কী মাথা তুলে বেড়াতে পারবে ? সমাজদ্রোহী রূপে চিরদিনের মতো দাগি হয়ে রইল।

দু-হাজারের মধ্যে প্রাণদণ্ড চার জনের। চোরা-কারবারের দায়ে গুলি করে মারা হবে। বুঝুন। আর তার মধ্যে কম্যুনিস্ট তিন জন। হয়তো ভেবেছিল আমি

শ্রীপ্রভঞ্জন শর্মা, অমুক কর্তার সঙ্গে দহরম-মহরম, মাকড় মারলে ধোকড় হবে, রাজত্ব চালাচ্ছে যখন আমাদের দল। কিন্তু হুকুম শুনে চক্ষু কপালে উঠে যায়।

কী সর্বনাশ, খুনে-ডাকাত নাকি আমরা?

হুঁ্যা। একজন দু'জন নয়—হাজারে হাজারে খুন হয়েছে। ডাকাতি এক-আধ জায়গায় নয়, লক্ষ লক্ষ বাড়িতে।

চুলচেরা হিসাব—অপকর্মের ফলে কত মানুষ খেতে পায় নি, কত খাদ্য পাতাল-পুরীর অন্ধকারে জমিয়ে রেখেছিল। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সে হিসাব জানিয়ে দেওয়া হল দেশের সর্বত্র সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে।

কম্যুনিস্ট পার্টির মাতব্বর গোছের মানুষও আছে আসামীদের মধ্যে। এ সমস্ত চাউর হয়ে গেলে দোষ তোমাদের পার্টির উপরেও পড়বে যে। শত্রুর অভাব নেই, তারা হাসাহাসি করবে—চোখ টিপে বলবে, মাছ খেয়েছে বাপু আরো কত জন, ধরা পড়েছে হাঁদারাম এই কয়েকটি মাছরাঙা। বুদ্ধিমানেরা হেন অবস্থায় চেপে যান, ধমক-ধামক দিয়ে সামলে নেন। কিন্তু ওরা গোঁয়ার-গোবিন্দ। বলে, ছিল এককালে পার্টির মানুষ—এখন পতিত। আর পার্টির চেয়ে অনেক বড় হল মহাচীন।

একজন আকুল হয়ে কেঁদে পড়ে।

পথের কুকুরের মতো তাড়া খেয়ে বেড়িয়েছি কুয়োমিনটাং আমলে, মুক্তি-সৈন্যদের মধ্যে থেকে লড়েছি, ঘর-গৃহস্থালীর দিকে চোখ তুলে তাকাই নি কোনদিন। বিবেচনা করো, আমার গৌরবময় অতীত—

মৃত্যুও গৌরবময় হোক এবার। মহাপাপের মহা প্রায়শ্চিত্ত।

পিকিন শহরে দুটো লোক প্রাণ দিল এমনি। বাহান্নর ফেব্রুয়ারিতে। এমন কিছু বেশি দিন নয়। সারা দেশের মধ্যে বাকি আর দু-জন। পঞ্চাশ কোটি মানুষের চারটি—ব্যস, এতেই একেবারে ঠাণ্ডা। কালোবাজারে লাল-বাতি। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা—ও-পথের ধুলো আর মাড়াবে?

কি অদ্ভুত পরিবেশ—দেশময় প্রায়-যুধিষ্ঠির হয়ে উঠেছে। মানুষ বটে তো। ইচ্ছে কি করে না দুটো পয়সা এদিক-ওদিক করে বেশি রোজগারের। কিন্তু জোট বাঁধে কার সঙ্গে? এমন হয়েছে, অমন চিন্তা মনের মধ্যে আনতেও ভয় করে। তা ছাড়া খাওয়া-পরা যখন মোটামুটি চলে যাচ্ছে, কিসের প্রয়োজন ঐ হাঙ্গামা-হুজ্জতের মধ্যে যাবার?

(১৭)

সেণ্ট্রাল কলেজ অব আর্টসে যাচ্ছেন জন-কয়েক। সে দলে আমার নাম নেই। অফিস-ঘরে চলে গেলাম।

লিস্টি কে করেছেন?

সেক্রেটারি বহুজন। যাকে বলি, তিনিই ঘাড় নাড়েন। শেষে টের পাওয়া গেল বন্দোবস্ত কুমুদিনী মেহতার। তিনি খেতে গেছেন। খানাঘরে অতএব হানা দিলাম।

আমায় বাদ দিলেন কেন?

একটা বাসে ক'জন ধরবে। লেখক মানুষ, লেখাপড়া নিয়ে থাকেন—ছবিও বোঝেন নাকি?

পরখ করুন। যে-ছবি সকলের গোরু বলে মনে হবে, ঠিক বলে দেবো পার্বত্য-ঝরনা; জোটো-তালগাছ যাকে বলেন, সেটা হবে বেণী-বিসর্পিণী আধুনিকা। ছবি দেখে দেখে ঘুণ হয়ে আছি।

হেসে হেসে বলছিলাম। তার পরে ঝাঁঝ এসে গেল কথায়।

শিল্পীর দেশ মহাচীন—'হুনুরে চীন'। তাদের নতুন কালের শিল্প-সাধনা চোখে দেখতে দেবেন না—সে হবে না, যাবোই আমি।

আজকে ঘুরে আসুক তো এরা। না হয় আর একদিন—

খাওয়া শেষ হয়েছিল। কুমুদিনী উঠে গেলেন। গটমট করে এক ফাঁকা টেবিলে আমি বসে পড়লাম। টাইপ-করা মেনু দিল হাতে। মেজাজ উষ্ণ—তালিকা ধরে একনাগাড় অর্ডার দিয়ে যাচ্ছি।

নিচে এসে দেখলাম, কলহের ফল ফলেছে। ছাড়পত্র মিলেছে, আমার নামও জুড়ে দিয়েছে তালিকায়।

মেয়েরাই বেশি এই ছবি দেখার দলে। দুটি মেয়ে-দোভাষিও চলেছে, একটি তো সুইং-ইঞা-মিং, আর একটির নাম—লিখে রেখেছিলাম, পেয়ে গেছি সম্প্রতি—চেন-ইয়েন।

আর দেখছি, মেয়েরাই যেন অধিক জমিয়ে তুলেছেন পুরুষদের ছাপিয়ে। রোহিণী ভাটে হলেন মধ্যমণি। তাঁর ঘরে এসে পিকিনের মেয়েরা ভারতীয় নাচ শেখে। রোহিণীও চীনা নাচ শিখে নিচ্ছেন। গানেরও এমনি পালটা-পালটি চলে। ভারত-চীনের মধ্যেকার হিমালয় পর্বত নিতান্তই নস্যাৎ করেছেন ওঁরা নাচ-গানের দাপটে।

আর ঐ গোলমেলে চীনা নামে তৃপ্ত হচ্ছে না বোধহয়। বাসের মধ্যে সেই কথা উঠল। রোহিণী বললেন, ভাই তোমাদের নাম দিয়ে দিচ্ছি আমাদের ভাষায়। সুইংকে বললেন, তোমার নাম হল উষা। চেন-ইয়েনকে বললেন, তুমি সন্ধ্যা।

ওরা হেসে খুন। উছা-উছা। বার কয়েক বলে বলে সুইং তো নতুন নাম রপ্ত করে নিল। সন্ধ্যা নামে কিন্তু আমাদের ঘোর আপত্তি। কাঁচাসোনার রঙের মেয়ে—সন্ধ্যা কেন সে হতে যাবে? দেশে ফিরে গিয়ে সন্ধ্যা কেন—নিশীথিনী, অমাবস্যা, ঘোরা তামসী—যত খুশি নামকরণ কোরো। মানাবেও চমৎকার!

সুইং বলে, মানে কি উষার? মানে জেনে খুশির অন্ত নেই। বলে, ভারি ভালো নাম—আমার বড় পছন্দ। ভারতের যা-কিছু শোনে, সমস্ত ভালো ওর কাছে। বলে, তোমাদের ভারতে যাবো আমরা। দেখতে বড় লোভ হয়। যাবো যখন, আমায় কিন্তু এই নামে ডাকবে।

তা যেন হল—কিন্তু তোমার ঐ আদি-নামের মানেটা কি, এবারে শুনি আমরা।

কিছুতে বলব না। ফিক-ফিক করে হাসে। বলে, জানি নে—

তাই কি শুনি? এমন চালাক মেয়ে তুমি—গ্রাজুয়েট হয়েছ, দুনিয়ার তাবৎ ব্যাপারের মানে জেনে বেড়াও, আর নিজের নামের মানে জানো না।

মানে নেই আমার নামের—

তখন বোঝাচ্ছি, দেখ মিথ্যে কথা বলতে নেই। বিশেষ আমরা হলাম যখন থিয়েন-চু—

আধুনিকা এরা স্বর্গনরক মানে না, থিয়েন-চু বলে ভয় ধরানো যাবে না। তবু অতিথিজনে এমন করে বলছে—বিশেষ যেগুলোকে সে অহরহ তাড়না করে বেড়ায়। সলজ্জ কণ্ঠে বলল, বিশ্রী নাম—মানে বলতে লজ্জা করে আমার। তখন এত সমস্ত কেউ তো জানত না, ফিউডাল নাম রেখেছেন বাপ-মা।

ঘাড় নাড়ে আর হাসে।

না-না, সে আমি কিছুতে বলতে পারব না।

আরও কৌতূহলী আমরা।

বলতেই হবে। ফাঁস করব না হে, কানে কানে বলো। এইও, কেউ শুনবে না তোমরা—

'সুইং ইএঞা-মি', কথাটার মানে হল, গ্লোরি অব দ্য ফ্যামিলি—পরিবারের গৌরব।

এই ব্যাপার! আমরা ভাবলাম, কি না কি! খাসা নাম হে তোমার—গৌরব করার মতোই মেয়ে তুমি।

সুইং বলে, ছোট্ট একটু গণ্ডীর মধ্যে গৌরব হয়ে থাকা। পরিবার আবার কি! ওসব বাতিল, থাকা উচিত নয়।

বোঝানো যাচ্ছে, নিখিল মানব-গোষ্ঠীই হল একটা পরিবার! তার গৌরব তুমি। এই রকম মানে করে নাও না—লজ্জার কিছু নেই।

তারপর এক সময় গভীর কণ্ঠে বললাম, আর কোন দিন দেখা হবে না, কিন্তু এই নাম যেন সত্যি হয়ে ওঠে তোমার জীবনে। এই আশীর্বাদ রইল আমার।

পীস-হোটেলে ঢুকল বাস। কয়েকটি আমেরিকান বন্ধুকে তুলে নেবো।

প্রতিশোধ নাও তুমি সুইং, ছাড়বে কেন? তোমাদের ভারতীয় নাম দিয়েছে, তোমরা পালটা চীনা নাম দিয়ে দাও এদের।

বেশ তো, বেশ তো—

রোহিণী প্রভৃতি কলকণ্ঠে উল্লাস প্রকাশ করেন।

কাকে কি নাম দিচ্ছ বলো, মুখস্থ করে ফেলি।

নাম বলতে গিয়ে মেয়ে দুটো থমকে গেল।

না, থাকগে এখন। ভেবে-চিন্তে দিতে হবে। এখন নয়, পরে।

নামকরণ হয়নি শেষ পর্যন্ত। অন্তত আমরা কিছু জানি নে।

আর্টস কলেজের মস্ত বড় বাড়ি। ঝকঝক-তকতক করছে। পরিচালকেরা এগিয়ে এসে সম্বর্ধনা করলেন। ঘরে ঘরে নানান শিল্পকর্ম। ছাত্রেরা নিবিষ্ট মনে কাজ করছে, পা টিপে টিপে সরে আসতে হয়। তারপর দোতলায় উঠলাম।

সামনেই শ্মশ্রু-সমন্বিত আমাদের আপন মানুষটি—রবীন্দ্রনাথ। বিশাল হলঘরে অগণিত ছবির ভিড়ের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ আর সর্বপ্রধান। যত অন্যমনস্ক থাকুন, নজর আপনার পড়বেই।

সুদূর চীনের জ্ঞানী-গুণীদের সমাজের গুরুদেব আজও জমিয়ে বসে আছেন, আমরা খবর রাখি নে। এদেশে-ওদেশে চিরকালের ভালবাসাবাসি—নতুন কালে সেই প্রীতি শান্তি ও সৌহার্দ্যের তিনিই দূতিয়ালি করলেন। চীন ঘুরে তাদের চিত্তজয় করে এলেন, চীন-ভবন গড়লেন শান্তিনিকেতনে—সে কতদিন আগের কথা! চিত্রপটের রবীন্দ্রনাথ প্রসন্ন হাস্যে তাঁর দেশের মানুষদের আহ্বান করলেন। শিল্পীরা নাম চু-বি-আন (Chu-bei-huang)। কবিকে শিল্পী চোখে দেখেন নি—মানস-স্বপ্ন তুলির টানে তুলে ধরেছেন।

ঘরের অবধি নেই। ঘুরে ঘুরে দেখছি। হিন্দি কথাসাহিত্যের রাজা মুন্সি প্রেমচাঁদকে জানেন, তাঁর ছেলে অমৃত রায় বিস্তর নোট নিচ্ছেন ছবি সম্পর্কে। ক্ষণে ক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়ছেন কোথাও, ধীরে সুস্থে আনন্দ-স্নান করে চলেছেন যেন রসসমুদ্রে। আমি এক পাক ঘুরে দেখে নিয়েছি ইতিমধ্যে। আবার এসে ঐ দলে জুটেছি। দোভাষি অবাক—তাদের বলবার আগেই পরিচয় দিচ্ছি। অনেক ছবির; যেটা অতি উপাদেয়, রসিক বান্ধবদের টেনে দাঁড় করাচ্ছি তার সামনে। দুই চোখের অপলক সুধাপান—বর্ণনা দিয়ে কি বোঝাব ছবির কথা। পুরানো আর আধুনিক সকল রকম

পদ্ধতিতে ছবি এঁকেছে। গ্রামে গ্রামে ছড়ানো লোকশিল্প থেকে অনুপ্রেরণা নিচ্ছে—সর্বক্ষেত্রে তার পরিচয়। আর ঐ যে ওদের নিয়ম, অকেজো বলে কোন জিনিস বাতিল হবে না—ছেঁড়া কাগজ আর টুকরো কাপড় নানান কায়দায় জুড়ে একটু-আধটু তুলির পোঁচ টেনে পুতুল, জানলার পর্দা, ফুলদানি আরও কত কি শিল্পবস্তু বানিয়েছে। উডকাটই বা কত রঙের, আর কত রকমের। দেখে তাজ্জব। নতুন-চীনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প ছবি করে ফুটিয়ে তুলেছে। কুঁড়ে মানুষ, পরের উপর নির্ভর করে বাঁচতে চায়—আজকের দিনে তার লাঞ্ছনার অন্ত নেই ; জনতা টিটকারি দিচ্ছে, মাথা নিচু করে আছে লোকটি—টিটকারির কথাগুলো যেন কানে শুনতে পাচ্ছি জনতার ভাবে-ভঙ্গিমায়।…ভূমি সংস্কার হয়েছে—চাষী এবারে জমির মালিক, ঢাকঢোল বাজছে—সেকালের বাতিল দলিলপত্র স্ফূর্তিতে ছুঁড়ে দিচ্ছে আগুনে।…একটা মজার ছবি—সরল গ্রামবাসীরা ভোট দিতে এসেছে গ্রাম-সমিতি নির্বাচনে, প্রার্থীরা সারি সারি দাঁড়িয়ে—পিছনে ভোটের বাক্স, কোন বাক্সে ফেলবে ভাবছে ভোটদাতা।…আপোসে মামলা মিটিয়ে নিচ্ছে—আর ওরা মামলা করে উচ্ছন্নে যাবে না…শ্রমিকরা নৈশ বিদ্যালয়ে যাচ্ছে।…লড়াইয়ের দুর্দিনে বাচ্চা ছেলেদের শুকনো কুয়োর মধ্যে সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখছে এক মা-জননী…

নাঃ, খাটিয়ে মেরে ফেলবে। এই ছবি দেখিয়ে আনল—রাত্রে আবার অপেরা। নাচ-গান-অভিনয়—হাজার বছরের ঐতিহ্য এর পিছনে। যে সব মানুষ অনেক কাল আগে অতীত হয়ে গেছে, তারাই রূপ উল্লাসে ঝলমল করে দাঁড়াল স্টেজের উপর। পুরানো চীনকে এরা একটুও ভোলে নি নতুন কালের ডামাডোলের মধ্যে। অপচয় ও বাহুল্যের বিরুদ্ধে এত জেহাদ—অপেরার ব্যাপারে কিন্তু দরাজ ব্যবস্থা। আলো, সাজপোশাক, বাজনা, দৃশ্যপট—মুঠো মুঠো টাকা ধুলোর মতো ছড়িয়েছে। পরে আরও অনেক পালা ও নাচ দেখেছি পুরানো বুনদের উপর আধুনিক পালাও অনেক গেঁথেছে। চীনের এই নাচ অপেরা নমো-নমো করে সারবার বস্তু নয়, মউজ করে বসা যাবে আর একদিন কি বলেন ?

(১৮)

শহর তোলপাড় বার্ষিক উৎসবের আয়োজনে। কাগজে পড়ছি, শুধু পিকিন শহর নয়—সারা চীন মেতে উঠেছে। ১লা অক্টোবর কাল। দেশের দূরতম প্রান্ত থেকে জনস্রোত অবিরল এসে পড়ছে। বাইরে থেকেও আসছে। তামাম দুনিয়ার যাবতীয় যানবাহনের বুঝি একটি লক্ষ্য—পিকিন।

সন্ধ্যায় ভোজ। ভোজ তো হামেশাই হয়ে থাকে—সে এক ভয়ের বস্তু। কিন্তু আজকে বড় স্ফূর্তি! চীন দেশটাই ধরুন ছোটখাটো এক পৃথিবী—উৎসব বাবদ তার সকল অঞ্চলের মাতব্বরা এসেছেন, তাঁরা খাবেন। যত দূতাবাস আছে ঢালাও নিমন্ত্রণ সকলের। আর তাবৎ দুনিয়ার শান্তি-সৈনিক আমরা তো আছিই। পৃথিবীর মানুষ পাশাপাশি পাত পাড়ব—নানান জাত নানান ধর্ম নানান ভাষার মানুষের একসঙ্গে পঙক্তি ভোজন।

খাওয়াচ্ছেন মাও-সে-তুং। ঐটে ভেবে দমে যেতে হয়। ভদ্রলোকের অবস্থা সুবিধের নয়—আমাদের অনেকের চেয়ে গরিব। মাইনে সর্বসাকুল্যে আটশ' (ইয়ং হিসাব দিল, জন তিনেকে আমরা কষে দেখলাম শ' আড়েকের বেশি আমাদের টাকায় কিছুতেই ওঠে না)। তাও শুনলাম, দিবারাত্রি হাড়ভাঙা খাটনি খেটে—রাত্রি একটা দুটোর আগে কোনদিন শোওয়া জোটে নি। ঐ মাইনের ভিতর যাবতীয় ঠাটবাট বজায় রাখতে

হয়। এতএব খান দুই-তিন ঘর নিয়ে বাসা, চৌপায়ায় শয্যা—আর অধিক কুলিয়ে ওঠে কি করে? এর চেয়ে প্রথম বয়সের পিকিন য়ুনিভারসিটির চাকরিটাই বোধ হয় ছিল ভাল। লাইব্রেরির কাজ করতেন ওখানে। আসল লাইব্রেরিয়ান নন। সহকারীদের একজন। ছাত্রছাত্রীরা ডেকে ডেকে দেখায় আজকে, এখানে বসতেন আমাদের মাও-তুচি, এই টেবিলে লেখাপড়া করতেন। সে আমলে যেমনটি ছিল আসবাব পত্র ঠিক তেমনি ভাবে রাখা আছে। ওদের ম্যাগাজিন আছে—যেমন থাকে কলেজে ইস্কুলে। ম্যাগাজিনের জন্য লেখা চেয়ে পাঠিয়েছিল ওরা মাও-র কাছে। আপনি পুরানো লোক এখানকার, সাহিত্যিক মানুষ—দিন আমাদের কাগজে একটা লেখা। মাও তাঁর জবাব দিয়েছেন, সময় কোথায় ভাই? সাহিত্যের পাট চুকিয়ে দিয়েছি। তোমাদের দিনকাল তোমরাই লেখো। সেই চিঠি ওরা সগর্বে দেখায় বিদেশি আগন্তুক যারা য়ুনিভার্সিটি দেখতে আসে।

তা সত্যি, ওদের মাও-তুচি সাহিত্যিক হিসাবেও খুব বড়—উঁচু দরের কবিতা-লিখিয়ে। রাজনীতির তালে না গেলে শুধু সাহিত্য করেই দেশ-বিদেশে নাম করতেন, দিব্যি বহাল-তবিয়তে থাকতেন। কিন্তু কপালের গেরো, তাছাড়া আর কি বলি! গুহার ইঁদুরের মতো উত্তর-চীনের পর্বতরন্ধ্রে কাটিয়েছেন কত কাল। যাতে ওঁদের বুলেটিন ছাপা হত সেই যন্ত্র, আর কিছু পরিমাণ সেই বুলেটিন মিউজিয়ামে রেখে দিয়েছে। দেখে হাসি ঠেকানো দায়। প্রথম স্ত্রীটাকে তো জ্যান্ত কোতল করল কুয়োমিনটাঙের লোকেরা; দ্বিতীয় স্ত্রী মরলেন আকাশের বোমায়। ঐতিহাসিক লং মার্চের দলবল যখন অতি-দুর্গম দক্ষিণ পথে ধাওয়া করেছে, সেই গোলমালের মধ্যে খতম হল দুটো ছেলে। তা বেশ—অনেকখানি হাত পা-ঝাড়া অবস্থা বলতে হবে মাও-র।

আর, কাকে ছেড়ে কার কথাই বলি। খোদ কর্তা মশাই ঐ প্রকার, তা হলে মেজো-সেজোদের দশা আন্দাজ করে নিন। চাউ-এন-লাই, চু-তে—ইনি প্রিমিয়ার, উনি কমাণ্ডার ইন-চীফ—শুনতে ভারী ভারী, বেতন কুল্যে ছ-শ তঙ্কা। আমাদের আধা-মন্ত্রীদের ওর বেশি মাইনে দিয়ে থাকি। সুন-চিন- লিং ডক্টর সান ইয়াৎ-সেনের বিধবা। কাঁচ কাঁচ চেহারা, আগুনের মতো দেহজ্যোতি—তিরিশ পেরিয়েছে কে বলবে? নতুন-চীনের জননী তো বটেই জগজ্জননী বলে ডাক পাড়তে ইচ্ছে করে। তা সে যা-ই হোন, রাজধানী পিকিনের বাস্তু দেড়খানা ঘর নিয়ে। সাংহাইয়ে সান ইয়াৎ-সেনের বাড়ি দেখেছি (এক বন্ধুর দান অবশ্য)। দোতালা বাড়ী, একটু লনও আছে—আশেপাশের বিশ-পঁচিশ তলা বাড়ি গুলোর সঙ্গে তুলনীয় না হলেও মোটের উপর ভালোই ছবির মতন। কিন্তু ম্যাডামের ফুরসত কোথা সেখানে যাবার? অহোরাত্র মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার না হয়ে যদি আটচল্লিশ ঘন্টার হত, তবে বোধ হয় দুনো খেটে ওঁরা আরও কিঞ্চিৎ সুখ করে নিতেন। এ চিত্র আমাদের অজানা নয়। গান্ধী জীবনে হাঁটু ঢেকে কাপড় পরতে পারলেন না, দিল্লি এসে জায়গা হত ভাঙা-বস্তির মধ্যে। কিন্তু স্বাধীন-ভারতে চটপট ভোল পালটে ফেলেছি! পারেন তো কোনো ঐতিহাসিক লিখে রাখুন গে সে সব দিনের কথা, ভবিষ্যতে ছেলেরা পড়বে।

সন্ধ্যাবেলা ওঁরা খাওয়াবেন। দুপুরটাই বা ন্যাড়া যায় কেন? পাকিস্তান ভায়াদের খাইয়ে দিই আমরা। আপত্তি কি, যখন স্রেফ মুফতে খাওয়ানো চলে। এক আধেলা খরচ-খরচা নেই। ওঁরা চাইবেন না, আর আগ বাড়িয়ে কড়ি গুনে দেবে এমন আহাম্মক কে আছে কলিযুগে।

চিরকাল একসঙ্গে ঘরবসত—আজকেই ভিন্নভাগ হয়ে হিন্দুস্থান-পাকিস্তান দু-

এলাকার মানুষ হয়ে দর্শন দিয়েছি। দেশে থাকতে দশ জনে দশ রকম কথায় তাতিয়ে তোলে, বিদেশে-বিভুঁয়ে সেই দশম অবতাররা নেই। খেতে খেতে অতএব মন খুলে সুখ-দুঃখের কথা চলল। এরোড্রোম অবধি ভারতীয়েরা গিয়েছিল পাকিস্তানিদের ডেকেডুকে আনতে। মন কেমন করে উঠল ভাই, মাঠের প্রান্তে আপনাদের দেখে। কত দেশের মানুষই তো এসেছে—কই, আপনারা চুপ করে ঘরে থাকতে পারলেন না তো আর সকলের মতো।

বলছিলেন—ভদ্রলোকের নাম পাওয়া গেল—মুজিবর রহমান। এই নাম তো জানি আওয়ামি লীগের সেক্রেটারির, মানুষ পাগল করে তোলেন নাকি তিনি মিটিঙে। এই এক ছোকরা, এমন সারল্য কথাবার্তায়—নাম ভাঁড়িয়ে বলছেন না তো?

কিন্তু পরিচয়গুলো মুলতুবি থাক আপাতত। জরুরি চিন্তা মগজে। পরশু থেকে শান্তি-সম্মেলন। বহুতর উৎকৃষ্ট জবান ছাড়া হবে বিশ্বজনের হিতার্থে—ঘরে ঘরে নিশিরাত্রে বক্তৃতার মক্স চলছে, অনুমান করি। আর খোদার জীব আমরাও সেই ডামাডোলে নিতান্ত অবোলা হয়ে থাকব না। কিন্তু তোড়ের মুখে হঠাৎ যদি কেউ বলে বসে, বাপু হে, ঘর সামাল করে তারপর পরের ভালো কপচাতে এসো! হিন্দুস্থান-পাকিস্তানে তোমরা যে পায়তারা ভেঁজে বেড়াচ্ছ, সেইটের ফয়সালা আগে করো দিকি।

মিলেছি যখন এই কল্যাণ-পরিবেশে, উপায় কিছু বাতলাবই। মারামারি কাটাকাটি করে যে সুহৃৎবর্গের গোপন আনন্দ জুগিয়েছি, ভাব করে ফেলে তাদের মুখে কাষ্ঠহাসি ফোটাব। ভায়ে ভায়ে ঝগড়া নিজেরাই মেটাব—বাইরে কেউ নাক গলাতে এসেছে কি নাক কেটে শূর্পণখা বানিয়ে দেব নির্ঘাত।

সত্যি, কি মিষ্টি লাগল যে সকলের কথাবার্তা! মিষ্টি লাগল সেই ভোজের ঝাল দোরমা অবধি (অতিকায় ঝাল-লংকার খোলে মাংস ইত্যাদির পুর)। দইকে বলে সাওয়ার-মিল্ক (sour milk)—ভোজের টেবিলে সেই দইয়েও যেন মধু ছিল সেদিন।

সন্ধ্যায় অনেক ধকল আছে—বিকালের বক্তৃতাদি থেকে রেহাই পাওয়া গেছে তাই আজ দেদার ছুটি—কি করা যায়? আবার কি করা যায়? আবার কি—ঘুরে ফিরে দেখে বেড়াও কালকের উৎসব-ব্যবস্থাদি। দেখে দেখে সাধ মেটে না। বেলাবেলি কিন্তু ফেরা চাই হে—সেজেগুজে যে যার ঘরে বসে থাকবে, পাক্কা ছ'টায় সময় বাসে পুরে ওঁরা অকুস্থলে চালান দেবেন। সবে তিনটে বাজল—ছ'টার অনেক দেরি। চলো।

সাহস কি পরিমাণ বেড়ে গেছে, শনুন। আমার ধুতি-পাঞ্জাবিতে দৃষ্টি দিলে রক্ষে নেই—তেড়ে তেড়ে ধরছি তাদের। হাত টেনে নিয়ে শেকহ্যাণ্ড করি। —হিন্দি, হিন্দি। ভালবাসা কুড়িয়ে টহল দিচ্ছি পিকিনের রাস্তায় রাস্তায় রাজচক্রবর্তীর মতো।

কাল জাতীয় উৎসব—যেদিকে তাকাই তারই আয়োজন। মানুষের অন্য ভাবনা-চিন্তা লোপ পেয়ে গেছে মরা-চীন নবীন মন্ত্রে মেতে উঠল এমন দিনে তিনটে বছর আগে। নেপোলিয়ন সেই যে বলেছিলেন—'চীন? ঘুমন্ত দৈত্য পড়ে থাকুক অমনি ঘুমিয়ে। জেগে যদি ওঠে—আরে সর্বনাশ! তামাম দুনিয়ার ঝুঁটি ধরে ঘুরপাক খাওয়াবে। সেই কাণ্ডই ঘটে গেল শেষ পর্যন্ত।

লাল সিল্কের উপর সোনার হরফ বসিয়ে যাচ্ছে। মূর্খ মানুষ—পড়বার ক্ষমতা নেই। কি হে, কি এত লিখলে বলো দিকি? একটুখানি পড়ে মানে বলে দাও। 'চিরকাল বেঁচে থাকুক আমাদের এত সাধের নবীন-চীন। দশ হাজার বছর বেচে থাকুক আমাদের মাও-তুচি...'

মাও-তুচি মানে হল চেয়ারম্যান মাও। কণ্ঠের সমস্ত মধু ঢেলে দিয়ে ওরা উচ্চারণ

করে। কেন জানি আমার মনে হত, প্রীতি বা শ্রদ্ধা তত নয়—বাৎসল্যের রসে কানায় কানায় ভরা কথা দুটো। চীনের তাবৎ মেয়ে-মদ্দ বাচ্চা-বুড়ো মাও সে-তুঙের মা বনে গিয়েছে। আহা, বিস্তর কষ্ট পেয়েছ তুমি মাও—আর নয় সর্বসুখ ও শান্তি আসুক এবার জীবনে। কোটি কোটি মনে অহোরাত্রি ঐ একটি কামনা।

আলো ফুল পাঁচ তারার রক্তনিশান, পীচবোর্ডের পায়রা—সমস্ত খাটিয়ে ফেলতে হবে সন্ধ্যার আগে। আনন্দ-সজ্জায় ত্রুটি না থাকে কোন রকম। রাত্রে আজ বাড়িতে বাড়িতে ভোজ। বিয়ের আগে অধিবাসের মতন উৎসবের শুরু সন্ধ্যা থেকেই বলতে পারেন।

তিয়েন-আন-মেন—স্বর্গীয় শান্তির দরজা—নতুন গাঁথনি হয়েছে তাঁর এদিকে-সেদিকে, নতুন করে রং ধরিয়েছে। হামেশাই এ পথে যাতায়াত—সকালে, সন্ধ্যায়, দুপুরে, কখনো বা রাত-দুপুরে। দিনে দিনে তিয়েন-আন-মেনের নতুন বাহার খুলছে। শরতের রোদে সমস্তটা দিন ঝিকমিক করে, আলো যেন ঠিকরে বেরোয়। শান্তির দরজা—তাই বটে। সুবিশাল অলিন্দের নিচে বড় দুয়ারটা খুলে ফেললেই বুঝি বিক্ষোভ-বেদনার সীমান্ত-পারে নিশ্চল মহিমময় শান্তি। দরজা ও পরিখা ইত্যাদির সামনের দিকটা বড় রাস্তা—পিকিনের চৌরঙ্গি বলতে পারেন। তার ওধারে অনেকগুলি পার্ক—পাঁচিল ভেঙ্গে একসা করে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত মিলে পিপলস্ পার্ক। ভেঙে চুরে প্রতি বছরই জায়গা বড় করা হচ্ছে, এবারও হয়েছে, নইলে কুলোয় না। সবুজ ঘাস বসানো হয়েছে পার্কে, আর দূরতম প্রান্তে নানা রকম ফুল। কত ফুল ফুটে আছে, দুলছে হাওয়ায়।

সারারাত আলো-আলোময় করে রাখে উৎসবক্ষেত্র। তিন শ' কুড়িটা জোরালো বাতি—সিনেমা-স্টুডিয়োয় যে ধরনের বাতি লাগে। গেল বছর যা ছিল, তা থেকে একশ' কুড়িটা বেড়েছে। মহাচীনের বহু কোটি মানুষের প্রত্যাশা কেন্দ্রিত যেন এই একটি জায়গায়। এ আলো সরিয়ে নেওয়া হবে না উৎসব অন্তে। বছরের প্রতিটি রাত্রে জ্বলবে।

শহর উৎসব সজ্জা পরেছে। কাল যা দেখেছি, সকালবেলা দেখি ভিন্ন এক রূপ। এখন আরও চমকদার। আর এই শহর জায়গা বলে নয়—শুনতে পাচ্ছি, কাগজে পড়ছি, দেশের তামাম জায়গা জুড়ে এই কাণ্ড।

দোকানের সামনে দরজায় দরজায় লাল সিল্কের গেট বানিয়েছে। চীনের ঐ চিরকালের রেওয়াজ—আমোদ-স্ফূর্তিতে এন্তার লাল সিল্ক ওড়ায়। আর বিশ-তিরিশ হাত অন্তর লাউড স্পীকার চতুর্দিকে গমগম করছে। উৎসবের বাজনাবাদ্য এবং হৈ হুল্লোড় ঘরে বসেই কানে যাবে। কিন্তু যা কাণ্ড—ঘরে থাকবে কি একটা মানুষ কালকের দিনে ?

শান্তি-সম্মেলনে দেশ-দেশান্তরের মানুষ আসছে। জল স্থল আকাশ—সকল পথে আনাগোনা। আসছে এখনও—ঐ যে ইয়ং-পায়োনিয়ররা এবং এক গাদা ফুলের তোড়া বাস বোঝাই হয়ে চলল এরোড্রোমে কিংবা রেল স্টেশনে। উঃ, এতও পারে মানুষ! হরবখত অভ্যর্থনা! একটা দল আছে শুধু অভ্যর্থনা করতে। কদিনে ফুল যা খরচ হল, শুধু সেই হিসাবটা ধরুন না! জমিয়ে রাখলে এক-পাহাড় হয়ে যেতো। দেশে দেশে মানুষের কত রং রূপ চেহারা পোশাক এবং মেজাজ থাকতে পারে, এখন এই পিকিন শহরে পদচারণা করেই অনেকটা আন্দাজ পেয়ে যাবেন। আর বাইরের মানুষ বলে কেন, চীন—একাই তো প্রায় এক পৃথিবী। পাঁচ হাজার

বছরের পাকা ইতিহাস আছে, সেই গুমরে তো বাঁচে না। কিন্তু মরুজঙ্গল ও গুহান্ধকারে হেন জাতও আছে, এই সেদিন অবধি যারা হাজার পাঁচেক বছর পিছনে ছিল। এখন অবস্থা পালটেছে অবশ্য—তারা আলোয় এসেছে। চীনা মহাজাতির সমান হকদার—আর দশটা মানুষের সঙ্গে তাদের সমান ইজ্জত।

আসছেন তা-বড় তা-বড় বীর—কৃষক বীর, শ্রমিক বীর। কোরিয়ার যুদ্ধে যারা ভলাণ্টিয়ার হয়ে গেছে, মেয়েরাও আছে তার মধ্যে—তাবৎ বিশ্বজনের কাছে তারা লড়াইয়ের টাটকা খবর ও চোখে-দেখা বৃত্তান্ত নিবেদন করবে। ইংরেজি নিউজ-রিলিজ ও সাংহাই-নিউজ দিয়ে যায় আমাদের রোজ। তার মধ্যে দেখতে পাই, পাল্লা চলেছে ফ্যাক্টরিতে ফ্যাক্টরিতে। উৎসব-ক্ষণে কাজের পরিচয় দিতে হবে না? প্রাণপাত করে খেটেছে—যে কাজ এক বছরে করবার কথা, আট মাসে তা সেরেসুরে বসে আছে। কাজ দাও, আরও কাজ, আরও পয়লা অক্টোবর তাদের পরম প্রিয় মাও তুচিকে দেখাতে চায় কে কি করেছে দেশের জন্য। মাও, তোমার পিছনে আছি আমরা—চীনের আবাল-বৃদ্ধ সকলে। তুমি যা চেয়েছ তারও এগিয়ে আছি, এই দেখ।

জিনিসপত্রের বেচাকেনা অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছে। পুজোর বাজার আর কি! আমাদের কলকাতায় এই হপ্তাখানেক আগেও যেমনটা ছিল। অনেক দুঃখ-ধান্দার পর দিন পেয়েছে—ঐ পরম-দিনে জগৎবাসীর সামনে সেজেগুজে জীবন-তারা অসামান্য হয়ে দাঁড়াবে। দাঁড়ানো বলি কেন—নেচে বেড়াবে, অফুরন্ত প্রবাহে ভেসে ভেসে বেড়াবে। দিকে দিকে তার আয়োজন।

ঘুরতে ঘুরতে মনের মধ্যে কেমন করে ওঠে। কি মাতামাতিটা করেছিলাম সাতচল্লিশ সনের পনেরই আগস্ট দিনটায়। তার পরে মিইয়ে এলো বছরের পর বছর। রীতরক্ষার মতো এক একটা নিশান—তাই বা তোলে ক'জন! মনে থাকে না তারিখটা।

হোটেলের দরজায় কুমুদিনী মেহতা। দরজা থেকে নেমে লনের এদিক-ওদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এক একবার দেখে আসছেন।

শিগগির তৈরি হয়ে আসুন। দু-মিনিটের মধ্যে।

ছ'টার দেরি আছে এখনো—

হাতমুখ নেড়ে কথা বলা শ্রীমতীর অভ্যাস। সেই ভঙ্গিতে বললেন, সময় বদলে গেছে। খবর পাঠিয়েছে, রওনা হতে হবে সাড়ে-পাঁচটায়। দুঃখ প্রকাশ করেছে এই গোলমালের জন্য।

কিন্তু সময় আছে মনে করে যারা না ফিরবেন?

যাওয়া হবে না তাঁদের—

রায় দিয়ে তর-তর করে তিনি উপরে উঠে গেলেন। সময়-বদলের খবর চাউর হয়ে গেছে এদিকে। হন্তদন্ত হয়ে সবাই ছুটছেন। একে দুয়ে তৈরি হয়ে নামতে শুরু করলেন আবার। নেমে এসে হলের ভিতর দাঁড়াচ্ছেন। সময় অতি-সংক্ষিপ্ত—এরই মধ্যে যেটুকু পারা গেছে। হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ক্রিম ঘসছেন—টেড়ি ঠিক করছেন কেউ কেউ। যে বঙ্গনন্দনকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোট-প্যাণ্ট ছাড়তে দেখি নি, তিনি দেখি ধুতি-কামিজে সেজেছেন, স্কন্ধোপরি শাল। মেয়েদের তো চেনাই দায়—এক একটি পটের পরী হয়ে আসছেন বাহারের সাজ-পোশাকে। ক্ষিতীশ বলে, কত শাড়ি বয়ে এনেছে রে বাপু, ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলানোর জন্য! তা দোষ দিলে হবে কেন—পাগড়ি বিহনে পেয়াদা অথবা খোলা বাদ দিয়ে চিংড়িমাছের কি বা থাকে বলুন? মুখের বাক্য শুনে বিতৃষ্ণা ধরলেও ঐ সাজের দৌলতে লোকে সিকি মিনিট কাল চেয়ে থাকবে

অন্তত। আজকের এই সব শাড়ি এত দিনের মধ্যে অঙ্গে ধরেন নি—তোলা ছিল পরম-দিনের জন্য। চাট্টিখানি কথা নয়—মাও-সে-তুঙের সঙ্গে এক ঘরে বসে খেতে হবে। আরও যদি কপালে থাকে, তিনি হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন শেকহ্যাণ্ডের জন্য। কিছু বলা যায় না। হাতের তলায় একটু ক্রিম ঘষে নেবেন নাকি? আমার পোশাকের কিঞ্চিৎ রকমফের আছে। বিলকুল সাদা। সাদা ধুতি পাঞ্জাবি এবং ধবধবে আলোয়ান। বলতে পারেন, কালো কালো হাত দুখানা ঐ যে বেরিয়ে রইল সাদা হাতা উত্তীর্ণ হয়ে! ছন্দপতন ঠিকই—কিন্তু আমি তার কি করতে পারি বলুন। স্রষ্টা যে অনেক উর্ধ্বে থাকেন—কৃষ্ণ হাতের নাগালের ভিতর থাকলে উত্তম রূপ পরিচয় করা যেত।

সুরলোকের ক্রিয়াকর্মে নারদ ঢেঁকি চড়ে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ করতেন—আজকের ব্যাপারেও প্রায় তাই। পাইকারি নিমন্ত্রণ সকলের। আর এক তাজ্জব—এত নিমন্ত্রণ পত্র গিয়েছে, সমস্ত হাতের চিত্রকর্ম—মাও-সে-তুঙের সই প্রত্যেকখানা চিঠিতে।

হোটেল থেকে সারবন্দি মোটরগাড়ি আর বাস চলল নিমন্ত্রিতদের নিয়ে। ডক্টর জ্ঞানচাঁদের পাশে আমি। জাঁদরেল পণ্ডিত, ভারত সরকারের অর্থনীতিক উপদেষ্টা ছিলেন—প্রদীপ তুলে চাঁদকে আমি আর কি দেখাব!

জ্ঞানচাঁদ বলেন, এক আই, সি, এস, সাহিত্যিক আছেন বাংলায়—হ্যাঁ, হ্যাঁ, অন্নদাশঙ্কর রায়ই বটে। তাঁকে আমি জানি। লেখেন কেমন? তিনি এলে বেশ হত। মতামত যা-ই হোক, চোখ মেলে দেখলে তবে বিচারের সুবিধা হয়।

জনারন্য পথের দু ধারে। কি করে অভিনন্দন জানাবে ভেবে পায় না। উল্লাস ফেটে পড়েছে তাদের চোখে মুখে। তাই তো ভাবি, কোন সে মন্ত্র যাতে সকল বয়সের মানুষকে মাতোয়ারা করে দেয়। মহাচীন, অতুলন তোমার প্রাণ-শক্তি—আশ্চর্য গতিতে এগিয়ে চলেছ সকল দিকে। সমস্ত মানি। কিন্তু আনন্দের যে প্লাবন দেখে এসেছি দেশের সর্বপ্রান্তে, সমস্ত কর্মোদ্যম ছাপিয়ে তারই হাস্যধ্বনি আজ এই লিখতে লিখতে আমার কানে বাজছে।

সেক্রেটারি দলের একজন হলেন ধর। উপাধি দেখে আন্দাজ হয়েছিল বাঙালি, ডক্টর নীলরতন ধরের জ্ঞানগুষ্টি কেউ হবেন বা! তা নয়, পাঞ্জাব-পুঙ্গব। এক তাজ্জব, হাসতে দেখি নি ভদ্রলোককে। হাসতে জানেন না, তা বলি নি; কিন্তু দন্ত চক্ষুর দর্শন-ভাগ্য হয় নি। চলতি বাসের মধ্যেই তিনি তালিম দিয়ে যাচ্ছেন সেই থেকে। নিমন্ত্রণ-চিঠি আছে তো সকলের সঙ্গে? ভাল করে দেখে নিন। পরখ করবে ওরা তন্নতন্ন করে, নামধাম দেখবে। আর আলোয়ান-ওভারকোট ইত্যাকার জবড়জং বস্তু নিয়ে ঢোকা যাবে না, বাইরে রেখে যেতে হবে···

ভয় ধরিয়ে দিলেন দস্তুরমতো; গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে শুনতে শুনতে। মাও-এর সঙ্গে এক দালানে ঢুকবার আগে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি সার্চ হবে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই! কি প্রক্রিয়ায় কতক্ষণ ধরে চলবে, সেই এক ভাবনা। অবস্থা গতিকে দোষও দিতে পারি নে। নতুন-চীন চক্ষু-শূল অনেকেরই। গোটা দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চল জুড়ে সাধুজন জগদিন্ধতায় দল পাকাচ্ছেন গা-ঢাকা দিয়ে। দুটো বছর আগে পঞ্চাশ সনের উৎসব-দিনে নায়কগণ সহ গোটা তিয়েন-আন-মেন ডিনামাইটে উড়িয়ে দেবার নিখুঁত ব্যবস্থা হয়েছিল—ব্যবস্থাপকরা তৎপূর্বে শুভার্থীর ভেক ধরে রাজ্যের আতিথ্য ভোগ করছিলেন। আজকের এই অতিথি-পল্টনের ভিতর থাকতে পারে তাদের চেলাচামুণ্ডা শিষ্য-সাগরেদ কেষ্ট বিষ্টু। মুখে হাসি—পকেটে

পিস্তল, অসম্ভব কিছু নয়। সন্তর্পণে আমি পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলাম। সকাল-বেলা নখ কেটেছিলাম—ব্লেডখানা রয়ে গেছে। সকলের অলক্ষ্যে ফেলে দিলাম সেটা—অস্ত্র রাখার দায়ে না পড়ি।

নিষিদ্ধ-শহরের এলাকা। আগের দিন হলে আপনার আমার শতেক হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। খান পনেরো বাস আমাদের নিয়ে সারবন্দি মস্ত বড় কম্পাউন্ডের মধ্যে ঢুকল। আরও কত মোটর, কত বাস এসে জমেছে। গাছে গাছে ভরা বিশাল চত্বর—বিস্তীর্ণ লেক একপাশে। জোরালো আলো দিয়েছে গাছের মাথায়—আলো ঝলমল করছে লেকের জল। গাড়ি চলছে কি নাচ চলছে—অত্যন্ত মৃদু গতিতে চলেছে লেকের কিনারা ধরে।

বাস থেকে নেমেও অনেকখানি পথ। একের পিছনে আর একজন—চলেছি তো চলেইছি। পাঁচ-সাতগজ অন্তর ফ্লাশ-আলো—একেবারে দিনদুপুর বানিয়ে তুলেছে। নিশ্চল দুটো সৈন্য—একের হাতে বন্দুক, অন্যের কোমরে রিভলবার। মানুষ না পুতুল—নেড়েচেড়ে দেখতে ইচ্ছে করে। আর একটু এগিয়ে যেতে—ওরে বাবা! হাজার খানেক হাত শানিয়ে আছে শেকহ্যান্ডের জন্য। বিদেশ-বিভুঁইয়ে এবারে প্রাণটা গেল। প্রাণ না-ই যদি যায়—এ হাতে খাবার তুলে ভোজ খাব, তার কোন আশা নেই।

এমনি করে অসংখ্য জাতি ও অগণ্য মানুষের প্রীতির পথ বেয়ে এসে পড়লাম সুবিশাল হলঘরে। আজকে ভোজনাগার—পরশু থেকে শান্তি-সম্মেলন বসবে এখানে। রাজসূয় ব্যাপার—বর্ণনা পড়ে হেন বস্তু ধারণায় আনা যায় না। লম্বা টানা টেবিল সারি সারি চলে গেছে। একটু আধটু ব্যাপার! হাঁটুন না টেবিলের এ-মাথা থেকে ও-মাথা। পা টনটন করবে। আর টেবিলের উপর থরে থরে সাজানো যাবতীয় খাদ্য ও পানীয়। গুণে দেখলাম পঁচিশ পদ তো হবেই। টেবিলের দু'পাশে নিমন্ত্রিতেরা লাইনবন্দি দাঁড়িয়েছেন। বসবার ব্যবস্থা নেই—খেতে হবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বুফে ডিনার বলে এমনি অবস্থায় খাওয়াকে। আগের দিককার জায়গা বেবাক ভরতি—সুইং ঠেলতে ঠেলতে আমাদের নিয়ে চলল। চলেছি তো চলেইছি। 'আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী?'

কিচলু দলপতি। তাঁকে রেখে দিল এদিকে—কর্তাদের সঙ্গে মোলাকাতের প্রয়োজন হবে। আর নিরামিষাশী যাঁরা—রবিশঙ্কর মহারাজ, যোশি, হোসেন, মালবীয়—এঁদের জন্য আলাদা রকমের সাত্ত্বিক বন্দোবস্ত। বন্দোবস্তু করে এ-দলেও যদি জুটতে পারতাম! পাকিস্তানিরা পিকিনে পরে এসেও দেখা যাচ্ছে, অধিক এলেমদার—ঠিক ঠিক সময়ে এসে উত্তম জায়গা বাগিয়ে বসে পড়েছেন। আর আমরা চলেছি, চলেছি—এবং চলেছি, দূরপ্রান্তের এক রঙিন দেয়াল লক্ষ্য করে।

ঠিক সাতটায় মাও-সে-তুং এলেন। সঙ্গে তাবৎ নায়কবৃন্দ। চোখে কি আর দেখেছি কিছু! কানের পর্দা-ফাটানো হাততালিতে বোঝা গেল, এসেছেন এইবার। হাজার খানেক আমরা—বেশি হব তো কম নই। নানান চেহারা, রকমারি সাজ-পোশাক। আর অগণিত ফ্লাশ-আলো একসঙ্গে জ্বলে উঠেছে, ক্লিক-ক্লিক—ফোটো তুলছে এদিক-ওদিক থেকে, ফ্লাশ-আলো নিবিয়ে দিচ্ছে তারপর। ধর বলেছিলেন, "নিমন্ত্রণ-পত্র দেখবে সার্চ করবে হলে ঢুকবার আগে। রামো! দ্বারে ঐ তো যাত্রাদলের দুই কাটা-সৈনিক, আর তাবৎ লোক এদিকে শেকহ্যান্ড ও হাততালিতে ব্যস্ত। অত হ্যাঙ্গামার ফুরসত কোথা? এই তো এলাহি ব্যাপার, অতি উৎসাহীরা আবার ঠেলেঠুলে সামনে ধাওয়া করছেন ভাগ্যবশে ফোটো উঠে যায় যদি কোন কর্তাব্যক্তির পাশে। নিদেন

পক্ষে গা-ছোঁয়াছুঁয়ি হতেও পারে! আমার ভয় ভয় করছে—এলাকাড়ি এতদূর ভাল নয় বাপু, কিঞ্চিৎ ফাঁকে-ফাঁকে থাকো। সকলের লাথিঝাঁটা খাওয়া জাতটা মাথা খাড়া করে দাঁড়াচ্ছে—বহুত জনে মুখে সাবাস দিচ্ছেন, মনে মনে কিন্তু মোটেই ভাল ঠেকছে না।

সামনের দেয়াল ঘেসে উঁচু প্লাটফরম। ফুলে ফুলে অপরূপ। আটত্রিশটা দেশের নিশান সাজানো গুচ্ছ রূপে। নিশানগুলোর উপরে শিল্পী পিকাসোর আঁকা শান্তির পারাবত। এরই উপর নাজিম হিকমত কবিতা ফেঁদে বসলেন:

আটত্রিশটা নিশান হলের ভিতর—
মহীরুহের যেন আটত্রিশ শাখা।
শাখাদলের মধ্যে পাখা ঝাপটায়
শান্তির শ্বেত-কবুতর।

আন্দাজ করেছিলাম, উঁচু জায়গাটা মাও-সে-তুঙের জন্য। ভাল করে তাঁকে দেখবে সকলে। তা নয়, শুধু পতাকা ঐ জায়গায়।

বাজনা, আলো আর হাততালি। কি এক ব্যাপার চলেছে, একজনে একরকম বলে! মাও এবার করমর্দন করছেন নানান জায়গায় মাতব্বরদের সঙ্গে···সুন-চীন-লিং মেয়েদের মধ্যে চলে গেলেন······চাউ-এন-লাই কিচলুকে কী বলছেন, ঐ দেখুন।

দেখছি না কোন কিছুই, শুধু অগণিত নরমুণ্ড।

এক ললনা—কোন দেশের জানি না, যেমন বেঁটে তেমনি মোটা—আকুলি-বিকুলি করছেন নজর খানেক মাওকে দেখে নেবার জন্য, একবার এদিক একবার ওদিক যাচ্ছেন। মনে হয়, গড়িয়ে বেড়াচ্ছেন সুবিশাল এক পিপে। তারপরে তাজ্জব কাণ্ড—সেই বস্তু টপা-টপ দেয়াল বেয়ে অত্যুচ্চ এক কুলুঙ্গি মতো জায়গায় উঠে পড়লেন। রেলিঙ ঝুঁকে পড়ে দেখছেন। নিম্নস্থ আমাদের রক্ত হিম হয়ে গেছে। বোঝার ভারে রেলিঙ ভেঙে যাওয়া বিচিত্র নয়। ওজনে নেহাত তিনটি মনও যদি হন, মাথার উপর পতন হলে নির্ঘাত চিঁড়ে-চ্যাপটা হয়ে যাবো।

তারপর দেখি, যে যেমন পারছেন—ঐ মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করছেন। মেয়ে-পুরুষ কটা-কালোয় তফাৎ নেই। মানুষের আদিপুরুষ কারা ছিলেন, এতদ্দর্শনে আর সংশয় মাত্র থাকে না! হঠাৎ মালুম হল আমি শূন্যদেশে। দিব্যি করে বলছি, ইচ্ছে করে উঠি নি—পা দিয়েও উঠেছি কি না সন্দেহ। দেয়ালে দেয়ালে ফুলের স্তবক ঝোলানো—তারই একটা দু-হাতে আঁকড়ে ধরেছি, আর পায়ের ভর কাঠ পাথর কী মানুষের মাথার উপর—আজও তা সঠিক বলতে পারব না। দেখতে পেলাম মাওকে—স্পষ্ট দেখছি আর দশজনের মতো নিচেই তাঁর আসন'। প্লাটফরম আজকে শুধু পতাকার জন্যে—ব্যক্তি-মানুষের চেয়ে পতাকা অনেক বড়।

বক্তৃতা করছেন মাও। চীনা ভাষায় বলছেন। রুশীয় এবং তার পর ইংরেজিতে তার তর্জমা হল। এক-একটা কথা—আর হাততালি ও আনন্দোচ্ছ্বাস।

'প্রিয় বন্ধুরা, সম্বর্ধনা জানাই সকলকে। মহাচীনের তৃতীয় মুক্তিবার্ষিকী এসে গেল। বিশ্বশান্তি ও লোকহিতের জন্য অতীতে আমরা কাজ করেছি, আগামী বছরে আরও অনেক কিছু করবার আশা রাখি।'

সর্বসাকুল্যে গোটা চারেক বাক্য। সবে থাম ঠেশান দিয়ে কান উঁচিয়ে জুত করে দাঁড়িয়েছি। বাস, খতম। বক্তৃতা ও তর্জমা ইত্যাদি নিয়ে সাকুল্যে মিনিট তিনেক। না মশায়, কথাতে ট্যাক্স লাগে যেন এদের! জহরলালের রাজ্যের মানুষ—নিক্তি-মাপা কথায় আমাদের সুখ হয় না। অপচয় বন্ধ—তা বলে সভাস্থলের বক্তৃতাতেও?

একজন টিপ্পনি কাটলেন, ডালকুত্তা-কুকুর এরা—ঘেউ-ঘেউ করে না, একেবারে মোক্ষম কামড় হানে।

হবে তাই। ভোজন শুরু এবারে। পানপাত্র ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে নানান জাতের মধ্যে ভালবাসা ও বন্ধুত্বের কামনা। এক চীনা ভদ্রলোক—ইংলণ্ড ও কণ্টিনেণ্টে পড়া বৈজ্ঞানিক—এগিয়ে বসে আলাপ করলেন। এমনি ঘুরে ঘুরে সকলে আলাপ-পরিচয় করছেন। বৈজ্ঞানিক একটু সুরা ঢেলে দিতে গেলেন গ্লাসে। আমরা নিলাম না। দুঃখ পেলেন বুঝতে পারছি। ম্লান হেসে বললেন, মোটেই চলবে না? ডক্টর জ্ঞানচাঁদ ও আমি লেমনেড ঢেলে নিয়ে গেলাস ঠেকিয়ে রীতি রক্ষা করলাম।

কত দেশের কত মানুষ! অনেকে আসে তীর্থযাত্রীর মতো বছরে একটিবার। আসে মাওকে দেখতে, মাওর সঙ্গে কথা বলতে। আত্মীয়-বন্ধু মরেছে লড়াইয়ে, সর্বাঙ্গে কত অস্ত্রের দাগ। সেই অতি-বড় দুর্দিনে ছিল একটিমাত্র পরম আশ্বাস, সকলের চেয়ে আপন জন, তাদের বড় আদরের মাও—মাও-তুচি। মাও আজকেও ঠিক সেদিনের মতো, একই রকমেব নীল কোর্তা গায়ে। কোন রকম বিশেষ উর্দি নেই যাতে চেনা যায়, ইনি মাও-সে-তুং—পিকিন বাজারের রামা-শ্যামা দোকানদার নয়। পরমাত্মীয়ের মতো সেকালের মানুষগুলোকে কাছে টেনে নিচ্ছেন। পরিচিত কথাবার্তা। মাওকে যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে কেউ প্রশংসা করে, মাও দেখিয়ে দেন তাদের। তাঁর একার কিছু নয়, কৃতিত্ব সকলের, মাও আলাদা নন ঐ মানুষগুলোর থেকে।

ভিড়টা এখন কিছু থিতিয়েছে। এগিয়ে গিয়ে অনেকেই মাওকে মুখো-মুখি দেখে আসছেন। অধ্যবসায়ী কেউ কেউ শেকহ্যাণ্ড করে এসেছেন, এমনও শোনা যাচ্ছে। সোয়া আটটায় মাও হল ছেড়ে চলে গেলেন।

আমাদের পাশের টেবিলে মঙ্গোলিয়ান ও উত্তর-পশ্চিম চীনের পিছনে-পড়া কয়েকটা জাত। একটি মেয়ে—হেন রঙ নেই যা তার অঙ্গের পোশাকে না আছে, তার উপর গাড়ির চাকার ধরনের পাগড়ি মাথায়। হাঁ, সাজ করতে হয় তো এমনি—মাও সে-তুঙের পরে সর্বচক্ষুর দৃষ্টি এখন মেয়েটার দিকে। এই নাকি জাতীয় পোশাক ওদের। কয়েকটা বছর আগেও শিকার করে ঝলসানো মাংস খেত। এমনি বিস্তর জাত চীনে—আজকে তাদের বড় খাতির। শ্রদ্ধার নব নামকরণ হয়েছে 'ন্যাশনাল মাইনরিটি'। যা কাণ্ড—সবুর করুন কয়েকটা বছর—পয়লা দলে টেনে ওদের তুলবেন।

চাউ-এন-লাই, দেখি, চলে এসেছেন এদিকে। চোখ মেলে দেখবার মতো। এক টেবিলের ধারে আছেন, হাত বাড়িয়ে দেন সকলকে—পাঁচ-দশখানা যা হাতের মাথায় পাওয়া গেল কিঞ্চিত ঝাঁকিয়ে দিয়ে গেলাস ঠোকাঠুকি করে গেলাসটা একটু ঠোঁটে ঠেকিয়ে চোক্ষের পলকে আর এক জায়গায়। অত বড় হলের হাজার মানুষের ভিড়ে তুড়ুক-সওয়ার হয়ে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

ডান হাত উঁচু করে কার্তিক ওদিকে তুড়িলাফ দিচ্ছে। চাউ শেকহ্যাণ্ড করে গেছেন আমার সঙ্গে—হেঁ-হেঁ, চালাকি নয়! সন্তর্পণে হাতে তুলে রেখেছে, ছোঁয়াছুঁয়িতে মহিমা এক তিল ক্ষয়ে না যায়।

আমি আরও রসান দিই, ও-হাত ধুয়ে ফেলবেন না খবরদার! ক'টা দিন বাঁ-হাতে খেয়ে নিন। দেশে ফিরে তারপর রুপোয় বাঁধিয়ে নেবেন।

নানান দেশের নানান সাজের মানুষ একখানা ঘরের মধ্যে অসংখ্য ভাষায় হুল্লোড় করছে। বসবার ব্যবস্থা নেই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হবার যোগাড়। উৎসবে কিছুতে ভাঁটা পড়ে না। পৃথিবীর যত ক্যাপা জুটে পড়েছে একটা জায়গায়?

হঠাৎ এরই মধ্যে গান ধরে বসল একজন। একজন দু-জন করে বেশ একটা দল। তারপরে আবার যাবে কোথায়—সকলকে প্রায় গানে পেয়ে বসেছে—দল তখন আর গোনাগুনতিতে আসে না। ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ, রুশীয় আর চীনা তো আছেই —আমাদের মঞ্জুশ্রী দেবী বাংলায় গান ধরলেন। কত মানুষ এসে জুটল এই বাংলা গানের দলে। কোন পুরুষে বাংলা জানে না অথচ কেমন দিব্যি ঠেকা দিয়ে যাচ্ছে। এই মানুষই জাত-বেজাত হয়ে এ-ওর বুকে গুলি মারে, এ কি বিশ্বাস হবার কথা? না, হতে পারে না—এসে দেখে যান এই গানের আসর, আপনিও দিব্যি করে সেই কথা বলবেন।

ফিরছি, অসংখ্য মানুষের তেমনি করে-মর্দন আর হাত তুলে আনন্দ-জ্ঞাপন করছে। রাস্তায় রাস্তায় সকল বয়সের মেয়ে-পুরুষের ভিড়।—কাল উৎসব—আজকে এরা ঘুমোবে না, সারা রাত পিকিন শহরে টহল দিয়ে বেড়াবে।

উৎসব-স্থানে বলেছি তো, আলোয় আলোয় দিনমান। মানুষ এখনই বোধ হয় পাঁচ সাত হাজার। (খবরের কাগজের লোক নই—কাজেই আন্দাজে বলা। ওরা নজর হেনে সঠিক বলে দেন। গুণে দেখবার উপায় নেই, অতএব ঘাড় হেঁট করে ওঁরা যা বলেন তাই মেনে নিতে হয়) বাস পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। টের পেয়ে গেছে যে ভোজের আসরের ফেরত আমরা। হাততালি দিচ্ছে। এক মা যাচ্ছেন রিক্সায় চড়ে বছর খানেকের বাচ্চা ছেলে নিয়ে। হাসিমুখে সেই বাচ্চার দু-হাত ধরে তালি দেওয়াচ্ছেন তিনি। রিক্সাওয়ালা রিক্সা থামাল একটু; হাত তুলে আমাদের অভিবাদন জানাল। যারা দূরে ছিল সচকিত হল হাত তালির আওয়াজে। রে-রে করে আসছে অভিবাদন জানাতে। ভিড় হয়ে গেল—চালাও, চালাও গাড়ি। ছুটে আসছে এদিক-ওদিক থেকে—এসে পড়বার আগে পালাও।

হোটেলে এসে স্থির হওয়া গেল না। ঘরে বসতে মন চায় না। আবার বেরুনো হল—একটা গাড়ি নিয়ে বেরুলাম কয়েকজন। আনন্দ, আনন্দ—আনন্দের লহর খেলে যাচ্ছে আলোকজ্জ্বল উৎসবমত্ত পিকিনের পথে। রোহিণী ভাটে হাতের বালা খুলে দিলেন একটা মেয়েকে। মেয়েটা যেন পাগল হয়ে উঠল—কি করবে ভেবে পায় না—গলার স্কার্ফ খুলে জড়িয়ে দিল রোহিণীর গলায়। চোখে জল বেরিয়ে আসে—মানুষ এমন মেতে যায় দরদি মানুষদের কাছে পেয়ে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ভাবের বন্যায় সারা দেশ ডুবিয়ে দিলেন। সে কেমনধারা? পুঁথিতে বর্ণনা পড়ি। উল্লসিত এই জনসমুদ্রের মধ্যে 'শান্তিপুর ডুব-ডুব ন'দে ভেসে যায়—'এই গানের কলি কেন জানি কেবলই আমার মনে আসছে।

ভোর হল। ঘুমের মধ্যেই মন নেচে ওঠে। সেই দিন আজকে, এসে অবধি যার নাম শুনেছি। যার সম্বর্ধনায় সারা চীন পাগল হয়ে উঠেছে।

ন'টা না বাজতেই তৈরি। তৈরি হয়ে ড্রইং-রুমে ভদ্রভাবে বসে থাকবার অবস্থা নেই। মন আকুলি-বিকুলি করছে। ঘড়ির কাঁটা যেন গোরুরগাড়ির চালে চলেছে। ছোট্ না রে বাপু আজকের এই দিনটা! ছুটে চল—উন্মুক্ত পথের উপর সকলে পায়চারি করছি। বাস দাঁড়িয়ে সারবন্দি। দোভাষিরা গুণছে আমাদের, নামধাম মিলিয়ে নিচ্ছে। হিসাবপত্র চুকে গেলে তখন বাসে উঠতে বলবে। যত্রতত্র উঠে পড়লে হবে না—ঠিক করা আছে, কোন নম্বরের বাস কাদের বইবে। জামার উপরে রক্তবরণ ব্যাজ। শান্তি-সম্মেলনের মহামান্য বিদেশি অতিথি, যে-সে ব্যক্তি নই—ব্যাজের উপরের সোনালী চীনা-লিপি নিঃশব্দ চিৎকারে জানিয়ে দিচ্ছে সর্বজনকে।

ভারতীয়দের জন্য দুটো বাস। তিলধারণের জায়গা আছে নিশ্চয়, কিন্তু একটা গোটা দেহ ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া একেবারে দুঃসাধ্য। হেনকালে ডক্টর কিচলু এলেন। তিনি দলপতি—সকলের সঙ্গে একাসনে নয়, আলাদা মোটরে পুরে তাঁকে চালান দেবে। রবিশঙ্কর মহারাজ সহ দলপতি এবং বুড়ো মানুষ বলে তাঁকেও নিয়ে তুলল সেই মোটরে। যেন শহুরে বিয়ের শোভাযাত্রা—মোটরে কর্তাব্যক্তিরা, বাস ভরতি চলেছি বরযাত্রিদল।

পিকিন শহরে ঘরবাড়ির গোনাগুনতি নেই; গাছপালাও তেমনি অজস্র। গাছের মাথায়, বাড়ির ছাতে, পাঁচিলের উপরে—যেখানে একটু উঁচু জায়গা সেইখানে পতাকা তুলেছে। নির্মেঘ আজ আকাশ—উজ্জ্বল রোদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কনকনে হাওয়া বইছে সকাল থেকে, হাজার হাজার রক্তপতাকা ঝিলিক দিচ্ছে যেন। হাওয়া না থাকলে এমন বাহার খুলত না! নতুন আশায় ও আনন্দে উন্মত্ত হাজার লক্ষ মানুষের মন—সেই মনগুলো যেন নতুন সূর্যের রং মেখে চোখের উপর নেচে বেড়াচ্ছে।

পিপল্‌স-পার্ক পিকিন হোটেলের অনতিদূরে—হোটেলের এই একই রাস্তার উপর। ট্রাম-লাইন রাস্তার মাঝখান দিয়ে—দু'পাশে যথারীতি অপরাপর গাড়ি চলবার জায়গা। আজকে এ রাস্তায় গাড়ি যাওয়া মানা। বাস তাই ঘুরে ঘুরে অলিগলি দিয়ে চলল। একটা মানুষ দেখছি নে বিরস-মুখ, এইটুকু জায়গা দেখছি নে সজ্জাবিহীন। ফুটপাথের উপর টুল পেতে বসে কয়েকটি বুড়ো-বুড়ি, আশেপাশে খেলা করছে বাচ্চারা। গাড়িতে বসিয়ে ঠেলছেও দু-তিনটিকে। বুড়োরা হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে আমাদের—বাচ্চারাও দেখাদেখি হাত নাড়ে। আজকে বাড়িতে আছে শুধু এরাই—ভীড়ের মধ্যে তাল সামলাতে পারবে না। বুড়োরা এইখান থেকে লাউড-স্পীকারে উৎসব শুনবে আর বাচ্চার খবরদারি করবে।

পেঁছিলাম অবশেষে। পিছন দিকে এসেছি—নিষিদ্ধ-শহরের মাঝামাঝি। সান-ইয়াৎ-সেন পার্কে বাস রাখল। পায়ে হাঁটা এখান থেকে। মোটরগাড়ি আরও কিছু এগিয়ে যাচ্ছে, মোটরওয়ালাদের কম হাঁটতে হবে।

পাথরে বাঁধানো প্রাচীন পথ। চলেছি তো চলেইছি! খানিক ডাইনে, খানিকটা বা বাঁয়ে। এগুতে এগুতে হঠাৎ পেছুতেও হচ্ছে দু-পাঁচ কদম। গোলকধাঁধা বিশেষ। রাজরাজড়ার ব্যাপার—ধরুন, পাঁচ-সাতশ' পুরস্ত্রী নিয়ে ঘরবসত। তাঁদের গতিবিধি আলাদা রকমের—নগণ্য সাধারণের মতো সাদামাটা সহজ পথে বেড়িয়ে সুখ হবে কেন?

মুশকিল এ যুগে আমাদের—পথ ভুল করে দেওয়ালে হুমড়ি খেতে হয়। মোড়ে মোড়ে তাই তীর-চিহ্ন দিয়ে পথ বাতলানো। তা ছাড়া লোকও রেখে দিয়েছে—সসম্ভ্রমে তারা গোলমেলে বাঁক পার করে দিচ্ছে। তিয়েন-আন-মেনের সামনে বাঁ-দিককার গ্যালারিতে আমাদের জায়গা—হঠাৎ এক সময় দেখি, তারই নিচে এসে দাঁড়িয়েছি। উঠে পড়ুন আর কি।

হেলতে দুলতে উপরে উঠে যে গ্যাঁট হয়ে বসে পড়বেন, সে জো নেই। দেখতে হবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। দশটা থেকে শুরু, এটা ঠিক আছে—শেষ কখন হবে, সঠিক তার হদিস পাই নি। কেউ বলে একটা, কেউ পাঁচটা। পড়া-না-পারা ছাত্রের মতো অতক্ষণ ধরে বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে থাকা। বেঞ্চিই বটে একরকম—গ্যালারির উপরে থাকে-থাকে কংক্রিটের ধাপ বেঞ্চির মতন উঠে গেছে।

এদিকে এই আমরা। আর ডাইনের গ্যালারিতে আছেন শ্রমিকবীর, কৃষকবীর; মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনারা; কোরিয়া যুদ্ধে হিম্মত দেখিয়ে ফিরেছেন যাঁরা। আর

শহীদদের মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন। নিঃসীম জনসমুদ্র সামনে। কত মানুষ হবে, দশ লক্ষ? কোস্টারিকার ছাত্র ভেগা একেবারে বসিয়ে দিল—এক লক্ষ নাকি! তুমুল তর্ক। যাদের সালিশ মানি তারা আবার নতুন এক এক সংখ্যা বলে। আরও জট পাকিয়ে যায়। ক্লান্ত হয়ে শেষটা মুলতুবি রাখা হল কালকের দিনের জন্য। কাগজে কি বেরোয় দেখা যাক। ছাপার অক্ষর তো মিছে কথা বলে না!

তা আমিই জিতলাম। ডেইলি নিউজ-রিলিজে লিখল পাঁচ লক্ষ। আমি বলেছিলাম দশ লক্ষ—প্রায় তো মিলে গেল, আবার কি!

কি সুন্দর আবহাওয়া যে আজকের! প্রসন্ন সোনালি রোদ আর সেই সঙ্গে হলুদে-সাগরের স্নিগ্ধ বাতাস। যেদিকে তাকাই—পতাকা। দিগ্‌ব্যাপ্ত পতাকার সমুদ্রে ঢেউ দিয়েছে বাতাসে! দুনিয়ার মানুষ আমরা পাশাপাশি—পাশের ইরানি ভদ্রলোক পরিচয় করলেন আমার সঙ্গে। কোথায় নিবাস, কি করা হয়, ছেলেমেয়ে ক'টি—ইত্যাকার প্রশ্ন। আমাদের গ্রামাঞ্চলে চাষীরা ভুঁয়ের আলে বসে হুঁকো টানতে টানতে পথিকজনকে যেমন ডেকে ডেকে শুধায়। এরই মধ্যে ঢুকে পড়েছেন, আবার দেখি, অস্ট্রেলিয়ান মহিলাটি। এমনি জমাটি আড্ডা এখানে-ওখানে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলছে। চলবে যতক্ষণ না নিচের ওঁরা শুরু করে দিচ্ছেন।

মুক্ত-চীনের বয়স আজ তিন বছর পুরল—এই তৃতীয় উৎসব। প্রতি উৎসবেই মনে রাখবার মতো কিছু ঘটেছে। পয়লা উৎসবে সারা চীন ঢুঁড়ে নিয়ে আসা হল পিছিয়ে-পড়া জাতগুলোর প্রতিনিধি। দু-চারটে নয়, ষাট রকম আছে এই প্রকার। চীনের মানুষ হয়েও এতাবৎ তারা পরদেশির অধম হয়ে থাকত। খানা-পিনা আদর-আপ্যায়ন আমোদ-স্ফূর্তি হল তাদের সঙ্গে। সমঝে দেওয়া হল: ভায়ারা গুহায় থাকো, ঝলসানো মাংস খাও, আর সাতরঙা পোশাকই পরো—মোটের উপর কিন্তু তাবত চীনের মানুষ এক। কেউ কারো চেয়ে কম নয়। এ পিছিয়ে থাকা আর ক'দিন? হাত ধরো দিকি—হ্যাঁ, হাতে হাত মিলিয়ে মনে মন মিলিয়ে এক হয়ে এসো, মহাজাতি গড়তে লেগে যাই। পরের বছর নানান দেশের মহামহোপাধ্যায়দের আহ্বান করা হল—দেখে শুনে আশীর্বাদ করে যান দু'বছরের নতুন-চীনকে। পুরানো আমলে কত যাতায়াত ছিল, তারপরে চীনের আপৎকালে বন্ধুত্বের পথে কাঁটা পড়ে গেল। আসুন আবার, আমরাও যাবো আপনাদের ওখানে—আসা যাওয়ায় তো মানুষের কুটুম্বিতা। এই শুভেচ্ছা-মিশনে ভারত থেকে সুন্দরলাল প্রভৃতি এবং পশ্চিমবাংলার অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী ও নির্মল ভট্টাচার্য গিয়েছিলেন।

আর এই তৃতীয় বারে এসেছি আমরা। নানা দেশের বহুতর গুণীজ্ঞানী এবং ধনীরা আছেন। আবার এমন মহাশয়রাও আছেন, যাঁদের নামের একটা বিশেষণ বলতে গিয়ে—হাতড়ে হাতড়ে শেষটা মরিয়া হয়ে বলতে হয় লেখক। অথবা সমাজকর্মী। জীবনে কোন এক বয়সে একখানা কি প্রেমপত্র লেখেন নি—নিদেনপক্ষে এক পাতা জমাখরচ? তবে লেখক হলেন না কিসে? আর চাকরি করেন কি রাজা-উজির মারেন, সমাজকে বাদ দিয়ে কোন কিছু নয়। সমাজকর্মী বললে, অতএব মিথ্যা পরিচয় দেওয়া হল না।

চুপ, চুপ! দশটা বাজল—বিপুল উল্লাসধ্বনি লক্ষ-লক্ষ কণ্ঠে। আকাশ বুঝি বা ফেটে যায়! কেন—হঠাৎ কি হল রে বাপু? আমাদের পিছন দিকে প্রধান-ফটকের অলিন্দ। মাও-সে-তুং এসে দাঁড়িয়েছেন সেখানে। সারা চীনের আনন্দ-সাগর-তরঙ্গের মতো উত্তাল হয়ে ভেঙে পড়ছে সেই অভিমুখে। তাদের মাও-তুচি! পাশে রয়েছেন

সুন-চিন-লিং। তাঁর পাশে চু-তে এবং সারবন্দি নতুন-চীনের নায়কেরা।

মিছিল শুরু। মিলিটারি ব্যান্ড। ঝকঝকে বাজনাগুলোয় রোদ পড়ে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। গুণতিতে এক হাজার। পায়োনিয়র ছেলে-মেয়ে—তারা বিশ হাজার, পরের দিন কাগজে পেলাম। চু-তে এর মধ্যে নিচে নেমে গেছেন কোন সময়—মোটর-বাইকে ভটভট আওয়াজ করে এসে আদেশ নিয়ে গেল তাঁর কাছ থেকে। সৈন্যরা মার্চ করছে—স্থল জল ও আকাশবাহিনী। অশ্বারোহী-দল—ঘোড়ার পা পড়ছে তালে তালে, খটাখট খটাখট—চলেছে তো চলেইছে। চার ঘোড়ায় টানছে কামানের গাড়ি—দু'জন করে চালক—জোড়া-ঘোড়া চালাচ্ছে প্রতি জনে। সারিতে এমনি চারখানা করে গাড়ি, চারটে কামান। লরিবোঝাই সাঁজোয়া বাহিনী আর বিমানধ্বংসী কামান। চলেছে রকেটবাহী আর কামান টানা লরি—গড়গড় করে রাস্তার উপর দিয়ে শত শত কামান টেনে নিয়ে চলেছে।

কামানের নাক উঁচিয়ে কালো কালো দৈত্যের মত ট্যাঙ্ক চলেছে সগর্জনে। মাথার উপরে প্লেনের মিছিল। আশ্চর্য বেগবান জেট প্লেন চক্ষের পলকে দিগন্তপারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। মোটর-সাইকেল চেপে যাচ্ছে নারীসৈন্যের পুরো এক রেজিমেণ্ট।

মিছিলের পুরোভাগটা এমনি। ভদ্র-সন্তানের পিলে চমকে যাবার কথা। তার পরে বন্যা এলো—বিচিত্র সাজসজ্জার, ফুলের, উল্লাসের এবং হাজার হাজার শান্তি-কবুতরের। বিদেশী দর্শক আমরা যে ভদ্রস্থ হয়ে দেখছি—নিতান্তই উপরতলায় আছি এবং ঝাঁপিয়ে পড়বার সহজ কোন রাস্তা নেই বলে। হাজার হাজার মুখের হাসি এই যে আসছে পিছনে—মিলিটারি কামান-বন্দুক উঁচিয়ে আগে ভাগে তারই যেন সতর্ক পাহারা দিয়ে ফিরছে। মাথার উপরে প্লেনের ঝাঁক বুঝি দূরবীন কষে দেখে গেল, দুশমন কেউ ঘাপটি মেরে আছে কি কোথাও।

সাদা পোশাক-পরা ভলাণ্টিয়ারদল—সঙ্গে ব্যাগপাইপ জাতীয় বাজনা। সোনার রঙের অতিকায় এক প্রতীক মাথায় তুলে ধরেছে। আসছে ফুলের তোড়া হাতে কলহাসিনী মেয়েরা—যে দিকে তাকাই ফুলের সমুদ্র। আবার আসে ভলাণ্টিয়াররা পতাকা নিয়ে। কত রং আর কত চেহারার পতাকা।

কি প্রকাণ্ড ছবি সান-ইয়াৎ-সেন ও মাও-সে-তুঙের। জনতা মাথায় নিয়ে চলেছে। অমন বিশাল মূর্তি মানুষের হয় কখনো। আমার আপনার চোখে অবাস্তব, কিন্তু চীনের কোটি কোটি নরনারীর কাছে সত্যি সত্যি এমনই বিরাট ওঁরা। সাধারণ মাপের মানুষের পাঁচ ছ' গুণ বড় করে এঁকে শিল্পীর তবু যেন তৃপ্তি নেই। ছবি আরও অনেক—কার্ল মার্কস, লেনিন, স্ট্যালিন, চাউ-এন-লাই, চু-তে···এঁরা হলেন প্রমাণ সাইজের।

আর পার্কের প্রান্তে অনেক দূরে ঐ যে ফুলের বাগান এসে অবধি দেখছি—হঠাৎ তারা দুলতে লাগল। লাল ফুল, হলদে ফুল, সবজে ফুল, সাদা ফুল—ফুলে ফুলে কিন্তু মেশামেশি নেই, চৌকো চৌকো সমআয়তনের বাগান যেন আল বেঁধে আলাদা করা। এ বড় তাজ্জব—বাগানগুলি, একের পিছনে অন্য, এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। এদেরও মিছিল—ফুলপাতা দুলিয়ে দুলিয়ে আসছে। লাল বাগান ধীরে ধীরে চলে গেল আমাদের গ্যালারি তারপর নেতাদের অলিন্দের সামনে দিয়ে। এলো তার পিছে বেগুনি, এলো হলদে, এলো সবুজ, এলো সাদা···দক্ষিণের গ্যালারির পাশে গিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ব্যাপারটা বুঝলেন? ইস্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েগুলোর কীর্তি। এতও জানে কাগজের ফুল-পাতা-ডাল বানিয়েছে। সত্যিকারের ফুল-পাতাও আছে—রং বাছাই তোড়া

বাঁধা। পাঁচ-শ' সাত-শ' নিয়ে এক একটা দল—একই রঙের ফুল-পাতা তারা ধরছে মাথার উপর। আমরা উপর থেকে দেখছি। দেখতে পাচ্ছি, মানুষ নয়—শুধুই ফুল। কাছে এসে এসে যখন মিছিল যাচ্ছে, তখনও সেই ফুল। স্বাস্থ্যে ও আনন্দে ঝলমল উৎসাহ-প্রদীপ্ত নতুন-চীনের ছেলেমেয়ে—ফুলই তো ওরা। সুবিশাল পিপল্‌স্‌-পার্কে কতক্ষণ ধরে রং-বেরঙের ফুল ছাড়া কিছু আর নেই...

আমার চোখে কিন্তু জল এলো। দোহাই পাঠকবর্গ, কথাটা ওদের কানে যেন না যায়। এত সমাদরের অতিথি—কিন্তু মন খুলে হাসতে পারি নি সেদিন তাদের আনন্দে। কোঁচার খুঁটে চোখ মুছেছি। এর আগে শুনেছিলাম ঐ পিপলস-পার্কের একটুখানি ইতিহাস। ১৯১৯ অব্দে প্রথম-মহাযুদ্ধের অন্তে রফা নিষ্পত্তি হল—জাপানিরাও ভোগ দখল করবে চীনভূমির এখানে-ওখানে। হেন উদার পরার্থপর প্রস্তাব ছাত্রদের বরদাস্ত হল না। বেরিয়ে এলো তারা এইখানে—ঐ পার্কের উপর। এক টুকরো লাঠিও নেই, একেবারে খালি হাত। এদের উপর নির্ঝঞ্ঝাটে বীরত্ব দেখানো চলে। তাই করলেন কর্তারা—সৈন্য লেলিয়ে দিলেন মিছিলের উপর। ঠিক আমাদের জালিয়ানওয়ালাবাগ—আর ঐ একই সনের ব্যাপার। পার্কের মাটি ভিজে গেল ছাত্রছাত্রীর রক্তে। আজকে নতুন কালে, দেখ দেখ, তারা সব ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে। সেই রক্তাক্ত ভূমির উপর আজকের ফুলবাগিচা। সেদিনের আর্তনাদ, শোন শোন, হাজার কণ্ঠের উচ্ছ্বসিত হাসি। ক্যান্টনের পথে ওং-ঔন সেই যে বলেছিল, মৃত্যুর জন্য দুঃখ নেই, তারা যা চেয়েছিল, পাওয়া যাচ্ছে—গরীব মেয়েটার কথাগুলো মন বড় ব্যাকুল করে তুলছে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের চেহারা ভাবছি—পিপলস-পার্কের সীমান্তে দাঁড়িয়ে। ও-বছর অমৃতসরে দেখে এলাম। সারা বিকালটা বসেছিলাম এক গাছের তলে। সে গাছে বুলেটের দাগ—সামনের বড় দেওয়ালেও দাগ ঐ রকম। ডায়ারের কীর্তি-চিহ্নগুলো পরিচায়ক-বোর্ড ঝুলিয়ে পরম যত্নে রক্ষা করছে। সে আমলে ছিল একটা মাত্র সিঁড়িপথ, যার মুখ কামান বসিয়ে আটকে ফেলেছিল। এখন দরাজ ব্যাপার—একটা দিকে পাঁচিল উড়িয়ে রাস্তার সঙ্গে একশা করে দিয়েছে হিন্দু-মুসলমানে সেই বড় দাঙ্গার সময়টা। ডায়ারের কামানে জাত বিচার ছিল না—আজাদির আমলে আমরা এজাত ওজাত করে বস্তি পুড়িয়েছি, পাঁচিল ভেঙেছি। পোড়ার দাগ, স্বচক্ষে দেখলাম, মোছেনি আজও। ডায়ারের চেয়ে আমাদের নিজ কীর্তি তবে কম হল কিসে? এক-কালের শোকবিধুর পিপলস পার্কে আজকের এই মাতামাতি, আর আমাদের জালিওনওয়ালা-বাগের প্রান্তে নিরীহ মানুষের পোড়া ভিটেগুলো সারি সারি শবদেহের মতো নিঃসাড় হয়ে পড়ে রয়েছে। হিংসার বিষে আরও কালো হয়ে এসেছি চীন থেকে—সত্যি বলছি, এত কালো এক আগে ছিলাম না।

দলের পর দল ধীর পায়ে এগিয়ে চলে—একটুকু থেকে দাঁড়ায় অলিন্দের সামনে এসে। যেখানে মাও অপর মহানায়করা। হাত তুলে পতাকা নেড়ে কুসুমগুচ্ছ দুলিয়ে তাঁদের সম্ভাষণ জানাতে ফুটফুটে এক দল মেয়ে আসছে—চুলে সবুজ ফিতে, হাতে সবুজ পতাকা। আসছে পিচবোর্ডে আঁকা শান্তির শ্বেত কবুতর বয়ে—আরে,—আকাশ ভরে গেল যে উড়ন্ত কবুতরে। আঁকা ছবি কোন ম্যাজিকে পাখনা মেলে আকাশে ওড়ে? তামাম মানুষের দৃষ্টি এবার উপর দিকে। করেছে কি শুনুন—জ্যান্ত পায়রা এনেছে কাপড়ের মধ্যে ঢেকে ঢুকে। একটা দুটো নয়—হাজার দু হাজার। মাও তুচির সামনে এনে ছেড়ে দিল। উড়ছে, উড়ছে—মুক্তির আনন্দে উড়তে উড়তে দৃষ্টির সীমানা পার হয়ে গেল।

চলেছে ঐ বেলনুন নিয়ে। উড়িয়ে দিল এক সঙ্গে নানান রঙের বেলনুন পায়রাগনুলোর মতো। ঝাঁকে ঝাঁকে বেলনুন উড়াচ্ছে পায়োনিয়র দল। কি হাত তালি, এরা যখন অলিন্দের সামনে মাও-র দিকে চেয়ে দাঁড়াল।

একটি খোকা আর এক খনুকু দনুড়দাড় ছনুটছে ফুলের তোড়া নিয়ে। উঠছে উপর-তলায়। ফুল নিয়ে এলো তাদের মাও-তুচির হাতে। ফুল দিয়ে ফিরে আসার পর তবে সে দল নড়ে সেখান থেকে। পতাকা নিয়ে উঠে গেল আর একটা দলের প্রতিনিধি। নিচের মাঠে তখন কি কলরব চলেছে আন্দাজ করে নিন। মিছিলে দলের পর দল চলেছে ফুল আর ছবির পায়রা নিয়ে, বেলনুন আর জীবন্ত পায়রা উড়িয়ে। বেলনুন ওড়াচ্ছে অবিকল আঘনুলের খোলার মতো করে, কত কি লেখা বেলনুনের গায়ে। ফুলের সমনুদ্র—আনন্দের উন্মত্ত কল্লোল। দালান-কোঠা ভেঙে ফেলবে যে চেঁচানির ঠেলায়। কি বলছে, মানেটা একটু সমঝে দেবেন কেউ? জয় হোক সর্বজাতি আর সকল মাননুষের, ব্যাপ্ত হোক বিশ্বভুবন জনুড়ে নির্বোধ আনন্দ আর নিশ্চল শান্তি!...

গ্যালারির স্বর্গধামে চড়েও ঢেঁকি এদিকে যথারীতি ধান ভেনে চলেছে। সবাই মগ্ন হয়ে দেখছে, হাততালি দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে—এ অধমেরই আতঙ্ক। ছিটেফোঁটাও ভাণ্ডারে না জমিয়ে তাবৎ আনন্দ একা একা যদি হজম করতাম, আস্ত রাখতেন কি পাঠক-সজ্জনেরা? তবে ছিটেফোঁটা নিতান্তই—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ অবস্থায় অধিক সঞ্চয় কি করে সম্ভব?

সদ্য-জোটানো ইরানি বন্ধনু হাসছেন আমার গতিক দেখে। সর্দার পৃথ্বী সিং এগিয়ে এসে বললেন, নিচে যান নি একবারও? রোদে দাঁড়িয়ে আধমরা হয়েছেন—জলটল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসনুন। লেখা দনু-দশ মিনিট মনুলতুবি থাকুক—ভুবন রসাতলে যাবে না।

গ্যালারির নিচের তলায় সারবন্দি খোপ—উঠবার মনুখে নজর করে এসেছি। তথায় চেয়ার-বেঞ্চি পাতা, সামনে টেবিল। টেবিলে গরম চা, ঠাণ্ডা মিনারলওয়াটার এবং ফলটা, বিস্কুটটারও বন্দোবস্ত আছে। যেমন আপনার অভিরনুচি। চাই কি উপরের গ্যালারিতে আদৌ না গিয়ে সাধারণ ঠাণ্ডা ঘরে বসে চা-সেবন এবং গনুলতানি করতে পারেন। কথার কথা বলছি। অতদনুর আয়েসি অবশ্য কেউ নেই কোন দলে। খররৌদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিতান্ত অপারগও হলে তবেই নিচে নামছে জিরোবার জন্য। নামলেই তো লোকসান—আমার জন্য থেমে থকেবে না উৎসব। একটা দিনের পরম দনুশ্যে নেহাত দশটা মিনিটের অঙ্গহানি হবে তো! পারতপক্ষে কে যেতে চায় তবে আড়ালে?

রবিশঙ্কর মহারাজ, অধ্যাপক শনুকলা ও উমাশঙ্কর যোশি নেমে যাচ্ছেন। মহৎ সঙ্গ ধরলাম। এসে দেখি, অধ্যাপক জৈন আর তাঁর আনন্দ-প্রতিমা মেয়েটা। নানা দেশের আরও বহনুতর ব্যক্তি। খোপের মধ্যে বাড়তি জায়গা বড় বেশি নেই।

চেয়ারে চেপে বসে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। কই-গো, গেল কোথায় ওরা। এই প্রথম দেখছি, খেজমতের লোকের অভাব। সামান্য দনু পাঁচজন আছে—তারা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। ব্যাপার কি মশায়, এদ্দিন রয়েছি—খাতির তাই কমে গেল নাকি? সেই যে এক ঘর-জামাইয়ের গল্পে আছে—পয়লা কিস্তিতে, হবিষে নয়, মাননুষে টান ধরল?

উঁহনু, ওদের দোষ—সদয় হয়ে ছনুটি দিয়ে দিয়েছেন পনুর্বাহ্নে যারা সব এখানে এসেছিলেন। সে কী কথা—উৎসব দিনে আটকে থাকবে কেন এত জন? যাও তোমরা দেখেশনুনে বেড়াওগে। হাত পা, চোখ কান আছে—আমাদের ব্যবস্থা আমরাও করে

নিতে পারব।

কেটলি ভরা চা এলো বটে কিন্তু পাত্রের অভাব। খেয়ে খেয়ে লোকে রেখে গেছে, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় পড়ে আছে। চক্রেশ তাড়াতাড়ি দুটো কাচের গ্লাস নিজ হাতে ধুয়ে নিয়ে এলো। যোশি বললেন, এঁকে দাও—বই লিখবেন। সকলের আগে দাও এঁকে, বইয়ে তোমার নাম থাকবে।

অধ্যাপক জৈন গম্ভীর মানুষ। ঘাড় নেড়ে মৃদু হেসে সায় দিলেন। অতএব সকলের আগে আমি। আর এক গ্লাস দিল শ্রান্ত ক্লান্ত এক বুড়ো ইংরেজকে। চোঁ চোঁ করে সাহেব গরম চা সরবতের মতো গিলছে।

চক্রেশ আবদারের সুরে বল্লে, আপনার বই বেরুলে আমায় পাঠাবেন কিন্তু। অবশ্যি যদি আমার নাম থাকে। নয় তো দেবেন না। নিজের নাম নেই, পরের একগাদা নাম পড়তে যাবো কি জন্য ?

কিন্তু তুমি তো বাংলা পড়তে জানো না। মিথ্যে করে যদি বলি নাম আছে তোমার—

সে আমি শিখে নেবো এর মধ্যে। বইতে নিজের নাম পড়বার লোভে।

তা সত্যি। জলের মতো ইংরেজি ও হিন্দী বলে। চীনাও শিখেছে, অল্প অল্প বলতে পারে এই তিনমাসের মধ্যে। চক্রেশের পক্ষে কঠিন নয় বাংলা শেখা।

বাপও বললেন, প্রবন্ধ বা বই যাই লেখেন, আমরা যেন পাই।

পিকিন ছেড়ে তাঁরা এখন বোম্বাইতে। তাগিদ এসে গেছে ইতিমধ্যে, কি লিখলেন ?

আবার উপরে এসে দেখি, মিছিলের ভিন্ন চেহারা। ফ্যাক্টরির শ্রমিকরা চলেছে—নীল পোশাক, হাতে হাতে লাল পতাকা আর ফুল। তাদেরই এক বাজনার দল—পোশাক হল নীল প্যান্ট, সাদা জামা, কোমরে লাল কাপড় ঝুলানো। চলেছে রেলকর্মীরা, বিশাল এক ইঞ্জিন—পিচবোর্ড কিংবা শোলার তৈরি—তাদের কাধে। ইলেকট্রিক শ্রমিক—নতুন আবিষ্কারের নমুনা লোহার জালের ফ্রেমে আটকে নিয়ে চলেছে। এক দল চলেছে ইয়াং সি নদী আটকাবার যে পরিকল্পনা হচ্ছে তারই বিরাট নক্সা বয়ে নিয়ে। ছাপখানার কর্মীরা নিয়ে চলেছে মাও-সে-তুঙের লেখা এক বই। এত বড় করে বানিয়েছে—একটা মানুষের পক্ষে সে বস্তু বয়ে নিয়ে যাওয়া দুষ্কর। দাঁড়িয়ে ছাড়া পড়া চলবে না, পাতা উল্টাবার জন্য আলাদা মানুষ ঠিক করে রাখতে হবে।

এমনি চলেছে—কত আর লিখব। এক বছরের মধ্যে তারা কি করেছে, বড় বড় হরফে তাই তুলে ধরেছে। কি বেগে এগিয়ে চলেছি চেয়ে দেখ, সকলে চক্ষু মেলে দেখছে তাবৎ বিশ্ববাসী। নব্বুই হাজার এমনি কর্মী—আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান। ত্রিভুবন থোড়াই কেয়ার করে, চলনে এমন উদ্ধত ভঙ্গিমা।

আসে এবারে চাষীর দল। যে যেখানে লাঙল চষে, সেটা এখন তাদেরই জমি। চাষীর প্রাণে সকলের বড় সাধ, এতদিনে তাই মিটেছে। কত রকম কায়দায় ফসল ফলাচ্ছে! নতুন নতুন যন্ত্রপাতি বের করেছেই বা কত! নমুনা দেখিয়ে যাচ্ছে সেই সব জিনিসের। রাক্ষুসে কুমড়ো-শশা নিয়ে যাচ্ছে। সত্যি সত্যি অত বড়, না মাটি দিয়ে বানানো কুমোরের চাক ?

এবারে অফিস-কর্মচারী, ছাত্রদল, শিক্ষকবৃন্দ। শিল্প ও সাহিত্যিকরা। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির দল। বিজ্ঞান-ছাত্রদের চিনতে পারি অতিকায় এক মাইক্রোস্কোপ নিয়ে চলেছেন, তাই থেকে।

জনস্রোতের কি শেষ নেই ? তাবৎ চীনদেশ যেন এনে জুটিয়েছে পিপলস পার্কে।

আর শৃঙ্খলা কেমন—লাইন ভাঙছে না কোন দিকে একটি মানুষ। কচি কচি ছেলে-মেয়েরা হাত ধরাধরি করে নেমে চলেছে মিছিল ঘিরে।

ছবি তুলছে নানা দিক থেকে। মোভি-ক্যামেরাও চলছে অনেক। পারবে কি বন্ধুরা মুক্তির এই রূপ ছবিতে গেঁথে রাখতে? আমার কলম তো হার মেনে নিল।

অপেরা দল চলেছে মজার পোশাকে। গায়ক বাদক আর ফিল্মের লোক—কোন শ্রেণীর কেউ বাদ নেই। গেরুয়া আলখেল্লায় চলেছেন বৌদ্ধ শ্রমণরা, সাদা টুপি মাথায় মুসলমানরা। চিত্রবিচিত্র সজ্জায় বিভিন্ন মাইনরিটি দল। এক বিপুল পৃথিবী বয়ে নিয়ে যাচ্ছে—তার উপর বিরাট শান্তি কবুতর পাখনা মেলে আছে। পৃথিবীর ঠিক সামনের দিকটায় আমাদের ভারতের মানচিত্র। পায়রার পাখা দুলছে চলার তালে তালে। পাখনার স্নিগ্ধ ছায়া সমস্ত এশিয়া অঞ্চলটা জুড়ে। খেলোয়াড়রা চলেছে—তরুণ আর তরুণীর দল। স্বাস্থ্য দেখে চোখ জুড়ায়—দৃষ্টি ফেরানো যায় না। মেয়ে খেলোয়াড়রা যাচ্ছে বিলকুল সাদা পোশাকে। ছেলেদের সাদা প্যাণ্ট সকলেরই—জামা হল, দল হিসাবে লাল হলদে আর সবুজ। পতাকার রঙও আলাদা। এক হাজার এমনি আনন্দ-মূর্তি সমান তালে পা ফেলে রূপের লহর তুলে চলেছে। মাও হাত তুলে আদর জানাচ্ছেন এই ভাবী চীনদের। মাও-র মুখোমুখি এসে গতি শ্লথ হয়—কী করবে তারা যেন ভেবে পায় না, কত রকমে মনের উল্লাস পৌঁছে দেবে মাও-র কাছে। দুটোয় মিছিল শেষ—পুরো সাড়ে তিন ঘণ্টা। তার পরেও মাও-সে-তুঙের উদ্দেশ্যে কী আনন্দোচ্ছ্বাস! সমুদ্রের আলোড়নের মতো—তার যেন শেষ নেই সীমা নেই। আর বুঝে দেখুন এ কর্তাদের অবস্থা। বেজুত ঠেকলে আমাদের নিজের খোপ আছে—তথায় ছড়িয়ে বসুন এবং যৎকিঞ্চিৎ সেবা নিন। ওদের সে জো নেই—কড়া রোদে লক্ষ চক্ষুর সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে এতক্ষণ! বারবার তাকিয়ে দেখছি, অলিন্দের ঠিক মাঝখানে মাও—নিশ্চল নিস্তব্ধ—পটে আঁকা ছবির মতন। কী ভাবছেন কবি মাও? সেই সমস্ত ছেলেমেয়ে…পথের মাঝে যাদের হারিয়ে এসেছেন, আজকের আনন্দ-দিনে যারা নেই? কিংবা সামনের দিনের আরও এক মধুরতর স্বপ্ন—নতুন চীন যেখানে গিয়ে পৌঁছবে? উৎসব শেষে এবারে তিনি ছুটোছুটি করছেন এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত—হাত তুলে চারিদিকের অগণিত মানুষকে প্রীতি সম্ভাষণ জানাচ্ছেন।

হোটেলে ফিরে গড়িয়ে পড়লাম। ধকল কম নয়—অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোকের পোষায়? ঘুমোই নি তা বলে—জেগে জেগেই দিবাস্বপ্ন।…মিছিল চলেছে বুঝি এখনো অফুরন্ত প্রবাহে—কলরোল কানে আসে। আহা, যাই হোক—এ আনন্দ না ফুরোয় যেন কোন কালে! মানুষ দুঃখ পায়, মানুষের চোখে জল আসে—আজকের এই ব্যাপার দেখে আর কে বিশ্বাস করছে বলুন? পৃথিবী এমন গরিব নয় যে মানুষ-গুলোর পেটের ভাত জোগাতে পারে না; এত সঙ্কীর্ণ নয় যে বাসিন্দাদের জায়গা দিতে পারে না। কাজ করো আর স্ফূর্তি করো ভাই—কেন মিছে ঝামেলা!

সন্ধ্যার কাছাকাছি ইয়ং এলো।

মিছিলের শেষ হয় নি, রাত্তিরেও আছে। আলো দেবে, বাজি পোড়াবে, নাচবে, গাইবে, খেলবে ছেলেমেয়েরা। আপনাদের জন্য বাসের ব্যবস্থা আছে—আমি এসে ডেকে নিয়ে যাবো।

তার মানে বাসে তুলে নিয়ে ভদ্রজন মাফিক স্থাপনা করবে গ্যালারির উপরে। খাতিরের অতিথি হয়ে উপর থেকে নাচ ইত্যাদি দেখে হাততালি দিয়ে ফিরে আসব সকালবেলার মতো। সেটি হচ্ছে না। ব্রজরাজ কিশোরের সঙ্গে যুক্তি আঁটলাম, আমরা

হেঁটে বেড়াবো। হাঁটতে হাঁটতে মিশে যাবো উল্লসিত জনতার সঙ্গে। সে আনন্দ আমাদের তো ধারণায় আসে না। ওদের সঙ্গে মেশামেশি করে গায়ে গা ঠেকিয়ে ওদের মনের স্ফূর্তির একটুখানি ছোঁয়াচ নিয়ে দেশে ফিরব।

ইয়ং-এর সাড়া পেয়ে কাতরাচ্ছি, বিষম মাথা ধরেছে রে ভাই—হ্যাঁ, দুজনেরই। যন্ত্রণায় ছটফট করে এতক্ষণ পরে একটু বুঝি চোখ বুজেছেন—ডেকো না কিশোর মশায়কে।

বিশ্রাম নেবার যথাযথ উপদেশ দিয়ে ইয়ং অগত্যা চলে গেল। দরজা ফাঁক করে করিডরের এদিক-ওদিক দেখে নিঃসন্দেহ হই। গেছে চলে সকলেই—সাততলা হোটেল-বাড়িতে সব ঘর ফাঁকা। একশ-পাঁচ নম্বর রুমের আমরা দুই ষড়যন্ত্রী এইবার জামা-কাপড় পরে বেরুবার তোড়জোড় করছি।

পৌনে আটটা। পায়ে হাঁটা—অতএব বড়-রাস্তা দিয়ে যেতে বাধা নেই। চতুর্দিক কি আলোয় সাজিয়েছে রে। আমাদের হোটেল-বাড়িটারই বা কি রূপ—লনে বেরিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। এখন দাঁড়িয়ে থাকার মুশকিলও কিছু নেই—ফাঁকা লন হা হা করছে, সব গিয়ে জড়ো হয়েছে তিয়েন-আন-মেনে। লাউড-স্পীকারে দ্রুততালের বাজনা—ফ্লাশ-লাইটের প্লাবন বইয়ে দেওয়া হচ্ছে ঘন ঘন। বুকের ভিতর নাচিয়ে তোলে। ঘরের মধ্যে হেন অবস্থায় কে পড়ে থাকবে—শহরের কোন বাড়িতে বুঝি একটা মানুষ নেই। বাচ্চা ছেলে মেয়েরা হাত ধরে, কোনটাকে বা কোলে কাঁধে তুলে চলেছে বাপ মায়েরা। একটা পুলিশের টিকি দেখতে পাই না—অথচ সবাই কেমন নিয়ম মেনে চলেছে। এতটুকু বেচাল নেই কোন দিকে।

শোঁ শোঁ করে বাজি উঠছে আকাশে—লাল সবুজ হলদে তারা কাটছে। এক কনফারেন্সে ওদের ঔপন্যাসিক মাও-তুন বক্তৃতা করছিলেন, দেখ হে—বারুদ আমরাই আবিষ্কার করেছি, কিন্তু তাই দিয়ে বানালাম শুধু আতসবাজি—বাজি দেখিয়ে মানুষকে আনন্দ দিলাম। সেই বারুদ কামান বন্দুকে পুরে মারণ কর্মে লাগাল অন্য জাত। ঠিক তাই, তাবৎ বিশ্ব বাজির হাতে-খড়ি নিয়েছে চীনের কাছ থেকে। আদি আমল থেকে হালফিল অবধি বহুত রকমের বাজি তৈরি করেছে, তারই নমুনা ছাড়ছে। মুহুর্মুহু হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে মানুষজন ফুটপাথের উপর বসে পড়ে বাজি দেখছে।

বিপুল এই জনারণ্যের মধ্যে এতটুকু ময়লা কি একটুকরো ছেঁড়া কাগজ বের করুন দিকি। দগ্ধাবশেষ সিগারেট হাতে নিয়ে চলেছি—খুঁজে পেতে আবর্জনার জায়গা না পাই তো শেষ অবধি পকেটে পুরে ফেলতে হবে। যত এগোচ্ছি ভিড় এঁটে আসে। সকলে তাকাতাকি করে আমাদের দিকে—বিশেষ করে আমার পোশাকের প্রতি। হিম-রাত্রিতে লম্বা ওভারকোট চাপিয়ে অনেকখানি তবু ঢেকে দিয়েছি। বুকে ব্যাজ——কৌতূহলীদের চোখের উপর সগর্বে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াচ্ছি, পড়ে দেখ সোনার অক্ষরে কি লেখা। দেখছ কি—রবাহূত নই—বড় কর্তাদের নিমন্ত্রণে সকালবেলা ঐ ঊর্ধ্বলোকে ছিলাম। ইচ্ছে করলে এখনো এক লহমায় উঠে বসতে পারি। দর্শন ও পঠন অন্তে নর নারী ঘাড় নেড়ে অভিনন্দন জানায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মজা পেয়ে গেছে—ঘিরে ধরছে আমাদের। কচি কচি হাত টেনে আচ্ছা করে মলে দিচ্ছি। কত খুশি?

খিল খিল করে হাসছে মুখের দিকে চেয়ে। বালখিল্যের আরও নতুন নতুন দল হাত বাড়াচ্ছে নিচের থেকে।

নাচছে এক এক জায়গায়। মানুষ জমে গেছে—বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে দেখছে। নৌ সৈন্যের সঙ্গে নাচছে মেয়েরা। বড় বড় মেয়ে—কলেজের ছাত্রী হয় তো। পবিত্র নিষ্পাপ

—মুখ আর হাসি দেখে কণ্ঠের গান শুনে সাধ্য কি আপনি অন্য কিছু ভাবেন! আনন্দের বন্যায় সকলে এক। এক মানুষে ও আর এক মানুষে তফাত আছে—কোন মূঢ় আজ উচ্চারণ করবে হেন বাক্য! কানামাছি খেলছে এক জায়গায়। এমনি কত। কাছে এসে আল গোছে কাঁধে হাত ঠেকাচ্ছে, কথা তো বুঝব না—নির্বাক ভালবাসা জানিয়ে যাচ্ছে এমনি করে। বিদেশী আমরা দু জন নিঃসীম এই জনসমুদ্রে দুটো বারিবিন্দুর মতো মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছি।

অথচ, বছর পাঁচ সাত আগেকার খবর নিন—কেমন ছিল এখানটায়? গা ঘিন ঘিন করবে শুনে। কালোবাজারির চাঁদনি-চক—ফাটকা জুয়ার আড্ডা। সন্ধ্যের পর নরক গুলজার—পৃথিবীর যত নোংরামি ও সামাজিক পাপের কথা জানা আছে, সমস্ত একখানে। সে সব ভেঙে এখন চুরমার করে দিয়েছে। ছোট পা পঙ্গু-মেয়ে আর লাস্যবতী পণ্য মেয়ে নেই, খুনি বোম্বেটে, পিঠ-কুঁজো কুলিও নেই—নতুন মানুষ এরা।

একটা নৃত্য চক্রের পাশে দাঁড়িয়ে দেখছি। কয়েকটি হঠাৎ এগিয়ে এলো। হাত ধরে টানছে। একটু না-না করি। কিন্তু হাতের আর ভালবাসার টান—সাধ্য কি এড়িয়ে পালাব! নাচের মধ্যে গিয়ে পড়লাম। কি হাততালি। আমরা দু'জনও হাততালি দিই। তার পরে, ও হরি! নাচতে বলছে তাদের সঙ্গে। আকারে ইঙ্গিতে বলে, তবু বুঝতে আটকায় না। কিন্তু সাহসটা কি—আমরা কি দূরের মানুষ, অবোধ ছেলেমেয়েরা ঠাহর পাচ্ছে না। কথা বুঝবে না—ঠাহর করাই বা কি করে? আবার দেখিয়ে দিচ্ছে, কেমন কায়দায় নাচতে হয়। আসরের মধ্যেই নাচের ক্লাস। নৃত্য গুরুর বয়স—তা বছর দশেক হবে বই কি! পরম গাম্ভীর্যে আনাড়ি ছাত্রদ্বয়কে হস্ত পদ চালনার প্রণালী শেখাচ্ছে। নেশা লেগে গেল। আহা, এই সুদূর দেশে এদের মধ্যে আবার একটা দিন কয়েকটা মুহূর্তে যাই না কেন ছেলেমানুষ হয়ে! কে দেখছে যে মহাবিজ্ঞ অমুক মহাশয় শিশুসুলভ চাপল্যে মত্ত হয়ে পড়েছেন! গিয়েই ভালমানুষ হয়ে শুয়ে পড়ব। কাল থেকে শান্তি-সম্মেলন—অনবসর কর্মপ্রবাহ, তাবৎ বিশ্বভুবনের জন্য দুশ্চিন্তা, তার মধ্যে কেউ খোঁজই পাবে না এক রাত্রের এই ক্ষণিক মতিবিভ্রম।

আমি নাচছি, নাচছেন ব্রজরাজ। ঢেঙা মানুষ তিনি, মাথায় চকচকে টাক—আর আমি কিঞ্চিৎ গায়ে-গতরে আছি। সিনেমা-ছবিতে লরেল-হার্ডিকে দেখে থাকেন, ধরে নিন তেমনি একটি জোড়া। বিলাতি পোশাক বলে ব্রজরাজের কিছু বাঁচোয়া। আমার আবার একখানা হাত সতত কোঁচা ধারণ করে আছে। নাচের বাহার আন্দাজ করে নিলেন তো রসগ্রাহী পাঠক-সুজন? এতেই রক্ষা নেই—একের পর এক আসছে হাত ধরে এক একপাক নাচবার জন্য। বাজনা বাজছে, গাইছে সকলে। কি গান বুঝিনে—একই কথা বারংবার আবৃত্তি করে যাচ্ছে। আমরাও করছি তাই। একটা ছোট মেয়ে—মাথায় লাল রিবন—তিড়িং করে এসে পড়ল আমাদের চক্রের মধ্যে। পঞ্চাশ আর পাঁচে হাত-ধরাধরি করে ঘুরঘুর করে নাচছি। সে তাণ্ডব দেখলেন না চোখে—লেখা পড়ে কি মজা পাবেন! আবার ভুল বাতলে দেয়—অমন নয়, পা ফেল, এমনি-এমনি করে। আরো বেতালা হয়ে যাচ্ছে আপনাদের কথা স্মরণ করে। হেন নৃত্যের পর আপনারা হলে কি কাণ্ডটা করতেন—টিটকারি না-ই দিলেন, হেসে ফেটে পড়তেন। অথবা মুখে কাপড় দিয়ে প্রাণপণে হাসি চাপতেন—সেইটে হল আরও মারাত্মক। আর এই বাচ্চার দল, দেখুন, ভারি ভদ্রলোক—মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, শ্রদ্ধা সম্ভ্রম আর আনন্দ জ্বলজ্বল করছে মুখের উপর।

এমনি ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম কতক্ষণ। আবার এক জায়গায় গ্রেপ্তার করে আসরে

নিয়ে দাঁড় করাল—নাচতে হবে। অত ফেলনা নই বাপু, যে বললেই অমনি নাচতে লেগে যাবো। এখন মনে হচ্ছে, নেচেছি নিশ্চয় উত্তম। দেখে তাক লেগে গেছে, তাই এমনিধারা পশ্বার। এই মওকায় কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করবঁ নাকি পিকিন অপেরা দলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে? সে অবশ্য পরের কথা, আপাতত এক নাচনেই হাঁপিয়ে পড়েছি—প্রাণপক্ষী পঞ্জর-পিঞ্জরের মধ্যে পাখা ঝাপটাচ্ছে। দু হাত নেড়ে সোজা বেকবুল যাই। হবে না—কোন উপায় নেই। ওরাই আমাদের ঘিরে নাচে তখন। স্বপদে না নাচলেও হাততালি দিয়ে তাল রাখছি। তালমাত্রায় কেমন পরিপক্ক হয়ে গেছি, এই আধঘণ্টাখানেকের ভিতর। বাজিতে বাজিতে আকাশে আগুন ধরবার যোগাড়। চাঁদ হাসিছে। নাক-ঢাকা পরে ঘুরছে অনেকেই—বারুদের বাতাসে নিশ্বাস নিলে স্বাস্থ্য খারাপ হবে। এই স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য করেই এরা মরবে—আমি নিরঙ্কুশ কেমন দেখুন দিকি!

রাত অনেক হয়েছে, উৎসবের তবু ক্ষান্তি নেই। ফিরে আসছি আনন্দোন্মাদ জনতার মধ্যে দিয়ে। এ ছবি আর কোথাও দেখব! মানুষে মানুষে এমন মেশামেশি, নিশিরাত্রে একসঙ্গে গাইছে বড় বড় ছেলে আর মেয়ে। হাত ধরাধরি করে নাচছে—

ব্রজরাজ জিজ্ঞাসা করেন, কেমন দেখলেন?

'স্বর্গীয় শান্তির দরজা' ঐ সামনে—এই তো স্বর্গধাম!

কি বলেন, স্বর্গ তো মানেই না এরা—

পাঁকের জীব আকাশের দিকে হাত বাড়ায়। স্বর্গের উল্লাস মাটিতে যারা নিয়ে আসছে, আর-এক স্বর্গ কি করবে তারা?

আরও খবর পাচ্ছি ক্রমশ। ক্ষিতীশ গায়ক মানুষ—কাঁধে কাঁধে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে তাকে। গাইতে গাইতে গলা ভেঙে সে ফিরল। রোহিনী ভাটে আর চক্রেশও পাগল হয়ে নেচে বেড়িয়েছেন। সবাই ফিরছেন হোটেলে। নেচেকুঁদে রাক্ষসের খিদে নিয়ে আসবে—ঘরে ঘরে এক গাদা করে স্যাণ্ডউইচ আর কলা-আঙুর-আপেল দিয়ে গেছে। দেড়টা বাজল, রাস্তার বাজনা শুনতে পাচ্ছি এখনো। সারা রাত্রি এমনতরো মচ্ছব চলবে নাকি?

এখন একটা চিন্তা। আজকের বৃত্তান্ত দেশে ঘরে না পেঁছায়! এমনি তো সভায় সভায় কূল পরিমাণ—সাহিত্য-ব্যাপার আছে, চীনের কথা শোনবারও বিস্তর হুকুম আসবে। কত আর অজুহাত রচনা করা যায় বলুন! না না করেও হাজির হতে হবে বহুত গুণীজন সামনে। এর উপর নাচের খবর প্রচার হয়ে গেলে মারা পড়ব! পিকিন-রাস্তায় নেচে এসেছি—অতএব বক্তৃতাদি অন্তে সুনিশ্চিত নৃত্যের ফরমাস হবে। আমার শত্রু বাড়বে—পেশাদার নাচিয়েরা ভাববেন, চীন থেকে ফিরে এই বুঝি আবার এক নতুন লাইন ধরল। তা আমিও সঙ্কল্প করেছি, সে নাচ কিছুতেই দেখাবো না আপনাদের। রাগ করলে নাচার। বলবার কথা আছে—এনে দিন আমার সেই দেব-শিশু নৃত্যসঙ্গী ও সঙ্গিনীদের। আর দশ বছরের সেই নৃত্যগুরুকে—পা ফেলবার কায়দাগুলো যে বাতলে দেবে। আর সেই পিকিন-পথের রসিক দর্শককুল—মাধুরীময় দৃষ্টি দিয়ে যারা অভিনন্দন করবে। দিলখোলা খুশির প্রবাহ চতুর্দিকে; আকাশে চাঁদ, আলো, আতশ-বাজি ও বাজনায় মর্তলোকে ইন্দ্রপুরী। পারবেন জোটাতে এত সব? তবে রাজি আছি। নয় তো সে-ই আমার জীবনের প্রথম নাচ এবং সে-ই শেষ!

এইখানে একটু দাঁড়ি টানি। প্রথম পর্বের ইতি। কাল দোসরা অক্টোবর—মহাত্মাজীর জন্মদিন। প্রত্যুষে তাঁর স্মৃতির আরাধনা। রবিশঙ্কর মহারাজ পুরোধা। শান্তি-সম্মেলনের শুরু তার পরে। আমার চীনের কাহিনীর পরের অধ্যায়।

প্রায় একটানা প্রশংসা চলল এত দিন। নিজেরই লজ্জা করছে। নিছক ভালো ভালো বস্তু নিয়ে ধর্মব্যাখ্যা হতে পারে, কাহিনী জমে না। থাকত দেবাসুর অথবা সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব—আপনারা রোমাঞ্চিত কলেবরে পড়তেন। বুঝি—সমস্ত বুঝি। আর ভেবেওছিলাম, দিই এক আধটা কাল্পনিক ভিলেন ছেড়ে কাহিনীর মধ্যে। কিন্তু সেই যে যাত্রা-মুখে কয়েকটি তরুণ বন্ধুকে কথা দিয়েছিলাম, নিজের চোখে-দেখা জিনিস ও অন্তরের উপলব্ধি হুবহু লিখব—তাই কাল হয়েছে। মন্দ মানুষ তবে কি কুলো বাজিয়ে একেবারে দেশ ছাড়া করেছ? এতখানি বিশ্বাস করি নে। সে ভরসায় যথাযথ খোঁজাখুঁজিও করলাম। কিন্তু তাঁরা এমন গা-ঢাকা দিয়ে রইল যে, কোন রকম পাত্তা পাওয়া গেল না। অদৃষ্ট আমার—আর কি বলব। খোঁজ পেলে তো লেখা মজাদার করা যেত। চীনকে যারা নখের উপর তুলে টিপে মারতে চান সেই মহদাশয়েরাও কিঞ্চিৎ স্ফূর্তি পেতেন।

প্রথম পর্ব শেষ

দ্বিতীয় পর্ব

(১)

তাজ্জব দেখুন। পিকিন-হোটেলে গান্ধি-জয়ন্তী। রাত আছে তখনো—প্রখর শীত। কলে গরম জল আসে নি। তা হোক—ততক্ষণ হাত-পা গুটিয়ে থাকলে হবে না। হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে ওরই মধ্যে নেয়ে ধুয়ে নিচে ছুটেছি।

গুটিকয়েক মানুষ—আয়োজন নগণ্য। গান্ধিজীর ছোট ছবি—দরিদ্র অর্ধনগ্ন ভারতের কঠিন ত্যাগ আর সুদৃঢ় সঙ্কল্প চিত্রায়িত ঐ নরমূর্তিতে। সত্তর বছরেব ক্ষীণদেহ নগ্নপাদ খদ্দরধারী রবিশঙ্কর মহারাজ গোটা চারেক বাক্যে করজোড়ে গান্ধিজীর কাছে প্রেরণা ভিক্ষা করলেন। সাঁইত্রিশটা দেশের তিন শো আটাত্তর জন প্রতিনিধি ও দর্শক আজ থেকে আমরা এক ঘরে একটা ছাতের নিচে শান্তি-সম্মেলনে বসব—একশো-ষাট কোটি মানুষের মুখপাত্র হয়ে। তাবৎ ভুবন নিঃশব্দ বাক্যে বুঝি আকুতি জানাচ্ছে—দেখো তোমরা, মানুষের রক্ত আর যেন না ঝরে মাটির উপর, কলঙ্কের পাক গায়ে আর মাখতে না হয়।

মিনিট দশেকেই অনুষ্ঠান শেষ। আন্তর্জাতিক বিরাট সম্মেলন—তারই এই অতি-ক্ষুদ্র ভূমিকা। ক্ষুদ্র হলেও সামান্য নয়। নতুন পৃথিবীতে গান্ধিজীর মতো জীবন দিয়ে কে লড়েছেন শান্তির জন্য ? ছবির একদিকে চতুর্নারায়ণ মালবীয়—ভূপাল রাজ্যের ভূতপূর্ব দেওয়ান, ইদানীং পার্লামেন্টের এক কংগ্রেসি মেম্বার। অন্য দিকে গোপালন—ইনিও পার্লামেন্টের মেম্বার, কমিউনিস্ট দলের নেতা। পার্লামেন্টে মুখোমুখি মুখ উঁচিয়ে থাকেন, বাগে পেলে কেউ কাউকে ছাড়েন না। আজকে দেখুন, নিস্তব্ধ পরম শান্ত তাঁরা—অতি-মধুর এক প্রত্যাশা অনুরণিত তাঁদের এবং সকলের মনে মনে।

ঘরে ঘরে শান্তি-সম্মেলনের কাগজপত্র এসে পড়ল—সবুজ ফাইল, সোনালি কপোত-আঁকা চমৎকার পকেট-বই, প্যাড-পেন্সিল, অভ্রের খাপের ভিতর নম্বর-সমন্বিত ডেলিগেট-কার্ড। ছোট-বড় কত সভাসমিতি দেখেছি এর আগে, কিন্তু এর সঙ্গে তুলনা চলে না। আয়োজনের নমুনা দেখে ইতিমধ্যেই মেজাজ

চড়ে উঠেছে। নিখিল বিশ্বভুবনের মালিক যেন আমরাই···না, দুষ্ট লোকের চক্রান্ত আর মেনে নেওয়া হবে না, আমরা পৌনে চারশ বিচারক এজলাসে গিয়ে বসেছি, ক'দিন ধরে সাক্ষিসাবুদ নিয়ে রণদৈত্যের নির্বাসন-দণ্ড বিধান করব মর্ত্যলোক থেকে।

বিকাল তিনটায় সম্মেলন শুরু। ইয়ং ও তার চেলাচামুণ্ডারা তাড়িয়ে-তুড়িয়ে সকলকে লনে এনে জড় করেছে। গজরাচ্ছে সারবন্দি বাস—মানুষগুলো উদরস্থ করেই দেবে ছুট। কার্তিককে ভোলেন নি নিশ্চয়—বিড়-বিড় করে বকতে বকতে সে দ্রুত পদচারণা করছে গঙ্গাস্নান অন্তে বুড়োমানুষের স্তোত্র পড়তে পড়তে পথ চলার মতো।

ব্যাপার কি হে ?

নম্বরটা রপ্ত করে নিচ্ছি। ডেলিগেট-কার্ড, ধরুন, খোওয়া গেল। নম্বর ঠিক থাকলে তবু অনেকখানি সুরাহা। নইলে যা শোনা যাচ্ছে—সে তো এক সমুদ্রবিশেষ।

কনফারেন্স-হল। পরশু এইখানে সরাসরি ভোজ হয়েছিল। ভোল বদলে ফেলেছে একটা দিনের মধ্যে। প্লাটফরমের পিছনে শিল্পী পিকাসোর বিরাট পারাবত, পারাবতের দু-পাশে সাঁইত্রিশটা দেশের পতাকা—এ সব সেদিন ছিল, আজও আছে। আজকের বাড়তি, প্লাটফর্মের উপর তিন সারি চেয়ার সভাপতি মশায়দের। একটি দুটি নন, গুণতিতে তেষট্টি হলেন তাঁরা। কোনও দেশ বড় বাদ নেই। পয়লা দিনের কাজকর্মের জন্য পাঁচ জন বাছাই হলেন—সান ইয়াৎ-সেনের বিধবা সুং চিং-লিং, ডক্টর কিচলু, পাকিস্তানের মিঞা ইফতিকারউদ্দিন, জাপানের হিরোসি মিনামি আর কোস্টারিকার এড়ুয়ার্ডো মোরা ভালভার্দে।

আসন নিলেন সভাপতিরা। টবে সাজানো অজস্র চারা, তারই ফাঁকে ফাঁকে বসেছেন। আর, ফুল—ফুলে ফুলে কি অপরূপ সাজিয়েছে! হঠাৎ মনে হবে, কুসুমোদ্যানে আরামসে তারা জমিয়ে বসে আছেন।

বক্তৃতার জায়গাটা কিছু এগিয়ে। চারটে মাইক এদিক-ওদিকে। সিকি-খানা শব্দও হারিয়ে যাবার আশঙ্কা নেই। বক্তার ডান দিকে কাচের কুজোয় জল ও গেলাস। দুই কোণে সিনেমেটোগ্রাফ-যন্ত্র উদ্যত—যেন বৃহৎ দুটো কামান পেতে রেখেছে। রঙিন সিনেমা-ছবি তোলার বন্দোবস্ত। সেই কামানের মুখ মাঝে মাঝে ঘুরছে আসরের দিকে—দপ করে জোরালো

আলোগুলো জ্বলে উঠেছে, আমাদের ইতরজনদেরও অর্ধেক হাত ইঞ্চি দুয়েক মুখ্যকর্তাদের সঙ্গে সঙ্গে উঠে যাচ্ছে ছবিতে।

নিচেয় আমাদের আসরেরও একটু বর্ণনা দিই। পরশুর ভোজ-সভায় সেই টানা-টানা টেবিল নেই! তার বদলে প্রতি জনের আলাদা চেয়ার-টেবিল। এক-এক দেশের মানুষ এক-একটা দিকে। ভারতীয় আমরা দলে ভারী সকলের চেয়ে—শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে উনষাট। মাঝখানে পাচ-ছয়টা সারি নিয়ে আমাদের জায়গা। অশোকচক্র-লাঞ্ছিত পতাকা সাঁটা রয়েছে সেখানে —রোমক হরপে 'ইণ্ডিয়া' লেখা। দলের মধ্যে যত্রতত্র বসে পড়বেন, সে জো নেই—ডেলিগেট-নম্বর-ওয়ারি জায়গার ব্যবস্থা। চলাচলের পথ এক দিকে —কার্তিক এবং অন্য এক মহাশয়, দেখলাম, উশখুশ করছেন ঐ পথের কিনারে বসবার জন্য; জায়গা বদলাবদলির বিশেষ প্রকার তদ্বির করছেন। ব্যাপার বুঝলেন? ছবি উঠবে ভাল, ফাঁকার মধ্যে ওঁদের আলাদা ভাবে চেনা যাবে। দেশে ফিরে সেই সব ছবি দেখিয়ে জাঁক করবেন, আমরা কি দরের মানুষ বোঝ!

কার্তিক এবং সেই ব্যক্তি—ফোটো তোলার ব্যাপারে আশ্চর্য প্রতিভা ওঁদের। কেমন যেন গন্ধ শুঁকে টের পান, কখন কোন দিকে ক্যামেরার মুখ ঘুরবে। সেখানে ঠিক জেঁকে বসে আছেন। কনফারেন্স-হলের পিছন দিককার মাঠেও বিরাম সময়ে ইনি-উনি ছবি তুলতেন। ছবি তোলবার সময়টা ঠাহর পান নি—কিন্তু ছবি হয়ে গেলে ঠিক দেখতে পাবেন, সকলের মাঝখানে সর্বপ্রধান জায়গা নিয়ে ওঁরা দুটি দাঁড়িয়ে। বিক্রির জন্য এইরকম অনেক ছবি থাকত হোটেলের নিচের তলায়; এ-দোকানে ও-দোকানে পথের ধারেও টাঙিয়ে রাখত। ওঁরা দু-জনে আঙুল দিয়ে দেখাতেন, এই যে আমি, —ঐ যে আমি ···। কিচলু দলপতি—কিন্তু সে ভদ্রলোক কোথায় চাপা পড়ে থাকতেন ঐ যুগলের দাপটে।

যাক গে, পয়লা দিনের কথায় আসি আবার। সভাপতি মশায়রা তো জেঁকে বসলেন প্লাটফরমের কুঞ্জবনে। বাজনা বেজে উঠল—কোন অলক্ষ্য লোক থেকে সুগম্ভীর মন্দ্র। পিছন দরজা গেল খুলে। উল্লাসের কলধ্বনি —জোয়ারের ঢেউ যেন এসে পড়ল ঘরের মধ্যে। ফুলের তোড়া দিতে যাচ্ছে তরুণ আর তরুণীরা। চলেছে প্লাটফরমের দিকে। স্বাস্থ্য আর হাসিতে ঝলমল, সেই হাস্যোল্লাস ছিটকে দিয়ে যাচ্ছে গতির বীর্যভঙ্গিমায়। চলেছে লাফিয়ে লাফিয়ে। উঠল প্লাটফরমের উপর—এক-এক জনে তোড়া দিল

এক-এক সভাপতিকে। তারপরে শেকহ্যাণ্ড। আরে আরে—কি কাণ্ড, কোণের ঐ টাক মাথা প্রবীণ মানুষটি আনন্দ-আবেগে আলিঙ্গন করেছেন তাঁর নাতনির বয়সি মেয়েটাকে। অজানা অচেনা কত সমুদ্রের পারবর্তী বুড়ো থুত্থুড়ে এক জন আর নূতন কালের ওই আনকোরা আধুনিকা—এতগুলো মানুষ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, কিন্তু বিকার নেই কারো মনে। কেউ মুখ বাঁকাচ্ছে না। ও-সব হল অন্ধকার কোণচরদের রীতি—এই আলোর প্লাবনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে মনের ঘৃণ্য বীভৎস কীটগুলো। তারপরে হাততালি—ঘর ফেটে যায় বুঝি-বা! সভাপতি মশায়রা সবাই তো বয়স্ক মানুষ—তাঁরা ঘেমে যাচ্ছেন, বুঝতে পারছি, আনন্দোন্মাদ জোয়ান ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি—এমনিতরো অবস্থা। করুণ চোখে ওদের দিকে চেয়ে কোন গতিকে তাল ঠেকিয়ে যাচ্ছেন। হাততালি বন্ধ হল শেষ পর্যন্ত, নাচুনে ছেলেমেয়েগুলো নেচে চলেছে লড়াইয়ের ঘোড়ার মতো। পথের পাশের লোকের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করে যাচ্ছে তীরগতিতে—সেকেণ্ডে খান পাঁচ-সাত হাতের সঙ্গে। অদৃশ্য হয়ে গেল বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো। বাজনা বন্ধ।

কাজ শুরু এবারে। চুপ করুন। কলম-পেন্সিল বাগিয়ে বসেছি।

অধোদেশে আমাদের চিত্রটাও আন্দাজ করে নিন একটু। শিবের মাথায় সাপ পেঁচিয়ে থাকে, সেই গোছের এক-এক হেডফোন শিরে ধারণ করে আছি। টেবিলের গায়ে সুইচ-বোর্ড—আটটা ফুটো বোর্ডে। ইংরেজি, চীনা, রুশীয়, স্প্যানিশ এবং বক্তৃতার মূলভাষা—তা ছাড়া আর তিনটে ফাউ। ঐ চারটে ভাষার একটা অন্তত আপনি জানেন; তবে আর কোনই অসুবিধে নেই। বক্তা বক্তৃতা করে যাচ্ছেন, চোখের সামনে লোকটিকে দেখতে পাচ্ছেন—আর যে ভাষা আপনার পছন্দ, সেই ছিদ্রে প্লাগ ঢুকিয়ে মহানন্দে কথা শুনে যান। আদি অকৃত্রিম বক্তৃতা শুনবেন তো তারও ব্যবস্থা রয়েছে—ঐ মূলভাষার ছিদ্র। এইগুলো ছাড়া অন্য ভাষায় যদি প্রচার-ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়, তারই জন্য বাড়তি ফুটো তিনটে। আপাতত নিঃশব্দ এগুলো।

কায়দাটা বুঝলেন? যা মুখে এলো, এলোপাতাড়ি বলে যাওয়া নয়—আগে থেকে তৈরি-করা প্রত্যেকটি বক্তৃতা। একটা কপি পূর্বাহ্ণে জমা দিতে হয়। ওঁরা চারটে ভাষায় তার অনুবাদ করে রেখেছেন—মূল বক্তৃতার সঙ্গে একুই সময় একই তালে ছাড়ছেন। নিখুঁত ব্যবস্থা—ধরা মুশকিল, বক্তার আসল ভাষা কোনটা।

শ্রোতৃবর্গ পরম গম্ভীর—ব্যস্তসমস্ত হয়ে টোকাটুকি করেছেন! কি অত টোকেন, আমি কিন্তু ভেবে পাইনে। বক্তৃতার পর বক্তৃতা চলেছে; টেবিলের উপর টাইপ-করা পুরো বক্তৃতার কপি এসে যাচ্ছে অনতিপরেই। পরের দিন দশটা না বাজতেই বক্তৃতা ও অনুষ্ঠানের রকমারি ছবি সহ ইংরেজি, রুশীয়, স্প্যানিশও চীনা—চারটে ভাষায় পরিচ্ছন্ন সচিত্র মুদ্রণে তাবৎ ছাপা হয়ে বেরুচ্ছে। সমস্ত দায় ওঁরাই কাঁধে তুলে নিয়েছেন। আমাদের কাজ তো দেখছি —পা ছড়িয়ে বসে বসে বক্তৃতা শোনা, বিরাম-সময়ে ঘুরে ঘুরে আলাপ জমানো আর যথাভীষ্ট পানাহারে ওঁদের অনুগৃহীত করা।

টুকে যাচ্ছি আমিও বটে! বক্তৃতার এক বর্ণ নয়—চতুর্দিকে যা কিছু দেখতে পাচ্ছি। টুকে রেখেছিলাম, তাই তো প্রাণ খুলে বলতে পারছি। জুত মতো টেবিল-চেয়ার পেয়ে ভারি সুবিধা হয়েছে। স্মৃতি হাতড়ে যে লেখা বেরোয়, জীবনের উত্তাপ পাওয়া যায় না তার মধ্যে। শুকনো বিবরণের বাণ্ডিল—প্রাতঃকালের সংবাদপত্র। সবজান্তা হওয়া যায়, কিন্তু মনের মধ্যে ঢেউ তোলে না। যাক গে, যাক গে—কাজকর্ম শুরু হয়ে গেল ঐ যে!

পয়লা বক্তৃতা সুং-চিং-লিঙের। ডক্টর সান-ইয়াৎ-সেনের ছবি তো যত্রতত্র, ছবির মুখে কথা পাইনে—কথ্যর সুধা আর কথার আগুন এই শুনতে পাচ্ছি তাঁর স্ত্রী মুখে। মাঞ্চু-রাজার গ্রাস থেকে মহাচীনকে ছিনিয়ে এনেছিলেন ওঁরাই। সেই থেকে গণরাজার রাজত্ব বহাল। তার পরে চল্লিশ বছর কেটে গেল, কত ছেলেমানুষ বুড়ো হয়ে গেল, মাদামের কিন্তু বয়স বাড়ল না। একটি চুল পাকে নি—মুখে একটি কুঞ্চন রেখা নেই, নব তারুণ্যের ঝলকিত হাসি খেলে বেড়াচ্ছে তথায়। কথা যে কটি বললেন—বৈদগ্ধ্যে বিচিত্র নয়, কিন্তু আশায় সমুজ্জ্বল।

'শান্তি যারা চায়; তাদের শক্তি অসীম হয়ে উঠেছে দিনকে-দিন। হতেই হবে। লড়াই বন্ধ হবে পৃথিবীতে—ঝগড়া-বিবাদের আপোস-নিষ্পত্তি। মারণাস্ত্র তৈরি আর চলবে না—ওটা মহা অপরাধ বলে ঘোষিত হোক। অবাধ ব্যাপার-বাণিজ্য চলবে সকল দেশের মধ্যে, সাংস্কৃতিক বন্ধনে এক হবে নানান জাতের মানুষ···'

সভা চালাচ্ছেন এখন ডক্টর কিচলু। মাও সে-তুং অভিনন্দন জানিয়েছেন, পড়া হল সেটা। উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে সকলে—কতক্ষণ কেটে গেল,

উল্লাস থামবার লক্ষণ দেখিনে। বাণী পাঠিয়েছেন—জোলিও কুরি, ইকুওয়াকা, পাবলো নেরুদা, পল রবসন—এমনি সব জাঁদরেল ব্যক্তিবর্গ।

তার পর বিরাম। ঘণ্টা দেড়েক ধরে বিস্তর ধকল গেল—খানাপিনা হোক পিছনদিককার চার-পাঁচটা ঘরে, প্রকাণ্ড উঠানে চরে-ফিরে বেড়ান, আলাপ-পরিচয় গল্পগুজব করুন। ঘণ্টা বাজলে আবার এসে বসবেন।

ঘণ্টা বাজল। মিঞা ইফতিকারউদ্দিন এবারের সভাপতি। হাসিখুশিব মানুষ—কথায় কথায় রঙ্গ-রসিকতা। দুরন্ত প্রাণাবেগ—একটি জায়গায় বসে থাকা বড় শক্ত মানুষটির পক্ষে। কংগ্রেসের সত্যযুগীয় আমলে ইনিও এক চাঁই ছিলেন। তখন নাম শোনা ছিল, পিকিনে এসে কাছাকাছি পরিচয় পেলাম।

বক্তৃতার স্রোত চলল অতঃপর। একের পর এক এসে দাঁড়াচ্ছেন। গেব্রিয়েল-দ্য-অরকুশিয়ের—বিশ্বশান্তি পরিষদের এক কর্মকর্তা। জাপানের অধ্যাপক হিরোশি মিনামি। আমাদের ডক্টর কিচলু। পাকিস্তানের দলপতি পীর মানকি-শরিফ। ব্রেজিলের আবেল চেরম। ওয়ার্লড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়ন্স-এর ই. থর্নটন। অষ্ট্রেলিয়ার ক্যানন মেনার্ড। ব্রিটিশ লেবার পার্টির জন বার্নস।

নানারকম হিতবাক্য, নিজ নিজ দেশের সমস্যা, তাবৎ বিশ্ববাসী সম্পর্কে ক্ষোভ-বেদনা ও প্রত্যাশার বাণী। অধিবেশন শেষ হতে সন্ধ্যা। পয়লা দিন, তাড়া কিসের! এর বেশি আর নয়। দশদিন ধরে চলবে এই রকম—কত কি শুনতে পাবেন।

বলে কি অধিবেশন নাকি দশ-দশটা দিন ধরে! এত কথা বলবার আছে, এত ভাবনা ভাববার আছে, এত সঙ্কল্প ঘোষণার রয়েছে। তাই দশ দিনে শেষ হল বটে, কিন্তু শেষাশেষি প্রতিদিন দুটো-তিনটে করে অধিবেশন চালাতে হয়েছে। শেষ অধিবেশন হল রাত্রি এগারোটা থেকে তিনটে। এর উপরে কমিশনের মিটিং আছে—তন্দ্রায় ঢুলছেন সকলে, রাত কাবার হয়ে যাবার দাখিল, তবু ছাড়ান নেই। বড় কঠিন কাজ—হুকুম-হাকাম দিয়ে সৈনিকদের লড়াইয়ে পাঠানো নয়, লড়াইবাজদের ধূলিশায়ী করা। যাতে আবার উঠে বসে তারা দল জোটাতে না পারে।

(২)

বাঘা শীত—ভোরে উঠা অতিশয় কঠিন। কায়ক্লেশে উঠে তবু বেরিয়ে পড়লাম, উষালোকে পিকিনের চেহারা দেখব। তামাম শহর ঝকঝক তকতক

করে—সে ব্যবস্থা হয়ে যায় মানুষের ঘুম থেকে উঠবার আগে। আগের দিন গান্ধি-জয়ন্তীতে উঠে ব্যাপারটার আন্দাজ পেয়েছি, তাই আজকে আরও সকাল-সকাল উঠে পড়েছি। ছেলেবেলায় যাত্রার সাজ-ঘরে উঁকি দিতাম—বিড়িখোর ছোঁড়াটা হঠাৎ কি করে রাজকন্যা হয়ে যায়! এ-ও প্রায় তাই। কি করে এত বড় শহর এমন ফিটফাট রাখে?

পথে-পার্কে বিস্তর মানুষ। দস্তুরমতো ভিড় জায়গায় জায়গায়। দোকান-পাট বেলায় খোলে—তার আগে এখন চতুর্দিকে পরিমার্জনা হচ্ছে। রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছে, জল দিয়ে ধোয়াধুয়ি হচ্ছে, নর্দমার মুখে আরক ঢেলে ঢেলে বীজাণুমুক্ত করছে। ময়লা ফেলার পাত্রগুলো সাফ-সাফাই। নতুন দিনে জেগে উঠে পথে বেরিয়ে সর্বত্র দেখতে পাবেন নির্মল প্রসন্নতা। মানুষগুলোর নাকে মুখে কাপড়ের পটি, চোখ দুটো শুধু খোলা। বীজাণুরা তাড়া খেয়ে ঐ সব ছিদ্রপথে দেহ-মধ্যে ঢুকে না পড়ে—তারই ব্যবস্থা। এই কাপড়ের পটি খুব চলেছে—ফেরিওয়ালারা দু-পয়সা চার পয়সায় বিক্রি করে, লোকে দেদার কেনে আর পরে। যারা বাইরে বাইরে ঘোরে, পরতেই হবে তাদের। রাস্তার ধারে দোকান দিয়ে বসেছে, তারা সব নাক-মুখ ঢেকে কিম্ভূত-কিমাকার হয়ে আছে। ইস্কুলের ছুটির সময়, দেখতে পাচ্ছি, ঐ বস্তুতে নাক-মুখ ঢেকে ছেলে-মেয়েরা সারবন্দি বাড়ি ফিরছে। মোটর-ড্রাইভারের আবার নাক-মুখ ঢাকা শুধু নয়, দু-হাতে দস্তানা—ষ্টিয়ারিং চাকার ময়লা যাতে হাতে না লাগে।

নজর কিঞ্চিৎ ছড়িয়ে দিন। এক সঙ্গে, দেখুন দেখুন, কত মানুষ ব্যায়াম করছে। রেডিওয়, এই এত ভোরে ব্যায়াম সম্পর্কে কিছু বর্ণনা দিয়ে এখন বাজনা বাজাচ্ছে। আর, এরা সব হাত-পা খেলাচ্ছে সেই বাজনার তালে তালে। এ পার্কে ঐ মাঠে এমন কি ফুটপাতের যেখানটা বেশি রকম চওড়া সেখানেও হয়তো দেখবেন, একই ধরণের শরীর-চর্চা। গ্রামে গ্রামেও নাকি এমনি সময়ে এই ব্যাপার। ছেলে-বুড়ো চাষী-মজুর ছাত্র-মাস্টার সবাই একই সঙ্গে হাত নাড়ে, পা তোলে, ঘাড় বাঁকায়। মানুষ মানুষে অজান্তে এক হয়ে যাচ্ছে—অযুতলক্ষ নরনারী সকলে তারা এক।

আর ঐ এক মজা আছে—যা-কিছু করবে তাই মিলে এক-একটা আন্দোলন। পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি হয়ে থাকবে—সেই বাবদেও। আন্দোলনের নাম হল, চার সাফাই...পাঁচ মার। সাফাই রাখো খাবার ও রান্নাঘর; সাফাই রাখো গোয়াল ও পায়খানা; সাফাই রাখো কাপড় ও বিছানা; সাফাই রাখো

রাস্তা ও ঘরবাড়ি। মারো মাছি; মারো মশা; মারো পোকামাকড়; মারো জোঁক; মারো ইঁদুর। এ ছাড়া আর যত প্রাণী রোগবীজাণু ছড়ায়, মেরে মেরে তাদের শেষ করে ফেল।

এক-এক আন্দোলনের ফুলকি ছেড়ে দেয়, আর তা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ে দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। 'মাকড় মারলে ধোকড় হবে—তুমিও যেমন!' অতি-বুদ্ধিমন্তেরা তুড়ি মেরে সমস্ত কিছু উড়িয়ে দেবার সাহস পায় না। প্রতি চেষ্টার দ্রুত সাফল্য দেখে আত্মবিশ্বাস এসে গেছে সকলের মনে। চেষ্টা করলে আলবত হবে। যে মতলবটা উঠল, অচিরে তা হাসিল হবেই—তাবৎ লোকজন মরিয়া হয়ে লেগে যায়। এক গ্রামে গিয়েছিলাম…গ্রাম-প্রধান নানা গৌরব-প্রচেষ্টার মধ্যে পরিচয় দিচ্ছেন, কত হাজার মাছি মারা হয়েছে এতাবৎ। এখানে শুধুমাত্র মাছিমারা কেরানী নয়, মাছিমারা সর্বজন। সরু জালে মাছি মেরে মেরে গোনাগুণতি করে রাখে। বেশি মারতে পারলে মুনাফাও আছে, উ ম পুরস্কার।

দেহ আপনার বটে, কিন্তু সেটা পরিপাটি করে গড়ে তোলা এবং সুস্থ রাখার পুরোপুরি দায়িত্ব রাষ্ট্রের। মানুষ নিয়েই সব...মানুষকে মজবুত করবার তাই দেশব্যাপ্ত আয়োজন। ডাক্তারকে ফি দিতে হবে না, অষুধের দাম লাগবে ন, রোগ-চিকিৎসা মুফতে; সিকি পয়সা সে বাবদে ডাক্তার-নার্সের প্রাপ্তি নেই। তাই রোগ যাতে কারো না হয়, ডাক্তারেরও চেষ্টা... হলে মুনাফা নেই, উপরন্তু হাঙ্গামা। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে পুরোপুরি এখনো হয়ে ওঠে নি। নিশ্বাস ফেলে ওরা দুঃখ করছিল—ইচ্ছে আমাদের তাই বটে। কিন্তু ডাক্তার কোথায় পাচ্ছি অত?

তবু যা হয়েছে, তাজ্জব মানি। ১৯৫১ সনে শ্রমিক-বীমা আইন হল। বীমা করতেই হবে সকলকে। খনি ও ফ্যাক্টরিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ করে, চিকিৎসা বাবদে তাদের এক পয়সাও লাগছে না বীমার কল্যাণে। ন্যাশনাল মাইনরিটি যত আছে, তাদের বীমার ব্যাপার নেই—তবু বিনামূল্যে চিকিৎসা। গবর্নমেন্ট তরফের যত লোক—তাদের সম্পর্কেও এই। এই দেখুন, মুখ বাঁকাচ্ছেন আপনারা। সে তো হবেই—সরকারি লোক, তারা আবার পয়সা দিতে যাবে নাকি? তাদের চাই সকলের আগে। আজ্ঞে না, গবর্নমেন্ট মানে জন-সাধারণ থেকে পৃথক তকমা-আঁটা রকমারি হিস্যার কর্তৃত্বভোগী এক আস্তিক গোষ্ঠী নয়—ঐ রাষ্ট্র-ধারণা মুছে ফেলতে হবে মন থেকে, মস্তিষ্ক ধুয়ে সাফসাফাই করতে হবে। এদের রাষ্ট্র গাঁয়ে গাঁয়ে; রাষ্ট্র-শক্তি ছড়িয়ে আছে

যাবতীয় জনসংস্থার মধ্যে। চাষীদের সমিতি আছে; তাদেরও নিখরচায় চিকিৎসা-ব্যবস্থা তাদের সমিতিগুলোর মাধ্যমে।

তবুও বাকি থেকে যায় কতক লোক। তাদের পয়সা খরচ করতে হয়। সেই হেতু নতুন চীন হা-হুতাশ করে। তিনটে বছরেও সকল মানুষের জন্য ব্যবস্থা হল না—কি হল তবে আর বলুন। অতএব দ্রুত ডাক্তার বানিয়ে তোলো ছেলেমেয়েদের, গড়ো ল্যাবরেটারি, চালাও গবেষণা, তৈরী করো রকমারি অষুধপত্তর।

রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ কিসে না হয়, সেই চেষ্টা। মশামাছির সঙ্গে লড়াই। ডাক্তারের সংখ্যা ছিল কম—শতকরা নব্বুই তার মধ্যে শহরে। গ্রামাঞ্চলে যে দু-দশটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, তথায় না ডাক্তার না অষুধপত্তোর —অব্যবস্থার চরম। আজকের গ্রামগুলো নিজ নিজ স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তুলছে —স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচার করে তারা, রোগ প্রতিষেধ ও চিকিৎসা-ব্যবস্থা করে।

আগে ছিল, প্রতি তিন বছরে একবার করে কলেরার প্রকোপ। শীতের পর যেমন গ্রীষ্ম, কলেরা তেমনি যথানিয়মে আসবেই। সারা চীনে এখন কলেরা বন্ধ হয়ে গেছে; তিন বছর অতীত হয়ে গিয়েও কোন লোককে কলেরায় ধরেনি। কখনো কারো কলেরা হবে না—ওরা জোর করে বলে। খাবার জল ফুটিয়ে খায় বারো মাস তিরিশ দিন—অবিরত প্রচারের ফলে কাঁচা-জল বিষের সমতুল্য ভাবতে শিখছে। ময়লা-আবর্জনার সঙ্গে দেশব্যাপী সংগ্রাম-ঘোষণা। তার উপরে নির্বিচারে কলেরা-টাইফয়েড ইনজেকশন—বিশেষ করে বন্দর জায়গা এবং চীনে ঢুকবার ঘাঁটিগুলোয়। জগৎবেড় জাল পেতে আছে যেন—একটি মানুষ বাইরের রোগ নিয়ে ঢুকে পড়বে, কিছুতে তা হবার জো নেই।

বসন্তের ব্যাপারেও এমনি যুদ্ধং দেহি ভাব। দেশ জুড়ে পায়তারা চলছে। ঠিক করেছে, পাঁচ বছরের মধ্যে মা-শীতলাকে পুরোপুরি এলাকাচ্যুত করবে। পাঁচ বছরের তিনটে পার হয়ে গেছে। আর দুটো বছর।

কি দুরন্ত বেগে স্বাস্থ্যোন্নতি চলছে! মানুষ কিলবিল করছে—তবু বলে কেউ মরবে না অকালে, রোগা-ডিগডিগে হয়ে থাকবে না—বাঁচার মতন করে সকলে বাঁচবে। রোগ খেদাও, রোগের জড় মারো, লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে বেড়াক মানুষ। মানুষ বাড়ুক আরও—মানুষ বোঝা নয়, মানুষই লক্ষ্মী।

কাজের মানুষ তৈরী করবে, সেই জন্য আরো বেশি মানুষ চাই। মৃত্যুর হার কমেছে, জন্ম বাড়ছে। বিশেষ করে ন্যাশনাল মাইনরিটিদের মধ্যে—দিনে দিনে যারা নিশ্চিহ্ন হবার দাখিল হয়েছিল।

I

আমার কি বিপদ হল, শুনুন তবে। ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মুখের কাছে অবিরত খাদ্য এনে ধরে, অভ্যাস বসে খেয়ে যাই। এম্ববিধ খাটনির দরুন পাকযন্ত্র একদা উষ্মা প্রকাশ করল। দেশে-ঘরে এমন একটু-আধটু হামেশাই হয়ে থাকে, আমলে আনি নে। এটা অনেক দূরের দেশ, আর শীতের দেশও বটে। রোগি হয়ে চোখ-কান বুজে শয্যায় পড়ে থাকতে মন্দ লাগে না অসুখের চেয়ে কু-মতলবই অধিক ছিল (ফাঁস করে দেবেন না কিন্তু)। তারিখটা ৭ই অক্টোবর—পাঁচদিন তৎপূর্বে কনফারেন্স হয়ে গেছে। পাঁচ পাঁচটা দিন একনাগাড় ডজন পাঁচেক বক্তৃতা শুনেছি—তাই ভাবলাম, ভাগ্যবশে শরীর যখন খারাপ লাগছে—সভার ঝামেলা আজকে নয়; চুপিসারে ঘরের মধ্যে লেপ মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকি।

তাই হতে দেবে নাকি? তক্কে তক্কে ঠিক চলে এসেছে সুইং—মেয়েটার চোখ দুটো চরকির মতো ঘুরে ঘুরে ত্রিভুবন পাহারা দেয়। এখনো ওকে পুলিশের বড়কর্তা কেন বানায় নি, তাই ভাবি।

অসুখ করেছে আপনার?

না হে, এমন-কিছু নয়...

অসময়ে শুয়ে কেন তবে?

মুহূর্তকাল নজর করে দেখে সে বেরিয়ে গেল। হাঙ্গামা চুকল ভেবে আরামে লেপমুড়ি দিলাম।

ফিরল সুইং অনতি পরেই। হাতিয়ারপত্র সহ ত্রিমূর্তি সঙ্গে। ডাক্তার এবং এক জোড়া নার্স। সে কি কাণ্ড! শোয়ায় বসায় দাঁড় করায়; আর হাত জিভ বের করে আছি; নিরিখ করে দেখে; খুন্তির মতো এক বস্তু গলায় ঢুকিয়ে দিয়ে টর্চের আলো ফেলে। পেট টিপে দেখে; বুকে নল বসিয়ে দেখে। বিশ মিনিট ধরে নানা রকম প্রক্রিয়ার পর ডাক্তার কায়েমি ভাবে শুইয়ে দিয়ে গেল। পাছে উঠে বসি, একটা নার্স মোতায়েন করে গেল শিয়রে।

তারপর অষুধপত্রের বোঝা এসে পড়ে। কোনটা খাওয়ার কোনটা শোঁকার। আয়োজনটা দেখে আঁতকে উঠি। রোগটা নিশ্চয় শক্ত। সত্যি বলুন, কি হয়েছে আমার?

মধুর হাস্যে নার্স ঘাড় নাড়ে।

কিছু নয়। ঘুমোন দিকি...আচ্ছা এক ঘুম দিন। জেগে উঠে দেখবেন শরীর ঝরঝরে হয়ে গেছে।

বলছে ভাল, চোখ বুজে থাকাই নিরাপদ। ডাক্তার এসে আবার যদি পরীক্ষা করতে চায়, সে চোখ কিছুতে আর খুলছি নে।

পাক্কা ছ-ঘণ্টা মড়ার মতো পড়ে থেকে সে যাত্রা রেহাই পেলাম।

আমার তো এই। আর এক অভাজন এসেছেন, তাঁর নাড়িতে সত্যি সত্যি দু-ডিগ্রি জ্বর পাওয়া গেল।

আর যাবে কোথা? মুহুর্মুহুঃ ডাক্তারের আনাগোনা। শিয়রে ছোটখাটো ডিস্পেনসারি। দশ মিনিট অন্তর নাড়ি টিপে চার্টে লিখছে, অষুধ খাওয়াচ্ছে। পুরো চব্বিশ ঘণ্টা চলল এই প্রকার। ইতিমধ্যে জ্বর ছেড়েছে। রেহাই নেই...শুয়ে পড়ে থাকতে হবে। জ্বর আবার যদি আসে?

সকালবেলা একবার একটু ফাঁক পাওয়া গেছে ঃ...নার্স-ডাক্তার কেউ নেই। রোগি অমনি পিঠটান দিয়েছে। খোঁজ, খোঁজ···কি সর্বনাশ! এ-ঘর ও-ঘর উপর নিচে...কোনখানে পাত্তা নেই। খোঁজ মিলল অবশেষে সাততলার খানা ঘরে। এক গণ্ডা আণ্ডার রাক্ষুসে অমলেট রং কফির বাটি নিয়ে তিনি টেবিলে বসেছেন।

নাকে খত দিচ্ছি মশায়, কদাপি আর রোগে ধরবে না যত দিন এ দেশে আছি। বড় ভয়ে ছিলাম। রোগের চেয়ে বেশি ভয় নার্স-ডাক্তারের।

(৩)

সেক্রেটারিদের একজন খবর দিয়ে গেলেন, দুপুরবেলা জাপানিদের সঙ্গে খানাপিনা। চর্বচোষ্য ঠেসেই যে অমনি ঘরে ঢুকে শয্যা নেবেন, সেটা সভ্য রীতি নয়। অনেকক্ষণ বসে বসে উদগার তুলতে হয়। বচনে—এবং কখনো কখনো গানে। ভারতীয় দলের হয়ে আজকে আমি বলব। আর বলবেন উমাশঙ্কর যোশি। ব্যাপারটা ঘোরতর—দুই সাহিত্যিক জোড়ে আসরে নামছেন। দেশে থাকতে হিতার্থীরা বিস্তর সদুপদেশ দিয়েছিলেন, রা কাড়বে না মোটে ও-সব জায়গায়—চোখ মেলে শুধু দেখে আসবে। জবান যা-কিছু ছাড়তে হয়, স্বদেশের নিরাপদ সীমানার মধ্যে ফিরে এসে। সতর্ক বাক্যগুলো বিলকুল ভুলে মেরে দিয়েছি। ভুল হয়ে যায় যে, ভিন্ন দেশে এসেছি—চতুষ্পার্শের এরা আমার আপন লোক নয়। ঘরের দুয়োর এঁটে বসে, দোহাই প্রাজ্ঞবর্গ, মানুষকে পর ভাববেন না। বিজ্ঞানের দয়ায় পথে বেরুনো আজকাল তো কঠিন নয়—দেখে আসুন, দেশ-বিদেশে কত আত্মীয়তা বিছানো আছে, মানুষজন কত ভাল!

সকাল-বিকাল ছু-বেলা আজ অধিবেশন। সভাপতি পুরোপুরি এক ডজন। খটমট একগাদা নাম শুনে কি হবে, সভাপতি মশায়দের দেশগুলো কেবল জেনে রাখুন। অস্ট্রেলিয়া, মঙ্গোলিয়া, সিংহল, বর্মা আর কলম্বিয়া। সকালে সভারোহণ করলেন। বিকালের জন্য আর ছ-জন—তুর্কি (নাজিম হিকমত), কোরিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, কানাডা ও ইকুয়েডর।

নতুন দেশে প্রথম আজ মুখ খুলব। মওকা পেয়ে গেছি, ছাড়ব কেন? আচ্ছা করে স্বদেশের গুণ-কীর্তন করা গেল। আর সত্যি কথাই তো, দুর্গম ইতিহাসের সুদূরকাল অবধি বিচরণ করুন—হেন দৃষ্টান্ত একটি পাবেন না, পররাজ্য গিলবার জন্য ভারত হাঁ করেছে। হানা দিয়েছে বটে ভারতের মানুষ—সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী নয়, সাধুসন্ত ও বিদগ্ধজনেরা—কণ্ঠে অভীঃ মন্ত্র, শান্তি প্রীতি ও আনন্দের বাণী···

শেষ করে বসতে না বসতে উমাশঙ্কর যোশি আমায় জড়িয়ে ধরলেন। ঐ যে বললেন, 'পাহাড়-সমুদ্রের ওপার থেকে চিরকাল আমরা বাইরের ভুবনের দিকে প্রীতির হাত বাড়িয়েছি—'ভারি সুন্দর! কিন্তু লেখক হয়ে অন্য লেখকের প্রশংসা—তবে কি লেখায় ইস্তফা দিয়েছেন উনি? অথবা ভিন্ন ভাষায় লিখলে বোধহয় নিয়মটা খাটে না। বাংলা দেশে আমরা তো হেন ক্ষেত্রে কাষ্ঠ-হাসি হেসে চুপ করে থাকি। হেসে হেসেও কত কান্না কাঁদা যায়, বুদ্ধিমানে বুঝে নেন।

বক্তৃতার আরও এক অহঙ্কার করেছিলাম। আর সেই সময়টা জওহরলালকে প্রাণ ভরে নমস্কার করেছি। বাইরের দশটা জাতের মধ্যে এসে দাঁড়ালে তখনই বুঝতে পারি, কতখানি ইজ্জত হয়েছে আমাদের, কত শক্তি ধরি আমরা। বুক ঠুকে উদ্ধত ভঙ্গিমায় বললাম, শোন হে জাপানি ভায়ারা, ভুবনের তাবৎ ধুরন্ধরেরা সানফ্রান্‌সিসকো চুক্তিতে সই মেরে বসলেন—ভারত কিন্তু নয়। এমনি অপমানের দশা আমাদেরও গিয়েছে এই সেদিন অবধি, বিশেষ করে বিশ্বযুদ্ধের সময়—ইংরেজ যখন মাথায় চড়ে ছিল। দেশের মানুষ না-রাম না-গঙ্গা কিচ্ছু জানে না, অথচ দুনিয়ার লোক জেনে বুঝে রইল, লড়নেওয়ালাদের মধ্যে ভারতও আছে। গান্ধিজীর সঙ্গে দেশসুদ্ধ আমরা চেল্লাচেল্লি করলাম, না গো—নেই আমরা। কার কথা কেবা শোনে? সে মনের দাগা এখনো মিলায় নি। তোমাদের জাপানি মানুষদের অবস্থাটা তাই মালুম হল। চুক্তিতে তোমরা রাজি হয়েছ বটে—বুঝতে পারি, সেটা খুশ মেজাজে নয়, কর্তার ইচ্ছাক্রমে।

কেমন-কেমন চোখে তাকায় জাপানিরা। সমব্যথীর কথায় বিচলিত হয়েছে। এই কথাগুলোই পরে আর এক বৈঠকে হচ্ছিল। সেবারে নানান দেশের অনেকে সেখানে। আমাদেরই পড়শি এক ব্যক্তি মাথা চুলকান, 'স্যানফ্রান্‌সিসকো-প্যাক্টে আমরা সই দিয়েছি বটে—কিন্তু সে হল গবর্নমেণ্ট, পিপল্‌স্ নয়।' আর উপায় কি, দেশের গবর্নমেণ্টের কান মলে দেশের আসরে কায়ক্লেশে মান বাঁচানো। আমাদের সে দায় ঠেকতে হল না; আমাদের জওহরলালের দূরের নজর অতি পরিষ্কার।

এক বক্তৃতা ঝেড়েই কিঞ্চিৎ পশার জমে উঠল—পিছন-বেঞ্চি থেকে পয়লা সারিতে প্রমোশন। লোকটা তবে কলম-পেশা লেখক মাত্র নয়, গরজ মতো বচনও ছাড়তে পারে! আর গণতান্ত্রিক ভুবন তো তারই মুঠোয়, তূণ-ভরা যার বাক্য-অস্ত্র।

ডক্টর জ্ঞানচাঁদ শেকহ্যাণ্ড করে বললেন, আপনাদের লেখকদের দিন এলো এবার। কি বলতে চাইলেন, ঠিক বুঝি না। কলমের খোঁচায় এ যুগে মানুষের পুরু চামড়া ভেদ করা শক্ত—তাই বুঝে জগতের লেখককুলও রসনায় শান দিচ্ছেন—এই নাকি। অমৃত রায় বললেন, আপনি এমন বলেন, তা তো টের পাইনি। যথারীতি আমি না-না করছি, অর্থাৎ বলুন না আরও-কিছু মনোরম বাক্য—আঙুর আপেলের সঙ্গে চেখে চেখে স্বাদ নেওয়া যাক। আর এক জন—উড়িষ্যার চিন্তামণি পাণিগ্রাহি—বয়স বেশি নয়, জাত-লেখক। যা-কিছু চোখে পড়ছে, টুকে বেড়াচ্ছেন আমারই মতো। অবসর পেলেই লেখাপড়ায় বসেন। ইংরেজি লেখেন বেশি, এক টাইপরাইটার অবধি ঘাড়ে করে নিয়ে এসেছেন সেই কটক থেকে। পাণিগ্রাহী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন··· উঁহু, আপনাদের ভ্রূকুঞ্চিত হচ্ছে, আন্দাজ পাচ্ছি। কি হে লেখক মশায়, সার্টিফিকেটের মালা গলায় ঝুলিয়ে শোভা বাড়ানোর লোভ হয়েছে?

এই দেখুন, কিঞ্চিৎ নাম জাহিরের চেষ্টায় ছিলাম, ঠিক ধরে ফেললেন! বক্তৃতা শুনে আমাদের সুবোধ বন্দ্যো বড় খুঁতখুঁত করছেন, বাংলায় বললেন না কেন আপনি? জাপানিরা তাদের ভাষায় বলল—জাপানি থেকে চীনায় তর্জমা, তারপরেই ইংরেজি। আপনারও তেমনি হত। বাংলার সাহিত্যিক—বাংলা ভাষায় শুনতে চেয়েছিলাম আপনার কাছে।

ক্ষোভের কথাই বটে! আন্তর্জাতিক সমাবেশে সবাই প্রায় স্বভাষায় বলে, আমরা কেন তবে লালাসিক্ত ভাঙা ইংরেজি বর্ষণ করি? কিন্তু মুশকিল হয়েছে—এত বড় এই পিকিন শহরে, যত দূর জানি, বাংলা-জানা আছেন

একজন মাত্র—এক বিদুষী রমণী, অধ্যাপক উ শিয়াও-লিঙের স্ত্রী। শান্তিনিকেতনে স্বামীর সঙ্গে অনেক দিন ছিলেন, ভাল বাংলা শিখেছেন, মহিলার ঐ সময় নাম হয়েছিল পার্বতী দেবী। সাহিত্যের উত্তম সমঝদার রবীন্দ্রনাথের অনেক বইয়ের তিনি চীনা তর্জমা করেছেন! অধ্যাপক উ-র সঙ্গে খানিকটা দহরম-মহরম হয়েছে। কিন্তু পার্বতী দেবীর ধরা পেলাম না। ফোনে উত্যক্ত করেছি, অনেককে বলেছি একটুখানি মোলাকাতের উপায় করে দেবার জন্য। শুনলাম, অত্যন্ত কর্মব্যস্ত তিনি—তিলেক ফুরসত নেই। তাই কি—না, গুরুতর কিছু? সে যা-ই হোক, রবীন্দ্রনাথকে তিনি চিরকালের চীনা গুণীদের আসরে আদর করে নিয়ে বসিয়েছেন—সে কুটুম্বিতা কিছুতে ভুলতে পারি না। আমার একটা বই মহিলার নামে পাঠিয়ে রবীন্দ্রোত্তর আর-এক বাঙালি সাহিত্যিককের আগমন জাহির করে এলাম। সে বইয়ের পাঠোদ্ধারের দ্বিতীয় মনুষ্য যখন নেই—ভরসা করা যায়, উপহারটা তাঁর হাতে পৌঁচেছে।

অবস্থা তো এই। আর রইলেন আমাদেরই দলের গুটিকয়েক বঙ্গনন্দন ...বাংলায় বচন ছাড়লে অতএব ঠেলা সামলাবেন তাঁদেরই কেউ না কেউ। ইংরেজীতে তর্জমা না হওয়া অবধি শ্রোতৃবৃন্দ ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাবেন, অথবা মৃদু মধুর আন্দাজি-হাসি হাসবেন। অবোধ জনদের এমন করে খেলাতে মায়া লাগে। ঝক্কিটা তাই নিজের কাঁধে রাখা...আর কিছু না হোক, সময় বাঁচে অনেকটা।

কিন্তু সুবোধ বন্দ্যোর মনোভাব মালুম হচ্ছে। এখানে যে যার নিজ ভাষায় বলছে, আমরাই বা কম কিসে? ঘাট মানলাম তাঁর কাছে। মূল শান্তি-সম্মেলনে আমায় যদি কিছু বলতে হয়, নিশ্চয় বাংলায় বলব। বলব বাংলায়, আর যদি কোথাও সুবিধা পাই।

বিস্তর জায়গায় বলতে হয়েছে আমাকে। আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্যস্ত হবেন না... ধীরে ধীরে আসছি। শেষটা যেন নেশায় পেয়ে গেল। বেপরোয়া জবান ছেড়েছি...মাথা-মুণ্ড কি পরিমাণ থাকত, সেটা আর না-ই শুনলেন। ভরসা ছিল, বিষম অতিথিবৎসল জাত; যত যা-ই করি হজম করে নেবে...অতিথির হেনস্তা হতে দেবে না। অত বক্তৃতার মধ্যে দুটো বাংলায়...একটা ঐ যে শান্তি-সম্মেলনের কথা শুনলেন। আর একটা এক ভোজসভায় পাকিস্তানি ভায়েদের সম্বর্ধনার ব্যাপারে।

তবে শুনুন। অধমও ছেড়ে কথা কয়নি। অনেক পরের ব্যাপার। শান্তি-

সম্মেলন চুকে-বুকে গেছে—পিকিন ছাড়ব-ছাড়ব করছি। খুচরা সভাসমিতির হিড়িক পড়ে গেল, এবেলা-ওবেলা মিলিয়ে অমন পাঁচটা-সাতটা। বক্তৃতাদি তেমন নয়, ঘরোয়া মেলামেশা—টেবিলে টেবিলে ভাগ হয়ে বসে আলাপ-আলোচনা এবং তৎসহ—। উঁহু, আমি কথা দিয়েছি, খাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে পাঠক-সজ্জনদের প্রতি নিষ্ঠুরতা করব না। তবু বারম্বার তাই উঠে পড়ে। থাক্‌গে না, ধরে নিন কথাবার্তাই শুধু। আর যদি কিছু থাকে, আমার তা মনে নেই।

আমাদের টেবিলটা ছোট—সাকুল্যে জন আষ্টেক হবো। ভুবনের এপাড়া ওপাড়ার কয়েকটি ব্যক্তি। মেক্সিকো আছেন, ইউ-এস-এ ও ইরান আছে। হন্দুরাসের ফরসা মোটা মেয়েটিও আছেন, অনুমান হচ্ছে। আর আছেন মাও তুন—তাঁকে পাকড়াও করে এনে বসিয়েছি; যে সে ব্যক্তি নন, জাঁদরেল উপন্যাসকার—শুনলাম, আমাদের শরৎ চাটুজ্জে মশায়ের দোসর। আবার ওদিক বড়-কর্তাদেরও একজন—সাংস্কৃতিক মন্ত্রী। চেহারায় পোশাকে কিংবা ভাবে-ভঙ্গিমায় অবশ্য টের পাবেন না। কথার তুবড়ি ছুটছে। মাও তুন চীনা বলছেন, আমাদের কেউ-ইংরেজি কেউ বা স্প্যানিশ। গোটা দুই-তিন দোভাষি ছেলেমেয়ে টপাটপ এ-ভাষা ও-ভাষায় তর্জমা করে করে এর ঠোঁটের কথা ওর কানে এনে জুড়ে দিচ্ছে। খুব জমেছে।

তখন আচ্ছা করে বললাম মাও তুনকে। এটা কেমন হল মশায়? রবীন্দ্রনাথ এলে খুব তাঁকে তোয়াজ করলেন, কলেজ অব আর্টস-এ তাঁর বিশাল ছবি। ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে আধুনিক ভারতীয় বই বলতে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি বইগুলো। তিনিও দেশে ফিরে চীনাভবন গড়লেন শান্তিনিকেতনে। আমাদের চিরকালের ভালবাসা তাঁকে দিয়েই ফের জমজমাট হল। আর এখানে সেই রবীন্দ্রনাথের ভাষা বাংলার অনাদর! কলকাতা য়্যুনিভার্সিটি চীনা ভাষা পড়াচ্ছে; কিন্তু ভারতীয় ভাষাগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম যে বাংলা—

আর যাবে কোথায়! ডাইনের টেবিলে তাকিয়ে দেখিনি—রে-রে রব উঠল সেদিক থেকে। বাংলা-বাংলা করে তড়পাচ্ছেন, রাষ্ট্রভাষাটা বুঝি ফেলনা হয়ে গেল?

হিন্দী-ভাষী বন্ধুকে তাড়াতাড়ি নিরস্ত করি: ঠিক কথা? ভাষাই তো হল দুটো—বাংলা আর হিন্দী।

বাঁয়ের টেবিলে অমনি ফোঁস করে ওঠেন, দক্ষিণের দ্রাবিড় ভাষাগুলোর খোঁজ রাখেন? না জেনে-শুনে আপ্তবাক্য ছাড়বেন না।

শান্তির সৈনিক হয়ে অশান্তির আলোড়ন তোলা চলে না। সেদিকে ফিরে ঘাড় নাড়তে হয়ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ—ভারতীয় সমস্ত ভাষাই অতি উত্তম।

এবং সকলে মিলে ওপক্ষকে চেপে ধরা গেল, হিন্দীর জন্য ঐ দেড়খানা অধ্যাপক রেখেই হয়ে গেল? আর কি করছেন বলুন? এবারে আমাদের যে-ই আসুক, নিজের ভাষায় কথা বলে যাবে। না বুঝতে পারেন, নাচার।

ওঁরা দোষ কবুল করেন। ঝামেলা কত রকম বিবেচনা করুন। অদূরে কোরিয়ার লড়াই। সকল দিককার তাল সামলাতে হচ্ছে, ভারতীর ভাষার ব্যাপারে তাই যথাযথ মনোযোগ দেওয়া যায় নি। কিন্তু বাংলা শেখাবার লোক কোথা পাওয়া যায়, সে-ও তো এক মহা ভাবনা!

কত চাই? বদলাবদলি চলুক না—ওখান থেকে বাংলা শেখাবার লোক আসবেন এদিক থেকে গিয়ে চীনা শেখাবেন। সেকালে যেমন শিক্ষক-ছাত্রের স্বচ্ছন্দ যাতায়াত ছিল।

কিন্তু দেখুন কাণ্ড! গড়াতে গড়াতে এ কোথায় এসে পড়েছি! গল্প জুড়ে বসলে তার ঠিক থাকে না। ভোজের আসরে ওদিকে জাপানি বন্ধুরা। খানাপিনা এবং বক্তৃতাদি সারা হয়েছে, আজেবাজে কথা এখনো বেশ খানিকক্ষণ চলতে পারে।

ছাড়পত্র দেয়নি, এসে পৌঁছলে তোমার কেমন করে ভাই? ডাঙা-পথ হলে বুঝতাম, কোন গতিকে সীমানা পেরিয়ে পাহাড়-জঙ্গল ভেঙে হাঁটিতে হাঁটতে চলে এসেছে। এ যে জল—জাহাজ ছাড়া গতি নেই। একটি-দুটি নয়—এতজন কি করে পার হবে উত্তাল সমুদ্র?

ওরা হাসে, বলবে না গুহ্য কথা। যা দিনকাল—আরো কতবার হয়তো এমনি হবে। কার মনে কি আছে, এতগুলোর মধ্যে মতলববাজও থাকতে পারে দু-চারটি—ফাঁস করে দিয়ে শেষটা মুশকিলে পড়ে আর কি!

তা না বলো তো বয়েই গেল! ভারি এক ব্যাপার! আমাদেরও ঢের ঢের জানা আছে। দায়ে পড়লে কায়দা বেরোয় মস্তিষ্ক ফুঁড়ে। রাসবিহারী বোস দিন দুপুরে চাঁদপাল-ঘাটে জাহাজে উঠলেন—সেই ঘাটেরই দেয়ালে তাঁর ছাপানো ছবি, ছবির নিচে মোটা অঙ্ক ফেলা আছে মাথার মূল্য হিসাবে। নেতাজি নিশিরাত্রে এলগিন রোডে মোটরে চাপলেন। সিপাহি-সান্ত্রী ঝিমিয়ে পড়ে ঠিক সময়টা। ঝিম-ঝিম করে রাত, নিঃসীম স্তব্ধতা। কে যায়? যুগ-যুগান্ত ধরে আমরা চলি এমনি আগুন হাতে। আঁধারের মধ্যে আলো ছড়াই, পঙ্গুর পায়ে পাহাড় ডিঙোবার বলের যোগান দিই। নিঃসহায় তুচ্ছাতিতুচ্ছ

একটি-দুটি প্রাণী—কিন্তু ইতিহাসের আমরা মোড় ঘুরিয়ে দিই, ভাবীকাল উজ্জ্বল বাহু বাড়িয়ে সমাদরে তুলে ধরে…

(৪)

বিকালে শান্তি-সম্মেলন চলছে—তার মধ্যে এক ব্যাপার। ভারতীয়দের তরফ থেকে কোরিয়ানদের উপহার দেওয়া হল—কী আর এমন জিনিস—জয়পুরী কাজ-করা কুঁজো, টেবিল-ঢাকা, আর ফুলের তোড়া। একটা বক্তৃতা সারা হতে গম্ভীর বাজনা বেজে উঠল হঠাৎ—উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল সকলে পিছন-দরজায়—দরজা খুলে গেল। পাঁচটি ভারতীয় মেয়ে ফুল আর জিনিস ক'টি নিয়ে প্লাটফরমের দিকে চলেছেন—কিচলু অগ্রবর্তী। কোরিয়ানদের মধ্যে দুটি মেয়ে—উপহার তাদের হাতে দিতে সে কী ভয়ঙ্কর হাততালি। আমাদের মেয়েদের তারা জড়িয়ে ধরল গভীর আলিঙ্গনে। ডুবন্ত মানুষের দিকে কারা যেন স্নেহের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে—সেই হাত যেমন শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। কিছুতে ছাড়বে না। তারপর ছেড়ে দিল তো এ-মুখে ও-মুখে চুম্বন করছে বারম্বার। বাইরে দেশের থেকে ধ্বংস আর মৃত্যুই পাচ্ছে ওরা, তাই যেন অভ্যাস—ভালবাসা এই প্রথম পেল। পেয়ে যেন পাগল হয়ে গেছে। শ্রোতৃমণ্ডলীর চোখে জল এসে যায়—বিশাল হলের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত সকলে চোখ মুছছে।

সেদিন সন্ধ্যার পর সাত তলার খানা-ঘরে খেতে যাচ্ছি। লিফটে দেখা হল কোরিয়ান কজন—তার মধ্যে মেয়ে দুটিও। তাকাচ্ছে আমার দিকে। বললাম, ইণ্ডিয়ান। সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিল সকলে। দোতলা থেকে সাত তলা—কতটুকুই বা? হাতগুলো ছোঁয়াও হল না। অনেক গেছে তাদের—ঘরবাড়ি চুরমার হয়েছে, রক্তে দেশ ভাসছে। জীবাণু-বোমার নিখুঁত বন্দোবস্ত, সকালবেলা এই হাসাহাসি ঝাঁপাঝাঁপি করছি, দুপুরের আগেই হয় তো ভবলীলা-সমাপন। পৃথিবীর এক অতি-মহৎ অতি-প্রাচীন দেশ আজকে তাদের অমৃত পান করাল—সেই নেশায় আবিষ্ট এখনো। ওরা জেনে বুঝে আছে, শক্তিমানের ভাণ্ডারে মারণাস্ত্রই শুধু—এই টের পেল দেশদেশান্তরের হৃদয়ে হৃদয়ে প্রীতি ও সমবেদনার সম্ভার। নিরাশ হবার কি আছে?

খানা-ঘর ভরতি, জায়গা খুঁজে পাইনে। এক প্রান্তে ছোট এক টেবিলে দু-জন গুজরাটি আর জন তিনেক বিদেশি। কায়ক্লেশে আরও একটা জায়গা

হতে পারে। বসলাম চেয়ার টেনে নিয়ে। বিদেশিরা অস্ট্রিয়া থেকে আসছেন—বাক্যের এক বর্ণও বুঝিনে। ঐ না-বোঝা নিয়ে-ই হাসাহাসি চলল। খেয়ে দেয়ে উঠে গেল তারা। সেই দুই চেয়ার দখল করলেন তখন আর এক শ্বেতাঙ্গিনী, এবং এক শ্বেত-পুরুষ।

পুরুষটির সঙ্গে আলাপ জমাই, ইংরেজি জানো তুমি?

ঘাড় নাড়লেন। রক্ষে পেলাম, জানেন তিনি ইংরেজি। এই পিকিনেই আছেন অনেক কাল। কুয়োমিনটাঙের আমল থেকে।

তাজ্জব লাগে মশায়, যেদিকে তাকাই ঝকঝক-তকতক করছে। কলকাতায় বিস্তর চীনা আছেন, তাঁদের দেখে চীন সম্বন্ধে উলটো ধারণা হয়েছিল।

ভদ্রলোক বললেন, বিদেশে গিয়ে তাঁরা হয়তো অমনি হয়ে গেছেন। পরিচ্ছন্ন চিরকালই এ জাতটা। নতুন আমলে পরিচ্ছন্নতা যেন নেশায় ধরেছে।

মহিলাটি একমনে নিজকর্মে রত ছিলেন। আমাদের কথার মধ্যে সহাস্য মুখ তুলে ভাঙ্গা ইংরেজিতে বললেন, ভারত থেকে আসছ? আমি সুইডিশ, ফরাসি বলি। কিন্তু দেখছ তো, ইংরেজিও বলতে পারি—

খাওয়াটা ইতিপূর্বেই দ্রুতহাতে প্রায় সমাধা করে এনেছেন—তাঁকে এখন ঠেকায় কে? গড়গড় করে একাই বলে চলেছেন—কমা-সেমিকোলন নেই যে তার ভিতরে পালটা কেউ একটা-দুটো জবাব গুঁজে দেবে। নাম-ধাম জাত-জন্মের নিজেই পরিচয় দিচ্ছেন। আইনজীবী আন্তর্জাতিক সংঘের বড় পাণ্ডা। বলুন তাই, কথা বিক্রিই পেশা। তার উপর স্ত্রীলোক। মণিকাঞ্চন যোগাযোগ—তবে আর এমন হবে না কেন বলুন।

তিনটে দিন পরে এই মহিলার বক্তৃতা হল শান্তি-সম্মেলনে। সে-ও এক তাজ্জব। জলের মতো প্রমাণ করে দিলেন, শান্তিকামী মানুষেরাই আসলে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট। যাদের কাজে ভুবনের শান্তি বিঘ্নিত হয়, ধরে ধরে তাদেরই কাঠগড়ায় তোলা উচিত; এবং বিচারান্তে চরম শাস্তি। আমি এই যেমন দু-কথায় সেরে দিলাম, তেমনটি ভাববেন না। দেশ-বিদেশের পাহাড়প্রমাণ আইন-নজির জুটিয়ে অশেষবিধ তর্কবিতর্কের পর শেষকালে সিদ্ধান্তে পৌছলেন।

বলছেন, তোমাদের দলেও তো উকিল-ব্যারিস্টার রয়েছেন। যত দেশের যত আইনবাজ এসেছেন, সকলের সঙ্গে আমি মোলাকাত করব। আমাদের ভিতর রীতিমতো বুঝসমঝ থাকা দরকার, যাতে কোনখানে বে-আইনি কিছু ঘটলে একসঙ্গে দুনিয়ার টনক নড়ে ওঠে।

তার পরে সকলের দিকে নয়ন তুলে পাইকারি প্রশ্ন, কি কারো তোমরা ?

গুজরাট ভদ্রলোক উধাকান্ত শেঠ আমার পরিচয় দিলেন, নানা বিশেষণ জুড়ে ওজন বাড়িয়েই বললেন।

লেখক ? বিগলিত কণ্ঠে মহিলা বললেন, নামটা কি বলো দিকি ? হ্যাঁ হ্যাঁ—ঢের জানি, তোমার কত বই পড়েছি—

সবিনয়ে প্রতিবাদ করি, আজ্ঞে না। আপনার ভুল হচ্ছে।

নছোড়বান্দা তিনি। এই দেখ, ভেবে রেখেছ—আইনের বই ছাড়া আর আমি কিছু পড়িনে। জানি তোমর নাম—এক-আধটা নয়, বিস্তর বই পড়েছি তোমার। আচ্ছা, বলে দিচ্ছি—ইংরেজিতে তোমার কি কি বই আছে, শুনি ?

একটাও নয়—

কোন বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ হয় নি ?

গল্প পাঁচ-দশটার। গোটা বই একটারও নয়।*

সে কি ! বিস্তর শুনেছি যে তোমার নাম—বাসু...বাসু...

বাসু (বসু) অমন দশ-বিশ হাজার আছেন আমাদের দেশে। বিস্তর গুণীজ্ঞানীও আছেন, তাঁদেরই কারো নাম শুনে থাকবেন। আমার লেখা চা-সন্দেশ কবুল করেও পাঠকদের পড়াতে পারিনে, আপনি নিজের থেকে কোন দুঃখে পড়তে যাবেন ?

না হে, পড়েছি আমি। আছে তোমার বই ইংরেজিতে—তুমি জানো না। যাকগে—একটা বাণী দিতে হবে আমার দেশের সাহিত্যিকদের জন্য। তাঁরা খুশি হবে। কাল আবার খানা-ঘরে দেখা হচ্ছে তো ? সেই সময় চাই।

খানা-ঘরে সেই থেকে দেখেশুনে ঢুকতে হত। আবার তাঁর খপ্পরে গিয়ে না পড়ি !

(৫)

পূর্ণিমা রাত—এত হুল্লোড়ে আকাশ পানে তাকাই কখন, কে জানে অত শত খবর !

জানিয়ে দিয়ে গেলেন অধ্যাপক চেন।

তৈরি থাকবেন মশায়রা, খেয়েদেয়েই শয্যা নেবেন না। চাঁদের আলোয় ভেসে ভেসে বেড়াবো।

* তখনকার কথা। এখন অনেক বইয়ের ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ হয়েছে।

রাত্রি ঠিক দশটা," সেই সময় এলেন তাঁরা। জোর-জবরদস্তি নেই, যাঁর যাঁর খুশি চলে আসুন। একটা মাত্র বাস—সেইটে কোন গতিকে বোঝাই হলো। আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না, তার উপরেও চারিদিক আলোয় আলোয় সাজিয়েছে। বছরের একটা বড় পরব। পরবের নাম তর্জমা করলে দাঁড়ায় —'মধ্য শারদ রাত্রির উৎসব।'

অধ্যাপক চেন মানে করে বোঝাচ্ছেন। আমুদে মানুষ—কথায় কথায় হাসিরহস্য। অথচ বিদ্যার বারিধি। তামাম জগৎ চষে বেড়িয়েছেন ; ভারত ঘুরে গেছেন মাস কয়েক আগে, কলকাতার অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। সেটা অবশ্য বড়-কিছু নয়। আমার সঙ্গে এই তো আজ সর্বপ্রথম দেখা—ঘনিষ্ঠ হতে মিনিট দুই লাগল। ঘড়ি ধরে দেখেছি, দু-মিনিটের কম বই বেশি নয়।

হোটেল থেকে ডাইনে ঘুরে নিষিদ্ধ-শহরের রঙিন পাঁচিলের পাশে পাশে বাস চলেছে। তারপর তারই মধ্যে ঢুকে পড়ল এক সময়। চলেছে, চলেছে …মাঠের প্রান্তে এসে থেমে দাঁড়াল। ফটক পার হয়ে হুড়মুড় করে সকলে ঢুকে পড়লাম।

পে-হাই পার্ক। পে-হাই কথার মানে হল উত্তর-সমুদ্র। লেক আছে ; লেকটা বড় বটে—লেকের দরুন তোলা-মাটিতে মাঝারি সাইজের পাহাড় গড়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও সমুদ্র বলতে কেমন-কেমন লাগে। গল্পটা আগে করেছি। রাজঅন্তঃপুরিকারা বাইরের সমুদ্র চোখে তো দেখবে না—তা এই সমুদ্রই দেখে নাও নয়ন ভরে। আসল সমুদ্র আয়তনে খুব খানিকটা না হয় বড়ই হবে—আবার কি! পে-হাইয়ের মতো সমুদ্র আরও অনেক আছে নিষিদ্ধ-শহরের ভিতর—দক্ষিণ-সমুদ্র, মধ্য-সমুদ্র। আর তোলা-মাটির পাহাড় সমুদ্রগুলোর পাশে পাশে ; দূরদুরান্তর থেকে সত্যিকার পাথরের চাঁই এনে সেই সব পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে বসানো। তবে আর কি দরকার রইল চাল-চিঁড়ে আঁচলে বেঁধে পাহাড়-সমুদ্র দেখতে বেরুবার? দুঃখ কিসের তবে আর রাজবধূ? নিষিদ্ধ-শহরের ভিতরেই ঘুরে ঘুরে খোদাতালার দুনিয়া দেখ।

এত রাত হয়েছে, তবু কত মানুষ! ঘুরে বেড়াচ্ছে, লেকের উপর নৌকা বাইছে, আড্ডা দিচ্ছে এখানে-ওখানে বসে পড়ে। দলে দলে বেড়াচ্ছে কলেজি ছেলেমেয়ে। এমনটা রোজ হয় না—আজকে, শুধু এই পরবের রাতেই, হস্টেলের দরজা অনেক রাত অবধি খোলা থাকছে। গান ধরেছে এক-একটা দল—এদিক-ওদিক থেকে গান ভেসে আসছে। আর চকিত হাস্যধ্বনি।

মনে পড়ে গেল, আমার বাংলাদেশেও এমনি! কোজাগরী রাত্রি—

লক্ষ্মীপূর্ণিমা। নাটমণ্ডপে পাশা চলছে—গ্রামের মানুষের জটলা। হুঙ্কার দিয়ে নির্জীব শুষ্ক অঙ্ককে শুনিয়ে দিচ্ছে, কোন দান পড়তে হবে এইবার। দানটা পড়ল তো উল্লাসের ধাক্কায় ঘরবাড়ি কাঁপতে থাকে। হুঁকো ফিরছে হাতে হাতে। পাথরের খোরায় চিঁড়ে ভেজানো নারিকেল-জলে। আজকে ফলাহার এবং নিশি-জাগরণ চারিপ্রহর। এরই মাঝে ক্ষণে ক্ষণে কর্তা উন্মনা হয়ে বাইরে তাকান। কে মেয়েটা ঐ, ধবধবে কাপড়-পরা? উহুঁ, গোয়াল-গাদার পাশে জ্যোৎস্না পড়ে ঐ রকমটা দেখাচ্ছে। তা আসবেন তিনি ঠিক—এমনি শারদ পূর্ণিমা রাত্রে ফুটফুটে-রং হাস্যমুখী লক্ষ্মীঠাকরুন মর্ত্যলোকে নেমে আসেন। গ্রামের সুঁড়ি-পথে ডালপালার ছায়ায় ছায়ায় জ্যোৎস্না পড়ে আলপনা এঁকে দিয়েছে। তারই উপর পদ্মফুলের মতো কোমল পা ফেলে ফেলে নিঃশব্দে তিনি এ-বাড়ি ও-বাড়ি উঁকিঝুঁকি দিয়ে বেড়ান। কে জেগে আছ গো? পায়ের ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় সারা উঠান শুচি হয়ে যায়—এই তো, আর ক'দিন পরে মাঠের হৈমন্তী ধান তুলবে এনে ওখানে। ঝি-বউ সকলে এতক্ষণে জেগে ছিল—পুজোআচ্চার পরে গল্পগুজব করছিল কিংবা বিন্তি খেলছিল। তা চোখ যদি ঝিমিয়েই পড়ে থাকে, তাদের জেলে-দেওয়া পূজার প্রদীপ তো রয়েছে। প্রদীপ নেভাবার নিয়ম নেই, সারারাত্রি এমনি জ্বলবে। মিটি-মিটি দীপের আলোয় লক্ষ্মী দেবীও আর এক কুমারী মেয়ে হয়ে ঘুমন্ত গ্রাম্যকন্যাদের মধ্যে একটুখানি বসে পড়েন।

ছেলেবেলা এমনি ছবি গ্রামে দেখেছি। পে-হাই পার্কে ঘুরতে ঘুরতে তাই মনে পড়ল! পালপার্বণেও এত মিল দুটো দেশের মধ্যে!

কথা হল, নৌকোয় করে চলে যাবো লেকের শেষ প্রান্ত অবধি; পায়ে হেঁটে ফিরব। কম সময়ে বিস্তর জিনিস দেখা যাবে। কিন্তু ঘাট হা-হা করছে, কোথায় নৌকো? বিস্তর খোঁজাখুঁজিতে শেষ অবধি মিলল একটা বটে, কিন্তু মাঝি নেই। এত রাতে কে বসে রয়েছে আপনার নৌকো বেয়ে দেবার জন্যে? নৌকো বেঁধে রেখে সে-ও হয়তো গান ধরেছে কোন পাহাড়তলীর বাঁশঝোপে।

পায়ে হাঁটা ছাড়া অতএব গতি নেই। রোহিণী ভাটকে জিজ্ঞাসা করি, পথ অনেকটা কিন্তু। পারবেন?

ঘাড় দুলিয়ে তিনি বললেন, হাঁটতে আমি খুব পারি।

এই এক ডাহা মিথ্যা বলে বসলেন। স্বচক্ষে দেখেছি সেদিন মহাপ্রাচীরের উপর ওঠা। হাঁটেন না তো উনি; নাচুনে মেয়ে—চলেন নাচের চালে। কিংবা বাতাসে লঘুদেহের ভর রেখে আঁচল মেলে পাখির মতো।

লেকের গা বেয়ে বাঁধানো পথ। ঘাটের যত নৌকো কারা সরিয়েছিল, এবার ঠাহর হচ্ছে। ডানপিটে যত কলেজি ছেলেমেয়ে। মাঝির তোয়াক্কা রাখে না, নিজেরাই বাইছে। নৌকোর পর নৌকো যাচ্ছে সাঁ-সাঁ করে জল কাটিয়ে। জ্যোৎস্নায় ঝিলিক দিচ্ছে। আর তার সঙ্গে দু-এক টুকরো হাসি, দু-এক কলি গান, একটু বা বাজনা। আমাদের গাঙে পৌষ-সংক্রান্তির সেই বাইচখেলা যেন। অধ্যাপক চেন বললেন, রাতে বুঝতে পারছ না—এই লেকের জল অবিকল কাশীর গঙ্গার মতো। ভারতে ঘুরে আসার পর প্রতি কথায় তিনি ভারতবর্ষ এনে ফেলেন।

আর এই ডক্টর আলিম। ইতিহাস একেবারে গুলে খেয়ে আছেন। পা ফেলতে না ফেলতে জায়গাটার হাড়হদ্দ বিশ পুরুষের খবর। খ্রীষ্টীয় নয় শতকে এই রাজ্যোদ্যান গড়তে হাত লাগানো হয়। তারপর কাজ কখনো টগবগিয়ে চলেছে, কখনো ঢিমে-তেতালায়; কখনো বা বিলকুল বন্ধ। সামনে ঐ যে সকলের বড় পাহাড়টা—বানানো-পাহাড় বলে নাক সিঁটকাবেন না, উঠে বুঝুন না গায়ে কত দূর শক্তি ধরেন। চড়াই-উতরাই, গুহা, গাছপালা—চাই কি হোঁচট খাবার পাথরের চাঁই অবধি রয়েছে। রাজরাজড়ার গড়া জিনিস—ঈশ্বরের চেয়ে তাঁরা বড় বেশি কম যান না। (ঝরনা দেখি নি, এই একটা ব্যাপারেই ঈশ্বরের জিত।) চূড়ায় সমাধি-মন্দির। এক তিব্বতী লামা মারা যান; শবদেহ তিব্বতে পাঠানো হয়েছিল—মন্দির রচিত হল তাঁর স্মৃতিতে। নিয়মমাফিক এক ঝুটো সমাধিও তৈরি আছে মন্দিরের ভিতরে।

সেইখানে আমরা উঠছি। হিমরাত্রি, কিন্তু গায়ে ঘাম দিল—পা আর চলে না। সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে আনন্দ-মূর্তি ঐ ছেলেমেয়ের দল ধুপধাপ করে উঠে যাচ্ছে। গান গাইছে, মাউথ-অর্গান বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে, নাচছেও কখনো কখনো। তখন নিজের উপর রাগ ধরে যায়। ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে যায়, আমরা না হয় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই চলি—ফিরে গেলে বড্ড অপমান। আমাদের গ্রামের বিলে দেখেছি, অগুন্তি আলেয়ার মুখে দপ-দপ করে আগুন ওঠে। আলোর লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে পথিককে তারা তেপান্তরে নিয়ে ফেলে। এরাও এদিকে-সেদিকে তেমনি ছুটোছুটি দাপাদাপি করে আমাদের চূড়োয় নিয়ে তুলল।

আলো-ঝলমল রাতের পিকিন চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। আর কি জ্যোৎস্না! রাত দুপুরে দিনমান। মন্দির ও সমাধি দেখছি চারিপাশে বারাণ্ডায় ঘুরে ঘুরে। মন্দিরের গায়ে অগুন্তি বুদ্ধমূর্তি। নাক-ভাঙা—এই এক

মজা দেখছি, শত শত মূর্তির মধ্যে একটিরও নাক আস্ত নেই। নাকের উপর এত আক্রোশ কেন বলুন দিকি? ওদের মঙ্গোল-মুখের উপরে থ্যাবড়া নাক থাকে বলে? এক জনে—ছাত্রই হবে—বলল, জাপানিদের কীর্তি। ডক্টর আলিম তা মানেন না, ইতিহাস এমন কথা বলে না কোথাও।

এই ঊর্ধ্বলোকেও চা-কফি-সরবতের দোকান। লোকে খাচ্ছে আর গুলতানি করছে। এখানে-ওখানে মগ্ন হয়ে বসেও কত জন—জ্যোৎস্না-রাত্রির রূপ দেখছে। হঠাৎ ঝোপঝাড়ের দিক থেকে বাঁশির আওয়াজ আসে—ছায়ামূর্তি ঐ যেন কারা! ঘড়ি দেখে শিউরে উঠি—বারোটা বেজে গেছে। আর নয়, আর নয়—পালানো যাক।

তা বলে এত সহজে? মোড় ঘুরে দেখি, পথ আটকেছে অনেক ছেলে। হাত বাড়িয়েছে, শেকহ্যাণ্ড করবে। আমরা এই ক-জন আর ওরা অতগুলো—ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে হাড়ের নড়া ছিঁড়ে দেয়। কোন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র তারা। চেন আমাদের জনে জনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। জকার উঠছে; হোপিং ওয়ানশোয়ে—শান্তি দীর্ঘজীবী হোক। ক্ষমা দেও লক্ষ্মীভাইরা এবারে যাই—। শান্তি-সৈনিক—বুঝতে পারছ তো? বেশ এক ঘুম ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার, সকালে চোখ মুছেই আবার গিয়ে সম্মেলনে বসতে হবে।

পরীক্ষা দিতে যেতে হবে—কটা চীনা কথা বলুন, তবে ছুটি। বলে ফেলুন—

একটা কেন—অমন এক গণ্ডা কথা ইতিমধ্যে জমেছে ভাণ্ডারে। পরোয় কিসের? লাগসই বুঝে ছেড়ে দিলাম—ছে-ছে অর্থাৎ ধন্যবাদ।

এবারে তাদের চেপে ধরি, বাংলা বলো। টেগোরের ভাষা—বলতে হবে একটা বাংলা কথা।

বেবাক হার। বোবা হয়ে রইল। দূও—দূও—আসবে আর লাগতে? ছাড়ো পথ। কিন্তু হেরে গিয়েও ছেড়ে দেব না। শিখিয়ে দিয়ে যাও বাংলা একটুখানি। শুনুন আবদার—রাত দুপুরে এখন টিলার উপরে ক্লাস করতে বসে যাই!

হাত ছাড়িয়ে পালাতে বড্ড দেরি হল। জোরপায়ে নামছি। একটা বড় জিনিস দেখা বাকি রইল—সাত ড্রাগনের দেয়াল। নাম ঐ বটে, ড্রাগন গুণতিতে ডবল। এ-পিঠে সাত, ও-পিঠে সাত। চেন বললেন, বাকিই থাক মশায়। আবার একদিন আসতে হবে এই লোভে লোভে। দু-দিন কেন, দশ দিন এলেও ক্ষতিও নেই এ জায়গায়।

চওড়া রাস্তা—মাঝখানটা বাঁধানো, ঢালু হয়ে ক্রমশ নেমে গেছে। রোহিণী পাশের দিকে চলতে চলতে পা পিছলে যাচ্ছিলেন। চেন বলেন, পথ হাঁটবার সময় মাঝামাঝি যেও সব সময়। বিপদ ঘটবে না।

আলিম বলেন, রাজনীতিতেও। মাঝ-রাস্তা সব ক্ষেত্রেই ভালো।

খানিকটা দূরে আর এক মাটির পাহাড়, তার উপরে প্রাসাদ। জ্যোৎস্না বলেই নজরে আসছে। আজ এই উৎসব-নিশীথে সারা শহর আলোর মালা পরেছে—শুধু কেন্দ্রভূমে ঐ জায়গাটুকুই নীরন্ধ্র অন্ধকার। আলো জ্বালতে মানা, দুয়োর খুলতে মানা—অন্ধকার হয়ে থাকবে প্রাসাদ-কক্ষগুলো দিবারাত্রি। শেষ সুঙ-রাজা ওখানে আত্মহত্যা করেন। জানি না, বিলাসলাস্য-নিক্কণিত নিষিদ্ধ-নগরের সর্বময় প্রভু শক্তিধর সম্রাটের কি ছিল অন্তর-বেদনা!

মার্বেল পাথরের মনোরম সেতু পার হয়ে বাসের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি। দলের দুটি লোকের সন্ধান নেই। জ্যোৎস্নালোকিত এই মায়াপুরীতে কোথায় তাঁরা পাগল হয়ে ঘুরছেন, সময়ের খেলায় নেই। ডাকতে চলে গেলেন একজন। কি ব্যাপার, তিনিও ফৌত। তারপর আবার একজন। এখনও দলে দলে মানুষ এসে ঢুকছে। বাসের হর্ন টিপে এই বিপুল উল্লাসের তাল ভাঙা যায় না। কি করব, শীতার্ত জ্যোৎস্নার মধ্যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি।

(৬)

গৌরাঙ্গ মাস্টার মশায় সেকালে আমাদের ভূগোল পড়াতেন। ছেলেরা বলাবলি করত, গৌরাঙ্গ নয়—গণ্ডার মাস্টার। উঃ, কি পিটুনিই দিতেন! শ্রীকৃষ্ণের শত নামের মতন ভুবনের যাবতীয় জনপদ তাঁর ঠোঁটের আগায়। দেয়াল ম্যাপ টাঙানো—মুখের কথার রেশ না মেলাতেই ম্যাপের উপর দেশ দেখাতে হবে। ঈশ্বরকে শাপশাপান্ত করতাম মনে মনে—এত বড় ভুবন কেন গড়ালে প্রভু, কেন এত সব রকমারি জায়গা? একমাত্র উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে, গ্রামবালকগুলোকে গৌরাঙ্গ মাস্টারের বেত খাওয়ানো। এ ছাড়া আর কি হতে পারে?

তারপর উঁচু ক্লাসে উঠে গৌরাঙ্গের বেতের দাগ অঙ্গ থেকে মেলালো—ভূগোল তৎপূর্বেই বেমালুম মিলিয়ে গেছে মন থেকে। সে এক দুঃস্বপ্ন! শত শত শুকনো নাম, আর সপাং-সপাং বেতের আওয়াজ। অনেক দিন অবধি আঁতকে উঠেছি পুরানো কথা মনে ভেবে।

সেই নামগুলো মানুষের মূর্তি হয়ে আজকে এক ঘরে জমেছে। ভুবন

অতি ছোট—বাল্যের কামনা পুরল এত দিনে। পাহাড়-সমুদ্র ব্যবধানের দেশ-ভূঁইরা মিলে মিশে দিব্যি যেন এক সংসার রচনা করেছে। সারির মাথায় মাথায়, দেখ, নানান দেশের নামের ফলক আঁটা; আর সেই সঙ্গে ছোট এক এক পতাকা। কনফারেন্সের চেয়ে বিরতিগুলোই বেশি আরামের। ঘণ্টা দেড়েক চলবার পর খানিকক্ষণের ছুটি। নিন, দেহমন চাঙ্গা-করে আসুন। পিছনের লাউঞ্জে এবং আরও পিছনে এদিক-ওদিকের ঘরগুলোয় আঙুর, কলা, আপেল, কেক, সাণ্ডুইচ, কফি, চা, মিনারেল-ওয়াটার—। নিজের হাতে যত দফায় যেমন খুশি তুলে নিন। দোভাষি ছেলেমেয়েগুলো ঘুরছে পরস্পরের কথা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য! কোন কিছুর অকুলান দেখলে—হয়তো বা গেলাস পাচ্ছেন না অরেঞ্জেড ঢেলে নেবার, কিংবা কাপগুলোর চা ঢেলে খেয়ে গেছে—ছুটে জোগাড় করে এনে হাতে দেবে। এই রে, ভুল করে নানান অকথ্য খবর দিয়ে বসলাম!···শীতের স্নিগ্ধ রোদে আসুন ঘুরে ঘুরে বেড়াই পিছনের প্রকাণ্ড মাঠে। বেড়ানো কি বলছি—আক্রমণ, ঝাঁপিয়ে এসে পড়ছে একে অন্যের উপর। কোন জায়গার মশায় আপনি? আমি ইকুয়েডরের আমি এল-স্যালভেডরের। পেরু থেকে আসছি আমি। আমি পানামা থেকে। আমার নিবাস ইরাক।···আপনার আমারি মতোই দু-হাত দু-চোখ-বিশিষ্ট মানুষ সকলে (বিশ্বাস করছেন তো পাঠক?)—হো-হো করে হাসে মজাদার কথায়, মেয়েগুলো বাহার করে মন ভোলায়, প্রশংসা-বাণীতে গলে পড়ে। এর মধ্যে সাধ্য কি আপনি আলতো হয়ে নিজ মহিমায় বিচরণ করবেন! আরে ছোঃ—এরই নাম দুনিয়া, এরাই সব দুনিয়ার মানুষ! ভাবনা কিসের তবে, কেন মানুষটার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারি নে? দুনিয়া তবে তো আমারই! কনফারেন্সের ব্যাপারে গিয়েছিলাম বটে...কিন্তু সত্যি বলছি, শুধুমাত্র বক্তৃতার কচকচানি হলে ফিরে এসে জাঁক করে এই রকম আসরে বসতাম না আপনাদের নিয়ে। উঁচু প্লাটফরমে উঠলেই বক্তা আপ্তবাক্য ছাড়তে শুরু করেন···কি এদেশে, কি সেদেশে। সে আর নতুন কি? কনফারেন্সের কথা রাজনীতি ধুরন্ধরেরা বলুন গে...আমি যে ওরই মধ্যে ভুবনের সঙ্গেও যৎকিঞ্চিৎ মোলাকাত সেরে এসেছি, ঐ এক আনন্দ নানারকম সুর ভেঁজে আপনাদের শোনাই।

বক্তৃতার পর বক্তৃতা। দিন তিনেক তো কেটে গেল, থামবার গতিক দেখিনে। পুরো দশ দিন চলবে নাকি। দু-বেলা হচ্ছে, তাতে কুলোবে না···শুনি, রাত্রিবেলাও বসতে হবে মাঝে মাঝে। ওরে বাবা, ইস্কুলের ছেলে-

মেয়ে বানিয়ে ফেলেছে আমাদের। আরও মুশকিল, প্রাজ্ঞ প্রবীণ সকলে—তিলেক মাত্র চাপল্য দেখানো চলবে না। পাকাচুল ব্রেজিলের ব্যক্তিটি দৈবাৎ হাই তুলে ফেলেছেন—চারিদিক তাকিয়ে ধড়মড় করে খাড়া হয়ে বসলেন আবার। পরম মনোযোগে বক্তৃতা শুনছেন—উঁহু, ভূমিকম্প জলস্তম্ভ দাবানল যাই ঘটুক না কেন আর তিনি মুখ ফেরাচ্ছেন না মঞ্চের দিক থেকে।

ভারি এক কাণ্ড হল সেদিন। এক বিদেশিনী পড়ে যাচ্ছিলেন শুনতে শুনতে। মাটিতেই পড়তেন, পাশের মানুষ ধরে ফেলল। বক্তৃতা অতি প্রখর তখন ওদিকে! ক্লান্ত মুদিত-চক্ষু মহিলা—নিশ্বাস পড়ে কি না পড়ে। এত লোক বাদ দিয়ে বক্তৃতার বাণ বিঁধল এসে অবলাজনকে! চাপা উদ্বেগ চতুর্দিকে সকলের মুখে, ক-জনে কর্তাদের খবর দিতে ছুটলেন। জাঁদরেল এক ডাক্তার আমাদের মধ্যে—উঠে গিয়ে তিনি নাড়ি টিপে দেখেন। ও-তরফের নার্স-ডাক্তার স্ট্রেচার-ফাস্টএডের বাহিনী এসে পড়েছে ইতিমধ্যে। সুযোগ পেয়েছে তো ছাড়বে কেন? হাসপাতালে নিয়ে যাবে।

আমাদের ডাক্তার হাঁকিয়ে দেন—উঁহু, কদাপি নয়।

সকলের উদ্বেগ-কাতর প্রশ্ন—হল কি ডাক্তার সাহেব, নাড়ানাড়ির ধকলও সইবে না এ অবস্থায়? বরফ দেওয়া হোক তবে, আর কিছু অষুধপত্তোর?

কিছু নয়, কিছু নয়।

রোগিণীকে সাবধানে বসানো হয়েছে চেয়ারের উপর, ঘাড় এলিয়ে পড়েছে। আহা রে, কী সর্বনাশ বিদেশবিভুয়ে এসে! কিন্তু কঠিন-প্রাণ ডাক্তার সাহেব—ওদের নার্স-ডাক্তার সরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন। ব্যাধিটা তখন মালুম হল—নিদ্রাকর্ষণ। ঝিমুনির মাত্রাধিক্য ঘটেছিল—তার পরে হৈ-চৈয়ের মধ্যে অমনি অবস্থায় নিঃসাড় নিশ্চেতন হয়ে থাকা ছাড়া উপায় কি? ঘুম ভেঙে গিয়ে মূর্ছিত হয়ে থাকেন মান বাঁচানোর দায়ে। ডাক্তার সাহেব হাসতে হাসতে ব্যাপারটা পরে ফাঁস করেছিলেন অন্তরঙ্গ মহলে।

ছবি তুলছে ক্ষণে ক্ষণে—স্থির অস্থির, উভয় রকমের। আমাদের মধ্যে দু-জন এই তালেই আছেন শুধু। ক্যামেরা যখন কোন দিকে তাক করছে, তদনুযায়ী ঘাড় বাড়িয়ে দিচ্ছেন—কোনও ছবি ফসকে না যায়? আসন ছেড়ে কেউ হয়তো বাইরে গেছেন, কিংবা বক্তা রূপে মঞ্চের উপর উঠেছেন—সেই সব খালি জায়গায় কখনো এটায় কখনো ওটায় গিয়ে বসলেন ছবি স্পষ্ট ওঠে যাতে। দেখুন দেখুন—বিশিষ্ট এক ব্যক্তি পড়ায় মগ্ন হয়ে আছেন টেবিলের

খোপে সকলের নজরের আড়ালে বই রেখে। ইস্কুলের ছেলের উপমা দিলাম...
—দিব্যি সেটা লাগসই হয়েছে তবে তো!

হাতে আমার কলম...ইতি-উতি চেয়ে অপর সকলের দোষ টুকে নিচ্ছি। নিজেও পরমহংস নই, এই থেকে মালুম। আজেবাজে এতেক কাহিনী লিখছ লেখক মশাই, এই কি সাচ্চা প্রতিনিধির কাজ? এই জন্যে কি এমন খাসা ফাইল পকেট-বই আর কাগজপত্র দেওয়া হয়েছে? মানি সেটা। কিন্তু একমনে কাঁহাতক এইপ্রকার জবানের পর জবান শোনা যায়? গরজও নেই...টাইপ-করা ও ছাপা যাবতীয় বিবরণই তো আপনা থেকে পেয়ে যাবো।

বিপদ হয়েছে, হলেও ভিতরে যতক্ষণ আছি মাথা থেকে হেডফোন নামাবার জো নেই। সকলে তাকাতাকি করবে। দেখ, দেখ, কী দুর্জন···শুনছে না, কনফারেন্স ফাঁকি দিচ্ছে। তিনিই মহাজন, যিনি ধরা পড়েন না; ধরা পড়লে গোল্লায় গেলেন। দু-কান জুড়ে অবিরত ভ্যানর-ভ্যানর...মাথা খারাপ হবার জোগাড়। তার পরে ভারি এক বুদ্ধি এসে গেল...আহা, কি চমৎকার! সুইচ-বোর্ডে ফালতু যে তিনটে ফুটো আছে, তারই একটায় প্লাগ ঢুকিয়ে দাও। বাস নিশ্চিন্ত...একেবারে বির্বাধ শান্তি। নিরুপদ্রবে তীরবেগে কলম চালাও এবার। সকলের চোখে চোখে সম্ভ্রম...হঁা, খাটনি খাটছেন বটে মানুষটি, বক্তৃতার কমাটুকুও ছাড়ছেন না।

ডাক্তার ফরিদি আমার ডাইনে। লক্ষ্ণৌয়ে বসতি, ভারি দরের ডাক্তার, ডিগ্রির অন্ত নেই। আগের বছর আন্তর্জাতিক চিকিৎসক-সম্মেলনের নিমন্ত্রণ পেয়ে নিউইয়র্ক গিয়েছিলেন। প্রতি দেশ থেকে দু-জন করে প্রতিনিধি··· ভারতের দু-জনের মধ্যে তিনি একটি। তারপর তামাম আমেরিকা চষে বেড়িয়েছেন তিন-চার মাস ধরে। এবারে এই নতুন-চীনে। রসিক মানুষ... ফিসফিসিয়ে মাঝে মাঝে ফষ্টিনষ্টি চলে আমাদের। বলেন, পৃথিবী বেড়ানো মোটামুটি শেষ হল এই বারেরটা দিয়ে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন আমার লেখা।

বই শেষ করে যাচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে?

আজ্ঞে না, শুধু মাত্র দাগা বুলানো। আজকের এই হৃদয়গুলোর আনন্দ-উত্তাপও যদি একটু লিখে নিতে পারি। দেশে ফিরে অনেক রাতে কলম নিয়ে বসব। মন তখন পিছিয়ে এই দিনে পৌছুবে লেখাগুলো ধরে ধরে।

সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন, কোন ভাষায় লিখবেন বই? ইংরেজি...ইংরেজিতে কিন্তু। নইলে আমাদের বঞ্চনা করা হবে।

বইয়ের নামে কৌতূহল অনেকেরই। পিছনের সারি থেকে বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় উঁকি দিচ্ছেন, দেখি কি লিখলেন? হাত ঢাকা দিই। দেখাবার মতন কি কিছু? এই খড়কুটোর উপর মাটি লেপে মূর্তি বানাই, তার পরে দেখবেন।

বাইরে যখন মাঠে ঘুরছি, হাতছানি দিয়ে একজন ডাকলেন। শুনুন, উত্তম চেয়ার-টেবিল, অফুরন্ত সময়, দেদার লিখে যান। আমি এক কায়দা বাতলে দিচ্ছি...

কানের কাছে মুখ এনে চোখ-মুখ ঘুরিয়ে কায়দাটা বাতলে দিলেন। আমি হেসে বললাম, ফালতু ফুটোয় প্লাগ ঢোকানো...এই কর্মই চালাচ্ছি মশায় কয়েকটা দিন।

বলেন, কি, ওটা তো আমারই মাথায় এলো।

দায়ে পড়ে অনেক মাথাই খুলেছে, খোঁজ নিয়ে দেখুন।

ডক্টর কিচলু উঠলে উৎকর্ণ হলাম। এখানে ফাঁকি নয়। সাংস্কৃতিক লেনদেন নিয়ে বলছেন। আমার মনের কথাগুলোই তাঁর কণ্ঠে উদ্দীপ্ত হয়ে বেরুচ্ছে।

"ইউরোপে বিভিন্ন দেশ; কিন্তু সাংস্কৃতিক লেনদেন তাদের মধ্যেই বরাবরই চলেছে। এখনই থমকে যাচ্ছে লড়াইয়ের আলাদা আলাদা ঘাঁটি বানাবার দরুন। এশিয়ার আমরা বহু পুরানো কাল থেকেই এক...মাঝখানটায় কেবল ছন্নছাড়া হয়ে ছিলাম, বিদেশীরা যখন ঘাড়ে চেপে বসল। তাদের সংস্কৃতি বয়ে এনে চাপান দিল আমাদের ঘাড়ে।

"প্রশান্তসাগরীয় অঞ্চলের তাবৎজাতি এখানে জমায়েত হয়েছেন। দক্ষিণ-আমেরিকা ফিলিপাইন নিউজিল্যাণ্ড...ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগটা অনেক কম। প্রীতির বাহু বিস্তার করুন ওঁদের দিকে...সমস্যা একই সকলের। সংস্কৃতি মানে আর এমন ধর্ম ও দর্শন নয়, সাহিত্য ও শিল্প নয়···সামগ্রিক জীবনরীতি। তারই বিস্তারে গোটা দুনিয়া এক হয়ে যাবে, শান্তি আসবে।

"এগিয়ে আসুন লেখক-শিল্পীরা, এদেশে-ওদেশে যাতায়াত ও মেলামেশা করুন। আসুন সাংবাদিক, শিক্ষক, সমাজ-কর্মী, অভিনেতা...সকলেই। চাষী-কারিগর চিনে ফেলুন পরস্পরকে। খেলুড়ের দল খেলাধুলো করুন এদেশে-বিদেশে। বাচ্চাদের মধ্যেও প্রসার হোক ঐক্য-চেতনা খেলনা-পুতুলের লেনদেন চলুক। এদেশের পড়ুয়ারা চলে যাবেন ঐ সব দেশে; ওদেশ থেকে

আসবেন এখানে। বিদেশে পড়াশুনোর জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা হবে। একজিবিশন হবে ; সভা হবে ভুবনের তাবৎ সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিয়ে। সিনেমা নাটক নাচ-গানের পালটাপালটি হবে। ভাষা শিখতে হবে এদেশের ওদেশের ; বইপত্তোর তর্জমা হয়ে ছড়িয়ে যাবে সর্বত্র। বড় বড় ওস্তাদ গুণীজ্ঞানীদের স্মৃতিতে আন্তর্জাতিক উৎসব…"

নিমন্ত্রণ ! কনফারেন্স করছি, সেক্রেটারি-চমূর একজন স্লিপ পাঠিয়ে খবর জানালেন। কয়েকজন চৈনিক পণ্ডিতের বাঞ্ছা হয়েছে…আমাদের পাঁচ জনকে ভোজ খাওয়াবেন…ডক্টর কিচলু, সর্দার পৃথ্বী সিং, অধ্যাপক উপাধ্যায়, কেরালার লেখক জোসেফ মুণ্ডেসরি এবং এই অধম। উক্তোক্তা মহাশয়দের পাণ্ডিত্যে খাদ নেই, তা এই মহৎ ইচ্ছা থেকে মালুম। অধিবেশনের পর হোটেলে না… সোজা চলে যাবো তাদের সঙ্গে, আহারাদি অন্তে পুনশ্চ এইখানে হাজির করে দেবেন বৈকালিক সভাশোভন বাবদে। দুপুরবেলাটা খাটে গড়ানো আজকে কপালে নেই।

আর একটু হাঙ্গামা…দাঁড়িয়ে যান হলের বাইরে এইখানাটায়। গোটা ভারতীয় দল নিয়ে ফোটো তোলা হচ্ছে। ঝানু ব্যক্তিরা তক্কে তক্কে…কিন্তু জুত হল না, রমেশচন্দ্র জায়গা ঠিক করে দিচ্ছেন। বলেছি তো…পয়লা সারির লোক হয়ে দাঁড়িয়েছি, কিচলু সাহেবের পাশেই আমি। আরে দূর…তাই হয় কখনো ? রবিশঙ্কর মহারাজ আর ডক্টর জ্ঞানচাঁদকে মাঝে ঢুকিয়ে নিলাম। সে ছবি দেখেছেন আপনারা বইয়ের গোড়ায়।

সকলে মিলে নিমন্ত্রণ খেতে চললাম দুখানি গাড়ি নিয়ে। তা-বড় পণ্ডিত…অতএব বিস্তর ভাল কথা শুনতে শুনতে যাচ্ছি। এই পিকিনের কথাই ধরুন। অতি-পুরানো…শহর…কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার…গোটা দুই-তিন রাস্তা মাত্র আঁকাবাঁকা ; আর সমস্ত সোজাসুজি চলে গেছে। রাস্তায় রাস্তায় কাটাকাটি সঠিক সমকোণে। প্ল্যান করে শহর বানিয়েছে সেই প্রাচীন কালের ইঞ্জিনিয়াররা ! চওড়া চওড়া রাস্তা ছিল তখন। নতুন আমলে এখন ছোট রাস্তাগুলো বড় করা হচ্ছে…দুপাশের বাড়ি ভেঙে ফেলে। খুঁড়তে গিয়ে মাটির নিচের সেকালের পুরানো পয়ঃপ্রণালী বেরিয়ে পড়ছে। অনেক রকম বিপর্যয় ঘটেছে পিকিনের উপর দিয়ে, চেহারা পালটেছে অনেক বার। কালে কালে মানুষ রাস্তা গ্রাস করে তার উপরে ঘরবাড়ি তুলেছিল।

উঁচু ঘর কিন্তু বানাতে দিত না সে আমলে। আপনার আমার ঘর

রাজবাড়ি ছাড়িয়ে মাথা তুলবে, এ কেমন কথা? যতদূর খুশি ছড়িয়ে ঘরবাড়ি করুন, কিন্তু উপর দিকে নয়। ছ-সাত তলা এই যে অট্টালিকা দেখছেন, নিতান্তই হাল আমলের এগুলো।

আরে···ঘুরে ফিরে গাড়ি যে আবার পিকিন-হোটলের সামনে। হোটেল ছাড়িয়ে ডান দিকের রাস্তায় ঢুকে পড়ল। তারপর আরো খানিকটা গিয়ে থেমে দাঁড়ায়।

রেস্তোরাঁ। পুরানো প্যাটার্নের বাড়ি—চেহারা চমকদার নয়! খানা-পিনার জায়গা, বাইরে থেকে মালুম হয় না। রসিক অধ্যাপক চেন হান-সেং নিমন্ত্রকদের একজন। আর আছেন চেং চেন তো, ভারি জাঁদরেল পণ্ডিত—সাহিত্যিক, সহকারী সাংস্কৃতিক মন্ত্রী।

তা নেমন্তন্ন করে রেস্তোরাঁয় কেন মশায়? বাড়িতে নিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছেন?

এই রেওয়াজ। কি কি পদ ভারতীয়েরা তারিফ করেন, আগে থাকতে জেনে গিয়েছিলাম; এরা সেই মতো আয়োজন করেছে। বাড়িতে এসব হয় না।

ঘরগুলো আধ-অন্ধকার, ঘিঞ্জি মতন। চেং বললেন, এই থেকে আমাদের সেকেলে গৃহস্থবাড়ির আন্দাজ নিন। ঐ হল উঠোন, এইগুলো, শোবার ঘর, ওখানে ওঠা-বসা হত। একজনের বসতবাড়ি এটা। জাপানিরা পিকিন দখল করল; তাদের এক দল গৃহস্থ তাড়িয়ে এখানে আস্তানা গড়ে। মালিকেরা ফৌত। কোথায় গেল, কি হল সেটা আর জিজ্ঞাসা করবেন না। এমন বিস্তর ঘটেছে, শেষটা তাই মরিয়া হয়ে উঠল একেবারে। কম্যুনিস্টদের মুক্তি-সৈন্য ধেয়ে আসছে পিকিনমুখো; কুয়োমিনটাং নানা রকম গুজব ছড়াচ্ছে—মানুষ নয়, ভূতপ্রেত দত্যিদানো হল বেটারা। লোকে তবু ভয় পায় না একটুও। যা-ই ঘটুক, জাপানিরা যে কাণ্ড করে গেছে তার বেশি তো নয়। ভাগ্য ভাল মশায় যে আপনাদের ভারত কখনো জাপানের তাঁবে থাকে নি।

এদিক-ওদিক ঘুরে দেখছি। নানা রকম তুকতাক, অদ্ভুত ধরনের চিহ্ন দেয়ালে। শয়তানকে ভয় দেখাতে এই সব করে। দেশময় কুসংস্কার ছড়ানো ছিল—পুরানো জাতের যেমন হয়ে থাকে। রেলগাড়ির যখন চলন হল, রেলের পাটি মাইলের পর মাইল উপড়ে দিয়েছিল—এই সব কাণ্ডকারখানায় শয়তান যদি খেপে যায়, তখন?

তবে আভিজাত্য ও জাতিভেদ বলে কিছু ছিল না কোন কালে। গরিব-ধনী মূর্খ-বিদ্বান সবই ছিল, জাত হিসাবে ইনি মোটা উনি খাটো এমন বিধান

চলে নি। বুদ্ধিজীবী চাষী, শিল্পী ও সৈন্য—চতুর্বর্ণের সমাজ। আপনি গুণ দেখিয়ে এ-বর্ণ থেকে ও-বর্ণে স্বচ্ছন্দে প্রোমোশন নিয়ে যান, কেউ রুখতে পারবে না। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক থেকে নাকি এই নিয়ম চালু।

আর নয়—আসুন, এবারে খাওয়াদাওয়া। ভাগ্যবশে এমন সঙ্গ পেয়ে গেছি, খাদ্যে রুচি নেই—জ্ঞানীগুণীদের মুখের বাক্যই গোগ্রাসে গিলছি। টুকে নিচ্ছি একটু-আধটু খাতায়।

নিজ দেশকে ওরা বলে চুং-কো (মাঝের দেশ)—চীন নয়। জাতটা ভারী ঠাণ্ডা মেজাজের। দুজনের মারামারি হচ্ছে—তাই দেখে বলত, ভারি বোকা তো! যুক্তি-তর্কে হারিয়ে দাও, গায়ের উপর খোঁচাখুঁচি কেন? সেই চীনকে কত কাল ধরে কি বিষম লড়াই করতে হল, দেখুন! লড়াই করেছে শত্রুর বিরুদ্ধে শুধু নয়, নিজেদের ভদ্র চরিত্র ও চিরাচরিত ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে। হীনবল ও প্রায় নিঃসহায় অবস্থায় গেরিলা-যুদ্ধ চালাল জাপানির সঙ্গে। রেগে তারা অগ্নিশর্মা। কি রকম অভদ্র বিবেচনা করুন—যুদ্ধের নিয়ম-কানুন মানবে না, পরনে ইউনিফর্ম নেই, পাহাড়-জঙ্গল রাস্তা-সাঁকোর আড়ালে আবডালে থেকে নোটিশ না দিয়ে আঘাত হানবে। তা, যেমন মুগুর তেমনি কুকুর হবে তো···জাপানিরাও এক-একটা অঞ্চল ধরে বিলকুল সাবাড় করতে লাগল।

(৭)

'সাদা চুলের মেয়ে' (White-haired Girl) চীনা ছবিটা দেখেছেন? দুনিয়ায় অমন নাকি দ্বিতীয় নেই। সেবারে ফিলম-উৎসবের সময় কলকাতায় এসেছিল। চীনে যাবার যদি মনন থাকে, তার আগে অতি-নিশ্চয় দেখে যাবেন ছবিটা। অনেকবার উঠবে ছবিটার কথা; নানা রকম জেরার তালে পড়ে যাবেন। জবাব না পেলে ছেলেমেয়েগুলো অভিমানে মুখ ভার করবে! অতএব তৈরি-জবাব নিয়ে যাওয়াই ভাল।

ভাগ্যবশে আমার দু-দুবার দেখা। চীনভূমিতে পা দিয়ে সেন-চুনের রেলগাড়ি থেকেই ঐ ছবির কথা। দেখেছ তুমি? নিশ্চয় খুব ভাল লেগেছে —লাগতেই হবে।

লাগুক যেমনই, সভ্য সমাজে হেন অবস্থায় একটিমাত্র বিধি···হাসিমুখে হাঁ-হাঁ করে ঘাড় নেড়ে যাওয়া।

অপেরার পালা—পালাটার নামে মানুষজন ভেঙে পড়ে। সিনেমার ছবিতে

গেঁথে ফেলার পর থেকে ভারি জুত হয়েছে। অপেরার তোড়জোড় হামেশাই তো হয়ে ওঠে না—এখন সিনেমার টিকিট কেটে স্বচ্ছন্দে হলে গিয়ে বসুন। এমন একটা জিনিস শতবার দেখেও নাকি আশ মেটে না।

এমনিতরো উচ্ছ্বাস শুনি, আর স্ফূর্তিতে প্রাণ ডগমগ হয়ে ওঠে। সিনেমার ব্যাপারটায় আমরা তা হলে অনেক বেশি লায়েক, অনেকদূর এগিয়ে আছি। উন্নতি হোক তোমাদের—তবে যতই করো, মুরুব্বির আসরে কলকে-প্রাপ্তির দেরি আছে অনেক। অনেক দেরি।

দু কথায় পালাটার একটু আঁচ দেবো নাকি? বাসন্তী পরবের দিন ভারি ঝড়জল—তার মধ্যে ইয়াং বাড়ি আসছে। জমিদারের ভয়ে বেচারি হপ্তাভোর পালিয়ে ছিল। বড় আদরের মেয়ে সিয়ার—ভেবেছিল, মেয়ের সঙ্গে আজকের দিনটা চুপিচুপি উৎসব করে যাবে। হেন কালে জমিদারের লোক এসে টুঁটি ধরে নিয়ে গেল। জবরদস্তিতে পড়ে ইয়াং জমিদারের কাছে মেয়ে বেচে দিয়ে এলো বাকি খাজনার দরুন।

শাশুড়ি ও হবু-স্বামী তা-কে নিয়ে সিয়ার ওদিকে ভোজ খাচ্ছে। এক বন্ধু বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল ইয়াংকে। তা সে সময়টা উজ্জ্বল মুখে মুক্তিবাহিনীর গল্প করছে। তারা আসছে, এসে পড়ল বলে, সকল দুঃখের অবসান হবে। জমিদারবাড়ি যে কাণ্ড করে এসেছে, ইয়াং সে সমস্ত এ আসরে বলতে পারল না। গভীর রাতে দেখল, আনন্দ-প্রতিমা মেয়ে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমুচ্ছে। বিষ খেয়ে ইয়াং ব্যথা-বেদনার শেষ করল।

সকালবেলা তা এসেছে প্রিয়তমার কাছে—এসে দেখে ইয়াঙের শবদেহ। সিয়ার জেগে উঠল। বাপের জামার মধ্যে পাওয়া গেল সর্বনেশে দলিল। অনতিপরে জমিদারের দল এসে ধরে নিয়ে গেল সিয়ারকে।

জমিদারের মায়ের দাসী সে এখন। অত বড় বাড়ির মধ্যে মুখের দিকে তাকাবার শুধু একটি মানুষ—বুড়ি চাকরানি চ্যাং। তা একদিন জমিদারের লোককে আচ্ছা করে ঠেঙানি দিয়ে মনের ঝাল ঝাড়ল। জেল হল। জেল থেকে পালিয়ে সে মুক্তিবাহিনীতে ভিড়ল। সিয়ারকে বলে পাঠিয়েছে, ফিরে আসবে সে দলবল নিয়ে—সিয়ার যেন অপেক্ষা করে তার জন্য।

তারপরে সেই ভয়ানক রাত্রি—জমিদারের ধর্ষিতা হল সিয়ার। বাপের মতোই আত্মহত্যা করে জালা জুড়োবে, কিন্তু বুড়ি চ্যাং হতে দিল না।

জমিদারের বিয়ে খুব বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে। সিয়ারকে অতএব বাড়ি

থেকে চালান করে দিতে হয়। গণিকালয়ে—তা ছাড়া কোথায়? টের পেয়ে সিয়ার ক্ষেপে গেল। তালা আটকে রাখল তখন তাকে। চাবি চুরি করে চ্যাং দোর খুলে দিল। খোঁজ, খোঁজ—সিয়ারের খোঁজে জমিদারের দলবল তোলপাড় করছে চতুর্দিক। নদীর ধারে সিয়ারের জুতো—অতএব জলে ডুবে মরেছে নিশ্চয়ই হতভাগী। তাই সকলে ধরে নিল।

কিন্তু সিয়ার পালিয়ে আছে জঙ্গলে-ভরা দুর্গম পাহাড়ের গুহায়। সেই পাহাড়ে লাই-লাই মন্দির—লোকে পূজো দিয়ে যায়। পূজোর নৈবেদ্য আর বনের ফল খেয়ে থাকে সিয়ার। নুন খেতে পায় না, আর রোদও বড় একটা লাগে না গায়ে—চুল তাই সাদা হয়ে গেল। চাষীরা কেউ কেউ দেখেছে তাকে ···তারা বলে প্রেতিনী। জমিদার একদিন পূজো দিতে এসে ঝড়বৃষ্টিতে আটকে পড়েছে। দুর্যোগের মধ্যে সিয়ার যথারীতি নৈবেদ্য কুড়োতে গেল। ঐ ভয়াবহ মূর্তি দেখে আঁতকে ওঠে জমিদার। সিয়ারও উদ্ধত আক্রোশে ধেয়ে যায় তার দিকে।

জাপানির তাড়ায় কুয়োমিনটাং-দল হুড়দাড় পালাচ্ছে; মুক্তিবাহিনী এসে রুখল। সিয়ারের হবু-বর তা হল বাহিনীর নায়ক। তারপর তা গাঁয়ে এসে পড়ল। জমিদারি অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুলছে সে চাষীদের। জমিদার ওদিকে ভয় ধরাচ্ছে প্রেতিনীর গল্প ছড়িয়ে! তা নিজেই ছুটল রহস্যের আস্কারা করতে। কতকাল পরে বিচিত্র অবস্থার মধ্যে তা আর সিয়ারের মিলন হল।

গণ-আদালতে বিচার। মেয়েটা গান গেয়ে বলছে...তার মধুর নিষ্পাপ জীবন কেমন করে ওরা পায়ে থেঁতলে দিয়েছে। জনতার ক্রোধ উদ্দাম হয়ে ফেটে পড়ে শয়তান জমিদারের দিকে।

গল্পটা এই। বাঁধুনি আহা-মরি নয়; বিশ্বাস করতে বাধে অনেক জায়গায়। আর, বক্তব্য ওরা সাদামাঠা ভাষায় বলে না, কেবলই গান। ছবি দেখে তারিপ করতে পারি নি, খোলখুলি বলছি।

সেই 'সাদা-চুলের মেয়ে' আজ রাত্রে অপেরায় করবে। নানান দেশের সজ্জনেরা জুটেছেন···আয়োজনটা বিশেষ করে তাদেরই জন্যে। আমি যাবো না, গোড়াতেই সাফ জবাব দিয়েছি। সেই যে শেয়াল-পণ্ডিতের কুমিরের বাচ্চা দেখানো। খেয়েটেয়ে সবে-ধন একটিতে এসে ঠেকেছে···সন্তানের খোঁজে যে কুমির আসে, তাকে সেইটে দেখিয়ে দেয়। তেমনি ব্যাপার। এক পালা কতবার দেখব বাপু কাজকর্ম না থাকে তো পড়ে পড়ে ঘুমবো ঐ সময়টা।

তা কাজেও জুটে গেল—যার চেয়ে ভাল কাজ হয় না, আড্ডা দেবার আমন্ত্রণ। সন্ধ্যাবেলা হাত-মুখ ধুচ্ছি। এমনি তাড়া…রমেশচন্দ্র নিজে সেইখানে এসে হাঁকডাক লাগিয়েছেন। হাত চালিয়ে নিন একটু…

অ্যানিসিমভের সঙ্গে সেদিনের মোলাকাতটা উপাদেয় হয়েছিল। চেহারায় জাঁদরেল হলে কি হয়, মানুষটি বড় ভালো। তাই বলেছিলাম, কোন একদিন নিরিবিলি একটু বসতে পারা যায় না? শুনেছি, বাংলা চর্চা হয় রাশিয়ায়, অনেকে বাংলা জানে। বাঙালি গিয়ে বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করেছেন, লোক জুটেছে রুশভাষায় তর্জমা করবার। এখানকার মতন বঙ্গজ্ঞের দুর্ভিক্ষ নয় সেখানে। ভারতীয় সাহিত্য নিয়ে রীতিমত নাড়াচাড়া হয় নাকি। এই সমস্ত শুনতে চাই একটু জমিয়ে বসে। সেদিন সপ্তরথী ব্যূহবেষ্টনে ঘিরে প্রশ্নবাণে ঘায়েল করবার তালে ছিলাম—এবারে হবে ধরণীর দুই প্রান্তবাসী লিখিয়ে দু-জনের আজেবাজে গল্পগুজব। জ্ঞানান্বেষণের মহতী আকাঙ্ক্ষা নেই, কোন তত্ত্বরসিক অতএব উৎকর্ণ হবেন না। রমেশচন্দ্রকে বলেছিলাম, এমনি কোন ব্যবস্থা হয় না?

তাই হয়েছে। এক্ষুনি। একটা অ্যানিসিমভে হবে না, চাই পোপোভকেও। আমার ইংরেজি বাক্য যিনি অ্যানিসিমভকে সমঝে দেবেন, অ্যানিসিমভের রুশ ইংরেজিতে হাজির করবেন আমার কাছে। এখন যোগাযোগটা ঘটেছে—তাঁরা দু-জনে অপেক্ষায় আছেন। একটা জামা চড়িয়ে নিস তো গায়ে। ব্যস, ব্যস —উঠে পড়ুন।

খানকয়েক বই হাতে করে গেলে কেমন হয়? বাংলা পড়ার মানুষ আছে ওদের দেশে, বাংলা বইও আছে। কোন এক লাইব্রেরির বাংলা তাকের উপর অধমও সম্ভবত ঠাঁই পাবে। ভিড় নেই, থাকা যাবে আরাম করে দিব্যি গতর ছড়িয়ে। বইগুলো যখন দিলাম, অ্যানিসিমভও ঠিক সেই ভরসা দিলেন। তা দেখে এলাম এবারে মস্কো শহরে, কথা রেখেছেন তিনি। জায়গা হয়েছে গোর্কি ইনষ্টিটিউট অব ওয়ার্লড লিটারেচার্সে রবীন্দ্রনাথের ঠিক পাশেই। বুঝুন, ফাঁকতালে সুদূর দেশে এই কায়দায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছি। দেশে আপনাদের কাছে বিস্তর ঝামেলা—কেমন লিখেছেন, সেটা বিবেচ্য নয়। পোঁ ধরে থাকবার সানাইওয়ালা আছে তো? আর কানে তালা-ধরানো ঢাকি? তাঁরা বহাল তবিয়তে থাকলে নাম-যশ ঠেকায় কেডা?

যাক গে যাক গে—কথাটা কি হচ্ছিল? রমেশচন্দ্র নিয়ে গিয়েছেন অ্যানিসিমভের ঘরে—ঐ পিকিন-হোটেলেরই পাঁচতলায়। হাজির করে দিয়ে

তিনি কেটে পড়লেন। বই ক'খানা টেবিলের উপর রেখে একটু ভূমিকা করি—টেগোরের বাংলা ভাষার আমি এক লেখক ; রুশ-ভারতের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন হচ্ছে, অধম কাঠবিড়ালি সেই ব্যাপারে মুঠোখানেক বালুর জোগান দিতে এসেছে।

কতবার যে ধন্যবাদ দিলেন অ্যানিসিমভ—পোপোভ তাই তর্জমা করে করে বলছেন। পরম সমাদরে রেখে দেওয়া হবে আপনার বইগুলো ; যারা বাংলা জানে, বই পেয়ে তারা খুব খুশি হবে।

সামান্য কয়েকখানা বই—তাই তাই নিয়ে এমন উচ্ছ্বাস ! লজ্জায় সঙ্কোচে তাড়াতাড়ি একথা-ওকথায় চলে যাই।

খাসা জমেছে, দিব্যি গদিয়ান হয়ে বসা গেছে। পোপোভ্ সহসা ব্যস্ত হয়ে বলেন, ইতি করা যাক এবারে। অপেরা আছে।

হাত নেড়ে বলি, যেতে দাও। ওরা তো এক পালাই শিখে রেখেছে—এক কথা কতবার শুনব ?

না হে, খুশি হবে। আমি বলছি, ঠকবে না।

আমি না গেলেও, বোঝা যাচ্ছে, ওঁরা না দেখে ছাড়ছেন না। অনিচ্ছার সঙ্গে তাই উঠে পড়তে হল। খালি ঘরে একা বসে লাভ কি ?

দেরি হয়ে গেছে, নিজের ঘরে যাবার আর সময় নেই। ওঁদের সঙ্গে বেরুলাম। লিফটের মুখে দাঁড়িয়েছি ভূতলে নামবার জন্য। গ্রহ এমনি, দুটো লিফটই নিশ্ছিদ্র হয়ে উঠানামা করছে। অনেকবার চেষ্টা করা গেল—তিন-তিনটে গতর কিছুতে সেঁধোনো যায় না ওর ভিতর। আরে, নেমে যাওয়া তো ! সিঁড়ি ভাঙা যাক—কতক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকব ?

লনে বাস নেই, মানুষজনও দেখছি না ড্রইংরুমে। সবাই বেরিয়ে পড়েছে। পোপোভ বলে, আমাদের গাড়িতে চলো—

অগত্যা। গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে, দোভাষি এলো ছুটতে ছুটতে। টিকিট আছে তো আপনার ? টিকিট নইলে ঢুকতে দেবে না।

রাগে ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বালা করে। টিকিট কেটে নাকি পিকিন শহরে অপেরা দেখতে হবে ! কাজ নেই মশায়, নেমে যাচ্ছি—

কিন্তু তৎপূর্বেই মানুষটি টিকিট জুটিয়ে এনে হাতে গুঁজে দিলেন।

যতগুলো সিট আছে, তারই হিসাব মতন টিকিট। আপনার টিকিট রয়ে গেছে আপনাদের দলের সেক্রেটারির কাছে।

হলের ভিতর ঢুকলাম—তখন আলো নিভিয়ে দিয়েছে, কনসার্ট বাজছে। তারপরে এক সময় দেখি, দুর্যোগ নিশায় আবছা অন্ধকারের মধ্যে থপথপ করে করে ক্লান্ত পায়ে এক চাষী চলেছে···

অবহেলা ও অবজ্ঞার ভাব নিয়ে এসেছি নিতান্তই পোপোভের জেদে পড়ে। খাতা-কলম আনি নি—টুকবার কি আছে—ঘণ্টা কয়েকের অপব্যয় শুধুমাত্র। কিন্তু একটুখানি দেখেই ছটফটানি মনের মধ্যে। হারাতে দেওয়া হবে না এ বস্তু—কি করি, কি করি! প্রোগ্রাম ভাগ্যক্রমে দিয়েছে—তার পৃষ্ঠা দুই সাদা। সন্তোষ খাঁ-এর কলমটা চেয়ে নিলাম। বাইরে-থেকে-আসা কয়েকটা দিনের অতিথি আর নয় তখন,—মহাচীনের অজানা এক গ্রামের মধ্যে গিয়ে পড়েছি, মিলেমিশে গিয়েছি স্টেজের ঐ চরিত্রগুলোর সঙ্গে। অন্ধকারে আন্দাজি কলম ছুটছে। এতদিনের পরে আজকে তার পাঠোদ্ধারে বসলাম।

স্টেজের তক্তার ছাউনির ঠিক নিচে বাজনার দল। সামনেই আমরা—তাদের কাজকর্ম পুরোপুরি নজরে আসছে। আমাদের চেয়ে বেশ খানিকটা নিচুতে তারা। গুনতিতে বত্রিশ। নাটকের চরিত্রগুলোর মনোভাব টেনেটুনে জাহির করে দিচ্ছে বাজনায়। নিসর্গ পরিবেশ, এমন কি এক দৃশ্য থেকে ভিন্ন দৃশ্যে চলে যাওয়া—বাজনা যেন সুরের কথায় বলে বলে যাচ্ছে।

এমনি তো দেখি, অপচয় মানা—কাঁচি চালানোর দাপট সর্বক্ষেত্রে। ঝিক-মিকে মেয়েগুলো একটু ব্যবহারের পোশাক পরতে পায় না। কিন্তু অপেরায় এ কি কাণ্ড—দু-টাকার জায়গায় দশ টাকা খরচা করে বসে আসে। নাচের আসরেও দেখছি এমনি দরাজ হাত। এ যেন হল—রুইমাছ যখন খাবে ঘিয়ে ভেজেই খাও, সর্ষের তেলে নয়। অপেরা হাজার বছরের ঐতিহ্য টেনে আসছে। নিজেদের উপর দিয়েই যত কঞ্জুসপনা—বাপ-ঠাকুর্দার বস্তুর তিলেক অঙ্গহানি ঘটলে ও-জাত রক্ষে রাখে না।

কত উঁচু দরের শিল্পী, সিনসিনারি থেকেই মালুম পাই। ভোঁতা নজর-ওয়ালা দর্শকের জন্য রংচঙে সিন নয়। পর্দা খাটানো, তার এদিকে কুঁড়েঘরের চালের মতো করেছে—ঐটে হল চাষী ইয়াঙের বাড়ি। আবার একসময়ে দেখি, রঙবেরঙের অনেক পর্দা—সামনে চেয়ার কতগুলো। জমিদারের ঘর এটা। পয়সার সাশ্রয়? আজ্ঞে না—রাজপোশাকে আলোয় বাজনায় যে প্রকার বাহুল্যের ঘটা, তার মধ্যে দু-দশটা থিয়েটারি কাটা-সিন ও উইংস বানানো নিতান্তই নস্যি। চিরকাল ধরে ক্লাসিক অপেরার এই ঢং চলে আসছে—তার থেকে এক চুল এদিক-ওদিক হতে দেবে না। আমাদের যাত্রাগানের সঙ্গে

খানিকটা যেন মিল…দর্শকের কল্পনার অবাধ প্রসার সেখানেও। সামিয়ানা ও ঝুলানো লণ্ঠনের নিচে এই রাজসভা বসল, পর মুহূর্তে ভয়াল অরণ্য…হিংস্র শ্বাপদকুল বিচরণ করছে। গেঁয়ো দর্শকেরা প্রায়ই তো নিরক্ষর, কিন্তু রসের স্রোতে তাঁরা অবাধে ভেসে বেড়ান, একটিবারও কোথাও ঠোক্কর খেতে হয় না। বরঞ্চ সিনে-আঁকা চ্যাপ্টা স্তম্ভ ও কাপুড়ে দেয়াল দেখেই রাজসভা মানতে শরম লাগে।

ঘরবাড়ি এমনি। আর, পাহাড়-জঙ্গলের যে রচনা দেখাল, চক্ষে তাতে পলক পড়ে না। পর্দার আকাশ…চাঁদ-তাঁরা ঝিকমিক করছে। ইতস্তত পাথর ছড়ানো। সরল সমুন্নত দেওদার একটি। চাঁদের আলোয় বিশাল পাহাড় তন্দ্রাচ্ছন্ন রয়েছে যেন।

আমাদের দু-দুজনের মধ্যে একটি ছেলে বা মেয়ে। অভিনয় বুঝিয়ে দেবার জন্য এসে বসেছে।…একা একা কি সব স্বগত উক্তি করেছে ঐ লোকটা? আমার নাম হল ইয়ং পাই-লাও, পালিয়েছিলাম জমিদারের ভয়ে, এখন বাড়ি ফিরছি। পালার গোড়ার দিকে নতুন চরিত্র স্টেজে ঢুকে আত্মপরিচয় দেবে, এই হল অপেরার রেওয়াজ (আমাদের পুরানো সংস্কৃত নাটকেও অনেকটা এই রীতি)। পথ চলছে…তখন ঝড় হচ্ছে, বরফ পড়ছে। বাজনায় ঝড় বহাচ্ছে…বরফগুঁড়ির মতো সাদা সাদা কি ফেলছে উপর থেকে। দ্রুত চলেছে লোকটা, কিন্তু পা দিয়ে তেমন নয়…অঙ্গভঙ্গিতে চলন বোঝাচ্ছে।

ছেলেমেয়েগুলো বকবক করছে অজ্ঞজনদের বোঝাবার প্রয়াসে। পালা জমে উঠলে বিরক্ত হয়ে তাড়া দিই, থামো দিকি বাপু। ওদের বোঝানোয় ছন্দ কেটে যাচ্ছে যেন। সর্বাঙ্গ দিয়ে অভিনয় হচ্ছে, মুখের কথা আর কতটুকু? কথা আদপে না হলেও ক্ষতি ছিল না।

পর্দা খাটিয়ে জমিদারের যে ঘর হয়েছে, এক বিশাল বাঘের ছবি তার মাঝামাঝি। বাজনা বাজছে ভয়াবহ রকমের—বুকের মধ্যে গুরগুর করে ওঠে। বাঘের ছবি আর বাজনা থেকেই আতঙ্ক হচ্ছে—কি কাণ্ড ঘটবে রে এখুনি! পরক্ষণে বেরিয়ে এলো মেয়েটা। বেশবাস বিশৃঙ্খল, চেহারাই পালটেছে এক লহমার ভিতর। মুখ দেখাবে না সে জনসমাজে। পালার গোড়ার দিকে হবু-বরের সঙ্গে মুখর আনন্দ-দীপ্তি দেখেছিলাম—কে বলবে সে আর এই একই মেয়ে। গান গাইছে—গানের মানে ক'জনই বা বুঝি—কিন্তু হলসুদ্ধ নরনারী ফোঁতফোঁত করছে, চোখ মুছছে রুমালে। আর সামনে তীক্ষ্ণ-

নখদংষ্ট্রা রক্তদৃষ্টি সেই বাঘ। একই বাঘের ছবি—কিন্তু মনে হচ্ছে, বাঘটার চেহারা হিংস্রতর হয়ে উঠেছে এবার।

জ্যোৎস্নাপ্রদত্ত রাত্রি—আলো ফেলে কি অপরূপ জ্যোৎস্নাবিস্তার! পর্দার আকাশে চাঁদ উঠেছে! রূপালি মেঘে মেঘে জ্যোৎস্না ঠিকরে পড়ছে—তার মাঝখানে, যেমন দেখে থাকেন, হাসছে পূর্ণচন্দ্র। তারপর ঘোর হয়ে আসে ধীরে ধীরে মেঘের রং। বিদ্যুৎ চমকায় এক একবার কালো মেঘ কেটে কেটে। বিদ্যুৎ আকাশময় ছুটোছুটি করছে। প্রবল ধারায় জল নামল। স্টেজের খুব কাছে আমরা—এত বৃষ্টি, কিন্তু সত্যিকারের জল পড়ছে না এক ফোঁটাও কোন দিকে। অথচ সেই ছায়াচ্ছন্ন কালো পাহাড়, অন্ধকার আকাশ, মেঘ-গর্জন, বিদ্যুৎ-চমক, ঝরঝর জলের আওয়াজ—সমস্ত মিলে আমরা তাবৎ দর্শকজনও বিষম দুর্যোগের মধ্যে পড়েছি, ভিজে জবজবে হয়ে গেলাম বুঝি! পরের দিন বন্ধুদের বর্ণনা দিয়েছিলাম, অন্ধকার হলের মধ্যে বাঁ-হাত হাতড়ে আমি ছাতা খুঁজছি···ছাতা মেলে মাথায় ধরব···

দেখুন দেখুন, দাড়িওয়ালা লোকটা ঐ আত্মগোপন করছে। স্টেজের বাইরে গেল না, নড়লই না জায়গা থেকে। পিছন ঘুরে দাঁড়িয়েছে, আর অপর লোকগুলো ঠিক সামনে এসেও দেখতে পাচ্ছে না তাকে। দেখবে কি করে, পাঁচিলের এধারে সে, ওপাশে ওরা। পাঁচিলও আপনি চোখে দেখতে পাচ্ছেন না। স্টেজের কিনারা থেকে খানিকটা অবধি পাঁচিল তার পরেই হঠাৎ কেটে দেওয়া হয়েছে। পাঁচিলটা পুরোপুরি থাকলে এদের দু-পক্ষের মাঝ দিয়েই যেত। কিন্তু পাঁচিল থাকতে পারে না—পাঁচিলে ঢাকা পড়ে গিয়ে তাহালে তো ওদিককার লোকের অভিনয় নজরে আসত না। পাঁচিলের অবস্থান অতএব আন্দাজ করে নিন। অপেরা-দর্শকের চোখ-কান শুধু নয়, মনেরও কাজ রয়েছে দস্তুরমতো; দৃশ্যপটের ফাঁকগুলো মনে মনে পরিপূরণ করে নিতে হবে।

চরিত্রগুলো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে, অথচ সময়ক্ষেপ সুস্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে আলো এবং বাজনা বদল করে। দিন দুপুর কাটিয়ে দিয়ে এখন রাত দুপুরে এসেছি—বুঝতে একটুও আটকায় না। ঘুরন-মঞ্চ নয়, দৃশ্য-বদল তবু আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় হয়ে যাচ্ছে। একবার পর্দা একটুখানি আটকে গিয়েছিল—কত লোক ছুটোছুটি করে ভিতরে কাজ করছে, ওরে বাবা!

আর ঐ কনসার্ট। অন্ধকারের মধ্যে জোনাকির মতন একটু একটু আলো প্রতিটি বাজনার সঙ্গে—স্বরলিপি দেখছে সেই আলোয়। ছায়ামূর্তি বাজন-

দারগুলো—ব্যাণ্ডমাস্টার মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে চালনা করছে। নাটকের চরম ভাবাবেগের সময় মানুষটি খেপে যাচ্ছে যেন। কণ্ঠ মিশিয়ে দিচ্ছে এক এক সময় বাজনার সঙ্গে। সেগুলো অর্থময় কথা কিনা জানি নে, কিন্তু সুরঝঙ্কারে অন্তলোক কাঁপিয়ে তোলে।

বিরাম সময় আলো জলে উঠল। ব্যাণ্ডমাস্টারের সঙ্গে ছুটে গিয়ে শেকহ্যাণ্ড করি, তাজ্জব দেখালে বটে ভায়া! দেরি করে এসেছি, হলে তখন আলো ছিল না। এবারে চেয়ে চেয়ে দেখছি, সামনে পিছনে কে কোথায় বসল। কি আশ্চর্য, পিছন দিকে গোটা তিনেক সারির পরে—উঁহু, আমার চোখেরই ভুল···তাই কখনো হতে পারে? প্রায় একই প্যাটার্নের গোলালো মুখ এখানকার মেয়েদের—তাঁদের একের জায়গায় অন্যকে ভেবে বসা বিচিত্র নয়। আমার কেশব-জেঠার সাহেব দেখা আর কি—দশ-দশটা বছর শহরে কাটানোর পরেও এক সাহেব থেকে অন্য সাহেবের তফাত ধরতে পারতেন না। সুন-চিন-লিঙ অর্থাৎ সানইয়াৎ-সেনের স্ত্রী চুপচাপ আমাদের পিছন দিকে বসে—এ কি একটা বিশ্বাস হবার কথা? নতুন-চীনে মাও সে-তুঙের পরেই বলতে গেলে তাঁর পদমর্যাদা। সাজসজ্জা নেই এবম্বিধ বিশিষ্টার, দেহরক্ষীই বা কোন দিকে? তার পর দেখি, কো মো-জো, মাও-তুন ইত্যাদি বাঘা-বাঘা নেতারাও পিছন সারিতে গা এলিয়ে মজাসে পালা দেখছেন।

লাউঞ্জে গেলাম। বসে বসে ধকল হয়েছে তো! সেই কষ্ট-নিরাকরণের ব্যবস্থা—যেমন সর্বক্ষেত্রে হয়ে থাকে। দোভাষি মেয়ে পাশে দাঁড়িয়ে; অপেরা নিয়ে তাকে এটা-ওটা জিজ্ঞাসা করি। সিয়ারার পাঠ বলছে, তার নাম ওয়াং কুন; এমন আশ্চর্য অভিনয় কোথায় সে শিখল? দোভাষি গড়গড় করে বোঝাতে লেগে যায়। এই পিকিনে অভিনয়ের ইস্কুল আছে দস্তুরমতো—এক্সপেরিমেণ্টাল স্কুল অব ক্লাসিক্যাল ড্রামা। মুফতে শেখা সেখানে। তারই ফাঁকে একবার বলে, কমলার রস একটু চেখে দেখুন না।

আমিও খাপছাড়া ভাবে প্রশ্ন করি, তোমরা এত ভালো কেন, বলো তো?

জবাব দেয়, আমরা শান্তি ভালবাসি। শান্তির দূত তোমরা—এত ভালবাসি তাই তোমাদের।

কত রকমের প্রশ্ন—মাথামুণ্ডু থাকে না অনেক সময়। নিরিবিলি সময়ে ভাবতে গিয়ে নিজেরই লজ্জা লাগে। তারা কিন্তু হাসিমুখে জবাব দিয়ে

যাচ্ছে। না বলতে পারলে লজ্জিত হাসি হাসে। না বুঝতে পারলে বলে, ইংরেজি আমি কম জানি। সর্বক্ষণ হাসিমুখে হোটেলে পরিবেশন করে, সেই মেয়েগুলোই বা কি! শত শত লোকের হাজারো বায়নাক্কা—একে এ দাও, ওকে তা দাও। ছুটোছুটি করে কুল পায় না। হাসতে হাসতে ছোটে। হাসে তাদের চোখ-মুখ, হাসে গতিভঙ্গিমা।

এক কলেজি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বলতে পারো—কেমন করে তোমায় রাগানো যায় ?

আমি রাগব না।

কেন ?

তোমরা বিদেশি, আমাদের অতিথি। তোমাদের কাছে কিছুতেই রাগতে পারি নে।

ওয়াং সিয়াও-মিই-র কথাটা সেই আর একদিন বলতে গিয়ে বলা হয় নি। পিকিন সিনওয়াল য়্যুনিভার্সিটির মেয়ে। বুদ্ধি প্রতি কথায় ঝিকমিকিয়ে ওঠে। তাকে বললাম, মেয়েরা যেন বেশি বুদ্ধিমান ছেলেদের চেয়ে ?

একটি ছেলে তার পাশে—চেন-চি, সাংহাই য়্যুনিভার্সিটির। স্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে ওয়াং বলে, ছেলেরা মেয়েদের মতোই বুদ্ধিমান।

জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি বিনয় ?

না, এটাই সত্য।

কথা পড়তে পায় না। সভ্য সংযত জবাব—মৃদু হাসি খেলে যায় মুখে। চেনের দিকে সকৌতুক তাকাচ্ছে এক একবার।

মাঝে মাঝে কিন্তু রাগ হয়ে যেতো দুরন্তপনায়। হিংসাও হতে পারে। জন্মাতে মানিক পঞ্চাশটা বছর আগে, মজা টের পেয়ে যেতে। জন্ম থেকে লোহার জুতো এঁটে পা ছোট করে রাখত, কাঙারুর মতন থপথপ করে চলতে সেই পায়ে। বড় ঘরে বিয়ে হলে দু-শো পাঁচশো বউয়ের একজন; নিতান্ত গরিব-ঘর হল তো পাঁচ-সাত গণ্ডার ভিতরে রইলে। বাড়িসুদ্ধ লোকের মুখ হাঁড়িপানা মেয়ে জন্মানোর পর। আগাছা গোড়া থেকে সাফ করলে হাঙ্গামা কম—বাচ্চা মেয়েকে তাই জলে ডুবিয়ে মারত, গলা টিপে মারত।

আহা, আমাদের—এই বেটাছেলেদের—কী সত্যযুগই ছিল সেকালে! সাত চড়ে মেয়েগুলোর রা কাড়বার জো ছিল না। সব পুরোনো দেশের এক গতিক। তাই ওদের বলতাম, পুরুষজাতটা কি বোকা! তোমাদের পায়ের শিকল ভেঙে দিলাম আমরাই তো! খোঁড়া পায়ে ঘর-উঠোন করতে, দেবতা

হয়ে বসে রাতদিনের সেবা নিতাম! দিব্যি ছিলাম। আর এখন যা কাণ্ড, শ্রীমতীরা উল্টে আমাদেরই না শিকলে বাঁধতে লেগে যায়!

১৯১২ অব্দ—তিন বন্ধন কেটে ফেলল ওরা। পয়লা নম্বর হল পুরুষের মাথার লম্বা টিকি! পুরানো ছবিতে দেখেন নি? আরে মশায়, মাথায় চুল হল বাপ-মায়ের সম্পত্তি। কোন হিসাবে সে বস্তু কাটা চলে, কেটে ফেললে গুনাহ্ হবে না? সমস্ত চুল রাখলে বড় ঝাকড়ামাকড়া হয়, তাই বেশ ওজনদার একটি গোছা নমুনা রেখে দিত। মাতৃগর্ভ থেকে যে চুল নিয়ে এসেছে, সেই আদি অকৃত্রিম বস্তু হওয়া চাই। দুই নম্বর হল, ঐ যে বললাম—লোহার জুতো পরিয়ে মেয়েদের পা ইঞ্চি পাঁচেকের ভিতরে রাখা। চলতে গিয়ে টলবে, রূপ কেটে পড়বে সেই চলনে! আর তিন নম্বর—কাউ-তাউ। উঠ-বোস করে ভারি এক মজার অভিবাদন-প্রথা।

কোথায় ছিলে সেদিন আনন্দমতীরা—উল্লাসে বীর্যে কর্মিষ্ঠতায় নতুন চীনের ছেলেদের যারা সমভাগিনী? ওয়াং ঘাড় নাড়লে কি হবে—বেশি উজ্জ্বল দেখতে পাচ্ছি, মেয়েরাই। ছেলেরা কাজ করে; মেয়েগুলোর কাজ করা শুধু নয়, আনন্দের তুফান বইয়ে দেওয়া ঐ সঙ্গে। যত শক্ত কাজই হোক, গান গেয়ে বেড়াচ্ছে মনে হবে।

ঘরগৃহস্থলীর চেহারা বিলকুল পালটেছে। আগেকার দিনের কর্তামশায়, এবং পোষা-মুরগি ও পোষা-রমণীদল নয়। ঘর এখন আনন্দ-নিকেতন; নতুন ছেলেমেয়েদের জন্মের সূতিকাগার। ভূমি-সংস্কারের পর মেয়েরাও জমির মালিক, পুরুষের সমান হকদার। তাদের সমাদর আর সম্মান তাবৎ চীনদেশ জুড়ে।

(৮)

দু-বেলা কনফারেন্স—সকালের দিকটা একটু আগেভাগে তাই ছুটি মিলেছে। ঘরে ঢুকে দেখি, রকমারি প্যাকেটে টেবিল ভর্তি। গরম সোয়েটার, পাজামা, ছাপা-সিল্কের স্কার্ফ—ব্যাপার কি হে, কোত্থেকে এলো এত সমস্ত?

সুইং বলে, শীত পড়ে গেছে বড্ড কি না!

চটে গিয়ে বলি, কি ভেবেছ বলো দিকি? ঈশ্বরের দেওয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোই মাত্র দেশ থেকে নিয়ে এসেছি—শীতের পোশাক দেবে, রোদের ছাতা দেবে...না না, এ সমস্ত হবে-টবে না, ফেরত নিয়ে যাও বলছি।

সুইং নিতান্ত গোবেচারি ভালমানুষ।

আমি তার কি জানি—যারা দিয়ে গেছে, তাদের ডেকেডুকে ফেরত দিনগে—

শুধু কি পোশাক! প্যাকেট খুলে খুলে তাজ্জব হয়ে যাই। হৃষ্টপুষ্ট ছবির বই, গ্রামোফোন-রেকর্ড, কারুকর্ম-করা কৌটো—সে কৌটো খুললে আর এক কৌটো—তার ভিতরে আর একটা—তার ভিতরে—তার ভিতরে···সাতটা এই প্রকার। আরও কত কি বস্তু—মনে পড়ছে না এত দিনের পরে।

একবারে কিচ্ছু জানো না সুইং, চুপিসারে কোন চোর এসে এত সমস্ত রেখে গেল?

না—বলে মেয়েটা সরে পড়বার কিকিরে আছে।

নিশ্বাস কেলে বলি, দিয়ে গেল বটে কিন্তু পাজামাটা বড্ড ছোট। কাজে আসবে না। মাপসই হলে পরে আরাম পাওয়া যেত। তা কার জিনিস কে-ই বা বদল করে দেয়! থাকুক গে পড়ে এমনি।

যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে সুইং শুনে নিল, মুখে কিছু বলল না।

ক্ষিতীশের ওদিকটা ভারি জমজমাট। নতুন দুই ভদ্রলোক।

আসুন দাদা, আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হলেন মি ল্যান-ফ্যাং। আর ইনি সাও ইয়েই।

ওরে বাবা, মি এসে পড়েছেন আমাদের ঘরে! নাম শুনছি এসে অবধি। পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—ক্লাসিক্যাল অপেরার রাজ্যে সার্বভৌম সম্রাট। আরও বড় পরিচয়, পরম লাঞ্ছনার দিনেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন এই মহাশিল্পী। দেশ জাপানিদের তাঁবে—মি'কে তারা হুকুম করল, নাট্যশালার দরজা খুলে দাও; নাচ-গান-অপেরা চলুক আগেকার দিনের মতো। না, কক্ষনো না—পরাধীনতা আনন্দের সময় নয়। স্ফূর্তির নেশায় মানুষ ভুলিয়ে রাখতে বলছ, সেটা হবে স্বদেশদ্রোহিতা। টাকাপয়সা দেখিয়ে হল না তো জোরজবরদস্তি। ঘর-বাড়ি জায়গাজমি বাজেয়াপ্ত। সারা চীনের মানুষ মি'র নামে পাগল—এর অধিক জাপানিরা এগুতে সাহস করল না। নতুন আমলে নবীন যুবার বল-শক্তি নিয়ে মি আবার অপেরা খুলেছেন। তাঁর লেখা অভিনয় সম্বন্ধে একটা বই আমায় দিয়েছেন নিজহাতে নাম লিখে। পড়বার বিদ্যে নেই, কিন্তু এ সম্পদ আমি বুকে করে রেখেছি।

আর এই সাও ইয়েই। ছোকরা মানুষ—নাটক লেখেন। ইংরেজি জানেন বলে সঙ্গে এসেছেন, কথাবার্তায় দোভাষির কাজ করবেন।

তা আমিও তো দলের বাইরে নই—নাটক লিখি, থিয়েটারে নাটক হয়েছে। একটা নাটক উপহার দিয়ে তাড়াতাড়ি ভাব করে ফেললাম মি'র সঙ্গে। খাতা-কলম নিয়ে আসছি—বসুন।

কলম বাগিয়ে জমিয়ে বসা গেল ওঁদের মধ্যে। অপেরার সম্বন্ধে শুনতে চাই। আপনার মতন কার জানাশোনা? বলুন আমায় দু-চার কথা।

চীনা অপেরা কি আজকের? অনেক শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছে। লোকজনের মনের সঙ্গে গাঁথা। চল্লিশ বছরের উপর স্টেজের সঙ্গে সম্পর্ক আমার। কুঁয়োমিনটাং আমলে দেখেছি, আর এই নতুন আমলেও দেখছি।

সেকালে যারা নাটক করত, সমাজে ইজ্জত ছিল না তাদের। লোকে মুখ বাঁকাত, বেটা পালা গেয়ে বেড়ায়। পালা শুনতে কিন্তু মানুষ ভেঙে পড়ে—রাজা রানী বা সেনাপতি সেজে যখন অ্যাক্টো করছে, তখন মাতোয়ারা। ব্যস, ঐ অবধি—আসরের সীমানাটুকুর মধ্যেই সমাদার। এখন দিন পালটেছে। আপনি সাহিত্যিক—আপনারই সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছি আমরা ইদানীং। আপনি লিখে বলেন, আমরা গান গেয়ে অ্যাক্টো করে বলি।

কাজেই দায়িত্ব এসে পড়েছে—বলার কথা নিয়ে ভাবতে হচ্ছে এখন। এবং শুধু কথাগুলোই নয়, বলা হবে কোন কায়দায়। আজকে, দেখতে পাচ্ছেন, যে যার কাজ নিয়ে চলেছে—মুখে না বলুক, দস্তুরমতো পাল্লাপাল্লির ব্যাপার। দেশের কাজের কাজী সকলেই আমরা—কোন মানুষ আজ হেলাফেলার নয়। হাজার হাজার লোকে আমাদের কথা শোনে—মনে মনে তাই বড্ড ভাবনা, আজে-বাজে কথা শুনিয়ে দেশের উন্নতি পিছিয়ে না দিই।

শুনুন তবে। সেই মান্ধাতার আমলের বিস্তর পালাগানই চলছে আজও। গোটাকয়েক মাত্র বাদ গেছে। পুরানো বস্তু নিয়ে বড্ড দেমাক আমাদের। পাঁচ-সাতশ বছর ধরে যা চলে আসছে, বাপ-ঠাকুর্দা যা শুনে গেছেন, এক কথায় তা বাতিল করবার জো নেই। তবে কি বলতে চাও, তাঁরা বোকা—রুচি ও রসবোধ ছিল না তাঁদের? ঐ যে বললাম—এমন গোঁড়া বামনাই দুনিয়ার অন্য কোন জাতের যদি দেখতে পান!

পালা ঠিকই আছে, অভিনয়ের ঢংটা শুধু বদলেছি। একালের মানুষকে নয়তো খুশি করা যায় না। যেমন ইয়াং কুই-ফি'র জীবন নিয়ে লেখা নাটক। ঐতিহাসিক ঘটনা—ইয়াং ছিল এক সম্রাটের উপপত্নী। তার আশ্চর্য রূপ আর অহঙ্কারের গল্প চীনের বাচ্চা-বুড়োর মুখে মুখে। হুবহু সেই একই নাটক

—কিন্তু আগেকার অভিনয়ে ফুটে উঠত ইয়াঙের প্রমোদ-লাস্ত, আর এখনকার অভিনয়ে রূপসী দুর্ভাগিনীর নিঃসহায় একাকিত্ব। প্রায় একই কথাবার্তা—কিন্তু অভিব্যক্তির রকমফেরে আজকের শ্রোতা লাজ-অন্তঃপুরিকার বন্দীত্ব-বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে। নতুন পালাও অবশ্য বিস্তর লেখা হচ্ছে। কিন্তু নতুন অর্থ বিকিরণ করছে অতি-প্রাচীন কাহিনীগুলোও।

সুইং ঝড়ের বেগে এসে পড়ল।

গল্প শেষ করুন। পাকিস্তানিদের আপনারা নেমতন্ন করেছেন, মনে নেই?

ঠিক বটে! আজকে দ্বিতীয় দফা। সেই যে কথা চলছিল, ভারত-পাকিস্তান গণ্ডগোল করব না, আপোসে ফয়শালা করে নেবো সমস্ত—তারই পাকাপাকি সিদ্ধান্ত হবে আজকে খাওয়ার সময়। যাচ্ছি সুইং, ওঁরা গিয়ে বসতে লাগুন, এক্ষুনি গিয়ে হাজির হবো।

মানুষ কি রকম বদলে গেছে শুনবেন? একটা পালায় রাজার পার্ট করে আসছি আমি আজ তিরিশ বছর। লড়াইয়ে হেরে এসে বলেছি—"আমি চেষ্টার কসুর করিনি, কিন্তু বিধাতা বিমুখ—রাজ্য আমার ধ্বংস হবেই।" অ্যাক্টো করছি গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে। সেকালে দেখতাম, এই শুনে হলের তাবৎ মানুষ চোখ মুছছে। এখনকার শ্রোতারা হাসে একই কথায়—বিধাতার আক্রোশে রাজার লড়াই হারবার কথা শুনে। সেকেলে এক নাটকের এক জায়গায় আছে—"মেয়েলোকের ব্যাপার তো! বোলো না, বোলো না, ওতে আবার কেউ কান দেয় নাকি?"…কথাগুলো এখন উচ্চারণ করবার জো নেই স্টেজের উপর। গুঞ্জন উঠবে—ঝাঁঝালো প্রতিবাদ হবে। মেয়ো নয় শুধু, পুরুষ ছেলেদেরও অমন কথায় ঘোরতর আপত্তি। একটা পালা ছিল—সেনা-পতি তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে মেরে ফেলল মায়ের তুষ্টির জন্য; মা বউকে মোটে দেখতে পারত না। মেরে ফেলে তারপর বিষম শোকার্ত হয়েছে সেনাপতি। মাতৃভক্তির চরম পরাকাষ্ঠায় হৈ-হৈ করত সেকালের শ্রোতারা। এখন পালাটা বাতিল—লোকে দু-কানে আঙুল দেয় শোনাতে গেলে। ভাঁড়ামি করে লোক হাসানো হত সেকালের অনেক পালায়; এখানকার মানুষ হাসে না, চটে আগুন হয়। কি ভাবো আমাদের, রুচি নোংরা করে দিতে চাও এই সব শুনিয়ে? কাগজে চিঠিও বেরোয় এই রকম পালা গাইলে।

রকমারি সাজপোশাকে রঙবেরঙের আলোর মধ্যে চল্লিশটা বছর রাতের

পর রাত কেমন বেশ স্বপ্নের ভিতর দিয়ে কাটিয়ে এলাম। স্টেজ বিনে আর কিছু জানিনে। দেশের মানুষ কি বেগে এগিয়ে চলেছে, ওখান থেকেই মালুম হচ্ছে; বাইরে এসে চতুর্দিক নিরীক্ষণের দরকার হয় না। নেচেকুঁদে স্ফূর্তির যোগান দেওয়া নয় শুধু, দশজনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটাও সকলের সঙ্গে আমরা কাঁধ পেতে নিয়েছি। মাও-তুচির কথা—পুরানো বনেদের উপর নতুন ইমারত গড়ে তোল। আমাদের নাটুকে ব্যাপারও ঠিক তাই। সারা চীন জুড়ে অগণ্য অপেরা-দল আছে—১৯৫০অব্দে সবাই এসে পিকিনে জমল। আলাপআলোচনা হল—কারা কোন দিকে চলছে, সকলে একসঙ্গে বসে তার নমুনাও দেখলাম। মোটামুটি একটা পথ ছকে নেওয়া গেছে সবাই যাতে পাশাপাশি চলতে পারি। আবার শিগগিরই আমরা মিলছি, যত অপেরা দল আছে। কারা কদ্দূর কি করল, তার হিসাবনিকাশ হবে···

অমিয় মুখুজ্জে এক সেক্রেটারি—খোদ সেই প্রভু এসে হাজির। সবাই হাত কোলে করে বসে, আর দিব্যি আপনারা গল্প জমিয়ে বসেছেন। আচ্ছা মানুষ!

তাড়া খেয়ে উঠতে হল—বাপরে বাপ, সেক্রেটারির তাড়া। ভোজনই শুধু নয়, উদ্গারণ-ক্রিয়াও আছে আজ আমাদের—আমার বক্তৃতা, ক্ষিতীশের গান। কিন্তু গুণীজনদের ছেড়ে যাই কেমন করে?

আপনারাও আসুন না—খাবেন আমাদের সঙ্গে। খেতে খেতে আরও কথা শুনব।

এমন দরের মানুষ...কিন্তু প্রস্তাবমাত্রেই উঠে দাঁড়ালেন। ব্যাঙ্কুয়েট-হলে ক্ষিতীশ আর আমি দুই মান্য অতিথিকে মাঝে নিয়ে বসেছি। খাওয়া অন্তে গান হচ্ছে, আবৃত্তি হচ্ছে মি'কে বলি, আপনার কিছু হবে না?

মি ঘাড় নাড়েন। উঁহু, এখানে 'কেন? ছিটেফোঁটায় সুবিধে হয় না আমার। আপনাদের জন্য পুরো পালার ব্যবস্থা করেছি। আমি তার নায়িকা। পরশু নাগাত দেখাব।

নায়িকা মানে বিশ-বাইশ বছরের ফুটফুটে রাজকন্যা। ষাট বছরের বুড়ো তরুণী রাজকন্যা সেজেছেন। বুঝুন। সামনের সিটে আমরা স্টেজের হাত-খানেকের মধ্যে। বারবার নজর হেনেও কিন্তু ধরতে পারছি নে। মি বোধ হয় ফাঁকি দিলেন শেষ পর্যন্ত। ছাপা প্রোগ্রাম উল্টেপাল্টে দেখছি, রাজকন্যা তিনিই বটে। কিন্তু এই চেহারা বুড়ো মানুষটার কি করে হতে পারে?

পাশের দোভাষি ছেলেটা হেসে খুন। ঐ তো মজা! মেক-আপ, গলার স্বর এখন এই রকম দেখছেন—আবার যেদিন উনি রাজা সাজবেন, দেখতে পাবেন বিলকুল আলাদা। এমনি না হলে ওঁর নামে এত মেতে ওঠে মানুষ!

পুরুষমানুষ রাজকন্যা সেজেছে, কিন্তু কন্যার সখিবৃন্দ—গুনতিতে জন ত্রিশেক—তারা সবাই সত্যিকার মেয়ে। সেকালের রেওয়াজ—মেয়ের পার্টে পুরুষ নামত। কিন্তু যত পার্ট করেছেন, বেশির ভাগ মেয়ে। মেয়ে মিলত না, সে জন্যে নাকি? আমাদের দেশের মতন আর কি! এখন দেদার মেয়ে—কত নেবেন?

যাকগে, যাকগে। কোথায় যেন ছিলাম? ব্যাঙ্কুয়েট-হলে ভোজ খাচ্ছি পাকিস্তানি ভায়াদের সঙ্গে। গলা খাঁকারি দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি আসরের মাঝখানে। চতুর্দিকে এক নজর তাকিয়েই নিই।

আজকে ছাড়ব একখানা বঙ্গভাষায়। সুবোধ বন্দ্যো সেই যে বলেছিলেন—দেখা যাক কেমনতরো দাঁড়ায় এই ঘরোয়া সম্মেলনে। সামনেই তরুণ বন্ধু মুজিবর রহমান—আওয়ামী-লীগের সেক্রেটারি। জেল খেটে এসেছেন ভাষা-আন্দোলনে; বাংলা চাই—বলতে বলতে গুলির মুখে যারা প্রাণ দিয়েছিল, তাদেরই সহযাত্রী। আর রয়েছেন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আতাউর রহমান; দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন; যুগের দাবীর সম্পাদক খোন্দকার ইলিয়াস, বাংলা ভাষার দাবি এঁদের সকলের কণ্ঠে। বাঁ-দিকে দেখতে পাচ্ছি ইউসুফ হাসানকে—আলিগড়ের এম. এ. উর্দুভাষী হয়েও বাংলা ভাষার প্রবল সমর্থক। এই বিদেশে বাংলায় বলবার এর চেয়ে ভাল জায়গা আর কোথায়?

গোড়ায় একটুখানি ভূমিকা করে নিই ইংরেজিতে।, মশাইরা, অবধান করুন। আমি ভারতীয় বটে, কিন্তু জন্মস্থান পূর্ব-পাকিস্তানে। আজকে আমার নিজ ভাষা বাংলায় কিছু বলব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই ভাষা। নিখিল-পাকিস্তানের বড় হিস্যাদার যে পূর্ব-বাংলা, তারও ভাষা এই।

খুব হাততালি। পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে যাঁরা এসেছেন, উৎসাহ তাঁদেরই উত্তাল। মিঞা ইফতিকারউদ্দীন হৈ-হৈ করে উঠলেন উল্লাসে···

সেই রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর মুজিবর রহমান এসেছেন আমার ঘরে। এমনি চলত আমাদের—কোন দিন আমি যেতাম ওঁদের আস্তানায়, কোন দিন

বা আসতেন ওঁদের কেউ কেউ। খাস-বাংলায় অনেক রাত্রি অবধি গল্পগুজব চলত। বক্তৃতার আসরে ঐ হাততালির কথা উঠল। কিগো ভায়া, পশ্চিম-পাকিস্তানিদের খুব তো নিন্দেমন্দ করেন বাংলাভাষার শত্রু বলে। অমন সম্বর্ধনা কি জন্যে হল তবে ?

মুজিবর বললেন, ভাষা-আন্দোলনের পর থেকে ওরা আমাদের ভয় করে। গুঁতোয় পড়ে বাংলাভাষার এত খাতির।

আবার বললেন, যে ক'টি এসেছে—এরা ভালো, আমাদের মনের দরদ বোঝে। এদের দেখে সকলের আন্দাজ নেবেন না।

দেশে থাকতে শুনে গিয়েছিলাম, দুই বাংলার মধ্যে যাতায়াতের পাশপোর্ট হচ্ছে। একদিন সেই কথা উঠল। মুজিবর বললেন, কেন বলুন দিকি ?

আমরা বিদ্যাবুদ্ধিমতো জবাব দিই। ভাষা-আন্দোলনের পর কর্তারা বোধ হয় সন্দেহ করেছেন, পশ্চিম-বাংলা থেকে অবাঞ্ছিত মানুষ গিয়ে উস্কানি দেয়। সেই সব মানুষ আটকানোর মতলব।

হল না। মুজিবর রহমান বলতে লাগলেন, এ হচ্ছে—পূর্ব-বাংলায় যতগুলো হিন্দু আছে তাদের তাড়াবার ফিকির। পাশপোর্ট চালু হবার মুখে আবার এক দফা পালানোর হিড়িক পড়ে যাবে, দেখতে পাবেন।

অবাক হয়ে গেছি। মুজিবর জোর দিয়ে বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, তাই। হিন্দুরা চলে গেলে পূর্ব-বাংলায় আমরা গুনতিতে কম হয়ে যাবো পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে। তখন আর এন্তাজারি খাটবে না, ও-তরফ থেকে যা বলবে 'জো হুকুম' বলে মেনে নিতে হবে।

উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, ভিটেমাটি ছেড়ে যাঁরা চলে গেছেন, আমি পশ্চিম-বাংলায় গিয়ে হাতে-পায়ে ধরব তাঁদের। নিজের দেশভূঁই কি জন্যে ছাড়তে যাবেন ? আর এই শুনে রাখুন—হাঙ্গামা যতই হোক, হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা পূর্ব-বাংলায় কোন দিন আর হবে না।

বক্তৃতাটা আজকে কি রকম উতরাল—তাই কি খেয়াল আছে ছাই ? খুব মেতে গিয়েছিলাম, এই মাত্র জানি। আমার সাত-পুরুষের ভিটা আজকের ভিন্ন রাজ্য হয়ে গেছে। সীমানা পার হতে হাজারো বায়নাক্কা। কর্তা হয়ে যারা জাঁকিয়ে বসেছে, তাদের সঙ্গে চেহারায় মেলে না, কথায় মেলে না, কথাবার্তা বোঝে না তারা কিছু। মনে দুঃখ হয় না, বলুন ? এদেশ-ওদেশ হয়ে আলাদা দল করে এসেছি বটে, চীনে আসবার পর তাবৎ বাঙালি এখন তো কাঁধ-ধরাধরি করে বেড়াই। পাকিস্তানের এবং ভারতের অপর

প্রতিনিধিরা থ হয়ে গেছেন আমাদের রকমসকম দেখে। বাংলা বক্তৃতা বুঝলেন ক'জনই বা! কিন্তু সব ক'টি মানুষ আগাগোড়া চুপ হয়ে ছিলেন। একটু-আধটু মনেও ধরেছে মালুম হচ্ছে—কথা না বুঝেও আমার মনের ব্যথা ছুঁয়েছে যেন তাঁদের মনে।

রমেশচন্দ্র এগিয়ে এসে বাহবা দিলেন, ভারি চমৎকার বলেছেন—

কি বলেছি বলুন দিকি?

আমতা-আমতা করেন তিনি। দেখুন, বাংলা মোটে যে বুঝি নে, এমন নয়। তবে ঝড়ের বেগে এমন ছুটলেন যে পিছু পিছু ধাওয়া করা গেল না।

(৯)

শান্তি-সম্মেলনে মোট ছিয়াশিটা বক্তৃতা। রিপোর্ট ও ঘোষণা ইত্যাদিতে আরও গোটা চল্লিশ। একুনে কতগুলো দাঁড়াল তবে, কষে দেখুন। শুনিয়ে দেবো নাকি তার থেকে ভারী গোছের ডজন দুই? আঁতকে উঠবেন না পাঠককুল—সাদামাঠা একটু রসিকতা। এর তুলনায় হাইড্রোজেন-বোমা তাক করাও দয়ার কাজ। দু-তিনটে বক্তৃতার যৎসামান্য নমুনা ছাড়ব। পুরো বস্তু নয়...এখান থেকে একটা লাইন, ওখান থেকে দুটো। এতে আর মুখ বাঁকাবেন না, দোহাই!

নারীর অধিকার ও শিশুমঙ্গল সম্পর্কে রিপোর্ট দিলেন তাহিরা মজহর। সর্দার সেকেন্দার হায়াত খাঁর কথা মনে পড়ে···অখণ্ড-পাঞ্জাবের যিনি প্রধান-মন্ত্রী ছিলেন? তাঁর মেয়ে। স্বামী মজহর আলী খাঁ পাকিস্তান-টাইমসের সম্পাদক...তিনিও এসেছেন। মেয়েটির অতি সুন্দর চেহারা, কণ্ঠস্বর ও ইংরেজি বাচনভঙ্গি অতি চমৎকার। সাঁইত্রিশটা দেশের পৌনে-চার শ মানুষ...আহা-ওহো করছেন। বক্তৃতা অন্তে দলে দলে সে কী অভিনন্দনের ঘটা! অধমও দলের বাইরে নয়।

...মেয়েদের কথা বলতে উঠেছি আমি। তারা লড়াই করে না, লড়াইয়ে মারা পড়ে অসহায়ের মতো। এখানকার লড়াই শুধু সৈন্য মারে না, নিরীহ মানুষের ঘর-গৃহস্থালি ভাঙে, যুগ যুগ ধরে গড়ে-তোলা মানুষের সহাজ ও সভ্যতা উৎখাত করে দেয়।

"মা ছেলেকে বিদায় দিচ্ছেন, কোনদিন আর চোখে দেখবেন না সেই ছেলে; হাস্যোচ্ছলা তরুণী নিঃসহায় বিধবা হয়ে আকাশ-ফাটা আর্তনাদ করছে; মনে মনে ভাবুন দিকি এই সব ছবি। কোন অজ্ঞাত সুদূর রণক্ষেত্রে

হাজার হাজার মায়ের বাছার উপর সঙ্গিনের ধার পরীক্ষা হচ্ছে; ফিরে যদি আসে কখনো, আসবে পঙ্গু-বিকলাঙ্গ হয়ে। একটা সত্যি ঘটনা শুনুন। বেরেয়েছে আমেরিকারই এক কাগজে। দক্ষিণ-কোরিয়ার দারুণ শীতে খোলা প্লাটফরমে শ-খানেক বাচ্চা আশ্রয় নিয়েছে। বাপ-মা আত্মীয়জন সবাই লড়াইয়ে মরেছে—ধরণীতে আপন বলতে কেউ নেই। আমেরিকান ভদ্রলোক একটিকে গিয়ে ধরলেন, এর পরে কি করবে, ভেবেছ তুমি কিছু?

"মরব—আবার কি! গেল শীতে আমার দাদা গেছে, এবার আমি—

"মরার ক্ষণ অবধি কোন গতিকে কাটিয়ে দেওয়া—তা ছাড়া ঐ বাচ্চা ছেলের আর কোন লক্ষ্য নেই জীবনে। এ ছেলে একটি নয়—হাজার হাজার। প্যারিসে শান্তি-কংগ্রেস হয়েছিল—পাকিস্তানে সাড়া দিয়েছিলাম আমরা মেয়েদের দলই সকলের আগে। পাঞ্জাব উইমেনস ডেমোক্রেটিক অ্যাসোসিয়েশন। কেন জানেন? নিজেদের ভাবনা তত ভাবি নে—মায়ের জাত, ছেলেমেয়ের কষ্টে দুঃখে স্থির থাকা অসম্ভব আমাদের পক্ষে! তাই বলছি, লড়াই থামাও বন্ধুরা সকলের মিলিত চেষ্টায়—নইলে তোমার বুকের মানিক নিঃসহায় নির্বান্ধব পথে দাঁড়িয়ে অমনি বলবে, আমি মরব এবারের শীত এসে পড়লে। ধরণীর সকল আলো-আনন্দ নিঃশেষে নিবে গেছে এক ফোঁটা ঐ বাচ্চা ছেলের চোখে..."

স্বর কাঁপছিল তাহিরা মজহরের। ব্যাকুল বেদনার্ত মাতৃকণ্ঠ, মনে হল, করজোড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে হল-ভরতি তাবৎ মানুষের চোখের সুমুখ দিয়ে।

আর একজনের দু-এক কথা বলি। আমাদের রবিশঙ্কর মহারাজ। সত্তর বছরের বুড়োমানুষ—অঙ্গে অম্লান খদ্দরের ভূষা, নগ্নপদ, মাথায় গান্ধীটুপি। আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন-ক্ষেত্রে ভারতের পুণ্যবাণী উদ্গীত হল মহারাজের কণ্ঠে। মহারাজের বক্তৃতার পর এই কথাগুলোই বললাম অধ্যাপক শুকলার কাছে। মহারাজকে গুজরাটিতে বুঝিয়ে দিতে সলজ্জ হাসি হেসে তিনি আমায় নমস্কার করলেন।

"সম্মেলন তিনটে কারণে অতি পবিত্র। সম্মেলনের শুরু মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে। সৃষ্টির আদি থেকে যত মানুষ জগতের শান্তি-সৌহার্দের জন্য কাজ করে গেছেন, মহাত্মার চেয়ে বড় কেউ নেই। দ্বিতীয় কারণ, সুপ্রাচীন চীন ভূমির উপরে এই অনুষ্ঠান। মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে পর্বতপ্রমাণ দুঃখ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে এই মহাজাতি। তিলেক সঙ্কল্পভ্রষ্ট

হয় নি ; শ্রমে অবসান আসে নি। তিন বছরের মধ্যে অসাধ্য সাধন করে পীড়িত অবমানিত মানুষের চিত্তে নতুন আশা জাগিয়েছে। আর তৃতীয় কারণ হল—সম্মেলনের পুণ্য লক্ষ্য, জগতের মধ্যে—বিশেষ করে এশিয়ার দেশে দেশে সকল মানুষের মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাবের অচল প্রতিষ্ঠা।

"বারম্বার মহাত্মাজীর কথা মনে পড়ছে। শেষ নিশ্বাস অবধি তিনি জগতে শান্তি কামনা করে গেছেন, সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা বা গণ্ডি-ঘেরা স্বদেশপ্রেমের প্রশ্রয় দিতেন না কখনো তিনি। জগতের যা-কিছু ভালো, নিখিল মানবজাতির তা ভোগ্য হবে, কয়েকটি মানুষের কুক্ষিগত হয়ে থাকবে না—এই তাঁর লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যের সাধনা অহিংসা পথ ধরে।

"শান্তি আকাশ থেকে পড়বে না—শান্তির জগৎ গড়ে উঠবে সকলের প্রতি যদি ন্যায় আচরণ হয়। যেখানে জোরজবরদস্তি, বাধা সেখানে দিতেই হবে। অহিংস-পথিক আমরা বিশ্বাস করি, মানুষের শান্ত চরিত্রই কেবল শান্তির সহায়ক হতে পারে। তবু যেখানে যে-কেউ অন্যায়ের প্রতিরোধ করে—তা সে যে উপায়েই হোক—আমার শ্রদ্ধা স্বতই তার প্রতি উৎসারিত হয়ে ওঠে।

"প্রতিটি মানুষ নিজ শ্রমের ফল ভোগ করবে। জাগতিক ভোগ-সুখ নিয়ে বেশি মাতামাতি করলে কখনো বিশ্বশান্তি আসবে না। ত্যাগের মনোভাব চাই। ভোগলিপ্সা থেকেই অপরকে বঞ্চনা, সম্পদের লালসা—এবং শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ের প্রবৃত্তি জাগে।'

(১০)

ছুটি, ছুটি! তারিখটা ৮ই অক্টোবর। আট-আটটা দিন একটানা কনফারেন্স হল, তাই বুঝি করুণা করে কর্তারা বিকেলটা মাপ করেছেন। রাত নটায় সাংস্কৃতিক কমিশন—তাক বুঝে গা-ঢাকা দিলে ওটাও ফাঁক কাটানো যাবে। খানাঘরের ক্রিয়া জবর রকমে সমাধা করে মনের স্ফূর্তিতে লেপ মুড়ি দিয়েছি। ডবল খিল লাগাও ক্ষিতীশ-ভায়া, ছোঁড়াছুঁড়িগুলো দুয়োর ভেঙে ফেললেও চারটের আগে সাড়া দিচ্ছি নে।

হায় রে কপাল! এ বিজ্ঞান-যুগে দুয়োরে খিল দিয়ে শত্রু ঠেকানো যায় না, ঘরের মধ্যে শিয়রের পাশেও শত্রু ওত পেতে থাকে। মনোরম আমেজ এসেছে, আর অমনি ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং—। হাত বাড়িয়ে ফোনের মুখ চেপে ধরবে, কিন্তু শীতের দুপুরে লেপের তলা থেকে হাত বের করা চাট্টি কথা নয়

পারেন? আরে, আমরা কি—লড়াইয়ের তা-বড় তা-বড় যোদ্ধাও হার খেয়ে যায়।

তোমর ফোন ক্ষিতীশ, কোন গাইয়ে-বন্ধু ডাকছে—

উঁহু, ফোন আপনার—

বেশ খানিকটা ঠেলাঠেলি চলল দু-জনে। নাছোড়বান্দা ফোন বেজেই চলেছে। ক্ষিতীশ অগত্যা বেজার মুখে রিসিভার কানে তুলে নিল। পরক্ষণে বলে, কানে নিলেন না। ফোন আপনারই।

আমারই বটে!' চালাকি করে সুখতন্দ্রা ভাঙলে খুনোখুনি হয়ে যেতো ক্ষিতীশের সঙ্গে। ভারতীয় দূতাবাস থেকে পরাঞ্জপে বললেন। আজ সন্ধ্যায় সময় আছে আপনার? তাহলে যাই।

যান মশায়, আরও দুদিন এমনি বলেছেন। হা-পিত্যেশ বসে রইলাম, মশায়ের টিকি-দর্শন হল না। সামান্য কদিন আছি, যদ্দূর পারি দেখে-শুনে যাবো—তার মধ্যে দুটো সন্ধ্যের ঘণ্টা দুই আপনি নষ্ট করে দিয়েছেন।

আজ নির্ঘাত রাত্তির বেলটা পুরোপুরি ফাঁক করে নিয়েছি। দেদার গল্প—কত শুনবেন? আসছি তাহালে কিন্তু—সাড়ে-ছয় থেকে সাতের মধ্যে।

উঠতেই যখন হল, আর লেপ নয়—ওভারকোট গায়ে চাপানো যাক। ওঠো ক্ষিতীশ, বেরিয়ে পড়ি। কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ নয়—দু-জনের দু-জোড়া পায়ের উপর নির্ভর। যেদিকে খুশি, নিয়ে চলে যাক তারা—

কিন্তু হবার জো আছে? লনে দেখি ভারি এক দল। সুবোধ বন্দ্যো আছেন—আর ওখানকার অনেকগুলি।

কোথায়?

চলুন না। হাঙ্গেরির একজিবিশন হচ্ছে। কর্মীদের সাংস্কৃতিক প্রাসাদও দেখে আসা যাবে অমনি।

চীনা বন্ধুটি বলেন, দাঁড়ান—গাড়ির কথা বলে আসি।

আজ্ঞে না। বিশ্বাস করুন, পা নামক এক প্রকার অঙ্গ আছে আমাদের—আমরাও কিঞ্চিৎ হাঁটতে পারি। কিন্তু যা গতিক, অব্যবহারে যন্ত্রটাকে বিকল না করে দিয়ে আপনারা ছাড়বেন না।

ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন। ততক্ষণে নেমে পড়েছি, দ্রুত পায়ে হাঁটছি।

কলকাতার চৌরঙ্গির মতো সুপ্রশস্ত পথ। পথের ধারে গাছপালা—ছায়ায় ছায়ায় চলেছি। এক সংস্কৃতের পণ্ডিত দলে জুটেছেন। পণ্ডিত বলতে যে রকমটা আন্দাজ করেছেন, তা নয়। ছোকরা-ছোকরা চেহারা—মুখ-ভরা

হাসি। অথচ পড়ান য়্যানিভার্সিটিতে, এবং গীতা-উপনিষদের আধাআধি তাঁর মুখাগ্রে।

পণ্ডিত এক কাণ্ড করে বসলেন। কি লজ্জা, কি লজ্জা! অনেকেই খেয়াল করে নি; আমার নজরে পড়ল। ধরণী দ্বিধা হলেন না, নির্বিঘ্নে তাই পথ হাঁটতে লাগলাম। আমাদের একজন সিগারেট খাচ্ছিলেন—গল্প করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে সিগারেটের গোড়াটুকু ফেলে দিয়েছেন পথে। পণ্ডিত আমাদের দিকে আড়চোখে চেয়ে সেই মহামূল্য বস্তু নিচু হয়ে তুলে নিলেন। হাতের মুঠোয় নিয়ে চলেছেন—তারপর ডাস্টবিন পেয়ে সুড়ুত করে কাছে গিয়ে তার মধ্যে ফেলে দিলেন। পণ্ডিতমানুষ হলে কি হবে—জাতে চীনা! অন্যের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে নিতে আটকাল না। কিন্তু এ ভারি বিপদ তো! সবজান্তা বন্ধুরা বলে থাকেন, ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই ওদেশে। কথাটা ঠিকই। পোড়া-সিগারেটটুকুও পথে ফেলা যায় না। স্বাধীনতা তবে আর রইল কোথায় বলুন?

তিয়েন-আন-মেনের তলা দিয়ে নিষিদ্ধ-শহরে ঢুকলাম। সেকাল হলে—ওরে বাবা, চোখ তুলে এদিকে তাকাবার কি তাকত হত! বেশ খানিকটা ছায়াচ্ছন্ন জায়গা। সেটা পার হয়ে সিঁড়ি উঠে এক বড় ঘর। ঘরের ভিতর দিয়ে পথ—ঘরে না ঢুকে আনাচ-কানাচ দিয়ে যে ওদিকে যাবেন, সে উপায় নেই। ঘর ছড়িয়ে উঠোন—পাথরে বাঁধানো। সারা উঠোন ভরতি দৈত্যদানোর মতো যন্ত্রপাতি। রেল-ইঞ্জিন, ট্রাক্টর, মোটরকার—কোন্ বস্তু যে নেই, বলতে পারব না।

ভারতের মানুষ? আহো, কি ভাগ্য—কি ভাগ্য! তাই দেখলাম, বাইরের ভুবনে আমাদের বিস্তর ইজ্জত। খ্যাতির পেয়ে পেয়ে মাথা প্রায় আকাশ-ছোঁয়ার দাখিল হয়েছিল। ঐ এখন বদভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। দেশে ফিরেও খাড়া মাথা আর নিচু হতে চাচ্ছে না।

উঠোনের দেখাশুনো শেষ হলে সামনের ও ডানদিকের ঘরগুলোয় নিয়ে চলল। কত রকম যন্ত্রপাতি বানিয়েছে রে ঐটুকু দেশ হাঙ্গেরি! হাসতে হাসতে বলে, চাই তোমাদের? তা হলে বলো। চাওয়া না-চাওয়ার মালিক যেন আমরা! হাসি থামিয়ে তারপর বলল, সত্যি, খদ্দের খুঁজছি আমরা। যে দেশের নেই, তাদের জোগান দিতে পারি।

শুধু যন্ত্রপাতি? চাষবাস ও ঘরোয়া শিল্পে কত উন্নতি করেছে—থরে থরে তার নমুনা সাজানো। সমস্ত ঘর ঘুরিয়ে তবু ছেড়ে দেবে না। তাই

কি হয় মশায়, খেয়ে যান কিছু। খাবার-দাবারও খাস-হাঙ্গেরির আমদানি—এখানকার একটি জিনিস নয়।

পাকড়াও করে নিয়ে বসাল একটা ঘরে। রকমারি মদ—ও-বস্তু আমার নয়। আচ্ছা, আরও আছে—টিনে মাংস, চকোলেট, কফি—কি বলবেন এবারে শুনি! এটা-ওটা অগত্যা মুখে ফেলে, চিত্রবিচিত্র ভারী এক-এক ক্যাটালগ বগলদাবায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

এবারে পশ্চিম দিকে একটু। সাইপ্রেস গাছের ঘনকুঞ্জ মাঝখানে লাল দেয়ালের ঘর, হলদে টালির ছাত। গাছ আর এই ঘরবাড়ি প্রায় একই বয়সি—পাঁচ শ' পেরিয়েছে। দক্ষিণের গায়ে ঝিরঝিরে একটু—আজ্ঞে হ্যাঁ, নদীই বলতে হবে; খাল বললে ওঁরা গোসা করবেন। সুদূর-পাহাড়ের উদ্দাম মেয়ে নিষিদ্ধ-শহরের অন্দরে এসে নিরুদ্যম নিস্তরঙ্গ ক্ষীণদেহ হয়ে গেছে। আরামে আছে অবশ্য। মার্বেল-পাথরে বাঁধানো দুই তটের শুভ্র শয্যা—মার্বেলের সাতটা সাঁকো কুলবধূর সাদা শাঁখরে মতো পর পর যেন হাতে পরানো। সেকালে মস্ত কাজ ছিল নদীর—আগুন-নেবানোর যাবতীয় তোড়জোড় এই বাঁধানো নদীতটে।

বাড়িটা ছিল পিতৃপুরুষের মন্দির। রাজারা এখানে অতীত মুরুব্বিদের পুজো দিতে আসতেন। রাজার রাজত্ব ফৌত হয়ে গেলে তারপর আরশুলা-চামচিকেয় বাসা বেঁধেছিল। এখন ভাল করে সেরে-সুরে নতুন ভাবে সাজিয়ে গুজিয়ে সাংস্কৃতিক প্রাসাদ পেয়েছে। নামকরণ মাও-সে-তুংএর—তিনি নিজের হাতে নাম লিখে টাঙিয়ে দিয়েছিলেন ১৯৫০ অব্দে। যারা খেটে খায়, তাদের নিজস্ব জায়গা। দলে দলে এসে জোটে এখানে পড়াশুনো খেলাধুলা আমোদ-স্ফূর্তি করে।

কারুকর্ম ও আসবাবপত্রের চেহারা দেখে নয়ন ফেরানো দায়। রাজরাজড়ায় বানানো বস্তু—ধরুন, একেবারে খাস এলাকা তাঁদের রাজার মূলপ্রাসাদেরই অংশবিশেষ বলা চলে। যতক্ষণ বেঁধে রয়েছে, থাকো রাজপ্রাসাদের ভিতর। মরবার পর একটু সরে এসে এখানে মন্দিরের মধ্যে জায়গা নাও। মিং আর চিং দু-দুটো রাজবংশের যাবতীয় প্রেতাত্মা ছিলেন এখানে, অদৃশ্য বায়বীয় দেহ বলেই কম জায়গায় গুঁতোগুঁতি হতে পারত না। প্রেতাত্মবর্গ বিরক্ত হয়ে এখন নিশ্চয় সরে পড়েছেন। গায়ে-খেটে-খাওয়া সামান্য লোকেরা দিন-রাত হৈ-হল্লা করছে, হেন সংসর্গে রাজন্যেরা কি করে থাকবেন?

পুব দিকে খেলার মাঠ; পশ্চিমের মাঠে স্টেজ—খোলা জায়গায় থিয়েটার হয়। দুটোই নতুন তৈরি। সামনের হলগুলোয় বারো মাস তিরিশ দিন একজিবিশন চলছে। জিনিসপত্র পালটাপালটি হয়, পিকিনের জিনিস বাইরে চলে গেল, বাইরের জিনিস এলো এখানে। তাই মানুষের আনাগোনা কমে না। পিছনের একটা হলে গান-বাজনা হয়, আর একটায় নাচ। সকলের পিছনে তাস-দাবা ইত্যাদি, এবং আড্ডা জমানোর জায়গা। ফুল-লতা-পাতা ও সাইপ্রেসের আলো-আঁধারি উপবনে অহরহ দেখবেন মেয়ে-পুরুষ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, গান গেয়ে গেয়ে উঠছে। খালের উপর ছোট ছোট নৌকো বেয়ে বেড়াচ্ছে; ক্ষণে ক্ষণে নৌকো বেমালুম হয়ে যায় সাত-সাঁকোর তলায়।

ইস্কুল আছে কাছাকাছি কোথাও। ছুটি হয়ে গেছে, বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা বাড়ি ফিরছে। এসো গো—একটু আলাপ করি তোমাদের সঙ্গে। কি বুঝল কে জানে—জোরে হেঁটে সরে পড়বার তালে আছে। সামনে গিয়ে হাসতে হাসতে পথ আটকে দাঁড়াই। হাত ধরব, তা পিছলে পিছলে সরে যাচ্ছে। একেবারে শিশু কিনা—ভয় পাচ্ছে হয়তো আমাদের অভিনব পোশাক ও আলাদা ধরনের চেহারা দেখে। অবশেষে একটিকে ধরে একটু আদর করলাম। পোষা-হরিণের মতো মাথা চেপে রইল গায়ে। নতুন-চীনের ভাবী নাগরিক, দেখ দেখ, কেমন আমার গা লেপটে দাঁড়িয়ে আছে।

যাবার সময়টাও, ভেবেছিলাম, পায়ে হেঁটে হেলতে দুলতে যাওয়া যাবে। কিন্তু হোটেল থেকে এক ভগ্নদূত এসে হাজির হয়েছেন, দন্ত মেলে হাসছেন তিনি।

কি করে টের পেলে ভাই, আমরা এখানে? গন্ধ শুঁকে শুঁকে এসেছ?

না এলে ফিরতেন কি করে? বাস নিয়ে এসেছি, হয়ে গিয়ে থাকে তো উঠে পড়ুন।

সবাই চটে উঠলেন। কক্ষনো না। বিস্তর ঘুরবো আমরা। তোমার বাসে তুমিই চড়ে ফিরে যাও।

আমি ভেবে-চিন্তে ক্রোধ সম্বরণ করে নিই। পরাঞ্জপের সময় হয়ে এলো —ওদের সঙ্গে আমার টহল দেওয়া চলবে না। অত বড় বাসখানায় তবু যা হোক একটি চড়নদার হল—একেবারে শূন্যগর্ভে ফিরতে হল না।

• সন্ধ্যায় একা হোটেল-ঘরের মধ্যে। কি করি, কি করি! বোতাম টিপে ওয়েটারকে ডেকে কফির অর্ডার দিই তো সর্বাগ্রে। আঙুর-আপেল-

চকোলেটের ছোট টেবিলটা ঘড়-ঘড় করে টেনে নিলাম পাশে। এবং তিন-চার দিনের জমে-ওঠা খবরের কাগজ।

দরজায় ঠক-ঠক। আসুন, ভিতরে চলে আসুন। আসা হল তবে সত্যি সত্যি ?

কি মুসকিল—পরাঞ্জপে নয়, চক্রেশ জৈন। ব্রজরাজ কিশোর কিছু সওদা করতে দিয়েছিলেন বুঝি মেয়েটার কাছে···একগাদা জিনিস নিয়ে এসেছে। তড়বড় করে এক নিশ্বাসে বলে, নেই বুঝি তিনি ? এগুলো তাঁর খাটের উপর রেখে যাচ্ছি। বলবেন।

আমাকেও তো কেনাকাটা করে দেবে বলেছিলে—

দেবো দেবো। কথা বলতে পারছি নে এখন। এগুলো রইল। আবার আসব আমি। কেমন ?

এই গতিক মেয়েটির। জমিয়ে বসল তো উঠবার নাম নাই। নয় তো ঝড়ের বেগে উড়ে উড়ে বেড়াবে এমনি। কফি এসে পড়েছে চুমুকে চুমুকে তা-ও এক সময়ে শেষ হয়ে গেল। সাতটা বেজে যায়, আজকেও তো আসার গতিক দেখিনে। চাই যে আমার পরাঞ্জপেকে। কুয়োমিনটাং পিঠটান দিল, পাঁচতারার নিশান উড়ল এই পিকিন শহরে—সমস্ত তাঁর চোখের উপর ঘটেছে। সেই সব গল্প শুনতে চাই তাঁর নিজ মুখ থেকে।

এলেন পরাঞ্জপে শেষ পর্যন্ত। নানান কাজে দেরি হল। কিন্তু এখানে নয়—এ জায়গায় হবে না। আমার বাড়ি চলুন।

খাওয়ার সময় হয়ে গেল !

খাওয়াটা আমার সঙ্গে হবে। সে অবশ্য না খেয়ে থাকারই সামিল। এদের রাজসূয় যজ্ঞের সঙ্গে পাল্লা দেবো কেমন করে ?

রাস্তার উপরে এসেছি দু-জনে। পরাঞ্জপের সাইকেল আছে, সাইকেলে যাবেন উনি। হাত নাড়তে সাইকেল-রিক্সা এসে দাঁড়াল আমার জন্য। মানুষ-টানা রিক্সা এখন বাতিল। একটু কথা হল রিক্সাওয়ালা ও পরাঞ্জপের মধ্যে। জিজ্ঞাস করলাম, কত নেবে ?

দু হাজার ইয়ুয়ান—

অর্থাৎ আমাদের প্রায় সাত আনা ?

পরাঞ্জপে হেসে বলেন, কয়েন্সির জটিলতা আপনি আপনি বেশ সড়গড় করে নিয়েছেন দেখছি—

কিন্তু দরাদরি করতে হল—এই যে ওয়া দেমাক করে, সব জিনিসের বাঁধাদর।

পরাঞ্জপে বললেন, রিক্সার বেলা চলে না। কোথায় কোন্ অলিগলিতে কোন্ পথ দিয়ে যেতে হবে, হিসেব করে তার দর বাঁধা চলে না। কিন্তু বেশি চায় না এরা। চেয়েছিল আড়াই হাজার। পথ ভাল করে বুঝিয়ে দিতে নিজেই দু-হাজারে নেমে এলো।

এখানকার রিক্সায় এক জনের বসবার জায়গা। রিক্সা যাচ্ছে, সাইকেল চেপে পরাঞ্জপে চলেছেন আমার পাশে পাশে।

ডায়েরিতে লেখা আছে দেখছি, 'স্মরণীয় রাত্রি!' তার এই শুরু হয়ে গেল। পরাঞ্জপে না হলে রিক্সা চড়ে পিকিনের অচেনা গলিঘুঁজি দিয়ে যাওয়া হত না কখনো। পরাঞ্জপের পাশাপাশি এই রকমারি গল্প শুনতে শুনতে যাওয়া।

গলিপথও ঝরঝরে পরিষ্কার। কে যেন একটু আগে ঝাঁটপাট দিয়ে গেছে। পরিচ্ছন্নতা মানুষের স্বভাব হয়ে গেছে। তিনটে বছর আগেও, কি আর বলব, বিদেশি মানুষ এমনি রিক্সা করে যাচ্ছেন—ভিখারির দল পঙ্গপালের মতো ছুটত পিছু পিছু। এখন একটা ভিখারি খুঁজে বের করুন দিকি! এই রিক্সাওয়ালারাই কি কাণ্ড করত লোকের সঙ্গে! টানাটানি, মারামারি, একরকম বলে গাড়িতে তুলে শেষটা অন্য রকম কথা—বিশেষ করে বাইরের লোক হলে তো কোন রক্ষে ছিল না।

আজকের চীনে ভিখারি নেই, পতিতা নেই। হাজার হাজার বছরের সামাজিক পাপ নাকি ঘণ্টা পাঁচ-ছয়ের মধ্যে সাফ-সাফাই। আরব্য উপন্যাসকে হার মানিয়ে দেয়। কিন্তু আজকে থাক, সে গল্প আর একদিন।

মুক্তি-সৈন্য ঘিরে ধরেছে পিকিন শহরকে। নানান দলে ভাগ হয়ে তারা আসছে। এসে পড়ল বলে। পাঁচ-সাত-দশ দিন বড় জোর—তার ওদিকে কিছুতে নয়। মানুষ কিন্তু তেমন মাথা ঘামাচ্ছে না—ওদের হল বওয়া ঘাড়, এমন বিস্তর দেখা আছে। এই সেদিন অবধি গোটা চীনের তিন ভাগের এক ভাগ জাপান দখল করে বসে ছিল। পিকিন শহরটাই কতবার হাতফেরতা হয়েছে, বিবেচনা করুন। লড়াইয়ে হেরে জাপানিরা সরে পড়ল তো কুয়োমিনটাং প্রভুরা আবার গদিয়ান হলেন। এঁরাই বা কি রামরাজত্ব রেখেছেন গো! এর উপর কমিউনিস্টরা এসে কি করে দেখা যাক। ঘা খেয়ে খেয়ে এমনি দার্শনিক নির্লিপ্ততা এসেছিল সকলের মধ্যে। চিয়াঙের সৈন্য

মনোবল হারিয়ে ফেলেছে। লড়াই করে না তারা, লড়াই করবার কারণ খুঁজে পায় না। বাইরে থেকে ভারে ভারে হাতিয়ার ও রসদপত্র আসছে...—খবরাখবর নেয়, কবে এসে পৌছবে সেগুলো। তার পরে ষোলআনা রণসাজে সজ্জিত হয়ে টুক করে উল্টো দলে ভিড়ে যায়। চিয়াঙের হাতিয়ার-পত্র চিয়াঙেরই দিকে তাক করে। সাধারণে রসিয়ে রসিয়ে এই সমস্ত গল্প করে, ভারি যেন এক মজার ব্যাপার! পথে ঘাটে লোক-চলাচল বেশ আছে—দোকানিরা একটু দেখেশুনে দোকান খোলে, এই যা। আর এক অসুবিধা—বাইরের জিনিস খুব কম আসছে শহরে। বাজারে তরিতরকারি মিলছে না। কয়লারও বড় টানাটানি।

পরাঞ্জপে যেমন-যেমন বললেন—তাই লিখছি। আরও একজন ছিলেন—অধ্যাপক উ সিয়ো-সিনিকা। তিনিও নিমন্ত্রিত—এক সঙ্গে খানাপিনা হবে, পরাঞ্জপের বাড়ি আগেভাগে এসে বসে ছিলেন তিনি আমার জন্য। শান্তিনিকেতনে ছিলেন এক সময়ে—হাস্যমুখ আনন্দময় মূর্তি। এঁর স্ত্রী উত্তম বাংলা জানেন—শান্তিনিকেতনে থাকার সময় নাম পেয়েছিলেন পার্বতী দেবী।

মুক্তি-সেনারা ঘণ্টায় ঘণ্টায় রেডিওয় বলছে, আত্মসমর্পণ করো চিয়াঙের দল, প্রাচীন মহিমময় পিকিন বোমা ফেলব না আমরা ওখানে, একটি ইটের টুকরো নষ্ট হতে দেবো না। আপোসে অস্ত্র ফেলে দাও নগররক্ষীরা।

নাগরিকদের অভয় দিচ্ছে, তোমাদের সেবক আমরা। কোন ভয় নেই। কুয়োমিনটাং নিন্দেমন্দ ছড়াচ্ছে—কান দিও না ও-সমস্ত বাজে কথায়।

পালানোর হিড়িক বড়লোকদের মধ্যে। কর্তাদের পেয়ারের মানুষ জীবন ও টাকাপয়সা নিয়ে সরে পড়তে পারলে হয়। এরোড্রোম শহর থেকে খানিকটা দূরে—দমদম যেমন আমাদের কলকাতা থেকে। বড়-রাস্তায় সেই সময়টা দিন-রাত দেখতে পেতেন, মোটরের পর মোটর ঊর্ধ্বশ্বাসে এরোড্রোমে ছুটছে। প্লেন হরবখত আসছে যাচ্ছে, আকাশে অবিরত আওয়াজ।

এরই মধ্যে শোনা গেল, এরোড্রাম থেকে বেশি দূরে আর নেই মুক্তিবাহিনী। সে কি কাণ্ড! যারা তখনো পালাতে পারে নি, তারা একেবারে খেপে উঠল। প্লেনের এক-একটা সিটের অবিশ্বাস্য রকম দর—বিদেশি কোম্পানিগুলো দু-হাতে টাকা লুঠছে এই মওকায়। বড় বড় ইমারত শ্মশানভূমির মতো খাঁ-খাঁ করছে, শৌখিন জিনিসপত্রের ছড়াছড়ি এখানে-সেখানে।

অধ্যাপক উ হাসতে হাসতে বললেন, আমার ভারি মজা সেই সময়টা।

দুষ্প্রাপ্য বই অনেকগুলোর কেবল নামই শুনেছিলাম, চোখে দেখবার ভাগ্য হয়নি—জলের দরে বিকোচ্ছে।

ঘুরে ঘুরে অধ্যাপক বই কিনে বেড়াচ্ছেন। পাঁচ-সাতটা দিনের মধ্যে বিশাল এক লাইব্রেরি। তারই মধ্যে ইদানীং ডুবে থাকেন। ভাগ্যিস গোলমালটা ঘটেছিল, নইলে সারা জীবন চুঁড়েও তো এমন সব বস্তুর নাগাল পেতেন না।

শেষটা শহরের ভিতরে, ঐ পিকিন হেটেলেরই কাছাকাছি, মাঠের উপরে প্লেন উঠানামা করছে। উপায় কি—যা হবার হোক, এরোড্রোম অবধি যাওয়া কোন মতে সাহস করা যায় না। অবস্থা ক্রমশ আরও সঙিন হল—আলো আর কলের জল বন্ধ। কষ্ট কী লোকের! জ্বালানি নেই—কুয়োর জল তুলে রান্না-খাওয়া। কেরোসিন যৎসামান্ত মেলে—সন্ধ্যা হতেই চতুর্দিক অন্ধকার। অথচ পাওয়ার-হাউস কিম্বা ওয়াটার-ওয়ার্কসের ত্রিসীমানায় আসেনি তারা তখনো। গোলমাল বুঝে বড়বাবুরা সরে পড়েছেন, দেখাদেখি মেজো-ছোট সকলেই। যন্ত্রপাতিও বিগড়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে ওরা এসে সহজে আবার চালু করতে না পারে।

মুক্তিসৈন্ত তারপর এসে পড়ল ঐ দুই ঘাঁটিতে। সেই সন্ধ্যায় শহরময় আলো জলে উঠল। পরের দিন সকালে কলের মুখে জল। রেডিও বলছে, আলো-জল পেয়ে কুয়োমিনটাঙের সুবিধা হল। কিন্তু তোমরা যে কষ্ট পাচ্ছ —তোমাদের লোক আমরা। ফয়শালা না হতেই আগে-ভাগে তাই আলো-জল দিয়ে দিচ্ছি।

আর কর্তাদের উদ্দেশ্যে বলছে, রাখতে পারবে না পিকিন; হাতিয়ার ফেলে মিটমাট করো এসে। তিনজিন বন্দরটাও দখল করে নিয়েছে, খবর এসে গেল। পিকিন শহর থেকে সমুদ্রে বেরুবার ঐ পথ। কি হে, এখনো আশা রাখো শহর ঠেকাবার? বাইরে বেরুনো বন্ধ—এবারের যে খাঁচার ইঁদুরে মতো মরবে তিল-তিল করে।

আর ভরসা নেই—কুয়োমিনটাং-সেনাপতি অতএব আত্মসমর্পণ করল। যতই হোক, শাসনকর্মটা বোঝে কুয়োমিনটাং—এরা কতকাল ধরে খালি লড়াই করে এসেছে, দুঃখকষ্ট সয়ে নিজেদের কথা প্রচার করে বেড়িয়েছে মানুষজনের মধ্যে। ঠিক হল, আপাতত এক মাস চলবে কুয়োমিনটাং ও কমিউনিস্টদের এজমালি শাসন-ব্যবস্থা। কাজকর্ম রপ্ত করে নিয়ে তার পরে এরা পুরোপুরি ভার নেবে। কিন্তু তার আর দরকার হয় নি। কুয়োমিনটাঙের মানুষগুলোই শেষ অবধি

এদের দলে ফিরে গেল। দেশ-গঠনে আজকে তারা তিলেক পরিমাণ খাটো নয় কারো চেয়ে। শান্তি-শৃঙ্খলায় দিব্যি কাজকর্ম চলে আসছে—শত্রুরা যত জগঝম্পই পেটাক, হাঙ্গামা বা রক্তপাত হয়নি কোনদিন পিকিন শহরের কোথাও।

পকৌড়ি এলো প্লেটে। আর ব্যাসনে-ভাজা আলুর টুকরো। হাতে-গরম—ফুরোচ্ছে, আবার এনে এনে দিচ্ছে। কতদিন পরে স্বদেশি বস্তু জিভে পড়ল! এদের খাদ্য খেয়ে মুখ পচে আছে। এনে দিচ্ছে—আর সঙ্গে সঙ্গে প্লেট খালি। পাচকটি জাতে চীনা—কিন্তু ভেজেছে ঠিক আমাদের মেয়ের মতন। পরাঞ্জপে হাতে ধরে শিখিয়েছেন। লোকটা পরিবেশন করছে, এঁটো বাসন সরিয়ে নিচ্ছে—পরনে কিন্তু সাদা পাট-ভাঙা ধবধবে পোশাক, হাতে ঘড়ি।

তেলে-ভাজার সঙ্গে সঙ্গে আবার গল্প জমে উঠল। ঐ আসে—ঐ আসে—সেই আমলের সব গল্প। আসছে মুক্তিসৈন্য—দেরি নেই, এসে পড়ল বলে—এসে গেছে অত্যন্ত কাছাকাছি, পিকিনের দশ-বারো মাইলের ভিতর।

কয়লার ভারি কষ্ট—সোনা হেন দুর্লভ হয়ে উঠেছে; খাবার এক বেলা না হলে পেটে কিল মেরে পড়ে থাকা যায়, কিন্তু হাড় কাঁপানো শীতে আগুন বিহনে প্রাণ টেকে না। কুয়োমিনটাং দুড়দাড় পালাচ্ছে 'চাচা আপন বাঁচা'—এই মহানীতি অনুসরণ করে। যাবার মুখে বজ্জাতি ভোলেনি। জুত পেলেই রেল-লাইন ভাঙছে, খনি ভরাট করে দিয়ে যাচ্ছে কাদামাটি ও আবর্জনায়। খনিগুলো আগে তো সাফসাফাই করো, কয়লা তুলো তারপর; রেললাইন ঠিকঠাক করে তবে কয়লা-চালানের কথা! কয়লার কড়া রেশন—অল্পসল্প যা মজুত আছে, তাতেই চালিয়ে নিতে হবে সকলের।

নানান রকম রটনা—কমিউনিস্টরা এ'করেছে, তা করছে। যাঁরা বলছেন, প্রত্যক্ষদর্শী নন যদিচ, তবু প্রায় সে নিজ চোখে দেখার সামিল। মাসতুত ভাইয়ের সাক্ষাৎ পিসশ্বশুর—তিনি তো আর মিথ্যে বলবার মানুষ নন। এমনি সব চলছে মুখে মুখে।

তা হলেও—লোকে যে খুব বেশি গা করছে, তা নয়। এক সাবান-কারখানা। কারখানার বড়-দরজায় খিল এঁটে দিয়ে ভিতরে অল্পসল্প কাজ চলছে। সৈন্যদের গতিক ভাল করে না বোঝা অবধি মানুষজন পথে বেরুবে না।

দরজা বন্ধ তো দেয়াল টপকে ছুটি সৈন্য কারখানার উঠোনে লাফিয়ে পড়ল। ফটক খুলে দিল তারা। সর্বনাশ করেছে—মার-কাট লাগায় বুঝি বাইরের দলবল জুটিয়ে এনে! এত দূর করল না—লোভ অধিক-কিছু নয়। টব ভরতি কয়লা ছিল উঠানে—দু-জনে ধরাধরি করে কয়লার টব বের করে নিয়ে গেল। যাকগে, যাকগে—কী আর হবে! নতুন জায়গার এই বাঘাশীতে ধর্মাধর্ম জ্ঞান থাকে? তবু যা হোক, কয়লার উপর দিয়ে গেল। খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে কারখানায় লোকে দরজায় হুড়কো তুলে দিল আবার।

সন্ধ্যাবেলা এই ব্যাপার—পরের দিন ভোর না হতে আবার দরজা ঝাঁকাচ্ছে। ফাঁড়া কাটবে এত সহজে? কাল দু-জনে দেখে-শুনে গেছে, পুরো দল এসেছে আজকে। লোকগুলো নিঃশব্দে—মড়ার মতো হয়ে আছে। ঝাঁকানি বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ—দুয়োর ভেঙে ফেলে বুঝি! কার্নিশ বেয়ে উঠে একজনে বাইরে উঁকি দিল; আরে সর্বনাশ—সৈন্যদের প্রভুস্থানীয় একজন দোরগোড়ায়। সাধারণ ফৌজ এসেছিল কাল, তাই চাট্টি কয়লার উপর দিয়ে গেছে। খোদ ফৌজদার মশায়ের শুভাগমনে আজ কারখানার ধুলোবালি অবধি লুঠ হয়ে যাবে। কপালে যাইই থাক, রাস্তার উপর দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না তো বিজয়ী প্রভুকে! দন্তে কিঞ্চিৎ হাসির ছটা বিকিরণ করে আনন্দ-আহ্বান জানাতে হয়, আসতে আজ্ঞা হোক—কি ভাগ্যি আজকে আমাদের!

দরজা খুলে কিন্তু তাজ্জব; কালকের সে দুটিও আছে পিছনে—কয়লার টব পুনশ্চ বহন করে নিয়ে এসেছে। ফৌজদার বললেন, লজ্জার অবধি নেই—নিজে আমি তাই মাপ চাইতে এসেছি। কয়লা ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। বিচার হবে এদের—কি শাস্তি হল, যথাসময়ে আপনারা জানতে পাবেন।

আর ঐ যে বললাম, তিনজিন বন্দর দখলে এসে গেছে—সেই তিনজিনেরই এক ব্যাপার। সৈন্যদের উপর কড়া হুকুম—জিনিসপত্র কিনে সঙ্গে সঙ্গে ন্যায্য দাম দেবে; যে সব বাড়িতে থাকবে, নির্গোলে তার ভাড়া চুকিয়ে দেবে। জনগণের ভাল করতে এসেছি—এইটে যেন সবসময় সকলে বোঝে।

জনকয়েক এক বাড়িতে এসে উঠল। হোটেল ছিল আগে সেখানে। তার পরে যেদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, কম্যাণ্ডার বাড়িওয়ালাকে ডাকলেন, দেখে নিন মশায়, আপনার জিনিসপত্রের সমস্ত ঠিকঠাক আছে কিনা।

ফর্দ হাতে মালিক জিনিসপত্র মিলিয়ে নিচ্ছে। সব ঠিক আছে—একটা মগ শুধু কম পড়ছে। আবার গুনে দেখে, তাই বটে!

যাক গে কতই বা দাম!

কিন্তু শুনবে না কম্যাণ্ডার। সৈন্যদের লাইনবন্দি দাঁর করিয়ে ছাভার-সাক তল্লাসি হচ্ছে। সেই মগ পাওয়া গেল একজনের কাছে। কোন কথা নয়—বন্দুক তুলে দুম করে সোজা তাকে গুলি!

এমনিতরো ব্যাপার। মানুষের মনোহরণ করেছে এমনি গোড়া থেকেই। ভারি চালাক—কি বলেন? সকল দেশের প্রভুগণ এবম্বিধ চালাকি শিখে নিন এই কামনা করি। সৈন্যরা ওখানে উপরওয়ালা নয়—জনসেবক। গটমট মার্চ করে পৌছল ধরুন এক গ্রামে। পৌছেই পোশাক-আশাক খুলে ফেলে দশ জনের একজন। সকালবেলা হয়তো বা দেখছেন; জলকাদার মধ্যে চাষাভূষোর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ধান কাটছে। কিম্বা কোদাল মেরে রাস্তা বাঁধছে মজুরদের সঙ্গে। শখের ব্যাপার নয়—গাঁয়ে যতক্ষণ আছে, করতেই হবে গাঁয়ের কাজকর্ম। এই হল বিধি। গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার—পুনশ্চ ঐ টুপি-পোশাক না পরা অবধি আলাদা করে ধরবার জো নেই।

বৌদ্ধমন্দিরে সেদিন দেখলাম, ভারা বেঁধে মিস্ত্রিরা কাজে লেগেছে। এলাহি ব্যাপার—টাকার শ্রাদ্ধ। কথাটা মনের ভিতর আনাগোনা করছিল, অধ্যাপক মশায়কে জিজ্ঞাসা করে বসলাম, নানান দিকে এত জরুরি কাজ আপনাদের—তার মধ্যে মন্দির-মেরামতের শখ আসছে কিসে?

অধ্যাপক হেসে বললেন, জরুরি এটাও—

বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। কম্যুনিস্ট দেশ—ধর্মের সঙ্গে লড়াই ওদের, মন্দির-মসজিদ-গির্জা ভেঙে ভূমি চৌরস করে ফেলছে, এই তো শুনে আসছি বরাবর।

কুয়োমিনটাংদের তাড়াল বটে কম্যুনিস্টরা একাই, তারপরে ডেকেডুকে সকলকে একত্র করে শাসন-ভার নিল। শাসন-ব্যবস্থার নাম নতুন-গণতন্ত্র। কাগজপত্র মেনে নিচ্ছে না, দেশটা কম্যুনিস্ট। সে যাই হোক—প্রতিপক্ষরূপে ভাল ভাল লড়নেওয়ালারা রয়েছে; কোন দুঃখে তবে নিরীহ নির্বিরোধ ধর্ম-ধ্বজীদের সঙ্গে লড়াই করতে যাবে?

আজ্ঞে হাঁ, ধর্মের সম্বন্ধে মতিগতি ওদের ঐ প্রকার। অধ্যাপক উ'র সঙ্গে বিস্তর ধর্মালোচনা হল—ধর্মের তত্ত্ব নয়, তথ্য। বিংশ শতাব্দীর অর্ধেক পার হয়ে এসেছি—বিজ্ঞানের গুঁতো খেয়ে ধর্ম কি জোরদার আছে এখন? ধুঁকছে। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া শক্তির অপব্যয়। এই এক মোক্ষম নীতি মশায় জেনে রাখুন, ধর্ম ও ধার্মিকদের সোয়াস্তিতে থাকতে দিতে হয়।

ধর্ম নিয়ে পায়তারা কষতে গেলে হরেক সমস্যা অহেতুক মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সত্যিই অনেক কাজ আমাদের এখন—ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কই?

চীনা জাতটা চিরকালই অধিক পরিমাণে ঐহিক। ধর্ম নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি করেনি কখনো। আজকের দিনেও নানান ধর্ম রয়েছে পাশাপাশি। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নামটাই শুধু। কনফুসিয়ানরা গুনতিতে সকলের চেয়ে বেশি। বৌদ্ধও বিস্তর আছেন। আছেন তাউ—সাধুসন্ত উদাসীন সম্প্রদায়। মুসলমানরা সংখ্যায় কম—কিন্তু নিষ্ঠা ওঁদেরই সকলের চেয়ে বেশি; মসজিদে নমাজ পড়েন, নীতিনিয়ম মানেন; তাঁরা সংঘবদ্ধও বটে—এক এক অঞ্চল নিয়ে বসতি। উত্তরপূর্ব দিকে এক-একটা জায়গার লোক আগাগোড়া মুসলমান। কিন্তু নাম শুনে মালুম পাবেন না—খাঁটি চীনা নাম, আরবি-পারসির গন্ধমাত্র নেই। চেহারা এবং পোশাকেও পুরো চীনা। সভাশোভনের সময়টা সাদা টুপি পরেন, এইমাত্র দেখছি। আর নাম করতে হয় রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের—তাঁরাও ধর্ম-কর্ম করে থাকেন। অন্য সবাই—এই আপনি আমি যে পরিমাণ ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাই।

মজা হল একদিন। ভুলে যাব, এইখানে বলে রাখি। ডাক্তার ফরিদিকে জানেন—লক্ষ্ণৌয়ের সেই যে জাঁদরেল ডাক্তার। সম্মেলনে আমার ডানদিকে যিনি বসতেন গো—নীচু গলায় গল্পগুজব হত। একদিন ধরে ফেললাম, আপনি পিকিন-মসজিদে গিয়েছিলেন ডাক্তার সাহেব—

ডাক্তার অবাক হয়ে যান, কে বলল?

আপনি, পাকিস্তানের ওঁরা, নানান দেশের আরও অনেকে, এবং এখানকার মোল্লা-মৌলবিরা একসঙ্গে নমাজ পড়ে এসেছেন। কাগজে ফলাও করে দিয়েছে।

বটে, কোন কাগজে বেরিয়েছে বলুন তো? দেবেন মশায় কাগজখানা আমাকে; যত্ন করে দেশে নিয়ে যাবো। বাড়িতে কেউ মানতে চায় না আমি নমাজ পড়তে পারি—এবং পড়ে থাকি কখনো-সখনো। কাগজ মেলে অবিশ্বাসীদের মুখের উপর ধরব······

চীনা কর্তারা বলেন, যার যেমন খুশি ধর্ম-কর্ম করুকগে; ইচ্ছে না হলে তো করবে না। নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার—স্টেটের কোন মাথাব্যথা নেই এ সম্বন্ধে। ধর্ম এ যুগে কোন জাতকে বাঁচিয়ে রাখবে না—ধর্মোন্মাদনা স্বাভাবিক ভাবেই মারা পড়বে, এই ওরা সার বুঝে নিয়েছে। মুসলমান দু-চার জনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, হাসিখুশিই দেখলাম তাঁদের। মসজিদ গড়বার কথা

সরকারকে জানালে এক কথায় জমি পেয়ে যাই; কোন রকম ঝামেলা নেই। শুধু মুসলমান বলে নয়—চার্চের পাদরিও হাত পেতে কখনো নিরাশ হয়ে ফেরেননি। মন্দির-প্যাগোডা যে আবার ঝকঝকে করে তুলছে—ওসব হল ওদের প্রাচীন পুরুষদের কীর্তি, অতি-বড় গর্বের ধন; সে বস্তু নষ্ট হতে দেবে না দিন পেয়েছে যখন, মন্দিরের উঠোনের টালিখানা অবধি অবিকল সেকালের মতো করে বসাবে।

খাওয়া-দাওয়া চুকল। দেশি পদও ছিল কখানা—পুরি, আলুর দম ইত্যাদি। খেয়েদেয়ে ফের জমিয়ে বসেছি।

শিক্ষার কি অবস্থা এখানে? ছেলেপুলে ইস্কুলে পাঠাতে হবে, আইন আছে নাকি এ রকম?

আইন-টাইন নেই। গোটা দুনিয়া জুড়ে যত মানুষ, তার সিকি ধরুন এ-একটা দেশে। পেটের বাচ্চা কতগুলি অতএব আন্দাজ করে নিন। আইন করে সবসুদ্ধ এনে জোটালে তো হবে না—তার জন্য চাই বাড়ি বইপত্তোর পণ্ডিত-মাস্টার। বাচ্চা পড়াতে পারেন—এমনি পাকা মাস্টারেরই বেশি অকুলান। লেখাপড়াটা আগে ভদ্রলোকের একচেটিয়া ছিল—চাষাভুষো মুটে-মজুর কিংবা মেয়েলোকের জন্য ও বস্তু নয়। ইস্কুলের দায়ঝক্কি কুলানো সাধ্যের বাইরে ছিল সাধারণের। এই সেদিন অবধি শতকরা আশি জনের উপর নাম সই করতে পারত না।

কিন্তু তিন বছরে যা গতিক দাঁড়িয়েছে, শিক্ষা বাবদে আইনে বাঁধাবাঁধি কোনদিন দরকার হবে না। বাপ-মায়েরা ছেলেপুলেদের আপোসে ইস্কুলে দিয়ে দিচ্ছে। কেন দেবে না বলুন! একপয়সা মাইনে লাগে না; বই-খাতা-কমলও দিয়ে দেয় ইস্কুল থেকে। গার্জেন গরিবানা জানিয়ে যদি দরখাস্ত করে, খাওয়ার ব্যবস্থাও মুফতে হয়ে যায়। এর পরে কোন্ আহম্মক তবে ছেলেপুলে ঘরে আটকে রাখবে? এক সংসারে, ধরুন, বিস্তর কাচ্চাবাচ্চা—দিনরাত কুরুক্ষেত্তোর। নিখরচায় ঘরবাড়ি ঠাণ্ডা হবে—অন্তত এই বাবদেও বাপ-মায়েরা টুঁটি ধরে ওগুলোকে ইস্কুলে দিয়ে আসবেন। আরও আছে। অবস্থা আজকে এমন হয়ে উঠেছে, ছেলে-মেয়ে পাঠশালায় না পাঠালে বাপ-মা নিচু হয়ে যান দশ জনের চোখে। দেখ, দেখ, অমুকের ছেলে বাড়ি বসে বসে বখামি করে। যেন বিষম এক সামাজিক পাপ!

শুধু ছেলেপুলে বলি কেন, বুড়োরাও ক্ষেপে গেছে। বই পড়া শিখতে হবে,

হাতের লেখা লিখতে হবে। ইস্কুলের জন্য ঘরবাড়ি মিলল না তো লাগিয়ে দাও বাড়ির রোয়াকের উপর, কি মন্দিরের চাতালে কিংবা গাছতলায়। সকাল-সন্ধ্যা-দুপুরে সময় না হল তো রাত দুপুরে। শহরে গাঁয়ে ঘুরতে ঘুরতে এমনি কত অধ্যবসায় আমাদের চোখে পড়েছে। চীনালিপি রপ্ত করা—সে যে কি কাণ্ড, আপনারা জানেন। ওখানকার ভাষাতাত্ত্বিকেরা আদা-জল খেয়ে লেগেছেন সহজ রাস্তা বের করবার জন্যে। তাঁদের কাজ তাঁরা করতে থাকুন —গাঁয়ে গাঁয়ে ওদিকে দেখতে পাবেন, গাছের ডালে পিচবোর্ড ঝুলিয়ে রেখেছে. তাতে সেই অক্ষরটা—যার মানে হল 'গাছ,' গোরুব পিঠে ঐ রকম 'গোরু' অক্ষরে সেটে দিয়েছে। পুকুরের ধারে সাইনবোর্ড তুলেছে—তাতে লেখা 'পুকুর'-অক্ষর। দেখে দেখেই কত অক্ষর শিখে ফেলছে এমন। আহা, কত সর্বনাশ হয়ে গেছে এই লেখাপড়া না জানার দরুন! খানিকটা হিজিবিজি লেখার নিচে সরল মনে টিপসই দিয়েছে—তারপর টের পেলো ক্ষেতখামার সমস্ত বিক্রি করে দিয়েছে মহাজনকে। মেয়ের ফ্যাক্টরিতে চাকরি হবে—আনন্দে মা দরখাস্তের উপর টিপসই দিল। তারপর জানা গেল, টিপসইর জোরে মেয়েকে নিয়ে তুলেছে পতিতাবাসে।

বারো বছর বয়সে প্রাইমারি পেরিয়ে ছেলেমেয়েরা ঢুকবে জুনিয়ার মিডল ইস্কুলে। তারপরে সিনিয়ার মিডল ইস্কুলে। বই মুখস্থ নয়। খাবে পরবে, আর দেশব্যাপ্ত পরিগঠনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে সর্ব-শক্তিতে—সেই সমস্ত তালিম দেওয়া হয় ঐ তখন থেকেই। বৃত্তির কাজে উৎসাহ দেয় বেশি। বিস্তর কর্মী চাই, যত সব ছেলেমেয়ে ধেয়ে যাও সেই দিকে। আঠারো বছর অবধি এদিককার পড়াশুনোর পর য়্যুনিভার্সিটি। তারপরেও আছে—দুরূহ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণা। এসব অতি-মেধাবীদের জন্য, সংখ্যায় তারা কম। সাধারণ ছেলেমেয়েরা উচ্চ বিদ্যার্জনে প্রাণপাত করবে, এটা ওরা চায় না। উপরদিককার ছাত্রের এদিক-ওদিক খরচপত্র আছে বটে, কিন্তু একটু এলেম দেখাতে পারলেই স্কলারশিপ। ,স্কলারশিপ জুটিয়ে নিয়ে নিজের খরচ-খরচা চালানো শুধু নয়, উপরি দু-চার পয়সা বাড়িতেও পাঠাতে পারো।

তাই বেরুমলের একটা কথা মনে পড়ছে। আমাদের স্বদেশীয় বেরুমল —মারিশন স্ট্রিটের সিল্কের ব্যাপারি। ব্যাপার-বাণিজ্যে সে-কালের মতো জুত নেই, ভদ্রলোক সেই জন্য নতুন গবর্নমেন্টের উপর খাপ্পা। মুখ ফুটে তেমন কিছু না বললেও—দেশোয়ালি মানুষ তো—ভাবে-ভঙ্গিতে মালুম পাই। এক-দিন তোড়ের মুখে উষ্মা ও বেদনা ভরে বলে ফেললেন, আরে মশায়. চিয়াং

কাইশেকের সাধ্যি আছে আর এখানে ঘাঁটি গাড়বার? বিষম চালাক এরা—একেবারে গোড়া ধরে বন্দোবস্ত। যত পড়ুয়া ছেলেমেয়ে দেখতে পান, সবাই নতুন সরকারের নামে পাগল—সবাই নতুন ভাবের ভাবুক। বাচ্চা বয়স থেকে গড়ে-পিটে তুলছে। তোয়াজ কত ছেলেমেয়েদের—ডাইনে-বাঁয়ে স্কলারশিপ ছড়ানো, দয়া করে তুলে নিলেই হল। পড়া শেষ হতে না হতেই কাজ ঢুকিয়ে আছে। এখন তো এই দেখছেন—আর এই সব ছেলেমেয়ে যখন মুরুব্বি হয়ে উঠবে, সেই ভাবী আমলের আন্দাজ নিন দেখি। তাই তো বলি, তামাম দুনিয়া জোটপাট করে চিয়াংকে যদি আবার গদিতে বসিয়ে দেয়, একটা বেলাও সে এখানে টিকতে পারবে না।

চীনের দক্ষিণ ভাগটি সকলের পরে এসে মিশেছে। সে অঞ্চলে যদিই বা দু-পাঁচ জন থাকে, আর কোথাও বেকারের নাম-গন্ধ নেই। বরঞ্চ লোকের জন্যই মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি। দেশ গড়ে তোলবার জন্য হাজার দিকে হাজার রকমের কাজ—পোক্ত লোকের অভাবে রামা-শ্যামাকে দিয়ে চালানো হচ্ছে। কাজ জানা লোক লাখে লাখে এখন দরকার।

(পরাঞ্জপের বাড়ি ছেড়ে মাঝে একটু এখানকার কথা বলে নিই। চীন থেকে সাংস্কৃতিক দল এসেছিলেন। পশ্চিম-বাংলার এক কর্তাব্যক্তি ডেলিগেশনের দলপতিকে শুধালেন, কি আশ্চর্য—এত শিক্ষা ছড়াচ্ছেন, বেকার বাড়ছে না তবু আপনাদের দেশে? আমরা যে মরে গেলাম মশায়—যত উৎপাতের মূল কাজ-না-পাওয়া বেকার ছোকরাগুলো। দলপতি জবাব দিলেন, শিক্ষা আমরা এলোমেলো ছড়াই নে, রীতিমত তার হিসাব আছে। কি রকম শিক্ষায় শিক্ষিত কত জন কারিগর লাগবে, সব কারখানা তার ফিরিস্তি দিয়েছে; জানা আছে, কত ডাক্তার কত মাস্টার কি ধরনের কত কেরানি চাই। আগামী চার-পাঁচ বছর দেশের কোনখানে কোন গুণের কি রকম কর্মী কত সংখ্যায় লাগবে, সমস্ত ছকে ফেলা হয়েছে মোটামুটি। শিক্ষালয়গুলো সেই হিসাবে ছাত্র নেয়। তাই একটা বিষয়ে পাশ করে দশ-বিশ হাজার বেকার বসে রইল, আর একটা বিষয়ে মোটে গুণীলোক পাওয়া যাচ্ছে না—এমনটা হতে পারে না। কথাগুলো ডেলিগেশন-দলপতির স্বমুখ থেকে শুনেছি)

গল্পের পর গল্প। হাতে ঘড়ি-বাঁধা, কিন্তু ফুরসত কোথা ঘড়ি তাকিয়ে দেখবার? অধ্যাপক হঠাৎ এক সময় উঠে দাঁড়ালেন, আর নয়—যাওয়া যাক এবার।

সর্বনাশ; বারোটা বেজে গেছে যে। পরাঞ্জপে সেই রাঁধুনি লোকটাকে কি

বলে দিলেন। রিক্সা এসে পড়ল। আমায় বললেন, আপনার হোটেলে পৌঁছে দেবে। সমস্ত বাতলে দেওয়া আছে, কিছু আপনাকে বলতে হবে না।

যেন চীনা ভাষায় ওস্তাদ ব্যক্তি আমি, মনে করলেই গড়গড় করে পথঘাট বুঝিয়ে দিতে পারব। নমস্কার করে রিক্সায় উঠে বসলাম।

রাত্রির এই কয়েক ঘণ্টা আমার মনের উপর দাগ কেটে রয়েছে। সে কি জ্যোৎস্না—জ্যোৎস্নায় ফিনকি ফুটেছে! আঁকাবাঁকা অতি সঙ্কীর্ণ পথে নিয়ে চলেছে। আমাদের মোটরগাড়ি বড়, নিতান্ত-পক্ষে মেজো, রাস্তাগুলোয় বিচরণ করে। পরাঞ্জপের উদ্যোগ না হলে পিকিনের গলিঘুঁজি অঞ্চল এমনি ভাবে দেখা হত না। জায়গায় জায়গায় এমন সরু যে রিক্সার পাশে একটা মানুষের যাবার পথও থাকে না।

নিষুপ্ত শহর। কদাচিৎ একটা দুটো মানুষ অতিক্রম করে যাচ্ছে আমাকে। তারপরে দেখি, একটা রোয়াক মতো জায়গায় জন পাঁচ সাত ষণ্ডামার্কা মানুষ গুলতানি করছে। রাত দুপুরে কলকাতা শহরেও অমন দেখতে পাবেন। মানুষগুলো হঠাৎ চুপচাপ হয়ে যায়। ধুতি পাঞ্জাবি পরা বিদেশি লোক একা একা রিক্সা চেপে চলেছে, কৌতূহলে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

ছোটবেলা লুকিয়ে চুরিয়ে ডিটেকটিভ বই পড়তাম (সবাই পড়ে আপনারাও পড়তেন কিনা যথাধর্ম বলুন)। যত লোমহর্ষক খুন-ডাকাতি-রাহাজানি—দেখা যায়, চীনে বোম্বেটেরাই করছে। অভিভাবকের চটিজুতা ফটফট করে ওঠে—ডাকাত-বোম্বেটেরা সঙ্গে সঙ্গে অমনি জ্যামিতির তলায়। এবং প্রবল চিৎকার—ত্রিভুজের দুইটি বাহু পরস্পর সমান হইলে···। চটিজুতা অতএব নিঃসংশয় হয়েছেন, ছেলেটা অতিশয় সাচ্চা। ফটফট আওয়াজে খুশি জ্ঞাপন করে চটি ক্রমশ দূরবর্তী হয়ে চললেন দাবার আড্ডায়। জ্যামিতির ঢাকা সরিয়ে বোম্বেটের দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আবার। সে স্মৃতি আজও ঝিকমিক করছে। কি সব সাংঘাতিক গল্প! কি আশ্চর্য বেপরোয়া কল্পনা! নিজে এখন গল্প লিখতে লজ্জায় মরি। সাধ্য আছে অমন গল্প রচনার? কারা পড়ে আমাদের এই সব ঘরব্যাভারি জোলো কাহিনী—কেন পড়ে তা-ও জানি না।

চীনের মানুষ, সেই তখন জেনেছিলাম। যেমন গোঁয়ার, তেমনি নৃশংস। ন্যায়-অন্যায় ধর্মাধর্ম মানে না। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেয়াড়া জায়গা তবে চীন! বইয়ের মধ্যে ছবিও থাকত বোম্বেটের। মাথায় সুদীর্ঘ টিকি—মেয়েদের বিনুনির মতো। কিন্তু চীনা মাটির উপর এই যে এতদিন বিচরণ করছি,

সে চেহারার একটি তো চোখে পড়ল না! মুসড়ে যাচ্ছি—ছোটবেলার সেই সব ছবি একেবারে ভুয়ো? জাত ধরে বদলে গিয়েছে—তা বলে একটা-দুটো নমুনাও কি থাকতে নেই এত বড় দেশের ভিতর?

দু'ধারের প্রাচীন রহস্যময় বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি। কোন এক চোরকুঠুরির দুয়োর খুলে হঠাৎ ধরুন বেরিয়ে এলো—হাতে ছোরা, মাথায় টিকি, আমার সেকালের ডিটেকটিভ বইয়ের এক বোম্বেটে। অপরিচিত দেশে নিশিরাত্রে নিঃসহায় আমি—পকেটে দশ-বিশ লাখ রয়েছে—ছোরাটা সে আমার বুকের উপর এনে ধরল। তারই বা গরজ কি—রিক্সা থামিয়ে সামনে এসে শুধু হাত বাড়ালেই হল। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকব। চেঁচিয়ে সাহায্য চাইব, সে উপায় নেই—কেউ আমার কথা বুঝবে না। কাঁদছি, হয়তো ভাববে চেঁচাচ্ছি স্ফূর্তির চোটে।

কিন্তু কিছুই ঘটল না। গলি ছাড়িয়ে নির্বিঘ্নে বড় রাস্তায় এসে পড়লাম। বোম্বেটেবর্গের গুঁড়োটুকুও আর পড়ে নেই। বড় রাস্তাও প্রায় জনশূন্য। একটা ট্রাম জোরে হাঁকিয়ে ডিপোয় ফিরছে। তাতে চড়ন্দার দু-চার জন।

হোটেলের সামনে নিয়ে এসেছে—নামতে যাবো, ইসারায় নিষেধ করে। ভাল করে ফুটপাথের গায়ে লাগিয়ে তবে নামতে দিল। ভাড়া মিটিয়ে দেবো—রাত দুপুরে বয়ে নিয়ে এসেছে, কিছু বেশিই ধরে দেওয়া যাক—তিন হাজার?

কথায় তো বুঝবে না, তিনটে আঙুল দেখাই। রিক্সাওয়ালা ঘাড় নাড়ে। মানুষটার লোভ কম নয়। তবে—চার? যাকগে, পুরোপুরি পাঁচ হাজারই দেবো না হয়।

পাঁচটা আঙুল দেখিয়েও রাজি করা যায় না, তখন সন্দেহ হল। আমার কথা বুঝতে পারছে না। মনিব্যাগ খুলে পাঁচ হাজারের নোট সামনে মেলে ধরি। কি হে?

রিক্সাওয়ালা তড়াক করে তার সিটে লাফিয়ে বসল। একটু সেলাম ঠুকে সাঁ সাঁ করে চালিয়ে দিল গাড়ি। এক ইয়ুয়ানও নিল না। পিকিন হোটেলের সামনে বড় রাস্তার উপর ভুবনপ্লাবী জ্যোৎস্নার মধ্যে হতভম্ব হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রাইলাম। রাগ করে চলে গেল বোধ হয়—আচ্ছা মানুষ!

সকালবেলা পরাঞ্জপেকে ফোনে ধরলাম। কি কাণ্ড মশায়, ভাড়া না নিয়ে সরে পড়ল।

পরাঞ্জপে বললেন, আমার লোক ভাড়া দিয়ে দিয়েছিল রিক্সাওয়ালাকে

ডেকে আনবার সময়। একবার ভাড়া নিয়েছে, আবার আপনার কাছ থেকে নিতে যাবে কেন?

অজানা এক রিক্সাওয়ালা—পথ থেকে এনেছে। পরাঞ্জপের লোকও কোন দিন পাবে না আর তাকে, বিদেশি মানুষ আমি তো নয়ই। আমার চোখের আড়ালে ভাড়া দিয়েছে কি না দিয়েছে—নিযুপ্তরাত্রে কোন দিকে কেউ নেই—আমি নগদ পাঁচ হাজার মেলে ধরলাম, তা মানুষটা চোখ তুলে তাকাল না একবার। সামান্য সাধারণ লোকগুলোও এমনি যুধিষ্ঠির হয়ে গেছে, আর আপনারা কিনা মুখ সিঁটকে বলছেন—নতুন চীনে ধর্মকর্ম নেই!

(১১)

স্বর্গ-মন্দির (Temple of Heaven) দেখতে গেলাম। মন্দির একটি নয়—বড় ছোট অনেকগুলো। মন্দিরের লাগোয়া বিস্তর কুঠুরি। শহরের দক্ষিণ ধারে হাজার হাজার অতি বৃদ্ধ সাইপ্রেস গাছ—বিপুলায়তন গৃহগুলি তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। ১৪২০ অব্দে তৈরি—বয়স, তবে তো পাঁচশ ছাড়িয়ে গেছে।

একটা হল শস্য প্রার্থনার মন্দির। পৌষের শেষাশেষি ওদের নতুন বর্ষ। বছরের পয়লা দিনে রাজা গিয়ে আকাশের কাছে হাত মেলে যাচ্ঞা করতেন ভরি পরিমাণ ফসল যাতে ফলে। মন্দিরটা তাই আকাশের মতন করে বানানো। ছাতের নিচে নীল রঙের টালি—ঐ যেন হল নীল আকাশ। সেই আকাশ-ছাত দাঁড়িয়ে রয়েছে চৌদিকে ঘোরানো আঠাশটা থামের উপর—অষ্টবিংশতি নক্ষত্র আর কি! ঠিক মাঝখান ড্রাগনমুখো আরো চারটে থাম—চার ঋতু ওরা। (চীনের চার ঋতু—জ্যোতিষিক হিসাবেও তাই বটে!) চার থাম ঘিরে লাল রঙের আরো বারোটা থাম—বারো মাস হল ওগুলো।

সূর্য চন্দ্র বাতাস আর বৃষ্টি—ওঁরা হলেন দুনিয়ার চালক, ফসল দেবার কর্তা। পুজো পেতেন ওঁরাই। ডাইনে বাঁয়ে অগুনতি ঘর। মন্দির ছেড়ে উপরমুখো চলে যান পাথর বাঁধা প্রশস্ত চত্বর ধরে। উপরে উঠছেন। আরও উপরে—উঠেই যাচ্ছেন—সত্যি সত্যি স্বর্গলোকে উঠে চললেন, এমনি মনে হবে।

অনেক ঘর সেদিকেও। রাজারা এদিকটায় ঘুরে ঘুরে পূজার আয়োজন দেখতেন। ভোগরান্নার ঘর। বলির জায়গা—পশুবলি দেওয়া হত স্বর্গের

প্রীতি-কামনায়। পূজোর হরেক জিনিসপত্র—রূপোর প্রদীপ, নানা রকম রূপোর বাসন, হাজার হাজার বছর আগেকার ঢঙে তৈরি। খাবার পাত্র, সুরাপাত্র, মাংস রাখার পাত্র। ফল রাখার ঝুড়ি—সেই কতকাল আগেকার। কত রকমের বাজনা—তারের যন্ত্র, বাঁশি, ঢাক-ঢোল জাতীয় পেটাবার বাজনা। গুণী পাঠক, নানান দেশের রকমারি বাজনা নিয়ে তো নাড়াচাড়া করে থাকেন—পাথরের বাজনা দেখেছেন কখনো? আজ্ঞে হাঁ—একখানা পাথর মাত্র। তার এখানে ওখানে ঘা দিন, মিষ্টি আওয়াজ বেরোবে; সেতারং এসরাজ হার খেয়ে যায়। একটা ঘরে নাচের সরঞ্জাম,—হায় রে, পাঁচশ বছর আগেকার নাচুনে মেয়েগুলো কোথায় ফৌত হয়ে গেছে, তাদের অঙ্গের সাজপোশাক আর পায়ের ঘুঙুর রেখে দিয়েছে কাচের বাক্স বোঝাই করে!

গোল বেদি-ঘর। বেদি হল স্বর্গের প্রতীক—তার সামনে রাজা দাঁড়িয়ে পূজো করবেন। অনেকটা উঁচু গোলাকার জায়গা—তিন থাক পর পর। সকলের উঁচু থাকের উপরে বেদি। বেদির উপর দাঁড়িয়ে কিছু বলুন—আহা, বলুন না, মজা দেখবেন—চতুর্দিক থেকে শত শত কণ্ঠ আপনার সেই কথা ফিরিয়ে বলবে। এমন মজার প্রতিধ্বনি শোনেন নি আর কখনো।

বেশি মজা আর এক জায়গায়। উঠোনের একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আওয়াজ করুন—দূর থেকে একবার প্রতিধ্বনি আসবে। পরের পাথরখানায় গিয়ে করুন দিকি আওয়াজ—প্রতিধ্বনি দু-বার। তার পরের পাথরে—তিন বার। অবওয়াজ করে পরখ করে দেখে তবে এই লিখছি।

গোল পাঁচিল আছে বেশ অনেকখানি জায়গা জুড়ে। তার একটা প্রান্তে গিয়ে পাঁচিলে মুখ করে ফিসফিসিয়ে বলুন তো কিছু—দূর প্রান্তের অপর জন সব কথা শুনতে পাবেন। টেলিফোন করেন যেমন ধারা। কোন আমলের কথা—ধ্বনিবিজ্ঞানের যাবতীয় কচকচানি সেই তখনই মাথায় এসেছিল ওদের। আর মাথায় আসার ব্যাপারই শুধু নয়! বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বিহনে এমন সূক্ষ্ম হিসাবের বস্তু কোন্ কায়দায় গড়ে তুলল—তাজ্জব হতে হয় কিনা বলুন!

উনিশ শতকে একবার বাজ পড়ে মন্দিরের অনেকটা ভেঙে যায়। আগাগোড়া মেরামত হয়েছে ঠিক পুরানো ধাঁচে। জ্ঞানী-গুণীরা ঠাউরে বলেন, আমাদের সাঁচির আদল আছে মন্দিরের কতকগুলো গেটে। তখন তো ভারি দহরম-মহরম আমাদের সঙ্গে—প্রভু বুদ্ধের নীতিধর্মের সঙ্গে আমাদের শিল্পরীতিও চলে গিয়েছিল হিমালয় পার হয়ে। যেতে যেতে এই পিকিনে এসে হাজির হয়েছে। পিকিন ছাড়িয়ে আরও অনেক দূর গিয়েছে, শুনলাম। ওসব

দেশ থেকেও এসেছে আমাদের এখানে। এমনি লেনদেন চলেছে আদিকাল থেকে।

শান্তি-সম্মেলন দোর্দণ্ড বেগে চলেছে। শুধু মাত্র বক্তৃতা নয়—বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে আর যা হচ্ছে, চোখ শুকনো রাখা দায় হয়ে ওঠে অনেক সময়। আমেরিকার প্রতিনিধিরা একটা চারাগাছ দিল কোরিয়ানদের। সমুদ্র-পার হতে বয়ে নিয়ে এসেছে। এই চারা নিয়ে পুঁতো তোমাদের দেশের মাটিতে —প্রসন্ন বায়ু ও সূর্যালোকে গাছ বড় হবে, ছায়া শান্তি ও আনন্দ দান করবে। আরও তারা দিল ফুল, কাপড় আর কম্বল। আমেরিকান সৈন্য বোমা ফেলে মানুষ মারছে, ঘরবাড়ি চুরমার করছে—আর সেই রণজর্জরদের কম্বল বিলোচ্ছে আমেরিকারই মানুষ।

ভারত ও পাকিস্তানের যুক্ত-ঘোষণা পড়া হল একদিন। মারামারি-কাটাকাটি করব না ভাই সকল, নিজেদের মাঝে। সকল বিরোধের আপোসনিষ্পত্তি করব। লড়াই দুনিয়ার কোথাও আর হবে না। বিশেষ করে হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের। আমরা সবে মাত্র স্বাধীনতার ধ্বজা তুলে ধরেছি —আমাদের মধ্যে নৈব নৈব চ। বিস্তর সুহৃদজন উতলা হয়ে চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছেন—চোখ টিপে দিলেই টাকাকড়ি আর অস্ত্রসম্ভার নিয়ে পড়েন,—কিন্তু খবরদার, খপ্পরে পড়েছ কি বিলকুল খতম! কাশ্মীর এবং অন্যান্য গোলমাল জিইয়ে রেখে তৃতীয় পক্ষই সুবিধা করে নেবে। কোন রকমে আস্কারা দেবো না তাদের।

তাই দু-তরফে ভেবেচিন্তে শান্তি-চুক্তির খসড়া হয়েছে। কো-মো-জো ঘোষণা করলেন চুক্তিপত্রে সই হচ্ছে এবারে। ঘর ফেটে যায় এমনি হাততালি। ঘোষণা পাঠ করলেন এক ডেপুটি সেক্রেটারি। গম্ভীর বাজনা। সইয়ের জন্য ডাকা হল প্রধানদের। চলেছেন ভারত-দলের নেতা ডক্টর কিচলু ও পাকিস্তান-দলের নেতা পীর মানকি শরিফ পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে। হল সুদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে। (তালে তালে দীর্ঘক্ষণ ধরে হাত পড়ত। তার শেষ নেই। পাকিস্তানের আতাউর রহমান সাহেব আর আমি বলাবলি করতাম—ছাদ পেটানো। অবিকল সেই আওয়াজ) প্লাটফরমের সামনে অবধি একত্র গিয়ে দু-দিক দিয়ে উপরে উঠলেন। সই হয়ে যাবার পর কিচলু ও পীর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন পরস্পরকে। এ দিকেও কি মাতামাতি আমাদের দু-দলের মধ্যে! পাকিস্তানের মেয়েরা ফুল ছড়াচ্ছেন আমাদের দিকে। আমাদের মেয়েরা ওদিকে। এ তরফ থেকে ও-দলের

গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছে, ও তরফ থেকে এই দলে। ডক্টর কিচলু পীরকে উপহার দিলেন গালার কাজ করা কাশ্মীরি বাক্স আর সিল্কের উপরে 'পিকিনের গ্রীষ্মপ্রাসাদ'-বোনা ছবি। পীর কিচলুর মাথায় পরিয়ে দিলেন জরিদার টুপি (পাঞ্জাব অঞ্চলে ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন ওটা), আর চীনের কারুকর্ম-করা কাঠের বাক্স। এদিকে পাকিস্তানিরা ঝাঁপিয়ে এসে পড়লেন ভারতীয়দের মধ্যে। কোলাকুলি প্রচণ্ড আবেগে। পাকা দাড়িওয়ালা সৈয়দ মুত্তালাবি—পাক পাঞ্জাবের নাম করা কবি, আমাদের সর্দার পৃথ্বী সিং এর সুদীর্ঘ কালের বন্ধু। দেখলাম, দু চোখে জল গড়াচ্ছে বুড়োমানুষটির। দেশ ভাগ হবার সময় এতদূর ধারণায় আসেনি—আজকে নাড়ি ছেঁড়া টান মর্মে মর্মে বুঝছি সকলেই।

(১২)

সম্মেলন চলে সকাল, বিকাল এবং কখনো কখনো রাত্রে! তার উপরে কমিশন আছে। কমিশনের মীটিং সারা হতে এক একদিন দুটো তিনটে বেজে যায়। ব্যাপারটা তাই ভয়ের হয়ে উঠেছে, জুত পেলেই ডুব দিই। আমি আছি সাংস্কৃতিক লেনদেনের কমিশনে। প্রস্তাব তৈরি হচ্ছে ঐ সম্পর্কে—তাই নিয়ে তর্কাতর্কির অবধি নেই। কমিশনের সভাপতি ভারতীয়—আলিগড়ের ডক্টর আবদুস আলিম। মনে পড়ছে না? কি বললেন, আপনাদের সঙ্গে অনেকবার মোলাকাত হয়ে গিয়েছে তো! রাত দুপুরে শীত সাগরের কনকনে হাওয়া দিয়েছে—ঘরে গিয়ে লেপের তলে ঢুকতে পারলে বাঁচি, প্রস্তাবটাও পাশ হয়ে যায়-যায়—হেনকালে কোত্থেকে এক নতুন ক্যাচাং তুললেন ব্রেজিলের ভদ্রলোক। লড়াইবাজ (warmonger) কথাটা খুব চালু—তার দেখাদেখি আমরা ভদ্রলোকের নাম দিয়েছিলাম শান্তিবাজ (peacemonger)।

উৎকর্ণ হোন পাঠক সজ্জন—এই অধম এবারে মঞ্চারোহণ করছেন। দেশ-বিদেশের তা বড় তা বড় লোকের বক্তৃতা শুনলেন—গোটা দুনিয়া দু-আঙুলে চোখের উপর তুলে ধরেন তাঁরা, বলেনও খাসা—বিস্তর জ্ঞানলাভ হয়। আমি সাহিত্যিক ব্যক্তি নিতান্ত সাদামাঠা কথা বলব, শুঁকে শুঁকে নাক ক্ষয়ে ফেললেও পাণ্ডিত্যের গন্ধ পাবেন না তার ভিতর।

জবানটা বাংলায় ছাড়ি, কি বলেন? বেশির ভাগ লোক নিজ নিজ ভাষা

শুনিয়ে দিচ্ছে—আমার কি লজ্জা, আমার ভাষা কম নয় কারো চেয়ে? কর্তাদের জানানো হল যে বাংলায় বলব। তা বেশ তো, আপত্তির কি আছে? তবে বক্তৃতার একটা ইংরেজি তর্জমা দিতে হবে কয়েকটা দিন আগে। তাই থেকে আরও তিনটে ভাষায় তর্জমা হবে—সেই কাজ ওঁরাই করবেন। মূল বাংলার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে আরও চারটে ভাষায় সমান তালে ছাড়া হবে—ইংরেজি, চীনা, রুশ ও স্পানিশ। আপনারা নয়ন ভরে বক্তার হাত মুখ নাড়া দেখুন—আর যে ভাষাটা বোঝেন, তাতেই বক্তৃতা শুনে যান যথাস্থানে হেড-ফোনের প্লাগ ঢুকিয়ে। শুনতে না চান, সে কায়দাও বাতলে দিয়েছি আগে।

কিন্তু বাংলা বলেই মুশকিল হয়েছে। ভাষাটা ওঁদের মধ্যে কেউ জানে না। তাই বাংলা-জানা এক জনকে চাইল বুঝে-সমঝে দেবার জন্যে। নইলে হয়তো দেখবেন, বক্তৃতা চুকিয়ে আমি প্লাটফরম থেকে নেমে গেলাম, স্পানিশওয়ালা ভীমবেগে ছেড়ে যাচ্ছেন তখনো। বাংলানবিশ গিয়ে তালিম দিয়ে দেবেন, মূল-বক্তৃতা ধাপে ধাপে ধাপে কখন কদ্দুর এগুলো। তর্জমাগুলো যথাসম্ভব সেই বেগে ছাড়বে। আমাদের নন্দী গেলেন এই কাজে—ফিরে এসে তাজ্জব বর্ণনা দিলেন। এলাহি কাণ্ড ভাই, দস্তুরমতো অফিস বসিয়েছে, শ'খানেক লোক খাটছে। বক্তৃতাদি চারটে ভাষায় এক সঙ্গে প্রচার করা, সমস্ত লেখার অনুবাদ করে সঙ্গে সঙ্গে কাগজে পাঠানো, নিজেদের সচিত্র বুলেটিন বের করা, পুরো রিপোর্ট বানিয়ে নানান ভাষায় তর্জমা ও টাইপ করে সকলের হাতে হাতে পৌঁছে দেওয়া—সমস্ত সমাধা হয়ে যাচ্ছে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে। মানুষগুলোর নিশ্বাস ফেলার ফুরসত নেই।

বক্তৃতাটি দিই পুরোপুরি? লেখক হওয়ার এই বড় সুবিধে, আপনারা পাল্লার মধ্যে পাচ্ছেন না। না হয় লাইন চারেক পড়ে ছেড়ে দেবেন—অধিক কি করতে পারেন? কিন্তু মুশকিল হয়েছে, অন্যের বক্তৃতা ভেঙে চুরে পরিবেশন করেছি—নিজের বস্তু আস্ত রাখলে তাঁরা যে মাথায় মুগুর ভাঙবেন। কিছু কিছু বাদ দিয়ে ছাড়ছি, তবে শুনুন—

"ভারতের লেখক আমি—এশিয়া ও প্রশান্তসাগরীয় অঞ্চলের সমাগত বন্ধুজনকে সাদর-সম্ভাষণ জানাচ্ছি। সভ্যতার আদি যুগ থেকে ভারতবর্ষ সর্ব মানুষের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে এসেছে। ভারতের সৈন্য কখনো পর-সীমান্ত লঙ্ঘন করে নি—শান্তি, প্রীতি, ও পরম-আশ্বাসের বার্তা দিকে দিকে পরিকীর্ণ করেছেন ভারতীয় ধর্মাত্মা বিদগ্ধমণ্ডলী। অস্ত্র নিয়ে যারা আক্রমণ

করতে এসেছিল, উদার ভারত-সংস্কৃতি গভীর আলিঙ্গনে তাদের অন্তরে গ্রহণ করল। বহু মানবের বিচিত্র সমবায়ে এমনি ভাবে অনেক শতাব্দী ধরে মহিমময় মহা-ভারত পরিগঠিত হয়েছে।

"সেকালের সেই শান্তি-দূতের পদাঙ্ক বেয়ে আমরা আজ সমুদ্র ও পর্বত-পারের পুরানো বন্ধুদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম। বহু দুঃখ ও দুর্যোগ গিয়েছে আমাদের উপর দিয়ে—সেই ঘনান্ধকারে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও অসহায় হয়ে পড়েছিলাম। আজ নূতন প্রভাত। ব্রিটিশের কবলমুক্ত আমরা এক সর্বমুখী অভিনব ভারত রচনায় সঙ্কল্পবদ্ধ। নানা দেশের মানবপ্রেমী নরনারীর এই পবিত্র মহাসঙ্গম থেকে অঞ্জলি ভরে আমরা নূতন আশা ও অনুপ্রেরণা নিয়ে ফিরে যাবো।

"মারণাস্ত্র মানুষ মারে, কিন্তু মন মারতে পারে না। লক্ষ-কোটি মানুষের মন দোলায়িত করি আমরা লেখক-সম্প্রদায়—অসীম আমাদের শক্তি। সাহিত্য আজ মানুষের অতি-কাছাকাছি—বিশিষ্ট কয়েকজনের বিলাসমাত্র নয়। জন-চিত্তে আনন্দ ও জীবনের প্রতি ভালবাসা জাগাবে আমাদের সাহিত্য, তাদের আত্মসচেতন করবে। সাধারণ মানুষ সংসার পেতে শান্তিতে থাকতে চায়। তারা আনন্দ চায়, পৃথিবীর সকল ঐশ্বর্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অংশীভাগী হতে চায়। মুষ্টিমেয় চক্রান্ত করে তাদের কামানের মুখে পাঠিয়ে দেয় নিজেদের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য। সমাজ-শত্রুদের চিনিয়ে দিক নূতন কালের সাহিত্য—তারা একক, শক্তিহীন, সর্বজনঘৃণ্য হয়ে নিশ্চিহ্নে মিলিয়ে যাক। সকল দেশের মানুষ পরস্পর জানাশোনায় প্রীতিপর গোষ্ঠীতে পরিণত হোক...।

"রণজর্জর বসুমতী আকুল আগ্রহে তাকিয়ে আমাদের দিকে। প্রভু বুদ্ধ, গান্ধি ও রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যবাহী আমি ভারতীয় সাহিত্যিক—এশিয়া ও প্রশান্তসাগরীয় জাতিপুঞ্জের সকল লেখকের সঙ্গে সমকণ্ঠে ঘোষণা করছি, আমাদের সুন্দরী শ্যামা ধরিত্রীর রক্তকলঙ্ক বিদূরণ করব—এই আমাদের অমোঘ সংকল্প।"

চার-পাঁচটা মাইক এদিকে-ওদিকে। ডাইনের টেবিলে কাঁচের গ্লাস। ফুলে ফুলে এমন সাজিয়েছে, যেন ফুলবাগানের ভিতর দাঁড়িয়ে। ব্যবস্থা অতি উত্তম। দপদপিয়ে ফ্লাশ-লাইট জ্বলে উঠছে—ছবি তুলছে। কামানের মতন মোভি-ক্যামেরা হাঁ করে গিলতে আসছে এক-একবার। আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেছে; কারা শুনছে, কিংবা শোনার ভান করে ঘুমুচ্ছে—আলোর

জন্তে সামনে তাকিয়ে দেখাবার উপায় নেই। তা ছাড়া দেখাবোই বা কেমনে— মুখের বক্তৃতা নয়, লেখা জিনিস পড়ে যাওয়া। কাজ শুধু মুখের নয়, চোখেরও।

পড়া শেষ করে হাততালির মধ্যে নেমে এলাম। এক মহিলা শেকহ্যাণ্ড করলেন সকলের আগে। তার এপাশে-ওপাশে আরো জন চার-পাঁচ। চোখ ধাঁধিয়ে আছে তখনো, কোন দেশের মানুষ ঠাহর করে দেখিনি। মাঝের রাস্তা দিয়ে ফিরে চলেছি নিজের সিটে। খান তিনেক চেয়ারের ওদিক থেকে অ্যানিসিমভ, দেখি, উঠে এসে হাত বাড়ালেন। এ সমাদরের মানেটা কি? ওজনদার বস্তু নেই, ঐ তো দেখলেন—(সে বুদ্ধি আছে, বিদ্যে ফাঁস হয়ে না পড়ে!)—কোন রকম ধরা-ছোঁওয়া দিইনি। সাহিত্যিকের সামান্য সহজ কথা, তাই তাঁর মনে ধরল?

গভীর প্রীতিতে শেকহ্যাণ্ড করলেন, পাকিস্তানের মুজিবর রহমান। মুজিবর বললেন, বড় ভাল বলেছেন, দাদা—

মুজিবর রহমানের বক্তৃতা হল মাঝে আরো কতকগুলো হয়ে যাবার পর। ইনিও বললেন বাংলায়। ছেয়াশি জন বক্তার মধ্যে বাংলার মোট দু-জন— পাকিস্তানের মুজিবর আর ভারতের এই অধম। ভারি এক মজা হল এই নিয়ে। গল্পটা বলি। এক ভদ্রলোক গুটিগুটি এসে বসলেন আমার পাশের খালিচেয়ারে। মার্কিন মুলুকের মানুষ বলে আন্দাজ হয়। চুপিচুপি শুধালেন, মশায়, আপনি বলেছেন—আর ঐ যে উনি বলছেন, দু-জনের একই ভাষা নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বাংলা।

একই রকম অক্ষর?

এক ভাষা, তা দুই অক্ষর হবে কি করে?

বুক চিতিয়ে দেমাক করি, বাংলার নাম জানো না—কে বটে হে তুমি!— টেগোর যে ভাষায় লিখলেন!

কদ্দুর কি বুঝল, মা-সরস্বতী জানেন। আমতা-আমতা করে বলে, সে তো বটেই! কিন্তু উনি এক দেশের মানুষ আপনি অন্য দেশের, অথচ দুটো দেশের ভাষা এক রকম—

বুঝতে পারলে না, বাংলা আন্তর্জাতিক ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদেশ সেদেশের মানুষ ঐ এক ভাষায় কথা বলে, এক রকম অক্ষর তাদের, যা বলে

ভাবে ঐ ভাষাকে, তার জন্য জান কবুল করে। তোমাদের ইংরেজি মতন আর কি!

খুব হাসতে লাগলাম। হাসতে হাসতে স্তব্ধ হয়ে যাই। বাংলা দেশ দু-টুকরো হয়ে গেছে আজকে। তবু একই ভাষা। বাংলাভাষা বেঁধে রেখেছে আমাদের। রাডক্লিফের খড়গ মাটি কেটে ভাগ করে দিয়েছে, ভাষার উপরে তার কোপ পড়ে নি। সাতসমুদ্র পারের বিদেশি চোখেও এই ঐক্য ধরা পড়ে গেছে।

(১৩)

সম্মেলন শেষ হয়ে এলো। এটা-সেটা উপহারের জিনিস আসছে প্রায়ই। এ-সমিতি পাঠাচ্ছেন, ও-ফ্যাক্টরি পাঠাচ্ছেন। যাবে তো চলে এবার—এই ক-দিন কত আনন্দ দিয়ে গেলে, তারই সামান্য স্মৃতি। কিছুই নয়—দেবার সামর্থ কি আছে আমাদের? দেশে গিয়ে এই সমস্ত দেখো কখনো-সখনো, তখনই মনে পড়ে যাবে আমাদের কথা।

বাঘা শীত পড়েছে। এখন এই—আর শোনা গেল, দিন কতক পরে বরফ জমবে নাকি পিকিনের রাস্তায়। সুইং একদিন আমার গরম পাজামা বদল করে নিয়ে এলো। কেমন হে, কোন চোর-চূড়ামণিরা খাটের উপর এইসব ফেলে দিয়ে গিয়েছিল কিছু নাকি তুমি জানো না—একেবারে ভিজে-বিড়ালটি! কি মিথ্যুক মেয়েটা দেখুন, ধরা পড়েও লজ্জা নেই। হাসে—হাসি ছড়িয়ে যত অপরাধ ধুয়ে দেয়।

আজ ক-দিন দেখতে পাচ্ছি জনকয়েক ফিতে-টিতে নিয়ে হোটেলে ঘোরাঘুরি করছে। কারা ওরা, কি মতলব—জানো নাকি সুইং?

কিছু নয়, ওরা শুধু গায়ের মাপটা নিয়ে চলে যাবে।

ইতিমধ্যে ঠাহর হল, নানান দেশের বহুতর ব্যক্তি উত্তম কাটছাঁটের নতুন নতুন পশমি পোশাকে বাহার করে বেড়াচ্ছেন। মাপের প্রত্যাশীরা ভারতীয়দের কাছেই আমল পাচ্ছেন না। হবে-টবে না বাপু, ভাগো। আমাদের পোশাকের বাবদে এক আধলা আর খরচ করতে দেবো না।

শেষটা প্রায় কাঁদো-কাঁদো অবস্থা তাদের। আর দেরি করিয়ে দেবেন না। পিকিন ছাড়বার দিন হয়ে এলো—এর পরে কবে কি হবে, দরজিরা সরবরাহ দেবেই বা কেমন করে?

বলে দিয়েছি তো আমরা—

কার্তিক একাই সকলের সঙ্গে লড়ে বেড়াচ্ছে। দেখুন দিকি, আমাদেরই মাথা মোটা সর্ব ব্যাপারে! খুশি মনে দিতে যাচ্ছে, অমন না-না করবার হেতুটা কি? লজ্জা লাগে—বেশ তো বিস্তর আপত্তি জানানো হয়েছে, এবার চেপে যান—গোটা দুনিয়ার মধ্যে আমরাই একমাত্র নির্লোভ—সে তো আচ্ছা করে জানান দেওয়া হয়ে গেছে সেই হাত খরচের টাকা ফেরৎ দেবার ব্যাপারে। আবার কেন? মানুষে আদর করে দিলে না নেওয়াটা অভদ্রতা—সেটা কেন বোঝেন না?

সুইং ইঞা-মিঁ মুরুব্বিয়ানা করে বললে, সকলের হয়ে গেল, আপনারা কজন এত ভোগাচ্ছেন কেন বলুন তো?

ভারতীয়দের কেউ মাপ দেবে না—

ভারতীয় বলবেন না—আপনারা এই কটি—

কে দিয়েছে আমাদের দলের? নাম বলো।

মেয়েটা পটাপট অনেকগুলো নাম বলে দিল। বলে, যারা দেয় নি, সেই কয়েকটা নাম বলাই বরঞ্চ সোজা।

তবে আর কি হবে! দরজিকে বললাম, তোমাদের সকলের গায়ের যে পোষাক, তাই আমায় বানিয়ে দাও।

ওরা বলে, এ নিয়ে কি হবে? পরতে পারবে না তো দেশে গিয়ে।

গভীর কণ্ঠে বললাম, সেই ভালো। পরলে তো নষ্ট হয়ে যায়—চিরকাল থাকবে তোমাদের এ পোষাক। বন্ধুজনদের ডেকে ডেকে দেখাবো—চীনে এসে ভালবাসা পেয়েছিলাম, তারই সুমধুর স্মৃতি।

বাসে উঠে বসেছি, বিকালের অধিবেশনে যাচ্ছি—সেই সময়ে কারসাজিটা ধরা পড়ে গেল। কী বজ্জাত! একই চাল সকলের সঙ্গে খেলেছে। সকলকে গিয়ে বলেছে, আর সকলে মাপ দিয়ে দিয়েছে, তাদের ঘরটাই বাকি শুধু। খিল-খিল করে হাসছে এখন মেয়েগুলো। মাপ একবার দিয়ে ফেলেছে, হাহুতাসে ফল কিবা?

বাস দাঁড়িয়ে আছে, এসে পৌছচ্ছে না কেন সকলে? সেক্রেটারি ধরের উপর তদারকির ভার। জন তিনেকের পাত্তা নেই, যাত্রীরা গরম হয়ে উঠছেন, ধরও উদ্বিগ্ন। আপনারা কেউ খবর জানেন ওঁদের?

এক ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্ত হয়ে নেমে পড়লেন। আমি যাচ্ছি, ধরে নিয়ে আসি। তারপরে কৌত ব্যক্তিরা হাজির হলেন, কিন্তু যিনি খুঁজতে গেলেন তিনি ফেরেন না। ক্ষিতীশ চুপিচুপি বলে, আমি বলতে পারি দাদা। সকলের

মাপ নেওয়া হয়েছে শুনে বেজার মুখে নেমে গেলেন। উনিও ঠিক মাপ দিতে বসে গেছেন, দেখুনগে।

সত্যি মিথ্যে বলতে পারি নে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে বাস শেষটা ছেড়ে দিল। তিনি পরে আসবেন অন্য গাড়িতে। সম্মেলনের কাজকর্ম সারা হয়েছে, শেষ অধিবেশন আজ রাত দুপুরে। নিয়ম মাফিক প্রস্তাব-গ্রহণ সেই সময়। বিকেলবেলা এখন বড় কাজ—সবসুদ্ধ একটা গ্রুপ-ফোটো নেওয়া। আরও কিছু টুকিটাকি থাকতে পারে। সেজন্য গা এলিয়ে চলেছি। অন্য দিন হলে—বাপরে বাপ, ঘড়ির কাঁটা ছেলেমেয়েগুলো দাঁড়িয়ে থাকতে দিত এমন হলের বাইরে?

সকলে গুলতানি করছি। পিছনের মাঠে শুনলাম, চেয়ার সাজানো হচ্ছে ছবি তোলার জন্য। পৌনে চার শ' প্রতিনিধি—কর্মী-উদ্যোক্তাদের নিয়ে মোটমাট শ'পাঁচেক। একটা ছবিতে এতগুলো লোক। এবং চেনা যাবে প্রতিটি মানুষকে! বুঝুন। সারা মাঠের চতুষ্পার্শ্বে বৃত্তাকারে চেয়ার সাজাচ্ছে। সকলের চেয়ারে বসা হবে না, সামনে এক সারি মাটিতে বসবেন, চেয়ারের পিছনে আর এক সারি দাঁড়িয়ে থাকবেন। চার-পাঁচটি ক্যামেরায় একসঙ্গে টুকরো টুকরো ছবি নেবে। পরে জুড়ে গেঁথে কি করবে ওরাই জানে। যোগাড়যন্ত্রের শেষ করতে ঘণ্টাখানেক এখনো।

মন ভারি সকলের। সাঁইত্রিশটা দেশের মানুষ বারো-বারোটা দিন এক ঘরে পাশাপাশি বসছি। ফাঁক পেলেই বাইরে এসে খাচ্ছিদাচ্ছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি, ছবি তুলছি। ইংরেজি জানো তো গল্পের ফোয়ারা ছুটিয়ে দেবো—নয়তো ঠারেঠারে প্রীতি জানাবো। হলের মধ্যেও যতক্ষণ জুড়ে অধিবেশন, হলের বাইরের অবসর-সময় হিসাব করলে প্রায় তার কাছাকাছি দাঁড়াবে। অবসর-সময়টা বিনা কাজের ভাববেন না, মানুষে-মানুষে আমরা চেনা-পরিচয় করি। কালা-ধলায় বাছবিচার নেই, তফাত নেই পোশাক-আশাকের পার্থক্যের দরুন। পেঁচার মতন মুখ করে নিজ মহিমায় বিচরণ করবেন, কেউ তা হতে দেবে না। শেষবারের মতো একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করে নাও এই বিকেলবেলাটা। দুপুর রাতের অধিবেশনে হয়ে উঠবে না, আর কাল থেকে তো একেবারেই ইতি।

হিন্দুরাসের মেয়েটার দেখছি আজকে একেবারে সাদামাঠা পোশাক। রোজই রং বদলে বদলে আসত সম্মেলনে। কোনদিন লাল, কোনদিন কালো, কোনদিন বা সবুজ। নজর না পড়ে উপায় ছিল না। খাতায় লেখা আছে তার বর্ণনা—আমার ঠিক সামনের দু-তিন সারি আগে বসত সে। মাথায়

চুলের বোঝা, ঈষৎ সোনালি। চুল বাঁধার ঢং আমাদের দেশের মেয়েদের মতো। ফিতে বাঁধত চুলের উপর, আমাদের ইস্কুলের মেয়েরা যেমন বাঁধে। কানে দুল দুলছে—আমার পাঠিকাকুল দেখলে সেই প্যাটার্ন ঠিক পছন্দ করে বসতেন। চুলে ক্লিপ-আঁটা—ওটা আর এখন পরেন না আপনারা, সেকালে পরতেন। আর বিষম ছটফটে মেয়েটা। সম্মেলনের বিরতি হতে না হতে দেখা যেত পিছনের ঘরে গিয়ে ফল-কেক-স্যাণ্ডউইচ-চা-অরেঞ্জড—হাতের কাছে যা পাচ্ছে, এক নাগাড়ে খেয়ে নিচ্ছে। তারপর এক ছুটে উঠোনে। কিবা রোদ কিবা শীত—পলকের মধ্যে দল জুটিয়ে নিয়ে তর্কাতর্কি হাসাহাসি অথবা ছবি তোলা। আজকেই দেখছি, পরম শান্ত। ভিন্ন দেশের এক সখীর সঙ্গে পপলারের ছায়ায় ধীর পায়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ...ভিয়েতনামের একজন এসে শেকহ্যাণ্ড করলেন। সেই ভোজসভা থেকে চেনাশোনা এঁর সঙ্গে। নামটা মনে নেই, দেখা হলেই মধুর হাসি হাসেন। চতুর্নারায়ণ মালবীয় কদিন আগে ভারতের তরফ থেকে প্রীতি-উপহার দিয়েছিলেন এই স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের। ভালবাসা আরও এঁটেছে সেই থেকে। ...কত জনে এসে খাতা এগিয়ে দিচ্ছেন, নাম-ঠিকানা লিখে দাও! আমার ছোট্ট খাতাখানাও দুনিয়ার নানান মানুষের নামে নামে নামাবলী হয়ে উঠেছে। যাবেন আমাদের দেশে, যাবেন কিন্তু—হাসি-মাখানো কত অনুরোধ! হায় রে, সমুদ্র-পর্বতের ওপারে সেই সব হাসি-আনন্দ আজকে কত দুর্লভ হয়ে গেছে! খাতার পাতা ওলটাতে ওলটাতে নিশ্বাস-ফেলা ছাড়া আর কিছু করবার নেই।

কোন দেশের এক অচেনা শিল্পী হুকুম ঝাড়লেন, দাঁড়াও ওখানে। হোসেন সাহেবের কাণ্ড—দরাজ-ভাবে বলছেন আমার সম্বন্ধে। অতএব দুই ভুবন-মনোরম মূর্তির স্কেচ হতে লাগল। তারপর ছবির নিচে সই করাতে নিয়ে আসেন। শুধু নাম নয়, কোন দেশ কি ঠিকানা—তা-ও। স্কেচ দেখে মানুষ বলে চেনা যাচ্ছে তো! অবাক কাণ্ড—শিল্পী তা হলে এমন কিছু বড় দরের নন!

কার্তিক প্রায় ভুড়িলাফ দিতে দিতে এসে হাত ধরে টানে, দেখে যান—কি ব্যাপার?

রাতে সম্মেলন খতম হবার মুখে ভারি রকম কিছু দেবে।

জানলেন কি করে?

নজর খোলা রাখতে হয়, বুঝলেন? তাই দেখাবো বলেই তো ডাকছি।

হলের সামনে গাড়ি রাখবার জায়গায় দুটো লরি—ছোট্ট ছোট্ট রঙিন ঝুড়িতে বোঝাই। হাসি-ভরা মুখ তুলে কার্তিক বলে, আন্দাজ পাচ্ছেন কিছু? ঝুড়িগুলো আমাদের তরে। তবে কোন কোন বস্তু ভরতি হয়ে আসবে, তার এখন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।

১২ই অক্টোবরের কনকনে রাত্রি। এগারো দিন ধরে সম্মেলন চলল, আজকে শেষ। কত দেশের কত মানুষ এসে জমেছে! প্লেনে এসেছে, ট্রেনে এসেছে, পাহাড়-সমুদ্র পেরিয়ে জঙ্গলের পথে বুনো জানোয়ারের মতন হেঁটে হেঁটেই বা এসেছে কত দল! উৎসব শেষ করে আমাদের সুন্দরী ধরণীকে রক্তকলঙ্ক-মুক্ত করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে কাল থেকে যে যার ঘরে ফিরবার ভাবনা।

খেয়ে-দেয়ে ঘরে ঘরে সবাই তৈরি হয়ে আছি। বড্ড শীত—পশমের পোষাকে আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে দুয়োর-জানালা বন্ধ করেও সামলানো যাচ্ছে না। কাগজ-টাগজ পড়ছি, ফলটা-আঁশটা খাচ্ছি—আর কতক্ষণ রে বাপু? ন'টা বাজল সাড়ে-ন'টা—এখনো খবর নেই।

আরও এক ঘণ্টা পরে সাড়ে-দশটায় বাসে উঠে কাচের দরজা-জানলা উত্তমরূপে এঁটে গায়ে-গায়ে ঠেসাঠেসি হয়ে বসলাম। শীতার্ত শহর ঘরের ভিতর ঢুকে লেপকাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে, পথের নিশ্চল শান্তি বিস্মিত করে লাইনবন্দি আমাদের বাসগুলো ছুটল।

এক বাড়ির খোলা বারাণ্ডায় আলো। ভিতর থেকে তার টেনে এনে অস্থায়ী আলোর ব্যবস্থা হয়েছে—সেই আলোয় বুড়ো-আধবুড়ো জন দশেক মানুষ সাড়া-শব্দ করে পাঠাভ্যাস করছে। দিনমানে সময় পায় না—সামান্য কাজ-কর্ম করে, গভীর রাত্রের হাড়-কাঁপানো হিমে এই হল বিদ্যার্জনের জায়গা। এমনি কায়দার পাঠশালা আরও দেখেছি। য়ুনির্ভাসিটি ও ইস্কুল-কলেজের বাইরে জনসাধারণের উদ্যোগে এই সমস্ত। মানুষ ক্ষেপে উঠেছে লেখাপড়ার জন্যে। নিরক্ষরতার চেয়ে বড় অপমান কেউ সেথায় ভাবতে পারে না।

সাড়ে-এগারোটায় অধিবেশন শুরু, তিনটেয় মোটামুটি শেষ। আবেদন ও প্রস্তাবে মোট এগারোটা। আজব ব্যাপার! নানা মত ও পথের এতগুলো মানুষ—সকলে একমত প্রত্যেকটি প্রস্তাবে। ভাবতে পারা যায়নি, সম্মেলন এত দূর সফল হবে। সমাপ্তি ঘোষণা হল। সঙ্গে সঙ্গে বাজনা বেজে উঠল

গম্ভীর মন্ত্রে। তিনশ'-তিরিশ জন তরুণ শিল্পী রকমারি বাজনা নিয়ে তিন সারিতে এসে উঠলেন প্লাটফরমের উপর। হোপিন ওয়ানশোয়ে, শান্তি দীর্ঘজীবী হোক—কণ্ঠে কণ্ঠে এই ধ্বনি। বাজনারও সেই সুর।

বাজনা থামতে না থামতে হলের সমস্তগুলো দরজা খুলে গেল একসঙ্গে। খিলখিল খিলখিল হাসি। ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল—পাখনা মেলে উড়ে এসে পড়ল পরীদেশের শিশুরা। ফুটফুটে চেহারা, ধবধবে পোশাক—রূপ আর উল্লাস ফেটে চৌচির হয়ে পড়ছে যেন। ঝুড়িভরতি ফুল প্রতিজনের হাতে। চারিদিকে ফুল ছড়াচ্ছে ছুটোছুটি করে। প্লাটফরমের উপর উঠেছে কতকগুলো—সেখানেও ফুলের হোলি। বুকে, মাথায়, গায়ে ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঘায়েল করে দিচ্ছে। কার্তিক বিকালে এই সমস্ত ঝুড়ি দেখিয়েছিল। ঝুড়ি ওদের অস্ত্রের তূণীর।

আমরাও শেষটা ক্ষেপে গেলাম। ওরাই মারবে, আর পড়ে পড়ে মার খাবো! বিদেশ-বিভুঁয়ে আমাদের অস্ত্রসজ্জা নেই—তা যে ফুল ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের টেবিলে, আশপাশে মেজের উপর—তাই কুড়িয়ে কুড়িয়ে মারি ওদের। ওরা যখন ফুরফুর করে আমাদের পার হয়ে যাচ্ছে, ওদেরই ঝুড়িরই ফুল লুঠ করে ছড়িয়ে দিচ্ছি ওদের মাথায় মুখে। নিজ অস্ত্রে নিজেরাই ঘায়েল।

তার পরে আরও সাংঘাতিক আক্রমণ। ধরছি এক-একটিকে--বুকে টেনে নিচ্ছি। দু-হাতে উঁচু করে তুলে দিচ্ছি আমাদের টেবিলের উপর। টেবিলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা হাততালি দিচ্ছে। আর শত শত কণ্ঠের আরাবে বিশাল হল রণিত হচ্ছে—হোপিন ওয়ানশোয়ে! আর ফুলের ছড়াছড়ি; পাহাড়প্রমাণ ফুল জুটিয়েছে—ডালার ফুল, অরে ডালা বয়ে নিয়ে এসেছে দেবলোকের এই যত শতদল-পদ্ম। রাত্রির শেষ প্রহরে এইটুকু-টুকু বাচ্চারা জেগে বসে রয়েছে, মা-বাপেরাও বাচ্চাদের ছেড়ে দিয়েছে কেমন!

অফুরন্ত আনন্দের মেলা। ফুল ছড়ানো শেষ হল তো গান। দুনিয়ার তাবৎ ভাষার যত রকম গান হতে পারে, সব এই একটা ঘরের মধ্যে। আর পেরে উঠছি না গো—চললাম আমরা একটা দল। পুবের আকাশে আলোর আভাস দেখা দিচ্ছে। পালাই।

সভা, সভা, সভা! পাঠশালার পড়ুয়ার মতো সকাল-বিকাল নিয়মিত সভায় গিয়ে বসা চুকল এতদিনে। আমি বাঁচলাম, পাঠকেরাও। প্রশ্রয়-মিশ্রিত

হাসি হাসছেন আপনারা, চোখে না দেখলেও বুঝতে পারি। আহা বলছে ভদ্রলোক— বলতে দাও। শান্তি-সম্মেলন কি প্রকার হয়েছিল, কোন কোন মহাজন কি প্রকার বুকনি ছেড়েছিলেন ; কিংবা ধরুন, মহাচীনের কথা—সে বেরিয়ে গেছে, পড়ে পড়ে আপনারা ঘুণ হয়ে আছেন। নতুন কি শোনাতে পারি তার উপরে ? ঠোঁট নাড়লেই তাবৎ বুঝে ফেলে দেন—জানি তো আপনাদের।

তাক লাগিয়ে দিতে পারি একটা খবরে। সেটা নিশ্চয় জানেন না। ভুবনময় ধুমধাড়াক্কা হল সম্মেলনের সাফল্য নিয়ে—কিন্তু সাঁইত্রিশটা দেশের মানুষ আমরা যে এক পরিবারস্থ হয়ে ছিলাম, এ খবর ঢাকঢোল পিটিয়ে জাহির করেনি কেউ। করবার কথাও নয়—এ হল অন্তরের বস্তু। ভাষা বুঝি না—কেউ বলি হিন্দি-বাংলায়, কেউ স্প্যানিশে, কেউ ফ্রেঞ্চ, কেউ জাপানি, কেউ রুশীয়, কেউ চীনা—এবং ইংরেজী বলি অধিকাংশই। কিন্তু ভাষার তফাৎ আটকাতে পারল না। দোভাষি থাকে ভালো, নয়তো সেই অদ্ভুত উপায়ে—যাতে অন্ধেরা দেখতে পায়, কালারা কানে শোনে—সেই উপায়ে আমদের আলাপসালাপ হত। সাদায় কালোয় তফাৎ আছে, সাদারা পছন্দ করে না কালা আদমিদের, আবার কালোদেরও দারুণ ঘৃণা সাদার উপর—কোন মিথ্যুক রটায় বলুন তো এ সব ? ফরাসি ছিল জার্মান ছিল,—এরা সাদা-জাতির মধ্যে মহানৈকষ্য কুলের মুখোটি। আর কালোর সেরা কালো নিগ্রো বংশাবতংসেরা ছিলেন—যাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে গাত্রবর্ণ বাবদে আমাদেরও আকাশচুম্বী অহংকার এসে যায়। কিন্তু স্বচক্ষে দেখেছি—ঐ মিসকালো মানুষ তিলেক হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে আছে, কুলীন শ্বেত অমনি তার পিঠে থাবা মেরে ভাবনা ভাঙিয়ে দিল। অর্থাৎ, কি হয়েছে ? আড্ডা দিই এসো, গুলতানি করি—

•

কাজের খোঁজই রাখেন আপনারা, কিন্তু যে সময়টা কাজ থাকে না ? পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে ভূগোল কমলালেবুর উদাহরণ দেয় ; আয়তনের পৃথিবী কমলালেবুর চেয়ে খুব বেশি বড় নয়—এমনি কোন আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে এলে মালুম হয় সেই মহাতত্ত্ব। কনফারেন্সের বিরাম-সময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা ইত্যাদি সেবন করছি, কেকটা বড় ভাল লাগল তো গুয়াতেমালার মানুষটি প্রেমভরে আধখানা ভেঙে দিলেন, খাও গো—খেয়ে দেখ। সত্যিই এইরকম ঘটেছে একদিন। খানাঘরের একটা টেবিলে উমাশঙ্কর যোশি আর

আমি পাশাপাশি খাচ্ছি—উমাশঙ্কর নিরামিষাশী, আমি নির্বিচার। বাকি দুটো খালি চেয়ারে বসে পড়লেন—একজন সুইস, অন্যজন অস্ট্রেলীয়।

কি খাচ্ছ? কেমন চিজ ওটা ভাল লাগছে? ওহে বয়, আমাদেরও দাও দিকি ঐ বস্তু।

তার পরে গল্প—গল্প! তোমাদের কুলশীল নাড়িনক্ষত্রের খবর বলো, তাঁদেরও শোনো আদ্যন্ত। আরে ছাই, ডার্লিং-ডাউনস কি ব্রেন্নার—নামগুলোই কি আগে ভাল করে শুনেছি? এখন তারা সত্যি হয়ে ফোটে চোখের সামনে—সেখানকার মানুষ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব বলছে।

ফোটো তোলা হত বিরামের সময়। কারা তুলত জানিনে। নিজে আমি যেতাম না—অনেক সময় টেনেটুনে দাঁড় করাতো দলের মধ্যে। ক্লিক করবার ঠিক আগের মুহূর্তে পাশে এসে দাঁড়াল হয়তো এক রঙিন মেয়ে—কিংবা এক টেকো বুড়ো। কোন দেশের কে জানবার দরকার নেই—মানুষ, এই তো ঢের। পৃথিবীর উপর গণ্ডি কেটে এদেশ-ওদেশ করছে—এ সব ভেদের কথা ভুলে বসেছিলাম নিখিল মানবজাতির মহামিলনের মাঝখানে।

তাই ভাবি, এত যেখানে স্বতোৎসারিত প্রীতি—মানুষ কেমন করে বন্দুক-বোমা তাক করে অপর মানুষের দিকে? এমন সহজ-সারল্য মানুষের মধ্যে—তাদেরও হিংস্র জানোয়ার বানিয়ে তোলা হয়, সভ্য সমাজ ক্ষমতা ধরেন বটে! সম্মেলনটা বড় বস্তু সন্দেহ নেই—আমার কিন্তু এই লিখতে লিখতে আনন্দময় অবকাশগুলো মনের উপরে বেশি ঝিকমিক করছে।

সমস্ত ইতি করে যাওয়ার সময় এলো এবারে!

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। টানা ঘুম দেবো এখন দশটা অবধি। তারপর স্নান ও সেবাদি অন্তে পুনশ্চ ঘুম। চারটেয় উঠে—অতঃ কিম্—তত্বতালাশি করে দেখা যাবে।

তাই হতে দিল আর কি! ওদের ক্লান্তি নেই—আয়েশ বস্তুটি একেবারে ভুলে বসে আছে। আজকেও ঠাসা প্রোগ্রাম। দশটা নাগাত চোখ মেলে দেখি, হৈ-হৈ ব্যাপার। কাগজে কাগজে ফলাও করে খবর বেরিয়েছে সম্মেলনের সাফল্যের কথা।

সাড়ে-দশটায় ডেলিগেটদের সভা। কবে ফিরে যাওয়া হবে, কে কোন পথে যাবেন, যে সব প্রস্তাব নেওয়া হল দেশে গিয়ে তৎসম্বন্ধে কি করা হবে ইত্যাদি। বেলা দেড়টায় বিরাট সভা নিষিদ্ধ-শহরের প্রাসাদ-চত্বরে। এতদিন

হলের মধ্যে সকলে মিলে সভা করছে—পিকিনের অগণ্য নরনারী উৎসুক হয়ে আছে—কি করে এলে বাপু আমাদের খানিকটা শুনিয়ে যাও।

জনারণ্য। সেকালে রাজ-দরবার বসত পাথরে-বাঁধা এই উঠোনে। একতলার সমান উঁচু প্রশস্ত জায়গা সামনের দিকে—ওরই উপর রাজা ও হোমরাচোমরা বসতেন। একেবারে তৈরি জিনিস—বড় বড় সভা ডাকতে ওদের কোন ঝামেলা পোহাতে হয় না।

দু-পাশে মানুষের সমুদ্র—মাঝখান দিয়ে পথ করে দিয়েছে। চলেছি আমরা দলে দলে। শেকহ্যাণ্ড করবার জন্ত পাগল—করছিও। কিন্তু সব জিনিসের সীমা আছে। ইস্পাতের তৈরি হাত নিয়ে আসি নি, এটা রক্তমাংসের। হাতের পাতা এক সময় গরম হয়ে ওঠে, অসহ্য মনে হয়। ঠিক মাঝখান দিয়ে চলি তখন আমরা। দু-দিক দিয়ে তারা বাহু বাড়িয়ে দিচ্ছে, যতদূর লম্বা করতে পারে। নাগাল পাচ্ছে না—একটু—আর একটু—হয়তো বা দেড় ইঞ্চি দু-ইঞ্চি—আর আমরা চলেছি দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যেমন ভানুমতীর খেলা দেখায়। তিলেক এপাশ-ওপাশ হলে ওদের হাতের কবলে যাবো। শেকহ্যাণ্ডের দরকার নেই—হাত ছুঁতে পারলেই যেন মোক্ষ। আর কি পারও আমরা দেখুন—উভয় দিকে কড়া নজর রেখে সন্তর্পণে স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে চলছি। এইটুকু নিশ্চিন্ত যে লাইন ভাঙবে না মরে গেলেও।

স্বর্গধামে সেকালের রাজা-মহারাজাদের পুণ্য পাদপীঠে তো উঠে পড়লাম। নিচের বিপুল সমাবেশের দিকে নজর হেনে দেখি, কালো কালো নরমুণ্ডে একাকার। সেই কালো জমিনের উপর সাদায় চীনা অক্ষর লিখে দিয়েছে। জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলাম, লেখাটা হল—'হো-পিন' অর্থাৎ শান্তি। ভিড়ের মধ্য দিয়ে আসবার সময় নজর হয়েছিল—সকলেরই খালি মাথা, তার মধ্যে খামোকা কতগুলো মাথার উপর সাদা টুপি। কি হেতু, বলুন তো সবজান্তা কেউ কেউ তখন বলেছিলেন, মুসলমান এঁরা—উৎসব-ব্যাপারে সাদা টুপি পরা মুসলমানের রেওয়াজ। তা যেন হল—কিন্তু এই ভাবে যত্র-তত্র ছড়িয়ে থাকার মানেটা কি? মানে মালুম এল এবার। সাদায় সাদায় লেখা হয়ে দাঁড়িয়েছে—উপর থেকে আমরা সেই লেখা পড়ছি।

ফুল আর শান্তির কবুতর—জাতীয় উৎসবের দিন সেই যেমন দেখেছিলাম। পারাবতও দুই রকম—জীবন্ত আর ছবিতে আঁকা। জীবন্ত পায়রা মওকা বুঝে জনতার হাত থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে উড়ল, ঘুরতে লাগল আমাদের মাথার উপর, তারপর আকাশের দূর প্রান্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। শান্তির

তাৎপর্য বোঝালেন বক্তারা। তার পরে উপহার—সকল দেশের অতিথিরা নানান রকম উপহার দিচ্ছেন নতুন-চীনকে। কো মো-জো আর মাদাম সান ইয়াৎ-সেন হাত পেতে পেতে নিচ্ছেন। উপহার স্তূপাকার হয়ে উঠল! আমার লেখা বই নিয়ে গিয়েছিলাম পিকিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য—প্রাচীন মহানগরের উদ্বেলিত জনতার সামনে দাঁড়িয়ে সনত শ্রদ্ধায় উপহার দিলাম। তারপরে গান—আবেশমত্ত কণ্ঠে আমাদের ক্ষিতীশ গান ধরল।

এই কাণ্ড সন্ধ্যা অবধি। হোটেলে গিয়ে হাত-পা ধোওয়ার সময় দেয় না—পিকিনের মেয়র পেং চেন ভোজে ডেকেছেন। সাতটায় সেখানে। আর পারি না রে বাপু। রক্ষে করো, সমাদরের বেগটা থামাও একটু—দম বন্ধ হয়ে আসে!

খাওয়াটা সান ইয়াৎ-সেন পার্কে। পার্ক মানে শুধু মাত্র মাঠ বিবেচনা করবেন না। নিষিদ্ধ-শহরের ভিতরে এক এলাহী জায়গা। তিয়েন-আন-মেন পেরিয়েই ঠিক সামনে। হাজার বছর আগে মন্দির ছিল এখানে। প্রাচীন সাইপ্রেস গাছ অজস্র। আর আছে ফুল—ফুলে ফুলে রঙের বাহার। আছে বেণুকুঞ্জ ছোট-বড় টিলার উপরে। খাল আর পুকুর—খালের উপর পাথরের পুল, কাঠ পুল। চিড়িয়াখানার মতন একদিকে—বানর, ময়ুর, নানা রকমের পাখি আছে। প্রশস্ত হলওয়ালা পুরানো ঘরবাড়ি—দেয়ালে দেয়ালে বহু বিচিত্র ছবি। জায়গাটা নতুন রকমের সাজিয়ে-গুছিয়ে ১৯৩৮ অব্দে জাতির জনকের নাম জুড়ে দেওয়া হয়। বিকালবেলা দেখতে পারেন, মানুষ দলে দলে এই মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে, চিড়িয়াখানা-মিউজিয়াম দেখছে, খেলাধুলা করছে।

পৌঁছবো আমরা হলগুলোর ভিতর—মেয়র মশায় যেখানে টেবিল সাজিয়ে ভোজের আয়োজন করে রেখেছেন। পৌঁছনো কিন্তু চাট্টিখানি কথা নয়। এর চেয়ে সেই যে মহাপ্রাচীরে উঠেছিলাম—সে অভিযান অনেক হাল্কা ছিল। যত কলেজের ছেলে-মেয়ে ভিড় করেছে। কান-ফাটানো হাততালি। আর সেই দরকার—শেকহ্যাণ্ড, অন্ততপক্ষে হাতের ছোঁয়া একটুখানি। রক্ষা এই অতি-বড় নিয়মনিষ্ঠায় এদের পেয়ে বসেছে। পথের দু-ধারে অফুরন্ত সংখ্যায় গাদাগাদি হয়ে দাঁড়িয়েছে—কিন্তু সেই যে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে, লোভ যত প্রচণ্ডই হোক, পা সেখান থেকে এক ইঞ্চি এগুবে না। অথচ খড়ি দিয়ে লাইন দেগে দেয়নি কেউ; এইও হাঁক দিয়ে সপাং-সপাং বেতের আওয়াজও ছাড়ছে না

কোন মাস্টার। শাসনের মানুষ কোন দিকে কাউকে দেখতে পাইনে। রেল-স্টেশনেও ঠিক এই ব্যাপার দেখেছি। দলে দলে স্টেশনে যেতে সমাদর করে নিয়ে আসতে, অথবা বিদায় দিতে। কিন্তু গাড়ির গায়ে গিয়ে কেউ দাঁড়াবে না, হাতখানেক দূরে সারবন্দি হয়ে সব থাকবে। মাথায় হাতুড়ি পিটলেও সেই জায়গা ছেড়ে কেউ নড়বে না, যেন খুঁটো পুঁতে শক্ত করে পা বাঁধা।

খাওয়া আর কি হল্লোড়! ভদ্রলোকে মুখ এবং হস্ত দিয়ে ভোজ খায়—এদের ভোজ খাওয়া সর্বাঙ্গ দিয়ে। ডায়েরিতে দেখছি, ভোজের সম্বন্ধে লেখা রয়েছে—'উঃ বিষম পচা মাছ আজকের টেবিলে?' এই নাকি ভারি এক উপাদেয় তরকারি! পরম তৃপ্তিতে সকলে পচা গজাল মাছ সাবাড় করছে। খাওয়া কতটুকুই বা—নাচ-গানই প্রবল। নটরাজের প্রলয় নাচন কোথায় লাগে! আমার তাগত নেই এ হেন বীরোচিত আহারের—প্রায় নিরম্বু উপোস সে রাত্রে।

খাওয়ার পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যত রাত হোক আর যত ক্লান্তি লাগুক, যেতেই হবে। মি ল্যান-ফাং সেই কথা দিয়েছেলেন—তিনি নামছেন 'কুই-ফির সান্ত্বনা' নাটকে। ফাউ হিসাবে আছে নাম-করা কতক-ক্লাসিকাল নাচ গান। আর দেশ বিদেশ থেকে যাঁরা এসেছেন—তাঁদেরও অনেকে নিজ নিজ লোক-সঙ্গীত গাইবেন।

চললাম অপেরায়। ঘুমে চোখ ভেঙ্গে আসছে, তা হোক—হেন শুভযোগ ছাড়তে পারিনে কিছুতে। নাট্যশালার জনক আমাদেরই খাতিরে স্টেজে নামছেন,—চীনে এসে তাঁর অভিনয় না দেখলে ছি-ছি করবেন যে আপনারা!

আরও মজা। যুবতী নায়িকা সাজবেন তিনি পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো-মানুষ—বিশ-বাইশের সুন্দরী সেজে দাঁড়াবেন। বুঝুন। অপেরা শুধু নয়, ম্যাজিকও দেখে নিচ্ছেন এক পালার ভিতর।

'নাচ-গানের সন্ধ্যা'—খাসা নাম দিয়েছে আজকের অনুষ্ঠানের। সন্ধ্যা অবশ্য নয়—সে পার হয়ে গেছে ঘণ্টা চারেক আগে। বাজনা, নাচ-গান আর আলোর বাহার চলল একের পর এক। রকমারি লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, বাচ্চাদের নাচ-গান, শত শত বৎসর ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে মুক্তি -সংগ্রাম চলেছে তারই নানা আলেখ্য। ভাল হচ্ছে, খুব তারিপ পাচ্ছে শ্রোতাদের।

আমি অধীর ভাবে প্রোগ্রাম ওলটাচ্ছি, মূল-পালা আসবে কখন? কুই-ফির সান্ত্বনা?

এ পালা আজকের বাঁধা নতুন কিছু নয়—পুরো শতাব্দী ধরে ক্ল্যাসিক্যাল নাটক দর্শকদের মাতিয়ে আসছে। এর আগে বলেছি, আবার শুনলেও দোষ নেই। চীন প্রবাদের নাম-করা রূপসী হলেন কুই-ফি। ঐতিহাসিক চরিত্র বটে—আমাদের যেমন পদ্মিনী কি নূরজাহান। সম্রাট তাং মিং-য়ুয়াঙের উপপত্নী। সেকালের দর্শক মুগ্ধ হয়ে দেখত রূপবতীর বিলোল-লাস্য—দেখে স্ফূর্তিতে ডগমগ হয়ে ঘরে ফিরত। এখানকার দর্শক ঐ একই পালা দেখতে দেখতে চোখের জল মোছে। অথচ পালার কথাবার্তা প্রায় কিছুই রদবদল হয়নি। আরও তাজ্জব, কুই-ফির পার্ট চল্লিশ বছর ধরে একই মানুষ করে আসছেন—মি ল্যান-ফ্যাং। অভিনয়ের ধারা পালটেছে, মানুষেরও রুচি বদলে গেছে।

কিন্তু এ কি, আজ যে ভিন্ন লোক! প্রথম সারিতে আমরা বসেছি, কুই-ফি স্টেজে এলে তীক্ষ্ণ চোখে বারম্বার তাকাই। না, এ মেয়ে কক্ষনো মি নন। একসঙ্গে গল্প-গুজব করেছি, খেয়েছি পাশাপাশি বসে—ঠকালেন শেষ পর্যন্ত? দোভাষিকে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করি, কি হে—অসুখ-বিসুখ করল নাকি তাঁর?

দোভাষি অবাক করে দেয়, ঐ তো মি। হ্যাঁ তিনিই—

বলছে যখন, কি আর করি—কিন্তু সংশয় রয়ে গেল। বিলকুল এমন ভোল বদলানো যায় মেক-আপের গুণে? পিকিন ছাড়বার দিন মি ল্যান-ফ্যাং তাঁর লেখা একটা বই দিলেন আমায়। চীনা বই—আমি তার কি বুঝব? শেষ দিকে অনেকগুলো ছবি—বিভিন্ন রূপসজ্জায় মি। মেয়ে-পুরুষ, রাজা-ফকির, বুড়ো-যুবা (হামাগুড়ি দেওয়া শিশু কেবল নয়)—নানান চেহারার কোটো। এঁরা যে সবাই একই মানুষ, ছবি দেখে কে বলবে? তার মধ্যে স্টেজে দেখা সেই কুই-ফিরও ছবি পেলাম বটে!

সেকালে পুরুষেরা মেয়ের পার্ট করত। এই হল অপেরার ঐতিহ্য (সেই রীতিক্রমে মি এখনো মেয়ে সাজেন)। আমাদের যাত্রার মতো। সেকালে আসরে অভিনয়ের মেয়ে পাওয়া যেত না বলেই হয়তো! চীন-ভারত দুই পুরানো জাতেরই এক গতিক। এখন দিন পালটেছে। কত চাই মেয়ে? গাদা গাদা মেয়ে নাচ-গান অভিনয় করে বেড়াচ্ছে। কুই-ফি রূপী মি ল্যান-ফ্যাঙের ডাইনে বাঁয়ে চার-পাঁচ গণ্ডা সখী—তারা সকলেই নির্ভেজাল মেয়ে।

জ্যোৎস্না-প্রমত্ত রাত—মনে মনে বড় সাধ, এই রাতে কুসুমমণ্ডপে কুই-ফি রাজার সঙ্গে আনন্দোৎসব করবে, ভোজ খাবে। চলল সে মণ্ডপে। সাদা

মার্বেলের সেতু চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করছে, য়ুয়েন-ইয়াং পাখি সাঁতার দিচ্ছে জলে। রঙিন মাছ দেখছে কুই-ফি সেতুর উপর দাঁড়িয়ে, উড়ন্ত বুনো হাঁস দেখছে। হায়, রাজা এলো না, সে এখন আর এক রানীর অন্দরে। অবসাদে কুই-ফি ভেঙে পড়ছে। সুরার মধ্যে সে সান্ত্বনা খোঁজে। নাচছে—পানোন্মত্তর অবস্থায় টলে পড়ে যায় বুঝি বা! খোজা চাকরকে পাঠাল, কিন্তু সে-ও সাহস করল না রাজার কাছে হাজির হতে। হতাশ কুই-ফি আবার ঘরে ফিরে চলল।

রাত আড়াইটে। বেদনা-বিহ্বল মনে আমরা হোটেলে ফিরছি। নারী ছিল খেলার সামগ্রী বড়লোকের কাছে। দুর্ভাগিনী কুই-ফি! রূপ হল অভিশাপ, বিলাস-কক্ষ বন্দিশালা।

লিফট থেকে ঘর অবধি গিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ব—তা-ও আর পেরে উঠিনে। এত ক্লান্তি লাগছে। সকাল-সকাল উঠতে হবে, কাল ভোরে আমাদের বারো জন চলে যাচ্ছেন। ভারতের নানা অঞ্চলে ঘর, কিন্তু এখানে এসে এক পরিবারের হয়ে গেছি। আবার কবে দেখা হয় না হয়—ঘরবাড়ি ছেড়ে দূর প্রবাসে যেতে হলে মানুষ যেমন করে, ঘরমুখো মানুষগুলো বিকাল থেকে আজ তেমনি মনমরা হয়ে বেড়াচ্ছেন।

(১২)

এরোড্রোম অবধি চললাম—আরও যেটুকু তাঁদের সঙ্গ পাওয়া যায়। আলাদা বাসে ফুলের তোড়া সহ পায়োনিয়ার ছেলেমেয়েরা; ফুলের তোড়া দিয়ে আহ্বান করে এনেছিল, তোড়া হাতে দিয়ে বিদায় দেবে। শেষ রাত থেকে দুর্যোগ চলেছে—ঝোড়ো হাওয়া, ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এরোড্রোমের এ-কামরায় ও-কামরায়। সময় পার হয়ে গেল, তবু প্লেনে উঠবার ডাক পড়ে না। কি ব্যাপার? দেখুন না আর কিছুক্ষণ—খাওয়া-দাওয়া করুন বসে বসে, কিংবা বই-টই পড়ুন।

ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে দিয়ে, যতগুলি হোটেল থেকে গিয়েছিলাম যেটের বাছা ঠিক ততগুলিই ফিরে এলাম। প্লেন উড়বে না—সাংহাই থেকে খবর হয়েছে, আরও খারাপ সেখানকার আবহাওয়া। ফুলের তোড়া যেমন-কে-তেমন পায়োনিয়ারদের হাতে, সিকিখানাও খরচ হয়নি। কেমন, চলে যাচ্ছিলেন বড় অভাজনদের বিভুঁয়ে ফেলে?

ফিরে তো এলাম। নেমে দাঁড়াতেই আবার বলে, উঠুন—। ব্যাকৃট্রিও-

লজিক্যাল মিউজিয়ামে যৎকিঞ্চিৎ নমুনা দেখে আসুন—সভ্য মানুষ আজ কত ক্ষমতা ধরে! বাঘ ভালুক বন্যা-মহামারী নিতান্তই নস্যি। সেই যে মহাপ্রাচীর দেখে ফিরবার সময় ঝর্নার জল খেতে দিল না, দুর্গম পাহাড়ের কোনখানে হয়তো বা বীজাণু-বোমা ফেলে গেছে—সেই থেকে দেখবার ভারি লোভ, কি এমন বস্তু যার নামে গাঁয়ে চাষাভুষো অবধি সন্ত্রস্ত!

খান আষ্টেক ঘর নিয়ে মিউজিয়াম। উত্তর-কোরিয়া এবং চীনের সীমানার মধ্যে যে সব বোমা ফেলেছে, তারই খোলা ও টুকরোটাকরা সাজিয়ে রেখেছে। দোভাষিরা ওত পেতে আছে, মানুষ পেলেই বোঝাতে লেগে যায়। কিন্তু মুখের বাক্য নিষ্প্রয়োজন—প্রতিটি বস্তুর পরিচয় লেখা রয়েছে। বোমা মারতে এসে কতকগুলো প্লেন ঘায়েল হয়েছে, বোমাবাজ সৈন্যও ধরা পড়েছে কিছু কিছু। দেয়ালে সৈন্যদের ছবি টাঙানো—আর তারা নিজ হাতে জবানবন্দি লিখে দিয়েছে, তার ফোটো। মূল দলিল কাচের বাক্সে তালাবন্ধ। টেপ-রেকর্ডে অনেকের মুখের কথাও ধরে রেখেছে, সেই সব বাজিয়ে শোনাল। সবিস্তারে বলছে, কেমন করে মারণ-যজ্ঞে তাদের নামানো হল। অনুশোচনায় ভেঙে পড়ছে, এ তো লড়াই নয়—নিরীহ নিরপরাধ মানুষ নির্বিচারে খুন করা। কেমন করে সংক্রামক রোগের বীজ ছড়িয়ে গ্রামকে-গ্রাম উৎচ্ছন্ন করা হয় সেই কাহিনী খোলাখুলি বলছে তারা।

রাত্রে বলনাচের আয়োজন। বাজনা বাজছে, ডিনারের পর সাজগোজ করে সকলে হলে নেমে যাচ্ছেন। জাতীয় উৎসবের দিন আমি নেচেছি, ওরা দেখতে পাননি। আজকে কিন্তু ওঁরা নাচবেন, আমি মজা করে দেখব।

বেড়ে জমেছে। বর্ণচোরা এতগুলি নৃত্যবিশারদ আমাদের মধ্যে, কে ভাবতে পেরেছে? পলিতকেশ একজন—বিষম কাঠখোট্টা মানুষ, সামনে যেতে বুক দুরদুর করে—দেখি, কচিকাঁচা এক মেয়ের হাত ধরে নাচের ঠমকে গলে গলে পড়ছেন। হলময় এই কাণ্ড! মগ্ন হয়ে দেখছি—হায় রে, শনির দৃষ্টি পড়ে গেছে অধমের দিকেও। বসে আছেন যে বড়! সকলকে নাচতে হবে, বসে বসে দেখবার এবং দেখে দেখে হাসবার একজন কাউকেও থাকতে দেওয়া হবে না।

কাপুরুষ ব্যক্তি আমি, প্রস্তাব মাত্রেই কপালে ঘাম দেখা দিল। শৈশবে কিঞ্চিৎ সঙ্গীতভ্যাস ছিল—ভাল লোকের আসরে নয়, হাটের ফিরতি পথে বাঁশতলার অন্ধকারে ভূতের ভয়ে যখন গা কাঁপত। নাচতে পারি, সে গুণের

কথাও জেনে ফেলেছেন পাঠককুল। কিন্তু সে হল আমার সেই দশ-বছুরে নৃত্যগুরুর চোখের উপর, পথের ভিড়ের মধ্যে—সে জায়গায় সাহস কত! সাজানো আসরে জ্ঞানীগুণীদের মধ্যে অত সব বড় বড় ঝিকমিক মেয়ের সঙ্গে পা উঠবে না, পা দুখানা খর্মখট করে বলবে।

অনেক কষ্টে হাত এড়িয়ে থামের আড়ালে আত্মগোপন করলাম। প্রেমচন্দের ছেলে অমৃত রায়—তাঁর উপরেও হামলা হচ্ছে। কিন্তু নড়াতে পারল না, বেকুব হয়ে শেষটা ফিরে গেল। ভরসা পেয়ে ঐ বীরপুরুষ অমৃত রায়ের টেবিলে গিয়ে বসি। দুটি মেয়ে একটু পরে এসে আমাদের সামনের চেয়ার দুটোয় বসল। থাকো বসে; চেয়ার খালি ছিল, তাই বসেছ—ব্যস! কেউ তাকাচ্ছে না তোমাদের দিকে। আরে মুশকিল, একটি ওর মধ্যে আবার ইংরেজি-জানা—হয়ত বা দোভাষির কাজ করে। বলল, এক পাক নেচে আসুন না আমার এই বান্ধবীর সঙ্গে। ভোজের আসরে বলে না, আমার পাশের লোকের পাতে মিষ্টি দাও—সেই গতিক আর কি! আর অমৃত রায় অমনি ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে ওঠেন, হাঁ-হাঁ—বটেই তো! আমি তাঁর হিল্লেয় এসে বসেছি, অথচ দরিয়ায় ঠেলে দিচ্ছেন তিনি। হাঁ-হাঁ—মোটে নাচেন নি আপনি, যান।

যে-ই না বলা, তড়াক করে উঠে দাঁড়াল অপর মেয়েটা। হাসছে মৃদু মৃদু, হাত বাড়িয়ে দিল। সে হাত ধরলাম না আমি। ইংরেজিনবিশটাকে বললাম, পায়ে ব্যথা আমার—সিঁড়ি থেকে পিছলে পা মচকে গিয়েছে, তোমার বান্ধবীকে বুঝিয়ে দাও—

মেয়েটি কেমনধারা দৃষ্টিতে তাকাল। সে দৃষ্টি এখনো মনে ভাসে। বোধ করি অপমান করা হল তাকে, আমার পক্ষে এক সামাজিক অপরাধ। বসে পড়ল সে চেয়ারে আবার, আসরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে নাচ দেখতে লাগল। টিপি-টিপি আমি সরে পড়লাম—বিপদের ত্রিসীমানায় আর থাকছি নে।

সিঁড়িতে ডক্টর কিচলুর সঙ্গে দেখা। নামছেন তিনি এতক্ষণে। হেসে বললেন, কি হে, ঘুম পেয়ে গেল এর মধ্যে?

আজ্ঞে না, পালিয়ে যাচ্ছি—

(১৩)

যে ক'টা দিন এখন পিকিনে আছি, বাঁধা-ধরা কিছু নেই—এখানে-ওখানে দেখে-শুনে বেড়ানো। একদিন গ্রামে নিয়ে চলো না, হ্যাঁ মশায়!

শহরে কি তোমাদের খাঁটি চেহারা পাচ্ছি ? চলো একদিন গ্রামযাত্রা দেখে আসি।

সেই বন্দোবস্তই হয়েছে। কাল। এক-এক গ্রামে পনের-বিশ জন করে তাতে যতগুলো গ্রাম লাগে। সকালবেলা বেরিয়ে সমস্তটা দিন টহল দিয়ে সন্ধ্যাবেলা বাসায় ফিরব !

তিন বছরে নতুন-চীন অসাধ্যসাধন করেছে। সব চেয়ে তাজ্জব ভূমিসংস্কার। চীনে পা দেওয়ার প্রথম ক্ষণ থেকে প্রত্যক্ষ করছি, সারা দেশ ঘনশ্যাম রং ধরেছে ! ফলাফলটা আরও ফলাও করে বুঝব কাল গ্রামের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে। ইতিমধ্যে ব্যাপারটা মোটামুটি শুনে নেওয়া যাক। এত বড় মাতব্বরকে পাকড়ানো গেছে, তিনি কিছু হদিশ দেবেন। চলুন পীসহোটেলে।

নিচের তলার এক বড় ঘরে ঘিরে বসেছি ভদ্রলোককে।

আমাদের দেশের, ধরুন, আড়াই গুণ জায়গা। চিরকালের নিয়ম ভেঙে এত বড় দেশের ভূমি-বণ্টন কি করে তিনটে বছরের মধ্যে করে ফেলবেন, বলুন দিকি ? কোন্ মন্ত্রে ?

তিন বছরে নয়, ওটা আপনাদের ভুল ধারণা। বরঞ্চ বছর ত্রিশেক বলুন। উনিশ শ' একুশ থেকেই এই নিয়ে ভাবনাচিন্তা হচ্ছে।

জমির ক্ষুধা চাষীমানুষের চিরকালের। নিজের ক্ষেতখামার হবে, আপন জমি চাষ করবে, এ তার সবচেয়ে বড় সাধ। এর জন্য বিস্তর লড়াই করে এসেছে—চীনের ইতিহাসে দু হাজার বছর আগেও তার খবর মেলে।

উনিশ শ' উনপঞ্চাশের অক্টোবর থেকে গোটা চীন জুড়ে নতুন ব্যবস্থার চলন হল। কিন্তু আগেও কোন না কোন এলাকা মুক্তিবাহিনীর দখলে ছিল ! ঘাঁটি বানিয়েই সঙ্গে সঙ্গে এমনি ভূমিসংস্কারের ব্যবস্থা···যাবতীয় পরিকল্পনার সকলের পয়লা নম্বরে হল এটা। হাতে-কলমে করতে গিয়ে অসুবিধা দেখা দিয়েছে অনেক রকম, বিস্তর কাটকুট করতে হয়েছে। গোড়ায় ছোট্ট দাবি, —জমির খাজনা কমানো হোক, সুদ-খরচাও অত দিতে পারব না। দাবি বাড়তে বাড়তে উনিশ শ' ছেচল্লিশে একেবারে মোক্ষম কথা—জোড়াতালিতে হবে না, জমিদারের জমি খাস করে চাষীদের ভিতর বাঁটোয়ারা করে দিতে হবে। লাঙল যার জমি তার। জাপানিরা উৎখাৎ হল ঐ সময়ে ! অনেক জমিদার জাপানিদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, তাদের জমি কেড়েকুড়ে চাষীদের দেওয়া হল। বাঘ রক্তের স্বাদ পেয়ে ক্ষেপে উঠেছে, ঘাসপাতা আর-মুখে

তুলছে না। মাও সে-তুঙের সেই কবে থেকে চাষীদের সঙ্গে মহরম-মহরম—তিনি ঠিক বুঝেছিলেন চীনের শাসনভার পাবে সেই দল, চাষীকে যারা জমি দিতে পারবে। তাই আজ দেখুন সরকারের একটু-কিছু ঘটলে কোটি কোটি চাষী মুঠোয় করে প্রাণ নিয়ে আসবে ঝুম করে ছুঁড়ে দেবার জন্য! পুরানো বনেদি জাত ওরা—নতুন দলের সম্পর্কে বিস্তর ভয়-সন্দেহ ছিল। কিন্তু ঐ একটা কাজ করেই রাতারাতি এরা তাবৎ চাষীর হৃদয় জয় করে ফেলল। চাষী, শ্রমিক আর ছাত্র ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা দলে ভিড়ে গেছে। একটা কথা জেনে রাখুন—ভুবনের তাবৎ ধুরন্ধরেরা জোট পাকিয়ে বোমায় পথ সাফাই করে বেয়নেট ঘিরে চিয়াংকে যদি গদিতে এনে বসান, চীনের মাটিতে তিলার্ধ সে ব্যক্তি তিষ্ঠাতে পারবেন না।

জমির মালিক জমিদার—ঈশ্বর বোধ করি ইজারা দিয়ে দিয়েছেন তাকে। জমি চষবে কিন্তু অন্য লোক। অথবা টাকা পেয়ে জমিদার জমি বন্দোবস্ত করে দিয়েছে অন্যকে; নিয়মিত খাজনা আদায় করে তার কাছে। এক শ' জনের মধ্যে পাঁচজন এরা গুনতিতে—অথচ জমি দখল করে ছিল অর্ধেকেরও বেশি।

চাষী হল চার রকম। জমিদারের নিচেই ধনী-চাষী; আমাদের দেশের জোতদার-তালুকদার আর কি! তার নিচে মধ্যবিত্ত-চাষী—নিজ হাতে চাষবাস করে, কায়ক্লেশে অশন-বসন জোটায়। গরিব-চাষী হল সংখ্যায় সব চেয়ে বেশি, তারা দিনরাত ক্ষেতে খেটেও খেতে পায় না, মজুর-বৃত্তি করতে হয়। ফসলের প্রায় অর্ধেক দিতে হয় খাজনা বাবদে; অসময়ে ফসল ধার করতে হয়, সুদ তার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে। কোন দিন শোধ হবার আশা নেই। বাদবাকিদের আর চাষী বলা কেন—পুরোপুরি মজুর—পরের জমি চাষ করে, নিজের বলতে এক কাঠাও নেই দুনিয়ার উপর।

কৃষক-সমিতি গ্রামে গ্রামে। সমিতির মধ্য দিয়া চাষীরা বল-ভরসা পায় জমিদারের অত্যাচারের কথা মুখে বলবার। একা হলে পারত না। অত্যাচারের দু-একটা শুনতে চান নাকি আপনারা? বেশি শোনালে তো কানে আঙুল দেবেন। শুধু মাত্র টাকা-পয়সার শোষণ নয়—বিস্তর বীরপুরুষ আছেন যাঁরা খুনই করেছেন দশ-বিশটা। মাকড় মারলে ধোকড় হয় তো গরিব মারলে হানি কিসের? শুধু বাইরের মানুষ মারে নি, ঘরের দু-পাঁচটা পত্নী ও উপপত্নী মেরে পূর্বাহ্নে হাত রপ্ত করে নিয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত হামেশাই মেলে। আর এ গৌরব পুরুষমানুষেরই নয় শুধু। মেয়ে জমিদারনীও চাপে

পড়ে মানুষ খুন করার আত্মকীর্তি ফাঁস করেছেন। এক প্রবীণ সৌম্যদর্শন জমিদার দুঃখ জানালেন, প্রজাপাটকের মধ্যে বিয়েথাওয়া হলে নববধূর প্রথম রাত্রিবাস তাঁর সঙ্গে। বরাবর তিনিই এই অধিকার উপভোগ করে এসেছেন। এমন পাওনাটাই যদি রহিত হয়ে গেল, জমিজমা সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র লোভ নেই। চুলোয় যাকগে জমিদারি!

ভূমি-সংস্কার—চিরকালের এক পাকা রীতি চুরমার করে দেওয়া—বড় কঠিন কজে—জমিদারের বিস্তর অর্থ ও প্রতিপত্তি—সহজে ছেড়ে দেবে না তারা। চাষীরাও কিল খেয়ে কিল চুরি করবে যতক্ষণ না সুনিশ্চিত বুঝছে, দেশের শাসনশক্তি পুরোপুরি তাদের দিকে। সমিতিগুলোর মধ্যে চোরাগোপ্তা জমিদারের লোক ঢুকে যাচ্ছে, পরিকল্পনা নিয়ে খুব সতর্ক ভাবে এগুতে হবে অতএব।

এক একটা অঞ্চল নিয়ে পড়ো, তার মধ্যে বিশেষ করে একটা গ্রাম বেছে নাও। শহর থেকে পাকাপোক্ত কর্মীরা এসে গেছে, গ্রামকর্মীরা আছে, আছে সমিতির প্রতিনিধিরা। সরকারি নীতি তারা লোককে বোঝাচ্ছে। বুঝে দেখ ভাই সব, জমিদার প্রজাসাধারণের জমিজমা ছলে বলে আহরণ করেই তো এমন ফেঁপে উঠেছে? মিটিং হচ্ছে, জমিদারের ছল-চাতুরী পাপ-অন্যায় সর্বসমক্ষে মোকাবিলা হবে সেখানে। গণ-আদালতে বিচার হবে বড় বড় অপরাধে অপরাধী যারা। 'হোয়াইট-হেয়ার্ড গার্ল' ছবির শেষটা দেখেছেন তো? সেই ব্যাপার।

দুটো শ্রেণী এমনি ভাবে আলাদা করে ফেলা হল, যাদের স্বার্থ একেবারে উল্টো। আপিল চলবে অবশ্য এই দল ভাগ করার ব্যাপারে। সকল পদ্ধতি পার হয়ে এলে সর্বশেষে পাকা সরকারী মঞ্জুরি। তার পরেও ব্যতিক্রম আছে কিছু কিছু। ধরুন, বুড়ো অশক্ত হয়ে পড়েছে একটা লোক কিংবা বাপ-মা হারিয়েছে এক শিশু। অথবা মুক্তিবাহিনীতে থেকে লড়াই করেছে কেউ। জমিদার শ্রেণীর হলেও এদের সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা হবে, আক্রোশ বসে কিছু করা হবে না।

তারপরে জমিদারি বাজেয়াপ্ত—চাষীর মধ্যে জমির বিলিব্যবস্থা। জমিদারি উৎখাত হল, কিন্তু জমিদারও সমাজের মানুষ—নিয়মমাফিক তারাও জমি পাবে। অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ চাষীর চেয়ে কিছু বেশিই। আর ভাল লোক হলে, তাকে প্লট বেছে নিতে দেওয়া হবে আগেকার দখলি সম্পত্তির ভিতর থেকে। তবে, বাপু, নিজে চাষবাস করতে হবে। স্বহস্তে না পেরে ওঠো

মজুর লাগাও। কিন্তু অন্যকে বিলি করে দিয়ে খাটে বসে পা দোলাবে আর উপস্বত্ব খাবে—সে সত্যযুগ চিরকালের জন্য খতম হয়ে গেল।

চাষীর সব চেয়ে বড় সাধ, নিজের ভুঁই-ক্ষেত হবে, সেখানে ফসল ফলাবে। সাধ পুরেছে এত দিনে। গ্রামে গ্রামে উন্মত্ত উৎসব। পুরানো দলিলপত্র গাদা গাদা বয়ে এনে আগুনে দিচ্ছে। দলিল পুড়ল, আর পুড়ল চাষীর চিরকালের মনোবেদনা।

রবিশঙ্কর মহারাজ বেজায় মেতেছেন। মানুষের ভাল দেখলেই খুশি। কোন্ জাত, কোথায় ঘর—এই সব অবান্তর কচকচি নিয়ে মাথা ঘামান না। একদিন বড় উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, মহাত্মাজী যা সমস্ত চেয়েছিলেন—সে আমি এখানেই দেখতে পাচ্ছি।

আমি বললাম, এই আমাদের চিরদিনের রীতি মহারাজ! গেঁয়ো যোগীদের কলকে দিইনে ভিন্‌দেশে গিয়ে তাঁদের আসর জমাতে হয়। প্রভু বুদ্ধের নাম আমার দেশে ক'টা জায়গায় শুনে থাকেন? এখানে তাঁর কত মঠ-মন্দির! নতুন আমলে এখনও হলদে আলখেল্লা-পরা শ্রমণরা বুদ্ধের নামগানে আকাশ-ভুবন বিমন্দ্রিত করছেন। মহাত্মাজীরও হয়তো বা তাই—স্বদেশের চেয়ে বিদেশ বিভুঁয়ে বেশি খাতির হবে।

দুপুরে মহারাজের দলে ভিড়ে পড়লাম। ছোট্ট দল ওঁদের—উমাশঙ্কর যোশি, যশোবন্ত, প্রাণশঙ্কর শুকলা আর মহারাজ—বড় দলের মধ্যেও দেখছি, এই তিনজন স্বতন্ত্র সদাই। হৈ-চৈ নেই, শান্ত পায়ে ঘুরে ঘুরে দেখেন এটা-ওটা। আজ ওঁরা পিকিনের এক ইস্কুল দেখতে যাচ্ছেন। চলুন, আমিও যাবো।

আট নম্বর মিডল-ইস্কুল। ইস্কুলের নাম এখানে সংখ্যা দিয়ে। তার মানে পড়াশোনার ইতরবিশেষ নেই এ ইস্কুলে ও-ইস্কুলে। ঝকঝকে বাড়ি, অনেকটা জায়গা নিয়ে। হোপিন ওয়ানশোয়ে, শান্তি দীর্ঘজীবী হোক—হাঁকডাক করে পরম আদরে নিয়ে গেল। ধবধবে পোষাক পরা ছেলেরা ঠাণ্ডা হয়ে লেখাপড়া করছে। আমাদের গেঁয়ো পাঠশালায় সেকালে ইনস্পেক্টর এলে এই দেখেছি। আগের দিন সমঝে দেওয়া হত—ধোপানো কাপড় পরে আসবি, টুঁ শব্দ হয়েছে কি পিটিয়ে পিঠের ছাল তুলে নেবো ইনস্পেক্টর চলে যাবার পর। বারোমেসে অনিয়মের মধ্যে একটা দিনের ঐ শৃঙ্খলার উৎপাত। কিন্তু আমরা তো আগে-ভাগে জানান দিয়ে আসিনি—এত ছিমছাম হবার এরা সময় পেলো কখন?

সকলের নিচের ক্লাসে ঢুকলাম ইস্কুলের প্রেসিডেণ্ট মশায়ের সঙ্গে। ভারত কোথায় জানো, এঁরা হলেন সেই ভারতের লোক। তামাম ক্লাস ড্যাবড্যাব করে চেয়ে দেখছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বলো দিকি? মনে রাখবেন, এ হল নেহরুর চীনে যাবার অনেক আগের কথা। তবু নানান দিক থেকে অনেকেই নাম বলে ওঠে। নানান শ্রেণীর মধ্যে জিজ্ঞাসা করে দেখি, নেহরুর নাম জানা অনেকেরই। আর রবীন্দ্রনাথকে জানে—কলেজ-পড়ার মধ্যেই বেশি।

উপর-নিচে এক পাক বেড়িয়ে এলে হলের ভিতর লম্বা টেবিলের দুধারে জাময়ে বসা গেল। আমরা চারজন, মাস্টার মশায়রা আর প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। চা-সেবন এবং তৎসহ মোলাকাত চলছে। যেমন যেমন শুনলাম, টুকে নিয়েছি। এর থেকে শিক্ষার হাল-চাল বুঝে নিন গে আপনারা।

জুনিয়ার সিনিয়ার দুটো বিভাগ। তিন বছর লাগে এক এক বিভাগের পড়া শেষ করতে। সাতাশটা ক্লাশ—ছেলেও সাতাশ শ'র কাছাকাছি। কর্মীরা হলেন মোট পঁচানব্বই—ওর মধ্যে মাস্টার হলেন চুয়ান্ন জন। কেরানি ইত্যাদি তবে হিসাব করে নিন।

প্রেসিডেণ্ট আর ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হলেন আমাদের যেমন হেডমাস্টার ও অ্যাসিস্টাণ্ট হেডমাস্টার। পড়াতে হয়, আবার দেখাশুনাও করতে হয় সকল রকম। আমাদেরই মতই। আবাসিক ইস্কুল—ছেলেদের বোর্ডিং-এ থাকতে হবে; তিন বারের খাওয়া—এক মাসের মোটমাট খাইখরচা ৭৫,০০০ ইয়ুয়ান। ঘরভাড়া ছয় মাসের একসঙ্গে দিতে হয়—১০,০০০ ইয়ুয়ান। মাইনেপত্তোরের ঝামেলা নেই, পাঠ্য বইও মুফতে পাওয়া যায়। এ দায় সরকার ঘাড় পেতে নিয়েছেন। শিক্ষালাভ করতে চায়—সে বাবদে আবার গাঁটের পয়সা খরচ করবে, এ কেমন কথা! গরিব বলে দরখাস্ত ছাড়লে খাইখরচাও মকুব হয়ে যায়, সরকার সেটা দিয়ে দেন স্কলারশিপ হিসাবে।

ইস্কুল আটটা-পাঁচটায়—মাঝে দু-ঘণ্টা, বারোটা থেকে, দুটো, নাওয়া-খাওয়া ফাঁক। তিন ঘণ্টা পড়াতে হয় মাস্টার মশায়দের। বাকিটা অবসর। তা-ও ঠিক নয়—নিয়মিত গবেষণা ও শলাপরামর্শ হয় শিক্ষা-ব্যবস্থার যাতে উন্নতি করা যেতে পারে!

এই ইস্কুলটা চালু করেন কুয়োমিনটাং-কর্তারা। এখন ন'টা ক্লাস, সাড়ে চার শ' ছেলে। এই যে বিশাল বাড়ি দেখছেন, ১৯৫০-এর শেষাশেষি এটা তৈরি—নতুন-চীনের জন্মের ঠিক এক বছর পরে। এ বছরও তিনটে নতুন ক্লাস বেড়েছে। খেলার মাঠের ঐ দেয়ালটাও এ বছরের।

শিক্ষার কায়দাকানুন বদলে যাচ্ছে নতুন কালে। শুধু পাণ্ডিত্য নয়—ছেলেরা যাতে স্বদেশপ্রাণ হয়, সেই শিক্ষা আমাদের। স্বদেশ-প্রেমের সঙ্গে বিশ্বপ্রাণতা শেখানো হয়—মানুষে মানুষে তফাত নেই, এই তত্ত্ব শিখছে শিশু বয়স থেকে। লড়াইয়ের উপর বিষম ঘৃণা—বড় হয়ে এরা পৃথিবীর শান্তি কোন রকমে বিঘ্নিত হতে দেবে না। মাও-ত্সুচিকে বড় ভালবাসে ছেলেরা আপন জন মনে করে।

কেমিস্ট্রির যন্ত্রপাতি ৩৫৪২ দফা, বায়োলজির ৯৩৬ দফা—সবই প্রায় হালের আমদানি। ল্যাবরেটারির উত্তম ব্যবস্থা—ঘুরে দেখেই মালুম পাবেন। লাইব্রেরির বই আঠাশ হাজারের উপর

মাস্টার মশায়দের উপর সরকারের খুব নেকনজর। মাইনে গড়পড়তা ন' লক্ষ ইয়ুয়ান। সব চেয়ে বেশি যিনি পান তিনি দশ লক্ষ! সব চেয়ে কম ছ' লক্ষ। ৫৫০ ক্যাটিশ চাল বা ময়দা মেলে ন-লক্ষ ইয়ুয়ানে! আগেকার দিনে মাস্টারেরা পেতেন ২২০ ক্যাটিসের মতন। জীবনমান অতএব শতকরা পঞ্চাশ ষাটের মতন বেড়েছে। বিষম খুশি সেজন্য তাঁরা, প্রাণ ঢেলে পড়াচ্ছেন। ছাত্র-শিক্ষকে ভারি ভাব। ছেলেদের পড়াশুনোর চাড় খুব বেড়ে গেছে। আগেকার দিনে ইস্কুলের চার দেয়ালের মধ্যে যাবতীয় পড়াশুনো হত। ছেলেদের নিয়ে দেশময় দেদার ঘোরাঘুরি এখন।

ল্যাবরেটারিতে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে সত্যিই তাজ্জব হলাম। এই তো এক ইস্কুল—দশ-বারো-চোদ্দ বয়সের ছেলেরা। সেই বালখিল্যমণ্ডলীর গবেষণার বাহার দেখুন একবার! ভারিক্কি চাল—এটা ঢালছে ওটা মাপছে। তাকিয়ে হেসে পড়ছে আমাদের দিকে, আবার তখনই ঘাড় ফিরিয়ে নিজের কাজে লেগে গেল। তিলেক অপব্যয়ের সময় নেই। লম্বা টেবিলের দুই প্রান্তে দুটো করে মাইক্রোস্কোপ। চোঙায় একবার করে চোখ দিচ্ছে, আর কাগজে আঁকছে যা আসছে চোখের নজরে···

তারপরে ছুটির ঘণ্টা বাজল। ওদের সঙ্গে আমরাও ছুটে এলাম খেলার মাঠে। নানান দলে ভাগ হয়ে খেলছে, খেলাই বা কত রকমের! নাচ হচ্ছে—নাচে-গানে মিলিয়ে আধেক-তাণ্ডব গোছের খেলা। দেবশিশুর মতো একটা ছেলে তার নিজের হাতে আঁকা ছবি দিল আমাকে। আর বুকের ব্যাজ খুলে আমার জামায় পরিয়ে দিল। ছেলেটার নাম নিয়ে এসেছি—চাও-উই-সিয়ান (Cao-wei-Hsian)। আর কিছু জানিনে তার, শুধু এই নামটুকু। চেয়ে দেখি, আর তিন জনকেও অমনি ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছে। ইস্কুলের ব্যাজ—

ছাত্ররাই শুধু পরতে পারে। কি করব বলুন—আপনাদের কাছে এত গণ্যমান্য হয়েও বিদশ-বিভুঁয়ে এক মিডল ইস্কুলের পড়ুয়া হয়ে যেতে হল।

(১৪)

১৬ অক্টোবর। তারিখটার নিচে দাগ দিয়ে রাখবার মতো। গ্রামে যাচ্ছি —খাঁটি চীন যেখানে দেখতে পাবো। সেদিন অবধি দুঃখী সর্বসম্বলহীন— আজকে কত হাসি সেই সব মানুষের মুখে। কোন্ ম্যাজিকে এসব হয়, গাঁয়ে গিয়ে তার যদি কিছু হদিস পাওয়া যায়।

বাসে চড়ে ছুটেছি প্রশস্ত রাজপথের উপর দিয়ে। সঙ্গে মোটরকারও যাচ্ছে—তদ্‌গর্ভে রবিশঙ্কর মহারাজ ইত্যাদি। আমার গাঁয়ের বাড়ি স্টেশন থেকে বিশ মাইল। বাসে যেতে হয়। সেই বাড়ি যাওয়ার স্ফূর্তি হঠাৎ লাগছে মনে। পিকিন কত একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল, খোলামেলার মধ্যে সেটা মালুম পাচ্ছি। শহরে সরে গিয়ে দু ধারে মাঠ এখন। মাঠ আর মাঠ। মাঝে মাঝে ছোটখাট গ্রাম পার হয়ে যাচ্ছি। অলস চোখে চেয়ে বাংলা দেশ বলে দিব্যি ভাবা যেতো, কিন্তু খামোকা এক এক পাহাড় উদয় হয়ে ভাবনা গুঁড়িয়ে দিয়ে যায়।

রাজপথ ছেড়ে ডাইনে বাঁকলাম। এ পথও কিছু নিন্দের নয়—আগের তুলনায় কতকটা সরু। তার পরে মেটে রাস্তায় এসে পড়েছি। একটা নালা মতন জায়গা, উপরে পাথর ফেলা। বাস পাথরের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে কিনা—প্রণিধান করে দেখতে ড্রাইভার নেমে পড়ল। আমরাও নেমেছি।

উঠুন, উঠে পড়ুন, যাবে—

কিন্তু একবার যখন মাটিতে পা ঠেকিয়েছি, কার কত ক্ষমতা আবার ঐ খোপে নিয়ে তুলবে! প্রাণ এমন ফেলনা নয় হে বাপু, নতুন-চীনে যা দেখে যাচ্ছি, দেশের ভাইব্রাদারদের কাছে তাই নিয়ে আসর জমাতে হবে না?

হেঁটে চললাম খুচরো খুচরো দল হয়ে। স্লুইস গেট। খালের জল ক্ষেতের উপরে সরবরাহের ব্যবস্থা; গাঁয়ের জলনিকাশও হয় এই খাল-পথে। বাঁধা-পুলের উপর দাঁড়িয়ে আবর্তিত জলধারা দেখলাম খানিক। মাছ মারছে বুঝি —কিন্তু বেশ খানিকটা দূরে, বদরসিক সঙ্গীরা অত উজান ঠেলতে রাজি নন। মনোবাসনা অতএব ঝেড়ে ফেলতে হল। আঁকা-বাঁকা গ্রাম্য পথ—পরিচ্ছন্নতার ব্যাধি এদ্দুর এই গাঁয়ে এসেও পৌঁছেছে। পাশাপাশি গোটা কয়েক ডোবার

ধার দিয়ে যাচ্ছি। অগভীর স্বচ্ছ জল—তলা অবধি দেখা যায়। তলায় ঝাঁঝি, অজস্র লাল মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে। যে লাল মাছ কাচের বোয়ামে পুরে আপনার বৈঠকখানার শোভা বাড়ান, ওদের খানা-ডোবা ভরতি সেই মাছে।

তারপর পাড়ার মধ্যে এসে পড়লাম। ঘরবাড়ির গা ঘেঁসে চলেছি। দু-তিনটে রাস্তার মোহনা অথবা একটুকু সদর জায়গা হলেই দেখতে পাচ্ছি, ব্লাকবোর্ড টাঙানো, তাতে অজস্র চীনা হরপ লিখে রেখেছে। প্রশ্ন করে অবগত হওয়া গেল, গ্রামের যাবতীয় খবরাখবর। এবং কৃষক সমিতি ও অপরাপর সমিতির নির্দেশনামা। যত্র-তত্র কপোতের ছবি—অতএব পিকিনে যে সম্মেলন সেরে এলাম তার যাবতীয় বার্তা পৌঁছে গেছে; সারা চীনের সকল জায়গায় শান্তির কপোতের বাসা। মানুষের ছবিও বিস্তর লটকানো। হিজিবিজি পরিচয়—পড়তে না পারলেও চেহারা দেখে স্বচ্ছন্দে বলতে পারি, সাধারণ চাষাভুষো কেউ। সকলের নজরের সামনে ঐ সব বদখত মূর্তি টাঙিয়ে দিয়েছ কেন হে?

কৃষক-বীর ওঁরা—

শুনলেন? লাঙল ছাড়া জীবনে যারা হাতিয়ার ধরে নি, তাদের নামে সেজুড় লাগিয়ে দিয়েছে—'বীর'!

আপনি আমি হাসছি বটে, কিন্তু কৃষক-বীরের ভারি ইজ্জত সমাজের মধ্যে, লড়াই-জেতা সেনাপতিও বোধ হয় অত খাতির পান না। কি না, জমিতে উনি দেড়া ফসল ফলিয়েছেন। শুধুমাত্র ছবিতে শোধ নয়—যাও দিন কতক আরামের প্রাসাদে কাটিয়ে এসো। জাতজন্ম আর রইল না! রাজা মহারাজারা শখ করে বানিয়ে অনুপম সজ্জায় সাজিয়েছে—দেখুনগে যান তাদের গদির উপর ঠ্যাঙ তুলে উবু হয়ে বসে দাবা খেলছে মাঠের লাঙল-ঠেলা
তাদের গদির উপর ঠ্যাঙ তুলে উবু হয়ে বসে দাবা খেলছে মাঠের লাঙল-ঠেলা
চাষী, কয়লা-খনির কালি-মাখা শ্রমিক।

গাঁয়ের নামটা কি যেন বললে?

কাওবিতিয়েং—

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি। পিকিন থেকে দোভাষি সঙ্গে এসেছে। ইংরেজি বানানে সে লিখে দিল। গ্রামের মণ্ডল দলের মুখপাত্র হয়ে এগিয়ে এলেন। ভদ্রলোকের নাম সু-চিং। নিতান্তই হাল আমলে ভদ্রলোক এবং মণ্ডল হয়েছেন, দাঁত-উঁচু চুল-খাটো একেবারে গ্রাম্য চেহারা। এক দঙ্গল মেয়ে আর ছেলে পাড়াগাঁয়ের বর এগোবার কায়দায় চলে এসেছে অভ্যর্থনা করতে। ছোট ছোট ঢোলক বাজাচ্ছে মেয়েরা—যে রকম ঢোলক নিয়ে

আমাদের বাচ্চারা খেলা করে। ঢোলকের সঙ্গে করতাল—ঝাঙ্কুসে করতাল, বড় বগিথালার সাইজ। তারা আমরা মিলে দস্তুর মতন এক মিছিল।

নিয়ে বসাল জুনিয়ার মিডল-স্কুলের বাড়িতে। বড় হল—হলের লাগোয়া ঘর। তারপর উঠান। উঠানের ওদিকে আরও তিনটে ঘর পাশাপাশি। ইস্কুল বসেছে ওদিকটায়। আগে দেবস্থান ছিল গোটা বাড়িটাই। পুরানো বাড়ি আগাগোড়া মেরামত হয়েছে, কাচের জানলা বসেছে। মাও-র ছবি সামনের দেওয়ালে। টানা-টেবিলের দুধারে আমরা বসেছি খানাপিনা ও আলাপ-সালাপ হচ্ছে। মহিলা-সামিতির নেত্রী শ্রীমতী জো এসেছেন, তিনিও দরিদ্র চাষী-ঘরের মেয়ে। মেয়েদের এমন সম্ভাবনার কথা কে ভাবতে পেরেছিল ক'টা বছর আগে ?

মণ্ডল মশায় বক্তৃতা পড়ছেন, দোভাষি ইংরেজি করে যাচ্ছে। আমি পাশে বসে টুকছি। জবর এক বই লিখব চীন সম্পর্কে, এটা কেমন চাউর হয়ে গেছে। দোভাষি থেমে থেমে বলছে, তাকিয়ে দেখে ঠিক মতো আমি টুকতে পারছি কিনা।

"৬৫৩ ঘর বসতি এ গ্রামে, মোটমাট ৩০১২ জন মানুষ। আবাদি জমির পরিমাণ ৫০৫৬ মো। ভূমি-সংস্কারের আগে ১২টা জমিদার ছিল—২০৮৮ মো জমি তাদের দখলে। কি অত্যাচার করতো যে জমিদারগুলো। যাবতীয় রাজনীতিক ক্ষমতাও প্যাঁকে-চক্রে তারা দখল করেছিল। এর মধ্যে আটজন ভারি জবরদস্ত—তাদের নাম হয়েছিল আট মুগুর। এক জমিদার—ম্যাং-আউং কত নারীর যে সর্বনাশ করেছে! ভূমি-সংস্কারের অল্প কিছু দিন আগেও এক কৃষক-বধুকে ধরে নিয়ে গেল। কি হল মেয়েটার, আর কোন খোঁজ হয়নি।

নতুন-চীনের জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভূমি-সংস্কার। জমিদারি উৎখাত করে চাষীদের জমি দেওয়া হল। কত কাল থেকে বলুন তো, ভূমির জন্য ক্ষুধাতুর হয়ে আছি আমরা!

গাঁয়ে কৃষক-সমিতি হল, সভ্য প্রায় ছ'শ। কিছু কর্মী এলো বাইরে থেকে। জমিদারের বিরুদ্ধে এরাই সব ব্যবস্থা করল। জমিদার কি অল্পে ছেড়েছে ? নানান রকম কায়দা-কৌশল, দল-ভাঙাভাঙি। জমি, মজুত ফসল, কৃষিযন্ত্র ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করবার পর তবে তারা সায়েস্তা হল। বাইশের মধ্যে বারোটি জমিদার-পরিবার আছে এখনো গাঁয়ে, তারা লোক খারাপ নয়, বেশি শয়তানি-বজ্জাতি করেনি ভূমি-সংস্কারের সময়। তাই দেশের একজন হয়ে

দিব্যি আছে তারা। জন-প্রতি ২·২ মো জমি (৬ মো=১ একর) তবে বাপু গায়ে গতরে খাটতে হবে। স্বহস্তে না পেরে ওঠো, মজুর-কিষাণ খাটাও। কিন্তু পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খাজনা আদায় আর প্রজাপাটকের উপর হুমকি দেওয়া চলবে না। জমিদার ছাড়া ১১ ঘর ধনী-চাষী আছে—তারা জন-প্রতি পেয়েছে ২·৭ মো! ১৭৩ ঘর মধ্যবিত্ত-চাষী—তাদের প্রতি জনের জমি ৩·৩ মো। আর গরিব-চাষী ও ক্ষেত-মজুর হল ৪১০ ঘর—তাদের প্রতি জন জমি পেলো ১·২৫ মো হিসাবে। অত্যাচারী জমিদারের জমির সঙ্গে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল মোট ২৪০ খানা ঘর, ৪টা চাষের পশু, ৩টা বড় গাড়ি আর ১২৫ দফা আসবাবপত্র। সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলি তার কতক পেয়েছে, বাদ-বাকি বিলি করে দেওয়া হয়েছে চাষীদের মধ্যে। এক মেয়ে জমিদার আছে—ওয়া-চাউ। ভূমি সংস্কারের পর নিজেই সে চাষবাস করে। স্ফূর্তিতে আছে, দশ জনের সঙ্গে মিলে-মিশে গেছে একেবারে।

নতুন চেহারা গ্রামের। সেদিন ন্যুব্জদেহ ভূমিদাসেরা নেই। আজ তারা বলিষ্ঠ মানুষ—রাজনীতিক চেতনা হয়েছে তাদের, শিক্ষা পাচ্ছে। চাষবাস সম্পর্কীয় শিক্ষাই প্রধানত। সরকার গেল বছর ৫৯১ লক্ষ মিলিয়ন ইয়ুয়ান চাষীদের ধার দিয়েছে পশু ও যন্ত্রপাতি কিনবার জন্য। উৎপাদন খুব বাড়ছে এই ভাবে। এক জমিতে দুটো তিনটে ফসল ফলাচ্ছে বছরে। ১৯৫০ সালে উৎপন্ন ফসলের মোট পরিমাণ ১৪৪৩ পিকো (১ পিকো=১৩৩ পাউণ্ড); ১৯৪৯ এর তুলনায় ২৩·৮ শতক বেশি। আর ঠিক হয়েছে, এই ১৯৫২ সালে ওটা ১১৫১২ পিকোয় তুলতে হবে সরকারের খুব নজর এদিকে। লাভও আছে। খাজনা টাকায় নয়, উৎপন্ন জিনিষের শতকরা ১৩ ভাগ। উৎপন্ন বাড়লে খাজনাও বেড়ে যাবে। ৩২টা কুয়া আছে গ্রামে; ১১টা জলচাকি। পশুর সংখ্যা বেড়েছে—৮৪ থেকে ৯৭। গাড়ি ৪৯ থেকে ৮১। তিনটে স্প্রে আনা হয়েছে জমিতে জল দেবার জন্য, তিনটে নতুন ধরনের লাঙল।

৪২টা মিউচুয়্যাল-এইড-টিম আছে। বস্তুটা কি বুঝলেন? ধরুন, এক বাড়ির জমি আছে ১৪ মো, খাটনির মানুষ ৩ জন। আর এক বাড়ির জমি ১২ মো খাটনির মানুষ ১০ জন। দু'বাড়ির ২৬ মো জমি ১৩ জনে মিলেমিশে চাষ করল, ফসল তুলল এক খামারে। তারপর ফসল সমান ভাগ করে নিল। ওদের জমি বেশি, মানুষ কম। এদের মানুষ বেশি, জমি কম—তারই হারাহারি করে নেওয়া হল। পদ্ধতিটা মোটের উপর এই।

মানুষ সুখী সচ্ছল,—খুব খরচপত্র করছে। ষোলটা পবিবার নতুন ঘর

বেঁধেছে মোট ৭০ খানা। তার মধ্যে ১৬ খানা প্রয়োজনের নয়, তিনাইই শখ করে বানানো! নববর্ষের উৎসবটা সকলের সেরা। ঐদিন একটু ময়দা খাবার জন্যে সকলে আঁকুপাঁকু করত; সঙ্গতিতে কুলিয়ে উঠতে পারত না। এখন মাসে দশ-বারো দিন তারা ময়দা খায়। আগে এক প্রস্থ কোট-পাজামায় বছর কাবার হত, এখন শীতের গরমের আলাদা আলাদা পোশাক। আর উৎসবের পোশাক-আশাক দেখে তো চক্ষু কপালে উঠবে—নিষিদ্ধ শহরের কবরখানা ফুড়ে বেরিয়ে সেকালের রাজরানীরা যেন গাঁয়ে গাঁয়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন। তিনটে বছর আগে একমুঠো ভাত পেলে যারা বর্তে যেত্তো, সেই চাষার ছেলে মেয়ের হাতে রিস্ট-ওয়াচ, পকেটে ফাউন্টেন-পেন।

সমবায়-দোকান হয়েছে, গাঁয়ের মানুষ টাকা দিয়ে সভ্য হতে পারে। লাভের বখরা পাবে। জিনিসপত্র এখানে অন্য জায়গার চেয়ে শতকরা ৫ ভাগ সস্তা। ২৭০ রকম জিনিস পাওয়া যায়।

আগেও প্রাইমারী ইস্কুল ছিল। কুয়োমিনটাং আমলের ছাত্রসংখ্যা ২০৪, এখন ৫৩৯-এ উঠেছে। নতুন মিডল ইস্কুল হয়েছে—তাতে ২৯০ জন ছাত্র। বেশির ভাগ ছেলেই সরাসরি বৃত্তি পায়। চাষীদের কাজের ফাঁকে ফাঁকে পড়ানোর জন্য ইস্কুল হয়েছে—৩৫২ জন পড়ছে এখন সেখানে। সংক্ষিপ্ত উপায়ে কম সময়ে চীনা ভাষা শিখবার কায়দা বেরিয়েছে, সেই ভাবে শেখানো হয়। সংস্কৃতি-ভবন দেখতে পাবেন। থিয়েটারের হল হয়েছে অবসর-বিনোদনের জন্য। ভূমি-সংস্কারের মরশুমে দুটো পালাগান বড্ড সমাদর পেয়েছিল—'সাদা চুলের মেয়ে' 'আর লাল পাতার নদী'।

স্বাস্থ্যের উপর খুব নজর চাষীদের। এই গাঁয়ে এ বছর ৬১৩ টা ইঁদুর মেরেছে, ৩৭০০০ মাছি মেরেছে (জাল পেতে মাছি মারে, এর জন্য পুরস্কার দেওয়া হয় গ্রাম-সমিতি থেকে)। হাসপাতাল বানানো হয়েছে ১৯৫০ অব্দে। আর নতুন পদ্ধতির সূতিকাগার। শান্তি আন্দোলন খুব চালু হয়েছে…লড়াই করব না, শান্তি চাই আমরা মনে দেহে বাক্যে। যে ভাবে উন্নতি হচ্ছে—প্রত্যাশা করছি দু-এক বছরের মধ্যে ট্রাক্টর আসবে, মিলিত ভাবে চাষ করব আমরা।

দেশে ফিরে আপনাদের চাষীদের কাছে আমাদের কথা বলবেন, আমাদের ভালবাসা জানাবেন। ভারত-চীন এক হোক, শান্তি সুদীর্ঘজীবী হোক!"

বক্তৃতা পড়া শেষ হল। সকলে কানে শুনছেন, আর হাতে-মুখে চালিয়ে

যাচ্ছেন সমান তালে। আমি বোকারাম পিছিয়ে পড়েছি, কলমই চালিয়েছি শুধু। যতটা পারা যায় তাড়াতাড়ি মুখবিবরে ফেলে উঠে পড়লাম! দু-জন চার-জনে একএক দল হয়ে চলেছি। মুখের কথায় শুনব না বাছাধন, নিজ চোখে দেখব। একটা ভাত টিপে হাঁড়িসুদ্ধ ভাতের গতিক বোঝা যায়—একটা গ্রাম থেকেই চীনের গ্রাম-জীবনের আন্দাজ নিয়ে নেবো।

কড়া রোদ। আরও পথও আমাদের বাংলাদেশের দশখানা গাঁয়ের যেমন হয়ে থাকে। কখনো আ'লের উপরে চলেছি, কখনো শুকনো পুকুরের খোলে। এর ঘর-কানাচ, ওর সদর-উঠান পেরিয়ে চলেছি। তারপর, যা থাকে কপালে, ঢুকে পড়ি এক বাড়ির অন্দরে।

তিন দিকে তিনটে ঘর, মাঝে উঠোন। উঠোনে মরাই। এক দিকে গাড়ি পড়ে রয়েছে—খচ্চরে টানে এ গাড়ি। শোবার ঘরে বেমক্কা রকমের উঁচু খাট, খাটের উপর মাদুর পাতা। খাটের নিচে হরেক জিনিসপত্র। দুটো ডিপ্লোমা টাঙানো ঘরের দেয়ালে—দুই ছেলে গ্রাজুয়েট! বসুন ঐ খাটের উপরে উঠে, বিশ্রাম করুন।

খাটে ওঠা চাট্টিখানি কথা নয়, কসরত করতে হবে। সে না হয় দেখা যেতো, কিন্তু সময় কোথা? এক নিশ্বাসে সাত-কাণ্ড রামায়ণ পড়ার মতন সারা গ্রামখানা বিকালের মধ্যে শেষ করে বেরিয়ে পড়তে হবে।

প্রাইমারী ইস্কুল। ইস্কুলের বড় ঘরটা মেরামত হচ্ছে। হেড-মাস্টারকে নিয়ে বারাণ্ডায় বসা গেল খবরাখবর নিতে। ১২টা ক্লাস, ১৬ জন মাস্টার। শতকরা ৯২ জন ছাত্র চাষী-শ্রমিকের ঘরের। পড়া শেষ হতে আগে ছ-বছর লাগত; নতুন পদ্ধতিতে এখন পাঁচ বছর হবে। শিখবে অনেক বেশি। মাস্টার মশায়দের মাইনে ও সামাজিক ইজ্জত বেড়ে গেছে, কাজকর্মে তাঁরা অধিক মনোযোগী হয়েছেন।

আগে ছেলেদের মারধোর করা হত, এখন বন্ধ হয়ে গেছে। গণতান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের। ছেলেদের মন জাগাতেই চাই, ইচ্ছে করে তারা বেশি শিখবে। পড়ানোর বিষয় হল—চীনা ভাষা, ভূগোল, ইতিহাস, গান, ছবি-আঁকা, দেহ-চর্চা…

ছোট ছোট ছেলারা উঠোনে বেরিয়ে পড়েছে, গান করছে নেচে নেচে। আর বলুন ভদ্র হয়ে বসে তথ্য কুড়াবে, হেন অবস্থায়? খাতা বড় বন্ধ করে উঠলাম। তারা দত্ত আর পাণিগ্রাহী পুরোপুরি মেতে গেছেন ছেলেদের হুল্লোড়ে। কি আনন্দ, কি আনন্দ!

চের হয়েছে গো! ঘরে এসো ছেলেরা, ছোট্ট ছোট্ট চেয়ার আর ডেস্ক, ছোট মানুষদের মাপসই খাওয়ার পাত্র।

অনেকক্ষণ থেকে চেঁচামিচি শুনেছি, বহু লোকের বচসা। ছেলেবয়সের স্মৃতি মনে পড়ে যায়। জমির জোর-দখল নিয়ে খুব দাঙ্গা হত সে আমলে। চষা ক্ষেতে এক একটা মাটির চাঁই টেনে নিয়ে বসেছে মরদগুলো—তেল চকচকে রাঙা লাঠি শোয়ানো। ওদিকে উঁচু ডাঙার খেজুরতলায় আছে বিরুদ্ধ দল। বাগ্‌যুদ্ধে গোড়ায় মেজাজ গরম করে নিতে হয়। এ দল বলছে, ও দল জবাব দিচ্ছে। গলা চড়ে উঠছে ক্রমশ। তারপর উত্তর-প্রত্যুত্তর নয়, আকাশভেদী চিৎকার। এবং ছুটে এসে যে যাকে পাচ্ছে, পিটছে দমাদম। মুহূর্তে রক্তগঙ্গা। চীনেও সেই ব্যাপার নাকি?

পা চালিয়ে গণ্ডগোলের জায়গা এসে পৌঁছলাম: পুরানো বাড়ির ভিতর সৈন্যরা বিচরণ করছে। হুঙ্কার তাদেরই। ভয়াবহ বটে, কিন্তু চিৎকারের মধ্যে কেমন যেন সুর পাওয়া যায়। দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সুর করে চেঁচাবে কেন?

কি মুশকিল! দাঙ্গা কোথায়—লেখাপড়া হচ্ছে। বিশ্রামের জন্য সৈন্যদের দিনকতক গাঁয়ে পাঠিয়েছে। নিরক্ষর অনেকেই—এখন এমন দিনকাল, পেটে দু-কলম বিদ্যে না থাকলে জনসমাজে মুখ দেখানো দায়। বিশ্রামের কয়েকটা দিন তাড়াহুড়ো করে খানিকটা শিখে নিচ্ছে। কলহ ব'লে মালুম হচ্ছিল, ওটা পাঠ্যাভ্যাস। লড়নেওয়ালা মানুষ—আপনার-আমার ন্যায় সাবুবার্লি-খাওয়া নিরীহ ভদ্রজন নয়—পাঠচর্চার বিক্রমে তাই পিলে চমকে যায়।

আরও এগিয়ে একটা খুব বড় বাড়ির বড় হলে এসে উঠলাম। জমিদার-বাড়ি ছিল, জমিদার কৌত হয়ে গিয়ে এখন সংস্কৃতি-ভবন। এ হেন ভবন আরও তিনটে আছে। সেগুলো শাখা, মূলকেন্দ্র এটা। মিস্ত্রি-মজুর খাটছে—বাড়ির ভাঙচুর চলছে, দু-একটা নতুন ঘর তোলবারও প্রয়োজন হবে এর পর। গ্রামে গ্রামে এমনি চলেছে। চাষীদের শুধু খাওয়া-পরা নয়, মানুষ হয়ে বেঁচে উঠতে হবে।

দেয়ালে রকমারি পোস্টার। মাঝখানে এক জায়গায় আনকোরা নতুন পেণ্ডুলাম দুলছে টক-টক করে। লাইব্রেরি—সাড়ে চার হাজার বই—বেশির ভাগ চাষবাস সম্পর্কে। শ' দুই লোক পড়াশুনা করে রোজ এসে। এ ছাড়া শিক্ষণ-বিভাগ আছে, চারটে ম্যাজিক-লণ্ঠন—স্লাইডের সাহায্যে নানা বিষয়ে

নিয়মিত শেখানো হয়। চারটে ড্রামের দল, প্রতি দলের পঁচিশটা করে ঢোলক। কাজের শেষে গ্রামের মানুষ ঢোলক বাজিয়ে আমোদ-স্ফূর্তি করে। সপ্তাহে সপ্তাহে নতুন প্রোগ্রাম। তাদেরই একটা দল সংবর্ধনা করেছিল আমাদের। বায়স্কোপ দেখানো হয় শান্তি ও দেশ-পরিগঠন সম্পর্কে।

ব্ল্যাকবোর্ডে নানান হাতের অনেকগুলো লেখা দরজার ঠিক সামনে রেখে দিয়েছে ঢুকেই যাতে পয়লা নজর পড়ে। কি হে বাপু এগুলো ?

নতুন যারা লিখতে শিখল, তাদের নাম সই। নিরক্ষরতা তাড়াবেই। চীনা শেখার নতুন কায়দা বেরিয়েছে—দু-ঘণ্টা করে পড়ে তিন মাসে মোটামুটি ভাষা শেখা যায়। যাদের শেখা হয়ে গেল, তারাই মাস্টার হয়ে পরের দলকে শেখাতে লেগে যায়।

ভিন্ন পাড়ায় এসেছি। এক তরুণী পথের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। উজ্জ্বল চেহারা, পোশাকও পাড়াগাঁয়ের পক্ষে বেশি রকম ফিটফাট। এতক্ষণ ধরে কত মেয়েকে দেখলাম, এ জন গোত্রছাড়া। হাসছে আমাদের দিকে চেয়ে। কথা বুঝতে পারিনে। দোভাষিকে হাত নেড়ে তাই কাছে ডাকল। কাছেই বাড়ি, বেশি পথ নয়—ভারতীয় বন্ধুদের আমার বাড়ি নিয়ে এসো, একটু বসবেন।

তা সে দাবি আছে তার বটে। মস্ত বড় কুলীন—ভলান্টিয়ার হয়ে তার স্বামী ও এক ভাই কোরিয়ায় লড়াই করছে; যারা মুক্তিসৈন্যের দলে ছিল, ইজ্জত নতুন-চীনে আর কারো নয়। স্বামী আর ভাইকে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিয়েও মেয়েটা তাই অমন হাসছে। আচারজাতীয় জিনিস বানিয়ে রেখেছে ফ্রন্টে পাঠাবে বলে। আর পুঁটলি বেঁধে রেখেছে শীতের কাপড়। বোন আর ছেলেটাকে নিয়ে সংসারধর্ম করে। হাত ধরছে আমাদের, পিঠের উপর হাত রাখছে কারো। সরল নিঃসংকোচ। চেহারায় আগে তো ভেবেছিলাম এক কচি কুমারী মেয়ে—মা হয়েছে সে। ফ্রন্টে গুলিগোলার মধ্যে লড়ছে ছেলের বাপ। আহা, কী ছেলে! এই আমি লিখতে বসে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। লাল পাজামা-পরা, দু-গালে লাল রং মাখা, কপালে রাঙা ফোঁটা। অমন সাজে কেন সাজিয়েছে, জানি না। চার বছরের তো ছেলে—আমাদের এতটুকু সমীহ করে না বিদেশি বলে! ও-দেশের কোন ছেলেটাই বা করে! স্বাস্থ্য ফেটে পড়েছে। গান ধরেছে।—গানে কি বলছে হে? একটুখানি শুনে নিয়ে দোভাষি ইংরেজিতে মানে বাতলে দিল—'প্রাচী মহান…।' তার পর দু-হাত উদ্যত করে বীররসের আর এক গান।

'দেশ রক্ষা করতে ইয়েলু নদী পার হবো আমি...।' বাপের বাপ, শত্রুর আর রক্ষে নেই তুমি যখন পার হয়ে হয়ে যাচ্ছ!

গান বন্ধ হঠাৎ, গায়ক বেঁকে বসেছে। কি হল? তোমরা হাসছ, গাইব না—কিছুতে গাইব না আর আমি।

বিস্তর সাধ্যসাধনায় মান ভাঙল। মুখ গম্ভীর করে শুনছি আমরা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে হাস্যলেশ আছে কিনা কোন মুখের উপর। খুশী হয়ে তার পর ঐকথাগুলোই গাইল বার কয়েক।

তখন মুশকিল, কিছুতে ছেড়ে দেবে না আমাদের। কদ্দুর যাবে খোকা? যাবে, যেখানে আমরা নিয়ে যাবো? ইণ্ডিয়ায় যাবে? মাটিও তেমনি—ছেলে গুটগুট করে চলল, হাসছে সে সকৌতুকে। চলেছে ছেলে কখনো আগে আগে, কখনো পিছনে। সমবায়-দোকান অবধি এসেছি, তখনো সঙ্গে আছে? রোদে ঘাম ফুটেছে সোনা মুখে। দোভাষিকে বললাম, আর নয়—জোরজার করে দিয়ে এসো একে বাড়ি পৌছে। পাষণ্ড মা খালি হাসে—ছেলে যদি সত্যি সত্যি ইয়েলু নদী পার হয়ে রণাঙ্গনে চলে যায়, তখনো বোধ করি হাসবে অমনি। ধরতে যাবে না।

সমবায়-দোকানে এসে কয়েকজন আমাদের শশব্যস্তে দরদাম টুকছেন। টুকেই চলেছেন। চলুন, চলুন—পরের আতিথ্যে চর্বচোষ্য দেদার চালিয়েছি, দোকানে দাড়িয়ে অত হিসাব-নিকাশের গরজ কি আমাদের?

নতুন-চীনের আর্থিক চেহারাটা পুরোপুরি পেত চাই।

অনেক তো হল! আর কেন চলুন—

সুবোধ বন্দ্যো বললেন, জমিদারি কেড়ে নিয়েছ—তাদেরই কোন এক বাড়ি নিয়ে চলো দিকি। আলাপ-সালাপ করে বুঝি তাদের মনোভাবটাই বা কি রকম!

প্রোগ্রামে এটা ছিল না। সবাই হাঁ-হাঁ করে সায় দিল।

হাসপাতাল দেখতে যেতে হবে তাঁদের বলে রাখা হয়েছে। তার উপরে এটা চড়ালে খেতে কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে যাবে।

তাই তো চাই। উদর অবকাশ পাবে, তোমাদের আয়োজন একেবারে বরবাদ হবে না।

মাঝারি গোছের এক জমিদার-বাড়ি পথে পড়ল, সদলবলে ঢুকে পড়লাম। বাড়ি দেখে সম্ভ্রম হয় না, জমিদার না হয়েও এ হেন বাড়ি আমাদের অনেকেরই। বাড়ির গিন্নি এগিয়ে এলেন। বয়স হয়েছে, বলিরেখায় চিত্রিত মুখ।

অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে বসালেন। একটু জলটল খেয়ে যেতে হবে—দাঁড়ান, সেই ব্যবস্থা আগে করি। জানিনে তো যে আপনারা আসবেন!

আমরা আপত্তি জানিয়ে বললাম, বেলা হয়ে গেছে—সে সব তালে যাবেন না। দুটো-একটা কথা জানতে এসেছি আপনার কাছে। দেশে ফিরলে সকলে জিজ্ঞাসা করবে কিনা—

গিন্নি হেসে বলেন, গিয়ে যে নিন্দেমন্দ করবেন—ঠিক দুপুরবেলা এক বাড়ি গিয়েছিলাম, শুকনো মুখে বকবকানি শুধু সেখানে।

কিছু না। কিছু না। ঠাণ্ডা হয়ে বসুন দিকি একটু।—

বসলেন না, দাঁড়িয়েই রইলেন তিনি। মুখ-ভরা সহজ স্বচ্ছ হাসি।

জমিদারি গিয়ে নিশ্চয় খুব খারাপ লাগে?

মোটেই নয়। বেশ ভাল আছি আগেকার চেয়ে।

চমক লাগল। এ কি একটা বিশ্বাস হবার কথা? জবাবটা দোভাষি ইংরেজিতে তর্জমা করে দিল, তারই কারসাজি হয়তো। এমনও হতে পারে, আমাদের ইংরেজী প্রশ্ন চীনাতে উল্টো ভাবে বুঝিয়েছে গিন্নিকে।

আবার এ-ও হতে পারে, গিন্নিই একদিনের উটকো লোকের কাছে মনের দুয়োর খুলেছেন না, সেরে-সামলে বুঝে-সমঝে বলছেন। বিশেষ করে আধা-সরকারি অতিথি যখন আমরা। কিন্তু মুখের কথা নিয়ে যে সন্দেহই করি, মুখের উপর ঐ যে হাসি খেলছে—ওটা জাল বলি কেমন করে? হেসে হেসে গিন্নি বলছেন, দিব্যি আছি। জমিদারির বিস্তর হাঙ্গামা; প্রজারা পয়সা-কড়ি দিতে চায় না, দশের কাছে শত্রু হয়ে থাকতে হয়। জান বেরিয়ে যায় ঠাটবাট বজায় রেখে চলতে। বেঁচেছি এখন। বৃহৎ সংসার পুষতে হত, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে তেইশ জন, তার উপরে একগাদা ঝি-চাকর। জমিদারি খতম হবার পর পরগাছা সরে পড়েছে। ছেলে বউ আর আমি—তিনটি প্রাণীর সংসার। ছেলে পিকিনে থাকে, সেখানে কাজ করে। আগে হবার জো ছিল না। জমিদার-বাড়ি ছেলে খেটে খেটে খাবে, কি সর্বনাশ! আগে এক শ বাইশ মো জমি ছিল, এখন সেখানে সাত মো! তার মধ্যে দুই মো হল পুকুর, বাদবাকি চাষের জমি। নিজেই চাষবাস দেখি। তাতে যে খুব কষ্ট হয়, তা মনে করবেন না। মিউচুয়াল-এইড-টিম—খাটাখাটনি কম।

ওখান থেকে হাসপাতালে। এ-ও আর এক জমিদার-বাড়ি; আট মুগুরের একজন। গাঁ-ঘর ছেড়ে সরে পড়েছে। হাসপাতাল খোলা হয়েছিল ১৯৪৫ অব্দে অন্য এক বাড়িতে। তখন এক ডাক্তার আর চল্লিশ-পঞ্চাশ

রকমের ওষুধ। সেই ওষুধই বা কে খাচ্ছে! চাষীরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করত রোগমুক্তির জন্য। ঈশ্বরের মরজি হল তিনি ওষুধেই সেরে যায়; আর মরজি না হলে ঐ পঞ্চাশ রকম একসঙ্গে গুলে খাইয়ে দিলেও রোগের কিছু হবে না। এখনো—গাঁয়ের প্রতিষ্ঠান তো—এমন-কিছু বৃহৎ ব্যাপার নয়। তিন জন ডাক্তার, দুই জন সহকারী, চার জন নার্স। ওষুধ তিন শ' দফার মতন। দুটো ঘর নিয়ে শুরু হয়েছিল, এখন কুড়িখানার উপর। সত্তর-আশী জন রোগী রোজ আসে চিকিৎসার বাবদে। সর্দি-জ্বরই বেশি।

দুপুর গড়িয়ে এলো। ফিরে চললাম—যে স্কুল-বাড়িতে প্রথম এসে উঠেছি। দুপুরের খাওয়া সেখানে। লম্বা টেবিল পড়েছে সারি সারি, স্তূপাকার আয়োজন। আর পল্লী-অঞ্চলের খাঁটি মাল—পানের সময় নাকি গলা দিয়ে আগুন নামে। অধম অরসিক—গুণাগুণ শুনেই আসছি শুধু। গেলাস থেকে একটু ঢেলে নিয়ে জ্বলন্ত কাঠি নিক্ষেপ করলাম দপ করে জ্বলে উঠল।

খাওয়ার পরে আবার বেরুনো। বসে থাকতে আসিনি—যতটুকু সময় আছে দেখেশুনে সঞ্চয় করে নিই। আহা, ঠিক যেন আমাদেরই কোন গ্রাম। সদর রাস্তা ধরে চলেছি মেটে রাস্তা, দুধারে পগার। এধারে ওধারে টালি-ছাওয়া ঘরবাড়ি। কুয়োর জল তুলছে খচ্চর দিয়ে চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। মানুষজন দেখবার জন্য ভিড় করেছে। দেখবে বই কি! একদল বিচিত্র মানুষ ঘোরাঘুরি করছে, রামা-শ্যামা নয়—ভারতের মানুষ। হেন ভাগ্য ক'টা গ্রামের হয়ে থাকে?

পথের প্রান্তে নিরিবিলি একটা বাড়ির দেয়াল ঘেঁসে—এই যে বলা হয়, ভিখারি নেই মোটে এ দেশে—ছেঁড়া পোশাক-পরা বুড়োমানুষটা কাতর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। দ্রুত পায়ে তার দিকে এগিয়ে যাই। লোকটা সরে গেল, বাড়ির উঠানে গিয়ে উঠল। সেখান থেকেও অমনি তাকাচ্ছে। কিন্তু পরদেশে বাড়ির উঠান অবধি হামলা দিয়ে দয়া দেখাতে সাহসে কুলোয় না। হাজার দুই ইয়ুয়ান দোভাষির হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, দিয়ে এসো লোকটাকে—

দোভাষি হাসল। সেকেলে গেঁয়ো-মানুষ—ওদের ধরনধারণ এই রকম। বিদেশি বলে কুতূহলী হয়ে তোমাদের দেখাচ্ছে। তাই একেবারে ভিখারী ভেবে বসেছ? টাকাকড়ি চাচ্ছে না বুড়ো, দিলেও নেবে না। দিতে গেলে অপমান করা হবে।

নিজেরই লজ্জা লাগে তখন। ছি-ছি, কাপড়-চোপড় দিয়ে আমরা মানুষের বিচার করি।

বেলা পড়ে আসে। ইস্কুলবাড়ি ফিরি এবার—আমাদের আড্ডাখানায়। ঘুরে-ফিরে সবাই ওখানে এসে জুটবেন, ওখান থেকে পিকিনে রওনা।

তুমুল বাদ্যভাণ্ড ইস্কুলবাড়ির উঠানে। দূর থেকে আওয়াজ পাচ্ছি। গাঁয়ে ঢুকবার মুখে সেই যে দেখেছিলাম—তারা সব এসে জুটেছে। শুধু বাজনা নয়, বাজনার সঙ্গে নাচ। নাচছে ওরাই শুধু নয়, ভারতীয়দের ধরে ধরে নামাচ্ছে। ঘন-বিন্যস্ত গাছের ছায়া, আধপুকুর গোছের জলাভূমি—তারই পাশে আসন্ন সন্ধ্যায় সে কি হুল্লোড়! সন্তর্পণে এক গাছতলায় দাঁড়াই। তবু দেখে ফেলল।

আসুন, নেবে পড়ুন—

কোঁচার কাপড় গুঁজে দিই কোমরে। অর্থাৎ নামবোই নির্ঘাত। নেমে পড়লামও বটে, আসরে নয়—পগার লাফিয়ে একেবারে রাস্তার উপর। হনহন করে চলেছি—দৌড়নো বললেও আপত্তি করব না। বেশ খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে রাস্তার উপর আমাদের বাস রয়েছে, তার খোপে ঢুকে পড়ে সোয়াস্তির শ্বাস ফেলি। সকলে এসে পড়লে বাস ছেড়ে দিল।

(১৫)

পিকিন ছাড়তে হবে দু-এক দিনের মধ্যে, দেখা-শুনোর যা-কিছু তাড়তাড়ি চুকিয়ে নাও। প্রত্নপণ্ডিত চেং চেন-তো-র সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সেই যে রেস্তোরাঁয় নিয়ে খাওয়ালেন আমাদের ক'জনকে। নিষিদ্ধ-শহরের এলাকার মধ্যে লেখক-সঙ্ঘ—সেইখানে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। অদূরে পে-হাই পার্ক, খাসা পরিবেশ! জায়গাটুকুকে বলে গোল-শহর। গিয়েছি একলা আমি সঙ্গে দোভাষি। এসে অবধি চেষ্টা করছি চেং মশায়ের সঙ্গে একটু নিরিবিলি বসব। অতীত কালের মধ্যে অতিস্বচ্ছন্দ তাঁর পদচারণ। ভারত-চীনের পুরানো সম্পর্ক নিয়ে বিস্তর নতুন কথা তিনি বললেন।

পে-হাই পার্কের সামনে ন্যাশন্যাল পিকিন লাইব্রেরি। তেরো শতকের তৈরি মূর্তি এদিকে-ওদিকে—নানা রকম সমুদ্রজন্তু, ড্রাগন, ঘোড়া, স্বস্তিক। বৃষ্টি হচ্ছিল টিপটিপ করে। প্রশস্ত অঙ্গন ছুটে পার হয়ে লাইব্রেরি-বাড়িতে উঠে পড়লাম।

পুরানো ধাঁচে তৈরী নতুন বাড়ি। বিশাল চীন দেশে একাল-সেকালের

বিস্তর লাইব্রেরি আছে, তার মধ্যে সকলের সেরা। একতলা, দোতলা, তেতলা ঘুরে বেড়াচ্ছি উঁচু ঘর যেমন, তেমনি আছে নিচু নিচু খোপ। সিঁড়ি নানান দিকে—এই উপরে উঠছি, এই নেমে যাচ্ছি আবার। বই আর বই আর বই। আর বই পড়বার এবং বই-পুঁথি থেকে টুকে নেবার মানুষ। অত বড় বাড়ি—লাইব্রেরির লোকজন ও পড়ুয়ার হাজারের বেশি বই কম হবে না। কিন্তু নিঃশব্দ—একটা সূঁচ পড়ে গেলে তার আওয়াজ পাবেন।

গ্রন্থগারিক নিজে এঘর-ওঘর দেখিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। পুরানো দুষ্প্রাপ্য বইয়ের তোয়াজ বড্ড বেশি। আলমারিতে বেশ হাত-পা ছড়িয়ে তাঁরা বিরাজ করছেন; ডেস্কের মধ্যেও শুয়ে আছেন অনেকে। এঁদেরই মধ্যে এক তাজ্জব—একটা জায়গায় এসে গ্রন্থাগারিক মৃদু মৃদু হাসছেন আমার দিকে চেয়ে, আঙুল তুলে দেখাচ্ছেন ডেস্কের কাচের দিকে। কি ব্যাপার? পুঁথির বয়স লেখা আছে হাজার খানেক বছর। পুঁথিখানা—তাই তো মালুম হচ্ছে যেন বাংলা হরফে লেখা। এ পুঁথি আমার বাংলা দেশ ছেড়ে হিমালয় লঙ্ঘন করে, দিগ্‌ব্যাপ্ত মরু দুস্তর নদী অগণন জনপদ পার হয়ে রহস্যকীর্ণ প্রাচীন পিকিন নগরীতে হাজার বছর ধরে সম্মানের আসন নিয়ে আছে।

দোভাষি জিজ্ঞাসা করে, পড়তে পারো? পড়ো দিকি কি আছে পুঁথিতে লেখা?

তাবচ্চ শোভতে—ইত্যাদি। অতএব চুপ করে রইলাম।।

রাজাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ক্রমশ লাইব্রেরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। চোদ্দ শতকের মাঝামাঝি প্রতিষ্ঠা; বয়স ছ-শ পেরিয়ে গেল। মাঞ্চু রাজাদের তাড়ানো হল উনিশ শ এগারোয়। পরের বছর ন্যাশন্যাল পিকিন লাইব্রেরি নাম নিয়ে এই জায়গায় লাইব্রেরির পত্তন।

ঝড় ঝাপটা অনেক গেছে এর উপর দিয়ে। উনিশ শ অব্দে পিকিন লুঠ-পাট করল—অনেক বই পোড়াল, বিস্তর বই খোয়া গেল সেই সময়টা। আরও অনেক বার এমনি হয়েছে। বইয়ের সংখ্যা মোটামুটি পাঁচ লাখ এখন। পাঁচটা বিভাগ, আলাদা আলাদা কাজ তাদের। একদল বই কেনে ও যোগাড় করে। আর একদল যোগাড় করে দুষ্প্রাপ্য বই; ঐ সব বইয়ের সযত্ন রক্ষণ-ভারও এই দলের উপর; ভিতরের মালামাল নিয়ে আলোচনা এবং গবেষণার কাজও এদের। একদলের কাজ ক্যাটালগ তৈরি—বইয়ের শ্রেণীবিভাগ করে পাঠকের সামনে যতদূর সম্ভব পরিচয় তুলে ধরা। আর একদল রিডিং-রুমে বইয়ের বিলি-ব্যবস্থা করে; দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের বন্দোবস্ত

এদের। তাছাড়া রকমারি বক্তৃতা ও নানা জায়গায় বইয়ের প্রদর্শনী এদের উদ্যোগেই হয়। কিছুদিন থেকে একটা বিশেষ বিভাগ হয়েছে—সোভিয়েট লাইব্রেরি; আলাদা তার রিডিং-রুম। সোভিয়েট বই আর সাময়িকপত্রাদির বিশেষ চাহিদা ইদানীং; অসংখ্য বই চীনায় তর্জমা হচ্ছে।

চীনের নবজন্ম থেকে দেদার বই কেনা হচ্ছে—সাবেক আমলের অনেক গুণ। আর এক ব্যবস্থা হয়েছে—বই ধার দেওয়া ও ধার নেওয়া। এক দেশকে ধরুন দশ হাজার বই ধার দিলাম, আনলাম সেখান থেকে ঐ পরিমাণ। পড়া শেষ হয়ে গেলে দেওয়া হল। অনেক জায়গার সঙ্গে এই রকম লেনদেন চলছে।

বইয়ের একজিবিশনে চক্কোর দিচ্ছি। হাড ও কচ্ছপের খোলার উপর লেখা—বই না কি বলবেন তাকে? বয়স হল খ্রীষ্টপূর্ব তেরো শ থেকে এক শ। কাঠের উপর লেখা বুদ্ধের নানা উপদেশ—৪৪৮ থেকে ৭৫০ অব্দের। আগে যে পুঁথির কথা বললাম, তাছাড়া আরও বাংলা ও সংস্কৃত পুঁথি আছে। ১৫০০ অব্দের খবরের কাগজ। কাঠের উপর আঁকা বহু বিচিত্র ছবি। দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সংখ্যা এক লাখ চল্লিশ হাজার।

মস্ত বড় পাঠাগার, সর্বসাধারণ সেখানে বসে বসে সাধারণ বই পড়ে। আর দুটো আলাদা পাঠাগার আছে বিজ্ঞান আর কারিগরি বই পড়ার জন্য। দুটো নতুন হল বানানো হচ্ছে—একটায় একজিবিশন মনের মত করে সাজানো হবে, আর একটা হবে বাচ্চা ছেলেদের পড়বার ঘর। শুধু বই পড়া নয়, নিয়মিত বক্তৃতার ব্যবস্থা পাঠাগারে—লেখক ও গুণী-জ্ঞানীরা পাঠকদের সামনে হাজির হয়ে মোলাকাত করেন। চিঠিচাপাটি আসে রোজ—লোকে নানান রকম প্রশ্ন করে চিঠি লেখে, পণ্ডিত-জনের সঙ্গে পরামর্শ করে তার জবাব দেওয়া হয়। বই ধার দেওয়া হয় অন্যান্য লাইব্রেরীতে—পিকিন ও আশেপাশে সাত শ তেত্রিশটা লাইব্রেরির সঙ্গে এমনি ধার দেবার ব্যবস্থা। সর্বব্যাপ্ত শিক্ষা প্রচেষ্টায় লাইব্রেরিও দায়িত্ব বহন করছে।

দূতাবাসে আজকে চায়ের নিমন্ত্রণ। শুধু মাত্র তরল চা নয়—লুচি তরকারি ইত্যাদি নির্ভেজাল ভারতীয় খাদ্য। সেই পরাঞ্জপের বাড়ি মুখবদল হয়েছিল, আর আজ আকণ্ঠ ঠেসে দুর্ভিক্ষের খাওয়া খেয়ে নিলাম। এর পরে যে কটা দিন পিকিনে রইলাম, ঐ স্বাদ জিভে জড়ানো ছিল।

বিকাল বেলা এই, সন্ধ্যার পর আবার একদফা ভারী ভোজ। আহা,

চলে যাচ্ছেন যে কটা দিন পরে! ধকলটা কিছু বেশিই হচ্ছে—তা খেয়ে নিন কষ্টে-সৃষ্টে, কি আর হবে! মাসবধি ধরে যাঁদের খাচ্ছি, তাঁরাই আবার আলাদা করে নিমন্ত্রণ করলেন আজ। এবং পিকিন হোটেলেই—নিচের তলার খানা-ঘরে। সব রকম ভোজই মজুত থাকে প্রতিদিনের খানা-টেবিলে—নতুন আর কি আসবে এর উপরে? নতুন এই হল, বিশেষ নিমন্ত্রণের নাম করে যাবতীয় বিশিষ্টেরা আজ আমাদের সঙ্গে খাচ্ছেন।

বড়দের বাদ দিয়ে চারজনে আমরা একটেরে আলাদা ভাবে ছোট্ট এক টেবিলে বসেছি। তিন জন ভারতীয়—আর এক প্রৌঢ়া চীনা মহিলা এসে খালি চেয়ারটায় বসে পড়লেন! নিতান্ত সাদা-মাঠা পোষাক, মাথার চুলগুলো অবধি পরিপাটি গোছানো নয়। ইংরেজি কিন্তু উত্তম বলেন। তা হলে দোভাষি করে নি কেন এঁকে? বাচ্চা ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গ উঠল—তার মধ্যে ডাক্তারির ফোড়ন শুনে মালুম হল, ঐ বিদ্যাও কিছু কিছু জানা আছে! তা সে যা হোক, ভারি স্ফূর্তিবাজ মহিলা, অবিরত হাসিরহস্য করছেন, বয়সের তুলনায় অতি চপল। হিন্দুস্থান আর চীনের অধিবাসী ভাই ভাই—এই মর্মে কয়েক দিন থেকে একটা শ্লোগান চালু হয়েছে—হিন্দী-চীনী ভাই ভাই। মহিলা ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে সকলের চেয়ে উঁচু গলায় সেই বুলি ছাড়ছেন। আর হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ছেন এ-কথায় ও-কথায়।

এই মাস কয়েক আগে মহিলাকে কলকাতায় দেখে চমকে উঠলাম। চীনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসেছেন, সংবর্ধনার সমারোহ। নলিনীরঞ্জন সরকারের 'রঞ্জনী' বাড়িটা এখন কলকাতার চীনা দূতাবাস। ঐখানে নিমন্ত্রণ হয়েছে স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর সঙ্গে মোলাকাতের ব্যাপারে। হলের দরজায় দাঁড়িয়ে কনর্সাল-জেনারেল অভ্যর্থনা করছেন, পাশে সেই আমুদে মহিলাটি। আমায় দেখে হেসে উঠলেন পিকিনের ভোজের আসরের মতোই। বললেন, একেবারে নাম করে বলে উঠলেন, আবার আমাদের দেখা হয়ে গেল বোস। বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে বললেন, ব্যানার্জি, তুমি অনেক রোগা হয়ে গেছ। তার পরে ভিতরে গিয়ে মহিলাটি বসলেন আমাদের রাজ্যপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। খাতির দেখে তখন বুঝলাম। পিকিনে সাধারণ এক ডাক্তার কিংবা নার্স ভেবেছিলাম —ওরে বাবা, খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্রী তিনিই যে! বিলাতে বিস্তর দিন কাঠ-খড় পুড়িয়ে ডাক্তারি শিখেছেন, কিন্তু সারল্য ও রস-রসিকতার উপর বিলাতি পলস্তরা পড়েনি।

সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মশায় ছিলেন, তাজ্জব ব্যাপারটা শোনালাম তাঁকে।

সামান্য মানুষ সেই কবে চীনে গিয়েছিলাম, কত দিন হয়ে গেল—কত রকম দায়ঝক্কি ওঁদের উপর—অথচ নামটা অবধি মনে করে রেখেছেন।

সুনীতকুমার বললেন, সাহিত্যিক মানুষ—তার উপর আপনার পরনে ছিল ধুতি-পাঞ্জাবি। তাই হয়তো চিনে ফেললেন—

কিন্তু বিজয় বাড়ুজ্জে? তাঁকেও তো ভোলেননি—

অসাধারণ স্মরণশক্তি অতএব মহিলার। আশু মুখুজ্জে মহাশের এমনি ছিল। যাকে একবার দেখতেন, কখনো তাকে ভুলতেন না।

হবে তাই। স্মরণশক্তির আরও পরিচয় পেলাম অচিরে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে গল্প করতে করতে পুরানো কথা উঠলো, পিকিনে এক টেবিলে খেয়েছিলাম আমরা; খেতে খেতে চেঁচাচ্ছিলাম 'হিন্দী-চীনী ভাই ভাই'—

ঘাড় নেড়ে হাসতে হাসতে মাননীয় মন্ত্রী বললেন, খুব মনে আছে। 'ভাই-ভাই' কেন হবে? 'বাই-বাই'। তাঁর ভাঙা উচ্চারণে 'ভাই-ভাই' কথাটা 'বাই-বাই'তে দাঁড়িয়েছিল, এত দিন পরে সেই মোতাবেক সংশোধন করে দিলেন।

এই দেখুন, গল্পে গল্পে কোথায় এসে পড়েছি। এমন করলে চীনের কথা কবে শেষ হবে! হচ্ছিল কোথায়?

ওঁরা ধরেছেন, চলে যাচ্ছে তো—কি রকম দেখলে, বলে যাও একদিন আমাদের রেডিয়োয়। জন আষ্টেককে বাছাই করা হয়েছে রেডিও বক্তৃতার জন্য। বক্তৃতার রেকর্ড করে নেবে, যন্ত্রপাতি ঘাড়ে করে নিয়ে এসেছে হোটেলে। সুবোধ বন্দ্যোর উপর ভার—সকলকে-ডেকে-ডুকে বক্তৃতা করাবেন। যথারীতি দক্ষিণাও দেওয়া হবে বক্তৃতার জন্য।

দক্ষিণা? তবে এই ঠোঁট বন্ধ, মশায়। এত আদর-যত্ন, ডাইনে-বাঁয়ে ভালবাসার উপহার—এর উপরেও টাকা? ভাবেন কি বলুন তো আমাদের।

কড়া হয়ে বসায় দক্ষিণা শেষ অবধি মকুব হল। এই একটা বস্তু মুফতে দিয়ে এলাম।

এক পাক বাজার ঢুঁড়ে আসব। আমার সেই পাকিস্তানি কনিষ্ঠ খোন্দকার ইলিয়াস ধরে ফেললেন, অবেলায় কোথায় ছুটলেন দাদা?

ব্লেড ফুরিয়ে গেছে। আজকের ক্ষৌরকর্ম হয়নি। ব্লেডের সৃষ্টি-ছাড়া দর এখানে—একটা-দুটো তবু না কিনে উপায় নেই।

চক্ষু কপালে তুলে ইলিয়াস বলেন, কি সর্বনাশ, নিজে দাড়ি কামান আপনি?

হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন আমায়। হলের অপর প্রান্তে অনেকগুলো

ঘর, দোভাষিরা বলা-ওঠা করে—ওদিকটায় কোন দিন যাইনি। তারই এক খোপের সামনে গিয়ে ইলিয়াস দাড়ি চাঁচার ইঙ্গিত করলেন! সঙ্গে সঙ্গে ছাপা করমে সই মেরে দিল তাঁতে। পিছনে এরে একটা ঘর—সেলুন। চেয়ারে বসিয়ে দিল—সে চেয়ার কখনো কাত হচ্ছে, কখনো শুয়ে পড়ছে। এমনি করে নানান ভাবে শুইয়ে বসিয়ে বিশ মিনিট ধরে ক্ষৌরকর্ম করল। তা-বড় তা-বড় অপরেশনেও বোধ করি এত ঘোর-প্যাঁচের প্রয়োজন হয় না।

হায় রে, পিকিনে পা দেওয়ার পরে এই ইলিয়াসকে আমি নানাবিধ পাঠ দিয়েছিলাম। ভায়া ইতিমধ্যে বিস্তর লায়েক হয়েছে, অগ্রজকে অনেক পিছনে ফেলে গেছে।

সেই দুপুরে আর এক ব্যাপার শ্রীমতী কোটনিশকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে —আগে-পিছে খেয়ে নেবেন না, এক সঙ্গে খাবো সকলে। ডাক্তার কোটনিশের কি পরিচয় দেবো—'কোটনিশ কা অমর কাহিনী'—সিনেমা-ছবি দেখেছেন নিশ্চয়! যুদ্ধের আমলে নেতাজি-নেহরুর উদ্যোগে ভারত থেকে দুর্গত চীনে মেডিকাল মিশন গিয়েছিল, কোটনিশ সেই দলের। ইনি সেই মেয়ে, যিনি কোটনিশের আমৃত্যু কর্মের সাথী—এবং জীবনসঙ্গিনীও হয়েছিলেন। এখন আর শ্রীমতী কোটনিশ বলা চলবে না, এক চীনা ভদ্রলোককে বিয়ে করেছেন। এটা হামেশাই চলে ওঁদের সমাজে। শ্রীমতী পিকিনে থাকেন; একটা ইস্কুলের স্বাস্থ্য-পরীক্ষক। আমাদের মধ্যে যে কজন মারাঠি, হঠাৎ তারা অনুষ্ঠানের মাতব্বর হয়ে উঠেছেন। আগে ধরতে পারিনি, তারপর মালুম হল, কোটনিশ জাতে মারাঠি। অতএব বাড়ির বউ এসেছে, এমনি একটা ভাব মারাঠি বন্ধুদের।

শ্রীমতী বয়স হয়েছে, প্রৌঢ়ত্বে এসে গেছেন। যে সব মিষ্টি রোমান্সের কাহিনী শোনা গেছে, এ চেহারার সঙ্গে তা যেন খাপ খায় না। ছেলেটি খাসা, বছর দশ-বারো বয়স, চেহারায় ভারতীয় আমেজ আছে, নামেরও মানে করলে দাঁড়ায় 'চীন-ভারত'। বললাম, দেশে যাবে খোকা? চলো না আমাদের সঙ্গে। লাজুক মুখে সে ঘাড় নাড়ে, উঁহু—এখন নয়। ওর মা-ও বললেন, যাবে বই কি; নিশ্চয় যাবে। আর একটু বড় হোক। কোটনিশের অনেক গল্প করলেন শ্রীমতী, সাহস ও কর্মনিষ্ঠার অনেক কাহিনী।

মাও-তুন জাঁদরেল ঔপন্যাসিক, প্রায় আমাদের শরৎ চাটুজ্জে মশায়ের সমতুল্য। হাস্যমুখ, সদালাপী ভদ্রলোক। জিজ্ঞাসা করলাম, নতুন কোন উপন্যাস ধরেছেন? হেসে উনি ঘাড় নাড়েন, উঁহু, বই লেখা আর বোধহয়

হবে না! কবি এমি-সিও পাশ থেকে ফোড়ন কাটেন, ধরেছেন বই কী! চীনের তাবৎ নরনারী বালবৃদ্ধ নিয়ে জীবন্ত উপন্যাস। হেন উপন্যাস পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যিক লিখেছেন, জানি নে।

মাও-তুন সাংস্কৃতিক মন্ত্রী—চীনের মহানায়কদের একজন। সেই কথাটা বলে দেওয়া হল আর কি। বলে না দিলে কে বুঝবে, এই চেহারা, এই চালচলনের মানুষ হলেন মাননীয় মন্ত্রী! বলে দিলেও বিশ্বাস হওয়া শক্ত। ফেডারেশন অব চাইনিজ রাইটার্সের সভাপতি। খুব ব্যস্ত আজকে—তাঁতের মাকুর মতন ছুটাছুটি করছেন। বসুন, বসতে আজ্ঞা হোক—অভ্যাগতদের বসবার জায়গা দেখিয়ে আবার বাইরের সিঁড়ির ধারে এসে দাঁড়াচ্ছেন সকলের অভ্যর্থনার জন্য। ওরই মধ্যে খাতাটি বাড়িয়ে দিলাম—সই মেরে দিন তো একটা। স্মৃতি থাকবে, চিঠিপত্র লিখব। চীনায় ও ইংরেজিতে নাম লিখে দিলেন।

লেখক ও শিল্পীদের সমাবেশ। বড় কিছু নয়, ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা। সাঁইত্রিশটা দেশের প্রতিনিধিদের মাঝ থেকে সাহিত্য-শিল্পের ছিটগ্রস্তদের বাছাই করে ডাকা হয়েছে। আর চীনা গুণীরা তো আছেনই।

লোক বেশি অতএব জাত হিসাব করে কয়েকটা টেবিলে ভাগ হওয়া গেল। জাত মানে—এঁরা লেখেন, ওঁরা আঁকেন, ওঁরা থিয়েটার করেন ইত্যাদি। খোদ মাও-তুন আমাদের টেবিলে। তিনি বলছেন, "আমাদের চীনা জাতি বড় শান্তিপ্রিয়। কখনো তারা পরের রাজ্যে হামলা দেয়নি। আমাদেরই উপর বাইরের লোক ঝাঁপিয়ে পড়েছে। শান্তির বাণী আজকের নয়—খুব পুরানো আমলের গুণী জ্ঞানীদের লেখার মধ্যেও এই শান্তির কথা। 'যা তুমি নিজে চাও না, অন্যকে তা কক্ষনো দিও না'—লড়াই সম্পর্কে কনফুসিয়াস বলেছেন। চীনের এক প্রাচীন প্রবাদ—যুদ্ধ হল আগুন, এ নিয়ে খেলা কোরো না, সব ঠাঁই ছড়িয়ে যাবে। বারুদের প্রথম আবিষ্কার হল আমাদের দেশে, কিন্তু সে বস্তু আমরা আগ্নেয়াস্ত্রে ভরিনি, বাজি বানিয়ে লোকের নয়ন বিমোহন করেছি।"

আমি এর মধ্যে ফোঁস করে উঠি একবার। হাঁ মশায়, নিজের দেশ নিয়ে কাহনখানেক তো বলছেন—আমাদের ভারত? আমাদের সৈন্যবাহিনী দেশের সীমানার বাইরে কবে পা বাড়িয়েছে? গিয়েছেন দেশ-বিদেশে ভারতের সাধুসন্ত জ্ঞানী-গুণীরা—

"তাই বটে। হাজার হাজার মাইল জোড়া দুই দেশের সীমানা। ইতিহাসে

তবু হানাহানির একটা দৃষ্টান্ত নেই। আর আজকের দিনে শুধু মাত্র চীনভারত নয়—যত লোক সমবেত হয়েছেন; তাঁদের সকলের দেশের ঐকান্তিক কামনা শান্তি। মাতৃভূমিকে ভালবাসি—তাকে উজ্জ্বল গৌরবে গড়ে তুলব শান্তি ও আনন্দের মধ্য দিয়ে। নানান শ্রেণীর শিল্পী এখানে উপস্থিত—হয়তো এই প্রথম বার আমাদের চাক্ষুষ দেখা, মুখোমুখি এসে বসা—কিন্তু এক সাধারণ শান্তির ভাষা আমাদের। সুদীর্ঘ কাল ধরে প্রত্যেকজনেই আমরা একটি প্রত্যাশা মনে মনে লালন করছি—পৃথিবীর নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। মনের কথা এই একটি মাত্র। এই ভাবনাই আমাদের সকল সাহিত্যের অন্তর্বাহী হয়ে চলবে। এই মীটিঙের পরেও আমি আশা করি, আমাদের মিলন শেষ হবে না—পরস্পরের কাছে পরিচিত থাকব আমরা সকলে, যাতে পৃথিবীর মানুষের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ দিন দিন নিবিড়তর হয়। চীনা লেখক-শিল্পীরা তোমাদের স্বাস্থ্যশ্রী ও সাফল্য কামনা করছে।"

তারপরে নীচু গলায় গল্পগুজব চলছে আমাদের। আর যা চলছে—থাক, কথা দিয়েছি, ওসবের পরিচয় আপনাদের লোভ সঞ্চার করব না। জায়গা বদলাবদলি হচ্ছে পাশাপাশি বসে এ-ওর পরিচয় নেবো বলে। কত জায়গার কত মানুষ—নাম-ঠিকানায় খাতা ভরে গেল। চিঠি লেখালেখি চলে যেন বারবর। নিশ্চয়, নিশ্চয়। সেদিন আন্তরিক ভাবেই স্থির করেছিলাম, মানুষ আমরা দূরে দূরে চলে যাচ্ছি বটে কিন্তু চিঠি আমাদের মনগুলোকে এক করে বেঁধে রাখবে। ব্যস, ঐ অবধি। ঠিকানা মতো একখানাও চিঠি লিখি নি আজ অবধি! তিন-চারটে চিঠি এসেছে, তারও জবাব দেওয়া হয়নি।

লেখকেরা রয়্যালটি পান ওখানে দেশ থেকে পনের পার্সেন্ট। আগে ভাষা নিয়ে খুব পায়তারা চলত—স্টাইলের নানা বৈচিত্র্য ও বর্ণবাহুল্য। নতুন কালে এখন সে ঝোঁক কেটেছে। সাদামাঠা ভাষায় লিখছেন লেখকেরা, জনগণের সঙ্গে তার ফলে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। লোকে খুব বই পড়ছে, বইয়ের কাটতি হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। আর সেই সঙ্গে সাধারণের মুখের ভাষারও উন্নতি হচ্ছে!

গ্রাম্য ভাষাতেও বই লেখা হচ্ছে, কিন্তু সংখ্যায় অত্যন্ত কম। এক গেঁয়ো চাষী আশ্চর্য এক উপন্যাস লিখেছেন—'নরকরাজ্য'। নতুন-চীন গড়ে উঠবার পর এই ধরুন বছর দুই-তিন মাত্র উন্নত-সংস্কৃতির স্পর্শ পেয়েছেন তিনি। পুরানো ইতিহাস নিয়েও নবযুগের উপন্যাস হয়েছে। আর লেখা হচ্ছে—হাঁসিমস্করায় ঠাসা গল্প, রম্যরচনা! এ বস্তুর খুব চাহিদা। নাটকের নামে

চীনা মানুষ চিরকাল পাগল; অভিনয় কিংবা সিনেমার ছবি দেখবার জন্য লোকে বিশ মাইল বরফের উপর দিয়ে হাঁটতে গররাজি নয়, সারারাত্রি হয়তো ধৈর্য ধরে বসে আছে। তাই বিস্তর নাটক লেখা হচ্ছে, অভিনয়ও হচ্ছে সুপ্রচুর। ধর্ম নিয়ে লোকের মাথাব্যথা নেই, হালফিল ধর্মের বই বড় একটা বেরুচ্ছে না।

জীবনের সত্য পরিচয় নেবার জন্য লেখকরা অনেক সময় চাষী শ্রমিক কিংবা সৈন্যদের মধ্যে গিয়ে থাকেন। শুধু দর্শক হিসাবে নয়, তাদেরই একজন হয়ে; তাদের কাজকর্ম আশাআকাঙ্খার ভাগিদার হয়ে। চো লি-বাউ 'ঝড়' উপন্যাস লিখে খুব নাম করেছেন। শহরের আত্মীয়জন ছেড়ে দীর্ঘকাল অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে ছিলেন ঐ বই লেখার জন্য! আর একজন লেখক—শ্রীযুত রোবিও বলতে লাগলেন, বিস্তর দিন ইংলণ্ডে থেকে আমি শিক্ষা নিয়েছিলাম। কিন্তু আসল শিক্ষা পেলাম দেশঘরে চাষাভুষোর মধ্যে বসবাস করে। তাদের সঙ্গে জল তুলেছি, বীজ বুনেছি। জীবন বুঝতে হলে কাজকর্ম দেখাই শুধু নয়, তাদের অন্ধি-সন্ধিতে বিচরণ করতে হবে। নইলে চাষী তার জমির সম্পর্কে গোরুবাছুর সম্পর্কে চাষের যন্ত্রপাতি সম্পর্কে যা ভাবে, কখনো তা জীবন্ত হবে না তোমার বইয়ে। তারা যখন জানবে, নিতান্তই তুমি আপন লোক, তখনই তোমার কাছে মন খুলবে!

যেমন বড় চীনদেশ, ভাষাও তেমনি শতেক রকম। প্রতিটি ভাষা সম্পর্কে উৎসাহ দেওয়া হয়। কতকগুলো ভাষার অক্ষর পর্যন্ত নেই, নতুন করে তাদের অক্ষর বানানো হল। চীনা ছাড়া প্রধান ভাষা হল মঙ্গোলিয়ান, তিব্বতী এবং আর দু-তিনটি। চীনাটা সব অঞ্চলেই শিখতে হচ্ছে। তিনহাজার বছরের সুপ্রাচীন এই ভাষা বহু কোটিকে জাতীয়তার বাঁধনে একত্র বেঁধেছে।

আমার কয়েকজন বন্ধু আছেন—ঘরে থাকলে কি হবে, তামাম দুনিয়া নখ-দর্পণে নিয়ে বসে আছেন। বার বার তাঁরা বলেছিলেন, গিয়ে লাভটা কি? সাজানো-গোছানো কয়েকটা জিনিস দেখিয়ে দেবে বই তো নয়! কিন্তু এসে যে বিষম ফেরে পড়লাম! কিছুতে ছাড়ে না, নানান অজুহাতে আটকে আটকে রাখে। এদ্দিন ছিলে কনফারেন্সের তালে—থাকো আর দুটো-পাঁচটা দিন, নিশ্চিন্তে আলাপ-সালাপ করি। আমাদের পাড়াগাঁয়ের যেমন রেওয়াজ ছিল, ছেলেবয়সে দেখেছি। আত্মীয়-কুটুম্ব এলে তাকে ফিরে যেতে দেবে না—ছাতা সারছে, জুতো সারছে। সবজান্তা বন্ধুদের কথা সত্যি হলে তো কাজকর্ম

তড়িঘড়ি, ঢুকিয়ে দিয়ে 'আসতে আজ্ঞা হোক' নমস্কার জানাবে; খুঁত চোখে পড়বার আগে সরিয়ে দেবে তাড়াতাড়ি। সাঁইত্রিশটা দেশের পৌণে চারশ মানুষ—বেছে বেছে দুনিয়ার যত গবেট নিয়ে গেছে এটা হতে পারে না, দু-পাঁচজন বুদ্ধিওয়ালা লোকও থাকতে পারে। অথচ আটকে আটকে রাখছে—এটা কি রকম ব্যাপার বলুন দিকি?

যাই হোক, ছাড়া পেয়েছি অবশেষে। যাওয়ার হিড়িক পড়ে গেল। এ-দল যাচ্ছে, ও-দল যাচ্ছে। নিচের হলে মালের পাহাড়—গাড়িভর্তি সেগুলো রওনা হয়ে গেল তো আবার এসে জমছে। হোটেল ফাঁকা হয়ে গেছে, খানা-ঘরে ভিড় নেই।

গা ছড়িয়ে অনেক বেলা অবধি বিছানায় পড়ে আছি। কাজকর্ম নেই, কেউ ডেকে তুলবে না। তারপরে এক সময়ে উঠে যথা ইচ্ছে বেড়িয়ে বেড়াই। আমাদের ভারত দলের খানিকটা আজ সন্ধ্যায় আরও উত্তরে মুকডেন অঞ্চলে চললেন। আর ষোল জন আমরা কাল ভোরে সাংহাইয়ে উড়ব। ডক্টর কিচলুর চিকিৎসা-ব্যাপার আছে, তিনি ক'দিন পরে রেল চড়ে সোজা ক্যাণ্টনে গিয়ে হাজির হবেন।

স্টেশনে গেলাম সন্ধ্যাবেলা মুকডেন-যাত্রীদের বিদায় দিতে স্পেশ্যাল গাড়ি, ঘন সবুজ রং। অতি-সম্প্রতি বানিয়েছে এসব গাড়ি। দুটো করে শয্যা প্রতি কামরায়—উপরে আর নিচে; দামি পর্দা, বসবার চেয়ার-টেবিল। কম জায়গার মধ্যে আরামের সকল রকম আয়োজন। জাতীয় সৈন্যবাহিনী স্টেশনে ঢুকল বিদায় দিতে, একপাশে আলাদা হয়ে দাঁড়াল। আবীর দিচ্ছে—হোপিন ওয়ানশোয়ে, শান্তি দীর্ঘজীবী হোক! জনারণ্য। গলায় লাল রুমাল জড়ানো পায়োনিয়ার দল—কি মনোরম স্বাস্থ্য, কি হাসি! হাতে কুসুমগুচ্ছ। আমরা আবার ফিরে আসব, সেজন্য প্লাটফরমে ঢোকবার সময় নীল ব্যাজ পরিয়ে দিল। পিকিনের তা-বড় তা-বড় ব্যক্তিরা এসেছেন, তাঁদের বুকেও ঐ নীল ব্যাজ। আভিজাত্য নেই, পদ-প্রতিষ্ঠার অভিমানে আলাদা নন কেউ। সরল, উদার, অমায়িক। উল্লাস-চিৎকারে কান পাতা যায় না। আর কাওবিতিয়াং গাঁয়ে দেখেছিলাম, সেই ধরনের ঢোল-কত্তাল বাজাচ্ছে স্টেশনে। গভীর আলিঙ্গনে এ-ওকে বুকে চেপে ধরছে। কত ভালবাসা মানুষে মানুষে! দেখে দেখে তাজ্জব লাগে, চোখের কোণে জল এসে যায়।

ফিরবার সময় কি কাণ্ড! বাচ্চা ছেলেমেয়ে এক দল আটক করল। একটু-আধটু হাত-ঝাঁকুনি দিয়ে সরে পড়ব—তা আমার হাত চেপে ধরেছে তুলতুলে

হাতটুকুন দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আরও বিস্তর নানা দিক দিয়ে ঘিরে ফেলল। ভয়াবহ ব্যাপার, পুরোপুরি বন্দী। জড়িয়ে পড়েছে গায়ে গায়ে—নাচছে, নাচতে নাচতে এগিয়ে নিয়ে চলল। আমাকেও একটু-আধটু পা ফেলতে হয়। হাসবেন না, অমন নির্মল অমায়িকতার দাবড়ি খেলেন না তো কখনো—ঐ অবস্থায় পড়লে আপনারা পাগল হয়ে উদ্দাম নৃত্য নাচতেন। দপ করে হঠাৎ জোরালো আলো জ্বলে উঠল ঠিক সামনে। চোখ ধাঁধিয়ে যায়, কিছু আর দেখতে পাই নে। ঘর-ঘর আওয়াজ—এই রে, মোভি-ক্যামেরায় ছবি তুলে নিল। দোভাষি এগিয়ে এলেন করুণাপরবশ হয়ে। ছেলেমেয়েরা শুধালো—আকারে-ইঙ্গিতে বুঝতে পারলাম—কোন দেশের এই ব্যক্তি? হিন্দী? আমি ভারত থেকে এসেছি, পরিচয়টা নিল নর্তন-কুর্দন শান্ত হয়ে যাবার পর। ভারত হোক কিংবা মেক্সিকো-আবিসিনিয়াই হোক, ওদের কাছে একই কথা। অচেনা বলে ভয়ডর নেই, মানুষ হলেই হল। হামেশাই যেন মোলাকাত হয়ে থাকে আমাদের সঙ্গে, ভাবখানা এই প্রকার। বাচ্ছাদের ওরা এমনি আন্তর্জাতিকতার শিক্ষা দিচ্ছে।

পিছন দিক থেকে কাঁধের উপর এক ভারী হাত এসে পড়ল। মি ল্যান-ফাং যে! উনিও স্টেশনে এসেছিলেন বিদায় দিতে। ভারিক্কি উভয়েই আমরা—কিন্তু ছোকরাদের মতন কেমন গলাগলি হয়ে ফিরছি। দোভাষিকে দেখা যাচ্ছে না, দরকার নেই—মুখের কথার গরজটা কি? মিটিমিটি হাসছি এ-ওর দিকে তাকিয়ে।

(১৬)

একুশে অক্টোবর ভোরবেলা মুখ গোমড়া করে ঘরে বসে আছি। পিকিন ছাড়ব অনতিপরেই, সাতটা নাগাদ এসে ডাকবে। এখানে যেন ঘরবাড়ি হয়ে গেছে, আপন জন এরা সকলে। মন বিগড়াবার আরও কারণ, হোটেলের কাউকে কিছু দিতে পারব না। কড়া নিষেধ। লোকগুলোও এমন হয়েছে, বকশিশ হাতে দিলে বেজার হয়।

বিদায়বেলা তাই ওদের হাত জড়িয়ে ধরছি, কোলের মধ্যে টেনে নিচ্ছি। বাইরের কত জনেও দাঁড়িয়ে পড়ে আমাদের এই বিদায়যাত্রা দেখছে। তাদেরও চোখ ছলছল করে বুঝি! দোভাষি অনেকে চলল এরোড্রোম অবধি। দোভাষি বলে পরিচয় হল না, আমাদের পরমতম বন্ধু। সেই যে বলে, কুক

পেতে দেবো, পায়ে কুশাঙ্কুর না বেঁধে—সত্যি সত্যি তাই যেন পারে ওরা। শুধুই কাজের সম্বন্ধ হলে প্রাণের এত কাছে আসত না।

শহর ছাড়িয়ে এলাম। আর আসব না হয়তো জীবনে, আর ওদের দেখতে পাব না। সকল মানুষ—রাস্তার অজানা মানুষটা অবধি কত ভালো, কত ভদ্র! ইয়ং বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। বললাম, সত্যি ভাই, বড্ড খারাপ লাগছে।

ইয়ং বলে, আমাদেরও। তবু বলি, সোয়াস্তিও পাচ্ছি মনে মনে। অহোরাত্রি এত দিন ভয়ে ভয়ে ছিলাম, পাছে তোমাদের কোনরকম কষ্ট হয়। যাবো তোমাদের দেশে—যদি কখনো যোগাযোগ ঘটে। ভারত চোখে দেখবার জন্য বড্ড লোভ।

এত ছেলে-মেয়ে এরোড্রোম চলেছে, সুইং কোথায়? সকাল থেকে তাকে দেখতে পাইনি। মালপত্র ও মানুষগুলো ওজন হওয়ার পরে এক মুশকিল। এত বোঝা প্লেন বইতে পারবে না। কমাও সাড়ে চার-শ কিলোগ্রাম। চড়ন্দার আমরা ষোল জন; আর ভারী মাল সবই প্রায় ট্রেনে চলে গেছে। তবু এই! দোষ বাপু তোমাদেরই। দু-হাতে উপহার দিয়েছ—আর এমন খাওয়ান খাইয়েছ মানুষগুলোও ওজনে দেড়া দুনো হয়ে গেছে।

কি করা যায়! মানুষে ছাট-কাট চলে না, জিনিসপত্র কি ফেলে যাওয়া যায়, দেখ। নীলিমা দেবী স্যুটকেশ খুলে নিতান্ত দরকারি কাপড়-চোপড় কিছু বোঁচকায় বেঁধে নিলেন। দেখাদেখি আরও অনেকে বোঁচকা বাঁধলেন: খাঁটি ভারতীয় কায়দায় বোঁচকা। বাড়তি জিনিস ট্রেনে চলে যাবে সাংহাই।

এই সব হচ্ছে—একটা বাস এসে পড়ল। হাতে ফুলের তোড়া—কলধ্বনি করে গুটি দশেক পায়োনিয়র ছেলেমেয়ে নামল। বিশিষ্ট বর্ষীয়ান আরও এক দল এসেছেন—অত সকালে হোটেলে এসে পৌঁছতে পারেননি, সোজা এরোড্রোমে এলেন। সকলের পিছনে—কে বট হে তুমি? সুই-ইঞা-মিঁ ধীরে-সুস্থে নামল। চশমা খুলে কাচটা ভাল করে মুছে আবার চোখে পরে। ভারি শান্ত।

আধ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে মাল চালাচালির দরুন। প্লেন ছাড়বে এবং সিঁড়ি লাগিয়েছে, প্রপেলার ঘুরছে। পায়োনিয়রদের দেওয়া ফুলের তোড়ার আঘ্রাণ নিচ্ছি। ফুলেরই নয় শুধু—কচি কচি সোনার হাতে ফুল তুলে দিয়েছিল, আঘ্রাণ সেগুলিরও। ভিড়ের সর্বশেষ প্রান্তে সুইং—নিকেলের গোল চশমার ফাঁকে ফাঁকে নিঃশব্দে চেয়ে রয়েছে।

স্থইং, লক্ষ্মী বোনটি, আসি এবারে? চলে যাবার সময় আমাদের ভারতে 'যাই' বলে না, বলতে হয় 'আসি'—

জবাবে স্থইং ভারতীয় রীতির একটি নমস্কার করল। কৌতুকি ঝগড়াটে দামাল মেয়েটা ভালমন্দ একটি কথা উচ্চারণ করল না। যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে শান্ত গভীর দৃষ্টিতে দেখতে লাগল শুধু। তার ছবি আজও চোখের উপর দেখতে পাই। নিকেলের গোল চশমা-পরা গম্ভীর ম্লান একটি মুখ।

প্লেন আকাশে উঠল, কত স্নেহ-ভালবাসা ফেলে এলাম ঐ মাঠের প্রান্তে। বিদায় বন্ধু বিদায়! আর কি কখনো দেখতে পাবো তোমাদের? পর্বত সমুদ্র ও হাজার হাজার মাইল ভূমির ব্যবধানে আবার আমরা তফাত হয়ে গেলাম!

কাচের জানালা দিয়ে দৃষ্টি আমার মাটির দিকে তাকিয়ে আকুলি-বিকুলি করছে। মানুষ এমন ভালো! তুমি একটুও জানো না, দুনিয়া-ভরা কত আত্মীয়তা তোমার জন্য! আমার ভাগ্যদেবতাকে আমি বার বার প্রণাম করি। ভুবনের কত রূপ দেখে গেলাম, ভুবনের দেশে দেশে পরমাশ্চর্য সুন্দর মানুষ!

এক পাক দিয়ে গ্রীষ্মপ্রাসাদ। বিশাল লেক, জলের উপর ঘর, মাটি কেটে পাহাড় উঁচু-করা, পাহাড়ের উপরের হর্ম্যমালা—ঐ যে গ্রীষ্মপ্রাসাদ, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। আর এক দিন বিমুগ্ধ সম্ভ্রমে কক্ষ-অলিন্দে-চত্বরে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম, আজকে চাঁদ-তারাদের মতন আকাশ থেকে উঁকি দিয়ে দেখছি। দেখে হাসি পায়। শ্বেতবরন জয়স্তম্ভ—কোন এক মহারাজা রাজদন্ত পাথরে গেঁথে পাকা করে গেছেন। স্তম্ভটা তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে হচ্ছে এই উপর থেকে। মহারাজ ভেবেছিলেন কি বিশাল কীর্তিই না স্থাপন করে যাচ্ছি! তখন যে মানুষের উড়বার পাখা হয়নি। আকাশ থেকে তাকিয়ে দেখলে নিজেরই তাঁর লজ্জা করত।

দিনটা ভালো নয়, জোর বাতাস বইছে। কাল সর্বক্ষণ টিপটিপ বৃষ্টি হয়েছে, আজকেও সূর্য মুখ দেখালেন না এখন অবধি। নগর-গ্রাম চৌবন্দি ক্ষেত-খামার এবং কারখানার খোপ-কাটা ছাত দেখতে দেখতে—হঠাৎ এক সময় ডুবে গেলাম মেঘ ও কুয়াশা-সমুদ্রের মাঝখানে।

স্বদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে দিকচিহ্নহীন আকাশে উল্কা-গতিতে ছুটছি। বিচিত্র অনুভূতি। ধরণীর সঙ্গে কোন বন্ধন নেই। কান দুটো আচ্ছা করে তুলো এঁটে বধির করে দিয়েছি। কর্মহীন চক্ষু দুটো অলস-

ভাবে কামরাটুকুর মধ্যে ঘোরা-ফেরা করছে ; এদিকে-ওদিকে লেখা কয়েকটা পড়ব—তা-ও চীনা হিজিবিজি। তাজ্জব ভাষাপ্রীতি এদের। সেদিনকার সেই যে লেখক-শিল্পী সমাবেশ, তাতে এক কাণ্ড হল। সেই কথা মনে পড়েছে! মাও-তুন বক্তৃতা করছেন—দোভাষি মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি করে যাচ্ছে। লাগসই কথা বলতে পারছে না, মাও-তুন শুধরে দিলেন তাকে দু-তিন বার। অথচ নিজে কিছুতে ইংরেজি বলবেন না—ইজ্জতহানি হয়।

তাক বুঝে হোস্টেস বসবার আসনটা নিচু করে দিল। বাঙ্ক থেকে কম্বল নামিয়ে গায়ে চড়াবার উদ্যোগ করছিল, হাত নেড়ে নিষেধ করলাম। তাকিয়ে দেখি ইতিমধ্যে কামরার বাকি প্রাণীগুলি কম্বলের তলে চোখ বুজেছেন। জাগরণ আর ঘুমে যেখানে কোন তফাত নেই, মিছে কষ্ট করে চোখ মেলে থাকে বোকারাই।

বেলা দুটোয় প্লেন ভুঁয়ে নামল। সাংহাই। প্লেনের ভিতরে সবাই পথ করে দিলেন, আমি আগে নামব! নেমে ক্যামেরার আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাচ্চার হাতের ফুলের মালা নেবো সর্বাগ্রে। ওঁরা সঙ্গে থাকবেন। দলনেতা কিচলু বরাবর এই ঝক্কি কুলিয়ে এসেছেন। তিনি পিকিনে। তখন বুঝিনি, ষড়যন্ত্র আছে এর পিছনে।

সারবন্দি মোটরকার—বড়লোকের বিয়ের শোভাযাত্রার মতো রাস্তা কাঁপিয়ে শহরতলী ছাড়িয়ে আমরা চললাম। অবশেষে আসল-শহর। পরিচ্ছন্ন, আধুনিক। পিচ-দেওয়া ঝকমকে চওড়া রাস্তা। পনের তলা, বিশ তলা, তিরিশ তলা ঘরবাড়ি। নগর-পরিকল্পনা পশ্চিমি মগজের। অনেক বছর ধরে মনের মতো করে গড়েছিল ; আজকে তাদের দেশেঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে। পরের জায়গায় ফোপরদালালি আর নয়। সাদা মানুষ তবু অবশ্য দশ-বিশটার দেখা মেলে—পিকিনের চেয়ে অনেক বেশি। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে তারা পথ চলে —ভূত হয়ে চলেছে যেন। ভূতই বটে, সকল প্রতাপ অস্তমিত। কেউ আর সম্ভ্রম করে না, প্রাণ-ধারণের গ্লানি পদে পদে। বরাবর যাদের কুকুর-বিড়াল ভেবে এসেছে, তারাই মাতব্বর। নিতান্তই পেটের দায়ে, যে ক'টা দিন পারা যায়, চোখ-কান বুজে পড়ে আছে।

আকাশ-ছোঁয়া অট্টালিকার সামনে গাড়ি একে একে এসে থামতে লাগল। ক্যাথে হোটেল আগেকার নাম, এখন কিংকং হোটেল। সিঁড়ি নেই, হলের এদিক-ওদিক চারটে লিফট অবিরত ওঠা-নামা করছে। আচ্ছা মশায়, বিদ্যুৎ-

সরবরাহ বানচাল হয়ে লিফট যদি অচল হয়, তখনকার উপায়? এত বড় বাড়ির একটা সিঁড়ি হয়নি কেন?

সে যে প্রায় স্বর্গের সিঁড়ি হয়ে দাঁড়াত! সিঁড়ি ভেঙে উঠবে কোন জন? হোটেলের নিজস্ব বিদ্যুৎ-তৈরির ব্যবস্থা আছে। শহরের বিদ্যুৎ বন্ধ হল তো বয়ে গেল—তক্ষুনি নিজেদের কল চালু করে দেবো।

এগারো তলায় নিয়ে তুলল। ঐখানে স্থিতি। খেতে হবে একতলা নেমে গিয়ে—দশ তলায়। লাউঞ্জে বসে কাপ দুই সবুজ চা খেয়ে চাঙ্গা হলাম। সে বস্তু খান নি বোধ হয় আপনারা—দুধ-চিনি ঠেকালেই বিস্বাদ হয়ে যাবে, গন্ধটুকু থাকবে না।

ঘরে ঢুকে জানালায় দাঁড়ালাম। শহর কত নিচে, মানুষগুলি গুড়িগুড়ি কলের পুতুলের মতন। আমরা আছি রীতিমত উঁচু মেজাজে। আকাশে উড়ে এসে যেখানটায় বাসা দিল, সে-ও আধেক আকাশ। মস্ত বড় ঘর—তার মধ্যে যথারীতি আমি এবং ক্ষিতীশ।

(১৭)

দরজায় ঠকঠকি। আলনার কোটটা গায়ে চাপিয়ে এক মুহূর্তে ভদ্রলোক হয়ে বসি।

আসুন—

আসছেন তো আসছেনই। দলে যত আছেন সকলেই। অত জনের বসবার জায়গা কোথায় দিই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চলল।

কিচলু তো আসেন নি। নেতা বিহনে কি করে চলে! নেতা ঠিক করতে হবে একজনকে!

বেশ, হোক তবে তাই—

তৎক্ষণাৎ নেতার নাম প্রস্তাব, সমর্থন এবং সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনান্তর। ঝটপট সকলে বেরিয়ে গেলেন। বিচারক যেমন রায় দিয়ে কামরায় ঢুকে যান—তাকিয়ে দেখেন না, হতভাগ্য আসামির অবস্থাটা কি দাঁড়াল। আধ মিনিটে শেষ। আমার একটা কথা শোনাবারও ফুরসত হল না। দলবল সাজিয়ে তৈরী হয়ে ঘরে ঢুকেছেন, আগে তা কেমন করে বুঝব?

তা যেন হল। কিন্তু নেতা হওয়ার ধকল যে বিস্তর! যেখানে পা ফেলবেন, আদ্য কিংবা অন্ত্য ভাগে সভা একটু হবে। নেতা মশায়ের সেই সময় জবান ছাড়তে হবে। ভারতীয় মানুষ—বাক্যের ব্যাপারে অবশ্য নিতান্ত

অপারগ নই। আর একটা আছে—অতিথির সম্মাননায় পয়লা মওকায় বিরাট ভোজ। অধিকন্তু ন দোষায় হিসাবে আবার বিদায়ভোজেরও আয়োজন থাকে অনেক জায়গায়। এবম্বিধ ভোজসভায় ইতিপূর্বে একটেরে বসে আত্মরক্ষা করেছি। নজর ফাঁকি দিয়ে পাঁচ বছরের বাসি-ডিম এবং ঐ জাতীয় বাছাই পদগুলি বেমালুম ডিশের তলায় চালান করেছি। কিন্তু নেতাকে বসতে হবে কেন্দ্রস্থলের বড় টেবিলে—ও তরফের বাছা বাছা মাতব্বরের সঙ্গে। কি খাচ্ছেন না খাচ্ছেন, ঘূর্ণ্যমান বহু-তারকা সেদিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে। এমনিতরো শতেক বিপদ নেতার।

ফাঁসির হুকুমে আপিল চলে। সেক্রেটারি জেনারেল রমেশচন্দ্রের কাছে অতএব ধর্না দিয়ে পড়লাম! কিন্তু পাষাণ অধিক মাত্রায় গলালো গেল না! শেষ পর্যন্ত রফা হল—নেতা আমিই; বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর দিল্লীর যজ্ঞদত্ত শর্মা আমায় মন্ত্রণাদান করবেন।

ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার অতিথির খাতিরে রাত্রিবেলা নাচ-অপেরায় দরাজ আয়োজন। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় ভোজের হাঙ্গামা। ইতিমধ্যে ঘুরে ঘুরে শহরের যেটুকু দেখা যায়।

গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। থামবার নয়—চলছে তো চলছেই। নতুন দোভাষি আমার গাড়িতে যাচ্ছে, মেয়েটির নাম তুন-সু-সে (Tung Shu-Tse)। অধ্যাপনার কাজে ঢুকেছে সম্প্রতি। ভাল মেয়ে, খাসা ইংরেজি বলে—নয়তো একফোঁটা মানুষটাকে অধ্যাপক করে! কিন্তু বৃষ্টিজলে পণ্ড করে দিল সমস্ত। নামতে পারছি না, গাড়ির খোলে বসে বসে কি জায়গা দেখা হয়? দেবরাজ, ক্ষমা দাও—কম সময়ে কত কি দেখবার! আমরা চলে গেলে যত খুশি তুমি জল ঢেলো।

চীনের সব চেয়ে বড় শহর সাংহাই। বাঁধানো রাস্তা দিয়ে চলেছি তরঙ্গিণী হোয়াং-পুর কিনারা ধরে। সমুদ্র বেশি দূরে নয়। মস্ত বড় বন্দর। নানকিনের সন্ধির মহিমায় যে সব জায়গা বিদেশির করায়ত্ত হয়েছিল, তার মধ্য সকলের সেরা। ক-বছর আগেও বিদেশি মানোয়ারি জাহাজ ঐ জলের উপরে ঘুরে ঘুরে বিদেশি স্বার্থ পাহারা দিত; চীনের মানুষজনকে উপোসি রেখে সমুদ্র-পারে খাদ্য পাচার করত। পরগাছারা বিদেয় হয়েছে। জাহাজঘাটায় আই ভিড় নেই—নিজেদের যে দু-পাঁচটা জাহাজ, তারাই গতর ছড়িয়ে আছে। ঐ যে সব বড় বড় বাড়ি—এমনধারা নিরামিষ ছিল কি আগে? হোটেল-

রেস্তোঁরা, পতিতালয়—সারা রাত আমোদ-ফুর্তি হৈ-হল্লা! সারা দুনিয়ার মানুষ, আসত আমোদ লুঠতে—সাংহাইর নাম দিয়েছিল 'পুব অঞ্চলের প্যারি'। বিদেশিদের জন্য আলাদা এক পাড়া—ফ্রেঞ্চ টাউন। নামেই মালুম—মানে বোঝাবার প্রয়োজন নেই! ফ্রেঞ্চ টাউনের বড় বড় বাড়ির ছায়ান্ধকার ভাঙা চোরা বস্তির মধ্যে কীটের মতন জীর্ণ-শীর্ণ চীনা ভিক্ষুকের দল। নদীর এধারে-ওধারে ফ্যাক্টরিগুলোর মালিক সমস্তই বিদেশি। আটটার ভোঁ বাজলে কোথা থেকে মজদুরের দল কিলবিল করে আসত, ফ্যাক্টরি বন্ধ হলে আবার নিজ নিজ গর্তে ঢুকে পড়ত তারা।

এখন ভিন্ন এক জায়গা। ভিখারি নেই, পতিতা নেই। ফূর্তি আর মাতলামির জায়গা হোটেল-রেস্তোঁরার বাড়িগুলোয় রকমারি জন-প্রতিষ্ঠান হয়েছে। স্বাস্থ্য ও সুরুচির উল্লাস সর্বত্র। কুয়োমিনটাং সৈন্যরা বোমা মেরে মেরে শহরের বুকে অগণ্য বিষাক্ত ঘায়ের সৃষ্টি করেছিল, বেমালুম এরা আরোগ্য করে ফেলেছে!

ভিক্ষা আর পতিতাবৃত্তি নির্মূল হল—গল্পটা বলতে হবে নাকি? ঝটপট এখন বই শেষ করতে চাই, কত আর গল্প শোনাবো? তুন মেয়েটা দেমাক করছিল—আদিম কাল-থেকে-আসা এত পুরানো ব্যাধি ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে আমরা নিরাময় করে ফেললাম। পতিতালয়ে আগের সন্ধ্যায় মধুপায়ীরা ভিড় জমিয়েছিল, পরের সন্ধ্যায় এসে দেখে ভোঁ-ভোঁ। নির্জন ঘরবাড়ি—একটি হতভাগিনী নেই কোন জানলার ধারে। একটা-দুটো বাড়ি নয়, গোটা শহরই পতিতাশূন্য। তাই বা কেন—পতিতা নেই মহাচীনের এ প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত কোন জায়গায়।

মুষ্টিমেয় কয়েক জনকে নিয়ে গভর্নমেণ্ট নয় ওখানে—রাজশক্তি দেশের সর্বমানুষের মধ্যে ছড়ানো বিভিন্ন ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে। নতুন আইন হবার আগে দেশময় জানান দেওয়া হয়। মীটিং করে, ভালমন্দ বিচার-বিবেচনা করে, প্রস্তাব পাশ করে বিভিন্ন ইউনিয়ন। মাসের পর মাস ধরে চলে এই সমস্ত। তারপরে আইনটা পাশ হতে লাগে দশ-বিশ মিনিট মাত্র; বক্তৃতাদি আগেভাগে চুকিয়ে রাখা হয় আইন-সভায় নয়—শহর-গ্রামের গণমানুষের মধ্যে। দেহ বিক্রি করা অথবা অর্থমূল্যে দেহ কেনা বে-আইনি—আইনটা পাশ হল ধরুন বেলা দুটোর সময় পিকিন শহরে। তিনটে নাগাত দেখা গেল শহরের পতিতালয়গুলোয় সরকারি লোক হানা দিয়েছে—হাতে এক এক কর্দ। তুমি শ্রীমতী অমুক বুড়ো অশক্ত হয়েছ—বেখরচায় সরকারি আশ্রমে গিয়ে ওঠো।

তুমি চলে যাও অমুক জায়গায় ন্যার্সিং শিখতে, তুমি অমুক ফ্যাক্টরিতে। তোমার অসুখ আছে—অমুক হাসপাতালে চলে যাও। এ বাচ্চাটি অমুক ইস্কুলের বোর্ডিং-এ যাবে; এটি অমুক নার্সারি-হোমে। এই যে হল, এটা পিকিন বা অমনি একটা-দুটো জায়গায় নয়—খবর নিয়ে দেখুন, দেশের সর্বত্র। আগে থেকে বিভিন্ন সমিতির মারফত তালিকা বানিয়ে বিলি-ব্যবস্থা করে রেখেছে; শুধু আইন করেই দায় খালাস নয়। ভিখারি সম্পর্কেও এমনি ব্যাপার। দেশের মধ্যে অপচয় বন্ধ—সেটা জিনিসপত্র জীবজন্তু এবং বিশেষ করে মানুষের সম্পর্কেই। সেদিনের সামাজিক আবর্জনারা আজকে তাই হীরা-মানিক কোহিনূর হয়ে উঠেছে। বিয়েথাওয়া করে সংসারধর্ম করছে অনেক মেয়ে। নার্স হয়েছে, রেলের গার্ড-ড্রাইভার হয়েছে। কয়েকটি স্বচক্ষে দেখলাম আমরা। আর দশটার মতন সমাজের সম্মানিতা মেয়ে—স্বাস্থ্যে ও আনন্দে ঝলমল।

অপেরায় তিনটে পালা একের পর এক। রাত কাবার করে ছাড়বে! নাচ আর গান, গান আর নাচ। সে আর দেখাই কেমন করে আপনাদের—দু-কথায় গল্প তিনটে বলে দিই। পয়লা পালা পৌরাণিক—'সিচাউ শহরের গল্প'। সিচাউর কাছে রামধনু-সাঁকোর নিচে জলকন্যা থাকে। নগরপালের ছেলে সি টিং-ক্যাংকে জলকন্যা ভালবেসে ফেলল; মায়া করে তাকে জলতলের প্রাসাদে নিয়ে এলো বিয়েথাওয়ার জন্য। সি'র কিন্তু কনে পছন্দ নয়। বিয়ের ভোজের মধ্যে সে জলকন্যাকে মদ খাইয়ে অজ্ঞান করে, তার কণ্ঠ থেকে মায়ামুক্তা নিয়ে জলতল থেকে পালিয়ে উপরে উঠে গেল। জলকন্যা ক্ষেপে গেল প্রতারিত হয়ে; বন্যায় শহর ভাসিয়ে দিল। লোকের দুঃখের অবধি নেই। জলকন্যার উপরওয়ালা দেব-রাজপুত্র। জলকন্যার কাণ্ড দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি দেবসৈন্য পাঠালেন তাকে দমনের জন্য। নদীর নীচে বিষম লড়াই। জলকন্যা হেরে গেল অবশেষে।

পরেরটা ঐতিহাসিক পালা—'প্রিয়তমার সঙ্গে রাজার বিচ্ছেদ'। খ্রীষ্টপূর্ব ২০৭ অব্দের ব্যাপার। অত্যাচারী চিন সি-ওয়াঙের বিরুদ্ধে লড়াই করছে লিউ পোঙের নেতৃত্বে চাষীর দল, এবং সিয়াং উ। লড়াই জিতে সিয়াং উ হল রাজচক্রবর্তী আর লিউ পোং হল হানের রাজা! তার পরে বেধে গেল সিয়াং উ আর লিউ পোঙের মধ্যে। সিয়াঙের মন বড় খারাপ—লড়াই সুবিধা করা যাচ্ছে না। সিয়াঙের উপপত্নী উ চি অসি-নৃত্য করল সিয়াংকে খুশি করবার জন্যে। উন্মাদক নৃত্যে নবোৎসাহে মেতে উঠল সিয়াং; সিয়াং সি নদীর পূর্ব-

পারে সে নতুন করে ব্যূহ রচনা করল। করল বটে, কিন্তু মন যায় না রূপসী প্রিয়া উ চি'কে ছেড়ে যেতে। উ চি অবশেষে আত্মহত্যা করে পথ নিষ্কণ্টক করে দিল। বিরহব্যাকুল সিয়াং হেরে গেল লড়াইতে ; আত্মহত্যা করে সে-ও প্রিয়তমার পথ নিল। লিউ পোং সর্বময় হয়ে হান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করল —দেশব্যাপ্ত চাষী-বিদ্রোহের ফল আত্মসাৎ করল একা একটি লোক।

শেষ পালাটা পরী-কাহিনী—'মায়াপদ্মের লণ্ঠন'। উত্তর-চীনে আকাশ জুড়ে অপরূপ হ-সান পর্বত। এই পর্বত নিয়ে যুগে যুগে বিস্তর পরী-কাহিনী চলেছে। এর ল্যাং-সেং দেব-রাজপুত্র। ছোট বোন দেবীকে নিয়ে সে পর্বতের উঁচু চূড়ায় থাকত। হ-সান পর্বতের সর্বোত্তম ঐশ্বর্য হল মায়াপদ্মের লণ্ঠন। পরী-জগতের কর্তা হবার জন্য এর এই লণ্ঠন চুরি করল, লোহাদৈত্যকে পর্বত চাপা দিল, নিজের বোন দেবীকে রাখল অত্যন্ত কঠোর শাসনে।

লিউ ইয়েন-চ্যাং কবি ; অফিসের পরীক্ষায় ফেল হয়ে মনমরা ভাবে বাড়ি ফিরছে। হ-সান পার হবার সময় পশ্চিম-চূড়ার মন্দিরে সে রাত কাটাচ্ছে। সেই মন্দিরে দেব-রাজপুত্র ও দেবীর মূর্তি। দেবীর রূপ দেখে পাগল হয়ে কবি দেয়ালে তার নামে এক কবিতা লিখল। জ্যোৎস্না রাত। লিউ ঘুমিয়ে পড়েছে—দেবী তখন মন্দিরে এলো। পড়ল দেয়ালের কবিতা।

সকালবেলা বড় কুয়াশা। তারই মধ্যে লিউ মন্দির ছেড়ে বেরুল। দেব-রাজপুত্রের এক ভয়ানক কুকুর—সে তাড়া করেছে লিউকে। দেবী আর তার সহচারী লিন চি দেখতে পেলো লিউর অবস্থা। হ-সানের চূড়ায় গিয়ে জোর করে তারা মায়াপদ্মের লণ্ঠন নিল লিউকে বাঁচাবার জন্য। লিউশের সঙ্গে দেবীর বিয়ে হল ; লোহা-দৈত্যও মুক্তি পেলো। স্বামী নিয়ে দেবী মহাসুখে থাকে। এদিকে দেব-রাজপুত্র কুকুরের কাছে সমস্ত শুনে বিষম খাপ্পা। কুকুর মায়া-লণ্ঠন চুরি করে নিল। দেবী তখন লিউকে দেশে পাঠিয়ে দিল, নয়তো ভাইয়ের আক্রোশ থেকে তাকে বাঁচানো অসম্ভব। দেবীর এক ছেলে হল—চেং সিয়াং। এর বাচ্চাটাকে মেরে ফেলেছিল, লিন চি অনেক কৌশলে বাঁচাল। তখন দেবীকেই পর্বতের নিচে আটকে রাখল এর। লিন-চি লিউর কাছে সমস্ত খবর দিল। কিন্তু কি করতে পারে শক্তিহীন নিঃসহায় লিউ!

পনের বছর কেটেছে, চেং সিয়াং বড় হয়েছে। সবাই তাকে ডাইনির ছেলে বলে। লিউ একদিন ছেলেকে সব বলল। রাত্রে চেং কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ল মায়ের উদ্ধারের জন্য। অসংখ্য বাধাবিপত্তি। শেষটা লোহাদৈত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ। চেঙের মায়ের উদ্ধারের জন্য দৈত্য সকল

সাহায্য করবে। দেব-রাজপুত্রকে কিছুতে খুঁজে পায় না। মন্দিরে তার যে মূর্তি ছিল, চেং এক কোপে সেই মূর্তির গলা কেটে ফেলল। এর আর কুকুর বেরিয়ে এলো সেই মুহূর্তে। কুকুরকে মেরে ফেলল, এরকে লড়াইয়ে হারিয়ে দিল। পাহাড় কেটে দু-ভাগ করে মায়ের উদ্ধার করল চেং সিয়াং।

(১৮)

অপেরা থেকে ফিরেছি গভীর রাত্রে, কথাবার্তার তখন সময় ছিল না। পরদিন ব্রেকফাস্টের আগেই রমেশচন্দ্র তুন ও আর কয়েকটিকে নিয়ে ঘরে এলেন। নেতা তুাম—চটপট এখানকার প্রোগ্রাম বানিয়ে ফেল। দেশে ফিরবার জন্য ব্যস্ত সকলে। পরের ভাত খেয়ে গতর বাগানো যাচ্ছে বটে—তা-হলেও দেশে কাজকর্ম রয়েছে। তারও বড় কথা, লজ্জা-শরম আছে তো কিঞ্চিৎ—কত দিন আর থাকা যায় পরের কাঁধে চেপে? সময় কম, দেখবার জিনিস বিস্তর। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটবার প্রোগ্রাম বানাও দিকি একটা!

চার জায়গায় আজকে—কর্মিদের সংস্কৃতি-ভবন, সান ইয়াৎ-সেনের বাড়ি, একটা কর্মিকপল্লী আর কাপড়-চোপড় ছাপানোর সরকারি ফ্যাক্টরি। আর এক ব্যাপার আছে—কাল বহু লক্ষ লোকের বিরাট সভা। পিকিনের পাট চুকিয়ে বিস্তর প্রতিনিধি সাংহাইয়ে জমেছেন। শান্তি-সম্মেলন থেকে ফিরে এলে—এখানকার মানুষও শান্তির কথা শুনতে চায়। পিকিনের মতো সাঁইত্রিশটা দেশের মানুষ নেই, তবু যে দেশগুলো হাজির আছে সকলের তরফ থেকে বলা হবে কিছু কিছু। ভারতের দু-জন বলবেন। দলনেতা হিসাবে আমার রেহাই নেই—অপর কে বলবেন, ঠিকঠাক করে ফেল।

জওহরলালের দেশের মানুষ—মুখ চুলকানো ব্যাধি অনেকেরই। তাই ঠিক করেছি, বক্তৃতা আর একজন-দুজনের একচেটিয়া কারবার থাকবে না, যত জনকে পারি, সুযোগ দেবো। সুযোগ পেয়েও না যদি বলেন, তখন আমায় দোষ রইল না।

পশুপতি বেঙ্কট রাঘবিয়া পার্লামেণ্টের সদস্য—তাঁকে বললাম বক্তৃতা তৈরি করবার জন্য। রাতের মধ্যে আমায় দেবেন; দুই বক্তৃতা সকালবেলা ওদের কাছে দেবো চীনা তর্জমার জন্য। আমরা তো ইংরেজিতে বলব, সঙ্গে সঙ্গে চীনায় না বলে দিলে সাধারণে কেউ বুঝবে না।

কর্মিকদের সংস্কৃতি-ভবন। মস্ত বড় বাড়ি—নতুন রংচং এবং একটু-আধটু রদবদল হয়ে আরও ঝকমকে হয়েছে। কুয়োমিনটাং আমলে হোটেল ছিল

—'প্রাচ্য হোটেল'। সেই সব হোটেলের একটি, যার নামে স্ফীতবাজ বিদেশির মুখে লালা ঝরতো। ১৯৫০ অব্দের ১লা অক্টোবর সংস্কৃতি-ভবন রূপে বাড়ির দরজা খুলে দেওয়া হল কর্মিক সাধারণের জন্য। রোজ তখন হাজার পাঁচেক লোক আসত, এখন আসে কমসে কম দশ হাজার।

নানান বিভাগ—একটা হল, শিক্ষা ও প্রচার বিভাগ। সাহিত্য, রাজনীতি ও কারু-শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতা হয় সপ্তাহে অন্ততপক্ষে একবার। দেশের ইন্দ্রচন্দ্রেরা এসে বক্তৃতা দিয়ে যান এখানে। লাইব্রেরি আছে—আটাত্তর হাজার বই। শ-দুয়েক বই রোজ বাড়ি নিয়ে যায় পড়তে ; হাজার তিনেক লোক পাঠাগারে বসে পড়ে। পাঠাগার অনেকগুলো—ঘুরে ঘুরে দেখছি। বই-কাগজ টেবিলে সাজানো সুস্বাদু খাদ্যের মতো—লোকগুলো অন্য মনে গোগ্রাসে গিলছে। যারা বেশি এগিয়েছে, তাদের পাঠাগার স্বতন্ত্র ; বেশি ছিমছাম—নিস্তব্ধতা সেখানে বেশি। বাড়িটার তেতলায় বইয়ের দোকান। পড়ে পড়ে কর্মিকদের নেশা ধরে গেছে, নিজস্ব বই না হলে তৃপ্তি হয় না। দৈনিক হাজার বই বিক্রি—ওদের জন্যে বিশেষ সস্তা সংস্করণ।

এরই মধ্যে একবার এক প্রশস্ত হলঘরে টেনে নিয়ে লম্বা টেবিলের এধারে-ওধারে চাপিয়ে বসিয়ে দিল। (এবং টেবিলের উপর—উঁহু, কতকগুলো প্লেটকাপ, তাতে কোন কিছু ছিল কিনা মনে পড়ছে না।) সেক্রেটারি মশায় আমাদের সংবর্ধনা জানালেন, আমাকেও পাল্টা জবাব দিতে হল তার। এই এক প্রতিযোগিতা—কে কার সম্বন্ধে কত ভাল কথা বলতে পারে!

অনেকগুলো ঘর নিয়ে রকমারি জিনিসের একজিবিশন। যেখানে যাই, একজিবিশন আছেই। মানুষকে শেখাবার এমন কৌশল আর নেই। যন্ত্রপাতির দিক দিয়ে বিস্তর এগিয়েছে এরা—ট্রলিবাস বানাচ্ছে নিজেরা, বয়লারের বিস্তর উন্নতি করেছে। নানা ধরনের বৈদ্যুতিক কলকব্জা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাবের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র। সহজে ও সস্তায় বাড়ি তৈয়ারির নানা কায়দা বের করেছে নিতান্ত এক সাধারণ মিস্ত্রি—মেজে পালিশ করা, মশলা মাখা ও গাঁথনির নানা পদ্ধতি। এমনিতরো অনেক আবিষ্কারেরই গৌরব হাতে-কলমে কাজ-করা ওস্তাদ কর্মিকদের, বই-পড়া ধুরন্ধর বৈজ্ঞানিকের কাছে। কাজ করতে করতে মাথায় এসে গেছে নতুন ভালো কায়দা। এক মেয়ে-কর্মিক আবিষ্কার করেছে কাপড় বোনার নতুন রীতি—কম সময়ে কম দামে ভাল জিনিস উতরাবে। দেখতে দেখতে এই কথাই বারম্বার মনে আসে —কর্মিকরা যদি উপলব্ধি করে তারা খাটছে নিজের দেশ ও নিজ মানুষদের

জন্য, তাদের গতর-ঘামানো লাভ অন্য কেউ লুঠ করে নেবে না, তবে তো অসাধ্যসাধন হয় তাদের দিয়ে।

সাংহাইয়ের কর্মিকদের মোট সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ সত্তর হাজার। কারখানা-মজদুরের যে চেহারা আমাদের মনে আসে, সে আঁধার উত্তীর্ণ হয়ে এরা এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু মাত্র সংস্কৃতি-ভবন নয়, ছোট-মাঝারি বিস্তর ক্লাব আছে। অনেকে ছবি আঁকে—কর্মিকদের আঁকা বিস্তর ছবি দেয়ালে। উড-কাটও আছে। কবিতা লেখে—তা-ও রেখে দিয়েছে এক্জিবিশনে। পোস্টার ও প্রচারপত্র ; গোটা চীনদেশের অগ্রগমনের ছবি। নবজাগ্রত জাতি দুরন্ত বেগে সকল দিকে এগিয়ে চলেছে—ছবি দেখেই সেটা মালুম হবে। ছবিতে লেখায় ও জিনিসপত্রে কর্মিক-আন্দোলনের ইতিহাস সাজিয়ে-রেখেছে, কয়েকটা ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও ও-প্রান্ত। শুধু একবার চোখ বুলিয়ে গেলেই ইতিহাস মনের উপর জলজল করবে। ১৯২৯ অব্দ থেকে আন্দোলনের শুরু বলা যায়—রাজনীতিক অর্থনীতিক উভয়মুখী। তার আগেও ছিল, কিন্তু সে হল ইতস্তত বিস্ফোরণ—নিয়মবদ্ধ কিছু নয়। পয়লা মওকায় আন্দোলনের নেতাদের জেলে ঢোকালো—সর্বত্র যেমন হয়ে থাকে। তাতে ফল হল না—সর্বত্র যেমন দেখা যায়। কুচাং-ফুং নামে এক মেয়েকে মেরে ফেলল (১৯২৩ অব্দ) ; থানার সামনে বিরাট মিছিল—সেই পুরানো ছবি দেখতে পাচ্ছি। জাপান ও আমেরিকার মিলিত-অভিযান। কী কষ্ট, কী কষ্ট দেশের মানুষের! কত মেরেছে, কত জনের হাত-পা কেটেছে! তারও বিস্তর ছবি। শহর জুড়ে সাধারণ-ধর্মঘট। সেই সময়কার কাগজে ধর্মঘটের ছবি দিয়েছিল—খবরের কাগজের সেই অস্পষ্ট ছবি কেটে রেখে দিয়েছে। তার পর বন্যা এলো আন্দোলনের। ঢেউয়ের পর ঢেউ ভেঙে পড়ছে। সে আমলের নগণ্য তরুণ কর্মীদের সব ফোটো। এঁদের অনেক আজ নতুন-চীনের কর্ণধার। প্রাণ গেছে কত জনের—নির্জন সেলের ভিতর মৃত্যুর মুখোমুখি বসে শান্তচিত্তে কত ভাবনা ভেবেছেন, বন্ধুদের লেখা চিঠিপত্রে তার পরিচয়। পালা বেঁধে রাস্তায় রাস্তায় অভিনয় করে জাপানকে রুখতে বলেছে। আহা, ভাগ্যিস ফোটো-গুলো তুলে রেখেছিল—তাই তো আন্দোলনের নানা পর্যায়ের খানিক আন্দাজ নিয়ে ফিরলাম। ১৯৩৮ অব্দে লড়াইয়ে জখম হয়ে এক মৃত্যুপথযাত্রী লিখছে, "আমার মরণ কিছুই নয়—এক হয়ে সকলে সংগ্রাম করে যাও।" ১৯৪৭ অব্দে মার্কিন জিনিসপত্র বয়কট করল, তাই নিয়েই বা মারা পড়ল কত মানুষ।

আর দেখলাম, এক সর্বত্যাগী তরুণের প্রতিমূর্তি—ওয়াং সাও-হো। ১৯৩৮ অব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর কুয়োমিনটাঙের লোক গুলি করে মেরেছিল তাকে। প্রতিমূর্তির নিচে এক কাঠের বাক্স—তার মধ্যে শহীদের জামা-পাজামা-টুপি, বই-খাতা-ফাউন্টেনপেন। গুলিতে জামা ফুটো হয়ে গেছে, রক্ত বেরিয়ে চাপ-চাপ এঁটে রয়েছে জামার উপর। সমস্ত আছে। কলেজি ছেলে, ক্লাসের অঙ্ক কষা রয়েছে খাতায়। এই তো সেদিন চারটে বছর আগে সে এই সব অঙ্ক কষেছে। চোখ জলে ভরে আসে। আমার কিশোর বয়সে কয়েক জনকে দেখেছি—যেদিন ডাক এলো, প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে হাসতে হাসতে ছুঁড়ে দিল। ক-জনই বা মনে রেখেছে তাদের! ওয়াঙের ঐ মূর্তির পাশে তাদের মুখগুলো ভেসে উঠছে। ওরা সকলে এক।

সান ইয়াৎ-সেনের বাড়ি। আগে এক সামান্ত বাড়ির খোটা-দুই তিন ঘর নিয়ে তিনি থাকতেন। এক কানাডাপ্রবাসী বন্ধু (চীনেরই মানুষ) এই বাড়ি করে দিয়েছিলেন। দোতলা ছোট বাড়ি—একটু লন আছে, শহরের দৈত্যাকার বাড়িগুলোর সঙ্গে তুলনা হয় না। ছোটখাটো ছিমছাম সুন্দর একখানা ছবির মতন। পড়ার ঘর, লাইব্রেরি, শোবার ঘর, অফিস ঘর—ঘুরে ঘুরে দেখছি। যে টেবিল-চেয়ারে কাজকর্ম করতেন, যে শয্যায় শুতেন, তাঁর দৈনিক ব্যবহারের টুকিটাকি অসংখ্য জিনিসপত্র। কোন জিনিস নড়ানো-সরানো হয়নি। বিপুল পুস্তক-সংগ্রহ—দাগ দিয়ে দিয়ে পড়ছেন, নিজের হাতে-লেখা নোট রয়েছে অনেক বইয়ের পাশে। নানা বয়সের নানা অবস্থার ছবি। সুন-চিন-লিঙের যৌবন-বয়সের একখানা ছবি—আশ্চর্য রূপের প্রতিমা। এখনকার প্রবীণ মাদাম সান ইয়াৎ-সেনের মধ্যেও সেকালের সেই রূপের আঁচ পাওয়া যায়।

১৯২৫ অব্দে সান ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর মাদাম সুন চিন-লিং বাড়িটা জাতিকে দিয়ে দিয়েছেন। সর্বসাধারণের সম্পত্তি—দলে দলে মানুষ এসে দেখে যায়। চারিদিক ঝকঝক তকতক করছে। তীর্থযাত্রীর মতো নত-মস্তকে আমরা বাড়ির ভিতর ঢুকলাম।

নাকে মুখে দুটো গুঁজে আবার বেরিয়েছি। বিশ্রামের সময় নেই। একটা কর্মিক-পল্লী—সাও-ইয়াং ভিলা—শহর থেকে ছয় মাইল, সাংহাইর শহরতলি বলা যায়। চারিদিক ফাঁকা, তার মধ্যে একশ-ছটা দোতলা বাড়ি। প্রতি

বাড়িতে ছটা করে ফ্লাট। ছশ ছত্রিশটা পরিবার অতএব থাকে এখানে। এ ছাড়া আরও অনেকগুলো একতলা বাড়ি—ইস্কুল, ডাক্তারখানা, সমবায়-দোকান ইত্যাদি। চল্লিশ হাজার ইয়ুয়ান দিয়ে সমবায়-দোকানের মেম্বার হতে হয়। বাড়িগুলোর সামনে পিছনে রাস্তা। গাড়ি থেকে নেমে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চলেছি—সে কি বিপদ! এ ডাকে, আসুন আমার বাড়ি; ও ডাকে, আসুন আমার বাড়ি। ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা সংবর্ধনা করছে—হোপিন ওয়ানশোয়ে—শান্তি দীর্ঘজীবি হোক! এলাহি ব্যাপার। আমরা খুশি মতো এর ঘরে একজন ওর ঘরে দুজন এমনি ঢুকে পড়লাম। যত বেশি ঘর দেখে নিতে পারি, বিচারটা তত সাচ্চা হবে। আমরা আসছি দেখে, যদি ধরুন ফিটফাট করে রেখে থাকে! কিন্তু ছশ ছত্রিশটা ফ্লাট লহমার মধ্যে নিখুঁতভাবে সাজানো এক আরব্য উপন্যাসের দৈত্য ছাড়া আর কেউ পারবে না। বেড়ে আছে সত্যি! অনেকের হিংসে হচ্ছে। একজন বললেন, দিল্লির পার্লামেণ্ট-সদস্যরা যে সব বাড়িতে থাকেন সেই কায়দায় নয়!

ছুটুন, ছুটুন। ফ্যাক্টরিতে এর পর। কাপড়-ছোপানোর এক নম্বর সরকারি ফ্যাক্টরি। মেয়ে ডিরেক্টার—মিং চুং-ফাং। আগেকার দিনের নিতান্ত এক সাধারণ কর্মী—মজবুত চেহারা, চিরকাল কঠিন শ্রম করে আসছেন সে আর বলে দিতে হয় না। নিয়মমাফিক বক্তৃতা করে সংবর্ধনা জানালেন তিনি। এবং যথারীতি আমার মুখের জবাব পাওয়ার পর কারখানা দেখাতে নিয়ে চললেন। চোদ্দ শ কর্মি খাটে এখানে। খাটুনি দশ ঘণ্টা থেকে কমিয়ে সম্প্রতি আট ঘণ্টায় আনা হয়েছে। সব রঙের ছাপা হয়, ডিজাইন বহু রকমের। তবে শতকরা নব্বুই ভাগ হচ্ছে নেভি-ব্লু রঙের থান ছোপানো। এই রঙের কোট-প্যাণ্টলুন মেয়েপুরুষ বাচ্চাবুড়োর সার্বজনীন পোশাক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই বিষম চাহিদা। ডিরেক্টারের অঙ্গেও ঐ পোশাক—তবে ধূসর রঙের। উঁহু—ঠাহর করে দেখি, আদিতে নেভি-ব্লুই ছিল। কাচতে কাচতে এই দশা।

(১৯)

স্বদেশের শুভার্থীরা বিস্তর উপদেশ ছেড়েছিলেন। কম্যুনিস্ট দেশ—যে প্রকার এতদিন জেনে বুঝে এসেছ, ঠিক উল্টোটি সেই রাজ্যে। বড়লোক-গুলোকে কেটে কুচি কুচি করেছে, মন্দির-দেবস্থানে রোলার পিষেছে, ঘর

গৃহস্থালি চুরমার। খাটবে এবং খাওয়া-পরা পাবে—ব্যস, এই মাত্র। ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই—রাস্তার ল্যাম্পপোস্টটা অবধি কান খাড়া করে রয়েছে। এমন-অমন বলেছ—কিংবা মুখ ফুটে বলতেও হবে না, বেয়াড়া রকমের কিছু মনে মনে ভেবেছ কি অমনি নিয়ে তুলবে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। দুনিয়ার মানুষ তার পরে আর চিহ্ন দেখবে তোমার।

অনেক দিন হয়ে গেল, রোমহর্ষক বর্ণনার সবগুলো মনে নেই। সকৌতুকে মনে মনে সেই সব আনাগোনা করতাম! কিছুই তো মেলে না হে! সারা জীবনে উঠোন-সমুদ্র উত্তীর্ণ হননি বটে, কিন্তু ভুবনের যাবতীয় সঠিক সংবাদ তাঁদের নখাগ্রে। তাঁদের সতর্কবাণী বিলকুল ফাঁকি হয়ে যাচ্ছে!

না, মিলল একটা বটে এত দিনে! ব্যক্তি-স্বাধীনতা যে নেই. তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। শুনুন—অধমের উপর হামলা হয়েছিল কি প্রকার। তাজ্জব হয়ে যাবেন। হয়তো বা চক্ষু বাষ্প-বিজড়িত হয়ে উঠবে।

দলনেতা এবং রুগ্ন অসমর্থের জন্য আলাদা গাড়ির ব্যবস্থা, অন্য সকলের পাইকারি বাস। দলনেতা বলেই নিরালা কোটের আটকাবে, এ কেমন কথা? এই নিয়ে পিকিনে নিন্দে-মন্দ করতাম! শেষটা নিজেকে নিয়েই টান পড়ল তো বিদ্রোহ করে বসলাম দস্তুর মতো। সে কিছুতে হতে দিচ্ছি নে। তখন করল কি মশায়, জন কয়েক তাগড়া জোয়ান বাসের দরজা চেপে দাঁড়াল—ঢুকবেন কেমন করে বাসে—ঢুকুন না! তাতেই শেষ নয়। গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে আছি তো দু-জনে দু-হাত ধরে টেনে জোরজার করে নেতার গাড়ির মধ্যে পুরে ফেলল। ইংরেজের আমলে দেখছি, স্বদেশি ছেলেদের এই কায়দায় কয়েদির গাড়িতে ঢোকাত। পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছি, দলের সকলের করুণা উদ্রেকের চেষ্টা করছি—দেখ হে তোমরা, ব্যক্তি-স্বাধীনতার পুরোপুরি বিলোপ-সাধন, শারীরিক বলপ্রয়োগ—তা পাষাণ আমরা স্বদেশবাসীরা! সকলের চোখের উপর দিয়ে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে গেল, তাঁরা হাসতে লাগলেন। অধমের দুর্গতিতে সকলে খুশি!

প্রতিকারের ভার তখন নিজের হাতে নিই। মোটরকার ও বাস পরদিন যথারীতি এসে দাঁড়িয়েছে হোটেলের দরজায়। সকলের আগে আমি চুপিচুপি বাসে উঠেছি, একটা বেঞ্চির কোণ নিয়ে নিঃসাড়ে বসে আছি। তারপর ওরা এসে পড়ল। খোঁজ—খোঁজ—নেতা মশায় গেলেন কোথা? হোটেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন তো!

ঘাড় নিচু করে পাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে আত্মগোপন করেছি অবশেষে দেখে ফেলল। বাসে ঢুকেছে গ্রেপ্তার করতে।

উঠে আসুন। আপনার এ জায়গা নয়—

আমি আইন দেখাই, ডেলিগেট যখন—নিশ্চয় এক্তিয়ার আছে বাসে উঠে বসবার।

কার্ড দেখান—

এর ইতিহাস বলি। সাহাই পৌছবার পরেই প্রতিনিধিদের একটা করে কার্ড দিয়েছিল। প্রয়োজন হলে বাসের লোককে ঐ কার্ড দেখাতে হবে, আজে-বাজে মানুষ যাতে বাসে উঠে না পড়ে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। দশ মিনিটের মধ্যে ওরা-আমরা ভাই-ব্রাদার—যেন দশ শ বছরের পরিচয়। কে বা চাচ্ছে কার্ড আর দেখাতে যাচ্ছেই বা কোন জন? কার্ড যেমন দিয়েছিল, তেমনি পড়ে আছে টেবিলের উপর। অথবা ঘর-সাফাইয়ের সময় ঝেঁটিয়ে ফেলে দিয়েছে। ভরসা সেইখানে। তাই হুমকি দিচ্ছে, দেখান আপনার কার্ড—

কপাল গতিকে আমার কার্ডখানা সেদিন পকেটেই ছিল। নাকের সামনে বের করে ধরি। হতভম্ব—ক্ষণকাল কথাই বলতে পারে না। তবু কি অক্লে ছাড়বার পাত্র। আবার এক দুষ্ট মতলব ঠাউরে ফেলেছে।

আপনি মোটা মানুষ বেঞ্চির অনেকটা জুড়ে বসেছেন। এত জায়গা দিতে পারব না। বাস ছেড়ে আপনাকে অন্য জায়গা দেখতে হবে।

সেক্রেটারি-জেনারেল রমেশচন্দ্র রোগা মানুষ—তাঁকে পাশে টেনে বসালাম। হল তো? দু-জনের জায়গা—আমি যদি দেড় হই, ইনি আধ। ব্যস, মিটে গেল। এবারে কি বলবে?

বলবার কিছু নেই। বেবুক হয়ে নেমে গেল হাসতে হাসতে। দলনেতার স্বতন্ত্র গাড়িটা গেল না আর সেদিন।

বাসে চড়ে জাহাজঘাটায় গেলাম। সাংহাই ডকের জগৎজোড়া নাম—কিন্তু আজকে আর কি দেখবেন! সন্ধিবন্দর ছিল—সন্ধিসূত্রে মাতব্বর জাতগুলোর অগাধ ব্যাপার-বাণিজ্যের অধিকার। বাণিজ্যের নামে মহাচীনের মেদ মজ্জা শুষে নিত অক্টোপাস। অক্টোপাস অর্থাৎ অষ্টভুজের উপমাটা খুব লাগসই। শোষক জাতিগুলো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চীনভূমিতে আড্ডা গেড়েছিল—গুনতিতে তারা আটই বটে!

জাহাজঘাটায় বিদেশি বলতে রয়েছে ব্রিটিশ ব্যাপারি জাহাজ একটা।

গতিক বুঝে আর সবাই আপোসে সরে পড়েছে, ঝামেলা করেনি। ফরমোশায় ওত পেতে রয়েছে তাদেরই কেউ কেউ; ঐখান থেকে প্রলুব্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে নিশ্বাস ফেলছে। এক চীনা-জাহাজের লোকলস্কর আমাদের দেখে শশব্যস্তে নেমে এলো, হাততালি দিয়ে খুব খাতির করে জাহাজে নিয়ে তুলল।

এখান থেকে জেড-মন্দিরে। বুদ্ধমূর্তি মূল্যবান জেড পাথরে তৈরি। খুব নাম এই মন্দিরের। তাজ্জব ব্যাপার—রোলার চালিয়েছে তবে কই? স্বদেশের কয়েকটি দিক্‌পাল যে তারস্বরে এই বুলি ধরেছেন! জানি, দোষ তাঁদের নয়—কলওয়ালারা পিছন থেকে স্প্রিংয়ে দম দিয়ে পুতুলের মুখ দিয়ে এই বুলি বলাচ্ছে। উঁহু, হাত দিয়ে লেখাচ্ছে। কিন্তু থাকুক এ সব। পীতাম্বর শ্রমণরা আমাদের দেশের গেরুয়াধারী সাধু মহারাজদের মতোই। ভারত থেকে আমরা, প্রভু বুদ্ধের দেশের মানুষ—ভারি খাতির! আমাদের চেয়ে আপন কে আছে বুদ্ধ-ভক্তদের কাছে?

বিস্তর জায়গা-জমি নিয়ে মন্দির। ঘরবাড়ি দেখে অবাক হয়ে যাই। সম্রাট ও যুগ-যুগের ভক্তদের আনুকূল্যে এই সমস্ত হয়েছে। প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্তি। এবং ভক্তদেরও বিস্তর মূর্তি আছে। দেয়ালে রাজা লিয়াং-তির প্রকাণ্ড ছবি—যিনি প্রথম এদেশে বৌদ্ধধর্ম আনলেন। শ্রমণদের আবাস এবং ধর্মালোচনা ও পড়াশোনার জায়গা। বিচিত্র অলঙ্করণ সর্বত্র—নানাবিধ দেয়াল-চিত্র। পুরো দিন ঘুরেও দেখা হয় না, অথচ ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে নমো নমো করে সারতে হবে। সময় নেই।

আরও তাজ্জব—মন্দির মেরামত হচ্ছে, মিস্ত্রি-মজুরদের দল ভারা বেঁধে কাজ করছে। পিকিনেও এই দেখেছি। মন্দিরের কোন কোন অংশ ব্যবহার হত না, ভেঙেচুরে পড়ে ছিল। বোমার আঘাতেও কিছু কিছু জখম হয়েছিল। সেই সমস্ত নতুন করে গড়া হচ্ছে পুরোনো স্থাপত্যরীতির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে। নতুন-চীনের কর্তারা ধর্মকর্ম মানে না—তবে এ সমস্ত কেন? মানি আর না-ই মানি—যে সব মানুষ মানে, তাদের বিশ্বাসে বাধা দিতে যাবো কেন?

শ্রমণরা ঘরে নিয়ে বসালেন আমাদের, চা ইত্যাদি দিলেন। বুদ্ধ-ভূমির মানুষ—মহা মাননীয় তোমরা। অজস্র ধন্যবাদ, এত দূরে আমাদের দেখতে এসেছ। প্রভু বুদ্ধ পরম শান্তিবাদী। আঠার-শ বছর আগে বৌদ্ধধর্ম এদেশে এসেছিল, সেই তখন থেকে বন্ধুত্ব তোমাদের সঙ্গে। আমাদের শ্রবণ-সম্প্রদায়ের

ভালবাসা তোমার দেশের মানুষদের জানিও। বোলো, সকলে আমরা মিলে-মিশে ভাই-ভাই শান্তিতে থাকতে চাই।

ফোটো তোলা হল সবাই একত্র হয়ে। বললেন, নতুন আমল বলে গোড়ায় খুব ভয় হয়েছিল—কিন্তু না, ভালই আছি আমরা মশায়। মন্দির-মসজিদ-গির্জা এবং যাবতীয় পুরানো কীর্তি সেরেসুরে দিচ্ছে ওরা। থোক টাকা পয়সার দরকার হলেও পাওয়া যায়। কর্তাদের সম্বন্ধে বলবার কিছুই নেই, দোষ হল হাল আমলের ছেলেমেয়েগুলোর। ভক্তি-নিষ্ঠা কিচ্ছু নেই, মন্দিরে আসে না—কেমন যেন সব হয়ে যাচ্ছে। সেকালের বুড়ো-আধবুড়োরাই শুধু মন্দিরে আসা-যাওয়া করেন, তাঁদের অন্তে কি যে হবে—

শুষ্ক মুখে করুণ কণ্ঠে আমরাও সমবেদনা জানাই, বলেন কেন—সব দেশের ঐ এক রীতি। আমাদের পুরুত-পাণ্ডারাও ব্যাকুল হচ্ছেন এই ভাবনা ভেবে। ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না ছেলেমেয়েরা—কী যে হচ্ছে দিনকে দিন।

ছুটলাম এক নম্বর কটন মিলে। এটাও সরকারি কারখানা। কর্মিক চল্লিশ হাজারের বেশি—তার মধ্যে আঠাশ হাজারের মতো মেয়ে। সরকারের হাতে আসার পর কর্মিকদের বড় স্ফূর্তি বেড়ে গেছে; মাইনেও পাচ্ছে তারা আগের চেয়ে অনেক বেশি।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়েছে, কর্মিকদের শরীর মজবুত রাখার জন্য মুফতে নানা রকম ব্যবস্থা। এখানে-ওখানে বোর্ড ঝুলিয়ে স্বাস্থ্য সম্পর্কে নানান উপদেশ লিখে দিয়েছে—বাচ্চাদের নার্সারি—মেয়ে কর্মিকরা শিশুসন্তান ওখানে গছিয়ে দিয়ে কাজে লাগে; কারখানা বন্ধ হলে ছেলে কোলে ঘরে যায়। বাচ্চাদের খাওয়া-দাওয়া লেখাধূলো ও পড়াশুনোর হরেক বন্দোবস্ত। মা কাছে নেই, সমস্ত দিনের মধ্যে তা খেয়ালই থাকে না। কর্মিকরাও পড়ে—আট ঘণ্টা ডিউটি, তার পয়লা দু-ঘণ্টা লেখাপড়া। দিনের খাটনির পর ক্লান্ত হয়ে পড়বে, লেখাপড়ার পাট সেজন্য আগেভাগে সেরে নেওয়ার নিয়ম। প্রায় সবাই আগে একেবারে নিরক্ষর ছিল, এখন দিব্যি খবরের কাগজ পড়ে। ছ-মাস পরে মিলের একটি মানুষও নিরক্ষর থাকবে না, এই ওরা পণ নিয়েছে।

মেয়েপুরুষ সব কর্মিকের এক মাইনে। পরিচালক ও সাধারণ কর্মিকের মধ্যে মাইনের বেশি ফারাক নয়। মেয়েরা প্রসবের আগে-পিছে পুরো মাইনের বাড়তি ছুটি পায়। বিপদ-আপদ ও দুর্দিনের কথা ভেবে প্রত্যেক কর্মিকদের শ্রম-বীমা আছে—প্রিমিয়াম কারখানা থেকে দিয়ে দেয়। কারখানায়

ঢুকলাম—কর্মিকরা একমনে কাজ করছে। তাদের মাঝখান দিয়ে এ-পথ ওপথ উপর-নিচে করছি আমরা। এত তুলো উড়ছে যে বহাল তবিয়তে ঘোরাফেরাই দায়। কর্মিকদের নাক-ঢাকা, তাদের অসুবিধে নেই।

দেখাশুনোর পর বক্তৃতা—ঘরের ভিতরে নয়, প্রাঙ্গণে। তারা দত্তকে বললাম, আমাদের হয়ে দু-কথা বলবার জন্য। খাসা বললেন অল্পের ভিতর।

হোটেলে ফিরতি মুখে দেখছি, রাস্তা লোকে লোকারণ্য। এখন থেকেই সভায় গিয়ে জমেছে। দল বেঁধে পতাকা উড়িয়ে মিছিল করেও যাচ্ছে। ব্যাপার তবে তো রীতিমত গুরুতর! গোটা সাংহাই শহর ভিড় জমাবে আজকের ময়দানে। নিতান্ত যারা যেতে পারবে না, তারা বাড়ি বসে শুনবে—সাংহাই রেডিও সেই ব্যবস্থা করেছে।

কিন্তু আমি এক মুশকিলে পড়ে গেছি। ভারতের তরফ থেকে ঐ মহতী সভায় দু-জনে দু-খানা জ্বালাময়ী ছাড়ব, এই ব্যবস্থা ছিল। শেষ মুহূর্তে তা ভেস্তে যাচ্ছে। কাল রাতে আরও কয়েকটা দেশের প্রতিনিধি এসে পড়েছেন, তাঁরাও বলবেন। সময়ের অকুলান পড়ছে অতএব। দু-জনে নয়, বলতে হবে শুধু একজনকে। সেই নামটা অবিলম্বে ঠিক করে দিন।

নাম ঠিক করতে আমার সেকেণ্ডও লাগে না। রাঘবিয়া বলবেন—আবার কে? আমি বাতিল। আমার কথায় তিনি যখন বক্তৃতা তৈরী করেছেন—তিনিই বলবেন। এ ছাড়া আর কোন রায় দিতে পারি আমি?

রমেশচন্দ্রের আপত্তি। একজনকে বলতে হলে বলবেন দলনেতাই। সর্বক্ষেত্রে এই রীতি।

রীতিটা ভাঙ্গতে চাই আমি—

রমেশচন্দ্র বললেন, মতভেদ হচ্ছে যখন, মন্ত্রণাদাতা দু-জনের মত নিয়ে দেখুন।

কিন্তু তাঁরা রমেশচন্দ্রের কথায় সায় দিলেন। ভোটে হেরে গেলাম একজন বলবে যখন, সে জন আমিই।

দুপুর দুটোয় সভা। জায়গাটা এক সময়ে ছিল কুকুর-দৌড়ের মাঠ। ব্রিটিশরা বানিয়েছিল। লড়াইয়ের মধ্যে জাপানিরা সাংহাই দখল করে নিল। তখন সৈন্যদের ঘাঁটি হয়েছিল। জাপানি হটিয়ে তারপর মার্কিনরা আড্ডা গাড়ে। ১৯৫১ অব্দে নতুন-চীনের গণতন্ত্রী সরকার বিরাট একজিবিশন খোলেন। ইদানীং আরও বিস্তর জমি ওর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে পিপল্স পার্ক

হয়েছে। সাঁতারের পুকুর আছে। বড় বড় সভা-সমিতি ও জাতীয় উৎসব এইখানে হয়ে থাকে। বিশাল স্টেডিয়াম—লাখ লাখ বসতে পারে।

বক্তৃতায় উত্তম উত্তম বচন ঝেড়েছিলাম। সাংহাই-নিউজে পরদিন অনেকখানি বেরিয়েছিল, কাগজটা খুঁজে পাচ্ছি নে। অতএব বেঁচে গেলেন আপনারা। কামনা করুন, কোন দিনই না পাওয়া যায়। আমার পরেই বললেন সোভিয়েট দলনেতা অ্যানিসিমভ। এই সেদিন মস্কোয় দেখা হল ভদ্রলোকের সঙ্গে। যে সে ব্যক্তি নন, গোর্কি ইনষ্টিট্যুট অব ওয়ার্লড লিটারেচারস নামক এক বিরাট প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর। এতৎসত্ত্বেও এক নজরে চিনে ফেললেন। এবং বার তিনেকের দেখা-সাক্ষাতে অজস্র কথাবার্তা হল। সাংহাইয়ের সভার কথা উঠল। বললেন, বক্তৃতার প্রতিযোগিতা চলেছিল যেন—আপনি সব চেয়ে বেশি হাততালি পেলেন। আমি ঘাড় নেড়ে বলি কখনো না—আপনি। এই নিয়ে হাসাহাসি চলল; আমাদের আর যাঁরা ছিলেন, উপভোগ করছিলেন আমাদের কলহ।

কিন্তু থাক এ সব। বক্তৃতার কথা ভুলে গেছি—কিন্তু এটা মনে আছে, অসুবিধা লাগছিল, বিরক্ত হচ্ছিলাম। বক্তৃতা করে জুত হয় না ওদেশে। আবেগভরে আচ্ছা এক মনোরম কথা বলে ক্যাল-ক্যাল করে এদিক-ওদিক তাকাই। চারদিক চুপচাপ—শ্রোতাদের মধ্যে না-রাম না গঙ্গা—কোন রকম প্রতিক্রিয়া নেই। কুমারী তুন ইংরেজি বাক্যগুলো ধীরগতিতে চীনায় তর্জমা করে যাচ্ছে। অবশেষে—বক্তৃতা ছাড়বার মিনিট দু-তিন পরে কলরোল উঠল, প্রবল হাততালি। ততক্ষণে কিন্তু আমার উত্তাপ জুড়িয়ে গেছে—পরবর্তী লাগসই কথাগুলো মুখের কছাকাছি আসতে চায় না।

দিনের পাট চুকিয়ে একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছি ক-জনে। বাজার করছি। সরকারি ও সাধারণ দোকান বিস্তর; কিন্তু ভিড় ঠেলে ঢোকা যায় না। মানুষের হাতে পয়সা হয়েছে, দেদার জিনিসপত্র কিনছে। কিছু কেনাকাটা করে বিরক্তি ভরে বেরিয়ে এলাম। আজকের সঙ্গী এক ছাত্র—সে-ও চলে এলো আমার সঙ্গে সঙ্গে। সঙ্গীদের উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি, তাঁরা এটা-ওটা পছন্দ করে ঘুরছেন। আমি আর সেই ছেলেটি মোটরে বসে গল্প করছি, ছেলেটাকে, এই লিখতে লিখতে, আমার সুস্পষ্ট মনে পড়ছে। লম্বা চওড়া উজ্জ্বল চেহারা—বয়স যা বলল, সে তুলনায় দেখতে অনেক বড়। আমি লেখক—পরিচয়টা শোনা অবধি যখনই সুবিধা পায়, কাছাকাছি ঘুরঘুর করে। হবু-সাহিত্যিক। কথাটা জিজ্ঞাসা করতে সলজ্জে মুখ নিচু করল। কাঁচা

লেখকদের এখানেও ঠিক এই রকম দেখে থাকি। তার একটা কথা কানে বাজছে—বলতে বলতে সেই কিশোরের চোখ ছুটো যেন দপদপ করে জলতে লাগল। রাস্তার বিদ্যুতের আলোয় আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। জানো বোস, কটা বছর আগে এ জায়গায় আমাদের আসতে দিত না। নোটিশ টাঙিয়ে রেখেছিল—'কুকুর আর চীনার প্রবেশ নিষিদ্ধ।'

বললাম আমাদেরও অমনি দশা গেছে ভাই। হরেক বাধা ছিল নিজের দেশভুঁয়ে স্বচ্ছন্দে চলে-ফিরে বেড়াবার। কলকাতায় অনেক হোটেলে ধুতি পরে ঢোকবার জো ছিল না।

(২০)

চব্বিশে, শুক্রবার। হ্যাংচাউ যাবো আজ। ওয়েষ্ট-লেকের উপর পাহাড়ের ছায়ায় অপরূপ শহর। ওরা বলে, মাটির ধরায় স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, এই হ্যাংচাউ। সাংহাইয় পালা অতএব ছুপুরের আগে পুরোপুরি শেষ করব।

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোর পায়ে কি-রকম একটা ব্যাথা উঠেছে। আধেক শয্যাশায়ী। বেরুবেন না। সেই ভাল, বিশ্রাম নিলে ব্যথা কমবে। পায়ের গতিকে হ্যাংচাউ যদি পণ্ড হয়, মনোবেদনা রাখবার ঠাঁই হবে না। বৈদ্যনাথ হোটেলে রইলেন, আমরা সকলে বেরিয়ে পড়লাম।

নার্সারি ইস্কুল। ইস্কুল বলা ঠিক হল না, গোটা নাম—নার্সারি অব চায়না ওয়েলফেয়ার ইনষ্টিট্যুট। শহরের একধারে মস্ত বড় বাগান-বাড়ি। তার মধ্যে ফালি ফালি খেলার মাঠ, সিমেন্টে বাঁধানো নির্জলা লেক, লেকের মধ্যে নৌকা। আপাতত লেকে এক ফোঁটাও জল নেই বটে, কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে জলে ডুবিয়ে দেওয়া যায়। তখন নৌকো জলের উপরে ছুলবে। এ সংসারের বাসিন্দা কেবল বাচ্চারা। লেকে তারা নৌকা বায়, সাঁতার কাটে। ছুর্ঘটনার ভয় নেই, জল হাতখানেক হবে বড় জোর, ইচ্ছে করলেও ডুবে যাওয়া যায় না।

প্রধান কর্মকর্ত্রী মাদাম সান ইয়াৎ-সেন—তাঁরই চেষ্টায় ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠান এত বড় হয়েছে। স্থপারিন্টেণ্ডেণ্ট সমাদরে আমাদের এগিয়ে নিয়ে চললেন। মুখে মুখে পরিচয় দিচ্ছেন। ছুটো বিভাগ—তিন বছরের নিচে যাদের বয়েস, আর যারা তিনের উপর। শিশু-লালনের অভিনব বন্দোবস্ত।

শরীর গড়ে তুলছে—ওজন নিতে হয় না, যে কোন শিশুর মুখে তাকিয়ে আন্দাজ পাওয়া যায়। আর নতুন কালের পুরো মানুষ হয়ে উঠছে তারা। তার এক পরিচয়ে, সহজ মেলামেশায় অভ্যস্ত হয়েছে, এইটুকু বয়স থেকেই মানুষের কাছ থেকে আশ্চর্য কায়দায় আদর কাড়তে শিখেছে—তা সে মানুষ যে কোন দেশের যেমন রং ও প্রকৃতির হোক না কেন।

একটা ঘরে নিয়ে বসালেন। ওরা অভিনয় দেখাচ্ছে। বুড়ো মানুষ সেজেছে—বছর চারেকের হবে সে বাচ্চাটি—পাকা গোঁফ পরেছে, মাথায় পাকা চুল। চীনের সাবেকি ধরনের পোশাক পরে থপথপ করে সামনে এসে দাঁড়াল। ভারী গম্ভীর—বড়োমানুষের যেমনটি হতে হয়; আমরাও ঠোঁট চেপে থেকে কোনপ্রকার চপলতা হতে দিচ্ছিনে। আসে তারপর নৌ-সৈন্যরা। বয়স তিন বছরের মধ্যে। সাজপোশাক অবিকল নৌবাহিনীর। গটমট করে মার্চ করে আসছে—বাপ রে বাপ, অন্তরাত্মা ভয় কাঁপে। নেহাত আমরা অত জনে একসঙ্গে আছি, খোদ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাদের মধ্যে রয়েছেন—তাই বসে থাকতে ভরসা পাচ্ছি, ভয়ে পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেলাম না। এক এক দফা অভিনয় হয়ে যায়, আর সাজপোশাক সুদ্ধ ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে সামনে বসা আমাদের এক একজনের কোলে। তখন আমাদের আর মোটেই ভয় করে না, কোলে বসিয়ে—মুখের কথা চলবে না—চোখের দৃষ্টি দিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে আদর করি। কোলে বসে বড় বড় চোখ মেলে ওরা পরের দলের অভিনয় দেখে। তার পরে তড়াক করে এক সময় কোল থেকে লাফিয়ে পড়ে সাজঘরে ছোটে। ওদের পালা এর পরে; নতুন এক সাজে সেজে এক্ষুনি আবার দেখা দেবে। এলো নাচের দল—পিয়ানো বাজাছে, পরীদেশের ছেলেমেয়েরা তালে তালে নাচছে বাজানার সঙ্গে। শুধু বাজনা শোনাতে একবার এলো গোটা কনসার্ট-পার্টি। ভায়োলিন ড্রাম ইত্যাদি অন্য লোকে ধরে দাঁড়িয়েছে, ওঁরা বাজাচ্ছেন। ভায়োলিন লম্বায় বাদককে ছাড়িয়ে যায়। ব্যাণ্ডমাস্টারও আছেন, বয়স সাত—সব বাদক, তাঁর হুকুমের প্রতীক্ষায় ছড় উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে।

বাগানে ঘুরে ঘুরে দেখছি। কেউ ছুটোছুটি করছে, রোদ পিঠ করে বসে ছবি দেখছে কেউ। মিষ্টি মিষ্টি শিশুকাকলী সমস্ত বাগানবাড়ি জুড়ে। বাচ্চাদের ঘরে ঘরে গিয়ে দেখছি। ছবি আঁকছে, নানা রঙের মাটি দিয়ে জিনিসপত্র গড়ছে, পুতুল গড়ছে! নিজেরাই এক-একটা পুতুল—ঐ পুতুল ছেলেমেয়েদের আবার পুতুল আছে আলাদা। ওদের ছেলেমেয়ে। পুতুলের

ঘর-বাড়ি, ঘুমিয়ে পড়েছে কয়েকটা পুতুল, খাচ্ছে কোন কোন পুতুল টেবিলে বসে। পুতুলের মালিকদেরও খাওয়া-শোওয়ার জায়গা দেখলাম।...আমি এক বিপদে পড়ে গেছি ইতিমধ্যে। চোখের চশমাটা খুলে একজনের চোখে একটু পরিয়ে দিয়েছি, আর যাবে কোথায়—যে যেদিকে আছে, ছুটে আসছে। ঘিরে দাঁড়িয়ে মুখ উঁচুতে তোলে। একটু একটু সকলকে পরিয়ে দাও ঐ চমশা। মাঠের ওধারে এক খুকিকে পেরাম্বুলেটারে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে—সে-ও দেখি, তুলতুলে হাত বাড়িয়েছে। চশমা পরবে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জিজ্ঞাসা করলেন, কদিন আছ আর তোমরা? জবাব দিলাম, এক মাসের উপর তো হয়ে গেল—যা খাতির-যত্ন, মোটেই যাবার ইচ্ছে নেই। ভাবছি জীবনের বাকি কটা দিন কাটিয়ে দিয়ে যাবো তোমাদের দেশে। বক্তৃতার মধ্যেও ভয় দেখালাম, জাতির গোড়া থেকে তোমরা গড়তে শুরু করেছ। আমারা তো যাচ্ছিই নে—চিঠি লিখে দিয়েছি, ছেলেপুলেদেরও যাতে পত্রপাঠ এখানে পাঠিয়ে দেয়। এখানে এসে থাকবে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হারাবেন কেন—তিনি পাল্টা বললেন, বেশ তো, ভালই তো! স্বাস্থ্য ভাল এখানকার, তারা আরামে থাকবে। আর একটা চিঠি লিখে দিন ছেলেপুলের মায়েরাও যাতে চলে আসেন। হাসি-স্ফূর্তিতে একসঙ্গে বেশ থাকা যাবে।

ঐটুকু বাচ্চারাও মিষ্টি রিনরিনে গলায় বিদায়-সম্ভাষণ দিচ্ছে, হিন্দি-চীনী জিন্দাবাদ! বলছে, হোপিন ওয়ানশোয়ে!

মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল! কম্পাউণ্ডের ভিতর ঘাসে-ঢাকা বিস্তৃত লন—তারই পাশে আমাদের গাড়িগুলো দাঁড়াল। এক দঙ্গল ছাত্র-ছাত্রী ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে গুলতানি করছিল, লাফ দিয়ে উঠে ঘিরে দাঁড়িয়ে এসে হাততালি দেয়। উ-উ-উ—আওয়াজ উঠল আকাশ থেকে। ঘাড় তুলে দেখি, তা সে আকাশই—তিনতলায় ছাতের আলসেয় ঝুঁকে পড়েছে কতকগুলো মেয়ে। মুখে মুখে আওয়াজ তুলেছে তাকাই আমরা যাতে ওদিকে। তাকিয়ে পড়তেই হাততালি। তারপরে মেয়েগুলো নিচে ছুটল। দুমদাম দুমদাম—কংক্রিটের সদ্য-তৈরী সুপ্রকাণ্ড সিঁড়ি ভেঙে না পড়ে ললনাদলের পদদাপে। একদা এমনি কাণ্ড ঘটতে পারে—এই সব ভেবেই হয়তো লোহার জুতোয় মেয়েদের পা সরু করে রেখেছিলেন সেকালের দূরদর্শী মুরুব্বিরা!

এসে গাড়ি-বারাণ্ডায় ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। শেকহাণ্ডের জন্য ব্যাকুল।

বিদেশি হাতগুলো কায়দার মধ্যে পেয়ে—আপনার বলব কি—হাত ঝাঁকাচ্ছে আর দস্তুরমতো লম্ফ দিচ্ছে সেই তালে তালে। সে আমি কোনদিন ভুলব না। বাইশ-চব্বিশ বছরের স্বাস্থ্যবিতা মেয়েগুলোর পা দুটো ভূমিতল থেকে অন্তত পক্ষে ইঞ্চি ছয়েক উঠে যাচ্ছে শেকহ্যাণ্ডের সময়টা। বুঝুন। একটা তুলনা মনে আসে—তেজি ঘোড়া কখনো স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না; এরাও ঠিক তাই। চীনের কত জিনিসই ভুলে গেছি, কিন্তু সাংহাই মেডিকেল কলেজ এবং মেয়েগুলোর এই লাফঝাঁপ মিলে মিশে এক বস্তু হয়ে রয়েছে। কলেজের প্রায় আধাআধি ছাত্র মেয়ে।

অধ্যাপক-ডাক্তাররা এবং স্বয়ং অধ্যক্ষ এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরিয়ে নানান বিভাগ দেখাচ্ছেন। জাপানিরা সাংহাই দখল করে ডাক্তারি যন্ত্রপাতি ভেঙেচুরে দেয়, অথবা পাচার করে। তারা বিদেয় হবার পর সব আবার নতুন হয়েছে।

শুধু মাত্র কলেজি পড়াশুনো নয়, জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্পর্কে ছাত্রদের কাজ করতে হয়। এটা শিক্ষারই অঙ্গ—গ্রাজুয়েট হবার কোর্সের অন্তর্ভুক্ত। অধ্যাপক ও ছাত্রেরা এক একটা দল হয়ে বেরিয়ে পড়ে ফ্যাক্টরি কয়লার খনি ইত্যাদি নানা অঞ্চলে ঐ সব জায়গার স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করে তারা, স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য হাতে-কলমে কাজ করে। স্বদেশের সঙ্গে এমনি ভাবে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। কোরিয়ায় পাঠানো হয়েছে এখানকার এক ডাক্তারি দল। দু-মাস অন্তর দলের লোক বদলাবদলি হয়; কতক ফিরে আসে, নতুন নতুন ছেলে-মেয়ে যায় তাদের জায়গায়।

আর এক ব্যবস্থা শুনলাম। আগের আমলের ডাক্তাররা কেবল শহরেই ভিড় করত—গ্রামের লোকের জল-পড়া ফুল-পড়ার উপর নির্ভর। এখন চারিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এই এরা ডাক্তারি শিখছে—পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে কাকে কোথায় পাঠানো হবে সমস্ত ছকে ফেলা আছে। রোগের চিকিৎসা বড় কথা নয়। রোগ যাতে মোটে না হয়, সেই উপায় করো—তবে বলি বাহাদুর। তার জন্যে বক্তৃতা করো, বেতারে বলো, স্বাস্থ্যের প্রদর্শনী খোলো এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে।

হোটেলের সামনে নানা বয়সের একপাল ছেলেমেয়ে। দরজা ও ফুটপাত জুড়ে দাঁড়িয়েছে। শতখানেক হবে গুনতিতে। কি ব্যাপার, সত্যাগ্রহ করেছ—ঢুকতে দেবে না আমাদের? অটোগ্রাফ দিলে তবে পথ ছাড়া হবে।

শ'খানেক খাতা তলোয়ারের মতো উচিয়ে ধরেছে। তার মানে বিকাল অবধি নাম-সই চালিয়ে যাও অবিরাম। সে না হয় হত—কিন্তু সময় কোথা ভাই? দুটো সাতচল্লিশে হ্যাংচাউ রওনা—ইতিমধ্যে খাওয়াদাওয়া ও বোঁচকাবুঁচকি বাঁধা আছে।

এতগুলি মানুষ আমরা—যে যাকে হাতের মাথায় পাচ্ছি, সই মেরে ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু একজনের একটিমাত্র নাম নিয়ে খুশি নয়—সকলের নাম চাই প্রতিটি খাতায়। কর্তাদের এক ব্যক্তি ছুটে এসে তাড়াতুড়ি দিয়ে পথ খালি করে আমাদের হোটেলে ঢুকিয়ে নিলেন। আহা, বেচারারা দাঁড়িয়েছিল কখন আমরা ফিরে আসব সেই প্রতীক্ষায়! সময় ছিল না যে—তা হলে কি ওদের মুখ অন্ধকার হতে দিই!

আবার এক কাণ্ড। লিফট থেকে বেরিয়ে এগারো তলায় পা ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে একটা মেয়ে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বলছে, নমস্কার—কেমন আছেন? খাসা বাংলা জবানে। নাম উ ঝিং-তাং (Woo Ching-tung)। আমার ছোট্ট খাতায় তার হাতের সই দেখতে দেখতে মনের পটে ফুটে উঠল থোপা থোপা কালো চুলে-ঘেরা পদ্ম-রঙের কচি মুখখানা। চোখা নাক-চোখ—দক্ষিণ-চীনের কোন এক অঞ্চলে মেয়েটার বাড়ি। কলেজে পড়ে। বয়সে বড় কাঁচা বলে কেউ বিশেষ আমল দেয় না। উ তা বলে ঘাবড়াবার পাত্রী নয়, সর্বত্র আগ বাড়িয়ে পড়ে নিজেকে জাহির করে। অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে একদিন তো স্পষ্টাস্পষ্টি বলে উঠল, আমিও ইণ্টারপ্রেটার—আমায় কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করো না কেন তোমরা? সেই মেয়েটা হাসি ছড়াতে ছড়াতে আমাদের প্রশ্ন করছে, আছেন কেমন?

তাজ্জব হয়ে মুখের দিকে তাকাই। তারপর সে একলা কেবল নয়—এ দিক থেকে ওদিক থেকে আরও পাঁচ-সাতটা বেরুল। সকলের মুখে কুশল-প্রশ্ন, কেমন আছেন? নমস্কার!

ব্রেকফাস্টের পর বেরিয়ে গিয়েছি—এর মধ্যে আমাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে এতজনের কি হেতু এত উদ্বেগ, ভেবে পাইনে। এবং ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে বঙ্গভাষায় এবম্বিধ পরিপক্ক হয়ে উঠল কোন প্রক্রিয়ায়, তা-ও এক সমস্যার বিষয়।

বৈদ্যনাথের পায়ের সংবাদ নিতে কামরায় ঢুকলাম, তখন পরিষ্কার হয়ে গেল। নিষ্কর্মা শুয়ে রয়েছেন, ছেলেমেয়েরা তখন বৈদ্যনাথকে গিয়ে ধরল, এক্ষুনি বাংলা শিখিয়ে দাও—

সে কি রে! এতই সোজা আমাদের ভাষা শেখা?

নাছোড়বান্দা ওরা। নেহাত পথে গোটা দুই-চার বাংলা কথা—তাকমাফিক ছেড়ে তাতে অবাক করে দেওয়া যায়। আচ্ছা, কেউ এসে দাঁড়ালে কি কায়দায় সম্ভাষণ করো তোমরা, কোন সব কথা বলো?

ঘণ্টা তিনেকের প্রাণপণ চেষ্টায় নমস্কারের প্রণালীটা রপ্ত করেছে। এবং 'কেমন আছেন'—এই কুশল-প্রশ্ন। তারই সমবেত প্রয়োগ চলছে আমাদের উপর। যা ওরা চেয়েছিল—কুশল-প্রশ্নের ঠেলায় সতি সত্যি আমরা অবাক হয়ে গেছি।

(২১)

চলুন হ্যাংচাউ। ২-৪৭-এ গাড়ি। যাচ্ছি একটা দিনের তরে—কাল রাত দুপুরে আবার সাংহাই ফিরব। হাতে মাঝারি সাইজের ব্যাগ—তার মধ্যে এক দিনের মতন কাপড়চোপড় টুকিটাকি জিনিস। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি—দলনেতা ব্যাগ বয়ে চলেনে! আরে, আছ কে কোথায় সব? কা কস্য পরিবেদনা! খ্যাতির করে কেউ ছুটে এসে বলে যা, কি সর্বনাশ! দিয়ে দিন ওটা আমার হাতে। নেতা মশায় অতএব হাঁপাতে হাঁপাতে কামরায় ব্যাগ তুলে ফেললেন। সকলের এই দশা।

গাড়ি ছাড়ল। নিঃসীম ধানক্ষেত আর জলাভূমি ভেদ করে যাওয়ার সেই অপরাহ্নটি বড় মনে পড়ছে। চোখ বুজলেই ছবি দেখি। চলতি ট্রেনে বসে চারিদিক দেখতে দেখতে নানান কথা লিখে রেখেছিলাম; সেইগুলো তুলে দিচ্ছি। পড়তে পড়তে আপনারাও উঠে আসুন না আমাদের সঙ্গে সেই কামরায়।

শহরের সীমানা ছাড়িয়ে এসেছি। লাইনের গা অবধি চাষ করেছে—নানান রকমের শাকসব্জি। সড়াক-সড়াক করে খাল পার হলাম কতকগুলো। গাড়ি শহরতলির স্টেশনে এসে দাঁড়াল। সকলের একই রঙের পোশাক; তার মধ্যে দু-পাঁচটা অবশ্য এদিক-ওদিক আছে। প্রাচীন মানুষ ওন্না; সাবেকি পোশাক পরে বেড়াচ্ছে। আপদ গাউন, তার উপরে কোর্তা, মাথায় হাতল-ওয়ালা অদ্ভুত ধরনের টুপি; মুখে বিশ-ত্রিশ গাছি লম্বা দাড়িও দেখা যায় কারো কারো। গুনতিতে অবশ্য অতি সামান্য তারা। ফ্যাক্টরি অদূরে; কর্মিকদের ঘর—ঝাড়াপোঁছা তকতক করছে। বড় বড় প্যাকিং বাক্সে উল্টোদিকের প্লাটফরম বোঝাই—মুটেরা সেই সব বাক্স বের করে নিয়ে যাচ্ছে।

মাথার টুপি ও পোশাকে কারো কারো তালি-মারা হলেও পরিচ্ছন্ন সকলেই। প্লাটফরমে এত লোকের উঠানামা, কিন্তু নোংরা-আবর্জনা দেখি নে। আজ সকালেই এই প্রসঙ্গ হচ্ছিল। একজনে বললেন, ছিমছাম থাকা এ জাতের অভ্যাস বটে—কিন্তু এত বেশি পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কীয় সতর্কতা রাশিয়ার কাছ থেকে শিখেছে।

মুখোমুখি দুটো বেঞ্চি, মাঝে টেবিল। এ-বেঞ্চিতে দু-জন ও-বেঞ্চিতে দু-জন বসে। কামরার মাঝ বরাবর পথ চলে গেছে—সেই পথ ধরে ট্রেনের আগাপাস্তলা যথেচ্ছ বিচরণ করুন। বিনামূল্যে যত খুশি চা সেবন করুন। গরম জল পাত্রে দিয়ে গেল, পাশে একটা করে মোড়ক। দু-রকমের মোড়ক —সবুজ আর লাল। সবুজ চা হালকা, লাল চা কড়া—ইচ্ছে করুন যে রকম অভিরুচি। মোড়ক ছিঁড়ে চায়ের পাতা ক'টি পাত্রে ঢেলে দিন—ব্যাস। লাউডস্পীকার তো আছেই। একটা লোক সঙ্গীত ধরেছে, গাড়িসুদ্ধ মানুষ তাল দিচ্ছে। সুরে সুর মিলিয়ে গাইছেও কেউ কেউ।

থুংচাং নামে ছোট শহর পার হয়ে এলাম। আধেক-খাওয়া চা একটা পাত্রে ঢেলে নিয়ে আবার নতুন করে গরম জল দিয়ে গেল। দু-পাশে দিগন্ত অবধি পাকা ধানক্ষেত। মাঝে মাঝে গ্রাম—খড় আর খোলার ছাওয়া কুটির। খোড়ো চাল অবিকল বাংলা দেশের মতো; খোলার চাল চীনা পদ্ধতিক্রমে কিছু দুমড়ানো। খুব জল এদিকে—খাল আর ছোট ছোট নদীতে দুর্বার জলস্রোত। আর মাঠে মাঠে সতেজ সুপুষ্ট ফসল। আমাদের মেয়েরা সবেগে গান শুরু করে দিয়েছেন দোভাষি মেয়েগুলোর সঙ্গে। চীনা গান এঁরা শিখবেনই, আর ওরা শিখে নেবে হিন্দি গান।

জোলো হাওয়া আসছে জানলা দিয়ে। মুখে বলতে হল না—হয়তো বা একটু ভ্রূকুঁচকেছি, ছোকরা তাড়াতাড়ি এসে কাচ ফেলে জানালা বন্ধ করল। ক্ষিতীশ গুণী মানুষ—কাঁহাতক মুখ বুঁজে থাকবে—সে-ও গিয়ে পড়ছে গানের আসরে। সব চেয়ে তাজ্জব করলেন রাঘবিয়া। পার্লামেণ্টের মেম্বর ভদ্রলোক —একটু ক্ষ্যাপাটে গোছের। ভ্রমণের এই সর্বশেষ অধ্যায়ে আবিষ্কৃত হল, উঁচুদরের গায়ক তিনি। চমৎকার গলা—আর গান অতি যত্ন করেই শিখেছেন। বিদেশি অজ্ঞদের তাক লাগিয়ে কত কত এরম-গায়ক মহাত্রুম বনে গেল, আর রাঘবিয়া এত ক্ষমতা ধরেন তার ভাঁজও কাউকে জানতে দেন নি।

সন্ধ্যা নামল, অন্ধকার হয়ে আসে চারিদিক। গ্রামের ধারে তিনটে খালের মোহনা। একটা নৌকো যাচ্ছে—একজন বোঠে বেয়ে চলেছে, আর একজন

গলুয়ের উপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে। দেশের গাঙে কতদিন ঠিক এমনি ধারা দেখেছি! দাঁড়ানো লোকটার চীনা পোশাক—এই যা একটুখানি আলাদা।

এক স্টেশনে চার জন কামরায় এসে উঠল—পূর্ব-চীন ছাত্র-সমিতির (East-China Student Society)-এরা—অটোগ্রাফ চায় আমাদের। সই করবার পর হাততালি। কী এক মহৎ কাজ করে ফেললান যেন! আমাদের কত-বড় সুহৃৎ ভাবে, সব জায়গায় সকল শ্রেণীর মধ্যে তার পরিচয়।

ঘোর হয়ে এলো। চব্বিশে অক্টোবর দিনটার অবসান হল দিগ্‌ব্যাপ্ত ধানক্ষেত ও দূরাস্তৃত খাল-বিলে ভরা অজানা মাঠের মধ্যে। চিরকালের মতো এই মাঠে সূর্যাস্ত দেখলাম, এই মাঠের মাথায় একটা-দুটো করে তারা কোটা দেখলাম...

হ্যাংচাউ পৌঁছলাম ঠিক সাড়ে-আটটায়। স্টেশন আলোয় ফেস্টুনে সাজিয়েছে। বাজনা বাজছে। বিপুল জনতা দাঁড়িয়ে আছে অভ্যর্থনার জন্ম। পরিচিত হচ্ছি বিশিষ্টদের সঙ্গে। বাঁ-হাতে ঝোলানো স্যুটকেশ, ডান হাতে পাওনিয়রদের দেওয়া ফুলের তোড়া। এত বড় ব্যাপার—তা কেউ এগিয়ে এলো না স্যুটকেশটা নিয়ে নিতে। সেটা নামিয়ে রেখে ডান হাতের ফুল বাঁ হাতে নিয়ে তবে শেকহ্যাণ্ড করছি। দপ-দপ করে আলো জ্বালিয়ে ফোটো নিচ্ছে বারম্বার।

শহরের ঘর-বাড়ি দোকান-পাট লোকজন দেখতে দেখতে লেকের ধারে এসে পড়লাম। সী-হু অর্থাৎ পশ্চিম হ্রদ। কিনারা ধরে যাচ্ছি। এমনই বেশ শীত—তার উপর লেকের জোলো হাওয়ায় হাড় অবধি কনকনিয়ে উঠল। সরকারি অতিথিশালায় উঠলাম। আগে হোটেল ছিল এখানে, বাড়িটার একদিক লেকের জলের মধ্যে থেকে গেঁথে তোলা। বিস্তর বড় বড় জায়গায় থেকে এসেছি—কিন্তু এ বাড়ির যা আসবাবপত্তোর, লাখপতি-কোটিপতিরা ব্যবহার করলেই মানায় ভাল (চীনের কোটিপতির কথা বলছিনে)

সময় বেশি নেই, এক্ষুনি ব্যাঙ্কুয়েটে ডাকবে। পয়লা রোজের ব্যাঙ্কুয়েট—বুঝতে পারছেন—সে রাজসূয় কাণ্ড ভাবতে গেলে অন্তরাত্মায় কাঁপুনি ধরে যায়। তবু দু-মিনিট একটু ফাঁক কাটিয়ে লেকের বারাণ্ডায় বসে নিই। আবছা-আবছা পাহাড়, জলের মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপ। জোনাকির মতন অগুন্তি আলো লেকের জলে ছড়ানো। নৌকোয় আলো জ্বলছে; দ্বীপের আলো স্থির দাঁড়িয়ে আছে জলের উপরে ছায়া ফেলে।

ডাকাডাকিতে খানাঘরে এলাম। দরজায় শান্তি-কমিটির প্রেসিডেণ্ট—এগিয়ে এসে তিনি হাত ধরলেন। উল্লসিত আর অতিমাত্রায় উত্তেজিত। বললেন, আশ্চর্য কাণ্ড ঘটেছে আপনারা এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে। আসুন, দেখুন এসে—

এক আজব ফুল ফুটেছে আজ। পোর্সিলেনের রঙিন টবে অনেক যুগ ধরে চারাটা তৈরি। এ ফুল বোঁটায় ফোটে না—ফোটে গাছের পাতার উপর। ফোটে ফুলের খেয়ালখুশি মাফিক, কোন নিয়মকানুনের ধার ধারে না। হয়ত ফুটল দশ-পনেরো বছর পরে, হয়তো বা দু-তিন বছরে। এই যেমন আজ ফুটেছে তিন বছর অন্তে। ফোটা অবস্থায় এখন অনেক কাল থাকবে। ফুলের নাম হল থাং। অথবা চোন ফুলও বলে। আকারে খুব বড়, অল্পসল্প গন্ধও আছে। কিন্তু উত্তেজনার কারণ আলাদা; বরাবর দেখা যাচ্ছে, এগুলো ফোটবার পরেই দেশের কোন পরম ক্ষণ আসে। ১৯৪১ অব্দে ফুটেছিল, মুমূর্ষু চীনের সেই তখন থেকেই বিচিত্র জীবনোল্লাস। থাং ফুল ফুটিয়ে শান্তির দূত আপনাদের এই যে শুভ পদার্পণ—আমাদের বিশ্বাস, চীনের মাটি মানুষের রক্তে ধারাস্নাত হবে না কখনো।

ফুলের ছবি তোলা হল। আবার দলের ছবি তুলল ফুল মাঝখানে রেখে। তার পরে সেই ভোজ। ভোজ সেরে রাত দুপুরে আবার বারাণ্ডায় গিয়ে বসি। কনকনে শীত, ক্লান্তিতে চোখ ভেঙে আসছে—তবু যতক্ষণ পারা যায়। ওয়েস্টলেকের পাশে এমনি রাত্রি জীবনে তো আর আসবে না!

(২২)

ভোরবেলা বাড়ি থেকে লেকের কিনারে নেমে এলাম। ক্ষিতীশ আছে; আর সঙ্গী হয়েছেন পাটনার শাণ্ডিল্য মশায়। মানুষ-জন বড় কেউ ওঠেনি এখনো। ছলাত ছলাত করে ঢেউ ভাঙছে অতিথিশালা-বাড়িটার গায়ে। ঠিক সামনের লেকের পারে পাহাড়; উঁচু শিখরে গির্জার চূড়া; পাহাড়ের নিচে ঘরবাড়ি। শহর ওদিকেও আছে।

পাকা গাঁথনির সঙ্কীর্ণ একটু বাঁধ মতন—লোক চলাচলের রাস্তা নয়—তার উপর দিয়ে যাচ্ছি। শাণ্ডিল্য বলেন, করছেন কি—পড়ে যাবেন যে!

এমন লেকে ডুবে মরেও সুখ আছে। আসুন না—আসবেন?

হাত ধরে তাঁকেও টানতে চাই বাঁধের উপর। কিন্তু রাজনীতিক মানুষ, বেকার কলমবাজ নয় অধমের মতন—স্বাধীন ভারতে বিস্তর প্রত্যাশা রাখেন,

কোন দুঃখে তিনি ডুবে মরার ঝামেলায় পড়তে যাবেন? ভদ্রজনের জন্য চওড়া পথ, সেই দিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে তিনি চললেন।

ছোট ছোট নৌকো কূলের কাছে কাছি দিয়ে বাঁধা। আরো খানিক পরে চড়ন্দার এসে জুটবে, নৌকো করে কাজে-অকাজে মানুষ লেক ঘুরবে। ছ'টা নৌকো ছপ-ছপ করে এসে আমাদের বাড়ির গায়ে লাগল। একটা দরজা সেখানে—অতিথিশালার এই দরজা দিয়ে বেরিয়েই জল। নৌকোগুলো আমাদের জন্য; ব্রেকফাস্ট খেয়ে লেকে বেরুব। নৌকো বায় বেশির ভাগ মেয়ে। জল তুলে তারা কুলকুচো করছে, মুখ-হাত ধুচ্ছে। গল্পগুজব হচ্ছে এ-নৌকোয় ও-নৌকোয়। গলুয়ের লাগোয়া ছোট্ট এক-এক কাঠের বাক্স; বাক্স থেকে বই বের করে নিয়ে এক মনে তারা পড়তে বসল। সব ক'টি নৌকোয় এক গতিক—অত ভোরবেলা ঘাটে যেন পাঠশালা বসে গেল। মানুষজন উঠে পড়লে আর হবে না—তার আগে যেটুকু লেখাপড়া শেখা হয়ে যায়।

একটা দিন শুধু এখানে—বিস্তর ঘোরাফেরা। সকাল সকাল তাই ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা। স্নানাদি সেরে আমি আবার বারাণ্ডায় বসলাম। এমন জায়গায় চার-দেয়ালে বন্দী হয়ে থাকে কোন মূর্খস্য মূর্খ? আমার খানা বাপু এইখানে পাঠিয়ে দাও।

ছয় নৌকোয় মিছিল করে লেকে চক্কোর দিচ্ছি। স্প্রিঙের গদিওয়ালা দুটো সোফা মুখোমুখি—দু-জন করে আরামে বসে পড়ুন। মাঝে টেবিল। এবং টেবিলের উপর, বুঝতেই পারছেন···ছবি দিয়েছি, ছবিতে দেখে নিনগে যান; আমি কিছু বলব না। কি নৌকোয় এক জন দোভাষি কিংবা স্থানীয় মরুব্বিদের কেউ। ক্যামেরাও যাচ্ছে গোটা দুই-তিন।

দোভাষির মধ্যে জুটেছে দুষ্ট মেয়েটা—উ চিং-তাং। এলেম দেখাবার জন্য সাংহাই থেকে এতদূর অবধি চলে এসেছে। কাল ভোজের বক্তৃতায় আগ বাড়িয়ে বাহাদুরি করতে গেল। বক্তৃতার মধ্যে একটা কথা ছিল 'রক্তস্নাত'; কথাটা দশ রকমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললাম, কিছুতে তার মাথায় ঢোকে না। ইংরেজি বিদ্যেয় আমরাও তো বিদ্যাসাগর—দেশে-ঘরে পারতপক্ষে ইংরেজি জবান ছাড়িনে গ্রামার-ভুলের আশঙ্কায়। এ রাজ্যে পরমানন্দে লক্ষ্য করছি, পিতার উপরে বহুতর পিতামহেরা আছেন। আর সবার সেরা হল ঐ—উ চিং-তাং। দেদার ইংরেজি ভুল করে, কিন্তু সে কারণে তিলেক পরিমাণ লজ্জা নেই। বরঞ্চ বীরত্বের ভাব—ইংরেজরা চীনকে বিস্তর জ্বালিয়েছে, জাতটার মাথায় মুগুর ঠুকছে যেন এই প্রণালীতে। সকলের আগে ভাগে, দেখ, পয়লা

নৌকোটায় ভাল মানুষ হয়ে উঠে বসে দিব্যি পা দোলাচ্ছে। মানুষ কাছে গেলেই, নিজে না-ই বা বুঝল, ইংরেজিতে ধড়াধ্বড় বোঝাতে লেগে যাবে। অন্যমনস্ক হয়ে আমি উঠে পড়েছিলাম আর কি ওর নৌকোয়, হঠাৎ দেখে পিছিয়ে এলাম। শেষ অবধি যেটায় উঠলাম, সেখানে আমি আর ক্ষিতীশ। আর দোভাষি পেলাম হ্যাংচাউরই মেয়ে—জানে-শোনে প্রচুর, বলেও খাসা।

লেকের জল আয়না হয়ে সূর্যালোকে ঝিকমিক করছে। পাহাড়, পাহাড়—পাহাড়ের ঘেরের মধ্যে এসে পড়লাম যে! এক পাশে একটুখানি ঐ বেরুবার ফাঁক দেখা যাচ্ছে। অপরূপ নিসর্গদৃশ্য, ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায়; হলে হবে কি—আমার হাতে খাতা-কলম। এই দুই সর্বনেশে বস্তু জীবনের সকল উপভোগ মাটি করে দিল। শনির দৃষ্টির মতো অহরহ সঙ্গে ঘোরে। শ্মশানের বহ্নিদাহের পূর্বে যে গ্রহশান্তি হবে, এমন মনে হয় না।

তিন প্যাগোডায় চাঁদের ছায়া (Shadow of the Moon in Three Pagodas)—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই বিশাল নাম জায়গাটার। নামের মধ্যে কবিতা গুনগুনিয়ে ঘুরছে। চলুন চলুন—। নৌকোয় নৌকোয় পাল্লা, কে যেতে পারে আগে; একবার বা পিছনে পড়ি, আগে মেরে উঠি আবার। কুমুদিনী মেহতা এবং আরো কে কে যেন গান গেয়ে উঠলেন ওপাশের নৌকো থেকে! গানে কলহাস্যে কথাগুঞ্জনে দাঁড়ের তাড়নায় নিস্তরঙ্গ হ্রদে আলোড়ন লেগেছে।

এদিক-ওদিক থেকে কত নৌকো কাছে এসে পড়ছে। নতুন মানুষদের সঙ্গে ক্ষনিক চোখাচোখি...সাঁ-সাঁ করে জল কাটিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে আবার তারা মিলিয়ে যায়। একটা পাথরের মরগার নিচে এসে পড়েছি। ফোটো তুলল সামনেটা নৌকোয় আটকে দিয়ে—হঠাৎ যাতে পালাতে না পারি! একটা রাস্তা লেক ভেদ করে সোজা গেছে ওদিককার পাহাড় অবধি। রাস্তার ধারে ধারে অজস্র স্থলপদ্ম—ফুলে ফুলে আলো হয়ে আছে। আবার ঐ ফোটো নিল—আমি লিখছি এই সময়ে। আহা—জলেও পদ্ম! পদ্মবনে এসে পড়েছি, ফুটে আছে একটা-দুটো—বেশির ভাগ ঝরে গেছে। ফুল ঝরে গিয়ে ডাঁটাগুলো শূলের মতন বেরিয়ে আছে। পদ্মপাতা ডুবিয়ে ডুবিয়ে নৌকো এগোচ্ছে।

প্যাগোডার গায়ে ঠকাস করে নৌকো ঠেকল। একটা এখানে, একটা ঐ আর-একটা উই যে! মোট তিন। জলের উপরে হাত দুয়েক পরিমাণ গোলাকার মাথা তুলে আছে। যতটা উঁচু হয়ে জেগে আছে, কারুকার্যে ভরা। রাত্রিবেলা প্যাগোডার মাথায় আলো দেয়, জলের মধ্যে আলোর প্রতিবিম্ব পড়ে। তাই থেকে মিষ্টি নামটা—তিন প্যাগোডায় চাঁদের ছায়া। সুং-

রাজাদের আমলের বিস্তর ভাল ভাল কবিতা আছে এর উপরে। মজা দেখুন—আমাদের এই নৌকোর গায়েও কাঠ খোদাই করে এক প্রাচীন কবিতা—'যেন এক পাতা ভেসে যাচ্ছে, নৌকোটাকে এমনি দেখাচ্ছে খালের উপরে।' আ মরি, মরি! মরবার পক্ষে অতিথিশালার ঘাটের তুলনায় এটা আরও মনোরম স্থান! আজকে যেন কি হয়েছে...লেকের উপর ভাসতে ভাসতেও সেই মরার কথা।

পাশের নৌকো থেকে কুমুদিনী বললেন, মরা-মরা করছেন—ডুবে মরার উপন্যাস লিখতে চান বুঝি?

আর একজন—পেরিনই বোধ হয়—বললেন, তবে তো অন্য কারও মরার দরকার। উনি নন। উনি উপন্যাস লিখবেন সেই মানুষটির মরণ নিয়ে।

অতএব হাঁকডাক শুরু হল, মরে গিয়ে উপন্যাসে কে চির-অমর হতে চান? উঠে দাঁড়ান—

দোভাষি হেসে বলল, জল এখানে মোটে এক মিটার—অর্থাৎ চল্লিশ ইঞ্চির কম। ঝাঁপিয়ে যদি পড়েন ডুবে মরার উপায় নেই, শেওলা আর কাদা মেখে ভূত হবেন শুধু। নিরর্থক খাটনি।

অতএব নিরস্ত হওয়া গেল।

প্যাগোডার সামনাসামনি জায়গাটা দ্বীপ। লম্বায় অনেকটা। গাছপালাগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়েছে লেকের জলে। একটা ঘন সবুজ নিরবচ্ছিন্ন শান্তি হাতছানি দিয়ে ডাকছে। দ্বীপের উপরেও জল—জলের উপর দিয়ে আঁকাবাঁকা পাথরের সেতু চলে গিয়েছে। মাঝে মাঝে ঘর; যেখানেই মাটি পাওয়া গেছে, মন্দিরের ঢঙে ঘর তুলেছে, বেদি বানিয়েছে। এমনি ঘুরতে ঘুরতে দ্বীপের অন্য প্রান্তে এসে দেখি—বা রে, আমাদের ছয় নৌকো আগে-ভাগে পৌঁছে অপেক্ষা করছে।

কোণাকুণি পাড়ি মেরে উঠলাম এবারে এক বিলাস-প্রাসাদে। জল ছাড়া পথ নেই সে বাড়ি ঢোকবার। সমস্তটা জায়গা জুড়ে বাড়ি আর বাগান। জলের ভিতর থেকে বাড়ি গেঁথে তুলেছে। পুরানো অট্টালিকা, বনেদিয়ানার ছাপ সর্বত্র। শৌখিন আসবাবপত্র। শখ করে এমনি জায়গায় বাড়ি বানিয়ে এমন সজ্জায় সাজিয়ে যাঁরা বসবাস করতেন, কি দরের মানুষ তাঁরা আন্দাজ করুন। সাত শ বছর আগেকার এক মস্ত কবি সু তুং-ফু; তাঁর কবিতায় এই অট্টালিকা পাওয়া যাচ্ছে—'চাঁদ উঠেছে, ফুরফুরে হাওয়ার পোষাক উড়ছে ওয়েন তিয়েন-সিয়াঙের। এখানে যে গান, পিকিন তা মোটে ভাবতেই পারে না। শত্রু এসে পড়ল—তবু দেখ, ফুল ফুটে আছে আর নাচ চলেছে।'

সেই জায়গা। ওয়েন তিয়েন-সিয়াঙও হলেন কবি, প্রচারক, মস্ত বড় বীর। শত্রুরা মেরে ফেলল, তিনি কিছুতে আত্মসমর্পণ করলেন না।

পরবর্তী কালে লিউ নামে এক জাঁদরেল সরকারি লোক গ্রীষ্মাবাস বানালেন এখানে। পঁচিশ বছর আগেও তিনি ছিলেন। এখন কবর রয়েছে। মূল কবর ঘিরে আরও এগারোটা কবর এগারো বউয়ের। মরে গিয়েও বধূকুল পরিবেষ্টনে উত্তম জমিয়ে আছেন। নতুন আমলে আইন খারাপ, একাধিক বউ নিয়ে ঘর করবার জো নেই। ঐতিহাসিক এই অট্টালিকা এখন রেলকর্মিদের বিশ্রামপুরী; মহাকবি সু তুং-ফু-র নামে উৎসর্গ-করা। সেরা কর্মিক যারা—বেশী কাজ করছে আর খুব ভাল কাজ করেছে—এমনি ষাট জন করে এখানে থাকতে পায়। ভারি ইজ্জতের ব্যাপার বিশ্রামপুরীতে এসে থাকা। তাই তো দেখে এলাম, এক হাত পুরু গদির উপর কর্মিক মশায়রা গড়াচ্ছেন কিংবা উবু হয়ে বসে তাস পিটছেন। শুধু তাস নয়, নানা রকমের খেলাধুলা রেডিও গ্রামোফোন বই পত্র-পত্রিকা—মনোরঞ্জনের হরেক ব্যবস্থা। আমাদের দেখে হাততালি; এ-ঘরে ও-ঘরে উঠোনে-বাগানে যেখানে যাই, হাততালি সামনে-পিছে ঘিরে চলেছে। হাততালি আর অভিনন্দন তাড়িয়ে তুলল ফের আমাদের নৌকোয়। জোরে জোরে বাও গো মা-লক্ষীরা! জলের কিনারে কর্মিকরা কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরাও হাততালিতে প্রত্যভিনন্দন দিতে দিতে পিঠটান দিচ্ছি।

বিশ্রামপুরী থেকে এক অভিনেতা সঙ্গ নিয়েছেন। নৌকার উপর তিনি অ্যাক্টো শুরু করলেন। আমাদের এরাঁই বা কম কিসে, ধরলেন গান। উটকো মানুষ যারা এদিকে-ওদিকে যাচ্ছিল, চুম্বকের টানে এসে আমাদের নৌকোর মিছিলে ভিড়ে যায়।

লেক-বিহার শেষ করে অবশেষে ডাঙায় উঠলাম। হ্যাংচাউয়ের আর এক প্রান্ত। এক বাগিচা—বাগিচার পুকুরে রঙিন মাছের বিপুল সংগ্রহ। মাছের খেলা দেখাতে এখানে নিয়ে এলো। উ চিংতাঙের সর্বত্র ফড়ফড়ানি—ইংরাজিতে পরিচয় দিচ্ছে, মাছগুলো 'ওয়েল অরগানাইজড'। বলতে চেয়েছিল বোধ হয় 'ওয়েল অ্যারেনজড'। আর যাবে কোথা, অট্টহাসি চতুর্দিকে। সমস্ত দিন এবং সাংহাইয়ের ফিরতি ট্রেনে গভীর রাত্রি অবধি, যে পারছে মেয়েটাকে ক্ষেপিয়ে মজা দেখছে।

কাল কি কাণ্ড করেছিল, সে বুঝি জানেন না? কার একটা শাড়ি চেয়ে নিয়ে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে সজ্জা করেছে। বলে, কেমন দেখাচ্ছে বলুন।

দেখাচ্ছে সত্যি চমৎকার! ফুটফুটে রঙে খাসা মানিয়েছে, চোখ ফেরানো যায় না। হাঁটতে গিয়ে জড়িয়ে পড়ে মরে আর কি! সেই যে সেকালে লোহার জুতো পরিয়ে রাখত, তারই দোসর। ট্রেনে উঠে এক নতুন ডাংপিটেমি মাথায় উদয় হল, সিগারেট খাবে। খাবে ঠিক কল্কে-টানার কায়দায়। একজন কাকে দেখেছিল ঐভাবে টানতে, সেই থেকে মাথায় ঘুরছে। আঙুলের ফাঁকে সিগারেট খাড়া রেখে সোঁ-ও-ও ও করে দিয়েছে মোক্ষম টান। চোখ লাল হয়ে কেশে ভিরমি লেগে পড়ে যাবার দাখিল। ঝিম হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। তা বলে ছেড়ে দেবে—সামলে নিয়ে আবার টানছে। এবার মৃদু ভাবে, বেশ সইয়ে সইয়ে। কায়দাটা রপ্ত করে নিয়ে তবে সোয়াস্তি। এবারে কেমন জব্দ! ঐ মেয়ে গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে ভুল ইংরেজীর বেকুবি এবং সেই বাবদে ক্ষেপানো শুরু হওয়ার পর থেকে।

জায়গাটা যেমন মনোরম, পুরানো কীর্তিরও তেমনি গোনাগুনতি নেই। এখানে-সেখানে বহু সাধক ও শহীদের স্মৃতি-নিদর্শন, প্রভু বুদ্ধের নামে উৎকৃষ্ট অসংখ্য গুহা ও মন্দির। ঘণ্টা কয়েক মাত্র হাতে, এর মধ্যে ক'টা জায়গায় বা যাবো, আর কি-ই বা পরিচয় দেবো আপনাদের! দুই বুদ্ধ-মন্দিরের মাঝে শ্যাম গিরিচূড়া—সেই-লাই (Tse Lai)। ভারতের রাজগির থেকে উড়তে উড়তে উনিই নাকি লেকের ধারের জায়গাটা পছন্দ হয়ে যাওয়ায় ঝুপ করে বসে পড়েন। 'হাস্যানন বিশাল-বুদ্ধ'—মস্ত এক পাহাড় খোদাই করে বুদ্ধ-মূর্তি বানিয়েছে, হাসিতে ঝলমল মুখখানা। এক পাহাড়ের কাছাকাছি তিন মন্দির—মন্দিরের নাম বাংলা করলে দাঁড়াচ্ছে—ঊর্ধ্ব ভারত-মন্দির, মধ্য ভারত-মন্দির আর নিম্ন ভারত-মন্দির। আর একটা মন্দিরের নাম হল—ছয় দিকের মন্দির। ছ'টা দিক হল—উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম, ঊর্ধ্ব-অধঃ। পৃথিবীর তাবৎ অঞ্চল থেকে ভক্তেরা বুদ্ধের উপাসনায় সমবেত হবেন, তদর্থে মন্দিরের এই নাম।

একটু এগিয়ে রাস্তার উপর বাস। অমিতাভ বুদ্ধ-মন্দিরে এবার। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিস্তর মন্দির; উঠোন এবং পূজা-অর্চনার ঘরও। অনেক; ধর্মশাস্ত্র ও প্রাচীন পুঁথিপত্রে ঠাসা লাইব্রেরী। শ্রমণদের বাসা এক দিকে—দিব্যি খোলামেলা। বুড়োরা দিনরাত শাস্ত্রচর্চা নিয়ে আছেন। জোয়ান যুবাদের এ সব তো আছেই, তার উপরে বাড়তি কাজ—চারি পাশের জায়গা-জমিতে ফলমূল শাকসব্জি ও নানারকম ফসল ফলানো। নতুন চীনের সঙ্কল্প, এক ফোঁটাও পতিত জায়গা থাকতে দেবে না—সে কর্মে সাধুরাও কোমর বেঁধেছেন।

বহুমূর্তি—সোনার পাতে মোড়া বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও দিকপালেরা। মুখ্যমন্দির অতি প্রকাণ্ড; রকমারি রঙিন চিত্রে ছাত ভরতি। ভিতরে মধ্যমূর্তির মাথা ঐ অমন উঁচু ছাত অবধি গিয়ে উঠেছে। কপালে উজ্জ্বল বৃহৎ মুক্তা, বুকে স্বস্তিক। সামনে ধূপাধার—তার সাইজও বুদ্ধমূর্তির অনুপাতে। ধূপের ছাইয়ে অত বড় পাত্র কানায় কানায় ভরতি।

পিছনে আর এক মন্দির। তিনটি বৃহৎ মূর্তি পাশাপাশি—তিন মূর্তিরই বুকে স্বস্তিক। মধ্যমূর্তির হাতে অর্ধচক্র—সেই দিকে বুদ্ধ নিবদ্ধদৃষ্টি। জগতের যাবতীয় ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্য তিনি অবলোকন করছেন এমনি ভাবে। এই মূর্তিদের ঘিরে চতুর্দিকে আরও চুরাশী মূর্তি—ভারত থেকে গিয়ে হাজির হয়েছেন নাকি। পূজার বিস্তর হাঙ্গামা, অনেক রকম তোড়জোড় করতে হয়। মন্দিরের বাইরে দোকানপাট পূজার উপকরণ বিক্রির জন্য। আমাদের তীর্থস্থানে যে রকম দেখতে পান।

একটা ছাত ধ্বসে পড়ে গিয়েছিল অনেকদিন আগে, নতুন আমলে সেটা মেরামত হয়েছে। এখনো টুকিটাকি কাজকর্ম চলেছে, দেয়াল-ছবিতে নতুন করে রং ধরাচ্ছে। ষোল শ বছর আগে এ সব তৈরি। পাশের মন্দিরে স্থাপয়িতার মূর্তি। মন্দির তৈরির কাঠ আসত বহু দূর থেকে। আসত নাকি মাটির নিচে পাতালপুরীর পথে। এক কুয়োর তলায় পৌঁছে সেখান থেকে সমস্ত কাঠ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ভুঁয়ের উপরে উঠে আসত। মন্দির শেষ হয়ে এলে মানা করে দেওয়া হল, আর কাঠ লাগবে না। সঙ্গে সঙ্গে আমদানি বন্ধ। কাঠ আসতে আসতে বন্ধ হয়ে গেল পাতালে; একটা কাঠ কুয়োর তলা অবধি চলে এসেছিল—সেইখানে আটকে রইল। তার পরে খেয়াল হল —আরে সর্বনাশ, সব চেয়ে বড় কড়িকাঠটাই তো লাগানো হয়নি। আর উপায় নেই। কুয়োর তলার কাঠ কোন রকমে উপরে তোলা গেল না। তখন জোড়াতালি দিয়ে মূল-কড়িকাঠ বানানো হল। চোখেও দেখলাম তাই। উৎকৃষ্ট কাঠ দিয়ে মন্দিরের অন্য সকল কাজকর্ম—কিন্তু আসল কাঠখানায় তালি দেওয়া। সেই কুয়ো রয়েছে মন্দিরের চত্বরে—দড়িতে আলো ঝুলিয়ে তার ভিতরে নামিয়ে দিল। অন্ধকার তলদেশে দেখতে পেলাম বটে প্রকাণ্ড কাঠের কুঁদোর অগ্রভাগ। একটু কারুকর্মও আছে সেই কাঠের উপর।

বাসায় ফিরে দেখি, খাওয়ার ঘণ্টাখানেক দেরি। সময়ের অপব্যয় করি কেন—সিল্কের দোকানে কিছু কেনাকাটা করা যাক। হ্যাংচাউ নানা জাতীয় শিল্প-কর্মের জায়গা; এখানকার রেশমি ব্রোকেডের ভারি নাম। সবাই চললাম; সওদা হল প্রচুর।

নাকে-মুখে দুটো গুঁজে এবার একজিবিশনে। যে জায়গায় যাচ্ছি, একজিবিশন আছেই। সেই অঞ্চলে কি কি বস্তু তৈরি হয়, কি তার দাম, কোন কোন বিষয়ের নতুন কি চেষ্টাচরিত্র চলছে—এক নজরে মালুম হবে। মানুষও ছোটে মেলা দেখবার মতো। ধরতে পারে না, কায়দা করে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাদের। সর্বত্র যেন শিক্ষার ফাঁদ পেতে রেখেছে; না শিখে যাবে কোথা বাছাধন!

পাটচাষের বিপুল উদ্যোগ। একটা লম্বা ঘরে কলকব্জা বসিয়ে গাঁইটবাঁধা এবং চট ও থলে তৈয়ারি দেখানো হচ্ছে। তেমনি দেখাচ্ছে সিল্কের উপর ছবি-বুনানি ও ব্রোকেড-তৈরি। কাগজের কল, সিগারেটের কল—আরও বিস্তর ভারী ভারী কলকব্জার নমুনা রেখে দিয়েছে।

একজিবিশন থেকে মিউজিয়াম। ভারি এক মজার জিনিস এখানে। পুরানো এক পাত্র—ওরা বলল, হাজার খানেক বছর বয়স—পাত্রের নিচে খোদাই করা আছে চারটে মাছ, মাছের মুখ থেকে থেকে ফোয়ারার মতন জলধারা উঠছে। পাত্রটা জলে ভরতি করে আংটা দুটো ঘষতে লাগল। ঘষতে ঘষতে শুনি, শিরশির করে আওয়াজ উঠছে জলে। তারপর সত্যি সত্যি ফোয়ারার ধারায় জল উঁচু হয়ে উঠতে লাগল পাত্রের নিচে ঠিক যেমনটা আঁকা রয়েছে। হ্যাংচাউ-মিউজিয়ামের এই আশ্চর্য বস্তুটা অতি অবশ্য দেখে আসবেন।

হ্রদের ঠিক উপরে পাহাড়ের গায়ে বাগিচা। ঝরনা আছে সেখানে, কুঞ্জবন, রং-বেরঙের মাছ, নানা রকম গাছপালা। টিলার উপরে বসবার জায়গা—বসে বসে হ্রদ-শোভা অবলোকন করুন। হ্রদটা দু-ভাগ করে মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে—সীমন্তিনীর কালো চুলে সিঁথিপাটির মতন। আর এদিকে ওদিকে ছড়ানো অগুন্তি পাহাড় ও দ্বীপের টুকরো।

মেয়ে-পুরুষ বাচ্চা-বুড়ো ঘিরে দাঁড়ায় আমাদের। সংবর্ধনা করছে, আর ঐ সঙ্গে মাও-তুচি অর্থাৎ চেয়ারম্যান মাও'র চিরজীবন কামনা। ভাষা না বুঝি—এটা বুঝতে পারি, ওদের বুক কানায় কানায় ভরে আছে মাও'র প্রতি ভালবাসায়।

বিদায়বেলা শান্তি কমিটির এক কর্তাব্যক্তি বললেন, বসুন—কটি জিনিস নিয়ে যেতে হবে,—আমাদের সামান্য স্মরণ-চিহ্ন। হ্যাংচাউয়ের হাতের কাজের জুড়ি নেই। তারই একগাদা করে দিয়েছে প্রতি জনকে। হাতির দাঁতের মূর্তি, চন্দনকাঠের পাখা, চিত্রবিচিত্র ছাতা, রুমাল—আরও কত কি, এত্তুদিন বাদে ফর্দ দিতে পারব না। বিদায়-বক্তৃতায় বললাম, ভাষার কারিগর

বটে আমি, কিন্তু অন্তর ভরে গেছে। ধন্যবাদ দেবো, সে ভাষা আজকে খুঁজে পাচ্ছি নে…

বাড়িয়ে বলা নয়, সত্যি সেই অবস্থা। স্টেশনে যাচ্ছি, পদে পদে ভালবাসার বাঁধন ছিঁড়ে এগোচ্ছি যেন। এক দঙ্গল চলল স্টেশন অবধি। সাড়ে সাতটায় হাংচাউ ছেড়ে ট্রেন রাত-দুটোয় সাংহাই এসে দাঁড়াল। ঘুমোবার অধিক সময় নেই, ন'টার আগে এরোড্রোমে হাজির হব। এখান থেকে ক্যাণ্টন। আসবার সময় ক্যাণ্টনে একটা রাত শুধু নিলাম—ফিরতি মুখে এবারে কিছু দেখে-শুনে যাবো।

(২৩)

বিদায় সাংহাই !

এরোড্রোমে প্লেনের ভিতরে বসে বসে দেখছি। তেপান্তরের মাঠ। লড়াইয়ের কাজে এত বড় করে বানিয়েছিল। এখন খানিকটা জায়গায় প্লেনের উঠানামা, বেশির ভাগ পোড়ো-জমি ও ঘাসবন হয়ে আছে। এই উঠানামার এলাকা বাড়ানো হচ্ছে, গ্যাংওয়ে লম্বা করা হচ্ছে, নতুন নতুন কোঠাবাড়ি উঠেছে এদিকে-ওদিকে। কাচের জানলা দিয়ে অলস দৃষ্টি মেলে দেখছি।

নদী অদূরে। জল দেখতে পাইনে, কিন্তু মন্থরগতি পাল ভেসে চলেছে হাওয়ায়। গোটা দুই-তিন জাহাজের মাস্তুল স্থির দাঁড়িয়ে। কাশবন মাঠের প্রান্তে, হু-হু করে হাওয়া দিয়েছে—পলিতকেশ বুড়োর মতন কাশফুল মাথা দোলাচ্ছে। নাম-না-জানা গুল্মে অজস্র হলদে ফুল ফুটে আলো হয়ে আছে চারিদিক। রুমাল নাড়ছে হাস্যমুখ মেয়েরা ওধারে বারাণ্ডার উপর ভিড় করে। বারাণ্ডার নিচে পায়োনিয়র ছেলেমেয়ের দল। মুরুব্বিরা প্লেনে উঠবার সিঁড়ি অবধি এগিয়ে এসেছেন। রুমাল আর হাত নাড়ছে সকলে। আমরা যেমন করে কাউকে কাছে ডাকি, ওরা ঠিক তেমনি ভাবে হাত নেড়ে বিদায় দেয়। এঞ্জিন গর্জন করছে, বিদায়, বিদায় !

সুপ্রাচীন এক প্যাগোডার চূড়া, নামটা জেনে নিয়েছি—লং-ফা প্যাগোডা। আর ফ্যাক্টরির অসংখ্য চোঙা ধোঁয়া ছাড়ছে আকাশে। আমার পাশে বসে এক ভদ্রলোক শহর থেকে এরোড্রোম অবধি এলেন। অল্প-সল্প ইংরেজি জানেন, মনের দোর মুক্ত করে দিয়েছিলেন তিনি একেবারে। দু-জনেই পরস্পরকে উত্তম রূপ বুঝি, এটা তিনি ধরে নিয়েছেন; অপার দুঃখ-রাতি কাটিয়ে উভয় জাতিরই সূর্যালোকের পথে যাত্রা। তাঁকেও ঐ দেখতে পাচ্ছি

—দলের বাইরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন। ছুটছে প্লেন গ্যাংওয়ের উপর, গর্জন ভয়ানক রকম বেড়েছে। উঠে পড়লাম আকাশে। খাল-নদী, বিশাল শহর, শহরের ঘরবাড়ি একদিকে হেলে পড়েছে। শহর পিছনে ফেলে সাঁ করে বেরিয়ে এলাম।

সকালবেলা আজ কিংকং হোটেলের জানালা দিয়ে প্রসন্ন রোদ মেজেয় পড়েছিল। পেরিন লাফিয়ে উঠলেন, দেখ, দেখ—কি আশ্চর্য রোদ্দুর! সোনা কুড়িয়ে পেলে মানুষ অমন করে না। চলে যাবার ক্ষণে সাংহাইয়ের সূর্য প্রথম আমাদের মুখ দেখালেন ; রোদ পোহাতে পোহাতে এসে প্লেনের খোপে ঢুকেছি। কিন্তু আকাশে উঠেই কোথায় সব রোদ মিলিয়ে গেল! মেঘ, মেঘ —মেঘের সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছি, মেঘ ছাড়া কিছু নেই কোন দিকে। জানলার কাচ কুয়াশায় আচ্ছন্ন। জানলার এধারেও দেখি জল ফুটেছে, ফোঁটা হয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। দেশের মানে—আপনাদের কাছে ফিরে আসবার জন্য, মেঘ ভেদ করে তীরবেগে ছুটনি। আচ্ছা, টুপ করে যদি ভুঁয়ে পড়ত প্লেন, এমন তো আকচার হচ্ছে—কাগজে এক ছত্র নামটা হয়তো দেখতে পেতেন, কিন্তু আমাদের মনের আকুতি একটুও পৌঁছত কি আপনাদের মনে?

২-৩৫-এ ক্যাণ্টন পৌঁছবার কথা। দুটো নাগাদ পাইলটের ঘর থেকে কবলু জবাব এলো—দেরী হবে, পৌঁছচ্ছি ৩-১৮ মিনিটে। বিষম এক মুখোড় বাতাসের সামনে পড়েছিলাম, বিস্তর হুটোপুটির পর পবনদেব পরাস্ত হয়েছেন। বাইরে এত কাণ্ড, ভিতরের আমরা কিছু জানিনে—আণ্ডা-আপেল মুখে ঠাসছি আর হাতে কলম চালাচ্ছি।

আবার উজ্জ্বল রোদে এসে পড়েছি, রোদের সমুদ্রে ঢেউ তুলে তুলে যেন উড়ছি। ভূমিতল স্পষ্ট হয়ে এলো। পাহাড়ের উপরে এখন—অগণ্য শিখর, ঝিকমিকে ঝরনাধারা। আরে, এসে গেলাম যে ক্যাণ্টনে! সেই আর একদিন এইখানে আমায় একলা ফেলে রেখে যাচ্ছিলেন, আজকে দলনেতা হয়ে সকলকে বহাল তবিয়তে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। এরই নাম মহৎ প্রতিশোধ!

নতুন জায়গায় পা ফেললে যেমন হয়ে আসছে—কচি কচি হাতের কুসুম-গুচ্ছ, আর শত শত হাতের হাততালি। এবং নানান দিক থেকে ক্যামেরার ঝিলিক হানা। হোটেলে ঢুকবার মুখে পুনরায় এক দফা অভ্যর্থনা।

সেই আই-চুন হোটেল—পাশে বয়ে চলেছে আনীল-সলিলা তরঙ্গময়ী পার্ল।

স্নান এবং বিশ্রামাদি হল। বাহাত্তর শহীদের সমাধিভূমি—যাবার সময় মোটে একটা রাত্রি ছিলাম, কোনখানে যাওয়া হয়নি। কুমুদিনী মেহতা, পেরিন এবং আরও কে কে যেন আমার কাছে জিজ্ঞাসা করতে এলেন। হ্যাঁ, সকলের আগে ঐ শহীদস্থানে ফুল দিয়ে তাঁদের প্রণাম করব। মেয়েরা বেরিয়ে পড়লেন; ঘণ্টা খানেকের মধ্যে তৈরি করিয়ে আনলেন সাদাফুলের দেড়মানুষ সমান স্তবক। পরম যত্নে এবং অতি সন্তর্পণে সেই বস্তু গাড়িতে তুলে নিয়ে দলসুদ্ধ আমরা চললাম।

জায়গাটার নাম বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'হলদে ফুলের পাহাড়'। তাই বটে! মর্মরসৌধের চতুর্দিকে লক্ষ-কোটি তারার মধ্যে হলদে হলদে ফুল ফুটে আছে। ২৯শে মার্চ, ১৯১১—সান ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে এই অঞ্চলের গর্বনরের বাড়ি হানা দিল একশ সত্তর জন তরুণ বিপ্লবী। তার মধ্যে বাহাত্তর জনকে পাওয়া গেল—বাহাত্তরটি স্তূপীকৃত শবদেহ। বাকি তারা কোথায় গেল, কেউ জানে না। সেই বাহাত্তর বীরকে বয়ে নিয়ে এসে এইখানে মাটি দেওয়া হল। স্মৃতিসৌধ অনেক পরে হয়েছে ১৯১৯ অব্দে—বেশির ভাগ খরচ দিয়েছিলেন প্রবাসী চীনারা।

সেই বিশাল পুষ্পোপহার-বহনের গৌরব আমাকেই দিলেন সকলে; ভারতীয় প্রতিনিধিদের তরফ থেকে আমি পুষ্পার্ঘ্য দিলাম। কয়েকজন সশস্ত্র সৈনিক দিবারাত্রি এখানে পাহারা দেয়। আমাদের দেখে এদিক-ওদিক থেকে বাড়তি সৈন্য অনেক এসে জুটল। সাধারণ মানুষও বিস্তর দাঁড়িয়ে গেছে। দোভাষি বললেন, বলুন আপনি কিছু; ওরা শুনতে চাচ্ছে। পেরিনও বলছেন, বলুন; বলুন। কিন্তু কী এদের সম্বন্ধে এখন ইনিয়ে বিনিয়ে বলব! এত বয়স অবধি নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে বেঁচে রয়েছি—তাতে যেন আজকে ছোট হয়ে যাচ্ছি এদের সামনে, লজ্জা লাগছে। এরাও তো বেঁচে থাকতে পারত! কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের শতেক লাঞ্ছনা হজম করে বাঁচতে তারা চাইল না। আমি যে জানতাম এমনি কত জনকে, কত তাঁদের সান্নিধ্য পেয়েছি! কথার বেসাতি করে তো জীবন কাটল,—কিন্তু এমন কথা কোথায় আজ পাই, যা দিয়ে এদের স্তুতি-গান গাঁথা যায়।

না, বক্তৃতা নয়; শুধু গান। এই দিনান্তগুলো সুরে সুরে ক্ষিতীশ এদের বন্দনা করবে। সে কোন নতুন গান নয়—ঠিক এই গানই আরও কতবার

শুনেছি। কিন্তু স্থান-মাহাত্ম্যে গানের কথা আজকে পাগল করে তুলল। আর বাংলায় গান যখন, আমারই বুঝিয়ে দেবার দায়। কিন্তু এ কি করছি—গানের মধ্যে নেই, তেমনি কত কি বলে চলেছি আকুল কণ্ঠে। বক্তৃতা বলবেন না একে, আমার মর্মছেঁড়া অশ্রুজল। বন্ধু, চোখে না-ই দেখে থাকি, চিনি আমি তোমাদের সকলকে। ভাল করে চিনি। আমাদেরও কত ছেলেমেয়ে গেছে এমনি! তারা আর তোমরা এক জাতের। এক তোমাদের ধর্ম, একটি মন। মানুষের মুক্তির জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, যে দেশ এবং যে কালেরই হোন—তাঁদের নামে কুসুমাঞ্জলি। কুসুম দিলাম ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, প্রীতিলতা, ভগৎসিংদেরও। আমার স্বদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে আজ এই সন্ধ্যালোকে সকলকে আমি পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি…

শহরের ভিতর ঘোরাঘুরি করতে করতে এলাম—কৃষক-শিক্ষণ-কেন্দ্রে। চাষীদের একেবারে আপন জায়গা। ১৯২৬ অব্দে মাও সে-তুং শিক্ষণ-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করেন কৃষক-আন্দোলনে কৃষকদের গড়ে তোলবার জন্য। তিনিই ছিলেন পরিচালক। আজকের প্রধানমন্ত্রী চাউ এন-লাই ছিলেন এক মাস্টার এখানকার; কো মো-জো এক কর্মী। গাছের তলায় একটুখানি চাতাল মতন—এইখানেই গভীর রাত্রি অবধি বসে মাও চাষীদের নিয়ে বৈঠক করতেন। রাত্রি বেলা কেন্দ্রের কাজকর্ম এখন বন্ধ হয়ে গেছে, ঘরবাড়িগুলোই শুধু দেখা হল।

হোটেলে ফিরতে-না ফিরতে ব্যাঙ্কুয়েটে গিয়ে বসল। দলনেতার বসতে হয় হলের মাঝখানটায় সকলের বড় টেবিলে সর্বদৃষ্টির সামনে। একটেরে বসে আত্মরক্ষা করব, সে জো নেই। টেবিলের উপরে থরে থরে রাক্ষুসে আয়োজন। এ-ও কিন্তু গৌরচন্দ্রিকা—খাওয়া বলবেন না একে, নিতান্তই চাখা। চাখার কাজ শেষ হয়ে গেলে তখনই আসল খাবার পদের পর পদ আসতে থাকবে। চীনে আমাদের দিন শেষ হয়ে এলো, আয়োজন তাই হিমালয়স্পর্ধী হয়ে উঠেছে। যাকে বলে শেষ মার।

ডক্টর কিচলু ভোরবেলা ট্রেনে এসে পড়ছেন। এলে তো বেঁচে যাই। আমার এই আবুহোসেনি বাদশাহির ভার-বোঝা নামিয়ে বাঁচি। একটা দিন আগে যদি আসতেন, এই বিষম ভোজ থেকেও রক্ষা পেয়ে যেতাম। শীতের জায়গা, তবু—হলপ করে বলছি—আলোয়ানের নিচে সর্বদেহ ঘেমে উঠেছে। মুখ শুকনো করে বলি, শরীর ভাল লাগছে না। রাত্তিরবেলাটা নিরম্বু উপোস দেবো ভেবেছিলাম—

মুরুব্বিরা শশব্যস্তে শুধান, অ্যাঁ, সে কি? অসুখ-বিসুখ করল বুঝি? কি রকমটা হচ্ছে বলুন তো?

সর্বনাশ, এ কোন দিকে চলেছি! চাটু থেকে উনুনের আগুনে। সেই পিকিনের মতন ডাক্তার-নার্সের জিম্মায় যদি ঠেলে দেয়! মিনিটে মিনিটে ওষুধ খাওয়াতে লেগে যায় শিয়রে নার্স মোতায়েন রেখে! সুরটা যেন সেই ধরনের। তার চেয়ে চোখ-কান বুজে যতদূর পারি চালিয়ে যাই। এখন তো গলাধঃকরণ করে নিই, তার পরে কায়ক্লেশে ঘর অবধি গিয়ে যে কাণ্ড হবার হোক গে।

কি হয়েছে আপনার?

এক গাল হেসে তাড়াতাড়ি সামলে নিই, হবে আবার কি। বড্ড বেশি খাওয়া হচ্ছে, এ বেলাটা একটু বিশ্রাম নেবার তালে ছিলাম। যাকগে—কম কম খাবো। এই আরজি জানিয়ে রাখছি আগে-ভাগে।

ওঁরা সন্দিগ্ধ চোখে তাকাচ্ছেন। ষোল আনা যে বিশ্বাস করেছেন, তা নয়। কিন্তু আমার অত উৎসাহের উপর কি আর বলবেন। নিরামিষ ব্যাঙের ছাতা গোটা দুই-তিন একসঙ্গে মুখে পুরে কপ-কপ করে চিবিয়ে অটুট স্বাস্থ্যের প্রমাণ দিয়ে দিই।

এর পরে সর্বোত্তম তরকারিটা এলো—শূওরের পাখনার ডালনা। সাবু খেয়ে থাকেন তো জরজারি হলে? রং অবিকল অমনি, এবং বস্তুটা ওর চেয়েও আঠা-আঠা।

কম করে দেবেন।

শান্তি-কমিটির সভাপতি আমার পাশে, বড় পাত্র থেকে তিনি চামচে কেটে কেটে দিচ্ছেন। বিগলিত কণ্ঠে ভদ্রলোক বললেন, মুখে ঠেকিয়েই দেখুন না। তার পরে বলবেন।

এক নাগাড়ে তারিপ শুনে শুনে দুর্বুদ্ধির বশে প্রায় পুরো চামচে গলায় ঢেলে দিয়েছি। আর যাবে কোথায়! যে আশঙ্কা করেছিলাম, তাই বুঝি এই ভোজের টেবিলে ঘটে যায়। অন্নপ্রাশনের দিনে প্রথম-খাওয়া অন্নগ্রাস অবধি ঠেলেঠুলে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে।

অসহায় ভাবটা মুখে চোখে প্রকট হয়ে থাকবে। চতুর মেয়ে কুমুদিনী হলের নির্বিঘ্ন দূরপ্রান্ত থেকে খুক-খুক করে চাপা হাসি হাসলেন। হেন অবস্থায় ধৈর্য থাকে না। ঠেলেঠুলে এই বিপাকে ফেলে দিয়ে এখন আপনারা মজা দেখছেন। এই বটে কলির ধর্ম।

আজকে আমার শেষ-সম্ভাষণ চীনদেশে এই চীনা বন্ধুদের মধ্যে। কিচলু এসে পড়লে কে ঝামেলায় যাচ্ছে। আছিও মোটে আর কালকের দিনটা। বললাম সেই কথাই—এক মাসের বেশি হয়ে গেল, এই ক্যাণ্টনে এমনি এক রাত্রে ভয়ে ভয়ে পা ফেলেছিলাম। সেদিন ছিলাম নিতান্ত পরদেশী। তার পরে আত্মীয় করে নিলেন আপনারা। আজকে আমি পুরোপুরি আপনাদের একজন। আমাদের দলের সকলেই তাই। চলে যাবো, তাই দেখুন চোখে জল ভরে আসছে, কথা ফুটছে না মুখে—

বড্ড ভারি হয়ে যাচ্ছে, তাই কিঞ্চিৎ হাসিয়ে রসিয়ে দিই।—যেতে মন চায় না আপনাদের ছেড়ে। ভেবেছিলাম যাবো না আর—পাকাপাকি থেকে যাবো। তাই কি হতে দেবেন? এমন খাওয়াচ্ছেন যে পাকস্থলী বিদ্রোহ করে বসেছে। সেই জন্যেই তো থাকা চলল না।

প্রায় পেশাদার বক্তা হয়ে উঠেছি, বিদেশ-বিভূঁয়ে এদের বোকাসোকা পেয়ে মজাসে আগড়ুম-বাগড়ুম চালাচ্ছি। তা বলে কামারের বাড়ি সূচ চুরি চলে না। আপনাদের কাছে হলে—ওরে বাবা, হাততালি দিতেন না, একখানা হাত বক্তার গলদেশে স্থাপন করতেন, আর এক হাতে পথ দেখাতেন। ক্ষিতীশ ভারি খুশি। বলে, আচ্ছা জমিয়েছেন দাদা! এবং আরো খুশি ভোজ অন্তে যখন এক গাদা উপহারসামগ্রী এসে পড়ল। ক্যাণ্টন ভালবাসে তোমাদের—ভাগ্যবশে এই যাদের কাছাকাছি পেয়েছি, তাদেরই শুধু নয়, ভারতের সকল নরনারীকে। এবং আজ বলে না, হাজার হাজার বছরের অবিচ্ছিন্ন ভালবাসা। ছয়-বটগাছের প্যাগোডা দেখে এসো কাল—ঐ এক জায়গা থেকেই পুরানো সম্পর্কটা ঠাহর হবে।

(২৪)

একদা ছিল সাত বটগাছ। একটা মরে গিয়ে এখন ছটা আছে। ডালপালা মেলানো ছায়াময়—দূর থেকেই নজরে আসছে। শ্রমণরা রাস্তা অবধি ছুটে এলেন, আসুন—আসুন—এ তো আপনাদেরই জায়গা। এই যত বটগাছ—সমস্ত ভারত থেকে এনে পোঁতা। পবিত্র জ্ঞানে পুরুষ-পুরুষান্তর ধরে আমরা পালন করে আসছি।

এক হাজার শ্রমণের বসতি এই প্যাগোডায়। ৫৩৫ থেকে ৫৪৫—দশ বছর লেগেছিল প্যাগোডা ও ঘরবাড়ি তৈরি করতে। সতেরো তলা স্তম্ভ; বাইরে থেকে দেখবেন কিন্তু সাত তলা। স্তম্ভের খানিকটা অবধি উঠে নেমে এলাম হাঁপাতে হাঁপাতে। চূড়ায় ওঠা হল না।

সেই পুরাকালে কাঞ্চিয়ান (আসল নামটা কি, পণ্ডিতেরা বলুন)। কাঞ্চন ? অথবা কাঞ্চীপুরবাসী ? ওদের মুখে মুখে কাঞ্চিয়ান নাম দাঁড়িয়ে গেছে। অবোধ্য হওয়ায় বানান করতে বললাম দোভাষিকে। সে ইংরেজী বানান দিল —Kunchin নামে এক ভারতীয় এসেছিলেন ধর্মপ্রচার করতে। নানান তরফের শত্রুতা, প্রাণ সংশয় হয়ে উঠল তাঁর। শেষটা তিনি নারী-বেশ নিলেন ; নারীর সজ্জায় থাকতেন অহোরাত্রি, ঐ বেশে ধর্মকথা বলতেন। সেই নারীরূপের প্রতিমূর্তি রয়েছে এখানে। পুরুষমূর্তিও আছে নাকি অন্যত্র। আর আছে ওয়াং-নাং রাজার তাম্রমূর্তি—যাঁর আমল থেকে এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রসার।

প্যাগোডায় আসবার আগে সকালবেলা আজ একা-একা বেরিয়ে পড়েছিলাম। কিঞ্চিৎ বকুনি খেলাম সেই অপরাধে।—অমন ধারা দুঃসাহস কদাপি দেখাতে যাবেন না, দোহাই,! হেসে হেসে তখন আমি পিকিনের গল্প করি। মরিশন ষ্ট্রিটের বাজার চুঁড়ে বেড়ানো, ভাষা না জেনেও পথের জনতার সঙ্গে দহরম-মহরম ; চন্দ্রালোকে তিয়েন-আন মেনের সামনে সেই আহা-মরি নৃত্য ; ওঁরা বলেন, পিকিনে যত্র-তত্র ঘোরাঘুরি করুন গে, সাংহাইতেও আপত্তি করব না ; কিন্তু এখানে—জানেন, গেল-বছর ভারতের বন্ধুরা ক্যাণ্টনে পা দিলেন, আর সেই রাতে বিপদের সাইরেন বাজল। আজকে অবিশ্যি ক্যাণ্টন অবধি এসে চিয়াং কাইশেকের বোমা মারবার তাগত নেই। তাহলেও চেলা-চামুণ্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোমাদের কোন রকম শারীরিক হানি ঘটানো বিচিত্র নয় চীন- ভারতের বন্ধুত্বে চিড় খাওয়াবার মতলবে। তাই এত সামাল, সামাল !

যাকগে। কিছু তো হয়নি—আছি বহাল-তবিয়তে, তবে আর কথা কি ! প্যাগোডা দেখা শেষ করে শিশলস স্টেডিয়ামের দোর-গোড়ায় মোটরগুলো এসে থামল। এখনো কাজ চলছে, লোক খাটছে। আগে ভিক্ষা করে খেতো এই সব লোক—এক ক্যাণ্টনেই ছিল তিন হাজার ভিক্ষুক। বৃত্তিটা বে-আইনি হয়ে যাবার পর সক্ষম সমর্থগুলোকে বেছে নিয়ে এমনি নানান কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। ১৯৫০ অব্দে পাঁচ মাসের ভিতর তড়িঘড়ি এই স্টেডিয়াম বানিয়ে ১ লা অক্টোবরের জাতীয় উৎসব করল। ত্রিশ হাজার বসবার জায়গা, আরও ষাট হাজার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। তিন দিকে পাহাড়—এটাও ছিল পাহাড় মতো জায়গা। মাঝের মাটি-পাথর খুঁড়ে ফেলে দিয়ে সমান চৌরস

করেছে। চতুর্দিকের উঁচু অংশে কেটে কোট ধাপ বানানো; সিমেণ্টের পলস্তারা ধাপের উপর। ঐ হল গ্যালারি। চালাকি করে কত সস্তায় কিস্তিমাত করেছে দেখুন।

পাশে পাঁচতলা বাড়ি—পিপলস মিউজিয়াম। ঐ যে বললাম—যেখানে পা ফেলবেন, মিউজিয়াম-একজিবিশন আছেই। সোভিয়েট দেশেও এমনি দেখে এলাম। শিক্ষা—শিক্ষা—শিক্ষা! না শিখে যাবেন কোথা? যত রকমে পারো মানুষের চোখ-কান ফুটিয়ে দাও, তারাই তারপরে দুনিয়ার হালচাল বুঝে নেবে। ঘুরে ঘুরে দেখছি। চারুকলা, ইতিহাস ও প্রত্নত্ত্বের নানা সামগ্রী। বিস্তর ছবি—১৯১১ থেকে ১৯৪৯, বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায় ছবিতে এঁকে দিয়েছে। একটা অতি-পুরানো জিনিস—হাতির দাঁতের উপর ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে লেখা! জোরালো ম্যাগ্নিফায়িং গ্লাসেও সে-লেখা পড়া মুশকিল।

সন্তরণাগার। আগে পোড়ো-জমি ছিল, হাল-আমলে ইন্দ্রপুরী বানিয়ে তুলেছে। ক্যাণ্টনে এলে এটা দেখতেই হবে। এখনো কাজ চলছে। বাইরের দিকে লম্বা খাল কাটা হচ্ছে, নৌকো বাইবে দাঁড় টেনে টেনে। সে খালের উপরে পুল হচ্ছে আবার। দেখুন, দেখুন, রাক্ষুসে ব্যাং একটা পাথরে তৈরি; তিনটে বিশাল সারস তিন দিকে। এই চার মুখে জলের ফোয়ারা। সাঁতারের সব রকম বন্দোবস্ত। উজ্জ্বল আলো। স্টেডিয়াম বানিয়েছে—সেখানে বসে লোকজন সাঁতারের প্রতিযোগিতা দেখে। অমনি যে টুপ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, তা হবে না। বাথরুম আছে, সাবান ঘষে আগে ভাল করে নেয়ে-ধুয়ে নেবেন; পরিচ্ছন্ন সাঁতারের পোষাক পরবেন, তবে নামতে দেবে।

আর চব্বিশ ঘণ্টাও নেই চীন-ভূমিতে। চীন দেখা সাঙ্গ হয়ে এলো। স্পেশ্যাল ট্রেনে আমাদের সীমান্ত পৌঁছে দেবে। রাত বারোটায় যাত্রা। সান-ইয়াৎ-সেনের স্মৃতি-ভবন তবে তো এই বেলার মধ্যেই সেরে নিতে হয়।

১৯২১-৩১ অব্দে তৈরি। পাহাড়ের নিচে অষ্টকোণ বিরাট সৌধ—পুরোপুরি চীনা পদ্ধতির। লাল দেয়াল, কাঠের কাজ; ছাতটা নীল টালির। হলে সাড়ে পাঁচ হাজার চেয়ার, দেয়াল ভরা খাসা ফ্রেস্কো ছবি। একটা থাম নেই এত বড় হলের ভিতর। স্টেজের অংশটা ভেঙে ১৯৫০ অব্দে নতুন ভাবে তৈরি। ডাক্তার সনের বিশাল মূর্তি প্রান্তদেশে। এই অঞ্চলের শান্তি-সম্মেলন হবে এখানে—তাই মাও-র ছবি দিয়েছে, পাঁচ তারার পতাকা আর রকমারি রঙিন আলোর সজ্জা করেছে।

পিছনে পাহাড়ের উপরে স্মৃতিস্তম্ভ। জাপানিরা বোমা মেরে জখম করেছিল, মেরামত হয়ে গেছে। আর হলের প্রবেশ মুখে সান ইয়াৎ-সেনের নিজের হাতের অক্ষরে খোদাই করা আছে—তিয়েন-সিয়া উই কুং—আকাশের নিচে যত মানুষ আছে সকলে এক।

সেই কতদিন আগে ক্যাণ্টন-স্টেশনে ফুটফুটে এক পায়োনিয়র মেয়ে নতুন আগন্তুকের হাত ধরে পথ দেখিয়ে এনেছিল। ওয়াই মিঁঞা—নামটা মনের মধ্যে গেঁথে নিয়েছিলাম, ওয়াই মিঁঞা। আজকে শেষ দিন সেই ক্যাণ্টনে।

ওঁরা বলেন, পায়োনিয়র-ঘাঁটিতে একবার যাওয়া তো উচিত!

নিশ্চয়, নিশ্চয়! সব শহরে এমনতরো ঘাঁটি আছে, একটাও দেখার ফুরসত হয়নি। তা ভালই হল। যাচ্ছি ওয়াই মিঁঞাদের ওখানে। কি বিপদেই ফেলেছিল মেয়েটা! হাত কিছুতে ছাড়বে না—মোটরে উঠে দরজা দিতে পারিনে। এক হাতে ফুলের তোড়া, আর এক হাত তার ফুলের হাত দিয়ে বেঁধে রেখেছে। ছাড়িয়ে নেওয়া সোজা! আজকে যদি—কপালের কথা কি বলা যায়?—ওয়াই মিঁঞাকে আজকে যদি পেয়ে যাই ওখানে! চিনতে কি পারব আলো-ঝলমল স্টেশনের বিপুল জনতার মধ্যে রূপের উল্লাসের দীপ্তির মাঝখানে মিনিট কয়েকের দেখা আমার ক্ষুদ্র বান্ধবীকে? সকলের থেকে আলাদা করে নিতে পারব?

পায়োনিয়র-ঘাঁটিতে ওয়াই মিঁঞাকে পেলাম না, কিন্তু তাতে কি! আর অন্তত পঞ্চাশটা রয়েছে অবিকল সেই মেয়ে। বিদেশি মানুষ কালো চেহারা—তা বলে এতটুকু ভড়কে যায় না কোনটি। যেন সকালে বিকালে দেখা হচ্ছে, হামেশাই এসে গল্পগুজব করি—আজকেও এসেছি। অচেনা নেই, এক নজর একটুখানি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখাও নয়! গিয়ে দাঁড়াতেই চক্ষের পলকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিল আমাদের। গুনতিতে আমরা কম, তারা অনেক বেশি। তাই তিনটি চারটি এজমালি সম্পত্তি হয়ে পড়লাম আমরা প্রতি জন। ভাগের মা গঙ্গা পান না, কিন্তু ভাগ-করা এই বুড়ো বুড়ো ছেলেগুলোকে হুল্লোড় করে এ গঙ্গায় নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছে। আজ্ঞে হঁ্যা, ঠিক তাই। তাদের পায়োনিয়রদের ঐশ্বর্যের অবধি নেই—এবাড়ি-ওবাড়ি এঘরে-ওঘরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এ ধরল ডান-হাত তো ও এসে ধরে বাঁ-হাত। এ সোনালি মাছ দেখাবে তো ও টেনে নিয়ে দেখাবে লাল পাতাবাহার।

সান ফুল-লিন নামে অতি ছোট্ট মেয়ে—আমি পড়েছি তার দখলে। আরও তিন-চারটে ভাগীদার আছে, কিন্তু সানের দোর্দণ্ড প্রতাপে তারা আমল পাচ্ছে না। লোক যেমন ছাতা কি ঘটি-বাটি কিংবা গামছাখানা খুশি মতন হাতে নিয়ে ঘোরে, আমাকেও তেমনি এদিক-ওদিক যথা ইচ্ছা হাত ধরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। একটা ছেলে—তারও ভাগের আমি—বোধ করি, একেবারে বেদখল হয়ে যাচ্ছে বলেই আস্তে আস্তে আমার পিছন ঘেঁসে দাঁড়াল; সান অমনি

মিলিটারি কায়দায় গটমট করে এল, ছেলেটাও আমার মাঝখানে গুঁজে দিল নিজেকে। গতিক বুঝে বেচারি আপোসে আরও খানিক পিছিয়ে গেল ; ও-মেয়ের সঙ্গে লড়াইয়ের তাগত নেই। সান ফড়ফড় করে একগাদা কি বলে গেল আমার মুখের দিকে চেয়ে। মূর্খ মানুষ—আমি কি বুঝব তার কথা, বোকার মতন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকি ! কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে নাকি ? যা মেজাজ এই দেখলাম—বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে। বিপন্ন হয়ে দোভাষিকে বললাম, শিগগির মানে বলে দাও, ভুবন রসাতলে গেল—দেখছ না মুখভাব ? মহাপ্রলয় নির্ঘাত এসে পড়ল, আর রক্ষে নেই। কি বলছে বুঝিয়ে দাও শিগগির।

দোভাষির সঙ্গে গোনা-গুনতি এই তো কয়েকটা কথা—তাতেও চটে গেছে। নিয়ে বের করল সেখান থেকে ; দোভাষির কাছ থেকে নিরাপদ দূরে নিয়ে গেল। বটেই তো ! সে যখন কর্ত্রী, যত কিছু বলাকওয়া একমাত্র তারই সঙ্গে। তার আদেশ বিনা অন্ত লোকের কাছে মুখ খুললে সহ্য করবে কেন ?

মিউজিয়ামে নিয়ে হাজির করল। মিউজিয়াম তো কতই দেখলেন, এ-মিউজিয়াম একেবারে আলাদা। ছেলেপুলেদের নিজ হাতে বানানো। আমরা বড়রা কি পারি ওদের সঙ্গে ? বলুন। দলের পর দল বড় হয়ে বেরিয়ে যায়, নতুন নতুন ছেলেমেয়ে আসে—মিউজিয়ামের সঞ্চয় বেড়ে চলেছে সকলের যত্নে ও ভালবাসায়। এ-আলমারির সামনে নিয়ে দাঁড় করাচ্ছে, ও-টেবিলের কাছে ঝুঁকে দেখাচ্ছে। বকবক করে তাবৎ বস্তুর পরিচয় দিচ্ছে, অনুমান করি।

দোভাষি দূর থেকে হাসি-হাসি চোখে অবস্থা তাকিয়ে দেখে,—কিন্তু তার ক্ষমতা কি আমাদের এলাকার মধ্যে এসে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেয় ! সানের মা-বাবা যখন অক্লেশে তার কথা বোঝে, ভাইবোন ও অন্য সব লোক বুঝতে পারে, আমাদের বেলা দোভাষির বোঝাতে হবে কি জন্যে ? তবু এতটুকু সন্দেহ হয়ে থাকবে—মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সায় দিচ্ছে, বুঝতে কোন প্রকার অসুবিধে হচ্ছে কি না। আরে, 'না' বলবার কি তাগত আছে, পরোমোৎসাহে ঘাড় নেড়ে যাচ্ছি—অর্থাৎ, হে কন্যা মনসাঠাকরুন, তোমার কমা-দাঁড়ি হীন তাবৎ চীনা বকবকানি জলের মতন বুঝে যাচ্ছি ; ফোঁস কোরো না, দোহাই ! শ্রোতার বুদ্ধিমত্তায় পরম খুশি হয়ে সান কথার তোড় আরও বাড়িয়ে দেয়।

দেয়ালে-দেয়ালে ছবি। ইজেলের উপর ছবি—আধেক-আঁকা, পুরো-আঁকা সব ছবির গাদা বের করে মেলে ধরে দেখাচ্ছে। ছবি আঁকে—তার বাবদে কত রং কত সরঞ্জাম ! অভিনয় করে তার জন্যে সাজ-পোশাকের বাহার কত ! রেলগাড়ি এরোপ্লেন বানায়, টুকরো টুকরো লোহা সাজিয়ে ক্রেন তৈরি করে। আরো কত রকম কারিগরি ! ঐশ্বর্য অনন্ত। কত পুতুল, কত রকম-বেরকমের খেলনা ! এসো না খেলবে একটু আমাদের সঙ্গে। এক আছে গাড়ি-গাড়ি খেলা—দৌড়তে হবে এঞ্জিন হয়ে।—আরে দূর, দৌড়ঝাঁপের খেলা ভদ্রলোক

খেলে বুঝি! চেয়ারে বসে বসে যা খেলা যায়! কানামাছির বুড়ি হয়ে বসি—ছোঁও দেখি চোখ বুজে কেমন পারো! তা ছুঁয়েই তো দিল প্রায় সকলে। হেরে গেলাম। হেরে গিয়ে তখন জোর করে কোলের উপরে তুলে নিই। তোমরা শুধু মাত্র ছুঁয়েছ, আমি এই জাপটে ধরেছি বুকে। শেষ অবধি জিত আমারই, কি বলো? চলো, আর কোথায় যাওয়া যায়, অন্য কি দেখবার আছে?

ছোট হলঘর। ঐ যে অভিনয়ের কথা শুনলেন, তার স্টেজ হল এখানে। থিয়েটার ছাড়া সভাও হয়ে থাকে। স্টেজটুকু বাদ দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট চেয়ারে বাকি ঘর বোঝাই। সেই চেয়ারে গুঁটিসুটি হয়ে বসলাম। দেখাচ্ছে আমাদের কত ছোট। কেউ ফোটো তুলে রাখেনি যে! তা হলে আপনাদের হাতে-কলমে দেখিয়ে দিতাম কেমন করে বয়স ভাঁড়িয়ে ছোট্ট এইটুকু হওয়া যায়। ভেবেছিলাম চেয়ার ভেঙে পড়বে। তা নয়, দিব্যি শক্ত। কিংবা হতে পারে, মাথা থেকে জ্ঞানবুদ্ধির আবর্জনা নেমে গিয়ে আমরাই ওজনে হালকা হয়ে গেছি। চেয়ার কেন তবে ভাঙবে?

সে তো হল, বক্তৃতা শুনতে চাই যে একটু। যেইমাত্র বলা বালখিল্য এক বক্তা গটমট করে স্টেজের উপর উঠে গেল। একটু দৃক্‌পাত নেই। ভাবখানা হল এ আর শক্তটা কি—হলে এসে বসে পড়েছে, শোনাতেই হবে যাহোক কিছু। মরীয়া হয়ে দোভাষিকে কাছে টানলাম। বক্তার চোখ-মুখের ভঙ্গি দেখছি—কথার মানে না বুঝলে পুরো মজা পাওয়া যাবে না।

'বিদেশী বন্ধুরা, তোমাদের পেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে। দেশে ফিরে ভারতের ছেলেমেয়েদের কাছে বলো আমাদের কথা। তাদের সঙ্গে ভাব করতে চাই···'

আমরা হলেও এর চেয়ে বেশি কি বলতাম? বক্তৃতার পরে আবার এক আবদার—গান শুনব তোমাদের। তাতে ভরায় বুঝি! সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি তানসেন আঁ-আঁ করে তান ধরল। গান হয়ে গেল তো—এবারে কি? নাচ। মস্ত বড় এক ঘরে নিয়ে দাঁড় করাল। ঘুরে ঘুরে নাচছে বাচ্চারা। আনন্দের মেলা। নাচছে, লাফালাফি করছে। এক ধারে দাঁড়িয়ে দেখছি। সান উসখুস করছে। লোলুপ চোখে একবার নাচিয়ে দলের দিকে তাকায় তার পরে একবার আমার দিকে।

তা যাও না তুমিও নেচে এসো একটু—

এক পা করে এগোয় আর মুখ ফিরিয়ে দেখে আমাকে। হাত নেড়ে খুব স্ফূর্তি করছে, যাও—যাও না—

লোভ কতক্ষণ আর সামলানো যায়। ঝাঁপিয়ে পড়ল দলের মধ্যে চক্ষের পলকে বেমালুম মিশে গেল।

কিন্তু এক পলক হয়েছে কি না হয়েছে—ছুটে এসে চিলের মতন ছোঁ মেরে আবার হাত ধরে। নাচলেই হল, ইতিমধ্যেই অপর কেউ দখল করে বসে যদি।

আর, সত্যিই তো—কয়েকটা ছেলেমেয়ে সন্দেহজনক ভাবে আমাদের আশেপাশে এসে দাঁড়িয়েছে। নাচের পা কি ওঠে এ অবস্থায়? বলুন।

কষ্ট হল। আহা, সবাই ফূর্তি করছে—ও বেচারা পারছে না মনের ধুকপুকানির জন্য। এগিয়ে তখন নাচের একেবারে গায়ে গায়ে দাঁড়াই। এই রইলাম নজরের সামনে। মন খুলে নাচোগে—ভাবনা নেই।

তবু জমে না। নিয়ে চলল এবার মাছ আর শেওলা-ঝাঁঝি দেখাবার ঘরে। কাচের বাক্সে সারি সারি রেখে দিয়েছে। বলে, একটা একটা করে সমস্ত দেখবে। সবগুলোই। (দোভাষি শুনিয়ে দিল হুকুমটা) বাস রে, রাত্রে যে চলে যাবো, সময় কোথা অত? তা কে জানে—দেখতেই হবে। না দেখে ছুটি নেই।

ঘোরা হয়ে এলো। এবারে ইতি। একটুকু মন্তব্য দিতে হবে যে কি রকম দেখলে। সেটা হয়ে গেল তো অটোগ্রাফ। গাড়ি ঘিরে ফেলেছে। এক এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দেয়—নাম লেখো, আমরা খাতায় সেঁটে রাখব। সাদা কাগজে সই করিয়ে নিচ্ছে, হ্যাণ্ডনোট লিখে নেবে না তো বাপু ঐ নামসই-এর উপরে? যে চাহিবা মাত্র দিবার অঙ্গীকারে আমি শ্রীঅমুকচন্দ্র অত্র তারিখে শ্রীমতী সান ফুন-লিন দেব্যার নিকট হইতে চলিত সিক্কার এক কোটি ইয়ুয়ান ধার করিয়া লইলাম—

পাঁচ দশটায় সই হতে না হতে গাড়ি ভিড় কাটিয়ে বেরিয়ে পড়ল। রাত বারোটায় রওনা, সমস্ত নয়-ছয় হয়ে আছে, কখন যে কি হবে—চলুন, চলুন!

(২৫)

আই-চুন হোটেলের করিডরে সকলের মালপত্র এসে জমেছে। সর্বনাশ! চীনের সীমানা অবধি এরা না হয় বয়ে দিল—তারপরে? প্লেনে পুরে এই পর্বত দেশে নিয়ে তুলতে হবে তো!

ভোজে ডাকছে। না, আজকে আর যাবো না। কিচলু এসে তাঁর ভার-বোঝা কাঁধে তুলে নিয়েছেন—আমি আর কে এখন? এ কয়দিন দায়ে পড়ে ধকল সয়েছি, নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচি রে বাবা! সামান্য কিছু খাবার ঘরে পাঠিয়ে দাও, বসে বসে আমি লিখব। চীনের মাটির উপর শেষ কলম ধরা।

লিখছি। একার জন্য একটি ঘর—কতক্ষণ ধরে লিখে চললাম, হুঁশ নেই। ক্ষিতীশের ঘর পার্লা নদীর ঠিক উপরে; ক্লান্ত হয়ে এক সময় তার জানলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। নদী দেখছি। কাশ্মীরে গিয়ে হাউস-বোটে ছিলাম, এ নদীতে বিস্তর তেমনি বোট। কিনারায় বাঁধা রয়েছে। বোট স্পষ্ট নজরে আসে না বোটের উপরের মিটমিটে লণ্ঠনগুলো শুধু। সন্ধ্যার মুখে চাঁদ দেখেছিলাম, সে চাঁদ কোন বড় বাড়ির আড়ালে চলে গেছে। মাঝে মাঝে স্টিমারের বাঁশি—সার্চলাইটে সাদা হয়ে যাচ্ছে মাঝনদীর জলতরঙ্গ। নৌকোও

চলাচল করছে—নৌকো নয়, ভাসমান আলোর কণিকা। আট তলার ঘর থেকে দেখছি, রহস্যাচ্ছন্ন অন্ধকারে জলের উপর দিয়ে অগণিত তারা ভেসে চলেছে।

ঘরে ফিরে আবার ডায়েরি খুলে বসেছি, দরজায় ঘা পড়ল।

এসো, এসো ভাই—

ইয়ং—পিকিন দোভাষিদলের সর্দার আমাদের সেই ইয়ং। ডক্টর কিচলুর সঙ্গে ভোরবেলা ট্রেনে এসে পৌঁছেছে। আবার তাকে দেখব, ভাবতে পারি নি! কী ভাল যে লাগল পুরানো মানুষ কাছে পেয়ে!

ইয়ং বলে, কিছুই তো খেলেন না! তা শুয়ে পড়ুন এবারে, কত আর লিখবেন?

বারোটায় রওনা—তাই ভাবছিলাম, লিখেই কাটিয়ে দিই সময়টুকু। খাতা-কলম পকেটে পুরে গাড়িতে উঠব।

ইয়ং জেদ ধরল, না—গাড়িতে ঘুম হয় কি না হয়—ঘুমিয়ে নিন এই ঘণ্টা দুই। আমরা জেগে রয়েছি, ঠিক সময়ে তুলে নিয়ে যাবো—

আলো নিবিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ইয়ং চলে গেল। এবং রাতদুপুরে ডেকে তুলে মোটরে চাপাল। শহরের ঘরবাড়ি তখন দুয়োর-জানালা এঁটে ঘুমুচ্ছে। রাস্তার আলোগুলো শুধু অতন্দ্র চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। এমনি নিশিরাত্রে আর একদিন চৌরঙ্গি থেকে দমদম-এরোড্রোমের দিকে ছুটছিলাম, কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি তখন।

বড় বড় বাড়ির ছায়ায় রহস্যময় জনশূন্য এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে ঘুরে স্টেশনে এলাম। আরে মশায়, শহরের রাস্তায় লোক থাকবে কি—সবাই তো দেখছি স্টেশনে! সাধারণ গাড়ি এখন নেই, আমাদের স্পেশ্যাল ট্রেনটা শুধু। শীতার্ত রাত্রে এত মানুষ বিদায় দিতে এসেছে। একদিন এই স্টেশন থেকে আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, বিদায়-দিনেও ঠিক তেমনি সুবিপুল জনতা।

ঝকঝকে স্পেশ্যাল ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। ঘড়িতে পৌনে একটা। সেই অগণ্য মানুষের হাতে হাত দিয়ে আমরা কামরায় উঠে পড়লাম। প্রতি খোপে দুজনের জায়গা। ব্যবস্থায় তিল পরিমাণ খুঁত নেই। ছেলেমেয়েরা কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে—এই একেবারে ইঞ্জিন অবধি। বেশির ভাগ মেয়ে—সব কাজে মেয়েরাই বেশি আগুয়ান। প্রথম ঘণ্টা পড়ল, আর চক্ষের পলকে প্রতিটি প্রাণী গাড়ি থেকে হাত দেড়েক দূরে লাইন দিয়ে দাঁড়াল। সেখান থেকে হাত বাড়াচ্ছে শেষবারের ছোঁওয়া ছুঁয়ে নেবে। ট্রেন ছাড়বার মুখে ভিড়ের দরুন দুর্ঘটনা না ঘটে—সেজন্য এই ব্যবস্থা।

ঠিক একটায় গাড়ি ছাড়ল। শত শত কণ্ঠে স্টেশনে মন্দ্রিত হচ্ছে—হিন্দী-চীনী ভাই ভাই! আর—হোপিন ওয়ানশোয়ে, শান্তি দীর্ঘজীবী হোক। এত ভালবাসার বাঁধন ছিঁড়ে গাড়িও যেন এগুতে পারে না—যাচ্ছে গড়িয়ে

গড়িয়ে। কামরার আলো এক একবার আনন্দে-ঢলঢল মুখের উপর ঝিলিক হেনে হেনে যাচ্ছে। সে মুখ বলছে—শান্তি···শান্তি···শান্তি—নিখিল ধরিত্রী শান্তিময় হোক।

প্লাটফরম শেষ হল। শেষ হয়ে গেল চকিত-দেখা মুখের পর মুখ। অন্ধকার। জানলায় বসে আছি বাইরে চেয়ে। ফুল দিয়ে গেছে—সবুজ আলোয় কামরা ভরা সুগন্ধ। মাঠ নদী পাহাড় আবছা-আবছা নজরে আসছে। দেখে দেখে—তার পরে এক সময় শুয়ে পড়লাম। ঘরমুখো ছুটছি, কিন্তু ঘরে ফেরার আনন্দ কই ?

শেষ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে বসলাম। তোলপাড় করে তীব্রগতিতে ট্রেন ছুটছে। সুবিস্তীর্ণ এক জলাভূমির কিনারা ঘেঁষে ছুটছি। করিডরে বেরিয়ে এসে দেখি উল্টো দিকটায় পাহাড়। ঝরনার জলধারা তারার আলোয় চিকচিক করছে। জানালা ধরে এক তরুণ ছেলে দাঁড়িয়ে। আমি ভুল পথে যাচ্ছিলাম, ইসারা করে সে অন্য দিকে যেতে বলল। নিজে এলো পিছু পিছু—বাথরুমের দরজা এসে খুলে দিল। দেখছি, একা সে নয়— দোভাষি ছেলেমেয়ে অনেকেই পাহারা দিচ্ছে দশ-বিশ হাত অন্তর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ক্যাণ্টন থেকে এই এলাকাটা ভাল নয়, চিয়াং-এর চরের আনাগোনা আছে বলে সন্দেহ। ট্রেনের কামরায় বিদেশি মানুষগুলো বিভোর হয়ে ঘুম দিচ্ছে, ওদের চোখে সারা রাত্রির মধ্যে পলক পড়ল না।

সেন-চুনে এসে গাড়ি থেমে দাঁড়াল। তখনো চোখ বুঁজে পড়ে আছি। ক্ষিতীশ ডাকল, উঠে আসুন। চা খেয়ে চাঙ্গা হওয়া যাক। ডাইনিং-কারে চা সাজিয়ে বসে আছে।

কামরা থেকে নেমে পড়লাম। মুখ-আঁধারি তখনো। শীতও খুব—ওভারকোট ইত্যাদি গায়ে চড়িয়েও কাঁপুনি যায় না। কতটুকু সময়ই বা আর নতুন-চীনের মাটিতে! ডাইনিংকারে গিয়ে বসেছি। আহা, ছেলে-মেয়েগুলো রাত জেগেছে···প্রভাত-কুসুমের মতো স্নিগ্ধ মুখে এখন আবার হাতে হাতে চা এগিয়ে দিচ্ছে। কালো পাজামা সাদা শার্ট ও কালো কোর্তায় কি অপরূপ দেখাচ্ছে!, এমন আতিথ্য এত সহৃদয়তা কোথায় পাবো দুনিয়ার ভিতর!

ভোরের আলো ফুটছে ক্রমশ, ঝোপে-ঝাড়ে পাখি ডাকছে। দূর পাহাড়ের উপর ছবির মতো ঘরবাড়ি স্পষ্ট হয়ে উঠল। সীমান্ত পাহারাদার আর রেলকর্মীরা থাকে ঐ সব বাড়িতে। একদল জাতীয় সৈন্য এলো উপর-পাহাড় থেকে। স্টেশনে বইয়ের টেবিলগুলো খালি ; বই আলমারিতে বন্ধ। কাল যাত্রীদের পড়াশুনো হয়ে যাবার পর যত্ন করে সাজিয়ে রেখে দিয়েছে ; পড়বার লোক এত সকালে এখনো এসে জমেনি।

ক্রমে জেগে উঠল চারিদিক। বেরুবার ভিসা দিতে বড় দেরি করছে—

সেটা হল ওপারে ব্রিটিশ-এলাকার ব্যাপার। তা হোক, আমাদের তাড়া

নেই। ভালই তো করছে—সীমান্ত-স্টেশনে আরও খানিকটা ওদের সঙ্গে জমিয়ে বসার সময় পাওয়া গেল। আর ক-গজই বা নতুন-চীন—খাল দেখা যাচ্ছে, পুরো খালটাও নয়, খালের মাঝ বরাবর গিয়েই শেষ।

অবশেষে ভিসা এসে গেল। চলি ভাই। পুলের উপরে উঠেছি। ছোট-খাট এক মিছিল—আমরা যাচ্ছি, ওরা আসে পিছনে-পিছনে। পা আর চলে না, চোখ ছল-ছল করছে সকলের। ঘরে চলেছি, না ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছি—গতিক দেখে কেউ বুঝবেন না। কুমুদিনী মেহতা আমার পাশে; ধরা-গলায় তিনি বললেন, প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাবার দিনে ঠিক এমনি অবস্থা হয়—কি বলো বোস? ভুলে গেছেন, তার মতন স্ত্রী-জাতীয় নই আমি। পুরুষরা শ্বশুরবাড়ি যায় ড্যাং-ড্যাং করে—চোখ মুছবে তারা কোন্ দুঃখে? এই সব বলে আবহাওয়া একটু হালকা করতে চাই। কিন্তু জমে না, হাসল না কেউ। কাঁটা-তারের বেড়ার মুখে এসে গিয়েছি। কাস্টমসের লোকগুলো অভিবাদন ক'রে পথ ছেড়ে দিল; বোঁচকা-বুঁচকিতে হাতটাও ছোঁয়ায় না। আর বাপু, তামাম মাল বয়ে নিয়ে যাচ্ছি তোমার দেশ থেকে—দেখ হে, নয়ন তুলে চেয়ে দেখ একবার! নয়ন তুলল বটে বলাবলির পর—হাসিমুখে আর একবার নমস্কার করল।

পুলের আধখানা অবধি এদের যাওয়ার এক্তিয়ার। সেই অবধি এসে দাঁড়িয়েছি। মেয়েরা হাত জড়িয়ে ধরছে এক এক করে। ছেলেরা বুকের মধ্যে লুফে নিচ্ছে। ছেড়ে দেবে না, কিছুতে ছাড়বে না। এই একবার হয়ে গেল তো আবার। গান ধরল ক্ষিতীশ। সকলের মুখে গান। বন্ধু, তোমাদের ছেড়ে যেতে হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে—ঘুরে-ফিরে এই এক গানের কথা। গান আর কোথায়—তানকর্তব গিয়ে এখন তো কান্নায় দাঁড়িয়েছে। পরশু রাতের সেই যে বক্তৃতা—এসেছিল বিদেশি হয়ে, চলে যাবার মুখে অশ্রুতে কণ্ঠরোধ হচ্ছে—আর সেটা সাহিত্যিকের অতিশয়োক্তি রইল না। তাকিয়ে দেখুন, চোখে-চোখে জল। এই নিয়ে একটু ঠাট্টা-তামাসা করব—তবে তো নিজের চোখ দুটোও শুকনো রাখতে হয়। সেটা বড় মুশকিল।

পুল পার হয়ে ভিন্ন পারের মাটি ছুঁয়েছি। আর ওদের আসবার জো নেই। দূরত্ব নগণ্য, কিন্তু ব্যবধান অতি-দুস্তর। এখানে আর এক জগৎ। গান চলছে দু-দিক দিয়ে অবিশ্রান্ত। হাত ছেড়ে দিয়ে এসেছি—গান আমাদের এক করে রেখেছে। হাওয়ায় ভেসে গানের সুর এপার-ওপার করছে—তাতে পাসপোর্ট-ভিসা লাগে না। আরও এগিয়ে গেলাম। চেহারাগুলো অদৃশ্য—শুধু ঐ গান। গানও শেষে বন্ধ হয়ে গেল।

লাউ-হু স্টেশনের প্ল্যাটফরমে এসেছি। ওদিককার কিছুই আর নজরে আসে না। হঠাৎ দেখা যায়, ঢিবি মতন একটা জায়গায় ওরা উঠে পড়েছে—রুমাল নাড়ছে সেখান থেকে। আমাদের ক'জন স্টেশনের ঘরে গিয়ে

বসেছিলেন, খবর পেয়ে হুড়মুড় করে বেরুলেন। দু'দিক দিয়ে উড়ছে রুমাল। উড়ন্ত শান্তির পারাবত পাখা নড়ছে এপারে-ওপারে। প্রশান্ত হিমপ্রভাতে, দেখ দেখ কত পাখির নিঃশব্দ কাকলী।

ওয়েটিংরুমে ঢুকেই, কী সর্বনাশ, বিদ্যুতের শক খেলাম যেন। এক তরুণী কোথায় যাবে, গাড়ির অপেক্ষা করছে। পোশাক-আশাক নিরতিশয় স্বল্প। অন্যমনস্ক মানুষের তবুও যদি নজর এড়িয়ে যায়, সেই কয় টুকরো কাপড়ে রামধনুর মতো রঙের বাহার। ছাত্রেরা পাঠ্য-বইয়ের দরকারি জায়গায় জায়গায় লাল-নীল পেন্সিলের দাগ দিয়ে রাখে, মেয়েটার ওপরেও তেমন যেন রঙিন ডোরা কাটা। একটা ইংরেজি বইয়ের নাম মনে এলো হঠাৎ—ম্যান-ইটার অব কুমায়ুন, কুমায়ুনের মানুষখেগো বাঘ। কিন্তু কোথায় কুমায়ুন পর্বত আর কোথায় বা—উঁহু, ডোরাকাটা বাঘের সঙ্গে বেশ খানিকটা মিল আছে। এ-ও এক চীনা মেয়ে—কিন্তু এতদিন ধরে চীন ঘুরলাম, একটা মেয়েরও এমন বেশরম বদরুচি পোশাক দেখতে পাইনি।

ওয়েটিংরুমে হল না তো প্লাটফরমের শেষ দিকে গাছতলার এক বেঞ্চিতে বসে পড়লাম। সিগারেট ধরিয়েছি। কালেভদ্রে কদাচিৎ ধোঁয়া খাই। দু-আঙুলের ফাঁকে সিগারেট আপনি পুড়ছে। উদাস দৃষ্টি মেলে বসে আছি। আঙুলে ছ্যাঁকা লাগতে মালুম হল, পুড়তে পুড়তে গোড়ায় এসে ঠেকেছে। পোড়া সিগারেটের টুকরো নিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। তাই তো কোথায় ফেলি? কোথায়, কোথায়? ফেলবার জায়গা পাইনে তো—

সহযাত্রীর নজর পড়েছে। বললেন, হংকঙের এলাকা—যেখানে খুশী ফেলে দাও। বিলকুল ডাস্টবিন—

যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠি। নতুন-চীন পার হয়ে এসেছি—অবাধ স্বাধীনতা। পোড়া সিগারেট প্লাটফরমের উপর ফেলে জুতোর তলায় পিষে দিলাম।

শেষ

মনোজ বসুর

শ্রেষ্ঠ গল্প

সম্পাদকীয় :

অধ্যাপক বারিদবরণ ঘোষ

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে
অনেক পরে এসেও যে আগে চলে গেল

গল্প বাছাই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের। তালিকা করে দিয়ে বলল, ছাপতে দিন দাদা। তার নিজ হাতের সেই তালিকা সামনের পাতায় ছেপে দেওয়া হল। শ্রেষ্ঠগল্পের ভূমিকাও সে-ই লিখত, ভালবেসে ভার নিয়েছিল। কিন্তু চলে গেল।

বলেছিলাম, একগাদা বাছাই করেছ—বই যে মহাভারত হয়ে যাবে। নারায়ণ বলল, হোক না। আবার বলল ছাপা হতে থাকুক—খুব বড় হচ্ছে দেখলে ইচ্ছে মতন বাদ দিয়ে দেবেন। দুটো গল্প—'জলতরঙ্গ' ও 'রায় রায়ানের দেউল' বাদ দেওয়া হল।

অতিলৌকিক গল্পের মধ্যে সে বেছেছিল 'ছায়াময়ী'। 'ভেজালের উৎপত্তি' সম্পর্কে আমার নিজের দুর্বলতা আছে। নারায়ণের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছিলাম—'ছায়াময়ী'র বদলে 'ভেজালের উৎপত্তি'।

॥ সম্পাদকীয় ॥

রবীন্দ্রনাথের হাতেই ছোটগল্পের জন্ম হয়েছিল—এই ঐতিহাসিক সত্যের কথা মনে রাখলে স্পষ্ট করে বলা যায়, বাংলা ছোটগল্পের শতবর্ষপূর্তি এখনো আরব্ধ হয়নি। কিন্তু সে কাল প্রায় সমাগত। এই কাল পরিধির মধ্যে এমন একজন আধুনিক গল্পলেখকের শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি, যিনি রবীন্দ্রনাথ যখন প্রায় গল্প লেখায় শিথিলচেষ্ট হয়েছেন, সে সময়ে তিনি গল্পরচনায় আত্মসমর্পণ করেছেন।

মনোজ বসুর (পিতৃদত্ত নাম মনোজ মোহন বসু) জন্ম ৫ জুলাই ১৯০১ খ্রীষ্ট জন্মাব্দ। বিদ্যালয় জীবনে প্রকাশিত গল্প রচনার কাল বাদ দিয়ে, এমন কি বিচিত্রা'র (কার্তিক ১৩৩৭) 'নতুন মানুষ' গল্পকে ছেড়ে দিয়ে, যদি 'প্রবাসী'তে (১৩৩৮) প্রকাশিত তাঁর 'বাঘ' গল্পটিকে আদি সাহিত্যপ্রতিষ্ঠ গল্প বলে ধরে নি তবে বলা যায় গল্প লেখক মনোজ বসুর সাহিত্যিক আবির্ভাব তাঁর ত্রিশ বছর বয়সে আরব্ধ হয়েছিল।

এইকালের মধ্যে বাঙালীর জীবনে কিছু মৌল পরিবর্তন ঘটে গেছিল আবশ্যিক ভাবে। সেকথাই আগে বলি। তাঁর জন্মের চার বছরের মধ্যেই বাঙালীর অখণ্ড ভৌগলিকবোধে প্রথম সচেতন আঘাত হানতে চেয়েছিল সুচতুর বিভেদধর্মী ইংরেজের অপশাসনযন্ত্র। বাঙালী সচেতন হয়ে উঠছিল রাজনৈতিক ভাবে। তাঁর জন্মের প্রথম দুই দশকের শেষার্ধে সারা বিশ্ব আলোড়িত হয়েছিল বৃহত্তর স্বার্থবুদ্ধিতে রাজনৈতিক বিষবাষ্প ছড়িয়ে। বাংলা দেশ ও সাহিত্যে এর প্রভাব পড়েছিল অনিবার্যভাবে, নইলে কল্লোল ও সবুজ পত্রের দুটি পক্ষসঞ্চালন করে আধুনিকতা এসে পড়তো না।

এই আধুনিকতা একই কালে সামাজিক এবং মানসিক-বাঙালীর দুটি জীবৎ-ক্ষেত্রেই নাড়া দিয়েছিল অল্পবিস্তর প্রবল বেগে। প্রেম-মিলন-বিরহের ধ্রুপদী উত্তরাধিকার কোনো কালেই অস্বীকৃত হতে পারে না, যদি হয় তা নিতান্তই কল্পিত এবং অবশ্যই কষ্টকল্পিত ও স্বল্পস্থায়ী। কিন্তু যে তেল-নুন-লকড়ির ভাবনা জীবনের প্রয়োজনের দ্বিতীয়স্তরে থাকতো, তা-ই সর্বগ্রাসী হয়ে এগিয়ে এল সামনে। মানুষ ও তার অন্তঃস্থ পশুবোধ বিচিত্র জীবনও জীবিকায়, স্থলে ও জলে সেই সত্যই বাঙালীর গল্পে এসে বাসা বাধল। রক্ষণশীল জটিলতা ক্ষয়ণীল জটিলতায় পরিণত হল। জমি-জমার অতিরিক্ত দেখা দিল ইন্ডাসট্রিয়ালাইজেশনের

বাস্তব শ্রমনিষ্ঠ সত্যরূপ। গড়ে উঠল নগরে বন্দরে শ্রমিক সংঘ। শ্রম একেবারে সর্বগ্রাসী হয়ে এসে পড়ল। গোয়াল ভরা গরু আর গোলাভরা ধানের নিশ্চিন্ততার পরিবর্তে দেখা দিল মোটাভাত কাপড়ের জন্য সংগ্রাম। যৌথ পরিবারের কাঠামো ধীরে এগিয়ে চলল বিচ্ছিন্নতার দিকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) প্রকৃতপক্ষে আমরা প্রত্যক্ষ অংশীদার ছিলাম না। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী তো স্পষ্টই বলেছিলেন যুদ্ধের আগুনের আঁচ থেকে আমরা মুক্ত থাকবো, এ কেমন করে হতে পারে। এই যুদ্ধের একমাত্র ফসল তো বিপ্লব-দর্শন ছিল না, ছিল মনস্তাত্ত্বিক দর্শনও। সেই মনস্তত্ত্ব এবং অবশ্যই ফ্রয়েডীয় গবেষণা এদেশের তরুণদের আকর্ষণ করল সবচেয়ে বেশি। 'কল্লোলে' বুদ্ধদেব বসু, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখদের রচনায় সেই চিন্তার ছাপ সোচ্চার। অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রাজনৈতিক ক্ষুধা পর্যবসিত হল এদেশে সাহিত্যিক ক্ষুধায়।

এর একটা অব্যবহিত ফল ফললো গ্রামীণ মানসিকতার পালাবদলে। একে ক্ষতিই বলি অথবা পরিবর্তনই বলি—গ্রামীণ সুরের উত্তরাধিকার থেকে বাংলা সাহিত্য যেন সরে আসতে চাইল, নাগরিক প্রাঙ্গনের জটিলতায় বাঙালী জীবন ক্রমলগ্ন হল। রবীন্দ্রনাথ থেকে কেউ আমরা সরে এলাম, কেউ বা তাঁর প্রতিপক্ষতা গ্রহণ করলাম। এটা শুধু কাব্যের ক্ষেত্রেই সত্য নয়। কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও। গল্পেও দেখতে পেলাম যৌবনের উত্তাল লহরীর ফাঁকে ফাঁকে নবজাগ্রত বোধের রক্তিম দিবাকরকে। সাহিত্যের এই পালাবদল ও 'মালাবদল' বস্তুতপক্ষে আমাদের সাহিত্যে দেখা দিল ঐ ১৯৩০ সাল থেকে। এর ধারাবাহিকতা চলেছিল ১৯৪২ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিমকাল পর্যন্ত। এই কালের মধ্যে মনোজ বসুর ভালো গল্পগুলির মধ্যে অনেকগুলিই লেখা হয়েছিল। তবুও তিনি স্বতন্ত্র রইলেন স্ব-তন্ত্রে।

দুই

১৯৩০ থেকে ১৯৪২ সালের কালপর্বকে আমরা আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের বিস্ফারকাল বলতে পারি। প্রেমেন্দ্র মিত্র, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকগণ বাংলা সাহিত্যকে বেনামী বন্দর, মহানগর, অতসীমামী, প্রাগৈতিহাসিক, সরীসৃপ, অকাল বসন্ত, ডবল ডেকার, এরা ওরা এবং আরো অনেকে, ঘরেতে ভ্রমর এলো, দিনমজুর, নারীমেধ, শ্রীমতী, মনপবন, রিয়ালিস্ট, রসকলি, বেদেনী,

মেঘমল্লার, মৌরীফুলের মতো উৎকৃষ্ট গল্পগুলি উপহার দিয়ে এই বিস্ফারকালকে রেখেছেন সুচিহ্নিত।

এঁদের গল্পে একটা সত্য অবিশ্বিকভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে শুধু আকারে ক্ষুদ্র আর প্রকারে বলা হলেই ছোট গল্প হয় না, তা হয় 'জীবনের ছোট একটু-খানি বলাকে সম্বল' করলে শুধু আকারে-প্রকারে নয়, বাচনভঙ্গিতেও প্রকাশভঙ্গিতে এল লক্ষনীয় পরিবর্তন।

এই পরিবর্তনের ধারা আমাদের বঙ্গদেশে সজীব থাকলো উভয় বঙ্গের রাজনৈতিক অঙ্গচ্ছেদ সত্ত্বেও। তবে এলো আরও জটিলতা—পরে আর এক নাম ভ্রাতৃবিদ্রোহ, সাম্প্রদায়িকতা। অবশ্য এর সঙ্গে কোথাও সংযুক্ত হল পল্লী-মধুরতা, কোথাও ক্লাসিকধর্মিতা, কোথাও বৈদগ্ধ্য, কোথাও আঞ্চলিকতা, কোথাও বা সাংবাদিক ক্ষণস্থায়িতা।

ফলকথা আজকের গল্প মানুষকে তার পরিবেশ সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন করে তুলেছে, 'জীবন এতটুকু কেনে' এই প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলছে, আমাদের স্বরূপটুকুকেও দর্পণে প্রতিফলিত করে আমাদের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে।

কিন্তু এই সব গল্প পড়তে পড়তে আমার বার বার মনে হয়েছে এই সব গল্পলেখকেরা তাঁদের মানসিক গঠন অনুযায়ী দুটি পৃথক গল্পলোকের বাসিন্দা হয়ে পড়েছেন। আধুনিকতার প্রাচুর্য এবং রক্ষণশীলতার মাধুর্য মিশিয়ে একদল লেখক গল্প লিখে গেছেন-চলেছেন, অন্য দলের গল্পে আধুনিকতার উগ্রতা এবং প্রগতিশীলতার ব্যগ্রতা হয়ে উঠেছে সোচ্চার। কেউ অন্তর্মুখী, কেউ বা বহির্মুখী। কারো গল্পে ফিরে আসতে চাইছে প্রবীণ পল্লীপ্রকৃতি ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাবলী, কারো মধ্যে রূপায়িত হচ্ছে বাস্তব উষরতা ও বিবস্ত্র দেহচারিতা। যেটা লক্ষনীয়—দুটি ধারাই পাশাপাশি চলছে ক্বচিৎ বিরোধ ঘটিয়ে, প্রমানিত করে যে জীবনের প্রবাহ দুটি—একটি কেন্দ্রাতিগ, অন্যটি কেন্দ্রানুগ।

তিন

এই রকম একটা পরিস্থিতিতে বাংলা গল্পে এসে আসর জমিয়েছিলেন মনোজ-বসু। কিন্তু, আগেই বলেছি, সে আসর ছিল স্ব-তন্ত্রীতে বাঁধা সুরের আলাপে জমজমাট। কোন্ এক শৈশবে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন। এখন 'বয়স বেড়ে বেড়ে জীবনের অপরাহ্ণ দেখা দিয়েছে। কিন্তু গল্প বলা আজও চলেছে।' আগে হয় তো মুখে বলতেন, এখন যা ভাবেন, তাই লিখে বলেন। শিশুপাঠ্য গল্পে তাঁর দক্ষতা অনেকেই জানেন শারদীয় আনন্দমেলার পৃষ্ঠায় এমন দক্ষ দু'একটি গল্পের নাম তাঁর অনুরাগীরা মনে আনতে পারেন সহজেই। কিন্তু তিনি অধিক

প্রিয় তার বয়স্ক-শিশুদের কাছে। 'বাঘ' গল্পে শিশুদের লোমহর্ষক আকর্ষণের চেয়ে বয়স্ক-শিশুরাই বেশি সন্নিকৃষ্ট হন।

প্রথম মুদ্রিত গল্প 'গৃহহারা' (বিকাশ, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা ১৩২৭) প্রকাশের আগে তার সাহিত্য জীবনের শুরু হয় হাতের লেখা পত্রিকাতে। দ্বিতীয় মুদ্রিত সাহিত্য প্রয়াস তার 'ছাপ' গল্পটি (বাঁশরী, ফাল্গুন ১৩৩১)। বড়ো পত্রিকায় তার আত্মপ্রকাশ 'বিচিত্রা'র ১৩৩৭ সালের কার্তিক সংখ্যায়। প্রকাশিত গল্পের নাম 'নতুন মানুষ'। পরেই পরের বছর 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয় তার রীতিমতো গল্প—'বাঘ'। পল্লীবাদের কৌতূহলী পরিবেশে একটি গ্রামোফোনকে এনে যে কৌতূহল-কৌতুকের সন্নিবেশ করেছেন লেখক—তার তুলনা হয় না। বস্তুতঃপক্ষে মনোজ বসুর গল্পের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি এই গল্পে মুদ্রিত হয়ে আছে।

গ্রাম মনোজ বসুর রচনার প্রথম প্রেম। তাঁর স্মৃতিমূলক রচনা ঝিলমিল-এ তিনি নিজেই লিখেছেন (সাহিত্য কথা ও 'নিশিকুটুম্ব' নিবন্ধে)।—

> 'গ্রাম আমার সুন্দরবন অঞ্চল থেকে দূরবর্তী নয় এখন পাকিস্তানে (অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে—সম্পাদক) চলে গেছে। কাঠ কাঠতে মধু ভাঙতে জীবিকার শতবিধ প্রয়োজনে লোকে বনে যায়—বাঘ-কুমির-সাপের কবলে পড়ে তার মধ্যে কত জনে আর ফেরে না। জনালয় থেকে বিচ্ছিন্ন, বনবিবি ও বাঘের সওয়ার, গাজি-কালুর রাজ্য রহস্যময় সুন্দরবন ছোটবেলা থেকে আমায় আকর্ষণ করত। দেশ-বিভাগের আগে সমগ্র সুন্দরবন আমি ঘুরেছি।…ঠিক বাঘের গল্প নয়—কিন্তু রয়্যাল-বেঙ্গল টাইগারের আস্তানা সুন্দরবন নিয়ে দুটো উপন্যাস ('জলজঙ্গল,' 'বন কেটে বসত') ও কতকগুলো গল্প লিখেছি আমি। কোন কোন অংশ একেবারে বনের ভিতর খালের উপর নৌকোয় বসে লেখা। এসব লেখাও পাঠকেরা সমাদরে গ্রহণ করেছেন।'

সুন্দরবন আর ২৪ পরগণার বাদা অঞ্চল মনোজ বসুর গল্পের পটভূমিকা রচনা করেছে। ফলে প্রকৃতি তার আদিমরূপ নিয়ে তাঁর গল্পে হতে পেরেছে প্রত্যক্ষীভূত। বাদার মানুষের যে আকর্ষণ তার পিছনে তার রুজিরোজগার, তার দুঃসাহসিক অভিযান আর তার বেদনাময় পরিণতির মেলবন্ধন ঘটে যায়—তাই তারই মধ্যে লেখক মানবের জীবন-সংগ্রামের একটা স্পষ্ট রূপ দেখতে পান। পল্লীপ্রকৃতি ও মানুষে গলা জড়াজড়ি করে তাঁর গল্প-উপন্যাসের জমি তৈরি করেছে। অন্যের গল্পে যখন গল্প গ্রাম থেকে শহরে উপনীত হয়, মনোজ বসুর গল্প তখন শহর থেকে গ্রামে পরিক্রমা করে।

গ্রামজীবন সর্বস্বতা ও বৃত্তিকেন্দ্রিকতা নিয়েও তাঁর গল্প কিন্তু গ্রাম্য নয়, অনেকাংশে রোমান্টিকও। জমি-জিরেত, মানব-মানবী, সমসাময়িক রাজনীতি সর্বত্রই তাঁর কুশলী কলম রোমান্টিকতার যাদু সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে বলেই আধুনিক নাগরিক মনও তাদের মধ্যে জীবনের প্রতিরূপ দেখে। কিন্তু তাঁর রোমান্টিকতায় মৃত্যুর নির্জনতা নেই, নেই অনাস্থার কোনো আভাস। বরং আছে জীবনের প্রতি গভীর মমতা, এর অস্ত্যর্থক দিক তাঁকে আকর্ষণ করে গভীর টানে—জীবন বিরক্তির সামগ্রী নয়। অনুরক্তির পরম প্রকাশ।

তাঁর এই আস্থা প্রকাশিত গার্হস্থ্য জীবনের মণিকোঠায় যেমন, তেমনি রাজনীতির কুটিল আবর্তেও। তাঁর জীবনের একটা মোটা অংশ রাজনীতির ওঠা-পড়াকে সানুরাগে লক্ষ্য করেছে। সন্ত্রাসবাদ, দেশপ্রেম তার সকল আসল-ঝুটা চেহারা নিয়ে লেখকের কাছে ধরা পড়েছে নিঃশেষে। ইংরেজের সাম্রাজ্য-বাদী স্বরূপে তিনি যত না ভয় পেয়েছেন, তার চেয়ে বেশি ভীত হয়েছেন ঝুটো দেশপ্রেমিকদের ক্রিয়াকলাপে। এই আপাত বিরোধিতা তাঁর মধ্যে সৃষ্টি করেছে তীব্র ব্যঙ্গপ্রবণতা—যা মনোজ বসুর গল্পের একটা স্বাদু অঙ্গবিশেষ। ব্যঙ্গ-রসের ব্যবহারে তিনি একেবারে ফরাসীভাষার জাত-গল্প লিখিয়েদের সমগোত্রীয়। বেশ গল্প শুনছিল পাঠক, হঠাৎ আচমকা ব্যঙ্গের শাণিত অস্ত্রে তার মস্তক কখন বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্তিকালগ্ন হয়েছে, পাঠক বুঝতেও পারেন না।

মনোজ বসু ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে শিক্ষক। তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁর ব্যক্তিগত আদর্শের সৃষ্টি করেছে। সেখানে আপোষ নেই। তাই যেখানেই আদর্শচ্যুতি, সেখানেই তাঁর নৈপুণ্য আদর্শ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর। অথচ নীতিবাক্য কণ্টকিত নয় গল্পগুলি। মানুষের জীবনের উপরের ঢেউগুলি এবং তার গভীরতা দুই-ই তাঁর গল্পে মেদমজ্জা জুগিয়েছে, অসীম পর্যবেক্ষণ শক্তি তাতে সঞ্চার করেছে লাবণ্য এবং অপরিমেয় সহানুভূতি তাতে সংযোগ করেছে প্রাণস্পন্দন।

চার

মনোজ বসুর গল্পগ্রন্থগুলির একটি তালিকা দিই।

১। বনমর্ম্মর ১৩৩৯
২। নরবাঁধ ১৯৩৩
৩। দেবী কিশোরী ১৯৪৩
৪। একদা নিশীথকালে ১৯৪২

৫। দুঃস্বপ্ন-নিশার শেষে ১৩৭১
৬। পৃথিবী কাদের ১৯৪০
৭। উলু ১৯৫৮
৮। খদ্যোত ১৩৫৭
৯। কাঁচের আকাশ ১৯৫০
১০। দিল্লী অনেক দূর ১৯৫১
১১। কুঙ্কুম ১৩৫৯
১২। কিংশুক ১৩৬৪ (২য় সংস্করণ)
১৩। মায়াকন্যা ১৩৫৮
১৪। কল্পলতা ১৯৫৮
১৫। ওনারা (ভৌতিক) ১৩৫৭

এসব গল্পগুলি নিয়ে পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি গল্পসংগ্রহ গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে।

১। মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প : জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ১৯৫০
২। গল্প সংগ্রহ : রবীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত ১৩৬৪
৩। গল্প পঞ্চাশৎ : ১৯৫২
৪। মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নির্বাচিত) : ১৩৩৬
৫। গল্প সমগ্র : ৪ খণ্ডে (ভূদেব চৌধুরী সম্পাদিত)

এতোগুলি গল্পসঙ্কলন বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়ে মনোজ বসুর গল্প বিষয়ে পাঠকদের আগ্রহ প্রমাণ করেছে নিঃসংশয়ে। 'গল্পসমগ্র' প্রকাশিত হওয়ার পরও এর প্রভূত চাহিদা বর্তমান। শেষ শ্রেষ্ঠ সংকলনটি সম্পাদনা করার কথা ছিল বিদগ্ধ অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের। সেই মত তিনি একটি তালিকা তৈরি করে মনোজ বসুর হাতে দেন। কিন্তু সম্পাদকীয় রচনার মতো অবকাশ তাঁকে ইহলোক দেয়নি। লেখকের একটু সংক্ষিপ্ত ভূমিকাসহ এটি তখন প্রকাশিত হয় তালিকার সামান্য হেরফের ঘটিয়ে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো রুচিশীল পাঠক এর তালিকা নির্মাণ করেছিলেন এবং স্বয়ং লেখক তাতে ইতস্তত রদ-রিফু করে দিয়েছিলেন বলে বর্তমান সংস্করণেও সেই একই গল্পাবলী মুদ্রিত হয়েছে।

এতো কথা জানানোর কারণ মনোজ বসুর কিছু পাঠকরা নিশ্চয়ই এই তালিকায় খুশী হবেন না। শ্রেষ্ঠ গল্প সম্পাদনার এই এক বিষম ঝুঁকি। কিন্তু অধিকাংশ লোক খুশী হবেন একথা নিশ্চিত জেনে এটিকেই প্রকাশ করা গেল। আমি জানি বাঘ, নরবাঁধ, রায় রায়ানের দেউল, একদা নিশীথকালে (কেউ কি একে এরোটিক

বলবেন ?), বাতাবী লেবু, রাত্রির রোমান্স প্রভৃতি গল্প এতে স্থান পেলে অনেকেই খুশী হতেন। তাঁদের ইচ্ছা জানতে পারলে অবশ্যই বারান্তরে সেগুলি অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রকাশককে আগাম অনুরোধ জানিয়ে রাখি। কারণ এগুলি সঙ্কলিত হলেই সম্ভবত তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-মনোজ বসু গল্পবৃত্তটি সুবলয়িত হয়ে উঠতে পারবে। মাটি মা ও মানুষ, জল আর জঙ্গল নিয়ে জীবনের যে আলপনা এই তিনজনের গল্পে ধরা আছে অবিসম্বাদীভাবে এই গল্প সঙ্কলনেও অবশ্য তা দুর্নিরীক্ষ নয়। যে গল্পগুলি সঙ্কলিত হয়েছে, এবারে তার যে সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা করতে চলেছি, তা থেকে মনোজ বসুর গল্পের প্রকৃতি পাঠকের কাছে অধরা রইবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

পাঁচ

এবার আমরা নির্বাচিত গল্পগুলির জমিতে দাঁড়িয়ে এর শস্যের অপূর্ব্ব স্বাদ গ্রহণ করে হতে চাইছি পূর্ণ পরিতৃপ্ত।

সঙ্কলিত গল্পগুলির শিরোভূষণ হয়ে রয়েছে '**বনমর্মর**'। এটিকে মনোজ বসুর শিরোধার্য গল্প বলেও অনেকেই মনে করে থাকেন। তাঁদের সে সিদ্ধান্তে আমরাও সায় দিতে সম্মত আছি। গঠন কৌশল, ব্যঞ্জনা সমাবেশ, সম্ভাবনীয়তার সীমার মধ্যে কল্পনাসঙ্কোচ—এই ত্রিবিধগুণে অলঙ্কৃত এই গল্পটিকে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনোজবাবুর 'সর্বপ্রধান গল্প' বলে অভিহিত করেছেন। এতে তিনি 'আরণ্য প্রকৃতির মর্মস্থলে যে অতিপ্রাকৃতের ব্যঞ্জনা গুপ্ত থাকে, তাহা অতি নিপুণতার সহিত মনস্তত্ত্বানুমোদিত উপায়ে ব্যক্ত করিয়াছেন।'

জমি জরিপের কাজে ক্যাম্পে জীবন কাটে সদ্য বিবাহিত শঙ্করের। স্ত্রীর কাছে বিদায় নিয়ে এসে 'এক বিকালবেলা মামুদপুর ক্যাম্পে সে জরিফের কাজ করিতেছে, এমন সময় চিঠি আসিল, সুধারাণী নাই।'

সংক্ষিপ্ত বাক্যে লেখক এই নির্মম সংবাদ দিয়ে শঙ্করের অন্তরের প্রেমের দেউলটিকে চুরমার করে দিলেও মন্দিরের প্রেমের প্রতিমাটিকে ধ্রুবতারার বিশ্বাসে স্থির রেখেছেন। সাতমাস পরেও তাই শেষ বিদায়ের অভিজ্ঞান চুরুটের কৌটোয় রাখা শুকনো বেলপাতায় শঙ্কর প্রেমের সুরভি আঘ্রাণ করে অন্তর পরিপূরিত করে।

কর্মী শঙ্করের জীবনে আসে ধনঞ্জয় চাকলাদারদের জমিদারি সমস্যা। সহকর্মী ভজহরি কর্মজীবনে এগিয়ে চলার হদিশ বাত্‌লে দেয়। মিতবাক্ প্রকৃতির বুকে সে বুনে দেয় রূপকথার মায়াজাল—দীঘির বুকে অজস্র ঢেউয়ে তোলে প্রেমের

শত আলিম্পন। কিম্বদন্তীর আঁচল ধরে শঙ্করের মন উধাও হয় চারশো বছর আগে মাঠের প্রান্তে ওঠা এক চাঁদের দেশে। রূপকথার জীবনের সঙ্গে কখন আনমনে মিলে যায় বর্তমান জীবনের অগীত বাণীর সংলাপ। জানকীরাম ও মালতীমালার প্রণয়মধুর অবস্থানে শঙ্কর নিজেকে আর সুধারাণীকে বসিয়ে দেয় দুর্বল কোনো মুহূর্তে। মন কেমনের হাওয়ার পাকে জেগে ওঠে অনেক স্মৃতি। সুধারাণী যা যা বলত, যেমন করে রাগ করত, ব্যথা দিত—সব কথা।

বেখেয়ালী হয়ে পড়ত শঙ্কর। গড়খাই পার হতে গিয়েও যেন হারিয়ে ফেলে সম্বিত। মনে হত 'ঘোড়াসুদ্ধ তাহাকে ঐ বনের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সমস্ত রাত ছুটিলেও কেবল বন প্রদক্ষিণ করিতে হইবে—নিষ্কৃতি নাই।' শঙ্করে অতলান্ত প্রেম, প্রেমের সুদূরবর্তী আভাস, তার সমস্ত উদাসীন বৈরাগী চিত্ত এক রহস্যঘন অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে আকর্ষণ করে এগিয়ে গেছে এই অনবদ্য গল্পটিতে। রূপকথা, প্রকৃতি আর মানব চিত্তে ঘটে গেছে এক পুণ্যশ্রী ত্রিবেণী-সঙ্গম।

'অশ্বত্থামার দিদি' গল্পটি পড়ে আমার মনে বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যাত্রার স্মৃতি' পুনর্বার মনে পড়ে গেল। যাত্রার অভিনেতারা যে মহনীয় ধারণা সৃষ্টি করে অভিনয়কালে স্পর্শকাতর দর্শকদের মনে, তা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, যখন গ্রীণরুমে সেই অভিনেতা তুচ্ছ বিড়িপানের তুচ্ছতায় নিজেকে নামিয়ে দেয় দর্শকদের অতলান্ত অবিশ্বাসের নরকে। তবুও অশ্বত্থামার দিদিরা অবিশ্বাসও করতে পারে না। চিকের আড়াল থেকে অশ্বত্থামার অভিনয় দেখতে দেখতে মজুমদার-এস্টেটের রকম সাতআনা শরিক স্বর্গীয় যদুনাথ মজুমদার মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রবধূ উমাশশীর চোখ জলে ভরে যায়।

কারণ তার মনে পড়ে যায় বাপের বাড়ি উজ্জলপুরে 'পাঁচ বৎসর আগে সেখানে প্রতি রাত্রে দিদি ও ভাইটি মায়ের কোলে জড়াজড়ি করিয়া থাকিত।' তার বোকা ভাইটি হারানকে সে আজ পাঁচটি বছর দেখেনি। অশ্বত্থামা অভিনয় করে চলেছে জমিদার দেউড়িতে—তার মুখখানাকে দেখে উমার মনে পড়ে গেছে তার হারানো কথা। আর সবাই যখন ভীম-এর বীররসাত্মক অভিনয়ের রসে আকণ্ঠ মগ্ন—উমাশশী তখন বিশ্বাস করে—'সব চাইতে ভালো একটো করলে কে? অশ্বথামা না?'

যাত্রা শেষে যাত্রাদলের লোকেরা খেতে বসবে। উমার মনে পড়ে চলেছে একটু দুধ খাওয়ার জন্যে যাত্রার ছেলে অশ্বত্থামার কান্না। শেষে দ্রোণ এনে

দিলেন একপাত্র পিটুলিগোলা। আহারে, তার বোকা ভাই হারাণ একটুও দুধ খেতে পাচ্ছে না হয়তো! উমা কাকুতি করে বলে, ও বামুন-মা, ঐ যে ছেলেটা অশ্বথামা সেজেছিল, ওকে খাওয়ার শেষে একটুখানি দুধ দিও। কোথায় পাবে এতো রাতে দুধ! উমার ছেলের সে রাতে আর দুধ খাওয়া হল না। বুকের মধ্যে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'আজকে আর দুধ পাবি নে—তোর সে দুধ দিয়ে দিইছি।' ভাইয়ের প্রতি দিদির ভালবাসা নিয়ে গ্রাম্যকথায় একটা প্রবচন আছে—'নুন খেয়ে যেমন জলের টান বোনের তেমনি ভাইকে টান'। কথাটা নিঃশেষে প্রমাণিত হয়ে গেল এই গল্পে। ভগ্নীপ্রেমের এমন দুকূলপ্লাবী গল্প বাস্তবিকই দুর্লভ। পেটের সন্তানও সেই প্রেমের কাছে তুচ্ছ হয়ে পড়ে। এসব মূল্যবোধ কি এই কৃত্রিম সমাজ ব্যবস্থায় হারিয়ে যাচ্ছে?

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় **'মাথুর'** গল্পটির মধ্যে গল্পের 'ঐক্য বিধ্বস্ত ও রস ফিকে' হতে দেখেছেন। এই অভিযোগ তিনি তীব্র ভাষায় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এর আবেদন সম্ভবত অস্বীকার করা যাবে না। আসলে এটিকে ছোট গল্প না ভেবে একে বড়ো গল্প ভাবলেই এর শিথিলতাকে ক্ষমা করা যাবে। অকর্মণ্য উমানাথ এবং বিষয়ানুরাগী ক্ষেত্রনাথ দুই ভাই। এঁদের গুরুকন্যা জগদ্ধাত্রী তাঁর বিষয়-উদ্ধারের জন্যে ক্ষেত্রনাথের সঙ্গে বিরোধিতায় নেমেছেন। এ-নিয়ে উভয়ের কাছেই অন্যায় প্রশ্রয় পেয়েছে। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে স্মৃতি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে উমানাথ এবং তার কীর্তনের পদাবলী—মাথুরের বিরহাত্মক পদও তার ললিত-কঠোর ভণিতা আর আঁখির। শেষ অবধি এক সিন্দুকের ওয়ারিশন নিয়ে জগদ্ধাত্রী আর ক্ষেত্রনাথের মধ্যে রফা করে দিল ঐ উমানাথই—ক্ষেত্রনাথকে সিন্দুকের জন্য (কারণ তাতে আছে গুরুর মূল্যবান পদাবলী সংগ্রহ) দিতে হবে দশ টাকা। কিন্তু জগদ্ধাত্রীর চলে যাবার সময়ে কৃপণ ক্ষেত্রনাথ পাঁচ টাকার বেশি দিতে চাইলো না। গাড়ীভাড়ার জন্য চার টাকা রেখে বাকী টাকাটা দিয়ে ক্ষেত্রনাথের ছেলের জন্য একটা কলের গাড়ি কিনে দিতে বলে জগদ্ধাত্রী সোজা একটা যোগবিয়োগের অঙ্ক কষে দিলেন। হাতে থাকলো তার বাপের বাড়ীর স্মৃতি—একখানা খাতা। গো-গাড়ীতে চলেছে জগদ্ধাত্রী—পিছনে পিছনে চলেছে ক্ষেত্রনাথ। হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করে বসে—'আর কতদূর যাবে পণ্টুদা; ফেরো এবার।' অমনি সব গোলমাল হয়ে গেল। কলহ, টাকার রাগ সব ছাপিয়ে এসে মেলো যৌবন-স্মৃতির লহরী। দুজনের রহস্যালাপে আমরা জানতে পারলাম—সে সময়ে রটে গেছিল ওদের বিয়ের কথা। মনে পড়ায় সব এলোমেলো হল। গাড়ি থেকে নেমে দুজনে গেল

খেয়া-ঘাটের কিনারে। দুই বুড়াবুড়ি পরম নিরাসক্তিতে বিগত দিনের স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগলেন।

মঠবাড়িতে তখন গান জমে উঠেছে। সহসা শ্রোতারা দেখলেন ক্ষেত্রনাথ চাটুজ্জ্যেও মাথুর পালা শুনতে বসেছেন। পরে 'সবিস্ময়ে সকলে দেখিল, ক্ষেত্রনাথের চোখে জল। গান শুনিয়া ক্ষেত্রনাথ কাঁদিয়া ফেলিবেন, অতি বড় শত্রুও এমন অপবাদ দিবে না। হয়তো চোখের অসুখ, হয়তো চোখে খড়-কুটা পড়িয়াছে।...'। শ্রীমতী রাধাকেও তো আমরা দেখেছি—'ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদে।'

এই সংকলনের সবচেয়ে ছোট আকারের গল্প '**গয়না**'। গল্পটি পড়েও শুধু আরও ছোট্ট একটি শব্দ বেরিয়ে আসে সমস্ত শরীর মনকে আক্ষিপ্ত করে—ওঃ!

বেকার অখিল স্ত্রীর কাছে দেখায় আশ্চর্য সতীপনা। সংসার অচল, তবুও সে স্ত্রীর গয়নায় হাত দেবে না, এমন ধনুকভাঙা পণ। পরিবর্তে সে নিজের আঙ্‌টি-বোতাম বন্ধক দেবার প্রস্তাব রাখে। চোখের জল আড়াল করে স্ত্রী সুরমা মুখে হাসির সুর্মা টেনে বলে—তোমার কাজেই যদি না লাগলো, তবে এ গয়না বয়ে বেড়ানোই মিথ্যে। উপরের ফ্ল্যাটের লিলির অভিযোগকে সে নস্যাৎ করে বলে এসেছে, অখিল কোনোদিন রেসের মাঠের ধারে-পাশে যায় না।

পাশের ফ্ল্যাটের চাটুজ্জে দম্পতি এদের প্রেমের গভীরতা আড়ি পেতে অনুভব করেন।

আর অখিল ঘুমিয়ে পড়লে তার আঙটি-বোতাম নিয়ে ঐ লিলির কাছে গভীর রাতে গিয়ে সুরমা সে দুটি রেখে দিতে অনুরোধ করে বলে—তুই রেখে দে ভাই। কি জানি—তালা খুলে চুরি করে যদি বের করে নেয়। অভ্যাস আছে তো?

আরও অনুরোধ করে ও-দুটোর বদলে যেন গিল্টি করা দুটো গয়না এনে দেয়—'আমার সর্বস্ব ঘুচিয়ে ও যেমন গিল্টির গয়নায় বাক্স ভরিয়ে রেখেছে ঠিক তেমনি।'

হায় সনাতন সতীত্ব! হায় প্রেমগর্ভ 'রসিক' স্বামীত্ব।

আগের গল্পটির মতো '**জমাখরচ**' গল্পটিও সংক্ষিপ্তাকার। এরও জীবনায়ন মানুষের জীবনের হিসেবের ঠিকে আনে অনিবার্য ভুল অঙ্কপাত।

রসময়বাবু হঠাৎ ছোটমেয়ের বিয়ের রাতে মারা গেলেন। আজন্ম হিসেবী রসময়বাবু মরে যাওয়ার মতো একটা বেহিসেবী কাজ করে ফেললেও বড় মেয়ে

চিত্রশিল্পী চিত্রলেখা (কুন্তী), মেজ মেয়ে গীতশিল্পী গীতলেখা (পূর্বনাম খুন্তি) এবং ছোট মেয়ে মঞ্জুশ্রীর (আদি ও অন্তপর্বের হিসেবে খেঁদি) বিয়ের একটা আনুপূর্বিক হিসেব রেখে গিয়েছিলেন। তিনি মেয়ের কোর্টশিপ বাবদ সামান্য কিছু খরচ বাদে বড় মেয়ের বিয়েতে মোট ব্যয় ১২৭৷৷৹/, মেজ মেয়ের শুভ বিবাহের রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ৩৩৷৴৹ এবং খেঁদির বিয়েতে বরপণ, বাড়িবন্ধকের দলিল সম্পাদন এবং বিবাহের গহনার মূল্য শোধ বাবদ মোট ২০৪৪৪৷৷৹ খরচের হিসেব দেখতে পাই। 'শেষ বিয়ের আনুষঙ্গিক খরচপত্র জমাখরচে লিখে যেতে পারেন নি।' শেষ হিসেবটি দেখলে অবশ্য মনে হয় রসময়বাবু মারা গিয়ে তাঁর হিসেবের যথার্থ রসবোধটুকু প্রকাশ করে গেছেন।

সাধারণত যে কোনো নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একটা ক্লেদ-পঙ্কিল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়ে থাকে। 'খাজাঞ্চিমশায় ও ভাইঝি' গল্পে এমন একটা সম্ভাবনা যে গড়ে ওঠেনি তা নয়। কিন্তু লেখকের নাম মনোজ বসু, পঙ্কে তিনি পঙ্কজের সৃষ্টি করে থাকেন। কৌতুক রসের ভিয়েনে, আপাত ক্রোধের উপচার এবং প্রেমের সুড়ঙ্গায়িত চলাফেরায় মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা জমে উঠেছে শেষ অবধি।

জমিদারের ছেলে বিমান নেমেছে ভোটে। জমিদারের কচুটি বোঝে। যিনি বোঝেন তিনি হলেন তাঁর খাজাঞ্চি গোপাল ঘোষ। ঘটনাক্রমে বিমানবিহারীর বিপক্ষে যিনি দাঁড়িয়েছেন সেই কিশোরীবাবুর পক্ষ নিয়ে বসেছে গোপাল ঘোষের ভাইঝি বনমালা। বিমানের দাপটে গোপালবাবুর যাত্রাশোনা, পদাবলী পাঠ ভড়কে যায় প্রায়ই। তার উপরে বনমালা উল্টো গাইছে। গোপালের চাকরি এই যায় তো এই যায়। নেহাৎ বুড়োকর্তা শ্রীনাথ রায় বাঁচিয়ে রেখেছেন—এই যা রক্ষে।

যাত্রার আসরে 'এই এক্ষুণি আসছি' বলে জমিয়ে বসেছেন গোপাল। দেরি দেখে বনমালা সোজা এসে হাজির। পাকড়ে নিয়ে গেল বিমান খাজাঞ্চিমশাইকে তার ঘরে অপেক্ষমানা বনমালার কাছে। ভোটের আগুনে পড়ল প্রথম জলের ছিটে।

এদিকের আগুন নিবু নিবু হয়ে উঠল। বিমানের আর ভোটে জেতার উৎসাহ নেই। ওদিকের আগুন জ্বলে উঠল—বিমানের মা বলেছেন, মেয়েটি বড় খাসা। অমনি বিমানের অহঙ্কার উড়ে গেল প্রেমের দারুণ তুফানে। 'হাত-মুখ নেড়ে সে মহাতর্ক শুরু করলে: বড়লোক, গরিবলোক, চাকর, মনিব—ও সব ভগবান

করেনি, মানুষ করেছে।' বিমানবিহারীর গলায় বনমালার দোদুল্যমানতার ইঙ্গিত দিয়ে লেখক একটি মিষ্টিমধুর প্রণয়ের ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন। অনেকদিন আগে পড়া তাঁর 'এক বিহঙ্গী' উপন্যাসেও এমনি একটা মিঠে পরিবেশকে দেখেছিলাম উচ্চকিত।

মায়ের চেয়ে মাটি বড়ো—শস্যশ্যামলা বাংলাদেশের এ যেন এক অহঙ্কারী সুবচন। মাটির অধিকার হারানো, সে যেন সমগ্র মনুষ্যত্বের অপমান। অথচ মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ, মাটির মালিক তারাই হন'—এই তীব্র অব্যবস্থা আর বৈষম্যের চরম প্রতিবাদ **'পৃথিবী কাদের'** গল্পটি। মাটিকে ভালবেসে, সংসারকে ভালবেসে নটবরেরা নিজেদের দীনতাকে অস্বীকার করে অবহেলায়। দম্পতির প্রেমে রচিত হয় নিশ্চিন্ততার নীড়। নটবর ঘরামি করে, সৌদামিনী খড় জোগায়। একপহর রাত না কাটতেই নটবর কাঁধে জোয়াল চাপায়।

এমনি করে দিন কাটছিল। কিন্তু একদিন নটবরের হাত দুটি ধরে জিগ্যেস করে সৌদামিনী—দিনে চাষ না করে এতো রাতে সে চাষ করে কেন। উড়িয়ে দেয় নটবর কোনো আশঙ্কার কথা। কিন্তু আশঙ্কা মূর্তিমান হয়ে এল মাণিক বরকন্দাজের রূপ নিয়ে। .তিন বছরের খাজনা বাকী। বাকী খাজনার দায়ে মানও গেল, পেটও ভরল না। আদালতের ছাপ-মারা পাকা হুকুম এল। সকালে উঠে নটবর দেখে তার সাধের 'বীজতলায় গরু পড়েছে'।

অবশেষে সৌদামিদীর কথায় সায় দিয়ে-নটবর বলে—'তাই চল, জমি যখন দেবে না—চল্ তোর পিশের বাড়ি যাই তবে।' মনে পড়ে যায় তখন আমিনার হাত ধরে গফুরের ফুলবেড়ের চটকলে যাওয়ার কথা। কিন্তু আরও কিছু তীব্রতা মনোজ বসুর কলম থেকে ঝ'রে পড়েছে—জলন্ত টেমিটা ঘরের চালে ছুঁড়ে দিয়ে পৈশাচিক হাসি হেসে সৌদামিনী বলে—যা পুড়ছে তা তো আমাদের নয়—'আমাদের কি—যাদের জিনিস, তাদের পুড়ছে—তাদের সর্বনাশ!' গফুরের মতো সৌদামিনীও না-থাক ঈশ্বরের কাছে অভিযোগ পাঠায়—'পৃথিবী যদি বাঁটোয়ারা করে দিয়েছিস—তবে আমাদের সেখানে পাঠাস কি জন্যে?'

এই গল্পেরই টান অনুভব করি **'ধানবনের গান'** গল্পটিতে। সেখানেও অবশ্য নোনা জলে ধান ডোবায় ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাই নিয়ে দেখা দেয় বিবাদ-বিসম্বাদ। এর জমির আল কেটে দেয়-ও; এখনও গ্রামের এ নিত্য চিত্র। সেখানে 'ধানগাছে গান গায়, ধানবন ডেকে ডেকে রূপ দেখায়।' এরই মধ্যে চাষীর মেয়ে দুলি আর গোয়ালার ছেলে নন্দরাম-এ লাগে সংঘাত জমিতে ঘাস খাওয়ানোর নামে অভিযোগ। নন্দরামের অগ্রজ কানাই মানুষটি ভাল।

এই ঝগড়ার একটা মিলনান্তক সমাপ্তি ঘটানোতে সে নেয় একটি মহনীয় ভূমিকা। ধান নিয়ে দুলির সঙ্গে নন্দরামের কোন্দল যখন চরমে। তখন কানাই বলে ওঠে —নন্দরাম যাতে ধান খাইয়ে না দেয় গরু দিয়ে, তা দেখার জন্য একটা 'সর্দার' দরকার। জীবধরকে বলে—'ধান-টান থাকগে, তুমি দুলি মা'টিকে দিয়ে দাও।'

শুনে নন্দ সদম্ভে বলে, 'ওরে দুলি, গয়লা-গয়লা করতিস যে বড়—এবার যদি তোকে কেউ ডাকে গয়লা-বৌ?' দুলি চুপ করে থাকার মেয়ে নয়—গয়লার ব্যবসা রাখতে দেবো বুঝি? বাড়িকে দিয়ে আসছে বছর চাষ হবে।'

যে ধানের জমিতে বিবাদের চাষ হয়েছিল পরের বছর দেখা গেল 'ঘন কালো আউস ধান। আল-পথে চলেছে দুলি আর নন্দ।'

রাজনৈতিক স্বাধীনতা যেমন এক নয়, মানসিক স্বাধীনতাকেও তেমনি এদের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটানো যায় না। রাজনীতি নিয়ে লেখক একদা ভেবেছেন এবং লিখেছেনও 'ভুলি নাই'-এর মতো অনুপম উপন্যাস। এদেশেও একদা স্বাধীনতা এসেছে কিন্তু কতোখানি আবেদন সৃষ্টি করেছে এই স্বাধীনতা সাধারণ মানুষের জীবনে? এর উত্তর একটা আছেই, স্পষ্ট করে বলা হয়েছে নিতান্ত সাহস ভরে —'**দিল্লি অনেক দূর**' গল্পে। সত্য কথা জানে অনেকেই, উচ্চারণ করে ক'জন?

আশ্রিত শৈল রাঁধুনির মেয়ে। কিন্তু প্রশ্রয়ে উঠেছে দুর্দান্ত রকমের বেড়ে। গোয়ালে কাজ করে পবন – তার সঙ্গে নিত্য খুনসুটি তার। কিন্তু তারই আড়ালে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে ওরা স্বাধীনভাবে বাঁচার স্বপ্ন। পবনকে তাই গোয়ালের কাজ ছেড়ে যেতে হয় স্বাধীন দোকানের ব্যবসায়ে।

আশ্রয়দাতা অজয় ভালবাসে দেশকে। সেও চায় ইংরেজ রাজত্বের অবসানে দেশে আসুক দীর্ঘ আকাঙ্খিত স্বাধীনতা। 'তারই আকর্ষণে বারিদ মুখুজ্যের মেয়ে তৃপ্তির আকর্ষণকে ছাড়িয়ে উঠে জেলকে বরণ করে সানন্দে। তারপর দেশ স্বাধীন হয়। ইউনিয়ন জ্যাকের পরিবর্তে উঠবে তেরঙা পতাকা জেলের গেটে সম্বর্ধনার জন্যে জমা হয় নকল দেশপ্রেমিকরা। তৃপ্তিদের বাড়িতেও পতাকা উঠবে। একদা 'অচ্ছুৎ দেশপ্রেমিক' অজয়কে জানায় তারা পতাকা উত্তোলনের আমন্ত্রণ।

সে আমন্ত্রণ অজয় অস্বীকার করে। অকৃত্রিম পল্লীপ্রেমে—সে যে শৈলিকে চিঠি দিয়েছে—'পনেরই আগস্ট স্বাধীনতা-দিবস; তার আগে ছাড় পেয়ে যাবো।

গাঁয়ে থাকব ঐ দিনটা, ওখানে পতাকা তুলব।' অজয়ের নৌকো গিয়ে লাগল গ্রামের ঘাটে। না, তাকে আহ্বান করার জন্য কেউ আসেনি। কোনো 'শঙ্খধ্বনি নেই।' এগিয়ে গিয়ে অজয় ডাকে শৈলিকে। জিগ্যেস করে স্বাধীনতা দিবসের কথা সে কি গ্রামের কাউকে বলেনি? জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে শৈলি উত্তর দেয় —'বলেছি বই কি! তা মনে সুখ নেই কারো। ধান-চালের এই দাম— একবেলা খেয়ে থাকে। তা-ও খেতে হয় না অবিশ্যি—বিষম জ্বরব্যাধি, উপোসই চলে বেশির ভাগ দিন।' অথচ 'স্বাধীন ঘর বাঁধবার জন্য এরা দুঃখের পথে পা বাড়িয়েছিল।' অজয়ের মনে হয়েছিল—'পতাকা না এনে সাধ্যমত দু'খানা চারখানা কাপড় কিনে যদি বগলদাবায় করে নিয়ে আসত!' এখনও কি সেই ছবির পরিবর্তন হয়েছে?

এই সঙ্কলনের অন্যতম সেরা গল্প বলে 'উলু' গল্পটিকে আমার মনে হ'য়েছে। নাতনিকে কনে দেখার মুহূর্তে সবাই যখন 'হুলুধ্বনি' দিচ্ছে তখন আনন্দে মগ্ন শিবনাথের দশ বছর আগেকার ঘটনা মনে প'ড়ে চোখে যে জল এসেছিল, সেই চোখের জলেই এই গল্পের পরিসমাপ্তি। এবং শেষ কথা বুঝি পড়ে শেষ করে ওঠা যায় না।

গল্প বেশ চলছিল পারিবারিক স্নেহ-ভালবাসার আলোছায়ার বুনুনি বেয়ে— সহজ রহস্যবোধে আর রোমাণ্টিক রসে ভরপুর হয়ে তরতর করে। কিন্তু বিয়ের কনে সেজে গৌরী যখন তৈরি, হঠাৎ খবর এলো 'ভরতের দেউলের ঐখানটায় এসে বাবুরা সব একদিকে ঝুঁকে পড়লেন। মাঝগাঙে কুমির ভেসে যাচ্ছিল। কোটালের গাঙ, টানের মুখ—'। লেখক বাক্য শেষ করেননি, প্রয়োজনও হয়নি বলার যে নৌকোডুবি হয়ে গেছে।

বাধ্য হয়ে লগ্নভ্রষ্টার আশঙ্কাকে দূর করার জন্যে যার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে সেই ঠাকুরদার বয়সী বিপত্নীক নিশি মল্লিককে ডেকে আনা হল পিঁড়িতে। নিয়মরক্ষা হল বটে। 'শুভবিবাহে উলু দেওয়া বিধি' কিন্তু সকলের গলা শুকিয়ে কাঠ এমন অঘটনে। হঠাৎ 'চিরদিনকার শান্ত লাজুক মেয়ে' গৌরী এক ঝটকায় চেলির ঘোমটা দূরে ফেলে উষার শান্ত নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে উলু দিতে আরম্ভ করল।

তারপর থেকে গৌরী প্রতি উষায় উলু দিতে আরম্ভ করল। সারাদিন ভাল থাকে। কিন্তু রাতে যে-কার সেই। পালিয়ে আসে এ-পাড়ায় শিবনাথের দেউড়ি পার হয়ে অন্দরমহলে। নিশিকান্ত গৌরীর নবনীত দেহে অত্যাচারের স্থায়ী চিহ্ন এঁকে দেয়। 'সোনার অঙ্গে আপন-হাতে নিশিকান্ত বেত মারিয়াছে,

চামড়া কাটিয়া গিয়াছে, চাপ চাপ রক্ত জমিয়াছে।'

ডাক্তার এল। বিকেলের দিকে গৌরী ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ, দিয়ে উঠল—উলু—উলু উলু। 'বেলা ডুবিবার সঙ্গে সঙ্গে গৌরী চোখ বুঁজিল'। লেখককে কি এতো নির্মম হতে হয়!

পরবর্তীকালে এই বিয়োগান্ত গল্পটি নিয়েই লেখন রচনা করেন তাঁর 'শেষ লগ্ন' নাটকটি। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র লেখককে ঠিকই বলেছিলেন 'এত বেদনা দর্শকদের সহ্য হবে না।'

'বীরপূজা' গল্পের পরিবেশ বিদেশ হলেও পরিস্থিতি ভারতবর্ষের। ট্রেনে ভ্রমণরত বাঙালী লেখক হঠাৎ পরিচিত হলেন এক অগ্নিদগ্ধ নিউজিল্যাণ্ডবাসীর সঙ্গে। তার সঙ্গে এক কুঞ্চিত কেশ তরুণী। ভারতীয় জেনে লেখককে নিউজিল্যাণ্ড-বাসী জিগ্যেস করলেন—'শরিফপুরা জানো?' সেই 'বরকত সিং সন্ত সিঙের বাড়ি যেই গ্রামে।' অমন বীর মানুষ আর হয় না।

তারপর সারা পথ ধরে চলল তাদের বীরপণার কথা। ভারতবাসীটি জানেন না সেই সিং-ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা। ফিরে এসেছেন দেশে। মাসখানেক আগে তাকে যেতে হয়েছিল অমৃতসরে। খোঁজ করে গেলেন শরিফপুরায়। একটা স্তম্ভে বরকত সিঙের নাম খোদাই দেখা গেল। কিন্তু সন্ত সিং? শুনে 'চেঁচিয়ে উঠল একটা ভিখারী।...আমি এই যে, আমি। কিছু দিয়ে যাও বাঙালীবাবু, ভাল হবে তোমার—'

তারপর কলমে তীব্র বিদ্রূপের শর শানিয়ে নিয়ে লেখক শেষ করলেন—'তা গুণগ্রাহী বটে সরকার বাহাদুর! সিমেন্ট-বাঁধানো পাকা চাতাল বানিয়ে দিয়েছে বরকত সিঙের স্মৃতিস্তম্ভের সঙ্গে। নইলে নিচের ঐ কাদার মধ্যে বসে ভিক্ষে করতে হত।' টীকা নিষ্প্রোয়জন।

'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চড়ানো বাঙালি জাতির জাতীয় অধিকার। ছোট লাইনে অতি ছোট স্টেশনের সন্নিকটস্থ আরও অতি ছোট গ্রামের সভায় দিকপাল সরকারকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সভাপতি হিসেবে। তাঁকে নিয়ে যাওয়ার কারণ বীরগড়ের সভাকে ফড়িংমারি গ্রামের সভা পণ্ড করে দেবেই। স্টেশনে এসে ফড়িংমারি পাণ্ডারা সভাপতিকে নিয়ে গেলেন। কিন্তু পরে জানা গেল তিনি বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিক দিকপাল সরকার নয়, রসময় দাস! পিতৃদত্ত নাম হলেও রসময় রসিক ছিলেন না, বক্তৃতা দেওয়া তাঁর কস্মিনকালেও আসে না। ধমক খেয়ে তাঁকে দিকপাল সেজে সভাপতিত্ব করতে হল।

সভায় বীরগড়ের কয়েকজন মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ধরিয়ে দিলেন জালিয়াতিটা—এ লোক দিকপাল সরকার নয়। শুরু হয়ে গেল সভায় প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা।

শেষে গণ্ডগোল থামল। বীরগড় পশ্চাদপসরণ করল। তাদের সভায় এসেছিলেন নাদু মল্লিক। ফেরার ট্রেন এসে হাজির। খুব ভীড়। নাদু মল্লিক ও রসময় দাস দুজনকেই তুলে দিতে এসেছে নিজ নিজ দলের লোকেরা। নাদু মল্লিকের মুখের চারিদিকে ব্যাণ্ডেজ-আঁটা। ট্রেনে ভদ্রলোক রসময়কে রহস্য খুলে বললেন—'আমার অদৃষ্ট দেখলেন তো মশায়? গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েই যত দুর্ভোগ। জংশনে গিয়ে ঘুম ভাঙল। সেখান থেকে ছয় মাইল ছুটোছুটি করে সভায় গেলাম। দেখলেন তো সেখানটায় অভ্যর্থনার বহর।

আপনার নাম?

'**দিকপাল সরকার**।' একে কি বলবো?—ভ্রান্তিবিলাস? না কমেডি অব এররস্। কমেডি নিশ্চয়ই নয় ট্রাজেডি অব এররস্। মনোজ বসু নব্যবঙ্গের দ্বিতীয় শেক্সপীয়র।

শেক্সপীয়র নাকি একদা বলেছিলেন যে গান ভালবাসে না, সে মানুষ খুন করতে পারে। কথাটা একটু বদলে নিয়ে 'গান'-এর জায়গায় 'হাসি' শব্দটি বসালেও সম্ভবতঃ শেক্সপীয়র আপত্তি করতেন না। কিন্তু হাসি যে 'সর্বনাশি হতে পারে সে সত্য তার মনে জাগতো না। তুলসীতলার যে প্রদীপটি তার স্নিগ্ধ আলোকে আঙিনায় যাদু সৃষ্টি করে, সে প্রদীপ আবার বহ্নিশিখা হয়ে গৃহ-দাহও ঘটাতে পারে। নতুন সাবান 'শুভ্রা'র প্রচার করতে গিয়ে সুশান্ত একদিন 'উপবন' হোটেলে হিমির হাসিতে ধরা দিল। হোটেল মালিক, তার ভূতপূর্ব মাস্টার মশায়ের প্ররোচনায় সুশান্ত ঐ হাসিতেই ধরা দিল নিজেকে। নিজের এলেমে 'শুভ্রা'-র একটা গোটা প্যাকেটও সুশান্ত বিক্রি করতে পারেনি। ফেরার পথে স্ত্রী হিমানী স্বামীকে বিক্রির কাজে সহায়তা করতে গেল। ফলে 'শুভ্রা' হু হু করে বিক্রি হতে লাগল। 'কম নিক, বেশি নিক ফেরায় না কেউ। দোকানিগুলো পুরুষমানুষ নিশ্চয়ই সেই কারণে।' কিন্তু জ্বালা ধরে যায় সুশান্তর পৌরুষত্বে—'হাসছিলে কেন দোকানদার ছোঁড়ার দিকে চেয়ে অমন ক'রে?' সে অপ্রস্তুত হয়। কিন্তু পোড়া হাসি চোখের জলেও ধুয়ে যায় না।

শেষে চিঠি এল মাস্টারমশায়ের—হোটেলের ভার সব হিমানী-সুশান্তকে দিয়ে যেতে চান। সেই ভাল। তারা গোছগাছ করতে লাগল। যাবার আগে—সরষের তেলে ফুলকপি ছাড়তে গিয়ে গরম তেল ছিটকে উঠে সারা

উঠে সারা মুখে পড়ল হিমানীর। তারপর হাসপাতাল থেকে হিমানী যেদিন এল, তার বিকৃত মুখের দিকে সুশান্ত আর তাকাতে পারে না। হি-হি হো হো প্রাণপণ নিঃসংকোচ হাসিতে হিমানী চারপাশ কাঁপিয়ে তোলে।

সেই মুখ নিয়ে মাস্টারমশায় রামজয়ের কাছে গেল ওরা। তিনিও দেখে আঁতকে উঠে বললেন - 'মুখ দেখে কেউ রান্না খাবে না, খদ্দের যে ক'টি আছে তারাও সরে পড়বে।' লেখক কিন্তু আমাদের বলে দেননি, সুশান্ত নিশ্চিন্ত হয়েছিল কিনা অথবা তার ঈর্ষাবীজের গাছটা একেবারেই উপড়ে গেছিল কিনা !

পড়ছি যেন ব্রতকথা—'উত্তরের পথ দক্ষিণের পথ'। কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপুজোর আয়োজন চলেছে নানা উপচার, উপকরণে। মেয়েমানুষের মাঝে শোভা করে বসেছেন এক ব্রতী কেদারকাকা। উবু হয়ে নারকেল কুড়ে চলেছেন।

গল্প চলেছে তারই ফাঁকে—পরিবারের ক্ষয়ের গল্প। সেই গল্পে এসে পড়েছেন বিধবা সুন্দরীপিসি। পুজোর শেষে তিনি চলে যাচ্ছেন। এমন সময় দেখা গেল তক্তপোষের নীচে থেকে নারকেল-সন্দেশে ভরা থলিটা উধাও। জানা গেল সব নিয়েছেন সুন্দরী পিসি। রেগে দুজনে প্রতিজ্ঞা করেন - সামনের বারের পুজোতে একজন যদি আসে অন্যজন আসবে না।

পরের বছর সুন্দরীপিসি গোরুর গাড়ি থেকে নেমেই জিজ্ঞেস করেন—কেদার আসেনি তো ? মরেছে ঠিক অম্লেয়ে—তারপর পুজোর বার্ষিক বরাদ্দ নামিয়ে দিয়ে চুপচাপ রইলেন—পরের বছর আর এলেনই না।

জীবনের উপরিচর সম্পর্কের গভীরে যে আন্তরিকতার স্তর, আস্তিক লেখক মনোজ বসুর গভীর আস্থা তার উপর। একটা করুণ প্রতিশ্রুতির অতি করুণ পরিণতি দিয়ে সেটা নিঃশেষে হয়েছে সপ্রমাণ।

বর্তমানটা এমনই অনাস্থায় ব্যতিব্যস্ত যে মানুষ প্রায়শঃই অতীতের গৌরব-স্মৃতিতে গঠিত হয়। না হয় সেটা সত্যকথন, না হয় সেটা মিথ্যাচারও। হোটেল-ডি-প্যারীতে থাকবার আমন্ত্রণ জানায় এর মালিক কিষণলাল। প্রসঙ্গক্রমে হোটেলের আভিজাত্য ঘোষণা করতে গিয়ে এর বাসিন্দাদের পরিচয় তুলে ধরে। মিনিস্টার পশুপতি সামন্ত, ফিল্মস্টার মধুমালতী, আর আছেন রাজা বাহাদুর কনক নারায়ণ।

মিথ্যা বলেনি কিষণলাল। লেখক গিয়ে দেখলেন, এঁরা সবাই আছেন। তবে সবাই ভূতপূর্ব—একদা ছিলেন। পশুপতি রাইটার্সে'ই আছেন—তবে মন্ত্রীর

গদি থেকে দারোয়ানের টুলে, লোলচর্মা মধুমালতীর কণ্ঠে তীব্র হতাশ্বাস। শুধু কনকনারায়ণ তার মেজাজটি ভুলতে পারেননি। তালগাছ কেটে নিলেও পুকুরটার নাম তালপুকুরই থাকে। **'একদা ছিলেন'** মানবজীবনের ওঠা-পড়ার নব্য পুরাণ।

'কানু গাঙ্গুলীর কবর'-এ ন্যাপলার মা-র পর আর কেউ টেমি জ্বালাতে আসেনি। সাহেবদের টাকা লুঠ করতে গিয়ে বন্দুকের গুলিতে মরেছিল কানু আর তাকে কবর দিয়েছিলেন নিজের হাতে শঙ্কর-দা। তার চিকিৎসা করেছিল যে অমূল্য সরকার ফোর্থ ইয়ার মেডিকেলের ছাত্র সে পরে খ্যাতিমান সরকারী চিকিৎসক হয়। ইংরেজের অনুগ্রহে প্রফুল্লবাবুও এম, এল, এ হন। সেটাই রীতি, নতুন কথা নয়।

কিন্তু কানু গাড়ি লুট করবার আগে প্রফুল্লর 'বিধবা-কুমারী' বোন হাসির কাছ থেকে শুধু মিষ্টি খেয়ে আসেনি, পেয়ে এসেছিল গা শির-শির করা হাতের পরশও।

তাই কবর দিয়ে আসার পর হাসি জিগ্যেস করলে শঙ্কর-দা, যে অক্লেশে আদালতে মিথ্যা কথা বলে এসেছে, সে মিথ্যা কথা বলতে পারেনি। কতো বিপ্লব আর ভালবাসা এমনি করেই কবরস্থ হয়ে গেছে।

'ভেজালের উৎপত্তি' গল্পটির নামে কি কোন লঘুচারিতা আছে? তাহলে পড়তে হয় এ-গল্পটি। কারণ এটি অবশ্য পাঠ্য-গল্প। অবশ্য আমি জানি গল্পটি পড়েই অনেকে বলবেন তাঁরা এ গল্পটি অবশ্য পড়েন নি।

পারলৌকিক পরিবেশে রচিত এই গল্পের সমস্যা দেখা দিয়েছে যমপুরীতে, সেখানে নাকি 'আত্মার ডেফিসিট' চলছে। অতএব যমদূতেরা আত্মার সন্ধানে এসেছে। স্বয়ং চিত্রগুপ্তও চাকরী বাঁচাতে এসেছেন কলকাতা শহরের দক্ষিণপ্রান্তে এক ঝানু লেখকের বাড়ি। তাঁর মা হাঁপানিতে গতপ্রায়। চিত্রগুপ্তের ভরসা হল—কিন্তু মা জননী পুড়ে মরতে রাজী নন। মা জননীর স্বামীও গতপ্রায়। তাঁর মরণের বাসনা শুনে চিত্রগুপ্ত তাঁকে ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পরামর্শ দেন। হার্টের রোগী সিঁড়ি ভেঙে উঠে মরতে নারাজ হলেন।

অবশেষে গেলেন লেখকের কাছে। সেখানেও ব্যর্থ হয়ে ফিরলেন যমলোকে। হঠাৎ চিত্রগুপ্তের মাথা খুলে গেল। ভেজালের সৃষ্টি হল। আর সে ভেজাল খেয়ে কতকাল মানুষ 'সুন্দর ভুবন' আঁকড়ে ধরে থাকবে?

যমরাজ এই প্রস্তাবে একটা সংযোজনী দিয়ে বললেন—আত্মাতেও ভেজাল দাও। 'মানুষ-আত্মার আকাল তো ভ্রূণের মধ্যে গরু-গাধা-নেড়িকুত্তা-পাতি-শিয়ালের আত্মা ঢুকিয়ে দাও।'

খুব হাসছিলাম না? এবার? লেখক শেষ মোক্ষম দাওয়াই দিলেন এই গল্প সংকলনের শেষ পঙ্‌ক্তিটিতে—'সেই জিনিস চলছে। নর-সমাজে ইদানীং এত যে জন্তু-জানোয়ার কীট-পতঙ্গের প্রাদুর্ভাব, গূঢ় রহস্য এইখানে।'

মনে হল 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্য পড়ছি।

ছয়

এই গল্প সংকলনের ভূমিকা লেখার ভার আমার উপর সাগ্রহে অর্পণ করেছেন বন্ধুবর ময়ূখ বসু—মনোজ বসুর সাহিত্যপ্রিয় সন্তান। সে তাঁর বন্ধুকৃত্য। আমারও আছে পিতৃকৃত্য। পিতৃতুল্য মনোজকাকার সঙ্গে আমিও একদা তিন রাত্রি বাস করেছি দূর ভাগলপুরের এক সরকারী বাংলোতে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে। তাঁর রচনার প্রতি আমার আবাল্য অনুরাগ সেই সান্নিধ্য দৃঢ়মূল হয়েছিল। আজ সুযোগ পেয়ে লিখিতভাবে তাঁর সম্পর্কে আমার ভাবনাচিন্তা নাম অনুরাগীদের কাছে পৌঁছে দিলাম।

একদিন বেঙ্গল পাবলিশার্স-এই আলাপ হয়েছিল শ্রীদীপক চন্দ্রের সঙ্গে। তাঁর 'মনোজ বসু : জীবন ও সাহিত্য' থেকে এই ভূমিকা রচনার উপকরণ যত্রতত্র সংগ্রহ করে সেই পরিচয়কে মুদ্রিত করে দিলাম সম্পাদকীয় শিলমোহরে। অবশ্য মনোজ বসুর অন্যান্য শ্রেষ্ঠগল্প সংকলনের ভূমিকা আমি ইচ্ছে করেই দেখিনি, পাছে প্রভাবিত হয়ে পড়ি। তবুও তাঁদের চিন্তায় আমার চিন্তায় গরমিল না ঘটতে পারে। কারণ আকাশকে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ যে কোণ থেকেই দেখা হোক না কেন, সে আকাশেই থাকে।

যাঁর তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি ও বিচারবোধ আমার পাণ্ডুলিপিগুলিকে পরিচ্ছন্ন করে তোলে এবারেও তাঁর উপদেশ থেকে বঞ্চিত হইনি।

বারিদবরণ ঘোষ

বনমর্মর

মৌজাটি নিতান্ত ছোট নয়। অগ্রহায়ণ হইতে জরিপ চলিতেছে, থানাপুরি শেষ হইল এতদিনে। হিঞ্চে-কলমীর দামে আঁটা নদীর কূলে বটতলার কাছাকাছি সারি সারি তিনটি তাঁবু পড়িয়াছে। চারিদিকে বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ।

শঙ্কর-ডেপুটি সদর-ক্যাম্প হইতে আজ আসিয়া পৌছিয়াছে। উপলক্ষ একটা জটিল রকমের মকদ্দমা। ছোকরা মানুষ, ভারি চটপটে—পত্নীবিয়োগের পর হইতে চাঞ্চল্য যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। আসিয়াই আমিনের তলব পড়িল।

আমিনকে ডাকিতে পাঠাইয়া একটা চুরুট বাহির করিল। চুরুটের কৌটায় সেই সাত মাস আগেকার শুকনো বেলের পাতা ক-টি এখনও রহিয়াছে।

সাত মাস আগে একদিন বিকালবেলা তাহাদের দেশের বাড়িতে দোতলার ঘরে ঢুকিয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল : সুধারাণী, কালকে কি বার?

সুধা বলিয়াছিল, পাঁজি দেখগে যাও, আমি জানি নে। তারপর হাসিয়া চোখ দুটি বিস্ফারিত করিয়া বলিয়াছিল, চলে যাবেন, তাই ভয় দেখানো হচ্ছে। ভারি কিনা ইয়ে—

শঙ্করও খুব হাসিয়াছিল। বলিয়াছিল যদি মানা করো, তবে না হয় যাই নে।

থাক!

কোনো জবাব না দিয়া সুধারাণী অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় কোঁচাইয়া পাট করিতে লাগিল। শঙ্কর তাহার হাত ধরিয়া কাছে আনিল।

শোনো সুধারাণী, উত্তর দাও।

বা-রে, পরের মনের কথা আমি জানি বুঝি?

নিজের তো জান?

তবু কথা কহে না দেখিয়া শঙ্কর বলিতে লাগিল, আমি চলে যাব বলে তোমার কষ্ট হচ্ছে কিনা সেই কথাটা বলো আমায়, না বললে শুনছি না কিছুতে।

না।

সত্যি বলছ?

না—না—না। বলিয়া হাত ছাড়াইয়া সুধা বাহির হইয়া যাইতেছিল। শঙ্কর পলায়নপরার সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

মিছে কথা। দেখি, আমার দিকে চাও—কই চাও দিকি সুধারাণী।

সুধা তখন দুই চক্ষু প্রাণপণে বুজিয়া আছে। মুখ ফিরাইয়া ধরিতেই ঝরঝর করিয়া গাল বাহিয়া চোখের জল গড়াইয়া পড়িল। আঁকিয়া-বাঁকিয়া পাশ কাটাইয়া বধূ পলাইল।...

শেষ রাতে বৃষ্টি নামিয়াছে। লক্ষ্মণ বাহির হইতে ডাকিল, ছোটবাবু, ঘাটে ষ্টিমার সিটি দিয়েছে।

সুধারাণী গলায় আঁচল বেড়িয়া প্রণাম করিল। কহিল, দাঁড়াও একটু। তাড়াতাড়ি কুলুঙ্গির কোণ হইতে সন্ধ্যাকালে গোছাইয়া রাখা বিল্বপত্র আনিয়া হাতে দিল।

দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা! হপ্তায় একখানা করে চিঠি দিও, যখন যেখানে থাক, বুঝলে?

আরও একটা দিনের কথা মনে পড়ে, এমনি এক বিকালবেলা মামুদপুর ক্যাম্পে সে জরিপের কাজ করিতেছে, এমন সময় চিঠি আসিল, সুধারাণী নাই।

ইতিমধ্যে নকশা ও কাগজপত্র লইয়া ভজহরি আমিন সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

দু-শ দশ—এগারো—তার উত্তরে এই হলে গে দু-শ বারো নম্বর প্লট—বলিয়া ভজহরি নকশার উপর জায়গাটা চিহ্নিত করিল। বলিতে লাগিল, অনাবাদী বন-জঙ্গল একটা, মানুষজন কেউ যায় না ওদিকে, তবু এই নিয়ে যত মামলা।

হঠাৎ একবার চোখ তুলিয়া দেখিল, সে-ই কেবল বকি?? মরিতেছে, শঙ্কর বোধকরি একবারও কাগজপত্রের দিকে তাকায় নাই—সামনের উত্তরের মাঠের দিকে এক নজরে তাকাইয়া আপন মনে দিব্য শিষ দিতে শুরু করিয়াছে; চুরুটের আগুন নিভিয়া গিয়াছে।

বলিল, হ্যাঁ, ঐ যে তালগাছ ক'টার ওধারে কালো কালো দেখা যাচ্ছে—জঙ্গলের আরম্ভ ঐখানে। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক, কিন্তু ওর মধ্যে জমি অনেক...এইবারে রেকর্ড একবার দেখবেন হুজুর, ভারি গোলমেলে ব্যাপার।

হাঁ হাঁ না—এই রকম বলিতে বলিতে একটু অপ্রস্তুত হইয়া শঙ্কর কাগজ-

পত্রে মন দিল। পড়িয়া দেখিল, দু-শ বারোর খতিয়ানে মালিকের নাম লেখা হইয়াছে, শ্রীধনঞ্জয় চাকলাদার।

ভজহরি বলিতে লাগিল, আগে ঐ একটা নাম শুধু লিখেছিলাম। তারপর দেখুন ওর নিচে নিচে উডপেন্সিল দিয়ে আরও সাতটা নাম লিখতে হয়েছে। রোজই এই রকম নতুন নতুন মালিকের উদয় হচ্ছে। আজ অবধি একুনে আটজন তো হলেন—যে রেটে ওঁরা আসতে লেগেছেন দু-একদিনের মধ্যে কুড়ি পুরে যাবে বোধ হচ্ছে, এই পাতায় কুলোবে না।

শঙ্কর কহিল, কুড়ি পুরে যাবে, যাওয়াচ্ছি আমি—বোসো না। আজই খতম করে দেব সব। তুমি ওদের আসতে বললে কখন?

সন্ধ্যের সময়। গেরস্ত লোক সারাদিন কাজকর্মে থাকে—একটু রাত হয় হবে, জ্যোৎস্না রাত আছে—তার আর কি?

আরও খানিকটা কাজকর্ম দেখিয়া শঙ্কর সহিসকে ঘোড়া সাজাইতে হুকুম দিল।

বলিল, মাঠের দিক দিয়ে চক্কোর দিয়ে আসা যাক একটা—এ রকম হাত-পা কোলে করে তাঁবুর মধ্যে কাঁহাতক বসে থাকা যায়! এ জায়গাটা কিন্তু তোমরা বেশ সিলেক্ট করেছ, আমিন মশাই। ওগুলো ভাঁটফুল, না? কিন্তু গাঙের দশা দেখে হাসি না কাঁদি—

বলিতে বলিতে আবার কি ভাবিল। বলিল, ঘোড়া থাকগে, এক কাজ করলে হয় বরং—চলো না কেন, দু-জনে পায়ে পায়ে জঙ্গলটা ঘুরে আসি। মাইলখানেক হবে—কি বল? বিকেলে ফাঁকায় বেড়ালে শরীর ভালো থাকে। চলো—চলো—

মাঠের ফসল উঠিয়া গিয়াছে। কোনোদিকে লোক-চলাচল নাই। শঙ্কর আগে আগে যাইতেছিল, ভজহরি পিছনে। জঙ্গলের সামনেটা খাতের মতো—অনেকখানি চওড়া, খুব নাবাল। সেখানে ধান হইয়া থাকে, ধানের গোড়াগুলা রহিয়াছে। পাশ দিয়া উঁচু আল বাঁধা।

সেখানে আসিয়া শঙ্কর কহিল, গাঙের বড় খাল-টাল ছিল এখানে?

ভজহরি কহিল, না হুজুর, খাল নয়—এটা গড়খাই। সামনের জঙ্গলটা ছিল গড়।

গড়?

আজ্ঞে হ্যাঁ রাজারামের গড়। রাজারাম বলে নাকি কে একজন কোনকালে এখানে গড় তৈরি করেছিলেন। এখন তার কিছু নেই, জঙ্গল হয়ে গেছে সব।

তারপরে দুজনে নিঃশব্দে চলিতে লাগিল।

মাঝে একবার জিজ্ঞাসা করিল—বাঘ-টাঘ নেই তো?

ভজহরি তাচ্ছিল্যের সহিত জবাব দিল, বাঘ! চারিদিকে ধুধু করছে ফাঁকা মাঠ, এখানে কি আর···তবে হ্যাঁ, অন্যান্যবার শুনলাম কেঁদো গোবাঘা দু-একটা আসত। এবারে আমাদের জ্বালায়—

বলিয়া হাসিল। বলিতে লাগিল, উৎপাতটা আমরা কি কম করছি হুজুর? সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই—কম্পাস নিয়ে চেন ঘাড়ে করে করে সমস্তটা দিন। ঐ পথ যা দেখছেন, জঙ্গল কেটে আমরাই বের করেছি, আগে পথঘাট কিছু ছিল না—এ অঞ্চলের কেউ এ বনে আসে না।

বনে ঢুকিয়া খানিকটা যাইতেই মনে হইল, এই মিনিট দুয়ের মধ্যেই বেলা ডুবিয়া রাত্রি হইয়া গেল।

ঘন শাখাজাল-নিবদ্ধ গাছপালা, আম আর কাঁঠাল গাছের সংখ্যাই বেশি। পুরু বাকল ফাটিয়া চৌচির হইয়া গুঁড়িগুলি পড়িয়া আছে যেন এক-একটা অতিকায় কুমির, ছাতাধরা সবুজ, ফাঁকে ফাঁকে পরগাছা···একদা মানুষেই যে ইহাদের পুঁতিয়া লালন করিয়াছিল আজ আর তাহা বিশ্বাস হয় না। কত শতাব্দীর শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা মাথার উপর দিয়া কাটিয়া গিয়াছে, তলায় আঁধারে এইসব গাছপালা আদিম কালের কত সব রহস্য লুকাইয়া রাখিয়াছে, কোনো-দিন সূর্যকে উঁকি মারিয়া কিছু দেখিতে দেয় নাই।

এই রকম একটানা কিছুক্ষণ চলিতে চলিতে শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল।

ওখানটায় তো ফাঁকা বেশ! জল চকচক করছে—না?

আমিন বলিল, ওর নাম পঙ্কদীঘি।

খুব পাঁক বুঝি?

তা হবে। কেউ আবার বলে, পঙ্খী-দীঘির থেকে পঙ্কদীঘি হয়েছে।

বলিয়া ভজহরি গল্প আরম্ভ করিল:

সেকালে এই দীঘির কালো জলে নাকি অতি সুন্দর ময়ূরপঙ্খী ভাসিত। আকারেও সেটি প্রকাণ্ড—দুই কামরা, ছয়খানি দাঁড়। এত বড় ভারী নৌকা, কিন্তু তলির ছোট্ট একখানা পাটা একটুখানি ঘুরাইয়া দিয়া পলকের মধ্যে সমস্ত ডুবাইয়া ফেলা যাইত। দেশে সে সময় শাসন ছিল না, চট্টগ্রাম অঞ্চলের মগেরা আসিয়া লুটতরাজ করিত, জমিদারদের মধ্যে রেষারেষি লাগিয়াই ছিল। প্রত্যেক বড়লোকের প্রাসাদে গুপ্তদ্বার ও গুপ্তভাণ্ডার থাকিত, মান-সম্ভ্রম লইয়া পলাইয়া যাইবার—অন্ততপক্ষে মরিবার—অনেক সব উপায় সম্ভ্রান্ত লোকেরা

হাতের কাছে ঠিক করিয়া রাখিতেন। কিন্তু নৌকার বহিরঙ্গ দেখিয়া এসব কিছু ধরিবার জো ছিল না। চমৎকার ময়ূরকণ্ঠী রঙে অবিকল ময়ূরের মতো করিয়া গলুইটি কুঁদিয়া তোলা—শোনা যায়, এক-একদিন নিঝুম রাত্রে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে রাজারামের বড় ছেলে জানকীরাম তাঁর তরুণী পত্নী মালতীমালাকে লইয়া চিত্র-বিচিত্র ময়ূরের পেখমের মতো পাল তুলিয়া ধীর বাতাসে ঐ নৌকায় দীঘির উপর বেড়াইতেন। এই মালতীমালাকে লইয়া এ অঞ্চলের চাষারা অনেক ছড়া বাঁধিয়াছে, পৌষ-সংক্রান্তির আগের দিন তাহারা বাড়ি বাড়ি সেই সব ছড়া গাহিয়া নূতন চাউল ও গুড় সংগ্রহ করে, পরদিন দল বাঁধিয়া সেই গুড়-চাউলে আমোদ করিয়া পিঠা খায়।

গল্প করিতে করিতে তখন তাহারা সেই দীঘির পাড়ের কাছে আসিয়াছে। ঠিক কিনার অবধি পথ নাই, কিন্তু নাছোড়বান্দা শঙ্কর ঝোপঝাড় ভাঙিয়া আগাইতে লাগিল। ভজহরি কিছুদূরে একটা নিচু ডাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নল-খাগড়ার বন দীঘির অনেক উপর হইতে আরম্ভ করিয়া জলে গিয়া শেষ হইয়াছে, তারপর কুচো-শেওলা শাপলার ঝাড়। ঝুঁকিয়া পড়া গাছের ডাল হইতে গুলঞ্চলতা ঝুলিতেছে। একটু দূরের দিকে কিন্তু কাকচক্ষুর মতো কালো জল। সাড়া পাইয়া ক-টা ডাকপাখি নলবনে ঢুকিল। অল্প খানিকটা ডাইনে বিড়ালআঁচড়ায় কাঁটাঝোপের নিচে এককালে যে বাঁধানো ঘাট ছিল, এখন বেশ বুঝিতে পারা যায়।

সেই ভাঙাঘাটের অনতিদূরে পাতলা পাতলা সেকেলে ইটের পাহাড়। কতদিন পূর্বে বিস্মৃত শতাব্দীর কত কত নিভৃত সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রে জানকীরাম হয়তো প্রিয়তমাকে লইয়া ওখান হইতে টিপিটিপি এই পথ বাহিয়া এই সোপান বহিয়া দীঘির ঘাটে ময়ূরপঙ্খীতে চড়িতেন। গভীর অরণ্যছায়ে সেই আসন্ন সন্ধ্যায় ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের সমস্ত সংবিৎ হঠাৎ কেমন আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

ধ্যেত, আমার ভয় করে—কেউ যদি দেখে ফেলে!

কে দেখবে আবার? কেউ কোথাও জেগে নেই, চলো মালতীমালা—লক্ষ্মীটি, চলো যাই।

আজ থাক, না না—তোমার পায়ে পড়ি, আজকের দিনটে থাক শুধু।

ঐ যেখানে আজ পুরানো ইটের সমাধিস্তূপ, ওখানে বড় বড় কক্ষ অলিন্দ বাতায়ন ছিল, উহারই কোনোখানে হয়তো একদা তারা-খচিত রাত্রে ময়ূরপঙ্খীর উচ্ছ্বসিত বর্ণনা শুনিতে শুনিতে এক তন্বঙ্গী রূপসী রাজবধূর চোখের তারা লোভে ও কৌতুকে নাচিয়া উঠিতেছিল, শব্দ হইবে বলিয়া স্বামী হয়তো বধূর

পায়ের নূপুর খুলিয়া দিল, নিঃশব্দে খিড়কি খুলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া দুইটি চোর সুপ্তপুরী হইতে বাহির হইয়া ঘাটের উপর নৌকায় উঠিল, রাজবাড়ির কেউ তা জানিল না। ফিসফাস কথাবার্তা…স্বচ্ছ মেঘের আড়ালে চাঁদ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল…শব্দ হইবার ভয়ে দাঁড়ও নামায় নাই…এমনি বাতাসে বাতাসে ময়ূরপঙ্খী মাঝদিঘী অবধি ভাসিয়া চলিল—

ভাসিতে ভাসিতে দূরে—বহুদূরে—শতাব্দীর আড়ালে কোথায় তাহারা ভাসিয়া গিয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের কেমন ভয় করিতে লাগিল। গভীর নির্জনতার একটি ভাষা আছে, এমন জায়গায় এমনি সময় আসিয়া দাঁড়াইলে তবে তাহা স্পষ্ট অনুভব হয়। চারিপাশের বনজঙ্গল অবধি ঝিম্ ঝিম্ করিয়া যেন এক অপূর্ব ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভয় হইল, আরও কিছুক্ষণ সে যদি এখানে এমনিভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, জমিয়া নিশ্চয় গাছের গুঁড়ির মতো হইয়া এই বনরাজ্যের একজন হইয়া যাইবে; আর নড়িবার ক্ষমতা থাকিবে না।…সহসা সচেতন হইয়া বারংবার সে নিজের স্বরূপ ভাবিতে লাগিল, সে সরকারী কর্মচারী…তার পসার প্রতিপত্তি…ভবিষ্যতের আশা… মনকে ঝাঁকা দিয়া সমস্ত কথা স্মরণ করিতে লাগিল। ডাকিল: আমিন মশাই!

ভজহরি কহিল, সন্ধ্যে হয়ে গেল, হুজুর।

যাচ্ছি।

ক্যাম্পের কাছাকাছি হইয়া শঙ্কর হাসিয়া উঠিল। কহিল, ডাকাত পড়েছে নাকি আমাদের তাঁবুতে? বাপরে বাপ! এবং হাসির সহিত ক্ষণপূর্বের অনুভূতিটা সম্পূর্ণরূপে উড়াইয়া দিয়া বলিতে লাগিল, চুরুট টেনে টেনে তো আর চলে না—হুঁকো-কলকের ব্যবস্থা করতে পার আমিন মশাই, খাঁটি স্বদেশি মতে বসে বসে টানা যায়?

আমিনও হাসিয়া বলিল, অভাব কি? মুখের কথা না বেরুতে গাঁ থেকে বিশটা রুপোবাঁধা হুঁকো এসে হাজির হবে, দেখুন না একবার—

গ্রামের ইতর-ভদ্র অনেকে আসিয়াছিল, উহাদের দেখিয়া তটস্থ হইয়া সকলে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। মিনিট দশেক পরে শঙ্কর তাঁবুর বাহিরে আসিয়া মামলার বিচারে বসিল। বলিল, মুখের কথায় হবে না কিছু, আপনাদের দলিলপত্তোর কার কি আছে দেখান একে একে। ধনঞ্জয় চাকলাদার আগে আসুন।

ধনঞ্জয় সামনে আসিল। কোষ্ঠীর মতো জড়ানো একখানা হলদে রঙের কাগজ, কালো ছাপ-মারা পোকায় কাটা, সেকেলে বাংলা হরফে লেখা। শঙ্কর বিশেষ কিছু পড়িতে পারিল না, ভজহরি কিন্তু হেরিকেনটা তুলিয়া ধরিয়া অবাধে আগাগোড়া পড়িয়া গেল। কে-একজন দয়ালকৃষ্ণ চক্রবর্তী নামজাদ রাজারামের গড় একশ বারো বিঘা নিষ্কর জায়গা-জমি মায় বাগিচা-পুষ্করিণী তারণচন্দ্র চাকলাদার মহশেয়ের নিকট সুস্থ শরীরে সরল মনে খোশকোবলায় বিক্রয় করিতেছে।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল : ঐ তারণচন্দ্র চাকলাদার আপনার কেউ হবেন বুঝি ধনঞ্জয়বাবু?

ধনঞ্জয় সোৎসাহে কহিতে লাগিল, ঠিক ধরেছেন হুজুর, তারণচন্দোর আমার প্রপিতামহ। পিতামহ হলেন কৈলাসচন্দোর—তাঁর বাবা। তিরাশি জরিপের চিঠে রয়েছে। কবলার তারিখটে একবার লক্ষ্য করে দেখবেন, হুজুর—

আরও অনেক কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু উপস্থিত অনেকে না না—করিয়া উঠিল। তাহারাও রাজারামের গড়ের মালিক বলিয়া নাম লেখাইয়াছে, এতক্ষণ অনেক কষ্টে ধৈর্য ধরিয়া শুনিতেছিল, কিন্তু আর থাকিতে পারিল না।

ধমক খাইয়া সকলে চুপ করিল। শঙ্কর ভজহরিকে চুপিচুপি কহিল, তুমি ঠিকই লিখেছ, চাকলাদার আসল মালিক, আপত্তিগুলো ভুয়ো—ডিসমিস করে দেব।

ভজহরি কিন্তু সন্দিগ্ধভাবে এদিক-ওদিক বার দুই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আসল মালিক ধরা বড় শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে, হুজুর—

বারো-শ উনিশ সনের পুরোনো দলিল দেখাচ্ছে যে!

ভজহরি কহিতে লাগিল, এখানে আটঘরা গ্রামে একজন লোক রয়েছে, ন-সিকে কবুল করুন তার কাছে গিয়ে—উনিশ সন তো কালকের কথা, হুবহু আকবর বাদশার দলিল বানিয়ে দেবে। আসল নকল চেনা যবে না।

বস্তুতঃ ধনঞ্জয়ের পর অন্যান্য সাতজনের কাগজপত্র তলব করিয়া দেখা গেল, ভজহরি মিথ্যা বলে নাই—ঐ রকম পুরানো দলিল সকলেরই আছে। এবং বাঁধুনিও প্রত্যেকটির এমনি নিখুঁত যে যখনই যাহার কাগজ দেখে একেবারে নিঃসন্দেহ বুঝিয়া যায়, রাজারামের গড়ের মালিক একমাত্র সেই লোকটাই। এ যেন গোলক-ধাঁধায় পড়িয়া গেল। বিস্তর ভাবিয়া-চিন্তিয়া সাব্যস্ত হইল না কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে রাখা যায়।

হাল ছাড়িয়া দিয়া অবশেষে শঙ্কর বলিল, দেখুন মশাইরা, আপনারা ভদ্রসন্তান—

হাঁ—হাঁ—করিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল।

এই একটা প্লট একসঙ্গে ঐরকম ভাবে আটজনের তো হতে পারে না ?

সকলেই ঘাড় নাড়িল। অর্থাৎ, নয়ই তো—

ভদ্রসন্তানেরা তাহাতে পিছপাও নহেন। একে একে সামনে আসিয়া ইশ্বরের দিব্য করিয়া বলিল, দু-শ বারোর প্লট একমাত্র তাহারই, অপর সকলে চক্রান্ত করিয়া মিথ্যা কথা কহিতেছে।

লোকজন বিদায় হইয়া গেলে শঙ্কর বলিল, না, এরা পাটোয়ারি বটে। দেখে-শুনে সম্ভ্রম হচ্ছে।

ভজহরি মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, এ রকম সে অনেক দেখিয়াছে।

শঙ্কর বলিতে লাগিল, তোমার কথাই মেনে নিলাম যে কাঁচা দলিলগুলো জাল। কিন্তু যেগুলো রেজেস্ট্রী ? দেখ, এদের দুরদৃষ্টি কত দেখ একবার—কবে কি হবে, দু-পুরুষ আগে থেকে তাই তৈরি হয়ে আসছে। চুলোয় যাকগে দলিলপত্তোর—তুমি গাঁয়ে খোঁজখবর করে কি পেলে বল ? যা হোক একরকম রেকর্ড করে যাই—পরে যেমন হয় হবে।

ভজহরি বলিল, কত লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আসবার আগে কত সাক্ষিসাবুদ তলব করেছি, সে আরও মজা—এক-একজনে এক-এক রকম বলে। বলিয়া সহসা প্রচুর হাসিতে হাসিতে বলিল, নরলোকে আশকারা হল না, এখন একবার কুমারবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করতে পারলে হয়।

শঙ্কর কথাটা বুঝিতে পারল না।

ভজহরি বলিতে লাগিল, কুমার বাহাদুর মানে জানকীরাম। সেই যে তখন ময়ূরপঙ্খীর কথা বলছিলাম, গাঁয়ের লোকেরা বলে—আশপাশের গ্রাম নিশুতি হয়ে গেলে জানকীরাম নাকি আসেন—উত্তর মাঠের ঐ নাক-কাটির খাল পেরিয়ে তেঘরা-বকচরের দিক থেকে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে রোজ রাত্তিরে মালতীমালার সঙ্গে দেখা করে যান—সে ভারি অদ্ভুত গল্প—কাজকর্ম নেই তো এখন ?

০ ০ ০ ০ ০

তারপর রাত্রি অনেক হইল। তিনটি তাঁবুরই আলো নিভিয়াছে, কোনো দিকে সাড়াশব্দ নাই। শঙ্করের ঘুম আসিতেছিল না। একটা চুরুট ধরাইয়া বাহিরে আসিল, আসিয়া মাঠে খানিক পায়চারি করিতে লাগিল।

ভজহরি বলিয়াছিল, কেবল জঙ্গল নয় হুজুর, এই মাঠেও সন্ধ্যের পর একলা কেউ আসে না। এই মাঠ সেই যুদ্ধক্ষেত্র, নদীপথে শত্রুরা এসেছিল। বেলা না ডুবতে রাজারামের পাঁচ-শ ঢালী ঘায়েল হয়ে গেল, সেই পাঁচ-শ মড়ার পা ধরে টেনে পরদিন ঐ নদীতে ফেলে দিয়েছিল···

উলুঘাসের উপর পা ছড়াইয়া চুপটি করিয়া বসিয়া শঙ্কর আনমনে ক্রমাগত চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।

চার-শ বৎসর আগে আর একদিন সন্ধ্যায় গ্রামনদীকূলবর্তী এই মাঠের উপর এমনি চাঁদ উঠিয়াছিল। তখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়া সমস্ত মাঠে ভয়াবহ শান্তি থমথম করিতেছে। চাঁদের আলোয় স্তব্ধ রণভূমির প্রান্তে জানকীরামের জ্ঞান ফিরিল। দূরে গড়ের প্রাকারে সহস্র সহস্র মশালের আলো···আকাশ চিরিয়া শত্রুর অশ্রান্ত জয়োল্লাস···দুই হাতে ভর দিয়া অনেক কষ্টে জানকীরাম উঠিয়া বসিয়া তাঁহারই অনেক আশা ও ভালোবাসার নীড় ঐ গড়ের দিকে চাহিতে চাহিতে অকস্মাৎ দুই চোখ ভরিয়া জল আসিল। ললাটের রক্তধারা ডান হাতে মুছিয়া ফেলিয়া পিছনে তাকাইয়া দেখিলেন, কেবল কয়েকটা শিয়াল নিঃশব্দে শিকার খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—কোনো দিকে কেহ নাই···

সেই সময় ওদিকে অন্দরের বাতায়নপথে তাকাইয়া মালতীমালাও চমকিয়া উঠিলেন, তবে কি একেবারেই—? অবমানিত রাজপুরীর উপরেও গাঢ় নিঃশব্দতা নামিয়া আসিয়াছে। দাসী বিবর্ণমুখে পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মালতীমালা আয়ত কালো চোখে তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন : শেষ ?

খবর আসিল, গুপ্তদ্বার খোলা হইয়াছে, পরিজনেরা সকলে বাহির হইয়া যাইতেছে।

দাসী বলিল, বউমা, উঠুন—

বধূ বলিলেন, নৌকা সাজানো হোক।

কেহ সে কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। নদীর ঘাটে শত্রুর বহর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সে সন্ধানী-দৃষ্টি ভেদ করিয়া জলপথে পলাইবার সাধ্য কি !

মালতীমালা বলিলেন, নদীর ঘাটে নয় রে, দীঘির ময়ূরপঙ্খী সাজাতে হুকুম দিয়েছি। খবর নিয়ে আয়, হল কি না।

সেদিন সন্ধ্যায় রাজোদ্যানে কনকচাঁপা গাছে যে ক-টি ফুল ফুটিয়াছিল তাড়াতাড়ি সেগুলি তুলিয়া আনা হইল, মালতীমালা লোটন-খোঁপা ঘিরিয়া তার কতকগুলি বসাইলেন, বাকিগুলি আঁচল ভরিয়া লইলেন। সাধের মুক্তাফল দুটি কানে পরিলেন, পায়ে আলতা দিলেন, মাথায় উজ্জ্বল সিঁদুর

পরিয়া কত মনোরম রাত্রির ভালোবাসার স্মৃতি-মণ্ডিত ময়ূরপঙ্খীর কামরার মধ্যে গিয়া বসিলেন।

নৌকা ভাসিতে ভাসিতে অনেক দূর গেল। তখন বিজয়ীরা গড়ে ঢুকিয়াছে, নদীর পাড় দিয়া দলে দলে রক্তপতাকা উড়াইয়া জনমানবশূন্য প্রাসাদে ঢুকিতে লাগিল। সমস্ত পুরবাসী গুপ্তপথে পলাইয়াছে।

বিশ-পঁচিশটি মশালের আলো দীঘির জলে পড়িল।

ধর, ধর নৌকা—

মালতীমালা তলির পাটাখানি খুলিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে দীর্ঘ মাস্তুলটিও নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। নৌকা কেহ ধরিতে পারিল না, কেবল কেমন করিয়া কোন ফাঁক দিয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠিল আঁচলের চাঁপাফুল কয়েকটি।

তারপর ক্রমে রাত্রি আরও গভীর হইয়া গড়ের উঁচু চূড়ার আড়ালে চাঁদ ডুবিল। আকাশে কেবল উজ্জ্বল তারা কয়েকটি পরাজিত বিগত-গৌরব ভগ্নজানু জানকীরামের ধূলিশয্যার উপর নির্নিমেষ দৃষ্টি বিসারিত করিয়া ছিল। সেই সময় কে-একজন অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া অতি সন্তর্পণে আসিয়া রাজকুমারকে ধরিয়া তুলিল।

চলুন, প্রভু—

কোথা ?

বটতলায়। ওখানে ঘোড়া রেখেছি, ঘোড়ায় তুলে নিয়ে চলে যাব।

গড়ের আর আর সব ?

বিশ্বস্ত পরিচালক গড়ের ঘটনা সব কহিল। বলিল, কোনো চিহ্ন নেই আর জলের উপর কনকচাঁপা ছাড়া—

কই ? বলিয়া জানকীরাম হাত বাড়াইলেন। বলিলেন, আনতে পারনি ? ঘোড়ায় তুলে দিতে পার আমায় ? দাও না আমায় তুলে দয়া করে—আমি একটা ফুল আনব শুধু।

নিষেধ মানিলেন না। খটখট খটখট করিয়া সেই অন্ধকারে উত্তরমুখো বাতাসের বেগে ঘোড়া ছুটিল। সকালে দেখা গেল, পরিখার মধ্যে যেখানে আজকাল ধান হইয়া থাকে—জানকীরাম পড়িয়া মরিয়া আছেন, ঘোড়ার কোন সন্ধান নাই।

সেই হইতে নাকি প্রতি রাত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া আসিতেছে। রাত দুপুরে সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন মধ্য-আকাশে আসিয়া পৌঁছে, আশপাশের গ্রামগুলিতে নিষুপ্তি ক্রমশ গাঢ়তম হইয়া উঠে, সেই সময়ে রাতের পর রাত ঐ

গভীর নির্জন জঙ্গলের মধ্যে চার-শ বছর আগেকার সেই রাজবধূ পঙ্কদীঘির হিম-শীতল অতল জলশয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ান, ভাঙা ঘাটের সোপান বহিয়া বিড়াল আঁচড়ার গভীর কাঁটাবন দুই হাতে ফাঁক করিয়া সাবধানে লঘু চরণ মেলিয়া তিনি ক্রমশ আগাইতে থাকেন। তবু বনের একটানা ঝিঁঝিঁর আওয়াজের সঙ্গে পায়ের নূপুর ঝুন-ঝুন করিয়া বাজিয়া উঠে। কুঙ্কুমে-মাজা মুখ, গায়ে শ্বেতচন্দন আঁকা, সিঁথায় সেই চার শতাব্দী আগেকার সিঁদুর লাগানো, পায়ে রক্তবরণ আলতা, অঙ্গে চিত্র-বিচিত্র কাঁচলি ও মেঘডম্বুর শাড়ি হইতে জল ঝরিয়া ঝরিয়া বনভূমি সিক্ত করে—বনের প্রান্তে আমের গুঁড়ি ঠেস দিয়া দক্ষিণের মাঠে তিনি তাকাইয়া থাকেন···

আবার বর্ষায় যখন ঐ গড়খাই কানায় কানায় একেবারে ভরিয়া যায়, ঘোড়া তখন জল পার হইয়া বনের সামনে পৌছিতে পারে না, মালতীমালা সেই কয়েকটা মাস আগাইয়া ফাঁকা মাঠের মধ্যে আসিয়া দাঁড়ান। ধূধসর ধানের সুগন্ধি ক্ষেতের পাশে পাশে ভিজা আলের উপর হিম-রাত্রির শিশিরে পায়ের আলতার অস্পষ্ট ছোপ লাগে, চাষারা সকাল বেলা দেখিতে পায়, কিন্তু রোদ উঠিতে না উঠিতে সমস্ত নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া যায়।

চুরুটের অবশিষ্টটুকু ফেলিয়া দিয়া শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল। মাঠের ওদিকে মুচিপাড়ায় পোয়ালগাদা, খোড়ো ঘর, নূতন বাঁধা গোলাগুলি কেমন বেশ শান্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। চৈত্রমাসের সুশুভ্র জ্যোৎস্নায় দূরের আবছা বনের দিকে চাহিতে চাহিতে চারদিককার সুপ্তিরাজ্যের মাঝখানে বিকালের দেখা সেই সাধারণ বন হঠাৎ অপূর্ব রহস্যময় ঠেকিল, ঐখানে এমনি সময়ে বিস্মৃত যুগের বধূ তাকাইয়া আছে, নায়ক তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া সেই দিকে যাইতেছে, কিছুই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। মনে হয়, সন্ধ্যাকালে ওখানে সে যে অচঞ্চল নিষ্ক্রিয় ভাব দেখিয়া আসিয়াছে, এতক্ষণ জঙ্গলের সে রূপ বদলাইয়া গিয়াছে, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি আজও যাহা আবিষ্কার করিতে পারে নাই তাহারই কোনও একটা অপূর্ব ছন্দ-সঙ্গীতময় গুপ্ত রহস্য এতক্ষণ ওখানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে তার সুধারাণীর কথা মনে পড়িল—সে যা-যা বলিত, যেমন করিয়া হাসিত, রাগ করিত, ব্যথা দিত, প্রতিদিনকার তুচ্ছাতিতুচ্ছ সেই সব কথা। ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের চোখে জল আসিয়া পড়িল। জাগরণের মধ্যে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া কোনদিন সে আর আসিবে না।···ক্রমশ তাহার মনে কারণ-যুক্তিহীন একটা অদ্ভুত ধারণা চাপিয়া বসিতে লাগিল। ভাবিল, সে

দিনের সেই সুধারাণী, তার হাসি চাহনি, তার ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রত্যেকটি স্পন্দন পর্যন্ত এই জগত হইতে হারায় নাই—কোনোখানে সজীব হইয়া বর্তমান রহিয়াছে, মানুষে তার খোঁজ পায় না। ঐ সব জনহীন বন-জঙ্গলে এইরূপ গভীর রাত্রে একবার খোঁজ করিয়া দেখিলে হয়। শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, কেবল মালতীমালা সুধারাণী নয়, সৃষ্টির আদিকাল হইতে যত মানুষ অতীত হইয়াছে, যত হাসি-কান্নার ঢেউ বহিয়াছে, যত ফুল ঝরিয়াছে, যত মাধবী-রাত্রি পোহাইয়াছে, সমস্তই যুগের আলো হইতে এমনি কোথাও পলাইয়া রহিয়াছে। তদ্‌গত হইয়া যেই মানুষ পুরাতনের স্মৃতি ভাবিতে বসে অমনি গোপন আবাস হইতে তারা টিপিটিপি বাহির হইয়া মনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। স্বপ্নঘোরে সুধারাণী এমনি কোনখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কত রাতে তার কাছে আসিয়া বসিয়াছে, আদর করিয়াছে, ঘুম ভাঙিলে আবার বাতাসে মিশাইয়া পলাইয়া গিয়াছে।…

বটতলায় বটের ঝুরির সঙ্গে ঘোড়া বাঁধা ছিল, ঐখানে আপাতত আস্তাবলের কাজ চলিতেছে, পৃথক ঘর আর বাঁধা হয় নাই। নিজে নিজেই জিন কষিয়া স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো শঙ্কর ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিল। ঘোড়া ছুটিল। সুপ্ত গ্রামের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনুকম্পা হইতে লাগিল—মূর্খ তোমরা, জঙ্গলের বড় বড় কাঁঠাল গাছগুলাই তোমাদের কেবল নজরে পড়িল এবং গাছ মরিয়া তক্তা কাটাইয়া দু পয়সা পাইবার লোভে এত মকদ্দমা-মামলা করিয়া মরিতেছ। গভীর নিঝুম রাত্রে ছায়ামগ্ন সেই আম-কাঁঠাল-পিত্তিরাজের বন, সমস্ত ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল, পদ্মদীঘির এপার-ওপার যাঁদের রূপের আলোয় আলো হইয়া যায়, এতকাল পাশাপাশি বাস করিলে একটা দিন তাঁদের খবর লইতে পারিলে না!

গড়খাই পার হইয়া বনের সামনে আসিয়া ঘোড়া দাঁড়াইল। একটা গাছের ডালে লাগাম বাঁধিয়া শঙ্কর আমিনদের সেই জঙ্গল-কাটা সঙ্কীর্ণ পথের উপর আসিল। প্রবেশমুখের দুইধারে দুইটি অতিবৃহৎ শিরীষ গাছ, বিকালে ভজহরির সঙ্গে কথায় কথায় এসব নজর পড়ে নাই, এখন বোধ হইল মায়াপুরীর সিংহদ্বার উহারা। সেইখানে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ সে সেই ছায়াময় নৈশ বনভূমি দেখিতে লাগিল। আর তাহার অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না, মৃত্যু-পারের গুপ্ত রহস্য আজি প্রভাত হইবার পূর্বে ঐখান হইতে নিশ্চয় আবিষ্কার করিতে পারিবে। আমাদের জন্মের বহুকাল আগে এই সুন্দরী পৃথিবীকে যারা ভোগ করিত, বর্তমান কালের দুঃসহ আলো হইতে তারা সব তাদের অদ্ভুত রীতি-

নীতি বীর্য ঐশ্বর্য প্রেম লইয়া সৌরালোকবিহীন ঐ বন-রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। আজ জনহীন মধ্যরাত্রে যদি এই সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া নাম ধরিয়া ধরিয়া ডাক দেওয়া যায়, শতাব্দীপারের বিচিত্র মানুষেরা অন্ধকারের যবনিকা তুলিয়া নিশ্চয় চাহিয়া দেখিবে।

কয়েক পা আগাইতে অসাবধানে পায়ের নিচে শুকনা ডালপালা মড়মড় করিয়া ভাঙিয়া যেন মর্মস্থানে বড় ব্যথা পাইয়া বনভূমি আর্তনাদ করিয়া উঠিল। স্থির গম্ভীর অন্ধকারে নির্নিরীক্ষ্য সান্ত্রিগণ তাহাকে বাক্যহীন আদেশ করিল: জুতা খুলিয়া এসো।

শুকনা পাতা খসখস করিতেছে, চারিপাশে কত লেকের আনাগোনা··· জ্যোৎস্নার আলো হইতে আঁধারে আসিয়া শঙ্করের চোখ ধাঁধিয়া গিয়াছে বলিয়াই সে যেন কিছু দেখিতে পাইতেছে না। মনের ঔৎসুক্যে উদ্বেগাকুল আনন্দে কম্পিত হস্তে পকেট হইতে তাড়াতাড়ি সে টর্চ বাহির করিয়া

জ্বালিয়া চারিদিক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে—শূন্য বন। বিশ্বাস হইল না, বারংবার দেখিতে লাগিল।···আর-একটা দিনের ব্যাপার শঙ্করের মনে পড়ে। দুপুরবেলা, বিয়ের কয়েকটা দিন পরেই, সুধারানী ও আর কে-কে তার নূতন দামি তাসজোড়া লইয়া চুরি করিয়া খেলিতেছিল। তখন তার আর-এক গ্রামে নিমন্ত্রণে যাইবার কথা, সন্ধ্যার আগে ফিরিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু কি গতিকে যাওয়া হইল না। বাহির হইতে খেলুড়েদের খুব হৈ-চৈ শোনা যাইতেছিল, কিন্তু ঘরে ঢুকিতে না ঢুকিতে সকলে কোন দিক দিয়া কি করিয়া যে পলাইয়া গেল—শঙ্কর দেখিয়াছিল, কেবল তাসগুলি বিছানার উপর ছড়ানো···

টর্চের আলোয় কাঁটাবনের ফাঁকে ফাঁকে সাবধানে দীঘির সোপানের কাছে গিয়া সে বসিল। জলে জ্যোৎস্না চিকচিক করিতেছে। আলো নিভাইয়া চুপটি করিয়া অনেকক্ষণ সে বসিয়া রহিল।

ক্রমে চাঁদ পশ্চিমে হেলিয়া পড়িল। কোনো দিকে কোনো শব্দ নাই, তবু অনুভব হয়—তার চারিপাশের বনবাসীরা ক্রমশ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে। প্রতিদিন এই সময়ে তারা একটি অতি-দরকারি নিত্যকর্ম করিয়া থাকে, শঙ্কর যতক্ষণ এখানে থাকিবে ততক্ষণ তা হইবে না—কিন্তু তাড়া বড্ড বেশি। নিঃশব্দে ইহারা তার চলিয়া যাওয়ার প্রতীক্ষা করিতেছে।

হঠাৎ কোনদিক হইতে হু-হু করিয়া হাওয়া বহিল, এক মুহূর্তে মর্মরিত বনভূমি সচকিত হইয়া উঠিল। উৎসবক্ষেত্রে নিমন্ত্রিতেরা এইবার যেন আসিয়া পড়িয়াছে, অথচ এদিকে কোনো কিছুর যোগাড় নাই। চারিদিকে মহা

শোরগোল পড়িয়া গেল। অন্ধকার রাত্রির পদধ্বনির মতো সহস্রে সহস্রে ছুটাছুটি করিতেছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে এখানে-ওখানে কম্পমান ক্ষীণ জ্যোৎস্না, সে যেন মহামহিমার্ণব যারা সব আসিয়াছে, তাহাদের সঙ্গের সিপাহিসৈন্যের বল্লমের সুতীক্ষ্ণ ফলা। নিঃশব্দচারীরা অঙ্গুলি-সঙ্কেতে শঙ্করকে দেখাইয়া দেখাইয়া পরস্পর মুখ চাঁওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল: এ কে? এ কোথাকার কে—চিনি না তো!

উৎকর্ণ হইয়া সমস্ত শ্রবণশক্তি দিয়া শঙ্কর আরও যেন শুনিতে লাগিল, কিছুদূরে সর্বশেষে সোপানের নিচে কে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে! কণ্ঠ অনতিস্ফুট, কিন্তু চাপা কান্নার মধ্য দিয়া গলিয়া গলিয়া তার সমস্ত ব্যথা বনভূমির বাতাসের সঙ্গে চতুর্দিকে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অন্ধকারলিপ্ত প্রেতের মতো গাছেরা মুখে আঙুল দিয়া তাহাকে বারংবার থামিতে ইশারা করিতেছে—সর্বনাশ করিল, সব জানাজানি হইয়া গেল!...

কিন্তু কান্না থামিল না। নিশ্বাস রোধ করিয়া ঐ অতল জলতলে চার-শ বছরের জরাজীর্ণ ময়ূরপঙ্খীর কামরার মধ্যে যে মাধুরীমতী রাজবধূ সারাদিনমান অপেক্ষা করে, গভীর রাতে এইবার সে ঘোমটা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া নিত্যকার মতো উৎসবে যোগ দিতে চায়। যেখানে শঙ্কর পা ঝুলাইয়া বসিয়া ছিল, তাহার কিছু নিচে জলে-ডোবা সিঁড়ির ধাপে মাথা কুটিয়া কুটিয়া বোবার মতো সে বড় কান্না কাঁদিতে লাগিল।

তারপর কখন চাঁদ ডুবিয়া দীঘিজল আঁধার হইল, বাতাসও একেবারে বন্ধ হইয়া গেল, গাছের পাতাটিরও কম্পন নাই—কান্না তখনও চলিতেছে। অতিষ্ঠ হইয়া কাহারা দ্রুতহাতে চারিদিকে অন্ধকারের মধ্যে ঘন কালো পর্দা খাটাইয়া দিতে লাগিল—শঙ্কর বসিয়া থাকে, থাকুক—তাহাকে কিছুই উহারা দেখিতে দিবে না।

আবার টর্চ টিপিয়া চারিদিকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিল। আলো জ্বলিতে না জ্বলিতে গাছের আড়ালে কি কোথায় সব যেন পলাইয়া গিয়াছে, কোনো-দিকে কিছু নাই।

তখন শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে কহিতে লাগিল, আমি চলিয়া যাইতেছি, তুমি আর কাঁদিও না হে লজ্জারুণা রাজবধূ, মৃণালের মতো দেহখানি তুমি দীঘির তল হইতে তুলিয়া ধরো, আমি তাহা দেখিব না। অন্ধকার রাত্রি, অনাবিষ্কৃত দেশ, অজানিত গিরিগুহা, গভীর অরণ্যভূমি এ সব তোমাদের। অনধিকারের রাজ্যে বসিয়া থাকিয়া তোমাদের ব্যাঘাত ঘটাইয়া কাঁদাইয়া গেলাম, ক্ষমা করিও—

যাইতে যাইতে আবার ভাবিল, কেবল এই সময়টুকুর জন্য কাদাইয়া বিদায় লইয়া গেলেও না হয় হইত। তাহা তো নয়। সে যে ইহাদের একেবারে উদ্বাস্তু করিতে এখানে আসিয়াছে। জরিপ শেষ হইয়া একজনের দখল দিয়া গেলে বন কাটিয়া লোকে এখানে টাকা ফলাইবে। এত নগর-গ্রাম মাঠ-ঘাটেও মানুষের জায়গায় কুলায় না—তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে, পৃথিবীতে বন-জঙ্গল এক কাঠা পড়িয়া থাকিতে দিবে না। তাই শঙ্করকে সেনাপতি করিয়া আমিনের দলবল যন্ত্রপাতি নকশা কাগজপত্র দিয়া ইহাদের এই শত শত বৎসরের শান্ত নিরিবিলি বাসভূমি আক্রমণ করিতে পাঠাইয়া দিয়াছে। শাণিত খড়্গের মতো ভজহরির সেই সাদা সাদা দাঁত মেলিয়া হাসি—উৎপাত কি আমরা কম করছি হুজুর? সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, কম্পাস নিয়ে চেন ঘাড়ে করে করে……

কিন্তু মাথার উপরে প্রাচীন বনস্পতিরা ভ্রূকুটি করিয়া যেন কহিতে লাগিল, তাই পারিবে নাকি কোনো দিন? আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাল ঠুকিয়া জঙ্গল কাটিতে কাটিতে সামনে তো আগাইতেছ আদিকাল হইতে, পিছনে পিছনে আমরাও তেমনি তোমাদের তাড়াইয়া চলিয়াছি। বন-কাটা রাজ্যে নূতন ঘর তোমরা বাঁধিতে থাক, পুরানো ঘরবাড়ি আমরা ততক্ষণ দখল করিয়া বসিব।…

হা-হা হা-হা-হা তাহাদেরই হাসির মতো আকাশে পাখা ঝাপটাইতে ঝাপটাইতে কালো এক ঝাঁক বাদুড় বনের উপর দিয়া মাঠের উপর দিয়া উড়িতে উড়িতে গ্রামের দিকে চলিয়া গেল।…

বনের বাহির হইয়া শঙ্কর ঘোড়ায় চাপিল। ঘোড়া আস্তে আস্তে হাঁটাইয়া ফিরিয়া চলিল। পিছনের বনে ডালে ডালে ঝাঁক-বাঁধা জোনাকি, আমের গুটি ঝরিতেছে তার টুপটাপ শব্দ, অজানা ফুলের গন্ধ…বারবার পিছন দিকে সে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতে লাগিল। অনেক দূরে কোথায় কুকুর ডাকিতেছে, কাহাদের বাড়িতে আকাশ-প্রদীপ আকাশের তারার সহিত পাল্লা দিয়া দপদপ করিতেছে…এইবার গিয়া সেই নিরালা তাঁবুর মধ্যে ক্যাম্প-খাটটির উপর পড়িয়া পড়িয়া ঘুম দিতে হইবে। যদি এই সময় মাঠের এই অন্ধকারের মধ্যে সুধারানী আসিয়া দাঁড়ায়…কপালে জ্বলজ্বলে সিঁদুর, একপিঠ চুল এলাইয়া টিপিটিপি দুষ্টামির হাসি হাসিতে হাসিতে যদি সুধারাণী ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া দুই চোখ ভরিয়া তার দিকে তাকাইয়া থাকে…মাথার উপর তারাভরা আকাশ, কোনো দিকে কেউ নাই—ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া শঙ্কর তাহার হাত ধরিয়া ফেলিবে, হাত ধরিয়া কঠোর স্বরে শুনাইয়া

দিবে—কি শুনাইবে সে ? শুধু তাহাকে এই কথাটা জিজ্ঞাসা করিবে : কি করেছি আমি তোমার ?

এই সময় হঠাৎ লাফ দিয়া ঘোড়া একটা আল পার হইল। শঙ্করের হুঁশ হইল, এতক্ষণের মধ্যে এখনও গড়খাই পার হয় নাই—জঙ্গল বেড়িয়া ঘোড়া ক্রমাগত ধানক্ষেতের উপর দিয়াই চলিয়াছে। জুতা-পায়ে জোরে ঠোক্কর দিল, আচমকা আঘাত পাইয়া ঘোড়া ছুটিল। গড়খাইয়ের যেন শেষ নাই, যত চলে ততই ধানবন, দিক ভুল হইয়া গিয়াছে, মাঠে না উঠিয়া ধানবন ঘুরিয়া মরিতেছে। শঙ্করের মনে হইতে লাগিল, যেমন এখানে সে মজা দেখিতে আসিয়াছিল, ঘোড়াসুদ্ধ তাহাকে ঐ বনের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সমস্ত রাত ছুটিলেও কেবল বন প্রদক্ষিণ করিতে হইবে—নিষ্কৃতি নাই—গড়খাই পার হইয়া মাঠে পৌছানো রাত পোহাইবার আগে ঘটিবে না। জেদ চাপিয়া গেল, ঘোড়া জোরে—আরও জোরে—বিদ্যুতের বেগে ছুটাইল, ভাবিল এমনি করিয়া সেই অদৃশ্য ভয়ানক বাঁধন ছিঁড়িবে। আর একটা উঁচু আল, অন্ধকারে ঠাহর হইল না, ছুটিতে ছুটিতে হুমড়ি খাইয়া ঘোড়া সমেত তাহার উপর পড়িল। শঙ্করের মনে হইল, ঘোড়ার ঝুঁটি ধরিয়া তাহাকে আলের উপর কে জোরে আছাড় মারিল। তীব্র আর্তনাদ করিতে করিতে সে নিচে গড়াইয়া পড়িল। ঘোড়াও ভয় পাইয়া গেল, শঙ্করকে মাড়াইয়া ফেলিয়া ঝড়ের মতো মাঠে গিয়া উঠিল। শুকনা মাঠের উপর দ্রুতবেগে খুর বাজাইতে লাগিল—খটখট খটখট। রাত্রির শেষ প্রহর, আকাশে শুকতারা জ্বলিতেছে। চার-শ বছর আগে যেখানে একদা জানকীরাম পড়িয়া মরিয়াছিলেন, সেইখানে অর্ধমূর্ছিত শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, সেই জানকীরাম কোন দিক হইতে আসিয়া তাহাকে ফেলিয়া ঘোড়া কাড়িয়া লইয়া উত্তরেমাঠের ওপারে তেঘরা-বকচরের দিকে চলিয়া যাইতেছেন। ঘোড়ার খুরের শব্দ আঁধার মাঠে ক্রমশ মিলাইয়া যাইতে লাগিল।

অশ্বত্থামার দিদি

গুরুপুত্র অশ্বত্থামার গরু চুরি মকদ্দমায় এক বৎসরের জেল হইয়া গেল।

অধিকারী একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিল। কারণ, তিলসোনার মজুমদাররা লোক ভালো নয়। বাড়ি আসিয়া পাঁচ টাকা বায়না দিয়া গিয়াছে, এবং বারংবার বলিয়া গিয়াছে—কালীপুজো মঙ্গলবারে, তার পরের দিন বুধবার তেরোই তারিখে গান। বেলাবেলি হাজির হোয়ো হে, সাতাশ

গ্রাম নেমন্তন্ন। অতএব গাফিলি হইলে তাহারা সহজে ছাড়িবে না নিশ্চয়। সেই তেরো-ই ও আসিয়া প'ড়ল।

অধিকারী চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, মা কালীর খাঁড়ার লক্ষ্য এবার তাহারই মাথাটা।

কিন্তু মাথায় হাত দিয়া তো খাঁড়ার কোপ ঠেকানো চলে না। কাজেই আর একবার স্বষ্টিধরের হাতে পায়ে ধরিয়া দেখা ছাড়া উপায় কি? তিলসোনার আসরে অশ্বত্থামা সাজিয়া যদি সে এবারকার মতো ইজ্জত বাঁচাইয়া দেয়!

স্বষ্টিধর বিদ্বান ব্যক্তি, ইংরাজি ফাস্টবুকও পড়িয়াছে—কিন্তু তাহার মোটে বিবেচনা নাই। গত বৎসর যাত্রাদলের স্থচনার সময় স্বষ্টিধরকে অনেক বলা-কওয়া হইয়াছিল, এমন কি দশ টাকা করিয়া মাহিনা দিবার কথাও উঠিয়াছিল। কিছুতে সে দলে আসিল না, সাফ জবাব দিল: দশটাকায় যাঁড় কিনে কাজ চালাও গে—

কিন্তু স্বষ্টিধরের গোঁফ উঠে নাই, নধর চেহারা, রানী সখী বা নিতান্ত পক্ষে রাজপুত্র বেশেই মানায়, তাহাকে তো সেনাপতি সাজিতে ডাকা হয় নাই। অতএব যাঁড় দিয়া তাহার কাজ চলে কি করিয়া?

যাহা হউক সে-সব আবশ্যক হয় নাই, বলাই তেলিকে পাওয়া গিয়াছিল এবং বড় স্থবিধামতই পাওয়া গিয়াছিল। খুব ফুর্তিবাজ লোক, টাকাকড়ির খাঁই মোটেই নাই। খুলনার দিকে কোথায় তাহার মামার বাড়ি, মামারা বড়লোক। যে মরশুমে দলের গাওনা থাকিত না, মামার বাড়ি ডুব মারিত। ফিরিয়া আসিয়া দিন কতক হরদম খরচ করিত। অশ্বত্থামার পার্টও বলিত খাসা।

কিন্তু তিলসোনার বায়না লইবার কয়েকদিন পরে অকস্মাৎ একদিন থানার দারোগা আসিয়া বলাইকে ধরিয়া লইয়া গেল, উহারা কয়জনে মিলিয়া নাকি কোন গ্রাম হইতে গরু সরাইয়া ঝিকরগাছির হাটে বেচিয়া আসিয়াছে। তারপর জেল।

অধিকারী মনে মনে সাব্যস্ত করিয়া গিয়াছিল—একটা রাতের গাওনা মোটে—টাকা তিনেকের মধ্যেই স্বষ্টিধর রাজি হইয়া যাইবে। তাহারও কিঞ্চিৎ হাতে রাখিয়া প্রথমে সে প্রস্তাব করিল: দু টাকা—

কিন্তু স্বষ্টিধর গরজ বুঝিয়া হাঁকল একেবারে স্বষ্টিছাড়া দর: পাচ টাকার কম হবে না।

লোকটার সত্যই বিবেচনা নাই। পঁচিশ টাকা বায়না, জুড়ি বেহালাদার

প্রভৃতিকে ধরিয়া মানুষও জন পঁচিশেকের কম হইবে না। তাহার মধ্যে একা অশ্বত্থামাকে যদি পাঁচ টাকা বখরা দিতে হয়, তাহা হইলে তস্য পিতা দ্রোণাচার্য পিতামহ ভীষ্ম মধ্যম-পাণ্ডব ভীম প্রভৃতি মহা মহা বীরগণের ভাগে কি পড়িবে ?

তিন, সাড়ে-তিন, পৌনে-চার করিয়া অবশেষে পুরাপুরি চারই স্বীকার করিতে হইল। না করিয়া উপায় নাই। এই কয়দিনের মধ্যে পার্ট মুখস্থ করিয়া একরকম চালাইয়া দিতে পারে এ অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র ঐ স্মৃতিধর।

গীতাভিনয় শুরু হইয়া গিয়াছে।

দ্রোণাচার্যের প্রায় আজানুলম্বিত দাড়ি—রাজবাড়িতে মাস্টারি করিবার মানানসই দাড়ি হইয়াছে বটে। আসরের দক্ষিণ কোণে অশ্বত্থামা চিঁ-চিঁ করিয়া বলিতেছে, দুধ, দুধ খাব বাবা—আর দ্রোণাচার্য দুই হাতে সেই দাড়ি-সমুদ্র অনবরত আলোড়িত করিয়া একবার ঝাড়লণ্ঠনের মধ্যে, একবার বেহালাদারদের পশ্চাদ্দেশে, একবার বা ছেঁড়া সামিয়ানার ফাঁকে আকাশমুখো তাকাইয়া দুধ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু এতসব. অত্যুৎকৃষ্ট স্থান হইতেও দুধ মিলিল না। শেষে একজন ছোকরা হারমোনিয়ামের বাক্সের এক কোণ হইতে একটা ছোট অ্যালুমিনিয়মের তেলের বাটি বাহির করিয়া আগাইয়া দিল। দ্রোণাচার্য, কোন প্রকার উপকরণ ব্যতীত বোধকরি কেবলমাত্র তপঃপ্রভাবেই, সেই বাটিতে পিটালি গুলিয়া দুধ বলিয়া ফাঁকি দিয়া অশ্বত্থামাকে খাওয়াইয়া দিলেন। আর সেই নিরাকার পিটালিগোলার শক্তিই বা কি অসামান্য! মুহূর্তমধ্যে অশ্বত্থামার মিহি গলা দস্তুরমতো সবল হইয়া উঠিল এবং আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সহিত বিশ হাত আসরের আগাগোড়া প্রদক্ষিণ করিয়া দুধ-খাওয়ার আনন্দে একটো করিয়া সে লাফাইতে লাগিল।

চারিদিকে বাহবা বাহবা পড়িয়া গেল।

চিকের আড়ালে একটি বধূ কেবলি চোখ মুছিতেছিল—মজুমদার-এস্টেটের সাতআনা শরিক স্বর্গীয় যদুনাথ মজুমদার মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রবধূ উমাশশী। তার যেন কেমন মনে হইল, ঐ অশ্বত্থামা তাহার ভাই, সে তাহার দিদি।

উমার কাঁচা বয়স, তবু এটুকু বুঝিবার বুদ্ধি আছে যে ইহার কিছু সত্য নহে, অভিনয় মাত্র। কিন্তু সত্য হউক মিথ্যা হউক অমন সুন্দর ছেলেটি আসরের পাশে পড়িয়া একটুখানি দুধ খাইবার জন্য অত করিয়া কাঁদিতে লাগিল তো! আর যখন দুধ বলিয়া খানিক পিটালির গোলা খাওয়াইয়া

দিল, অশ্বত্থামা রাগ করিয়া ঐ বাটিসুদ্ধ আসর ডিঙাইয়া কলাবনের মধ্যে ফেলিয়া দিল না কেন? তাহা না করিয়া অবোধ বালক আনন্দে নাচিতে লাগিল।...

যাত্রা দেখিতেছে আর কত কি ভাবিতেছে এমনি সময়ে উমার মনে পড়িয়া গেল, তাহার খোকামণি এতক্ষণ হয়তো জাগিয়াছে। সন্ধ্যার সময় তাহাকে খাটের উপর ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া মোক্ষদাকে সেখানে বসাইয়া তবে গান শুনিতে আসিয়া বসিয়াছে। যে আদুরে ঝি মোক্ষদা—এতক্ষণ কি করিতেছে তার ঠিক কি! হয় ঘুম মারিতেছে, নয় তো এই ভিড়ের মধ্যে কোনোখানে চুরি করিয়া বসিয়া সে-ও গান শুনিতেছে। মোটে এক বছরের একরত্তি ছেলে, দুধ খাইবার সময় হইয়াছে, বাড়িতে কেহ নাই, জাগিয়া থাকে তো কাঁদিয়া কাঁদিয়া খুন হইতেছে। ব্যস্ত হইয়া উমাশশী উঠিয়া পড়িল।

ছয় শরিকের এজমালি কালীপুজা। সম্পত্তির অংশক্রমে যাত্রাদলের লোকজন খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যদুনাথের তরফে খাইবে বারোজন। অনেক রাত্রে গান ভাঙিয়া গেলে পুরুষমানুষদের খাওয়া শেষ হইয়া গেল। তারপর উমা খাইতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল: যাত্রার লোকেরা খেয়ে গেছে?

বামুন-ঠাকরুন উত্তর করিলেন: না বউমা, এমন কি নবাবপুত্তুররা এয়েছেন যে সন্ধ্যা না লাগতে বাবুদের আগেভাগে খাইয়ে দেব। আমার সব হয়ে গেছে, আর দেরি নেই। মোক্ষদা এবার ডাকতে যাক। মোক্ষদা, ও মোক্ষদা—

উমার খাওয়া শেষ হইয়া আসিয়াছিল। অবশিষ্ট ভাতগুলির কতক খাইয়া তাড়াতাড়ি আঁচাইতে গেল। মোক্ষদা তখন উপর হইতে নিচে নামিতেছে।

উমা কহিল, কেমন গান শুনলি মোক্ষদা?

মোক্ষদা বিস্ময়ে খানিকক্ষণ কথাই বলিতে পারিল না। শেষে কহিল, অ পোড়াকপাল, আমি গেনু কখন? আমি বলে মাজার ব্যথায় ছটফটিয়ে মরি।

উমা হাসিয়া ফেলিল: তুই যে আঁধারে আঁধারে কচুবনের পাশ দিয়ে— আমি নিজের চোখে দেখলাম। তা বেশ তো, কি হয়েছে তাতে, তুই খোকাকে একলা ফেলে চলে গেছিস, আমি কি কাউকে তা বলতে যাচ্ছি?

অতঃপর মোক্ষদার আর মনে না পড়িবার কথা নয়—এখনও স্মরণ না হইলে আরও যে কি বাহির হইয়া পড়িবে, তার ঠিক কি?

বলিল, আস্তে কথা কও বউদি, শুনতে পেলে গিন্নিমা আস্ত রাখবে না।

বামুন-ঠাকরুনকে বলে দিইছিনু, যখন যুদ্ধু হবে আমায় ডেকো। তিনি এসে বললেন, মোক্ষদা, দেখসে এসে, ভীম সাঁই-সাঁই করে কী গদাই ঘুরুচ্ছে! গিইছি আর এয়েছি—দাঁড়াই নি মোটে।

উমা বলিল, আর অশ্বত্থামা কেমন একটো করলে বল দিকিন। দেখতেও যেন রাজপুত্তুর, না?

মোক্ষদা ঘাড় নাড়িয়া সংক্ষেপে বলিল, হুঁ। তাহার মাথার মধ্যে তখনও সাঁই-সাঁই করিয়া ভীমের গদা ঘুরিতেছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিল; কিন্তু দুর্যোধন কি পালোয়ান রে বাপু! আমি গুণে দেখনু, একটা নয়, দুটো নয়—ভীম ছয় ছয়টা গদার বাড়ি মারল, তবু লাফাতে লাফাতে চলে গেল। সোজা কথা! ভীমের ঐ গদা বিশ-পঁচিশ মন হবে, না বউদি?

কিন্তু গদাতত্ত্বের আলোচনা আর অধিক চলিল না, বামুন-ঠাকরুন ডাকিতেছিলেন: ও মোক্ষদা, ডাকতে গেলি নে? যা দিদি, আমি আর কত রাত অবধি ভাত চৌকি দেব?

উমাও বলিল, যাচ্ছিস ডাকতে? যা, কেন মিছিমিছি রাত করিস? আর ঐ যে অশ্বত্থামা—চিনতে পারবি নে? যে দুধ-দুধ করে কাঁদছিল গো, তাকেও ডেকে আনবি। বারোজন খাবে আমাদের বাড়িতে—ঐ ছেলেটাও খাবে। যদি না আসতে চায়, ছাড়বি নে—বুঝলি?

মোক্ষদা ডাকিতে চলিয়া গেল।

এবারে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকিয়া উমা দেখিল আয়োজন প্রচুর। ভীমরুলের ডিমের মতো মোটা মোটা আউশচালের ভাত, পুঁইডাঁটার চচ্চড়ি এবং খেসারির ডাল রান্না হইয়া গিয়াছে, এখন নিবন্ত উনানে পাঁচ-সাতটি বেগুন পোড়াইয়া দিলেই হইয়া যায়। কহিল, ও বামুন-মা, করেছ কি? এই দিয়ে লোকগুলো কি করে খাবে?

বামুন-ঠাকরুন আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, বল কি বউমা, বেগুন-পোড়া নিয়ে তিন-তিনটে তরকারী হল—আরো খাবে কি দিয়ে? বাড়িতে ওরা কি সোনা-স্বর্ণ খেয়ে থাকে? তুমি ছেলেমানুষ, জানো না তো!

কিন্তু ছেলেমানুষ হইলেও উমা জানে। এই সব লোক—যাহারা যাত্রার দলে রাজা সাজিয়া বেড়ায়, আবার বাড়িতে ভাঙা মণ্ডপে সাবেকি চালে একরকম নিশ্চিন্তভাবে হুঁকা টানিয়া থাকে এবং ধান-ভরা সবুজ বিলের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আগামী পৌষে নূতন গোলা বাঁধিবার স্বপ্ন দেখে, তাহারা সদাসর্বদা যে-অপরূপ সোনা-স্বর্ণ খাইয়া থাকে তাহা উমা ভালো করিয়াই

জানে। সেই যে রূপকথার কোন কাঠকুড়ানি ছেলে-মেয়ে বনের মধ্য দিয়া যাইতেছিল, রাজবাড়ির শ্বেতহস্তী শুঁড়ে করিয়া আনিয়া সিংহাসনে বসাইয়া দিল—উমারও হইল তাই।

উমার বাপের বাড়ি উজ্জলপুরে, এখান হইতে পুরা তিনটি ভাঁটির পথ, একেবারে মধুমতীর উপর। পাঁচ বৎসর আগে সেখানে প্রতি রাত্রে দিদি ও ভাইটি মায়ের কোলে জড়াজড়ি করিয়া থাকিত। বোকা ভাইটি—তার নাম হারান। এমনি অবোধ যে আর সকলের মতো তাহাদেরও বাবা বাঁচিয়া ছিল—এ রকম অসম্ভব কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিত না, ইহা লইয়া উমার সঙ্গে ঘোরতর তর্ক করিত।

একবার হইয়াছে কি, চৌধুরিবাড়ি অমিয়ার বিবাহ উপলক্ষে কলিকাতা হইতে নানান রকম জিনিস আসিয়াছে। সেদিন হারানের আর টিকি দেখিবার জো নাই, বেলা দুপুর অবধি আগামী উৎসবের আয়োজন দেখিতেছে। অমিয়ার কাকা ট্রাঙ্ক খুলিয়া জিনিসপত্র বাহির করিয়া অমিয়ার মাকে বুঝাইয়া দিতেছিলেন, উবু হইয়া বসিয়া হারান একমনে তাহা দেখিতেছিল।

বাড়ি ফিরিয়া হারান উমাকে চুপি চুপি কহিল, আজ এক তা পেয়েছি, কাউকে বলিস নে দিদি। ভুলে ওরা রোয়াকের পরে ফেলে চলে গেল, কেউ নেই দেখে তুলে নিলাম। কি বল্ দিকি? কলকাতার মেঠাই—না? বলিয়া চারিদিক তাকাইয়া কোঁচার খুঁট হইতে অতি সন্তর্পণে সেই দুষ্প্রাপ্য কলিকাতার মিঠাই বাহির করিল।

দেখিয়া খানিকক্ষণ তো হাসির চোটে উমা কথাই কহিতে পারিল না—একটা টকটকে রাঙা মোমবাতি। বলিল,ও হারান, ওরে বোকা, তুই যেন কি—বাতি চিনিস নে? বাতি, বাতি—জ্বেলে দিলে ঠিক পিদ্দিমের মতো আলো হয়।

দিদির অত হাসি দেখিয়া হারান অপ্রস্তুত হইয়া প্রথমটা কিছু বলিতে পারিল না, কিন্তু একটু সামলাইয়া লইয়া শেষে পুরাদস্তুর তর্ক করিতে লাগিল: উহা কক্ষনো বাতি নয়—সে বুঝি বাতি চেনে না? চৌধুরিদের মানিক নন্দ প্রভৃতিকে স্বচক্ষে ঐ বস্তু খাইতে দেখিয়াছে যে!...

উজ্জলপুর গ্রামখানি পরগনে সৈদাবাদের মধ্যে, অতএব তিলসোনা মজুমদার-এস্টেটের অন্তর্গত।

যদুনাথ মজুমদার মহাশয় তখন বাঁচিয়া। একবার কিস্তির মুখে তিনি স্বয়ং আদায়পত্র তদারক করিতে গিয়াছিলেন। কাছারিবাড়ির সামনে দিয়া কাঁচা-রাস্তা সোজা দক্ষিণমুখো একেবারে খেয়াঘাট অবধি চলিয়া গিয়াছে।

সকালবেলা মজুমদার মহাশয়ের অনেক কাজ—রোকড় সেহা খতিয়ান প্রভৃতি অত্যাবশ্যক কাগজপত্র পরীক্ষা করিতে হইত। তাহারই মধ্যে একবার রাস্তার দিকে তাকাইয়া চশমার ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইতেন, পাততাড়ি বগলে একটি ছেলে একেবারে দিদির আঁচলের মধ্যে গা ঢাকিয়া পাঠশালায় যাইতেছে। দিদি আর ভাই হরদম বকিতে বকিতে যাইত, কী যে বকিত উহারাই জানে।

মজুমদার মহাশয় রোজই দেখিতেন। একদিন তিনি উমাকে ধরিয়া ফেলিলেন। সন্ধ্যাবেলা ভাইকে লইয়া ফিরিতেছিল, যদুনাথ রাস্তার পাশে পায়চারি করিতেছিলেন, ডাকিলেন, শোনো মা লক্ষ্মী—

উমা সসঙ্কোচে কাছে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যদুনাথ কি যে শোনাইবেন ঠিক করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন, আমার তিলসোনার বাড়িতে যাবে? আমার ঘরদোর আলো হয়ে যাবে—লক্ষ্মী-মা, যাবে তো? বলিয়া পরম স্নেহে উমার মুখের উপর যে ক-গাছি চুল উড়িতেছিল তাহা সরাইয়া দিলেন।

উমা কিছু কিছু বুঝিল, কিন্তু হারানের কাছে যদুনাথের কথাগুলি বড় দুর্বোধ্য ঠেকিল। পথে যাইতে যাইতে পরম উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল—দিদি, ওদের বাড়ি তোকে যেতে বলে কেন? আবার যদি জিজ্ঞাসা করে তুই বলে দিস—যাব না। যদি না যাস ওদের লেঠেল-পাইক দিয়ে ধরে নিয়ে যাবে না তো?

পরদিন যদুনাথ স্বয়ং উমাদের বাড়ি আসিয়া সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, উমার সহিত তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রমানাথের বিবাহ দিতে চান। দেনাপাওনার কোনো কথা নাই, স্বয়ং মা-লক্ষ্মী ঘরে গিয়া উঠিবেন, টাকা দিয়া আর কি হইবে?

বিবাহ হইয়া গেল।

যে দিন উমারা রওনা হইয়া যাইবে তার আগের দিন সন্ধ্যায় হারান বলিল, দিদি, রাজরানী হলি, তা মাথায় মুকুট কই?

উমা বলিল, যাঃ—রাজরানী না হাতি! কে বলেছে রে?

কিন্তু হারান বুঝি কিছু বোঝে না! বলিল, রানী নয় তো কি? মা বললে, তবে যে সুশীল মানিক সবাই বলছিল—আর তুই লুকুচ্ছিস? ও দিদি, তোদের রাজবাড়িতে যেতে দিবি আমায়? সেপাইরা মারবে না?

উমা চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেউ কোথাও নাই তো? শ্বশুরবাড়ির কথা বলিতে বড় লজ্জা করে, কিন্তু অবুঝ ভাইটিকে আবার লজ্জা! বলিল,

ইঃ মারলেই হল! আমার ভাইটিকে মারে কে? তুই আর একটু বড় হলি নে কেন হারান, তা হলে কালই সঙ্গে নিয়ে যেতাম। খানিক বড় হয়ে যাস—গেলে তোকে এত বড় রুইমাছের মাথা দিয়ে ভাত বেড়ে দেব, এই এত বড়। যাবি তো?

হারান ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল: হ্যাঁ, আর মেঠাই—কলকেতায় মেঠাই দিস? দিবি নে দিদি?

বামুন-ঠাকরুনের চাকরি অল্পদিনের, তিনি উমার বাপের বাড়ির কোনো খবর রাখেন না। বলিতেছেন, তুমি মা ছেলেমানুষ—ভাবো পিরথিমের সব্বাই বুঝি তোমাদের মতো খায় দায়। তিন-তিনটে তরকারি রেঁধেছি, তবু বলছ যাত্রার লোকেরা কি দিয়ে খাবে? আর বড়বাবুর ঘরে দেখে এসগে, সেখানকার ব্যবস্থা শুধু ফ্যানসাভাত আর নুন—তেঁতুলটুকুও নয়—

উমা বলিল, তা হোক বামুন-মা, বাড়িতে কত মিঠাই-মোণ্ডা ভিয়েন হল—তার কি কিছু নেই? থাকে তো, ওদের একটা একটা যাহোক-কিছু দাও। আচ্ছা, তুমি ভাত বাড়ো, আমি দেখছি—

উপরে আসিয়া ভাঁড়ার খুঁজিয়া দেখিল, কিছুই নাই। অনেক বড় বড় ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, তাঁহারাই শেষ করিয়া গিয়াছেন। সে কথা বামুন-ঠাকরুনকে গিয়া বলিতে লজ্জা করিতে লাগিল। যা হয় করুন গিয়া তিনি—উমা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

দেখিল, সারাদিন খাটিয়া-খুটিয়া রমানাথ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, মাথার কাছে আলো জ্বালা। শিয়রে এমনি আলো জ্বালিয়া কখনো ঘুমায়! এমন মানুষ, যদি কোনো-কিছুর খেয়াল থাকে।

উমা আলোটা সরাইয়া জোর কমাইয়া দিল। তারপর খোকার চাঁদের মতো মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল। সে-ও অঘোরে ঘুমাইতেছে। আজ আর জাগে নাই, দুধও খায় নাই। খোকার সেই দুধের বাটি হাতে করিয়া উমা ফের নিচে নামিয়া গেল।

তখনও বামুন-ঠাকরুন একলা ভাত লইয়া বসিয়া আছেন। বলিলেন, দেখ তো মা মোক্ষদার কাণ্ড! এখনও এলো না। হতভাগী কোথায় গল্প গিলতে বসেছে।

উমা বলিল, ওর ঐ রকম, কিছু বোঝে না। আচ্ছা, তুমিও তো যাত্রা শুনেছ বামুন-মা, সব চাইতে ভালো একটো করলে কে? অশ্বত্থামা, না?

বামুন-ঠাকরুন ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ছাই! একটোর কথা যদি বল ভীমের উপরে কেউ নেই। প্রথমে মোহড়ায় গোটা দুই লাফ দিয়েছে কি,

সামনে যে ছেলেগুলো বসেছিল তারা ছুটে একেবারে নাটমণ্ডপের নিচে। হবে না, কত বড় বীর! মহাভারত পড় নি বউমা?

উমা কহিল, তা ঠিক। কিন্তু অশ্বত্থামাকে দেখে আমার বড্ড কষ্ট হয়। গরিব বামুনের অবোধ ছেলে, একটুখানি দুধের জন্য কী কান্নাটাই কাঁদলে! তারপর দুধের বাটিটা আগাইয়া দিয়া বলিল—ঐ অশ্বত্থামা ছোকরা এখানেই খেতে আসবে, তুমি তাকে এই দুধটুকু দিও বামুন-মা।

বিড়ালের বড় উপদ্রব। বামুন-ঠাকরুন দুধের বাটি তাকের উপর তুলিয়া ঢাকা দিয়া রাখিলেন। উমা চুপ করিয়া রহিল, তারপর উনানের কাছে সরিয়া গিয়া বসিয়া বলিল, এবারে শীত যা পড়বে—এরি মধ্যে কেমন শীত-লাগছে, দেখ না। আর আমার বাপের বাড়িতে এদ্দিন ঠিক লেপ গায়ে দিতে হচ্ছে—একেবারে মধুমতীর উপর কি না! হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল, মজার কথা শোনো বামুন-মা, আজকে প্রথমে যখন অশ্বত্থামা আসরে এলো, আমি ভাবলাম আমার ভাই হারান এলো বুঝি! এমন পেটুক তুমি ভূ-ভারতে দেখ নি কখনো। অশ্বত্থামা যখন দুধ-দুধ করে কাঁদছিল, আমার মনে হল হারান কাঁদছে।

বামুন-ঠাকরুন কহিলেন, তোমার ভাই বুঝি ঐ রকম দেখতে?

উমা কহিল, দূর! ওর চেয়ে ঢের ছোট আর ধবধবে ফরশা—যেন কড়ির পুতুল। সেবারে যখন এখানে আসি, খুব ভোরবেলা—পানসিতে উঠে দেখলাম, হারান কখন এসে ঘাট-কিনারে বাবলাতলায় দাঁড়িয়ে আছে। পানসিতে ডেকে তার কড়ে আঙুলে একটু কামড় দিয়ে এলাম। আঙুল কামড়ালে নাকি মায়া-মমতা ছেড়ে যায়—ওসব ছাই কথা।

বামুন-ঠাকরুন সমবেদনা প্রকাশ করিয়া কহিলেন, আহা! আসে না কেন?

উমা বলিল, আসে কার সঙ্গে? মোটে এগারো বছর বয়স। আর ক-টা বছর বাদে বড় হয়ে আসবে ঠিক। এসে সে আমাকে ফি বছর উজ্জলপুরে নিয়ে যাবে। তখন বছর বছর যাব, কাউকে খোশামোদ করছিনে, আর ক-টা বছর যাক না।

এমন সময় ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। কান্না তো নয়, যেন উপরে ডাকাত পড়িয়াছে। উমার বড় ইচ্ছা করিতেছিল, যাত্রার লোকদের খাওয়া হইয়া গেলে তবে যাইবে, কিন্তু আর দাঁড়ানো চলে না। যাইবার সময় বলিয়া গেল, বামুন-মা, ঐ ছোকরাকে মনে করে দুধটুকু দিও—ভুলো না যেন। তোমার যে ভোলা মন!

এমনি বেশ শান্ত, কিন্তু উমার খোকা একবার কান্না যদি আরম্ভ করিয়াছে—অবাক হইয়া যাইতে হয়, অতটুকু গলায় ঐ প্রকার আওয়াজ উঠে কি করিয়া ?

ইতিমধ্যে রমানাথেরও ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল, উমাকে দেখিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল, কোথায় ছিলে এতক্ষণ ? জ্বালাতন করলে ! যাও, তোমার ছেলে নিয়ে যাও।

উমা ছেলে কোলে করিয়া বাহিরে ছাদের উপর আসিল।

অন্ধকার রাত্রির মাথার উপর লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র জ্বলিতেছে। উমা ছাদের উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছেলে শান্ত করিতে লাগিল। ছেলেকে বুকের উপর চাপিয়া বারংবার বলিতেছিল, কাঁদিস নি মানিক আমার, ধন আমার, আর কাঁদে না। আজকে আর দুধ পাবিনে—তোর সে দুধ দিয়ে দিইছি—একদিন দুধ না খেলে কি হয় ? ওরে হিংসুটে, তবু কাঁদিস ? তুই রোজ খাস, ওরা যে জন্মে কোন দিন দুধ খেতে পায় না—

চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, আঁচল দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া আবার বলিতে লাগিল, আ-মরে যাই, মরে যাই, খোকনমণির কি হয়েছে ! ও খোকা, মামার বাড়ি যাবি ? মামা দেখবি ? তুই ঘুমিয়েছিলি, দেখলিনে খোকা, তোর মামা এসেছিল। কেমন সুন্দর টুকটুকে মামা। দুধ-টুধ যা ছিল সব সে খেয়ে গেছে, এক ফোঁটাও নেই। কান্না কেন ও আমার গোপাল, তুমি এখন ঘুমোও। আয় চাঁদ, আয়-আয়—খোকার কপালে টিপ দিয়ে যা।

উমা আবার যখন ঘরে ফিরিয়া আসিল, রমানাথ বিছানায় উঠিয়া বসিয়া আলো ধরিয়া ছারপোকা মারিতেছে। কহিল, নতুন হিম পড়ছে, অমনি করে এখন বাইরে বাইরে ঘোরে।

যেন কে কাহাকে কহিতেছে, উমা যেন ঘরে নাই। ঘুমন্ত ছেলে কোল হইতে নামাইয়া সে আস্তে আস্তে শোয়াইয়া দিল।

রমানাথ কাছে আসিয়া উমার একখানি হাত ধরিয়া বলিল, রাগ করেছ উমা ? ঘুমের ঘোরে কি বকেছি, আমার কিছু মনে নেই।

আর উমা চোখের জল ঠেকাইতে পারিল না, বর্ষার মধুমতী উমার চোখের কূলে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িল। রমানাথের কোলের উপর মাথা রাখিয়া উমা কাঁদিতে লাগিল, আর রমানাথ বিব্রত হইয়া তাহার চোখ মুছাইতে মুছাইতে বলিতে লাগিল, আমায় মাপ করো, মাপ করো উমা। অত কাঁদছ কেন ? না, একেবারে পাগল তুমি।

কতক্ষণ পরে কাঁদিতে কাঁদিতে উমা বলিল, আমি উজ্জ্বলপুরে যাব।

কতদিন যাইনি বলো তো। আমার বুঝি হারানকে মাকে দেখতে ইচ্ছা করে না!

রমানাথ বলিল, এই কথা? দাঁড়াও, কিস্তির মুখটা কেটে যাক—তারপর ছয়-দাঁড়ের পানসি নিয়ে যাব। তুমি যাবে, আমি যাব, খোকা যাবে, মোক্ষদাও যাবে—আর কেঁদো না লক্ষীটি।

যাত্রাওয়ালাদের ডাকিয়া আনিতে সত্য সত্যই অনেক রাত্রি হইয়া গেল, কিন্তু তাহাতে মোক্ষদার অপরাধ নাই। মোক্ষদা গিয়া দেখিল, অশ্বত্থামা ইতিমধ্যে পোশাক ছাড়িয়া ফেলিয়া বেঞ্চে বসিয়া বিড়ি টানিতেছে, কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি রথিবৃন্দ দাড়ি-গোঁফ-সমন্বিত অবস্থাতেই বায়নার টাকার বখরা করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। অবশেষে অনেক কষ্টে হিসাব মিটিয়া প্রতিজনের ভাগে সাড়ে-দশ আনা করিয়া পড়িল। দ্রোণাচার্য পয়সা গণিয়া ট্যাঁকে বাঁধিলেন, তারপর ছোঁ মারিয়া অশ্বত্থামার মুখ হইতে বিড়িটি কাড়িয়া লইয়া টানিতে লাগিলেন। অধিকারী হাঁ-হাঁ করিয়া আসিল, অমন দাড়ি-পরা অবস্থায় বিড়ি খায় কখনো? পাঁচসিকা দামের দাড়িটায় আগুন লাগিলে একেবারে সর্বনাশ হইয়া যাইবে যে!

বারোজনকে একত্র করিয়া গোছাইয়া বাড়ির ভিতর লইয়া যাইতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল।

আর সকলের খেসারি-ডাল অবধি পৌঁছিয়া ইতি, কেবলমাত্র সৃষ্টিধরের পাতের কোলে দুধের বাটি আসিল। সে যে আজিকার আসরে অত্যুৎকৃষ্ট একটো করিয়া সকলকে বিমোহিত করিয়াছে এবং তজ্জন্য অন্তঃপুরে আহারের এই বিশেষ ব্যবস্থা, তাহাতে সৃষ্টিধরের সন্দেহমাত্র রহিল না।

মাথুর

মাসখানেক মাত্র নিরুদ্দেশ থাকিয়া উমানাথ বাড়ি ফিরিয়াছে কাল রাত্রে। এত শীঘ্র ফিরিবার কারণ, মঠবাড়িতে মেলা লাগিয়াছে, ভাল ভাল কীর্তনিয়ারা আসিয়াছে, বিশেষ করিয়া এবার সোনাকুড়ের বালক-সঙ্কীর্তনের আসিবার কথা। খবরটা কাকপক্ষীর মুখে কি করিয়া তাহার কানে পৌঁছিয়াছিল।

বড় ভাই ক্ষেত্রনাথ দাওয়ায় বসিয়া সকালবেলার মিষ্ট রোদ সেবন করিতে

করিতে একখানা দলিলের পাঠোদ্ধারের চেষ্টায় ছিলেন। দলিলটি বহু পুরানো, পোকায় কাটা, জায়গায় জায়গায় ছিঁড়িয়া এমন পাকাইয়া গিয়াছে যে, এক একটা জট খুলিতেই একটি বেলা লাগে।...উমানাথ সোজা সেইখানে উঠিয়া তড়বড় করিয়া আপনার বক্তব্য বলিতে লাগিল।

বিস্মিত চোখে ক্ষেত্রনাথ একবার মুখ তুলিয়া দেখিলেন। কথা শেষ হইলে প্রশ্ন করিলেন: জগদ্ধাত্রীর বাড়ি কবে গিয়েছিলে?

কুড়ি-বাইশ দিন আগে।

হৃদয় ছিল সেখানে?

না।

হুঁ—বলিয়া ক্ষেত্রনাথ চুপ করিয়া নিজের কাজ করিতে লাগিলেন। তারপর হাতের দলিল সযত্নে ভাঁজ করিয়া রাখিয়া বলিলেন, আমি জগদ্ধাত্রীর চিঠি পেয়েছি পরশুদিন। এখন তোমার ঐ বিশ দিনের বাসি খবর শুনে লাভালাভ নেই।

দলিল বাক্সবন্দি করিয়া ধীরেসুস্থে পরম নিশ্চিন্তভাবে তিনি তামাক ধরাইয়া বসিলেন। এবার বলিবার পালা তাঁহার। কণ্ঠ চিরদিনই প্রবল, আজও তাহার অন্যথা হইল না। বাক্যের তূণ একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেলে ক্ষেত্রনাথ অন্য কাজে চলিয়া গেলেন। তাহার পরেও উমানাথ সেখানে একই ভাবে বসিয়া রহিল।

ঘণ্টা দুই পরে বাড়ির মধ্যে গিয়া তরঙ্গিণীর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। তরঙ্গিণী ভাল মানুষের ভাবে জিজ্ঞাসা করিল: বটঠাকুরের সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল:

অর্থাৎ এবার দ্বিতীয় কিস্তি। উমানাথ চুপ হইয়া রহিল।

তরঙ্গিণী আবদারের ভঙ্গিতে মোলায়েম সুরে বলিতে লাগিল, তা বল, বল না গো—মেয়েমানুষ, ঘরের কোণে পড়ে থাকি, কামাই-ঝামাই করে এলে এদ্দিন পরে, ভালমন্দ কত কি নিয়ে এলে, দেখে এলে, শুনে এলে—বল না দুটো কথা, শুনি।

উমানাথ বলিল, জগদ্ধাত্রী-দিদি ওঁরা দেশে-ঘরে ফিরেছেন, তাই বলছিলাম দাদাকে—

গুরুকন্তে? মস্তবড় খোশখবর, গামছা বখশিস দিই? তরঙ্গিণী হাসিয়া যেন গলিয়া পড়িতে লাগিল। গামছা হাতে মাথা মুছিতেছিল, সেটাকে পরম পুলকে সে স্বামীর দিকে আগাইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, পুরুষের তো মুরোদ হল না যে জন্মের মধ্যে পরিবারের হাতে একটা-কিছু

দিই এনে, তা আমি দিচ্ছি এই গামছাখানা বখশিস—

মনে মনে আহত হইয়া উষ্ণকণ্ঠে উমানাথ বলিল, গামছা বখশিস কেউ আমায় দেয় না।

তরঙ্গিণী তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া লইল : না, তা-ও দেয় না। হাসিয়া কহিতে লাগিল, গামছা তো দেয় না, উত্তম-মধ্যম দেয় কি-না বোলো তো একদিন—

উমানাথ এ কথায় একেবারে ক্ষেপিয়া গেল।

মহামিথ্যুক তোমরা। বখশিসের কত শাল-দোশালা এনে দিয়েছি এ-যাবত, তবু বার বার ঐ কথা। উত্তম-মধ্যম দেয়···দিলেই হল অমনি! ডাকো দিকি দশগ্রামের সভা, ডাকো একবার এদিককার যত কবিয়াল।

বলিতে বলিতে উত্তেজনার মুখে কবিতা বাহির হইয়া আসিল—

হরেক কবি হরবোলা
সবার উপর ময়রা ভোলা,
তাঁর শিষ্য সহায়রাম,
গুরুর পায়ে কোটি প্রণাম—

গুরু সহায়রামের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া অবশেষে সে কিঞ্চিৎ শান্ত হইল।

তরঙ্গিণী কিন্তু একবিন্দু রাগ করে নাই, তেমনি হাসিভরা মুখ। খানিক পরে উমানাথের রাগ পড়িয়া আসিলে পুনরপি প্রশ্ন হইল : ঠাকরুনের ওখানে স্থিতি হয়েছিল ক'দিন, ওগো?

উমানাথ সদম্ভে বলিতে লাগিল, ক'দিন আবার, যাবার পথেই পড়ল বলেই তো! দলের সমস্ত লোক হাটখোলার পাশে উনুন খুঁড়ে নিল, আমি তো আর তা পারিনে? হাজার হোক পজিশন আছে একটা—

বলিয়া পজিশন মাফিক গম্ভীর হইল।

তবু তরঙ্গিণী সমীহ করিল না। বলিল, তা জানি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করছি, পজিশনটা টিকল কি করে? অতিথ বলে হাতজোড় করে গিয়ে তাঁর উঠোনে দাঁড়ালে?

কথাবার্তার ধরনে মনে মনে শঙ্কিত হইলেও উমানাথ মুখের আস্ফালন ছাড়িল না।

আমার বয়ে গেছে। হঠাৎ দেখা হল, তারপর আমারই হাত ধরে টানাটানি। সে কি নাছোড়বান্দা! কিছুতেই শুনবেন না—

তারপর?

তারপর বিরাট আয়োজন। জগদ্ধাত্রী-দিদি আর বাকি রাখেন নি কিছু।

দুধ-ঘি, সন্দেশ-রসগোল্লা, মাছ-মাংস, বাটির পর বাটি আসছে পাতের ধারে। ফুরোয় না।

গম্ভীর কণ্ঠে তরঙ্গিণী কহিল, খাওয়া-দাওয়ার পরে?

উমানাথ চমকিয়া গেল। ঝড় প্রত্যাসন্ন। সে পলাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু তাহার আবশ্যক হইল না। ছোটবউ আসিয়া ঢুকিল, তার পিছনে মেজবউ। দু'টিই অল্পবয়সি। ক্ষেত্রনাথের মেজ ও ছোট ছেলের বউ। বিয়ে এই বছর দুই-তিন মাত্র হইয়াছে।

জলচৌকির পাশে তেলের বাটি নামাইয়া রাখিয়া ছোটবউ বলিল, নাইতে যান কাকাবাবু, রাত্তিরে তো উপোস করে আছেন। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—তা, আমদের ডাকতে পারলেন না—এমনি আপনি। একদৌড়ে নেয়ে আসুন—নয় তো দেখবেন কি করি।

এই বলিয়া দু'টি বউ মুখোমুখি চাহিতেই ছোটবউ খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দেয়াপাড়া-জাগুলগাছি অঞ্চলে যাঁহাদের গতায়াত আছে, উমানাথ চাটুজ্জে অর্থাৎ ছোটচাটুজ্জের পরিচয় তাঁহাদিগকে দিবার দরকার নাই। বর্ষার সময়টা এই সর্বসমেত মাস চারেক বাদ দিয়া বাকি দিনগুলি ছোট-চাটুজ্জের দলের গাওনা লাগিয়াই আছে। দলটা কিন্তু হিসাবমতো উমানাথের নয়, সে বাঁধনদার মাত্র। এবং রাহাখরচ ও টাকাটা-সিকিটা ছাড়া প্রাপ্তিও এমন কিছু নাই। তাই ঘর-বাহিরের ক্রমাগত হিতোপদেশ শুনিতে শুনিতে এক এক সময়ে উমানাথ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, ছোটলোকের সমাজে ছড়া কাটিয়া বেড়াইয়া পিতৃপুরুষের মান-ইজ্জত যা ডুবিয়াছে তা ডুবিয়াছে—আর ডুবাইবে না। দিন কতক বেশ চুপচাপ কাটিয়া যায়, সে দিব্য বাড়ি বসিয়া খাইতেছে, বেড়াইতেছে, ঘুমাইতেছে,—হঠাৎ কেমন করিয়া খবর উড়িয়া আসে, অমুক গ্রামে ভারি হৈ-চৈ—তিন দলে কবির লড়াই, কার্তিক দাস তার শিষ্য অভয়চরণ আর বেহারী ঢুলিকে লইয়া পুব অঞ্চলের সমস্ত বায়না ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিতেছে। পরদিন সকাল হইতে আর ছোট-চাটুজ্জের সন্ধান নাই, খেরো-বাঁধা খাতাখানাও ঐ সঙ্গে অন্তর্ধান করিয়াছে।

বিকালের দিকে মঠবাড়ি হইতে খোলের আওয়াজ আসিতে উমানাথ শশব্যস্তে ঘরে ঢুকিয়া চাদর কাঁধে ফেলিল। বগলে যথারীতি গানের খাতা রহিয়াছে।

দাঁড়াও ছোটদাদু, আমি যাচ্ছি।

ছ-সাত বছরের নিতাইচন্দ্র, কাল মারামারি করিতে গিয়া ফুলপাড় শৌখিন ধুতিখানার ক'জায়গায় ছিঁড়িয়া আসিয়াছে, তরঙ্গিণী তাহাই মেরামত করিতে লাগিয়াছে। উবু হইয়া বসিয়া বসিয়া নিতাই মনোযোগের সঙ্গে শিল্পকার্য দেখিতেছিল, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, আজকে আর থাক রাঙাদিদি উ-ই দাও। ছোটদাদু মেলায় যাচ্ছে, আমি যাব।

তরঙ্গিণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, যাও তাই। ছোটদাদু সন্দেশ কিনে খাওয়াবে।

তারপর তরঙ্গিণী নাতিকে কাপড় পরাইয়া সুন্দর করিয়া কোঁচা দিয়া দিল। গায়ে পরাইয়া দিল সবুজ একটি ছিটের জামা. ফুটফুটে মুখখানি অতি যত্নে আঁচলে মুছাইয়া মুগ্ধচোখে কহিল, বর-পাত্তোরটি চলেছেন। বউ নিয়ে আসা চাই কিন্তু নিতু বাবু।

উদ্দেশ্যে কিল তুলিয়া নিতু বলিল, বুড়ী !

বুড়ী বলেই তো বলছি মাণিক। কাজ করতে পারিনে, তোমার কাকীরা মনে মনে কত রাগ করে। এমন বউ নিয়ে আসবে যে দু'বেলা আমাদের কাজকর্ম রান্নাবান্না করে খাওয়াবে, কোলে করে সকাল-বিকাল তোমায় পাঠশালায় দিয়ে আসবে। কেমন ?

নিতু লজ্জা পাইয়া একদৌড়ে পলাইয়া গেল।

তারপর তরঙ্গিণী হাসিতে হাসিতে উমানাথের দিকে ফিরিয়া বলিল, তুমিও একটা জামা গায়ে দাও। শীতের দিন—এতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না গো—

উমানাথের অত অবকাশ নাই। কাঁধের চাদরের উপরেই একটা কামিজ ফেলিয়া সে পা বাড়াইল।

পিছন হইতে তবু বাধা : শোন—

তরঙ্গিণী কহিতে লাগিল, ভাসুর ঠাকুর খেতে বসে বড্ড দুঃখ করছিলেন। আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে সব বলছিলেন।

ভূমিকার রকম দেখিয়া উমানাথের মুখ শুকাইল। এক কথায় হাঁ-না করিয়া সরিয়া পড়িবার ব্যাপার ইহা নহে। ওদিকে খোল-করতালের ধ্বনি ক্ষণপূর্বে থামিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ গৌরচন্দ্রিকা সারা হইয়া নিশ্চয় এবার পালা আরম্ভ হইল।

তরঙ্গিণী বলিল, তুমি সাতেও থাকনা, পাঁচেও থাকনা। অমন দাদা —বাপের মতন বললেই হয়—তাঁর সঙ্গে এসবের কি দরকার ছিল বল তো ?

উমানাথ সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, কিন্তু কথাটা মিথ্যে নয়। সহায়রামের

ভিটে থেকে এক সরষেই বিক্রি হয় বছরে কত টাকায় ? এতকাল জগদ্ধাত্রী দিদি বিদেশে পড়ে ছিলেন, নিতে-থুতে আসেন নি—এখন কিছু না দিলে চলবে কেন ?

তরঙ্গিণী ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া তীব্রকণ্ঠে কহিল, এই যুক্তিগুলো কার শেখানো ? জমাজমি আমাদের কি আছে না আছে—কোনো দিন তুমি চোখ মেলে দেখেছ, না খবর রাখ ? জগদ্ধাত্রী-দিদির মায়ায় আজ বড্ড টনক নড়ল। আর তা-ও বলি, অনাথা বিধবা মানুষ তোর আপনার পেটে ভাত জোটে না, নেমন্তন্ন করে চর্বচোষ্য খাইয়ে এই যে ভাইয়ে ভাইয়ে ঘর ভাঙবার মতলব—এ দুষ্টবুদ্ধি কি জন্যে তোর ?

কিন্তু শেষ কথাগুলি উমানাথ বোধকরি শুনিলই না। সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কহিতে লাগিল, সত্যি বউ, দিদি বড্ড অনাথা, সত্যিই তাঁর পেটে ভাত জোটে না। সমস্ত শুনেছ তা হলে ? কোত্থেকে শুনলে ?

তরঙ্গিণী আঙুল তুলিয়া দেখাইল।

ঐ ভাঙা দেরাজটা খুলে দেখ। দেশে এসেছেন শ্রাবণ মাসে, সেই অবধি হপ্তায় হপ্তায় চিঠি। হৃদয় ঠাকুরপো পৈতৃক শত্রুতা সাধতে লেগেছে, ও-ই হয়েছে আজকাল মন্ত্রী। সে যা শিখিয়ে দেয়, ঠাকরুন তাই লেখেন।

উমানাথ আর্দ্রস্বরে বলিল, কিন্তু অবস্থা দিদির সত্যিই বড় খারাপ—সাক্ষি আমি নিজে। নিজের চোখে দেখে এসেছি। দেখে জল আসে চোখে।

তারই মধ্যে তো এই নেমন্তন্ন-আমন্তন্ন—দুধ-ঘি, মিষ্টি-মেঠাই। বুঝতে পার ? ওগো বুদ্ধিমন্ত মশাই, মানে বোঝ এর ? তরঙ্গিণী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল।

কিছু না, কিছু না। উমামাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিতে লাগিল, সমস্ত বাজে কথা বউ, আমি ওঁর বাড়ি নিজেই গেছলাম। খেতে বসেছি হঠাৎ বৃষ্টি এলো। তারপর বাইরের বৃষ্টি থামল তো ঘরের বৃষ্টি আর থামে না। ভাতের থালা নিয়ে কোথায় গিয়ে বসি—লজ্জায় দুঃখে দিদি মুখ তুলতে পারেন না। আর সেই মোটা মোটা বীরপালা চালের ভাত—সহায়রাম রায়ের মেয়ে, গুরু সহায়রামকে গড় না করে তিনটে জেলার কেউ কবির আসরে নামতে সাহস করে না—তাঁর মেয়ের এই রকম হাল ! বলিতে বলিতে উমানাথের কণ্ঠ ভারি হইয়া আসিল। হঠাৎ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া জামাটা পরিয়া লইবার জন্য অত্যন্ত তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেল।

গান চলিতেছে।

বকুল ও মাধবীলতার কুঞ্জবন, তাহারই পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মূল-

গায়েন মুখরা বৃন্দাদূতীর বিদ্রূপ-বাণী বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিল :

বৃন্দা কহিতেছে—সুখে আছ তো মথুরার রাজা ? তোমার নব-সঙ্গিনীকে পাশে লইয়া ত্রিভঙ্গ ঠামে একবার দাঁড়াও—দেখি, বাঁকা শ্যাম আর কুব্জা-নায়িকায় মিলিয়াছে কেমন ? মনে কি পড়ে বন্ধু, কোথায় কবে এক রাখাল ছেলে বাঁশী বাজাইত—আর কাঞ্চনলতা কুলের বধূ কুল ভাসাইয়া কলসি ভাসাইয়া ছুটিয়া আসিয়া পায়ে লুটাইত ? আজিকার এই সুখবাসরের মধ্যে গন্ধদীপের আলোয় হঠাৎ যদি একটি ম্লান মুখচন্দ্র তোমার মনের দরজায় সসঙ্কোচে পলকের জন্য তাকাইয়া যায়, তাহাকে দূর করিয়া দিও মহারাজ, দুঃস্বপ্নকে মনে ঠাঁই দিতে নাই…

শ্রোতাদের মুখে মুখে ম্লান হাসি। যুগান্ত-পারের একটি সর্বব্যাপী বিরহ-ব্যথা গানের সুরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া শীতক্লিষ্ট ক্ষীণ জ্যোৎস্নার মধ্যে সকলের বুকের মধ্যে পাক খাইয়া বেড়াইতে লাগিল। উমানাথ তদ্গত হইয়া শুনিতেছিল। নিতাই ফিস-ফিস করিয়া ডাকিল : ছোটদাদু !

উমানাথ কহিল, চুপ !

মিনিট কতক চুপ করিয়া নিতাই ছেঁড়া কানাতের ফাঁকে আকাশের দিকে চাহিয়া আপন মনে কত কি বকিতে বকিতে আঙুল ঘুরাইতে লাগিল। আবার প্রশ্ন করিল : শোন ছোটদাদু, জয়ন্তী বলে কি, আগে নাকি আকাশ হাতে পাওয়া যেত। একদিন এক বুড়ি ঝাঁটার বাড়ি দিয়েছিল—সত্যি ?

উমানাথ টানিয়া তাহাকে আরও কোলের আছে আনিল : ঐ শোন্ খোকা, গান শোন্।

—না, বাড়ি চল।

মুখ না ফিরাইয়া উমানাথ বলিল, হুঁ—

আরও খানিক বসিয়া থাকিয়া নিতাই আস্তে আস্তে সামিয়ানার বাহিরে আসিল। তাকাইয়া দেখিল, ছোটদাদু কিছুই টের পায় নাই, তেমনি এক মনে গান শুনিতেছে।

গায়ক তখন গাহিতেছে :

ওগো মাধব, গোকুলে চাঁদ ওঠে না, ভ্রমরের গুঞ্জন নাই, যমুনা কলধ্বনি ভুলিয়া গেছে, আর তোমারি গরবিনী রাই আজ ধুলায় পড়িয়া আছে। দশমী দশায় কণ্ঠ তাহার নিরুদ্ধ,শ্বাস বহে কি না বহে। কবরী খুলিয়া পড়িয়াছে, চোখের জলে শতধারা নদী বহিতেছে। সখীরা তাহাকে ঘিরিয়া তোমার নাম কত শোনায়, ক্ষীণ কাঞ্চন-রেখা তনু ঈষৎ কাঁপিয়া উঠে—কিন্তু চোখ মেলিবার ক্ষমতা নাই। অভাগিনী এতদিনে মরিয়া জুড়াইল বুঝি !

*কৃষ্ণ অভয় দিলেন : ভয় করিও না। সখি বৃন্দে, তোমাদের কিশোর রাখাল আবার ফিরিয়া যাইবে……

একজন দোয়ার আসরের পাশে সরিয়া তামাক খাইতেছিল, হাত নাড়িয়া উমানাথকে কাছে ডাকিল। কহিল, কেমন গান শুনছেন ছোট-চাটুজ্জে মশাই?

উমানাথ বলিল, খাসা।

উহু—বলিয়া লোকটা ঘাড় নাড়িল। বলিল, আরে মশাই, মাথুর পালা হল এর নাম।—চোখের জলে এতক্ষণ সতরঞ্চি ভিজে যাবার কথা। এ পালা কিছু বাঁধতে পারে নি। আর এ যা শুনলেন, শেষটা একেবারে কিছু হয় নি। আপনাকে মশায়, পালাটা আগাগোড়া একবার ঠিক করে দিতে হবে। কর্তাবাবু বলেছিলেন আপনার কথা।

উমানাথ ঘাড় নাড়িল।

ইতিমধ্যে নিতাই ছুতারপটি লোহাপটি তরকারির হাট পার হইয়া সার্কাসের তাঁবুর চারিদিকে বার আষ্টেক ঘুরিল। কিন্তু সুবিধা কোনদিকে নাই, তাঁবুর কোথাও একটু ছেঁড়া রাখে নাই। দরজার সামনে পরদা টাঙানো, তার ফাঁক দিয়া একটু-আধটু নজর চলে বটে, কিন্তু সেখানে জনকয়েক এমন মারমুখি হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে ভিতরে চাহিতে সাহসে কুলায় না।

ওদিকে এক সারি দোকানে বড় বাহার করিয়া গ্যাসের আলো জ্বালিয়া দিয়াছে, ঠিক যেন দিনমান। ছেলে-ছোকরার ভিড় সেখানটায় কিছু বেশি। একটা দোকানের সামনে গিয়া নিতু অবাক হইয়া গেল, তাহার বয়সি আরও তিন-চারিটি ছেলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। অত্যাশ্চর্য ব্যাপার, একটা ইঞ্জিন আর তার সঙ্গে খান তিন-চার রেলগাড়ি—পূজার সময় মামার-বাড়িতে যে গাড়িটা চড়িয়া গিয়াছিল, অবিকল তাই—তবে অতিশয় ছোট। আবার লাইনও পাতা রহিয়াছে। দোকানি দম দিয়া ছাড়িয়া দেয়, গাড়ি লাইনের উপর গড়-গড় করিয়া একবার আগাইয়া যায়, আবার পিছাইয়া আসে……

মজা আরও আছে অনেক। এদিকে নাগরদোলা ঘুরিতেছে, পাশের একটা দোকান হইতে রকমারি বাঁশীর সুর ভাসিতেছে, মাঠে বাজি পোড়ানো হইতেছে, শোঁ-শোঁ করিয়া হাউই আকাশে উঠিয়া তারা কাটিতেছে…অন্য ছেলে কয়টি ছুটিয়া বাজি দেখিতে গেল। নিতাই আগাইয়া গিয়া ইঞ্জিনের গায়ে সন্তর্পণে একটু আঙুল বুলাইয়া দেখিল।

নেবে খোকা? পয়সা আছে কাছে?

হুঁ—বলিয়া আসিবার সময় রাঙাদিদির কাছ হইতে কয়টা পয়সা

আনিয়াছিল, তাহাই সে বাহির করিয়া দেখাইল।

দোকানি কহিল, ওতে হবে না তো, টাকা লাগবে। কার সঙ্গে এসেছ? যাও, বাবাকে নিয়ে এস, দশটা অবধি আমার দোকান খোলা আছে। যাও—

নিতুর অদৃষ্ট ভাল, ছোট দাদু অবধি যাইতে হইল না, সামনেই পড়িয়া গেলেন ক্ষেত্রনাথ। রোজ বিকেলে ক্ষেত্রনাথকে মেলায় আসিতে হয়। সঙ্কীর্তনের আকর্ষণে নয়—মেলার মধ্যে চারিদিককার গ্রাম হইতে বিস্তর খেজুর-গুড় আমদানি হয়, প্রতিবছর এই সময়টায় তিনি কিছু গুড় কিনিয়া রাখিয়া বর্ষাকালে দক্ষিণের ব্যাপারিরা আসিয়া পড়িলে ছাড়িয়া দেন। এইপ্রকার দু-পয়সা লভ্য হইয়া থাকে।

নিতাই ক্ষেত্রনাথকে জড়াইয়া ধরিল। ক্ষেত্রনাথ কহিলেন, এসেছ আজ আবার? কি বলবে বলে ফেল—দেরি কেন দাদা? ক্ষিধে? বাড়ি থেকে পা বাড়ালে ক্ষিদে অমনি সঙ্গে সঙ্গে পিছু নেয়—

নিতাই হাসিয়া আবদারের সুরে কহিল, কর্তাবাবু, ইদিকে একবার এসো —শিগগির এসে দেখে যাও।

গাঁট খালি—এই দেখ। আর কিছু হবে না।

কিন্তু উল্টাগাঁট উঁচু হইয়া রহিয়াছে, নিতুর সেদিকে নজর আছে। বলিল, না কর্তাদাদু, আমার ক্ষিদে পায় নি—সত্যি পায় নি—বিদ্যের কিরে। তুমি একটিবার এসে দেখে যাও।

গাড়ি ও ইঞ্জিনের দাম দোকানি হাঁকিল পাচ সিকা।

অগ্নিমূর্তি হইয়া ক্ষেত্রনাথ বলিতে লাগিলেন, দিনে ডাকাতি করতে এসেছ এখানে? ঐ তো টিনের পাত, জিল-জিল করছে, তিনটে দিনও টিকবে না। আর খোকা, চলে আয়—কি হবে ও নিয়ে। আমরা নেবো না।

দোকানি নিরুত্তরে স্প্রিঙে দম দিতেছিল। ছাড়িয়া দিতে ইঞ্জিন লাইনের উপর ছুটিতে শুরু করিল।

চলে আয়। বলিয়া ক্ষেত্রনাথ নিতুর হাত ধরিয়া টানিলেন। কিন্তু সে নড়ে না। আর একবার টান দিতে দোকানের খুঁটি জাপটাইয়া চিৎকার করিয়া নিতাই কান্না জুড়িয়া দিল।

সব তাতে তোমার ইয়ে—না? পাজি কাঁহাকা!

ক্ষেত্রনাথ যত টানেন, তত জোরে নিতু খুঁটি আঁটিয়া ধরে। তারপর খুঁটি ছাড়িয়া গেল তো ঝাঁপ ধরিতে চায়। নাগাল না পাইয়া সেইখানে সে মাটির উপর আছড়াইয়া পড়িল।

হঠাৎ শঙ্কিত ব্যস্ত স্ত্রীকণ্ঠ।

ছুঁসনি ছুঁসনি—অ হতচ্ছাড়া ছেলে,দিলে বুঝি এই রাত্তিরে ছুঁয়ে?

মেয়েলোকটি ঠিক মেলায় আসে নাই, রাস্তার ধারে ছইওয়ালা একখানা গরুর-গাড়িতে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। গণ্ডগোল ও ছোটছেলের কান্না শুনিয়া কয়েক পা আগাইয়া উঁকি দিয়া ব্যাপারটা দেখিতেছিল। একদিকে স্তূপাকার বাঁশের চাঁচাড়ি পড়িয়াছিল, সেইখানে বসিয়া মেলার যাবতীয় বাঁশের কাজকর্ম হইয়াছে—স্পর্শদোষ বাঁচাইতে তাড়াতাড়ি সে ছুটিয়া তাহার উপর উঠিল। লোক জমিয়া যাইতেছে দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ নিতুকে ছাড়িয়া এক পাশে দাঁড়াইলেন।

জনমত ক্ষেত্রনাথের প্রতিকূলে। যার যেমন খুশি মন্তব্য করিতে লাগিল।

আচ্ছা গোঁয়ার-গোবিন্দ হে! মেরেই ফেলেছিলে ছেলেটাকে! শাসন করতে হয় বলে এমনি শাসন?...রক্ত পড়ছে যে—লোকটা কে হে? ধরে জেলে দেওয়া উচিত।

নিতুর হাতে-পায়ে আঁচড় লাগিয়া দু-এক ফোঁটা রক্ত পড়িতেছিল, তাহা ঠিক। ক্ষেত্রনাথকে যাহারা চিনিত, তাহারা অত দরদ দিয়া সম্বর্ধনা করিতে পারিল না। বলিল, যা হবার হয়েছে চাটুয্যে মশায়, রাগ না চণ্ডাল—আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না, তুলে নিন নাতিকে, বাড়ি গিয়ে কাটা-জায়গায় তেল-টেল দিন গে। হাঁটিয়ে নেবেন না যেন—গাড়ি করে চলে যান।

স্ত্রীলোকটি ইতিমধ্যে নির্বিঘ্ন স্তূপ হইতে নামিয়া নিতুকে কোলে তুলিয়া শান্ত করিতে বসিয়া গিয়াছে। প্রৌঢ়া বিধবা—দেহ ক্ষীণ বটে, কিন্তু কণ্ঠস্বরের জোর যেমন অসামান্য, তেমনি উহা যেন মধু ছড়াইতে ছড়াইতে বহিয়া যায়। ক্ষেত্রনাথের দিকে এক পলক তীব্র দৃষ্টি হানিয়া বিধবা কহিল, পয়সাকড়ি চিতেয় সঙ্গে নিয়ে উঠবে নাকি?

অতিশয় সঙিন প্রশ্ন। উচিতমতো উত্তর দিতে গেলে আবার একদফা দুর্যোগ ঘটিবার সম্ভাবনা। বিশ-গ্রামের লোকের সম্মুখে ক্ষেত্রনাথের আর তাহাতে উৎসাহ নাই। কিন্তু আশ্চর্য এই, যাহাকে লইয়া এত লোকের এমন দুশ্চিন্তা, চক্ষের পলকে সেই নিতাইচন্দ্র লাফ দিয়া উঠিয়া পুনশ্চ দোকানের খুঁটি আঁটিয়া ধরিয়া দাঁড়াইল।

বিধবা বলিল, দাও না গো দোকানি, ছেলেমানুষ ধরে বসেছে—দিয়ে দাও সস্তা করে।

দোকানি বলিতে লাগিল, এক টাকার কম দেওয়া যায় না মা, কল বলেই না এত দাম। এই গাড়িটে নিন, চার পয়সায় দিচ্ছি। চাকা আছে, চোঙ

আছে, কিন্তু টানতে হবে দড়ি বেঁধে।

আমরা দড়ি বেঁধেই টানব, কি বল খোকা? বলিয়া চার পয়সার গাড়িটা তুলিয়া সে নিতুর হাতে দিল।

ক্ষেত্রনাথ চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু রঙ্গস্থলে হৃদয় রায় আসিয়া পড়িতেই পরিচয় প্রকাশ পাইল। হৃদয়ের হাতে একবোঝা হাটের বেসাতি। বলিল, আমার কেনাকাটা হয়ে গেছে। এইবার গাড়িতে চলুন দিদি।

অর্থাৎ চল্লিশ বছর পরে জগদ্ধাত্রী বাপের-বাড়ির গ্রামে ফিরিতেছে, হৃদয় মুরুব্বি হইয়া লইয়া যাইতেছে। দূর জ্ঞাতিসম্পর্কের এই দিদিটির প্রতি ভক্তি তাহার যেরূপ, গুরুজনদিগের প্রতি সেই প্রকার ভক্তি এই কলিযুগের দিনে লোকে যেন শিক্ষা করিয়া রাখে।

জগদ্ধাত্রী ডাকিল: গাড়িতে এস খোকা।

এবং নিতুকে কোলে তুলিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিল।

নিঃশব্দ গ্রামপথ। ক্বচিৎ কখন মেলার ফিরতি দু-একটি লোকের সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। বালুপথে গরুর-গাড়ির শব্দ হইতেছে না। গাড়ির পিছনে ক্ষেত্রনাথ ও হৃদয় পাশাপাশি চলিয়াছেন।

খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ ক্ষেত্রনাথ কথা কহিয়া উঠিলেন: তাই তো বলি, ব্যাপার কি? ভটচায-বাড়ি এত বড় খাওয়া-দাওয়া, তার মধ্যে আমাদের হৃদয় নেই। তোমার সেজছেলেকে জিজ্ঞাসা করলাম, বলল—বাবার পেটের অসুখ, নেমন্তন্নে আসবে না। নিজে না গিয়ে গাড়ি পাঠালেই তো জগদ্ধাত্রী আসতে পারত।

হৃদয় অপ্রস্তুতের ভাবে নানা প্রকার কৈফিয়ৎ দিতে লাগিল: সে জন্য নয়, এমনি গিয়েছিলাম ওদিকে। দিদি বললেন, এত বড় মেলা হচ্ছে, দেশবিদেশ থেকে মানুষজন আসছে, দেখে আসিগে একবার। গাড়ি ভাড়া-টাডা ওঁরই,সব—আমার কি গরজ পড়েছে বলুন—

ওদিকে ছইয়ের মধ্যেও মৃদুকণ্ঠে কথাবার্তা শুরু হইয়াছে। নিতুর মতে এ জগতের একটি লোকও ভাল নয়।

কর্তাদাদু?

মারে।

মেজ কাকা, ছোট কাকা?

তারাও।

বাবা এবং কাকাবাবুরা বাড়ি আসিবার সময় তার জন্য নানারকম জিনিষ

লইয়া আসে, সে হিসাবে ভালই। কিন্তু অপরাধ তাদের, আবার চাকরি করিতে চলিয়া যায়। বাড়ি থাকিতে বলিলে কথা শোনে না—মিছা কথা বলিয়া ফাঁকি দিয়া ভুলাইয়া চলিয়া যায়।

আর আমি? জগদ্ধাত্রী সমস্যাময় প্রশ্ন করিয়া বলিল, আমি কেমন লোক, বল তো নিতুবাবু।

নিতাই চুপ করিয়া রহিল।

জগদ্ধাত্রী বলিল, এই গাড়ি কিনে দিলাম তোমায়, আমি ভাল না?

নিতাই কহিল, তোমার গাড়ি মোটে চলে না, কলের গাড়ি ভাল।

আচ্ছা কিনে দেব ঐ কলের গাড়ি। হাসিমুখে জগদ্ধাত্রী বলিল, কিনে দেব, যদি—এক কাজ করতে পার।

উৎসাহের প্রাবল্যে নিতাই খাড়া হইয়া বসিল: দাও।

বললাম তো, একটা কাজ করতে হবে।

কি বল, এক্ষুনি করব। নিতাই গরুর-গাড়ি হইতে লাফাইয়া তখনই কাজে প্রবৃত্ত হইতে যায় আর কি।

জগদ্ধাত্রী হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, আমায় যদি বিয়ে কর নিতুবাবু। করবে?

সঙ্কীর্ণ গ্রামপথ, পথের ধারে ছোট ছোট ঝোপজঙ্গল, আকাশে শীতের নির্জীব অস্পষ্ট চাঁদ, নিকটে-দূরে এখানে ক'খানা ঘুমন্ত খোড়ো-ঘর ···হঠাৎ তাহার মধ্যে কোথা দিয়া কি হইয়া গেল—যেন এক বৈঠার আঘাতে একটি ডিঙা চল্লিশ পঞ্চাশ বছর উজান ঠেলিয়া গেল। গাড়ির পিছনে চলিতে চলিতে ক্ষেত্রনাথ সেই কথা কয়টি শুনিতে লাগিলেন, আমায় বিয়ে করবে, আমায় বিয়ে করবে গো?

বছর চল্লিশ পরে লোকনাথ ঠাকুরের মেলায় জনারণ্যের মাঝখানে ক্ষেত্রনাথ কয়েক মুহূর্তের জন্য আজ জগদ্ধাত্রীকে দেখিয়াছেন, দেখিয়াছেন বটে—তাহাও বড় ঝাপসা রকম, বয়সকালের চোখের সে দৃষ্টি নাই—রাত্রিবেলা কোন-কিছু ভাল করিয়া দেখিতে পান না. সেই ক্ষণিকের-দেখা মূর্তি ভুলিয়া গিয়াছেন—কোন কালের মূর্তিই মনে নাই। কেবল মনে আসিতেছে, কারণে-অকারণে খিল-খিল করিয়া হাসি, আবার সঙ্গে সঙ্গেই জলভরা অভিমানাহত ডাগর ডাগর চোখ দুটি।

আমায় বিয়ে করবে? ও দাদা, বিয়ে করবে আমায়?

ক্ষেত্রনাথের বউদি সম্পর্কের এক নিঃসন্তান বিধবা তাহাদের বাড়িতে থাকিতেন। এতটুকু মেয়ে জগদ্ধাত্রী বেড়াইতে আসিলে বউদিদি আদর

করিয়া চুল বাঁধিয়া খয়ের-টিপ পরাইয়া গিন্নির ঝাঁপি হইতে আলতা-পাতার পা ছোপাইয়া অনেক শিখাইয়া পড়াইয়া তাহাকে ক্ষেত্রনাথের কাছে পাঠাইতেন। ক্ষেত্রনাথের বয়স বেশি, বুদ্ধিও বেশি। নায়িকার শুভ প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে স্বামিত্বের প্রথম সোপানস্বরূপ তার পিঠের উপর যে বস্তু উপহার দিত তাহাতে জগদ্ধাত্রী ব্যথায় যত না হউক অভিমানে চতুর্গুণ কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিত···সেই সব কথা মনে পড়িতে লাগিল।

সেদিন উমানাথ বাড়ি ফিরিল, যখন চাঁদ ডুবিয়াছে। অত রাত্রেও ক্ষেত্রনাথের ঘরে আলো। উমানাথ খিড়কি ঘুরিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিবার মতলবে টিপিটিপি কয়েক পা পিছাইয়াছে, কিন্তু ক্ষেত্রনাথের চোখকে হয়তো ফাঁকি দেওয়া যায়, কান ভারি সজাগ। বলিলেন, কে? কে ও? এই ঘরে এসো? তোমার জন্যে বসে আছি কেবল।

হয়তো সত্যই তাহার অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন—কিন্তু নিতান্ত যে হাত-পা কোলে করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনটা দলিলের বাক্সই খুলিয়া ডালা তুলিয়া রাখা, প্রদীপে একসঙ্গে অনেকগুলো সলিতা ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, চোখে চশমা-আঁটা, স্তূপীকৃত দলিলের মধ্য হইতে একখানা বাছিয়া ক্ষেত্রনাথ মেঝের উপর উবু হইয়া যেন ঐ দলিলখানির উপর স্তিমিত চোখের সকল দৃষ্টিশক্তি ঢালিয়া দিয়া পড়িতেছিলেন।

উমানাথ কহিল, এখানো শোন্ নি আপনি?

এটা কিছু নূতন ব্যাপার নয়, আশ্চর্য হইবার কিছু নাই ইহাতে। বৈষয়িক ব্যাপারে ক্ষেত্রনাথের সতর্কতা চিরদিনই অপরিসীম, এ বিষয়ে দিনরাত্রি জ্ঞান নাই। দলিলের বাক্সগুলি থাকে শোবার ঘরে। ঠিক শিয়রের কাছ-বরাবর, প্রত্যেকটি দলিলের গায়ে একটুকরা করিয়া কাগজ আঁটা, তাহাতে ক্ষেত্রনাথের স্বহস্তে লেখা স্থূলমর্ম। শীতকালে এক-একদিন কাগজপত্র ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া রৌদ্রে দেন, সমস্ত বেলা নিজে পাহারা দিয়া পাশে বসিয়া থাকেন, আবার নিজের হাতে সমস্ত গোছাইয়া নূতন-কাপড়ের দপ্তরে সাজাইয়া বাঁধিয়া রাখেন। এমন অনেক দিন হইয়া থাকে, নিষুপ্ত গভীর রাত্রি—এক ঘুমের পর ক্ষেত্রনাথের মনে কি-রকম একটা গোলমাল লাগিল, উঠিয়া আলো জ্বালিয়া বাক্স খুলিলেন, তারপর দু-চারিটা দলিল বাহির করিয়া নিবিষ্ট মনে খানিক পড়িয়া দেখিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইয়া শুইতে পারেন। গৃহিণী গত হইবার পর হইতে ইদানীং রোগটা আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

উমানাথ কহিল, রাত একটা-দুটো বেজে গেছে। আর রাত জাগবেন না দাদা।

ক্ষেত্রনাথ বাহিরের পানে চাহিলেন। কিন্তু জানলা বন্ধ, কি দেখিবেন? বলিলেন, রোসো। তাড়াতাড়ি কাগজপত্র তুলিয়া রাখিলেন। বলিলেন, এসো এদিকে, সিন্দুকটা ধরো দিকি।

কোন্ সিন্দুক?

বিরক্ত মুখে ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, সিন্দুক ক-টা আছে তোমাদের বাড়ি? বাক্সর কথা বলছি নে, ঐ—ঐ সিন্দুক—

অনেক পুরানো সেগুনকাঠের অতিকায় সিন্দুক, কাঠগুলি কালো পাথরের মতো হইয়া গিয়াছে। এমন জিনিষ আজকালকার দিনে হয় না। আগে উহার সমস্ত গায়ে ফুল-তোলা অপ্সরী-আঁকা বিস্তর সাজপত্র ছিল, দু-একটা করিয়া খুলিয়া পড়িতে পড়িতে এখন তার চিহ্নমাত্র নাই। ইদানীং ইহা বড় একটা ব্যবহারেও আসে না। এখানে সেখানে তক্তার জোড় ফাঁক হইয়া ঘরের এক কোণে অবহেলিত ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে।

খানিক টানাটানি করিয়া উমানাথ কহিলেন, চার-পাঁচ মনের ধাক্কা দাদা, নড়ে চড়ে না একটু।

ভাল করে ধরো। বলিয়া ক্ষেত্রনাথ সিন্দুক ধরিয়া প্রাণপণ বলে ঝুলিয়া পড়িলেন। কিছুতে কিছু হয় না। পরিশ্রমের ফলে হাঁপাইতে লাগিলেন। বলিলেন, দেবীদাস রায়ের সিন্দুক এর নাম—নড়বে কি সহজে! মধ্যে আবার তোমার ঐ সহায়রাম আর সার্বভৌম ঠাকুরের গুষ্টির পিণ্ডি বোঝাই করা। এই রাত্রে খুলে সব বের করে ফেলা, সেও তো মহাহাঙ্গামের ব্যাপার—

চিন্তান্বিত মুখে ক্ষেত্রনাথ চুপ করিলেন। উমানাথ বলিল, এখন কি ওসব হয়? দরকার হলে সকালবেলা না-হয় মানুষ-জন ডেকে সরিয়ে ফেলা যাবে।

বুদ্ধির জাহাজ! ক্ষেত্রনাথ চটিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, খুব কথা বললে তুমি! সকালবেলা লোক জানাজানি হয়ে যাবে না? যা করবার এখুনি করতে হবে।

সহসা যেন সমাধান দেখিতে পাইয়া বলিলেন, এক কাজ কর দিকি, চালির থেকে বালিশ-বিছানা সব পাড়ো। ঐগুলো সিন্দুকের উপর সাজিয়ে রেখে দাও, বাইরে থেকে যাতে দেখা না যায়। মনে হবে, এখানে কেবল বিছানাপত্তোর গাদা করা রয়েছে।

সিন্দুক ঢাকা হইয়া গেল! ক্ষেত্রনাথ আলো ধরিয়া এদিক-ওদিক ভাল করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া খুশি হইলেন। বলিলেন, জগদ্ধাত্রী তো জগদ্ধাত্রী—শ্মশান থেকে সহায়রাম রায় উঠে এলেও আর ধরতে হচ্ছে না।

সিন্দুকের ইতিহাস উমানাথ সমস্ত জানে, এবং আজ জগদ্ধাত্রী যে গ্রামে আসিয়াছে সে কথাও তাহার কানে গিয়াছে। অতএব এখনকার আয়োজন দেখিয়া ব্যাপার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। বলিল, এই তো ভাঙাচোরা খানকতক তক্তা—কী-ই বা জিনিষ—এ দেখে তারপরে কি আর জগদ্ধাত্রী-দিদি দাবি করতে আসবেন? আর করেনই যদি, অনাথা বিধবার জিনিস দিয়ে দেওয়া উচিত।

রুক্ষ দৃষ্টিতে চাহিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, কোনটা কার জিনিষ—সে আমাদের সেকেলে সত্ত্বাসত্ত্বির কথা। তুমি তার কি খবর রাখ যে বলতে এসেছ?

তাড়া খাইয়া উমানাথ নিরুত্তর হইল। ক্ষেত্রনাথ তামাক সাজিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, উমানাথ ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবার উদ্যোগে আছে। কিঞ্চিৎ হাসিয়া সদয় কণ্ঠে কহিলেন, ভায়া আমার মনে মনে ভাবেন, দাদা দেশের লোককে ফাঁকি দিয়ে বিষয়আশয় করেছে। জগদ্ধাত্রী আমায় এক চিঠি দিয়েছিল—দেখেছ?

হ্যাঁ।

আশ্চর্য হইয়া ক্ষেত্রনাথ কহিলেন, কোন চিঠি দেখেছ? কি লেখা আছে বলতো?

দেশে ফিরে অবধি দিদি তো ঢের চিঠি লিখেছেন। সেই যে সহায়রাম কাকার ভিটেবাড়ির দরুন টাকা চেয়ে লিখেছিলেন—

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, ও তো হৃদয় শিখিয়ে দিয়েছে, জগদ্ধাত্রীর হাতের লেখাটা কেবল। আগের চিঠি দেখেছ?

তাতেও ঐ। লিখেছেন, বসতবাড়ির দরুন না দাও—সব সারাতে হবে, তারই সাহায্য বলে দাও গোটা পাঁচেক টাকা।

ক্ষেত্রনাথ অসহিষ্ণু ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, সে আগের কথা বলছি নে তুমি সে সময় বিষ্ণুপুরে বেহালা বাজিয়ে বেড়াও। সহায়রাম রায় মারা গেলেন। জগদ্ধাত্রী সেই সময় দিল্লি থেকে চিঠি লিখেছিল। চিঠি নয় সে আমার দলিল। দেখেছ?

উমানাথ তাহা জানে না? ক্ষেত্রনাথ বলিতে লাগিলেন, গোড়া না জেনে বলতে নেই। বিয়ের পর-বছর জগদ্ধাত্রীকে নিয়ে গেল পশ্চিমে।

সহায়রাম খুড়ো মারা গেলে খবর দিলাম, কেউ এলো না। জগো লিখল, বাবার জিনিষপত্তর যা আছে—তুমি নিও। তুমি নিলেই বাবার তৃপ্তি হবে। ঐ হৃদয়ের বাপ বরদাকান্ত রায় মশায় তখন বেঁচে। তিনি এসে বাদী হলেন, বলেন, আমরা হলাম নিকট-জ্ঞাতি—সহায়রামের অস্থাবর সম্পত্তি আমাদের ডিঙিয়ে ক্ষেত্তোর চাটুজ্জে পর্যন্ত পৌঁছয় কি করে? লোক ডাকাডাকি, হুলস্থুল কাণ্ড—জিনিষের মধ্যে তো খানকতক পিঁড়ি-বারকোষ আর ঐ দেবীদাস রায়ের সিন্দুক ছাইভস্মে বোঝাই। আমারও জেদ—তাই বা ছাড়ব কেন?

ছাইভস্ম? এই অঞ্চলের একটা বিখ্যাত বস্তু এই সিন্দুক, যা লইয়া সহায়রাম রায় পালা বাঁধিয়াছিলেন। এখনও ক্ষেত নিড়াইবার মরশুমে চাষাভূষার মুখে উহার দশ-বিশটা কলি মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায়। ক্ষেত্রনাথ সিন্দুক খুলিয়া দেখেন নাই, খুলিলে হয়তো দেখিতেন ছাইভস্ম নয়—তাল তাল সোনা ফলিয়া আছে। সহায়রামের গানের দু'টি ছত্র উমানাথের মনে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল:

সিন্দুকের মধ্যে সোনার বৃক্ষ, বৃক্ষে ফলে সোনা—
আকাশের চাঁদ দিব পেড়ে (ও বাপ) সিন্দুক খুলিব না।

নিজের ঘরে আসিয়া উমানাথ দেখিল, তরঙ্গিণী দুয়ার ভেজাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। একটা জানলা খুলিয়া দিতেই টাটকা বুনো ফুলের গন্ধ আর সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুকের পালার কথাগুলি একটির পর একটি যেন বাহিরের ঘন অন্ধকারের মধ্য হইতে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। কত রাত্রি অবধি সে আপনার মনে গুন-গুন করিতে করিতে অবশেষে একসময় ঘুমাইয়া পড়িল। ঢাকা দেওয়া খাবার পড়িয়া রহিল, খাওয়া হইল না।

দেবীদাস রায় সম্পর্কে জগদ্ধাত্রীর ঠাকুরদাদা—সহায়রাম রায়ের কি রকমের খুড়া হইত। বাপ ছিলেন দশকর্মান্বিত ব্রাহ্মণ, দু-দশ ঘর যজমানের কল্যাণে কায়ক্লেশে সংসার চলিত। কিন্তু দেবীদাস ওপথে গেল না, দিনরাত কেবল কুস্তি লড়িয়া লাঠি ভাঁজিয়া ছোটলোকের ছেলেদের সঙ্গে বেড়াইত। মজা টের পাইল বাপের জীবন অন্তে। বয়স তাহার তখন কুড়ি-বাইশ। নিত্যকর্ম-পদ্ধতি খুলিয়া অবাধ্য স্মরণশক্তিকে বশে আনিবার রীতিমত প্রয়োজন পড়িয়া গেল। ঠিক এই সময়ে এক যজমান-বাড়ি কি-একটা ব্যাপারে যৎপরোনাস্তি অপদস্থ হইয়া আসিয়া মনের ঘৃণায় দেবীদাস নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। লোকে বলিত, নবদ্বীপের কোন টোলে পড়িতে গিয়াছে। পড়াশুনা কতদূর কি

হইয়াছিল জানা নাই—মাস ছয়েকের মধ্যেই একদিন সকালবেলা দেখা গেল, দেবীদাস ফিরিয়া আসিতেছে, সঙ্গে দু'খানা গরুর-গাড়ি। একটা হইতে নামিল বেশ গোলগাল-গড়ন হাসিমুখ একটি বধূ, অন্যটি হইতে নামাইল ঐ বিশালকায় সিন্দুক।

মেয়েরা আড়ি পাতিতে গিয়া দেখিয়াছে, নববধূ গভীর রাত্রি পর্যন্ত প্রদীপের সামনে তালপাতার পুঁথি লইয়া, নিবিষ্ট মনে বসিয়া থাকিত, আর দেবীদাস খাটের অপর প্রান্তে অনেকটা দূরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ঘুমাইত কি, কি করিত কে জানে! মোটের উপর বোঝা যাইত, সরস্বতী-সম্পর্কিত ব্যাপারগুলা তখনও দেবীদাস সসম্ভ্রমে পাশ কাটাইয়া চলে।

তারপর কেমন করিয়া বলিতে পারি না, বধূর সঙ্গে ভাব জমিয়া আসিল। এক একদিন রাত্রে টিপিটিপি ঘরে ঢুকিয়া দেবীদাস অধ্যয়ন-রত বধূর যৌবনস্নিগ্ধ তদ্‌গত মুখের দিকে প্রলুব্ধ চোখে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিত। তবু সম্বিত হয় না দেখিয়া একটানে বালিশ বিছানা বধূ ও পুঁথিসুদ্ধ খাটখানি জানলার দিকে হুড়মুড় করিয়া টানিয়া লইত, বধূ চমকিয়া সলজ্জভাবে তাড়াতাড়ি বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইত, মুখে ঈষৎ বিরক্তির ছায়া। তখনই সে ভাব সামলাইয়া একটু হাসিয়া বলিত, অমনি করতে হয়! এসে সাড়া দাওনি কেন?

দেবীদাস হাসিমুখে চাহিয়া থাকে।

বধূ বলিত, খাট সমেত টেনে নিলে, তোমার গায়ে জোর তো খুব।

দেবীদাস সগর্বে পেশীবহুল সুস্পষ্ট হাত দু'খানি নাড়িয়া বলিত, ভারি তো! এতে আর জোরটা কি লাগে? আচ্ছা ঐ সিন্দুকটাও চাপিয়ে দাও খাটের উপর। তারপর যেমন বসেছিলে তেমনি থাকো। দেখ—

আবার হাসিয়া বলিত, এ বসে বসে কেবল তালপাতা নাড়া নয়।

বিস্ময়ে বধূর চোখ কপালে উঠিত: সত্যি পারো?

দেখ—বলিয়া দেবীদাস বধূকে ছোট্ট একটি তুলার পুঁটুলির মতো শূন্যে তুলিয়া ধরিত। তারপর লুফিয়া টানিয়া বুকের মধ্যে আনিতে গেলে বধূ কাঁপিয়া চেঁচাইয়া উঠে।

তখন মাটিতে নামাইয়া দিয়া হাসিয়া দেবীদাস বলে, ভয় পেয়েছ বড্ড? তারপর সদয় কণ্ঠে বলে, আর ভয় দেবো না।

একদিন দুপুররাত্রে দু'জনে ঘুমাইয়া আছে। খুটখুট শব্দ হইতেছে। বধূ জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে স্বামীর বুকের মধ্যে লুকাইল। ফিস-ফিস করিয়া কহিল, শুনছ?

দেবীদাসেরও ঘুম ভাঙিয়াছে। আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিল। বলিল

চোর সিঁদ কাটছে বোধহয়। কিছু ভয় নেই, তুমি আমায় ছাড় তো একটু লক্ষ্মী—

অনেক করিয়া বধূকে সে ঠাণ্ডা করিল।

খন-খন ক্স-ক্স ঝরিয়া পড়িতেছে। ছোট সরু জানলা, তাহারই নিচে সিঁদ কাটিতেছে। অন্ধকারের মধ্যে অনেকক্ষণ তাহারা জানলার পাশে বসিয়া আছে। ক্রমে গর্ত কাটা হইয়া গেল। খানিকক্ষণ চুপচাপ, তারপর একটা কালো মাথা সিঁধের মুখে ভিতরে আসিতেছে।

বধূ ব্যস্ত হইয়া আঙুল দিয়া দেখাইল: ঐ—

চুপ—বলিয়া দেবীদাস তাহাকে থামাইয়া দিল। বলিল, মানুষ নয়, ও লাঠির মাথায় কালো হাঁড়ি। আগে ঐ পাঠিয়ে পরখ করে, কেউ পাহারা দিয়ে বসে আছে কি-না। চুপ, চুপ!

হাঁড়ি ঘরের মধ্যে অনেকখানি আসিয়া এদিক-ওদিকে নড়িয়া চড়িয়া আবার বাহির হইয়া গেল।

আবার চুপচাপ। তারপর দেখা গেল, অতি সন্তর্পণে গর্তের আলগা মাটির উপর দিয়া ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিতেছে সত্যকার মাথা। অন্ধকারে দেবীদাসের মুখে তীক্ষ্ণ হাসি খেলিয়া গেল। চোর আর একটু আসিতেই তাহাকে জাপটাইয়া ধরিয়া হো-হো করিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

নিতান্ত ছেলেমানুষ চোর, একেবারে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল: আমি কিচ্ছু জানিনে ঠাকুরমশাই। আমায় ওরা ঠেলে পাঠিয়েছে, আমি নতুন লোক—

ওরা কারা?

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল, জন দুই-তিন দাওয়া হইতে উঠানে লাফাইয়া পড়িল।

দেবীদাস হাসিয়া বলিল, যা হতভাগা বেকুব বেল্লিক। আর কাঁদিস নে, যা চলে—

বলিয়া দোর খুলিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া পলায়মান একটি আবছা মূর্তি লক্ষ্য করিয়া দেবীদাস ছুটিল।

বাড়ির সীমা ছাড়াইয়া বিল। লোকটি ছুটিতে ছুটিতে বিলে গিয়া পড়িল। শুকনার সময় বিলে জলকাদার সম্পর্ক নাই। দেবীদাস তীরের মতো ছুটিয়াছে। কাছাকাছি আসিয়া বলিল, আর পালাবি কতদূর? বিলে এসেই যে ভুল করলি, বেকুব গাধা কোথাকার! এখানে গা-ঢাকা দিবি কোথায়?

কিন্তু সে ভাবনা ভাবিবার আগেই চোর একটা উঁচু আল বাধিয়া পড়িয়া

গেল। দেবীদাস কাছে আসিয়া পড়িল; কিন্তু গায়ে হাত দিল না। বলিল, এখন ধরব না। ওঠ্ বেটা, ছোট্—শেষে তুই ভাববি পড়ে না গেলে দেবীদাস রায় ধরতে পারত না।

লোকটি কিন্তু উঠিল না, পড়িয়া পড়িয়াই কাতরাইতে লাগিল। পড়িয়া গিয়া তাহার পা ভাঙিয়াছে। অতএব দৌড়িয়া ধরিবার বাসনা স্থগিত রাখিয়া দেবীদাস আপাততত চোরকে কাঁধে করিয়া বাড়ি আসিল। দিন তিনেক ধরিয়া স্বামী-স্ত্রীতে বিস্তর তদ্বির করিয়া তাহাকে খাড়া করিয়া তুলিল।

একদিন বধূ সেই চোরকে জিজ্ঞাসা করিল—কি মতলবে এসেছিলি বাবা? জানিস তো, আমরা ভিখিরি বামুন—

অনেক রকমে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানা গেল, এদেশে গুজব রটিয়াছে—দেবীদাস রায় বিবাহ করিয়া সিন্দুক ভরিয়া বিস্তর টাকা আনিয়াছে। লোভে পড়িয়া অনেকে তাই নিশিরাতে এই বাড়ি হাঁটাহাঁটি করে।

বধূ বলল, টাকা নয় রে বাবা সোনার তাল। সিন্দুকে সোনার গাছ আছে—তাল তাল সোনার ফলন হয়। সে আমি দেখাব না তো—কিছুতেই না।

তারপর হাসিতে হাসিতে সিন্দুকের ডালা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিল। অগণিত তালপাতার পুঁথি। তাহারই কয়েক বোঝা তুলিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সিন্দুকের ভিতর দেখাইল। অজস্র পুঁথি, তা ছাড়া আর কিছু নাই।

বধূ বলিল, আমার বাবা মস্তবড় সার্বভৌম পণ্ডিত, মরবার সময় সিন্দুক বোঝাই এই সব ধনরত্ন দিয়ে গেছেন। এর এক টুকরাও আমি কাউকে দিতে পারব না বাপু।

এক বছরের আগ-পাছ স্বামী-স্ত্রী অপুত্রক মরিল। দেবীদাসের স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি সহায়রামে বর্তাইল। সহায়রামের পৈতৃক তেজারতির কারবার ছিল,' কিন্তু এক দুরারোগ্য রোগে সমস্ত মাটি করিয়া দিল। সহায়রাম পালা লিখিতেন—যাত্রার পালা, কীর্তন-কথকতার পালা—দুই কানে যাহা শুনিতেন, পালায় বাঁধিয়া বসিয়া থাকিতেন। বন্ধকি কাগজপত্র অন্দরে গিন্নির বাক্সে তালাবন্দি হইয়া থাকিত, দেবীদাস রায়ের সিন্দুকটি কেবল সহায়রামের নিজস্ব সম্পত্তি—ওটি থাকিত বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে। ভোরবেলা সকলের আগে উঠিয়া আসিয়া সিন্দুকের উপর বসিয়া বসিয়া তিনি সুর ভাঁজিতেন। খাগের কলম ও হলদে-কাগজের খাতা বাহির হইত। লোকজন আসিতে শুরু হইলে খাতা-কলম আবার সিন্দুকে ঢুকিত।

প্রৌঢ় বয়সে সহায়রামকে বড় শোকতাপ পাইতে হয়। তিনটি ছেলে ওলাওঠায় মরিয়া গিয়া একেবারে নির্বংশ হইলেন। আগে যা-একটু কাজকর্ম দেখিতেন, ইহার পরে তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল—বড় একটা বাড়ির মধ্যেই আসিতেন না। সমস্ত দিন ও অনেক রাত্রি অবধি সিন্দুকের উপর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। এক এক সময়ে গানের খাতা খুলিয়া সুর ধরিতেন। সুর খুলিত না, গলা আটকাইয়া যাইত, চোখের জল খাতার উপর টপ-টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িত।

এই সময়ে জগদ্ধাত্রীর জন্ম হয়।

মেয়ের যতদিন বিবাহ হয় নাই, মেয়ে ছাড়া কিছুরই তিনি খোঁজ রাখিতেন না। গিন্নি মারা গেলেন, মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল, সহায়রামের যাহা-কিছু ছিল মেয়ের বিবাহে উজাড় করিয়া দিলেন—দিলেন না কেবল ঐ সিন্দুক। নিরালা খোড়ো-ঘরে কর্মহীন বৃদ্ধের জীবনান্তকাল পর্যন্ত ঐ সিন্দুক ও গানের খাতা সম্বল হইয়া রহিল। উমানাথ সেই সময়ে রাতদিন বুড়ার সঙ্গে লাগিয়া থাকিত। তার অনেক দিন পরে সহায়রামের মৃত্যুর পর তাঁহাকেই গুরু বলিয়া ভনিতা দিয়া উমানাথ কবির দলে গান বাঁধিতে শুরু করিয়াছে।

পরদিন বেলা বোধকরি প্রহরখানেক হইবে, জগদ্ধাত্রী সন্তর্পণে পা ফেলিতে ফেলিতে ভিতরের উঠানে দাঁড়াইল। পরনে তাহার অতি জীর্ণ একখানি মটকার থান। স্নান হইয়া গিয়াছে, ভিজা চুলের উপর ফেরতা দিয়া আঁচল জড়ানো।

কই গো, মানুষজন কোথা ?

প্রথমটা জবাব আসিল না। আরও দু-একবার ডাকাডাকি করিতে তরঙ্গিণী বাহিরে আসিল। দাওয়ায় পিঁড়ি পাতিয়া দিয়া মুখ কালো করিয়া প্রণাম করিতে গেল। জগদ্ধাত্রী তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া বলিল, ছুঁয়ে দিও না দিদি। তোমাদের কর্তাদের সঙ্গে কাজ রয়েছে, কাজ সেরে এই পথে অমনি মঠবাড়ির মচ্ছবে যাব। তুমি তো উমানাথের বউ—বাড়ির গিন্নি হয়েছ এখন। দেখি—দেখি—সেদিনকার উমানাথ, তার আবার বউ, সে হল গিন্নিঠাকরুন !

বলিয়া হাসিতে গিয়া তেমন করিয়া হাসিতে পারিল না। বলিল, কী সুন্দর সোনার সংসার আগলে বসে আছিস বউ, দেখে যে হিংসে হয় !

সেজবউ, ও ছোটবউ ঘাটে গিয়াছিল। সমস্ত ঘাটের পথ বকবক করিতে

করিতে এখন আসিয়া রান্নাঘরে কাঁখের কলসি নামাইল। অচেনা মানুষ দেখিয়া কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া গেল। জগদ্ধাত্রী ডাকিল : ইদিকে আয়, ঘোমটা দিচ্ছিস যে বড়! আমায় কুটুম ঠাওরালি নাকি? মুখ তোল্—তোল্ শিগগির—

ঘোমটা টানিয়া শান্ত সভ্যভব্য হইয়া থাকা ছোটবউর পক্ষেও দুরূহ ব্যাপার। মুখ তুলিয়া একবার চাহিয়া আবার সে ঘাড় নামাইল।

জগদ্ধাত্রী বলিল, আমার যে ছোঁবার জো নেই! ওগো ও গিন্নিঠাকরুন, এখানে এসে দে দিকি এই দুষ্টু মেয়েদুটোর পিঠে দুটো কিল বসিয়ে।

তরঙ্গিণী আসিয়া উভয়ের ঘোমটা খুলিয়া দিল। খুশি হইয়া জগদ্ধাত্রী বলিতে লাগিল, বাঃ বাঃ, চাঁদের মতো মেয়ে—লক্ষ্মী-সরস্বতী দু'টি বোন। হ্যালা ও মেয়েরা, টিপিটিপি হাসছিস যে বড়! জানিস আমি কে?

বধূরা বোকা নয়। ছোটবউ বলিল, আপনি পিসিমা—

কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া জগদ্ধাত্রী বলিল, জবাব শোন একবার। পিসিমা! গুণের নিধি শ্বশুরঠাকুর বলে দিয়েছেন বুঝি? কেন, শুধু মা হলে দোষটা কি? হ্যাঁরে, মা বেঁচে আছেন তো?

ছোট বউ ম্লানমুখে তাকাইল।

জগদ্ধাত্রী বলিল, নেই? খেয়ে-দেয়ে অবসর হয়েছিস?

নানা কথায় বেলা বাড়িয়া আসিল। বহুকাল পূর্বে যখন এ-যুগের এই সব নূতন মানুষের দল পৃথিবীকে দখল করিয়া বসে নাই, তখন এই গ্রামের মধ্যে এই বাড়ির চতুঃসীমায় এই উঠানের ধুলার উপর অতীতের আর এক দল কিশোর-কিশোরী দিনের পর দিন যে-সব হাসি ও অশ্রু ছড়াইয়া বেড়াইত, সেই ক্ষীণ বিস্মৃত কণিকাগুলি একজনে কুড়াইয়া ফিরিতেছে, আর দুইজন তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া একেবারে মগ্ন হইয়া বসিয়া আছে। হঠাৎ বাহিরে অনেকগুলি গলার আওয়াজ শুনিয়া জগদ্ধাত্রী চুপ করিল।

ছোটবউ খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল : গল্পে গল্পে ফাঁকি দিয়ে কত বেলা করে দিলাম, আপনি কিচ্ছু টের পান নি। এত বেলায় মচ্ছবে গিয়ে আর হবে কি?

জগদ্ধাত্রী উত্তর করিল না। কান পাতিয়া ক্ষণকাল বাহিরের কথাবার্তা শুনিয়া একসময়ে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, হৃদয়ের গলা চিনিস তোরা? ও কি হৃদয় কথা বলছে? উঁহু, এখনও এলো না, আচ্ছা মানুষ!

মেজবউ বলিল, আপনি বসে বসে গল্প করুন মা, আমি কাপড় ছেড়ে জল-টল এনে দিচ্ছি, তারপর রান্না চাপিয়ে দেবেন। বেশ তো হচ্ছিল, আপনি ব্যস্ত

হয়ে উঠে পড়লেন।

মৃদু হাসিয়া জগদ্ধাত্রী বলিল, গল্প করব বলে আসিনি মা, রান্না করব বলেও আসিনি—এসেছি কাজে। হৃদয়ই মুশকিল করল। ক্ষণপরে বলিল, বাড়িতে ট্যা-ভ্যা করছে না—তোদের বুঝি সে পাট হয় নি এখনও ?

ছোটবউ ভালমানুষের মতো মেজবউকে দেখাইয়া কহিল, হয়েছে মেজদির একটা—সাত বছরের খোকা। মেজদি নিজে এবার সতর্ক হয়ে পড়েছে।

তাহার কানের পাশে কতকগুলি চুল উড়িতেছিল, খপ করিয়া তাই ধরিয়া আচ্ছা করিয়া টানিয়া মেজবউ ছোটবউকে শাস্তি দিল। সম্পর্কে ছোট-জা, বয়সেও বোধকরি কিছু ছোট, শাস্তির কষ্টে সে হাসিয়া ফেলিল।

মেজবউ বলিতে লাগিল, ছেলে একলা আমার নয় মা, ওর-ও। বল তুই আভা, ছেলে তোর নয়। বল—

আভা তাহা বলিতে পারিল না। বলিল, ছেলে আমাদের তিন শাশুড়ি-বউর। বলিয়া রান্নাঘরে তরঙ্গিণীর উদ্দেশে হাত তুলিয়া দেখাইল।

বলিতে লাগিল, বড়-জা মারা যাবার পর থেকে নিতু থাকত মামার-বাড়ি। গেল বছর এখানে এসেছে। সেই থেকে আদর দিয়ে দিয়ে মেজদি ওকে যা করে তুলেছে—

মেজবউ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল : আর তুই বড্ড ভাল, না ? মিথ্যে কথা বলিসনে আভা, তা-হলে তোর সমস্ত কীর্তি বলে দেবো এক্ষুনি। জগদ্ধাত্রীর দিকে চাহিয়া হঠাৎ আর এক প্রশ্ন করিল : আপনার ছেলেমেয়ে নেই ?

স্মিত মুখে জগদ্ধাত্রী কহিল, কে বললে নেই ? এই তো কতগুলি রয়েছিস তোরা।

উঠানের প্রান্তে ডালপালায় আচ্ছন্ন ছোট একটি পেয়ারা গাছ। সহসা নজরে পড়িল, গাছের নিচের দিককার ডালপালাগুলি ভয়ানক আন্দোলিত হইতেছে। সর্বাগ্রে নজর পড়িল মেজবউর।

কে রে ? দু-একটা কুশি পড়েছে, হতভাগাদের জ্বালায় থাকবার জো নেই। কে রে তুই, কথা বলিস নে ?

ছোটবউ আগাইয়া উঁকি দিয়া দেখিয়া কহিল, আবার কে ! সেই ডাকাত। ইস্কুল-টিস্কুল এর মধ্যে হয়ে গেছে তোমার ? কখন এসে সুড়-সুড় করে গাছে চড়ে বসেছ—নেমে এসো এক্ষুনি।

ডাকাত বিনাবাক্যে নামিয়া আসিল। বাড়ির মধ্যে একমাত্র ছোটকাকীকে যে যৎকিঞ্চিৎ সমীহ করিয়া থাকে।

ছোটবউ বলিতে লাগিল, সেদিন মানা করে দিইছি, তবু ডালে ডালে

হনুমানের মতো লাফাতে লেগেছে। হাত-পা ভেঙে পড়ে মরবে যে কোন দিন—

উচ্চকণ্ঠে পাড়া জানাইয়া বিশেষত একজন বাহিরের লোকের সামনে, এই প্রকার তুলনামূলক আলোচনায় নিতাই অপমান জ্ঞান করিল। ঘাড় ফিরাইয়া হাত তুলিয়া বলিল, মারব।

ছোটবউ হাসিয়া বলিল, ইস্—কত বড় মুরোদ! আয় দিকি কাছে এগিয়ে, কে কাকে মারে! আয়—

নিতাই আর আগাইল না, তা বলিয়া পরাজয় স্বীকারও করিল না। স্বস্থানে দাঁড়াইয়া বীরোচিত ভঙ্গিতে পুনশ্চ কহিল, মারব।

জগদ্ধাত্রী উঠানে নামিয়া আসিল। কহিল, গুরুজনকে মারতে চাচ্ছ, এই তোমার বুদ্ধি হয়েছে খোকা? ছিঃ—

এবারে খোকার নজর পড়িল জগদ্ধাত্রীর উপর। মারব—বলিয়াই বোধ করি তাহার মনে হইল, ভয় দেখাইবার এই মামুলি কথায় তেমন আর জোর বাঁধিতেছে না। সহসা আর এক পন্থা ধরিল। বলিল, দে, আমায় রেলগাড়ি দে—

কাল যে দিলাম।

সে ছাই গাড়ি। কলের গাড়ি দিবি বলেছিলি, দে এক্ষুনি।

জগদ্ধাত্রী হাসিতে হাসিতে বলিল, রেলগাড়ি আমি গড়াই নাকি? মেলা থেকে কিনে দেবো।

অতএব জগদ্ধাত্রী নিতান্তই বেকাদায় পড়িয়া গিয়াছে। দে এক্ষুনি—বলিতে বলিতে উদ্যত হাতে নিতাই তীরবেগে ছুটিয়া আসিল।

ছোটবউ তাড়া দিয়া উঠিল: খবরদার, ছুঁয়ে দিও না ওঁকে। শুদ্ধ কাপড়চোপড় পরে মঠবাড়ি যাচ্ছেন।

নিতাই ছুঁইল না। থুঃ থুঃ—করিয়া মুখের সমুদয় চিবানো পেয়ারা জগদ্ধাত্রীর গায়ে ঢালিয়া দিল। দিয়াই পলাইতেছিল, জগদ্ধাত্রী ধরিয়া ফেলিয়া ঠাস ঠাস করিয়া পিঠে দিল দুই চাপড়। প্রবল চিৎকারে নিতাই আছড়াইয়া মাটিতে পড়িল।

তরঙ্গিণী কোথায় ছিল, হাঁ-হাঁ করিয়া আসিল। সকলের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া বিনাবাক্যে সে ছেলে কাড়িয়া লইয়া গেল। ঘরের মধ্যে গিয়া নিতুর কান্না থামিল। তাহাকেই সম্বোধন করিয়া তরঙ্গিণী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিতে লাগিল, আর যদি কারও কাছে যাস হতভাগা ছেলে, মেরে একেবারে খুন করে ফেলব। শত্তুরের হাতে ছেলে ফেলে দিয়ে সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখে—

তাহার পর কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধতা। কোন দিক দিয়া কোন সাড়া আসিল না দেখিয়া এবারে তরঙ্গিণী ঘরের আড়া-খুঁটিগুলিকেই শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল, মিছরির ছুরি! গ্রামসুদ্ধ মানুষ ডাকাডাকি, কি সমাচার?—না, জমিদারি-তালুকদারি সমস্ত ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে, তার শালিশি হবে। আবার ইদিকে বাড়ির ভিতরে এসে কত রঙ্গরস! ছেলে খুন করার মতলব—ধনে-প্রানে মারতে এসেছে আমাদের।

মেজবউ কখন উঠিয়া গিয়াছে। ছোটবউ মুখ লাল করিয়া নখ খুঁটিতে লাগিল। জগদ্ধাত্রী কথা কহিল, কিন্তু কণ্ঠস্বরে উত্তাপ নাই। বলিল, ছেলেকে অত আদর দিও না বউ। একটু শাসন করলে ছেলে খুন হয়ে যায় না।

ঘরের মধ্য হইতে জবাব আসিল: পেটের ছেলেকে শাসন করুক গিয়ে লোকে—

ম্লান হাসি হাসিয়া জগদ্ধাত্রী বলিল, তা যে নেই।

মুখের কথা কাড়িয়া তরঙ্গিণী বলিতে লাগিল, ভগবান দেয় নি। সে অন্তর্যামী, সব বোঝে—খুনে মেয়েমানুষের কোলে দেবে কেন ছেলে? যে যেখানে ছিল সব শেষ করে এখন আমার সংসারে নজর দিতে এসেছে।

কি, কি বললি? জগদ্ধাত্রী বাঘিনীর মতো উঠিয়া চক্ষের পলকে উঠানের এই প্রান্ত অবধি আগাইয়া আসিল। বলিতে লাগিল, বুঝি গো বুঝি, খাওয়া-জিনিষ উগরে দিতে বড্ড লাগে। কিন্তু এত দেমাক! দর্পহারী আছেন, এখনও চন্দ্রসূয্যি আছে। আমি আর কি বলব!

গলা আটকাইয়া আসিল। সামলাইয়া লইয়া বোধকরি যাহাতে সেই দর্পহারীর কান পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে এমনি উচ্চকণ্ঠে কহিতে লাগিল, ছেলের দেমাকে মরে যাচ্ছিস—তবু যদি নিজের ছেলে হত! খোঁটা দেবার জিনিষ এ নয় বউ, এক দণ্ডে কার কি হয়ে যায় কেবল ঐ উপরওয়ালা জানে।

মুহূর্তের জন্য জগদ্ধাত্রীর বোধকরি একটি অতি চরমক্ষণের কথা মনে পড়িয়া গেল। বিয়ে তখন তার খুব বেশি দিন হয় নাই। নূতন গিন্নীপনার আনন্দে লজ্জায় দিনগুলি উড়িয়া চলিয়া যায়। জগদ্ধাত্রী ছ-মাসের অন্তঃস্বত্বা। স্বামী কণ্ট্রাক্টরি কাজ করিতেন—দুপুরের পর দিব্য পান চিবাইতে চিবাইতে ভালমানুষ বাহির হইয়া গেলেন, ঘণ্টা দুই পরে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিল। সর্বাঙ্গ রক্তে ভাসিতেছে, চক্ষু মুদ্রিত, উঁচু পাঁচিলের উপর হইতে পড়িয়া গিয়া প্রাণটুকু ধুকধুক করিতেছিল—বাড়ি আনিবার পথে তাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। জগদ্ধাত্রী আছাড় খাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। একবার জ্ঞান

হয়, আবার তখনই অজ্ঞান হইয়া পড়ে। পরের দিন প্রসব করিল অপরিণত একটি রক্তপিণ্ড, মানব-শিশু বলিয়া তাহাকে চিনিবার জো নাই। মিছাকথা নয়—মিছাকথা বলে নাই তরঙ্গিণী। মা হইয়া নিজের শিশুকে সত্যই সে খুন করিয়াছে। তারপর কতদিন গিয়াছে, এখনও মাঝে মাঝে সেই সব মনে পড়িয়া দৃষ্টি তাহার ঝাপসা হইয়া আসে।

বাহিরে তখন অনেকগুলি কণ্ঠ চিংকারের যেন প্রতিযোগিতা চালাইয়াছে। হৃদয় ব্যস্ত হইয়া আসিয়া ডাকিল: দিদি, আসুন তো শিগ্গির। তারপর হাসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিতে বলিতে চলিল, আচ্ছা এক মজা হয়েছে। বিপিন চক্কোত্তি-টক্কোত্তি সবাই হাজির, তারই মধ্যে ক্ষেত্তোর-দা আপনাকে সাক্ষি মেনে বসেছেন। এইবার আপনি সব কথা বলুন গিয়ে।

ক্লান্তি জগদ্ধাত্রীর মুখের উপর বিস্তীর্ণ হইয়াছে। করুণকণ্ঠে বলিল, ওর মধ্যে আর আমাকে কেন? আমি বাইরের দিকে থাকব। তুমি যা-হয় কর গিয়ে হৃদয়, ঐ গণ্ডগোলে আমাকে টেনো না।

সে কি? হৃদয় আশ্চর্য হইয়া কহিল, গণ্ডগোল কোথায়? এত ঠিকঠাক করে শেষকালে পিছিয়ে গেলে চলে?

বলিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল। বলিতে লাগিল, আমার দিদি এক কথা। বাটটি টাকা দেবো, নগদই দেবো—কাল চান কালই পাবেন। আপনি গিয়েই ঘর মেরামত আরম্ভ করতে পারবেন। কিন্তু দশজনের মোকাবেলা জমিটা নির্গোল হওয়া চাই।

একটু চুপ থাকিয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া আবার বলিল, বাপের-বাড়ির গ্রাম—কার সামনে বেরুতে লজ্জা হচ্ছে ঠিক করে বলুন তো? ক্ষেত্তোর-দা রয়েছেন বলে বুঝি?

তীক্ষ্ণস্বরে জগদ্ধাত্রী বলিয়া উঠিল, আমি কাউকে গ্রাহ্য করি নে। চলো—

গ্রামের অনেকেই আসিয়াছেন। বিপিন চক্রবর্তী মহাশয় বয়সে সকলের বড়—এতক্ষণ যা কথাবার্তা হইয়াছে, জগদ্ধাত্রীকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন। মাঝখানে হৃদয় বাধা দিয়া বলিল, ও সেটেলমেণ্টের কথা ধরবেন না আপনারা ট্যাকে দু-পয়সা গুঁজতে পারলে 'হয়'কে স্বচ্ছন্দে 'নয়' করা যায়। সহায়রাম জ্যেঠার বসতবাড়ি ছিল, সিদ্ধ-নিষ্কর। তিনি মারা যাবার পর ঘরদোর পড়ে গেল, ভিটের উপর একহাঁটু জঙ্গল হয়ে পড়ল। তারপর ক'বছর পরে ক্ষেত্তোর-দা ওঁর উত্তর-বাগের বেড়াটা ঘুরিয়ে ও-জমিটাও ঘিরে ফেললেন। আমি বললাম, ক্ষেত্তোর-দা, কাণ্ডটা কি? জবাব দিলেন: ওরা দেশে-ঘরে এসে যখন দাবি করবে তখন ছেড়ে দেব। পোড়ো জায়গাটুকু বেড়া দিয়ে নিজে

ওদিকে মজা-দীঘি পড়ে যায়—দু-পাশে আর বেড়া বাঁধতে হয় না, অনেক খরচের আসান হয়। তখন কেউ আর বাদী হয় নি, খামোকা ঝগড়া করতে কার মাথাব্যথা পড়েছে? এবার জগদ্ধাত্রী দিদি তাঁর পৈতৃক ভিটে চাচ্ছেন—অনাথা বেওয়া মানুষ, আপনারা দশজনে বিচার করুন।

ক্ষেত্রনাথ গর্জন করিয়া উঠিলেন: মিথ্যে কথা!

বিপিন চক্রবর্তী বলিলেন, তা হলে তুমি যা বলবে, বলো ক্ষেত্তোরনাথ—

ক্ষেত্রনাথ রুদ্ধকণ্ঠে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, আমি কিছু বলব না চকোত্তি মশায়। আমি তো বলেছি—আমি এক কথাও বলব না। ও-ই বলুক।

উত্তেজনার বশে স্বর কাঁপিতে লাগিল। বলিলেন, হৃদয়ের সঙ্গে যোগসাজস করে বড় আজ বাদী হতে এসেছে, ও বলুক আজ আপনাদের দশজনের সামনে। ওর বিয়ের পরদিন, ফাল্গুন মাসের সতের তারিখ—তারিখটা পর্যন্ত আজো মনের মধ্যে আঁকা রয়েছে—কুলীন বরযাত্রীরা বেঁকে বসল, মর্যাদা না পেলে খাওয়া-দাওয়া করবে না। সহায়রাম-খুড়ো চোখে অন্ধকার দেখলেন—সেই সময় কে রক্ষে করল? বলো জগদ্ধাত্রী, বলো—মনে আছে সে সব দিনের কথা? আমার মা'র বাজুবন্ধ কেশব দত্তর কাছে বন্ধক দিয়ে চল্লিশ টাকা এনে দিলাম। সহায়রাম খুড়ো আমার হাতখানা ধরে কেঁদে ফেললেন। বললেন, মেয়ে আমার রাজার ঘরে গেল—সে কিছু নিতে-থুতে আসবে না। তোমার এ টাকা শোধ করতে পারি ভাল, না পারি জমাজমি বাড়ি-ঘর-দোর সমস্ত তোমার। থাকত যদি কেশব দত্ত বেঁচে, সে বলত। এখন ও-ই বলুক।

জগদ্ধাত্রী আগড়ের বাঁশ ধরিয়া অন্য দিকে চাহিয়া ছিল, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, বলো সব। সহায়রাম-কাকা মাদুরে বসে, তুমি খাটের পাশে দাঁড়িয়েছিলে লাল বেনারসি পরে। অনেক বরযাত্রী বউ দেখতে এলো সেই সময়—বলো তুমি যে সত্যি নয়। আমি এককথায় সমস্ত ছেড়ে দিচ্ছি।

জগদ্ধাত্রী কথা বলিল না, তেমনি মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জবাব দিল হৃদয়। বলিল, আমরা শুনেছি, সে টাকা শোধ হয়ে গেছে। তা ছাড়া চল্লিশ টাকায় অতটা নিষ্কর জমি হতে পারে না।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, তোমরা স্বপ্নে শুনেছ। চল্লিশ টাকা কি বলছ—কেশব দত্তর কাছ থেকে বন্ধক ছাড়িয়েছিলাম তার ডবল আশি টাকা দিয়ে। তার উপর আরও কত বছর হয়ে গেছে, সুদের সুদ তস্য সুদ ধরব না? কত টাকা হয় তা হলে? সিকিপয়সা রেহাত দিচ্ছি নে।

একটু থামিয়া বলিতে লাগিলেন, আজ হৃদয় তোমার বড় আপন হল

জগদ্ধাত্রী, কোথায় ছিল সেদিন ওরা? ওর বাপ বরদাকান্ত তো সেইখানে ছিলেন, চল্লিশটা পয়সা দিয়ে কোন সুহৃৎ সেদিন সাহায্য করে নি।

জগদ্ধাত্রী একবার হৃদয়ের মুখের দিকে চাহিল। তারপর বলিল, বাবা কেশব দত্তর টাকা শোধ করে দিয়েছিলেন।

অগ্নিদৃষ্টিতে চাহিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, তোমার কাছে টেলিগ্রাফ হয়েছিল বুঝি?

বাবা চিঠি লিখেছিলেন।

দেখাও চিঠি।

জগদ্ধাত্রী একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, এত দিনের চিঠি—তাই কি থাকে?

ক্ষেত্রনাথ অধীর কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, থাকে, থাকে—সত্যি হলে সমস্ত থাকে। আমার কাছে টুকরো কাগজখানি অবধি রয়েছে। পাঠশালে যে দাগা বুলিয়েছ তা পর্যন্ত বের করে দেখাতে পারি।

বলিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, এত কথা শিখিয়ে দিতে পেরেছ হৃদয়, আর একখানা চিঠি যেমন-তেমন করে জোগাড় করে রাখতে পার নি?

হৃদয়ও মহাক্রোধে সমুচিত জবাব দিতে যাইতেছিল, নিবারণ মজুমদার মধ্যবর্তী হইয়া কলহ থামাইয়া দিল। নিবারণ কহিল, মোটের উপর আপনি কিন্তু ঠকে গেলেন চাটুয্যেমশায়, জগদ্ধাত্রী ঠাকরুনকে সাক্ষি মেনেছিলেন আপনিই।

ক্ষেত্রনাথ সে কথা আমলেই আনিলেন না। হাতমুখ নাড়িয়া কহিতে লাগিলেন, কিসের ঠকা? ও মিথ্যেবাদী, মহাপাপী—যা বলবে তাই হবে নাকি? আইন-আদালত রয়েছে, মামলা করে নিকগে। আমার আজ চল্লিশ বছরের দখল, গ্রামের সমস্ত লোক দেখছে, মিথ্যে বলে ও তো কেবল নিজের পরকাল খোয়ালো—আমার কি!

নিবারণ কহিল, গ্রামের সমস্ত লোক আপনার দিকে সাক্ষি দেবে, তা-ই বা কি করে জানলেন?

ক্ষেত্রনাথ কহিলেন, দিক ঐ দিকে সাক্ষি—গ্রাহ্য করি নে। এটা কোম্পানির রাজত্ব—আমার দলিল রয়েছে, জরিপের রেকর্ড, তার উপরে মতি বিশ্বেসের মেয়াদি কবলুতি। বিপিন চক্রবর্তীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, চক্কোত্তিমশায়, আপনি বসুন একটু। যখন পায়ের ধুলো পড়েছে মতি বিশ্বেসের কবুলতিটা একবার দেখে যান।

দ্রুতপায়ে ক্ষেত্রনাথ ঘরে গেলেন। ঘরের কোণে দেবীদাস রায়ের সিন্দুক বিছানায় বালিসে বিলুপ্ত হইয়া রহিয়াছে, কোন চিহ্ন নজরে পড়ে না।

ক্ষেত্রনাথ দলিলের দুই নম্বর বাক্স খুলিয়া মুহূর্ত মধ্যে কবুলতি লইয়া বাহিরে আসিলেন।

দেখুন, দেখুন রেজিস্ট্রির তারিখটা হল কোন সাল। হিসেব করে দেখুন, তেত্রিশ বছর হয়ে গেছে। বিশেষ জঙ্গল কেটে চাষবাস করবে এই চুক্তিতে মেয়াদি বন্দোবস্ত। আপনি তো বৈষয়িক লোক—বলুন এবার, দখলি-স্বত্ব প্রমাণ হয় কি না ?

ফিরিবার পথে বিপিন চক্রবর্তী কহিতে লাগিলেন, আমি বুড়োমানুষ, অনর্থক আমাকে এই সব হাঙ্গামে টেনে আনা। কেঁদে করবি কি মা জগদ্ধাত্রী, ওর আর কোন উপায় নেই। বাঘের মুখ থেকে মানুষ ফেরে, কিন্তু ক্ষেত্তোর চাটুজ্জের হাত থেকে বিষয়-সম্পত্তি ফিরেছে কেউ কোনো দিন শোনে নি। সেবারে কি হল, বাসুকডাঙার ভড়দের সঙ্গে ? ভড়দের সেজবাবু এত লাফালাফি—হেন করেঙ্গা তেন করেঙ্গা—শেষকালে দেখি ক্ষেত্তোরনাথ ওয়াসিলাতসুদ্ধ আদায় করে নিলে। মনে পড়েছে না নিবারণ ?

বিকালবেলা ক্ষেত্রনাথ সেই চণ্ডীমণ্ডপেই বসিয়াছিলেন। মাদুরের উপর একদল প্রজাপাটক। গোমস্তা রাখাল হাতি দাখিলা লিখিয়া টাকা লইতেছিল। নানারূপ গল্প হইতেছিল, বিশেষ করিয়া ও-বেলাকার বিজয় কাহিনী। রাখাল একবার মুখ তুলিয়া বলিল, ঠাকরুনের শ্বশুরবাড়িরা তো খুব ধনীলোক—

হা—হা করিয়া হাসিয়া ক্ষেত্রনাথ কহিলেন, খুব ধনী—বুঝলে, একেবারে রাজা রাজবল্লভ। আমার ভায়া একদিন গেছলেন সেখানে। তার মুখে রাজবাড়ির বর্ণনা পাওয়া গেল। ভাঙা পাঁচিলের উপর একখানা দোচালা, নারকেলপাতার ছাউনি, অগুন্তি ফুটো। শুয়ে শুয়ে দিব্যি চাঁদের আলো পাওয়া যায়।

রাখাল বলিল, দেশেও তো ওদের জমিজমা ছিল, সে সব কি হয়ে গেল ?

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, দেনাও ছিল একরাশ। সবাই মরে হেজে গেল, মহাজনেরা আর সবুর করল না। এখন থাকবার মধ্যে ঐ দোচালা অট্টালিকা আর বিঘেখানেক আমবাগান।

বলিতে বলিতে হাসির মধ্যে অকারণেই ক্ষেত্রনাথ রুখিয়া উঠিলেন : কিন্তু আমি এই বলে দিলাম রাখাল, আমার কাছে যেন সিকিপয়সার প্রত্যাশা না করে। তোমায় হুকুম দেওয়া রইল, উমানাথ হোক আর সে নিজেই হোক,

যদি এসে প্যানপ্যান করে—সিকিপয়সার সাহায্য না পায়। ঘাড় ধরে বের করে দিও—মিথ্যেবাদী হাড়বজ্জাত সব! ব্যবহারটা কি রকম দেখলে? টাকার অভাব হয়েছে—আগে যদি আসত আমার কাছে, এসে কেঁদে কেটে পড়ত, আমি কি ফেলে দিতে পারতাম, না দিইছি কোনদিন?

রাগের বশে এ কথাটা মনে পড়িল না, জগদ্ধাত্রী সর্বাগ্রে তাঁহাকেই অন্তত পনর বিশখানা চিঠি লিখিয়াছে।

ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল। বাহিরবাড়ির সীমানায় ঘনসন্নিবিষ্ট তলতা-বাঁশের ঝাড়, তার ওদিকে রাস্তা, রাস্তার পরপারে সহায়রাম রায়ের সেই পোড়ো ভিটাবাড়ি। সেখানে আজকাল সরিষাক্ষেত—হলুদবরণ অজস্র ফুল ফুটিয়াছে। ক্রমে দু-একজন করিয়া লোক জমিতে আরম্ভ করিল, কি কথায় উঠিল বাতাবি লেবুর গল্প, হইতে হইতে আধমুনে কৈলাস। এই কৈলাসটি কে, কোথায় তাঁর জন্ম, সে খবর কেউ জানে না। গল্প আছে, আধমনের কমে তাঁর পেট ভরিত না। একবার কোন রাজবাড়িতে তিনি অতিথি হন। বিকালবেলা সরকার মহাশয়ের কাছে গেল, ব্রাহ্মণ তখন পর্যন্ত অভুক্ত। বৃত্তান্ত কি? অতিথিশালায় ছুটিয়া আসিয়া দেখেন, সিধায় যে আধ-সেরখানেক চাউল দেওয়া হইয়াছিল, কৈলাসচন্দ্র স্নানাদির পর সে-ক'টি মুখে ফেলিয়া এক ঢোক জল খাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, আর কি করিবেন?

সেকালের কথা কহিতে কহিতে অকস্মাৎ ক্ষেত্রনাথ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন: কী দিনকালই ছিল! স্বর্গে গেছেন তাঁরা, সে-সব মানুষও আর আসবে না, তেমন হাসি-ফূর্তি আমোদ-আহ্লাদও হবে না কোন দিন।

একটা নিশ্বাস চাপিয়া বলিতে লাগিলেন, মনে হয় যেন কালকের কথা স্পষ্ট চোখের উপর ভাসছে। কিন্তু কোথায় বা কে!

আরও ঘোর হইয়া আসিল। রাখাল কাগজপত্র তুলিয়া রাখিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষেত্রনাথও আসিলেন। হঠাৎ যেন তাঁহার নজরে ঠেকিল, আবছা মতন একটা লোক অতিশয় মন্থর গমনে রাস্তা পার হইয়া সরিষাক্ষেতে ঢুকিয়া পড়িল।

দেখ তো, দেখ তো একবার রাখাল—

অত দূর অবধি স্পষ্ট করিয়া ঠাহর হয় না, তবু যেটুকু নজরে পড়িল তাহাতেই ক্ষেত্রনাথ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, নিশ্চয় বাগদিপাড়ার ভৈরবী, বদমায়েসের ধাড়ী। ভেবেছ অন্ধকারে বুড়ো দেখতে পারে না—

কাঁপিতে কাঁপিতে লাঠি লইয়া নিজেই নামিয়া পড়িলেন। সামনে উমানাথকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, ছুটে যাও, গিয়ে মাগীর চুলের মুঠো

ধরে নিয়ে এসো এখানে। তোলাচ্ছি আমি সর্ষেফুল! হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এসো।

উমানাথ বলিল, উনি জগদ্ধাত্রী দিদি। মঠবাড়ির মচ্ছব থেকে এলেন এতক্ষণে।

ক্ষেত্রনাথ আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, নবদ্বীপের-গোঁসাই এলেন। বের করে দিয়ে এসোগে। মামলা করে দখল নিয়ে তারপর যেন আমার ক্ষেতে ঢোকে।

উমানাথ ইতস্তত করিতে লাগিল। ক্ষেত্রনাথ কিছুকাল গুম হইয়া থাকিয়া বলিলেন, ঘরভেদি বিভীষণেরা সব পিছনে আছ, তা বুঝেছি। গালমন্দ না দিতে পার, গিয়ে ভাল কথায় কি বলা যায় না—দিদি, যা তুলেছ তুলেছ—আর তুলো না। এখন ফুল তুললে সর্ষের ফলন হবে না।

উমানাথ কহিল, উনি সর্ষেফুল তুলেছেন না। ভিটের উপর গিয়ে আছড়ে পড়লেন—কাঁদাকাটা করছেন না, কিছু না। দুপুরবেলাতেও ঐ রকম আর একবার দেখেছি।

আরও খানিক দাঁড়াইয়া উমানাথ আবার কহিল—আমি বললে কি যাবেন? আপনি গিয়ে একবার দেখে আসুন।

অর্থাৎ স্থূলকথা, তাহার দ্বারা এ-কাজ হইবে না। ক্ষেত্রনাথ তখন পায়ে পায়ে নিজেই চলিলেন।

সরিষা-ক্ষেতের এক পাশে বড় একটি দেবদারুগাছ। তাহার গোড়ায় আসিয়া দেখিলেন—অনতিস্পষ্ট জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, সেই আলোক প্রথমটা নজরে আসিল না—তারপর দেখিলেন, হলুদ-বরণ ফুলের মধ্যে সাদা কাপড়ে ঢাকা আবছা একটি মূর্তি মাটির উপর একেবারে ডুবিয়া আছে। ক্ষণকাল চুপ থাকিয়া ক্ষেত্রনাথ মনে মনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। কথা বলিতে হয়, তাই যেন বলিবেন, কে ও? জগো?

জগদ্ধাত্রী চমকিয়া উঠিয়া গভীর কণ্ঠে ডাকিল, পল্টু-দা!

সেইখানেই ক্ষেত্রনাথ বসিয়া পড়িলেন। দুইজনে চুপচাপ। চল্লিশ বছর পরে মুখোমুখি বসিয়া কিসের নেশায় মন ঝিমাইয়া আসিতেছে।…

হলুদ রঙের ফুলে ভরা জনশূন্য নিস্তব্ধ ক্ষেতের উপরে আলতা-রাঙা পা ফেলিয়া ঘরের লক্ষ্মীরা এঘরে ওঘরে সন্ধ্যা দেখাইয়া ফিরিতে লাগিলেন। সামনের আশশ্যাওড়া ও ভাঁটের জঙ্গলের উপর দেখিতে দেখিতে গড়িয়া উঠিল রুক্মিণী কারিগরের তৈরি প্রকাণ্ড আটচালা ঘর একখানি। ভিতরে জোড়া-

তক্তাপোষে ফরাসের উপর ঝকঝকে সাপের মাথায় হুঁকাদান, তার উপর রূপাবাঁধানো হুঁকা। কলিকার তামাক পুড়িয়া যাইতেছে—ও-পাড়ার বৈকুণ্ঠ চাটুজ্জে হাত বাড়াইয়াছেন, কিন্তু হুঁকার নাগাল পান নাই। পাশার দান পড়িতেছে, চিৎকারে ঘর কাঁপিয়া যাইতেছে, ফিরিয়া তাকাইবার ফুরসত কাহারও নাই। বৈকুণ্ঠ আসিয়াছেন, কেদারনাথ বরদাকান্ত আসিয়াছেন, আরও কে কে যেন—নজর যায় না। বাড়ির মধ্যে দমাদম ঢেঁকির পাড় পড়িতেছে, নাড়ু ভাজার গন্ধ—কানে পৈতা-জড়ানো ফর্সা রং কে খড়ম খটখট করিতে করিতে দীঘির ঘাট হইতে এইদিকে আসিতেছে। কে ডাকিয়া উঠিল: ও জগো, ঘুমুসনি—ওঠ্, ছুটো খেয়ে নিগে আগে, তারপর—

চুপ, চুপ, চুপ! নিশ্বাসেরও যেন শব্দ না হয়, উহারা কত কি কথা কহিতেছে—ভাল করিয়া শুনিতে দাও…

অনেকক্ষণ পরে ক্ষেত্রনাথ বলিয়া উঠিলেন, কেন তখন অত বড় মিথ্যে কথা বললে? হৃদয় তোমার আপনার হল? ঘর সারাবার টাকার দরকার—আমায় যদি আগে ভাল ভাবে বলতে জগো, দু-পাঁচ টাকা দেবার সঙ্গতি আমার কি নেই?

বড়বাবু!

হঠাৎ রাখাল হাতির কণ্ঠস্বর। সে বাড়ি যাইতেছিল, রাস্তা হইতে বলিয়া গেল, আমি চললাম বড়বাবু।

ক্ষেত্রনাথ একবার কাসিয়া চারিদিক তাকাইয়া বলিলেন, এখানটা ছিল পথ, তুমি পাল্কির মধ্যে উঠে বসলে। কপালে সোনার সিঁথিপাটি ছিল—না?

পথ ওদিকে, এটা বাইরের উঠোন। তুমি সমস্ত ভুলে গেছ।

বলিয়া একটু থামিয়া ম্লান হাসিয়া জগদ্ধাত্রী আবার বলিল, কতদিন পরে বাপের বাড়ি এসেছি পল্টুদা, চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পরে।

ক্ষেত্রনাথ তাহারই কথার প্রতিধ্বনি করিলেন: গিয়েছিলে একরত্তি মেয়ে, ফিরে এলে কি'রকম—

তোমারও কি সে রকম সব আছে? চুল পেকে গেছে, সামনের দাঁত নেই।

তা হোক, তা হোক! ক্ষেত্রনাথ ব্যাকুল হইয়া সমস্ত যেন চাপা দিতে চাহেন। বলিলেন, তুই আর পল্টু-দা বলে ডাকিস নে জগো, ডাক শুনে চমকে উঠি। গা'র মধ্যে কেমন করে ওঠে যেন। মা মরার পর থেকে ও নাম ভুলে বসে আছি। আজকাল দশ-গ্রামের লোকে আমায় মানে গণে এর

মধ্যে ছেলেবয়সের ঐ ডাক-নাম —না-না-না, ও বলে আর ডাকিস নে, বুঝলি ?

বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

হিমে সরিষা বন ভিজিয়া গিয়াছে, ঝিঁঝি ডাকিতেছে, চাঁদের আলো তীক্ষ্ণ ছুরির মতো গাছপালা বিদীর্ণ করিয়া মাটিতে আসিয়া পড়িয়াছে। নিশুতি গ্রাম, চারিদিক কী মায়ায় চমকিয়া আছে। উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষেত্রনাথ ডাকিলেন : চলো যাই।

আবার সহসা বলিয়া উঠিলেন : আমার টাকাটার একটা কিনারা করে দে জগদ্ধাত্রী, তোর বাপের ভিটে তোরই থাকুক। শুধু ঐ আশিটা টাকা দে—সুদ-টুদ আর চাইনে—সরষে কলাই আম-কাঁঠালে যাই হোক কিছু ঘরে তো উঠেছে।

জগদ্ধাত্রী জবাব না দিয়া একটুখানি হাসিল। কয়েক পা গিয়া রাস্তায় পড়িয়া বলিল, ও সব মরুকগে—তুমি আমায় শুধু চারটে টাকা দিতে পার ? দু'টাকা এই আসার গরুর-গাড়ি ভাড়া, আর দু-টাকা ফিরে যাবার।

তার মানে শেষকালে তো বলে বেড়াবি, জমিটা ফাঁকি দিয়ে নিল। চিরকালের খোঁটা। ও সব আমি পারব-টারব না বাপু—যা-কিছু আছে তোমার, নিয়ে আমায় অব্যাহতি দাও।

নিঃশব্দে আরও কয়েক পা আসিয়া আবার ক্ষেত্রনাথ কথা কহিয়া উঠিলেন—টাকার দরকার থাকে, সিন্দুক বিক্রি কর—দিচ্ছি টাকা। এমনি কে কাকে টাকা দিয়ে থাকে ? সেই যে দেবীদাস রায়ের দরুন সিন্দুক—সিন্দুক নয়, ক'খানা ভাঙা তক্তা। সেবারে লিখেছিলে, তাই নিয়ে এসে সেই অবধি টানাটানি করে মরছি। চার-টার নয়, ঐ পুরোপুরি পাঁচই নিয়ে নিয়ো—ক্ষতি-লোকসান যা হয় হোকগে, আর কি হবে।

বাড়ি ফিরিয়া ক্ষেত্রনাথ চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। খানিক পরে আভা পা ধুইবার জল দিয়া গেল। তারপর আহ্নিকের আয়োজন করিতে আসিয়া দেখিল, জলচৌকির উপর তিনি যেমন বসিয়াছিলেন তেমনই আছেন—যেন তাঁহার সম্বিত হারাইয়া গিয়াছে। ক্ষেত্রনাথ বড় লজ্জিত ভাবে তাড়াতাড়ি জলের ঘটি টানিয়া লইলেন। বলিলেন, বউমা, তোমার ছোট-মাকে ডাকো দিকি একবার—

তরঙ্গিণী সামনে আসে না, সম্পর্কে বাধে। কবাটের ওধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

মুখখানা অতিশয় ম্লান করিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিতে লাগিলেন, সর্বনাশ

হয়েছে মা, বিষম সর্বনাশ। সহায়রামের ঘুষে-বল না ছেড়ে আর উপায় নেই। গ্রামসুদ্ধ সব একজোট। মামলা করবে, আপোষে না দিলে হাজার টাকা খেসারত আদায় করবে।

করুক গে। এতবড় ভয়ানক কথাটাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিয়া তরঙ্গিণী বলিল, আভা, বল তুই, ওসব ঠাকরুন মিথ্যে করে ভয় দেখিয়েছেন। গ্রামের লোকের বয়ে গেছে।

গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, তা বলা যায় না—

করে করুক। আমরাও দেখব শেষ অবধি।

রায় দিয়া তরঙ্গিণী চলিয়া যাইতেছিল, ক্ষেত্রনাথ আবার ভয়ে ভয়ে বলিলেন, আবার তার সিন্দুক ফিরে চাচ্ছে।

তরঙ্গিণী এক মুহূর্ত থমকিয়া দাঁড়াইল। বলিল, সিন্দুক-টিন্দুক নেই আভা, বলে দে, সে ভেঙেচুরে কবে উই-ইঁদুরের পেটে চলে গেছে।

কিন্তু কাল যে নিতে আসবে, আমি স্বীকার করে এসেছি।

কাল? আসুক আগে, তখন দেখা যাবে।

দৃপ্ত ভঙ্গিতে তরঙ্গিণী চলিয়া গেল। ক্ষেত্রনাথ চুপ হইয়া গেলেন।

সিন্দুকের বৃত্তান্ত হৃদয়ও শুনিল। শুনিয়া নূতন করিয়া সে রুখিয়া উঠিল: আপনি নিশ্চয়ই হাতে-নাতে ধরে ফেলেছিলেন—না দিদি?

জগদ্ধাত্রী চুপ করিয়া রহিল।

হৃদয় বলিতে লাগিল, নইলে ও কি স্বীকার করে! ও বুড়ো কি কম পাত্তোর! ওটা আমার চাই। এই একখানা জমি নিয়ে কতদিন আপনার পিছনে ঘুরলাম, কত পয়সা ব্যয় করলাম—সমস্ত গেল ফেঁসে।

ইহারও ভাল মন্দ কোন জবাব না পাইয়া আরও উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, পাঁচ টাকা কি—আমি দশ টাকা দেব, আমাকে দিন ঐ সিন্দুক। বাবাকে একদিন না-হক দশকথা শুনিয়ে চোখের সামনে দিয়ে হিড়হিড় করে করে ক্ষেত্তোর-দা ঐ সিন্দুক ঘরে তুলেছিল, ও-ই আবার আমি ঘর থেকে বের করব। কড়ায় গণ্ডায় সমস্ত শোধ তুলব, তবে আমি বরদাকান্তর বেটা।

পরদিন জগদ্ধাত্রী আসিল। সঙ্গে হৃদয়। বলিল, সিন্দুকটা কি রকম আছে, দেখি একবার। ক্ষেত্রনাথ ঘরের মধ্যে গিয়া এদিক-ওদিক তাকাইয়া ভিতরের দিককার দরজা বন্ধ করিলেন, তারপর ঝনাৎ করিয়া চাবি ফেলিয়া দিয়া নিস্পৃহভাবে তামাক খাইতে লাগিলেন। উমানাথ বালিশ-বিছানা সিন্দুকের উপর হইতে নামাইতে লাগিয়া গেল।

কড়কড়—কড়াৎ। প্রকাণ্ড লোহার তালা কতকাল মরিচা ধরিয়া আছে। গোড়ায় কিছুতে চাবি ঢোকে না, অনেক ঝাঁকাঝাকি টানাটানি করিতে করিতে অবশেষে শিকলের মাথা ভাঙিয়া ঝুলিয়া পড়িল। উমানাথ ডালা তুলিল।

বিশ্রী ভাপসা গন্ধ। তারপর স্রোতের জলের মতো আরশুলার ঝাঁক বাহির হইতে লাগিল। ভিতরটায় অতলস্পর্শী অন্ধকার।

হৃদয় উঁকি দিয়া বলিল, বাপ রে, তালপাতার আঁস্তাকুড়। ঝেঁটিয়ে ফেল—ঝেঁটিয়ে ফেল। ভিতরের ঐ দু-দিক তলা-মাথা কেমন আছে দেখি আগে। বলিয়া ঝাঁটার অভাবে সে নিজেই দুই হাতে একবোঝা ঝপ করিয়া ফেলিয়া দিল, তারপর আর এক বোঝা। তালপাতার পুঁথি, পুঁথির উপর চিত্র-বিচিত্র কাঠের পাটা, ক'খানা তুলোট কাগজের পুঁথিও রহিয়াছে। হাতে তুলিতে সমস্ত টুকরা হইয়া মাটিতে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

রোসো, রোসো, সব যে গেল! উমানাথ ব্যাকুল হইয়া তাড়াতাড়ি হৃদয়কে হঠাইয়া দিল।

হৃদয় বলিল, রাগ কোরো না, একেবারে ফেলে দিই নি। তোমাদের উনুন ধরাতে কাজে লাগবে।

উমানাথ তখন মাটির উপরে ছড়ানো ছিন্নবিচ্ছিন্ন টুকরাগুলি সাজাইতে লাগিয়া গিয়াছে। হৃদয়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, এ সব সোনার গুঁড়ো হৃদয়, এ চিনবার ক্ষমতা তোমার নেই। এই সার্বভৌমের পুঁথির স্বাদ নিতে দেশদেশান্তর থেকে কত কত পড়ুয়া ছুটে আসত—

সে কবি লোক। পূর্বগামী মহাজনেরা তাঁহাদের অতি আদরের যে-কথাগুলি উত্তর-পুরুষের জন্য যত্ন করিয়া পুঁথির পাতায় গাঁথিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে চক্ষু মুদিয়াছিলেন, তাহাদের এই অবহেলার বেদনা তাহার বুকে আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল। বলিল, এই খাতাগুলোয় রয়েছে সহায়রামের গান, ধানক্ষেতে চাষাভুষোর মুখে একদিন শুনে এসো। তারা ভুলে যায় নি।...কিন্তু এটা কি?

একখানি লম্বা আকারের খাতায় গোল গোল মোটা হরফে গঙ্গা-স্তোত্র, দাতাকর্ণ এবং আরও কত কি উপাখ্যান। উমানাথ পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে জিজ্ঞাসা করিল: এটা আবার কার গান?

জগদ্ধাত্রী হাতে লইয়া দেখিয়া শুনিয়া খাতাটি নিজের কাছে রাখিয়া দিল।

কি ওটা?

বাজে।

উমানাথ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, দেবীদাস রায়ের সিন্দুকে সোনা থাকে—বাজে

জিনিষ থাকে না দিদি, আপনি চিনতে পারেন নি। দিন আমাকে, দেখব।

বলিয়া হাত বাড়াইল।

জগদ্ধাত্রী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল : তা বই কি। আমার হাতের লেখার খাতা, আমি চিনি নে?

ক্ষেত্রনাথকে দেখাইয়া বলিল, এ ওঁর কীর্তি।

বলিতে লাগিল, মনে পড়ে পণ্টুদা, এই খাতা আর শিশুবোধক তুমি চুরি করে এনে দিয়েছিলে। এই তোমার হাতের লেখা—কী ধ্যাবড়া আর যাচ্ছেতাই। আর এই আমার—কেমন মুক্তোর মতো দেখ দিকি। সকালবেলা উনি তিন-ছত্র করে লিখে দিয়ে যেতেন—পাঠশালে সমস্ত দিন ধরে যত মার খেতেন, বাড়ি এসে তার শোধ তুলতেন আমার উপর। সমস্ত দিন ধরে সেই ভয়ে বসে বসে দাগা বুলোতাম। কত কষ্টই যে দিয়েছ তুমি!

পুঁথিপত্র নামাইয়া সিন্দুক ক্রমশ খালি হইতে লাগিল। মাঝের তক্তা ভাঙিয়া গিয়াছে, সমস্ত জোড় আলগা হইয়া গিয়াছে, তলাটাও একদম নাই। দেখিয়া শুনিয়া হৃদয়ের প্রতিশোধের উষ্ণতাও ক্রমশ শীতল হইয়া আসিতে লাগিল, টাকা দিয়া এই বস্তু কিনিয়া বাড়ির পথেই তো অর্ধেক গুঁড়া হইয়া যাইবে। বলিল, ইস, একদম গিয়েছে যে!

জগদ্ধাত্রীও বুঝিল, ইহা কায়দায় ফেলিয়া দাম কমাইবার চেষ্টা। সভয়ে কহিল, নেবে না নাকি? না-ই যদি নেবে, এই টানা-হেঁচড়ার দরকার ছিল কি?

হৃদয় বলিতে লাগিল, নেবো না বলছে কে? কিন্তু আগে তো জানতাম না, এই দশা। দশ টাকা আমি দিতে পারব না।

ক্ষেত্রনাথ কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তার আগেই উমানাথ বলিয়া উঠিল, আমি রাখব দিদি, আমি দশ টাকা দেবো। সরুন, পুঁথিপত্তোর তুলে ফেলি—গানের খাতা তুলে ফেলি—

বলিয়া সহায়রামের গানের খাতা কপালে ঠেকাইয়া সে সিন্দুকে তুলিল। বলিতে লাগিল, বরাতক্রমে ঘরে এসেছে তো এমন সিন্দুক জীবন থাকতে ছাড়ছি নে। দশ টাকা চান, তাই দেওয়া যাবে। সরো হৃদয়, তোমার পিছনে ওদিকটায় আরও কী কী সব পুঁথি রয়েছে···

সমস্ত সাজাইয়া তুলিয়া উমানাথ সিন্দুকের ডালা বন্ধ করিল। ক্ষেত্র-নাথের দিকে তাকাইয়া দেখিল, তিনি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছেন। তারপর জগদ্ধাত্রীর হাতের দিকে নজর পড়িতে বলিল, ওটা আবার কি—সেই হাতের লেখার খাতা?

জগদ্ধাত্রী হাসিয়া বলিল, এটা তো বিক্রি করি নি···আচ্ছা, কত টাকা দিতে পার এটার দাম? এক পয়সাও না? তাই বই কি! লাখ টাকা—বুঝলে, তারও বেশি।

তারপর বলিল, যা-ই হোক, টাকা দশটা কালকে দিয়ে দিও উমানাথ, খুব সকালে রওনা হয়ে যাব। হৃদয়, লক্ষ্মী ভাই, আজ বিকেলের দিকে একটা গরুর-গাড়ি ঠিক করে রেখো।

হৃদয় বিরক্ত কণ্ঠে বলিল, আমি পারব না। ক'দিন ধরে এই করে করে কাজকর্ম হচ্ছে না কিছু। আজ আমার আদায়ে বেরুতে হবে। আপনি আর কাউকে বলুন।

ক্ষেত্রনাথ এতক্ষণ সকলের পিছনে নির্বাক পাথরের মতো দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছিলেন · তিনিই জানেন, এইবার কথা কহিয়া উঠিলেন। বলিলেন, তুমি ভেবো না জগো, গাড়ি আমি ঠিক করে দেব। আর, এত বেলায় হৃদয়ের বাড়ি অদ্দুর না-ই গেলে!

তরঙ্গিণীর আপ্যায়নের কথা ভাবিয়া একবার একটু ইতস্তত করিলেন, তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, আজ থাকো আমার বাড়ি, কাল এখান থেকে এমনি চলে যেও। হৃদয় বরঞ্চ একসময় কাউকে দিয়ে তোমার জিনিষপত্তোর যা আছে পাঠিয়ে দেবে।

তা দেবো—বলিয়া ব্যঙ্গভরা হাসি হাসিয়া হৃদয় বলিল, অঢেল জিনিষপত্তোর! ফুটো ঘটি আর খান দুই কাঁথা—দেবো পাঠিয়ে বিকেলবেলা।

সকলে চলিয়া গেল, রহিল কেবল ক্ষেত্রনাথ ও জগদ্ধাত্রী। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, জগো, দিয়ে দে আশি টাকা। আমি তোর জিনিষপত্তোর, বাপের ভিটে···সমস্ত ছেড়ে দিচ্ছি। আমি তো বাঁচি তা হলে।

জগদ্ধাত্রী হাসিল।

না পারিস—আচ্ছা, টাকা দিস এর পরে। সত্যি তুই চাস?

একটু থামিয়া আবার বলিলেন, সত্যি সত্যি চাস কিনা তাই বল।

জগদ্ধাত্রী একটু চুপ থাকিয়া বলিল, ও তোমারই থাক। তুমি বরঞ্চ মাঝে মাঝে দু-এক টাকা করে পাঠিয়ে দিও আমায়। জায়গাজমি তো পেটে খাওয়া যায় না!

পরদিন খুব ভোরে গরুর-গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। মেজবউ ছোটবউ অনেক আগেই উঠিয়াছে। বলিল, ভুলে যাবেন না মা, আসেবন আবার।

আঁচলের প্রান্তে চোখ মুছিয়া জগদ্ধাত্রী বলিল, সোনার রাজ্যি তোদের মা,

ছেড়ে যেতে মন চাচ্ছে না।

ক্ষেত্রনাথ আসিয়া ডাকিলেন : শোনো—

তাহাকে একান্তে ডাকিয়া পাঁচটি টাকা হাতে দিলেন। বলিলেন, সিন্দুকের দাম।

জগদ্ধাত্রী আশ্চর্য হইয়া বলিল, এ কি? দশ টাকার কথা ছিল যে! উমানাথ কোথায়?

সে তো তারপর থেকে নিরুদ্দেশ। মঠবাড়িতে গেছে, সেখানেই মালসা-ভোগ হচ্ছে আর কি! তার কথায় কি হবে—দরদস্তুরের সে জানে কি? নেহাৎ বলে ফেলেছে বলেই—নইলে ভাঙা সিন্দুক আর কি কাজে লাগবে বলো? ইচ্ছে হলে তোমার জিনিষ নিয়ে যেতে পার।

জগদ্ধাত্রী ভাবিতে লাগিল।

ক্ষেত্রনাথ প্রশ্ন করিল : কি বলো, যাবে নিয়ে? ঐ রকম বেকায়দা জিনিস গরুর-গাড়িতে যাবে বলে তো বোধ হয় না, অন্য রকম ব্যবস্থা করতে হয় তা হলে। খরচও ঢের।

জগদ্ধাত্রী বলিল, দাও, ও-ই দাও—তোমার যা খুশি। আসা-যাওয়ার ভাড়া গেল চার—হাতে থাকল এক টাকা। তাই ভাল।

বলিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া হাত পাতিল।

ক্ষেত্রনাথ টাকা দিয়া একটু ওদিকে যাইতে আভা পুনশ্চ আগাইয়া আসিয়া সসঙ্কোচে বলিল, মা, ছোঁব আপনাকে?

জগদ্ধাত্রী হাসিয়া বলিল, মুচির মেয়ে নাকি তুই যে ছুঁলে জাত যাবে?

নত হইয়া সে জগদ্ধাত্রীকে প্রণাম করিল। বলিল, সকালবেলা নেয়েটেয়ে নিয়েছেন কিনা, তাই বলছিলাম। পায়ের ধূলো নি একটু আপনার যাবার বেলা—

জগদ্ধাত্রী ছোট মেয়ের মতো তাহাকে জড়াইয়া কোলে তুলিয়া লইল। অশ্রু আর বাধা মানিল না, ঝরঝর করিয়া গাল বহিয়া ঝরিতে লাগিল। চিবুকে আঙুল ছোঁয়াইয়া আঙুলের অগ্রভাগ চুম্বন করিয়া বলিল, রাজরানী মা তুই আমার—পোড়াকপালীর পায়ে হাত তুই কেন দিবি মা? কেন দিবি, কেন?

খানিক স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর যেন তন্দ্রা ভাঙিয়া বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, যাই তবে। তোর শাশুড়ি এখনও ঘুমুচ্ছেন বুঝি! নিতাই কোথায় রে—ঘুমুচ্ছে?

হুঁ।

আচ্ছা, চললাম। ও পল্টু-দা—

ক্ষেত্রনাথ মুখ ফিরাইতে জগদ্ধাত্রী বলিল, আচ্ছা, সেই যে গাড়িটা—মেলার সেই রেলগাড়ি—দাম ঠিক ঠিক কত নেবে বলো তো?

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, বলে তো পাঁচসিকে। এক টাকার কম দেবে না বোধ হয়।

এই টাকাটা দিয়ে নিতুকে ওটা কিনে দিও। বলিয়া আঁচলের প্রান্ত হইতে ক্ষেত্রনাথের দেওয়া পাঁচ টাকার একটি টাকা বাহির করিয়া বাঁধানো বোধন-পিড়ির উপর রাখিল। আবার হাসিয়া বলিল, গরুর-গাড়ির চার আর রেলগাড়ির এক। হাতে রইল আমার এই খাতাখানা। তবু তো বাপের-বাড়ির একটা জিনিস—

জীর্ণ মটকার থানের আঁচলে সেই কীটদষ্ট বহু পুরাতন দাগা-বুলানো হাতের-লেখার খাতাখানা যত্ন করিয়া লইয়া জগদ্ধাত্রী গাড়িতে গিয়া বসিল।

ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ করিয়া আর্তনাদ করিতে করিতে অসমান গ্রাম্য রাস্তার উপর দিয়া গাড়ি চলিয়াছে। চলিতে চলিতে হঠাৎ কি রকমে গরুর কাঁধের ফাঁস খুলিয়া গিয়া গাড়ি একটুখানি থামিল। অল্প দূরেই সহায়রাম রায়ের পরিত্যক্ত ভিটার উপর শিশির-স্নাত হলুদবরণ সরিষাফুলের সমুদ্র। প্রভাতের শান্ত নিস্তব্ধ গ্রাম। চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক্ষেত্রনাথ দেখিতেছিলেন। হঠাৎ কি মনে হইল, বাক্স হইতে আরও পাঁচটি টাকা লইলেন। এক মুহূর্ত ইতস্তত করিলেন, তারপর গাড়ির পিছে পিছে এক রকম ছুটিয়া গিয়া ডাকিয়া থামিইয়া টাকা কয়টি জগদ্ধাত্রীর হাতে দিলেন। এই নাও। হল তো? ঘর সারাতে হয়, যা করতে হয়, করো গিয়ে—আমি আর কিছু জানি নে।

যেন একজন কাহার উপর বড় অভিমান করিয়া বিদায় হইয়া যাইতেছে—নিজের মান বজায় রাখিতে হইবে, তাহাকেও ঠাণ্ডা করিতে হইবে, এমনি একটা ভাব। ক্ষেত্রনাথ বলিতে লাগিলেন, ভায়া আমার বেশ মানুষ! দশ টাকা হুকুম করে নিজে তো গা-ঢাকা দিয়েছেন, এখন মর শালা তুই টাকার জোগাড় করে।

অপর পক্ষ অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া আছে দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ গাড়োয়ানের উপরেই হাঁক দিলেন: চালা, চালা—বেলা বাড়ছে না? থেমে রইলি কেন?

জগদ্ধাত্রী বলিল, আর কতদূর যাবে পল্টু-দা, ফেরো এবার।

তাই তো! বলিয়া ক্ষেত্রনাথ চমকিয়া মুখ তুলিলেন। তারপর হাসিবার

চেষ্টা করিয়া বলিলেন, না হয় যাবো তোর বাড়ি অবধি। একটা দুটো দিন খেতে দিবি নে ?

উঠে এসো, গাড়িতে জায়গা ঢের। গাড়োয়ানকে বলিয়া জগদ্ধাত্রী গাড়ি দাঁড় করাইল। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তুমি যাবে আমার বাড়ি ? হা রে আমার কপাল! সেই জঙ্গলরাজ্যের মধ্যে যাবে আনন্দের হাট ফেলে ?

ক্ষেত্রনাথ বিনা আপত্তিতে গাড়িতে উঠিলেন, আবার গাড়ি চলিতে লাগিল। সামনে ধূলা উড়াইয়া আর একটা গরুর-গাড়ি চলিতেছে। জগদ্ধাত্রী পুনশ্চ প্রশ্ন করিল : সত্যি, চললে কোথায় ? এদিকে তাগাদাপত্তোর আছে বুঝি ?

সে কথায় কান না দিয়া হঠাৎ ক্ষেত্রনাথ উচ্ছ্বসিত গলায় হাসিয়া উঠিলেন। মনে হইল, কতকাল—কতকাল পরে গলার উপর হইতে কিসের একটা বাঁধন, খসিয়া গিয়াছে, বুক ভরিয়া ক্ষেত্রনাথ হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন দেখ, দেখ - ঐ গাড়ির ওরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। কি ভাবছে বলো তো ?

জগদ্ধাত্রীর মুখেও মৃদু হাসির আভা খেলিয়া গেল। বলিলঃ কি ভাবছে ওরাই জানে—

আচ্ছা, এই যদি বিশ-পঞ্চাশ বছর আগে হত—এমনি ভাবে যেতাম, লোকে ঠিক হাসাহাসি করত—না ? কি ভাবত বল দিকি ?

জগদ্ধাত্রী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল : তা হাসত। ভাবত, তোমার ঠ্যাং ভেঙেছে। পায়ে বল থাকতে শখ করে কেউ কি আর গরুর-গাড়িতে চড়ে ?

তোমার মুণ্ডু।

তবে ?

সেই সময় এদেশ-সেদেশ কত কি রটে গিয়েছিল, মনে আছে ?

জগদ্ধাত্রী ভালমানুষের মতো সায় দিল : তা আছে। একবার রটেছিল, পানে পোকা। হাজার হাজার মানুষ নাকি পান খেয়ে মরে গেছে। গাঁয়ের কেউ আর পান খায় না। বারুইরা বাবার কাছে এসে কাঁদে, গোছা গোছা পান দিয়ে যাচ্ছে, পয়সা লাগবে না—বলে, বারোয়ারির চাঁদা যা ধরবে তাই দেবো—তোমরা একবার একটা পান মুখে দিয়ে দেখ।

অধীর কণ্ঠে ক্ষেত্রনাথ বলিয়া উঠিলেন, তুমি গাধা।

জগদ্ধাত্রী বলিল, তুমি নামো দিকি—শিগগির গাড়ি থেকে নেমে যাও। আমার ভয় করছে। গালাগালির পরে আবার হয়তো সেইরকম ঠেঙানি শুরু হবে।

ক্ষেত্রনাথ সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, হবেই তো। তুই সমস্ত ভুলে

থাস। কথা উঠেছিল না, আমাদের বিয়ে হবে ?

জগদ্ধাত্রী ভাবিবার ভান করিয়া বলিল, তা হবে হয়তো। কত সম্বন্ধ হয়েছিল, সব কি মনে থাকে ?

মনে থাকে না···মাথায় তোর গোবর-পোরা, তাই মনে থাকেনা !

হঠাৎ মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, মিটি-মিটি হাসি। বলিলেন, সমস্ত মনে আছে তোর। দুষ্টুমি হচ্ছে। চিরকাল জানি তোমাকে। তবে শোন্ একটা কথা···

ক্ষেত্রনাথ অকারণে চারিদিকে একবার তাকাইয়া দেখিয়া গলা নিচু করিয়া বলিতে লাগিলেন, কেউ জানে না, কোন দিন কাউকে বলিনি। যেদিন তোকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে গেল, আমি কেঁদেছিলাম। বাঁশঝাড়টার ঐখানে দাঁড়িয়ে দেখলাম, তোর পাল্কি খেয়ায় তুলল। কি রকম হয়ে গেল মনটা··· খানিক পরে আপনি চোখে জল গড়িয়ে এলো। ঐখানে উপুড় হয়ে পড়ে কত কাঁদলাম···

শ্রোতার মুখের হাসি মিলিয়া গেল। এক মুহূর্ত চুপ থাকিয়া গম্ভীর বিরক্ত কণ্ঠে জগদ্ধাত্রী বলিল, তুমি এই শোনাতে গাড়িতে উঠে এলে নাকি ? তিন কাল কেটে গেছে, একজন বিধবা-মানুষের সামনে ঐ সব বলতে মুখে বাধে না ?

ক্ষেত্রনাথ ঘাবড়াইয়া গেলেন। ভারি লজ্জা হইল। সহসা কথা জোগাইয়া উঠিল না। বলিলেন, লজ্জা নয়···হাসির কথা। শুধু একটা হাসির কথা জগো, একটা সেকেলে কথা। কত কথাই তো মানুষে বলে—

জগদ্ধাত্রীর চোখে এক ফোঁটা জল গড়াইয়া আসিল। অলক্ষ্যে মুছিয়া সে বলিয়া উঠিল, হোক কথা। আমি এক্ষুনি গ্রামে ফিরে তোমার সমস্ত কীর্তি রাষ্ট্র করে দেবো।

কণ্ঠস্বরে কৌতুকের আভাস পাইয়া ক্ষেত্রনাথ মুখের দিকে তাকাইলেন, চোখ দু'টি তার ছল-ছল করিতেছে। হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, তা দিগে যা। তখনকার মানুষ কে আছে, আর কে-ই বা বুঝবে ? এক্ষুনি আনন্দের হাটের কথা বলছিলি না জগো—আমাদের এখন ভাঙা হাট, আমাদের হাটের মেলা ঐ জমছে ঐদিকে।

বলিয়া আকাশের দিকে নির্দেশ করিয়া হঠাৎ চুপ হইয়া গেলেন।

নদীর তীরে খেয়াঘাটে গাড়ি থামিল। মঠবাড়ি এখান হইতে বেশি পথ নয়, সেখানে এখনও প্রবল খোলের আওয়াজ। খেয়ানৌকা ঘাটে পড়িয়া

আছে, কিন্তু মাঝি নিরুদ্দেশ। জন্মার খেয়া নয়, অতএব ইহা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। পারার্থীরা আসিয়া মাঝির ঘরের দরজায় ধন্না দিয়া পড়ে, মেজাজ যেদিন তার ভাল থাকে ঘণ্টাখানেকের বেশি ডাকাডাকি করিতে হয় না। গাড়োয়ান মাঝির খোঁজে চলিয়া গেল।

দু'জনে খেয়াঘাটের কিনারে গিয়া বসিল।

শীতের নদীজলে ধোঁয়ার মতো কুয়াসা উড়িতেছে। তখন ভরা জোয়ার, কলকল বেগে জল ছুটিয়া আসিয়া পাড়ের উপর প্রহৃত হইতেছে। একটু দূরে মহাকালের মতো মহাবৃদ্ধ একটি অশ্বত্থগাছ শত সহস্র ঝুরি নামাইয়া অনেকখানি জায়গা জাপটাইয়া বসিয়া আছে। আগের গরুর-গাড়িখানাও গাছের তলায় আনিয়া রাখিয়াছে। ছইএর মধ্যে ফুটফুটে একটি বউ, বউটির মুখের উপর অশ্রুর ছাপ। চালার উপর বাহিরে সুন্দর একটি যুবা বধূর মুখের কাছে মুখ লইয়া হাত-মুখ নাড়িয়া নাড়িয়া কত কি বলিতেছে। অশ্রু-চোখে বউটি হাসিয়া উঠিল।

দু'জনে সেই তরুণ-তরুণীকে দেখিল, কুয়াসাচ্ছন্ন নদীস্রোতের দিকে দেখিল, চারিদিকের নিস্তব্ধ প্রান্তর পথঘাটের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। হঠাৎ ক্ষেত্রনাথ বলিয়া উঠিলেন, দশা তোরও যা, আমারও তাই। আমারও কেউ নেই—তোরও না।

জগদ্ধাত্রী গাঢ় স্বরে বলিল, ওরা কেউ যত্ন করে না বুঝি !

ক্ষেত্রনাথ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, মানুষের দোষ নয় রে, বয়সের দোষ। কিন্তু সে যাক, তুই রাগিস নি তো ? বল্ জগো, সত্যি করে বল্—

জগদ্ধাত্রী হাসিয়া বলিল, না। আমি কি সেই জগদ্ধাত্রী আছি না তুমি সেই পন্টু দা ? আমরা দুই বুড়োবুড়ি আর কাদের গল্প বলছিলাম।

দু'জনেই হাসিতে লাগিল।

গাড়োয়ান ফিরিয়া খবর দিল, মাঝি বাড়িতেও নাই—রাত্রে মঠবাড়িতে গান শুনিতে গিয়াছিল, এখনও ফিরে নাই।

ক্ষেত্রাথ বলিলেন, আমিও যাই—বেটাকে তাড়া না দিলে কি উঠবে ?

জগদ্ধাত্রীও উঠিয়া দাঁড়াইল।

তুইও যাবি নাকি ?

মঠবাড়িতে গান তখন বড় জমিয়াছে। অষ্টপ্রহর সঙ্কীর্তন, শেষরাত্রি হইতে গান জুড়িয়াছে। কাল বালক-সঙ্কীর্তনের দল আসিয়া পড়িয়াছে, কালও

সমস্ত দিন গান হইয়াছে, সেই জন্য উমানাথের আর বাড়ি যাওয়া হয় নাই। জগদ্ধাত্রী চলিয়া যাইবে তাহা মনে ছিল, তবু যাইতে পারে নাই। অনেকক্ষণ অবধি চুপ করিয়া গান শুনিয়া, তারপর সে থাকিতে পারে নাই, নিজেই দলের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। গান ভাঙিতে বেলা গড়াইয়া গেল, তখন আর বাড়ি-ঘরের কথা উমানাথের মনে নাই। বৈষ্ণব সেবার ডাক আসিল, উমানাথ তখনও মনে মনে সুর ভাঁজিতেছে।

সেই প্রথম দিনের দলটির কর্তা আসিয়া মনে করাইয়া দিল: ছোট চাটুজ্জেমশায়. মনে আছে তো আমাদের মাথুর পালাটা ঠিক করে দেবার কথা?

কীর্তনীয়াদের থাকিবার জন্য খড়ে-ছাওয়া প্রকাণ্ড মণ্ডপ। তাহার একদিকে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। কেরোসিনের ডিবাটা সরাইয়া লইয়া উমানাথ সেখানে বসিল। খেরো-বাঁধা খাতা বাহির হইল, আর বাহির হইল সহায়রামের পুরোণো গানের খাতা—দেবীদাস রায়ের সিন্দুকে যাহা পাওয়া গিয়াছে। খাতার সঙ্গে দড়ি দিয়া-বাঁধা পেন্সিল থাকিত।

গুণগুণ করিয়া গাহিতে গাহিতে উমানাথ পালা লেখা শেষ করিল। রাত্রেই খানিক তালিম দেওয়া হইয়াছে, সকাল হইতে সেই পালা চলিতেছিল—

বৃন্দা বলিতেছে—ওগো অকরুণ শ্যাম, তোমার বিরহে বৃন্দারণ্য শ্মশান হইয়াছে, তোমার পথ চাহিতে চাহিতে গোপীরা অন্ধ হইয়া গেছে, তোমার সোহাগিনী রাই শীর্ণ চতুর্দশী-চাঁদ হইয়া ধুলায় পড়িয়া রহিয়াছে, প্রাণের স্পন্দনটুকু তাহার বুঝি এতদিনে নিঃশেষে থামিয়া গেল…

সহসা শ্রোতারা চাহিয়া দেখিল, ক্ষেত্রনাথ চাটুজ্জে মহাশয় একপাশে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিয়া অবশেষে সকলের মধ্যে বসিয়া পড়িতেছেন। জগদ্ধাত্রীও মেয়েদের মধ্যে বসিয়াছে।

তখন দূতীকে কৃষ্ণ অভয় দিতেছেন—ভয় করিও না সখি বৃন্দে, আমি ফিরিয়া যাইতেছি। আমার রাইকমল—আমার কৈশোরের সেই বৃন্দাবন—কিছুই মরে নাই। আবার আমি ফিরিয়া যাইব, ম্লান কুসুম শতদল ফুটিয়া উঠিবে…

…পীত ধড়া পরিয়া হাতে মুরলী লইয়া মথুরার রাজা কতকাল—কতযুগ পরে আবার রাখাল বেশে কৈশোরের বৃন্দাবনে চলিলেন। আকাশে চাঁদ উঠিল, যমুনা উজান বহিতে লাগিল, হারাণো কালের বাঁশীর ধ্বনি আবার গোকুল-বৃন্দাবন আকুল করিয়া বাজিতে লাগিল…দুরন্ত কালার ভয়ে ভূমিশয্যা ছাড়িয়া চকিতে শ্রীমতী মুখ ঝাঁকিয়া বসিলেন। আঁচল ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে কত কি কহিতেছেন। বৃক্ষবৃক্ষের শাখাগে কোকিল-ডাকিতে লাগিল…

সজল চোখে জগদ্ধাত্রী ক্ষেত্রনাথের দিকে চাহিল। ক্ষেত্রনাথও তাকাইলেন। সবিস্ময়ে সকলে দেখিল, ক্ষেত্রনাথের চোখে জল। গান শুনিয়া ক্ষেত্রনাথ

কাঁদিয়া ফেলিবেন, অতিবড় শত্রুও এমন অপবাদ দিবে না। হয়তো চোখের অসুখ, হয়তো চোখে খড়-কুটা পড়িয়াছে…

গয়না

ঘোলের শরবত দই আর পাতিলেবু এনে রেখেছিলাম বাজার থেকে। খাও, শরীর জুড়োবে। ইস—কী চেহারা করে এসেছ! আমার কান্না পায়।

কাঠ-ফাটা রোদ্দুর—ঘরে বসে বুঝতে পারছ না। মাথা ফেটে চৌচির হচ্ছে না, সেইটেই আশ্চর্য।

রোদে রোদে ঘুরবে না, এই বলে দিলাম।

অখিলের কৌতুক লাগে এই রকম বেহিসাবি আবদারে।

ঘুরব না—তবে কি বাড়ি এসে চাকরি দিয়ে যাবে?

ঘুরে ঘুরেও তো হয় না কিছু। বর্ষা পড়ুক, সৃষ্টি ঠাণ্ডা হোক, তখন চাকরি খুঁজো। এক বাক্স গয়না আছে তো আমার! অত ভাবনা কিসের?

অখিল শিউরে উঠে।

তোমার গয়নায় পেট চালাতে হবে? অসম্ভব।

দায়ে-বেদায়ে লাগে বলেই তো গয়না। কোন কাজে আসবে না তো সোনার বোঝা বয়ে বেড়ানো কি জন্যে?

অখিল উত্তেজিত হয়ে বলল, জীবন যায় সে-স্বীকার—তোমার গয়না নিতে পারব না।

সোঁ করে এক চুমুকে শরবত খেয়ে নিয়ে ক্লান্তিতে সে শুয়ে পড়ল।

চোখ বুজে আধ ঘণ্টাখানেক কাটল এমনি। তার পর উঠে বসে চিন্তিত মুখে অখিল বিড়ি ধরাল। সুরমা আয়নায় দাঁড়িয়ে উড়ন্ত চুলগুলো ঠিক করছিল। শৌখিন মেয়ে—সর্বদা ছিমছাম হয়ে থাকতে ভালবাসে।

মৃদু হেসে সুরমা বলে, খুব একচোট ঝগড়া হয়ে গেল উপরের ফ্লাটের লিলি-দির সঙ্গে। লোকে যে কত রকমে শত্রুতা সাধতে চায়! ওর বর নাকি রেসের মাঠে তোমায় দেখে এসেছে।

অখিল বলে, মাঠে নয়—মাঠের পাশে বটতলায়। খিদিরপুরে একটা কাজের খোঁজ পেলাম। লালদীঘি থেকে হেঁটে পাড়ি দেবার সময় জিরিয়ে নিচ্ছিলাম একটুখানি।

তাই বললাম আমি লিলি-দিকে। তোর বর রেসে যায়, সেইটেই প্রমাণ হল এর থেকে। নইলে সে দেখল কি করে? রাগ করে চলে এসেছি। অকথা-কুকথা শুনতে আর কোন দিন যাচ্ছি না উপরে।

অখিল নিঃশ্বাস ফেলে বলে, দুপুরের রোদে মাঠ ভেঙে লালদীঘি থেকে খিদিরপুর। দু-পয়সার বিড়ি সম্বল। ধোঁয়া ছাড়া কিছু পেটে পড়ে নি। তুমি শরবত তৈরি করে দিলে. অমৃতের মতো লাগল।

কাঁদো-কাঁদো হয়ে সুরমা বলে, দেখ তো—ছাই গয়নার বাক্স তবু বয়ে বেড়াতে বলো আমায়?

কিন্তু অখিল কিছুতে শুনবে না।

জীবন যাবে, তবু নয়। আমার বোতাম আংটি রয়েছে—তাই বন্ধক দেবো। চাকরি হলে আবার ছাড়িয়ে আনা যাবে।

সুরমারও তেমনি জেদ।

জীবন যাবে তবু তোমার শখের জিনিষে হাত দিতে দেবো না। আমার বলে এত গয়না—

চাটুজ্জে-দম্পতি পাশের ঘরের ভাড়াটে। শনিবারে আজ চাটুজ্জেমশায় সকাল সকাল অফিস থেকে ফিরেছেন। এদের মনোহর কলহ উপভোগ করছেন তাঁরা দরজার ওধার থেকে।

চাটুজ্জে-গিন্নি বলেন, শুনছ? শুনে শেখো। কানের মাকড়িজোড়া তুমি বেচে দিয়েছিলে, বিয়ের বছরটাও পেরোতে দাও নি।

চাটুজ্জেও বলেন, ছেলেমানুষ বউটি কি বলছে—শোন একটু কান পেতে। বুড়ো হয়ে গিয়েছ—সেই মাকড়ির শোক আজ অবধি ভুলতে পারলে না।

অখিল ঘুমিয়ে পড়লে সুরমা ছুটল উপরতলায় লিলি অর্থাৎ লীলাবতীর কাছে। সাড়া দিতে লিলি বেরিয়ে এলো।

এই রাত্রে?

আজকে আবার আংটি-বোতামের বায়না ধরেছে। সব গেছে—শনির দৃষ্টিতে এ দুটিও থাকবে না। তুই রেখে দে ভাই। কি জানি—তালা খুলে চুরি করে যদি বের করে নেয়। অভ্যাস আছে তো!

দু-চোখে জলের ধারা বইছে। লিলি আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিল।

সুরমা বলে, আর একটা কথা। তোর বরকে বলে গিণ্টির আংটি-বোতাম

ঐ রকম এক সেট গড়িয়ে দে ভাই। আমার সর্বস্ব ঘুচিয়ে ও যেমন গিন্নির গয়নায় বাক্স ভরিয়ে রেখেছে ঠিক তেমনি।

জমাখরচ

ছোট মেয়ের বিয়ের রাত্রে রসময়বাবু আকস্মিকভাবে মারা গেলেন। মন্ত্র-পড়া এবং কনের পিঁড়ি ঘোরানো ইত্যাকার অনুষ্ঠানগুলো হয়ে গিয়েছিল, তাই রক্ষা। হঠাৎ কি হল—কোন ডাক্তার তার হদিস পায় না।

দাহ করে আগুনে হাত-পা সেঁকে নিমপাতা চিবিয়ে এবং লোহা ছুঁয়ে পরের দিন দুপুরে ওঁদের বৈঠকখানায় বসেছি, সদ্যবিধবা যোগমায়া দেবী এসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। সম্পর্কে তিনি আমার দিদি হন। রসময়বাবুর গুণপনার কত কথাই যে বললেন! তার পরে চোখ মুছে বললেন, দেখ তো পাওনাথোওনা কার কাছে কি আছে। সমস্ত জমাখরচ আছে ওঁর। আমার চোখ ভাল নয়, তুমি ভাই পড়ে দেখ একটু ভাল করে।

চোখ ভাল থাকলেও তিনি পড়তে পারতেন না। অক্ষর চেনেন না, সে আমি জানি। কিন্তু কী বিপুল কাণ্ড করে গেছেন রসময়বাবু! খেরো-বাঁধা বড় বড় খাতায় প্রকাণ্ড এক আলমারি ভরতি। প্রথম জীবন থেকে প্রতিটি দিন প্রত্যেকটি পাই-পয়সার হিসাব রেখে গেছেন। কোন মনিব আছেন কোথায়—তাঁর কাছে দাখিলের জন্য কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব তৈরি। পাওনার খোঁজ পেলাম না, কিন্তু রসময়বাবু কি রোগে মরেছেন, সেটা যেন ধরি-ধরি করছি। জমাখরচ থেকে রোগের নিদান নির্ণয়। ইতস্তত কয়েকটা হিসাব তুলে দিচ্ছি, আপনারাও দেখুন—

২৮শে বৈশাখ—

বড় মেয়ে কুন্তী ছবি আঁকিবে। ঐ বাবদ মাস্টারের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়	৪৲
কুন্তীর সাবান গন্ধতেল স্নো ক্রীম পাউডার ও জুতা একুনে	১৩৷৶১০

১২ই জ্যৈষ্ঠ—

চা এক পাউণ্ড	২৲
বিস্কুট এক টিন	২৷৷৶০

মাখন এক কৌটা	২৸০
ময়দা ⁄২॥	১৸০
ঘৃত ⁄১	৪৸০
২রা আষাঢ়	
চিত্রলেখার মাস্টারের এক মাসের মাহিনা	২৫৲
চিত্রলেখা ও মাস্টার মহাশয়ের সিনেমার টিকিট	২॥০
ঐ বাবদ ট্যাক্সি ভাড়া ইত্যাদি	৩।৶০
(কুন্তীর নাম চিত্রলেখা হল বুঝি ! ছবি আঁকে সেই কারণে ?)	
৪ঠা শ্রাবণ —	
চিত্রলেখার পাকাদেখার খরচ মোট	২০।৶০
শুভবিবাহের নিমন্ত্রণপত্র ছাপা	৪॥০
২২শে শ্রাবণ—	
শুভবিবাহে মোট ব্যয় (খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ হেতু নিমন্ত্রিতবর্গকে চিনাবাদাম-ভাজা দেওয়া হইয়াছিল।)	১২৭॥/০
২৪শে শ্রাবণ	
মেজ মেয়ে খুন্তি গান শিখিবে। ঐ বাবদ গানের ইস্কুল ভরতি করিবার ব্যয়	২৫৲
হারমোনিয়াম	৬৫৲
(বিয়ের হাঙ্গামা মিটতে না মিটতেই ! অকারণে সময়ক্ষেপ রসময়ের ধাতে সইত না।)	
১৫ই ভাদ্র	
গানের মাস্টারদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ এবং জলসা ইত্যাদির ব্যয়	৫০।৵০
১৬ই ভাদ্র—	
গীতলেখার জন্য সেতার খরিদ	১০২৲
(খুন্তি হয়ে গেল গীতলেখা। রসময় রসিক ছিলেন নিঃসন্দেহে।)	
১৯শে ভাদ্র—	
সেতার-শিক্ষকের জলযোগাদির জন্য মাং বড়বউ	৩॥০
ঐ সিগারেট ইত্যাদির জন্য গীতলেখার নিকট জমা রাখা হয়	৫৲
৩০শে ভাদ্র—	
সুরঞ্জনের পিতার কাছে যাওয়ার বাসভাড়া	৶১০
টিঞ্চার আইডিন, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি	৸৶০
ফিরিবার ট্যাক্সি	৩৲

(বিয়ের প্রস্তাব করতে গিয়ে এই দুর্গতি ? কি সর্বনাশ !)

২রা কার্তিক—	৫—১
স্বরঞ্জন ও গীতলেখার পরিণয়ে রেজিস্ট্রেশন ফী ও অন্যান্য বাবদ	৩৩।৵০
(শেষরক্ষা হয়েছে, তবু ভাল !)	
৩রা কার্তিক—	
খেঁদির প্রাইভেট-মাস্টারের জন্য বিজ্ঞাপন	৪৲
খেঁদির জুতা, সাবান, পাউডার, স্নো ইত্যাদি সেলসট্যাক্স সহ	১৮।৵০
বই-খাতা	১২৶০
১৭ই অগ্রহায়ণ—	
মাস্টারের নভেম্বরের মাহিনা	২৫৲
মঞ্জুশ্রী ও মাস্টারের সিনেমার টিকিট	২॥০
ঐ বাবদ ট্যাক্সিভাড়া ও অন্যান্য	৩॥৴০
১৯শে পৌষ—	
মাস্টারের ডিসেম্বরের মাহিনা	২৫৲
এক পাউণ্ড চা	২॥০
বিস্কুট এক টিন	৩৸৵০
মাখন এক কৌটা	৪৲
ময়দা /২॥	২॥০
জানুয়ারী মাসে মাস্টারের মিষ্টান্ন ইত্যাদির দরুন বড়বউর কাছে জমা রাখা হয়	১৫৲
২২শে মাঘ—	
মাস্টারের জানুয়ারির মাহিনা	২৫৲
২৩শে ফাল্গুন—	
মাস্টারের ফেব্রুয়ারির মাহিনা	২৫৲
৩০শে কার্তিক—	
মার্চ হইতে আগস্ট পর্যন্ত মাস্টারের মাহিনা সমেত সুদ-খরচা শোধ মাং মাস্টারের পিতৃদেব শ্রীনকুলচন্দ্র ধাড়া	১২৭৲
(মোট আট মাসের মাইনে নিয়ে নিল গালে চড় মেরে – উঃ !)	
৩রা অগ্রহায়ণ—	
খেঁদির পাকাদেখার খরচ	২৩।৵০
বরপণ মাং শ্রীনকুলচন্দ্র ধাড়া	৩০০১৲

(আর মঞ্জুশ্রী নয়—পুনশ্চ খেঁদি।)

৭ই অগ্রহায়ণ

বাড়ি-বন্ধকের দলিল-সম্পাদনের খরচ মোট ৩৩৫৷৷০

২১শে অগ্রহায়ণ—

খেঁদির বিবাহের গহনার মূল্য শোধ মাং শ্রীঋষিভূষণ মালাকার ১৭১০৮৵

শ্রীমতী খেঁদির বিয়ের তারিখ ২৪শে অগ্রহায়ণ। রসময়বাবু ঐ রাত্রেই দেহত্যাগ করেন। বিয়ের আনুষঙ্গিক খরচপত্র জমাখরচে লিখে যেতে পারেন নি।

খাজাঞ্চিমশায় ও ভাইঝি

ছোট শহর, দু'টি মাত্র পাকা-রাস্তা। রাস্তায় কেরোসিনের আলো সব সাকুল্যে গোটা কুড়ির বেশি নয়। কিন্তু মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনের উদ্যোগ-আয়োজন দেখে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

মিস্ত্রি-মজুর তো অনেকেই। তারা অত শত বোঝে না, জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ মশাই, চাকরিটায় মাইনে কত?

বিমানবিহারী জবাব দেয়: এক পয়সাও নয় ভাই। এ শুধু ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ানো।

তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, কথাটা বিশ্বাস হতে চায় না। বিমান জমিদারের ছেলে, কলকাতায় থেকে লেখাপড়া করত। এই কিছুদিন হল, বাড়ি এসে জমিদারি দেখতে আরম্ভ করেছে। জমিদারির কতদূর কি বোঝে, সে বলতে পারবেন বুড়ো খাজাঞ্চি গোপাল ঘোষ। আরও অনেকে হয় তো পারবে, কিন্তু সে যাই হোক, তার মোটরের হর্ন শুনলে কাছারির আমলা-গোমস্তা মায় ম্যানেজারকে অবধি তটস্থ হতে হয়। বুড়ো কর্তা শ্রীনাথ রায় অবধি ছেলের সামনে কথা বলতে ভরসা পান না। যে দুটো পাকা-রাস্তা আছে, তার উপর দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা ধুলোর ঝড় উড়িয়ে বিমান মোটর হাঁকিয়ে বেড়াত। সেই লোক ইদানীং খদ্দর পরে গান্ধি-টুপি মাথায় দিয়ে হেঁটে জনে জনের কাছে ধরনা দিয়ে বেড়াচ্ছে, বিনা-লাভে মহিষ তাড়াবার এমন উৎসাহ কলিকালের দিনে আর দেখা যায় না।

চোখ টিপে একজন মন্তব্য করল : আছে, আছে গো—মাইনে না থাক, দু-চার পয়সা এদিক-ওদিক আছে বই কি!

আস্তে বললেও কথাটা বিমানের কানে গিয়েছে। ঘাড় নেড়ে তৎক্ষণাৎ সে স্বীকার করে নিল : আছেই তো, ঠিক বলেছ ভাই। সেই লোভেই শামলা-ছেঁড়া ছোকরা উকিলের দল উঠে পড়ে লেগেছে। আর, যেখানে এক টাকা দিলে হয়, তোমরা সেখানে চার টাকা ট্যাক্স দিয়ে মরছ।

ছোকরা উকিলই বটে, কিন্তু দলসুদ্ধ নয়—একটি মাত্র লোক। সে কিশোরীলাল। বিমান বুঝল, কিশোরীলাল সম্বন্ধে বিষোদ্গার কেউই কানে নিচ্ছে না। কিন্তু এই সব বলতেই তো আসা! বলতে লাগল, সে রকম আর হবে না ভাই সকল। তোমাদের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে জানত সবাই—পেটের ভাবনা ভাবতে হয় না। উপরি আয়ের কি দরকার আমার? নতুন বাজেটের সময় ট্যাক্স এবার অর্ধেক কমিয়ে দেব।

বিমান উঠে যেতে খুব হাসাহাসি আরম্ভ হল। একজন বলল, চোর সবাই। কিশোরীবাবুও যে সাধু, তা বিশ্বাস করি নে—যে যাই বল। তবে তার হল ছেঁড়া জামা আর পাঁচসিকের জুতো। ওই জামা-জুতোর দামটাই না-হয় সে উশুল করবে। তুমি বাবা জমিদারের ছেলে, হেঁ হেঁ, তুমি গেলে মোটরের তেল জোগাতে আমাদের হাড় ক-খানা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

এই মহাযুদ্ধে জনৈক উলুখড়ের বিষম বিপদ হয়েছে, তিনি গোপাল খাজাঞ্চি। পঁচিশ বৎসর চাকরির মধ্যে এমন অঘটন আর কখনও ঘটেনি। অপরাধের মধ্যে কিশোরীলালের খুড়া তিনি। কেবল খুড়া বললেই হবে না, বাপের চেয়ে বেশি। গোপাল জমা-ওয়াশিল-বাকি করেই জীবনটা কাটিয়ে দিলেন, বিয়ে করার ফুরসত হল না। গান-বাজনা করতে জানেন না কিন্তু ঐ বিষয়ে অনুরাগ খুব। আনুষঙ্গিক আর একটা শখ আছে, বটতলার বাছা বাছা গানের-বই ও নাটক পড়া। এরই উপর এসেছে কিশোরীলাল ও বনমালা—ভাই-বোন দু'টি। বছর দশেক আগে তারা মা-বাপ হারিয়েছে, এই দশ বছর ধরে গোপাল ঐ মনিব দু'টির কাছে বড় ভয়ে ভয়ে থাকেন। অত ভয় তিনি শ্রীনাথ রায়কেও করেন না।

দুপুরে ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে গোপাল গড়গড়ার নলটি কেবল মুখে ধরেছেন, বনমালা অগ্নিমূর্তিতে এসে দাঁড়াল।

শুনেছেন কাকাবাবু?

নল মুখ থেকে পড়ে গেল।

বিমানবাবু নাকি বলে বেড়াচ্ছেন, 'পিঁপড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে—'

কবিতা শুনে গোপাল মহা খুশি হয়ে উঠলেন: বলেছে নাকি? তা হলে পড়াশুনো করেছে কিছু কিছু। আমি ভাবতাম, কলকাতায় বসে বসে খালি ঘাস কাটত।

নিজের রসিকতায় গোপাল নিজেই হেসে উঠলেন। বললেন, বড্ড খাসা পদ্য রে, অমন আর হয় না। ওর পরের ছত্র বলতে পারিস মালা?

তাঁর উল্লাসে কিছুমাত্র যোগ না দিয়ে বনমালা বলতে লাগল, আর বলেছেন, তুমি নাকি তাঁদের এস্টেটের টাকা ভেঙে দাদার ইলেকশনের জন্য খরচ করছ।

বলেছে নাকি? গোপালের মুখের হাসি নিভে গেল। বললেন, এটা মিথ্যে কথা। কিশোরী তো একটা পয়সাও আমার কাছ থেকে নেয় না।

বনমালা বলল, আচ্ছা কাকাবাবু, এই বুড়োবয়সে তোমার চাকরির দরকারটা কি?

গোপাল ঘাড় নেড়ে বললেন, কিছু না, কিছু না।

কিশোরী কোর্টে যায় নি, কোন্ দিক দিয়ে এসে অতি-সংক্ষেপে সে রায় দিল: ওই চাকরি ছেড়ে দিতে হবে।

চাদরটা কাঁধে ফেলে গোপাল তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন। গলি পেরিয়ে সদর রাস্তায় এসে তবে হাঁফ ছাড়লেন। জমিদারবাড়ি এসে চুপি চুপি মহেশ দারোয়ানের কাছে শুনলেন, সংবাদ বড় শুভ—বিমান বাড়ি নেই, দুপুরে দুটো নাকে-মুখে গুঁজে দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেছে। শ্রীনাথ উপরে আছেন, তিনিও নামেন নি।

তিন-চার জনে প্রকাণ্ড এক সামিয়ানা কাঁধে ভিতরে ঢুকল।

ব্যাপার কি?

মহেশ বলল: শোনেন নি খাজাঞ্চি বাবু? মঙ্গলবারে যাত্রা হবে।

গোপাল উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, বলিস কি! কার দল? কি পালা হবে, শুনেছিস্ কিছু?

মহেশ বিরক্তমুখে বলতে লাগল—জ্বালাতন আর কি! মঙ্গলবারে সমস্ত রাত জেগে আবার বুধবারে ওই হাঙ্গামা। আমাদের যেন মানুষের শরীর নয়! বড়বাবুর বিচার-বিবেচনা নেই।

তখন মনে পড়ল, ইলেকশন তো বুধবারে। তার অবশ্য পাঁচ দিন বাকি। গোপাল চিন্তিত ভাবে বললেন, গোলমালের মধ্যে যাত্রা কি জমবে?

কর্তামশায়ের খেয়াল হয়েছে বোধহয়। নইলে আর এমন বুদ্ধি কার?

মহেশ বলল, বুদ্ধি বড়বাবুর। যাত্রা না, ঘোড়ার-ডিম। যারা ভোট দেবে, যাত্রার নাম করে তাদের রাত্রি থেকেই আটকে রাখবার ফিকির। সকালবেলা গাড়িতে পুরে পুরে চালান করবে। মিষ্টি-মণ্ডা খেয়ে ভোট দিয়ে তারপর ছুটি। একটু চুপ করে থেকে বলল, বুদ্ধিটা খুব ভাল। কিন্তু আমাদের যে জানে কুলোয় না।

কাছারি-ঘরে ঢুকে গোপাল হাতবাক্সর সামনে বসলেন। বাঁ দিকে রাশীকৃত কান-ফোঁড়া খাতা। সেই সব খাতার নিচে আছে অভিমন্যু-বধ গীতাভিনয়। হাতবাক্সে কনুই ভর দিয়ে পা ছড়িয়ে গোপাল বই খুলে বসলেন। তারপর কর্তা নামলেন, নেমে বৈঠকখানার দিকে গেলেন। গোপাল চোখ না তুলেই সমস্ত টের পাচ্ছেন। চোখ তোলবার জো নেই—খাসা জমেছে বইখানা, বড় চমৎকার বই।

একটু পরেই ডাক এল: গোপাল!

আজ্ঞে, যাই।

আরও পাতা দুই এগিয়েছে। কর্তা আবার ডাকলেন: কই গো, কি করছ তুমি?

রসভঙ্গে বিরক্ত হয়ে গোপাল জবাব দিলেন: একটা জরুরী হিসেব দেখছি, দেরি হবে।

মিনিটখানেক পরে প্রবল হাসির সঙ্গে সচকিত হয়ে মুখ তুলে দেখেন শ্রীনাথ স্বয়ং এসে দাঁড়িয়েছেন। হাসতে হাসতে বললেন, আ-হা-হা ঢাকছ কেন? দেখি দেখি, হিসেবটা কিসের! পরশু থেকে বইটা উড়ে গেছে—তখনই জানি, গোপালচন্দোর ঐ নিয়ে হিসেব ধরছেন। বলি, এমন অভিনিবেশ ইস্কুলে পড়বার সময় ছিল কোথায়! তা হলে যে চাই-কি একটা হাকিম হয়ে বসতে পারতে।

বুড়োর দু-হাতে দুটো রেকাবি। একটা রেকাবি হাতবাক্সর উপর রেখে বললেন, লুচি ন্যাকড়া হয়ে যাচ্ছে, ও নড়বড়ে দাঁতে ছিঁড়বে না হিসেবটা না-হয় দু-মিনিট বন্ধ থাকুক। ওরে হীরু, জল দিয়ে যা দু-গেলাস।

মহানন্দে আহার চলছে, এমন সময়ে সুতীব্র আলোয় সমস্ত উঠান উদ্ভাসিত করে বিমানবিহারীর মোটর এসে দাঁড়াল। জুতোর আওয়াজে মার্বেলের মেজে কাঁপিয়ে সোজা সে এসে দাঁড়াল কাছারিঘরের মধ্যে।

ইতিমধ্যে জাদুমন্ত্রে যেন সেখানকার অবস্থা বদলে গেছে। শ্রীনাথের হাতের রেকাবি ঢুকেছে তক্তাপোষের তলায়, আর গোপালেরটা গেছে

খাতাপত্রের আড়ালে। হাতের কাছে এক আদালতের সমন পেয়ে গোপাল তারই উপর শশব্যস্তে যোগ দিয়ে চলেছেন।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বিমান বলল, এখানে কি বাবা ?

শ্রীনাথ বললেন, জলকরের হিসেব নিচ্ছি। তুমি যাও বাবা, কাপড়-চোপড় ছেড়ে ঠাণ্ডা হও গে।

বিমান বলল, ঠাণ্ডা হব কি, মাথায় আমার আগুন জ্বলছে। সমস্ত অঞ্চল ঘুরে দেখে এলাম, কোন আশা নেই।

শ্রীনাথ অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। একবার ছেলের দিকে আর একবার গোপালের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, তা হলে কি হবে ?

এমন কিছু হবে না। কিশোরী জিতবে, আমি বিষ খাব। বলে গোপালের দিকে কঠোর একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিমান গট-মট করে উপরে উঠে গেল।

গোপাল নিশ্বাস ফেলে নড়ে চড়ে বসলেন। শ্রীনাথ বলতে লাগলেন, পাগল, পাগল ! আমাদের সময় এসব ছিল না, আমরা বেশ ছিলাম। আমরা খেতাম, ঘুমোতাম, পাশা খেলতাম, কোন হাঙ্গামা ছিল না। কি বল হে গোপাল ?

গোপাল ততক্ষণে পুনশ্চ গীতাভিনয় খুলে বসেছেন। শ্রীনাথেরা কথা তাঁর কানে গেল না। বললেন, কর্তামশায়, যাত্রায় কি পালা হবে ঠিক করলেন ?' অভিমন্যু-বধ হোক না, খাসা জমবে।

বেশ, বেশ ! তোমরাই ঠিক কর। তারপর গোপালের হাত ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে বললেন, ওঠো হে, সন্ধ্যে হয়ে গেল, আর কত কাজ করবে ? চলো, একহাত পাশায় বসি গে।

হাতবাক্স ও লোহার সিন্দুকে চাবি এঁটে সমস্ত গুছিয়ে-গাছিয়ে নিতে, এর মধ্যে বিমান আবার নেমে এলো। এ সময়ে তার নামবার কথা নয়, আজ তার চোখে মুখে যেন আগুন ফুটে বেরুচ্ছে। এসে গম্ভীরভাবে চেয়ার টেনে বসল। গোপালের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল : খাজাঞ্চিমশায়, কিশোরীকে বলেছিলেন সে কথা ?

গোপাল ঘাড় নাড়লেন : আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীনাথ বললেন, কি কথা বাবা ?

বিমান বলতে লাগল, আমার চিরশত্রু কিশোরী। কলেজে পাশাপাশি বসতাম, ও ক্লাসে বসে ঝিমোত, ক্লাসের বাইরে হৈ-হৈ করে বেড়াত, আর আমি সমস্ত রাত জেগে পড়তাম। তবু সে কোন বার আমায় ফার্স্ট হতে দেয়

নি। এবার ইলেকশন হচ্ছে, তাতেও সে আমার পথ আটকে দাঁড়াল। নতুন উকিল হয়ে এসেছে, যাতে প্রাকটিশ জমে সেই তো তার দেখা উচিত। আমি বরং দু-দশ জনকে বলে দেব। এই আমাদের এস্টেটেই কত কাজকর্ম রয়েছে। এসব হাঙ্গামে দরকারটা কি? সব কথা ভাল করে বুঝিয়ে বলেছিলেন খাজাঞ্চিমশায়?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সরে দাঁড়াতে রাজি হয়েছে?

গোপাল মৃদুস্বরে বললেন, আজ্ঞে।

উৎসাহের প্রাবল্যে বিমান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল: বেশ বেশ, তবে আর কি! তা হলে লিখে দিক একটা-কিছু, আমি কালই ছাপিয়ে বিলি করে দেব।

হঠাৎ গোপালের মুখের দিকে চেয়ে সন্দেহ হল। বলল, আপনি বলেন নি বোধহয় খাজাঞ্চিমশায়?

গোপাল সভয়ে জবাব দিলেন, আজ্ঞে বলব।

মুহূর্তে বিমানের দৃষ্টি রুক্ষ, স্বর কঠোর হয়ে উঠল: বলবেন বই কি? কিশোরী কেল্লা-ফতে করুক, এই সব বলে বলে হাসি-ঠাট্টা করবেন।

তারপর চারিদিক তাকিয়ে বলে উঠল, ওঃ, জলকরের নিকেশ নেওয়া হয়ে গেছে এর মধ্যে? খাতাগুলো আর একবার দয়া করে বের করতে হবে। আমি দেখতে চাই।

সকলে নির্বাক ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মাটির দিকে তাকিয়ে বিমান মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে রইল, তারপর মুখ ফিরিয়ে দ্রুতবেগে উঠান পেরিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। খাতা বের করবার অপেক্ষায় রইল না।

এরই দিন দুই পরে এক কাণ্ড হয়ে গেল। গোপাল সম্প্রতি নদীর ধারে নূতন বাড়ি করেছেন। বিমান শুনেছে কথাটা, কিন্তু তেমন কানে নেয় নি। এক একটা রাস্তা ধরে তারা ঘুরছিল। তখন আসন্ন সন্ধ্যা, নদীর জল ডুবন্ত সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে। বিমান আর জন দুই-তিনকে নিয়ে ঢুকে পড়ল গোপালের বাড়ি। নিচের তলায় কেউ নেই, ঘর-দোর হাঁ-হাঁ করছে।

অক্ষয় সন্দেহ প্রকাশ করল: এই বাড়ি ভাড়া নিয়েছে ভূপাল শা? কখনো নয়। আড়তদার মানুষ, এ রকম পছন্দ পাবে কোত্থেকে।

ফিরে যাবে মনে করছে, এমন সময় আলো হাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো বনমালা। বিমান চেনে না, কিন্তু বনমালা তাকে চিনতে পারল। ছোটবেলা কতবার সে গোপালের সঙ্গে জমিদার-বাড়ি গিয়েছে, বিমান ছুটিতে বাড়ি

আসত, সেই সময় তাকে দেখেছে। বনমালা বলল, আসুন—

আলো রেখে সকলকে চেয়ার দেখিয়ে দিল : কি দরকার বলুন তো ?

এমন সপ্রতিভ মেয়ে বিমান খুব কম দেখেছে। এ রকম জায়গায় তো আশাই করা যায় না। ছাপানো নানা রকম নিবেদনপত্র তারা ছড়াতে ছড়াতে যাচ্ছিল, একজনে তার একখানা বনমালার হাতে দিল।

বনমালা হেসে বলল, ভোট চাইতে এসেছেন ?

বিমান বলল, বুঝেছেন তো দুর্ভোগ ! বাড়ির কর্তারা কোথায় ?

বনমালা বলল, এখন কেউ নেই। থাকুন আর না থাকুন, এ-বাড়ির ভোট আপনি তো পাবেন না।

এ রকম স্পষ্টভাষায় কেউ 'না' বলে না। স্বীকার করে, এমন কি দিব্যি করে বলতেও অনেকে গররাজি নয়। যদিও বিমান জানে, সেই দিব্যি-ওয়ালাদের শতকরা নব্বুই জন ভিন্ন দলের। বিমান চমকে গেল। বলল, ভোট পাব না, কারণটা শুনতে পাই ?

বনমালা বলল, কারণ একটা নয় তো। প্রথমত আপনি বড়লোক, অতএব ভিন্ন জাত—

বিমানবিহারী অধীরভাবে তর্ক আরম্ভ করল : কেন বড়লোক হওয়া কি অপরাধ ? বড়লোক হলে মানুষ হতে নেই ? এসব ধারণা কেন আপনাদের হয় ? কে বলে বেড়ায় এসব ?

বনমালা বলল, আচ্ছা, এ বিচার না হয় আর একদিন হবে। আজ আপনার অনেক কাজ। বরঞ্চ অন্য কোথাও গিয়ে ভোটের চেষ্টা করলে মিছামিছি সময় নষ্ট হবে না।

বিমান আরও চেপে বসল : থাকুক কাজ। চাই না অন্যের ভোট। খান-দুই মোটর আছে বলেই আপনাদের ভোট পাবার অনধিকারী নই, এইটে প্রমাণ করে তবে আজ এখান থেকে উঠব।

বনমালা খিল-খিল করে হেসে উঠল। বলে, প্রমাণ করলেও ভোট পাবেন না। যেহেতু এটা গোপাল ঘোষের বাড়ি। কিশোরীলাল ঘোষ আমার দাদা।

বাড়িতে কেউ নেই, এটা বনমালা মিথ্যা বলেছিল। গোপাল ছিলেন, তিনি এসব টের পান নি। তিনি উপরে ছিলেন। বনমালা বলল, শোন কাকাবাবু আজ মজা হয়েছে। বিমানবাবু এসে হাজির। বলেন, ভোট দাও। তারপর হেসে বলল, আমার ভোটটা আমি ওঁকে দেব ভাবছি।

গোপাল সায় দিয়ে বললেন, দেওয়া তো উচিত। কিশোরী যদি এই

খেয়ালটা ছাড়ত, আমার ভোটও ওকে দিতাম। বড্ড ভাল ছেলে।

বনমালা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, ভাল না ছাই। কি বলছিল, জান?

গোপাল রীতিমত চটে উঠলেন: বলেছে তো গায়ে ফোস্কা উঠেছে নাকি? অমন ঢের ঢের বলে থাকে। আমাদের সময় কি হত? তখন ভোটের কুরুক্ষেত্তোর ছিল না, বেধে যেত তবলার বোল, কি পাশার দান নিয়ে। তোদের আমলে খালি মুখের কথা—আমাদের বেলায় হাতাহাতি হয়ে যেত।

পরদিন বাপের সঙ্গে দেখা হতেই বিমান বলল, খাজাঞ্চিমশায়ের বাড়িখানা দেখেছ?

শ্রীনাথ উৎসাহ ভরে বলতে লাগলেন, খাসা বাড়ি। আমায় নিয়ে গিয়েছিল একদিন। যাই বল বাবা, আমাদের বাড়ি বড় বটে—কিন্তু গোপালের বাড়ি ছোট হলেও ছবির মতো। আমার তো ইচ্ছে করে, ওই রকম একটা জায়গা পেলে রাতদিন গিয়ে থাকি।

বিমানের মুখের দিকে চেয়ে বুড়োর কথা বন্ধ হল। ভ্রূকুঞ্চিত করে বিমান বলল, বাড়ি ভাল, তা জানি। কিন্তু উনি মাইনে পান কত?

শ্রীনাথ ইতস্তত করে বললেন, তিরিশ বোধ হয়।

বিমান বলল, তিরিশ নয়, আটাশ টাকা। তা-ও আট মাস বাকি পড়ে রয়েছে, নিয়ে যাবার ফুরসত হয় না। পাঁচ বছরের কাগজ উল্টে দেখলাম, পুজোর সময় উনি একসঙ্গে বারো মাসের মাইনে নিয়ে থাকেন। বাকি এগার মাস কি করে চলে তা হলে?

সে কৈফিয়ৎ যেন শ্রীনাথের দেবার কথা। বলতে লাগলেন, জমাজমি আছে কিছু-কিছু। কিশোরীও রোজগার করছে।

আর বাড়ি?

করেছে—একরকম করে। বাড়ি-ভাড়া লাগে না, তাই চলে যায়।

কঠোর কণ্ঠে বিমান বলল, কিসে চলে তা বোঝবার বুদ্ধি আমার আছে। কিন্তু সেয়ানা, কাগজপত্রে ধরা-ছোঁয়া পাচ্ছি না। যাই হোক বাবা, নতুন খাজাঞ্চি রাখতে হবে, এস্টেট ফাঁক করে দিচ্ছেন। কাঁচা-পয়সা নইলে কিশোরী অমন করে দু-হাতে ছড়াতে পারে? কোর্ট থেকে নিজে যা আয় করে, সে তো আমার অজানা নেই।

একটু পরেই হেলতে দুলতে পান চিবোতে চিবোতে গোপাল এসে উঠলেন। বাপে ছেলেয় তখন কথাবার্তা হচ্ছে। প্রথমটা গোপাল বিমানকে দেখেন নি, তারপর দেখতে পেয়ে পাশ কাটাবার উদ্যোগে ছিলেন। বিমান ডাকল: শুনুন খাজাঞ্চিমশায়—

গোপাল তটস্থ হয়ে এসে দাঁড়ালেন।

আপনি ইংরেজী জানেন না। তাতে এস্টেটের কাজকর্মের অসুবিধা হচ্ছে। আমরা একজন ইংরাজি-জানা ক্যাশিয়ার রাখব।

গোপাল জবাব দিলেন : আজ্ঞে।

আজই আপনি ম্যানেজারের কাছে চার্জ বুঝে দেবেন। খেসারত হিসাবে আপনাকে তিন মাসের মাইনে দিয়ে দেওয়া হবে।

মাথা নিচু করে গোপাল বললেন, যে আজ্ঞে।

তাড়াতাড়ি কাছারি-ঘরে ঢুকে পড়তে পারলে গোপাল বাঁচেন। পিছন হতে বিমান বলল, বেলা হয়ে গেছে, এখন আর কাজ নেই—বিকেলেই সমস্ত বুঝিয়ে দেবেন তা হলে।

শ্রীনাথ চুপচাপ ছিলেন, কিন্তু বড় কটু হয়ে উঠেছে দেখে আর কথা না বলে পারলেন না। বললেন, অর্থাৎ তুমিই বলছিলে না গোপাল, চাকরি আর ভাল লাগে না। সেই কথা হচ্ছিল আর কি! তা তোমার যদি ইংরেজি-জানা তেমন কেউ থাকে, বরং—

বিদ্রূপের হাসি হেসে বিমান বলল, তা কিশোরী যদি আসে, চাকরিটা তাকে দিতে পারি। কোর্টে যা পায়, তার চেয়ে মন্দ হবে না।

সময় নষ্ট করবার লোক গোপাল নন, ঘরে ঢুকেই যথারীতি অভিমন্যু-বধ খুলে বসেছেন। হরিচরণ মুহুরি অনেক দিনের লোক, গোপালকে বড় ভালবাসে। এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল, খাজাঞ্চিমশায় বিমানবাবুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলুন একবার।

মুখ না তুলে গোপাল বললেন, কি বলব আবার ?

হরিচরণ বলতে লাগল, বাইরেটাই ওঁর ওই রকম। আসলে বড়বাবু লোক খারাপ নন। ইলেকশন নিয়ে মেজাজ বিগড়ে আছে কিনা!

থাকুক গে। বলে গোপাল গীতাভিনয়ের পাতা উল্টালেন।

বিমান কিন্তু ভুলে যায়নি। পরদিন আবার গোপালকে ধরে বসল, খাজাঞ্চিমশায়, ম্যানেজার বলছিল—আপনি হিসেবপত্র বুঝিয়ে দেন নি।

গোপাল বললেন, আজ্ঞে না।

আজই দেবেন।

ঘাড় নেড়ে গোপাল ঘরে গিয়ে উঠলেন।

মঙ্গলবার সকালবেলা দল এসে পড়ল। অধিকারীর গলায় বাইশখানা মেডেল। গোপাল সেদিন দুপুরে ঘুমুলেন না, খেয়ে উঠেই অমনি চাদর কাঁধে

ফেললেন। বনমালা রান্নাঘরের দিকে ছিল, যেন হাত গুণে টের পায়, সে ঝগড়া করতে এসে দাঁড়াল।

এক্ষুনি চললে যে!

গোপাল সভয়ে বললেন, জানিস নে তো কত কাজ!

কাজ, কাজ! জিজ্ঞেস করতে পারি, এত কাজের দরকারটা কি?

গোপাল হেসে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, দরকারটা কি, শোন কথা! বলি টাকাটা তো খোলামকুচি নয়—না খাটলে টাকা দেবে কেন?

ফলে উল্টো-উৎপত্তি হল। মেয়ের অভিমান উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বলে, কাকাবাবু, আমরা অনেক খাই, বুড়োবয়সে তাই তোমায় অমন করে খেটে মরতে হয়। বেশ, এখন থেকে একবেলা করে খাব। আসুক দাদা—

খেটে মরি আমি? গোপাল এবার হো-হো করে হেসে উঠলেন: গোপালচন্দোর খেটে চাকরি করে, এ তো শ্রীনাথ রায়ও বলতে পারবেন না। সকাল সকাল যাচ্ছি, সে না খাটবার ফিকির রে—সবাই রাত জেগে মরবে, আমি ন'টা না বাজতেই চলে আসব দেখিস।

যাত্রা বিকেলবেলা থেকে হবার কথা, কিন্তু আরম্ভ হতেই সাড়ে আটটা। গোপাল নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলেন: তাই তো, গান শোনা হবে আর কখন, আসর বন্দনাতেই আধ-ঘণ্টা কাটাবে। রোয়াকের উপর একখানা চেয়ারে উবু হয়ে বসে শুনছিলেন। তারপর উত্তরা এসে গলা কাঁপিয়ে গান ধরল। ঐ ছোকরাই গোপালের কাছে একটা বিড়ি চেয়েছিল বটে, গোপাল হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন। সে যে এমন খাসা গান গায়! গোপাল আর ওরকম ভাবে থাকতে পারলেন না, উঠানে আসরের মধ্যে এসে চেপে বসলেন। ঘড়িতে ন'টা-দশটা বেজেই চলল, গোপালের খেয়াল নেই।

মহেশ দারোয়ান এসে বলল, বড়বাবু ডাকছেন।

গোপাল অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিলেন: যাচ্ছি।

আবার খানিক পরে মহেশ এসে ডাকল: কই গো খাজাঞ্চিমশায়, বড়বাবু দাঁড়িয়ে আছেন, বড্ড দরকার, শিগগির আসুন।

গোপাল ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, একশ বার এক কথা! বললাম তো যাচ্ছি। তালুক লাটে উঠেছে নাকি?

মহেশ বলল, কথাটা কানে নেন নি—বড়বাবু ডাকছেন, কর্তামশায় নন।

কিন্তু পাণ্ডবদের তখন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা, অভিমন্যু ব্যূহভেদের উদ্যোগে আছেন। গোপাল মহেশের কথায় কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। বললেন,

[illegible] বড়বাবু। বড়বাবু ক্যাশ মেলেনি তো? বল্ গে যেয়ে, এখন হবে না, চার্জ সকালবেলা বুঝিয়ে দেবো।

মহেশ হঠাৎ ত্রস্তভাবে পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল। গোপাল মুখ ফিরিয়ে দেখেন, বিমানবিহারী স্বয়ং এসে দাঁড়িয়েছে। আসরের মধ্যে সে এসে দাঁড়াবে, এটা একেবারে অভাবিত। আরও আশ্চর্য, কণ্ঠস্বর তার মোলায়েম। বলল, একটুখানি না উঠলে তো হবে না খাজাঞ্চিমশাই—

আজ্ঞে। গোপাল তৎক্ষণাৎ উঠে বিমানের পিছু-পিছু চললেন। অভিমন্যু তখন ব্যূহের সামনে খুব লম্ফঝম্ফ সহকারে অ্যাক্টো করে বেড়াচ্ছে। রোয়াকে উঠে গোপাল একবার পিছন ফিরে সেদিকে তাকিয়ে নিঃশ্বাস ফেললেন। বিমান এ কোথায় নিয়ে যায়? এ যে উপরে চলল! সেখানে বারান্দার উপরে একখানা সোফা বিমান আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

সর্বনাশ! বনমালা এসে বসে আছে।

গোপালের রাগ হল। বললেন, ভোট দিবি, দিস। তা এখানে আসবার দরকার কি?

বিমানের মুখ হাসিতে ভরে গেল: আপনি ভোট দেবেন আমাকে?

বনমালা জবাব না দিতে মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গোপাল বলতে লাগলেন, দেবে বই কি! আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, সোজা কথা! ও বলেছে, ওর ভোটটা আপনাকেই দেবে। আবার তাই নিয়ে আমার সঙ্গে কত ঝগড়া!

বনমালার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে কথা ঘুরিয়ে নিল। বলল, ঝগড়া হয় সাধে! ঝগড়া না করে উপায় আছে তোমার সঙ্গে? রাত্রি ক-টা বাজল কাকাবাবু?

গোপাল বললেন, বলেছি তো ফিরতে ন'টা হবে। তাই বুঝি ছুটে আসা হয়েছে?

বনমালা বিমানের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে বলতে লাগল, আসব না তো বুড়োবয়সে রাত জাগিয়ে তোমায় মেরে ফেলবে, বসে বসে তাই দেখতে হবে নাকি? বাড়ি চলো কাকাবাবু, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, কানাই গাড়িতে বসে—

বিমানের অপরাধ নেই, সে গোপালকে থাকতে বলে নি। তবু সে রাগ করল না। বলল, বাড়ি যাবেন কি রকম? ভোট দেবেন যখন বলেছেন এইখানে থাকতে হবে।

বনমালা হাসিমুখে বলল, আটকে রাখবেন নাকি?

নিশ্চয়। যত ভোটার কেউ যেতে পারবে না। সবাইকে যাত্রা শুনতে

হবে। কাল ভোট দিয়ে তারপর ছুটি। তারপর হেসে উঠে বলল, মা, জেঠাইমা, ওঁদের সঙ্গে বসে যাত্রা শুনুনগে যান।

গোপাল মহানন্দে সায় দিয়ে উঠলেন: সেই ভাল, পালাটা জমেছে।

কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। সে উঠে দাঁড়াল। বিমানের নির্দেশ মতো যাত্রা শুনতে না বসে গোপালের হাত ধরে বলল, বাড়ি চলো।

এই রকম ক্ষেত্রে গোপাল কাউকে ভয় করেন না। হেঁকে উঠলেন, বলছি তো, রাত্তির হবে — ন'টার আগে ফিরব না।

ন'টা বেজে গেছে দেড় ঘণ্টা আগে। বনমালা দেয়াল-ঘড়িটা আঙুল দিয়ে দেখাল।

হুঁ, বাজলেই হল! অভিমন্যু এখনও ব্যূহের বাইরে রয়েছে, ঐ ব্যূহ ভেদ হবে, তারপর অভিমন্যু-বধ, তারপর জয়দ্রথ-বধ। ঘড়ি যদি লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, আমি তার করব কি?

বিমান নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। সমর্থনের আশায় তার দিকে তাকিয়ে গোপাল বললেন, যাঁদের চাকরি করি, কাল তাঁদের মহামারী কাণ্ড। তাতে আধঘণ্টা যদি দেরিই হয়, কি হবে?

চাকরিতে ইস্তফা দিতে হবে। পঁচিশ বছর শরীরপাত করেছ, আর করতে দেবো না।

গোপাল বললেন, দেবো তাই। যাত্রা ভেঙে যাক, কাল সকালে দেবো।

কোনদিক থেকে শ্রীনাথ সেই সময়টা এসে পড়লেন। তিনি বলে উঠলেন, সেই ভাল। আমিও ইস্তফা দেবো। তারপর বুঝলে গোপাল,, দু-জনে কাশী গিয়ে সেখানে পাশার ছক পেতে নেবো।

বলতে বলতে তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন।

বিমান বলল, সে কি করে হবে? ভেবে দেখলাম, ওঁকে ছাড়লে মুশকিল হবে। আমরা আগে কাজকর্ম শিখে নিই ভাল করে।

তারপর গোপালের দিকে চেয়ে বলল, বুঝলেন খাজাঞ্চিমশায়, চাকরি আপনি ছাড়তে পারবেন না।

যে আজ্ঞে—বলে গোপাল সসম্ভ্রমে ঘাড় নাড়লেন।

বিমান বলতে লাগল, আর ভেবে দেখলাম, মিউনিসিপ্যালিটিতে যাওয়া আমার পোষাবে না। কিশোরী যাক। ঘরের খেয়ে কে অত খাটবে। যত ভোটার এসেছে, যাত্রা থামিয়ে এখনই সকলকে বলে দিচ্ছি।

এবার গোপালের বিশেষ আপত্তি দেখা গেল। বললেন, আজ্ঞে, ব্যূহভেদটা আগে হয়ে যাক।

বিমান আপত্তি করল না, খুব হাসতে লাগল। ততক্ষণে গোপাল শ্রীনাথের সঙ্গে শশব্যস্তে নিচে নামতে লেগেছেন। চেঁচিয়ে বললেন, ওরে মালা, তুই তবে গিন্নিমাদের সঙ্গে বসে শোনগে যা। ব্যূহভেদ হয়ে গেলেই মায়েপোয়ে বেরিয়ে পড়ব।

বিমান মৃদুকণ্ঠে বলল, ব্যূহভেদ হয়ে গেছে বলে ভরসা হচ্ছে, কি বলেন?

যান। বলে বনমালা রাগ করে মেয়েদের ওদিকে চলে গেল।

বিমানের মা বলছিলেন, মেয়েটি বড় খাসা। যেমন পটের মতো চেহারা, তেমনই মিষ্টি কথাবার্তা।

বিমান বলল, বড্ড ঝগড়া করে মা, তোমাদের সামনেই ভিজে-বেড়ালটি।

মা হেসে বললেন, তোর সঙ্গে করেছে নাকি? তা হলে দেখেছিস তুই? তোর যা স্বভাব, ঝগড়াটে না হলে তোকে আঁটবে কে? কেমন লক্ষ্মীর মতো আমার পায়ের গোড়ায় বসেছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল, লক্ষ্মীকে ঘরে বেঁধে রাখি।

বিমানের এত পশার-প্রতিপত্তি, মায়ের কাছে কিছুই খাটে না। সে চুপ করে রইল।

তারপর একটুখানি ভেবে মা বলতে লাগলেন, তবে আমাদের গোপাল খাজাঞ্চির ভাইঝি—এই একটা কথা। কর্তার সঙ্গে যতই থাক, তবু ঘোষ-মশায় এখানে চাকরি করেন। তাঁরই ভাইঝি কিনা—

এবার বিমানের কথা ফুটল।

তা যদি বলো মা, তবে আমি কিছুতে শুনব না।

হাত-মুখ নেড়ে সে মহাতর্ক শুরু করল: বড়লোক, গরিব লোক, চাকর, মনিব—ওসব ভগবান করেন নি, মানুষে করেছে। সমস্ত উঠে যাচ্ছে। রাশ্যা বলে দেশ আছে শুনেছ? সেখানে সব সমান।

পৃথিবী কাদের?

একেবারে উঠানের উপরে বীজতলা, সেইখানে ধান বুনেছে। নতুন বর্ষায় ধানচারার রঙ হয়েছে মেঘের মতো কালো। নটবর লাঙল নিয়ে ক্ষেতে যাবার সময় দেখে, ক্ষেত থেকে ফিরে এসে দেখে, রাত্রিবেলা একঘুমের পর তামাক সেজে যখন দাওয়ায় বসে, তখনও ঐ বীজতলার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।

এরই মধ্যে একদিন সর্দি করে একটু জ্বর হয়েছে সৌদামিনীর। আর যাবে কোথায়! নটবর বলে, হুঁ হু—বুঝতে পেরেছি। ঘর তো নয়, ঐ হয়েছে যেন তেঁতুলতলা। বাইরের বৃষ্টি বন্ধ হয়, তেঁতুলতলার বৃষ্টি থামে না। রোসো—

ক্রোশ পাঁচেক দূরে ভদ্রার ও-পারে পিশশ্বশুরের বাড়ি। তাদের অবস্থা ভাল। নটবর ছুটল সেখানে। বলে, তিন কাহন খড় দিতে হবে গো পিসেমশাই। মেয়ে তোমাদের নবাবনন্দিনী। গায়ে ফোঁটা দুই জল লেগেছে, সেই থেকে বিছানা নিয়েছেন।

পিসে একটুখানি ইতস্তত করতে নটবর বলল, ডরাচ্ছ কেন গো? এই চারটে মাস দেরি কর—তোমার ঐ তিন কাহনের জায়গায় আরও এক কাহনের বেশি দাম ধরে দেব। জমিদার এবার লকগেট করে দিয়েছে, আমার বাইশ বিঘে জমিতে সোনা ফলবে। আর কিছু ভাবনা করি!

ক্ষেতের কাজের ফাঁকে ফাঁকে নটবর মটকায় উঠে ঘর ছায়। নিচে থেকে সৌদামিনী খড়ের আটি ছুঁড়ে দেয়। খড় সে অবধি বড় পৌঁছায় না, নটবরের কাছেও যায় না, গড়িয়ে আবার নিচে এসে পড়ে। নটবর বলে, এই তোর হাতের ঠিক? কোন কামের নোস রে বউ, তোরা পারিস কেবল বেগুন কুটতে। তাক করে ফেল্ দিকি।

খুব মনোযোগের সঙ্গে বউ তাক করে। খড় পড়ে এবার চালের উপর নয়—নটবরের পিঠের উপর।

উহু—হুঁ···এই?

বউ হেসে গড়িয়ে পড়ে। নটবরের ইচ্ছে করে, নেমে এসে ঐ পাগলীকে ধাক্কা মেরে জলকাদার মধ্যে ফেলে দেয়। সেখানে গড়িয়ে গড়িয়ে হাসুক—যত পারে, হাসুক।

নতুন ছাউনিতে ঘরখানা ঝকমক করে। নটবর দাওয়ায় শোয়। রাতের বাতাসে ধানচারার নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পায়। লালভেরেণ্ডা-ঘেরা উঠানের ফালির মধ্যে গাদাগাদি হয়ে তারা আর থাকতে চাইছে না, সীমাহীন বিলে যাবার জন্য অধীর হয়েছে। আপন মনে মাথা নেড়ে হাসিমুখে নটবর বলতে থাকে, সবুর, সবুর—মাটি ভেঙে তোদের জন্য গদি তৈরি হচ্ছে। হয়ে যাক, সবাইকে নিয়ে যাব, সবুর—

এক-একদিন ঘুমের ঘোরে নটবর চমকে ওঠে; মাঝরাতে বৃষ্টি নেমেছে। ঝড়ো বাতাসে জলের ছাট সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। একটুখানি সরে শুয়ে

আতসের মালসার কাছে বসে। ভুড়-ভুড় করে হুঁকো টানে, আর ভাবে, সকালটা হলে হয়—উঃ, কত রাত্রি এখনো!

বিছানাটা বেড়ার দিকে টেনে নিয়ে আবার শুয়ে পড়ে। ঘুমোবার জো আছে! তখনই ধড়মড় করে ওঠে। ফরসা তো প্রায় হয়েই গেছে। জোরে জোরে সে দরজা ঝাঁকায়ঃ ওঠ্, শিগগির ওঠ্। ও বউ, মরে ঘুমুচ্ছিস নাকি? উঠে বোদাটা ধরিয়ে দে না একটু।

চোখ মুছতে মুছতে সৌদামিনী দরজা খুলল। নটবর ততক্ষণে গোয়াল থেকে বলদ বের করেছে, লাঙল কাঁধে নিয়েছে। সৌদামিনী বলে, কী ভূত চাপল তোমার ঘাড়ে—দুই চোখ এক করতে পার না। রাত যে এখনো এক প'র বাকি।

হুঁ, রাত না হাতী! আকাশের দিকে চেয়ে নটবর কিন্তু একটু বেকুব হয়ে গেল। রাত পোহায় নি সত্যি। চাঁদ জলজল করছে। মেঘ-ভাঙা জ্যোৎস্না দিনের মতো লাগছে।

নটবর বলল, কী বৃষ্টিটা হয়ে গেল! কিচ্ছু তো জানলি নে বউ, তুই তখন নাক ডাকছিলি। আমার ধানচারা আজ এক বিঘত বেড়ে গেছে।

নালা দিয়ে কলকল শব্দে জল বেরুচ্ছে। নটবর হাল-গরু নিয়ে মাঠে নামল। শখ করে বলদের গলায় ঘণ্টা বাঁধা হয়েছে, ঘণ্টার ঠুন-ঠুন শব্দ ক্রমশ মিলিয়ে গেল। কাদায় ভর্তি উঠান পেরিয়ে তেরেণ্ডার বেড়ার ধারে সৌদামিনী কতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবল, বেশ হয়েছে, আর শোব না, কাজকর্মগুলো এইবারে সেরে রাখি। গোবর-মাটি দেওয়া হল, ঘর-দোর ঝাঁট হয়ে গেল, রাত আর পোহাতে চায় না। কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। মানুষটি কী রকম হয়ে গেছে—ক্ষেত আর ক্ষেত? রাতবিরেতে একলা একটি প্রাণী বেরিয়ে যায়, কত রকম দোষ-দৃষ্টি পড়তে পারে, বুনো-শুয়োর কি সাপ—

সাপের কথা মনে হতে সৌদামিনী শিউরে ওঠেঃ আস্তিকস্য মুনের্মাতা। হে মা মনসা, রক্ষা কোরো—

ঐ ধানক্ষেতের উপরেই সাপের কামড়ে নটবরের বাপ মারা গিয়েছিল। সে অনেকদিনের কথা, আবাদের জঙ্গল সাফ হচ্ছিল। সৌদামিনি এ বাড়িতে আসে নি, নটবরই তখন একফোটা শিশু। সেই সব কাহিনী নটবর যখন বলে, সৌদামিনীর চোখে জল এসে যায়।

এরই মধ্যে একদিন রান্নাঘরে বসে সৌদামিনী ক্ষেতে পান্তা পাঠাবার

ব্যবস্থা করছিল, এমন সময় ঢোলের আওয়াজ শোনা গেল, ডুম-ডুম-ডুম। তাড়াতাড়ি সে বাইরে এলো। বাজনা আসছে মাঠের দিক থেকে। রোদ ওঠে নি ভাল করে, এখন ঢোলের বাজনা। বিয়ে করতে যাবার সময় এ নয়— তা হলে বিয়ের পর বর-কনে ফিরে চলেছে ঠিক।

মাঠের দক্ষিণে বাঁধাল, সেইখান দিয়ে কাঁচারাস্তা গিয়েছে ভোমরার ভদ্রপাড়ার দিকে। সৌদামিনী দৃষ্টি বিসারিত করে সেই দিকে তাকাল। বিস্তর লোক সেখানে—চারো, দোয়াড়ি, ঘুনি পেতে নানা উপায়ে মাছ ধরা হচ্ছে। বর-ক'নের কোন পালকি কিন্তু নজরে এলো না।

লাঙল-গরু নিয়ে একটু পরেই নটবর ফিরে আসছে।

এ কি, এরই মধ্যে যে ?

নটবর ম্লান হেসে বলল, কিছু না, ব্যস্ত হোস নে বউ—একটা মাদুর দে দিকি।

কি হয়েছে বলো না তুমি। বলদ দুটোর দড়ি নিজের হাতে নিয়ে সৌদামিনী কাতর চোখে চাইল।

নটবর বলল, বড্ড মাথা ধরেছে, ক্ষেতে আর দাঁড়াতে পারলাম না।

দাঁড়াবার জো ছিল না সত্যি। সৌদামিনী বিছানা করে দিল। নটবর শুয়ে পড়ে সেই যে চোখ বুজলো, সমস্তটা দিনের মধ্যে আর উঠল না—খেলও না। সৌদামিনী বারবার গায়ে হাত দিয়ে দেখে, গায়ে কিন্তু জ্বর নয়।

আরও ক'দিন কাটল এই রকম। নটবরের কী যে অসুখ, সব সময় শুয়ে শুয়ে থাকে। ক্ষেতে ওদিকে বড় গোন লেগেছে—প্রিয়নাথ, মদন, কাসেম আলি ওরা সব সকাল-সন্ধ্যা দু-বেলা চাষ জুড়েছে। ক'দিনের বৃষ্টিতে ধানচারা আরও বেড়ে গেছে। তারপর আবার একদিন রাত্রিবেলা ঘুম থেকে উঠে নটবর ডাকতে লাগল, ও বউ, শিগগির ওঠ্—উঠে বোঁদাটা ধরিয়ে দে এট্টু।

রাত দুপুরে নটবর ক্ষেতে যায়, ভোর না হতে ফিরে আসে। সৌদামিনী আর পারে না, হাত দু-খানা ধরে একদিন জিজ্ঞাসা করল : কিছু হয়েছে তোমার ? সত্যি কথাটা বল দিকি।

কিছু না, কিছু না। নটবর কথাটা উড়িয়ে দেয়। রোদ লাগলে মাথা ধরে যে। রাতারাতি না চষে উপায় কি ?

সন্ধ্যার পর সৌদামিনী ভাত বেড়ে দিয়ে সামনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছে। কেরোসিনের ঢেমি জ্বলছে। দু-চার গ্রাস মুখে দিয়ে নটবর ফিক করে হেসে

উঠল। বলে, বউ, একেবারে যে মহা-মচ্ছব ব্যাপার! রোজ রোজ এ তুই আরম্ভ করলি কি?

ব্যাপার গুরুতর বটে। ডাল এবং শাকের ঘন্টের উপর খেজু-গুড়ের পায়স দিয়েছে। সৌদামিনী গাই দুইতে পারে ভাল। হরি চাটুজ্জের বেয়াড়া গড় কেউ সামলাতে পারে না, আজ সৌদামিনী দুয়ে দিয়ে এসেছে। সেখান থেকে দুধ পেয়েছে, এবং দুধ যখন পাওয়া গেল—ঘরে গুড় রয়েছে, আগুনে একটু সিদ্ধ করা বই তো নয়! কিন্তু এত সব কৈফিয়ৎ দেবার মেয়ে সৌদামিনী নয়। সে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল: দেখ, মানা করে দিচ্ছি—আমি গিন্নি, আমার ঘর-সংসার। তুমি কেন আমায় সংসারের কুচ্ছো করবে?

হাসতে হাসতে নটবর বলে, আচ্ছা, আচ্ছা, আর করছি নে। কিন্তু একটা কাজ কর্ বউ, আগে ঐ আলোটা নিভিয়ে দে। মাছ নেই যে কাঁটা বেছে খেতে হবে। এত রোশনাই করলে লাটসাহেবও যে ফতুর হয়ে যায়।

সৌদামিনী তাড়া দিয়ে ওঠে: আবার!

হতাশ স্বরে নটবর বলে, বেশ, কিন্তু আবার যে কাল বলবি এক পয়সার কেরোসিন কেনো—

কাল বলব না, পরশুও না। তুমি চুপ কর দিকি। অত বকবক করলে খেয়ে কখনো পেট ভরে!

বাঁশবাগানের ফাঁক দিয়ে উঠানে অস্পষ্ট জ্যোৎস্না পড়েছে। নটবর এক এক গ্রাস খায় আর ভাবে, নাঃ, মেয়েমানুষের মতো বেহিসাবি জাত আর নেই। এই তো চাঁদের আলো পড়েছে, কী দরকার ছিল কেরোসিন পুড়িয়ে নবাবি করবার!

হঠাৎ কুকুর ডেকে ওঠে। নটবর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পথের দিকে চাইল। সৌদামিনী বলে, কিছু না, তুমি খাও—

হাত গালে ওঠে না।

সৌদামিনী ব্যাকুলকণ্ঠে বলল, ওকি, উঠছ যে! শেয়াল-টেয়াল কি হয়তো যাচ্ছিল। তুমি বোসো, আমি দেখে আসছি।

টেমির কেরোসিন অকারণে ব্যয় হতে লাগল—লাটসাহেবের অপব্যয়! কিন্তু নটবরের সেদিকে দৃষ্টি নেই, দূরের অন্ধকারের সুঁড়িপথের দিকে সে তাকিয়ে আছে।

ফুঃ ফুঃ—

আলো নিভিয়ে এক ঝটকায় সৌদামিনীর হাতে ছাড়িয়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কাছারির মাণিক বরকন্দাজ উঠানে এসে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক উঁকি মেরে সে বলে উঠল, কোথায় গো?

বাড়ি নেই।

ভেগেছে?

পিঁড়ি টেনে নিয়ে ধীরে সুস্থে মাণিক দাওয়ায় উঠে বসল! আপন মনে বকাবকি করে: আঁধারে ভূতের মতো এসেও দেখা পাবার জো নেই মানুষ কম শয়তান হয়েছে আজকাল! তারপর সৌদামিনীকে বলে, আলো জ্বালো মা গো, ভালমানুষের মেয়ে—এই তো জ্বলছিল এতক্ষণ।

আলো জ্বেলে দিয়ে সৌদামিনী নিরুত্তরে রান্নাঘরের দিকে চলল।

মাণিক হি-হি করে হেসে উঠল: তা নটবরের দিনকাল যাচ্ছে ভাল। পিঠে-পায়েস—যেন যজ্ঞির বাড়ি। শোন গো লজ্জাবতী ঠাকরুন, নতুন হাঁড়ি নিয়ে এসো—আর চাল-ডাল কাঠকুটো—

সৌদামিনী ফিরে দাঁড়াল। মাণিক বলে, রান্না-খাওয়া আজকের এইখানে হবে। তারপর একটা মাদুর দিও, পড়ে থাকব। হুজুরের দেখা তো সহজে মিলবে না।

গোবরমাটি দিয়ে পরম যত্নে নিকানো দাওয়া—সিঁদুর পড়লে তুলে নেওয়া যায়। বলা নেই কওয়া নেই—খন্তা এনে মাণিক নির্মমভাবে দাওয়া খুঁড়তে লাগল। সৌদামিনীর পাঁজরে যেন সেই খন্তার কোপ পড়ছে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করল: কি হচ্ছে?

উনুন খুঁড়ছি। তুমি আর দাঁড়িও না গো, সিধের উয্যুগ করগে।

ঘরের পিছনে বাঁশতলায় বড় উনুন। শীতকালে খেজুর-রস জ্বাল দেওয়া হয়, এখন ঝরা বাঁশপাতায় প্রায় ভর্তি হয়ে আছে। চারিদিকে আশশ্যাওড়া ও ভাঁটের জঙ্গল, উনুন বলে ধরবার জো নেই। সৌদামিনী নিচু হয়ে দু-হাতে বাঁশের পাতার স্তূপ তুলতে লাগল।

বলি, বেঁচে আছ—না সাপখোপে দয়া করেছে?

সাড়া পাওয়া যায় না।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে সৌদামিনী বলল, উঠে এসো বলছি। তুমি চোর না ডাকাত —যে উনুনে সেঁদিয়ে থাকবে? বরকন্দাজ কি লাগিয়েছে দেখ, আমার ঘর-দোর খুঁড়ে তছনছ করছে।

নটবর ফিসফিস করে বলল, চুপ! মেজাজ দেখাস নে বউ—তিন বছরের খাজনা বাকি, জানিস?

মাণিক হুঁসিয়ার লোক, তারও এই রকম গোছের একটা সন্দেহ ছিল। সে

কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। বলে উঠল, কে রে? উনুনের মধ্যে কথা বলে কে?

আতঙ্কে ঢুকে পড়া যত সহজ, বেরিয়ে আসা তেমন নয়। নটবর নানারকমে চেষ্টা করে। বলে, হবে, হয়ে যাবে—ও মাণিক ভাই, অত হাসছ কেন? মাজাটা বড্ড ধরে গেছে কিনা! বউ, কাঁধের এই এইখানটা ধরে একটু টান দে দিকি—হ্যাঁ জোর করে টান দে—

অনেক কষ্টে সে বেরিয়ে এলো। কাঁধের কাছে কেটে গেছে, বিছুটি লেগে সর্বাঙ্গ ফুলে ফুলে উঠেছে। একটুখানি হাসির মতো ভাব করে নটবর বলল, উনুনটা সাফ করছিলাম মাণিক ভায়া। কী রকম জঞ্জাল হয়েছে দেখ।

মাণিক হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল। বলল, তবু ভাল। আমি ভাবলাম বুঝি শেয়াল ঢুকেছে।

ঘাড় নেড়ে নটবর বলে, তাই, ঠিক তাই—শেয়াল-কুকুর ছাড়া কি? মানুষের ভয়ে শেয়াল গর্তে ঢোকে, আমারা গর্তে ঢুকি তোমাদের ভয়ে।

নিজের রসিকতায় খানিক সে হা-হা করে হাসে। তারপর খপ করে বরকন্দাজের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলে, কাছারি গিয়ে বলোগে ভায়া, বাড়ি নেই। তোমার রোজ-গণ্ডা সমস্ত দিয়ে দেব।

মাণিক হাত বাড়িয়ে বলে, দাও। আমার নগদ কারবার—

আজ নয়, পরশু। হাটে দিয়ে দেব। মাইরি। আজ একটা পয়সাও নেই—থাকে তো বাপের হাড়।

বরকন্দাজ বলল, তবে হবে না, মনিবের নুন খেয়ে মিথ্যে বলতে পারব না। আজ আবার ছোটবাবু এসেছেন সদর থেকে। রেগে আগুন হয়ে আছেন। চলো—

দৃঢ়মুষ্টিতে তার হাত এঁটে ধরল।

ফাঁসির আসামির মতো নটবর কাছারির হলঘরে এসে দাঁড়াল।

ছোটবাবু অল্পকথার মানুষ। বললেন, মালিকের মাল-খাজনার দায়ে তোমার জমি নিলাম হয়ে গেছে।

আজ্ঞে।

বয়নামা জারি হয়েছে, ঢোল-শহরত হয়েছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ—

নায়েব একটা হিসাব নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, চশমার ফাঁকে চেয়ে বললেন, শুধু তাই নয় হুজুর, একদিন বরকন্দাজ দিয়ে লাঙল খুলে জমি থেকে তাড়িয়েও দিয়েছিলাম—

ছোটবাবু বললেন, অথচ শুনতে পাই রাত্তিরে রাত্তিরে জমি চষা হচ্ছে। খলি, মতলবটা কি?

নায়েব টিপ্পনি কাটলেন: মতলব বোঝাই যাচ্ছে হুজুর। পেছনে ঠিক রঘুনাথ সা রয়েছে, এই বলে দিলাম। জমির দখল বজায় রাখছে।

ছোটবাবু বলতে লাগলেন, তোদের জন্যে আমি সদরে ফৌজদারি করতে যাব না। আসবার সময় কলকাতা থেকে একখানা ভাল হাণ্টার নিয়ে এসেছি। তা-ই যথেষ্ট। দেখবি?

নটবর আকুল হয়ে কেঁদে উঠল: হুজুর বাঁধ ভেঙে তিন তিন বছর ক্ষেত ভাসিয়ে দিল—পেটে খেতে পাই নি, খাজনা দেব কোত্থেকে?

সে ছোটবাবুর পা জড়িয়ে ধরল।

এবার জমিতে বড্ড ভাল গোন—সোনা ফলবে, হুজুর। খাবার ধান যা যোগাড় ছিল, সমস্ত বীজতলায় চড়িয়েছি। এইবারটা রক্ষে করুন ধর্মবাপ, সিকিপয়সা আর বাকি থাকবে না।

নায়েব ডাকলেন: শোন্, শোন্—এদিকে আয় নটবর। তোদের ঐ মায়াকান্না শুনলে কি আর রাজ্যি রক্ষে করা যায়? আচ্ছা—আচ্ছা, তামাক সাজ্ দিকি। তোর ধানের চারা খুব ভাল হয়েছে—না?

হ্যাঁ, বাবা—

কত জমিতে বীজধান ছড়িয়েছিস? কাঠা দশেক?

বেশি হবে, বাবা।

ভাল ভাল। তা হলে সেই কোন্ না বিশ-কুড়ি টাকার ফসল! মাকি বরকন্দাজের দিকে চেয়ে নায়েব বললেন, এ সব খবর তো কই আমাদের কানে আসে না!

নটবর হাত জোড় করে অস্পষ্ট স্বরে আবার কি বলতে গেল। নায়েব বললেন, হ্যাঁ, হবে—ধানচারার একটা উপায় হবে বই কি! তুই হুজুরের হুকুম নিয়ে চলে যা এখন।

ছোটবাবু বললেন, আচ্ছা যা। কিন্তু জমি জমিদারের। আর কোনদিন লাঙল চষবি নে—খবরদার!

ঘাড় নেড়ে নটবর বেরিয়ে এলো। তারপর হেসেই খুন। জমি চষিস না—হঃ, বললেই হল! চষব না তো সোনা হেন ধানের চারা বুঝি বীজতলায় শুকিয়ে মরবে! নায়েবমশায় লোক মন্দ নয়, মনে মনে দয়া আছে। ছোটবাবু আগে চলে যাক সদরে। কাছারির কিছু পার্বণী লাগবে, তা লাগুকগে—

সৌদামিনী রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল। জিজ্ঞাসা করল: কি হল?

কিছু না, কিছু না, বাবু শিরতুল্য লোক—

সে জানি। তারপর আর্তকণ্ঠে সৌদামিনী বলল, জমি চষেছ বলে মারধোর করেছে কিনা, সেই কথাটা বলো আমায়।

মারধোর? বাঃ রে—

স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে নটবর বিব্রত হয়ে উঠল। বলল, মগের মুল্লুক নাকি,—এ সব কথা কে বলেছে শুনি? বাবু যে আমাদের সাক্ষাৎ শিবঠাকুর।

সে ওরা সবাই—ঐ বরকন্দাজটা অবধি। শিবঠাকুরেরা ঢোল বাজিয়ে জমি নিলাম করেছে, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দু-পুরুষে জমি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সেই দিন থেকে তোমার মাথাধরা আর ছাড়ে না। তুমি বলো না, কিন্তু আমি সমস্ত শুনেছি, সমস্ত জানতে পেরেছি।

সৌদামিনীর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। নটবর মৃদু কণ্ঠে অপরাধের সুরে বলল, তার আর কী বলব বউ। ওদের দোষ কি, তিন তিনটে বছর মালখাজনা পায় নি।

সৌদামিনী আগুন হয়ে উঠল। ওরা খাজনা পায় নি, আর তুমি এই তিন বচ্ছর দিন নেই, রাত নেই, তিল তিল করে জীবন দিয়েছ, তুমি কি পেয়েছ শুনি?

নটবর বলল, ঠাণ্ডা হ বউ, তুই একেবারে আস্ত পাগল। খাজনা না পেলে ওদের চলে! বুড়ো-কর্তা কত টাকা দিয়ে বিষয় করেছে—ছোটবাবু আজও বলছিলেন, সে টাকার সুদ পোষাচ্ছে না।

আর, আমার বুড়ো শ্বশুর ঐ আবাদ করতে সাপের কামড়ে মরেছেন, তাঁর ছেলেপুলের পেটে দানা পড়ছে না—সেটা কিছু নয়?

অবোধ চাষার ঘরের বউ—নটবর যা বলেছে, পাগলই ঠিক! এই কথাটা কিছুতে বোঝে না, লাঙল টানতে টানতে গরু-মহিষও কত মুখ থুবড়ে মরে যায়! মানুষ সাপের কামড়ে মরেছে, জ্বরে ওলাউঠায় পালপালের মতো মরেছে, বাঘ-কুমিরের পেটে গেছে—আবার নূতনের দল এসেছে, যুগের পর যুগ চলেছে, বন কেটে জনপদ হয়েছে, শস্যশালিনী পৃথিবী হাসছে। যাঁদের এই পৃথিবী, রাজ্য দেখতে তাঁরা মাঝে মাঝে শুভ পদার্পণ করেন, রাজ-কাছারিতে উৎসব পড়ে যায়, আলো জ্বলে, মাছ আর মিষ্টান্ন দেশদেশান্তর থেকে ভারে ভারে উদয় হয়, শতজনে তটস্থ, তিলমাত্র ত্রুটি যেন না ঘটে! কবে কোন্‌খানে কে মরেছিল, কে তার ইতিহাস মনে রেখেছে—আর তার দরকারই বা কি!

প্রকাণ্ড দিন এবং তারও চেয়ে মন্থর চারপ্রহর রাত্রি কেটে যায়, নটবরের কাজকর্ম নেই। বিলের মধ্যে কেবল তার ক্ষেতটাই ফাঁকা। যখন তখন সে আলের উপর বসে, বুকের মধ্যে হু-হু করে। ওদের সব রোয়া হয়ে গেছে, এমন গোন আজ কত বছর হয়নি! দেবরাজ অঘোর ধারে জল ঢালছেন। বৃষ্টির মধ্যে রিমঝিম বাজনা বাজে, গাছপালা মাঠঘাট উল্লাসে সবাই মিলে গান ধরে, বীজতলায় ধানের চারা দুষ্ট ছেলের মতো বৃষ্টিতে বাতাসে দাপাদাপি করে। হতভাগারা বলছে যেন, নিয়ে যাও গো আমাদের ঐ বড়-বিলের মাঝখানে। দুপুরের কড়কড়ে রোদ পড়বে মাথার উপর, চারিদিকে জল থৈ থৈ করবে, দু-ক্রোশ পাঁচ-ক্রোশ থেকে বাদলা ছুটে আসবে, দেয়া ঝিলিক দেবে, কত আমোদ! তার লাঙল-বলদও যেন নিঃশব্দে কথা বলে, তার শূন্যক্ষেত হাতজোড় করে চেয়ে থাকে…

এমন সময় এক-একদিন নটবর ভাবে, ঐ পাগলী—সৌদামিনীর কথাগুলো। জমি চষতে দেবে না—হঃ, বললেই হল! আমার বাবা মরেছে সাপের কাপড়ে—যে ক'টা ধান ছিল পেটে না খেয়ে বীজতলায় ছড়িয়েছি, জমি দেবে না তো এদের জায়গা দেবো কি মাথার উপর? কেন দেবে না?

আবার একদিন সে কাছারি গিয়ে একেবারে কেঁদে পড়ল।

নায়েবমশাই, আর যে বাড়ি থাকতে পারি নে—

হল কি?

ফাঁকা ক্ষেত, দাওয়ায় বসলে দেখা যায়। থাকি কি করে? হুকুম দাও, রুয়ে ফেলি! ফসল না হয় কাছারির গোলায় উঠবে।

ছোটবাবু নেই, আমার হুকুমে কি হবে! আসছে, সদর থেকে পাকা হুকুম আসছে।

তারপর প্রায় রোজই নটবর হাঁটাহাঁটি করে: চোখের উপর চারাগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে—তুমি যে বলেছিলে বাবা, উপায় একটা হয়ে যাবে।

নায়েব অভয় দিয়ে বলেন, হবে। বলেছি যখন উপায় হবে না! ব্যস্ত হোস নে নটবর, পাকা হুকুম এলো বলে।

অবশেষে হুকুম এলো—পাকাই বটে। আদালতের ছাপ-মারা। নটবর সকালবেলা উঠে দেখে, বীজতলায় গরু পড়েছে।

হোই গো, কী সর্বনেশে কাণ্ড গো!

ঠ্যাক নিয়ে তাড়া করতে পালাল, এগিয়ে এল চরণ ঘোষ।

গরু তাড়াও কেন মোড়ল? বারো টাকা গণে দিয়ে বন্দোবস্ত পেয়েছি।

বন্দোবস্ত? নটবরের চক্ষু কপালে উঠল।

মাণিক বরকন্দাজ দখল দিতে এসেছিল, সে-ই সমস্ত বুঝিয়ে দিল। জমি নিলাম হয়েছে, তাতে খাজনা সব শোধ হয় নি। তাই বীজতলায় ধানচারা ক্রোক হয়েছে। চরণ ঘোষ জাতে গোয়ালা—গরু-বাছুর অনেক। গরুর খোরাকি কম পড়ে গেছে, তাই কাছারি থেকে বীজতলার বন্দোবস্ত নিয়ে গরু নামিয়ে দিয়েছে।

ভাল, ভাল। নটবরের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো। বলতে লাগল, তোমাদের আক্কেল ভাল বটে মাণিক ভাই। কোন চাষার সঙ্গে বন্দোবস্ত করা গেল না বুঝি! তবু আমার ধানচারা গরুর পেটে যেত না—ভুঁয়ে ঠাঁই পেত।

মাণিকের অনেক কাজ, হাসতে হাসতে সে চলে গেল। চরণ ঘোষের দিকে নটবর গর্জন করে উঠল: গরু নিয়ে চলে যাও, ভাল হবে না বলছি।

চরণ বলল, টাকা কি আক্কেল সেলামি দিয়ে এলাম?

নটবর অধীর কণ্ঠে বলতে লাগল, ধান গরু দিয়ে খাওয়াবে চাষার ছেলে হয়ে চোখে তা দেখতে পারব না—পারব না। গরু সরিয়ে নাও বলছি। না-হয় আমিই উপড়ে দিচ্ছি, বাড়ি নিয়ে গিয়ে খাওয়াও গে।

অদূরে দেখা গেল, চরণের ছেলে কানু—একটা দুটো নয়—তাদের গোয়ালসুদ্ধ গরু নিয়ে আসছে। তাই দেখে চরণের জোর বাড়ল। কিন্তু নটবর একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠেছে। বাঁক নিয়ে সে সমস্ত ক্ষেতে ছুটাছুটি করে। ধান মাড়িয়ে বীজতলা চষা-ক্ষেতের মতো কাদা-কাদা করে গরুগুলো ছোটে। নটবর চিৎকার করতে লাগল: বেরো—বেরো আমার জমি থেকে—

কানু ছুটে এলো। বাপ-বেটা একসঙ্গে এসে নটবরের সামনে রুখে দাঁড়াল, খবরদার!

সঙ্গে সঙ্গে বাঁকের এক বাড়ি চরণের চোয়ালের উপর। চোখে অন্ধকার দেখল, বাবা গো—বলে জলকাদার মধ্যে সেইখানে চরণ বসে পড়ল। কানু চেঁচাতে লাগল। মাণিক বরকন্দাজ বেশি দূর যায় নি—ছুটতে ছুটতে ফিরে এলো, মাঠ থেকে চাষারা এলো, গাঁয়ের মেয়ে পুরুষও কেউ আর বড় বাকি রইল না। সকলের শেষে এলেন নায়েবমশায়, অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললেন, পিপীলিকার পাখা উঠেছে—

কিন্তু আসামির দেখা নেই। ঘরবাড়ি অন্ধি সন্ধি কোথাও খুঁজতে বাকি নেই—গোলমালে কখন সে সরে পড়েছে, যেন পাখী হয়ে উড়ে গেছে।

উত্তেজনা ও আস্ফালন চলল রাত্রি অবধি। ক্রমশ যে যার বাড়ি যেতে,

লাগল, চারিদিক নির্জন হয়ে এলো। সৌদামিনী আজ সমস্ত দিন রান্না করে নি, এক জায়গায় চুপটি করে বসে সকলের গালি শুনেছে আর কেঁদেছে। গভীর রাতে টেমি জলছিল। টেমির আলোর ছায়া দেখে সে চমকে উঠল। নটবর টিপিটিপি ঘরের মধ্যে এসে উঠেছে। ফিসফিস করে সে বলল, চরণ কেমন আছে রে বউ ?

ভাল। একটু চুপ করে থেকে সৌদামিনী বোধকরি উদ্গত অশ্রু রোধ করল। বলল, ভাল না থাকলে কি অমন বাঁধুনি-আঁটা গালিগালাজ বেরোয় ?

নটবর একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

সমস্ত চরণের ভিরকুটি। ছুতো ধরে পড়ে ছিল, আমি তখনই জানি—

সৌদামিনী বলল, তা বলে নায়েব ছাড়বে না। থানায় গেছে, কাল তোমার কোমরে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবে। আর বলেছে, ঘরের চাল কেটে বসত ওঠাবে।

মুখখানা ম্লান করে নটবর বলতে লাগল, কেন ছাড়বে ? সুবিধে পেলে কে কাকে ছাড়ে বল্ ? একটা ফ্যাসাদ বাধলে দু-চার পয়সা পাওনা-থোওনাও তো রয়েছে।

তারপর সে বলল, বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, কিছু ভাতটাত আছে বউ ?

বউ উঠে দাঁড়াল। ভাত নেই, রাঁধার সম্ভাবনাও নেই—উনুন ভেঙে হাঁড়িকুড়ি ভেঙে চাল-ডাল ছড়িয়ে তারা প্রতিশোধ নিয়ে গেছে।

উঠে দাঁড়িয়ে সৌদামিনী নটবরের হাত ধরে টানল : চলো, চলে যেতে হবে এখান থেকে—

নটবর একটু কাষ্ঠ-হাসি হাসল। মেয়েমানুষ, তায় বয়সে কত ছোট —এই তো মাত্র ক-বছর আগে এই সংসারে এসেছে। কিন্তু সৌদামিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে নটবর প্রতিবাদের ভরসা পায় না। একটু ইতস্তত করে বলল, তাই চল্। জমি যখন দেবে না—চল্ তোর পিশের বাড়ি যাই তবে। পাইকঘেরির বন কেটে নাকি নতুন আবাদ করবে শুনেছি।

যা-কিছু সামনে পেল পুটুলি বেঁধে তারা কাঁধে নিল। ক'পা গিয়ে বধূ থমকে দাঁড়াল।

কি ?

টেমিটা জলছে যে !

নটবর তাচ্ছিল্যের ভাবে বলল, থাকগে, কি হয়েছে—জলে জলে আপনি নিভে যাবে।

কিন্তু সৌদামিনী মানা শুনল না। ঘরে ঢুকে জলন্ত টেমি নিয়ে দ্রুতপদে বেরিয়ে এল। এসে সেই টেমি ধরল চালের কিনারায়। নূতন-ছাওয়া ঘরের চাল রাতের অন্ধকারে ঝিকমিক করছে। চালে আগুন ধরল। নটবর ছুটে এসে বলে, কী করলি ! ঘরে আগুন দিলি, কী সর্বনাশ করলি বউ !

সৌদামিনী হেসে উঠল। আগুন দাউ-দাউ করে ওঠে, হাসি তার আরও উগ্র হয়। বলে, বয়ে গেল—বয়ে গেল ! আমাদের কি—যাদের জিনিস তাদের পুড়ছে—তাদের সর্বনাশ !

টেমিটা সে ছুড়ে ফেলে দিয়ে নটবরের হাত ধরে বাঁধের উপর দিয়ে ছুটল। নটবর আর পেরে ওঠে না।

থাম্‌, থাম্‌—ওরে বউ, ভুল-পথে চললি যে ! পিশের বাড়ি কি এইদিকে ?

না, যমের বাড়ি।

বালাই ষাট ! নটবর একটু রসিকতার চেষ্টা করল। তোর যে কত সাধ বউ ! এই বয়সে—এত সকাল সকাল সেখানে যাবি ?

সৌদামিনী বলল, হাঁ যাব। গিয়ে সেই পোড়া বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করব, পৃথিবী যদি বাঁটোয়ারা করে দিয়েছিস—তবে আমাদের সেখানে পাঠাস কি জন্যে ?

ধানবনের গান

ধানগাছে গান গায়, ধানবন ডেকে ডেকে রূপ দেখায়, শুনেছ কখনো ? মেঘের মতো কালো কচি কচি ধানের চারা—দেমাক তাদের গায়ে ধরে না। তুমি যদি আল-পথে যাও কোনদিন, থমকে দাঁড়াতে হবে। সাধ্য কি, হাঁ করে খানিক না তাকিয়ে থেকে চলে যেতে পার।

আরও কতজনের কত জমি রয়েছে, জীবধরের তো মোটে বারো বিঘে। কিন্তু তার মতো কারও নয়। ক্ষেতে নামলে খাওয়া-নাওয়ার জ্ঞান থাকে না জীবধরের।

বৈশাখের মাঝামাঝি। মাঠ দিয়ে আগুনের হল্কা বয়ে চলেছে। জীবধর জন আষ্টেক কিষাণ নিয়ে আড়াই পহর অবধি ক্ষেতে নিড়ান দিয়েছে। তারপর বাড়ি এসে খেয়েদেয়ে গড়িয়ে নিচ্ছে। ঘুম বেশ এঁটে এসেছে—এমন সময় শুনল, ছুলি ডাকছে, ও বাবা, বাবা গো—আম কুড়োতে যাবে ? বড়-হেলার তলায় ঝুড়ি ঝুড়ি কাঁচা আম পড়েছে ঠিক।

জীবধর উত্তর দিল : উহুঁ, তুই যা—

ঘুম পাতলা হয়ে এলো। জীবধর শুনতে লাগল, ঘরের চালে জল পড়বার শব্দ···বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, সোঁ-সোঁ করে হাওয়া এসে বেড়ায় ধাক্কা দিচ্ছে। তারপর উঠে তামাক সাজাতে বসল। এই জলের মধ্যে বেরিয়ে গেছে দুলি। ডাকাত মেয়ে।

হুঁকা টানতে টানতে জীবধরের বড় স্ফূর্তি লাগল। এই বৃষ্টিটায় ধানের চারা একহাত বেড়ে উঠবে। তারপর মনে পড়ল, সরকারদের এঁদো-পুকুরে খুব সম্ভব কইমাছ উঠতে লেগেছে। বৈশাখমাসের প্রথম বৃষ্টি—এ সময় মাছ ডাঙায় না উঠে যায় না। গামছা মাথায় সে চুপি চুপি বেরুল।

পুকুরের কোণে কাঁটাঝিটকের ঝোপ। জীবধর সেইখানটায় চুপ করে বসে রইল। জলস্রোত গড়িয়ে পড়ছে। মাছ খলবল করছে, একটাও কিন্তু ডাঙায় ওঠে না।

হল কিছু ?

ঘাড় তুলে দেখে কানাই গায়েন। হাতে খালুই। সে-ও একই উদ্দেশে বেরিয়েছে।

কানাই বলল, এখানে কিছু হবে না, বারোজনে ঘাঁটা দিয়ে গেছে। তারপর ফিস-ফিস করে বলতে লাগল, মাঠের দিকে যাই চল। নৈমদ্দি মোড়ল শোলাবনে চারো পেতেছে। বিশ-ত্রিশখানা পেতেছে। চারো কই-মাগুরে ভরে গেছে। শোলাবনের মাগুর—জান তো ?

দু-হাতে কানাই মাগুরমাছের যে আয়তন দেখাল, রুই-কাতলাও অত বড় হয় না। পায়ের উপর দিয়ে স্রোত চলেছে, ছপছপ করে দু-জনে মাঠের দিকে চলল।

জীবধর বলে, নৈমদ্দি যদি ঘাপটি মেরে বসে থাকে কোথাও ?

বয়ে গেছে নৈমদ্দির। যাত্রার দল করে বেড়ায়—এই বৃষ্টিতে বৈঠকঘরে কাঁথা মুড়ি দিয়ে নাক ডাকছে, দেখগে যাও।

আলের উপর দিয়ে পথ। আলের কানায় কানায় জল—আর একটু এগুতে পায়ের পাতা ডুবে যেতে লাগল। জীবধর বলল, বাপ রে, জল জমেছে তো খুব।

কানাই বলল, তা বৃষ্টিটা কম হল নাকি ? মাঠে ঘাস-পাতা মিলছিল না। গরুগুলো শুকিয়ে মরছিল, এবার খেয়ে বাঁচবে।

তোমার তো কেবল গরু আর গরু। ভুঁই-ক্ষেত ছেড়ে চাষার ছেলে গোয়ালা হলে হয় ঐ রকম।

কিন্তু হাসতে গিয়ে জীবধরের হাসি এলো না। সে অবাক হয়ে গেছে।

বলল, আরে, বিল যে জলে জলে নৈরেকার! দেলখোলায় জল উঠেছে—কাণ্ডটা কি!

কানাই বলল, দাঁড়িয়ে গেলে যে?

জীবধর বলল, তুমি এগুতে লাগ কানাই। আমি মাঠের দিকটা ঘুরে যাচ্ছি। না-হয় দু-জনেই ঐ পথে ঘুরে যাই চল।

কিন্তু কানাইয়ের এক কাঠা জমি নেই, মাঠে ঘুরতে যাবে সে কি দেখতে? জীবধর একাই চলল।

দূর থেকে দেখা গেল, আলের উপর ডুলি দাঁড়িয়ে। বাতাসে খোলা চুল উড়ছে, দিগন্তবিসারী সবুজ আউশধানে তার কোমর অবধি ডুবে গেছে।

ডুলি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকছে: ওরে গয়লা, দেখেছি—সব কীর্তি দেখতে পাচ্ছি গো—

অতএব কাছাকাছি কোথাও নন্দরাম আছে। নন্দরাম কানাইয়ের ছেলে। গোয়ালা বললে সে ক্ষেপে যায়, আর ডুলিও তাকে ঐ ছাড়া ডাকবে না। বাপকে দেখে মেয়ের মূর্তি রণরঙ্গিণী হয়ে উঠল। বলে, দেখ বাবা, দেখ—

অনেক দূরে ধানের চারা নড়ছে বটে, ধানবনের মধ্যে গরু! গরুর পিছনে নন্দরাম আছে।

জীবধর বলল, তুই যে আম কুড়োতে গেলি—

ডুলি বলল, গেলাম তো। তারপর দেখি, গোয়ালা গরু নিয়ে মাঠে আসছে। পিছন পিছন এলাম। জানি, ধান খাওয়াবে। ও কি কম শয়তান! খাওয়াচ্ছেও তাই।

নন্দরাম কাছে এসে পড়েছে। আলের উপর উঠে সে রুখে দাঁড়াল।

খবরদার ডুলি, মুখ সামলে কথা কোস। দুটো আগা কেটে খেয়েছে কি না খেয়েছে—হয়েছে কি তাতে?

ডুলি মুখ ঘুরিয়ে বলল, হয়েছে কি! যাদের জমি চষতে হয় না, খালি যারা গরু তাড়িয়ে বেড়ায়—তারা কি বুঝবে, আগা কেটে খেলে কি হয়—

জীবধরের কানে এসব যাচ্ছে না। সে দেখছে, হৈ-হৈ করে গ্রামের দিক দিয়ে অনেক লোক ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে চলেছে।

কি? ব্যাপার কি?

সর্বনাশ হয়ে গেছে সর্দার। বাঁধ ভেঙেছে। খালের নোনা জল উঠছে। শিগগির চলো।

জীবধর পাগল হয়ে ছুটল।

নন্দরাম দুঃখিত স্বরে বলে, দেমাক করতে নেই। আমাদের জমিজমা

নেই—গরু তাড়িয়ে বেড়াই। কিন্তু জমিজমার খোয়াব দেখলি তো হাতে হাতে? দুটো আগা খেয়েছে বলে গালমন্দ করলি, এবারে কি হবে? নোনা-লাগা ধান কেটে কেটে তো গরুকেই খাওয়াতে হবে।

দুলি মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। গরুর দড়ি ধরে নন্দরাম এগিয়ে চলল।

চল রে দুলি, তোদের বাড়ি থেকে একটা কোদাল দিবি আমায়।

দুলি তবু নড়ে না। নন্দরাম ধমক দেয়: কোদাল দিতে বললাম, তা রাজকন্যের কথা কানে যায় না?

দুলি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল: বাঁধ বাঁধতে গিয়ে কাজ নেই কারও। খুব হয়েছে! বাঁধ তো ভাঙে নি, শত্তুররা কেটে দিয়েছে। এখন ভালমানুষ সাজতে এসেছে।

সে কেঁদে ফেলল।

বাঁধ ভেঙেছে অনেকটা। জলের বেগ কিছুতে ঠেকানো যায় না। বাঁশের খোঁটা পুঁতে ফাঁকের মধ্যে বোঝা বোঝা বিচালি দেওয়া হচ্ছে। তা-ও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অনেক কষ্টে অবশেষে খানিকটা আটকানো গেল, তখন রাত হয়ে গেছে। নির্মল আকাশ, ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে। চরের মাটি কেটে জলে ঢালা হচ্ছে, ঝপাঝপ কোদাল পড়ছে।

শ্রান্ত জীবধর উপরে উঠে বাবলার গুঁড়ি ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। খবর শুনে কানাইও কখন এসেছে। হঠাৎ নজরে পড়ল, কোদালওয়ালাদের মধ্যে নন্দরাম।

এই নন্দা, জল-কাদা মাখছিস—কাল তুই পাঁচন খেয়ে উঠেছিস না?

নন্দরামের জবাব সঙ্গে সঙ্গে: গরু রাখতে বলেছিলে, তাতে জলকাদা লাগে না বুঝি?

কানাই এদের মতিগতি বুঝতে পারে না। উঠানে ধানের একটা চিটেও উঠবে না, তোর এত কোদাল পাড়বার দরকার কি রে বাপু? জীবধরকে বলল, সর্দার ভাই, চাষবাসের এই ফ্যাসাদ। এত খাটনি খাটলে, সমস্ত মাটি। এর চেয়ে আমার দুধের ব্যবসা ভাল। জমি বেচে আমার মতো গরু কেনগে এবার।

জীবধর আশা ছাড়ে নি। বলে, নোনা জল কতটুকুই বা ঢুকেছে! ওতে কিছু ক্ষতি হবে না।

দিন পাঁচ-সাতের মধ্যে জল শুকিয়ে এলো। ধানের সবুজ পাতাও সঙ্গে সঙ্গে লাল। ক্ষেত থেকে ফেরবার পথে জীবধর যেন টলে পড়ে যায়। দাওয়ার উপর মাথায় হাত দিয়ে সে বসে পড়ল—কী হবে!

ফুলি দড়ি ধরে টানতে টানতে একটা গরু নিয়ে এলো—নন্দরামের রাঙি গরুটা।

বাবা, শয়তানিটা দেখ। তুমি বাড়ি আসতে আসতে অমনি গরু ছেড়ে দিয়েছে। আমিও তকে তকে ছিলাম। গরু খোঁয়াড়ে দিতে হবে—ছেড়ে দেওয়া হবে না। যেমন তেমনি—দণ্ড দিয়ে মরুক।

একটু পরে নন্দরাম এলো। সে প্রতিবাদ করে: ছেড়ে দিয়েছি, না আরো-কিছু! দড়ি ছিঁড়ে গিয়েছিল।

ফুলি বলল, তাই বা যাবে কেন?

নন্দরাম মুখ বাঁকিয়ে বলল, ক্ষেত আগলে রেখে কি হবে শুনি? নোনা-লাগা ধান—দু-দিন বাদে শুকিয়ে তো খড় হয়ে যাবে। গরুতে খেলে ভগবানের জীবের পেটে যাবে।

ফুলি আগুন হয়ে উঠল: তা বুঝি, বুঝি গো—পোড়ারমুখো ভগবানকে ডেকে বারোজনে ঘটিয়েছে এটা। ধান শুকিয়ে খড় হয়ে যাক—আগুন জেলে পুড়িয়ে দেবো, তবু যেন কারো গরু সেখানে না যায়।

থাম না ফুলি।

বাপের তাড়ায় ফুলি চুপ হয়ে গেল। জীবধরের স্বর কাঁপছে। বলে, নন্দরাম, সমস্ত গরু ছেড়ে দাওগে আমার ক্ষেতে। খেয়ে সাফ করে ফেলুক। আমার এত কষ্টের ফসল যে রোদ-পোড়া হয়ে শুকোবে, এ আমি চোখে দেখতে পারব না বাবা—

তাড়াতাড়ি সে দু-ফোঁটা চোখের জল মুছে ফেলল।

উঠানের আমড়াগাছে রাঙিকে বেঁধে নন্দরাম দাওয়ার উপর পা ঝুলিয়ে বসেছে। কানাই হুঁকো সাফ করছিল, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল খানিকক্ষণ। শেষে আর থাকতে পারলে না, বলল, গরুর পেট চিটেপানা হয়ে রয়েছে—এরই মধ্যে ফিরে এলি ওরে নন্দা?

নন্দ উদাসভাবে বলল, কোথায় কার জমিতে যাব, কে ফ্যাসাদ বাধাবে—

চক্ষু কপালে তুলে কানাই বলল, বলিস কি রে? তামাম মাঠে নোনা লেগেছে, এখন আবার গরুর খাবার ভাবনা? গতর নাড়াতে চাস নে, সেই কথাটা বল।

জান না তো মাঠের খবর। পরের জমিতে গরু নামতে দেবে কেন?

নন্দরাম অবাধে মিথ্যা বলে চলল: ঐ তো সর্দার-খুড়োর ক্ষেতে নিয়ে

গিয়েছিলাম। গরু ধরে তাঁরা খোঁয়াড়ে দিতে যায়। অনেক বলে-কয়ে ছাড়িয়ে আনলাম।

তারপর বলল, টাকাকড়ি দিয়ে একটা বিলি-ব্যবস্থা করে নিলে হয় কিন্তু।

কানাই বলে, টাকা চায় নাকি?

নন্দ বলে, তারা জন-কিষেণ দিয়ে চাষ করিয়েছে, খরচ হয়েছে—চাবে না কেন? টাকা পঁচিশেক হাতে গুঁজে দিয়ে একটা ব্যবস্থা করে নাওগে বাবা। আমাদের বিশটা গরু এক মরশুমে খেয়ে শেষ করতে পারবে না।

হুঁ—বলে কানাই গুম হয়ে খানিক ভাবতে লাগল। বলল, পঁচিশ টাকা না হাতী! আচ্ছা দেখছি আমি।

সন্ধ্যার পর কানাই জীবধরকে নিয়ে নীলরতন চাটুজ্জের বৈঠকখানায় গেল। গ্রামের অনেকেই সেখানে, আড্ডা বসেছে। দশ টাকার একখানা নোট সে জীবধরের কোঁচার খুঁটে বেঁধে দিল।

না, না—সর্দার ভাই, সে কি হয়? গতরে খেটেছ, এত পয়সা খরচা করেছ, তোমার কত ক্ষতি হয়েছে! তবু যা হোক, বীজধানের দামটা তো ঘরে উঠল। এই ক'টা মাস ক্ষেত আমার জিম্মায় থাকবে, গরুগুলো চরে খাবে—মাঘ-ফাগুনের মধ্যেই তোমার ক্ষেত তুমি ফিরে পাবে। চাটুজ্জে মশায়রা সব শুনে রাখলেন।

নন্দরামের বুকের ছাতি ফুলে গেছে, এখন দুলিদের বাড়ির সামনে দিয়েই গরু তাড়িয়ে মাঠে যায়। দুলিকে দেখলে শব্দ-সাড়া বেড়ে ওঠে। দুলি কিন্তু ভুলেও তাকায় না। দুপুরবেলা আবার যখন গরু ফিরিয়ে আনে, মেয়েটা ঐ সময় প্রায়ই ঘাটে বসে বাসন মাজে। একটা দিনও সে মুখ তোলে না। কুড়িটা গরু হৈ-হৈ শব্দে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া—তা কালা দুলির কানেই যায় না যেন!

আবার একদিন বড় মেঘ করে এলো। তারপর ঝমঝম করে বৃষ্টি। বৃষ্টি—বৃষ্টি—রাত-দুপুর অবধি একটানা বৃষ্টি চলল। শুকনো মাঠে-ঘাটে জলের তুফান বইতে লাগল। দু-এক দিনের মধ্যে দেখা গেল, লাল ধানবন আবার সবুজ হয়ে উঠেছে। জীবধর ক্ষেতের ধারে গিয়ে দাঁড়াল, মুখ হাসিতে ভরে গেল।

সেখান থেকে সোজা গেল সে চাটুজ্জে-বাড়ি। বলে, চাটুজ্জেমশায়, কপাল ফিরেছে। ধানের চেহারা দেখবেন একবার গিয়ে। কানাইয়ের টাকা ফেরত দিতে যাচ্ছি।

কানাই আকাশ থেকে পড়ল: বোশেখে এমন বর্ষা দেখেছ কখনো? তোমার কপালে নোনা লেগেছিল, আমার কপালে নোনা ধুয়ে সাফ হয়ে গেল।

আমি গোলা বাঁধছি—টাকা আমি ফেরৎ নেবো না।

আবার সেই দিন নন্দরামেরও ছুলির সঙ্গে ঝগড়া লাগল। নন্দরাম অতশত খবর রাখে না—গরু নিয়ে যেমন যায়, তেমনি যাচ্ছিল। ছুলি সাড়া পেয়ে কাজকর্ম ছেড়ে রাস্তার উপর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল: ও গয়লা, গরু নিয়ে যাচ্ছ যে বড় !

নন্দরাম অবাক হয়ে গেছে। বলল, আজকে নতুন যাচ্ছি নাকি ?

ছুলি হাসিতে যেন ফেটে পড়ে। বলল, ক্ষেতের নতুন রূপ খুলেছে, দেখগে গিয়ে. দরদ হয় না ? গরু দিয়ে খাওয়াতে শরম লাগে না ? হাঁরে গয়লা ?

নন্দর রাগ হয়ে যায়। বলল, হ্যাঁ-হ্যাঁ টাকা দিয়েছি—গরু দিয়ে খাওয়াই, যা করি—গাঁয়ের মানুষ কথা বলতে যাবে কেন ?

ছুলি মুখ ঘুরিয়ে বলল, সাধে গয়লা বলি ! হতে চাষা, ধানের মর্ম বুঝতে পারতে। চল দিকি কানাই-জেঠার কাছে—বিচারটা কী হয় দেখি।

ছুলি কিছুতে ছাড়ে না। গরু রইল সেখানে, ঝগড়া করতে করতে দু-জনে চলল কানাইয়ের কাছে।

নন্দ বলে, দেখ বাবা, উৎপাতটা দেখ একবার। গরু মাঠে নিতে দেয় না। দাও দিকি এক-নম্বর ফৌজদারি ঠুকে। ডাকাত মেয়ে জেল খেটে মরুক—

কানাই বলল, আচ্ছা হাবা ছেলে ! কড়কড়ে ধানবন—তার মধ্যে গরু নিয়ে যাস তুই কোন আক্কেলে ? সত্যি কথাই বলেছে ছুলি মা ! আমি বলে গোলা বাঁধতে বায়না দিয়ে এলাম, আর তুই গরু নিয়ে খাওয়াতে যাস ?

নন্দরাম আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল: ধানগাছ গরু দিয়ে খাওয়াবার কথা - ধান আমাদের গোলায় তুলতে দেবে কেন ?

কানাই বলতে লাগল, না দেবে না ! চাটুজ্জেমশায়ের চেয়ে আইন কেউ বেশি জানে না। তিনি বললেন, আলবৎ দেবে। নন্দা, গরুগুলোকে রাত্রে জাবনা দিবি, ধানবনে নিয়ে যাস নে আর।

কানাই ঘরে গিয়ে উঠল। নন্দ ছুলির দিকে চেয়ে দেখল, মেয়েটার খুশির অবধি নেই। জিজ্ঞাসা করে: ও গয়লা জিৎ হল কার ?

নন্দ বলে, কার শুনি ?

আমার, আমার—

হাঁদারাম মেয়ে দম্ভে যেন ফেটে পড়ছে।

কেমন ? ধান খাওয়াতে যেও এবার চুপি-চুপি—আমি কানাই-জ্যাঠাকে

বলে দিয়ে যাব, তখন বুঝবে মজা।

নন্দর চোখে জল আসতে চায়। সামলে নিয়ে বলল, আচ্ছা তুলি, এত কষ্ট করে চাষ করলি তোরা, ফাঁকি দিয়ে আমরা সব নিয়ে নিচ্ছি। তা কষ্ট হচ্ছে না তোর ?

তুলি বলল, আমার কষ্ট হয় লক্ষ্মীর হেনস্তা দেখলে। গরু দিয়ে ধান খাওয়ালে আমার এক-একটা পাঁজরা খসে যায় যেন। এবারে সেটি পারবে না।

হাসতে হাসতে বিজয়ীর মত তুলি চলে গেল। নন্দ নিজের মনে ভাবে, এই বুদ্ধি নিয়ে গয়লা-গয়লা করে! টের পাবে যখন ডাহা উপোস করে মরবে।

ক্ষেতে নামবার হুকুম নেই—আলের ঘাস কেটে এনে গরুকে খাওয়াতে হবে। একদিন সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে, নন্দ ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে আসছে। হঠাৎ দেখে শান্ত ডোমের ভিটার ধারে তালগাছের গোড়ায় একটা লোক চুপচাপ বসে।

কে ?

আমি, বাবা।

বুড়া জীবধর ধানবনের দিকে মুখ করে বসে আছে। কৈফিয়তের ভাবে বলল, কাজকর্ম নেই, কি করি—বেড়াতে বেড়াতে চলে এলাম ইদিক পানে।

বৃষ্টির জল পেয়ে নাটা ও কালকাসুন্দের ঝোপ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, ভাসা-বাদার দু-দশটা জাত-কেউটেও যে আস্তানা না নিয়েছে, এমন নয়। বেড়াবার জায়গাই বটে !

মাথার বোঝা মাটিতে ফেলে নন্দরাম তার উপর এক পা তুলে দাঁড়াল : ক্ষেতটা তা হলে আমাদেরই সাব্যস্ত হল ?

জীবধর বলল, ক্ষেত তো নয়, ক্ষেতের ধান—

শুধুই ধানগাছ আমাদের। ধানের চুক্তি তো আমাদের সঙ্গে ছিল না—

গাছ হলে তার ফলও পাওয়া যায় বাবা। চাটুজ্জেমশায় বলে দিয়েছেন।

তা বলে—বাড়িতে ভারে ভারে দই-ছানা বয়ে নিয়ে গেলে সবাই অমন বলে থাকে।

নন্দরাম যেন ক্ষেপে গিয়েছে। বলতে লাগল, চাটুজ্জে বললেই অমনি হবে নাকি ? জমিদারের কাছারি নেই।

জীবধর বলল, হা রে কপাল! কানায়ের নামে বলতে আমি যাব জমিদারের কাছারি ?

তুমি না যাও, যাবার কত লোক রয়েছে সর্দার-খুড়ো। রাণ্ডি দড়ি ছিঁড়ে

দু-গোছ ধান খেল, তুলি তাতে খোঁটা দিয়ে হেন-তেন কত কি গালমন্দ করল। কেন করল অমন? গোলমাল তো সেই থেকে। আমি কি করলাম? টাকা আদায় করে দিয়েছি—তোমাদের চুক্তির সময় ছিলাম আমি? যত গণ্ডগোলের গোড়ায় তো তুলি।

কথা আর সে বলতে পারল না। তাড়াতাড়ি বোঝাটা মাথায় তুলে হন-হন করে চলে গেল।

ক-দিন পরে নন্দ জীবধরের একেবারে সামনে পড়ে গেছে, সরে পড়বার ফিকির নেই।

জীবধর বলে, এ কি আরম্ভ করেছ বাবা? এক মায়ের পেটে না জন্মেও কানাই আর আমি চিরকাল ভাই-ভাই ছিলাম। ক'খুঁচি ধান যে সব বরবাদ করে দেয়—

নন্দ আকাশ থেকে পড়ল: কি হয়েছে সর্দার-খুড়ো?

জীবধর বলে, তুমি জান না কিছু? কাছারি থেকে ডেকে পাঠিয়েছিল। নায়েব বললেন, কে নাকি নালিশ করে এসেছে। তুমি সেদিন কি-সব বলে গেলে—ভাবলাম, তুমিই বুঝি খবর দিয়ে এসেছ।

নন্দরাম বলল, সর্বনাশ, আমি খবর দিতে যাব? তাতে ক্ষতিটা আমার না আর কারো? অন্যায় তো হচ্ছেই, খবর দেবার লোকের অভাব কি? কে গিয়ে লাগিয়ে এসেছে।

তারপর উৎসুক কণ্ঠে বলল, বিচারটা কি রকম হল শুনি—

জীবধর চিন্তিত ভাবে বলল, বিচার হয়নি এখনো। একটা কিছু হবেই, তাই আরও ভাবনা লেগেছে। আমি দেখছি, জেতার চেয়ে আমার হারই ভাল। একবার ইচ্ছেও হল চেপে যাই। কিন্তু রাজ-কাছারিতে দাঁড়িয়ে খোলাখুলি বলে আসতে হল। কাল কানাইকে ডেকে পাঠাবে শুনলাম।

পরদিন সত্যই কানাইয়ের ডাক হল। কিন্তু ফিরে এলো খুব হাসিমুখ নিয়ে। নন্দ মুখ কাঁচু-মাচু করে বলল, খবর কি বাবা? উতলা হয়ে আছি।

হি-হি করে হাসতে হাসতে কানাই বলল, হবে আবার কি, হবে ঘোড়ার-ডিম! নায়েবের সঙ্গে রফা হয়ে গেল, নগদ আড়াই টাকা আর আড়াই সের মাখন। বাস! জীবধরের কারসাজিটা দেখ। খবর পেয়েছে, কাছারি ম্যানেজার এসেছে। অমনি তাড়াতাড়ি তার কাছে সাতখানা করে লাগানো হয়েছে। আরে বাপু, ম্যানেজার এর করবে কি? ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গেলে হয় কখনো? নায়েব তাই আরো রেগে গেছে।

শুষ্ক মুখে নন্দ বলল, হল কি তাই বল না—

কানাই সগর্বে বলতে লাগল, নতুন কি হবে? নায়েব বলে দিয়েছে ধান আমার পাওনা।

কিন্তু নায়েব যাই বলুন এবং কানাইয়ের সঙ্গে রফা তাঁর যে প্রকারই হোক, ম্যানেজার উপস্থিত থাকায় শেষ পর্যন্ত হুকুম সম্পূর্ণ উল্টা রকম হয়ে গেল। ধান পাবে জীবধর, এমন কি কানায়ের দশ টাকা ফেরতও দিতে হবে না, গরুকে এতদিন যা খাইয়েছে, তাতেই টাকা শোধ হয়ে গেছে। হুকুমটা এখনও জানাজনি হয় নি।

তেঘরার গাঙে নৌকা-বাইচ। এই বাইচের বড় নামডাক। যে দল জেতে, তাদের পিতলের ঘড়া বকশিশ দেওয়া হয়।

জীবধর ছুলিকে নিয়ে বাইচ দেখতে গিয়েছিল, কাছারির নকুল বরকন্দাজও সেখানে। সে-ই চুপি চুপি জীবধরকে হুকুমের কথাটা বলল।

ছুলি আর বেশিক্ষণ থাকতে দিল না, কেবলই বলে, বাড়ি চলো, বাড়ি চলো—। বাড়ি এসে খবরটা ঢাক পিটিয়ে জাহির করে নন্দরামের সামনে দিয়ে জাঁক করে বেড়িয়ে আসবে—এই তার মতলব।

বাপে-মেয়েতে ফিরছে। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। বাড়ি যাচ্ছে, তা ছুলি যেন নাচতে নাচতে চলেছে। দেহাটার চরের কাছাকাছি এসে বলল, চলো না বাবা, ক্ষেতের দিক দিয়ে ঘুরে যাই একটু।

উঁহু, এই রাত্তিরবেলা—জীবধর মাথা নাড়ল।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! কানাই যেদিন ধান খাওয়াবার চুক্তি করে নিয়েছে, সেদিন থেকে ছুলি ক্ষেতমুখো হয় নি। আজ সে কিছুতে শুনল না, জীবধরকে এক রকম জোর করেই নিয়ে চলল।

গেঁয়ো-বনের মধ্যে যেন কিসের আওয়াজ। ছুলি হাঁক দেয়: কে?

সাড়া নেই, চারিদিক চুপচাপ।

ছুলি বলে, বাবা মানুষ আছে ওখানে।

জীবধর বলে, আছে তো আছে। মাছ ধরছে কারা। আরে আরে, চললি ঐ জঙ্গলের মধ্যে ম্যাচ-ম্যাচ করে? এমন মেয়ে দেখিনি তো!

জঙ্গলের মধ্যে থেকে ছুলি চিৎকার শুরু করেছে: বাবা, দেখ—দেখ এসে গয়লার কাণ্ড! আমি তখনই জানি—

জীবধর গিয়ে দেখে, চোর কোদালসুদ্ধ ধরা পড়েছে। কোদাল দিয়ে নন্দরাম বাঁধ কাটছিল। আর খানিকটা কাটতে পারলেই খালের নোনা জল

ধানবনে পড়ে সানায় ধান ডুবিয়ে দিত। সাংঘাতিক ছেলে!

তুলি কোমরে দু-হাত দিয়ে মল্লযোদ্ধার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে। বলে, দেখ শয়তানি। নোনা লাগলে গরুকে ধান খাওয়াবার মজা হয়, না?

নন্দরাম একটুও অপ্রতিভ নয়। জবাব দিল: হয়ই তো। গরুকে আমি খাওয়াবই। তুই জিতে যাবি, তাই হতে দেবো নাকি?

তুলি বলতে লাগল, দেখলে বাবা? ছিংসুটে কেমন, দেখ একবার। খবর পেয়েছে, ক্ষেতের ধান আমাদের পাওনা। বাঁধ কেটে অমনি সব ডুবিয়ে দিতে এসেছে।

কোদাল ছুঁড়ে ফেলে নন্দরাম খাড়া হয়ে দাঁড়াল: ক্ষেতের ধান তোমরা পাবে সর্দার-খুড়ো? নায়েব তাই হুকুম দিয়েছে?

জীবধর নন্দকে বুকে জড়িয়ে ধরল। বলল, কার কীর্তি, সে কি জানি নে বাবা? নকুল বরকন্দাজের কাছ থেকে সমস্ত শুনে এসেছি। নায়েবের কাছে হল না দেখে তুমি নিজে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে সব বলে এসেছ। কাজটা কিন্তু মোটে ভাল হয় নি। বাপের নামে লাগিয়ে এলে। কানাই যখন শুনতে পাবে, তার মনটা কী রকম হবে বলো তো?

তুলির কালো চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে উঠল: গয়লা বলে এসেছে? ম্যানেজারের কাছে যেতে সাহস হল ওর?

জীবধর বলে, ও ছাড়া আবার কে! আমি বরাবর সন্দেহ করেছিলাম, মিথ্যে বলে বলে ও আমার কাছে লুকিয়ে এসেছে।

তবেই দেখ কী রকম লোক! তুলির চোখে-মুখে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বলতে লাগল, চুরি করে বাঁধ কাটে, আবার এত মিথ্যেকথা বলে। ওকে যে কী করে তুমি ভাল বলো—

তিন-চারটা লণ্ঠন আল-পথে এসে বাঁধের উপর উঠল। কানায়ের গলা পাওয়া যাচ্ছে। ডাকছে: জীবধর!

জীবধর সাড়া দিলে সকলে সেইখানটা এসে দাঁড়াল। কানাই ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, কেষ্ট গিয়ে খবর দিল, আমি কিন্তু বিশ্বাস করি নি—

সবাই যেন স্তম্ভিত হয়ে আছে। তাদের মুখের দিকে এক নজর চেয়ে শুষ্ক মুখে জীবধর বলল, কি বলেছে কেষ্ট?

জবাব দিল দক্ষিণপাড়ার মধু।

মাথামুণ্ডু কী আর বলবে! মাছ ধরে এই পথে ফিরছিল। গিয়ে খবর দিল, বাঁধের এই দিকটায় কোদাল পড়ছে। একরশি আগের থেকে আমরা গলার আওয়াজ পেলাম, কোদালও ঐ পড়ে রয়েছে। তা দিনটা বেছেছ ভাল

সর্দার—সবাই বাইচ দেখতে গেছে। আমরাই ক'জন সকাল সকাল ফিরেছি।

তুলি জলে উঠল। বাঁধ কাটতে বয়ে গেছে বাবার। কাটছিল ঐ নন্দা—

নন্দা কাটছিল বাঁধ?

কানাই বলল, হ্যাঁ—হ্যাঁ—। ঘাড় নাড়ছ কেন মধু, তা হতে পারে। হারামজাদা কুলের মুষল।

তারপর জীবধরের দিকে চেয়ে বলতে লাগল, ওর কানে যে কি গুড়মন্তোর দিয়েছ সর্দার-ভাই, রাতদিন ও তোমাদের হয়ে ঝগড়া করে। ধানগুলো আমার গোলায় উঠলে ওর সর্বনাশ হয়ে যাবে কিনা, তাই ও বাঁধ কাটতে লেগেছে—

নন্দরাম বলে, তোমার গোলায় ধান উঠবে কি করে বাবা? ম্যানেজার হুকুম দিয়েছে, যাদের জমি ধান তাদের। আমি বাঁধ কাটি আর নোনাজলের তুফান বইয়ে দিই, তোমার তাতে কি যায় আসে?

সত্যি নাকি? কানাই জীবধরের দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকাল।

জীবধর বলল, ম্যানেজার বলেছে তাই বটে। কিন্তু ক'টা ধানের জন্য তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে যাব বুঝি! ধান আমি নন্দ-বাবাকে দিয়ে দিলাম —ও তোমাদের। আমি আর উদিকে ছায়া মাড়াতে যাচ্ছি নে।

কিন্তু তুলির আপত্তি আছে। সে বলল, না, যাব না! একশ' বার যাব ধান দিয়ে দাওগে। কিন্তু ওকে বিশ্বাস নেই—গরু দিয়ে ধান না খাওয়ায়, সেটা দেখতে হবে।

কানাই বলে উঠল, দেখতে হবে বই কি মা! হারামজাদার কাণ্ডজ্ঞান মোটে নেই, ওকে দেখবার জন্যেই একজন পাহারাদার দরকার। সর্দার-ভাই, ধান-টান থাকগে, তুমি তুলি মাটিকে দিয়ে দাও। ধান দিলে লাভ হবে না কিছু—হারামজাদা গরু দিয়ে খাইয়ে দেবে।

লণ্ঠন নিয়ে ওরা একটু এগিয়ে পড়েছে। তুলি আর নন্দ পিছিয়ে গেছে। অত ঝগড়া করবে, তা পা চলবে কখন?

নন্দ সদম্ভে বলল, ওরে তুলি, গয়লা-গয়লা করতিস যে বড়—এবার যদি তোকে কেউ ডাকে গয়লা-বউ?

তুলি মুখ ঘুরিয়ে বলল, গয়লার ব্যবসা রাখতে দেবো বুঝি! রাত্তিরকে দিয়ে আসছে বছর আউশের চাষ হবে।

ঘন কালো আউশধান। কোমর সমান উঁচু হয়েছে, রাতের বাতাসে

দুলছে, গান ধরেছে বুঝি চুপিসাড়ে। আল-পথে চলেছে দুলি আর নন্দ। ধান তাদের গায়ের উপর গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

দিল্লি অনেক দূর

জেল থেকে অজয় শৈলিকে চিঠি দিয়েছিল: পনেরোই স্বাধীনতা-দিবস, তার আগে ছাড় পেয়ে যাব। গাঁয়ে থাকব ঐদিনটা, ওখানে পতাকা তুলব।

মোক্ষদা অজয়ের মামার-বাড়ির পুরানো ঝি। মামারা পৃথক হয়ে ভায়ে ভায়ে তুমুল ঝগড়া বাধালেন, মোক্ষদারও শরীর অপটু হয়ে পড়ল। সেই সময় মা তাকে নিয়ে এসেছিলেন, সঙ্গে একফোঁটা মেয়ে ঐ শৈলি। তারপর মোক্ষদা মারা গেল, শৈলি বরাবর অজয়ের মার কাছে থেকে মানুষ।

মোক্ষদা এমন ছিল, মেয়েটা হল বিষম বজ্জাত। আস্কারা দিয়ে মা তার মাথাটি খেয়েছিলেন। ঝিয়ের মেয়ে, করবেও ঝি-গিরি—কিন্তু মনমেজাজ সে রকমের নয়। কাজ কিছু করবে না, কেবল ঝগড়া করে বেড়াবে—আর মোড়লি করবে বাড়িসুদ্ধ সকলের উপর।

বাড়িতে তখন তিনটে দোওয়া-গাই আর দুটো বলদ। পবন গরুর কাজ করে। সে নালিশ করল, শৈলিকে গোবরের মশাল তৈরি করতে বলা হয়েছিল, সে তা কানে নিল না। তাস খেলছে কাঁঠালতলায় বসে। মায়ের নাম করে বলতে উল্টে সে লাথি দেখিয়েছে পবনকে।

বারান্দায় বেরিয়ে এসে মা ডাকতে লাগলেন: শৈলি, শৈলি—। সাড়া নেই। মা তখন অজয়কে পাঠালেন, তুই যা তো। গিয়ে বল্, আমি ডাকছি।

অজয় ফিরে এসে বলল, কানেই নিল না মা। ছক্কা করবে, সেই ভাবনায় মশগুল।

অগ্নিশর্মা হয়ে মা বললেন, চুলের মুঠো ধরে নিয়ে আয় হারামজাদিকে টানতে টানতে।

একটু পরেই কোলাহল। তীরের মতো ছুটে এলো শৈলি। মায়ের আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে: দেখ তো মা, দাদা চুলের মুঠি ধরতে আসছে।

মা বললেন, আমি বলেছি। বড্ড অবাধ্য হচ্ছিস দিন দিন। তাস খেলছিলি এই অসময়ে?

কিন্তু বয়ে গেছে তার মায়ের কথায় কান দিতে। অগ্নিদৃষ্টিতে সে পবনের

দিকে তাকিয়ে। বিজয়ীর মতো হাসছিল পবন। হঠাৎ ফাঁক বুঝে এগিয়ে তার কাছে গিয়ে—

থুঃ থুঃ !

থুতু দিল পবনের গায়ে। দিয়েই আবার মায়ের পিঠের আড়ালে গেল।

পবন বলে, এই দেখ, দেখ মা—থুতু দিয়েছে।

বড্ড বাড় বেড়েছে। তোমার হাড় এক জায়গায় মাংস এক জায়গায় করব, তখন বুঝতে পারবে মেয়ে।

শৈলি একেবারে গুটিসুটি হয়ে মায়ের পিছনে লুকিয়ে আছে। মা বললেন, তুই গা ধুয়ে আয় পবন। আমি দেখে নেবো ওকে।

শৈলির দিকে চেয়ে তার ভাবভঙ্গি দেখে হেসে ফেললেন মা, আর রাগ করে থাকা চলল না।

এর পর বড় হয়ে শৈলি শান্ত হয়েছে, মারামারিটা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু শত্রুতা সেই রকমই আছে পবনের সঙ্গে। যখন তখন পবনের নামে লাগায় মায়ের কাছে। তক্কে তক্কে থাকে—কাজের মধ্যে এক মিনিট বসে যদি কলকে ধরিয়েছে, আর রক্ষে নেই—মায়ের হাত ধরে হিড়-হিড় করে টেনে এনে দেখাবে। অতিষ্ঠ করে তুলল পবনকে।

মাঘের মাঝামাঝি আবাদ থেকে ধানের নৌকা আসত। তখন দুটো তিনটে দিন খুব কাজ পড়ে যেত অজয়দের বাড়ি। লোকজন ডেকে খালের ঘাট থেকে উঠানে ধান নিয়ে আসা, ধান ঝাড়া, পালি মেপে ধান তোলা গোলার ভিতর। মা একদিন বুঝি বলেছিলেন পবনকে সকাল সকাল ডেকে তুলে দিতে—ব্যস, ঐ হল কাল। সেই থেকে ভোর না হতেই শৈলি পবনের ঘরের দরজায় হানা দেয়। ধান তোলার কাজ শেষ হয়ে গেল, কিন্তু রাত থাকতে তাকে ডেকে তুলে দেবার ব্যবস্থা কায়েমি হয়ে রইল। পবন বাইরের ঘরে শোয়, তাকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে—এই সুখে শৈলি শীতের শেষরাত্রে আঁচল মাত্র গায়ে দিয়ে উঠান পার হয়ে অত দূর চলে যায়, একটা দিন ব্যতিক্রম হয় না।

পবন অজয়কে বলল, আমি চাকরি ছেড়ে দেবো।

অজয় বলল, মাকে বলব। সত্যিই তো—কি দরকার সাত সকালে রোজ রোজ ডেকে তোলার ?

পবন বলে, মা'র বয়ে গেছে। মা কি এখন ডাকতে বলেন ? এসব করছে মাতব্বরি করা যার স্বভাব। মা ওকে ঠাণ্ডা করে দিতে পারেন ভাল, নয়তো ওর শাসনে কক্ষনো আমি থাকব না বাবু।

শৈলি শুনে বলে, যাক না যেখানে পারে। কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই। ও না থাকলে বাড়ি আমাদের বুঝি অন্ধকার হয়ে যাবে! তুমি জবাব দিয়ে দাও মা—যে চুলোয় ইচ্ছে চলে যাক। পাঁচ টাকা মাইনে বাঁচবে, দু-বেলার পাঁচপো চালের ভাত বেঁচে যাবে।

গলা খাটো করে বলবার মানুষ নয় শৈলি। পবন বলে, শুনলে তো মা? উড়ে এসে জুড়ে বসেছে দেখ কি রকম! আমাদের বাড়ি—বাড়িটা অবধি যেন ওর হয়ে গেছে!

মা হাসতে হাসতে চলে গেলেন। শৈলিও হাসে: হিংসে হচ্ছে? আচ্ছা, তুমি যেদিন বাড়ি করবে, সেইটেকে না হয় বলা যাবে আমাদের বাড়ি।

পবন বলে, কি বললি শৈলি?

বলা কথা আমি দু-বার বলি নে। কালা যারা, শুনতে পায় না—কানা যারা, দেখতে পায় না।

পুলকে ডগমগ হয়ে পবন বলে, ঘর একটা বাঁধতে হয় তা হলে!

হঠাৎ আবার রূঢ় হল শৈলি। বলে, পাঁচ টাকা মাইনেয় ঘর বাঁধা যায় না। ঘর বাঁধতে কোনদিন হবে না তোমায়।

এ কথাবার্তা অজয় জানে। তার পড়ার ঘরের পাশেই হচ্ছিল এই সব। পর-দিনই পবন কাজ ছেড়ে দিল, মা'র কাছে গিয়ে সসঙ্কোচে ইচ্ছাটা ব্যক্ত করল।

মা বললেন, কোথায় যাচ্ছিস? কত দেবে তারা।

জিভ কেটে পবন বলল, কোথাও যাব না মা, এমন যত্ন আর কোথা পাব? ছেলে হয়েই তো আছি—চাকরগিরি করছি, আপনার সংসারে বুঝবার জো নেই।

মা বললেন, তবে কি করবি?

ব্যবসা করব।

পুঁজি?

পুঁজি আর কে দিচ্ছে মা! এক মাস আঠারো দিনের মাইনে পাব, ঐ দিয়ে পান-সুপারি কিনে ফিরি করে বেড়াব ভাবছি।

মা চুপ করে ভাবলেন একটুখানি। তারপর বললেন, বেশ। মাইনে এক মাস আঠারো দিনের নয়—দু-মাসেরই পুরোপুরি। তার উপর আমি আরও কুড়ি টাকা দেবো। ব্যবসা ভাল চলে তো শোধ দিবি, নয় তো কিছুই দিতে হবে না!

কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে পবন মা'র পায়ের গোড়ায় প্রণাম করল। আড়ালে

গিয়ে শৈলি ধমক দেয় পবনকে : ভিক্ষের টাকা হাত পেতে নিতে লজ্জা করবে না ?

পবন হতভম্ব হয়ে গেল। মা ভালবেসে দিতে যাচ্ছেন—সেই সম্পর্কে এমন কথাও বেরুল শৈলির মুখ দিয়ে ! বলে, ভিক্ষে দেখলি কোথায় ? এ তো কর্জ নেওয়া। সুসময় এলে শোধ করে দেবো।

শৈলি বলে, বেশ কর্জ নেবে তো আমার কাছ থেকে নিও, সুদ দিতে হবে টাকায় এক পয়সা। কুড়ি টাকা আমি দেবো, সুদের পাঁচ আনা মাসে মাসে তুমি শোধ করে যেও।

অনেক টাকা হয়েছে তোর, টাকা খাটাবার দরকার ? পবন গালভরা হাসি হাসল। বলে, এই কথাটা সোজা করে বললেই হত। কিন্তু মা'র টাকা ভিক্ষে বলে ঠেস দিলি তুই কোন্ মুখে ? জিভে আটকাল না ?

গঞ্জ থেকে ব্যবসার মালপত্র নিয়ে এলো, সেদিনের কথা অজয়ের মনে পড়ে। পান সুপারি, দোক্তা-তামাক, ঘুনসি, কাচের চুড়ি, আলতা পাতা। মোক্ষদার একটা ফাঁদিনথ ছিল মুক্তা-বসানো—মায়ের সেই গয়না বিক্রি করে শৈলি পবনকে টাকা কর্জ দিয়েছে। মালপত্র শৈলি নিজে ডালায় সাজিয়ে দিতে বসল। একবার একভাবে তোলে, আবার মাটিতে নামায়। কিছুতে যেন মনোমত হয় না। অজয় হবে প্রথম খরিদ্দার···তার কিনবার মতো জিনিস কিছু নেই, দু-পয়সার পান-সুপারিই কিনল অগত্যা। কাঁচা-সুপারি চিবিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যায় আর কি !

তারপর কী নিদারুণ পরিশ্রম পবনের ! কাউকে আর ডেকে দিতে হয় না—সকাল হতে না হতে ডালা মাথায় বেরোয়, এ গ্রামে ও গ্রামে বাড়ি বাড়ি ফিরি করে বেড়ায়। ফেরে বিকালবেলা। দুটো নাকে-মুখে গুঁজে আবার তখনই রওনা হয়ে পড়ে হাট করতে। তিন-চার ক্রোশ দূর অবধি হাট করতে যায়। চেহারা আধখানা হয়ে গেছে, কিন্তু মুখের উপর হাসি লেগে আছে। এমন আগে ছিল না তো এ পবন !

অজয় জিজ্ঞাসা করে, কি রকম হচ্ছে, বল তো ?

পবন বলে, হবে বই কি, নিশ্চয় হবে। বছরের মধ্যে দেখতে পাবেন, দোকান ফেঁদে বসেছি, দুয়োর দুয়োর ঘুরে বেড়াতে হবে না। শৈলি বুদ্ধিটা দিয়েছিল মন্দ নয়। পরের বাড়ি খেটে কিছু হয় না—এতে উন্নতির আশা আছে।

কাজ ছেড়ে দেবার পরও পবন অজয়দের সেই বাইরের ঘরে আছে, খাওয়া-দাওয়াটা কেবল আলাদা করে। মা বলেছিলেন, এ হাঙ্গামায় গরজ কি ?

আগে ভাল করে নিজের পায়ে দাঁড়া, তখন রান্নাবান্না করে খাস। পবন রাজি হল না শৈলির প্ররোচনায় সম্ভবত। ফিরে আসতে তার বিকাল হয়ে যায় বলে শৈলিই ফাঁকমতো দুপুরের রান্নাটা করে রেখে আসে।

বি, এ, পড়বার জন্য অজয় এইবার কলকাতায় গিয়ে থাকবে। মা বললেন, অশ্লিতেই শৈলির বিয়ে দিই। বোনের বিয়ে অজয় দেখবে না, সে কখনো হতে পারে না। শৈলিকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন, আর তো আমার মেয়ে নেই—শখ মিটিয়ে এই বিয়ের আমোদ-আহ্লাদ করব।

শৈলি প্রতিবাদ করে, না মা, গরিবের বিয়েয় আমোদ-আহ্লাদ করলে নিন্দে করবে যে লোকে!

করে করবে আমার নিন্দে। তুই বিয়ের কনে—একেবারে মুখটি বুজে থাকবি। কোন রকম পাকামি করবি নে।

শৈলি বলে, তা হলে মা দাদার ছেলেবয়সের যে পুতুলগুলো আছে, তারই একটার বিয়ে দিয়ে দাও। যত খুশি আমোদ-আহ্লাদ করো। পুতুল কথা কইতে পারে না, মুখ বুজে থাকবে।

অজয়ের মনে পড়ে, বিয়ের পর পবন আর শৈলি যেদিন তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, মা বলেছিলেন, কি দরকার তোদের নতুন ঘর বাঁধবার? খামোকা কতকগুলো পয়সা খরচ। আলাদা থাকতে চাস, তাই না হয় থাকবি। তিন-তিনটে ঘর পড়ে রয়েছে, ঐখানে সংসার পাত। তোদের ওদিকে ফিরেও তাকাব না আমরা।

শৈলি ঘাড় নাড়ল: না মা, তোমার বাড়ির আনাচে-কানাচে কেন আমরা থাকতে যাব?

অকারণে আঘাত করতে আর কাটা-কাটা কথা বলতে শৈলির জুড়ি নেই। মা'র গলাটা ধরে এল বুঝি। ম্লান হেসে বললেন, আনাচ-কানাচ হল কি করে শুনি? বাইরের ঘর—তোরা সামনে রইলি, আমরা বরঞ্চ পিছনে পড়ে গেলাম।

তাই বা থাকতে যাব কেন মা? তার চেয়ে তোমাদের বড়-বাগানের এক পাশ থেকে কাঠা আষ্টেক জমি দাও আমাদের। সেখানে নতুন ঘর বাঁধি।

মজা নদীর ধারে বড়-বাগান। এককালে প্রচুর আম-কাঁঠাল গাছ ছিল শোনা যায়, এখন বাবলা নাটা সুঁইকাঁটা আর কাঁটাঝিটকের জঙ্গলে জায়গাটা দুর্গম হয়ে আছে। মা'র মুখের কথায় হল না, দস্তুরমতো দলিল করে দিতে হল তাদের—দেড় টাকা বার্ষিক খাজনা। সাপ আর বুনো-শুয়োরের ভয়ে ওদিকে পা ছোঁয়াত না কেউ, সেই বাগান কেটে পবন সেখানে ঘর তুলেছে।

অজয় পরমোৎসাহে ওদের ঘর বাঁধা দেখতে যেত। দেখে এসে মায়ের কাছে গল্প করত। ঘর ছাওয়া, ঘরের মাটি তোলা, বেড়া দেওয়া—পবন আর শৈলি কেবল এই দুটি প্রাণী মিলে সমস্ত করছে। যেদিন তাদের টুকিটাকি জিনিসপত্র গাঁটরি বেঁধে নিয়ে মাকে প্রণাম করল, মা শৈলিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন: কসাড় জঙ্গল—কেমন করে থাকবি ওখানে বল্ তো?

অজয় বলল, কাঁদছ তুমি মা—

মেয়ে বনবাসে পাঠাচ্ছি, কাঁদব না?

আগে অনেক সময় অজয়ের রাগ হয়েছে শৈলির কথাবার্তার ধরনে। ইতিমধ্যে বার দুয়েক জেল ঘুরে এসে এখন মনের ভাব অন্য রকম। বড় ভাল লাগে, দারিদ্র্যের সামনে ওদের মুখের উৎসাহ-দীপ্তি, নিজেদের চেষ্টায় ঘর বেঁধে বসত করবার এই আগ্রহ। অজয় বলল, আমাদের পথেও তো মা কত বিপদ! নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাচ্ছি আমরাও, সাপ-শুয়োরের চেয়ে কত ভয়ানক শত্রু ঘাপটি মেরে আছে আমাদের চারিদিকে! ছেলের বেলা আপত্তি কর না, আর মেয়ের বেলা কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছ?

শৈলি বলে, তাই দেখ দাদা। আমরা তবু সামনেই রইলাম, দু-মাসে ছ-মাসে তোমায় একবার হয়তো চোখের দেখাও দেখতে পারেন না।

এর অনেকদিন পরে অজয় একবার গ্রামে এসেছিল। তখন মা মারা গেছেন, অজয়দের ঘরবাড়ি খসে পড়ছে। জ্ঞাতি সম্পর্কীয় কাকার বাড়ি গিয়ে উঠবে, এই মতলব ছিল। কিন্তু নদীর ঘাটে নৌকা লাগতেই শৈলির সঙ্গে দেখা—সে স্নান করতে আসছিল। নাছোড়বান্দা একেবারে—বলে, না দাদা, কাকামশায়ের বাড়ি যাওয়া কখনো হবে না, উনি গালিগালাজ করেন। তুমি স্বদেশি করে বেড়াও বলে মাকে পর্যন্ত দেখতে যান নি শেষ সময়।

ওদের বাড়ি নিয়ে তুলল। বড়-বাগানের প্রান্তে ঝিকমিক করছে খড়ে-ছাওয়া ছোট্ট ঘরখানা। তকতকে উঠান—এমন পরিচ্ছন্ন যে সিঁদুর পড়লে তুলে নেওয়া যায়। কিন্তু বাড়িতে পিতল-কাঁসার বাসন নেই—মাটির হাঁড়ি-কড়াই শানুক-মালসা। রোজ কলাপাতা কেটে এনে ভাত খায়—গ্রামে দুর্লভ নয়, এ জিনিসটা। আর দেখল, শৈলির দু-হাতে দু-গাছা মাত্র শাঁখা।

পবনকে জিজ্ঞাসা করে, কেমন চলছে তোমার দোকান?

পবন বলে, না বাবু হয়ে ওঠে নি এখনও। হয়ে যাবে, দেরি নেই—চড়কের বাজার লাগবার আগেই দোকান তুলব। জোগাড় হয়ে এসেছে।

'এখনো সে তেমনি ফিরি করে বেড়ায়, বর্ষায় এক-হাঁটু কাদা ভেঙে আর শীতকালে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে রাজপুরে হাট করে বাড়ি ফেরে। এক বছরের ভিতর দোকান হবে ভেবেছিল, বছর তিনেক কেটে গেছে—তা হোক, এইবার আর অন্যথা হবে না।

শৈলি কী যত্ন করে যে খাওয়াত অজয়ের সামনে বসে। উপকরণ সামান্য—ভাত, কচুপাতার ঘণ্ট, হয়তো বা কাঁচা-তেঁতুলের ঝোল তার উপর। সঙ্কোচ নেই সেজন্য। শৈলি যেন রানী হয়ে রাজ্যপাট করছে, আনন্দ উপচে পড়ছে তার চলনে-বলনে।

অজয় একটা-দুটো দিন থাকবে ভেবেছিল, কিন্তু পুরো সপ্তাহ কাটিয়ে গেল এদের বাড়ি। বড় ভাল লাগল। সচ্ছল সংসার গড়ে তুলবেই এরা নিজেদের পরিশ্রমে, গ্রামের কারও অনুগ্রহ চায় না। অজয়ের মনে হল, স্বাধীনতার জন্য লড়াই—এদেরই এমনি সব গৃহস্থালী সর্ববাধা-মুক্ত হবে বলেই তো!

জেলের মধ্যে অজয়ের অনেক দিন মনে পড়েছে শৈলির কথা। পবনের দোকান তোলা হয়েছে নিশ্চয় এতদিনে। ছোট শিশু হেসে নেচে আনন্দময় করছে তাদের জঙ্গল-কাটা বাড়ি। কাঁসার থালায় দুধ-মাছ দিয়ে ওরা ভাত খায়, ছেলেপুলের মুখে আদর করে দুধ-মাছ তুলে দেয়। ছাড়া পেলে আর একবার কয়েকটা দিন অজয় বিশ্রাম নিয়ে আসবে ওদের সংসারে। পনেরোই আগস্টের আগে ছেড়ে দেবে খবর পেয়ে অজয় শৈলিকে চিঠি লিখল: স্বাধীন পতাকার নিচে তুই, তোর ছেলেপুলে, পবন আর আমি একসঙ্গে দাঁড়াব। আমার মায়ের আত্মা খুশি হবে।

আর ভেবেছিল, তৃপ্তিকেও চিঠি দেবে একখানা। কিন্তু না, উচিত হবে না। বারিদ মুখুজ্জের সন্দেহ বেড়ে যাবে মেয়ের উপর। উপকারী জনকে বিপদে ফেলা উচিত নয়। এবার জেলে আসবার আগে সে তৃপ্তির আশ্রয়ে ছিল।

রাস্তা দিয়ে যখন মিছিল যেত, জানলা বন্ধ করে দিত তৃপ্তি। আশ্চর্য মেয়ে, কৌতূহলও হয় না একনজর তাকিয়ে দেখবার। বারিদকে বলত, কী আবার দেখব বাবা? যারা কাজ করে না, তারাই চেঁচায়। চেঁচিয়ে মাথা ধরিয়ে দেয় আর দশজনের। আমি বাবা দোতলায় পিছন দিকে পড়ার ঘর করব। রাস্তার এদিকে পড়াশুনো হয় না।

অজয় সেই সময়টা বিষম বিপন্ন। থাকবার জায়গা খুঁজছে। কলকাতা ছেড়ে যাবারও উপায় নেই। অনেক কাজ।

তৃপ্তি থার্ড-ইয়ারের বার্ষিক পরীক্ষায় অঙ্কে ফেল হয়ে এল। মুখ শুকনো করে

বাপের সামনে দাঁড়ায়।

বারিদ বললেন, তাই তো! অঙ্ক ছেড়ে বরং আর কিছু নিয়ে নে তার বদলে।

না বাবা, এতদিন পড়ে এসে এখন ছেড়ে দেব কেন? মাস্টার রাখতে হবে। আমার চেনা-জানা একজন আছেন—ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ম্যাথামেটিকসে।

কত দর হাঁকবে ঠিক কি!

উঁহু, দর হাঁকবে না—

টাকা নেবে না? অঞ্জলি দেবী সন্দেহদৃষ্টিতে তাকালেন মেয়ের দিকে।

কিছু হাত-খরচ দিলেই হবে। থাকার জায়গা পাচ্ছেন না ভদ্রলোক—কলকাতায় একটু জুতমতো জায়গা পেলে বর্তে যান।

তৃপ্তি চলে গেলে স্বামী-স্ত্রীতে কথা হয়। অঞ্জলি বলেন, বিনা মাইনেয় পড়াবে, আমার সন্দেহ হচ্ছে।

বারিদ হেসে বলেন, তা হলে তো আরও বাড়িতে আনা উচিত। মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে—এটাকে চোখের সামনে রেখে ভাল করে বাজিয়ে দেখা যাক।

কিন্তু অজয় আসবার পর অঞ্জলি দেবী মুগ্ধ হয়ে গেলেন ক-দিনের মধ্যে।

সত্যি, ছেলেটি ভাল—ঠাণ্ডা মেজাজের। কোন রকম বেয়াড়াপনা নেই।

বারিদ বললেন, স্বাস্থ্য চমৎকার, চেহারাও ভাল। খোঁজখবর নাও দিকি বাড়ি কোথায়, কি জাত, কেমন বংশ—

অঞ্জলি দেবী হেসে বললেন, সে সব কিছু নয়। মেয়েমানুষ আমরা—ভাব দেখে বুঝতে পারি। একেবারে পরমহংস গোছের ছেলে।

বারিদের অফিস-ঘরের পাশে অজয়ের থাকবার ঘর। পাবলিক প্রসিকিউটার—বাইরের মক্কেলও আছে। যতক্ষণ বাড়ি থাকেন, ফাইল পরিবৃত হয়ে থাকেন। আর অজয়ের মতো ঘরকুণো ছেলেও দেখা যায় না—সব সময়ে একটা না একটা বই মুখে দিয়ে আছে। বই ছাড়া আর কোন-কিছুর সম্বন্ধে মাথাব্যথা নেই জগতের মধ্যে। বারিদ মনে মনে হাসেন। তাঁদের মধ্যে কত না জল্পনা হয়েছিল এই ছেলের সম্পর্কে!

সকালবেলা তৃপ্তিকে পড়ানোর সময়, তখন এক বার অজয়কে উপরে যেতে হয় তৃপ্তির পড়ার ঘরে। আড়াল থেকে অঞ্জলির খরদৃষ্টি থাকে। দেখে দেখে অবশেষে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন। না—এমন সৎ ছেলের কাছ থেকে কোন আশঙ্কার হেতু নেই মেয়ের সম্বন্ধে।

অজয় প্রথম দিন তৃপ্তিকে বলেছিল, এই বাড়ি এনে তুললে?

তৃপ্তি বলল, সারা শহরের মধ্যে এর চেয়ে নিরাপদ জায়গা আর কোথাও নেই।

বড্ড পুলিসের যাতায়াত—

তারা বাবার ঘরে আসে নিজেদের কাজকর্ম নিয়ে। পাশের ঘরে উঁকি দিতে যাবেন না।

তা যেন হল। কিন্তু অঙ্কের কিছুই যে আমি জানি নে। তোমার এসব বই আগে কখনো চোখে দেখি নি।

কী করা যাবে! অঙ্কেই যে ফেল করে বসলাম। সংস্কৃতে হলে সংস্কৃতের পণ্ডিত হতে হত আপনাকে।

কিন্তু সামনের পরীক্ষায় একেবারে শূন্য পাবে।

খুব ভাল নম্বর পাব দেখবেন সামনের পরীক্ষায়—মাস্টারমশায়ের পড়ানোর গুণে।

সত্যিই সে ভাল নম্বর পেল। কলেজের সমস্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে অঙ্কে দ্বিতীয় স্থান হল তার। পুলকিত বারিদ অজয়ের ঘরে এসে সেকহ্যাণ্ড করলেন। অঞ্জলি নিজের হাতে খাবার নিয়ে এলেন। প্রথম সেই কথা বললেন, একটাও বাজারের জিনিষ নয়। সারা দুপুর বসে বসে তৈরি করেছি, ঠাকুরের হাতে দিতে ভরসা করি নি। সবগুলো খেয়ে ফেলতে হবে বাবা।

অজয় আশ্চর্য হয়ে তৃপ্তিকে জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যাপার বল তো?

তৃপ্তি বলে, বাবা যা যা বলে গেলেন, একটা কথাও মিথ্যে নয়। কৃতিত্ব সমস্ত আপনার।

সেবারে অঙ্কে তবে ইচ্ছে করে ফেল হয়েছিলে?

না। ইচ্ছে করে পাশ করলাম এবার।

ইচ্ছে করলে সবই পারো দেখছি তুমি।

দেখছেনই তো। বাবা-মার ইচ্ছেয় কেমন ভাল মেয়ে হয়ে আছি, স্বদেশিদের গালি দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিই। আবার আপনাদের ইচ্ছেয় পার্টি মিটিংএ গিয়ে বসি কলেজ পালিয়ে।

পুলিস অজয়কে ধরে ফেলল। যেন শুঁকে শুঁকে এখানে এসে ধরল। বারিদ আর অঞ্জলি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এমন ছেলে এই করতে পারে, জগতের কাউকে আর বিশ্বাস নেই।

তৃপ্তি ভয়ে কেঁদে ফেলে আর কি!

উঃ, পেটে পেটে এত ছিল ভদ্রলোকের! আমাদের আবার গোলমালে

ফেলাবে না তো বাবা, অমন লোককে আশ্রয় দিয়েছিলাম বলে ?

তখন অজয়ের উদ্দেশে গালমন্দ স্থগিত রেখে বারিদ মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে প্রবৃত্ত হলেন : ভয় নেই, অত তুই ভয় পাচ্ছিস কেন ? আর কেউ হলে রক্ষে ছিল না, জড়িয়ে দিত। আমাকে চেনে সবাই, আমরা এ কাজের কাজি পুলিস বিশ্বাস করবে না।

তৃপ্তি তবু ঠাণ্ডা হয় না।

বিশ্বাসঘাতক ! দেখো বাবা, ছাড়া না পায় যেন কিছুতে। সবাই তো তোমার বন্ধুবান্ধব – বলে দিও, কি রকম আমাদের সঙ্গে চালাকি খেলেছে।

হেসে বারিদ বলেন, আমায় কিছু করতে হবে না মা। যে-সব চার্জ তার নামে, শুনেই গা শিউরে ওঠে। আচ্ছা অভিনয় করতে পারে ওরা কিন্তু।

তৃপ্তি বলে, কি জানি, কেমন করে মনের ভাব চেপে থাকে—আমি তো ভেবে পাই নে। আমার তো হাসি পেলেই হেসে ফেলি, কান্না পেলে কাঁদি।

একদিন বারিদ কোর্ট থেকে ফিরে এসে বললেন, তুই যে বলেছিলি অঙ্কে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ?

তবে ?

দূর ! বি. এ, পড়তে পড়তে ইস্তফা দিয়েছিল। তা-ও পিওর আর্টস পড়ত, ক্যালকুলাসের 'ক'-ও জানে না।

অঞ্জলি বললেন, পড়াত কিন্তু অতি চমৎকার। তোমার ফেল-হওয়া মেয়ের অঙ্কের জন্য ফার্স্ট হওয়া ফসকে গেছে। যাই বলো – আমার মনে হয়, মিছামিছি ওকে ধরেছে। গোবেচারা ভালমানুষ—ও যে এতসব করতে পারে, চোখে দেখলেও বিশ্বাস করি নে।

জেলের গেটে লোকারণ্য। একা অজয়ের জন্য নয়, অনেকেই বেরুচ্ছে আজ, জেলের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। জেল-বিভাগের নূতন মন্ত্রী অজয়দেরই একজন—তাদের দাদা-স্থানীয়। গোটা বারো বছর জেলে বসবাস করে এসেছেন বাইশ বছরের রাজনৈতিক জীবনে। এবার পাশা উল্টে গেল। বড় আসনে বসে অধম কনিষ্ঠদের কথা মন্ত্রীমশায় ভুলে যান নি এখনো।

বেরুচ্ছে, পার্টির ছেলেরা ঘিরে দাঁড়িয়েছে। খানিকটা দূরে—তৃপ্তি নয় ? মেয়ের সঙ্গে বারিদ মুখুজ্জেও মোটর নিয়ে এসেছেন।

ছেলেরা মালা পরাল। বারিদ তাদের মধ্যে এগিয়ে এসে বললেন, হল আপনাদের ? এবারে ছেড়ে দিন। আর যা কাজকর্ম থাকে, বিকেলে আমার

বাড়ি যাবেন আপনারা—সেখানে গিয়ে হবে। যাবেন দয়া করে, চায়ের নিমন্ত্রণ রইল আপনাদের সকলের। আজকের আনন্দের দিনে একজন কেউ বাদ না থাকেন।

বারিদ মুখুজ্জে হেন ব্যক্তি পার্টির ছেলেদের এই কথা বললেন, বাড়িতে তাদের নিমন্ত্রণ করলেন। অজয় চোখ কচলায়, স্বপ্ন দেখছে না তো ?

কোন কথা অজয়কে বলতে দিল না, তৃপ্তি হাত ধরে বিশাল মোটরের গর্ভে নিয়ে তুলল। হু-হু করে ছুটল গাড়ি।

মৃদু কণ্ঠে তৃপ্তিকে অজয় জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কি ?

বারিদের কানে গেল। তিনি বললেন, কাল স্বাধীনতা-দিবস। আমার বাড়ি পতাকা তোলা হবে। আলো আর উৎসবেরও আয়োজন করেছি। এক সময়ে আপনার সামান্য কিছু কাজে লাগবার ভাগ্য হয়েছিল। সেই সুবাদে নিবেদন জানাচ্ছি, পতাকা আপনাকেই তুলতে হবে। আপনার কাছ থেকে কথা পেলে খবরটা কাগজে পাঠিয়ে দিই।

এমন করে বলছেন যে, 'না' বলতে লজ্জা করে। তবু বলতেই হল,—শৈলিকে চিঠি লেখা হয়েছে, তার যেমন কাণ্ড—হয়তো গ্রামের অর্ধেক মানুষ জুটিয়ে এনে জোয়ারের সময় নদীর ঘাটে অপেক্ষা করবে।

তৃপ্তি বলে, পরশু যাবেন কালকের দিনটা না গিয়ে। গেঁয়ো ব্যাপার—কী-ই বা হবে সেখানে, ক-জনে দেখবে ! একদিন হলেই হল। কাল বা পরশু সমান তাদের কাছে।

অজয় বলে, না তৃপ্তি, বাধা দিও না। তোমাদের বড় আয়োজন, অনেক দেশবিখ্যাত মানুষ পাবে তোমাদের অনুষ্ঠানে। তাদের গাঁয়ের ঘরে স্বাধীনতার খবর পৌঁছে দেবার জন্য মন আমার ছটফট করছে। গাড়িটা রাখতে বলো একটু।

রাস্তা জুড়ে বড় বড় গেট তৈরি হচ্ছে। ইলেকট্রিক-মিস্ত্রিরা মই আর যন্ত্রপাতি নিয়ে ছুটোছুটি করছে আলোক-সজ্জার ব্যবস্থায়। আগামী দিনের উৎসবের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। পতাকা বিক্রির জন্য অস্থায়ী অনেক দোকান তুলেছে পথের ধারে। দোকানদারদের মরশুম পড়েছে। অজয় একটা পতাকা কিনে নিয়ে এলো।

অঞ্জলি দেবী রাস্তা অবধি এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন : এসো বাবা, এসো—

তৃপ্তি অজয়ের কানের কাছে মুখ এনে বলে, কী আদর দেখুন এবার, এ-বাড়িতে !

অজয় বলে, সে আমলে হোমরা-চোমরা সাহেবসুবোর যেমন ছিল, অবিকল সেই রকম।

তৃপ্তি বলে, মাকে বলেছি—ষড়যন্ত্র করে আপনাকে বাড়ি এনে তুলেছিলাম, সেই সব গল্প। বাবাকে আজ বলব। খুব হাসাহাসি হবে দেখবেন?

তৃপ্তি এক মুহূর্ত কাছছাড়া হয় না অজয়ের। কতদিনের জমানো কথা, কত হাসি-রহস্য! বলে, জানেন—এক মজা হয়েছিল। এক ছোকরা আই. সি. এস আনাগোনা করছিল কিছুদিন ধরে। একদিন জুতোর হিলে কাদা ছিটকে তার স্যুট নষ্ট করে দিই—সেই থেকে পিছু ছেড়েছে।

ভুল করেছ তৃপ্তি। আরামে থাকতে পারতে।

তৃপ্তি বলে, ওদের দিন ফুরিয়েছে।

অজয় বলল, সরকারি বাড়িতে ইউনিয়ন-জ্যাকের বদলে তেরঙা পতাকা উঠবে কাল। গতিক বুঝে তাড়াতাড়ি সবাই ভোল বদলাচ্ছে। রাগ করো না—তেমাদের বাড়িও তার ব্যতিক্রম নয়। এবারের লড়াই এই এদেরই সঙ্গে। আগে একটু সুবিধা ছিল, গায়ের রঙে জাত ধরা যেত। এবারে সেটা হবে না।

গ্রামের ঘাটে নৌকা লাগল। কেউ আসে নি, কাকস্য পরিবেদনা। চিঠি পায় নি নাকি?

শৈলিদের বাড়ির দিকে চলল। এত পথ গেল, একটা মানুষ দেখতে পায় না। শঙ্খধ্বনি নেই, পনেরোই আগস্ট—এই স্মরণীয় দিনটির চিহ্ন নেই কোন দিকে। কোথায় ওদিকে ক্ষারে-সেদ্ধ কাপড় আছড়াচ্ছে পাটের উপর—তার আওয়াজ আসছে। ক-জন চাষা পাশাপাশি ক্ষেতে নিড়ানি দিচ্ছে, ধানবনের আড়ালে তাদের মাথার টোকা দেখা যাচ্ছে। তৃপ্তি বলেছিল ঠিক আজকে না এসে যে কোন একদিন এলেই চলত এখানে। এ পতাকার কোন মহিমা নেই এদের কাছে।

শৈলি!

বড়-বাগানের জঙ্গল বেড়ে উঠে গ্রাস করতে বসেছে শৈলিদের ঘরটা। উঠান ভাদলা-ঘাসে এঁটে গেছে। ভাঁট আর আশশ্যাওড়ায় বাড়ি ঢুকবার পথটুকু এমন আচ্ছন্ন যে সন্দেহ হয় মানুষ থাকে না এখানে। পা দিতে আতঙ্ক লাগে। উঠানে এসে উচ্চকণ্ঠে অজয় ডাক দিল।

শৈলি বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

চিঠি পাস নি?

পেয়েছিলাম দাদা। জ্বরে কাঁপছি—ঘাটে যাব একবার ভেবেছিলাম। কিন্তু উঠতে পারি নে, যাই কেমন করে?

গ্রামে বলেছিস আজকের উৎবের কথা?

বলেছি বই কি! তা মনে সুখ নেই কারো। ধান-চালের এই দাম—একবেলা খেয়ে থাকে। তা-ও খেতে হয় না অবিশ্যি—বিষম জরজারি, উপোসই চলে বেশির ভাগ দিন।

এখন নজর পড়ল, ওধারে সুপারি-চারাগুলোর নিচে কয়েক টুকরা বাখারি নিয়ে একটি ছেলে খেলা করছে। বাখারিগুলো যেন গরু—গলায় দড়ি বেঁধে টেনে বাঁধছে সুপারিগাছে। নিকষ কালো গায়ের রং, ন্যাংটো একেবারে, গলায় দুটো লোহার মাদুলি। অজয়কে দেখে খেলা ছেড়ে কাছে এসে দাঁড়াল। অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

তোর ছেলে?

হ্যাঁ দাদা। গড় কর্ খোকা। তোর মামা হন।

শৈলির ছেলে প্রণাম করতে গেল। অজয় তাকে জড়িয়ে ধরল। হাতে ভাঁজ-করা তেরঙা পতাকা—ছেলেটা লোলুপ চোখে সেদিকে তাকাচ্ছে।

অজয় গভীর কণ্ঠে বলল, অনেক দুঃখের জয়-পতাকা, অনেক রক্তের রাগ লেগে আছে। তোদের জন্যে এনেছি খোকা। এখনই টাঙিয়ে দেবো।

শৈলি চোখ মুছছিল, হঠাৎ সে ডুকরে কেঁদে উঠল।

আজকে তুমি এসেছ। সে থাকলে কত আমোদ করত। দোকান-দোকান করে মারা গেল, কিছু করে যেতে পারল না। অসুখের মধ্যে সব দিন এক ঝিনুক বার্লিও মুখে তুলে দিতে পারি নি দাদা, এক ফোঁটা ওষুধ জোটে নি।

তখন আর হল না—শৈলির পথ্য আর শৈলির ছেলে ও নিজের জন্য চাল কিনতে অজয়কে ছুটতে হল হাটখোলা অবধি। বিকালবেলা শৈলির জ্বর কমেছে, পাড়াটা ঘুরে আবার সে বাড়ি বাড়ি বলে এলো। পবিত্র স্বাধীনতা-দিবস—যতটা তার বুদ্ধিতে কুলায়, প্রতি জনকে বুঝিয়ে দিয়ে এলো শৈলি। তবু পুরুষমানুষ বড় কেউ এলো না। কাজে বেরিয়ে গেছে, নয় তো জ্বরে ধুঁকছে কাঁথা মুড়ি দিয়ে—উঠবার ক্ষমতা নেই। এলো কয়েকটি বউ-মেয়ে আর ছেলেপিলে কতকগুলো। নূতন এক মজা দেখতে এসেছে যেন তারা, কোলাহল করছে—এতবড় মহৎ গম্ভীর অনুষ্ঠান, তা বলে একবিন্দু সমীহ নেই। গাঙের ধার থেকে দীর্ঘ এক তলতাবাঁশ কেটে এনে তার মাথায় পতাকা তোলা হল। অজয়ের দু-চোখ জলে ভরে আসে সতীর্থদের কথা ভেবে—পথের মধ্যে যারা প্রাণ দিয়েছে, আজকের দিনে যারা নেই। কি-জানি কেন, তাদের সঙ্গে

পবনকেও মনে পড়ল। আর মনে পড়ে আগেকার সেই শৈলিকে। স্বাধীন ঘর বাঁধবার জন্য হাসিমুখে এরা দুঃখের পথে পা বাড়িয়েছিল।

বাতাসে পতাকা উড়ছে, ঝিলমিল করছে বিকালের আলো পড়ে। শৈলির ছেলেটা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। শুধু কচি ছেলেটাই বা কেন— সবার চোখে বিস্ময় ও কৌতুক। অজয়ের ছেলেমানুষি দেখছে তারা অবহেলা ভরে। পবিত্র পতাকা শুধু এক রঙবেরঙের নেকড়ার ফালি ছাড়া কিছু নয়।

অজয়ের লজ্জা করছে। পতাকা না এনে সাধ্যমতো দু'খানা চারখানা কাপড় কিনে যদি বগলদাবায় করে নিয়ে আসত!

উলু

উলু! উলু! উলু!

মেয়েরা উলু দিতেছে। শিবনাথেরও যেন নবযৌবন ফিরিয়া আসিল। বৈঠকখানা পার হইয়া একেবারে লাফাইতে লাফাইতে তিনি তাদের মধ্যে গিয়া পড়িলেন।

ও কি হচ্ছে? ওরে শালীরা, একি লগ্ন-পত্তর হচ্ছে—না, পাকা-দেখা?

মেয়েরাও হারিবার পাত্র নয়। কমলা মুখ ঘুরাইয়া বলিল, তার চেয়ে বেশি দাদু। শুভদৃষ্টি হচ্ছে। বর ঐ চার চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে মেয়ের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিচ্ছে নাম ভাঁড়িয়ে কি আর আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া যায়?

পরাস্ত হইয়া শিবনাথ তখন বলিলেন, দে, তবে খুব করে উলু দে।—এ ভাঙা-ঘরে দশ বছর তো হয় নি ও-পাট!

বলিয়া হাসিতে গিয়া বুড়া চোখ মুছিলেন।

দশ বছর আগেকার সে ঘটনা মনে পড়িলে চোখে জল আসিবার কথা বটে। শিবনাথের একমাত্র ছেলে সন্ন্যাসী হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। ঘরে অতুল রূপ লইয়া পুত্রবধূ যোগিনী সাজিল। গৌরী তখন বছর পাঁচেকের। সেই গৌরীর বিয়ে, দিন-ক্ষণ সমস্ত স্থির, টাকাকড়ির কিছু অপ্রিয় লেনদেন হইয়া গিয়াছে। আজ হঠাৎ বরের ক'জন বন্ধু মেয়ে দেখিতে আসিয়াছেন। এবং উঁহাদের সঙ্গে বর নাকি আসেন নাই, তিনি কিছুতেই আসিলেন না, তাঁর নাকি ভয়ানক লজ্জা—ইত্যাদি ইত্যাদি।

অন্দর হইতে শিবনাথ পুনশ্চ বৈঠকখানায় গিয়া দাঁড়াইলেন। ওদিকে তখন মহা মুশকিল, মেয়ে কিছুতে মুখ তুলিবে না। শিবনাথ মিনতি করিতে লাগিলেন: ও গরবী দিদি, কথা শোন্, কিসের এত লজ্জা, আচ্ছা আমার দিকে চা দিকি—

এত পীড়াপীড়ি—গৌরীর ফর্সা মুখ একেবারে রাঙা হইয়া গিয়াছে, মেয়ে ঘামিয়া খুন। চেষ্টাচরিত্র করিয়া এক একবার মুখ তুলিতে যায়, খানিক উঠিয়া আবার নত হইয়া পড়ে, মুখ সে কিছুতে তুলিতে পারিল না।

বন্ধুরা হাসিয়া বলিল, থাক, থাক, ঐ হয়েছে—

শিবনাথ হাসিয়া বলিলেন, বড্ড লজ্জা। আজকালকার মেয়ের মতো নয়। এই বুড়োর সঙ্গে থেকে একেবারে যেন আত্তিকালের বুড়ি হয়ে উঠেছে।

তার পর সকলের পিছনের চশমা-চোখে নিতান্ত গোবেচারা গোছের ছেলেটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাকে একটু উঠতে হবে দাদা।

যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে, আগন্তুকেরা সকলেই এমনি ভাবে তাকাইল।

শিবনাথ বলিলেন, মানে আমার ছোট মেয়ে কালই এখান থেকে চলে যাচ্ছে জামাইএর সঙ্গে সিমলা পাহাড়ে। বিয়ের সময় থাকতে পারবে না। সে একবার একটু ভাল করে দেখতে চায়।

নিশিকান্ত মল্লিক মহাশয় ও-পাড়ার একজন মাতব্বর ব্যক্তি। তিনি আসিয়াছিলেন। হাসিয়া বলিলেন, পাত্র কনে দেখতে এসেছে, আর পাত্রী বুঝি বর না দেখে ছেড়ে দেবে!

বন্ধুরা তুমুল আপত্তি করিতে লাগিল: বললাম তো, পাত্র আমাদের মধ্যে নেই। আমরা কি মিছে কথা বলছি মশাই?

সে আমরা বুঝলাম। কিন্তু ওরা যে শোনে না। শিবনাথ নেপথ্যের দিকে তাকাইয়া বলিলেন ওরা ঐ ওঁকে পাঠিয়ে দিতে বলছে।

বন্ধুরা চোখ টেপাটেপি করিতে লাগিল, এবং তাদের দিকে করুণ অসহায় দৃষ্টি ফেলিয়া চশমাধারী উঠিল।

অন্দরে মহা সোরগোল।

ও গৌরী, দেখ্ সে এসে। কোথায় গেলি হতভাগী, বর পছন্দ করবি আয়।

মেয়ে এক-আধটি নয়, পনেরো বিশ কি তারও বেশি। নানা বয়সের। তাদের মধ্যে পড়িয়া সভয়ে ছেলেটি বলিল, আজ্ঞে, আমি বর নই।

সে হচ্ছে। আজিনটা তোল দিকি।

দেখিতে ভালমানুষ হইলে কি হয়, আসলে কিন্তু ছেলেটি মোটেই সে রকম নয়, অধিকতর ভয়ের ভঙ্গি করিয়া বলিল, আজ্ঞে না। আস্তিন গুটিয়ে কি হবে? দৃষ্টিটা ছিল বিশেষ করিয়া খুব স্থূলকায়া একজনের দিকে। বলিল, আপনাদের সঙ্গে পেরে উঠব না, আমি আপোসে হার মানছি।

সুধা আগাইয়া আসিয়া বলিল, উনি কে—জান?

না—

তোমার বউএর ছোটপিসি। তা হলে তোমারও পিসি হলেন। উনিই তোমায় দেখতে চেয়েছিলেন।

ছেলেটি মনে মনে জিভ কাটিল। সুধা তখন আস্তে আস্তে তার হাতের জামা সরাইয়া দিয়া বলিল, এই যে জতুক রয়েছে। ও জুয়োচোর, তুমি ঢাকলে কী হয়! ঘটক যে ফাঁস করে দিয়েছে। তোমার চোখে চশমা, হাতে জতুক, নাম নবমী। মিথ্যে নাম বলবার শাস্তি এবার কি হবে বল তো?

হাতে নাতে ধরা পড়িয়া নবমীর আর কথা বলিবার জো রহিল না। বিজয়ীর দল তখন শাসাইতে লাগিল: শাস্তি দেবার জনকে ডাকছি এখুনি। দেখ তোমার কী হয়। গৌরী গৌরী!

ভাংগচোরা অতি-পুরানো প্রকাণ্ড দালান। তাহারই মধ্যে পাথরের মতো ভারী কালো হাঙরমুখো খাটের উপর গদি ও সেকেলে জাজিম পড়িয়াছে। বর সেইখানে শাস্তির প্রত্যাশায় বসিয়া রহিল। কিন্তু কোথায় গৌরী?

পাতি-পাতি করিয়া এঘর-ওঘর সমস্ত খোঁজা হইল। একটা জায়গায় বালিশ-বিছানা গাদা করা, দুষ্ট মেয়ে করিয়াছে কি—একদম তার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, ধরিবে কাহার সাধ্য! সকলে খুঁজিয়া মরে—সে এক একবার মুখ বাড়াইয়া চোখ মিটি-মিটি করিয়া মজা দেখে, কাছাকাছি কেহ আসিলে তখনই আবার লুকাইয়া পড়ে। কিন্তু একবার কেমন একটু অসাবধানে গোটা তিন-চার বালিশ দুমদাম করিয়া মেজেয় পড়িয়া গেল। আর রক্ষা আছে! ধরিয়া ফেলিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে তাকে লইয়া চলিল।

ঝুম-ঝুম-ঝুম পায়ের তোড়া বাজিতেছে। প্রায় দোরের গোড়া অবধি পৌঁছিয়াছে নবমী তখন যুক্ত করে কাতর হইয়া কহিল, আমার অন্যায় হয়েছিল, মাপ করুন।

কিন্তু ততক্ষণে মেয়ে আসিয়া লজ্জিত মুখে মেজে লইয়াছে।

ছোটপিসি হাসিয়া ডাক দিলেন: ধুলোয় বসিস নে। উঠে আয় খাটের উপর।

কমলা কহিল, ইস, পোড়ারমুখী লজ্জায় আর বাঁচেন না! মনে না ধরে,

দাদুকে বল্। এখনও সময় আছে।

অনেক জোরজবরদস্তি করিয়াও মেয়েকে উঠানো গেল না। তখন ছোটপিসি গিয়া বরের হাত ধরিলেন: তুমি বাবা, তবে একটু নিচে নেমে এসো। আমার বড় সাধ একটু পাশাপাশি বসিয়ে দেখে যাই।

শিহরিয়া নবনী বলিল, না, না—

সুধা বলিল, আপত্তিটা কি ভাই? দু-দিন আগে আর পরে। পিসিমা এত করে বলছেন। ওতে কোন দোষ নেই। এসো—

অবশেষে উঠিতেই হইল। সকলে জোর করিয়া গৌরীর ঘোমটা খসাইয়া দিল। দুটিতে অপরূপ মানাইয়াছে। কে বেশি ভাল, তুলনা করিয়া বলিবার জো নাই। দৃষ্টি আর ফিরানো যায় না।

ছোটপিসির চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। এমন রাজরাজেশ্বরী মেয়ের বাপ না-জানি কোন্ দূরদেশে ছাইভস্ম মাখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! গাঢ়স্বরে বলিলেন, চিরজীবী হও তোমরা। দুজনের চিবুকে হাত ঠেকাইয়া আশীর্বাদ করিলেন।

বর ধীরে ধীরে উঠিয়া আবার খাটের উপর গিয়া বসিল। ছোটপিসি পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন দেখলে, বল বাবা। আমি একবার কানে শুনে যাই। দেখতে তো পাব না।

ভাল।

সুধা রাগিয়া উঠিল: শুধু ভাল? ইঃ, নিজের একটুখানি কটা চামড়া আছে কিনা—সেই দেমাকে বাঁচেন না! মেয়ে তো তোমরা ডজন ডজন দেখলে, শুনলাম। এমনটি আর দেখেছ কোথায়?

মুখ টিপিয়া নবনী বলিল, কিন্তু দোষ আছে—

ছোটপিসি শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন: কি দোষ বাবা?

আপনি কেন? আপনি চলে যান পিসিমা। আমি আর-সকলের সঙ্গে কথা বলছি। বলিয়া সেই আর-সকলের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, ঐ গৌরী-টৌরি—সত্যযুগের নাম চলবে না। নাম বদলাতে হবে।

এই? চলিয়া যাইতে বলিলেও ছোট পিসি এক পা নড়েন নাই। এতক্ষণে তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। বলিলেন, তোমাদের যে রকম খুশি—বিয়ের সময় সেই নাম দিয়ে নিও। এ তো আজকাল হচ্ছেই। ঐ যে হালদারদের পটল, বিয়ের সময় তার নাম হয়ে গেল সুলেখা দেবী।

সকলেই খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বর তখন চুপি চুপি কহিল, বন্ধুরা বলল, নামটা মীরা হলেই যেন—

মীরা? মীরাবাঈ? কমলা একেবারে হাততালি দিয়া নাচিয়া উঠিল। বলিল, কিন্তু আমাদেরও একটা আপত্তি আছে বরমশাই।

বর সপ্রশ্ন ভাবে চাহিল।

কমলা বলিতে লাগিল, তোমারও নাম ঐ নবনী-টবনী চলবে না ভাই। তোমার নাম হবে কুম্ভসিং।

সুধা টিপ্পনী কাটিল: শুধু কুম্ভ। যে রকম বক-বক করে!

যে আজ্ঞে—বলিয়া বর তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে ঘাড় নোয়াইল।

কমলা বলিল, আরও আছে—

হুকুম হোক।

পালকি চেপে বিয়ে করতে আসা চলবে না।

নবনী বলিল, পালকি হবে না। নৌকোর ব্যবস্থা হয়েছে।

উঁহু, তা-ও চলবে না। হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কমলা বলিল, ঘোড়ায় চড়ে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে আসতে হবে। মশাল জ্বলবে, জয়ঢাক বাজবে, মাথায় উষ্ণীষ ঝলমল করবে—

কিন্তু আমি সে রাজসজ্জা দেখতে পাব না! ছোটপিসির মুখভরা আনন্দ-দীপ্তির মধ্যে আবার অশ্রু চকচক করিয়া উঠিল। বলিলেন, যাই হোক বাবা, গৌরীকে তুমি আদরযত্ন করো। বড্ড অভিমানী। বাবা থেকেও নেই, হতভাগী বড্ড ভালবাসার কাঙাল।

বর ও বরের বন্ধুরা চলিয়া গিয়াছে। মেয়েরা ধুপধাপ বাহিরের ঘরে আসিয়া কলকণ্ঠে শিবনাথের সম্বর্ধনা করিল।

চমৎকার! সত্যি দাদু, তোমার পছন্দ আছে। এ মাণিক কোথা থেকে খুঁজে-পেতে আনলে?

কিন্তু উহাদের বয়স এমনি, সোজা কথাটাওর বাঁকা মানে হইয়া যায়। শিবনাথ বলিলেন, ঠাট্টা করছিস?

নিশিকান্ত মল্লিক তখনও বসিয়া গুড়গুড়ি টানিতেছিলেন। নল ফেলিয়া উৎসাহের প্রাবল্যে খাড়া হইয়া বসিলেন। বলিলেন, ঠিক ধরেছিস তোরা। কেবল রাঙা-মুলো, ভেতরে কিছু না। আমি তাই বলছিলাম দাদাকে।

ছোটপিসি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, না মল্লিকমশায়, তা কেন? আলাপে ব্যবহারে বিদ্যেয় ছেলে একেবারে হীরের টুকরা।

হা-হা-হা করিয়া প্রবল হাসির চোটে বক্তব্যের শেষটা মল্লিক উড়াইয়া দিলেন। বলিলেন, এদিকে ভাঁড়ে যে ভবানী—এক কাঠা জমাজমি নেই, ঘরে

ছুঁচোর তে-রাত্তির করে—সে খবর জানিস ?

শিবনাথ দুঃখিত স্বরে কহিলেন, কিন্তু সর্বাঙ্গসুন্দর পাই বা কোথায় ?

সুধার মুখে কিছু আটকায় না। তৎক্ষণাৎ কহিল, কেন, এই মল্লিক মশায়। ঘরদোর বিষয়সম্পত্তি, নাতিপুতি বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে এমন কোথায় মিলবে ?

যাঃ ফাজিল! বলিয়া শিবনাথ তাড়া দিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তা হলে পছন্দ হয়েছে তোদের ? বাঁচলাম! ও যে আমার কড় সাধের গরবিনী—ঐ দুর্গা-প্রতিমা কি যার তার হাতে দিতে পারি !

কমলা বলিল, তুমি তো শিবঠাকুর আছ দাদু, অন্যের হাতে দিতে গেলে কেন ?

চেষ্টার কি কসুর করেছি ? মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় বলে, বুড়ো। কিছুতে রাজি হয় না।...ও কে রে ? ও গৌরী, ও গৌরী, ও গরবিনী, এদিকে এসো। বলে যাও বর পছন্দ কিনা।

গৌরী জানলার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঝুম-ঝুম করিয়া তোড়া বাজাইয়া পলাইয়া গেল।

বিয়ের দিন। সেই ভাঙা বাড়ির চেহারা বদলাইয়াছে, জঙ্গল একদম নাই। বৈঠকখানার ইট-বাহির-করা দেয়ালের উপর লাল-নীল কাগজ আঁটা হইয়াছে। ভিতরের উঠানে মস্ত সামিয়ানা, ফুল দেবদারুপাতা দিয়া বিবাহ-আসর সাজানো। সকাল হইতে ঢোল আর কাঁসি পাড়া সরগরম করিয়া তুলিয়াছে।

শিবনাথ অন্দরে আসিয়া ঘন-ঘন তত্ত্ব লইতেছেন।

আহা, দিদির আমার মুখ শুকিয়ে গেছে। একটু দুধ খেতে দাও। ওতে কিছু দোষ হবে না। দাও বউমা, দাও।

মেয়ের মা'র যদি বা একটু মন নরম হয়—কিন্তু এই বিয়ে উপলক্ষে শিবনাথের ছোট বোন আসিয়াছেন, নাম কাদম্বিনী, তাঁর একেবারে ধনুকভাঙা পণ, যা বিধি আছে একচুল তার এদিক-ওদিক হইবে না। একদিন না খাইলে কেহ আর মরিয়া যায় না।

বড় সুন্দর পিঁড়ি চিত্র করা হইয়াছে—আলপনার পদ্মটি যেন সত্য সত্যই একটি শ্বেতপদ্ম হইয়া উঠিয়াছে। শিবনাথ মহা আনন্দে চেঁচাইয়া বাড়ি মাত করিতে লাগিলেন : ও দিদি, কোথায় পালালি গো ? এদিকে আয়।

কি দাদু ?

আয়। ঐ পদ্মটার উপর কমলে-কামিনী হয়ে একবার দাঁড়া দিদি, আমি দেখি।

যাঃ—বলিয়া পলাইতে যাইতেছিল, এবারে মা আসিয়া হাত ধরিলেন। তাঁরও যেন ঐ ইচ্ছা। আনন্দদীপ্ত মুখে বলিলেন, বোস্ না একটু—বাবা বলছেন।

গৌরীর তবু লজ্জা। এক একবার মুখ তোলে, চোখাচোখি হইলেই হাসিয়া ঘাড় নামায়। তার পর অনেক সাধ্য-সাধনায় এক এক পা করিয়া পিঁড়ির উপর ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। সেই মুহূর্তেই আবার উঠিয়া দৌড়। দৌড়—দৌড়। মেয়ে আর ত্রিসীমানায় নাই। আর ছেলেমানুষ শিবনাথও পাকা দাড়ি দোলাইয়া পিছন পিছন ছুটিলেন: ধর্ ধর্—

লগ্ন দুটা—একটা সন্ধ্যার পর, আর একটা মাঝ-রাতের দিকে। সন্ধ্যার লগ্নেই শুভকার্য চুকিয়া যায়, সেইটা সকলের ইচ্ছা। বাড়িতে মানুষজন নাই। কুটুম্বের মধ্যে আসিয়াছে ঐ এক কাদম্বিনী। পাড়ার লোক ধরিয়া কাজকর্ম খাওয়ানো-দাওয়ানো সমস্ত করিতে হইতেছে, কাজেই সকাল সকাল হইয়া গেলে সবদিকে সুবিধা। বরপক্ষকে বার বার এই কথাটা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘোর হইয়া আসিতে মশালের বোঝা লইয়া কদমতলার ঘাটে জন কয়েক গিয়া দাঁড়াইল। একটু পরেই রায়গঞ্জের বাঁকের দিক দিয়া ঢোলের আওয়াজ। শিবনাথ কোমরে গামছা বাঁধিয়া কাজকর্মের তদারকে ব্যস্ত ছিলেন, দূরের সেই ঢোলের বাদ্যে তাঁহার বুকের মধ্যে গুর-গুর করিয়া উঠিল। এ পক্ষের ঢুলিরা মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে জল-সইয়া সারা পাড়া ঘুরিয়া এখন বসিয়া চিঁড়া ও নারিকেল-সন্দেশ চিবাইতেছিল। শিবনাথ তাহাদের উপর গিয়া রুখিয়া পড়িলেন: ওরে বেটারা, হাত-পা কোলে করে বসে রইলি—ওরা যে এসে পড়ল। জবাব দিবি নে? জিততে পারলে গামছা বকশিশ একখানা করে।

গুড়-গুড় গুড়-গুড়—বীরদর্পে ঢোলে কাঠি দিতে দিতে এদিককার বাজনদারেরা উঠিয়া পড়িল। শিবনাথ আর সেখানে নাই চরকির মতো এদিক-ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে কনের ঘরে গিয়া দাঁড়াইলেন। চন্দন-আঁকা মুখ, লাল চেলি-পরা, শুভ্র অঙ্গে সোনার গহনা ঝিকমিক করিতেছে। মুখখানা আদর করিয়া তুলিয়া ধরিতে ঝর-ঝর করিয়া শিবনাথের এক রাশ চোখের জল ঝরিয়া পড়িল। বলিলেন, ও দিদি, নতুন বর পেয়ে বুড়োকে মনে থাকবে তো?

গৌরীর বড় ইচ্ছা করিতে লাগিল, দাদুর চোখ দুটা মুছাইয়া দেয় একবার। কিন্তু সাহস হইল না। সুধা, মিনু, কমলারা সব নানাদিকে রহিয়াছে। যে শত্রুপুরীতে বাস, ফাঁক পাইলে কেউ আজ রেহাই দিবে না।

সদর-বাড়িতে এদিকে তুমুল কাণ্ড। লোকে লোকারণ্য। ফটকের এ-ধারে রাস্তার দিকে মুখ করিয়া কন্যাপক্ষের ঢুলি ও কাঁসিদারেরা। ওদিককার ঢুলির দল তাদের সামনে মুখোমুখি যুদ্ধভঙ্গিতে আসিয়া দাঁড়াইল। তেজী ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকাইয়া সুপুষ্ট পেশীবহুল হাত ঝাঁকাইয়া তারা ঢোলে ঘা দিতেছে মুখে বলিয়া সেই বোলগুলি অবিকল ঢোল-কাঁসির মধ্য দিয়া আদায় করিতেছে। ভিড়ের মধ্যে হইতে বাহবা আসিতেছে। বরের ঢোলে হাঁকিল :

কোথায় কনে—কুনো ব্যাঙ ?

অমনি দুই ফেরতা দিয়া কন্যাপক্ষের জবাব :

ঘরের কনে দেবো ক্যান্? ঘরের কনে দেবো ক্যান্ ?

তির্যগ্‌গতিতে পাঁচ-সাত পা ছুটিয়া আসিয়া বরের ঢুলি কাঠি দিতে লাগিল :

না দিবি তো এলাম ক্যান্ ? না দিবি তো ভাঙব ঠ্যাং—ভাঙব ঠ্যাং—ভাঙব ঠ্যাং।

হঠাৎ ইহার মধ্যে শিবনাথের চিৎকারে রসভঙ্গ হইল : বর কই ?

বরের বাপ নাই, জ্ঞাতিসম্পর্কের এক কাকা বরকর্তা। আগাইয়া আসিয়া তিনি বলিলেন, এই এসে পড়ল বলে। পিছনের নৌকোয় আসছে। বরযাত্রীরা প্রায় সব এসে গেছেন।

নিশিকান্ত মল্লিক মহাশয়ের উপর ভাঁড়ারের ভার। বর দেখিতে তিনিও আসিয়াছিলেন। বলিলেন, আচ্ছা কাণ্ড! বিয়ে যেন আপনাদের মশায়। গ্রামের মানুষ সব ভেঙে এসেছে—ছাদের উপর ঐ ওরা সব কী রকম তাকিয়ে। বাজনা-টাজনাগুলো বর আসা পর্যন্ত সবুর করতে হয়।

বরকর্তা হাসিয়া উঠিয়া সগর্বে কহিলেন, এ হল বরযাত্রীর বাজনা। বর এলে কি আর এই হবে ? ইংরেজি-বাজনা মশায়, ইংরেজি-বাজনা ! জয়ঢাক রয়েছে, জিলিপি-বাঁশি—বরের নৌকোয় আসছে সব। এ ঢোলের বাপ্পি-টাপ্পি উড়ে যাবে তার মধ্যে।

বরযাত্রীরা আসন গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ভিড় কমিল না। বর ঐ আসে, ঐ আসে—নিশ্বাস নিরুদ্ধ করিয়া সকলে ফটকের দিকে চাহিয়া আছে। ক্রমশ চারিদিকে কেমন ঝিমাইয়া পড়িতে লাগিল। প্রথম লগ্ন কাটিয়া গেল, ত্রিসীমানার মধ্যে ইংরেজি-বাজনার সাড়াশব্দ নাই।

গ্রামে মধু চক্রবর্তীর ঘোড়া আছে। ঘোড়ায় করিয়া তাঁকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, নদীর তীরে তীরে কুকশিমার ঘাট অবধি যাইবেন, যদি পথে বরের নৌকার দেখা পান।

ক্ষণপরে নিশিকান্ত বৈঠকখানায় আসিয়া বিনা ভূমিকায় বলিলেন, মশাইরা গাত্রোত্থান করুন।

বয়স্কর্তা এদিক-ওদিক তাকাইয়া বলিলেন, অর্থাৎ ?

হাসিয়া নিশিকান্ত বলিলেন, সে সব কিছু নয় মশায়, কাজকর্ম এগিয়ে রাখছি। উঠে পড়ুন।

কিন্তু ওরা না এসে পড়লে—সে কি রকম হবে! হঠাৎ তিনি অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন: ঐ যে কথায় কথায় ইংরেজি বলে, গোঁফ-কামানো, টেড়ি-কাটা ঐগুলোকে আমি দু-চক্ষে দেখতে পারিনে মশায়। ওরাই তো গোল বাধাল। বসে বসে চা গিলছে, আর বলল—আপনারা রওনা হন, আমরা ছোট নৌকোটায় চলে যাব, কতক্ষণ লাগবে! নবনীকে বললাম, তুই আয়। ও বলল, কলকাতার বন্ধুদের ফেলে যাই কি করে? আমি ঠিক বললাম, বেটারা কুকশিমার ঘাটে বসে খিঁচুড়ি-ভোজ লাগিয়েছে। আস্ত রাক্ষস এক একটা।

বরযাত্রিদলের পরিতোষপূর্বক আহারে কোন বাধা ঘটিল না। তার পর একদল দু-দল করিয়া গ্রামের নিমন্ত্রিত মেয়ে-পুরুষদেরও হইয়া গেল। বরের খোঁজ নাই।

বিয়ে-বাড়ি তখন একেবারে নিস্তব্ধ। পাড়ার সকলে দুই-একে সরিয়া পড়িয়াছেন—আপাতত বাড়ি গিয়া একটু ঘুমাইয়া লওয়া যাক, ইংরেজি-বাজনা শুনিলেই তখন আসা যাইবে। বৈঠকখানার বড় আলো নেভানো, মিটিমিটি বাতি জ্বলিতেছে, বরযাত্রীদের নাসিকা-গর্জন ছাড়া কোন দিকে ধ্বনি নাই। অন্দরের উঠানে সাজানো বিয়ের আসরের খানিক দূরে মেয়ের মা আবছা অন্ধকারে বসিয়া আছে। আর শিবনাথ, একবার ঘর একবার বাহির, কেবলই ছুটাছুটি করিতেছেন।

শেষ-লগ্নও উত্তীর্ণ হইয়া যায়, এমনি সময়ে খটখট করিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া মধু চক্রবর্তী আসিয়া নামিলেন। ঘটক ত্রিলোকতারণ তাঁর পিছন হইতে ভিজা কাপড়ে লাফাইয়া পড়িয়া হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শিবনাথ ছুটিয়া আসিলেন, কাদম্বিনী আসিলেন, ওদিকে কোথায় ঝিনমিন গহনা বাজিয়া উঠিল।

কি? কি? কি?

নৌকোডুবি।

ঘুমচোখ মুছিতে মুছিতে বৈঠকখানা হইতে বরের কাকা ছুটিয়া আসিলেন: সে কি সর্বনাশ! ঝড় নেই, ঝাপটা নেই—

ঘটক বলিল, ভরতের দেউলের ঐখানটায় এসে বাবুরা সব একদিকে ঝুঁকে পড়লেন। মাঝগাঙে কুমীর ভেসে যাচ্ছিল। কোটালের গাঙ, টানের মুখ—

কাঁপিতে কাঁপিতে শিবনাথ বলিলেন, নবনীধন ?

ঘটক দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িয়াছে।

আর্ত আকুল চিৎকার করিয়া শিবনাথ কহিতে লাগলেন, বর কোথায় ? বলো শীগগির—বলো—বলো—

তার পর বজ্রাহতের মতো তিনিও সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল।

কাদম্বিনী আসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, বসে থাকলে তো হবে না দাদা। কপালের ভোগ। ওঠো।

শিবনাথ ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া ছিলেন। তার পর উঠিয়া সদর-বাড়ির দিকে চলিলেন। সেখানে অপরিসীম নিঃশব্দতা। আবছা অন্ধকারের মধ্যে প্রকাণ্ড উঠানটির ভয়াবহ শূন্যতা যেন প্রেতপুরীর মতো লাগিতেছে। বৈঠকখানার বাতি জ্বলিতে জ্বলিতে একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়াছে, দপ করিয়া তাহাও একসময় নিভিয়া গেল। শিবনাথ বসিয়া রহিলেন। এমনি সময়ে ছায়ামূর্তির মতো মেয়ের মা'র হাত ধরিয়া কাদম্বিনী আসিয়া দাঁড়াইলেন। পুত্রবধূ কাঁদিয়া শ্বশুরের পায়ের উপর পড়িল।

ও বাবা, না খেয়ে না দেয়ে সাতরাজ্যি ঘুরে খুকির আমার সোনার বর এনেছিলে—কোথায় গেল সে ? ধরে নিয়ে এসো।

পলকহীন চোখ মেলা ছিল, এইবার শিবনাথ চোখ বুঁজিলেন। চোখের কোণ দিয়া দরদর ধারে জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

চুপ কর বউমা, চুপ কর। কাদম্বিনী আঁচল দিয়া নিজের চোখ মুছিলেন তার পর বলিলেন, আভ্যুতিক হয়ে গেছে, ও মেয়ে তো ঘরে রাখা যাবে না দাদা। ওঠো—

মেয়ের মা আগুন হইয়া উঠিল : কে তাড়ায় আমার মেয়ে ? আমিও সেই সঙ্গে বিদায় হব তা হলে।

কাদম্বিনী বলিলেন, অবুঝ হোস নে বউমা, রাত পোহালে মেয়ে যে বিধবা হয়ে যাবে। তার চেয়ে রাতের মধ্যে একজনকে এনে—

ভগ্নকণ্ঠে শিবনাথ বলিলেন, কাকে পাব ? সোনার প্রতিমা কার হাতে দেবো ; বলিয়া মাথায় হাত দিলেন।

কিছু না হলে তো হবে না—ওঠো। হঠাৎ কাদম্বিনীর একটা কথা মনে

পড়িয়া গেল। বলিলেন, ঐ নিশি মল্লিক। বউ মরবার পর দিনকতক উসখুস করেছিল না? কাকে দিয়ে যেন একবার খবর পাঠিয়েছিল, শুনেছিলাম।

অমন কাজও কোর না পিসিমা, মেয়ে আমার আত্মহত্যা করবে।

মেয়ের মা আবার কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল। বলিল, আমি যেমন ওকে জানি, কেউ তোমরা জানো না। ও আমার বড্ড অভিমানী।

কাদম্বিনী বলিলেন, বউমা, অবুঝ হোস নে। আর তো উপায় নাই। রাত শেষ হয়ে এলো। তুমি এসো দাদা।

নিশিকান্ত মল্লিকের কর্তব্যজ্ঞান খুব প্রখর বলিতে হইবে। বিয়েবাড়ির বাহিরের একটা মানুষও নাই। কেবলমাত্র তিনি যথারীতি ভাঁড়ার আগলাইয়া বসিয়া আছেন। শিবনাথকে লইয়া একরকম টানিতে টানিতে কাদম্বিনী সেখানে উপস্থিত হইলেন।

প্রস্তাব শুনিয়া মল্লিক তো আকাশ হইতে পড়িলেন। সে কি! ইহা যে স্বপ্নেও ভাবিতে পারা যায় না। ঘর খালি করিয়া তিন তিন দফা ঘরের লক্ষ্মী বিদায় লইয়াছে, বুকের মধ্যে তাঁর যা হইয়া থাকে সে কথা আর বলিয়া কাজ কি! আবার সেখানে কোন্ মুখে আর একজনকে লইয়া বসানো যায়?

ঘাড় নাড়িয়া দৃঢ়কণ্ঠে নিশিকান্ত বলিলেন, না, ও হবার জো নেই।

কাদম্বিনী বলিলেন,, 'না' বললে হবে না মল্লিকমশায়। ও যে বিধিলিপি। গৌরী তোমার হাঁড়িতে চাল দিয়ে এসেছিল—বিয়ে কি আর-কোথাও হবার জো আছে। রাত শেষ হয়ে এল। ওঠো—

অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর নিশিকান্ত নরম হইলেন। শিবনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কিন্তু সোনা-রুপো নগদটাকা—যা-সমস্ত দেওয়া হচ্ছিল, তার একপাই এদিক-ওদিক হলে চলবে না। কত ঝক্কি পোহাতে হবে, কত লোকে কত কি বলবে, বাড়িতে এক পাল ছেলেপুলে রয়েছে—বুঝে দেখুন ব্যাপারটা।

চুক্তি সমাধা হইয়া গেলে ধাঁ করিয়া নিশিকান্ত কোমরের গামছা খুলিয়া হাত-পা ধুইয়া পিঠের উপর কোঁচার খুট তুলিয়া সভ্য ভব্য হইয়া বরাসনে বসিলেন। বলিলেন, বাড়িতে খবর দিয়ে কাজ নেই। পঙ্গপালগুলো এসে জুটবে, বাধা পড়ে যাবে। আমার তো ইচ্ছে ছিল না—কি করি, তোমাদের এই মহাবিপদ।

পুরুতঠাকুর চলে গেছেন, তাঁকে তো ডাকতে হবে—

শিবনাথ হতভম্বের মতো বসিয়া ছিলেন, তাঁহার গায়ে নাড়া দিয়া কাদম্বিনী বলিলেন, যাও না একবার—ও দাদা, ঠাকুরমশায়কে আর পাড়ার ওদের সব ডেকে নিয়ে এসো।

নিশিকান্ত বাধা দিয়া উঠিলেন: না না, পাড়ার লোকে গরজ নেই। ওঁকে যেতে হবে না, পুরুত আমিই আনছি।

উদ্যোগী পুরুষ। হারিকেন জ্বালিয়া নিজেই পুরোহিত ডাকিতে বাহির হইলেন। ঢুলিরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদেরও আর ডাকা হইল না। রাত্রি শেষ প্রহর। নিঃশব্দে বিবাহের আয়োজন হইল।

গৌরী! গৌরী!

গৌরী ঘুমায় নাই, জানলায় বসিয়া বাহিরের অন্ধকারে তাকাইয়া ছিল। ঝুন-ঝুন করিয়া সে উঠিল। শিবনাথ সজল কণ্ঠে বলিলেন, চলে আয় দিদি, সম্প্রদান হবে।

ধীরে ধীরে মেয়ে পিঁড়ির উপর বসিল।

ফিস-ফিস করিয়া কাদম্বিনী বলিলেন, দেখলেন বউমা? তুমি যে কত ভয় করেছিলে মেয়ে আত্মহত্যা করবে—হেন করবে, তেন করবে। সত্যি, বড্ড শান্ত মেয়ে।

নিঃশব্দ অন্ধকারাচ্ছন্ন অতিবৃহৎ সেকেলে বাড়ি। দুটি মাত্র লণ্ঠনের স্তিমিত আলো। মাথার উপরে নির্নিমেষ নক্ষত্রমণ্ডলী! হঠাৎ আলোর শিখা কাঁপাইয়া হু-হু শব্দে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া বহিয়া গেল। পুরোহিতের দেহের প্রতি শিরায় কম্পন বহিল। বলিলেন, নাও হয়ে গেল এবার। বর কনে ঘরে তোল। এ কী রকম কাণ্ড—এমন তো দেখিনি কখনো। একটা উলু পর্যন্ত দিতে পারলে এ না কেউ—

কাদম্বিনী বলিলেন, ও বউমা, দাও না গো। আমি বিধবা মানুষ—আমার যে দিতে নেই।

শুভ-বিবাহে উলু দেওয়া বিধি, বিবাহক্ষেত্রে সধবা বলিতে ঐ এক মেয়ের মা। দু-তিন বার চেষ্টা করিল, কিন্তু গলা যেন কাঠ হইয়া গিয়াছে। স্বর না ফুটিয়া চোখের জলে কাপড় ভিজিয়া যায়।

শিবনাথ নিস্তব্ধ পাথরের মতো বসিয়াছিলেন—হঠাৎ মহা চেঁচামেচি শুরু করিলেন: কে আছিস—শাঁখ নিয়ে আয়। বাজনদার বেটারা, বাজা এইবারে। দিদি আমার বিদেয় হয়ে গেল। ওগো বউমা, তুমি একটু উলু দাও।

পুরোহিত বলিলেন, উলু দাও শাঁক বাজাও, মেয়ে-জামাই ঘরে তোল।

তবু চুপচাপ। হঠাৎ ইহার মধ্যে কি হইয়া গেল। সেই বিয়ের কনে—

চন্দন ও অলঙ্কারে ভূষিতা চিরদিনকার শান্ত লাজুক মেয়েটি অকস্মাৎ গুণ-ছেঁড়া ধনুকের মতো পিঁড়ির উপর খাড়া হইয়া দাঁড়াইল, এক ঝটকায় চেলির ঘোমটা টানিয়া দূর করিয়া দিল। বিদ্যুল্লতার মতো মুখখানি জ্বলিতেছে। উষাকালের শান্ত নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া বিমথিত করিয়া আরম্ভ করিল: উলু—উলু—উলু—

ধর্, ধর্, ধরে বসা। তেল-জল নিয়ে আয়, বাতাস কর্। শিবনাথ আর্তনাদ করিয়া আসিয়া গৌরীকে ধরিলেন। পুরোহিত, কাদম্বিনী সকলেই ধরিলেন। ধরিয়া বসায় কাহার সাধ্য—মেয়ের গায়ে যেন অসুরের বল। কোনো দিকে তার দৃষ্টি নাই, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চারিদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই ভাঙাবাড়ির প্রত্যেকটি অলিন্দ কাঁপাইয়া ক্রমাগত সে উলু দিতেছে: উলু—উলু—উলু—

ও গৌরী, মাগো আমার!

মা পাগলের মতো দুই হাতে সকলকে ঠেলিয়া সরাইয়া একেবারে মেয়ের মুখের কাছে মুখ লইয়া আসিল। বলিতে লাগিল, ওরে, তোমরা ধরে বেঁধে আমার মাকে খুন করলে। আয় মা, তুই আর আমি চলে যাই।

ধপাস করিয়া গৌরী সংজ্ঞাহারার মতো আবার পিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িল।

এত গোলমালের মধ্যেও বর কিন্তু অবিচল। আসন হইতে তিনি নড়েন নাই, এবং ইহাদের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। এইবার বিজয়ীর মতো মুখ করিয়া কাদম্বিনীকে বলিলেন, দেখলে তো দিদিমা, ঠাণ্ডা হয়ে বসল কিনা! অনেক দেখা আছে, তোমার নাতজামাই তো আজকের লোক নয়—

সে বিষয়ে কারও সন্দেহ ছিল না, কাদম্বিনীরও নয়। নিশি মল্লিক বলিতে লাগিলেন, এই কাজ করে চুল পাকিয়ে ফেললাম, জানতে কিছু বাকি আছে! সমস্তদিন খায় নি, তার উপর এই রকম একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল। ও অমন হয়েই থাকে। আর এই নিয়ে আপনারা কী সব আরম্ভ করে দিলেন বলুন তো।

মেয়ে তখন দিব্যি জড়সড় হইয়া বসিয়াছে, ঠিক আগেকার মতো। এই মেয়েই যে একটু আগে এমন করিয়া উঠিয়াছিল, ভাব দেখিয়া তিলমাত্র বুঝিবার জো নাই। ফুটফুটে সকাল হইয়া গিয়াছে। সকলে লজ্জিত হইয়া পড়িল।

পুরুত বলিলেন, এক পাক বাসরটা বেড়িয়ে এসো হে মল্লিক, রীতিরক্ষে করতে হয়।

অনেক পাকই হয়ে গেছে ঠাকুরমশায়, এখন অনেক কাজ—হেঁ হেঁ—

মল্লিক দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া হাসিতে হাসিতে গাঁটছড়া খুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শিবনাথের উদ্দেশ্যে বলিলেন, একা মানুষ—জানেন তো দাদামশায়। কিছু মনে করবেন না। এখনই বাড়ি গিয়ে বউ তোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

দীর্ঘ পদক্ষেপে নিশিকান্ত অদৃশ্য হইলেন। এবং বিকালে পালকি লইয়া আসিয়া বধূ বরশয্যা গহনা ও টাকাকড়ি দেখিয়া শুনিয়া হিসাবপত্র করিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

কাদম্বিনীও সেই দিন চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পর চাকরটা কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে, ঝি নিচে শুইয়া। এ-ঘরে বুড়া দাদু আর ও-ঘরে মা আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িলেন।

অনেক রাত্রে খোলা-জানলার সামনে দেবদারু-ফল খাইতে বাদুড়ে ঝটাপটি লাগাইল। মা'র ভয়-ভয় করিতে লাগিল। উঠিয়া গিয়া খট করিয়া জানলা বন্ধ করিয়া দিল।

ও-ঘর হইতে শ্বশুর প্রশ্ন করিলেন : বউমা, জেগে আছ?

ঘুম আসছে না।

আমারও না। এসো তাস খেলি।

আলো লইয়া শ্বশুরের শয্যার একান্তে বধূ তাস লইয়া বসিল। তাস হাতে ধরিয়াই শিবনাথ ঝিমাইতে লাগিলেন।

বধূ বলিল, বাবা টেক্কা ঘুস দিলে যে!

ইস, বড্ড ভুল হয়ে গেছে তো! চোখ মেলিয়া তাড়াতাড়ি বুড়া খাড়া হইয়া বসিলেন। হাত দুই খেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, দুত্তোর, এ কি হয়! আমি বাপু, খেলা দেখতে পারি—তাই আমার সভ্যাস।

ইহাদের অভ্যাস এই, অনেক রাত্রি অবধি মা ও গৌরী তাস খেলিত। শিবনাথ বধূর দিকে জুত দিবার নাম করিয়া বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেন। গৌরি বলিত, ও দাদু, শুয়ে পড় না।

অর্ধমুদ্রিত চোখ বড় বড় করিয়া মেলিয়া হাসিয়া শিবনাথ বলিতেন, তোর ঘাড়ে পাঞ্জা-ছক্কা না দিয়ে! ও বউমা, বসে বসে করছ কি?

গভীর রাত্রে গৌরী ঘুমাইয়া পড়িত, প্রকাণ্ড খাটের আর-একধারে শিবনাথ ঘুমাইতেন। মা উঠিয়া আলো নিভাইয়া অন্য ঘরে চলিয়া যাইত।

শিবনাথ বলিতে লাগিলেন, গরবী দিদি এমন আড্ডাটা ভেঙে দিয়ে গেল—

আমার বড্ড রাগ হচ্ছে। আসুক সে একবার। আচ্ছা, সে এখন কি করছে—বল দিকি বউমা।

ঘুমুচ্ছে আর কি! কাল সারারাত তো দু-পাতা এক করে নি।

শিবনাথ যেন কতকটা সান্ত্বনার ভাবে কহিতে লাগিলেন, এক হিসেবে বর নিতান্ত মন্দ হয় নি। বাড়ি-ঘর, চাকর-চাকরানী, এলাক-পোশাক কোন কিছুর অভাব নেই। এক, বয়সের দিক দিয়ে একটু—তা এর চেয়েও ঢের ঢের বেশি বয়সে মানষে বিয়ে করছে।

বধূ কিন্তু সায় দিতে পারিল না, চুপচাপ রহিল। শিবনাথ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, কিছু বলছ না যে বউমা?

মৃদু স্বরে বধূ কহিল, কী আর হবে!

শিবনাথ রুখিয়া উঠিলেন: কি হবে, মানে? ভেবে দেখ দিকি, মন্দটা কি! আমি তো বলি, নবনীধনের চেয়ে ভালই হয়েছে। গরবী দিদিও মনে মনে বুঝে দেখেছে তাই। ভারি চালাক মেয়ে। আজকে কেমন ঠাণ্ডা হয়ে পালকিতে উঠে বসল। আমি ভেবেছিলাম, কত কাঁদাকাটা করবে। একবার টুঁশব্দটা করল না।

এক পক্ষেরই কথা চলিতেছে, বধূ নিরুত্তর।

নিশ্বাস ফেলিয়া শিবনাথ বলিতে লাগিলেন, যা ভয় হয়েছিল আমার! তুমি দেখো বউমা, নিশি আমার দিদিকে কী রকম যত্ন করবে। তিন তিনটে বউ গিয়েছে, এবারে রাঙা-বউ পেয়ে ধিন-ধিন করে কাঁধে তুলে নাচাবে। তুমি দেখো।

বলিয়া নিজের রসিকতায় হা হা করিয়া নিজেই হাসিয়া আকুল।

বধূ ধীরে ধীরে উঠিয়া দোর ভেজাইয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

আরও কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে। আলো নিভিয়া ঘর অন্ধকার। ডাকাডাকিতে শিবনাথের ঘুম ভাঙিয়া গেল। বধূ পা নাড়াইতেছে, আর ডাকিতেছে, বাবা, বাবা

শিবনাথ তাড়াতাড়ি লাফাইয়া উঠিলেন।

শুনতে পাচ্ছ?

কি?

হাত ধরিয়া এক রকম টানিয়া শ্বশুরকে বধূ নিজের ঘরে জানলার দেবদারু-গাছের কাছে লইয়া আসিল।

শুনতে পাচ্ছ না, ঐ কে যেন উলু দিচ্ছে?

শিবনাথ বলিলেন, না তো—

শোন। মা আমার এসেছে—ঢুকতে পারছে না, বাইরে-বাড়ির ফটকের ঐখানে উলু দিচ্ছে। ভাল করে কান পেতে শোন দিকি।

এমনি সময়ে আবার একঝাঁক উলু উঠিল। অনেক দূরের অস্পষ্ট ধ্বনি রাত্রির বুক ফাটিয়া আসিতেছে—

উলু—উলু—উলু—

যাচ্ছি দিদি। উন্মাদের মতো আকাশ-ফাটানো কণ্ঠে শিবনাথ চিৎকার করিয়া উঠিলেন। এক লাফে দুই-তিন ধাপ করিয়া সিঁড়ি ভাঙিয়া অন্ধকারের মধ্যে প্রকাণ্ড দুটি মহল পার হইয়া ছুটিয়া চলিলেন। পিছনে পিছনে মা-ও ছুটিল। ফটক খুলিয়া অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে দেখা গেল, গৌরী। একটা গাছের উপর অজস্র জোনাকি পড়িয়া ঝকমক করিতেছে, তলায় ছোট ছোট অজস্র ঝুপসি গাছ। তার মাঝখানে আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া গৌরী ক্রমাগত উলু দিয়া যাইতেছে: উলু—উলু—উলু—

সকাল হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিশিকান্ত মল্লিকও উপস্থিত। বলিলেন, দিনমানে খাসা ভালমানুষ—কোন গোলমাল নেই। সন্ধ্যের থেকেই ক্ষেপে উঠল। উলু দেয় আর ছুটে ছুটে বেড়ায়। কালরাত্রি বলে আমার আবার সামনে যাবার জো ছিল না। মেজখোকা খুদি আর চারুকে বলে দিলাম। তা ওদের কাজ? জোরজার করে ধরে শুইয়ে দিয়েছিল। কখন পালিয়ে এসেছে। সকালবেলা উঠে খোঁজ—খোঁজ—

একটু পরেই পালকি-বেহারা চলিয়া আসিল।

শিবনাথ মিনতি করিয়া বলিলেন, আমাদের এখানে ক'দিন রেখে যাও দাদা? আমরা সুস্থ করে তার পর পাঠিয়ে দেবো।

হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া নিশিকান্ত বলিলেন, মিছে ব্যস্ত হচ্ছেন। আজকে ফুলশয্যে, তার পর বউভাত। জ্ঞাতির পাঁতে দুটো ভাত দেবো, মনন করেছি। বিয়ে তো ঐ রকমে হল, এর পরে একেবারে কিছু না করলে লোকে যে গায়ে থুতু দেবে।

শিবনাথ বলিলেন, নিতান্ত আজকের দিনটে থাকুক। ওর মনটা একটু ভাল হয়ে যাক। নাতজামাই-এর হাত দু'খানা ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, আমার তো সেই থেকে গা কাঁপছে দাদা। সমস্ত রাত ও ঘুমোয় নি, কেউই আমরা ঘুমোই নি। এখন একটু ঘুমোচ্ছে। আজকে থাক, কাল নিয়ে যেও।

মল্লিক মুখ কালো করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইলেন। বলিলেন, তাই আমি

সেদিন কিছুতে রাজি হচ্ছিলাম না। চুন কালি আমার মুখে ভাল করে পড়ুক গিয়ে। আজকে ফুলশয্যে, নেমন্তন্ন-আমন্ত্রণ হয়ে গেছে—আত্মীয়-কুটুম্ব এসেছে—

বিরস মুখে শিবনাথ কহিলেন, তবে নিয়ে যাও।

ঘুম হইতে মেয়েকে ডাকিয়া তোলা হইল। সকলকে প্রণাম করিয়া শান্তভাবে গৌরি পালকিতে গিয়া বসিল। নিশিকান্ত ভরসা দিয়া বলিলেন, কিচ্ছু ভাবনা করবেন না দাদামশাই। আপনারা জানেন না তাই, আমার বিস্তর দেখা আছে। কাল তো আমি দেখাশুনো করতে পারি নি—এখন থেকে নিজে দেখব, যত্ন-আত্তি করব, দরকার হয় ডাক্তার দেখাব। ভয় কি? শাশুড়ি ঠাকরুনকে বুঝিয়ে দেবেন।

কিন্তু চেষ্টা যত্ন এবং নিশিকান্তের নিজের দেখা সত্ত্বেও ঠিক আগের রাত্রির মতো উলু পড়িতে লাগিল। এবং এদিন একেবারে অন্দরের উঠানের উপর সেই দেবদারু গাছটির গোড়ায়। গলায় ফুলের মালা, সর্বাঙ্গে ফুলের অলঙ্কার, মূল্যবান কাপড়েচোপড়ে এসেন্সের সুগন্ধ। বাতাস সেই গন্ধে সুরভিত হইয়াছে, ফুলের শয্যা হইতে পলাইয়া রাজরাজেশ্বরী দেবদারুর ডাল ধরিয়া কলকণ্ঠে যেন ঘুমন্ত নিশীথিনীর কানে উলুধ্বনি করিতেছে: উলু—উলু—উলু—

গৌরী, গৌরী!

যেন তার সম্বিৎ নাই, যেন সে আর কোন জগতে চলিয়া গিয়াছে। ধরিয়ার আনিয়া গৌরীকে শোয়ানো হইল! তার পর আর কোন গোল নাই, চুপ করিয়া সে ঘুমাইতে লাগিল।

শিবনাথ চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, উঠোনে এল কি করে বউমা?

বধূ বলিল, ফটক আমি খুলে রেখেছিলাম।

তুমি কি জানতে?

আমার মন ডেকে বলেছিল। ভাবলাম, যদি আসে, সে কি আমার পথে দাঁড়িয়ে থাকবে?

পরদিন পালকি-বেহারা সহ নিশিকান্ত যথারীতি দর্শন দিলেন। মুখখানা হাঁড়ির মতো। বলিলেন, এই করে নিত্যি আমার পালকি-ভাড়া লাগছে পাঁচ-সিকে। প্রতিবিধান করা আবশ্যক হয়ে উঠেছে, রাতবিরেতে বউঝি এই এক মাইল পথ পায়ে হেঁটে আসবে—এই বা কি রকম!

শিবনাথ বলিলেন, ও তো সহজ বুদ্ধিতে আসে নি। দিদি আমার তেমন মেয়ে নয়।

নাতজামাই গর্জাইতে লাগিলেন : না, বজ্জাতের হাঁড়ি! আমি জেগে আছি—বলে, বাইরে থেকে আসছি। তার পর চোঁচা ছুট। আমি আর রাগ করে এলাম না। এ রকম ব্যাধি তো কোন পুরুষে শুনি নি। সমস্ত ঢং মশায়, বাপের বাড়ি আসবার ছুতো। কিন্তু যাবে কোথায়, আমিও তিন তিনটে বউ শায়েস্তা করেছি।

এই বিষয়ে এককালে মল্লিকমশায়ের সুনাম রটিয়াছিল বটে, সেই কথা স্মরণ করিয়া মেয়ের মা ও শিবনাথ দুজনেই শিহরিয়া উঠিলেন।

এতদিন পরে মা আজ জামাই-এর সঙ্গে প্রথম কথা কহিল : না বাবা, ছুতো ধরবার মেয়ে ও নয়।

স্বর কাঁপিতে লাগিল, কথা আর ফুটিতে চায় না। তবু বলিতে লাগিল, সমস্ত সেরে যাবে বাবা, তুমি একটু দৃষ্টিমুখ দিও। গৌরী আমার বড় শান্ত মেয়ে।

পরম কৃতার্থ হইয়া জামাতা পায়ের ধূলা লইলেন। একমুখ হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, নিশ্চয় নিশ্চয়! মন্তোর পড়ে বিয়ে করেছি—চালাকি কথা নয়। যা করতে হয়, আমি করব। কিছু ভেবো না মা, মেয়ে তোমার ঠিক হয়ে যাবে। দুটো দিন সবুর কর।

ভক্তিমান জামাই পুনশ্চ শাশুড়ি ও দাদাশ্বশুরের পায়ের ধূলা লইয়া বিদায় হইল।

শিবনাথ বলিলেন, আজকেও কি ফটক খুলে রাখবে বউমা?

বধূ জবাব দিল না, কিন্তু ফটক সে খুলিয়া রাখিল। গভীর রাত্রি পর্যন্ত সে জানলায় দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর সপ্তর্ষিমণ্ডল পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল, শেষ-রাতের চাঁদের আলো তেরছা হইয়া ঘরের মধ্যে লুটাইয়া পড়িল, শিয়ালের দল শেষ ডাক ডাকিয়া চুপ করিল, তখন শিবনাথকে ডাকিয়া বলিল, বাবা, উলু কিছু শুনতে পাও?

কান পাতিয়া দুজনে আরও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। জগতের ক্ষীণতম স্পন্দনটুকুও বুঝি থামিয়া গিয়াছে, এমনি গভীর নিদারুণ স্তব্ধতা। সেই স্তব্ধতা ভাঙিয়া হাসিয়া শিবনাথ বলিলেন, গরবী দিদি এতক্ষণ বরের কাছে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। চল চল বউমা, আর কোন ভয় নেই—

দিন সাত-আট কাটিয়া গেল, সত্যই কোন গোল নাই। নিশিকান্ত বহুদর্শী লোক—বাগ মানাইবার ক্ষমতা আছে, স্বীকার করিতে হয়। ইতিমধ্যে ঝি গিয়া দিন তিনেক খবর আনিয়াছে। প্রথম দিন গৌরীর সঙ্গে দেখা

হইয়াছিল, দিব্যি সে হাসির কথাবার্তা কহিয়াছিল, চুপি চুপি বলিয়াছিল, দাদুকে বলিস নিয়ে যেতে। কিন্তু তা হইবার জো নাই, বউভাত হয় নাই। এবং কবে যে সে শুভক্ষণ আসিবে, তাহাও নিশিকান্ত ঠিক করিয়া বলেন না। তার পর আরও দু দিন গিয়াছে, কিন্তু জামাই দেখা হইতে দেন নাই। শেষের দিন চটিয়াই আগুন। বলিয়া দিলেন, নিত্যি নিত্যি তোমারা শত্রুতা সাধতে কেন এসো, বল দিকি ?

ঝি অবাক।

জামাতা বলিতে লাগিলেন, বাপের বাড়ির কুটোগাছটা দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়, আর তুমি তো আস্ত মানুষ একটা। ওষুধপত্তর হচ্ছে—নিজেরা রাত-দিন লেগে পড়ে আছি, প্রায় ঠিক হয়ে এসেছে, তোমরাই এসে গোল বাধাও। কিন্তু আর বিশেষ গোলমাল নেই—ওঁদের গিয়ে বোলো।

খবর শুনিয়া শিবনাথ নিশ্চিন্তে নিশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন, ও বউমা, মিছিমিছি আর ফটক খুলে রাখ কেন ? আঁব-দুধ মিশে গেছে—আঁটি এখন তল। শুনলে ? নাতজামাইএর আমার চেষ্টার কসুর নেই। আহা-হা, চিরজন্ম বেঁচে থাক। কিন্তু শালীর আক্কেলটা দেখ, নতুন বর পেয়ে বুড়োটাকে একদম ভুলে গেল। না আসতে পারিস, এক-আধ ছত্র চিঠি লিখেও তো খোঁজ নেওয়া যায়।

মনের আনন্দে হাসিয়া বুড়া ছাদ ফাটাইতে লাগিলেন।

পরের দিন সকালবেলা শিবনাথ উঠিয়া খাটের উপর বসিয়াই গুড়গুড়ি টানিতেছিলেন। বধূ আসিয়া অস্বাভাবিক উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, বাবা, গৌরী এসেছে।

এসেছে ? গুড়গুড়ি ফেলিয়া শিবনাথ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অ বউমা, পালকি করে এসেছে তো ? নইলে নাতজামাই রেগে যাবে।

দেখসে এসে। বলিয়া উন্মাদিনীর মতো বধূ শ্বশুরের হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। নিচে গিয়া চেঁচাইতে লাগিল : ওরে, কে কোথায় আছিস—ছুটে আয়। মা আমার ফিরে এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে।

ঝি ও চাকর ছুটিয়া আসিল। রাস্তার উপর তখন ভিড় জমিয়া গিয়াছে। ফটকের গা ঘেঁসিয়া ফুটন্ত চাঁপার গুচ্ছের মতো গৌরী এলাইয়া পড়িয়া আছে। ছিন্ন বেশ, রুক্ষ আলু-থালু চুল, পিঠের ও হাতের কাপড় সরিয়া গিয়াছে—তাহার আগাগোড়া ব্যাপিয়া বড় বড় রক্তের রেখা। সোনার অঙ্গে আপন-হাতে নিশিকান্ত বেত মারিয়াছে, চামড়া কাটিয়া গিয়াছে, চাপ চাপ রক্ত জমিয়াছে।

রাস্তার লোক একজন মন্তব্য করিল : পশু ।

মা কাণ্ডজ্ঞান ভুলিয়া সেইখানে রাস্তার উপর আছড়াইয়া পড়িল ।

মা আমার, আজ কী গয়না পরে এলি !...ও বাবা, তুমি আমায় ফটক খুলতে মানা করতে, মা আমার সমস্ত রাত এইখানে রয়েছে। কত ডেকেছে, কালঘুম ঘুমিয়ে ছিলাম।

অজ্ঞান অবস্থায় বাড়ির মধ্যে ধরাধরি করিয়া আনা হইল। ডাক্তার আসিল। নিশি মল্লিকের কাছে খবর গেল, রাগ করিয়া তিনি আসিলেন না ! বেলা প্রহর দেড়েকের সময় রোগিণীর জ্ঞান ফিরিল। জ্বর খুব বেশি, চোখ দুটি জবাফুলের মতো লাল। চোখ মেলিয়াই সে লাফাইয়া উঠিতে যায়। তার পর প্রলয়ের কণ্ঠে—

উলু—উলু—উলু—

বিকালের দিকে গৌরী ঘুমাইল ! ডাক্তার বলিলেন, বিকারে দাঁড়িয়েছে মনে হয়। ওষুধে কাজ হয়েছে। একটু কমেছে। আমি চলে যাচ্ছি—কিন্তু খুব সাবধান !

এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা কাটিয়া গেল, গৌরী শান্ত চোখ দুটি বুঁজিয়া তেমনি ঘুমাইতেছে। মা ভয়ে ভয়ে একবার নাকের কাছে নিশ্বাসের স্পর্শ লন। তার পর একবার বার্লি তৈয়ারির জন্য রান্নাঘরে গেলেন। কেহ নাই। হঠাৎ, উলু—উলু—উলু—

বিছানা ছাড়িয়া গৌরী উঠিয়াছে। রুক্ষ এলায়িত চুলের বোঝা। কবে কখন সিন্দুর পরিয়াছিল, তাহার রেখাটি কপালের উপর জ্বলজ্বল করিতেছে। রক্তের রেখা নিটোল শুভ্র অঙ্গে চিত্র-বিচিত্র ডোরা কাটিয়া গিয়াছে। অসংবৃত বেশ-ভূষা। নিচের তলায় নামিয়া আসিয়া পুরানো বাড়ির কক্ষে কক্ষে ঝঙ্কার তুলিতেছে : উলু—উলু—উলু—

ধর্ ধর্—

কে তার সঙ্গে ছুটিয়া পারিবে ? ধরিতে গেলে সেই অপরূপ রূপে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া সে ছুটিয়া পলায়। বেলাশেষে সূর্য আকাশপ্রান্তে নামিয়া আসিয়াছে, বেড়ার ধারে সন্ধ্যামণি ফুটিয়া উঠিল, হাওয়ায় ঝুর-ঝুর করিয়া দেবদারুপাতা ঝরিতে লাগিল। তাহারই মধ্যে মহাপ্রলয়ের অগ্নিশিখার মতো নাচিয়া নাচিয়া সে উঠানময় ঘুরিতে লাগিল। যেখানে সামিয়ানার নিচে বিয়ের বাসর রচিত হইয়াছিল, পায়ের আঘাতে সেই শুকনা শতচ্ছিন্ন ফুল উড়াইতে লাগিল।

আকাশ-বাতাস মথিত করিয়া, বাড়ির প্রতি কক্ষ, অলিন্দ, প্রত্যেকখানি ইট স্পন্দিত করিয়া অশ্রান্ত কণ্ঠের অবিরাম তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, উলু-উলু-উলু—

বেলা ডুবিবার সঙ্গে সঙ্গে গৌরী চোখ বুঁজিল।

বীরপূজা

লাউড-স্পীকারে বারংবার ক্ষমা চাইছে। ট্রেনের কামরায় লাউড-স্পীকার। ভাষা একবর্ণ বুঝি নে—দোভাষি মেয়েটা মানে বুঝিয়ে দিচ্ছে:

সামনের ঐ স্টেশনে গাড়ি দশ মিনিট থেমে থাকবে। পাহাড়ে উঠবে এর পর পর, নতুন ইঞ্জিন জোড়া হবে। স্টেশনে নেমে বিশ্রাম করবেন, জল-টল খাবেন। সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে।

এক গাড়ি ঠাসা মানুষ। ছোট্ট পৃথিবীর সকল অন্ধিসন্ধি থেকে এসেছেন দু-দশ জন করে। গাড়ি থামতে না থামতে নেমে পড়লেন সকলে। রকমারি পোশাক-আশাক—ভাষাই বা কত রকমের। ভাব করবার জন্য মুকিয়ে আছেন সকলে, হাত বাড়িয়ে ছুটে আসেন।

আমি অমুক দেশ থেকে এসেছি। নাম আমার—

ঠিক দুপুরে সূর্য মাথার উপর। ছায়া নেই—কিন্তু দোভাষি ছেলে-মেয়েগুলো ছায়ার মতোই গায়ে গায়ে লেপটে আছে। অতএব আলাপ-পরিচয়ের অসুবিধে নেই। আর ওরা না থাকলেই বা কি! মনের দরজা খোলা থাকলে ভাষায় কি আটকাতে পারে?

তৃষ্ণা পেয়েছিল। ঢুকে পড়লাম ওয়েটিংরুমে—কিংবা বলি, বড়মানুষের এক সাজানো বৈঠকখানায়। জলের ব্যবস্থা আছে বলেছিল—তা বলে নদী-তড়াগের শাদামাটা জল নয়। লেমনেড ইত্যাদি, অথবা সুপক্ক কমলালেবুর রস। প্রবীণ এক ব্যক্তি ধমকে ওঠেন: কী জল-জল করছ! দেশে ফিরে দেদার জল খেও। খাতির করে যা দিচ্ছে, ঢকঢক করে গিলে নাও এখন।

আর তা-ও বলি, বড় দুর্ভাগ্য এরা, তেষ্টার জলটুকু নির্ভয়ে মুখে নিতে পারে না। বীজাণু-বোমা ফেলেছিল—গোটা কয়েক তার পাওয়া গেছে। কত দিকে অজানা আরও কত ছড়িয়ে আছে, কে বলবে! ভাল করে না ফুটিয়ে জল খাওয়া মানা। নিজেরা খায় না, অতিথি জনকে তা দেবে কেমন করে? নানান রকম তাই অনুকল্প ব্যবস্থা।

লম্বা টানা টেবিলের এধার-ওধার বসেছি। কোণের লোকটিকে দেখে

শিউরে উঠলাম। মুখের খানিকটা পুড়ে গিয়ে চামড়া ঝুলা হয়ে আছে। তবু কিন্তু সাহেব। নীলাভ মণি দুটো ভ্রূহীন কোটরের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। সে-ও তাকাচ্ছে আমার দিকে। সেটা কিছু বিচিত্র নয়। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা কৃষ্ণমূর্তি—হংসো মধ্যে, বক আর কি হিসাবে বলি, বায়স একটি। অস্বস্তি লাগে। লোকটার গা ঘেঁষে কুঞ্চিতকেশা এক তরুণী। ফিসফিস-গুজগুজ করছে দুটিতে। আমার সম্বন্ধে বলাবলি হচ্ছে, এমত সন্দেহ। জোড়ে এসেছে নাকি—স্বামী ও স্ত্রী? মহাপ্রাচীর দেখতে যাচ্ছি—কিন্তু ঐ বীভৎস পুরুষটার গা ঘেঁসাঘেসি করে পরমা সুন্দরী মেয়েটা—মহাপ্রাচীর এর চেয়ে কী বেশি আশ্চর্য ব্যাপার?

একটা জায়গায় বসে নেই কেউ। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক'টা দিনই বা থাকা হবে একসঙ্গে—তার মধ্যে যতটা সম্ভব পরস্পরকে চিনে বুঝে নেওয়া? আমার পাশের চেয়ার খালি হতেই মুখপোড়া সাহেব সেইখানে এসে বসল।

ইণ্ডিয়া থেকে আসছ তুমি? আমি নিউজিল্যাণ্ডের।

ফড়ফড় করে একগাদা কথা বলে গেল।

লড়াইয়ের ধাক্কায় ঘরবাড়ি গেল, একটা ভাই আর ভাইপো মারা পড়ল। দেশে আর থাকতে পারলাম না, ভিনদেশে নতুন বসতি। একটা ডেয়ারি-ফার্ম করেছি, তাইতে দিন চলে যায়…

এমনি সময় খবর দিল: চলে আসুন—উঠে পড়ুন গাড়িতে। এবারে ছাড়বে।

কিন্তু কমলি ছাড়ছে না। চলল পিছনে পিছনে। তার পিছনে সুন্দরী মেয়েটা।

এই কামরা? আমরাও উঠছি। গল্প করা যাবে তোমার সঙ্গে!

সামনাসামনি বেঞ্চে জুত করে বসে প্রথম কথা—

শরিফপুরা জানো?

সবিস্ময়ে তার মুখের পানে তাকাই। সাহেব একটু যেন গরম সুরে বলে, জানো না? এই যে বললে ভারতের মানুষ—

ভারতের মানুষ হয়ে শরিফপুরা না জানা যেন বিষম অপরাধ। এমন অপরাধের মার্জনা হয় না, সাহেবের মুখচোখের ভঙ্গি এইপ্রকার।

আমতা-আমতা করে বলি, ভারত কি একটুখানি জায়গা? শরিফপুরার মতো লাখ লাখ গ্রাম সেখানে। দ্বীপের মানুষ তোমরা—অত বড় দেশ আন্দাজে আসবে না।

সাহেব অধীর কণ্ঠে বলে, কিন্তু বরকত সিং, সন্ত সিংয়ের বাড়ি যে সেই গ্রামে।

ব্যাপার আরও ঘোরালো হয়ে উঠছে। একে শরিফপুরা, তার উপর কোথাকার কোন বরকত সিং ও সন্ত সিং। ত্রিবিধ বস্তুর কোনটারই নাম ইহজন্মে কানে শুনি নি। এককালের ফৌজি সাহেব তো—সাবেকি মেজাজ কিয়ৎ পরিমাণে আছে এখনো। জেরায় পড়লে রক্ষে থাকবে না। ভয়ে ভয়ে কথার মোড় ঘুরিয়ে নিতে চেষ্টা করি।

ভারতে চলো না একবার। কতটুকু পথ! পৃথিবীর দূর বলে কিছু তো আজকাল নেই—

যাবো। ঘাড় নেড়ে জোর দিয়ে সাহেব বলে, যাবো নিশ্চয়ই। সন্ত সিং আছে এখনো বেঁচে। প্রায়ই ভাবি ওদের দু-ভায়ের কথা। অমন বীর মানুষ হয় না!

ফোলিও-ব্যাগ রেখেছিল টেবিলে (আজ্ঞে হ্যাঁ, গাড়ির কামরায় প্রতি বেঞ্চের সঙ্গে টেবিল), তুলে নিয়ে হাতড়াচ্ছে। বের করল বিজীর্ণ এক পকেট-বই।

এই যে—দেখ, ঠিকানা লিখে দিয়েছিল সন্ত সিং, তার নিজের হাতে লেখা। ফি বছর ভাবি, যাব—গিয়ে দেখেশুনে আসব। তা আর হয়ে ওঠে না। আসছে শীতকালে নিশ্চয় যাব, এই বলে রাখলাম।

তারপর সমস্ত পথ ধরে চলল বরকত আর সন্ত সিং দু-ভায়ের কথা। গল্প বলতে জানে বটে সাহেব। ওরা এক রেজিমেণ্টে থাকত, পাশাপাশি লড়েছে। কুমির-হাঙরে ভরা খরস্রোত নদী সাঁতরে পার হয়েছে কতবার, অরণ্যে সাপের মতো বুকে হেঁটে চলেছে। এক নিশিরাত্রে হুকুম এলো, পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে হবে। শত্রু ওপারে, তারাও আসছে—তাদের আগে উঠে পড়তে হবে। উন্মাদ হয়ে ছুটেছে—শেলের আগুনে অন্ধকার বিভাসিত হচ্ছে বারংবার। বরকত আর সন্ত সিং সকলের আগে…উঠে পড়েছে তারা…বৃষ্টির মতো গুলির ধারা মেসিনগান থেকে। বিপুল বিজয়োল্লাস। দু-ভাই এবং আরও কতজনে মুখ থুবড়ে পড়ল হঠাৎ গুলি বিঁধে। তবু জয় আমাদের। তারার আলোয় স্ট্রেচারে করে নিঃশব্দে তাদের হাসপাতালে নিয়ে চলল। সন্ত সিং-এর পা দুটো গেল, বরকত প্রাণে মরল। কম্যাণ্ডারের চোখে জল। সামরিক সম্মানে কবর দেওয়া হল বরকতকে। ঘরবাড়ি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অজানা দেশে সে ঘুমিয়ে আছে।

নিশ্বাস ফেলে সাহেব চুপ করল। চলন্ত গাড়ির জানলায় ক্ষণকাল বাইরের পানে তাকিয়ে থাকে। মুখ ফিরিয়ে আবার বলে, আমার এই দশা দেখছ, এ চেহারা ছিল না আমার—

মেয়েটার দিকে এক নজর চেয়ে নিম্নকণ্ঠে বলে, বিশ্বাস করো, লিজিও আমার কাছে দাঁড়াতে পারত না। বড়লোকের মেয়ে—রূপ আর স্বাস্থ্য দেখেই আমায় বিয়ে করেছিল। সে আমলের ছবি আছে ওর লকেটে।

ডেকে বলে, লিজি, লকেটটা দেখাতে পার আমাদের বন্ধুকে?

এই মাসখানেক আগে একটা কাজে অমৃতসর যেতে হয়েছিল। বেড়াতে বেড়াতে জালিয়ানওয়ালাবাগ গেলাম এক সন্ধ্যায়, চুপচাপ এক গাছের তলায় গিয়ে বসলাম। উনিশ-শ-উনিশের বুলেটের দাগ গাছের গুঁড়িতে, অদূরের দেয়ালটায় নানা জায়গায়। সমস্ত চিহ্নিত করে রেখেছে, নষ্ট হতে দেয়নি। একটিমাত্র সুঁড়িপথ ছিল যাতায়াতের, ডায়ার সেই মুখে কামান বসিয়েছিল। রক্তে রাঙা হয়ে গেল মাঠ—বখরার ব্যাপার নেই, রক্তের তাই জাতবিচার ছিল না সেদিন।

দেখছি চেয়ে চেয়ে। পাঁচিল ভেঙে এখন একটা দিক একেবারে ফাঁকা—জুত হয়েছে চলাচলের। সাবেকি সুঁড়িপথে কেউ বড় যায় না। আবার যদি কোন ডায়ার এসে কামান বসায়, পালাবার অসুবিধা হবে না।

যাঁদের বাড়ি এসে উঠেছি, তাঁরা মস্ত বড়লোক। তিন-তিনটে শালের ফ্যাক্টরি তাঁদের। মেজছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে খেদমত করছে। বলে, এই টানা বস্তি ছিল দেয়ালের ধার দিয়ে। দেয়াল ভেঙে বস্তি পুড়িয়ে দিয়েছে দাঙ্গার সময়। আজাদির সেই সমারোহের সময়টা।

তাই বটে। এত বছর কেটেছে, জায়গাটা ভালমতো সাফসাফাই করে নি। পোড়ার চিহ্ন যত্রতত্র। কেন জানি না—মনে পড়ে গেল, মুখপোড়া সাহেবের গল্প। সন্ত সিং-এর লেখা ঠিকানা দেখিয়েছিল—সে গ্রাম তো অমৃতসর জেলায়।

শরিফপুরা জানো?

হ্যাঁ জানে সে। এক কথায় চিনতে পারল। দূরও নয় বেশি। অনেক কারিগরের বাড়ি সেখানে। ফ্যাক্টরি থেকে কাপড় নিয়ে যায়, বাড়ির মেয়ে-পুরুষে মিলে নক্সা তোলে। হপ্তায় হপ্তায় এরা সেগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। কালই তো যাচ্ছে ঐ দিকে মোটর নিয়ে।

পরের দিন আমিও তাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসি। পথের মধ্যে একবার জিজ্ঞাসা করলাম: সন্ত সিং বরকত সিং-এর বাড়ি তো ওখানে?

হাঁ করে চেয়ে থাকে। সেই সব বীরত্বের কাহিনী বললাম। তখন মনে

পড়ল—ঠিক, স্তম্ভ গেঁথে নাম লিখে দিয়েছে। নাম বরকতই বটে! বরকত সিং—

দুটো শহর পাশাপাশি। রাভির জল দিগ্‌ব্যাপ্ত শস্যক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে শহরের পথে। পুল পার হয়েই সারি সারি দোকান রাস্তার ধারে। শরিফপুরা বাজার। ঐখানে নেমে পড়লাম।

পুলের উপর পা ছড়িয়ে আয়েশ করে তেল মাখছে অনেক লোক, তেল মেখে ঝুপ-ঝুপ করে জলে পড়ছে। গরু-মহিষ ধোয়াচ্ছে। শুকনার সময়—তবু কাদা-কাদা হয়ে গেছে জায়গাটা। পুলের একেবারে লাগোয়া বরকত সিং-এর স্মৃতিস্তম্ভ। গুরুমুখী পড়তে পারি নে—তবু আন্দাজ করা যায়, বীরত্বের বহু ব্যাখ্যান পাথরের গায়ে লিখিয়ে দিয়েছে গুণগ্রাহী ইংরেজ সরকার। সিমেন্টে বাঁধানো চাতাল—কিন্তু বিষম নোংরা করে রেখেছে। ছেঁড়া ময়লা ঝুলি-কাঁথা নিয়ে একদল ভিখারি। ভাল করে জায়গাটা দেখব—কিন্তু ভিখারিগুলো এমন করছে যে অধিক এগুনো যায় না।

সে যাকগে, বরকত সিং তো হয়ে গেল—স্নানার্থী একজনকে জিজ্ঞাসা করি: সন্ত সিং বলে এ গাঁয়ে কে আছেন?

চেঁচিয়ে উঠল এক ভিখারি। হাত নেড়ে ডাকছে, লোভে চকচক করছে দু-চোখ।

আমি—এই যে, আমি। কিছু দিয়ে যাও বাঙালিবাবু, ভাল হবে তোমার—

পা দুটো কাটা। লক্ষণ মিলে গেল। তা গুণগ্রাহী বটে সরকার বাহাদুর! সিমেন্ট-বাঁধানো পাকা চাতাল বানিয়ে দিয়েছে বরকত সিং-এর স্মৃতিস্তম্ভের সঙ্গে। নইলে নিচের ঐ কাদার মধ্যে বসে ভিক্ষে করতে হত।

দিকপাল সরকার

ছোট লাইনের অতি-ছোট স্টেশন। প্লাটফর্ম নেই। লোকের পায়ে পায়ে হাত কয়েক জায়গায় ঘাসবন মরে সাফ হয়েছে—যে দু-চারটে মানুষ উঠা-নামা করে, ঐখানেই কুলিয়ে যায় তাদের। সন্ধ্যা হতে না হতে ঝিঁঝির আওয়াজ ওঠে। শিয়াল উঁকি-ঝুঁকি দেয় টিকিট-ঘরের পিছনে কসাড় জঙ্গল থেকে। ব্যাঙ ডাকে বর্ষার সময়টা চারিদিককার খানাখন্দে।

বড়বাবু ও ছোটবাবু—সাকুল্যে দু'জন কর্মচারী স্টেশনের। আর আছে

সদাসুখ পয়েন্টসম্যান। স্টেশনের গেটের সামনেটায় লাইটপোস্ট—সদাসুখ সেখানে কেরোসিন-আলো জ্বেলে দিয়ে ওজনকলের উপর বসে বসে ঝিমোয়। বড়বাবু ও ছোটবাবু টেবিলের খাতাপত্র একপাশে ঠেলে দিয়ে দাবার ছক-গুঁটি সাজিয়ে বসেন। বাসায় গিয়ে উঠতে পারেন না রাত্রি সাড়ে-এগারোটায় একটা গাড়ি থাকার জন্য।

আজও যথারীতি তাঁরা খেলছেন। আর দু'জন দু-দিকে বসে জুত দিচ্ছে। রাত্রিবেলা স্টেশনে দু-দুটি অতিরিক্ত মানুষ—এটা নিতান্ত অভাবনীয়। ফড়িংমারি গ্রাম থেকে এঁরা এসেছেন, আলাপ-পরিচয় হয়েছে—এক জনের নাম নবকান্ত, আর একজন রাখাল। কাল সকালে এঁদের আপার-প্রাইমারি ইস্কুলে স্পোর্টস—তদুপলক্ষে কলকাতা থেকে দিকপাল সরকার আসছেন—তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে এসেছেন। দিকপাল সরকারের নাম শোনেন নি—কী সর্বনাশ! কোন জগতে থাকেন—অ্যাঁ? রবিঠাকুরের শূন্য সিংহাসনের অবিসম্বাদী অধিকারী—এই কথা বিজ্ঞাপনে লিখে থাকে। বিজ্ঞাপনের একবর্ণ মিথ্যে নয়।

রাত্রি অনেক হল। দুটো বাজি শেষ হয়ে তৃতীয়টা চলছে এখন। বড্ড জমেছে—এমনি সময়ে সদাসুখ ঘণ্টা দিল। অর্থাৎ গাড়ির সাড়া পাওয়া গেছে। ছোটবাবু মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন দরজা দিয়ে। না, টিকিটের খদ্দের নেই—পাঁচ-দশ মিনিট চালানো যাবে এখনো।

গাড়ি নিতান্তই যখন হুড়মুড় করে এসে পড়ল, তাঁরা উঠলেন। একবার তবু মুখ ফিরিয়ে সদুঃখে ছোটবাবু বললেন, ঘোড়ার কিস্তি দিতাম—বেআক্কেলে গাড়ি মোক্ষম সময়টা এসে পড়ল!

বড়বাবু চটে গিয়ে বলেন, ঘোড়ায় মাত হয়ে যেতাম নাকি? নৌকো কোন জায়গায় এসে চেপে বসে আছে, খেয়াল রাখো? হারামজাদা গাড়ি এক-একদিন রাত কাবার করে আসে, আজকে একেবারে ঘড়ি ধরে হাজির!

এসেছে তাই তো বেঁচে গেলেন—

নবকান্ত ও রাখাল মাঝে পড়ে কলহ থামিয়ে দিল। রাখাল বলে, কাজ সেরে আসুনগে যান। এসে আবার বসবেন। ততক্ষণ আমরা চালাচ্ছি। এমন আসর জুড়োতে দেওয়া হবে না।

কিন্তু আপনাদেরও তো হাঙ্গামা আছে—

রাখাল বলে, তা আছে। আপনারা সঙ্গে করে আনবেন হাঙ্গামাটিকে। বলবেন, বেলা দুপুর থেকে আমরা হা-পিত্যেশ বসে রয়েছি। আপনারা রয়েছেন—গাড়ির ধারে না-ই বা গিয়ে দাঁড়ালাম।

নবকান্তটা এত ভাবে এক একটা চাল দেবার আগে! গালে হাত দিয়ে ভাবছে. ঘরবাড়ি নিলামে উঠলেও মানুষে এত ভাবে না। হঠাৎ দেখা গেল, বড়বাবু ও ছোটবাবু ফিরে এসেছেন ভদ্রলোককে নিয়ে।

চললাম। আপনারা চালান এবার সমস্ত রাত। নমস্কার!

ঘাটে পানসি। পানসিতে খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত। এখনই ছাড়তে হবে, সময় নেই। তাই পৌছতে রোদ উঠে যাবে হয়তো।

কিন্তু পৌছল, তখনও আকাশে পোহাতি-তারা। আবছা দেখা গেল, ছেলের দল বাঁধ ধরে পিলপিল করে ঘাটের দিকে আসছে। সারারাত্রি জেগে বসে আছে নাকি খাল-ধারে? বাচ্চা বাচ্চা মেয়েও কতকগুলি শাঁখ বাজাচ্ছে, জয়ধ্বনি দিচ্ছে।

কিন্তু রাখালের দৃষ্টি সেদিকে নয়, সে ও-পারে তাকিয়ে।

বীরগড়ের ওরা কই?

নবকান্ত বলে, পুরো সকাল হয় নি তো এখনো! ঘুমুচ্ছে।

চোখে ঘুম থাকবে কি, চক্ষু যে চড়কগাছ! আছে ঝোপে-ঝাড়ে কোথায় লুকিয়ে, দেখতে পাচ্ছি নে। ওরা মিটিং করছে আর কাউকে না পেয়ে যশোরের নাছু মল্লিককে সভাপতি করে। হ্যাক—থুঃ! কালা-মুখ কোন লজ্জায় দেখাবে!

আগন্তুক ভদ্রলোক ঘুমুচ্ছিলেন। কলরব তুমুল হয়ে উঠলে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন।

কি ব্যাপার মশায়?

নবকান্ত সগর্বে বলে, আপনার পায়ের ধুলো পড়ল—ফড়িংমারির কম ভাগ্য! গাঁয়ের সকলে একটু আনন্দ করছে।

রাখাল বলে, এ আর কী দেখছেন! মিটিঙের সময় জয়ঢাক জগঝম্প বাজবে। বীরগড়ের কানে তালা ধরিয়ে দেবো। বেটারা ক'দিন ধরে তড়পে বেড়াচ্ছিল—এই ধাপধাড়া জায়গায় দিকপাল সরকার ইয়ে করতে আসবেন! আসেন কিনা দেখ্ এইবার নয়ন মেলে।

ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলেন, কোথায় এসেছি বলুন তো? আমি যাব আড়পাংশায়।

নবকান্ত সংশয়িত কণ্ঠে বলে, আপনার নাম—

রাখাল শুনতে দেয় না জবাবটা, তাড়া দিয়ে ওঠে: দিকপাল সরকার। দেশবিশ্রুত নাম। পাঁচ বছুরে ছেলেটা অবধি জানে, তুমি জানো না?

ভদ্রলোক বললেন, না মশায়। ভুল হয়েছে আপনাদের। আমি শ্রীরসময় দাশ।

রাখাল বলে, কক্ষনো না। সভার কাজ সমাধা করে ভালমন্দ খেয়েদেয়ে স্টেশনে গিয়ে রেলগাড়ি চাপুন—তারপর আপনি যা-ইচ্ছে হোন গে, কিছুমাত্র আপত্তি নেই। এসে যখন পড়েছেন, আপনিই কবি দিকপাল। নয়তো আমাদের গায়ে থুতু দেবে বীরগড়ের ওরা।

নবকান্ত বলে, ভোলাটা কি করল বলো তো? দু-দুখানা পোস্টকার্ড ছাড়ল যে দিকপাল সরকার যাচ্ছেন—

রাখাল বলে, ঐ রকম। চিরকাল দেখে আসছি। তোমরাই ভোলা-ভোলা করে মাথায় তুলেছ। ভাগ্যি ভাল, তবু একজনকে পাওয়া গেছে। না পেলে কী কাণ্ড হত, আন্দাজ করো দিকি—

রসময় বললেন, আমি আড়পাংশায় চলে যাব। ভাইয়ের বিয়ে, মেয়ে আশীর্বাদ করতে যাচ্ছি সেখানে।

রাখাল বলে, আমাদের দায় মিটিয়ে দিয়ে তারপরে যাবেন। মেয়ে উড়ে পালাবে না, মেয়ের পাখনা গজায় নি।

রসময় কাতর হয়ে বলেন, আচ্ছা বিপদে পড়লাম। আটটা-সাতাশ থেকে ন'টা-পাঁচের মধ্যে আশীর্বাদ শেষ করতে হবে। আমিও যেমন—জিজ্ঞাসাবাদ করলাম না, কিছু না—আপনাদের তটস্থ ভাব দেখে মনে করলাম, মেয়েওয়ালারা আগ বাড়িয়ে নিতে এসেছেন। তা কি করে বুঝব যে কন্যাদায়ের মতো আরও সব দায় আছে!

নৌকার মাঝিকে ডেকে বললেন, আড়াই টাকা—থাকগে, পুরোপুরি তিনই দেবো, আমায় বাপু আটটার মধ্যে আড়পাংশায় পৌঁছে দিতে হবে।

রাখাল বলে, কে পৌঁছে দেবে কাকে? ইয়ার্কি? ঘরে পুরে তালা আটকে রাখলে সেটাই কি বড় শোভন হবে মশাই?

রসময় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলেন, কোন পুরুষে আমি সভা করি নি। বক্তৃতা-টক্তৃতা আমার আসে না।

নবকান্ত আশ্বাস দেয়: ঘাবড়াচ্ছেন কেন? বক্তৃতা এখানকার এরাই কত করবে! হপ্তা দুই ধরে এক নাগাড়ে সব মুখস্থ করছে। দিকপাল সরকার হয়ে আপনি গলায় ফুলের মালা পরে চুপচাপ বসে থাকবেন শুধু। কিছু করতে হবে না। বক্তৃতা হতে হতে সভাপতির সময় যখন আসবে, দেখতে পাবেন আধ-ডজনের বেশি লোক নেই।

ছেলেরা প্রাণপণে খেলার কসরত দেখাল। বুড়োরা তারপর বক্তৃতার কসরত দেখাচ্ছেন—এমনি সময় এক খণ্ড-যুদ্ধ।

বীরগড়ের জন কয়েক একপ্রান্তে বসে ছিল। এক ভদ্রলোক সহসা বলে উঠলেন, দিকপাল সরকার নয়, এ মানুষ জাল।

ভদ্রলোককে বীরগড়ের একজন প্রশ্ন করে, চেনেন আপনি দিকপালকে?

নিশ্চয় চিনি। আমি প্রমাণ করে দেবো—

কিন্তু সে ফুরসত হল না। রাখাল বিপুল বিক্রমে সভার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যস্ত ছিল। প্রচণ্ড এক চড় কষিয়ে দিল সে ভদ্রলোকের গালে, মাথা ঘুরে তিনি পড়ে গেলেন। বীরগড়ের লোকেরা হৈ-হৈ করে ঘিরে দাঁড়াল। রাখাল ও ফড়িংমারির ছেলেরা তারপর এলোপাথাড়ি কিল-ঘুসি চালাচ্ছে। লাঠিও আছে কারো কারো হাতে। মিনিট চার-পাঁচ চলল এই রকম। তারপর দেখা গেল, ঝপাঝপ খালে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বীরগড়ের লোক।

গণ্ডগোল থামল। চারদিক প্রকম্পিত বক্তৃতার হুঙ্কার চলল আবার একটানা। রণ জয় করে রাখাল নবকান্তকে চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করে: জানল কি করে হে? কে লোকটা—বীরগড়ের তো নয়!

কেমন দেখতে?

বেঁটে-খাটো—কালো রং। মাথা ফুটবলের মতো গোলাকার।

ঐ তো নাদু মল্লিক। বীরগড়ের সভার জন্য এসেছে। নানান জায়গায় ঘোরে—কোনখানে দেখে থাকবে দিকপালকে।

স্টেশনে ফিরতি গাড়ি এলো। রাখাল ও নবকান্ত রসময়কে সঙ্গে এনেছে। গাড়িতে তুলে দিয়ে তবে ছুটি। গাড়ি একেবারে বোঝাই হয়ে এসেছে, মোটে জায়গা নেই।

মুখের চারিদিকে ব্যাণ্ডেজ-আঁটা একটা লোককে দেখিয়ে রাখাল বলে, ঐ যে নাদু। খোল দরজা, এই গাড়িতেই তুলে দিতে হবে।

জায়গা কোথা?

না থাকে নাদু বেটাই দাঁড়িয়ে যাক। আমাদের সভাপতি শুয়ে বসে গা এলিয়ে মৌজ করে যাবেন।

ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মানুষটি এদের দেখে আগেভাগেই উঠে দাঁড়ালেন।

শুঁতোর নাম বাবাজি। পথে এসো বাপধন!

রসময়কে ভাল ভাবে বসিয়ে দিয়ে রাখালরা স্টেশনের অফিস-ঘরে ঢুকল। নিশ্চিন্তে এক হাত দাবা খেলবে।

ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মানুষটি আলাপ করছেন: সভা তো জবর হল মশাই। খাওয়াল কেমন?

আরো ভাল। কিন্তু হলে কি হবে। চার-পাঁচ ঘণ্টা একনাগাড় চেয়ারে বসে থাকা—খাওয়ার শোধ ছারপোকায় তুলে নিয়েছে। পিঠের চামড়া যেন খুবলে খুবলে খেয়েছে।

রসময় জামা উঁচু করে দেখালেন।

ভদ্রলোক বললেন, পেটে খেলে পিঠে সয়। আমার অদৃষ্ট দেখলেন তো মশায়? গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েই যত দুর্ভোগ। জংশনে গিয়ে ঘুম ভাঙল। সেখান থেকে ছয় মাইল ছুটোছুটি করে সভায় গেলাম। দেখলেন তো সেখানটায় অভ্যর্থনার বহর!

আপনার নাম?

দিকপাল সরকার।

হাসি হাসি মুখ

ক'টা বছর আগেও কসাড় বন। এখানে ওখানে পাথরের চাঁই। বিস্তীর্ণ খাদের মধ্যে ঝিরঝিরে জলধারা—বর্ষায় তিনিই আবার দুরন্ত নদী। সেই নদীতে মহা আয়োজনে বাঁধ বাঁধা হচ্ছে। দৈত্যাকার যন্ত্রপাতি ও হাজার হাজার লোকজন এসে পড়ল। দেখতে দেখতে শহর।

দুটো হোটেল। একটার নাম উপবন, আর একটা পান্থবাস। বিকালবেলা মোটরের প্রচণ্ড গর্জন তুলে সুশান্ত উপবনে এসে নামল। বলে, চা দাও এক কাপ, সঙ্গে যা-হোক কিছু। যা তোমাদের তৈরি আছে, তাই দাও, নতুন কিছু বানিয়ে দিতে হবে না। বিষম তাড়া। চা খেয়েই ছুটব, থাকছি না।

চা-দিয়ে-বেড়াচ্ছে সেই লোক বেজার মুখে বলে, জায়গাও নেই থাকবার। টেনেটুনে পনেরটা সিট, সেখানে কুড়ি হয়ে গেছে। ঘরে জায়গা হয় না তো বারান্দায় তক্তপোশ নিয়ে পড়েছে।

বটে, এমন জমেছে হোটেলের ব্যবসা!

রোস্ট খেতে আসে সব উপবনে। দিদিমণির হাতের রান্না।

একটা মেয়েকেও বুঝি দেখা যাচ্ছে রান্নাঘরে—উনুনের ধারে বসে ছ্যাকছোঁক করছে। চায়ে বেশি মিষ্টি বলে এক্ষুনি সুশান্ত অনুযোগ করতে

যাচ্ছিল, এদের ব্যবসায় কাহিনী শুনে চা লহমার মধ্যে উৎকট তিতো। অন্যে ছাইমুঠো ধরলে কেমন সোনামুঠো হয়ে যায়, তার অদৃষ্টেই মিছা খাটুনি। উঠতি শহরের দোকানে দোকানে তারস্বরে বক্তৃতা করে দু'হাতে বিজ্ঞাপন বিলিয়ে গলদঘর্ম হল তিন-চার ঘণ্টা, সাবান বিক্রি হয়েছে সাকুল্যে পাঁচ-সাতখানার বেশি নয়। দোকানদার বেটারা কয়েকটা চালু নাম মুখস্থ করে রেখেছে, তার বাইরে যেন কেউটেসাপ। হাতে ছুঁতেও চায় না, ছুঁলে বুঝি ছোবল দেবে! শুকনো গলা চায়ে ভিজিয়ে এক্ষুনি সুশান্ত এই পোড়া জায়গা থেকে বেরিয়ে পড়বে। মাইল তিনেক দূরে ছোটখাট এক গঞ্জ —সন্ধ্যার আগেই সেখানে পৌঁছে ঢুঁ দিয়ে দেখবে। খোরাকি খরচটা তোলবার জন্যেও অন্তত ডজন দুই গছানোর দরকার। না হলে উপোস আজ রাত্রিবেলা।

দাম মিটিয়ে উঠতে যাচ্ছে, হেনকালে উপবনের মালিক এসে পড়লেন। হাটবার আজ এখানে, হাট করতে বেরিয়েছিলেন। চাকরের মাথায় ঝুড়িতে একপাল ঠ্যাঙ-বাঁধা মুরগি কক-কক করে উঠল।

মুখ তুলে চেয়ে সুশান্ত অবাক।

মাস্টারমশায় যে! হোটেল খুলে বসেছেন এখানে?

অনেক বছর পরে দেখা, চিনতে তবু মুহূর্তের দেরি হয় না। রামজয় বিশ্বাস— মাস্টার কোনদিন ছিলেন না, অন্তত সুশান্ত যতদিন জানে তার মধ্যে নয়। দলের ছেলেরা তবু বরাবর মাস্টারমশায় বলত। সুশান্ত তাদের মধ্যে একজন।

রামজয় হো-হো করে হেসে সুশান্তর জবাব দিলেন: বুড়ো হয়েও হাত নিসপিস করে। বোমা-রিভলভারে শত্রু বধ করব, প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম। অহিংসা ব্রত এসে আমরা সব বাতিল। জঙ্গুলে শহরে চুপচাপ এখন মুরগি বধ করে অভ্যেসটা বজায় রেখে যাই।

চেয়ার টেনে সুশান্তর ধারে জমিয়ে বসলেন। বলেন, রাত্রে মুরগির রোস্ট খাওয়াব। কত জায়গায় খেয়ে থাকিস, উপবনেও খেয়ে যা। জিভে স্বাদ লেগে থাকবে, ইহজন্মে মুছবে না।

চা পরিবেশনকারী সেই লোকটা—নাটক-নবেলে যেমন হামেশাই দেখা যায়—ভৃত্য হলেও অতিশয় প্রতাপশালী ভৃত্য। মালিক রামজয়ের উপর খিঁচিয়ে উঠল: নেমন্তন্ন হচ্ছে—শুতে দেবেন কোথা শুনি? বারান্দাও ভরে গেছে, উঠোন ছাড়া জায়গা নেই। রাত্রে বৃষ্টি হলে ছাতা খুলে বসতে হবে। পয়সার খদ্দের সবাই—ঘুম ভেঙে তখন কেউ দরজা খুলতে উঠবে না।

সুশান্তকে বলে, না বাছা কর্তার কথা কানে নিও না। মুরগি খাওয়ানোর লোভে উনি বলছেন। রাত্রে থাকবে তো গুটগুট করে পান্থবাসে চলে যাও। একটুখানি পথ—এই রাস্তার মাথায়। ফাঁকা হোটেল, শান্তিতে থাকবে। উপরের তিনটে ঘরই দিয়ে দেবে। একটায় সন্ধ্যারাত্রে শুয়ো, একটায় এক ঘুমের পর, বাকি যেটা রইল সকালের ঘুম। পড়ে পড়ে ঘুমিও সেখানে। কেউ ঝঞ্ঝাট করতে আসবে না।

রামজয় বলেন, কিন্তু রোস্ট ? তা ও যদিই বা দেয়, আমার হিমির রান্না মুরগি রোস্ট পাবে কোথায় ওরা ?

কথাবার্তায় দেরি হয়ে গেল। এখন আর নতুন গঞ্জে গিয়ে সুবিধা হবে না। লোভও হচ্ছে, হিমি অর্থাৎ হিমানীর রান্না রোস্ট না-জানি কী অপূর্ব চিজ ! দু-চারটে দোকান এখানেই বাকি আছে, সেইগুলো সেরে পান্থবাসে শোবার ব্যবস্থা করে ফিরবে। শোওয়া পান্থবাসে, খাওয়া এখানে হিমির হাতের রোস্ট। ভোর থাকতে উঠে রওনা।

পান্থবাসে এসে হিমির বৃত্তান্ত পাওয়া গেল। রামজয় চিরকাল দেশের কাজে ছিলেন, নিজের সংসারধর্ম নেই, হিমি তাঁর ভাগনী। পাকিস্তানে ছিল, সেখানে সুপাত্র মেলে না, বোন-ভগ্নিপতি কন্যাদায়-মোচনের জন্য হিন্দুস্থানে এসেছেন। এসে উঠেছেন রামজয়ের উপবনে, তা-ও প্রায় আট-দশ মাস হল। মেয়ে গছানো হয়ে গেলে ফিরে যাবেন।

জ্বলছেন ঈর্ষ্যায় পান্থবাসের মালিকটি। সেটা কিছু আশ্চর্য নয়। বলেন, আমাদের কি দেখছেন ! ঐ উপবনের ঘরে ঘরে চামচিকের বাসা—সত্যিই চামচিকে উড়ত। হিমির রোস্টে কপাল ফিরেছে। রোস্ট না ঘোড়ার-ডিম ! খদ্দের ঝুঁকেছে রাঁধুনি দেখে। পচা কাঁঠাল থাকলে মাছি জমে, যুবতী রমণীতে তেমনি মানুষ। বলতে হয় না, বিজ্ঞাপন দিতে হয় না, আপনা-আপনি কেমন টের পেয়ে যায়। ট্রেনের টিকিট কেটে পর্যন্ত আসে। এতকালের দেশসেবক হয়ে এমনধারা কাজে উনি আস্কারা দিচ্ছেন, আশ্চর্য !

অতএব শুধুমাত্র রোস্ট নয়, হিমানী নামে প্রাণীটিকেও দেখবার অতিশয় লোভ। যাকে নিয়ে মাস্টারমশায়ের উপবন জেঁকে উঠেছে, যার জন্য টিকিট করে ট্রেন যোগে মানুষ আসে।

চোখাচোখি হল। এবং চোখের দেখাতেই শেষ নয়—মজে গেছে বোধহয় ওই হিমিই। প্রথম দর্শনে প্রেম। পুরো ঘণ্টাও লাগেনি।

তারিয়ে তারিয়ে রোস্ট শেষ করতে রাত গভীর হল। সুশান্ত বলে, প্রকাণ্ড

দায়িত্ব নিয়ে বেরিয়েছি মাস্টারমশায়, আজকের বিকেলটা বরবাদ। রাত থাকতে বেরিয়ে পড়ব। এই রাত্রে পান্থবাস অবধি হাঙ্গামা করতে যাব না, যেখানে হোক গড়িয়ে পড়ি।

রামজয় নিরুপায়। ছাতের চিলেকোঠা কুটুম্বদের ছেড়ে দিয়েছেন, ঠাসাঠাসি করে কায়ক্লেশে আছেন তাঁরা। বুড়োমানুষ নিজে বাইরে শুতে সাহস করেন না, হাঁপানি-কাশি চেপে ধরবে।

সুশান্ত কোন কথা কানে নেয় না। গুরুতর রকমের ঘুম ধরেছে আর কি—কুয়াতলার চাতালের উপর মাদুর টেনে নিয়ে সে গড়িয়ে পড়ল।

বলে, বৃষ্টিবাদলা হবে না, পরিষ্কার আকাশ। রাত থাকতে কেউ ডেকে তুলে দেবেন। মাস্টারমশায়ের অত ভোরে ওঠা ঠিক হবে না। তুমি ডেকে দিও হিমানী, বুঝলে? নয় তো বড্ড ক্ষতি আমার।

পরের দিন রোদ উঠে গেছে, তখনো সুশান্ত পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। ডাকতে আসেনি হিমানী। বয়ে গেছে! এত লোক থাকতে সে কেন অচেনা বেটাছেলেকে ডাকতে যাবে? মামামশায়ের পুরানো সাগরেদ—ডেকে তোলার মানে দাঁড়াবে সে-ই যেন মানুষটাকে তাড়িয়ে তুলতে চায়। ঘুমেরও বলিহারি যাই! লোকের পর লোক এসে দাঁতন করে করে মুখ ধুয়ে যাচ্ছে কুয়াতলায়। বালতি বালতি জল তুলছে, আতাগাছের ডালাপাতার ফাঁক দিয়ে রোদের ঝিলিক পড়ছে এসে মুখের উপর। এতেও ঘুম্ ভাঙে না, সে মানুষ কাজের দায়িত্ব নিয়ে পথে বেরোয় কোন বিবেচনায়?

হঠাৎ একসময় সুশান্ত ধড়মড়িয়ে উঠে চারিদিক তাকিয়ে হায়-হায় করে উঠল: ছি-ছি-ছি, খাওয়াদাওয়া করে অরে মরণঘুম ঘুমিয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট করছি। এত জনকে বলে রেখেছি, কেউ ডেকে দিল না! তুমি কেন ডাকলে না হিমানী?

ডাক শুনে হিমানী চোখ তুলে তাকাল। চোখাচোখি আবার, দু-চোখে হাসি ছাপিয়ে পড়ছে। হাসি যেন ডেকে বলে: বুঝি লো বুঝি, ইচ্ছে-ঘুম তোমার। লোক দেখিয়ে দুষতে হয়, তাই তুমি বলছ এসব।

রামজয় এই সময় এসে সুসংবাদ দিলেন: মাঝের ঘরের একজন বিকেলে চলে যাচ্ছেন, একটা সিট খালি হবে। ভালই হল, আজ রাত্রে তোকে আর দুর্ভোগ ভুগতে হবে না।

রাত্রিটাও থেকে যাবে, এতদূর ধরে নিয়েছেন। এই যত হা-হুতাশ কেউ ওঁরা আমলে আনেন না। একজনে তো হাসছে টিপিটিপি, অন্যে সিটের ব্যবস্থা

করে এলেন। পাকাপাকি বসবাসের জন্যেই যেন উপবনে আসা—মান বাড়ানোর জন্যে মুখে যাই-যাই করছে, মনের কথা উল্টো।

আমি রওনা হচ্ছি মাস্টারমশায়—

এখন এই একপহর বেলায়? রামজয় খিঁচিয়ে উঠলেন: রোদ চড়ে গিয়ে একটু পরেই তো আগুন ঢালবে! দোকানে দোকানে তোর কাজ—দোকানিরা ঝাঁপ বন্ধ করে ঘুমুবে তখন। কাজের চাড় হলে সকাল সকাল উঠে বেরুতিস।

হিমানীকে দেখা গেল—রান্নাঘরের বারান্দায় দ্রুতহাতে চা ঢালছে, দুধ-চিনি মেশাচ্ছে। দেখিয়ে দেখিয়ে নিঃশব্দে যেন বলে, যাচ্ছ সত্যি তো এক্ষুনি? কত তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে দিই দেখ।

হাই তুলে সুশান্ত তারই যেন মনে মনে জবাব দিচ্ছে: ব্যস্ত হয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলো না হিমানী। ধীরেসুস্থে করো। মাস্টারমশায় ঠিক বলেছেন, এখন বেরিয়ে কাজ হবে না। দুপুরের পর যাব।

রামজয়ের দিকে চেয়ে বলে, শ্যামল দত্ত বড় ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমার। চাকরি না নিয়ে আমারই কথার উপর কারবার ফেঁদেছে। আমার উপরে তাই বিশেষ রকমের দায়িত্ব। বিকেলে চলে যাব, তখন মানা করলে হবে না কিন্তু মাস্টারমশায়।

রামজয় বলেন, কেন মানা করব? খালি সিটের জন্য বলছি—সিটের কি আর ভাড়া দিতে যাচ্ছিস তুই?

এক বয়সে লুকিয়েচুরিয়ে জন-সমাজের বাইরে বাইরে দিন কাটত, কথাবার্তার ধরনটা সেই জন্যে খাপছাড়া। বলছেন, সে-দিন নেই আর উপবনের। হিমি-মা'র হাতে অমৃতের ঝারি। সিট আমার খালি পড়ে থাকে না। একটা সিট খালি শুনলে পাঁচ-সাত খদ্দের ঝাঁপিয়ে এসে, আমায় দিন আমায় দিন—করবে।

হিমানী চা দিতে এসেছে। সেই চোখ-ভরা-হাসি। বাচাল চোখ দুটো যেন তড়পাচ্ছে: গেলে না চলে? তাহলে ক্ষমতা বুঝতাম।

আচ্ছা, দেখা যাবে ওবেলা। রোদের জোর একটু কমতে দাও। বড্ড ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, সুশান্ত সারাক্ষণ ছটফট করছে।

মোটরগাড়ি উঠানের উপর—কাল থেকে রয়েছে। বিকালবেলা তৈরি হয়ে খুব রোখে রোখে সে বেরুল। গাড়িতে স্টার্ট দিতে হবে এবার।

সে বড় চাট্টিখানি কথা নয়। শ্যামল দত্ত এ গাড়ি বাতিল করে দিয়েছিল, সুশান্ত সেরেসুরে পথে বের করেছে। বুড়োমানুষের মতো নড়ানো বড় মুশকিল,

তরে একেবার নড়াতে পারলে তারপর বেশি গোলমাল করে না। পুরো একদিন বিশ্রাম পেয়ে আজ বোধহয় গাড়ির আলস্য লেগে গেছে। এত হ্যাণ্ডেল মেরেও সাড়া জাগানো যায় না। হ্যাণ্ডেল মারতে মারতে হাসফাঁস করছে সুশান্ত বেচারি, ভিড় জমিয়ে হোটেলের মানুষ রোমহর্ষক কাণ্ড দেখছে।

অনতিদূরে হিমানী—করুণা নেই, হাসছে সে-ও যথারীতি। মুচকি হেসে বলল, ছেড়ে দিন, এখন হবে না। আবার এক সময় দেখবেন।

এবং মুখ ফুটে যা বলল না, তা-ও সুশান্ত বুঝতে পারে: নাট-বোল্টু কোথায় কি ঢিলে করে রেখেছেন, হবে কেমন করে? সকলের দেখা তো হয়ে গেল—আর কেন, হাত-পা ধুয়ে উঠে আসুন এবার।

সেই অনুক্ত কথাগুলোই সুশান্তকে বেশি করে ক্ষেপিয়ে তুলল। রামজয় এসে তার উপর ইন্ধন দিলেন: হ্যাঁ, গাড়ি সরিয়ে উই কুয়াতলায় ওদিকে নিয়ে রাখ্। বড় আসর চাই। শুনেছিস তা হলে, আদিবাসী ছোঁড়াছুঁড়িদের একটা দল সন্ধ্যাবেলা নাচতে আসবে। মাঝে মাঝে নেচে যায়, চা আর মুড়ির মোয়া খেতে দিই। বড় ভাল নাচে রে, দেখে মজা পাবি।

বুড়োমানুষের মনে ঘোরপ্যাচ নেই, সরলভাবে বলছেন। কিন্তু হিমির হাসির সঙ্গে জুড়ে গিয়ে উৎকট লাগে। অন্য রকম মানে দাঁড়ায়। আসর বড় করার জন্যেই যেন মোটরগাড়ি নিয়ে এতক্ষণের এত কসরত। নাচের ঘটা দেখা ছাড়া যেন অন্য কোন অভিপ্রায় ছিল না।

আরও চরম করলেন রামজয়: থাকগে বাপু। বড্ড ঘেমে গিয়েছিস্। যেটুকু ফাঁকা আছে ওর মধ্যেই কুলিয়ে যাবে একরকম। হাত-পা ধুয়ে খালি সিটে তুই খানিকটা গড়িয়ে নিগে যা।

গাড়িও তেমনি লেগেছে। সাড়া-শব্দ দেবে না, গুম হয়ে রয়েছে। সুশান্ত এবারে বনেট তুলে খুটখাট করছে, এটা খুলছে ওটা আঁটছে। মুখ তুলে হিমানীকেও এক-আধবার দেখতে পায়। সেই হাসি, কাজের ছুটোছুটির মধ্যেও একটু একটু হেসে সরে পড়ে। অর্থাৎ বেলা ডুবে গেছে—যাওয়ার কথা এখন আর উঠছে না। যন্ত্রপাতি নিয়ে উঠে পড়ো দিকি এবার, কাল সকালে আবার দেখো।

নাচ হল সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ ধরে। এমন-কিছু নয়। কিম্বা মনে উদ্বেগ বলেই সুশান্তর ভাল লাগল না। শ্যামল দত্ত এত খরচা করে গাড়ি দিয়ে বাইরে পাঠাল, কাজের নমুনা এই। অথচ সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে শুভ্রা-সাবান দাঁড় করানোর উপরে। উৎসাহ পেলে শ্যামল আরও টাকা ঢালবে,

কারবার বড় করবে। সুশান্ত এখনই সর্বেসর্বা, তেমনি হলে তো হাতে মাথা কেটে চারিদিক চক্কোর দিয়ে বেড়াবে।

আশ্চর্য, গাড়ি এতক্ষণে গর্জন করে উঠল। বুড়ো গাড়ি বোঝে সব—এখন এই রাত্তিরবেলা ছুটোছুটির বিপদ নেই, সেই জন্যেই হয়তো। কুয়া থেকে সুশান্ত বালতিতে জল তুলছে—ইঞ্জিনে ভরে রাখবে, ভোরবেলা উঠেই সঙ্গে সঙ্গে যাতে রওনা হতে পারে।

রামজয় পাশে এসে আচমকা প্রশ্ন করেন: কে কে আছে তোর সংসারে?

সুশান্ত বলে, একা আমি।

হিমিকে বিয়ে করে ফেল্ তবে। দু-জন হবি।

হাতের বালতি ছপ করে মাটিতে পড়ে জল গড়িয়ে গেল।

রামজয় নিজের কথা বলে চলেছেন: ওরা এসেছে আট মাসের উপর হয়ে গেল, এখনো কিছু করতে পারলাম না। বিয়েথাওয়ার কাজ পারিনে আমি, পারলে কি নিজেই একটা করতাম না? বোন-ভগ্নিপতি হয়তো ভাবছে, হোটেলের উপকার হচ্ছে—মতলব করেই এগুচ্ছিনে আমি। হঠাৎ মনে হল, তোকে যদি বলি তুই কক্ষনো 'না' বলবিনে। কি রে, রাখবিনে আমার কথা?

বিয়ে করে খাওয়াব কি মাস্টারমশায়?

ভাত—

আসবে কোত্থেকে সে ভাত?

হিমি রেঁধে দেবে। এত জনকে রোস্ট রেঁধে রেঁধে খাওয়ায়, দু-জনের মতো ভাত রাঁধতে ও পারবে।

হেসে উঠে সুশান্ত বলে, চাল কোথা পাবো?

দোকানে। কিনে-কেটে আনবি, দিব্যি রাঁধা-ভাত। আমোদ করে খাবি।

বলবার কিছু নেই। সর্ব সমস্যা মাস্টারমশায় জল করে দিলেন। সে আমলেও এমনি দিতেন:

কত ইংরেজ ভারতে আছে—চল্লিশ হাজার?

তাই হবে।

ওদের একটার জন্যে ধরা যাক আমাদের পাঁচটা খরচা। আমাদের দিকে তাহলে দু-লাখ। রইল কত দেশবাসী—বিয়োগ করে বের কর্।

আদমসুমারি সঠিক জানা না থাকায় সুশান্ত জবাব দিত: তা অনেকই তো রইল।

তারাই স্বাধীন হয়ে দেশ শাসন করবে। সুখসমৃদ্ধি হবে। বুঝলি রে এবার?

অকাট্য হিসাব, না বোঝার কিছু নেই। ঠিক আজকেরই মতন।

রামজয় বলে যাচ্ছেন, সময়টাও ভাল পাওয়া গেছে—বোশেখ মাস, বিয়ের মাস। আজকে আর হবার উপায় নেই—হিমি উপোস করেনি, পুরুত-পরামাণিকের ব্যবস্থা নেই। কাল। দিনক্ষণ পাই ভাল, নয়তো গোধূলিলগ্ন যাচ্ছে কোথায়!

এহেন ব্যবস্থা সত্ত্বেও একটা ব্যাপারে সুশান্ত কিন্তু-কিন্তু করছে: কালকের দিন তবে তো বরবাদ। পরশুও কি যেতে দেবেন ওঁরা? তার পরের দিনও বোধহয় না—ফুলশয্যার কত সব বখেড়া থাকে, শোনা আছে। হিমানীর বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়ি সবই তো এখন এক জায়গায় হয়ে যাচ্ছে—উপবন হোটেল।

কাতর হয়ে বলে, বড্ড ক্ষতি-লোকসান মাস্টারমশায়। শ্যামল এত খরচা করে পাঠাল, কাজ দেখাতে না পারলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এবারটা ছেড়ে দিন, শিগ্‌গিরই আসব আবার। উপবন রইল, আপনার হিমিও কিছু পালিয়ে যাচ্ছে না।

রামজয় চটে গিয়ে বলেন, হিসেবের বাইরে তো কিছু নেই—কত ক্ষতিলোকসান হিসেব করে বল্‌। আমি পূরণ করব। সাবান পেটিসুদ্ধ আমায় দিয়ে দে। কত দাম—ষাট-সত্তর, না-হয় একশ'ই হল। একটা গরু কি মহিষের দাম। সাবান আমার হোটেলে খরচা হবে। মিটল তো এবার, জামাই হয়ে সিটে শুয়ে পা দোলাগে এবার।

ফুলশয্যা হয়েও ছুটি হল না। কন্যাদায় মুক্ত হয়ে হিমানীর বাপ-মা নিশ্চিন্তে পাড়ি দিয়েছেন। চিলেকোঠা এখন সুশান্ত ও হিমানীর—দু-জন দিব্যি একলা আছে। অসুবিধা অন্য কিছু নয়, শুধু এক শুভ্রা-সাবান। খচখচ করে সর্বক্ষণ মনে বিঁধে আনন্দ মাটি করে দেয়। হয়তো-বা শ্যামল প্রশ্ন করবে: কাজ ফেলে কি জন্যে এক জায়গায় পড়ে ছিলে?

ভেবেচিন্তে তারও একরকম উপায় করা গেল। টেলিগ্রাম কলকাতায় শ্যামল দত্তের কাছে: তোমার আবিষ্কৃত শুভ্রা-সাবানের আশ্চর্য সমাদর। পেটি সুদ্ধ শেষ। আবার পাঠাও, ফিরতি পথে বিক্রি হতে হতে যাবে। মালের অপেক্ষায় এখানকার উপবন হোটেলে পড়ে আছি।

কি করি বলুন মাস্টারমশায়। মালিকের জবাব না পেয়ে ফিরি কেমন করে? জবাব এলেও তো হবে না, মাল এসে পৌঁছবে, তারপর।

রামজয় বলেন, ছটফট করিস কেন? ভালই তো আছিস।

আছে ভাল সন্দেহ কি! উপবনের সুবিখ্যাত মুরগি-রোস্ট রোজ রাত্রে। সত্যি চমৎকার। আরও উপাদেয় লাগে একেবারে মুফতে বলে।

শ্যামলের জবাব এলো। বিষম খুশি সে। প্রথম যাত্রায় এতদূর সাফল্য, কে ভাবতে পেরেছে! সাবান বুক করা হয়েছে, দু-চার দিনে পৌঁছে যাবে। ততদিন থাক কষ্ট করে হোটেলে। খদ্দেরের যখন এমন আগ্রহ, তাদের বঞ্চিত করা ঠিক হবে না।

এসে পড়ল অবশেষে মাল। গাড়ির পিছন দিকে বোঝাই দিয়ে রওনাও হতে হল একদিন। এ-ও ভাল, বিচিত্র অভিজ্ঞতা। একা এসেছিল কলকাতা থেকে, ফিরছে দু-জন। গাড়ির মধ্যে বন্ধনহীন দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, এ জিনিস স্বপ্নে ভাবা যায় না। শুভ্রা-সাবানের দৌলতেই হল, শুভ্রার উপর তারা কৃতজ্ঞ। স্টিয়ারিং হাতে ধরে সামনের দিকে একাগ্র হয়ে সুশান্ত গাড়ি চালায়। গায়ের উপর এলিয়ে আছে হিমানী, দু-চোখে হাসি। গাড়ির পিছনে গাদা গাদা সাবান। এবং অর্ডার-বই, ক্যাশমেমো, রকমারি সচিত্র বিজ্ঞাপন। বাজার চলিত সাধারণ সাবান নয়—সুপ্রসিদ্ধ কেমিস্ট ডক্টর শ্যামল দত্তের অভিনব আবিষ্কার। বিশেষ কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো, যার ফলে সিকি পরিমাণ সাবান এবং অর্ধেক পরিমাণ শ্রম ব্যয়ে কাপড়চোপড় ডবল ফর্সা হয়! এই ফর্মুলা দেশি এবং বিদেশি যে কোন শিল্পপতিকে দিলে বিনিময়ে কোটি টাকা—কিন্তু ধনীকে আরও ধনী করা ডক্টর দত্তের উদ্দেশ্য নয়··· ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেদার বিজ্ঞাপন ছড়াচ্ছে, মুখেও বোঝাচ্ছে। সমস্ত দিন ধরে কাজের নামে যত দূর সেখানে খুশি চলে যাও! সন্ধ্যা হলে তখন খোঁজ নাও কাছাকাছি আশ্রয় কোথায় মেলে। আজ এই জায়গায় থেকে গেলাম, কাল রাত্রে অন্য কোন রেস্ট-হাউস বা হোটেলে। —অথবা ঠাঁই না পেয়ে ঐ গাড়ির খোপেই কিনা, আগেভাগে কিছু বলবার জো নেই। বড় মজার মধুচন্দ্র-যাপন—ক'টা বর-বউয়ের ভাগ্যে জোটে? ঘুমোয় না, কামরার ভিতরে হোক আর গাড়ির খোপেই হোক—ঘুম আসবার আগেই ওদের রাত পোহায়ে যায়।

রাতগুলো কাটে চমৎকার। দিনমানটা নিয়ে—সুশান্তর কিছু নয়, হিমানীরই যত মুশকিল। দেশের একটা প্রধান সড়ক ধরে চলেছে—বিশ-ত্রিশ মিনিট অন্তর গঞ্জ জায়গা। গাড়ি পথের একদিকে রেখে নমুনা ও কাগজপত্র নিয়ে সুশান্ত নেমে পড়ে। শুভ্রা-সাবান ও আবিষ্কারক ডক্টর দত্তের গুণপনা যথোচিত জাহির করে ব্যাগ খুলে সন্তর্পণে এইবার সাবানের প্যাকেট

বের করল। দোকানি সঙ্গে সঙ্গে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, সামনের খদ্দের সামলায়। অগত্যা সুশান্ত গোড়া থেকে শুরু করে আবার। এ-দোকান থেকে সে-দোকানে—এই চলে সারাক্ষণ। গাড়ির মধ্যে হিমানী পাহারায় আছে—একলা হিমানীর সময় আর কাটতে চায় না। বড় কষ্টের এই দিনমান।

একদিন বড় একটা জায়গায় গিয়ে পড়েছে। রাস্তার দু-পাশ দিয়ে দোকানের অনন্ত লাইন। সর্বনাশ করেছে—এত দোকান সন্ধ্যা অবধি ঘুরেও সারা হবে না, রাত হয়ে যাবে। তাতেও কুলাবে না, কালকের দিন লেগে যাবে বোধহয়। রোদটা বিষম উগ্র আজ। উল্টা দিকের এক দোকানে সুশান্ত অনেকক্ষণ ঢুকেছে, বেরুবার নাম নেই।

অধৈর্য হয়ে একসময় হিমানীও গাড়ি থেকে বেরুল।

হাতছানি দিয়ে সুশান্তকে কাছে ডাকে: অতক্ষণ ধরে কি করো?

গল্প করছিলাম, তা বুঝি জানো না! ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর গল্প।

হিমানী বলে, এক জায়গায় অত সময় নিলে হবে কেন? তাড়াতাড়ি করো। বসা যাচ্ছে না গাড়ির ভিতর। যেন তপ্তখোলা।

কাজের জুত হচ্ছে না, মেজাজ খারাপ সুশান্তর। খিঁচিয়ে উঠল: তাড়াতাড়ি করতে গেলে আর এ-রকম হাসি থাকবে না মুখে।

হাসছি আমি? তুমি আমার হাসি দেখতে পেলে?

একটুকরো আয়নার কাচ সামনেটায়—গাড়িতে যেমন থাকে। হিমানী মুখ দেখতে যায়, কিন্তু সে কাচে ছায়া পড়ে না। বলে, তপ্তখোলায় ধান ফুটে খই হয়ে যায়—ভাবছি আমিই বা কখন ফুটে গিয়ে চিড়িং করে হুডের ফাঁকে বাইরে গিয়ে পড়ি! উল্টে তুমি আমার হাসি দেখছ—হাসির কি হয়েছে শুনি!

আমি নাজেহাল হচ্ছি। লোকের কষ্ট দেখার মতো সুখ কিসে আছে? দোকানদারকে এত করে জপালাম—তা সাবান যেন অস্পৃশ্য জিনিস, ছুঁলেই চান করতে হবে। কাজ নেই, ঢের হয়েছে। এখান থেকে সোজা কলকাতা, শ্যামলকে স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব দেবো—আমায় দ্বারা ক্যানভাসিং হবে না, আমায় ছেড়ে দাও। বন্ধুমানুষের খামোখা কতকগুলো টাকা নষ্ট করলাম!

মুখের কথা এই। তা বলে লহমায় জন্যে কাজ বন্ধ করে থাকে না। আবার পাশের দোকানে ছোটে। ছুটে গেল বোধকরি হিমানীর সঙ্গে যে সময় নষ্ট হল সেইটুকু পুষিয়ে নেবার জন্য। ঠিক আগেকার মতোই—বেরুবার নাম নেই।

হিমানী গাড়ির বাইরে এবার। বাজে-পোড়া নারিকেলগাছ একটা রয়েছে,

কাছেপিঠে অন্য কোন গাছ নেই যে ছায়ায় গিয়ে একটু দাঁড়ায়। এদিকেও দোকানপাট—পায়ে পায়ে তারই একটার ছাঁচতলায় গেল।

গদির উপর হাতবাক্সের সামনে মালিক লক্ষ্য করছিল। মেয়েটা গাড়ি থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে এদিকে এলো, সঙ্কোচে উঠতে পারছে না দোকানে। সমস্ত তার নজরে পড়েছে। বৃদ্ধ কর্মচারী একজন ঝিমোচ্ছিল বসে বসে। তাকে পাঠিয়ে দেয়: দেখে আসুন তো সরকারমশায়, উনি কি চান।

সরকারমশায় হিমানীর কাছে এসে বলে, কী দরকার বাবু জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন।

ডেকে পাঠাচ্ছে অপর পক্ষ, হিমানী নিজে থেকে কিছু বলতে যায়নি। একটা জায়গায় বসে রোদে ভাজা-ভাজা না হয়ে ক্যানভাসিং-এর কাজ দিক না কিছু এগিয়ে। রাস্তার ওপারে লাইন ধরে সুশান্তর কাজ—হিমানী এধারে যে ক'টা দোকানে পারে সেরে রাখুক। খারাপটা কী হবে! মরার বাড়া গাল নেই—সুশান্ত কিছু করতে পারছে না, হিমানীরও না-হয় তাই।

বুড়ো লোকটি বলছে, বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—

গাড়িতে গিয়ে কাগজপত্র এবং সাবানের কয়েকটা প্যাকেট হাতে নিয়ে হিমানী সাহস করে দোকানে ঢুকল।

কি চাই বলুন।

কী বলবে হিমানী, মুখ যেন সুঁচ-সুতোয় সেলাই করে দিয়েছে। বিজ্ঞাপনের কাগজ কয়েকটা এগিয়ে দিল।

হাতে নিয়েছে মালিকমশায়, পড়ে না। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে হিমানীর হাসি-ভরা মুখের দিকে। ঘেমে উঠে হিমানী মুখ নামিয়ে নিল।

মালিক চমক খেয়ে বলে, ও হ্যাঁ, কি জিনিস দেখি—সাবান? শুভ্রা-সাবানের নাম শোনা আছে। খুব ভাল জিনিস। কোথায় পাওয়া যায়, ভাবছিলাম। তা ঈশ্বরই যেন মিলিয়ে দিলেন। দিয়ে যান ডজন চারেক।

সরকারমশায়কে বলে, চার ডজন নিয়ে নিন।

বিজ্ঞাপনে এতক্ষণে নজর দিল। পাইকারি মূল্য ছাপা আছে, হাতবাক্স থেকে টাকা বের করছে। কৃতজ্ঞতা ভরে হিমানী মুখ তুলেছে। চোখোচোখি হল।

মালিক বলে, আরও কিছু নিতে বলছেন? তা বেশ, খুচরো কেন পুরো গ্রোসই দিয়ে যান। খুব চলবে এ জিনিস। আপনি মাঝে মাঝে আসবেন। আসছে সপ্তাহে আসুন না একবার। এসে খোঁজ নেবেন। সমস্ত কেটে যাবে তার মধ্যে।

আশাতীত ব্যাপার। আনন্দে থই পায় না হিমানী। সুশান্ত সেই দোকানেই এখনো—না, সেটা সেরে অন্যত্র ঢুকেছে? বড্ড বেশি বকে, বকে বকে মাথা ধরিয়ে দেয়। আর চটে ওঠে কথায় কথায়। দোকানের মানুষ বিরক্ত হয়ে পড়ে। হিমানী তো কথাই বলল না। কায়দাটা ধরিয়ে দিতে হবে সুশান্তকে।

উৎসাহ ভরে পরের দোকানে গিয়ে ঢুকল। পদ্ধতি একই। কথা নয়—কথা বলতে জিভ তো জড়িয়ে আসে—বিনা বাক্যে বিজ্ঞাপনের কাগজ হাতে এগিয়ে দেয়। হাতে নিয়ে মানুষটা মুখের পানে তাকায়: শুভ্রা-সাবান—আহা-মরি নাম! নামটা শুনেই মনে হয় কাপড়-জামা ধবধব করছে। নামেই কাটবে, দিয়ে যান। আসছে হপ্তায় আসবেন, বেশি করে নেবো।

গোটা পাঁচ-ছয় দোকানে ঘুরল। কাছাকাছি আর নেই, আর সব দূরে। গাড়ির পাহারা ছেড়ে দূরে যাওয়া চলে না। শুভ্রার নাম ও গুণপনা সব ক'টা দোকানই জানে, দেখা গেল। কোথায় পাওয়া যায়, সঠিক ঠিকানার অভাবে এতদিন উদ্যোগ হয়নি। বসেছে আবার গাড়িতে। কাজের সাফল্যে, এবারে গরম নয়, বসন্তের হাওয়া গায়ে লাগে।

সুশান্ত এলো এই সময়। বিজ্ঞাপন ফুরিয়েছে, কিছু বিজ্ঞাপন নেবে। রোদ খেয়ে ক্ষেপে আছে। হিমানীর উপর বোমার মতন ফেটে পড়ে: হাসছ যে তুমি বড়ো?

টিপিটিপি হাসছিল হিমানী, খিল-খিল করে জলোচ্ছ্বাসের মতো ফেটে পড়ে। ঝগড়া করে: কেন হাসব না? তোমার যে কত ক্ষমতা, জানো না! বলেই মন গুমরে থাকো। যত খাটনি খেটেছ, কিছুই বিফল হয় নি।

ঠাট্টা?

প্রমাণ স্বরূপ হিমানী ক্যাশমেমো বের করে ধরল। নতুন একটা বই নিয়ে এই ক'জায়গায় বিক্রি করে এসেছে। রাগ জল হয়ে গিয়ে সুশান্ত অপলক তাকিয়ে পড়ে: ঠিক তুমি মন্তোর জানো হিমানী।

হাত দুটো জড়িয়ে ধরেছে তার। নেহাত বাজার জায়গা, এর বেশি চালানো যায় না। বলে, গোটা ত্রিশেক জায়গায় ঘুরেছি; তোমার সিকির সিকিও তো হয়নি আমার। কাজে প্রথম নেমেই দিগ্বিজয় করে এলে।

এদিক-ওদিক চেয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গাঢ় স্বরে হিমানী বলে, সত্যি বলছি, একটা মুখের কথাও বলতে হয়নি। তোমরা বিজ্ঞাপন ছড়িয়েছ,

বিজ্ঞাপনে জানা ছিল সকলের। একেবারে মুখয়ে ছিল, শুভ্রা নামটা দেখেই লুফে নিল। দিগ্বিজয় বলো যা-কিছু বলো সমস্ত তোমার।

এর পরে আজ আর কাজকর্ম নয়, কাজ বিস্তর হয়েছে। গাড়ি চলল। ছুটি এইবারে। মফস্বল জায়গা হলেও সিনেমা আছে ঠিক। খুঁজেপেতে গিয়ে বসে পড়বে।

রাত্রে রেস্টহাউসের কামরায় যুগলে শলাপরামর্শ: ঠিক, ঠিক! এমনি কায়দা এবার থেকে। মাল ক'টা কাটিয়ে দিয়ে সোজা কলকাতা। আবার যখন বেরুব, এই লঝ্‌ঝড় গাড়িতে নয়। শ্যামলের নিজের গাড়িটা নিয়ে আসব। কাজ ভাল দেখলে হাসতে হাসতে দিয়ে দেবে সে।

ঘাড় ছুলিয়ে হিমানী বলে, বয়ে গেছে। চাকরি তোমার, আমি কি জন্যে খাটতে যাব? একবেলা একটু শখ হয়েছিল—তাই বলে কি নিত্যিদিন?

বলছে এই মুখে। চোখের হাসি জয়ের আনন্দে আরও যেন ঝিলিক দিচ্ছে। সুশান্ত যত বলে—তুমি ছাড়া হবে না হিমানী, সকৌতুকে হিমানী তত ঘাড় নাড়ে: পারব না, কক্ষনো না। আমি তো ক্যানভাসার নই তোমার শ্যামল দত্তর। আমি কেন করতে যাব?

এক সময় গম্ভীর হয়ে বলে, দেখ, ভয় করে বড্ড আমার। পুরুষের সামনে ঠকঠক করে পা কাঁপে। গেঁয়ো মেয়ে আমি—মা-ঠাকুরমা আমায় ঘরকুনো বানিয়েছেন। এসব কাজে লাগাবে তো শহুরে মেয়ে বিয়ে করলে না কেন?

এই কলহ, এই আবার সোহাগের গদগদ ভাব। নতুন বিয়ের বর-বউয়ের যা দস্তুর। শেষরাত্রের দিকে অবশেষে নিমরাজি হল হিমানী: এমন জেদি মানুষ দেখিনি কখনো। যা ধরবে, তাই করিয়ে তুমি ছাড়বে। কী যে করি আমি তোমার জ্বালায়!

চলছে সেইভাবে। তবু এক একদিন হিমানী বিগড়ে যায়। বিষম খেয়ালি। এক পা নড়বে না—কিছুতে না। গাড়ির ভিতর জেদ করে বসে থাকে, আর হাসে মিটিমিটি: আমি কি জানি এসব, করেছি কখনো? বিয়ে হতে না হতে কাজে জুড়ে দিয়েছ। আজকে আমার ছুটি।

তাকে গাড়িতে রেখে অগত্যা সুশান্ত ঢুকে গেল কোন এক দোকানে।

কী নিয়ে এলেন আবার? এখানে সাবে কাপড় কাচে মশায়, সাবান

লাগে না। পুরো কাপড় ক'টা মানুষেরই বা—পরে সব ন্যাকড়া। তাতে সাবান কোথা লাগবে?

যেখানে যাচ্ছে—উল্টেপাল্টে এমনি ধরণের কথা। সাবান নিতান্তই অপ্রয়োজনের বস্তু।

হিমানীকে অনেক সাধ্যসাধনা করে অবশেষে ওরই মধ্যে এক জায়গায় পাঠাল। পরখ করে যাক না। নিজে অলক্ষ্যে পিছনে আছে।

হিমানীর যা কায়দা—একটি কথা নেই। বিজ্ঞাপনের কাগজ দিল এগিয়ে। মুখের দিকে তাকিয়ে দোকানির কণ্ঠস্বর এবার ভিন্ন রকম। কর্মচারীকে বলে, শুভ্রা সাবান নিয়ে এসেছেন হে! রেখে দাও খান কয়েক। চেষ্টা কোরো তোমরা, কিছু কি আর কাটবে না?

কম নিক বেশি নিক, একেবারে ফেরায় না কেউ। দোকানিগুলো পুরুষমানুষ নিশ্চয়ই সেই কারণে। পুরুষ পুরুষকে সুনজরে দেখে না—একজন পুরুষে করে খাবে, সহ্য করতে পারে না অন্য পুরুষ। সুশান্তকে তাই অবহেলা। হত এই দোকানিরা মেয়েলোক, হিমানী তবে বুঝত ঠেলা। সুশান্তকে খাতির করত, তার কথা রাখত। নিয়মই এই।

পথে পথে আর ভাল লাগে না। যা হবার হল, ফেরা এবারে। কলকাতায় ফিরে যাওয়া যাক।

হিমানী বলে, সেই গঞ্জে একটিবার যেতে ইচ্ছা করে, আমার হাতে-খড়ি যেখানটা। ঐদিক দিয়ে ঘুরে যাই চলো। হপ্তাখানেক পরে যেতে বলে দিয়েছিল—যে ক'টা মাল পড়ে আছে, ওখানেই নিয়ে নেবে।

বাজে-পোড়া নারিকেলগাছ, টিনের বেড়া, পাকা মেজের সেই দোকান। দুপুরের বিশ্রামের পর সবে দোকান খুলছে প্রকাণ্ড চাবির থলে হাতে সেদিনের সেই বুড়ো কর্মচারী। দেখেই হিমানীকে চিনেছে। ভ্রূকুঞ্চিত করে বলে, আপনি-ই তো সেদিন সাবান দিয়ে গেলেন। উঃ, সাবান বটে! ভাবলাম, এত ভাল ভাল কথা লিখেছে, দেখিই না এক কুচি ফতুয়ায় লাগিয়ে। এই যেটা গায়ে পরে আছি। পুরো একখানা সাবান ক্ষইয়ে ফেললাম। যতই কাচি, ফর্শা না হয়ে উল্টে আরও ঘোর হয়ে যায়।

মুখ কালো সুশান্তর, সপাং করে কে যেন চাবুক মেরে বসল। প্রবোধ দেয় হিমানীকে: এ লোকের কথায় কী আসে যায়! গুণ না থাকলে এত সোরগোল পড়ে যেত না। কথা বাড়িও না, চলে এসো তুমি।

সোরগোল সহসা পিছন দিকেই। মালিক এসে পড়েছে, পিছন থেকে মালিক বলে ওঠে, এই যে, এসে গেছেন আপনি। আজকেই ভাবছিলাম

আপনার কথা। সাবান কোথা?

সুশান্ত বুড়ো কর্মচারীর দিকে অপাঙ্গে চেয়ে বলে, দরকার?

সুশান্তর কথা কানেই গেল না তার। হিমানীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলে, হাত খালি আজকে—বিজ্ঞাপনের কাগজও দেখছিনে। গাড়িতে রেখে এলেন বুঝি? ভিতরে চলুন। মানুষটিকে বলে দিন, তিন চার ডজন সাবান আনতে।

কর্মচারীটি বিরক্তি ভরে বলে, আগের সাবান তো গাদা হয়ে পড়ে আছে—আবার কেন? তাই বরঞ্চ কতক ফিরিয়ে দিলে হয়।

অপ্রতিভ হয়ে মালিক বলে, কে বলেছে? আপনি কিছু জানেন না সরকারমশায়। চলে যান, নিজের কাজে বসুন গে।

বিক্রি ছাড়া কাজ কি আমার? সেইজন্যে জানতে পারি। বলে কয়ে একজনকে একখানা গছিয়ে দিলাম, ফেরত এনে যাচ্ছে-তাই করে বলল। আপনার সামনেই তো হল, আপনি এখন চেপে যাচ্ছেন।

মালিক তর্জন করে ওঠে: আপনাকে কে মাতব্বরি করতে বলছে শুনি? কথাবার্তার মধ্যে কখনো আপনি ফোড়ন কাটবেন না, শেষবারের মতো মানা করে দিচ্ছি। সাবধান!

মুখ কালো করে সরকারমশায় নিজ স্থানে গিয়ে বসল। ফিক করে হেসে মালিক বলে, এই হপ্তায় আপনি আবার নিয়ে আসবেন, কথা ছিল। দিন যদি সব না-ও গিয়ে থাকে, ভাবনার কি আছে? নানা ঝঞ্ঝাটে আমি নিজে ক'দিন দেখতে পারিনি। মাল কিছুই পড়ে থাকবে না।

একটু থেমে আবার বলে, থাকে পড়ে সে আমার থাকবে। আপনার কোন দায়? হপ্তায় হপ্তায় আপনি নিয়ে আসবেন।

সুশান্ত হাত চেপে ধরেছে হিমানীর। গাড়িতে গিয়ে স্টার্ট দিচ্ছে।

হিমানী বলে, সাবান চাইল যে?

সুশান্ত বলে, বেচব না এদের কাছে।

হাত টেনে হিমানীকে পাশের সিটে তুলল।

হিমানী আবার বলে, আরও ক'টা দোকান এদিকে আছে। তাদের হয়তো সত্যিই ফুরিয়েছে।

তোমার খদ্দের একজনের কাছেও বিক্রি করব না।

গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

ক্ষণ পরে তিক্ত কণ্ঠে সুশান্ত বলে, হাসছিলে কেন দোকানদার ছোঁড়ার দিকে অমন করে?

অবাক হয়ে হিমানী বলে, কি বলছ, হাসি দেখলে কখন তুমি ?

আলবৎ হেসেছ। মন-মজানো হাসি। গেঁয়ো মেয়ে বলে আবার ন্যাকা সাজতে যাও। শহুরে মেয়ের বাপ-ঠাকুর্দাও অমন করে না। হাসি দিয়ে বড়শি-গাঁথার মতো আমায় গেঁথে ফেললে। নইলে বিয়ের অবস্থা আমার! একেবারে দিশে করতে দিলে না।

গাড়ি গর্জন করে ছুটেছে।

হিমানী বলে, না বুঝে একবার একদিন বিক্রি করে এসেছিলাম। অন্যায় হয়েছিল আমার। বলে বলে তুমিই তো তারপর পাঠাতে।

হিমানী কেঁদে পড়ল।

আরও জ্বলে উঠে সুশান্ত বলে, দিব্যি তো জল আনতে পারো চোখে! হাসি কান্না দু-রকম দুই চোখে—সে জিনিষও নয়। এক সঙ্গে মেশানো। হাসির আরও বাহার খোলে এতে—যে দেখে, তার মুণ্ডু ঘুরে যায়।

হিমানী আরও ব্যাকুল হয়ে পড়ে। পোড়া হাসি চোখের জলেও ধুয়ে যায় না, কান্নার মধ্যেও হাসি লেগে থাকে—এ রোগ নিরাময় হবে কেমন করে!

শ্যামল দত্ত আনন্দে থই পায় না। প্রথম যাত্রায় এতদূর সাফল্য ধারণার অতীত। শত্রুরা কত কি বলত, তাদের মুখ চুন। হয়েছে কি এখনো! এক্সপেরিমেণ্ট চালাচ্ছে, আরও কয়েকটা জিনিস মেশানোর ইচ্ছা আছে, তখন এক আজব কাণ্ড হবে, বালতির জলে শুভ্রার একটুখানি গুলে যাতে ঢালবে, তাই ফরসা! মানুষ কুকুর কাপড়-চোপড় টেবিল-চেয়ার যার উপরেই হোক। দেশে আর অন্য সাবান পাত্তা পাবে না।

ইতিমধ্যে খবর কানে গেল, বিয়ে করে বউ নিয়ে এসেছে সুশান্ত।

শ্যামল লাফিয়ে ওঠে: সত্যি? এতবড় জিনিসটা চেপে রেখেছ, আচ্ছা মানুষ তো তুমি! বউ কবে দেখাচ্ছ? কবে তোমাদের সময় হবে জেনে এসে বলো, এইখানে ছোটখাট একটু চায়ের ব্যবস্থা করি।

সুশান্ত বাড়ি এসে বলে, কবে যাওয়া যায় বলো। সামনের রবিবার—কেমন?

হিমানী জ্বলে ওঠে: কোনদিন নয়। খবরদার, বাইরে যাওয়ার নাম করবে না আমার কাছে।

মুখে যা বলল, তাই। নিচের তলায় আধ-অন্ধকার একটা ঘর—অহোরাত্রি হিমানী তার মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে আছে।

সুশান্ত বলে, হল কি তোমার? নবাব-বাদশার হারেমকে যে হার মানিয়ে

দিলে। এক পা কোথাও বেরুবে না ?

বেরুলেই তো হেসে মানুষের মুণ্ডু ঘোরাব। মাথা ঘুরে পটপট করে সব পড়বে, দেশে মড়ক লেগে যাবে।

সুশান্তও চটেছে। বলে, সেটা বুঝি মিথ্যে কথা ? মিটমিট করে হাসো, যাচ্ছেতাই হাসি তোমার। না হাসলে কেউ বানিয়ে বলতে যায় না।

না হাসবার জন্য হিমানীর কত চেষ্টা—দু-জন মানুষের সামান্য ঘরকন্নার পর সমস্তটা দিন এই নিয়ে আছে। আয়না নিয়ে জানলার কাছে বসে নানান কায়দায় মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাসি বন্ধের অভ্যাস করে।

শীতলা-মূর্তি মাথায় করে বাড়ির দরজায় এসেছে : মায়ের নামে পয়সা-কড়ি কি দেবে দাও—

মা কি করবেন ?

দয়া হলে তোমার ঘরে মা অনুগ্রহ দেবেন না।

হিমানী বলে, পয়সা কেন, আস্ত একটা আনি ধরে দিচ্ছি। মা যেন অনুগ্রহই দেন। পূজোর সময় আমার নামে চেয়ে নিও, মুখ যেন বসন্তে ঝাঁঝরা হয়ে যায় আমার।

ছোটবেলা সবাই বলত, বড্ড হাসকুটে মেয়ে গো! আদর করত। ঠাকুরমা বলতেন আমি দেখবার জন্য থাকব না, কিন্তু চিরকাল যেন হেসে হেসে এমনি কাটাতে পারিস। আশীর্বাদ ভেবে অভিশাপ দিলেন তিনি, সত্যি সত্যি তাই ফলে গেছে। সারা মুখে হাসির মাখামাখি। সন্ধ্যাবেলা ঠনঠনে-কালীবাড়ির আরতির ঘণ্টাধ্বনি আসে। ঘরের মেঝেয় মাথা কোটে তখন হিমানী : মাগো, কাঁদতে পারি যাতে তাই করো। নিখুঁত পারিপাটি কান্না—যার মধ্যে হাসির ছিটেফোঁটাও নেই।

শ্যামল তাগাদা দেয় : কই হে, কবে আসছ তোমরা ? আমার বাড়ি এত ভিড়ের মধ্যে আসতে না চান, হোটেলই চা-টা হতে পারে। তোমার বউ আজও দেখলামও না, বড্ড অন্যায় হয়ে যাচ্ছে।

বাসায় এসে সুশান্ত স্ত্রীকে বলে, হোটেলেই চলো তবে। শুধু শ্যামল তুমি আর আমি। ছোটবেলার সহপাঠী, মানুষটি বড় ভাল—সেই জন্য এমনি করে। আসলে তো মনিব, অন্নবস্ত্র তারই দৌলতে—

হিমানী ঝেড়ে ফেলে দেয় : মনিব তোমার। আমার কেউ নয়, আমি কেন যেতে যাব ?

সুশান্ত অনেক করে বোঝাচ্ছে : শুভ্রা একদম চলছে না। সারাদিনের মধ্যে আমার বিশ্রাম নেই—এত বড় শহরের অলিগলি চষে ফেলছি। আগে

তবু দশ-বিশ গ্রোস কাটত, এখন বোধহয় দশখানাও নয়। শ্যামল যদি কারবার তুলে দেয়, চোখে অন্ধকার দেখতে হবে।

হিমানী রায় দিল : ও যাবেই। পণ্ডশ্রম তোমার, ঠেকাতে পারবে না। কেমিস্ট না কচু—যা করেছে সাবানের জাতই নয়। নিজে আমি কেচে দেখেছি, কাপড় আরও কাল হয়ে যায়। বিজ্ঞাপনে আকাশ ফাটিয়ে ক'দিন চলবে ?

এর পর হঠাৎ এক সকালবেলা শ্যামল নিজেই তাদের বাসায় এলো। অন্ধকার মুখ। বলল, সাবান নিয়ে আজকে আর বাজারে বেরিয়ে কাজ নেই। সোজা তুমি অফিসে চলে যেও। জরুরী কথা আছে।

হিমানী একহাত ঘোমটা টেনে জবুথবু হয়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে শ্যামল একটু হাসল। বলে, বড্ড লাজুক তো ইনি। আজকাল এমন দেখা যায় না। যাক, বিব্রত করব না।

কানের গয়না নিয়ে এসেছে—গয়নার কৌটো হিমানীর হাতে দিল না, চেয়ারের পাশে রাখল। সুশান্ত মনে মনে গরগর করছে, ব্যাপারটা কোন রকমে চাপা দিতে চায় : অজ পাড়াগাঁয়ের মানুষ তো—

কিন্তু বলছে কাকে ! শ্যামল ইতিমধ্যে উঠে পড়েছে, একটা মিষ্টি মুখে দেবার সবুর সয় না। বলে, কর্তব্য অনেকগুলো মুলতুবী রয়েছে, সেইগুলো সারতে বেরিয়েছি। চাকরি নিয়েছি এলাহাবাদে, সেইখানে চলে যাচ্ছি।

শ্যামল বেরিয়ে যেতে সুশান্ত বোমার মত ফেটে পড়ে : এটা কি হল শুনি ? কাপড়চোপড়ে মুখ ঢেকে কলাবউ হয়ে রইলে—রাস্তায় রাস্তায় ক্যানভাসিং করেছ, সে খবর শ্যামল বুঝি জানে না ?

হিমানী বলে, কী করব মুখ না ঢেকে ? মুখে যে হাসি ! কত চেষ্টা করি হাসি কিছুতে ছাড়ছে না।

কে এমন বাড়ি বয়ে গয়না দিতে আসে ? এসে অপমানিত হয়ে গেল।

কথা কেড়ে নিয়ে সজোরে ঘাড় নেড়ে উগ্র কণ্ঠে হিমানী বলে, উপকার করে বলেই কি তার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিতে বলো ? সে আমি পারব না। কক্ষনো না।

শ্যামলের যা বলবার বাসায় এসেই একরকম বলে গিয়েছিল। অফিসে গিয়ে সুশান্ত সবিস্তারে সব শুনল। শুভ্রা চলবে না, বিস্তর লোকসান হয়েছে। কারবার তুলে দিয়ে চাকরি নিয়ে শ্যামল এলাহাবাদে চলল। একমাসের মাইনে দিয়ে লোকজন সমস্ত বিদায়।

মাথায় হাত দিয়ে বসে সুশান্ত। যত রাগ আর দুঃখ হিমানীর উপর

ঝাড়ছে : একা একা ছিলাম দিব্যি। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়—জঙ্গুলে রাজ্যে গিয়ে কুহকিনীর পাল্লায় পড়ে গেলাম। নইলে বিয়ে করার অবস্থা কি আমার! যা বাজার পড়েছে, লক্ষপতি মানুষও বিশবার আগুপিছু করে। মাস্টারমশায়ও লেগে গেলেন, দিশা করতে দিলেন না।

মাথায় হাত দিয়ে পড়েছিল, হাতে স্বর্গ এসে পৌছল ডাকের চিঠি ভর করে। রামজয় বিশ্বাস চিঠি লিখেছেন।

তাঁদের শহর আরও জাঁকিয়ে উঠেছে। ভাল ভাল সব হোটেল। উপবন বলতে গেলে কাঁটাবন এখন, খদ্দের বড় একটা আসে না। দিন কতক সেই সুদিন এসেছিল—হিমি যখন ছিল। হিমির রোস্টের নাম হয়ে গিয়েছিল। এখনো লোকে সে জিনিস ভুলতে পারে নি।

সুশান্তকে লিখেছেন : প্রাণান্তক খাটনি খেটে পরের কারবার বড় করছ তুমি। চলে এসো হিমানীকে নিয়ে। তোমরা ছাড়া আমার কে আছে? উপবন তোমাদের নামে লেখাপড়া করে দেবো—জিনিসটা চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সহ্য করতে পারিনে। হিমির নামে হোটেল আবার জেঁকে উঠবে। মালিক হয়ে তোমরাই চালাও—বুড়োমানুষ যে ক'টা দিন আছি, চাট্টি খেতে দিও। এই বন্দোবস্ত।

চিঠি বার পাঁচ-সাত সুশান্তর পড়া হয়ে গেছে। হিমানীকেও পড়তে দেয়। বলে, নিজেদের কাজকারবার, নিজেরা কর্তা। চলো হিমানী।

হিমানীও বলে, চলো তাই—

দুটি প্রাণীর দরিদ্র সংসার—সেদিক দিয়ে বড় সুবিধা। বাঁধা-ছাঁদার হাঙ্গামা নেই, মালের দরুন মাশুলও বেশি দিতে হবে না রেল-কোম্পানিকে। চিরজীবনের মতন চলে যাচ্ছে, আর কলকাতা ফিরবে না।

যাত্রায় বাধা পড়ে গেল, আকস্মিক দুর্ঘটনা। গিয়েই তো রোস্ট রান্নায় লেগে যেতে হবে—কিছু সড়োগড়ো করে নিচ্ছে হিমানী। মুরগি জুটছে না বলে ফুলকপির রোস্ট। ঘিয়ের বদলে সর্ষের তেল। কলকল করে তেল ফুটছে, তার মধ্যে আস্ত কপি ফেলে দিয়েছে। গরম তেল ছিটকে উঠে সারা মুখে পড়ল। গরিবঘরের মেয়ে ছোট্ট বয়স থেকে রান্নাবান্না করছে, এত অসাবধান কেন? মুখই বা কড়াইয়ের অত কাছে নিয়েছিল কী দেখবার জন্য?

দুর্গ্রহ কাকে বলে। রাঁধা-কইমাছ গ্রাসের সামনে জ্যান্ত হয়ে পালিয়ে যাওয়ার মতো। প্রাণরক্ষা হল, সুস্থ হতে তবু মাসখানেক। হাসপাতাল থেকে হিমানী যেদিন বেরিয়ে এলো, সুশান্ত মুখের দিকে তাকাতে পারে না।

গা শিরশির করে। হাসতে যায় আজ হিমানী মনের সাধে, সুশান্তকে দেখিয়ে দেখিয়ে। ভয়সঙ্কোচ নেই।

হি-হি হো-হো—প্রাণপণ হাসি! আওয়াজটা বটে হাসির, কিন্তু মুখের উপর হাসির চেহারা কই? পরম উল্লাসে স্বামীর গায়ে ঝাঁকি দেয়: ওগো দেখ, হাসি মুছে গেছে। নজর ফেলে দেখ, একেবারে কিছু নেই।

স্টেশন থেকে ঘোড়ার-গাড়ি করে উপবনে পৌঁছল। রামজয় দোতলায় ছিলেন, উঠি-পড়ি নেমে এলেন: কই রে হিমি, কোথায় তুই?

সুশান্তর দিকে চেয়ে হাহাকার করে উঠলেন: এ কোন মুখপুড়ি সঙ্গে করে আনলি, আমার সে হিমি কই?

হিমানী বলে, মুখ পুড়েছে মামামশায়, হাত পোড়েনি। রোস্ট সেই আগেকার মতোই করব। আগের চেয়েও ভাল করব। খাবে তো রোস্ট, আমার মুখ কেউ খুবলে খুবলে খেতে যাবে না।

তবু রামজয় প্রবোধ মানেন না। খিঁচিয়ে উঠলেন: তোর চেয়ে বামুনঠাকুর ঢের ঢের ভাল করবে। চলে যা তোরা। মুখ দেখে কেউ রান্না খাবে না, খদ্দের যে ক'টি আছে তারাও সরে পড়বে।

উত্তরের পথ দক্ষিণের পথ

এ গাঁয়ের সব গরিব বাসিন্দা—দুর্গাপূজো হয় না, কালীপূজোও নয়। ভারি ভারি দেবদেবীদের নাগাল পাওয়া সাধ্যে আমাদের কুলোয় না। লক্ষ্মীপূজোটা ঘরে ঘরে। কোজাগরী পূর্ণিমায় অমলধবল জোৎস্নায় ভেসে বেড়ান, তিনি নন কিন্তু। ভিন্ন এক লক্ষ্মী—পাঁজির পাতায় নিশানা মেলে না। নিশিরাত্রে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে মোষ-পাঁঠা বলি দিয়ে জাঁকের কালীপূজো—তারই খানিক আগে সন্ধ্যাবেলাটা এই লক্ষ্মী এসে চুপিসারে নিরামিষ পূজো নিয়ে যান।

আমাদের গাঁয়ের সব চেয়ে বড় উৎসব। সারা বছর ধরে আয়োজন। বাড়ির সঙ্গে নারকেল-বাগান, বিস্তর নারকেল ফলে। কাঠঝুনো নারকেল বাছাই করে ছোবড়ায় বেঁধে জোড়ায় জোড়ায় ঘরের আড়ায় ঝুলিয়ে রেখেছে। খয়ে-ধান গোলার এক দিকে আলাদা করা আছে। খেজুরগুড়, খেজুরচিনি ও নলেন-পাটালি বানায় আমাদের তল্লাটে, দেশবিদেশে খুব নাম। পৌষ মাসে সরেস দানাগুড়ের কলসি ঐ খয়ে-ধানের উপর রেখে দেয় মা-লক্ষ্মীর নামে। খেজুরচিনিও রাখে—চিনি রাখার কিছু বেশি হাঙ্গামা। ছাপবাক্সর

ভিতরে কানেস্তারা ভর্তি হয়ে আছে—বর্ষাকালে রোদ দেখা দিলেই রোদ্দুরে দিতে হবে। নয়তো গলে জল হয়ে যাবে সমস্ত। গুড়-নারকেলে গুড়ের সন্দেশ, চিনি নারকেলে চিনির সন্দেশ, খই ভেজে গুড় মেখে মুড়কি। লক্ষ্মী-পুজোয় দিতে হবে এ-সব। আরও আছে। তাল খেয়েছে ভাদ্র মাসে—বাঁশের মাচা বানিয়ে তাদের আঁটি গাদা দিয়ে রাখে। মাটিতেও না রাখে এমন নয়। কিন্তু সে বস্তু বেশিদিন থাকে না। ভিতরে শাঁস পানসে হয়ে পচে যায় শেষটা। মাচার উপরে থাকে ভাল—কল বেরিয়ে নিচের দিকে ঝুলে আছে—মনে হবে, একগাদা সাপের বাচ্চা নিম্নমুখে ঝুলছে। তালশাঁস ও মা-লক্ষ্মীর ভোগে লাগে।

সব তো হল, কিন্তু কেদার-কাকা আসেন না যে এখনো! ঝাঁপা থেকে সুন্দরীপিসির গরুরগাড়ি পৌঁছে গেল—পিসি নামলেন। সঙ্গে এক বোঝা আখ এবং দুটো পুঁটলিতে আস্ত মুগ আর আস্ত ছোলা। ঐ উত্তর অঞ্চলটা উৎকৃষ্ট ডাল-কলাইয়ের জন্য প্রসিদ্ধ। আখের কুচি এবং মুগ-ছোলার অঙ্কুর নৈবেদ্যে দেওয়া হবে। পিসিমার এই বার্ষিক পুজোর বরাদ্দ—বরাবরই আসে।

নেমে পড়েই খোঁজ নিচ্ছেন: কেদার?

সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, মরেছে তাহলে অলপ্পেয়ে, আপদ গেছে। বেঁচে থাকলে ঠিক চলে আসত।

বাড়ির দক্ষিণে বিল। পাকাধানের ভারে ধানগাছ ক্ষেতের উপর গড়িয়ে পড়েছে। আরও দক্ষিণে জলাভূমি। জলার ওপারে কোথায় অনেকদূরে বাগদা নামে গ্রাম—জেঠামশায় জানেন খুব জায়গাটা—সেইখানে কেদারকাকা থাকেন। জল ঝাঁপিয়ে কাদা ভেঙে চলে আসেন। সুন্দরীপিসি ছুতোয় নাতায় ঘন ঘন ঐ বিলের দিকে যাচ্ছেন। ফিরে এসে মাকে জেঠাইমাকে প্রবোধ দেন: ভাবছ কেন বউ? না আসে তো বয়ে গেল। ঝগড়া-কচকচি থাকবে না, দিব্যি শান্তিতে কাজকর্ম হবে। আমি আছি, তোমরা সব আছ। যে দেশে কাক নেই, সে দেশে বুঝি রাত পোহায় না!

তা সত্যি—

বিমর্ষমুখে সায় দিয়ে মা বলছেন, কুড়ি পাঁচেক নারকেল ভাঙা, কোরানো, ভিয়েন করে সন্দেশ পাকানো, এত সমস্ত কাজ দুটো দিনের মধ্যে। বাড়িসুদ্ধ লেগে পড়তে হবে আর কি! সংসার কার জন্যে আটকে থাকে?

জলার মধ্যে দ্বীপের মতন একটুকু উঁচু জায়গা, প্রাচীন বটগাছ সেখানে। ভূতুড়ে গাছ লোকে বলে। ডালে ডালে বাদুড় ঝোলে—আসলে অপযোনি

ওঁরা, গুণীনেরা বলে। বাদুড়মূর্তিতে সারা দিনমান বিশ্রাম নেন, রাত্রিবেলা ডেরা ছেড়ে চতুর্দিকে চরতে ফিরতে বেরোন। পারতপক্ষে কেউ সেদিকে যায় না, রাত্রিবেলা তো নয়ই।

বেলা ডুবুডুবু, সেই সময় কে-একজন বলল, ভূতুড়ে বটতলায় মানুষ। জলা ভেঙে ঐখানটা ডাঙার উপরে উঠে জিরিয়ে নিচ্ছে। পিসিমাও ছুটলেন আমাদের সঙ্গে। এমনি তো পিসি সুঁচে সুতো ভরতে পারেন না, আমাদের পরিচয় দিতে হয়—অতদূরে কিন্তু নজর ফেলেই বলে দিলেন, সেই মুখপোড়া, দেখতে হবে না। এতক্ষণে এইবারে মরণ হল। বাড়িসুদ্ধ জ্বালাতন করে মারবে।

ধরেছেন ঠিকই। হাঁটুভর জল এবং তারপরে ধানবনের কাদা ভেঙে কেদারকাকা পুকুরপাড়ে এসে উঠলেন, দু-পাটি জুতো ফিতেয় ফিতেয় বেঁধে ছাতার মাথায় ঝুলিয়ে কাঁধে নিয়েছেন।

কেদারকাকা—কেদারকাকা এসে গেছেন রে!

উল্লাসে নাচানাচি করছি আমরা। ঘাটে নেমে কাদা-পা ধুয়ে ফেলার পরে জুতো যে কাঁধ ছেড়ে পদতলে নেমে যাবে, তা নয়। বললেন, কুটুমবাড়ি হলে তাই করতাম—জুতো পায়ে ভদ্দোর হয়ে খটমট করে বাড়ি ঢুকে যেতাম। আপনবাড়ি খামোকা ধুলো মাখিয়ে জুতো কেন ময়লা করতে যাই?

জেঠাইমা বললেন, ভেবে মরি, কেদার কেন আসে না?

মিছামিছি ভাবেন আপনারা। পুরো দুটো দিন বাকি—লক্ষ্মীপুজো তো নস্যি—বলেন তো অশ্বমেধযজ্ঞ গুছিয়ে দিই এর মধ্যে

জুতো চালের বাতায় গুঁজলেন, ছাতা বেড়ার গায়ে ঝুলিয়ে দিলেন। থাকবে এই অবস্থায়, কাজকর্ম মিটিয়ে যাবার ক্ষণে আবার কাঁধে তুলে নেবেন। এদিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে লহমায় কেদারকাকা বীরমূর্তি ধরলেন—ঢেঁকিশালে ঢুকে এক লম্ফে আড়ায় চড়ে বসলেন, কোথায় কি থাকে অবিদিত নেই। আড়ার উপর থেকে ঝুনো-নারকেল উঠোনে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছেন: এই ছেমড়ারা সরে যা। গায়ে পড়লে চুরমার হয়ে যাবি, পাটিসুদ্ধ দাঁত ভাঙবে। ফোঁপল খেতে হবে না তখন কামড়ে কামড়ে।

আড়া থেকে ভুঁয়ে নেমে আমার উপর হুকুম: এই কায়েতের-ছোট বেদের-বড়, তামাক সেজে নিয়ে আয়।

কথাটার অর্থ জানি, অনেকের কাছে বিস্তর বার শুনেছি। জাতে কায়েত বলে বয়সে সকলের ছোট আমাকেই তামাক সাজতে হবে। বেদের ক্ষেত্রে নাকি উল্টো নিয়ম—বৃদ্ধরা তামাক সেজে এনে বাচ্চাদের খাওয়ায়। এই নিয়ে

অনুশোচনাও জাগে : আহা রে, বেদের ঘরে কেন জন্ম নিলাম না! কেদারকাকারা তাহলে সেজে এনে দিত, পা ছাড়িয়ে আর্ধেক চোখ বুজে সুখটানটি দিতাম আমরা।

মাহিন্দার পবন যত নারকেল এক জায়গায় এনে এনে জড় করেছে। আমরাও সাথেসঙ্গে আছি। পাহাড় হয়ে উঠল। কাটারি এনে রাখল কেদারকাকার পাশে। ভুড়ুক-ভুড়ুক হুঁকো টানতে টানতে কেদারকাকা অনাসক্ত দৃষ্টি মেলে দেখে যাচ্ছেন। তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন সহসা। ডাক ছাড়লেন : বিজয় কোথা গেলি রে, হুঁকো নিয়ে রাখ।

মামাতো-ভাই বিজয় এ-বাড়ি থেকে পাঠশালায় পড়ে। সকলকে বাদ দিয়ে বিজয়ের উপর হুঁকো রাখার আদেশ—যেহেতু ছিলিমে এখনো কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে, আমাদের মধ্যে একমাত্র বিজয়ই হুঁকো অন্তরালে নিয়ে ঐ বস্তুর সদ্ব্যয়ে সক্ষম। কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও কেদারকাকা হুঁশজ্ঞান হারান না।

এইবারে নারকেল-ছোলা। মেশিনের কাজ যেন—উঁহু, মেশিনে কখনো এমন দ্রুত আর এত পরিপাটি ভাবে পারে না। কেদারকাকার হাত দুটোর মতন। খোসা-ছাড়ানো নারকেল ঝুড়িতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছেন, বয়ে নিয়ে পবন ঘরের মেঝেয় ঢালছে। সুন্দরীপিসি কখন এসে কাঠের দেলকোর উপর টেমি ধরিয়ে দিয়ে গেছেন। ঠাকুরমা সন্ধ্যে হলেই শুয়ে পড়েন, শোবার মুখে একবার এসে প্রসন্নকণ্ঠে বললেন, আমার কেদার এসে পড়েছে—দেখতে দেখতে সব সারা হয়ে যাবে। ছোঁড়াগুলো, এখানে কি তোদের? উঠোনে বসে কার্তিকের হিম লাগাচ্ছে। অ বড়বউমা, ডাক দাও এদের সকলকে, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুক।

রাত অনেক। উঠানে জনপ্রাণী নেই। একা কেদারকাকা অশ্রান্ত কাজ করে চলেছেন। ঘরে শুয়ে আমি এক একবার জানলায় উঁকি দিচ্ছি। রান্নাঘরের দাওয়ায় ঢপাঢপ পিঁড়ি পড়ল, বড়দের খাওয়া এখন। পিঁড়ির আওয়াজ কানে শুনে যে যেখানে থাকেন লাইনবন্দি সব বসে যান। খেতে খেতে জেঠামশায় ডাকলেন : জায়গা হয়েছে, এসো কেদার—

হুঁ—বলে কেদারকাকা ঘাড় নাড়লেন।

খানিক পরে জেঠামশাই হাঁক দিয়ে ওঠেন : কই হে কেদার? সবাই বসে গেছে, চলে এসো।

কেদারকাকার ভ্রূক্ষেপ নেই। ঝুড়ি ভরতি হয়ে গেলে লোকাভাবে নিজেই এখন নারকেল নিয়ে ঘরে ঢালছেন। হেনকালে বজ্রপাতের মতন অকস্মাৎ

সুন্দরীপিসির আবির্ভাব: বলি কানের মাথা খেয়েছ নাকি? ওঠো, ভাত কোলে করে কতক্ষণ লোকে বসে থাকবে?

খেতে খেতে মেজদা গণপতি বলে, দেহ রোগা লাগছে কেদারকাকা, ম্যালেরিয়া ধরেছিল নাকি?

হুঁ, ধরেছিল—

ঊর্ধ্বশ্বাসে খাচ্ছেন কেদারকাকা, খাওয়ার ঝঞ্চাট কোনক্রমে চুকিয়ে পুনশ্চ কাজে বসে যাবেন। কোঁৎ করে মুখের দলাটা গিলে নিয়ে বললেন, ম্যালেরিয়া টিয়া নয়, ধরেছিল কবিরাজে। গিরিশ কবিরাজ ধরে-পেড়ে ডোঙার উপর তুলে একেবারে খপ্পরে নিয়ে ফেলেছিল। পুরো চিকিচ্ছে না করে ছাড়াছাড়ি নেই। ভাত বন্ধ। অমন চিকিচ্ছেয় চলে আমার! ফাঁক পেয়েছি তো লম্বা। তবু তো দেরি হয়ে গেল। আগেভাগে সুন্দরী এসে কেউটেসাপের মতন ফোঁস-ফোঁস করে বেড়াচ্ছে। ঝগড়ার জুড়ি পাচ্ছে না।

বড়দা সুরপতি বলল, পালানো ঠিক হয় নি কেদারকাকা। রোগপীড়ে হেলার জিনিস নয়। চেহারায় তোমার আগের লালিত্য দেখছি নে।

হি-হি করে হাসেন কেদারকাকা: ত্র্যক্ষ জ্বর। কবিরাজ বলে, সাথেসঙ্গে নাকি আরও অনেকে আছেন। একগাদা নাম গড়গড় করে মুখস্থের মতো বলে যায়। তার মানে, শুইয়ে ফেলে মনের সুখে লম্বা চিকিচ্ছে চালাবে। ধাপ্পায় আমি ভুলি!

খাওয়া সেরে আবার গিয়ে বসেন—মেলগাড়ির বেগে হাত ছুটেছে। পান চিবোতে চিবোতে উঠান পেরিয়ে যাবার সময় জেঠামশায় বললেন, শোও গিয়ে এবারে। বাকি যা থাকে, সকালবেলা হবে।

কেদারকাকা বলেন, সকালে আরও কত কাজ। নারকেল-কোরানো ভিয়েন করা। বেশি আর বাকি নেই, এক্ষুনি হয়ে যাবে। সেরেসুরে একপিঠে হয়ে শোব।

বড়দা মেজদা সন্ধ্যে থেকে তাসে বসেছিল। চক্ষুলজ্জায় এবারে একটু না এসে পারে না। হাঁক দিয়ে পবনকে ডাকে: শুয়ে পড়লি নাকি রে পবন? তোকে কিছু করতে হবে না, চেয়েচিন্তে দুখানা কাটারি এনে দে। দু-পাঁচটা নারকেল আমরাও ছুলে দিই।

কেদারকাকা আপত্তি করে বলেন, তোমরা কেন আবার। কাউকে লাগবে না, আর তো হয়ে এসেছে।

ঠাকুরমা ঘুমিয়ে গেছেন, এই জানতাম। কান পেতে ছিলেন বুড়ি, কেদারকাকার সুরে সুর মিলিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন: তোমরা কেন আবার!

আমার বাবা যখন এসে গেছে কাউকে লাগবে না। একাই সে শেষ করে দেবে। ঠাণ্ডা লাগাস নে, শুয়ে পড়গে তোরা।

না শুয়ে কাজও তো নেই। পাড়া ঘুমোচ্ছে, পবন ফিরে এলো। কাটারি সংগ্রহ হয়নি। এ-বাড়িও নিঃসাড়, ছোবড়া ছাড়ানোর ক্ষীণ আওয়াজ কেবল উঠোনে।

খুড়তুতো জেঠতুতো সমবয়সি তিন ভাই আমরা এক খাটে। সকালবেলা নারকেল ভাঙবে, ভিয়ান করবে—মজা বাধবে তখন। উৎসাহে চোখের ঘুম ঝরে গেছে। নারকেলের পর নারকেল ছুলে কেদারকাকা ঝুড়িতে ফেলে যাচ্ছেন। ছোবড়া পর্বতাকার।

পিছন দিয়ে চুপিসারে এসে ফুঁ দিয়ে টেমি নিভিয়ে দিলেন—কে আবার, সুন্দরীপিসি। তিনিও দেখছি ঘুমোন নি। কেদার-কাকা তাকিয়ে দেখে বললেন, আলো নেই তো কি—অন্ধকারেরও আমার হাত চলে। চেয়ে দেখ।

দেখবার জন্য পিসি সেখানে নেই, লহমায় অদৃশ্য। ক্ষণ পরে তিনি তামাক সেজে এনে ধরলেন। সুন্দরী ঠাকরুনের এ হেন সুমতি, কেদারকাকা মুহূর্তকাল অবাক হয়ে রইলেন। সাজা-তামাক এবং বাড়া-ভাত নিতান্ত গাড়োল ছাড়া কেউ ছাড়ে না—কাজে বিরতি দিয়ে হুঁকোটা হাতে ধরেছেন, আর কাটারি তুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পিসির পৃষ্ঠপ্রদর্শন। হেলতে দুলতে ঘরে চলেছেন—কিছুই হয়নি যেন। হঠাৎ একবার হতভম্ব কেদারকাকার দিকে মুখ ফিরিয়ে ফিক করে হেসে ফেললেন। পিসির দাবরাবে সকলে সশঙ্ক, তাঁর ভিতরেও রঙ্গরস আছে নিশিরাত্রে জানলা দিয়ে দেখে ফেললাম।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আনন্দরসে মন টইটম্বুর : মনের সাধে ফোঁপল খাবো, ভিয়েনের গরম গরম সন্দেশ খাবো। গরীব গাঁয়ে আমরা ছানার-সন্দেশ তেমন বুঝিনে, গুড়-চিনি আর নারকেলে মিশাল করে আমাদের সন্দেশ। উণান-জোড়া মাচা লাউগাছ কুমড়োগাছ ঝিঙে-বরবটিগাছে ভরভরতি। গোবরমাটি দিয়ে নিচেটা পরিপাটি করে নিকানো—বেশ কেমন ঘর-ঘর লাগে। একপাশে বাইরের উনুন, মাচারও বাইরে—আগুনের আঁচে গাছগাছালির ক্ষতি না হয়। ফ্যানসা-ভাত উনুনে টগবগ করে ফুটছিল, থালায় থালায় মা ভাত ঢেলে দিলেন। বীচেকলা-ভাতে এক এক দলা তার উপরে। ভাঁটিয়াল-চালের মিষ্টি ভাত—লোহার কড়াইয়ে রান্না হয়ে সবুজের আভা ধরেছে। ভাত এতে আরও মিষ্টি হয়েছে যেন। গোল হয়ে সব বসেছি, হাপুস-হুপুস করে খাচ্ছি। কেদারকাকা এবং আরও দু-একটি বয়স্ক মানুষ বসেছেন, পিঁড়ি তাঁদের জন্যে। কেদারকাকার জন্য আরও বিশেষ খাতির—

উনুনের গায়ে সর-বাটা ঘিয়ের বোতল, ঘি একটু নরম হলেই ভাতের উপর খানিকটা ঢেলে দেওয়া হল।

কেদারকাকা হাঁ-হাঁ করে হাত ঢাকা দেন : আরে দূর, ঘি ঢালেন কেন? বাড়ির জামাই নাকি আমি।

হতে পারতিস তো তাই। বাঙাবউর বড় ইচ্ছে ছিল। কপালে নেই কী হবে।—ঠাকুরমা মাচার নিচে ঝিঙে তুলে তুলে বেড়াচ্ছিলেন, নিশ্বাস ফেলে তিনি বলে উঠলেন।

ফ্যানসা ভাত খেয়ে তামাকের পুরো ছিলিম নিঃশেষ করে এইবারে ফের কাজে বসবেন—বাগড়া পড়ে গেল। কেদারকাকা এসে গেছেন—খবরটা পাড়ায় চাউর হয়ে গেছে, এ সুযোগ কেউ ছাড়বে না। জাতকুমড়ো ঘাড়ে পিলপিল করে আসছে গিন্নিরা বউরা মেয়েরা—এ-বড়ির ও-বাড়ির সে-বাড়ির।

জাতকুমড়ো কাটার লোক আখচার মেলে না। মহাষ্টমী পুজোয় ছাগল বলি দেয়, জাতকুমড়োও বলি দিতে হয় সেই সঙ্গে। কুমড়োর ভিতরে খোল করে চুন-হলুদের গোলা ঢুকিয়ে রেখেছে, খোসার উপরে পিঠালির পুতুল—নরমূর্তি। ড্যাডাং করে পুতুলের উপর মেলতুনের কোপ—কুমড়ো দু-খণ্ড হয়ে পড়ল দু-দিকে, চুন-হলুদের গোলা গোলা গড়াল রক্তের মতন। পুরাকালে নরবলি হত, তার অনুকল্প। মানুষের বদলে জাতকুমড়ো। সেই কারণে জাতকুমড়ো দুই খণ্ড করতে কেউ চায় না—নরহত্যার পাপ হবে। খণ্ডিত হয়ে গেলে কোটায় রান্নায় তার পরে আর আপত্তির কারণ থাকে না। কেদারকাকা এই বাবদে সদাব্রত - সামনে এনে ধরলেই ঘ্যাচ করে কাটারির কোপ। ঐ থেকে নামই একটা হয়ে গেল কুমড়ো-কাটা কাকা। বুড়ো-আঙুল নেড়ে বেপরোয়া ভাবে কেদারকাকা বলেন, পাপ হল তো বয়েই গেল। পিছনে ছেলেপুলে নেই বউও নেই, কার উপর পাপের দায় বর্তাবে?

সুন্দরীপিসি কাছাকাছি থাকলে নিশ্চিত এই সময় করকর করে উঠবেন—তাঁর গায়ে যেন সেক লাগে। বলেন, ইটে নেই ভিটে নেই—কার মেয়ে অত সস্তা যে বাউণ্ডুলের হাতে দিতে যাবে! বুড়ো হয়ে গিয়েও বিয়ের দুঃখ যায় না, হায় রে কপাল!

কুমড়োর পর্ব শেষ করে নারকেল ভাঙা এবারে। মা পাথরের খোরা নিয়ে এলেন : নারকেলের জল সব ফেলে দিও না ঠাকুরপো, খানিকটা রেখো। পবন পই পই করে বলে গেছে।

ঝুনো-নারকেলের জল কোন কাজে লাগবে?

মা বললেন, রোদে তেতে পুড়ে এসে চোঁ-চোঁ করে মেরে দেবে, কচি নারকেল পাড়তে দিচ্ছে কে ওদের ? তা ছাড়া নারকেলজলে তেঁতুল গুলে অম্বল রেঁধে দেবো—খাসা লাগে, খেয়ে দেখো।

ছেলেপুলে আমরা হাতের মাথায় নারকেল এগিয়ে দিচ্ছি—কল বেরিয়েছে, ভিতরে ফোঁপল, সেইগুলো সর্বাগ্রে। ফোঁপল বাড়তি বস্তু, আমাদের প্রাপ্য—কাড়াকাড়ি করে খাব। মা কিন্তু এতেও বাধ সাধলেন। সব দিয়ে দিও না ঠাকুরপো। ফোঁপলের ডালনা রাঁধব, খেয়ে দেখো।

নারকেল কোরানো এবার। এক কুরুনিতে কত বেলা ধরে হবে! কষ্টের কাজ একলা একজনের সাধ্যও নয়। এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে কুরুনি চেয়ে এনেছে—চারখানা পড়ল পাশাপাশি। কেদার-কাকা তো আছেনই, জেঠাইমা ও বড়বউদি আছেন। মেজবউদির মাস ছয়েক মাত্র বিয়ে হয়েছে—একফোঁটা বালিকা, কুরুনি পেতে সে-ও ওদের পাশে বসে পড়ল।

ঠাকুরমা এক পাশে বসে মাটির পিদিম গড়ছেন। কালীপুজোর আগের দিন আজ ভূতচতুর্দশী—গৃহস্থ-বাড়ি ভূতমশায়দের আনাগোনা। চোদ্দ-পিদিম দিতে হবে—ঘরে উঠোনে গোলায় তুলসিতলায় পুকুর-ঘাটে—এবং একটি পিদিম বোধনতলায় অতি-অবশ্য। ভূতের সমাজে শ্রেষ্ঠ হলেন ব্রহ্মদৈত্য—তাঁদের একটি ঐ বোধনের বেলগাছে নাকি বসবাস করেন। পিদিম দেওয়া সন্ধ্যাবেলা, আর দুপুরে ভাতের সঙ্গে চোদ্দশাক খাওয়া। চোদ্দ রকম শাক এবং সেই সঙ্গে একটা ওলের পাতা—'চোদ্দশাকের মধ্যে ওল-পরামানিক' মেয়েলি শাস্ত্রের বিধান।

সুন্দরীপিসি শাক তুলতে বেরিয়েছিলেন, শাকের ঝুড়ি নিয়ে ফিরলেন। আঙুলের কর গুণে বিড় বিড় করে চোদ্দ রকম শাক মেলাচ্ছেন। জেঠাইমা বলেন, পরামাণিকটি আছেন তো ?

পিসি হাসেন না তো বড়—সেই আমি ফিক করে চপল হাসি হাসতে দেখলাম। কেদারকাকাকে দেখিয়ে হেসে বললেন, ঐ যে আর এক ওল-পরামাণিক। মেয়েমানুষের মাঝে তাদেরই একজন হয়ে শোভা করে আছে কেমন।

কেদারকাকার কোরানো নারকেল এই উঁচু হয়ে উঠেছে, এই কর্মেও তাঁর জুড়ি কেউ নেই। জেঠাইমা বললেন, মেয়েমানুষের কান কেটে নেয় ঠাকুরপো, আধাআধিও আমরা পৌঁছতে পারব না। ঠাকুরপো আর বলব না, আমাদের কেদার-ঠাকুরঝি। সত্যি সত্যি মেয়েমানুষ হলে না কেন তুমি ?

শাক নিয়ে সুন্দরীপিসি রান্নাঘরে ঢুকে গেছেন। কেদারকাকা বললেন, খাসা হত মেয়েমানুষ হলে। এর বাড়ি এক বছর ওর বাড়ি ছ'মাস— ভবঘুরে হয়ে হড্‌ড হড্‌ড করে বেড়াতে হত না, একটা জায়গায় এক বাড়িতে একজন মানুষের ঘাড়ে চেপে খেয়েপরে থাকতাম।

ছেলেমানুষ মেজবউ সুধায়ঃ কয় ছেলেমেয়ে তোমার কেদারকাকা?

ঢনঢন, ঢনঢন—বউই হল না তার ছেলে আর মেয়ে!

বড়বউদি হেসে উঠলেনঃ এঃ কেদার কাকা, লোকে পাঁচটা সাতটা বিয়ে করে—একটা বিয়েরও মুরোদ হল না সারাজন্মে!

কেদারকাকা চেপে চেপে নারকেল-কোরার দুধ গালছেন এবার। ঠাকুরমা বলে উঠলেন, ঐ সুন্দরীর সঙ্গে কথা উঠেছিল। রাঙাবউ বলতেন, মেয়ে পরঘরি করব না, ঘরজামাই হয়ে কেদার ছেলের মতন বাড়ি থাকবে। হলে ভাল হত—বিশ্বেসবাড়ি জঙ্গল হয়ে খসেগলে পড়ছে, দিব্যি একঘর গৃহস্থ হয়ে থাকত। হল না, ঝাঁপার চৌধুরিরা এসে একনজরে পছন্দ করে বসল। অমন ঘর-বর পেয়ে কেদারকে দিতে যাবে কেন?

কেদারকাকা বলেন, সে বর মাস চারেকের মধ্যেই পটল তুলল। চৌধুরিবাড়িও বছর পাঁচ-সাতের মধ্যে শ্মশান। হয়নি বিয়ে খুব রক্ষে হয়েছে—প্রাণ নিয়ে বেঁচেবর্তে বেড়াচ্ছি তবু।

নারিকেল-দুধ পুরো দুই গামলা হয়েছে। দুধ কিছু কমিয়ে নিলে সন্দেশ ভাল ওতরায়। মজা আমাদের—ভাতের সঙ্গে ঐ দুধ খাওয়া হবে আজ দুপুরবেলা। তরকারির সঙ্গে মিশাল হবে। বড়াও হতে পারে—নারকেল-দুধের বড়া খেতে বড় ভাল। লক্ষ্মীপূজোর আগে এই সমস্ত উপরি পাওনা আমাদের।

পরের দিন সকালে নিমন্ত্রণ করতে বেরুলাম। আমরা তিন ভাই, এবং 'সর্বঘটে নারায়ণ' কেদারকাকা তো আছেনই। আজামৌজা নিমন্ত্রণে হবে না, রীতিমতো বয়ান আছে, বার বার আবৃত্তি করে রপ্ত করে নিয়েছি আগে। আমার নিবেদন, সন্ধ্যেবেলা আমাদের বাড়ি লক্ষ্মীপূজো হবে। উপস্থিত অনুপস্থিত আত্মীয় কুটুম্ব সহ আপনারা সব পূজো দেখতে যাবেন, জলপান করবেন।

বাড়ির যিনি মাথা, তাঁর কাছে নিমন্ত্রণ করতে হবে (আমাদের বাড়িতেও জেঠামশায় নিমন্ত্রণ নেবার জন্য বাইরের তক্তাপোশে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছেন)। সেই তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মুখপানে তাকিয়ে আছেন—বলে যাচ্ছি, কান পেতে সতর্কভাবে শুনছেন। ছেলেমানুষ আমি থতমত খেয়ে যাই।

এক বাড়ি দৈবাৎ একটু ছাড় হয়ে গেল—আর যাবে কোথা! এইও, ওটা কি হল—ধমক দিয়ে উঠলেন: উপস্থিত-অনুপস্থিত জোড়া-কথা বাদ দিয়ে গেলি—এর পরে যদি কোন অতিথকুটুম্ব বাড়ি এসে পড়েন, তাঁর বেলা কি হবে? নেমন্তন্ন পেলেন না, সে মানুষ কেন যেতে যাবেন তোদের বাড়ি? আর কুটুম্বটিকে বাদ দিয়ে আমরাও কেউ যেতে পারব না। একটুকু 'অনুপস্থিত' কথার কত দাম বোঝ্ এবারে।

ফেরার সময় বিশ্বাসবাড়ির সামনে এসে পড়েছি। পোড়োবাড়ি, দালান-কোঠা ভেঙে চতুর্দিকে ইটের স্তূপ। ভাঁট-আশশ্যাওড়ার জঙ্গল, উঠোনে সাপ শিয়াল আর বুনোশুয়োরের আস্তানা। কেদারকাকা আঙুল দেখিয়ে বললেন, সুন্দরীদের বাড়ি এটা। আমিও থাকতাম। মনে হয় সেদিনের কথা। আহা-হা, বৈঁচিফল কত পেকে রয়েছে। তোরা সব অকর্মার ধাড়ি—আমরা যখন ছিলাম, ফল ভাল করে পাকতেই দিতাম না। খেতে খেতে হাটখোলা অবধি যেতাম। হাটখোলা ছাড়িয়ে বড়রাস্তা অবধি গিয়ে পড়তাম এক এক দিন। আর তোদের তো বাড়ির উপরে বললেই হয়। থোলো থোলো পাকাফল এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি।

অপমান হল। অকর্মা বলে মিথ্যা বদনাম—ওঁরা পারতেন আর আমরা যেন পারিনে! যান না চলে হাটখোলা অবধি, ঝোপেঝাপে পাকা বৈঁচি আছে কিনা দেখে আসুন।

পোড়োবাড়ির বৈঠকখানাটার এখনো কিছু ছাত রয়ে গেছে। ছাতটুকু জুড়ে কসাড় বৈঁচি-জঙ্গল—কেদারকাকা সেইদিকে দেখাচ্ছেন। ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললাম, সিঁড়ি ভেঙে পড়েছে—যাব কি করে ওখানে?

সিঁড়ি দিয়ে বুঝি চলাচল তোদের? আ আমার কপাল; সে তো মেয়েমানুষ আর বুড়োমানুষে যায়—

কেদারকাকা কেমন একটু ঘৃণার চোখে তাকালেন: সিঁড়ি থাকতেও আমরা তো কখনো ঝঞ্ঝাট করতে যেতাম না। আমগাছে উঠে ডালে ঝুল খেয়ে ছাতে লাফিয়ে পড়তাম। দেখবি চল।

হাতে কলমে কায়দাটা তখনই দেখাবেন। কিন্তু দু-পা গিয়ে থমকে গেলেন, গলা বিস্তর খাদে নেমে এলো শাঁকচুন্নি কাকে বলে জানিস? দেখেছিস কখনো?

পেত্নীর রকমফের শাঁকচুন্নি, কে না জানে। কেদারকাকা ফিসফিসিয়ে বললেন, না দেখে থাকিস তো দেখ ঐ উঠোনে তাকিয়ে।

শাঁকচুন্নি চোখে দেখিনি সত্যি, সে যে অবিকল এই বস্তু সংশয়মাত্র

নেই। ভর দুপুরে এই একগলা জঙ্গলের মধ্যে ঝাঁকড়া-চুল আলু-থালু কাপড়-চোপড় সুন্দরীপিসি একা-একা কোন্ সুখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তিনিই জানেন। কেদারকাকা হাত ধরে টানলেন: চলে আয় রে। দেখতে পেলে আমি তো যাবোই, তোরা সাথী হয়েছিলি—তোদেরও চিবিয়ে খাবে কচর-মচর করে। রেগে গেলে তখন আর মানুষ থাকে না।

রাগের চেহারা আমরাও সেবারে দেখেছি—এই পোড়োবাড়িতেই। পড়বি তো পড়, জেঠামশায়ের নজরে পড়ে গিয়েছিলেন পিসি। জেঠামশায় ধমকে উঠলেন: জঙ্গলে কী মেয়েমানুষের: জায়গাটা নিলাম হয়ে যাচ্ছিল, আমরা না কিনলে বাইরের কেউ কিনে পাড়ার ভিতরে চেপে বসত। সেই থেকে দেখছি, ভিটেয় এসে আঙুল মটকে মটকে শাপমন্যি দিয়ে যাও আমাদের। এবারে কাঁটা-তারে ঘিরে দেবো, সহজে যাতে ঢুকতে না হয়।

তখন একেবারে তুলকালাম কাণ্ড—সুর করে মরাকান্না জুড়ে দিলেন পিসি। মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন, বুকের উপর দমাদম কিল মারছেন। শেষটা মা এসে পড়ে বিস্তর কষ্টে ঠাণ্ডা করলেন।

এ জিনিষ দেখা আছে—বিনাবাক্যে অতএব আমরাও দৌড়চ্ছি কেদারকাকার পিছু পিছু। দৌড়াদৌড়ির মধ্যে প্রতিশ্রুতি কিন্তু ভোলেন নি। বললেন, পূজোর হাঙ্গামে বিকেলবেলাও তো হয়ে উঠবে না। ছাতের উপর বৈঁচিবনে কাল নিয়ে তুলব।

পুরুতঠাকুর মশায় আসেন অনেক দূর বড়েঙ্গা গ্রাম থেকে শালগ্রাম-শিলা হাতে নিয়ে। বিস্তর ঝামেলা। দেখেশুনে সতর্ক হয়ে পা ফেলতে হয়—ছোঁয়াছুঁয়ি না হয় কারো সঙ্গে, পথের অনাচার না লাগে। মুখে কথা বলা নিষেধ যতক্ষণ শালগ্রাম সঙ্গে রয়েছেন—কথার সঙ্গে থুতুর কণিকা বেরিয়ে পড়তে পারে। কেউ কিছু প্রশ্ন করলে আকারে ইঙ্গিতে জবাব দিচ্ছেন। সাপেও যদি কাটে, হাতের শালগ্রাম পরিপাটি স্থানে নামিয়ে রেখে তারপরে আর্তনাদ করবেন। ধর্মখেয়া পার হতে হয়, ঘাটে এসে দাঁড়িয়েই আছেন। মাঝি দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু দাওয়া ছেড়ে নামবে না। হুঁকোয় দম দিয়ে আয়েসে নাকে-মুখে ধোঁয়া ছাড়ছে। হাঁকডাক গালিগালাজ করতে পারছেন না ঠাকুরমশায়—অতএব ত্বরা নেই, যখন খুশি এসে বোঠে ধরবে।

বিস্তর যজমান, সন্ধ্যা না লাগতেই ঠাকুরমশায় পূজোয় লেগেছেন। এক এক বাড়ি হয়ে যাচ্ছে, ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্য বাড়ি ছুটছেন। নৈবেদ্য কাপড়চোপড় ইত্যাদি পাওনাগণ্ডা যজমানেরাই বেঁধেছেঁদে রাখবে, কাল সকালে উনি কুড়িয়ে বেড়াবেন। কোন বাড়ি আগে কোন বাড়ি পিছনে, বংশলতিকা দৃষ্টে ব্যবস্থা

করা আছে। আপনি ধনী লোক এবং আপনার বাড়ির আয়োজন গুরুতর, সে বিবেচনায় পূজো আগে হবার জো নেই।

আসনে বসেই, লক্ষ্মী নয়—একেবারে বিপরীত, অলক্ষ্মীর পূজো। কলার খোলার উপর পিটুলির সঙ্গে ঝুল-কালি মিশিয়ে কালিবরণ মূর্তি—অলক্ষ্মী তিনি। মিনিট দুয়েকে পূজো সারা, খোলা সমেত ঠাকরুনকে পুরুত বাঁ-হাতে ঠেলে পূজাস্থান থেকে সরিয়ে দিলেন। দুই দাদা এসে লুফে নিল সেই বস্তু। আর 'সর্বঘটে'র কেদারকাকা—কোনদিক দিয়ে ছুটে এসে পড়লেন তিনি: দে রে কুলো আমার হাতে দে। একজনে অলক্ষ্মীকে নেয়, পিছনে একজন ঢপা ঢপ করে কুলো বাজায়। কুলো বাজিয়ে বিদায় করা লাঞ্ছনা অপমানের ব্যাপার—আজ সন্ধ্যায় অলক্ষ্মীঠাকরুনকে পূজোর নামে বাড়ি আহ্বান করে এনে কুলো বাজিয়ে তাড়াচ্ছে। কথাও আছে বাজনার সঙ্গে: আপদবালাই বাড়ির ত্রিসীমানা ছেড়ে বিদায় হয়ে যাও। কক্ষনো আর এসো না। কিন্তু বেহায়া ঠাকরুনের মনে থাকে না, পূজোর লোভে ঠিক আবার আসবেন আগামী বছর।

এর পরে পূজো যেখানে, এ-বাড়ির কুলোর আওয়াজে তাদের মধ্যে ব্যস্ততা লেগেছে: কই গো, সারা হল তোমাদের? ঠাকুরমশায় এক্ষুনি তো এসে পড়বেন। এসে, আজকের দিনে, মোটেই আর দাঁড়াবেন না—গোছগাছ বাকি থাকলে তক্ষুনি অন্য বাড়ি গিয়ে বসে পড়বেন। এ-বাড়িতে তাহলে সকলের শেষে—সব বাড়ির পূজোআচ্চা চুকে যাবার পর।

কাল ছিল গোণাগণতি চোদ্দপিদ্দিম, আজকে দীপাবলীতে পিদ্দিমের লেখাজোখা নেই যে যদ্দুর পারো—বাড়িতে বাড়িতে পাল্লাপাল্লি। সন্ধ্যাবেলা গ্রাম আমাদের ইন্দ্রপুরী হয়েছিল। সামান্য পরেই তেল ফুরিয়ে নিভে গেছে সব, চারিদিকে অন্ধকার। অন্ধকার থমথম করছিল—জঙ্গলে পথে আবার এক-একটা আলো দেখা দিচ্ছে। নেমন্তন্নে বেরিয়েছে মানুষ।

তবে আর কি, আমরাও বেরুই। ঝাঁজশঙ্খের আওয়াজ আসছে এক একদিকে। অর্থাৎ পূজো সারা হয়নি, চলছে এখনো। নেমন্তন্ন অন্যত্র সারতে সারতে ঐসব জায়গায় পরে গেলেই হবে। সর্বশেষ অবশ্য মধ্যবাড়ি—দোতলা বাড়ি, আবাদ থেকে বছরখোরাকি ধান আসে, ধানী-মানী গৃহস্থ। পাতা পেতে লুচি খাওয়াবেন ওঁরা। লুচি, কুমড়োর ছক্কা, ছোলার ডাল, পেঁপের চাটনি—আর নারকেল-সন্দেশও হবে দু-চারটে। লুচি দু-রকমের। ঘিয়ের লুচি ভদ্রজনদের। অন্য যারা আছে তারাও তো ছাড়বে না—সদ্য ঘানি ভাঙিয়ে নারকেল-তেল বানিয়েছে, সেই তেলের লুচি তারা খাবে। ঘিয়ের লুচি

ফুরিয়ে গেলে তার পরে অবশ্য সমব্যবস্থা সকলের জন্ত।

দলপতি কেদারকাকা জেঠামশায়ের কাছে সবিস্তারে শুনে নিচ্ছেন, কোন্ কোন্ বাড়ি বাদ। পুজো ঠিকই হয়েছে, কিন্তু গ্রামসুদ্ধ জলপান খাওয়ানোর তাগত নেই। অতঃপর খোঁজ নিচ্ছেন, থলি সঙ্গে নিয়েছি কিনা সকলে। নিশ্চয়, নিশ্চয়—জলপানে যাচ্ছি আর থলি নেবো না। পেট তো একটুকু এক চামড়ার থলি, দু-বাড়ি চার-বাড়ি সারতে না সারতেই ভরভরতি হয়ে যায়—সে ক্ষেত্রে কাপড়ের থলিই আসল ভরসাস্থল। কিন্তু এতজনের অতগুলো থলিই বা মেলে কোথায়, বালিশের খোল খুলে এক একটা তাই নিয়ে নিলাম।

বাহিনী-সজ্জা সমাপ্ত, রওনা হয়ে পড়ব—কিন্তু ভাল কাজে নানান ফ্যাকড়া। সুন্দরীপিসি মায়ের সঙ্গে পুজোস্থানে আছেন, নিমন্ত্রিত লোকজন এইবারে আসতে থাকবে, তাদের জলপানের গোছগাছ হচ্ছিল। হঠাৎ তিনি বেরিয়ে এসে হামলা দিলেন: তুমি যাচ্ছ নাকি?

দলের অগ্রবর্তী কেদারকাকা, অতএব জবাব দেবার কিছু নেই। বিড় বিড় করে কেবল আমাদের শুনিয়ে বললেন, উঃ, মাথায় যেন জট নড়ে ওঠে! ঠিক সময়টিতে এসে পড়ল। ঝগড়ায় কান ঝালাপালা করবে।

সুন্দরীপিসি রায় দিলেন: যাওয়া হবে না, ঘরে এসো।

কেদারকাকা সদম্ভে বলেন, কেন, বিনি-নেমন্তন্নে যাচ্ছি নাকি? বান্দা সে পাত্তোর নয়। উপস্থিত অনুপস্থিত আত্মীয়কুটুম্ব খোলসা করে বলে গিয়েছে। কর্তামশায়ের কাছে সঠিক শুনে নিয়ে তবে বেরিয়েছি।

পিসি ধমক দিয়ে উঠলেন: এসো বলছি। জর হয়েছে তোমার, শুয়ে পড়োগে।

নির্ভীক কেদারকাকা ভ্রূকুটি করে করে বললেন, নাড়ি দেখা নেই, গায়ে হাতখানা ঠেকানো নয়, ধন্বন্তরী ঠাকরুন বলে দিচ্ছেন জর।

পিসি বললেন, তোমার চোখ-মুখ বলে দিচ্ছে জর এসেছে। কুলো পিটিয়ে অলক্ষ্মী তাড়ালে, তা আওয়াজই নেই—কুলোর গায়ে সুড়সুড়ি পড়ল যেন। তখনই বুঝেছি। আচ্ছা বেশ, দেখি তবে হাত ঠেকিয়ে, অন্যেরাও দেখুক।

দাওয়া থেকে তড়াক করে উঠানে পড়লেন। সত্যি সত্যি আসেন যে! আর দেরি করেন কেদারকাকা—বয়স তো পঞ্চাশের কাছে, কিন্তু লক্ষ্মীপুজোর জলপানের লোভে চোঁচা-দৌড়। এক দৌড়ে বাঁশবনে ঢুকে গেছেন। শিয়ালে দুষ্কর্ম করে রাখে বাঁশবনের ভিতর, পুজাস্থান থেকে এসে পিসি মরে গেলেও সেখানে যাবেন না। সম্পূর্ণ নিরাপদ স্থান অতএব। ঝাড়ের পর ঝাড়

চলেছে—ঘনান্ধকার। তার ভিতর দিয়ে অমনধারা দৌড় ছেলেপুলে আমরাও তো পেরে উঠিনে।

আমরা রাস্তা ধরে যাচ্ছি হেরিকেন নিয়ে। বিপদ এলাকা পার হয়ে কেদারকাকা দেখি মোড়ের মাথায় অপেক্ষায় রয়েছেন। আমাদেরই সালিশ মানলেন : দেখ দিকি, গার্জেন হয়ে বসেছে যেন আমার। জ্বর হয়েছে না কি হয়েছে, তাই নিয়ে ওর মাথাব্যথা কেন ?

সুন্দরীপিসি নাগাল পান নি, আমিই খপ করে গায়ে হাত দিলাম। হাত সরিয়ে নিই—সত্যিই তো জ্বর, গা পুড়ে যাচ্ছে।

কেদারকাকা অবহেলার সুরে বললেন, ত্র্যহ্যজ্বর—দুটো দিন বাদ দিয়ে তিন দিনের দিন আসে। আজকে সেই পালার দিন।

মেজদা বলল, ঠাণ্ডা পড়েছে বেশ আজ। ঠাণ্ডা লাগিও না কেদারকাকা, বাড়ি চলে যাও।

বৃষ্টি-বাদলা গরম-ঠাণ্ডা সমস্ত আমি লাগিয়ে থাকি। কিছু হয় না।

বিজয় বলল, ওষুধপত্তোর খাও না কেন কেদারকাকা ?

কোন্ দুঃখে ওষুধ খাব ? কাজকর্ম আটকায় না, কোন রকম ক্ষতি-লোকসান নেই। এ আমার পোষা জ্বর।

হেসে আবার বললেন, জাতসাপ থাকে এক-একজনের ভিটেয়—গৃহস্থের কোন ক্ষতি করে না, কাউকে কামড়ায় না। আমার জ্বরও তাই। বছরের উপর চলছে। দিব্যি সময় হিসেব করে আসে একপহর রাত কাটিয়ে—শুয়ে পড়বার সময় তখন। আবার রোদ উঠতে না উঠতে বিজ্বর। জ্বরে অসুবিধা ঘটাচ্ছে না তো আমিই বা কেন জ্বরের পিছনে লাগতে যাব ?

আগে তুমি কেডা—কেদার না ? কেদার এসে গেছ, একবারটি চোখে দেখলাম না—কুটুম্ব হয়ে এখন জলপানে এসেছ !

বাড়ি বাড়ি এমনি অনুযোগ, স্নেহভরা প্রশ্ন : কেদার তুমি গাঁয়ে এসেছ, তা আমাদের বাড়ি এলে না একদিন ! এতই পর আমরা ? কেদারকাকাও যথাযোগ্য উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন : শরীরগতিক ভাল ছিল না—আসতে দেরি করে ফেললাম। এসেই কাজের মধ্যে পড়ে গেছি, নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসত ছিল না। কাজকর্ম চুকে গেল, দেখাশুনো ঘোরাফেরা এইবার।

পাতার চিলতেয় করে প্রসাদ দিচ্চে। ছোলা-ভেজানো মুগ-ভেজানো কদমা-বাতাসা তালশাঁস আখ গুড়ের-সন্দেশ চিনির-সন্দেশ, বিশেষ বিশেষ বাড়িতে চন্দ্রপুলি ক্ষীরের-ছাঁচ, কদাচিৎ বা গঞ্জের হাটের গুলতি-রসগোল্লা। থলিতে নারকেল-সন্দেশ কদমা বাতাসা তুলে নিয়ে আর যা আছে একটু-আধটু

মুখে ছুঁইয়ে উঠে পড়লাম। এ বাড়ির নিমন্ত্রণ-রক্ষা হয়ে গেল। এরই মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে আবার কেদারকাকার ধমকানি: পেটে জায়গা রাখিস রে হতভাগারা। ছোলা-মুগে পেট ভরালি তো মধ্যবাড়ি গিয়ে কি করবি?

সকল বাড়ি সেরে অবশেষে মধ্যবাড়ি। থলি এই মোটা এখন, এবং দস্তুরমতো ভারী। কেদারকাকা প্রস্তাব করলেন: লাইনে বসিয়ে খাওয়াবে, থলি নিয়ে জুত পাবিনে। দেখতেও উৎকট। বাড়িতে রেখে আয় তোরা কেউ গিয়ে। আমি যাব না—ওত পেতে রয়েছে, আটক করবে। আমার থলিটাও নিয়ে যা। তক্তাপোশের নিচে হাত লম্বা করে রাখবি—কারো যাতে নজরে না আসে।

থলির সংগ্রহ হপ্তাখানেক ধরে খাওয়া চলবে। এ জিনিস একেবারে নিজস্ব, অন্য কারো দাবি চলবে না। ইচ্ছে হলে দান খয়রাত কিছু অবশ্য করতে পার। করতেও হবে তাই, নারকেলের জিনিষ দিন আষ্টেকের বেশি হলে ছাতা ধরে অখাদ্য হয়ে যাবে।

মধ্যবাড়ি সেরে কেদারকাকার আবার নতুন মতলব চাঙ্গা দিয়ে উঠেছে। মিন-মিন করে ভূমিকা করছেন: আসলে আজ কালীপূজো—লক্ষ্মীর পূজোটা ফাউ। বাজুবন্দের সঙ্গে মুদো ঝোলে যেমন। আসল পূজো চোখে দেখব না, সে কেমন করে হয়!

কালীপূজো কেউ তো করছে না—

কেদারকাকা বললেন, এ গাঁয়ে না করুক ভিন গাঁযে তো করেছে। বাঁটবিলায় করেছে—কান পেতে মনোযোগ করে শোন্, বাজনাও একটু একটু শুনবি। কতটুকু বা পথ—গোটা দুই বিল আর খানতিনেক গ্রাম পাড়ি দিলেই পৌঁছে গেলাম।

ফিসফিসিয়ে উপদেশ দেন: ভালমানুষ হয়ে শুয়ে পড়গে যা। সময় বুঝে দুয়োরে টোকা দেবো। সজাগ থাকিস, টিপি টিপি বেরিয়ে আসবি।

একটা সমস্যা থেকে যায়, আমায় দেখিয়ে বিজয় বলল, বজ্রাঁটুল যে সব—নোনাখালির খাল পেরুবে কেমন করে? ডুব-জল হবে এদের।

কেদারকাকা অভয় দিয়ে বললেন, আমি নিয়ে যাচ্ছি, আমার উপর সকল দায় ছেড়ে দে তোরা। এক এক ফোঁটা বালক—কাঁধে নিয়ে ওদের পারে তুলে দিয়ে আসব।

গায়ে জর ধাঁ-ধাঁ করছে, রাত দুপুরে জলের মধ্যে অত ঘোরাঘুরি ঠিক হবে কেদারকাকা?

কেদারকাকা অগ্নিশর্মা একেবারে: তকরার করিবেনে। জর আছে

আমায় আছে, তোদের মাথায় কী ঘোল ঢালা যায় রে? ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তে বললাম, তাই যা এক্ষুনি।

গুড়গুড় করে ঘরে ঘরে চলে যাই। খুড়তুতো জেঠতুতো তিন ভাই যথারীতি আমরা এক বিছানায়। কখন টোকা পড়ে—উদ্বেগে ঘুম আসে না। এপাশ-ওপাশ করি। তারপরে কখন একসময় ঘুমিয়ে গেছি—এক ঘুমে রাত কাবার। ঘুম ভাঙল তখন রোদ উঠে গেছে চারদিকে।

কেদারকাকা দেখি থমথমে মুখে পায়চারি করছেন। চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করি: জ্বর বেড়েছিল নাকি?

কেদারকাকা আগুন হয়ে বললেন, জ্বর জ্বর সকলের বুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুলি কপচে জব্দ করা আমায়।

তবে ডাকলে না কেন? জেগেই তো ছিলাম আমরা।

কেদারকাকা বললেন, বাইরে থেকে দরজায় শিকল আটকে দিয়েছিল।

কে শিকল দিল?

অন্দরের দিকটায় চোখ পাকিয়ে কেদারকাকা বলতে লাগলেন, আবার কে? যার বাপের ভাত খেয়েছিলাম কোনো এককালে। চিরজন্ম ধরে শোধ তুলছে। কিন্তু আর নয়, এসপার-ওসপার হয়ে যাবে। আজকেই।

তবু সেদিন কিছু নয় তড়পানি সত্ত্বেও। সুন্দরীপিসি ও কেদারকাকা সামনাসামনি হলেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। ধুন্দুমার পরের দিন। গরুর-গাড়ি এসেছে, সুন্দরীপিসিকে ঝাঁপায় নিয়ে যাবে। কেদারকাকাও যাবেন, চালের বাতা থেকে জুতো নিয়ে ভিজে ন্যাকড়ায় ঘষে চকচকে করলেন, ফিতের গেরো দিয়ে নিলেন। তক্তাপোশের নিচের থলিটা কোথা—নারকেল-সন্দেশে ভরা সেই থলি? সুঁচ নয় যে কোন একদিকে পড়ে আছে, নজরে আসছে না! গেল কোথা আমার থলি? কোন্ চোর নিয়ে নিয়েছে?

বাড়ি তোলপাড়। মা আমাদের জনে জনের কাছে শুধান: নিয়েছিস তোরা কেউ?

সাদা থানকাপড়-পরা বগলে বোঁচকা সুন্দরীপিসি গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন। এগিয়ে কেদারকাকার সামনাসামনি হয়ে বললেন, আমি নিয়েছি।

এনে দাও।

খেয়ে ফেলেছি সব সন্দেশ।

শুদ্ধাচারী বিধবা মানুষ বাড়ি বাড়ি কুড়ানো সন্দেশ খাবেন, এটা অবিশ্বাস্য। তাছাড়া একটা দিনের মধ্যে অত সন্দেশ খাবেনই বা কি করে!

মিছে কথা বলছ। এনে দাও আমার জিনিস, ভালর তরে বলছি।

ফিরে গিয়ে পিসি শূন্য থলিটা এনে কেদারকাকার গায়ে ছুঁড়ে দিলেন।

বোমার মতো ফেটে পড়লেন কেদারকাকা : কেন নেবে আমার জিনিস, কী সম্পর্ক তোমার সঙ্গে ?

অচঞ্চল কণ্ঠে পিসি বলেন, সম্পর্ক আছে তাই বলেছি কখনো ?

একটু থেমে আবার বলেন : জরের উপরে ছাইভস্ম ঐ সব গিললে নির্ঘাৎ মরণ ! একটা মানুষ ইচ্ছে করে মরছে - দেখি কেমন করে চোখের উপর ?

জবাব দিতে গিয়ে সামলে নিলেন কেদারকাকা। মা জেঠাইমার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, বউঠানেরা শোন। মাতব্বর ঠাকরুন বারদিগর যদি লক্ষ্মীপূজোয় আসে, আমি আসব না। সাফ কথা বলে দিচ্ছি। কোনো কাজ তাহলে আমার আশায় ফেলে রেখো না, সময় মতন ব্যবস্থা করে নিও।

জেঠাইমা বললেন, আচ্ছা আচ্ছা—

ছাতার মাথায় জুতোজোড়া ঝুলিয়ে কাঁধে ফেলে কেদারকাকা গজর-গজর করতে করতে দক্ষিণের পথ ধরলেন। দিগ্ ব্যাপ্ত ধানবন অদূরে, তার পরেই বিশাল জলা।

সুন্দরীপিসি বলছেন, আমারও ঠিক সেই কথা। তোমাদের পাতানো-ঠাকুরপো যদি আসে, আমি আর আসব না বলে দিচ্ছি। দু'জনের একজন— যাবার আগে ঠিক করে বলে দাও। গজ-কচ্ছপের লড়াইয়ে আর দরকার নেই, লোকেও ভাল দেখে না।

জেঠাইমা আগেকার মতোই বললেন, আচ্ছা—

পিসি গরুর গাড়িতে উঠে বসলেন। ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে গাড়ি উত্তরমুখো ঝাঁপার পথে চলল।

গিন্নি-বউরা সব গাড়ির কাছে এসেছেন। মেজবউদি নিতান্ত ছেলেমানুষ— চেঁচামেচি ঝগড়াঝাটিতে বিষম ঘাবড়ে গেছে সে। মা হেসে বললেন, কি হয়েছে মেজবউমা, মুখ আঁধার করে আছ কেন ? ফী বছর হয়ে থাকে, দিব্যিদিশেলা কত হয় এমনি। বলে যায়, আসব না। দু জনাই আসবে ঠিক, দেখো।

বরাবর তাই হয়ে এসেছে, কিন্তু মায়ের কথা পরের বছর খাটল না। সুন্দরীপিসির গরুর-গাড়ি যথাসময়ে এসে পৌঁছল। এবং নেমেই বরাবরকার প্রশ্ন : কেদার আসেনি তো ? মরেছে ঠিক অলপ্পেয়ে—

মুখে আঁচল দিয়ে মা বললেন, সত্যি সত্যি তাই হল ঠাকুরঝি। ঠাকুরপো

নেই। খবর শুনে ভাসুরঠাকুর নিজে বাগদা চলে গিয়েছিলেন।

বজ্রাহতের মতন পিসি দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর পুজোর বার্ষিক বরাদ্দ মুগ-ছোলা ও আখ নামিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে ঘরে চলে গেলেন। চারদিন ছিলেন—কাজেকর্মে নেই, শুয়ে বসে ঘরের ভিতর কাটিয়ে দিলেন। তারপর থেকে পিসি আর লক্ষ্মীপুজোয় আসেন না।

একদা ছিলেন

দেড় যুগ পরে কলকাতায়। আচমকা কিষণলালকে দেখলাম। শহর বদলেছে, কিন্তু কিষণলাল যেমন-কে-তেমন। কলেজে পড়ার সময়েও এই ছিল।

ট্যাক্সি ছেড়ে একছুটে গিয়ে ধরে ফেললাম: কোথায় থাকিস এখন তুই? কি করিস?

তুই যা করিস, তাই। বিজনেস। খবর রাখি সব। তোর হল সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেণ্টস। আমার হোটেল। এ-ও বেশ ভাল।

সগর্বে ছাপা-কার্ড বের করে দিল। হোটেল-ডি-প্যারী। ওল্ড বালিগঞ্জে মোদিপার্ক আছে কোথায়, সেই ঠিকানা।

কোথায় উঠেছি, ক'দিন থাকব—ইত্যাদি জবাব নিয়ে কিষণলাল চুক চুক করে: আমার হোটেল থাকতে গ্রেট-ইস্টার্নে কেন উঠতে গেলি? জানবি কেমন করে, সে অবিশ্যি একটা কথা। এখন তো জানলি, থেকে যা কয়েকটা দিন।

কিষণলালের হাত এড়ানো অসাধ্য, সে আমলেও দেখতাম। বলল, কয়েকটা দিন না হোক, একটা দিন। আচ্ছা, একটা বেলা? ঘাড় নাড়লে ঘাড় মুচকে ভেঙে দেবো। ডিনারের নেমন্তন্ন—কাল সন্ধ্যায়। বড়লোক হয়েছিস তুই—সমস্ত জানি। তা হোটেল-ডি-প্যারীও নিতান্ত ফেলনা নয়। মিনিস্টার থাকেন, স্টার থাকেন, রাজা থাকেন—

কিন্তু মালিকের চালচলন ও সাজ-পোশাক দেখে এত সমস্ত বৃহৎ কাণ্ড বিশ্বাস হতে চায় না। কিষণলাল এবার নামওয়ারি পরিচয় দিচ্ছে: মিনিস্টার পশুপতি সামন্ত, তোরই তো বস ছিল রে—মনে পড়ছে না?

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি: জন্তুপতি? তোর হোটেলে আছেন তিনি?

দোর্দণ্ডপ্রতাপ মানুষটি—করিডরে পায়চারি করতেন, পদদাপে রাইটার্স বিল্ডিংএর ভিত অবধি কাঁপত। তবু পুরো নন আধাও নন, সিকি-মিনিস্টার। ডেপুটি মিনিস্টার। চাকরিতে আমি তখন নতুন ঢুকেছি, উপরওয়ালার কাছে হাত কচলে পদোন্নতির চেষ্টায় আছি। উন্নতি কেউ যদি দিতে পারেন, সে পশুপতি। তৃণজ্ঞান করেন না কাউকে। আমারই দেখা এক ঘটনা। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বিস্তর খেটেখুটে পুলের নকশা বানিয়ে এনেছেন, দৃষ্টি মাত্রেই পশুপতি কিছু হয়নি কিছু হয়নি করতে করতে খচাখচ পেন্সিলে ঢেরা কেটে দিলেন। হুকুম হলঃ নতুন করে বানিয়ে আনুন। 'ইয়েস সার' বলে ইঞ্জিনিয়ার ঘাড় নেড়ে বেরুলেন! বাইরে এসে ফেটে পড়লেনঃ চেয়ারের গুণ—নাম সই করতে তো কলম ভাঙে, চেয়ারে বসলেই সর্ববিদ্যা-বিশারদ। আমার কি! মাইনে খাচ্ছি—যতবার বলবে, ততবার করব। বানের জলে পুরানো-পুল ভাসিয়ে নিয়ে যাক না—আমার কি!

প্রতিকার নেই, চীফ মিনিস্টারের কাছে বললেও চেপে যাবেন তিনি, যেহেতু পাক্কা তিন ডজন এম-এল-এ পকেটে নিয়ে ঘোরেন পশুপতি—ইলেকসন জিতিয়ে আনা থেকে তাদের অশন-বসন বসবাসের যাবতীয় দায়ঝক্কি তাঁর। পশুপতি চটলে মুহূর্তমাত্রে গণেশ উলটে দেবেন। অন্তরালে বলাবলি হতঃ এম-এল-এ কে বলে ঐ ক'টাকে? পশুপতি জন্তু পুষেছেন—তিন ডজন গরু-ভেড়া-ছাগল। সেই সুবাদে পশুপতি স্থলে প্রাঞ্জল বাংলায় জন্তুপতি তাঁর নাম দিয়েছিল।

এ হেন মিনিস্টার থাকেন নাকি হোটেল-ডি-প্যারীতে!

স্টারও থাকেন—কিষণলাল সগর্বে বলল। স্টুডিও-য় নিয়ে গিয়ে সেই যে সেবার মধুমালতীকে দেখলাম—মনে পড়ছে না?

ওরে বাবা, বলে কি! সর্ব অঙ্গে শিহরণ আমার।

'পদ্মিনী' ছবি তোলা হচ্ছে তখন। প্রোডিউসার বলবন্ত কাপুর, হিরোইন মধুমালতী। এই কিষণলাল প্রোডাকসন-অ্যাসিস্টান্ট হয়ে কাজ করছে।

আমায় বলল, অফিস পালিয়ে পারিস তো স্টুডিও-য় চলে আয়। মধুমালতীকে দেখাব।

মধুমালতী দর্শন বাবদে অফিস পালানো কোন ছার—এভারেস্টে উঠতে পারি, উত্তরমেরুতে গিয়েও হাজির হতে পারি।

কখন যাবো?

খুব খানিকটা আগে গিয়ে কি হবে? নিত্যিদিন মধুমালতী দেরি করে

আসে। বলবন্ত কাপুর, জানিস তো, কোটিপতি লোক—হাতে ধরে সেই লোক বলে দিয়েছে, আজকের দিনটা অন্তত হিরোইন সময় মতো আসে যেন। দিব্যি করে গেছে মালতী, ন'টা বাজতে বাজতে পৌঁছে যাবে। কিন্তু তবু বাদ-সাদ দেওয়া ভাল।

বিড়বিড় করে কিষণলাল কী একটু হিসাব করল। বলে, বারোটা নাগাদ আসিস তুই। হিরোইনের মোক্ষম অ্যাকটিং সেই সময়টা।

কাজেকর্মে আরও কিছু দেরি হয়ে গেল, পৌঁছুতে প্রায় একটা। এসে দেখি, কাকস্য পরিবেদনা! রং মেপে পোশাকআশাক পরে আর্টিস্টরা আড্ডা জমাচ্ছে, বিড়ি-সিগারেট ফুঁকছে, দরবারের বিশাল সেটে ঈষৎ পরিমাণে দিবানিদ্রাও সারছে কেউ কেউ। সাউণ্ড-ক্যামেরা-লাইট সকলে তৈরি। পাত্তা নেই শুধু হিরোইনের। কাপুরের টাক-মাথায় অল্প কয়েকটি চুল—ক্রোধবশে তা-ও বোধকরি ছিঁড়ে শেষ করবেন। বলছেন, সন্ধ্যার ফ্লাইটে হিরো বম্বে পাড়ি দিচ্ছে। এত করে বললাম—কথা দিল, কালীর নামে দিব্যি করল। দেবতা-গোঁসাই বলেও তো মাগী কেয়ার করে না।

পরক্ষণে এদিক-ওদিক তাকিয়ে সভয়ে বললেন, বড্ড আলগা মুখ আমার। ঘুণাক্ষরে এসব কেউ মুখের আগায় আনবেন না। বাপ্পা সেই আটটা থেকে ধন্না দিয়ে আছে, এতক্ষণের মধ্যে একটা খবর পর্যন্ত দিল না। ফ্যানেদের প্রেম-নিবেদনের ঠেলায় নাকি বাড়িতে ফোন রাখার জো নেই—তা ক্যামাক-স্ট্রীটের যত ফোন সমস্ত কেটে দিয়ে গেছে, এমন তো শুনিনি।

সামান্য পরেই ক্রিং ক্রিং। কাপুর লম্ফ দিয়ে পড়ে রিসিভার ধরলেন: তোর আক্কেলটা কী বাপ্পা, গোটা ইউনিট হাঁ করে রয়েছে—অ্যাঁ, কি বললি? কী করি আমি এখন? জলে ঝাঁপ দিই, না গাড়ি-চাপা পড়ি?

সকলে ব্যাকুল হয়ে শুধাচ্ছে: হল কি কাপুর সাহেব?

ফোনের মুখে কাপুর বলে যাচ্ছেন, বসেই যখন গেছেন সাঙ্গ হতে দে। তারপরে আর একটা সেকেণ্ডও যেন দেরি না হয়।

ফোন ছেড়ে কৌতূহলীদের বলছেন, লাঞ্চ খাচ্ছে। স্টুডিও-র ভোজনে নাকি জুত হয় না। বিলিতি হোটেলের খানা আনিয়ে দিই, তার উপরে দই-রাবড়ি মিষ্টিমিঠাই, তার উপরে যত রকম ফল মার্কেটে মেলে। তবু নাকি পেট ভরে না। ফিতে নিয়ে একদিন পেটের খোলে কত জায়গা, মেপে জুপে দেখব।

ম্যানেজার কুলপতি মুৎসুদ্দিকে বললেন, বাপ্পাকে পাঠানো ভুল হয়েছে। ছাগলে যদি চাষ হত, লোকে গরু কিনতে যেত না। আপনি যান চলে। সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে ইদিকে, হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে আসুন।

ট্যাক্সি নিয়ে কুলপতি ছুটলেন। কাপুর স্থির থাকতে পারেন না—সদর রাস্তা অবধি চলে যান এক একবার, ফিরে আসেন: কী খাওয়া রে বাবা! গোটা হিমালয় চিবিয়ে খাওয়া যায় এতক্ষণে।

কুলপতির ফোন এলো: লাঞ্চ সেরে একটু গড়িয়ে নিচ্ছেন। সেটের উপরে হাই উঠবে, এক ধার দিয়ে এন-জি হতে থাকবে, সে বড় বিশ্রী। আর্টিস্টেরও বদনাম।

হিরো ক্ষেপে গেলেন শুনে: মধুমালতীই সব, আমরা কেউ কিছু নই। পাঁচটা বাজলেই গোঁফ-চুল ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ব, একটা মিনিটও বাড়তি নয়। শুধু হিরোইন নিয়ে শুটিং করবেন তখন।

কাপুরের গাড়ি নিয়ে খোদ ডিরেক্টরই সাঁ করে বেরিয়ে গেলেন। আরও আধ ঘণ্টা—ঘুম থেকে টেনে তুলে মধুমালতী সহ এসে পড়লেন স্টুডিও-য়। লোকজন চক্ষের পলকে চাঙ্গা। উল্লাসের জোয়ার। চতুর্দিকে ছুটোছুটি পড়ে গেছে।

কিন্তু যাঁকে ঘিরে এত কাণ্ড, স্থির অবিচল তিনি। নরলোকের পানে একটি বারও তাকালেন না, বটগাছের শীর্ষদেশে দৃষ্টি নিবদ্ধ। চিতোরলক্ষ্মী গাছের মধ্যে কী পেয়ে গেলেন, ভেবে পাইনে।

মালুম হল অনতিপরে। কাপুরের দিকে চেয়ে গদগদ কণ্ঠে বলে উঠলেন, ডালের ফাঁকে সূর্য লুকিয়ে যাচ্ছে—কী সুন্দর দেখুন।

কাপুর মুখ ফিরিয়ে ছিলেন, নিসর্গ-দৃশ্যে তাঁর কেমন মুখভাব হল, ঠাহর করতে পারিনি।

মধুমালতী বললেন, বেলা শেষ হয়ে এলো—কাজ হবে আর কেমন করে? মুডও নেই আজ। প্যাক আপ।

নমস্কার সেরে অলস-গমনে মধুমালতী গাড়ির দিকে চললেন।

এত তড়পাচ্ছিলেন, এখন কিন্তু কথাটি নেই কাপুরের মুখে। দুধাল গাইয়ের লাথি নির্বাকভাবে খেতে হয়। এ গাভী অতিশয় দুগ্ধবতী। মধুমালতী ঠোঁট নেড়েছেন—এক নাগাড়ে ছ'টি মাস অন্তত সে-ছবি হাউস-ফুল নেবে।

মালিক নির্বাক, কিন্তু কিষণলাল থাকতে পারে নি। কথাবার্তা আমার সঙ্গে হচ্ছিল। বলল, কমসে-কম একটি হাজার গলে জল।

বলেছে আস্তে আস্তে। আর ঠাকরুনের কানও চুলের বোঝার তলে ঢাকা। সে কান কত লম্বা না-জানি, কথাগুলো ঠিক ঠিক তিনি ধরে নিয়েছেন। থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, মধুমালতীকে নিতে অমন বিস্তর

হাজার গলে যায়। সবাই জানে। যারা তা পারে, তারাই শুধু কন্ট্রাক্ট করতে যায়।

কাপুর এইবারে খেঁকিয়ে উঠলেন—মধুমালতীকে নয়, কিষণলালের উপর : গিয়ে থাকে আমার টাকা গেছে। তোমাদের মাথায় কী ঘোল-ঢালা যাচ্ছে শুনি ? যাও, ফোড়ন কাটতে হবে না এখানে দাঁড়িয়ে।

সেই মধুমালতীর এখন নাকি কিষণলালে স্থিতি !

আরও আছেন। রাজা বাহাদুর কনকনারায়ণ।

করেছে কি কিষণলালটা—অষ্টবজ্র-সম্মেলন জমিয়েছে হোটেল-ডি-প্যারীতে ! কলকাতা শহরে রাজপথের উপর আমাদের কথোপকথন—একটা আয়না পেলে বড্ড ভাল হত। চোখের মণি বিস্ময়ে নির্ঘাৎ মিঠেকুমড়োর সাইজে এসে গেছে—আয়নায় বস্তুটা দেখে নিতাম।

কলেজে পড়তাম আধা-শহর জায়গায়—এই রাজাদের প্রতিষ্ঠিত কলেজে, রাজবাড়ির কম্পাউণ্ডের ভিতর। রাজবাড়ি এক পেল্লায় ব্যাপার, কম্পাউণ্ডে চক্কোর মেরে আসতে পুরো বেলা কেটে যায়। পিলখানায় হাতি, আস্তাবলে ঘোড়া গাঙের ঘাটে চিত্র-বিচিত্র বজরা। দিবারাত্র চারিদিক গম গম করে। এমনি রাজার নানান অখ্যাতি—কিন্তু মেজাজটা দিলদরিয়া। আমার নিজেরই ব্যাপার। বাবা মারা যাবার পর মাইনে আর হস্টেলচার্জে তিন-শ টাকার মতো বাকি পড়েছে, পড়াশুনোয় ইস্তফা দেবার গতিক। কনকনারায়ণের কাছে গেছে : সে কী কথা, সামান্য টাকার জন্যে ছেলেটার পড়া বন্ধ হবে ! কলেজের প্রাপ্য শোধ করে দিলেন, এবং ভবিষ্যতের জন্যে একটা বৃত্তি মঞ্জুর হয়ে গেল। অথচ আমি নিজে কিছুই বলতে যাই নি—প্রিন্সিপাল না দেওয়ানজী, রাজকর্ণে খবরটা কে তুলেছিলেন, আজও বলতে পারব না।

রাজার রাজ্য গবর্নমেণ্টে নিয়ে নিল। রুড়কিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি—বৃত্তান্তটা লোকমুখে শুনেছি, স্বচক্ষে দেখিনি। কনকনারায়ণ সবে খেতে বসেছেন তখন। রাজবদনে অন্ন ওঠা চাট্টিখানি কথা নয়, গৌরচন্দ্রিকা বিস্তর। বিশাল বগিথালা—ভাত বিরিয়ানি লুচি যেদিন যেমন বাঞ্ছা, পূর্বাহ্নে ফরমাস হয়ে যায়। থালা ঘিরে তরকারির বাটি—কমসে-কম তিরিশখানি পদ। হেডরাঁধুনি হাজির আছে, পিছনে আরও তিন-চারটে বাঘা-বাঘা রাঁধুনি। কনকনারায়ণ তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন আয়োজনের উপর, তারপর খুশি মতন কয়েকটা জিনিসে নিরিখ করলেন। সেইগুলো বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত সরে গেল। হেডরাঁধুনি চাখছে প্রতিটি তরকারি, রাজা ঘুন হয়ে দেখছেন—চামচে

কেটে নেওয়া, মুখগহ্বরে ফেলা, চিবিয়ে গলাধঃকরণ—আদ্যন্ত প্রক্রিয়াটি। শুধু হেডরাঁধুনিতে হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে, অন্য রাঁধুনিদেরও চাখতে হয়। ডবল তে-ডবল সতর্কতা। চলে যাবার সময় প্রতি জনে হাঁ করে দেখিয়ে যাবে, মুখের মধ্যে অবশিষ্ট কিছু নেই—সবটুকু পেটে গেছে। কনকনারায়ণের বাপের আমলে খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল রানীঠাকরুনের আদেশ মতে তখন থেকে এই বন্দোবস্ত।

খাদ্য পরীক্ষা অন্তে একটি-দুটি গ্রাস সবেমাত্র মুখে তুলেছেন, হুড়মুড় করে দেওয়ানজী এসে হাজির। বিরক্ত হয়ে কনকনারায়ণ বললেন, খেতেও দেবেন না?

পুরানো লোক দেওয়ানজি, অন্দরে আসার এক্তিয়ার আছে। তা বলে এতখানি বাড়াবাড়ি বরদাস্ত করা কঠিন। মুখ কালো করে রাজা বললেন, আসুনগে দেওয়ানজি। যা কিছু আর্জি, ঘুম থেকে উঠে বিকেলবেলা শুনব।

শখ করে তিনি রোদের মধ্যে ছুটতে ছুটতে আসেন নি। টেলিগ্রাম এসেছে—মেলে ধরে দেওয়ান বললেন, রাজ্য আর নেই।

তড়াক করে উঠে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে কনকনারায়ণ মায়ের মহলে ছুটলেন। রানীঠাকরুন নামে সর্বজনা জানে তাঁকে, এস্টেট আসলে তাঁরই। মৃত্যুর পর কনকনারায়ণে অর্শাবে।

মহল বেশ খানিকটা দূর। রাজাবাহাদুর তীরবেগে ছুটলেন। খেতে খেতে আচমকা উঠে পড়েছেন—খালি পা খালি-মাথা। কী সর্বনাশ! জুতো নিয়ে জুতোবরদার ছুটল পিছন পিছন। ছাতা হাতে ছাতাবরদার ছুটেছে। ইতস্তত করে দেওয়ানও ছুটলেন—স্বমুখে রানীঠাকরুনকে যাবতীয় বৃত্তান্ত বলবেন। বরকন্দাজগুলোও ছুটতে লেগেছে। বাইরের লোক দেখলে ভাবত, রাজাকে তাড়া করেছে এতগুলো লোক।

নাগাল পায় না কেউ। নাদুসনুদুস রাজদেহে এত তাগত কে জানত। মহলে পা দিয়েই কনকনারায়ণ আর্তনাদ করে উঠলেন: মাগো—

কী হয়েছে, কী হয়েছে—বলতে বলতে রানীঠাকরুন এসে পড়লেন। কনকনারায়ণ আকুল হয়ে বলেন, সর্বনেশে খবর মা। এস্টেট আর আমাদের নেই, গবর্নমেণ্টে বাজেয়াপ্ত। আমি যা, পিছনে ঐ যারা সব আসছে ওরাও তাই।

ছেলে কি বলছে রানীঠাকরুন কানে নেন না। পিছনের উদ্দেশে হুঙ্কার ছাড়লেন: খালি পায়ে কেন রাজা বাহাদুর? ছাতাই বা কেন মাথায় ধরা হয়নি? হপ্তার মাইনে জরিমানা—দু-জনেরই। শুনে রাখবেন

দেওয়ানজি, ব্যবস্থা করবেন। বারদিগর ভুলচুক হলে বরখাস্ত হবে ওদের দল সুদ্ধ।

এঁদের ছাড়াও তা-বড় তা-বড় আরও আছেন হোটেলে—কিষণলাল বিবরণ দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু কী হবে—তিনটি যা মুশল ছাড়ল, তাতেই ধরাশায়ী আমি। দাওয়াত তৎক্ষণাৎ শিরোধার্য করে বললাম, পরিচয় করিয়ে দিবি কিন্তু ভাল করে। আগে থেকে একটু গেয়ে রাখিস।

হোটেল ডি-প্যারী নিঃসন্দেহে মস্তবড় ব্যাপার. কিন্তু বিস্তর কাল কলকাতা ছাড়া বলে খুঁজে পাচ্ছিনে। মোদি-পার্কও নয়। ওষুধের কারখানার পাশ দিয়ে রাস্তা—কিষণলাল বলে দিয়েছে। কারখানা অনেক কষ্টে পেলাম—পাশের রাস্তা নিতাই মুদি লেন।

কারখানারই একটা লোক হদিস দিয়ে দিল: গাছের গায়ে লটকে রেখেছে বটে—মোদি পার্ক। আপাতত ডোবা—ডোবা বুজিয়ে পার্কই হবে বোধহয় ওখানটা। হাঁ, হাঁ—ডোবার ধারে হোটেলও তো আছে, কারখানার লোকে খায়। ট্যাক্সি ছেড়ে পায়ে হাটুন সাহেব, গলিতে গাড়ি ঢুকবে না।

গলি ধরে তখন পদব্রজে এগোচ্ছি। চিনতে পাছে অসুবিধা ঘটে—কিষণলাল দেখি পথে দাঁড়িয়ে আছে। সাইনবোর্ডও দেখিয়ে দিল। তক্তার উপর সাদা অক্ষরগুলো রোদে-বৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে গেছে। কিষণলাল আঙুল বুলিয়ে দেখাল, গড় গড় করে তখন পড়ে গেলাম—হোটেল-ডি-প্যারী।

কিষণলাল হি-হি করে হাসে: শৌখিন নামের বাবদ করপোরেশন যখন বাড়তি লাইসেন্স-ফি নিচ্ছে না, নামে কেন কঞ্জুসপনা করতে যাব? নিতাই মুদি লেনের মুদি-টাও থেতলে দুমড়ে 'মোদি' করে রেখেছি। এ বাজারে নামেরই আসল দাম, বুঝে দেখ্। হোটেলের নাম যদি 'হিন্দু-ভোজনালয়' হত, গোড়াতেই তুই উড়িয়ে দিতিস। কারসাজিটুকু আছে বলেই আনতে পেরেছি।

তোর রাজাবাহাদুর-মিনিস্টার-সিনেমাস্টারেও কারসাজি নাকি?

ঘাড় নাড়ল কিষণলাল: আদি ও অকৃত্রিম। চোখে দেখা আছে—মিলিয়ে নিবি। উপরে থাকেন। এক নম্বর দু-নম্বর তিন নম্বর, তিন ঘরে পাশাপাশি তিনজন।

দোতলা টিনের ঘর। রসুইবাস খানাপিনা নিচের তলায়। বোর্ডাররা উপরে। ঢাউশ ছাতা মাথায় এক ব্যক্তি এই সময় কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ঠুক ঠুক করে উপরে উঠে যাচ্ছেন। কিষণলাল আঙুল দেখাল: ঐ তো একজন—রাজা

কনকনারায়ণ। চেয়ে দেখ, মিলিয়ে নে।

ছাতা মাথায় কেন রাত্তিরবেলা ?

কিষণ বলে, অভ্যেস যে চিরকালের। সেকালে ছাতাবরদারে ছত্রধারণ করত, নিজেই এখন ছাতা ধরে চলেন।

আহা, কী হয়ে গেছে চেহারা। টাকা একদিন খোলামকুচির মতো ছড়াতেন। আমি তো চিরঋণী এই মানুষটির কাছে।

কিষণলাল বলে, মিনিস্টার স্টার সে দু'টি ঘরেই আছেন। তোর কথা বলে রেখেছি, যাবি তো চল। টেবিল সাজাতে থাকুক ততক্ষণ এদিকে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই পয়লা রুমে পশুপতি সামন্ত। ভূতপূর্ব মিনিস্টার এবং ভূতপূর্ব জন্তুপতি। রুম মানে নিতান্তই এক খুপরি। শ্মশানে যে জাতীয় খাট যায় তেমনি একটা কোনক্রমে পড়েছে। দুটো মানুষ আমরা তার মাঝে ঢুকে পড়ে দাঁড়ানোর জায়গা পাচ্ছিনে।

পশুপতি খাতির করে খাটের উপর নিজের পাশে আহ্বান করলেন : বসুন—

পূর্বপরিচয় দিয়ে বলি, রাইটার্স বিল্ডিংএ আমি এক সময়ে চাকরি করে গেছি। আপনি তখন ছিলেন।

একগাল হেসে পশুপতি বললেন, এখনো আছি।

চমক লাগল। ইলেকসনে হেরে ভূত হয়েছিলেন। তার উপর সরকারি টাকা গাপ করার দায়ে মামলা ঝুলছে। বম্বের এক কাগজে পড়েছিলাম।

সন্দেহ নিরসন পশুপতি নিজেই করে দিলেন : আমি রসাতলে ডুবেছি, হরিহর রায় টাল সামলে কিন্তু এখনো সেই মিনিস্টার। চিরকালের ইয়ারবন্ধু লোক—ধন্না দিয়ে পড়লাম : রাক্ষসের প্রাণ-ভোমরা কৌটোর মধ্যে থাকে, আমার প্রাণ তেমনি রাইটার্সে। ও-জায়গা ছাড়া হয়ে একটা দিনও বাঁচব না। হরিহর কথাটা বুঝলেন, নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন।

চোখ টিপে মৃদু কণ্ঠে কিষণলাল বলল, অর্ডারলি —

কানে গিয়েছে কথাটুকু। পরম আহাম্মক কিষণটা—মুখের উপরে বলে এমনি করে ! পশুপতি কিন্তু তিলেকমাত্র লজ্জিত নন। বললেন, যা আমার বিদ্যে, দুইরকম শুধু হওয়া চলে। এয়ারকণ্ডিসণ্ড কামরায় গদির চেয়ারে-বসা মিনিস্টার, অথবা কামরার বাইরে টুলের-উপর-বসা মিনিস্টারের আরদালি। আগেরটা চুটিয়ে করেছি, পরেরটা করছি এখন। রাইটার্স বিল্ডিং ঠিকই আছে।

কিষণলালের দিকে দৃষ্টির খোঁচা দিলেন। অর্থাৎ : কেটে পড়ো, গোপন

বাতচিত এইবার। কিষণলাল ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়: ডিনার-টাইম হয়ে গেল, কী করছে দেখিগে।

দ্রুত সে নিচে নেমে গেল।

গলা নামিয়ে পশুপতি বললেন, ইলেকসন সামনে। টুল থেকে আবার চেয়ারে ওঠার বাসনা। বিজনেসম্যান আপনি, আমার সঙ্গে পুরানো সম্পর্কও আছে একটা। কিছু ধার ছাড়ুন।

জোর দিয়ে বললেন এ-ও বিজনেস—আহা-মরি বিজনেস। আপনার ধারনায় আসবে না। লেগে গেল তো মুনাফার মুড়োদাড়া নেই। আর আমার ক্ষেত্রে লাগবেই—ঘাঁত-ঘোঁত সমস্ত জানা। মিনিস্টারই হবো, বরাবর যেমন হয়ে এসেছি। ছ-মাসের মধ্যে সুদ সহ আপনার টাকা শোধ করে দেবো। তার উপরে, আমি তো কেনা হয়ে রইলাম একেবারে। লাইসেন্স-পারমিট যেটা যখন আবশ্যক, চড়-চড় করে বেরিয়ে আসবে। বম্বে পড়ে থাকতে হবে না, কলকাতায় থেকেই লাল হয়ে যাবেন।

অবিরাম বলে চলেছেন, কমা-ফুলস্টপ নেই। দু-নম্বর থেকে রমণীটি এসে বেরিয়ে উদ্ধার করলেন। সরাসরি ঢুকে পড়ে আমার কবজি এঁটে ধরলেন: ও কিষণলাল-বাবুর বন্ধু, আমার ঘরে একবারটি। আমারও অনেক কথা। চিনতে পারছেন না? এমনি না হোক, ছবিতে অঢেল দেখেছেন মধুমালতী।

দৃক্পাত না করে হিড়হিড় করে দু-নম্বর এনে ঢোকালেন—নিজের প্রক্রিয়ারে। হাত ধরে মধুমালতী ঘরে নিয়ে এলেন—সে আমলে যদি হত? দেহটা ফেঁপে ফুলে বেলুন হয়ে গিয়ে আকাশে তো ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি এতক্ষণ!

দরমার বেড়া। চৌদিকের চারখানা বেড়াই ছবিতে ঠাসা। ললনাদের ছবি—রাজকন্যা, রাজরানী, হালফ্যাসানের আধুনিকা ইত্যাদি, ইত্যাদি। কী রূপ, কী সাজসজ্জা! ছবির দিকে আঙুল ঘুরিয়ে মধুমালতী পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন: চিতোরলক্ষ্মী পদ্মিনী, সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান, প্রেম-বৃন্দাবনের শ্রীরাধা, দুর্গেশনন্দিনীর তিলোত্তমা, বসন্তবিহারের মঞ্জুলা, কুহকিনীর শান্তা……

দু-চক্ষু আমার উপর স্থাপিত করে বলেন, সমস্ত আমি। একলা আমি—বিলকুল সমস্ত। নানান মেক-আপে। ঠাহর করে করে দেখুন। অথচ আজকে আর কেউ ডাকে না—হিংসুটে ডিরেক্টররা চক্রান্ত করেছে।

একবার ছবির দিকে তাকাই, একবার মধুমালতীর দিকে। মেলাচ্ছি। দেয়ালজোড়া তন্বী নায়িকারা, আর দরমার ঘরে লোলচর্মা স্ত্রীলোক। রম্ভা-

মেনকা-তিলোত্তমারা এবং এক শাকচুন্নি। মনে মনে মোহমুদ্গার আওড়াচ্ছি : মা কুরু ধন-জন-যৌবন-গর্বম্। চক্রান্ত কেউ যদি করে থাকে, সিনেমা-ডিরেক্টর নয়—মহাকাল স্বয়ং।

তারপরেই আসল কথা : বম্বে পড়ে থাকতে হবে কেন—কলকাতায় বুঝি ব্যবসা হয় না ? ছবি করুন, আমি হিরোইন। গল্পও লিখতে জানেন শুনলাম—তবে তো আরো ভাল। আগাপাস্তলা আমায় খাটিয়ে নিতে পারবেন। ছবি রিলিজের দিন পুলিশ ডাকতে হবে বক্স-অফিস সামলানোর জন্যে। টিয়ার-গ্যাস ছাড়বে তারা। ফ্যানরা ট্রাম পোড়াবে, বাস পোড়াবে, দশ-বিশটা হাসপাতালে যাবে। বরাবর হয়ে এসেছে, এখনো হবে তাই।

উত্তেজনার বশে রক্ষে হাতটা ছেড়েছিলেন, হুঁ-হাঁ দিয়ে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়ি।

তিন নম্বরে রাজা কনকনারায়ণ, ওঁকে দেখতে পেয়েই উঠে এসেছি। জীবনে যা-কিছু উন্নতি, ওঁরই দয়া মূলে রয়েছে। উনি না হলে লেখাপড়ায় ইস্তফা পড়ত, পাড়ায় মস্তান হয়ে ঘুরতাম।

টিমটিমে হেরিকেনের আলোয় হাতল-ভাঙা চেয়ারে রাজাবাহাদুর বসে। এ-ঘরটা কিছু বড়। গোটা তিনেক পোর্টম্যাণ্টো ও কয়েকটা টুল এদিক-ওদিক ছড়ানো—মাঝখানটায় তিনি। গম্ভীর, স্থির। মনে হল, দরবার করে বসে আছেন সেকালের মতো—অদৃশ্য পারিষদবর্গ চতুর্দিকে। আমি গিয়ে প্রণাম করলাম।

চোখের উপর দিয়ে এলাম, এতক্ষণ বুঝি তাকিয়েও দেখেননি! রাজকীয় মেজাজই আলাদা। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, কে তুমি ? কী চাই ?

আপনার কলেজের ছাত্র ছিলাম। যদি কোন সেবায় লাগতে পারি—

বেনেবৃত্তি করে দুটো পয়সা হয়েছে, শুনলাম বটে কিষণলালের কাছে।

গর্জন করে উঠলেন : পয়সার গরম দেখাতে এসেছ ? বেরোও।

ছিন্ন সাজগোজ, মলিন বিষণ্ণ চেহারা। তা হলেও মর্জিমেজাজ যাবে কোথা ? রাগে কাঁপতে কাঁপতে আমায় দরজার পথ দেখিয়ে দিলেন।

নিচে এসে দেখি, টেবিল-সজ্জা সারা—ন্যাপকিন-ডিস কাঁটা-ছুরি-চামচে যেমনটি যেখানে লাগে। কিষণলাল কিঞ্চিৎ অভিমানের সুরে বলল, স্টার-মিনিস্টার-রাজা—দেখে এলি তো সব ? কারসাজি নয় তাহলে ?

সংক্ষেপে টিপ্পনী ছাড়ি : ছিলেন একদা—

তাতে কি হল! হিটলারের গুঁতোয় একদিন তা-বড় তা-বড় স্বাধীন গবর্নমেন্টের ব্যাপারেও তো ঠিক এই জিনিষ। রাজ্যপাট ছেড়েছুড়ে লণ্ডনের ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে পাশাপাশি সব দপ্তর সাজিয়ে বসেছিল।

ঠুনঠুন ঠুনঠুন ডিনারের ঘণ্টা। নারায়ণপুজোর আরতিতে পুরুতে যে রকম ঘণ্টা বাজায়। বাজাচ্ছে লোকাভাবে, হোটেল-ডি-প্যারীর প্রোপাইটার কিষণলাল স্বয়ং। টেবিলের কেন্দ্রস্থলে কোর্সগুলি এনে এনে রাখছে—ভাত, সজনে-ডাঁটার চচ্চড়ি, চুনোপুঁটির ঝোল, বরুই-এর অম্বল। ছুরি-কাঁটায় এই সমস্ত সাপটানো সমস্যা বটে, তবে আমার বেলা তত নয়! চীনারা দু-খামা মাত্র কাঠি সম্বল করে তরল স্থপ অবধি মুখে তুলে গলাধঃকরণ করে—চীনে গিয়ে আমিও কয়েকটা দিন এই ম্যাজিকে পাঠ নিয়ে এসেছিলাম। স্বদেশে এতদিন পরে আজ কাজে লাগবে।

অতিথিরা একে একে নেমে এলেন। দিক্‌পালগণের মধ্যে আমিও—সামান্য ব্যবসাদার মানুষ। বুঝুন। আজব জিনিস দেখি। আসন নিয়েই কনকনারায়ণ চুঃ-চুঃ আওয়াজ দিলেন, কোন দিক থেকে বিশাল এক হুলোবেড়াল এসে পড়ল। তরিতরকারি একটু একটু চামচেয় তুলে রাজাবাহাদুর বেড়ালের মুখ ধরছেন।

ফিসফিস করে কিষণলাল বলল, খাওয়ার আগে অন্যে চাখবে—রাজমাতা নিয়ম করে গেছেন। মানুষ নেই তো পোষা-বেড়ালে সেই কাজ করে দিচ্ছে।

কানু গাঙ্গুলির কবর

খোঁড় এখানটায়। বেশি নয়, হাত তিন চার খুঁড়লেই হবে। না পাও, আর একটু দক্ষিণে গিয়ে খোঁড়। যতক্ষণ না পাও খুঁড়ে খুঁড়ে চলে যাও দিকি। নিশ্চয় পাবে।

খুঁড়ছে ছেলেগুলো। কড়া রোদ, সর্বাঙ্গে ঘামের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, খুঁড়ে যাচ্ছে তবু।

গুপ্তধন আছে নাকি শঙ্কর-দা ?

শঙ্কর-দা বুড়ো হয়েছেন এখন। একমুখ দাড়ি। ঘাড় নেড়ে তিনি হাসলেন। মুক্তার মতো পরিচ্ছন্ন সাদা সাদা দাঁত। হাসেন কথায় কথায়, হাসি ছাড়া আর কিছু জানেন না। আর যখনই হাসেন, দু-পাটি দাঁত বিদ্যুতের

মতো ঝিলিক দিয়ে যায়।

শঙ্কর-দা হাসতে হাসতে দেখাচ্ছেন : উঁহু—এদিকে আর নয় ভাই। ডোবা ছিল, ডোবার পাশে ছিল বাঁশবন।...কি হে, হাত-পা গুটিয়ে দাঁড়িয়ে কেন তোমরা? তোমাদের ওদিকেই হবে।

কোদাল মারতে মারতে হাত রাঙা হয়ে গেছে দেখুন শঙ্কর-দা—

হাত মেলে দেখাল ছেলেটা। টুকটুকে ফরসা কোমল ছেলে—জীবনে ধরে নি কোদালের মুঠো। হাতের তলা সত্যিই রাঙা হয়ে গেছে।

শঙ্কর-দা একটু অপ্রতিভ হয়ে বললেন, কি করব—ঠিক ধরতে পারছি না যে! তখন এরকম ছিল না—বনজঙ্গল বাঁশঝাড় হ্যাপলার-মার চালা কুড়েঘর একখানা। অন্ধকার রাত্রে তাড়াতাড়ি পুঁতে ফেলেছিলাম। জায়গার নিশানা রাখা হয় নি, আর সময়ও ছিল না ভাই। আবার কোনদিন যে দিনদুপুরে খুঁড়ে দেখবার আবশ্যক হবে, একালের সোনার ছেলে তোমরা কোদাল হাতে এসে জুটবে, সে কি ভাবতে পেরেছি সেদিন?

অকৃত্রিম হাসিতে শঙ্কর-দার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তিনি বলতে লাগলেন, খোঁড়—খোঁড়াখুঁড়ি করতে করতে কলসি পেয়ে যাবে একটা। সোনার নয়, পেতলের নয়, মেটে কলসি।

কলসির ভিতর?

সেই ফরসা ছেলেটা বলে উঠল, সোনার মোহর—

আর একজন বলে, মোহর আসবে কোত্থেকে? বড়লোক ছিলেন না তো এঁরা।

বড়লোকেরা দিত টাকা নইলে এত সব কাজ চলত কি দিয়ে?

না দিলে ডাকাতি করে আসতেন।

শঙ্কর-দা তখন কিছুদূরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। এদের আলোচনা কানে যাচ্ছে না তাঁর। একেবারে অপরিচিতের মধ্যে এসে পড়েছেন, এমনি মুখের ভাব। এই গাছপালাবিহীন প্রশস্ত জায়গাটা, এই ছেলেগুলি, পীচের রাস্তা, বিদ্যুতের আলো আর বড় বড় বাড়িতে উদ্ধত এই মহকুমা-শহর—সেকালের সঙ্গে কিছুতে এদের যোগ ঘটাতে পারছেন না। দু-তিন বছর পরে এক একবার জেল থেকে বেরিয়ে নূতন পরিচয়ে শুরু করেন, ভালো চেনাজানা হবার আগেই আবার ধরে নিয়ে যায়। এবারেই বা কতদিন থাকেন, তাই দেখ।

বিকাল অবধি বিশ-পঁচিশ জায়গায় খুঁড়েও শঙ্কর-দার মাটির কলসি পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার পর তিনি অমূল্য ডাক্তারের বাড়ি গেলেন। ডাক্তার

যথারীতি কলে বেরিয়ে গেছেন। দু-হাতে টাকা রোজগার করছেন—তাঁকে বাড়ি পাওয়া দুর্ঘট। আর মানইজ্জতও খুব, এখানকার হাসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গভর্ণমেন্টের পেয়ারের মানুষ।

তিনবার গিয়ে রাত্রি সাড়ে-ন'টার পর দেখা হল অমূল্য ডাক্তারের সঙ্গে। মোটর থেকে নেমে উপরে উঠে যাচ্ছিলেন, শঙ্কর-দাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বারান্দায় এলেন।

চোখে কম দেখি, ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না। তুমি নিশ্চয় জায়গাটা দেখিয়ে দিতে পারবে অমূল্য-ভাই।

কোন্ জায়গা?

মনে পড়ছে না? ন্যাপলার-মার বাড়িতে সেই যে রাত্রিবেলা—

অনেক দিনের কথা, জীবনে এক বিস্মৃত অধ্যায়। অবশেষে অমূল্য ডাক্তারের মনে পড়ল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিচু গলায় বললেন, আমাকে আর ওসবের মধ্যে কেন দাদা? ও. বি. ই. টাইটেল দিয়েছে এবার আমাকে।

শঙ্কর-দা বললেন, ভোরবেলা বেড়াতে গিয়ে তুমি একটু আন্দাজ দিয়ে এসো। কে দেখছে বলো সে সময়? ছেলেরা সমস্ত দিন জমি কুপিয়ে আধমরা হয়ে গেছে।

শঙ্কর-দার হাত কোনদিন কেই এড়াতে পারে না, আজকে বুড়ো হয়ে পড়েছেন—এখনো নয়। অমূল্য ডাক্তারকে ঐখানে নিয়ে তবে ছাড়লেন। খুব ভোরবেলা—রাত আছে বললেই চলে—সেই সময় তাঁরা গেলেন। বাঁশবন কেটে ফাঁকা করে ফেলেছে। পাকাবাড়ি হবে—বাড়ির সীমানা ঠিক করে খুঁটো পুঁতেছে। ইট এনেছে—ঢালছে গাড়ি গাড়ি। খোয়া ভেঙে পাহাড় জমিয়েছে ওদিকে।

অমূল্য ডাক্তার বললেন, উঃ—বিষম বাড়ি ফেঁদেছে তো এতটা জমি নিয়ে!

শঙ্কর-দার চোখের সামনে দিয়ে এ সমস্ত ভেসে যায়, মনে পৌঁছয় না। নিজের খেয়াল ছাড়া বিশ্বভুবনের আর সমস্ত নিরর্থক তাঁর কাছে। অমূল্য বলতে লাগলেন, অ্যাসেম্বলির মেম্বর—মোটা মাইনে-ভাতা, তার উপর চালের সাপ্লাই দিয়ে কম টাকা মেরেছে! ডাক্তারি না করে পলিটিক্সে নামলে মুনাফা অনেক বেশি ছিল। আর আমার সুযোগও ছিল—আধাআধি তো নেমেই ছিলাম। কি বলেন?

শঙ্কর-দার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে অমূল্য ডাক্তার জায়গাটার সন্ধান করতে লাগলেন। কাঁঠালগাছের গর্তের ভিতর মৌচাক হয়েছিল—মনে আছে দাদা? এই যে সেই গাছের গোড়া। আপনার চোখ খারাপ, দেখতে পান নি। কাঁঠালগাছের

গোড়া নিশানা করে খুঁজতে বলুন তো আজকে।...খুঁড়তেও হবে না, ভিতের মধ্যে পড়ে গেছে, চুন দিয়ে দাগ দিয়েছে এই দেখুন। কত বড় বড় ঘর ফেঁদেছে—উঃ!

অমূল্য দেরি করলেন না, মানুষজন এদিকে এসে পড়বার আগেই অদৃশ্য হলেন। কবে ওরা ভিত কাটবে, কি করবে—সে অপেক্ষায় থাকবার মানুষ শঙ্কর-দা নন। একটু পরেই ছেলেদের নিয়ে এলেন।

খোঁড়—

প্রফুল্লর লোকজন হঁ-হঁা করে পড়ল: এখানে কি মশাই? আর যেখানে যা-ইচ্ছে করুন গে, ভিতের উপর খোঁড়াখুঁড়ি চলবে না।

শঙ্কর-দা বললেন, তোমাদের মনিবকে খবর দাও গিয়ে। সে এসে মানা করলে তবে থামব। পথ বেশি নয়, ছুটে চলে যাও তার কাছে। কি বলে শুনে এসোগে।

ছুটেই চলল তারা। ছেলেরা এদিকে খুঁড়ে চলেছে, কিন্তু মানা করতে কেউ ফিরে এল না। প্রফুল্ল শুনে অবহেলার ভাবে বলল, থাকগে, থাকগে—বুড়োমানুষ যা করছেন তার উপর বলতে যেও না তোমরা।

বিস্ময়ে ভ্রু-চোখ কপালে তুলে সরকার বলল, বলেন কি। এদ্দিন এদিকে-ওদিকে হচ্ছিল, আজকে যে জায়গায় আরম্ভ করেছেন। তাতে আমাদের প্ল্যান মতো বাড়ি তৈরির অসুবিধে হয়ে যাবে কিন্তু হুজুর।

প্রফুল্ল বলে, প্ল্যান বদলাতে হবে। চুপচাপ দু-চার দিন এখন তুমি বসে থাকগে, ওদিকে যেও না। ওঁর যা করবার করে চলে যান। তখন ভাবা যাবে, কোন্‌খানে বাড়ি তুললে অসুবিধা না হয়।

দু-চার দিনের আর দরকার হল না, কলসি সেই দিনই পাওয়া গেল। ঠুক করে একটু আওয়াজ কোদালের আগায়। গাছতলায় বসে আর দুটো ছেলের সঙ্গে সে আমলের গল্প করছিলেন শঙ্কর-দা। চোখে ভালো দেখেন না কান অত্যন্ত সজাগ, ছুটে চলে এলেন।

বেরিয়েছে তা হলে। কানায় কোপ ঝেড়েছিস, দফাটি সেরে দিয়েছিস তো?

কলসির কানা একটুখানি ভেঙে গিয়েছে কোদালের কোপ লেগে। ছেলেরা নেড়েচেড়ে দেখবার চেষ্টা করছে, কি আছে এর ভিতর—যার জন্য আজ দিন চারেক ধরে শঙ্কর-দা উঠে পড়ে লেগেছেন কলসি আবিষ্কারের জন্য। কিন্তু দেখবার কিছু নেই আপাতত। মাটি ঢুকে কলসির ভিতরটা বোঝাই —সোনার মোহর ইত্যাদি যদি থাকে, সে ঐ মাটি চাপা পড়ে আছে। মাটি

বের করে দেখবে, তারও আর উপায় নেই, শঙ্কর-দা এসে পড়েছেন। বলছেন, হ্যাঁ—এইটেই। এইটে বলেই মনে হচ্ছে। এক কাজ কর্—একখানা খোঁটা পুঁতে রাখ ঐখানটায়। কলসি তুলে নিয়ে আয়—দেখি, সেই কলসি কিনা।

কলসি উপরে আনা হল। শঙ্কর-দা ভিতরে হাত ঢুকিয়ে মাটি বের করে ফেলছেন। ছেলেরা চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে, নিশ্বাস পড়ছে না কারও যেন। কী তাজ্জব জিনিস না-জানি এর মধ্যে, সাত রাজার ধন কোন মাণিক! কিন্তু শঙ্কর-দা মাটি বের করেই যাচ্ছেন—কলসির তলা অবধি শুধুই মাটি। এ কলসি নয় নাকি তবে? হঠাৎ কী কতকগুলো পেয়ে আনন্দোদ্ভাসিত কণ্ঠে শঙ্কর-দা বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এই বটে!

মুঠো খুলে দেখালেন—কড়ি কতকগুলো! বললেন, পাওয়া গেছে—ওই সেই জায়গা। কলসি যেমন ছিল বসিয়ে এক টুকরা বাঁশের আগায় নিশান উড়িয়ে দে এখানে।

ছেলেরা অবাক হয়ে চেয়ে আছে। শঙ্কর-দার চোখ চক-চক করে উঠল। ধরা গলায় বললেন, কানু গাঙ্গুলির কবর এইখানটায়।

গাঙ্গুলির কবর?

শঙ্কর-দা স্তিমিত দৃষ্টিতে দূরের দিকে এক নজরে কি দেখতে লাগলেন।

এই মহকুমা শহর তখন একটা বড়গোছের গ্রাম বললেই চলে। এখান থেকে মিটারগেজের লাইন বসিয়েছিল কেশপুরের গঞ্জ অবধি। খালধারে তার ওয়ার্কশপ ছিল। ওয়ার্কশপ কম্পাউণ্ডের ভিতরেই পাশাপাশি পাঁচ-ছ'খানা বাংলো-প্যাটার্নের বাড়ি। বাড়িগুলো আজও আছে, উকিল-মোক্তাররা থাকেন। সে আমলের নামটা কেবল রয়ে গেছে—সাহেবপাড়া। মোটরবাসের দৌরাত্ম্যে রেললাইন শেষাশেষি অচল হয়ে ওঠে। সাহেব কোম্পানি এক ভাটিয়ার কাছে সবসুদ্ধ বিক্রি করে দিয়ে সরে পড়ল, এসব ভিন্ন এক কাহিনী। এখন ছোটরেলের কোনই চিহ্ন নেই এ অঞ্চলে, লড়াইয়ের সময় লোহার পাটিগুলো অবধি উপড়ে নিয়ে গেছে।

তখন শঙ্কর-দা দস্তুরমতো যুবাপুরুষ—ছাব্বিশ-সাতাশের বেশি বয়স নয়। অন্ধকারে পিছল মেঠো-পথ ধরে টিপিটিপি তাঁরা চললেন। আজকের স্বনামধন্য প্রফুল্ল মজুমদার মশায়ও সেই দলে। প্রফুল্লের বাড়ি থেকেই সব রওনা হয়েছেন। প্রফুল্লর বোন হাসিকে দেখেছেন আপনারা। মোটা থপথপে, গলায় সরু সোনার হার। ঐ বিধবা মেয়েটা তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ। কেমন করে টের পেয়েছিল বুঝি—যাবার সময় জোর করে একমুঠো সন্দেশ

খাইয়ে দিয়েছিল কানুকে। কানু কিছুতে খাবে না, তখন হাসি তার হাত ধরে ফেলল। জীবনে প্রথম ঐ সে তার হাত ধরল—গা শিরশির করে উঠেছিল কিনা বলতে পারি নে সেদিনের কুমারী মেয়ে হাসির। যা-হোক কিছু মুখে দিয়ে অন্ধকার বর্ষারাত্রে পা টিপে টিপে সকলে যাচ্ছে, গাইড ফিস-ফিস করে নির্দেশ দেয়, বুকের মধ্যে গুর-গুর করে ওঠে গাইডের কণ্ঠের মৃদু আওয়াজে।

কুলি-বস্তি উত্তীর্ণ হয়ে সাহেবপাড়ার ভিতরে পা দিলে মনে হয়, নন্দনকাননে এসে পড়লাম নাকি? ওদের সুস্থ ছেলেমেয়েগুলো লনের উপর ছুটোছুটি করে বেড়ায়, কোঁকড়ানো সোনালি চুল বাতাসে ওড়ে। রাত্রে জোরালো পেট্রোমাক্স জ্বলে প্রতি বারান্দায়, রেকর্ডে নাচের বাজনা বেজে ওঠে। আর রাস্তার অন্ধকার মোড় থেকে বস্তির ছেলেরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, অকারণে উল্লসিত হয়, ঘরে এসে সাহেবপাড়ায় কি দেখে এল, সেই গল্পগুজব করে। দূরের গ্রাম থেকে আত্মীয়-কুটুম্ব যারা আসে, তাদের কাছে ঐসব বলে গর্ববোধ করে।

খবর এসেছিল, টমাস সাহেব অনেক টাকা নিয়ে সন্ধ্যার গাড়িতে সদর থেকে এসেছে। গাড়ি লেট ছিল, সাহেব পৌঁছবার আগেই ওয়ার্কশপ বন্ধ হয়ে গেছে, সেজন্য কুলিদের মাইনে দেওয়া হয় নি, সমস্ত টাকা বাড়িতেই আছে সাহেবের।

একটা কথা জেনে রাখুন—শঙ্কর-দা প্রায়ই বলেন কথাটা—সাদা চামড়ার মানুষগুলোর মধ্যে এমন কাপুরুষ আছে, যাদের জুড়ি দুনিয়ার মধ্যে নেই। জালিয়ানওয়ালাবাগে আর আগস্ট-আন্দোলনের সময় অনেক ক্ষেত্রে ওদের বীরত্বের বহর দেখা গেছে, আর শঙ্কর-দার কাছ থেকে শুনতে পাবেন সেই রাত্রে সাহেবপাড়ার বাসিন্দাদের বীরত্ব-কাহিনী। গুলি-বোঝাই ছয় সিলিণ্ডার রিভলবার হাতে রয়েছে, কিন্তু টমাস সাহেব ট্রিগার টিপল না, কাঁপতে কাঁপতে হাত থেকে রিভলবার পড়ে গেল। আর কানাই সেইটাই তুলে ধরল তার মুখের সামনে। রাত তখন বেশি নয়, দলের একজন দু'জন গিয়ে দাঁড়িয়েছে এক এক বাংলোয়, অতগুলো প্রাণীর তাতেই প্রায় মূর্ছার অবস্থা। মোটের উপর এত নির্গোলে কাজ হাসিল হবে, কেউ এরা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি।

বেরিয়ে চলে আসছে—সাহেবরা নিপাট ভদ্রলোক, হাতখানা উঁচু করবার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছে, তারা কিছু করে নি—পিছন দিক থেকে রাইফেলের গুলি কানুর পিঠে এসে বিঁধল। বাহাদুর বলে এক গুর্খা ছোকরা ছিল পাহারাদার—গুলি করেছে সে-ই। এর জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না, আর অব্যর্থ টিপ—কানাই মাটিতে পড়ে গেল। আর ওদিকে ওই গোলযোগে

কুলিবস্তি থেকে পিল-পিল করে মানুষ বেরুচ্ছে। মানুষ দেখে সাহেবগুলোর হতভম্ব ভাব কাটল এতক্ষণে, তারাও বেরুল। কানু অসাড়, ক্ষতস্থান দিয়ে রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে। দাঁড়ানো গেল না তার পাশে, পঙ্গপালের মতো মানুষ আসছে। বিষম হৈ-চৈ, টর্চের আলোয় রাস্তা আলোকিত হয়ে গেছে। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল। কানুকে কাঁধে তুলে নেবার সুযোগ পাওয়া গেল না।

প্রফুল্লর চিরদিনই সাফবুদ্ধি, সে এক চালাকি করল। ওদের ধাঁধা দেবার জন্য তিন-চারজনে মিলে উল্টোমুখো সদর-রাস্তা বেয়ে ছুটল। বুটজুতোর আওয়াজ তুলে সাহেবগুলোও পিছু ছুটছে। বকুলতলার অন্ধকারে শঙ্কর দা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। সবাই খুব খানিকটা এগিয়ে গেলে কানুকে কাঁধে নিয়ে টিপিটিপি বাগিচার ভিতর দিয়ে বিলের প্রান্তে এসে পৌঁছলেন।

নিরন্ধ্র অন্ধকার। কানুর মুখখানা শঙ্কর-দা একবার দেখবার চেষ্টা করলেন, যে মুখে ওরা লাথি মেরে গিয়েছে। দেখা যাচ্ছে না। রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে তাঁর সর্বাঙ্গ বেয়ে। যখন ছুটছিল প্রফুল্লর পিছু পিছু, বকুলতলা থেকে ওদেরই টর্চের আলোয় শঙ্কর-দা দেখলেন, ছুটতে ছুটতে থমকে দাঁড়িয়ে একজন বুটের লাথি ঝেড়ে দিয়ে গেল চেতনাহীন কানুর মুখে। ফুটফুটে ছেলে কানাই—কোদাল পাড়তে পাড়তে মুখ রাঙা হয়ে গেছে ঐ যে ফরসা বড়লোকের ছেলেটি, ওরই মতো প্রায় দেখতে—সবে কলেজে ঢুকেছিল, পবিত্র পুণ্যবান বংশের ছেলে। শঙ্কর-দা নিঃশব্দে নিষ্পলক চোখ মেলে দেখলেন, লাথি মেরে আক্রোশ মিটিয়ে ওরা আবার ছুটল।

কানুকে নিয়ে এলেন এখানে। এই চৌরস মাঠ নয় তখন কশাড় বাঁশবাগান, তার এক প্রান্তে জেলেদের এক বুড়ি কুঁড়ে বেঁধে বসতি করত, হ্যাপলার মা বলে তাকে ডাকত সকলে। কখন কখন শুধুমাত্র 'মা' বলে ডাকতেন এঁরা, মা ডাকে বুড়ি গলে যেত। কত যে ঝঞ্চাট পোহাত! রাতবিরেতে যখনই দায় পড়ত, চলে যেতেন তাঁরা হ্যাপলার মার ওখানে। হ্যাপলার মা আজ বেঁচে নেই, তার ঘরখানার চিহ্নমাত্র নেই, ওঁদের কত সাহায্য করেছে, কত ঘটনার সাক্ষি ছিল সে। দশ বাড়ি ধান ভেনে, গোবরমাটি লেপে খাওয়া-পরা চালাত—বক-বক করা ছিল তার স্বভাব, কাজ করতে করতে কোন অদৃশ্য অলক্ষ্য শত্রুর উদ্দেশে গালি পাড়ত, যত কষ্ট হত গালিরও জোর বাড়ত তত বেশি। কিন্তু আশ্চর্য এই, কখনো কোন অবস্থায় এঁদের বিষয়ে একটা কথা উচ্চারণ করে নি বুড়ি।

হ্যাপলার মার ঘরের ভিতর তো এনে নামালেন কানুকে। টেমি জ্বলছিল,

ফুঁ দিয়ে বুড়ি সেটা নিভিয়ে দিল—কি জানি, খোঁজে খোঁজে কেউ যদি এসে পড়ে। কানুর তখন জ্ঞান ফিরেছে অল্প অল্প, অস্পষ্ট কণ্ঠে জল চাইল। ন্যাপলার মা সজল চোখে, বাসনপত্র তো নেই—নারকেলের মালায় জল গড়িয়ে দিল। শঙ্কর-দা নামিয়ে রেখেই ছুটে বেরিয়েছেন ডাক্তারের সন্ধানে। ডাক্তার এনে ফল যা হবে, সে অবশ্য জানাই আছে। তবু মনকে প্রবোধ দেওয়া—ডাক্তার দেখানো হয়েছিল। আর ডাক্তারও সেই সময়টা সহজলভ্য ছিল, ঐ অমূল্য সরকার—তাকে খবর দেওয়ার মাত্র অপেক্ষা।

পুরোপুরি ডাক্তার নয় তখন অমূল্য, ফোর্থ ইয়ারে পড়ত, প্লুরিসির মতো হয়—মাস ছয়েক তাই বাড়ি থেকে বিশ্রাম করছিল। এ ব্যাপারে বাইরের কাউকে ডাকা চলে না, অতএব অমূল্যর চেয়ে ভাল ডাক্তার আর কোথায় ?

অমূল্য ঘুমুচ্ছিল। বাইরের চৌরিঘরখানায় সে শুত, শঙ্কর-দা জানতেন। দরজায় টোকা দিলেন, ঘুম ভাঙল না। তখন ছ্যাচা-বাঁশের বেড়া দু-হাতে একটু ফাঁক করে ফিস-ফিস করে ডাকতে লাগলেন : অমূল্য—অমূল্য ! পাশ ফিরে শুল সে একবার। বাখারি ছিল একটা পড়ে, সেইটে ঢুকিয়ে খোঁচা দিতে ধড়মড় করে অমূল্য উঠে বসল।

কে ?

চুপ ! বেরিয়ে এসো—

মেঘ জমে এসেছে আকাশে, গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। শঙ্কর-দা বললেন, বুলেট রয়ে গেছে, বের করে ফেলতে হবে। শিগ্‌গির চলো।

অমূল্য বলে, তাই তো—অপারেশনের যন্ত্রপাতি কিছু যে নেই আমার কাছে।

যেন যন্ত্রপাতি থাকলেই আর কোন রকম ভাবনার বিষয় ছিল না। যাই হোক, যন্ত্রও মিলল অবশেষে। খুঁজে পেতে ভোঁতা একটা ল্যানসেট পাওয়া গেল তার বাক্সর মধ্যে। সেইটে আর এক শিশি আইডিন পকেটে পুরে অমূল্য দ্রুতপায়ে শঙ্কর-দার সঙ্গে চলল।

গিয়ে তাঁরা অবাক। আশাতীত ব্যাপার—কানু বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে, টর-টর করে কথা বলছে। প্রফুল্ল ফিরে এসেছে, হাঁপাচ্ছে সে তখনও—হাঁপাতে হাঁপাতে কৃতিত্বের গল্প করছে, কেমন করে ধোঁকা দিয়ে দলসুদ্ধ সে খেয়াঘাট অবধি নিয়ে গিয়েছিল। তারপর বোঁও করে দৌড় দিল পাটক্ষেতের দিকে—পুরোদমে ছুটলে তাকে ধরতে পারে কে। এ-ক্ষেত থেকে সে-ক্ষেতে—শেষকালে চারদিক দেখেশুনে সন্তর্পণে এখানে চলে এসেছে।

আবার টেমি জ্বালতে হল ডাক্তারকে অবস্থা দেখাবার জন্য। হাসিতে

উদ্ভাসিত কানুর মুখ, প্রফুল্লর গল্প খুব সে উপভোগ করছে। বুলেট আটকে রয়েছে পিঠের দিকটায়, এখনও রক্ত বন্ধ হয় নি, যন্ত্রণায় মুখ এক একবার কালিবর্ণ হচ্ছে, দেহ আকুঞ্চিত হয়ে উঠছে—হাসির প্রলেপ কিন্তু ঠোঁট দু'খানার উপর।

টেমির আলোর তিন দিকে ভালো করে ঢেকে দেওয়া হল, কানুর দেহ ছাড়া বাইরে কোনদিকে আলোর রেশ না বেরোয়। প্রফুল্ল আর শঙ্কর-দা তৈরি হয়ে বসেছেন, কানু ইশারায় মানা করল—ধরতে হবে না তাকে। দাঁতে দাঁতে চেপে সে উপুড় হয়ে আছে, অমূল্য ডাক্তার হাঁটু গেড়ে বসে ল্যানসেট একবার আধ-ইঞ্চিখানেক বসিয়ে আবার তুলে নিল। যাচ্ছে না ঠিকমতো। নতুন হাঁড়ি চেয়ে নিয়ে তাতে ঘষে ঘষে ধার দিল যন্ত্রটায়। আগুন করে একটুখানি সেঁকে নিয়ে তারপর এমনভাবে চিরতে লাগল যে শঙ্কর-দা অবধি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। চোখে আর দেখা যায় না—কাজ সেরে টেমিটা নিভিয়ে দিতে পারলে বাঁচেন।

কিন্তু কিছুই করা গেল না, চামড়া চিরে খোঁচাখুঁচিই হল খানিকটা। নিঃশব্দে অমূল্য নাড়ি ধরে বসে আছে। একবার দেশলাই জ্বেলে হাতঘড়ি দেখল—সাড়ে-তিনটে। মেঘভাঙা অল্প অল্প জ্যোৎস্না ফুটেছে তখন। তিনজনে ওঁরা মাটির উপর উবু হয়ে বসে আছেন। ন্যাপলার মা জল গরম করবার জন্য মাচার উপর থেকে টেনে টেনে শুকনো নারকেল পাতা বের করছে। শঙ্কর-দা ডেকে বললেন, থাক মা, আর দরকার হবে না।

ধপ করে দাওয়ার উপর সেইখানে বসে পড়ল ন্যাপলার মা।

বাঁশবনের বাসা থেকে এবারে হঠাৎ কাক ডেকে উঠল। আচ্ছন্নভাব কাটিয়ে তাঁরা চমকে উঠলেন—রাত আছে আর মোটে দণ্ড দেড়েক। প্রফুল্ল ছুটল কানুর দাদা বলরামের বাড়ি—শেষ দেখা দেখতে দেওয়া উচিত। হ্যাঁ ভাই, সরকারি উকিল রায় সাহেব বলরাম গাঙ্গুলি—মহামহোপাধ্যায় হরিচরণ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বড় ছেলে বলাই। অমন অবাক হয়ে তাকাবার কি আছে! এমনি সর্বত্র—ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। ইংরেজের খোশামুদি করে যারা দিন গুজরান করত, খোঁজ করলে দেখতে পাবে ইংরেজের প্রবলতম শত্রু হয়তো তাদের বাড়িতেই। লাঠি মেরে মাথা ফাটানো যায়, কিন্তু মনের মাথায় যে লাঠি পড়ে না! শেষাশেষি আর এদেশে ইংরেজের নিরাপদ ভূমি একটুকরাও ছিল না—কেউ ভালো চোখে দেখত না ওদের। কম মুশকিলে পড়ে ওরা ভারত ছেড়েছে!

হাত তিনেক গর্ত খোঁড়া হয়েছে ইতিমধ্যে বাঁশতলায় নাটার ঝোপের

আড়ালে। গর্তের ভিতর কানুকে এনে নামানো হল। এমনি সময় রায় সাহেব এলেন—ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে গভীর একটা নিশ্বাস চেপে নিলেন।

শঙ্কর-দা বললেন, আপনি একা এলেন গাঙ্গুলিমশায়, প্রফুল্ল মায়ের কথা বলে নি? তিনিও এসে দেখে যেতেন একটু।

বলরাম বিচলিত ভাবে না-না করে উঠলেন। বললেন, মা দেখে তো কষ্টই পাবেন শুধু, হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠবেন। তার চেয়ে আমি রটিয়ে দেব, কানু নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। বেড়াতও তো অমনি ভাবে!…না না শঙ্কর, কাজ নেই, এক কান দু-কান করে ছড়িয়ে যাবে। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা—একেবারে বংশসুদ্ধ টান পড়ে যাবে আমাদের।

পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের ম্লান আলো এসে পড়েছে কানুর মুখের উপর। ঝুপ-ঝুপ করে তিনজনে গুঁড়ো মাটি ছড়িয়ে দিচ্ছেন দেহের চারি পাশে। নিষ্পলক চোখে চেয়ে চেয়ে রায় সাহেব বলে উঠলেন, মহামহোপাধ্যায়ের ছেলের শেষটায় কবর দিলে শঙ্কর?

পরক্ষণেই সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, আমি কিছু বলছি নে এ নিয়ে। শ্মশানে নিতে জানাজানি হবে, উপায় কি বলো? যে যেমন অদৃষ্ট করে এসেছে। বলে নিঃশ্বাস ফেলে চুপ হয়ে গেলেন।

শঙ্কর-দা বললেন, হিন্দু আর মুসলমান, শ্মশানঘাট আর কবরখানা—যারা খবরের-কাগজের রাজনীতি করে, পাখার নিচে বসে টাকা-পয়সার বখরার হিসাব করে, তাদের। লড়াইয়ের মুখে জাত-বেজাতের হিসাব থাকে না রায় সাহেব।

মাটির বড় চাঁইগুলো কানুর নধর গায়ে চাপাতে কষ্ট হচ্ছে বুঝি শঙ্কর-দার, মাথার ধারে বসে হাতের মুঠোয় গুঁড়িয়ে ফেলছেন। হ্যাপলার মা এই সময়ে এই মাটির কলসি আর পাঁচ কাহন কড়ি এনে বলল, দাও বাবা, এসব ওর সঙ্গে। দিতে হয়। কড়ি নইলে বৈতরণী পার হতে দেবে না যে!

ইহলোক আর পরলোকের মধ্যে দুস্তর ভয়াল বৈতরণী নদী। কানুর বিদেহী আত্মার পারানি-কড়ি কলসির মধ্যে পুঁতে দেওয়া হল তার সঙ্গে। ধরণীর এত ঐশ্বর্যের মধ্যে পাঁচ কাহন কড়ি মাত্র শেষ সম্বল—যা ঐ হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে শঙ্কর-দা পাষাণ-মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

গর্ত ভরাট হল। তার উপর নারিকেল-পাতা বাঁশ আর বাঁশের চেলা সাজিয়ে ঢেকে দেওয়া হল। অনেক দিন ধরেই আছে যেন এই রকম, কেউ সন্দেহ করতে না পারে।

সন্দেহ কেউ করে নি। সেই অমূল্য মস্তবড় ডাক্তার—গভর্নমেণ্টের তরফে অনেক নাম, রায় সাহেব বলরাম যথারীতি সেলাম বাজিয়ে রায় বাহাদুর

রূপে সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন, আমাদের প্রফুল্লও এম. এল. এ, হয়ে গত মন্বন্তরের সময় চাল-সাপ্লাইয়ের কাজে দেদার টাকা পিটেছে। খ্যাপলার মা বুড়ি কোনকালে মরে গেছে। তার সেই বাড়ি আর আশপাশের অনেক জমি নিয়ে এক বিরাট বাগানবাড়ি ফেঁদেছে প্রফুল্ল। শঙ্কর-দা জেল থেকে এসে কানুর প্রসঙ্গ তুললেন, প্রফুল্লর মনে পড়ে গেল, তটস্থ হয়ে সে বলল, বটেই তো! জায়গাটা নিরিখ করে দিন—কবরের উপর। বাড়ি তোলা ঠিক হবে না। রেলিং দিয়ে একটা পিলার গেঁথে দেবো আমি ঐ জায়গায়।

পিলার হয়তো প্রফুল্ল সত্যই গেঁথে দেবে—কিন্তু ঐ পর্যন্ত। সে প্রফুল্ল নেই তো আর! মড়ার পাশে তাড়াতাড়ি ফুঁ দিয়ে টেমি নিভিয়ে দিয়েছিলেন কেউ দেখতে পাবে বলে—সে আলো আবার কেউ জ্বালাতে আসবে না কবরের উপর। কিংবা—ঠিক বলা যায় না, প্রফুল্লর বোন ঐ মোটা থপথপে হাসির ভাবটা যেন কেমন-কেমন। নাছোড়বান্দা তার কাছে শঙ্কর-দা সেবার বলেছিলেন এই কাহিনী। শঙ্কর-দার মতো মানুষ—তাঁরও মুখ খুলতে হয়েছিল দলের বাইরে ঐ বিধবা মেয়েটার কাছে। হাসি হাত ধরে জিজ্ঞাসা করেছিল, সেই যে চলে গেল—কোথায় গেল তার পরে শঙ্কর-দা? মিথ্যা কথা অনেক সাধনা করে এঁদের অভ্যাস করতে হয়, জাঁদরেল পুলিশ-অফিসারদের মুখের উপর অবাধে এঁরা মিথ্যা বলে যান, কিন্তু সজল-চোখ মেয়েটার সামনে শঙ্কর-দার মুখ দিয়ে কিছুতেই সেদিন মিথ্যা বেরুল না।

ভেজালের উৎপত্তি

চাল-তেল মাছ-মিঠাইয়ের আকাল। আবার ভূতেরও আকাল যাচ্ছে, সেটা ঠাহর করেননি বোধহয়। কলকাতা শহরের অলিতে গলিতে কত ভূতের-বাড়ি ছিল, ভুলেও কেউ ছায়া মাড়াত না!, ভূত সরে গিয়ে এখন মানুষ কিলবিল করে সে সব জায়গায়।

বাড়িওয়ালাদের প্রতি অনুকম্পা বশত ভূতেরা শহরের বাস তুলে পাড়াগাঁয়ে আস্তানা জুটিয়েছে, তা-ও নয়। ভূতের উপদ্রব পাড়াগাঁয়েই বা কই? দু-একটা যা শোনেন, অনুসন্ধানে প্রকাশ পেয়েছে ভূত নয় তারা—ভূতবেশী মানুষ। বলতে পারেন মানুষ-ভূত। এরা টিট হয় রোজার মন্ত্রে নয়, সরকারের আইনেও নয়, পাড়ার ছোঁড়ারা জুটেপুটে যখন সহিংস দাওয়াই

প্রয়োগ করে। মোটের উপর রোজার রুজিরোজগার বন্ধ—দিনকে-দিন তারা উৎসন্ন হয়ে যাচ্ছে।

শহরের অগুন্তি হানাবাড়িতে, এবং পল্লীর শ্মশানে গোরস্থানে বাঁশবাগানে এত যে ভূত থাকত, গেল কোথায় তারা সব ?

ধরুন, মরে গেলাম। আপনারা নন, বালাই ষাট!—আমি একলা। মৃত্যুর পর দেহ-খাঁচা থেকে আত্মা ছাড় পেল। যমদূত ধরে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অমনি যমের দরবারে হাজির করে দেবে। রেজিস্ট্রী-খাতায় আত্মা নম্বরভুক্ত হল, তারপরে ছুটি। এই অবস্থার নাম ভূত। পরলোকের কর্তারা অতিশয় বিবেচক—দেহ-খাঁচার অভ্যন্তরে এতদিন কষ্ট করে এলে, ছুটি ভোগ করো এবারে। যদ্দিন না আবার আহ্বান আসছে।

তাই করে বেড়ায় ভূতেরা। গাছের চূড়ায় চড়ে প্রাণ ভরে মুক্তবায়ুর নিঃশ্বাস দিচ্ছে খানিক, ঝুপ করে নেমে পড়ে ঢিল-পাটকেল ছুঁড়ছে এর বাড়ি তার বাড়ি, কিম্ভুত-কিমাকার মূর্তি ধরে পথচারীদের ভয় দেখাচ্ছে, এলোচুলে ডবকা ছুঁড়ি দেখে শেষমেশ তার কাঁধেই বা চেপে পড়ল। রোজা এসে লঙ্কা পুড়িয়ে নাকে ধরে, গালিগালাজ করে পিটুনি দেয়—কিছুতে না পেরে কড়া মন্তোরের ধুনোবাণ-সর্বেবাণ ছাড়ে শেষটা। ভূত অগত্যা এই কাঁধ ছেড়ে পছন্দসই আর-একটা দেখে নিয়ে সেখানে চড়ে বসল। রোজারা সেখানে আবার হানা দিয়ে পড়ে।

চলে এমনি ভূতের নৃত্য—তারপরে একদিন তলব এসে যায়। পিতামহ ব্রহ্মা ফরমান পাঠিয়েছেন: আড়াই লক্ষ বাচ্চা গর্ভগত হয়েছে, অতএব সমপরিমাণ আত্মার জরুরি আবশ্যক। চিত্রগুপ্ত লিস্টি করে দিলেন, দূতগণ ভূতের আস্তানায় আস্তানায় ছুটোছুটি করছে: ফুর্তিফার্তি অঢেল হল, আবার কি! ডিউটিতে ঢুকে পড় এবারে।

সেই বন্দীজীবন। দুই পাঁচ জনের পঁচিশ পঞ্চাশ—তেমন তেমন আয়ুষ্মান হলে নব্বুই-পঁচানব্বুই বছর অবধি টানবে। মানুষটা না মরা অবধি ছুটি নেই। খোদ ব্রহ্মার হুকুম, তার উপরে আপিলও চলবে না। মুখ চুন করে ভূতেরা ফের আত্মা হয়ে নির্দিষ্ট ভ্রূণের মধ্যে ঢুকে গেল।

এই নিয়মে চলে আসছে বরাবর। কাজ বড় কষ্টের, তবে দুই জন্মের ফাঁকে ভৌতিক স্ফূর্তিতে কষ্টের অনেকখানি উশুল করে নিত। ইদানীং অবস্থা বড় জটিল—ছুটী কমতে কমতে একেবারে শূন্যের কোঠায় ধেয়ে আসছে। এই বেরুল এক দেহ থেকে, সঙ্গে সঙ্গে নতুন দেহে ঢুকে পড়ার পরোয়ানা।

নিঃশ্বাস ফেলার ফুসরত দেয় না। জন্মের হার নাকি সাংঘাতিক রকম বেড়েছে, আত্মার জোগান দিতে হিমসিম হয়ে যাচ্ছেন যমালয়ের প্রভুরা।

জন্মাচ্ছে দেদার, আবার ওদিকে মরণ ব্যাপারটা লোপ পেয়ে যাবার গতিক। ভাল ভাল অষুধপত্তোর বেরুচ্ছে—যেসব অষুধ ডেকে কথা কয়, রোগ ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়ে। সার্জারিও এমনি নিখুঁত, একটা আস্ত মানুষ কেটে দু খণ্ড করে বেমালুম আবার জুড়ে দিচ্ছে। ফলে যমরাজের সেরেস্তায় কাজকর্ম প্রায় বন্ধ। এবং ধরণীতে হু-হু করে জনসংখ্যা বাড়ছে। ফ্যামিলি-প্ল্যানিং-এর বাঁধ দিয়ে ঠেকাবে—নিতান্তই বালির বাঁধ, স্রোতের মুখে দাঁড়াতেপারছে না।

বিষম গণ্ডগোল—যেমন এই ধরালোকে, তেমনি পরলোকেও। ছুটি বন্ধ হয়ে বিক্ষুব্ধ ভূতেরা ধর্মঘটের হুমকি দিচ্ছে। কিন্তু এত করেও তো সামলানো যায় না। উপর থেকে ঘন ঘন তাগাদাঃ আত্মার সাপ্লাই অভাবে সৃষ্টি বানচাল হয়ে যাবার গতিক। তার সঙ্গে কড়া-নোটও আসে সরাসরি যমের নামেঃ সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিন কাল জুড়ে তিন টার্মে রাজত্ব করলে—লোভ ছাড়ো এবারে, পোর্টফোলিও কোন কর্মঠ তরুণ দেবতার চার্জে দিয়ে দাও।

ব্যাকুল হয়ে যমরাজ নিজেই সেকসনে ছুটলেন। ম্যানেজার চিত্রগুপ্ত টেবিলে পা তুলে নাসাধ্বনি করে ঘুমুচ্ছে। ধড়মড় করে উঠে কৈফিয়ৎ দেয়ঃ কাজ না থাকলে ঝিমুনি ধরবে। বসেই তো আছি নিমতলা-কেওড়াতলার মতো অহোরাত্রি অফিস সাজিয়ে। মরে না মানুষ—কী করব?

দূতগুলো তোমার কি করে? শুয়ে বসে আর তাস খেলে ভুঁড়ি যে ওদের পর্বতাকার হল! ধরাতলে নেমে পড়ুক।

চিত্রগুপ্ত মিনমিন করে বলে, মরে গেলে তার পরেই তো ওদের কাজ—আত্মা এনে হাজির করে দেওয়া। মরে না যে!

যম খিঁচিয়ে উঠলেনঃ পুরানো নবাবি চাল ছাড়ো দিকি। আপোসে একটা লোকও মরবে না, বিনি ক্যানভাসিং-এ আপন নিয়মে কাজ হবার দিনকাল চলে গেছে। দূতেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বুঝিয়েসুজিয়ে দেখুক। আত্মা জোটাতে না পারলে বরখাস্ত করবে। এখন গদি চেপে লাটসাহেবি করছ—চাকরি গেলে দৌবারিকের কাজেও ডাকবে না মনে—রেখো।

চাকরির দায় বড় দায়। যমদূতেরা হুড়দাড় বেরিয়ে পড়ল। চিত্রগুপ্তও চুপচাপ থাকতে পারে না—চাকরির উদ্বেগে নিজেও বেরুল এক সময়।

গিয়ে হাজির কলকাতা শহরের দক্ষিণ প্রান্তে এক ঝানু লেখকের বাড়ি। দোতলা ছিমছাম বাড়িখানা—ঠিকানা বলব না, বাড়ির সামনে খাটিয়া পেতে

দুটো হিন্দুস্থানী গোয়ালা ঘুমুচ্ছে এই থেকে যদি চিনে নিতে পারেন। নিচের ঘর দুটোয় লেখকের মা ও বাবা আছেন, উপরটায় লেখক একলা। অক্তদার, এবং পুরানো-সিঁড়ি রাস্তা থেকে সোজা দোতলায় উঠে গেছে—প্রেমচর্চারও সুযোগ-সুবিধা প্রচুর।

রাত দশটা। কামারের হাপরের মতো শাঁ শাঁ একটা আওয়াজ আসছে একটানা। ছায়ামূর্তি প্রথমটা সেই নিচের ঘরে ঢুকে মা-জননী বলে ডাক দিল: হাঁপানির বড় কষ্ট মা-জননী প্রাণ যেন নিঙড়ে বের করে।

বেরোয় না তবু যে আপদ-বালাই—মরলে তো বেঁচে যেতাম।

একটা কথা ছুঁড়েই চিত্রগুপ্ত এতখানি ফল প্রত্যাশা করে নি। তবে যে মানুষের বদনাম দেয়, প্রাণ কড়া-মুঠোয় আঁকড়ে ধরে থাকে, মরতে চায় না কিছুতে!

পুলকিত চিত্রগুপ্ত আরও তাতিয়ে দিচ্ছে: রত্নগর্ভা আপনি মা, আপনার লেখক-ছেলেকে দুনিয়াসুদ্ধ একডাকে চেনে। আপনার মরা তো পাঁচি-খেঁদির মরা নয়—মরে দেখুন, কী মজা তখন। কাগজে কাগজে সচিত্র শোক-সংবাদ, আপনার লেখক-ছেলের ভক্তরা সব খোল বাজিয়ে খই-পয়সা ছড়িয়ে মিছিল করে নিয়ে যাবে—

মা-জননী প্রলুব্ধ কণ্ঠে বলেন, লোক আসবে অনেক, মচ্ছব হবে, কাগজে ছবি উঠবে—বানিয়ে বলছ না তো বাবা? সত্যি?

সত্যি না ঝুটো অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে নেবেন। না, মেলাবেন আর কেমন করে—তখন যে মরে গেছেন। ফুল দিয়ে খাট সাজিয়েছে, ফুলে ফুলে মড়া দেখবার জো নেই। পুলিস ভাবতে পারে, মড়াই নয়—কেরোসিনের টিন খাটে তুলে ফুলে ঢেকে ব্লাকে পাচার করছে। সেই সেকালের ফুলশয্যার রাত্রে ফুলের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন—মনে পড়ে মা-জননী? আবার তেমনি।

মা-জননী মহোৎসাহে বলেন, বটে বটে!

মড়ার খাট তো শ্মশানে নিয়ে নামাল। ডবল-চিতে সাজিয়ে ফেলেছে ওদিকে—কিলো কিলো চন্দনকাঠ। এক-ঝিনুক ঘি লোকে খেতে পায় না, টিন টিন ঘি ঢালছে চিতের আগুনে—

চিতেয় তুলে আগুনে দগ্ধাবে? ওরে বাবা, ওরে বাবা—

হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে মা-জননী আর্তনাদ করে ওঠেন: সেটি হচ্ছে না, আগুনে পুড়তে পারব না বাপু। ভীষণ জ্বালা করে। বাঁ-পায়ে কেটলির জল পড়ল সেবার, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করেছিলাম। সে তবু একখানা মাত্তোর পা, চিতের উপর কোনো অঙ্গ বাকি রাখবে না। সে ছিল গরম জল, এবারে চিতের গনগনে আগুন।

পাকা-ঘুঁটি কেঁচে যায়, চিত্রগুপ্ত মনে মনে নিজের গালে চড়াচ্ছে। বর্ণনা এতদূর না টানলেই ভাল ছিল। ঠাণ্ডা করার মানসে বলে, ধর্মীয় আপত্তি না উঠলে কবরের ব্যবস্থাও হতে পারে।

না বাপু, অন্ধকারে থাকতে পারিনে, ঘরে আমার সারা রাত আলো জ্বলে। মাটির নিচে ঘুরঘুট্টি পাতালে থাকা আমার দ্বারা পোষাবে না।

কিছুবিরক্ত হয়ে চিত্রগুপ্ত শুধায়: তবে কি রেখে দিতে বলেন দেহটা?

ওয়াক-থুঃ, পোকা পড়বে, গন্ধ গন্ধ হবে—

ধৈর্য হারিয়ে মা-জননী গর্জে উঠলেন: যোলো যা! ঘরে শুয়ে আমি হাঁপ টানি আর জগঝম্প বাজাই—কোথাকার কোন মুখপোড়া এসে মরা-মরা করছে দেখ। বেরো—

কথাবার্তার মধ্যে কিছুক্ষণ হাঁপানির বিরাম ছিল। শোধ নিচ্ছেন তার, প্রাণপণে হাঁপাচ্ছেন। চিত্রগুপ্ত দাঁড়িয়ে থাকে—হাঁপানি কমলে আবার দু-এক কথা বুঝিয়ে বলবে। না, এ হাঁপানি রাতের মধ্যে কমবে না—চোখ পাকিয়ে মা-জননী হাত নেড়ে দিলেন।

ছায়ামূর্তি অগত্যা চলল পাশের ঘরে।

তথায় পিতা—কর্তামশায়। তাঁর অবস্থা বিপরীত। শব্দসাড়া নেই, আফিমের নেশায় ঝিম হয়ে আছেন। ও-ঘরের মা-জননী তৃতীয় পক্ষ—তৃতীয় বিয়ের সময় কর্তার বয়স চুয়াল্লিশ, মা-জননীর চোদ্দ। ছাকা তিরিশটি বছরের ব্যবধান। তালগোল পাকিয়ে কর্তামশায় তক্তাপোশের উপর শুয়ে আছেন। অথবা বসেই আছেন—দু-রকমই হতে পারে। শোওয়া-বসার তফাত করার অবস্থা নেই। ছায়ামূর্তি পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ভাব জমাচ্ছে: বয়স কতহল কর্তামশায়?

তোমার কি দরকার বাপু?

বলেই বুঝি হুঁশ হল, কথা বাড়ানোয় তাঁরই ক্ষতি—মৌতাত চটে যাবে, তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দেওয়াই ভাল। বললেন, আটের কোঠার শেষাশেষি—অষ্টাশি কি উননব্বুই।

কী সর্বনাশ!

চিত্রগুপ্ত আঁতকে ওঠে। এমন বেয়াড়া রকম বাঁচলে আত্মার দুর্ভিক্ষ হবে ছাড়া কি! বলেই ফেলল, এদ্দিনে তিন বার অন্তত মরা উচিত।

কর্তা বলেন, মরা কি আমার হাতে?

আপনার হাতে বই কি! ধরুন, দোতলার ছাতে উঠে আলশের উপর থেকে হাত-পা ছেড়ে যদি রাস্তায় পড়েন। এ বয়সে ধকল সামলাতে পারবেন না, নির্ঘাত মরবেন।

কর্তা বললেন, উঠব কেমন করে ছাতে? হার্টের দোষ—সিঁড়ি ভাঙতে গেলে বুক ধড়ফড় করে।

তবে রাস্তায় নেমে লরি চাপা পড়ুন গে। ড্রাইভারগুলোর পাকা হাত—তিনটে চারটে একসঙ্গে চাপা দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে যায়। কাজখানিও এমনি নিখুঁত, মানুষগুলো রাস্তার ওপরেই খতম। হাসপাতাল অবধি বড় যেতে হয় না।

কর্তা করুণ কণ্ঠে বলেন, গাঁটে গাঁটে বাত—মাটিতেই পা ছোঁয়াতে পারিনে, রাস্তা অবধি কেমন করে যাই? হাড়গোড়-ভাঙা দ হয়ে পড়ে আছি, দেখতে পাও না? সাত-সাতটা বছর এই অবস্থা।

কথা-কথান্তরে মৌতাত কিছু চটে গিয়ে থাকবে। কৌটো খুলে আফিমের একটা বড়ি তিনি মুখে ফেলে দিলেন। আশায় আশায় চিত্রগুপ্ত বলে, এক তাল আফিমই তবে খেয়ে নিন না। হাতের কাছে রয়েছে—কষ্ট করে উঠে বসতেও হবে না, শুয়ে শুয়ে কাজ হয়ে যাবে।

আফিমের আকাল চলছে, জানো না বুঝি? লাড্ডু সাইজের খেতাম, মালের অভাবে এখন সরষে প্রমাণ ধরেছি। কে হে তুমি এ বাজারে এসে তাল তাল ফরমাস দিচ্ছ?

লোলুপ চোখে কর্তা তাকিয়ে পড়লেন চিত্রগুপ্তের দিকে: এই ক'টা বছর কায়ক্লেশে বাঁচতে পারলে হয়। বলি ঘাঁত-ঘোঁত আছে নাকি জানা? দাও না কিছু মাল জুটিয়ে।

অনুরোধের জবাব না দিয়ে কৌতূহলী চিত্রগুপ্ত প্রশ্ন করে: কি হবে এই ক'টা বছর পরে?

সমস্ত হবে—কল্পতরু হয়ে যাবে আমাদের সরকার। চাল-চিনির পাহাড়, দুধ-সর্ষেরতেলের সমুদ্দুর। ষষ্ঠ প্লানের শেষাশেষি কোন-কিছুর অনটন থাকবে না, কর্তারা কসম খেয়েছেন। বাইশ বছর কষ্ট করেছি, আরও না-হয় দশ বারোটা বছর। সে তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে!

নাঃ, বুড়োহাবড়া দিয়ে হবে না। বেশি দিন বেঁচে বেঁচে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে—পুরানো অভ্যাস ঘোচানো কঠিন। তেড়েফুঁড়ে চিত্রগুপ্ত এবারে ঘুরানো সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় খোদ লেখকের কাছে গিয়ে উঠল। ছুটকো বয়স—মরলে এরাই মরতে পারে। মরেও তাই—ভাল কাজে এবং মন্দ কাজেও।

কুন্থর খবর জানো?

প্রশ্নটা লেখকের কানে যায় না, কানে যাবার সময় নয় এখন। পুজোর লেখার চিন্তা। আঙুল টনটন করছে, মাথা ফোঁপরা—যা-কিছু ছিল, ছাড় করিয়ে দিয়েছে ছ'টা উপন্যাস ও পুরো ডজন গল্পে। তবু লিখতে হবে, না

শিখে পরিত্রাণ নেই, হাঁ করে বসে আছে সব। পাকে-প্রকারে শাসিয়েও গেছেন কেউ কেউ: বিজ্ঞাপনে নাম ছেপে বসে আছি—লেখা না দিলে কোর্টে দাঁড়াতে হবে কিন্তু।

নাছোড়বান্দা চিত্রগুপ্ত কানে না ঢুকিয়ে ছাড়বে না। বলে, তোমার কুহু যে উড়ছে।

মুখ না তুলে লেখক অন্যমনস্কভাবে বলে, আগরতলা না এর্নাকুলাম? আমায় যেন বলেছিল মাসতুত না পিসতুত কি রকমের দাদা আছে ঐ ঐ জায়গায়।

অদ্দুর নয়, এই শহরের ভিতরেই। ভেবে ভেবে তুমি মাথার চুল ছিঁড়ছ, ট্রামে-বাসে সিনেমায়-রেস্তারায় দিব্যি সে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

এ হেন মর্ম-ছেঁড়া সংবাদে লেখক খুব যে বিচলিত হয়েছে, মনে হয় না। কলম তুলে আঙুল মটকে তাকাল সে একবার।

বিশ্বাস হয় না? বেশ, মেট্রোর সামনে গিয়ে দাঁড়াও গে—শো ভাঙলে দেখতে পাবে, সোমের সঙ্গে গলাগলি হয়ে বেরুচ্ছে।

লেখক বলে, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা এখন নয়। দশটা লেখার দাদন নিয়ে বসে আছি। লেখাগুলো হয়ে গেলে তখন একদিন আসবেন, ভাল করে শুনব।

তদ্দিনে বেহাত হয়ে যাবে তোমার কুহু—

তাচ্ছিল্যের সুরে লেখক বলে, কুহু গেল তো দেবিকা, চন্দ্রলেখা, চন্দ্রিকারা সব রয়েছে। ভিন দেশেরও আছে—আফরোজা, ফিলোমেল। ট্রাম একটা চলে গেলে আমি পিছনে ছুটিনে—পিছনে কত কত আসছে!

সময়ের আর অধিক অপব্যয় না করে লেখক ঘাড় নামিয়ে খসখস করে কলম চালাতে লাগল।

ছিঃ ছিঃ, প্রেমের মাহাত্ম্য শুধু কাগজে-কলমে! নিজের বেলা দিব্যি কেমন হাত ঘুরিয়ে দিল। গল্পের মধ্যে হতাশ-প্রেমিক ডজন-ডজন তুমি বধ করে ফেল—হিটলারের গ্যাস-চেম্বারও হার মেনে যায়। গল্পের চরিত্র মরে গিয়ে ভূত হয় না যে—টের পেতে তা হলে বাছাধন! গল্পের ভূত লেলিয়ে দিতাম, দলবদ্ধ হয়ে এসে ঘাড় মটকে যেত তোমার।

রাগে গরগর করতে করতে চিত্রগুপ্ত যমলোকে ফিরল। যমদূতরাও শ'য়ে শ'য়ে ফিরে এলো সর্বদেশ থেকে। একই খবর—আপসে কেউ মরবে না দুটো-চারটে হুটকো ছোঁড়া-ছুঁড়ি ছাড়া। ভাল ভাল বচন ছাড়ে: মরণের শতপথ খোলা—মরণ মানেই পরাজয়। বাঁচা মানে শতেক সংগ্রামে জয়ী হয়ে বর্তমান থাকা। কবিতা আওড়ায় আবার: 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।' আরে বাপু সে যখন ছিল তখন ছিল। কবিগুরু বেঁচে থাকলে

ভুবনের নতুন চেহারাটা দেখে কবিতার লাইন স্বহস্তে পালটে দিতেন। কিন্তু শুনছে কে! হাত ঘুরিয়ে সবাই পথ দেখিয়ে দেয়। এক ভাগড়া মেয়ে পায়ের স্যাণ্ডেল তুলেছিল, যমদূত তখন পালানোর দিশা পায় না।

যমরাজ আর চিত্রগুপ্ত মুখোমুখি বসে গালে হাত দিয়ে চিন্তা করছেন। আত্মার দুর্ভিক্ষ ঠেকানোর উপায়টা কি?

মাথা খুলে গেল হঠাৎ—চিত্রগুপ্তেরই। বলে, ভেজাল—

একটুখানি ভেবে নিয়ে কণ্ঠে জোর দিয়ে বলে, অব্যর্থ দাওয়াই। রামা-শ্যামা ইতরজনদের কাছে যাওয়া ভুল হয়েছে—যেমন আছে থাকুকগে, ওদের ঘাঁটা দিয়ে কাজ নেই। দূতরা চলে যাক এবারে সেরা লোকের কাছে—সেরা যারা ম্যানুফ্যাকচারার, বিজনেসম্যাগনেট। পাইকার-দোকানদারগুলোকেও চোখ টিপে আসবে। প্লানটা লুফে নেবে ওরা। দুধে নর্দমার জল, চায়ে চামড়ার কুচি, চালে কাঁকর, ওষুধে ময়দা, ময়দায় তেঁতুল-বীচি—এ সমস্ত বহু-পরীক্ষিত পুরানো রেওয়াজ—কোলের বাচ্চাটা অবধি জানে। চুমরে দিলে মাথা আরও কত শত নতুন মশলা বের করবে। ভেজাল খেয়ে কতকাল মানুষ 'সুন্দর ভুবন' আঁকড়ে ধরে থাকে দেখা যাক।

প্রস্তাবটা উল্টেপাল্টে ভাল করে বিবেচনা করে দেখে যমরাজ সায় দিলেন: মন্দ বলো নি—কাজ হতে পারে।

পরমোৎসাহে চিত্রগুপ্ত বলে, ভি. আই. পি. রাজপুরুষের কাছেও দূতরা যাবে। জেনেশুনে তাঁরা যাতে চোখ বুঁজে থাকেন। তা থাকবেন নিশ্চয়ই—কাজটা আসলে তাঁদেরই তো। ফ্যামিলি প্লানিং চালিয়ে ফলের আশায় ভবিষ্যতের পানে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হয়—ভেজালে তড়িঘড়ি ফলপ্রাপ্তি। ঠিক মতন চালু হলে জনসংখ্যা তরতর করে নামবে।

যমরাজ ভাবছিলেন। তাঁরও মাথায় সহসা আলাদা এক প্লান চাড়া দিয়ে উঠল। বলেন, নরলোকে খাদ্যে ভেজাল দিক—আমরাও এদিকে আত্মার ভেজাল চালিয়ে যেতে পারি। মানুষ-আত্মার আকাল তো ভ্রূণের মধ্যে গরু-গাধা নেড়িকুত্তা-পাতিশিয়ালের আত্মা ঢুকিয়ে যাও। সাপ-ছুঁচো কেন্নো-বিছেতেই বা দোষ কি। বায়ুভূত নিরাকার জিনিস—ভাল রকম মিশাল করে করে দিও, বুড়ো ব্রহ্মার পিতামহও ধরতে পারবে না।

সেই জিনিস চলছে। নরসমাজে ইদানীং এত যে জন্তু-জানোয়ার কীট-পতঙ্গের প্রাদুর্ভাব, গূঢ় রহস্য এইখানে।